প্রবাসী, ৪৭শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৪

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

সূচী-পত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

মুদ্রাকর ও প্রকাশক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা





আমেরিকার স্কুলের ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি-'বাস'



আমেরিকার নার্সারি-স্কুলের ছেলেমেয়েরা চীনা-নাটক অভিনয় করিতেছে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫৪

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

বাংলার ইতিহাসে ১৩৫৩ ও ১৩৫৪ সাল চিরদিন বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৩৫৩ সাল অশেষ বড়বঞ্চার মধ্য দিয়া শেষ হইয়া গেল, বর্ত্তমান ১৩৫৪ সাল নানাপ্রকার জটিল সমস্যা বহন করিয়া আনিয়াছে। ১৩৫৩ সালে বাঙালী হিন্দুকে দলন ও দাসত্বে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা চরমে উঠিল, তাহার ধন-মান-সম্ভ্রম, পরিবার-পরিজনের প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইল আমাদের চক্ষের সম্মুখে। আজও দেশবাসীর মন বিপদের আশঙ্কায় আচ্ছন্ন, দেশের লোকের জীবনযাত্রার পথ প্রতি পদে বিপৎসঙ্কুল। বাংলার বাহিরেও এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে পড়িয়া বিহার, পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হইল এই ১৩৫৩ সালে। নূতন বৎসরে কি শান্তি আসিবে, সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত দেশে নিরাপত্তা কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে?

ছয় কোটি লোকের বসতি যে প্রদেশে, যে প্রদেশের লোকের গরিষ্ঠ অংশ লঘিষ্ঠ অংশকে সকল ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে উদ্যত ও উৎসুক, সে প্রদেশের শাসন ও বিচারের অধিকারীবর্গের পথ অতি দুরূহ, অতিশয় সমস্যাপূর্ণ। এমত অবস্থায় যদি জনমত ন্যায়ের পথে চলে, যদি অধিকারীবর্গ এবং কর্ত্তৃপক্ষ পক্ষপাতদোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে তবে হয়ত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিতে পারে। বর্ত্তমানে যে দলের হাতে বাংলার ভাগ্য বিদেশীর মারফত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই দলের নিকট ন্যায় বিচার বা নিরপেক্ষ ব্যবস্থা আশা করা বাতুলতা। বাংলার বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে এরূপ শোচনীয় দিন অল্পই গিয়াছে যখন বাঙালী হিন্দুর সম্মুখে এত অবিচার, এত বিপদ আসিয়াছে যেরূপ আজ বাংলাদেশে উপস্থিত। বর্ত্তমানে এদেশ যে পথে চালিত হইতেছে তাহাতে অচিরে বাংলার সর্ব্বনাশ সুনিশ্চিত, কেননা, চালকের দল অদূরদর্শী, পরস্বলোভে অন্ধ এবং মূলতঃ বিচারবুদ্ধিহীন। এইরূপ অবস্থায় বাংলা বিভাগ ভিন্ন এই বিপদের শান্তির অন্য কোন উপায় নাই—ইহা এখন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যদি কেহ অন্য পথের সন্ধানে সময় নষ্ট করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে বলিতে হইবেই যে তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক।

স্তোকবাক্যে ভুলিয়া আলেয়ার পাছে ছুটিয়া বাঙালী তো আজ কয় যুগ ধরিয়া মরিতেছে। কোথায় গিয়াছে স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, সংস্কৃতি, কোথায় গিয়াছে শান্তি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য? সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তিলে তিলে মরিবে বাঙালী আর কত দিন? স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও শান্তির পথ অতি কঠিন ইহাই তো ইতিহাসের লিখন। তবে কেন এই বৃথা চেষ্টা সহজ পথের সন্ধানের জন্য? বঙ্গ-বিভাগের জন্য অনেক কিছু ছাড়িতে হইবে, অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা স্থির করিয়া বাঙালীকে স্বাতন্ত্র্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

বস্তুতঃ বাংলাদেশ আয়তন, রাষ্ট্রনীতি, গঠননীতি সমস্যা ও লোকসমষ্টির হিসাবেই এখন দুই প্রদেশে বিভক্ত হওয়া উচিত। কার্জনের দুরভিসন্ধি বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন-ফলে সাময়িক ভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল মাত্র। পরবর্ত্তী বড়লাট ও গবর্ণরবর্গ প্রচ্ছন্নভাবে সেই কাজ চালাইয়া একই প্রদেশে দুই প্রকার বিচার ও ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে। ফলে বিশ বৎসর যাবৎ এই প্রদেশে কাজির বিচারই চলিতেছে। হিন্দু-উচ্ছেদ ও হিন্দু-নিপীড়ন ব্রিটিশ শাসকবর্গ এত দিন ছলে ও কৌশলে চালাইয়া আসিয়াছে এবং সেই ঘৃণ্য নীতির প্রধান পরিপোষক ছিল লীগ। আজ লীগ ইংরেজের চক্রান্তে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে পাইয়া পশুবলের সাহায্যে দ্রুত কার্য্যোদ্ধার করিতে উদ্যত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের কর্ত্তব্য এখন আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য ও সংহতি সম্পূর্ণভাবে বঙ্গ-বিভাগে নিয়োগ করিয়া লীগের বন্ধন ছেদন করা। ইংরেজীতে প্রবাদবাক্য আছে, 'নরকের পথ অতি সরল'—এই কথা স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মীয়বিচ্ছেদ বন্ধুবিচ্ছেদের শোক সহ্য করিয়া স্বাতন্ত্র্যের দুরূহ পথে চলিতে হইবে। অনেকের ধারণা এই যে, বঙ্গ-বিভাগ অতি সহজে এবং সরলভাবে হইবে। আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আমাদের বিশ্বাস বাঙালীকে আরও অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া, অনেক দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া এই কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।

কংগ্রেসের উচ্চতম পরিষদ বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগকে রাষ্ট্রনৈতিক 'খ'ড়ের চাল' হিসাবে চালিতেছেন এই সন্দেহ

অনেকের মনে আসিতেছে। বাংলার কংগ্রেস-সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিবৃতির শেষাংশেও ঐ জাতীয় পরিকল্পনার আভাস রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ চাল ভুল ও বিপজ্জনক। এখনকার পরিস্থিতিতে ঐ সকল চালবাজী ছাড়িয়া স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করা প্রয়োজন "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। বাংলার সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রগতি এবং জাতিগত অগ্রগতি যে জাতীয়তাবাদী দলের অশেষ ক্ষতি স্বীকার ও আত্মাহুতির ফলে হইয়াছে, বঙ্গ-বিভাগ না হইলে তাহার অস্তিত্বলোপ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই এবং বাংলার জাতীয়তাবাদ পুড়িয়া ছাই হইলে ভারতের অন্য প্রদেশে আগুন লাগিবে তাহাও নিঃসন্দেহ। পঞ্জাবের অবস্থা অনুরূপ না হইলেও মূলতঃ একই সমস্যার অন্তর্গত। সুতরাং এই দুই প্রদেশের বিভাগ যে কোন হিসাবে কংগ্রেসের কার্যপ্রকরণের শীর্ষে থাকা উচিত একথা এখন কংগ্রেসের উচ্চতর-পরিষদের স্বীকার করা প্রয়োজন।

দেশে অরাজকতা ; গবর্ণর অকর্মণ্য ও নির্বোধ, মন্ত্রীদল ভারসাম্য জ্ঞানশূন্য, মিথ্যাচার ও বিষম পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট, সমস্ত বিচার ও শাসনব্যবস্থা কলুষিত, এইরূপ অবস্থায় নববর্ষ আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবন এখন ঘোরতর বিপন্ন এবং অতিশয় দৃঢ়তার সহিত নিজেদের শক্তি ও সংহতির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে না পারিলে ভবিষ্যৎ আরও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবেই এবং আশার আলো এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাও ম্লান হইয়া যাইবে যদি আমরা মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়া বা বিপদের আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে বিরত হই।

রাত্রির পর দিন আসিবেই। বাংলাদেশে আজ প্রায় বিশ বৎসর রাত্রির অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়াই চলিতেছে। ভোরের আগেই অন্ধকার গাঢ়তম হয় এ কথা স্মরণ রাখিয়া আমাদের শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বাংলার ৬০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ও অনশনজনিত ব্যাধিতে মরিল এই সে দিন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে। এতগুলি প্রাণ গেল বিফলে, বিনা কাজে, লাভ হইল ঘুষখোর শাসকবর্গের এবং তাহাদের পরিপোষক চোরাকারবারীর। স্বাধীনতার যুদ্ধে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইলেও শেষ পর্যন্ত লাভ দাঁড়াইবেই সকলেরই। কেননা, সকল কলুষ নাশকারী স্বাধীনতার আলোয় দেশের পথ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবেই।

দেশবাসীর কর্তব্য এখন এই শেষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া। দৃঢ়চিত্তে ও নব উদ্যমে যদি চেষ্টা করা যায় তবে জাতীয়তাবাদী বাঙালীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। প্রবল-প্রতাপ সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর ব্রিটিশ সিংহ এক দিন হার মানিয়াছিল যে বাঙালীর কাছে তাহাকে কি পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে এই "ইরাণদেশের কাজি"দিগের নিকট ?

অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এখনকার অবস্থা অন্যরূপ। গৃহবিবাদ এবং গৃহশত্রুর আক্রমণ অধিকতর বিপদের কারণ। কিন্তু মন স্থির করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবেই।

বঙ্গ-বিভাগের দাবি

বঙ্গ-বিভাগের দাবি গত দুই মাসের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এক দিকে কংগ্রেসের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে এই দাবির প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে, অপর পক্ষে লীগ বঙ্গ-বিভাগ রোধ করিবার জন্য সর্বশক্তি নিযুক্ত করিবে বলিয়া প্রচার সুরু করিয়াছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মুসলমান প্রধান এমন একটিও এলাকা নাই যেখানে হিন্দুরা নিজেদের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্মান নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারে। রাজধানী কলিকাতারই এমন অবস্থা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অক্ষতদেহে বাড়ী ফিরিয়া আসিব এই ভরসা লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপায় নাই, কেহই জানে না শেষ পর্যন্ত সে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে পারিবে অথবা কোন হাসপাতালে বা মর্গে আশ্রয় লাভ করিবে। বাড়ী ফিরিলেও আসিয়া কি দেখিবে সে সম্বন্ধেও কেহ নিশ্চিত নহে। অথচ জীবিকা অর্জনের জন্য বাহির না হইয়াও উপায় নাই। শহরের বহু স্থলে বিকাল সাতটায় ঘরে-বন্ধ আইনের বলে মানুষকে ঘরে ঢুকিতে বাধ্য করা হইতেছে, ফলে ২৪ ঘণ্টার দিন সঙ্কুচিত হইয়া ১৩ ঘণ্টায় দাঁড়াইয়াছে। ইহারই মধ্যে সকল কার্য সমাপন করা কিরূপ কঠিন তাহা সরকারের কর্ণধারগণ ব্যতীত সকলেই অনুভব করিতেছেন। এই দুর্দশার জন্য জনসাধারণ দায়ী নহে, ইহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব লীগের এবং সম্প্রদায়-বিশেষের গুণ্ডা দমনে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক সরকারের। পৃথক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বীয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের অসন্তুষ্ট করিবার উপায় নাই, এই রূঢ় সত্য স্বীকার করিবারও পথ নাই, সুতরাং নির্বিরোধী লোকদের লাঞ্ছনার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াই তাঁহাদের শাসন-তৎপরতা দেখাইতে হইতেছে। যুদ্ধের সময় যে সব নামজাদা গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করায় কলিকাতার রাহাজানি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বর্তমানে গুণ্ডামির মূল নায়ক জানিয়াও মুক্ত রাখা হইয়াছে। শুধু কলিকাতা নয় নোয়াখালী, ঢাকা, বগুড়া, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানেও যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং যে নির্লজ্জতার সহিত লীগমন্ত্রীরা উহা উপেক্ষা করিয়া এবং সাফাই গাহিয়া চলিয়াছেন তাহাতে বাংলার সকল অঞ্চলের নির্যাতিত হিন্দু সমস্বরে দাবি তুলিয়াছেন যে অবিলম্বে বঙ্গ বিভাগ করিয়া এই দুঃসহ পীড়ন হইতে বাঙালীকে মুক্তি দেওয়া হউক।

বঙ্গ-বিভাগের দাবিতে লীগ ভয় পাইয়াছে ইহার প্রমাণ আজকাল লীগ সংবাদপত্রে এবং লীগ নায়কদের কাহারও কাহারও উক্তিতে মিলিতেছে। যাহারা এত দিন হিন্দু মুসলমান ভিন্ন জাতি, উভয়ে কখনও মিল হইতেই পারে না বলিয়া চীৎকার করিয়া আসিয়াছেন এখন তাঁহাদেরই কণ্ঠে হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই এবং উভয়ে একই বাঙালী জাতি বলিয়া

ধ্বনি উঠিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীও এই ধ্বনিতে কণ্ঠ মিলাইয়াছেন। যাঁহারা মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, উর্দু বলিয়া এতকাল জাহির করিয়া আসিয়াছেন এবং বঙ্গভাষাকে উর্দু মিশ্রিত খিচুড়ীতে পরিণত করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই এখন মুসলমানকে বাংলাভাষাভাষী বলিয়া বাঙালী হিন্দুর সহিত তাহার অভিন্নতা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। তবে হিন্দুর প্রতি দরদ ও কর্তব্য পালনে ইঁহাদের ইচ্ছা যে শুধু মুখের বচনে ও কাগজের লেখাতেই সীমাবদ্ধ তাহাও সহজেই ধরা পড়িতেছে। কলিকাতা এবং নোয়াখালীতে পাকিস্থানী প্রেতনৃত্যের জের এখনও একই রূপে চলিতেছে। তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা অল্পই হইয়াছে, অন্যদিকে ঢাকা এবং বগুড়া প্রভৃতি স্থানে গ্রামাঞ্চলে উহা ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং ময়মনসিংহ জেলাকে ঘাঁটি করিয়া লীগের আসাম আক্রমণে বাংলা-সরকারের সমর্থনও নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

এবারকার সাম্প্রদায়িক আক্রমণে একটি বিষয় অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা, পঞ্জাব ও সীমান্তের ঘটনায় দেখা গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী যে মুসলমান হিন্দুর সহিত পাশাপাশি বাস করিয়াছে, আপদে-বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছে, পরস্পরের উৎসবে যোগ দিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, তাহারাই অকস্মাৎ অজানা অচেনা শুধু নামটি মাত্র জানা এক ব্যক্তির আহ্বানে প্রতিবেশী এবং যুগ যুগ পরিচিত লোককে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ পাশবিক অত্যাচারে নিপীড়িত করিতে ও হত্যা করিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করে নাই। অশিক্ষিত লোকে ইহা করিয়াছে, শিক্ষিত লোক ইহাতে বাধা দেন নাই এবং উচ্চশিক্ষিত সরকারী পদাধিকারীরা এই নরপশুগুলিকে আইনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্ম প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্মের নামে যে সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোক পশুর পর্যায়ে নামিয়া আসিতে পারে, সুস্থ লোকে তাহার সহিত একত্র বাস করিবে কিনা সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকার ভদ্র মানুষ-মাত্রেরই আছে। কথায় কথায় বিহার, গড়মুক্তেশ্বর প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলি হেলন করিয়া ইঁহারা নিজেদের দুষ্কৃতি ঢাকিবার চেষ্টা করেন কিন্তু উহা নিরর্থক। কারণ বিহার, গড়মুক্তেশ্বর প্রভৃতি প্রতিক্রিয়া মাত্র, আক্রমণ নহে।

লীগনেতারা এক ধুয়া তুলিয়াছেন যে, বাংলা বিভাগ করিতে হইলে বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতিও ভাগ করিতে হইবে। কারণ যুক্তপ্রদেশে ৮০ লক্ষ, বিহারে ৫০ লক্ষ, বোম্বাইয়ে ৪০ লক্ষ, মাদ্রাজে ৪০ লক্ষ মুসলমান আছে। ইহারাও নাকি তাহাদের 'হোমল্যাণ্ড' দাবি করিতে ছাড়িবে না। কিন্তু যাহারা কোনদিন ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করে নাই, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য না করিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের চর অনুচরের কাজই করিয়াছে এবং সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে, দুই পুরুষে মুসলমান হইয়া যাহারা নিজেদের খাস আরবের অধিবাসী হাল-সাকিন বসিরহাট বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের মুখে 'হোমল্যাণ্ডের' বুলি কেন? ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে হিন্দু, স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার যদি কাহারও থাকে তবে সে হিন্দুর। হিন্দুর সুশাসনে মুসলমান নিরাপদে বসবাস করিতে পারিবে বড়জোর এই প্রতিশ্রুতি তাহারা চাহিতে পারে এবং উহা পাইবেও নিশ্চয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে মুসলমানের উপর অত্যাচারের কাহিনী যে সর্বৈব মিথ্যা পীরপুর রিপোর্টেই তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে কয়েকটি হানাহানি ঘটিয়াছে তাহার জন্ম সর্বৈব দায়ী মুসলিম লীগের উস্কানি। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া 'হোম-ল্যাণ্ড' গড়িবার আব্দার তুলিবার কোন অধিকার ইহাদের নাই।

বাংলার হিন্দুর 'হোমল্যাণ্ড' বাংলা এবং পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখের হোমল্যাণ্ড পঞ্জাব। হিন্দু তাহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-বশে মুসলমানকে বাড়িতে দিয়া নিজেই স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ হইতে বসিয়াছে। হোমল্যাণ্ড দাবি এবং হোমল্যাণ্ড বহিঃশত্রু এবং গৃহশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার অধিকার ও দায়িত্ব হিন্দুর। এবং ঠিক ঐ কারণেই যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ ভাগ হইবে কিনা তাহা নির্ধারণের অধিকারের কথা ছাড়িয়া দিয়াও সর্বপ্রথমে আমরা বলিতে পারি, ঐ সব প্রদেশ কোথায় তোমরা ভাগ করিতে চাও দেখাও, কি যুক্তি আছে বল। "Wholesale লোক বিনিময় অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।" অতএব তাহাদের জন্ম হিন্দুকে সরাইয়া জায়গা ঠিক রাখিতে হইবে বলিলে চলিবে না। তাহারা আসিবে কিনা, কে তাহাদের আনিবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। আড়কাঠি পাঠাইয়া জামাই আদর এবং সরকারী খরচে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াও বাংলা-সরকার বিহারের ৫০ লক্ষের মধ্যে লাখ দেড়েকের বেশী লোক আনিতে পারেন নাই এবং যাহারা আসিয়াছিল তাহাদেরও অধিকাংশই ছিল গৃহহারা, ভবঘুরে, গুণ্ডাশ্রেণীর লোক। "হোলসেল" লোক বিনিময়ের জন্ম যাঁহারা আজ জোর গলায় প্রচার করিতেছেন মাত্র মাসখানেক আগে তাঁহারাই কলিকাতা হইতে বিহারী-দের বিতাড়িত করিয়া বিহারী কাঁটা উপড়াইবার জন্ম আর্তনাদ করিয়াছিলেন একথাও যেন তাঁহারা ভুলিয়া না যান। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিনের পাকিস্থান সংখ্যায় খোদ জিন্না সাহেবই লাহোর পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণের পর লিখিয়া-ছিলেন যে, লোক বিনিময় কল্পনা অসম্ভব ও অবাস্তব এবং উহা বাঞ্ছনীয়ও নহে। বাংলায় বিহারী আমদানীর চেষ্টায় দেখা গিয়াছে লীগওয়ালাদের সাধ্য উহা নয়।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের দুইটি প্রদেশ গ্রাস

করিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার দাবি যিনি আজ তুলিয়াছেন, সেই মিঃ জিন্না অল্প কয়েক বৎসর আগেও পাকিস্থানের সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি গলাধঃকরণ করিতে চাহিতেছেন। ১৯৪২ সালে আমেরিকার জনৈক সাংবাদিক জিন্না সাহেবকে পাকিস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, যে-সব এলাকায় মুসলমানের অনুপাত শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন সেই এলাকাগুলিতেই তিনি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ঐ বৎসরই আগষ্ট মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের উপর মন্তব্য করিতে গিয়া আবারও তিনি বলেন, যে-সব এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন সেইগুলি লইয়াই তিনি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চান। এই হিসাবে তিনি পঞ্জাবের বড়জোর দুইটি ডিভিসন এবং বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিসন এবং রাজসাহী ডিভিসনের একাংশ মাত্র চাহিতে পারেন। অবাঞ্ছিত নিত্যকার উপদ্রব এবং সসর্প গৃহবাসের নিয়ত দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই আশায় অন্যায় জানিয়াও বাঙালী তাহা পূরণ করিতে পারে। কিন্তু সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার এবং নূতন বাংলার সীমা নির্ধারণের চূড়ান্ত অধিকার আছে জাতীয়তাবাদী বাঙালীর।

বঙ্গ বিভাগ ও লীগ

বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের গতি ও পরিণতি দেখিয়া লীগ নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গণিয়াছেন ইহা তাঁহাদের অনেক অসংলগ্ন উক্তিতে প্রমাণিত হইতেছে। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে মিঃ সুরাবর্দীর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তৃতা, মিঃ জিন্নার বিবৃতি, বাংলার লীগ সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাসেমের বিবৃতি এবং বঙ্গীয় লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব তাহার প্রমাণ। মিঃ সুরাবর্দী বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনকে হিন্দু মহাসভার কাজ এবং পরাজিতের মনোবৃত্তিসঞ্জাত বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে এই চালাকি খেলিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হিন্দু মহাসভা এই সুযোগে আবার ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি একথা বলেন নাই যে, হিন্দু মহাসভাকে যে কংগ্রেস গত নির্বাচনে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়াছিল সেই কংগ্রেস বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছে।

বঙ্গ বিভাগ অসাধারণ ক্ষতিকারক হইবে (So fraught with unending mischief) এই বলিয়া মিঃ সুরাবর্দী আন্দোলন বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্ষতিটা যেন হিন্দুরই বেশী হইবে এমন একটা ভাব তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহা ভুল; বঙ্গ বিভাগে ক্ষতি হইবে ঠিকই, সে ক্ষতি স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী বাঙালীর হইবে না, পরস্বাপহরণে উদ্যত গুণ্ডা শ্রেণীর যে সব লোক গবর্মেণ্ট হাতে পাইয়া মানুষের ধনপ্রাণ এবং নারীর সম্মান লইয়া খেলা করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়াছে ক্ষতি হইবে তাহাদেরই; কারণ বঙ্গ বিভাগের দ্বারা তাহাদের শক্তির সমস্ত উৎস হাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে। হিন্দুর টাকা, হিন্দুর সম্পত্তি হাত করিয়া হিন্দুর উপর যে অত্যাচার চলিতেছে বঙ্গ বিভাগের পর সেই টাকা লীগের হস্তচ্যুত হইবে এবং তাহাতে ক্ষতি হিন্দুর হইবে না, দুই দিনের আবুহোসেনীতে মাথা ঠিক রাখিতে না পারিয়া যাঁহারা হাতে মাথা কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ক্ষতি তাঁহাদেরই হইবে। সুতরাং বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা।

মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার বক্তৃতায় "স্বাধীন ও সার্বভৌম কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন বাংলার" লোভনীয় চিত্র আঁকিয়াছেন এবং আশ্বাস দিয়াছেন সেই বাংলায় হিন্দুর কোন ভয় থাকিবে না। এই আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি বা প্রলোভনে আর কেহ ভুলিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই। সিন্ধুর হিন্দু, পঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ, বাংলার হিন্দু ছাড়া সীমান্তের পাঠানের বৃহত্তম অংশ পর্যন্ত পাকিস্থানের নরকে প্রবেশ করিতে ঘোর আপত্তি জানাইয়াছে কাল্পনিক বিদ্বেষবশে নয়, লীগওয়ালাদের মনোবৃত্তির পরিচয় লাভ করিয়াই তাহারা লীগশাসনে মাথা গলাইতে আপত্তি জানাইয়াছে। বাংলা হইতে যে লীগ অভিযান সুরু হইয়াছে আসামের মুসলমানেরা পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। শ্রীহট্ট জেলা পাকিস্থানে প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। পাকিস্থানের নরক হইতে অব্যাহতি লাভের এই চেষ্টা লীগের অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

মিঃ সুরাবর্দী যুক্ত নির্বাচন মানিবেন কিনা, লীগ কর্তৃপক্ষের সহিত হিন্দুর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে কি করিবেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস মন্তব্য করিয়াছেন যে বাংলার মাথা-খারাপ (erratic) প্রধান মন্ত্রী বোধ হয় রাজধানীতে সমস্ত সাংবাদিককে বোকা ঠাওরাইয়াছিলেন।

ভবিষ্যৎ বাংলায় সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল থাকিতে পারিবে না বলিয়া সুরাবর্দী সাহেব আশ্বাস দিয়াছেন কিন্তু এখনই যে কেন সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডল ভাঙিয়া দেওয়া হইবে না তাহা বলেন নাই। যে বাংলার ছবি তিনি আঁকিয়াছেন সেই বাংলার সেন্সাস মিঃ সুরাবর্দীর হাতে থাকিবে। তাঁহার সত্যনিষ্ঠার যে পরিচয় আমাদের জানা আছে তাহাতে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নূতন সেন্সাস লইয়া বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা বিশ জন ইহা দেখাইলেও আমরা বিস্মিত হইব না। এইরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় তাঁহার ঐ বিবৃতিতেই রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে ১৯৪১ সালের সেন্সাসে মুসলমানদের প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করে এবং উহাতে হিন্দুর সংখ্যা খুব বেশী করিয়া দেখানো হইয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণা। পরের মুখে নিজের কথা চাপাইতে ওস্তাদ মিঃ সুরাবর্দী অতঃপর বলিতেছেন যে হিন্দুরা নিজেরাই বলিতেছে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু ক্ষয়িষ্ণু এবং পূর্ব বঙ্গের মুসলমান বর্দ্ধিষ্ণু; তৎসত্ত্বেও কেমন করিয়া ১৯৩১ সালের সাম্প্রদায়িক অনুপাত

বজায় থাকে। ইহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। সর্বশেষে তাঁহার মন্তব্য এই যে, বাংলাদেশে এমন একটি থানাও খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন যেখানে বর্ণহিন্দু এবং তপশীলী মিলাইয়াও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহাও সত্য নয়।

তপশীলীদের মধ্যে কংগ্রেস অপেক্ষা আম্বেদকরী ফেডারেশন দলের প্রভাব বেশী ইহা প্রমাণের জন্যও মিঃ সুরাবর্দী অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গত নির্বাচনে অধিকাংশ ফেডারেশনী প্রার্থী শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন বটে, কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছিলেন। প্রকৃত তথ্য এইরূপ: বঙ্গীয় পরিষদে মোট ৩০টি তপশীলী আসনের মধ্যে ২৯টিতে কংগ্রেস প্রার্থী দাঁড় করানো হয়। তন্মধ্যে ১৩ জন বিনা বাধায় নির্বাচিত হন। ১২ জন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। ফেডারেশন মোট ৮ জন প্রার্থী দাঁড় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হন। কংগ্রেসপ্রার্থীরা ভোট পান ৫৫,৯৫১ ফেডারেশনীয়রা পান ১৭,৩৯২। প্রাথমিক নির্বাচনে কংগ্রেস এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান ১,৩৮,২২৭ ভোট, ফেডারেশনীরা পান ২১,১২৯।

মিঃ সুরাবর্দীর বিবৃতি প্রকাশের পরদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাসেম এক বিবৃতিতে বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি না করেন তবে যুক্তনির্বাচন-ব্যবস্থার দ্বারা পাকিস্থান গবর্মেণ্ট গঠিত হইবে। স্বাধীন বঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের স্ব-স্ব ধর্মীয় ব্যাপারে ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে কোনও প্রকার স্বতন্ত্র অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে না। অতঃপর বিভক্ত বঙ্গের পরিণাম সম্বন্ধে হিন্দুদের ভয় দেখাইয়া হাসেম সাহেব লিখিতেছেন, 'বিভক্ত বঙ্গ সম্বন্ধে যতই আকাশকুসুম রচনা করা হউক না কেন আমি এ কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি যে তাহাতে হিন্দুরা বিদেশী পুঁজিপতিদের অধীনস্থ দিনমজুরের সমান অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।"

লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে এক বৈঠকে নেতাদের সঙ্গে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইবার জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন, তার মধ্যে মৌলবী সিরাজুদ্দীন পাঠান অন্যতম। আসাম অভিযানের জন্য যে পূর্ব পাকিস্থান কিল্লা তৈরি হইয়াছে ইনিই তাহার বড় কিল্লাদার এবং অভিযানের প্রধান নায়ক। কমিটি এক দিকে আসাম অভিযান এবং বাংলার হিন্দুদলন কার্য চালাইতে থাকিবেন, অপর দিকে বিভক্ত বঙ্গে বিদেশী পুঁজিপতিদের অধীনতা হইতে হিন্দুকে রক্ষা করিবার জন্য হাত বাড়াইবেন এবং তাঁহাদের ধারণা জাতীয়তাবাদী বাঙালী এত নির্বোধ যে ইহাই মানিয়া লইবে। লীগ নেতারা বাঙালী হিন্দুর বিশ্বাস একেবারে নিঃশেষে হারাইয়াছেন, উদারতার ও ভবিষ্যতে কর্তব্য পালনের সহস্র প্রতিশ্রুতিতেও আর কেহ ভুলিবে না। তাঁহাদের মিথ্যাচার, তাঁহাদের অত্যাচার এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতা বিংশ শতাব্দীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ ও চেষ্টার যে পরিচয় বাঙালী পাইয়াছে তাহাতে আর তাঁহাদের উপর আস্থা ফিরিবার কোন আশা নাই।

মিঃ হাসেমের বিবৃতি সম্পর্কে আজাদ লিখিয়াছেন, "একবার মিঃ হাসেম বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠার কাজে কংগ্রেসী নেতা মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর সাথে যে ভাবে মিশিয়াছিলেন তার কথা পাঠকগণ আজও ভুলিয়া যান নাই। এবার তিনি পুনরায় তাঁর চিরাচরিত ভূমিকায় নামিয়াছেন এবং অখণ্ড বাংলার ভবিষ্যতের ভাবনায় তিনি তাঁর খেয়ালমাফিক একা একাই বাংলার হিন্দুগণকে শতকরা ৫০টি রাজনৈতিক অধিকার দানের গালভরা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন। মিঃ আবুল হাসেম বাংলার নেতৃত্বের বৃথির দাবিদে ও মালিকানার একচ্ছত্র অধিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে জানাইতেছেন, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মিঃ সি. আর. দাসের ৫০:৫০-এর ভিত্তিতে বাংলার রাজনৈতিক সুযোগ ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করুক। মিঃ আবুল হাসেমের এসব কথা শুনিলেই সেই প্রবাদ বাক্যটিই মনে পড়ে—'যেখানে ফেরেশতা পা বাড়াইতে ভয় পায় সেখানে আহম্মক ঝাঁপাইয়া পড়ে।...'"

সুরাবর্দি ও আবুল হাসেমের স্তোকবাক্য কতদূর অসার সে কথা আজাদ না বলিলেও বুদ্ধিমান লোকমাত্রেই তাহা বুঝে। আজাদ লীগদলের মনোবৃত্তি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলিবার পরও যাহারা অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার কথা বলে তাহাদের আহাম্মকি বাস্তবিকই অসীম।

বাংলার সীমানা

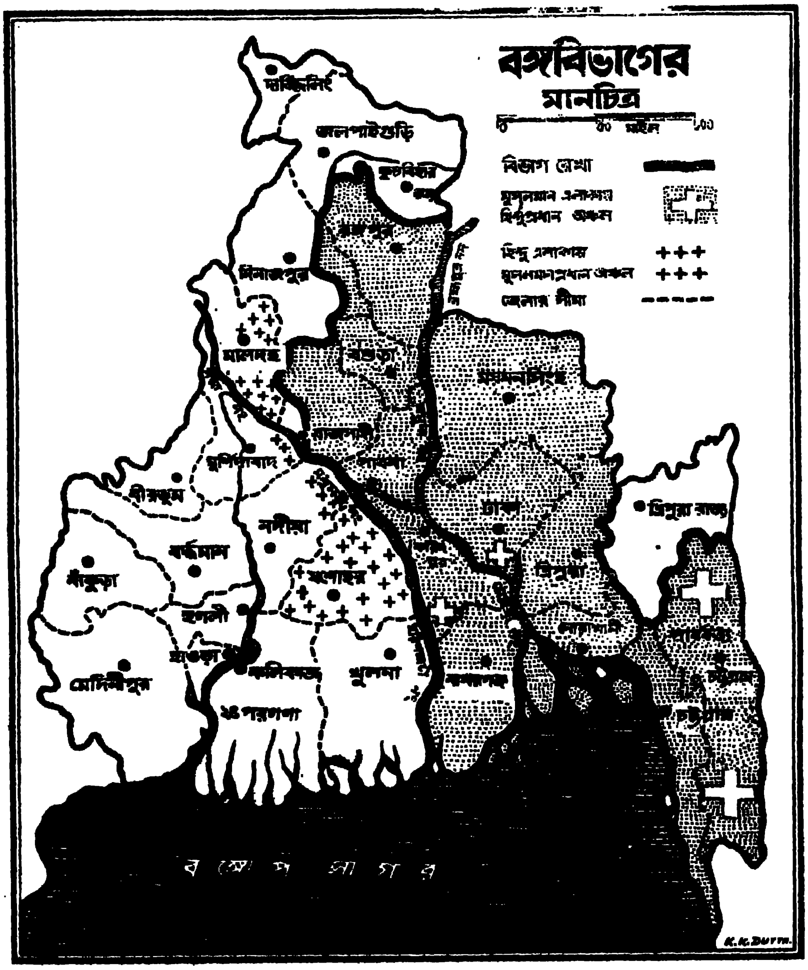
বঙ্গ-বিভাগের পর নূতন বাংলার সীমানা কিরূপ হইবে তাহা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কথা উঠিয়াছে কিন্তু তার পূর্বে বাঙালীর নিজের মন স্থির করা দরকার। সীমানা সম্বন্ধে নানা জনে নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন এবং নানা রূপ মানচিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে পঞ্জাবের পন্থা বাংলাতেও অনুসৃত হইতে পারে। জেলা বা থানার লোকসংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে সীমানা নির্দেশ অপেক্ষা আরও সহজ পন্থার অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। পঞ্জাব ও বাংলা উভয় প্রদেশেই পাঁচটি করিয়া ডিভিসন আছে, তন্মধ্যে দুইটি ডিভিসনে হিন্দু এবং দুইটিতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। পঞ্চমটির একাংশে হিন্দু ও অপরাংশে মুসলমান সংখ্যা বেশী। পঞ্জাবে দাবি উঠিয়াছে যে, দুইটি করিয়া ডিভিসন এক এক অংশকে ছাড়িয়া দিয়া পঞ্চমটি ভাগ করা হউক। বাংলাতেও ঠিক এই দাবি তোলাই যুক্তিসঙ্গত। এই হিসাবে যে দুইটি ভাগ হইবে তাহার আয়তন, লোকসংখ্যা এবং মুসলমানের সংখ্যানুপাত কি হইবে তাহা নিম্নে দেখানো হইল:

পশ্চিম বঙ্গ

	বর্গমাইল	সমগ্র লোকসংখ্যা	মুসলমান	অমুসলমান	মুসলমানের অনুপাত শতকরা
সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪,১৩৫	১,০২,৮৭,৩৬৯	১৪,২৯,৫৩০	৮৮,৫৭,৮৬৯	১৩'৯
সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৬,৪০২	১,২৮,১৭,০৮৭	৫৭,১১,৩৫৪	৭১,০৫,৭৩৩	৪৪'৬
রাজসাহী জিলার ২টি থানা	২০০	১,১৬,৯৭৯	৫৪,৬৬৬	৬২,৩১৩	৪৬'৭
মালদহ জিলা	২,০০৪	১২,৩২,৬১৮	৬,৯৯,৯৪৫	৫,৩২,৬৭৩	৫৬'৮
৪টি থানা ব্যতিরেকে দিনাজপুর জিলা	৩,৪২৮	১৬,১৬,৩৫০	৭,৫৪,৬৯১	৮,৬১,৭৫৯	৪৬'৭
জলপাইগুড়ি জিলা	৩,০৫০	১০,৮৯,৫১৩	২,৫১,৪৬০	৮,৩৮,০৫৩	২০'১
দার্জিলিং জিলা	১,১৯২	৩,৭৬,৩৬৯	৯,১২৫	৩,৬৭,২৪৪	২'৪
সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ	৪০,৪১১	২,৭৫,৩৬,২৮৫	৮৯,১০,৭৪১	১,৮৬,২৫,৫৪৪	৩২'৪

পূর্ব্ববঙ্গ

	বর্গমাইল	সমগ্র লোকসংখ্যা	মুসলমান	অমুসলমান	মুসলমানের অনুপাত শতকরা
সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ	১১,৭৬৫	৮৪,৭৭,৮৯০	৬৩,৯২,২৯১	২০,৮৫,৫৯৯	৭৫'৪
সমগ্র ঢাকা বিভাগ	১৫,৪৯৮	১,৬৬,৮৩.৭১৪	১,১৯,৪৪,১৭২	৪৭,৩৯,৫৪২	৭১'৬
রঙ্গপুর জিলা	৩,৬০৬	২৮,৭৭,৮৪৭	২০,৫৫,১৮৬	৮,২২,৬৬১	৭১'৪
দিনাজপুর হইতে ৪টি থানা	৫২৫	৩,১০,৪৮৩	২,১২,৫৫৫	৯৭,৯২৮	৬৮'৬
বগুড়া জিলা	১,৪৭৫	১২,৬০,৪৬৩	১০,৫৭,৯০২	২,০২,৫৬১	৮৩'৯
পাবনা জিলা ২টি থানা ব্যতিরেকে	১,৮৩৬	১৭,০৫,০৭২	১৩,১৩,৯৬৮	৩,৯১,১০৪	৭৭'১
রাজসাহী জিলা	২,৩২৬	১৪,৫৪,৭৭১	১১,১৮,৬১৯	৩,৩৬,১৫২	৭৬'৯
সমগ্র পূর্ববঙ্গ	৩৭,০৩১	৩,২৭৭০,২৪০	২,৪০,৯৪,৬৯৩	৮৬,৭৫,৫৪৭	৭৩'৬



সীমানা নির্ধারণে প্রথম বক্তব্য

সীমানা নির্দ্ধারণকল্পে কয়েকটি মুখ্য বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার থাকা দরকার। প্রথমতঃ, বাংলা বাঙালী হিন্দুর দেশ। মুসলমান এখানে আগন্তুকমাত্র। মুসলমানের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া হিন্দু একত্র বাস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছে। নোয়াখালী, ঢাকা প্রভৃতি যে সব মুসলমান-প্রধান স্থানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হইয়াছে সেখানে একটি বিষয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় লোকেরাই দুষ্কর্ম্মের নায়ক। ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করিয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ইংরেজ আমলের সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচনের ফল, তৎপূর্বে ইহা ছিল না এই ভ্রান্ত ধারণা যাঁহারা পোষণ করিতেছেন ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইসলাম সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাঁহাদের এই ভুল ভাঙিবে। ধর্ম্মপ্রচারের ব্যাপক

চেষ্টা এবং তার জন্য বলপ্রয়োগ মুসলমান শাসনের ইতিহাসের বিশেষত্ব। ইংরেজ-প্রবর্তিত পৃথক নির্বাচন-প্রথা এই সুপ্ত প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে যে বর্ণনা আছে তার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :

হাসন হুসেন তারা দুই ভাইয়ের নাম।
দুইজনে করে তারা বিপরীত কাম॥
কাজিয়ানী করে তারা জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাই হিন্দুয়ানী রীত॥
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল॥ ইত্যাদি

বংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে আছে :—

সাজ সাজ বলিয়া হাসন পাড়ে ডাক।
এক ডাকে বাহিরিল যোদ্ধা তিন লাখ॥
আসিয়া মিলিল সবে পদ্ম পূজা স্থান।
ই দেখিয়া হিন্দুয়ানের উড়িল পরাণ॥
কেহ পলাইয়া গেল কেহ দিল দণ্ড।
কেহকে মারিল বান্ধি করে খণ্ড খণ্ড॥
পূজা ভাঙ্গি ঘটবারি ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য পাড়ে দুই পায়॥

মুসলমান শাসনে শাসকবর্গের সহায়তায় ও সমর্থনে এই অত্যাচার হইত। এইরূপ অত্যাচারের ফল সেই প্রাচীনকালে কি হইয়াছিল সে বিষয়ে বংশীদাসের মনসামঙ্গল কাব্যে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণও পাই :—

এই সব যুক্তি তারা করই বসিয়া।
হেনকালে গোপ সব আইল সাজিয়া॥
ধর ধর মার মার বলে গোপ গণে।
মিঞা সব পলাইল ভয় পাইয়া মনে॥
বনে ঝোপে গেল তারা লড়ালড়ি পাড়ি।
মিনা কাজি পলাইতে ধরিলেক বেড়ি॥

বাংলায় মুসলমান আগমনের দুই শতাব্দীর মধ্যেই এই ব্যাপার সুরু হইয়া যায়। তদবধি এই সংঘর্ষ চলিয়াছে, কখনও বেশী কখনও বা কম। সুলতান জালালুদ্দীন এবং নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই দুই জনের আমলেই বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং হিন্দু দলনের চেষ্টা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক ভাবে হয়। ভারতবর্ষে মাত্র দুই বার এই আক্রমণ প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য এবং বিংশ শতাব্দীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের দ্বারা। হিন্দুকে মুসলমান এবং মুসলমানকে হিন্দু করিবার উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে; মারামারি হানাহানির দ্বারাও ফল হইবে না ইহাও দেখা গিয়াছে। সুতরাং বিনা রক্তপাতে এবং আপোষে এই সপ্ত শতাব্দী ব্যাপী বিরোধের অবসান চেষ্টা হওয়া উচিত। মুসলমানের মধ্যে হিন্দু এবং হিন্দুর মধ্যে মুসলমান অহরহ ভীতির মধ্যে বাস করা অপেক্ষা সীমানা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা সহজ।

সীমানা নির্ধারণে দ্বিতীয় বক্তব্য

সীমানা নির্ধারণে দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাংলা কখনও একটি প্রদেশ ছিল না; বিভিন্ন সময়ে উহার সীমানা বিভিন্ন রূপ ছিল। রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিনটি লইয়াই বর্তমান বাংলা গঠিত। সুতরাং রাঢ় ও বঙ্গ আলাদা করা এবং বরেন্দ্র ভূমির মধ্যে বাঙালীর প্রাচীনতম কৃষ্টির প্রতীক স্থান গৌড় রাঢ়ের সহিত যুক্ত করা বঙ্গ-বিভাগের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। গৌড় ও নবদ্বীপ বাংলার কৃষ্টিকেন্দ্র, ইহাদিগকে বাদ দিয়া বাঙালী হিন্দুর বাংলা গঠিত হইতে পারে না।

বিভক্ত বঙ্গের উভয় অংশের আয়তন ও জনসংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম বঙ্গ এলাকার আয়তন বেশী হইয়াছে। এই দাবিও যুক্তিসঙ্গত। গত আট মাসের হানাহানিতে দেখা গিয়াছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পৈত্রিক ভিটা মাটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন এবং সুযোগপ্রাপ্তি মাত্র তাঁহাদের মধ্যে বহু লক্ষ লোক এখনই চলিয়া আসিতে প্রস্তুত। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের একটি মুসলমানও আজ পর্যন্ত স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্থানে উঠিয়া যাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বিভক্ত বাংলার অধিবাসী বিনিময়ের প্রশ্ন অবান্তর, কারণ পশ্চিম বাংলার মুসলমানেরা পূর্ব-বঙ্গের পাকিস্থানে যাইতে চাহিবেন না, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা নিঃশেষে চলিয়া আসিতে চাহিবেন। সুতরাং পশ্চিম বাংলার আয়তন নির্ধারণের সময় এই কথা মনে রাখিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য জমি রাখা আবশ্যক হইবে। বঙ্গ-বিভাগের মূল সূত্ররূপে এই কথা সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, বাংলা বাঙালী হিন্দুর দেশ, এ দেশের উপর পূর্ণ স্বত্বাধিকার তাঁহাদের। এক দল বিদেশী আগন্তুক বাংলায় আসিয়া ছলে-বলে-কৌশলে সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া লইয়াছে বলিয়াই বাঙালী হিন্দু অনন্তকাল তাহাদের 'প্রটেক্টেড মাইনরিটি' হইয়া উহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া অনুগৃহীত জীবন যাপন করা অসম্মানজনক বলিয়া মনে করে। নিজের দেশে পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বের দাবি বাঙালী কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না।

বঙ্গ-বিভাগের দাবী প্রতিরোধের নূতন ষড়যন্ত্র

বঙ্গ-বিভাগের দাবী প্রতিরোধের চেষ্টায় মুসলিম লীগ-নেতারা নিত্য নূতন 'যুক্তি ও তথ্যে'র অবতারণা সুরু করিয়াছেন। বঙ্গবিভাগ সম্পর্কে তপশীলীদের মতামত এবং হিন্দুদের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে নানারূপ ভুল সংবাদ প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। গত সেন্সাসে বহু হিন্দু নিজ নিজ জাতি না লিখাইয়া নিজেদের শুধু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু এবং তপশীলী উভয়েই আছেন। এ

সম্বন্ধে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল :

"এই মর্মে এক অতি আজগুবি সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইতেছে যে, কলিকাতার হিন্দুদের সংখ্যা হইতেছে ১৫ লক্ষ এবং তাহার মধ্যে তপশীলী সম্প্রদায়ই হইতেছে ১০। গত আদমসুমারীর রিপোর্টে বাংলার হিন্দুদের হিসাব দেওয়া হইয়াছে তিনটি বিভিন্ন দফায়, এই তিনটি শ্রেণী হইল প্রথমতঃ, তপশীলী জাতি ; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু তবে কোন বর্ণভুক্ত তাহা আদৌ বলাই হয় নাই এবং তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সকলে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অন্য কোন প্রদেশেই হিন্দুদের এইরূপ পৃথক পৃথক জাতির নামে আলাদা করিয়া রেকর্ড করা হয় নাই। অন্য সকল প্রদেশের সেন্সাসে হিন্দুদের শুধু তপশীলী জাতি ও অপরাপর সকল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বাংলার রিপোর্ট এইরূপ বিশেষভাবে লিখিবার একটি কারণ ঘটিয়াছিল। আদমসুমারীর সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে সকল প্রকার শ্রেণীভেদ লোপ করিয়া ফেলিবার জন্য প্রদেশব্যাপী এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেন এবং সকল হিন্দুর নিকট এই বলিয়া আবেদন করেন যে, তাঁহারা যেন সেন্সাসে নিজেদের শুধু হিন্দু বলিয়া নাম লেখান এবং নিজেদের স্বতন্ত্র বর্ণের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ না করেন।

"রিপোর্টে মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদগত কোন পৃথক্ জাতির পৃথক্ উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের সকলকেই শুধু মুসলমান বলিয়া লেখা হইয়াছে। সেবারকার প্রচারকার্যের মূলে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে সমগ্র হিন্দুদের মধ্যে একতার ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু তপশীলী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই কারণ তাহাদের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রচারকার্যও অবিরাম চলিতেছিল। ইহা ব্যতীত তপশীলীদের মনেও ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা নিজেদের জাতি স্পষ্ট করিয়া না লিখাইলে তাহার ফলে হয়ত তাঁহারা তাঁহাদের প্রাপ্ত অধিকারসমূহ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

"আমাদের এই আন্দোলনের ফলে তপশীলী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলার সকল জেলাতেই বেশ ভাল রকম সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। এই উপলক্ষে আমরা লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার বিলি করিয়া বাংলার সর্বত্র হিন্দুদের আমাদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। ঐ সময় আমরা কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী লইয়া, এমন কি কলিকাতা হইতে কবি নিজেও ঐ সময়ে আদমসুমারীতে নিজেকে শুধু 'হিন্দু' বলিয়া লিখাইয়াছিলেন।

"উল্লিখিত অবস্থায় এ কথা বলা অত্যন্ত অদ্ভুত যে, যে-সকল নামের সহিত বিশেষ বর্ণের কোন কথা উল্লেখ নাই তাহার মধ্যে তপশীলীরা যথেষ্ট সংখ্যায় রহিয়াছেন। বাংলার জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের লোকের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য যদি পুনরায় লোকগণনা করা হয়, তাহা হইলে হিন্দুরাই তাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হইবে। গত লোকগণনায় মুসলিম লীগের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্ট অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার ফলে হিন্দুরা দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আজ যদি বাংলায় ঠিকমত লোকগণনার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে এই প্রদেশে হিন্দুরা আদৌ সংখ্যালঘু নয়।

"আমি আশা করি বর্তমান সঙ্কটের সময় উপরি-উক্ত বিষয়সমূহ হইতে কেহ কোনরূপ রাজনৈতিক সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন না। এই সকল বিষয় উত্থাপন করিয়া বঙ্গবিভাগের দাবির বিরোধিতার চেষ্টা করা চলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে তৃণখণ্ড আশ্রয় করিবার চেষ্টারই সমতুল্য।"

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের এই স্পষ্টোক্তির পরেও প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী দিল্লীর সাংবাদিক সম্মেলনে সেন্সাসের এই বিষয়টির সুযোগ লইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সব হিন্দু সেন্সাসে জাতি লিখান নাই তাঁহারা তপশীলী এবং বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধী।

বাংলায় ন্যায় বিচারের নমুনা

স্বধর্মী দুষ্কৃতকারীদের আইনের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা কিভাবে চলিতেছে নোয়াখালীতে তাহা খুব ভাল ভাবে দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি আলিপুর আদালতেও তাহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন মিলিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে মেটিয়াবুরুজ থানা এলাকার সংখ্যালঘুদের উপর যে নৃশংস আক্রমণ হয় সেই সম্পর্কে পুলিস তদন্ত করিয়া ৪১০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১১টি চার্জসিট দাখিল করে। কিন্তু মামলা কয়েক বার মুলতুবী থাকার পর ২৪ পরগণার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশক্রমে কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর মামলাগুলি তুলিয়া লওয়ার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেন এবং বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেটরা ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আসামীদের মুক্তি দেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপরোক্ত আদেশ নাকচ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া ১১ ব্যক্তি ২৪ পরগণার জেলা জজের আদালতে দরখাস্ত করে। জজ ঐ সকল দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া ম্যাজেষ্ট্রেটদের আদেশগুলি নাকচ করিয়া দেন এবং মামলাগুলি আইন অনুসারে বিচারের জন্য আদেশ দেন। আদেশ দান প্রসঙ্গে জজ নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :

"মামলার বিবরণ হইতে মনে হয় যে, মেটিয়াবুরুজ থানা অঞ্চলে অতিশয় ভয়ানক অপরাধসমূহ ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহা হইতে এই মামলাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া পুলিশ বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭, ৩২৬, ৪৩৬ ও ২৯৫ ধারা অনুসারে চার্জশীট দাখিল করে। ইহার মধ্যে অধিকাংশ মামলাই সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বেই প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। মামলাগুলির কোনটির যে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার করিয়া তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইয়াছে এমন নয়।

"আমি জানিতে পারিয়াছি যে, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নির্দেশক্রমে কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর মামলা প্রত্যাহারের জন্য দরখাস্ত করেন এবং বিষয়টি সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাহারও সহিত পরামর্শ করা হয় নাই। মাত্র দুইটি মামলা সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটর প্রত্যাহারের পক্ষে মত দিয়াছিলেন, কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সুস্পষ্ট অনুমতি লইয়াই যে এই দুইটি মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

"পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়াছেন যে, এই সকল মামলা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কয়েকখানি দরখাস্তে মূল ফরিয়াদীরা মামলা প্রত্যাহারে সম্মতি দিয়াছেন। এদিকে এ বিষয় সম্পর্কে বর্তমান দরখাস্তকারীদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, কতকগুলি দরখাস্তে ফরিয়াদীদের নাম আদৌ নাই, আবার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত দরখাস্তে ফরিয়াদীর যে নাম সহি আছে তাহা জাল। বলা হইয়াছে যে, আসলে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য আদৌ হয় নাই এবং শান্তি ও সম্প্রীতির কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহা একটা বাজে অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে মামলাগুলি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকের বিরুদ্ধে চলিয়াছে, পুলিস ঐগুলি চাপা দিবার জন্য অতিমাত্রায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল অভিযোগ সত্য কিনা তাহা বিচার করার আমার কোন প্রয়োজন নাই, তবে আমাকে দেখিতে হইবে যে, ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলাগুলি প্রত্যাহারের জন্য যে অনুমতি দিয়াছেন তাহা কোনরূপ অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল কিনা।

"একটি জিনিস বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ইহা হইতেছে এই যে, অপরাধগুলি দণ্ডবিধি আইনের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ধরণের এবং সেই সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অতি ব্যাপকভাবে। ঘটনাগুলি খুঁটিনাটির বর্ণনায় ভয়াবহ পাশবিকতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় যাহার তুলনা মেলা ভার। এ কথা ঠিক যে, সরকার পক্ষ ও তাঁহাদের দরখাস্তে সম্মতিদাতা ম্যাজিস্ট্রেটরা মামলা প্রত্যাহারে সহায়তা করিয়া গুরুতর দায়িত্ব হাতে লইয়াছেন। যে সকল অপরাধের অভিযোগে মামলা হইয়াছিল তাহার কোনটিই পক্ষদ্বয়ের সম্মতিক্রমে মিটানো আইনসঙ্গত হয় না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, দাঙ্গা সম্পর্কে কলিকাতা, হাওড়া ও আলিপুরে বহু মামলা গবর্ণমেণ্ট জোরের সহিত চালাইয়া যাইতেছেন, অথচ প্রত্যাহারের প্রয়োজন হইল শুধু মেটিয়াবুরুজের মামলাগুলি। যাঁহারা মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যত মহৎই হউক না কেন, এ কার্যের ফলে ব্যাপারটা নিতান্ত দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইবে এবং যে উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হইল সেই উদ্দেশ্যই ইহাতে ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মামলাগুলি প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়া আসামীদের খালাস দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটদের পক্ষে উচিত হয় নাই। আমি সমস্ত মামলা পৃথকভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছি এবং আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্ত ভুল হইয়াছে।"

জজ অতঃপর মামলাগুলি সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিয়া বলেন যে, আসামীদের মধ্যে কয়েকজনকে পুলিস পূর্বে অতিশয় বদমায়েস ও ভয়ঙ্কর স্বভাবের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল এবং কয়েকজনের জামিনের দরখাস্তে পুলিস খুব জোরের সহিত বাধা দিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের মুক্তি দিলে পুনরায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত কয়েকজন আসামীকে প্রাথমিক সাক্ষ্যপ্রমাণ অনুসারে পুলিস দোষী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল, অথচ পরে সকলেরই বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হইল।

পরিশেষে জজ বলেন যে, যে ভাবে এই মামলা প্রত্যাহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ন্যায় বিচারের মর্যাদা স্থাপনে সহায়তা করা হয় নাই। তিনি এই আদেশ দেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশ বাতিল করা হইবে এবং আসামীদের আইন অনুসারে বিচার করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িক স্বার্থসাধক দল বিশেষের উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকায় অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করিতে গাফিলতি হইতেছে, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কর্মচারী দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিলে উর্দ্ধতন লীগ কর্মচারীরা মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দিতেছেন এবং মামলা প্রত্যাহার অসম্ভব হইলে পরে দণ্ডাদেশ লাঘব অথবা স্থগিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। গুমা খাঁ নামক রায়গঞ্জ মুসলিম লীগের সভাপতির বিরুদ্ধে একটি চৌদ্দ বৎসরের বালককে গুলি করিয়া হত্যা করার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে গুমা খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টেও এই দণ্ডাদেশই বহাল থাকে এবং বিচারপতিরা মন্তব্য করেন যে বালকটি হিন্দু শুধু এই কারণে তাহাকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে সে কোনরূপ দয়া লাভের উপযুক্ত নহে। কিন্তু লীগের দয়া উথলিয়া উঠিতে বিলম্ব হয় নাই, গুমা খাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করা হইয়াছে। ঢাকা জেলার একটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট জনু মিঞা এক জন হরিজন নেতাকে মারাত্মক আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণহানি ঘটাইবার চেষ্টার অপরাধে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং মাত্র আট মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বাংলা সরকার জনু মিঞার এই দণ্ডাদেশ ভোগ স্থগিত রাখিবার আদেশ দেন। আর একটি মামলায় কলিকাতা পুলিসের এক জন এসিস্টাণ্ট কমিশনার, এক জন ইন্সপেক্টর এবং একটি থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা, তিন জনেই মুসলমান, বেপরোয়া গুলি করিয়া বাসের একটি আরোহীর মৃত্যু ঘটাইবার অভি-

যোগে কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আদি রেজার আদালতে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগের তদন্তের ভার দেওয়া হয় ইহাদেরই ঊর্দ্ধতন একজন পুলিস কর্মচারীকে এবং তাঁহার রিপোর্টে নির্ভর করিয়া কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না লইয়া অথবা কোন প্রকার বিচারের চেষ্টা না করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে মুক্তিদান করেন।

নোয়াখালীতে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া সকলকে হয় একেবারে নয়ত জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দুদের নামে পাল্টা মামলা করিয়াছে। এই সব পাল্টা মামলার বিচার আগে আরম্ভ হইয়াছে, মূল মামলা মুলতুবী আছে।

পুলিসের কাজ অপরাধের সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ এবং বিচারকের কাজ প্রকাশ্যে ঐ সব সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান। পাকিস্থানী রাজত্বে বাংলায় এই দুই ব্যবস্থাই উঠিয়া গিয়াছে। খুন, মারাত্মক জখম, গৃহে অগ্নি-সংযোগ, নারীধর্ষণ প্রভৃতির ন্যায় গুরুতর অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব পুলিসের, যে পুলিস ইহাতে অসমর্থ তাহার পদচ্যুতি স্বাভাবিক নিয়মে অপরিহার্য। অথচ বর্ত্তমান মন্ত্রীদের আমলে যেখানে হিন্দুদের উপর এই প্রকার অপরাধ অনুষ্ঠিত হইতেছে সেখানে পুলিস পরম নির্বিকার চিত্তে "কোন প্রমাণ নাই" বলিয়া রিপোর্ট দেয় এবং বিচারপতিরাও এই পুলিস রিপোর্টকেই চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া অপরাধীদের ছাড়িয়া দেন। এত মারাত্মক সব অপরাধের প্রমাণ পুলিস কেন সংগ্রহ করিতে পারে নাই এবং পুলিসের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে এই অক্ষমতার জন্য তদন্তকারী কর্মচারীদের পদচ্যুত করা উচিত এরূপ একটিও মন্তব্য কোন বিচারকের নিকট হইতে শোনা গেল না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, এক দল পাকিস্থানী অত্যাচারের সমর্থক অপর দল চাকুরীর ভয়ে অথবা পদোন্নতির লোভে সত্য স্বীকারে ও প্রকাশে ভীত।

নোয়াখালীতে এখনও অরাজকতা

নোয়াখালীর পল্লী অঞ্চলে এখনও লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি নানারূপ অরাজকতা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী মহাত্মা গান্ধীকে নোয়াখালীতে পুনরায় উপদ্রব বৃদ্ধির সংবাদ জানাইলে গান্ধীজী বিচলিত হইয়া এই মর্ম্মে তার করিয়া তাঁহাদিগকে জানান যে, তিনি মনে করেন নোয়াখালী হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের চলিয়া আসা উচিত। অন্যথায় তাহাদের এই উন্মত্ততার আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের এই দুইটির একটি পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি না পাওয়ায় পুনর্বসতি কার্য অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া, বলপূর্বক গরু বাছুর লইয়া যাওয়া, রাত্রে দলবদ্ধভাবে তাহাদের উপর আক্রমণ প্রভৃতির সংখ্যাও দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি উৎপীড়িতগণ ঘরে ফিরিয়া গিয়া জমি চাষ করিতে চাহিলেও বাধা দেওয়া হইতেছে। দুর্বৃত্ত এবং পলাতক আসামীগণ বিনা বাধায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং প্রকাশ্যে সভাসমিতিও করিতেছে। নরহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও লুণ্ঠনের অভিযোগে যে সব মামলা দায়ের করা হইয়াছিল, উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি পাওয়া যায় নাই বলিয়া সেগুলির চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়া হইতেছে। ১২২টি মামলায় ৬৯১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৪৮০ জন এখনও গ্রেপ্তার হয় নাই। ইহাদিগকে পলাতক বলিয়া বলা হয় কিন্তু প্রকাশ্যে ইহারা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইলেও পুলিস তাহাদিগকে ধরে না। অক্টোবরের ঘটনা সম্পর্কে প্রায় দুই হাজার মামলা দায়ের করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় নাই এই অজুহাতে ৭৬০টি মামলা বাতিল করা হইয়াছে। মোট ১০৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩৩৭ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, ৬৬৮ জন জামীনে খালাস পাইয়াছে এবং মাত্র ৫৪ জন বর্ত্তমানে হাজতে আছে। উপদ্রুত এলাকায় থানাগুলি হইতে সমস্ত হিন্দু কর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে। যে সব কর্মচারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করিয়াছিল তাহাদিগকেও বদলী করা হইয়াছে। যে সব কর্মচারী হাঙ্গামা দমনের বা গুণ্ডা গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। এই সব কর্মচারীর মধ্যে অনেকের নামে পাল্টা মামলা দায়ের করিয়া তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করা হইতেছে।

এই প্রকার অবস্থা অবগত হইয়া গান্ধীজী মিঃ সুরাবর্দীকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করেন, "আমি নোয়াখালী জেলার অরাজক অবস্থা সম্পর্কে বহু তার পাইতেছি। এই সমস্ত তারে মর্মভেদী ঘটনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের নিকট হইতে যে সমস্ত তার পাওয়া গিয়াছে তৎপ্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং এতৎসম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

গান্ধীজীর এই টেলিগ্রাম প্রকাশের পর মিঃ সুরাবর্দী এক বিবৃতি দিয়া নোয়াখালীর গুণ্ডামির সংবাদ উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন :—

"অসমর্থিত সংবাদের উপরে নির্ভর করিয়া সংবাদপত্রে কয়েকটি টেলিগ্রাম প্রকাশিত হওয়ায় আমি দুঃখিত। ইহাতে এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি যখনই শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত কিম্বা মহাত্মা গান্ধী কিম্বা অন্য কাহারও নিকট হইতে কোনও অত্যাচার, অপ্রীতিকর ঘটনা কিম্বা

তাহার আভাসের সংবাদ পাই, তখনই আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করি এবং সমস্ত পরিস্থিতিটি পরীক্ষা করিয়া দেখি। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এই সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং প্রায়ই ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই সমস্ত সংবাদ ভিত্তিহীন কিম্বা অতিরঞ্জিত এবং তাহা আতঙ্কপ্রসূত, অতএব এই সমস্ত সংবাদাদি যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষা না করিয়া প্রকাশ করা অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হইয়াছে। ইহাতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইবার এবং পরিস্থিতির অবনতিরই সম্ভাবনা। সাম্প্রদায়িক মনোভাব উগ্র হইয়া উঠে এমন সমস্ত বিবৃতি প্রকাশের আমি নিন্দা করিতেছি। এই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এবং যত উচ্চ মহল হইতেই এই জাতীয় সংবাদ প্রকাশিত হউক না কেন তাহা সংবাদপত্রে না প্রকাশ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাইতেছি।" প্রধান মন্ত্রী আরও বলিয়াছেন যে, "তাঁহার যত দূর জানা আছে তাহাতে নোয়াখালির অবস্থা স্বাভাবিক আছে। পৃথক পৃথক ঘটনার সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এবং সেইগুলি ঘটিলে আকাশ ভাঙিয়া পড়িল বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না। তিনি মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে ঐ সম্পর্কে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন বলিয়া জানান। তিনি ঐ সম্বন্ধে স্থানীয় অফিসারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে, সংবাদাদি পাইবার পর মহাত্মাজীকে উত্তর দিবেন।"

নোয়াখালীর অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়া দেখাইবার এই চেষ্টায় অত্যন্ত বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উহার জবাব দিয়া বলেন :—

"নোয়াখালির অবস্থা স্বাভাবিক বলিয়া প্রধান মন্ত্রী সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। জনসাধারণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, নোয়াখালী সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিতর্ক হইবার পর প্রধান মন্ত্রী গত ২১শে মার্চ ব্যবস্থা-পরিষদের কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান সদস্যের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ঐ সম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রথমতঃ স্থির হয় যে সাহায্য-কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দিবার যে কথা উঠিয়াছিল তদনুসারে কাজ না হইয়া পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত ওগুলি খোলা রাখা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সম্মেলনে আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পর প্রধান মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন যে, অবিলম্বে তিনি ঐ সকল অভিযোগ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের আদেশ দিবেন।

"সম্মেলনের পরদিন আমি দিল্লী চলিয়া যাই। যাইবার সময় আমি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলি যে তিনি যেন নোয়াখালীর উপদ্রুত অঞ্চলগুলির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ও উৎপীড়িত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া এই সকল ঘটনার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় গত ২৪শে মার্চ এই তালিকাটি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দেন। উহাতে চল্লিশটিরও অধিক লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার, অর্থনৈতিক বয়কট ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর উৎপীড়নের ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, একটি পরিবারের ১৯ জন লোককে পাশবিকভাবে হত্যা সম্পর্কিত একটি ঘটনায় ফেরার আসামী প্রকাশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে নেতৃত্ব করিতেছিল অথচ পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে নাই। যে তারিখে এই সকল অভিযোগের বিবরণ দাখিল করা হয় তাহার পরও উপরোক্ত ধরণের আরও ঘটনার কথা আমাদের জানান হইয়াছে।

"ঐ সকল ব্যাপার সম্পর্কে সুরাবর্দী কোনরূপ তদন্তের আদেশ দিয়াছেন কিনা তাহা আমাদের বা নোয়াখালীর উৎপীড়িত অধিবাসীদের কেহই জানে না। যদি তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার দ্বারাই তাঁহার গুরুতর কর্তব্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। আর সমস্ত বিষয় জানা সত্ত্বেও তিনি যে কিছুই না জানার ভান করিতেছেন ইহা আরও গুরুতর চিন্তার কথা।"

এই বিবৃতি প্রকাশের পর দিন, ১০ই এপ্রিল, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন নোয়াখালী অভিমুখে রওনা হইয়া যান। প্রধান মন্ত্রীও জনমতের চাপে বাধ্য হইয়া স্থানীয় কতিপয় কর্মচারীকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া একটা মুখরক্ষা গোছের বৈঠক করেন এবং তার পরেও বলেন যে এমন কিছুই ঘটে নাই যার জন্য নোয়াখালীর অবস্থা খারাপ মনে করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত অতঃপর কাজিরখিল ক্যাম্প হইতে একটি বিবৃতি দিলে দেখা যায় যে প্রধান মন্ত্রীর উক্তি ভিত্তিহীন। তিনি বলেন যে, ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনি নোয়াখালীর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে ৯০টি অপরাধের বিবরণ দাখিল করিয়াছেন কিন্তু তার কোন প্রতিকার করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের পূর্ণ বিবৃতিটি এই (তারিখ ১৫ই এপ্রিল):

"আমি এতদিন সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি প্রকাশ করিতে চাহি নাই। আমি এতদিন শুধু নোয়াখালীতে ঘটনাগুলি সম্পর্কে সমস্ত বিষয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ও প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়া যাইতেছিলাম ও গান্ধীজীর নিকট সমস্ত বিবরণের একটি করিয়া অনুলিপি পাঠাইয়া দিতেছিলাম। আমি যে এতদিন এ সকল ব্যাপার সম্পর্কে সংবাদপত্রে কোন বিবৃতি দিই নাই তাহার কারণ এই যে, গবর্মেণ্টের কার্যে অন্তরায় কোন কিছু বাধার সৃষ্টি করা আমার অভিপ্রেত ছিল না এবং আমার আশা ছিল যে, গবর্মেণ্ট প্রয়োজনবোধ করিলে তাঁহাদের কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু গত শনিবার প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার

একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমি সংবাদ-পত্রে কোনরূপ রিপোর্ট দিয়া থাকি একথা বলিয়া প্রধান মন্ত্রী একটি ভুল করিয়াছেন।

"প্রধান মন্ত্রী জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট যে রিপোর্ট পাইয়া থাকুন না কেন বর্তমানে নোয়াখালীতে অগ্নি-সংযোগ, বয়কট ও ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। আমরা চাই হিন্দুরা এখানে বাস করুক। এই কারণেই আতঙ্কের সৃষ্টি করা আমাদের নীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। প্রধান মন্ত্রী ও গান্ধীজীর নিকট আমি যে সকল টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি তাহা সমস্ত সত্য ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে ঐ সকল বর্ণনা আজগুবি। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমি ভিন্ন মত হইতে বাধ্য। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে এযাবৎ আমি পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট মোট ৯৬টি ঘটনার বিবরণ দাখিল করিয়াছি। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। এই সকল ঘটনা হইতে জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কেও কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। শোনা যাইতেছে যে, গত অক্টোবর মাসের হাঙ্গামা সম্পর্কে যে সকল লোকের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে তাহাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে আর এই মামলা চালানো হইবে না। এই ব্যাপারটি যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি উদ্বেগজনকও বটে। ফেরারী আসামীরা চতুর্দিকে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের এই সকল কার্যকলাপ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

"বাংলাদেশের রচনাত্মক কার্যের প্রধান কর্মীরা এখন গান্ধী ক্যাম্পে কাজ করিতেছেন, ইহা ব্যতীত গান্ধীজীর সেবা-গ্রামের কয়েকজন সহকর্মীও এখানে রহিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কর্ণেল জীবন সিংহজীও আছেন। বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সকলেরই মত এক ; তবে এক এক অঞ্চলে অবস্থা এক এক রকম রহিয়াছে।

"আমরা আশা করি, সমানে কাজ করিয়া যাইব এবং জনসাধারণ বিপদের মধ্যে স্থির থাকিতে চেষ্টা করিবেন। প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার পরও আমি আশা করিতে থাকিব যে তিনি যদি সত্যই গান্ধীজীকে বিহারে কার্যরত রাখিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি এখনও তাঁহার নীতির পরিবর্তন করিবেন।"

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দেন তাহাতেও শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের উক্তিই সমর্থিত হয়। এই বিবৃতিতে বলা হয় :—

"সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আস্থা হারাইয়াছে। সম্প্রতি আবার গোলমাল সুরু হইয়াছে। অগ্নিসংযোগ, চুরি, ঘর ভাঙিয়া জোর করিয়া জিনিসপত্র অপসারণ হামেশাই ঘটিতেছে। কাজিরখিল ক্যাম্প হইতে এইরূপ ৭০টি ঘটনা তথ্যসহ কর্তৃপক্ষকে জানানো হইয়াছে কিন্তু এখনও এ সম্পর্কে কোনও তদন্ত হয় নাই। রামগঞ্জ থানাতেই গোলযোগ বেশী চলিয়াছে। এই অঞ্চলেই দুর্বৃত্তদের বাসস্থান। গোপেরবাগ মামলার আসামী এখনও ফেরার অথচ ১০ই এপ্রিল ঐ ব্যক্তিকে পোড়াদহ রেল-ষ্টেশনে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩ই এপ্রিল রামগঞ্জ থানার অধীনে এক চায়ের দোকানে উহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ পুলিসই নাকি তাহাকে দেখিতে পায় না। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বর্তমানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহার মধ্যে একটি হইতেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বয়কট। কোন কোন স্থানে বাহির হইতে দরজা আটকাইয়া বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি লোকের একখানি কুটির অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, বেপরোয়া ভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হইতেছে। শোভাযাত্রা বাহির করা, ধ্বনি উচ্চারণ ও সভাসমিতি করিয়া সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের উস্কানি দেওয়া হামেশাই চলিতেছে। জনৈক মন্ত্রী মহাশয় রামগঞ্জে পাকিস্থান দিবসে সভা করিয়াই কাজ খারাপ করিয়াছেন। গরুচুরি ও গরুহত্যা নিত্যকার ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মামলা প্রত্যাহার করিবার জন্য অনেককেই শাসান হইয়াছে।

"এই সকল সংবাদ নিয়মিত থানায় পাঠান সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইতেছে না। ৭৬টি মামলার চূড়ান্ত বিবরণ পুলিসের তরফ হইতে পেশ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে অভিযোগগুলিকেও সত্য বলিয়াই ধরা হইয়াছে কিন্তু পুলিস চার্জশীট দাখিল করে নাই। নূতন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলিয়াছেন তাঁহাকে না দেখাইয়া কোনও চার্জশীট দাখিল করা চলিবে না। ইহার ফলেই পুলিশী শাসন-ব্যবস্থার উপর হইতে লোকের আস্থা চলিয়া যাইতেছে। এমন কি চার্জশীট দাখিল করা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসামী ফেরার। ৬৯৯ জন লোকের মধ্যে ৪৮৯ জন এখনও ফেরার অথচ তাহাদের গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। মোট ১০৫৯ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উহার মধ্যে ৩০৭ জনকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ৬৬৮ জনকে জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। মাত্র ৫৪ জনকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

"একে ত এই ব্যাপার তাহাতে আবার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছে। এইরূপ মামলার সংখ্যা ১৫০টি। রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাঁহার আমলে ৪০টি চার্জশীট দাখিল করা হয়। সম্ভবতঃ এই অপরাধে তাঁহাকে বদলী করা হইয়াছে। সন্দীপ থানাতেও একই অবস্থা। সেখান হইতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুলিস অফিসারকে সরাইয়া তাহার স্থলে এক জন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোককে বসান হইয়াছে। বেগম-

গঞ্জেও একই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উচ্চপদস্থ সকল পুলিস কর্মচারীই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রধান মন্ত্রী যদি নোয়াখালীতে সত্যই শান্তি ফিরাইয়া আনিতে চান তাহা হইলে স্থানীয় পুলিস কর্মচারীদের মধ্যে অনেক রদবদল করিতে হইবে এবং যোগ্যতাসম্পন্ন এমন সব কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহারা সম্প্রদায়নির্বিশেষে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিবে। বিহারের মুসলিম লীগ যেমন পুলিস বিভাগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগের দাবি জানাইয়াছে, নোয়াখালীর দাবিও ঠিক তাই।

"নোয়াখালির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মত এই যে, কয়েকজন দুর্বৃত্তকে আটকাইয়া রাখিলেই নানা প্রকারের উৎপাত বন্ধ হইবে। আর একটি কথা। আসাম আক্রমণের জন্য নোয়াখালিতে লীগ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলিতেছে। সাম্প্রদায়িক অবস্থা বিবেচনা করিয়া উহা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।"

ইহার পর শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী নোয়াখালী গিয়াছিলেন এবং তিনিও দেখিয়া আসিয়াছেন যে দুর্বৃত্তেরা বেপরোয়া ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং গ্রামের সঞ্চার করিয়া পুনর্বসতি-কার্য অসাধ্য করিয়া তুলিতেছে। ইহার পরও প্রধান মন্ত্রী নোয়াখালীর দুর্বৃত্ত দমনের কোন চেষ্টা করেন নাই, বরং এখনও সেখানকার অরাজকতাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা

কলিকাতায় সশস্ত্র পুলিসে পঞ্জাবী মুসলমান নিয়োগের পর হইতে উহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। মাণিকতলার নিকট মুর্গীপাড়া লেনে কয়েকটি গৃহে প্রবেশ করিয়া কয়েকজন স্ত্রীলোক ও শিশুর উপর মারপিটের অভিযোগ হয় কিন্তু পুলিস রিপোর্টে উহা চাপা পড়ে। অতঃপর ১০০ নং হ্যারিসন রোডস্থ গৃহে রাত্রে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারের এবং দুই জন পঞ্জাবী সশস্ত্র পুলিস-কর্তৃক নারী ধর্ষণের অভিযোগ হয়। এই ঘটনায় তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং কলিকাতায় এমন এক হরতাল হয় যাহাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী ক্রুদ্ধ হন কিন্তু উহার গুরুত্ব উড়াইয়া দিতে অক্ষম হন। আন্দোলনের চাপে তিনি উক্ত পুলিসদ্বয়কে বিচারার্থ আদালতে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। সংবাদপত্রের এই শক্তি খর্ব করিবার জন্য অতঃপর তিনি এই মর্মে এক আদেশ জারী করেন যে, সরকারকে পূর্বে না দেখাইয়া পুলিসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রকাশ করা চলিবে না। ইহার পরও অনেক গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে এবং প্রাণহানিও হইয়াছে কিন্তু সংবাদ প্রকাশ করা যায় নাই। আদালতের রিপোর্টকেও এই নিষেধাজ্ঞার আমলে আনা হইয়াছে।

বাংলার সংবাদপত্র দলনের সাফাই রূপে প্রধান মন্ত্রী বার বার বলিয়াছেন যে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হইলেই সাম্প্রদায়িক গোলযোগের অবসান ঘটিবে। এই ধারণা হইতে তিনি সাম্প্রদায়িক কারণে সংঘটিত গুরুতর ঘটনার বেলাতেও স্থান কাল এবং পাত্রের নাম ও সম্প্রদায় প্রকাশ করা বন্ধ করিয়াছেন। প্রায় ছয় মাস কাল এই নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ইহাতে কমে নাই বরং আক্রমণ-স্থানের সঠিক বিবরণ প্রকাশ না হওয়াতে অনেক নিরীহ লোক বিপজ্জনক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি বন্ধ করিবার নামে সংবাদপত্রের শিরোনামা এবং উহার হরফ ছোট করা হইয়াছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তেজ ইহাতে কমে নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং ব্যবস্থাপক সভায় সংবাদ প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লওয়ার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রতিবাদকল্পে মুলতুবী প্রস্তাব উপাপিত হয়। উভয় সভাতেই প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজ সদস্যেরা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের এই আদেশ বক্তৃতায় এবং ভোটের দ্বারা সমর্থন করেন। প্রধান মন্ত্রী বাংলার সহিত অপরাপর প্রদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সকল স্থানেই উহারা স্থানীয় গবর্মেন্টের সহিত সহযোগিতা করে, বিরোধিতা করে শুধু বাংলায়। প্রধান মন্ত্রী ভুলিয়া গিয়াছেন যে, অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস গবর্মেন্ট প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা হিন্দু স্বার্থের জন্য উদ্বিগ্ন না হইয়া সম্প্রদায়নির্বিশেষে জনস্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর এবং গবর্মেন্টসমূহের এই শুভ প্রয়াসে সাহায্যের জন্য সংবাদপত্রসমূহও আগ্রহশীল। অবস্থা বিবেচনায় তাঁহারা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলিতেছেন, বাংলার লীগ সরকারের ন্যায় ঐসব গবর্মেণ্ট সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণের জন্য কোন আদেশ জারী করেন নাই। বাংলার মিঃ সুরাবর্দীর গবর্মেণ্ট সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর, বাংলায় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের কাম্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা হিন্দুর সকল অধিকার ও স্বাধীনতার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত। শাসনযন্ত্রে, পুলিসে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগে, সর্বত্র তাঁহারা সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষাতেই ব্যগ্র এবং এই স্বার্থরক্ষা করিতে গিয়া সাধারণ ভাবে জন-স্বার্থ এবং বিশেষভাবে হিন্দুস্বার্থের বলিদানে তাঁহাদের কোন দ্বিধা নাই, বরং উৎসাহই প্রচণ্ড। সুতরাং বাংলায় জন-স্বার্থের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাধাদানের নৈতিক দায়িত্ব সংবাদপত্রসমূহের এবং সংবাদপত্রগুলি এই অধিকার যথাসম্ভব সংযমের সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। লীগ সরকার কথায় কথায় বলেন সংবাদপত্রগুলি মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত সংবাদ প্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে উস্কানি দেয়। ইংরেজ প্রতিনিধিরাও ইহা সমর্থন করিয়া লীগকেই তাঁহাদের ভোট দেন। কিন্তু এই অভিযোগ একান্ত অসত্য। সরকারের হাতে আইনে এবং অর্ডিন্যান্সে

এত ক্ষমতা আছে যে উহার বলে মিথ্যা, অতিরঞ্জিত অথবা উস্কানিদায়ক সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশকে কঠোর ভাবে দণ্ডিত করা যায়। এত ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, প্রকাশিত সংবাদ উক্ত তিন পর্যায়ে ফেলিতে পারা যায় না বলিয়াই তাঁহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিবার জন্যই এত আগ্রহান্বিত।

কলিকাতার অবস্থা

মাসাধিককাল যাবৎ কলিকাতার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। শহরের উত্তর ও দক্ষিণের দুইটি স্থান ব্যতীত প্রায় সর্বত্র ঘরে-বন্ধ আইনানুসারে সন্ধ্যা সাতটার সময় সকলকে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। দৈনন্দিন কাজে বাহির হইবার সময় কোন লোকই অক্ষত দেহে যে বাড়ী ফিরিবে কিনা অথবা ফিরিলেও পরিবারস্থ সকলকে একত্র দেখিবে কিনা তাহা বলিতে পারে না। প্রতিদিনই বেশ কয়েকজন লোককে কার্যোপলক্ষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হয় হাসপাতালে নতুবা স্বর্গে স্থান গ্রহণ করিতে হইতেছে। সন্ধ্যার পরও লোকের স্বস্তি নাই। শান্তি রক্ষার ভার যাহাদের উপর তাহারা কখন কোন অছিলায় দরজা ভাঙিয়া ঘরে ঢুকিয়া মারধর করিবে অথবা নারীর উপর অত্যাচার করিবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। নগরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লীগ সরকারের কর্ণধারেরা কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিতেছেন এবং কার্যতঃ এমনভাবে উহা প্রয়োগ করিতেছেন যাহাতে দুষ্ট লোকের অসৎ কার্য সাধনে বাধা পড়িতেছে না, লাঞ্ছিত হইতেছে নিরীহ নাগরিক। মুসলমান স্বার্থ রক্ষার জন্য গবর্মেণ্ট কলিকাতার সশস্ত্র পুলিস পঞ্জাবী মুসলমান আমদানী করিয়াছেন এবং তদবধি শহরে এক নূতন উপদ্রব সুরু হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ইহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগে কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত নহেন এবং ইহাদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। ১০০ নং হ্যারিসন রোডে ইহাদের দুই ব্যক্তি রাত্রে জোর করিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এই অভিযোগ হইলে প্রধান মন্ত্রী প্রথমে উহা চাপা দিবার জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু জনমত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিতে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করেন। জনমতের এই তীব্রতা দেখিয়া অতঃপর আন্দোলন এড়াইবার জন্য তিনি ইহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ জোর করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

যত্রতত্র পুলিসের বেপরোয়া গুলি চালনা এবং ঘরের ভিতর মেয়েদের পর্যন্ত আহত হওয়ায় সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী ইহাতেও নির্বিকার। তাঁহার সাফাই এই যে, জনসাধারণ এবং নেতারাই বহুবার অভিযোগ করিয়াছেন যে, পুলিস কেন গুলি চালায় না, এখন তাহারা গুলি চালাইতেছে, সুতরাং অভিযোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। পুলিস প্রয়োজনমত গুলি চালাইলে আততায়ীরা ভীত হইবে, অতএব গুলি চালনা একান্ত আবশ্যক, এ কথার এই অর্থ নয় যে পুলিসকে যত্রতত্র এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়িয়া নিরীহ লোকের প্রাণহানি ঘটাইয়া গুলি ছোড়ার মহিমা দেখাইতে হইবে। কাহাকেও আঘাত হানিতে অথবা এসিড ছুঁড়িতে দেখিয়া পুলিস তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেও তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না, সে আততায়ী যে কোন সম্প্রদায়েরই লোক হউক না কেন। কোথাও কোন ঘটনা ঘটিবার পর পুলিস সেখানে উপস্থিত হইয়া এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিলে লোকে অবশ্যই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিবে।

পাইকারী জরিমানা ধার্যের প্রস্তাব কোন কোন সংবাদপত্র করিয়াছিলেন এবং বাংলা-সরকারও এই প্রস্তাব লুফিয়া লইয়াছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে দেখা গিয়াছে যে, আক্রান্ত ও সর্বস্বান্ত যাহারা হইয়াছে পাইকারী জরিমানা তাহাদেরই উপর বেশী করিয়া ধার্য হইয়াছে। জরিমানা বসাইবার জন্য যাঁহারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন পরে তাঁহারাই উহাকে পাইকারী পক্ষপাত আখ্যা দিয়া আর্তনাদ করিয়াছেন।

ঘরে-বন্ধ আইন সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রকট হইয়াছে। সামান্য অছিলায় এক এলাকায় ২৪ বা ৩৩ ঘণ্টা ঘরে বন্ধের হুকুম জারী হইয়াছে অথচ অপর স্থানে নরহত্যা ও ছুরি মারার পরেও কোন কিছু করা হয় নাই। যে সব রাস্তা এই এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে সেগুলিকে পথচারীদের যাতায়াতের জন্য ছাড়িয়া দিলেও যেখানে অসুবিধার কারণ ছিল না সেখানে গাড়ী চলাচল পর্যন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছে। কঠোর ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে গণ-স্বার্থের খাতিরে প্রযুক্ত না হইয়া সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের অস্ত্র হইয়া উঠিলে উহাতে বিপরীত ফল ফলিতে বাধ্য। শান্তিরক্ষার কঠোর উপায়গুলি লোকে নির্যাতনের অথবা জব্দ করিবার অস্ত্র বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাইলে উহার পরিণাম ভাল হইতে পারে না। লীগ সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিলে উহার ব্যবহার কিরূপ হয় তাহার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাইবার পরও নেতারা ইহাদেরই ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা এখনও কেমন করিয়া বলিতেছেন আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম।

বাংলায় জমিদারী উচ্ছেদের প্রস্তাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে জমিদারী উচ্ছেদ বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। বিলটির সারমর্ম এই :

বিলটি সাধারণভাবে 'জমিদারী প্রথা বিলোপ বিল' নামে পরিচিত।

উক্ত প্রস্তাবিত আইনে যাঁহারা কৃষক নহে, তাহাদের নিকট জমি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং অল্পসংখ্যক লোক যাহাতে বহু পরিমাণ জমির অধিকারী না হইতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ ফজলুর রহমান তাঁহার বিবৃতিতে বলেন যে, গবর্মেণ্ট প্রকৃত কৃষকদের সহিত সরকারের সাক্ষাৎসম্পর্ক স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার, যাঁহারা খাজনা পাইয়া থাকেন, এইরূপ সর্বশ্রেণীর লোকের স্বত্ব অধিকার করিবেন। স্বত্ব অধিকার করিবার সময় সরকার বর্তমান স্বত্বাধিকারীর নীট লাভের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন। সরকার হাট, বাজার, বন, জঙ্গল, জলাভূমি ও বালুচরের স্বত্বও ক্রয় করিবেন।

উক্ত বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, জমিদার ও রায়তদের হাতে বিশেষভাবে নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে আবাদী জমি আছে, সরকার তাহাও অধিকার করা প্রয়োজন মনে করেন। উক্ত অধিকৃত জমি দরিদ্র কৃষক, জমিহীন শ্রমিক ও বর্গাদারদের মধ্যে বিলি করা হইবে। সরকার-কর্তৃক জমি ও অন্যান্য জিনিষের স্বত্ব অধিকৃত হইবার পর প্রজারা জমির একমাত্র মালিক হিসাবে সরকারের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিবে। উক্ত প্রজাদের অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র এক শ্রেণীর প্রজা থাকিবে। উক্ত রায়তদের জমির উপর পূর্ণ অধিকার থাকিবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি অপেক্ষা কম জমির মালিক আসল কৃষকের নিকট এক জন রায়ত জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন অপরের নিকট জমি বিলি করা একেবারে নিষিদ্ধ হইবে। জমি খণ্ড খণ্ড করা সম্পর্কে একটি বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট থাকিবে। সমবায় ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা করিবার জন্য ছোট ছোট জমিখণ্ড একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ফজলুর রহমান বলেন যে, কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের মতে জমিদারী প্রথা জাতীয় স্বার্থের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে না। তদনুযায়ী তাঁহারা এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে রায়তদিগকে জমি বিলি করার পদ্ধতি প্রচলিত করা হউক। ইহার ফলে সরকারের সহিত প্রকৃত কৃষকদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। ১৯৪০ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর সংবাদপত্রে, জনসভায় ও আইন সভায় এ সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত জমিবিলি-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা না হইলে যে দেশের কৃষিকর্মের পুনর্গঠন করা সম্ভব নহে, ইহা জোর দিয়া বলা হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে উক্ত বিলে যে পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সম্পত্তির নীট আয় যত কম হইবে, ক্ষতিপূরণের হার তত অধিক হইবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের উক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী নীট আয়ের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে।

(ক) যেখানে নীট আয় ২০০০ টাকার অধিক নহে, সেখানে নীট আয়ের ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করা হইবে; (খ) যে ক্ষেত্রে নীট আয় ২০০০-এর অধিক, কিন্তু ৫০০০-এর বেশী নহে, সে ক্ষেত্রে নীট আয়ের ১২ গুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করা হইবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যাহা প্রদান করা হইবে, তাহা 'ক'এ বর্ণিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা কোন ক্ষেত্রেই কম হইবে না; (গ) যে ক্ষেত্রে নীট আয় ৫০০০-এর বেশী, কিন্তু ১০০০০-এর অধিক নহে, সে ক্ষেত্রে নীট আয়ের ১০ গুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত হইবে। 'গ'এ বর্ণিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 'খ'এ বর্ণিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা কোনক্ষেত্রে কম হইবে না; (ঘ) যেখানে নীট আয় ১০০০০-এর অধিক, সেখানে নীট আয়ের ৮ গুণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত হইবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ 'গ'এ বর্ণিত সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা কম হইবে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপসাধন সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী বাংলায় দ্বিমত নাই কিন্তু বর্তমান সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীমণ্ডলের উহা সাধ্য কি না সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের অবসর যথেষ্টই রহিয়াছে। লীগ সরকারের আমলে বাংলার আর্থিক দুর্গতি যেরূপ প্রচণ্ড হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইঁহাদের হাতে আরও গুরু ব্যয়সাধ্য কাজ তুলিয়া দেওয়া আত্মহত্যার নামান্তর হইতে পারে। তা ছাড়া বিলটি তাড়াতাড়ি পাস করিয়া পশ্চিম বঙ্গের জমি দখলের জন্য ইঁহাদের পক্ষে উদ্‌গ্রীব হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। পতিত জমি দখলের জন্য যাহাদের এত আগ্রহ, ভাল জমি জমিদারের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা স্বধর্মীদের মধ্যে বিলি করিয়া পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান সংখ্যানুপাত বৃদ্ধির চেষ্টা ইঁহারা করিবে এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বিলটি পাস হইলে এখনই একটা বিরাট বিভাগ খুলিয়া ছোট বড় নানাবিধ চাকুরি সৃষ্টি করিয়া দলগত বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টাও সহজেই হইতে পারিবে। এই বিল সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী বাঙালীর অভিমত এই যে, দেড় শত বৎসর যদি তাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরু ভার সহিতে পারিয়া থাকে তবে আর এক বৎসরও পারিবে। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন বাঙালী রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন সুষ্ঠুভাবে মীমাংসা করিতে পারিলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের অবসর ও ক্ষমতা উভয়ই লাভ করিবে। জনমত জানিবার জন্য বিলটি প্রচার করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া উহা তাড়াহুড়া করিয়া সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করায় লোকে গবর্মেণ্টের

অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহই পোষণ করিবে। বিলটি যে দিন পরিষদে উত্থাপন করা হয় সে দিন হরতালের জন্য কংগ্রেস সদস্যেরা উপস্থিত হন নাই। ইহার পর দিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা এলাকায় একটি জঘন্য ব্যাপারের প্রতিবাদে কংগ্রেস পক্ষ হইতে অধিবেশন স্থগিতের প্রস্তাব উত্থাপনে অনুমতি না দেওয়ায় কংগ্রেস দল পরিষদ হইতে বাহির হইয়া যান। তাঁহাদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ঐদিনই রুট মেজরিটির জোরে সরকার পক্ষ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিয়াছেন। এই কার্য্যে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক জিদ প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনস্বার্থ রক্ষার আগ্রহের পরিচয় উহাতে নাই।

মৌলবী ফজলুল হকের শেষ প্রার্থনা

মৌলবী ফজলুল হক গত এক মাসের মধ্যে এক বার আল্লা এবং এক বার ইংরেজের নিকট মুসলমানকে রক্ষা করিবার জন্য শেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন। হাজার জহরলালকে কথায় কথায় পকেটে রাখিবার এবং গান্ধীজীকে খাল পার করিয়া তাড়াইয়া দিবার হুমকী যিনি দিয়াছেন, দশ লক্ষ মুসলমান দশ কোটি হিন্দুর সমান এই কথা যিনি সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন, লাহোর লীগ সম্মেলনে যিনি পাকিস্থান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, শাতানা লইয়া পাকিস্থান রক্ষা করিবার নামে মধ্যযুগীয় নৃশংস বর্বরতা অবলম্বনের কথা বলিতেও যাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হয় নাই, বাংলার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক কলিকাতায় তৃতীয় পর্ব পাকিস্থানী আক্রমণ হওয়ার দিন বরিশালে এক সভায় কাঁদিয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, "হে আল্লা, তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমরা দুর্বল, তুমি আমাদের বল দাও। আমরা না বাঁচিলে ভারতে তথা পৃথিবীতে তোমার কোরাণের আলো প্রচার করিবার জন্য এবং তোমার জয়গান করিবার জন্য কেহ থাকিবে না।" ইহার ঠিক এক মাস পর আবার তিনি কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, "হে প্রভু ইংরেজ, তোমরা আমাদের ছাড়িয়া গেলে আমরা বাঁচিব না, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক।" মিঃ জিন্নার সঙ্গে এই শেষোক্ত প্রার্থনায় আশ্চর্য মিল আছে, তবে প্রভেদ এই যে জিন্না সাহেব আকারে ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতেছেন, হক সাহেবের ন্যায় স্পষ্ট ভাষায় অনুরূপ প্রার্থনা জানাইয়া পাকিস্থানের স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই।

নারীহরণে রেল-কর্মচারীর সহায়তা

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি. এন. মণ্ডল আব্দুল হাকিম নামক এক ব্যক্তিকে নারীর মর্যাদাহানির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া উহাকে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ: ১৯৪৬ সালের ২৫ মে ব্রজেন্দ্র কিশোর গোস্বামী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার নবপরিণীতা ষোড়শবর্ষীয়া পত্নী শ্রীমতী নির্মলা দেবীকে সঙ্গে লইয়া সকাল-সাড়ে দশটায় মোহনগঞ্জ রেল-ষ্টেশনে অবতরণ করেন। পত্নীকে ষ্টেশন প্রাঙ্গণে বসাইয়া রাখিয়া ব্রাহ্মণ নৌকা ভাড়া করিবার জন্য খেয়াঘাটে গমন করেন। তাঁহাদের গন্তব্য স্থল ষ্টেশন হইতে জলপথে দশ মাইল দূর। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান আসামী আব্দুল হাকিম তাঁহার পত্নীর হাত ধরিয়া টানিতেছে এবং তিনি উহার হাত ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের এক সহযাত্রী দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চৌধুরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দুর্বৃত্তের কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। আব্দুল হাকিম শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চৌধুরীর আঙুল ভীষণভাবে কামড়াইয়া দেয় এবং সাহায্যের জন্য এক জন রেলওয়ে গার্ড এবং টি-টি-ইকে আহ্বান করেন। উহারা উভয়েই ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং টি-টি-ই শেরাণী একটি অতিরিক্ত ভাড়ার রসিদ আসামীর পকেটে দিয়া দেয়। আসামী হাকিম তখন পুলিসের হেফাজতে। গার্ড আলি মিঞা আসামীকে পুলিশের হেফাজত হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে পলায়নের সুযোগ করিয়া দেয়।

রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন, "এই মামলা এতদঞ্চলের কতকগুলি মতলববাজ লোকের সহায়তায় বেপরোয়া দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নারীহরণের গভীর ষড়যন্ত্রের একটি নিদর্শন। রায়দান কালে আমি এই মন্তব্য না করিয়া পারি না যে, টাকেটিং টিকিট একজামিনার শেরাণী এবং গার্ড আলি মিঞার কার্য অতিশয় নিন্দনীয়; প্রকাশ্য দিবালোকে এই জঘন্য অপরাধের আসামী হাতেনাতে ধরা পড়িবার পর এই দুই জন সরকারী কর্মচারী যেভাবে উহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা অত্যন্ত জঘন্য মনোভাবের পরিচায়ক।

রায়ের নকল রেল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে রেলকর্মচারীরা নারীহরণ এবং লুণ্ঠন প্রভৃতি অন্যান্য অপরাধেরও সহায়তা করিতেছে এরূপ অভিযোগ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর যাবৎ পূর্ববঙ্গের রেলপথের কয়েকটি এলাকা সম্বন্ধে এরূপ গুরুতর অভিযোগ হইয়াছে; বর্তমান বাজেট অধিবেশনের গোড়ার দিকে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের দৃষ্টিও পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের রেলপথের অরাজকতার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। বর্তমান মামলায় দুইটি রেল কর্মচারীর কীর্তি প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এরূপ আরও অনেক আছে ইহা বিশ্বাস করিবার সঙ্গত কারণ আছে। রেল বিভাগ কর্তৃক অবিলম্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দ্বারা এই শ্রেণীর কর্মচারীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ভারতের শিক্ষাতন্ত্রে কলা-শিল্পের স্থান

[ভগিনী নিবেদিতা লৌকিক বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-
উৎসবে অভিভাষণ]

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজকের অনুষ্ঠানের কার্য্য-তালিকায় এই বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবের অভিভাষণ দেবার ভার দেওয়া হয়েছে এমন একজন অযোগ্য মানুষের উপর, যে মানুষ বাচালতায় পটু নহে, কথার পথে যার যাতায়াত অতি অল্প। জ্ঞান-অর্জ্জনের যে পথে তার যাওয়া আসা—সেটা হ'ল বিদ্যা শিক্ষার নিরক্ষর পথ—যে পথে কথা বলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না,—যে পথের সাধনা কথার কথা বন্ধ হলেই সিদ্ধ হয়। এই স্কুলের কর্ম্মকর্ত্তারা নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে এই বিদ্যালয়ে—নিরক্ষরের পথে জ্ঞানলাভের সাধনার যথেষ্ট আয়োজন, যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহার প্রমাণ আজকের এই বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে—জ্ঞান-অর্জ্জনের দুটি স্বতন্ত্র সাধনার পথ পড়ে রয়েছে। সাধারণতঃ, আমাদের প্রচলিত সাধারণ বিদ্যাপীঠের পাঠ্য-তালিকায়—কেতাবের ছাপার অক্ষরের পথে—বিদ্যা-শিক্ষার বহুল ব্যবস্থা এমন ভীড় করে থাকে যে, নিরক্ষরের সাধনার অবসর ও সুযোগ অনেক সময় একবারে মেলে না। সুতরাং, জ্ঞানের একটা পথ—এই চোখের মধ্য দিয়ে—নিরক্ষর শিল্পকলার পথটা—এক রকম বন্ধই থাকে আমাদের সাধারণ বিদ্যা-মন্দিরে। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা সাহস ক'রে বলতে চেয়েছেন যে, আমরা জ্ঞানের কোনও দরজাই বন্ধ রাখব না, অক্ষরের ও নিরক্ষরের দুই পথই আমরা খোলা রাখব এবং শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিল্পকলার জন্য একটা বড় স্থান আমরা দেব। কথাটা একটু দুঃসাহসের, শক্ত কথা হয়ে দাঁড়ায়।

কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে, ছোট ছোট শিশুদের ছবির ছেলেমো ছাড়াবার জন্যই ত বানানের ব্যবস্থা; শ্লেট, কাগজ ও দেওয়ালের গায়ে হিজিবিজির দুরন্ত-পানা দমন করবার জন্যই ত—কেতাবের ক্লাস। অক্ষরের দাপটে নিরক্ষরের স্বপ্নকে ভুলিয়ে দেবার দারুণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ক্লাসের মাষ্টারমহাশয়দের মাথায়। কারণ অভিভাবকেরা প্রায় অভিযোগ করে বলেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি আর হুটোপুটির অবসরে নানা রকমের "খগাবগার" ছবি এঁকে, ছেঁড়া কাগজের নৌকা বানিয়ে, আর বালির কেল্লা আর মাটির পুতুল গড়ে সারাদিনটা নষ্ট করে, কেতাবের কিনারা দিয়েও যায় না। তাদের এই শারীরিক ও মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার রোগ—তাদের ঐ খেলার ও ছবিলেখার ব্যারাম সারাবার জন্যই ত 'লেখাপড়ার হাসপাতালে' পাঠানো। সুতরাং মাষ্টার-মহাশয়রা যদি আবার বুড়ী মণ্টিসেরির কাছে মাথা মুড়িয়ে, ছেলেমেয়েদের ছেলেমোর প্রশ্রয় দিয়ে, ছবিলেখার ছাড়-পত্র দিয়ে দেন, তা হলে লেখাপড়ার বিদ্যা ত বিদ্যায়ই বন্ধ হয়ে যাবে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলা মুশকিল হবে।

যারা লেখাপড়া শিখতে চায় না, বা যাদের লেখাপড়া শেখবার যোগ্যতা নাই, তাদের জন্য ত হাতুড়ী পেটবার আর ঐ নক্সা ছক্‌বার টেকনিক্যাল স্কুল, আর আর্ট স্কুল রয়েছে। কেতাবী কারখানাকে শিল্পের কারখানা ক'রে তুললে নিরক্ষতার সমস্যা সমাধান হবে কেমন করে? লিখতে পড়তে পাকা না হলে কেরাণীকুল যে নির্ম্মূল হয়ে যাবে।

সুতরাং কেতাবীবিদ্যার বিদ্যালয়ে কলা-শিল্পের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত কি না, লেখাপড়ার পাঠ্যতালিকায় একটা ছবির ক্লাস জুড়ে দেওয়া, হঠকারিতা কিনা সেটা বিচার করে দেখতে হয়।

এই দুঃসাহসের শিক্ষার আদর্শ আলোচনা করতে হলে শিক্ষাতত্ত্বের একটা নিগূঢ় রহস্যের আলোচনা করতে হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষাপদ্ধতিতে যে শিল্পকলার একটা বড় স্থান আছে, এই কথাটা এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন—যদিও আমাদের সাধারণ পড়া-লেখা শিখবার বিদ্যালয়ে শিল্পকলার সাধনা একটা নিষিদ্ধ সাধনা। এই বিদ্যালয়ে তার বিপরীত ব্যবহার—একটা নূতন পরিকল্পনার শিক্ষা গড়ে তোলবার দারুণ দাম্ভিকতার পরিচয় ব'লে হঠাৎ মনে হতে পারে।

আগেই বলেছি যে পড়া-লেখা শিখবার ইস্কুলে কলা-শিল্পের স্থান আছে কি না তার সঠিক বিচার করতে হলে শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তিগত কতকগুলো রহস্যের আলোচনা করতে হয়।

শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত প্রচলিত আছে। আমাদের দেশের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসবে, আমাদের দেশের শিক্ষাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ মনীষীরা—শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ উপদেশ আমাদের দিয়ে আসছেন।

কেউ বলেন, আমাদের শিক্ষায় আমাদের পুরবাসীর

কর্ত্তব্যপালনে পাকা ক'রে তোলা উচিত,—duties of citizenship সম্বন্ধে সজাগ ও সদাজাগ্রত করে তোলা হ'ল শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। কেউ বলেন সেবাধর্ম্মে মজবুৎ ক'রে তোলা হ'ল শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য—মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর ক'রে মানুষের অন্নকষ্ট নষ্ট করে দিয়ে, দেহে এবং মনে নূতন আলো জেলে দিয়ে মানুষের সমাজকে সর্ব্বতোভাবে সুখের সংসার করে তোলাই শিক্ষার আদর্শ। কেউ বলেন, জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করবার শক্তিলাভ করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য; নানা স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও মারামারি কাটাকাটির মধ্যে টি'কে থাকবার কৌশল অর্জ্জন করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। যাঁরা লিখতে পড়তে শেখে তাঁরাই নাকি জীবনযুদ্ধে জান বাঁচাতে পারে,—যদিও অনেক সময়ে তার উল্টোই চোখে পড়ে—অশিক্ষিত ব্যবসাদার দোকানীরা ও ব্যাপারীরা অনেক সময় পি-এইচ্‌ ডি-কে পিছনে ফেলে চলে যায়। এইজন্যই কেউ কেউ বলেন যে, যে শিক্ষা আমাদের ডাল-ভাতের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে সেই শিক্ষাই হ'ল আসল শিক্ষা। কেউ কেউ বলেন, শিক্ষাকে বহুমুখী করে তুলে মানুষকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করবার শক্তি দিতে হবে, মনের চাষ, শরীরের চাষ, ফল-ফুল ফসলের চাষ কাপড়ের চাষ, বিজ্ঞানের চাষ, অর্থনীতির চাষ, কর্ষণবিদ্যার সকল ক্ষেত্রেই, মানুষ আপন আপন শক্তি অনুসারে কৃষ্টিলাভ করে' মানুষের সমাজকে বড় করে তুলবে, সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করে তুলবে—এই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

মানুষের সমস্তরকম শক্তিকে 'মানুষ' করে তোলা, বড় করে তোলা যে শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য—এ সম্বন্ধে প্রায়ই সমস্ত শিক্ষা-তাত্ত্বিকেরা একমত। তবে অবস্থাভেদে, অর্থাভাবে, শিক্ষকের অভাবে সব সময়ে আমাদের বিদ্যালয়ে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাকে সফল করে তোলা সম্ভব হয় নাই। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের চেয়ে বর্ত্তমান কালে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষা-তালিকায় বড় স্থান পেয়েছে। শিক্ষণীয় আর একটি বস্তু বর্ত্তমান কালে আমাদের শিক্ষামন্দিরে সম্মানের স্থান পেয়েছে—এটি হ'ল সঙ্গীতবিদ্যা। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে পর্য্যন্ত শিক্ষিত সমাজে—সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনার উপর শিক্ষিত সমাজের একটা বিরুদ্ধ মনোভাব বর্ত্তমান ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচলনে ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীত ও সঙ্গীতবিদ্যার সমধিক সমাদর বেড়ে উঠেছে। Radio-র মারফৎ দিনরাত অনেক গান শুনে শুনে অনেক 'অসুর' প্রকৃতির মানুষও সুরের পিপাসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটা সঙ্গীতের আদর ও সঙ্গীতের রসবোধশক্তি বেড়ে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা যে সব কঠিন রাগরাগিণীর কসরত করতে শিখেছে কয়েক বৎসর আগে আমরা তা কল্পনাও করতে পারতুম না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় একটা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় না হলেও সঙ্গীতবিদ্যা ঐচ্ছিক শিক্ষণীয় বিষয় বলে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া অনেক বে-সরকারী সঙ্গীত বিদ্যালয়ে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে 'সুর-শ্রী', 'গীত-শ্রী' প্রভৃতি নানা উপাধি দেওয়া হয়। মোট কথা, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে—শিক্ষা-তন্ত্রের একটা দিক ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সুরশিল্পের ক্ষেত্রে যে নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে তার অনুরূপ কোনও চেষ্টা রূপশিল্পের ক্ষেত্রে আজও দেখা দেয় নাই। সাধারণ লেখাপড়ার বিদ্যালয়ে রূপবিদ্যার বড় একটা স্থান নাই। কোনও কোনও স্কুলে কিছু কিছু ড্রইং শেখান হয় বটে, কিন্তু রূপ-গ্রহণের শক্তি, রূপশিল্পের রসগ্রহণের শক্তি, তার দোষ-গুণ বুঝবার শক্তিকে সুশিক্ষিত ও পরিণত করবার কোন ব্যবস্থাই থাকে না। মানুষের ঈশ্বরদত্ত নানা শক্তির মধ্যে রূপগ্রহণ এবং বর্ণবোধ শক্তি একটা বহুমূল্য শক্তি—ব্যাবহারিক জীবনে ও শ্রম-শিল্পের ক্ষেত্রেও এই শক্তি সাধনার ও প্রয়োগের যথেষ্ট উপকারিতা আছে। এই রূপগ্রহণের শক্তি একটা সৌখীন বিলাসের উপকরণ নহে। দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার অনেক ক্ষেত্রেই এই শক্তি সাধনার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।

যে সব হাতে-গড়া বা কলকারখানায় গড়া পণ্যদ্রব্য রঙে, রেখায়, ও নক্সায় মনোহারী নহে, সে সব রূপহীন পণ্যদ্রব্য বিশ্বের বাজারে অন্য অন্য দেশের পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় টি'কে থাকতে পারে না। এক কালে আমাদের দেশের নানা পণ্যদ্রব্য তাহার রেখা-রঙের মনোহারী মহিমায় এবং নয়ন-ভুলান নক্সায় সারা জগতে সম্মানের স্থান অধিকার করেছিল। উৎকট স্বদেশীয়তা ও দেশভক্তির প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেও আমাদের দেশের কোনও পণ্যদ্রব্যকেই উচ্চশিল্পের আসনে উন্নত করতে পারছি না। তাহার প্রধান কারণ আমাদের সাধারণ মানুষের এবং শিল্পীদের চোখ থেকে রূপ-বুদ্ধি ও রূপরস-বোধশক্তি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। মুঘল-যুগের প্রাচীন শিল্পকলার একটি সামান্য নিদর্শনে যে উচ্চ অঙ্গের রূপরস, যে নক্সার মুন্সিয়ানা, যে বর্ণসমাবেশের কৌশল আমাদের মুগ্ধ করে, আমাদের অনেক 'আদরে' মানুষ করা—বর্ত্তমান কালের কোনও স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্যতে তাহার কোনও গুণই আমরা গড়ে তুলতে পারি নাই। এই ব্যাপারটা যে ঘটেছে,

তার কারণ কেবল যাঁরা হাতে গড়বেন সেই শিল্পীদের শিক্ষার দৈন্যতা নহে, যাঁরা সেটা ব্যবহার করবেন, যাঁরা তার খরিদ্দার ও পৃষ্ঠপোষক হবেন তাঁদেরও রূপবিদ্যার শিক্ষার অভাবে রুচিবিকার ঘটেছে। সুতরাং কেবল আর্ট স্কুল আর টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষার সংস্কার করেই আমাদের শ্রমজাত শিল্পের সমস্যার সমাধান হবে না—যাঁরা এই শিল্পজাত সামগ্রী ব্যবহার করবেন তাদেরও উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। এবং এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ক্লাস থেকে।

মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি—যার দ্বারা মানুষ সৃষ্টি-কর্ত্তার নিজের হাতে লেখা স্বভাবের সুদৃশ্য দৃশ্য-পটে অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সমারোহের মধ্যে অবগাহন ক'রে বর্ণ ও রূপ-রেখার সার্থকতা কি তার আস্বাদন ও কারণ অনুসন্ধান করবার শক্তি সংগ্রহ করে,—সেই সৌন্দর্য্য-শক্তি, সেই সৌন্দর্য্যবোধ-শক্তি, ভগবৎ দত্ত একটি বিশিষ্ট রীতির আধ্যাত্মিক শক্তি। শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা বসেছেন তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য বালক-বালিকাদের মধ্যে এই ঈশ্বরদত্ত শক্তি, এই স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিকে রক্ষা করা, পরিপুষ্ট করা, সম্মার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত করা। সুন্দরকে, সত্যকে, শিবকে, মঙ্গলকে আস্বাদন করবার এবং তাকে নূতন রূপ দিয়ে নূতন সৃষ্টি করবার দৈবী শক্তি মানুষের মনের অন্যান্য বৃত্তির মত সাধনাসাপেক্ষ। প্রকাশ, অনুশীলন, ও সাধনার সুযোগ না পেলে মানুষের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি ও সৃষ্টি-শক্তি দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হয়ে ক্রমশঃ লোপ পায়—মৃত্যুমুখে পড়ে।

এই সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইনের স্বীকারোক্তি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ—তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে পত্রে লিখেছিলেন—

"Up to the age of thirty, or beyond it, poetry of many kinds . . . gave me great pleasure, and even as a school-boy I took intense delight in Shakespeare, especially in the historical plays. I have also said that formerly pictures gave me considerable, and music very great delight. But now for many years I cannot endure to read a line of poetry; I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerably dull that it nauseated me. I have also almost lost my taste for pictures and music . . . My mind seems to have become a machine for grinding general laws out of large collections of facts: but why it should have caused the atrophy of that part of my brain alone on which the higher tastes depend—I cannot conceive . . . If I had to live my life again I would have made it a rule to read some poetry, to listen to some music and to look at some pictures at least once a week,—for, perhaps the parts of my brain now atrophied would thus have been kept alive through use. The loss of these tastes is a loss of happiness, and may probably be injurious to the intellect and more probably to the moral character by enfeebling the emotional part of our nature."

ডারউইনের উক্তি থেকে এই কথাটা প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের মনকে কেবল বুদ্ধিজীবী করে তুললে তার অনেক সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং তার নৈতিক বৃত্তিগুলি দূষিত হয়ে উঠে।

সুতরাং শিক্ষা-তালিকায় কেবলমাত্র লেখাপড়ার উপর অতিমাত্রায় ঝোক দিলে মানুষের মনের অন্য অন্য শক্তি পঙ্গু হয়ে যায় এবং একেবারে লোপ পায়। লেখা-পড়ার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের বানান-পাঠের উপর ঝুঁকে পড়ে দিন-রাত B-L-A (ব্লে) বলে চীৎকার করলে শব্দ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিদ্যার্থীর অন্যান্য শক্তির ক্ষতিপূরণের সুযোগ ও অবসর মেলে না,—বালক ও বালিকাটি কেবল কেতাবী বিদ্যায় আবদ্ধ হয়ে যে পরিমাণে শব্দ ও শব্দের অর্থবোধে পাকা হয়ে উঠে, সেই পরিমাণে রূপবিদ্যার অক্ষর ও অভিধানে কাঁচা হতে থাকে, রূপের রস-বোধ শক্তি ক্রমশঃ হারাতে থাকে। এইরূপে তাদের যত বয়স বাড়ে, লিখিত-পড়িত বিদ্যায় যত পারদর্শী হয়ে উঠে—ঈশ্বরদত্ত একটি শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকার থেকে তারা তত বঞ্চিত হয়, রূপরাজ্যের অমরাবতী তারা হারায়।

এটা আমরা নিত্যই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, লিখিত-পড়িত বিদ্যার পারদর্শিতার প্রমাণ-স্বরূপ নানা "প্রাইজ", "পারিতোষিক" ও "সার্টিফিকেটের" সম্ভার নিয়ে, নানা "মেডেল" ও "ডিপ্লোমা"র ডালি নিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা যেদিন স্কুল-কলেজের সিংহদ্বার অতিক্রম করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান, তখন দেখা যায় তাঁদের মধ্যে অনেকেই গান শোনবার কান হারিয়ে বসেছেন, সুন্দরকে দেখবার, বুঝবার, চেনবার চক্ষু হারিয়ে বসেছেন—মানুষের সৌন্দর্য্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ রচনার বাণী ও আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে তাঁরা বেশ পটু হয়ে উঠেছেন—জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় নেবার, তাদের গুণ বিচার করবার, রস আস্বাদন করবার, তা থেকে আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করবার শক্তি একেবারে হারিয়ে বসেছেন।

আপনারা জানেন আধুনিক মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র মানুষের মনের চিৎশক্তি ও চিন্তা-শক্তির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। নানা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে প্রথমতঃ, শিশুর স্বাভাবিক বোধশক্তি puberty বা বয়ঃপ্রাপ্তির পর বেশী কিছু বেড়ে উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, শিশুমনের মানসিক বৃত্তি বা প্রবৃত্তি, তার চরিত্রের বিশিষ্ট গতি ও ভাবগুলি—তা স্বাভাবিক হউক বা অস্বাভাবিক হউক—খুব অল্প বয়স থেকেই দেখা দেয়। যেমন মনে করুন, কোনও শিশুর অস্বাভাবিক স্মরণ-শক্তি কিম্বা সঙ্গীতের প্রতিভা, কিম্বা কোনও

দুষ্টবৃত্তি বা পাপের দিকে মনের ঝোঁক ও প্রবৃত্তি—এই সমস্ত বিশিষ্ট রকমের মনের গতি ও প্রবৃত্তি, মানসিক জীবনের অস্তি প্রত্যুষেই দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ, শিশুমনের ভাবুকতা, কল্পনা-শক্তি এবং বস্তুর রূপগ্রহণ করবার শক্তি বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত খুব প্রখর ও উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে। শিশুমনের ক্রমবিকাশ যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখেছেন তাঁরা বলেছেন,—শিশুর কথা ফুটবার আগে, অর্থাৎ কথার ভিতর দিয়ে পরিষ্কার রূপে ও যুক্তিযুক্ত শব্দ অবলম্বন ক'রে চিন্তা প্রকাশের শক্তি অর্জ্জন করবার আগের বয়সে শিশুর মন ও জীবন-লীলা রূপের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে এবং কথা বলতেও যখন শিখেছে, তখনও লিখে বলবার বিদ্যা অর্জ্জনের পূর্ব্বের বয়সে শিশুর মন সহজ ও সরল ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে নিরক্ষরের ভাষায়, রেখা-অঙ্কন ও রূপবিদ্যার অন্যান্য চাক্ষুষ ভাষা অবলম্বন ক'রে শিশুমন আপনাকে প্রকাশ ক'রে আনন্দ পায়,—অক্ষরের ও শব্দের দুরূহ পথ এড়িয়ে চলতে চায়। অনেক হিজিবিজির ছবি লিখে তার মনের কথা সরল ভাবে বলতে চায় এবং বলতে পারে। মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আমরা এই একই "আগে-পিছে"র পারম্পর্য্য সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎপত্তির মধ্যে দেখতে পাই।

মানুষ কথিত ও লিখিত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চিত্রকলার চাক্ষুষ ও নিরক্ষর ভাষায় আত্মপ্রকাশ করবার কৌশল অর্জ্জন করেছে। স্পেনের আলতামীরা গুহায় ইতিহাসের বহু যুগ আগে লিখিত চিত্রাবলী পঁচিশ হাজার বৎসর বয়সের দাবি করে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে রূপবিদ্যাই মানুষের মনের কথা প্রকাশ করবার অতি আদিম ও প্রাচীন ভাষা। শিশুমনের বিবর্ত্তনের স্তরে স্তরে এই কথাটাই সপ্রমাণ হচ্ছে।

শিক্ষাতত্ত্বের আধুনিক গবেষকরা প্রমাণ করেছেন যে শিশুচিত্তের ইতিহাসে, emotion বা ভাব বা রসবোধ-শক্তির বিশেষ উদ্বোধন হয় চার থেকে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে। এই সময়টাকে মনোবিজ্ঞানীরা শিশুমনের চিন্তাশক্তি বা যুক্তিপ্রয়োগের পূর্ব্বযুগ বলেন, এটি হ'ল মনের pre-logical বা non-logical অবস্থা। মন তখন যুক্তির পথে চিন্তা করতে পারে না, চিন্তার ধার ধারে না, কিন্তু মন তখন ভাবরসে ভরপুর। শিশুমনের এই অবস্থাটি বড় সজীব, বড় critical অবস্থা। এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিশুর ভাবরসশক্তি এবং তাহার ভাবরাজ্য গড়ে উঠে। এই emotional life বা ভাবজীবনকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য—যথাযোগ্য রস ও খাদ্য যোগাতে হবে, তার ভাব ও কল্পনাশক্তি বড় ক'রে তুলতে হবে নানা "খেলাধুলার" মধ্য দিয়ে, নানা রূপকথা, নানা ছড়া-উপকথার আহার জুগিয়ে।

মনোবিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ করেছেন যে, শিশুমনের এই কল্পনাশক্তির বিকাশ ও পরিপোষণ কেবল যে শিশুর ভাবজীবনের পক্ষেই আবশ্যক তা নয়—শিশুর চিৎশক্তি, চিন্তাশক্তি, মননশক্তি ও বুদ্ধিবিকাশের দিক দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার গরজে এই কল্পনাশক্তির পরিপোষণ একান্ত আবশ্যক। উইলিয়ম হেলী যিনি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তিনি প্রমাণ করেছেন যে, শিশুমনের এই কল্পনালীলা যেটি তার বয়সকালের সহজ ও সাধারণ ধর্ম্ম তাকে নিরোধ করলে, দমন করলে, তার প্রকাশের পথ না দিলে, পরবর্ত্তী বয়সে নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। তার মনে নানা পাপ-বৃত্তি, অনেক অবাঞ্ছনীয় দুষ্ট-প্রবৃত্তি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সুতরাং শিশুজীবনের এই emotionকে বা ভাববৃত্তিকে মানুষ করে তোলা, সুশিক্ষিত করে তোলা প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য ও পালনীয় ধর্ম্ম। এই emotionকে বাঁচিয়ে রাখবার খাদ্য কেবল কথিত ভাষার রূপকথা, উপকথা নহে, তার প্রধান খাদ্য হ'ল রূপ-রসের রেখা-বর্ণের চাক্ষুষ জগতের সহিত সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। নানা সুচিত্রিত ও সুলিখিত চিত্রপট তাদের চোখের সামনে ধরতে হবে, যার দ্বারা শিশুর বর্ণবোধ-শক্তি পরিবর্দ্ধিত, সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত হবে। এই colour sense বা রঙ চেনা এবং রঙ ফলান, এবং কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রঙ খাপ খায়, কোন্ রঙ কোন্ রঙের সঙ্গে মিলতে পারে, এই বর্ণের সুর-জ্ঞান ও সুর-সঙ্গতির সমাবেশ ও সমালোচনার শক্তি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের, আমাদের নিত্য ব্যবহারের নানা craft ও industryর সার্থকতার হিসাবে খুব একটা বড় কথা, খুব একটা কাজের কথা। বর্ণজ্ঞান না থাকলে আমাদের সমস্ত জীবন যে কেবল মলিন, মসীলিপ্ত ও বিবর্ণ হয়ে উঠে তা নয়, আমাদের শ্রমজাত industrial artর নমুনা বাজারে বিকোয় না। চীন, জাপান ও য়ুরোপের ওস্তাদ শিল্পীরা তাঁদের কারখানায় নানা শিল্পজাত দ্রব্যকে রঙের যাদুবিদ্যায় যেমন চিত্তহারী করে তুলতে পারেন, বর্ণজ্ঞানহীন আমাদের দেশের আধুনিক অশিক্ষিত শ্রমশিল্পীরা তার সঙ্গে এখনও পাল্লা দিতে পারছেন না। প্রাচীন কালের ভারতের শিল্পীরা এই বর্ণজ্ঞানের কৌশলে খুব পাকা ছিলেন। তাঁদের হাতের প্রাচীন কালের ভারতের কারুকলার নানা শ্রেষ্ঠ নমুনা বর্ণবিজ্ঞানের অলৌকিক

রসবোধের দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিম দেশের নানা যাদুঘরে সম্মানের আসনে পূজা পাইতেছে। সুতরাং এই বর্ণের "বস্থ" "দস্থ" জ্ঞান কেবল সৌখীন ভাবুকতার দিক দিয়ে নয়, শিল্প-বৃত্তির ও দেশের শিল্পের উন্নতি-বিধানের দিক্ দিয়ে একটা মস্ত বড় কথা এবং অত্যন্ত কাজের কথা। এই নিরক্ষর বিদ্যার বর্ণবোধের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর form-sense বা রূপ-গ্রহণ ও রূপ-বিচারের শক্তি অতি সন্তর্পণে গড়ে তোলা আবশ্যক। এই রূপ-গ্রহণের শক্তি আমাদের জীবনের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-রীতির গোড়ার কথা। জাতিগত ভাবে আমরা form-sense হারিয়েছি,—তাই কোনও জিনিষই এখন "গড়ে" তুলতে পারি না। কি সমাজে, কি শিক্ষাতন্ত্রে, কি রাষ্ট্রতন্ত্রে জীবনের কোনও বিভাগেই আমাদের আদর্শকে মনের মত "রূপ" দিয়ে খাড়া করে তুলতে পারি না। এই "রূপবিদ্যা", এই গড়বার বৃত্তি, গঠনরীতির কৌশল এই plastic sense, এই রূপ গড়বার শক্তি আমরা হারিয়েছি। আমাদের হাতে-গড়া সব জিনিষই কেমন 'এলোমেলো' হয়ে ওঠে—তার রূপের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনও সঙ্গতি, কোনও সামঞ্জস্য, কোনও গঠনরীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যাধির কারণ হ'ল এই যে, আমরা ঈশ্বরদত্ত রূপশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, রসবোধ-শক্তি aesthetic sense আমরা হারিয়েছি। ছেলেবয়সে পঠদ্দশায় এই সব শক্তির অনুশীলন করবার কোনও সুযোগ-সুবিধা আমরা পাই নাই—আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতিতে একটা বড় অভাব, একটা বড় ফাঁক অনেক দিন থেকে মুখব্যাদান করে রয়েছে।

শিক্ষায়তনে শিশুদের এই ঈশ্বরদত্ত মানসিক বৃত্তি এই রূপবুদ্ধির অনুশীলন ও সাধনার নানা ব্যবস্থা ও সুযোগ পশ্চিম দেশের প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ে কিছু কিছু আছে। জার্ম্মেনীতে, ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডেও রূপবিদ্যার অনুশীলন ও উন্নতি সাধনের যথোচিত বিধি-ব্যবস্থা আছে। শিল্পকলার সাধনা এবং শিল্পকলার শিক্ষা ও প্রচার সকল দেশেই একটা বড় জাতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়েছে। ফ্রান্স দেশে Ministry of Fine Art নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রীর দপ্তর আছে। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তারা শিক্ষার এই বিভাগের দায়িত্ব বহন করেন এবং বিলাতের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ম, বোর্ড অব এডুকেশন বা শিক্ষা-সংসদে বিদ্যালয়ে কলাশিল্পের আলোচনার নানা সুযোগ ও সুব্যবস্থা ক'রে থাকেন। সাময়িক প্রদর্শনী, ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী, কলাবিদ্যা সম্বন্ধে নানা বক্তৃতামালার ব্যবস্থা ক'রে এবং চিত্রশালার সংগ্রহ হইতে নানা শ্রেষ্ঠ-চিত্রের নিদর্শনের সস্তা ও সুন্দর প্রতিলিপি প্রকাশ ক'রে, মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষরা সকল রকমের শিল্প-সাধকদের নানা উপায়ে সাহায্য করে থাকেন এবং নানা পথে জাতীয় শিল্পকলাকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

আমেরিকার শিক্ষাতন্ত্রে কলাবিদ্যার শিক্ষার ব্যবস্থা আরও অধিক পরিমাণে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত। সে দেশে শহরে শহরে চিত্রশালা ও সংগ্রহশালার সঙ্গে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—স্কুলে ও কলেজে যে সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তার চাক্ষুষ উপলব্ধির জন্য ছেলেদের নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে চিত্রশালায় নিয়ে গিয়ে পুস্তকে পঠিত জ্ঞানের বিষয়গুলি চিত্রের মারফত সহজ, সরস ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরিণত করা হয়। কেবল যে নানা যুগের নানা শ্রেষ্ঠ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া ছাত্রছাত্রীদের রূপবুদ্ধি পরিণত ও সুশিক্ষিত করা হয় তা নয়, ইতিহাসের প্রত্যেক যুগের পাঠ্যবস্তুকে নানা ঐতিহাসিক পুরাবস্তুর নিদর্শনের মারফত চাক্ষুষ রূপে জীবন্ত ক'রে, প্রত্যক্ষ ক'রে দেখান হয়।

এই visual method বা চাক্ষুষ পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগই একটা সরস, সজীব ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সহজ অনুভূতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অতীত কালে নানা যুগে নানা শিল্পকলা—বয়নশিল্প, মৃৎ-শিল্প, কাঠের শিল্প—ধাতুশিল্প—কত উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল—কি নক্সায়, কি পরিকল্পনায়, কি বর্ণবোধে, কি কারিগরী ও মুন্সীয়ানায় সেকালের শিল্প-সৃষ্টি কি উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল, চাক্ষুষ নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তার তুলনা করবার সুযোগ পেয়ে বর্ত্তমান কালের শিল্প উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার শিক্ষা ও যোগ্যতা লাভ করে।

এই রূপে রূপবিদ্যার চাক্ষুষ পথে এমন অনেক রকমের জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়, মানুষের সৃষ্টিশক্তির এমন অনেক গুপ্তরহস্য অধিকার করা যায়, যার সন্ধান লেখা পুঁথী আর ছাপা কেতাবের পাতায় পাওয়া যায় না।

শিক্ষাতত্ত্বের এই বহুমূল্য সত্যটি স্বীকার ক'রে নিয়ে পশ্চিম দেশের শিক্ষাতন্ত্র একটা সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় সুগঠিত হয়েছে যার প্রয়োগে মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তির সমস্ত শক্তির অভ্যাস ও অনুশীলনের সম্যক্ সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের মেট্রোপলিটন মিউজিয়মে রোজ অন্ততঃ এক হাজার ছেলেমেয়ে নানা স্কুল থেকে পালা করে ঐ চিত্রশালায় চাক্ষুষ শিক্ষা লাভ করতে উপস্থিত হয়। বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তাদের নানা চিত্রবস্তু ও পুরাবস্তু দেখিয়ে দিয়ে নানা বিষয়ে তাদের জ্ঞান পাকা ক'রে তোলা হয়। এইরূপে নিউ ইয়র্কের চিত্রশালায়

প্রতি বৎসর তিন লক্ষ ছেলেমেয়ে চক্ষুর পথে শিক্ষা লাভ করে, তাদের রূপদৃষ্টিকে পরিপূর্ণ ও পরিণত ক'রে, তোলে, সার্থক ক'রে তোলে। তা ছাড়া প্রত্যেক স্কুলের দেওয়ালে যথাযোগ্য ছবি টাঙিয়ে রাখা হয় এবং সেগুলি মধ্যে মধ্যে বদলে দিয়ে ছেলেমেয়েদের রূপ-রস বোধের অভ্যাসটা গড়ে তুলে তাদের দৃষ্টিশক্তি সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত করে তোলা হয়। তাদের মধ্যে যাদের শিল্প-সৃষ্টির প্রতিভা থাকে তাদের জন্য আর্ট স্কুলে বিশিষ্ট রকম শিক্ষা দেবার সুচারু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণতঃ সকল ছেলেমেয়েকেই তাদের দৃষ্টিশক্তি সুশিক্ষিত করবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। কেবল পুঁথির পাতায় নিবদ্ধ রেখে তাদের ঈশ্বরদত্ত রূপদৃষ্টি ও রূপবুদ্ধিকে হত্যা করা হয় না।

কারণ যাঁরা কলাবিদ্যাকে উপজীবিকা বলে না নিয়ে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করবেন, তাঁদেরও উপযুক্ত রকম রসবোধ-শক্তি থাকা চাই—এই কথাটা শিক্ষাতত্ত্বের একটা মূলগত সত্য বলে গৃহীত হয়েছে।

কারণ সমাজে রুচিসম্পন্ন 'রসবিৎ' সমজদার না থাকলে 'রসকৃৎ' বা শিল্প-সৃষ্টিকারদের শিল্প-সৃষ্টির উপযুক্ত বিচার হবে না, এবং সমাজে শিল্প-সৃষ্টিকার, অর্থাৎ শিল্পীর যথাযোগ্য আদর, প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ ক'রে সমাজকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি দিয়ে পরিপূর্ণ করবার অবকাশ পাবেন না। আমাদের দেশের অন্যান্য প্রদেশে সাধারণ বিদ্যালয়ে শিল্পকলার দৃষ্টি সুশিক্ষিত করবার জন্য নানা নূতন পরিকল্পনার শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তনের চেষ্টা সুরু হয়েছে। গত নবেম্বর মাসে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে একটি পরিকল্পনা ধার্য্য হয়েছে। এই পরিকল্পনাটিতে প্রাইমারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে ইউনিভার্সিটির পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষা ব্যাপারের প্রত্যেক স্তরেই রূপশিল্পের সহিত সম্যক্ পরিচয়ের সুব্যবস্থা হয়েছে।

ইতিমধ্যে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটি বিশেষজ্ঞ-কমিটি নিযুক্ত করেছেন—শিক্ষা ব্যাপারের প্রত্যেক স্তরে কি ভাবে কলাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত তার একটি পরিকল্পনা এই কমিটি স্থির করবেন। আমাকে এই কমিটির সভ্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কমিটির কাজ দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

বাংলাদেশে সাধারণ বিদ্যালয়ে কলা-শিক্ষার ব্যবস্থার কিছু কিছু সূচনা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার অনুরোধে প্রবেশিকা পরীক্ষায় Art Appreciation Course নামে একটি নূতন কোর্সের প্রবর্ত্তন করেছেন। অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই কোর্সের পরীক্ষা আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ দিয়ে আসছেন। সাহস করে বলা যেতে পারে—এই কোর্সের ছেলেমেয়েরা খুব ভাল ফল দেখাতে পেরেছে। এই সম্পর্কে Trained Art Teachers তৈয়ারী করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের অবকাশে দু'মাসের জন্য Training Class খোলা হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ত্রিশ জন শিক্ষক এই বিদ্যায় special training-এর ডিপ্লোমা নিয়েছেন।

ভদ্রকালীর এই বিদ্যালয়ে—সাধারণ পাঠ্যতালিকার সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যা অনুশীলনের যে সুব্যবস্থা হয়েছে, তা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যম। ঠিক এই রকমের ব্যবস্থা আর কোনও স্কুলে আমি দেখিনি। এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন প্রাচীন গ্রাম্য শিক্ষার পথ অবলম্বন ক'রে এবং ইতিমধ্যে যে বেশ ভাল ফল দেখিয়েছেন সেটা এই স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্তৃপক্ষীয়দের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা।

কলিকাতার অনেক দূরে এই ছোট গ্রামের মধ্যে এমন একটা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে কত বড় শক্ত কাজ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম করা খুব শক্ত। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে, যাঁরা এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সফল করে তুলেছেন তাঁরা দেশবাসীকে একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি দান ক'রে ধন্য করেছেন। আমাদের সকলের কর্ত্তব্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও বড় ক'রে তোলা, পূর্ণ ক'রে তোলা, সার্থক ক'রে তোলা।

শিক্ষাতত্ত্বে এই স্কুলের শিক্ষকেরা একটি নূতন দান দিয়েছেন, সেটি হ'ল এই যে শিক্ষাদান কার্য্য কেবল একটা খবর সরবরাহ করবার পদ্ধতি মাত্র নহে। শিক্ষা হ'ল আধ্যাত্মিকতার পথে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে অসমসাহসিক অভিযান ও জয়যাত্রা, এবং কলা-শিল্প এই জয়-যাত্রার জীবন্ত, মঙ্গলময় আর পবিত্র পথ।*

* ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৭ তারিখে পঠিত।

এহ্যেহি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হে প্রভু, আসিছ তুমি কি ?
রাঙা হয়ে কেন উঠিতেছে ধরা
জানিতে পেরেছে তুমি কি ?
জন-সমুদ্র কেন উতরোল ?
কোথা থেকে এলো হেন হিল্লোল ?
কল্লোল-ভরা যত পল্বল,
দেখিয়া দাঁড়াই থমকি !

তুমি কি আসিছ, হে কেশব ?
রয়ে রয়ে মোর কানে যে পশিছে
তব অশ্বের হ্রেষা রব ।
খর করবালে রক্তের রেখা—
করে ঝকমক, ক্ষণে যায় দেখা,
মণ্ডলী করি নর্তন করে
নারায়ণী সেনা ওকি সব ?

ওকি উৎসব মরণের !
এই চরাচর ইঙ্গিত পেলে
বুঝি তব অবতরণের ?
উন্মাদনায় যায় জীব মরি,
কদম্বরেণু সম পড়ে ঝরি,
হিন্দোলে এসে যম দোল লাগে
কোন্ সে শঙ্কা হরণের ?

কুসুম ঢেকেছে পিয়ালে—
জীর্ণ শীর্ণ মুমূর্ষু দিকে
এমন করে কে জিয়ালে ?
প্রলয় দোলের রাঙা পিচকারী—
বিস্মিত ভীত চিনিতে যে পারি,
ভুবন ভরিয়া উড়ে রাঙা ফাগ্,
ও মরণবাহী হিঁয়ালে ।

দেখি আঁখি মেলে কি করি ?
কিরীটে তোমার কোটি সূর্য্যের
কিরণ পড়িছে ঠিকরি' ।
তীব্র জ্যোতিতে হারা হ'ল সব,
তুমি ছাড়া নাই কিছুই কেশব,
বিচ্ছিন্ন এ বিশ্বে বাঁধুক
তোমার প্রেমের নিগড়ই

বট হে তুমিই বট হে,
পাঞ্চজন্য কম্বু-নিনাদ
পশিছে কর্ণপটহে ।
নহে আনন্দ, নহে সৎ চিৎ,
এ বিশ্বরূপ লোকক্ষয়কৃৎ,
নব পৃথিবীর নূতন যুগের
শুচি শুভোদয় ঘটয়ে ।

কই শার্ঙ্গপাণিতে ?
দুষ্কৃতি দলে দলিতে আসিছ
সাধুরে অভয় দানিতে ।
মহাসমুদ্র উঠিছে কাঁপিয়া,
জীবময়ী ধরা উঠিছে কাঁপিয়া,
করাল কোটাল জোয়ার আসিছে
সফরী পেরেছে জানিতে

ধরাতলে লুটে প্রণমি,
ভুবন টলানো তব আগমন
প্রতি পলে পলে গণমি ।
বহু দিন পর আসিছ আবার,
ডুবায়ে, চুবায়ে, সুধা-পারাবার,
রেখে যাই নতি—জানিনে রহিব
কোথায় কি হয়ে জনমি ।

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

৩

অন্নদাবাবু ইতিমধ্যে খেদা থেকে একটু দূরে অবস্থিত তাঁর ক্যাম্পে গিয়েছিলেন, অশোকও সেখানে গিয়েছিল। ওরা ফিরে এল প্রায় ছটোর সময়। অন্নদাবাবুর কাছ থেকে জানা গেল এইবার বুনো হাতীর গলায় ফাঁস পরানোর কাজ আরম্ভ হবে, সুতরাং ফোটোগ্রাফ তোলার জন্যে আগে থাকতেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। তিনি তৃতীয় মাচাটি দেখিয়ে বললেন এইখানে উঠুন। কিন্তু সে মাচায় তখন এত লোক যে সেখানে ওঠা অসম্ভব। অন্নদাবাবু তা দেখে সেখান থেকে তাদের নামিয়ে দিলেন। আমি উপরে উঠেই বুঝতে পারলাম অন্নদাবাবু ঠিকই বলেছেন, কারণ একমাত্র এইখানে দাঁড়ালেই সূর্য প্রায় পিছনে থাকে। অন্য দুটি মাচায় দাঁড়ালে সূর্য পড়ে যায় চোখের উপর, সুতরাং ক্যামেরার লেন্সেরও উপর। তবে এখানেও একটি অসুবিধা আছে। গড়ের বেড়ার গাছগুলোর কয়েকটা একটু বেশি উঁচু—ক্যামেরাকে বাধা দেয়।

আমি যে মাচাটি সম্পূর্ণ একা পেলাম তা নয়, একজন ভদ্রলোক ওখানে বসে গড়ের মধ্যে কলাগাছের এক একটা টুকরো মাঝে মাঝে ফেলছিলেন বুনো হাতীদের মধ্যে। তিনি রইলেন, তা ছাড়া আরো অনেকে উঠে এল একটু পরেই। ইতিমধ্যে দূর দূরান্তর থেকে বহু দর্শক এসে পড়েছে, তার মধ্যে বাঙালী মেয়েও আছে অনেক। ইউরোপীয় ভদ্রলোক দু'জনও ক্যামেরা নিয়ে আমার ডান ধারের মাচা থেকে আমার পাশে উঠে এলেন। কিন্তু যত লোক এসেছে তাদের সবার জায়গা তিনটি মাত্র মাচার উপর হতে পারে না, তারা গড়ের বেড়া বেয়ে উপরে উঠে অথবা নিচে দাঁড়িয়ে বেড়ার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল।

আমার ঠিক বিপরীত দিকেই গড়ের দরজা, সেও সরু সরু গাছ কেটে তৈরি। পোষা হাতীর দল এই দরজা দিয়েই এসে ঢুকবে গড়ের মধ্যে, তাদের প্রত্যেকের পিঠে থাকবে একজন করে মাহুত, বুনো হাতীর গলায় ফাঁস পরাবার জন্যে।

পোষা হাতী আসবার সময় হয়ে গেছে। সবাই উন্মুখ হয়ে আছে, তবু যেন বেশ দেরি হচ্ছে। নিচে কত দেশের লোককে দেখা যাচ্ছে। নেপালী, ভুটিয়া, হিন্দুস্থানী, শিখ, বাঙালী—সব জাতীয় মেয়ে-পুরুষ। আমি ক্যামেরা প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে আছি। এমন বিপজ্জনক জায়গা যে একটু অন্যমনস্ক হলে গড়ের ভিতরে পড়ে যাব। অথবা ডানধারে এক ইঞ্চি পা সরালে বাইরে পড়ব। দু'দিকেই সমান বিপদ। এক দিকে বুনো হাতী, আর এক দিকে খোঁচা খোঁচা বাঁশ ও কাঠের প্রান্ত। মাচাটি টুকরো বাঁশ পাশাপাশি বেঁধে তৈরি, চেরা বাঁশ নয়, আস্ত গোল গোল। ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, প্রত্যেক দুটি বাঁশের মাঝখানে একটু করে ফাঁক আছে। সমস্ত মাচাটা চার সাড়ে চার হাত লম্বা-চওড়া। তার উপরে তখন আমরা অন্ততঃ দু'জন লোক আছি, আমার পিছনে আমাদের ট্রাক চালকের সহকারী লালু নামক একটি ছেলে। আমার রক্ষক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে সে—যদি হঠাৎ পা ফস্কে যায় সে আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাকেই দু'বার পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম।

গড় পনর-ষোল হাত উঁচু এবং ভিতরের গোল জমিটার ব্যাস হবে প্রায় পঁচিশ হাত। বাইরের দিকে মোটামোটা কাঠ দিয়ে কয়েক হাত পর পর গড়ের বেড়াকে ঠেলে রাখা হয়েছে গড়কে বেশি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। গড়ের ঠিক মাঝখানে একটি আধ-মোটা গাছ।

এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা অবশ হয়ে আসছে, মাঝে মাঝে উপর থেকে ঝুলে-পড়া সরু একখানা ডাল ধরে বিশ্রাম করছি। সেও খুব নির্ভরযোগ্য নয়, সুতোর মতো সরু এবং শুকনো। এমন সময় পোষা হাতীর পিঠে মাহুতদের মাথা দেখা গেল গড়ের দরজার বাইরে পাতাঘেরা পথে। তারা দরজার কাছে এগিয়ে আসামাত্র মুহূর্তে এক কাণ্ড ঘটে গেল। তাদের সাড়া পেয়েই গড়ের ভিতরের বুনো হাতীরা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার উপর। এ রকম সদলবলে গড়ে অনধিকার-প্রবেশকারীদের উপর হঠাৎ আক্রমণ দেখে বোঝা গেল ওদের বেরোবার পথ থাকলে কত সহজে শত্রুদের চূর্ণ করে জঙ্গলে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওদের এই আক্রমণ এখন সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

গেটের সঙ্গে সংলগ্ন যে মাচাটি ছিল ইতিপূর্বে সেই মাচাটিতেই আমি ছিলাম। হাতীর আক্রমণে তা বার বার কেঁপে উঠছিল। কিন্তু এখন যে মাচায় আছি তা গড়ের বেড়া থেকে তিন-চার ইঞ্চি তফাতে, তাই ছবি নেওয়ার পক্ষে সে দিক দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত। কিন্তু বন্য হাতীকে প্রথম ফাঁস লাগিয়ে বাঁধার কাজ যে এমন আশ্চর্যরকমের একটি ব্যাপার সে বিষয়ে আমার কোনোই ধারণা ছিল না। এর মধ্যে বিস্ময়কর কৌশল, দৈহিক শক্তি, খেলার ওস্তাদি এবং চরমতম নিষ্ঠুরতার যে সব ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখলাম তাতে ছবি তুলব, না সেই খেলা দেখব, তা ঠিক করাই হ'ল বিষম সমস্যা। এ কথা সত্য যে আগে যদি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা থাকত তা হলে আরও অনেক রকম অবস্থার ছবি নেওয়া যেত।

প্রথমে দু'টি হাতী ঢুকল গড়ের মধ্যে, তিনটি বাইরে রইল।



খেদার গড়ে পোষা হাতীর দল জংলী হাতীদের উপর আক্রমণ
চালাইবার জন্ত ঢুকিতেছে



খাসির একটি কুলী মেয়ে



ন্দী বুনে   তীর   ন গ



ভয়   জংলী-হাতীর উপর পোষা হাতীর মারাত্মক   ক্রম

ওরা ঢুকেই বুনো হাতীগুলোকে অতি প্রবল বেগে আক্রমণ করতেই বুনো হাতীগুলো হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। ওরাও ফিরে আক্রমণ করার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু পোষা হাতীদের অতি হিংস্র আক্রমণের মুখে ওদের সকল চেষ্টা বিফল হতে লাগল, ওরা বুনোদের মুখ ফেরাতেই দিল না।

এই পোষা হাতীগুলো এদের চেয়ে আকারে অনেক বড় এবং ওদের মধ্যে মাকনা এবং কুনকী দুইই আছে। দাঁতাল হাতীর দু-একটার দাঁত সম্মুখের দিকে করাত দিয়ে কাটা। ওরা মাথা দিয়ে এবং দাঁত দিয়ে ওদের পিছন থেকে চার্জ করতে লাগল। তিনটি অনভিজ্ঞ হাতীর পিছনে (ছোট দুটিকে তো দেখাই যাচ্ছে না)—অতগুলো ওস্তাদ হাতী। মাহুত পোষা হাতীর মাথায় ক্রমাগত শড়কির খোঁচা মারছে আর মুখে একরকম শব্দ করছে—খোঁচার ঘায়ে ওদের মাথা দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত ঝরছে আর ক্ষেপে গিয়ে বুনো হাতীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এইভাবে আক্রমণ চালাতে চালাতে ওরা বুনোদের গড়ের এক পাশে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল। বাচ্চা দুটো হাতী বড় তিনটির মধ্যে সর্বদা লুকিয়ে আছে, মাঝে মাঝে তাদের পা দেখা যাচ্ছে। ওরা কোণঠাসা হয়ে আছে আর পিছনের হাতীরা ওদের দাঁত দিয়ে, মাথা দিয়ে, এবং শুঁড় দিয়ে এমন চেপে রেখেছে যে কয়েক মিনিট সবাই যেন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকা যায় না। পিছনের হাতীগুলোর চাপ একটু ঢিলে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে এক বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সমস্ত গড়-একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। এমন উত্তেজনাপূর্ণ খেলা ইতিপূর্বে আর দেখি নি।

মাহুতদের পিঠে নিয়ে আক্রমণকারী হাতীগুলো উন্মাদের মতো বুনো হাতীগুলোর গায়ে যেখানে-সেখানে আঘাত হানতে লাগল। নিচের ধুলো-বালি উড়ে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ধোঁয়াটে হয়ে গেল। মাহুতরা ঘেমে উঠল। তারা তাদের হাতীদের মাথায় ক্রমাগত শড়কির খোঁচা মেরে ক্ষিপ্ত হিংস্র হাতীগুলোকে আরও হিংস্র করে তুলতে লাগল। মাহুতরা তাদের পা হাতীর গলায় জড়ানো জালের মধ্যে দু'দিক থেকে চালিয়ে দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করে রেখেছে, নইলে এ রকম অবস্থায় তারা যত ওস্তাদই হোক নিচে পড়ে যেত।

আমার ডান দিকের মাচায় অন্নদা বাবু এক কোণে বসে খেলার মাঠের দর্শক যেমন নিজের দলকে চীৎকার ক'রে উৎসাহ দেয় তেমনি ভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন মাহুতদের। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্যামেরার লেন্সে সোজা সূর্যের আলো লাগছে, অতএব ক্যামেরা ছেড়ে হাতীর লড়াই দেখছে। অশোকও খুব উত্তেজিতভাবে তার পাশে দাঁড়িয়ে। সম্মুখের মাচায় সুশীল বাবু ও শীতলা বাবু এবং আরও দশ বারো জন দর্শক। গড়ের বেড়া বেয়ে বহু লোক উপরে মাথা বের করে লড়াই দেখছে। নিচে তো দাঁড়াবারই জায়গা নেই।

বুনো হাতীগুলো একে তো ক'দিন অর্ধাহারে দুর্বল, তার উপর এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ—এ যেন আর সহ্য করতে



ভিম· কোয়া'রর মধুর

পারছে না। ওদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাচ্চা-গুলোকে এই বিপদের অবস্থাতেও চেপে আড়াল ক'রে রাখছে। ওরা হাঁপাচ্ছে—কিন্তু তবু হয় তো আশা করছে এর পরেও ওরা পালাবার পথ পাবে, তাই ওরা প্রাণপণ শক্তিতে বিদ্রোহ ক'রে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে।

পোষ হাতীদের এই স্বজাতিবিদ্বেষ কেমন অদ্ভুত লাগে। মনে হয় যেন এক দিন ধরা পড়ে ওরা যে অত্যাচার নিজেরা সহ্য করেছে, আজ ঠিক সেই অত্যাচারই চালাচ্ছে ওরা নতুন-ধরা হাতীদের উপর।

মাহুতদের হাতে মোটা দড়ির ফাঁস। এইবার তারা ক্রমাগত চেষ্টা করতে লাগল কোন্ ফাঁকে তা ওদের গলায় পরাবে। কিন্তু অবস্থা যা দেখা গেল তাতে কাজটি মোটেই সহজ নয়। বুনো হাতীরা সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার না করলে ফাঁস পরানো প্রায় অসম্ভব।

এইবার গড়ের মাঝখানের গাছটি ঘিরে ওদের লড়াই চলতে লাগল। বুনো হাতীদের উপর শুধু পোষা হাতীর আক্রমণ নয়, মাহুতরাও তাদের শড়কি দিয়ে ওদের মাথায় খোঁচা মারতে লাগল।

শুধু বুনো হাতীরাই যখন গড়ের মধ্যে ছিল তখন তাদের শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। এখন দেখছি তারাই ক্রমে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ছে পোষা হাতীদের আক্রমণে। ফাঁস হাতে করে মাহুতরা তাদের হাতীগুলোকে যখন বুনো হাতীদের উপর দিয়ে ফেলল তখন ওদের আর এক ইঞ্চিও নড়বার উপায় রইল না। বুনো হাতীগুলো গড়ের বেড়ায়



তিস্তায় হিমালয়ের একটি পাশ ধ্বসিয়া খাড়া প্রাচীরের মত হইয়াছে—দুটি মানুষকে দেখাইতেছে পিঁপড়ের মত

সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে পরস্পর গায়ে গায়ে কঠিনভাবে এঁটে দাঁড়িয়ে আছে—পোষা হাতীরা রয়েছে তাদের পিছনে। এ অবস্থায় বুনোদের গলা অনেক দূরে থাকায় ফাঁস পরানো সম্ভব হ'ল না। ফাঁস পরাতে হলে দুটো পোষা হাতীর সাহায্যে দু'দিক থেকে একটা বুনো হাতীকে চেপে ধরা দরকার, কিন্তু সে আর কিছুতেই হয়ে উঠছে না। বুনো হাতীরা আত্মরক্ষার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে। পোষা হাতীরা গোড়া থেকেই প্রয়োগ করছে পশুশক্তি, কিন্তু বুনো হাতীদের আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই, তাই তারা পাল্টা প্রয়োগ করছে শুধু তাদের বুদ্ধিকৌশল। ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছে যে শত্রুপক্ষ তার শেষ অস্ত্র হেনে ওদের বন্দী করবে—তাই ওরা অদ্ভুত চাতুর্যের সঙ্গে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু ওরা হয় তো এখনও জানে না যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে প্রবল শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

পূর্বোক্ত অচল অবস্থা দু'তিন মিনিট স্থায়ী হ'ল। তার পরেই আরম্ভ হ'ল নতুন আর একটা যুদ্ধ। এবারেও ঠিক আগের মতোই সমস্ত আঙিনায় ধুলো উড়িয়ে ওরা সমস্তটুকু জায়গায় পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। মিনিট পাঁচেক লড়াইয়ের পর হঠাৎ সুযোগ পাওয়া গেল ছোট দাঁতাল হাতীটার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেবার। তখন খেলার মাঠে এক পক্ষে গোল হলে বিজয়ী দলের সমর্থকেরা যেমন উল্লাস প্রকাশ করে তেমনি একটা জয়ধ্বনি শোনা গেল খেদার লোকদের মুখ থেকে। হঠাৎ আমার ডান ধারের মাচার দিকে চেয়ে দেখি অশোক এবং সুধাংশু সেখানে নেই—তাদের জায়গায় বহু বাঙালী মহিলা। তাঁরাই যে ক্রমশঃ ওদের স্থানচ্যুত করেছেন তাতে আর সন্দেহ রইল না। এক কোণে খোলা হ্যাটের নিচে অন্নদাবাবুর মুখখানা দেখা যাচ্ছে—তিনি একটি হাতী বাঁধা পড়াতে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন।

ফাঁস লাগিয়ে বাচ্চা হাতীটাকে পোষা হাতীর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ল। তারপর তাকে বাইরে নিয়ে যাবার পালা। কিন্তু এই বাইরে নিয়ে যাওয়া দেখলাম একটা মস্ত বড় সমস্যা। বাচ্চা হাতী বেঁকে দাঁড়াল, সে কিছুতেই যাবে না। সে এমন শক্ত ভাবে দাঁড়িয়েছে যে তাকে স্থানচ্যুত করে কার সাধ্য! প্রকাণ্ড পোষা হাতী তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও হিমসিম খেয়ে গেল। একখানা ষ্টীমার নদীর চড়ায় আটকে গেলে অন্য ষ্টীমার তাকে দড়ি বেঁধে টানতে থাকে কিন্তু নড়াতে পারে না, সেই ছবিটিই মনে পড়ল এই টানাটানির দৃশ্য দেখে। পোষা হাতী এক দিকে প্রাণপণ টানছে, বাচ্চা হাতী গড়-মধ্যস্থ গাছের সঙ্গে দড়ি বাধিয়ে আর এক দিক থেকে টানছে—ফলে কেউ কোনো দিকে সরছে না।

এদিকে অন্যগুলোর উপর আবার পোষা হাতীর আক্রমণ সুরু হয়েছে—ঐ অল্প পরিসর জায়গার মধ্যে সেই আক্রমণের ধাক্কা এসে লাগল ছোট হাতীটার উপর, এবং তার ফলে সে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হ'ল, আর ঠিক সেই সুযোগে বড় হাতীটা ওকে এমন জোরে টান মারল যে সে তার বেগ সামলাতে না পেরে একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে হাঁ ক'রে ফেলল। গলার ফাঁস কঠিন হয়ে এঁটে গেছে। সে কি বীভৎস দৃশ্য! তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে বেশ কিছু সময় লাগল।

এদিকে অন্যগুলোর উপর আক্রমণ চলতে চলতে বড় আর একটার গলায় ফাঁস পরানো দেখলাম। ষ্টীমার-বাঁধা দড়ির মতো মোটা দড়ির ফাঁস মাহুতরা সর্বক্ষণ হাতে ক'রে লড়াই চালাচ্ছে। সুযোগ পাওয়া মাত্র বুনো হাতীর মাথার উপর তা ফেলে দেয়, এবং যত বার ফেলে তত বার সে শুঁড় দিয়ে সেটাকে নামিয়ে দেয়। নামানোর সময় শড়কির খোঁচা পড়ে মাথায়—কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। এইভাবে বহু বারের ব্যর্থ চেষ্টার পরে তবে সফল হওয়া যায়।

ফাঁস ঠিক মতো পরানো হলে তা টেনে গলার সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়, এবং পরে বন্দী হাতীর দুই পাশে দুটি পোষা হাতীর সঙ্গে তাকে এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয় যে তখন আর তার পালাবার বা বাধা দেবার কোনো উপায় থাকে না।—এ রকম দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য টিকিট বিক্রি করে দেখালেও দর্শকের ভিড় কমবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সমস্ত দেখে-শুনে কেবলই মনে হতে লাগল হাতী ধরার এই প্রাচীন নিষ্ঠুর প্রথার কি কোনো পরিবর্তন করা যায় না? এ সমস্ত কাজই কি যন্ত্রের সাহায্যে হতে পারে না?

আমি মাচার উপর একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছি—ভিড়ের চাপে আমার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, এবং এমন অবস্থা হয়েছে যে একটা ফিল্ম শেষ করে ক্যামেরায় নতুন

কিন্তু পরানো সে অবস্থায় একেবারে অসম্ভব। নিচে নামলেও আর ওঠবার উপায় নেই, কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ ছবিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। আরও কত রকম ভঙ্গি তোলা যেত, তা ভেবে দুঃখ হ'ল। কিন্তু কোনো উপায়ই ছিল না। তা ছাড়া আলোর তেজ তখন একেবারে কমে গেছে—ডিসেম্বর মাসের বেলা সাড়ে চারটে। তদুপরি সূর্য মেঘে ঢেকে গেছে। সিনেমা ক্যামেরা ভিন্ন এ রকম একটা দৃশ্যের মনের মতো ছবি অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। অন্য দেশ হলে তার ব্যবস্থা হ'ত অবশ্যই।

শুনলাম দুটি হাতী বাঁধাতেই আজকের মত খেলা শেষ। তখন নিচে নেমে এসে সবাই কিছু খেয়ে নিলাম। অশোক ও সুধাংশু নিচে নেমে এসেছিল অনেক আগেই মেয়েদের ভিড়ে। সমস্ত দিন ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে আমি এমন দুর্বল হয়ে পড়েছি যে এতক্ষণ কি করে দাঁড়িয়ে ছিলাম তা ভেবে বিস্মিত হলাম। খেলার উত্তেজনাই বোধ হয় এতক্ষণ আমাকে খাড়া রেখেছিল। অতঃপর বাঁধা হাতী কোথায় নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং সেখানে গিয়ে নিচে থেকে আরও ছবি নেওয়ার দরকার কি না—এ সব কথা ভাববার মতো আর তখন উৎসাহ ছিল না।

এমন সময় শোনা গেল একখানা ট্রাকে কুমারগ্রাম পর্যন্ত যাবার সুবিধা আছে। শোনা মাত্র আমরা উঠে পড়লাম। ট্রাকে তখনই না গেলে অন্নদাবাবুর গাড়িতে দু' বারে দু' দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি কোনো রকমে যাওয়া যাবে বটে, কিন্তু যাবার সুবিধা যেটুকু পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম তা আর হ'ল না। প্রায় দু' ডজন মহিলা ট্রাক আগেই দখল করেছেন। ড্রাইভারের পাশে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী। আমরা ছয়-সাত জন মাডগার্ড এবং ফুটবোর্ডে অতি বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে গেলাম। কলকাতার বাস্-এ এ রকম ভিড়ের অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। সেই খাড়া-উঁচু এবং খাড়া-নিচু চড়াই উতরাই-এর পথহীন পথে সে অবস্থায় বিপজ্জনক হলেও নূতনত্বের ঝোঁকে খুব উপভোগ্য মনে হচ্ছিল। সমস্তটা পথেই ঘন জঙ্গল। সঙ্কীর্ণ পথের দু' ধার থেকে বাঁশের কঞ্চি ও গাছের ডাল আমাদের মাথায় আঘাত করবে বলেই যেন দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। ক্রমাগত মাথা নিচু ক'রে ক'রে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছিল। এক জায়গায় খাড়াভাবে নিচে নেমে এলাম এক শুকনো নদীর বুকে। সেখানে নেমে ট্রাক আর উপরে উঠতে চায় না। তখন আমরা অনেকেই নেমে পড়ে তাকে ঠেলে পার করে দিলাম সেই উঁচু পথটুকু।

তিন-চার মাইল এইভাবে এসে দুই সমতল বিপরীত পথের সঙ্গম-স্থলে পৌঁছলাম। ওখানে যাবার সময়েও এই পথেই গিয়েছিলাম। পথের এক দিক গেছে রায়ডাক নদীর দিকে আর এক দিক কুমারগ্রামের দিকে। ট্রাক এই বিপরীত পথে সিউল্যাণ্ড ডাকঘর পর্যন্ত যাবে। এইখান থেকে রায়ডাক নদী প্রায় দু' মাইল। আমরা নেমে পড়লাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছিলেন সিউল্যাণ্ডের পোস্টমাস্টার। তিনি বললেন



ডিমা কোয়ারিতে পাথর-কাটার কাজের অবসরে রান্না

আপনারা গাড়িতেই থাকুন, এখান থেকে ঘুরে আবার আপনাদের পৌঁছে দেওয়া যাবে। প্রস্তাবটি ভাল মনে হ'ল। ট্রাক গিয়ে থামল ডাকঘরের সম্মুখে। মেয়েরা সব নেমে গেলেন এখানে। কিন্তু তখুনি ট্রাকে ওঠা গেল না, কারণ পোস্টমাস্টার আমাদের অভ্যর্থনা না ক'রে ছাড়বেন না।

ডাকঘরের সঙ্গে সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব ঘর। অন্দর মহলও একটা আছে—কিন্তু তিনি একাই আছেন বাসায়। তরুণ যুবক, নাম নিশীথকৃষ্ণ মুনসী। টেবিলে কয়েক খণ্ড মডার্ন রিভিউ—ডি এল রায়ের নাটক ও অন্যান্য বই। ঘরখানি ঝকঝকে পরিষ্কার। কি উৎসাহ তাঁর। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তড়িৎ গতিতে আমাদের জন্যে ডিম ভাজা, ফল ও চায়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন। খুব আনন্দ হ'ল তাঁর ব্যবহারে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি ঘুচল এইখানে।

আমরা ওখান থেকে ট্রাকে রায়ডাক নদীর পাড়ে এসে পৌঁছলাম। আমাদের ট্রাক অপর পারে অপেক্ষা করছিল। আমরা সন্ধ্যার কিছু আগেই নদী পার হচ্ছি খেয়া-নৌকোয়। রায়ডাক নদী এখান থেকে যে রকম চমৎকার দেখায়, তাতে এ অঞ্চলে নৈসর্গিক দৃশ্য হিসাবে বোধ করি এটি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। প্রশস্ত নদী—পটভূমিতে সু-উচ্চ হিমালয়। নদীর মাঝখানে চর। চর আগাগোড়া উপলখণ্ডে ঢাকা। রোদের আলোয় সেগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—তখন গাঢ় নীল পাহাড়ের

সঙ্গে, দুই তীরের সবুজ অরণ্যের সঙ্গে, ধু ধু বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত শৈবাল, ঘন নীল নদীটির, উপলখণ্ডের ধাক্কায় ধাক্কায় কলগান তুলে নক্ষত্রবেগে ছুটে চলার দৃশ্য বর্ণনার ভাষা নেই।



তিস্তার ভুটিয়া পল্লী

এ নদীর জলের ভিতরেও একটি আশ্চর্য শোভা আছে। জল খুব বেশি নয় এবং তা এমনই স্বচ্ছ যে একমাত্র লেন্সের স্বচ্ছ কাচের সঙ্গেই তুলনীয়। নদী কোথায়ও দু হাত, কোথায়ও চার হাত গভীর। উপরের স্তরে স্রোতে এবং হাওয়ায় স্বল্প শিলের কাজ করা। উপরের স্তর ভেদ ক'রে নীচের দিকে চাইলে মনে হয় যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্যে অগণিত মণিমুক্তা-হীরে-জহরৎপূর্ণ এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করলাম। জলের নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ দেহ তখন যেন সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। চোখের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ বিচিত্র বর্ণের নুড়িগুলোর কি বর্ণমহিমা! কোনোটা সবুজ, কোনোটা নীল, কোনোটা হলদে, কোনোটা জরদা, কোনোটা বেগুনি, কোনোটা চকোলেট, কোনোটা টকটকে লাল। জলের আবরণ তাদের আরও রহস্যময় ক'রে তুলেছে। নৌকোয় বসে নিকট দৃষ্টিতে জলের নীচের এই যে অপরূপ শোভা দেখলাম তা কোনো দিন ভুলব না।

এ পারে ট্রাকে এসে উঠলাম সন্ধ্যাবেলা, এবং সমস্ত পথটা সমস্ত দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ মনে নীরবে কেটে গেল। বাংলোয় ফিরে কথা হ'ল, সুশীল বাবু পর দিনই ভোরে রওনা হয়ে যাবেন ট্রাক নিয়ে। সঙ্গে রেডিও-সেটটিও চলে যাবে। সুতরাং পর দিন হতে আমরা বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃত অরণ্যবাসী হব এই কল্পনা এক দিকে উৎসাহজনক হলেও মাঝে মাঝে খারাপ লাগতে লাগল। এমনি সময় সেই অন্ধকারে, নীরব অটবীর বুকে চার ধার থেকে সমস্বরে শেয়াল ডেকে উঠল। বহুকাল ঘরের পাশে শেয়ালের ডাক শোনার সৌভাগ্য হয় নি—তাই এই উপলক্ষ্যে আমরা নিজ নিজ পল্লী-অভিজ্ঞতার স্মৃতিভাণ্ডার উন্মুক্ত করলাম।

কিছুক্ষণ পরে শীতলা বাবু ফিরে এলেন এবং পরদিন আমাদের নিয়ে ডিমা 'কোয়ারি'তে যাবেন প্রস্তাব করলেন। সেখানে পাথর-কাটার বিরাট আয়োজন নাকি দেখবার মতো।

৩ ডিসেম্বর। আজ সকালে অটবী বাংলোর সম্মুখস্থ পাহাড়ের এক আশ্চর্য রূপ দেখা গেল। হিমালয়ের সৌন্দর্য যেন এখানেই এসে আসর জমিয়েছে। পাহাড়ের চূড়াগুলো ঘিরে কত বিচিত্র আকারের মেঘ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছে। প্রথমে মেঘের লেশও ছিল না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একখানি শিশুমেঘ দেখা দিল দূরের একটা চূড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকখানা এসে তার পাশে দাঁড়াল। এই ভাবে আধ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো খণ্ড মেঘ জমে গেল সেখানে। ওরা ক্রমে সমস্ত চূড়ার গায়ে গায়ে লেগে গেল। কতকগুলো আরও নিচে নেমে আসছে, কতকগুলো অনেক উপরে নিজেদের বিস্তার করে দিচ্ছে। কিন্তু যতই ঘুরোফিরে বেড়াক, চূড়ার আশ্রয় থেকে বেশি দূরে যাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ পরে মেঘগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলল। সবই সাদা মেঘ—তাদের ফাঁক দিয়ে গাঢ় নীল আকাশ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আরও একটু পরে সমস্ত মেঘ কুয়াসায় রূপান্তরিত হ'ল, আর সমস্ত দৃশ্য চকিতে সেই কুয়াসায় আচ্ছন্ন হয়ে চোখের সম্মুখ থেকে মিলিয়ে গেল। ঘন নীল কুয়াসা। নীল রং গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। এ রকম নীল কুয়াসা কোথাও দেখি নি। আমরা কালো মেঘের কালো অন্ধকার দেখেছি, কিন্তু এখানে এখন যে অন্ধকার নেমে আসছে তা বিশুদ্ধ নীল অন্ধকার। মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ মণ চূর্ণনীল সমস্ত আকাশে আর পাহাড়ে স্প্রে ক'রে দেওয়া হচ্ছে। অদ্ভুত!

সকালেই খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে ডিমা কোয়ারি দেখতে রওনা হলাম—সুধাংশুপ্রকাশ ও আমি। শীতলা বাবু আমাদের ট্রলিতে ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। অশোক আজ আর বেরবে না, সে শিকারের সন্ধান করবে।

ট্রলিতে রেলপথে যেতে খুব ভাল লাগছিল। কয়েকজন কুলি ট্রলি ঠেলে নিয়ে চলেছে, কিন্তু কিছু দূর যাবার পরেই আর ঠেলতে হ'ল না, এখান থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত বক্সা রোড পর্যন্ত জমি ক্রমশ নিচের দিকে এমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে যে আমাদের গতি ক্রমেই দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল। ত্রিশ মাইল বেগ থেকে অবশেষে ষাট মাইল বেগে ছুটতে লাগলাম পানা নদীর সেতু পর্যন্ত। তার পর বক্সা রোড স্টেশনে গিয়ে ট্রলিকে ধরাধরি ক'রে তুলে ডিমা কোয়ারিতে

যাবার লাইনে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। এইখান থেকে পথের দু'ধারে গভীর জঙ্গল। রেল-লাইনও এখান থেকে ক্রমশ আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, তাই ট্রলির বেগ কম, কারণ এইবার আবার তাকে ঠেলে নিতে হচ্ছে।

জঙ্গলে কত রকম গাছ। শাল, সেগুন, শিশু, রয়না, ময়না, আম, কাঁঠাল আরও কত কি। মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফার্ন, আর পথের দু'ধারে ঝোপ সৃষ্টি করেছে আসাম লতা। কোনো কোনো শালগাছের ছাল কেটে আঠা বেরিয়েছে। সেগুলো শুকিয়ে গেলে ধুনো হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমরা যে ধুনোর সঙ্গে পরিচিত তা ঐ শালগাছেরই শুকনো আঠা।

মাইলখানেক যাবার পর ঘন জঙ্গল থেকে মুক্তি। তার পর আরম্ভ হ'ল রেলের দু'ধারে আসাম লতার দুর্ভেদ্য ঝোপ। তার মধ্যে অনেকগুলো বুনো পাতিলেবুর গাছও দেখলাম। সম্মুখে দূরে পাহাড়ের গায়ে বক্সা ডিটেনশন ক্যাম্প এখান থেকে দেখা যায়। আধ মাইল পরেই ডিমা কোয়ারি। এখানে পাহাড় কেটে কেটে পাথর বের করা হয়, তার পর তাকে নানা আকারে ভেঙে শ্রেণী বিভাগ ক'রে বাইরে চালান দেওয়া হয়। এক মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান এই কোয়ারির ইজারা নিয়েছে। এই কোয়ারিতে রেলেরও যেমন আয়, ইজারা-দারেরও তেমনি আয়, এবং শুধু এই ডিমা কোয়ারির জন্যেই বক্সা রোড স্টেশন থেকে দেড় মাইল অতিরিক্ত রেল-লাইন পাতা হয়েছে।

কিন্তু এইখানে এই প্রশস্ত ডিমা নদীর বুকে এই বিস্তীর্ণ কারখানা অঞ্চলে কুলিদের এবং কোয়ারি সম্পর্কিত অন্যান্য লোকদের পক্ষে স্থায়ীভাবে বাস করা এক রকম অসম্ভব ছিল। তার প্রধান কারণ জলের অভাব। জল যে সময়ে অতি সুলভ, অর্থাৎ বর্ষাকালে, তখন নদী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং সে সময় পাথর কাটার কাজও বন্ধ থাকে। তারপর নদী শুকিয়ে গেলে কাজ সুরু হয়। নদী অবশ্য সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় না, মাঝখানে চর জাগে, অথবা দুই পাশে চর বিস্তৃত হয়, তখন নদীর বেগ থাকে না, স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসে, সে সময় বসতি অঞ্চল থেকে বহু দূর গিয়ে জল টেনে আনতে হয়। কিন্তু এ ভাবে একটা উপনিবেশ চলতে পারে না। কিন্তু তবু এত দিন দারুণ দুর্ভোগ সহ্য করেও তাদের সেখানে বাস করতে হ'ত। এই অসুবিধা অবশেষে দূর করেছেন শীতলাকান্ত শীল। এঁর পরিচয় আগেই দিয়েছি। ইনিই নিজের বুদ্ধিতে পরিকল্পনায় এবং দুঃসাহসে অপরিসীম বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রায় দু' মাইল দূরের এক ছোট পাহাড়ী নদী (মাগাদি-খোলা) থেকে পাইপের সাহায্যে ডিমা উপনিবেশে স্থায়ী-ভাবে কলের জলের ব্যবস্থা করেছেন। পাইপ পাততে হয়েছে জনহীন বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

আমরা ডিমায় ট্রলি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। ট্রলি কোয়ারি লাইনে তোলা হলে আবার তাতে উঠে প্রথমতঃ আমরা কোয়ারির কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে বিভিন্ন



ডিমা জলাধার

অংশে কি ভাবে কাজ চলছে দেখলাম। কুলিরা মাটি কাটছে, পাহাড় কাটছে, পাথর ভাঙছে, কেউ কেউ রান্না করে খাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখলাম। তারপর আমরা রওনা হলাম শীতলা-বাবুর কৃতিত্ব—কলের রিজার্ভয়ার (জলাধার) দেখতে। সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। আগাগোড়া পথই নদীর বুকের উপর দিয়ে; এই নদীটি এসে মিশেছে ডিমা নদীর সঙ্গে। নদীটি এখন প্রায় শুকিয়ে গেছে—পাহাড়ের এক পাশ দিয়ে পাঁচ-ছ' হাত চওড়া স্রোতের ধারা কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। আমরা ক্রমাগত পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে চলেছি। চলতে চলতে পা থেমে যাচ্ছে, পায়ে ব্যথা ধরে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে গা থেকে গরম জামা সব খুলে ফেললাম—সেগু'ল বয়ে নিয়ে চলল সঙ্গের একটি ছেলে। যত এগিয়ে যাচ্ছি ততই নদীর 'গর্জের' প্রশস্ততা কমে আসছে। নদীর বাঁক পার হতে হ'ল কয়েক জায়গায়। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হওয়া অতি বিপজ্জনক। সব জায়গায় পা ফেলবার মতো পাথর নেই। সে সব জায়গায় পাথর টেনে এনে পাততে হ'ল। কিন্তু তাতেও সব সময় সুবিধা হ'ল না, শেষ পর্যন্ত একখানা ভাঙা শুকনো গাছের ডাল সংগ্রহ করে তাইতে ভর করে পার হলাম। কিন্তু যত যাই ততই শুনি আরও কিছু দূরে। শেষে ক্রমেই জঙ্গলে প্রবেশ করছি। একটা বাঁকের কাছে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের পাশ এমনভাবে ধ্বসে গেছে যে মনে হচ্ছে সেটি একটি প্রাচীর। কাছে গেলে ভয় হয়—সে প্রায় পকাশ

ষাট ফুট উঁচু—তার গায়ে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গেছে। আমরা যেন অতিকায় একটি দুর্গে প্রবেশ করলাম।



ডিমা কোয়ারির সাধারণ চেহারা

ইতিমধ্যে আকাশ মেঘে ছেয়ে আসছে, এবং তার চেহারা নৈরাশ্যজনক, মনে হচ্ছে বৃষ্টি অনিবার্য। তা ছাড়াও ভয়ের কারণ ছিল, অবশ্য সেটা আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত। শীতলা বাবু এই রকম জনহীন অরণ্যপথে অত্যন্ত নিশ্চিন্তমনে চলেছেন এটা আমার খুব ভাল লাগছিল না। সে রকম আবহাওয়ায় আমরা কখনও পড়ি নি, তার যে-কোন দিকে চাইলেই মন অবসন্ন হয়ে আসে। এক দিকে আকাশে অনিশ্চয়তা, আর এক দিকে মনে আতঙ্ক, এই নিয়ে এগিয়ে চলেছি। এ রকম অবস্থায় অরণ্য পাহাড় নদী আকাশের একটা রহস্যময় অবাস্তব চেহারা ফুটে ওঠে মনশ্চক্ষে।

নদীর বুকে যেখানেই একটু জল এখানে সেখানে জমে আছে, সেখানেই দেখি ছোট ছোট অসংখ্য মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। একটা জায়গায় হরিণের পায়ের চিহ্ন। যেখানে জল সেইখানেই বাঘ হরিণ প্রভৃতি কাছাকাছি থাকে। চার দিকে সুগভীর নিস্তব্ধতা—সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে খাসা নিখোলা নদীর স্রোতোধ্বনি। এগিয়ে যেতে গা ছমছম করছে, পরিশ্রমও হয়েছে খুব। আমরা পাহাড়ের গা ঘেঁসে—পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা গাছ, ঘাস, ভাঙা ডাল প্রভৃতির হাত থেকে মাথা বাঁচিয়ে কখনও বা মাথা নিচু ক'রে, কখনও বা সেগুলো দু'হাতে ঠেলে রেখে কখনও বা সেগুলো টেনে ধ'রে একটু একটু ক'রে এগোচ্ছি। এমনিভাবে চলতে চলতে অবশেষে আমাদের গন্তব্যে গিয়ে পৌছলাম।

ঐ একটুখানি মানুষের চিহ্নপূর্ণ জায়গা। নদীস্রোত উজান দিকের দুই পাহাড়ের আড়াল থেকে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। জলের রিজারভয়ারটি খুব ছোট, বড়র দরকার নেই, এরই মধ্যে কলকল শব্দে স্রোতের জল এসে ঢুকছে এবং জলের পাইপে যাচ্ছে। অতিরিক্ত জল পাশের আর একটা পথ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—পাম্পিঙের দরকার হচ্ছে না, কারণ জল উঁচু জায়গা থেকে নিচু জায়গায় যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে এল। আকাশ আরও অন্ধকার হয়ে এল। আমরা ওখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম করেই উঠে পড়লাম। ঝির ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—তবু তার মধ্যেই একবার ক্যামেরা খুলতে হ'ল। আমরা ফেরবার সময় পাহাড়ের উপরের পথ ধরলাম। জলের পাইপ এই পথেই ডিমা উপনিবেশে এসেছে। পায়ে হেঁটে ঘন অরণ্যের পথ এই প্রথম। নদীর বুকের উপর দিয়ে হাঁটতেই ভয় হচ্ছিল, এবারে অন্ধকার অরণ্য আর ঝোপ-জঙ্গল। এটাকে পথ বললে ভুল হবে। লতাপাতা কাঁটা গাছ কত রকমের। বাঁশের মতো দেখতে মানুষসমান উঁচু ঘাস। শেঁয়াকলের গাছ, বিছাল-আঁচড়া কাঁটা আর চোরকাঁটার ঝোপ। সেই সব ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসতে সমস্ত কাপড় জামা এবং মাথায় নানারকম কাঁটা জমতে লাগল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু মেঘে আকাশ ঢাকাই রইল। আসতে আসতে দেড় মাইল পার হয়ে আমরা পৌছে গেলাম এক ভুটিয়া পল্লীতে। তারা সব কোয়ারিতে কুলির কাজ করে। এক দল ভুটিয়া ও নেপালী তাস খেলছিল, আমাদের দিকে ফিরেও চাইলে না। ছোট ছোট জীর্ণ খড়ের ঘর। তার ভিতরে মাচা—সেই মাচায় ওদের বাস। প্রকৃত জংলী চেহারা। অনেকগুলো ভুটিয়া মেয়ে-পুরুষ এগিয়ে এল আমাদের দেখতে। ওদের কয়েকজনের ছবি নিলাম, কিন্তু অনেক কষ্টে। তারা বার বার শীতলা বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল টাকা লাগবে না তো? এক ভুটিয়া যুবক হঠাৎ এসে শীতলা বাবুর পা জড়িয়ে ধরল। কারণ কিছুই নয়, ওদের আজ ছুটির দিন, অতএব সবাই একটু বেশি পরিমাণে মত্ত অবস্থায় ছিল।

এখানে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা দেরি হ'ল, যখন চলে আসছি তখন পাশের এক নেপালী বস্তীর মধ্যে হঠাৎ খুব গোলমাল শুনে দেখি ওদের মধ্যে ভীষণ মারামারি সুরু হয়ে গেছে। এই মারামারি অতি হিংস্র, ভোজালির ব্যবহারও হচ্ছিল। বড় অস্বস্তিকর বোধ হওয়াতে সুধাংশু ও আমি সরে এলাম সেখান থেকে, শীতলা বাবু এগিয়ে গিয়ে খুব কৌতূহলের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটি দেখতে লাগলেন।

মাড়োয়ারী ইজারাদারের ডেরায় চা খেয়ে আমরা যখন উঠলাম তখন বেলা চারটে। বক্সা রোডে এসে ট্রলি প্রধান লাইনে তুলতে হয়, সেই উপলক্ষ্যে শীতলা বাবু নেমে স্টেশন-ঘরে গিয়ে জানতে পারলেন একখানা পাথর-টানা মালগাড়ি একটু পরেই সে পথে জইন্তীতে ফিরবে এবং আমরা ইচ্ছে করলে সেই গাড়িতে যেতে পারি। শুনে

উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কারণ ট্রলিতে ফেরা মানে আগাগোড়া পথ প্রাণপণ শক্তিতে ট্রলিকে উপরের দিকে ঠেলে নেওয়া, এবং জইন্তীতে পৌঁছনোর তাতে অনেক দেরি। দেরির অসুবিধা থেকে আমরা, এবং ট্রলি ঠেলার দায় থেকে কুলিরা, এই উপলক্ষ্যে মুক্তি পেয়ে গেল।

স্টেশনের এক পাশে অনেকগুলো আলমারী ও লোহার খাট। স্টীলের পাতে ফিতের মতো ছাওয়া খাটগুলো। আরও অনেক রকম টুকরো জিনিস। শুনলাম ডিটেনশন ক্যাম্প ভেঙে দেওয়ার পর তার সম্পত্তিগুলো এখানে আনা হয়েছে। দেশের কত দুর্দান্ত যুবক এই সব লোহার খাটে শুয়ে শুয়ে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছেন, আজ আর তাঁদের উঁচু পাহাড়ের বুকে সতর্ক প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে সাম্রাজ্য নিরাপদ রাখবার দরকার নেই—ব্রিটিশ শাসনেরই ইস্পাতের ফ্রেম আজ ভাঙার মুখে।

বহু বেদনাময় স্মৃতিবিজড়িত ঐ পরিত্যক্ত তুচ্ছ টুকরো জিনিষগুলোর স্তূপের দিকে নীরব বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মালগাড়িখানা এসে পড়ল। পাথরটানা এই গাড়িগুলো অদ্ভুত। প্রত্যেক ওয়াগনের উপরটা ফাঁকা, এবং মাঝখানে একটি ক'রে স্প্রিং-ব্রেক, এবং প্রত্যেক ব্রেকের কাছে একজন ক'রে লোক বসে আছে। আমরা উঠে পড়লাম একখানা গাড়িতে। ভিতরে বেঞ্চিতে বসার মতো পা ঝুলিয়ে বসা গেল। গাড়িতে পাথর বোঝাই থাকলে ইঞ্জিন যখন পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন প্রায়ই ইঞ্জিনের গতি থেমে যায়। সেই সময় সবসুদ্ধ গড়িয়ে গাড়ি নিচের দিকে নেমে না আসে তারই প্রতিষেধক হিসাবে এই সব স্প্রিং-ব্রেক—দেখতে মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এর মতো। বিপদ আশঙ্কা করলেই ইঞ্জিন থেকে সাংকেতিক ধ্বনি করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক ওয়াগন থেকে ব্রেক কষে দেয়।

আসবার সময় ট্রলিকে নিরাশ্রয় ভাবে ছেড়ে আসা হয় নি—তাকে বেঁধে নেওয়া হয়েছে পিছনের গাড়ির সঙ্গে—এবারে কুলিরা তাতে বসে আরাম ক'রে আসছে।

শীতলাকান্ত শীল জলের কল ক'রে জিমা উপনিবেশের এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ের যে সব সুবিধা করে দিয়েছেন তার কাহিনী আগাগোড়া শুনলাম। আগে ইঞ্জিনের জল নিতে হ'ত আট মাইল দূরে অবস্থিত রাজাভাতখাওয়া স্টেশন থেকে, কারণ জিমা থেকে জল নেওয়া সম্ভব ছিল না। এখন আর সে অসুবিধা নেই। সব চেয়ে বড় কাজ যা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই জলকলের কৃপায় জিমা উপনিবেশে মজুরদের এবং অন্য সবার স্থায়ীভাবে বাস করার যে মারাত্মক অসুবিধা ছিল তা দূর হয়েছে। নদীর জল খেয়ে নানাবিধ অসুখ হ'ত, তাতে কুলিরা অনেকে পালিয়ে যেত, কিন্তু এখন আর সে ভয় নেই। এই জল আনার ব্যবস্থাটি দেখতে সহজ হলেও গড়ে তুলতে যে অমানুষিক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হ'ত। সমস্ত কাজ যুদ্ধকালে দু' সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হয়েছে এবং যে জঙ্গলপথে সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত ধরে পাইপ পাততে হয়েছে সে হচ্ছে বাঘ, হাতী এবং সাপের স্থায়ী বাসভূমি। এখানকার সকল জঙ্গলেই অবশ্য এ সব আছে কিন্তু তবু সমস্ত রাত ধরে অরক্ষিত অবস্থায় এ রকম জায়গায় কাজ করা কতখানি বিপজ্জনক তা সহজেই বোঝা গেল। কাজ করতে করতে বাঘ ও হাতীর দেখাও এঁরা পেয়েছেন।

একজন বাঙালী ওভারসিয়ার এই কাজটি করেছেন দেখে আনন্দলাভ করলাম। কোনো ইউরোপীয় এঞ্জিনীয়রের হাতে হলে এটা একটা 'glorious achievement' হিসাবে ইতিহাসের পাতায় লেখা পড়ত, এবং তিনি পুরস্কৃতও হতেন। কিন্তু শুনলাম এঁর ভাগ্যে দুটোর কোনোটাই জোটে নি।

ফিরে এসে দেখি অশোক বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু একটু পরেই আর একটি উত্তেজক খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জইন্তী থেকে দু' মাইলের ভিতরে গত কাল সন্ধ্যায় নাকি একটা বুনো হাতী জঙ্গলের এক কুলিকে শুঁড়ে জড়িয়ে পায়ে পিষে মেরে ফেলেছে। দু'জন কুলি আগে পিছে চলছিল, একজন একটু দূরে ছিল। হাতী যখন আক্রমণ করে তখন একজন কোনো মতে ছুটে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে, পিছনের লোকটি আত্মরক্ষা করতে পারে নি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবলাম আমরা কিন্তু আজকের মত পেরেছি।

ক্রমশঃ

স্বাক্ষর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বয়স তখন আমাদের কতই বা ! সাত কিংবা আট। ঠাকুর-মা আর মায়ের মুখে গল্প শুনে শুনে মনের মধ্যে রূপ-কথার রং ধরতে সুরু করেছে। শুধু মন্ত্রিপুত্র, রাজপুত্র, পক্ষী-রাজ ঘোড়া, রাক্ষসের পুরী, সাত-সমুদ্র তের-নদী পারের ঘুমন্ত প্রাসাদে সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি শিয়রে নিয়ে নিদ্রামগ্ন কেশবতী কন্যার কথা নয়—রামায়ণের চিত্রকূট পর্ব্বত, দণ্ডকারণ্য আর মহাভারতের খাণ্ডববন, কুরুক্ষেত্র—এ সবের ছবিও রীতিমত মনের পরদায় ছায়া ফেলছে। কল্পনার তো অবাধ গতি। একটা পড়ো বাড়ি দূর থেকে দেখেই রাক্ষসপুরীর রহস্য মনকে আশঙ্কা কৌতূহলে দোলা দিতে থাকে, খানিকটা ঝোপ-ঝাড়ের পিছনে দণ্ডকারণ্যের ছবি স্পষ্ট হয়। পাহাড় দেখবার সৌভাগ্য হয় নি বলেই—বইয়ে-দেখা ছবির সঙ্গে কোন কোন দিন বিকেল বেলাকার আকাশ হুবহু মিলে যায় ; মার মুখে শোনা হিমালয় ও কৈলাস পর্ব্বত মনে পড়ে।... এমনি করে কল্পনা দিন দিন আমাদের দুঃসাহসী করে তুলছিল। সে যুগের রাজপুত্র বা মন্ত্রিপুত্ররা কেন যে সুখৈশ্বর্য্য ছেড়ে দুঃখ বিপদের মধ্যে সাধ করে ঝাঁপ দিতেন—তার অস্পষ্ট আভাস এ যুগের সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলেদের জ্ঞানের রাজ্যে ভারি গোলমাল বাধিয়ে দিতে লাগল।

তিন বন্ধু মিলে এক দিন পরামর্শ করা গেল—গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় রোদ যখন ঝাঁ ঝাঁ করে—বাড়ির মেয়েরা কাজ-কর্ম্ম সেরে ঠাণ্ডা মেঝের ঘণ্টা দুয়েক একটু ঘুমিয়ে নেন—তখন বেরিয়ে পড়বো মাইল দুই দূরের পড়ো নীল-কুঠির উদ্দেশে। কুঠিটা আমরা দূর থেকে কয়েকবার দেখেছি। বাঁওড়ে নাইতে যাবার পথে এক মাইলটাক গেলেই বাঁ-হাতে যে বনের সরু পথ দেখা যায়—তাই ধরে গেলেই ঐ কুঠিতে নাকি পৌঁছনো যায়। লোকে আঙুল দিয়ে ঘন সেগুনের জঙ্গল দেখিয়ে বলে,—ওই—ওইখানে। কুঠির দু'ধারের অনেক জমি নিয়েই তখন নীলচাষ হ'ত, কাজেই বাঁওড় যাবার রাস্তার দু'ধারে ঘন দুর্ভেদ্য বনফুলের ঝোপের সঙ্গে অজস্র বুনো নীলের গাছ চোখে পড়ে। ফুল ফোটার সময় মনে হয় আকাশ থেকে দেবতারা নীল চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন মাটিতে—হয় তো রাত্রের বেলায় কিংবা নির্জ্জন দুপুরে মানুষ যখন ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—তখন ওঁরা মেঘের মই দিয়ে নেমে এসে বসেন ওই ফরাসের ওপর। খানিক গল্প-গুজব—খানিক বা ছুটোছুটি করে আমোদ-আহ্লাদ করেন। আমাদের যেমন ভাল লাগছে না—রোজ রোজ খাওয়া, বাঁধা রাস্তায় বা মাঠে খেলা-ধুলা, সকালে সন্ধ্যায় খানিক পড়া আর ঘুমের আগে মা, ঠাকুর-মার গল্প শোনা—ওঁদেরও তেমনি আকাশ এক ঘেয়ে লাগে হয়তো। ...যাই হোক, দূরের ঐ কুঠিটা প্রতিদিন হাতছানি দিয়ে ডাকত আমাদের। ওর সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি মা, ঠাকুর-মার মুখে। নীল সাহেবদের জুলুম জবরদস্তি, মানুষকে খাটিয়ে পয়সা না দেওয়া, চাবুক মারা, কুকুর লেলিয়ে দেওয়া, অবাধ্য চাষীকে দেওয়ালে গেঁথে শাস্তি দেওয়া—এমনি অনেক কথা। সেই পাপেই তো সায়েবরা উচ্ছন্নে গেল ! এখন ওই জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা কুঠিতে শেয়াল আর হাঁড়োলের আড্ডা। বাঘও নাকি আছে। ঠিক দুপুর বেলায় কি মাঝ রাত্রিতে কারা গোঙাতে থাকে—একটানা কান্নার আওয়াজ বহু দূর থেকে শোনা যায়। মোট কথা—দেবতা, বাঘ, ভূত, সব মিলিয়ে যত রকমের অলৌকিক রহস্য মানুষকে আতঙ্ক-রোমাঞ্চিত করতে পারে তার কোনটার অভাব ওই নীলকুঠি-অভিযানের মধ্যে ছিল না।

অসীম বললে, তা হোক—দিনের বেলাই ত।

রবীন বললে, তা ছাড়া আমরা তিন জন আছি। একটা করে লাঠি না হয় নেব, আর কাগজে রামনাম লিখে পকেটে রাখব।

আমি বললাম, আমার হাতে রাম-নৃসিংহ কবচ আছে, রামনাম লেখা কাগজ দরকার হবে না।

অসীম আমাদের চেয়ে বছর খানেকের বড়। গায়ে তার বল আছে, মনে সাহসও খুব। বলতে গেলে সে-ই আমাদের দলের সর্দার। রবীন আর আমার বয়স আট। একই ক্লাসে আমরা পড়ি বলে আমাদের ভাবটা জমেছে বেশী। ইচ্ছে করলে এই অভিযানে আরও সঙ্গী নিতে পারতাম, কিন্তু দুঃসাহসিক অভিযানের গৌরব তাতে একটুও বাড়বে না। সকলের থেকে আমরা যে আলাদা এটুকু অন্ততঃ না জানালে আমাদের কথা লোকে হাঁ করে শুনবেই বা কেন আর বাহবাই বা দেবে কেন।

চৈত মাসের প্রথম। বেল গাছ মাথা ন্যাড়া করেছে, আম গাছের সবুজ পাতার ঝিলিমিলি খুলে সদ্য মুকুলমুক্ত আমের গুটিগুলি রোদ বাতাসের ছোঁয়া লেগে পিটিয়ে পিটিয়ে উঠছে। বনে ফুটেছে অনেক নাম-না-জানা ফুল—গন্ধে ম' ম' করছে জায়গাটা। রোদের তেজ খুব চড়ে নি—তবু পথের ধুলো ঈষৎ তপ্ত হয়েছে আর গাছের ছায়া মিষ্টি লাগছে। শুকনো পাতার ওপর শব্দ তুলে বাতাস বইছে এলোমেলো। কোথায় একটা ঘুঘু ডাকছে কাৎরে কাৎরে আর মাঝে মাঝে টুনটুনি পাখীর আওয়াজ ভকভরা পেতলের গামলার গায়ে লোহা দিয়ে শব্দ করার মত ঝোপের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। দূরের মাঠে হয় তো লোক আছে—কিন্তু বনফুল, বৈঁচি, কালকাসুন্দা, মন্দা ও আলকুসির ঝোপে ভরা মাঠগুলো বিজন বনের মত খাঁ খাঁ করছে। গভীর মধ্যাহ্ন তিনটি বীর-পুরুষকে অভ্যর্থনা করলে।

অসীম তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা বড় চাকু ছুরি বার করে বললে, শুধু হাতে বনে ঢোকা ঠিক নয়, আয় শক্ত দেখে তিনটে ময়নার ডাল কেটে নিই।

শক্ত গাছ—ছুরিতে ধার থাকলেও আমাদের শক্তি কম। দুটো ডাল কাটতে অনেকখানি সময় গেল। চাচা ছোলা শুরু করেই একটা ডাল কেটে দুখানা করে একটা আমাকে আর একটা রবীনকে দিয়ে অসীম বলল—বেলা বড় হলে তোরা আবার চালাতে পারবি নে। নিজে যেটা নিলে—সেটা আমাদের দু' গুণ।

লাঠি নিয়ে একযোগে আমরা কালকাসুন্দা ঝোপ ঠেঙাতে লাগলাম। গাছগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে যেতেই অসীম হেসে বললে—ময়নার লাঠিতে বাঘ মারা যায় জানিস? এই যে দেখছিস এক একটা গাঁটের চার দিকে চারটে কাঁটা—এ লোহার মত শক্ত। বলে সবেগে সে লতাঘেরা একটা ঝোপের মাথায় বসিয়ে দিলে। ঝোপটা বৈঁচির—শুকনো কুঁচ লতায় মাথাটা তার ঢাকা ছিল। লাঠি পড়তেই খড় খড় শব্দ হ'ল; লতা গেল ছিঁড়ে, শুকনো শুঁটিগুলো ফেটে বেরিয়ে পড়ল কালো ফুট দেওয়া লাল লাল ফল। মনে হ'ল এর মত দুর্লভ জিনিষ আর নেই। স্যাকরাকে সোনা ওজন করতে দেখেছি এ দিয়ে। সুতরাং—যত পারলাম—কুড়িয়ে পকেট ভর্ত্তি করলাম। তার পর নজর পড়লো সবুজ পাতার মধ্যবর্ত্তী কচি কচি আমগুলির উপর। মাঠের গাছ নীচু—ছোট লাঠির খোঁচায় অনেকগুলি পাওয়া গেল। একখানি মাত্র ছুরি—আর তা দিয়ে ছাড়াতে গেলে দেরি হবে বলে—গাছের গুঁড়িতে রেখে কিল মেরে সেগুলি ফাটিয়ে নেওয়া গেল।

অসীম বললে—আর আম পাড়ে না—ফিরে যাবার সময় দেখা যাবে।

তার পর আম চিবুতে চিবুতে বাঁ দিকের পথ ধরে আমরা ঢালু জমিতে নেমে গেলাম।

খানিকটা ফাঁকা জমি—তাতে বড় বড় ডোবা। এই সব ডোবায় শীতকালে জল থাকে খানিকটা, ফাল্গুনে শুকিয়ে কাদা জমে—এখন সেই কাদা শক্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। কাদাতে মাছ আছে কিনা জানি না—কিন্তু আমাদের দেখে কয়েকটা পাখী উড়ে গেল। ওদের লম্বা লম্বা ঠোঁটে কাদা লেগে রয়েছে।

অসীম বললে—কাদাখোঁচা পাখী—মাছ ধরতে এসেছিল।

হবেও বা! কাদাখোঁচা এই প্রথম দেখলাম—তাও ভাল করে নয়। লম্বা ঠোঁট ছাড়া ওদের গায়ের রং বা ওদের আকার কোনটাই মনে নেই।

ডোবা ছাড়িয়ে পাওয়া গেল বনকুলের ঝোপ। পথ ক্রমশঃ সরু হয়েছে আর ঝোপ হয়েছে ঘন।

বললাম অসীমকে, হাঁরে—পথ আছে তো?

নেই তো আমরা যাচ্ছি কি করে! অসীম শাসনের সুরে বললে।

জিজ্ঞাসা করাটা অন্যায় হয়েছে। কেননা আমরা বেরিয়েছি যে উদ্দেশ্যে—তা সুগম পথ জেনেও নয়—বিনা বাধায় পৌঁছে বিনা আয়াসে ফিরে আসব এ সান্ত্বনাতেও নয়। তবু ফিরে যে আসব তা জানতাম বলেই দুর্গম পথকে কল্পনায় ভালই তো বেসেছিলাম। কল্পনাকে বিদায় দিয়ে ভাবছি—পথ যদি বনকুলের ঝোপে হারিয়েই যায়—আমাদের গতি কি হবে!

ক্রমে আরও সঙ্কীর্ণ হ'ল পথ। দু' পাশ থেকে কুলের ডাল এসে আমাদের পায়ে মাথা কুটতে লাগল, যেয়ো না—যেয়ো না। ওদের স্পর্শ সুখস্পর্শ নয়। পা গেল ছড়ে—কাপড় গেল ছিঁড়ে। কাপড়ের কাঁটা ছাড়াতে সময় নষ্ট হ'ল অনেকখানি।

অসীম বললে—দূর—কি বোকা আমরা! হাতে লাঠি থাকতে কিনা—বলেই সে বসিয়ে দিলে লাঠি। কুলের ডাল নুয়ে পড়ল পায়ের তলায়—পথ খানিকটা চওড়া হ'ল।

হাতের লাঠি কুলের ঝোপে পড়ছে ঝপাঝপ—বুকের রক্তও ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠছে সেই তালে। এ শব্দ অবশ্য রণবাদ্যের নয়—তবু হাতের হাতিয়ার শক্রর ঘাড়ে পড়লে রক্ত চলাচল যে বেড়ে যায় এ আমরা ভাল করেই বুঝলাম। ভয় গেল—দুর্গম পথ কি করে পার হব সে ভাবনা গেল—আমাদের ক্ষুদ্র তিনটি প্রাণীর শক্তি কতটুকু তাও ভুললাম। শব্দ হচ্ছে ঝপাঝপ—আমরা বীর দর্পে এগিয়ে চলেছি অনেকক্ষণ ধরে।

হঠাৎ ডান দিকের ঝোপ থেকে কি একটা জানোয়ার বার হয়েই সাঁ করে বাঁ দিকের ঝোপে ঢুকে গেল। নিমেষে পা আমাদের সেইখানে পুঁতে গেল—হাতের লাঠি ঝোপের মাথা থেকে আর উঠল না।

কি রে? রবীন জিজ্ঞাসা করলে।

স্—স্—স্। ঠোঁটে আঙুল চেপে অসীম চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলে। চুপ তো করলামই—কিন্তু বুকের মধ্যের কলকজাগুলো ইস্কুল-বসার ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ করে উঠছে।

আমার শুকনো গলা থেকে শব্দ বার হ'ল, বাঘ?

অসীম চাপা গলায় বললে, না—হাঁড়োল বোধ হয়।

কামড়ায়? রবীন জিজ্ঞাসা করলে।

না, তা কি আর—আদর করে! অসীম ভেংচে উঠল।

রবীন রেগে বললে—হাঁড়োল না হাতী!

অসীম চোখ পাকিয়ে বলল—তবে কি?

শেয়াল। ঐ দেখ।—বলে সে আঙুল তুলে বাঁ দিকের ঝোপ নির্দেশ করল।

ঠিকই তো। ঝোপের ওপাশে পরিষ্কার এক টুকরো জমি। তার মাঝখানে সেই ধূসর রঙের জানোয়ারটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকিয়ে এই তিন বীর প্রবরকে দেখছে। ছুচলো মুখে লেপা কালির দাগ—জল জলে, চোখ আর মোটা

লেজের গোছা পিছনের দু'পায়ের ফাঁকে দিয়েছে গুঁজে। ভয়, কৌতূহল আর ধূর্তামিও হয়তো ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ও চাউনিতে লেগে রয়েছে।

অসীমকে অপ্রস্তুত হতে দেখে রবীন খিল খিল করে হেসে ঝোপের মাথায় লাঠি আছড়ে এগিয়ে গেল। শেয়ালটা লেজ গুটিয়ে আর একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকলো—আমরাও নির্ভয় হলাম।

রবীন বললে, বাঘ কি হাঁড়োল দিনের বেলায় বেরয় না।

অসীম লুপ্ত সাহস ফিরে পেয়ে বললে, সে তো গাঁয়ে। বনে তো ওরা থাকেই—তা আবার বেরুবে কি!

রবীন বললে, তা থাকুক গে—দিনের বেলা ওরা ঘুমোয়!

ঘুমোয়! তা শব্দ করলেও ঘুমোবে? কি বুদ্ধি! ব্যঙ্গভরে ও হেসে উঠল।

ব্যঙ্গ হলেও কথাটা মনে লাগল। আমাদের উদ্যত আয়ুধ কুলের ঝোপে আর পড়ল না। ঝোপ ঠ্যাঙাবার দরকারও ছিল না। ঝোপ বিরল হয়ে এসেছে পথ হয়েছে প্রশস্ত। তবু আমরা ঠ্যাঙানোর মোহে বাড়ি দিয়ে চলেছিলাম ঝোপে ঝোপে। এবার দেখলাম কুলের বদলে বুনো নীলের চারা আসছে এগিয়ে। ফুলে ফুলময় মাঠ—নীলের চাদর পাতা হয়েছে—নিস্তব্ধ চারদিক। হলুদ রঙের দুপুর সেই নীল চাদরে সোনালী পাড় বুনে চলেছে হাওয়ার কাঁপনে। সামনে একটা খাদ পরিখার মত। সেটা নীল চাদরে ঢাকা; তার গা বেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে কুঠির দেওয়াল—শ্যাওলায় সবুজ। দেওয়ালের মাথায় নানা জাতের গাছ। ছাদ অলিন্দ দরজা জানালা চত্বর কিছুই দেখা যায় না—শুধু গাছ আর গাছ। মানুষকে পরাভূত করে বন দখল করে নিয়েছে কুঠি। সেগুন বট অশ্বত্থের গাছ প্রবীণ সেনাপতির মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুঠির চওড়া পাকা-গাঁথনির দেওয়ালের মাথায়। ওদের বিক্রমে ছাদ হয়েছে ভূমিসাৎ। আর চারা গাছগুলি বনস্পতিদের হাঁটুর নীচের সঙ্গীদের মত সাজানো রয়েছে শিথিল ভঙ্গীতে। আক্রমণকারীরা কোন যুগে হয়তো ফিরে আসবে না এই নিবন্ধ্যা পুরী দখল করতে—তাই ওরা পরম নিশ্চিন্ত।

অসীম বললে, ওই কুঠি।

রবীন বললে, উঃ—কি জঙ্গল।

আমি বললাম, যাবি নাকি ওখানে?

কেউ উত্তর দিলে না। একটা বড়ো হাওয়া পিছন থেকে তাড়া করে নীল কুঠির জঙ্গলে গিয়ে আছড়ে পড়ল। খানিক আগে যেমন করে আমরা কুলের ঝোপ ঠেঙাচ্ছিলাম—তার এক শ' গুণ বেশী জোর আর শব্দ নিয়ে ঝড়ের লাঠি গিয়ে পড়ল বনের মাথায়। ভয় আমাদের যথেষ্টই হয়েছিল—নইলে তিনটিকে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম কেন—পিছনের ঝোপের মত।

অসীম ও রবীন বুক পকেট থেকে রামনাম লেখা কাগজ বার করলে—আমি বাঁ হাত দিয়ে মাদুলি সমেত ডান হাতের কনুই চেপে ধরলাম। ঝড় একনাগাড়ে বন ঠেঙাতেই লাগল।

হঠাৎ অসীম বুকে চাপড় মেরে বললে, মন্তর বল্—মন্তর। সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করলে—আমরাও যোগ দিলাম:

ঠিক দুপুর বেলা
ভূতে মারে ঢেলা,
ভূতের নাম রসি
হাঁটু গেড়ে বসি।

সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম তিন জনে।

অতঃপর অসীমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আর একটা মন্ত্র আওড়ালাম:

ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি।

তিন বার করে মন্ত্র আওড়াতে অনেকখানি সময় গেল। ঝড়ের বেগ ততক্ষণে বাতাসের একটু নিশানা রেখে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

অসীম উজ্জ্বল মুখে বললে, দেখলি?

অব্যর্থ মন্ত্রে বিশ্বাস আমাদের ফিরে এল।

অসীম বললে, দিনের বেলা কিনা ঘূর্ণো ঝড় নিয়ে ওঁরা আসেন।

রবীন বললে, চ—ফিরে যাই।

অসীম বললে, ভয় কিসে—যা মোক্ষম মন্তর দেওয়া গেল—আর কেউ আসবেন না।

কিন্তু এ জঙ্গলে কোথায় যাব?

ওই কুঠির ছাদের ওপর। আমরা যে এখানে এসেছিলাম ফিরে গিয়ে গল্প করলে কেউ বিশ্বাস করবে?

বললাম, কিন্তু আমরা তো এসেছি।

দূর্ বোকা—একটা চিহ্ন না রেখে বা নিয়ে গেলে ওরা বলবে চালবাজি।

রবীন বললে, বেশ তো এই ময়নার ডাল চিহ্ন রইলো হাতে।

আহা—নীলকুঠী ছাড়া ও যেন আর কোথাও পাওয়া যায় না!

তা কি চিহ্ন নেয়া যাবে?

চ' তো আগে—দেখি কি পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কি আমারও এগুতে ইচ্ছে করছিল না। এমন নিস্তব্ধ দুপুর চারদিকে জনমনুষ্য নেই—কোথাও একটা চোখে পড়ে না, দূর থেকে কুকুরের ডাকও শোনা যাচ্ছে না। চারদিক বনে ঘেরা—মাঠে মাঠে হাওয়া নীল ফুল—কথা কইলে কোন্ শূন্যে ভেসে যাচ্ছে—আর বিরাট এই পরিমণ্ডলে কয়েকটা বিন্দুর মত আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি। রাতের আকাশে ঝড় উঠে জলভরা নক্ষত্রগুলোকে ঝেঁটিয়ে যেন মেঘের জঞ্জালে মিশিয়ে কোথায়

ঠেলে নিয়ে যায়—তেমনই বনে বড় উঠলে আমরাও মিশিয়ে [illegible]তে পারি কিংবা রোদের মাঝেও মিলিয়ে যেতে পারি। এই বিজনে আমরা আছি কি নেই সে বোধশক্তি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

তবু এগিয়ে চললাম। বন আমাদের আপন নয় জেনেই হয়তো—ঘর তা হোক সে ভাঙা—তারই হাতখানি ধরে, নির্ভয় হবার আশ্বাসে এগিয়ে চলেছি। আর কৌতূহল—সে তো ছিলই। প্রথম থেকে সেই তো টেনে এনেছে আমাদের এই রহস্যপুরীর অঙ্গনে।

পরিখা পেরিয়ে এলাম সেই বিরাট পুরীর সামনে। কি চওড়া আর পাকা গাঁথুনির দেওয়াল। প্রকাণ্ড খিলানের নীচে দুয়ার-জানালার ফোকর। কপাট নেই—উইয়েই হোক আর চোরেই হোক সেগুলি আত্মসাৎ করেছে। তবু তাদের বিস্তৃতি বিস্ময় বাড়াচ্ছে। একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল উপরে উঠবার। প্রশস্ত—পাকা। তাই দিয়ে উঠলাম উপরে। শুধু ছাদটিই নেই—হয়তো নীচে ধ্বসে পড়েছে। বন উঠেছে মেঝের সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে। পাঁচিলের মাথায় পাহারাওয়ালার মত দাঁড়িয়ে যে গাছগুলো এতক্ষণ আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল—ওরা শক্ত শিকড়ের অসংখ্য আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে নীলকুঠির গলাটা। একদিন বনের গাছকে নির্ম্মূল করে সাদা মানুষ মুনাফা শিকারের আশায় এখানে ইমারৎ তুলেছিল—আজ কালের সুযোগ পেয়ে অরণ্যের সেনাগুলি নিচ্ছে তার প্রতিশোধ। ইমারতের গায়ে অজস্র শিকড় চালিয়ে ওরা টেনে নিচ্ছে সেই মুনাফার রস—নইলে পাকা ভিতের ওপর কি রসদ পেয়ে ওরা এমন সতেজ ও বলশালী হয়ে উঠল!

অনেকটা উঁচুতে উঠেছি বলে ভয়ও কমে গেছে। ওই মাঠ পড়ে রয়েছে আমাদের পায়ের তলায়—ও পাশের বনের গলা ধরে দাঁড়িয়েছি আমরা। ফুল গাছের ঝোপকে অত্যন্ত নিরীহ পাতা ছাড়া আর কিছু বোধ হচ্ছে না। দুপুরের হলদে রোদ এই দেওয়াল-ফুঁড়ে-ওঠা বটের ছায়ায় ঝিমিয়ে পড়েছে। পকেট থেকে আমের গুটিগুলি বার করে চিবুচ্ছি আর ভাবছি—কি চিহ্ন দিয়ে গেলে আমাদের এই অভিযান-কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারব সহপাঠীদের। ওরা চমকে উঠে বলবে, সাবাস—সাবাস!

অসীম পকেট থেকে ছুরিখানা বার করে বললে, ঐ গাছটার গায়ে নামের একটা অক্ষর লিখে যাব। কেউ বিশ্বাস না করে দেখে যাক এসে। বলে সে হেসে উঠল।

নাম স্বাক্ষর শেষ হলে তিন জনেই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। ভাবলাম, বাস—যে চিহ্ন রেখে যাচ্ছি এই গাছের গায়ে— তা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দু' যুগ পরে একখানা মিলিটারি লরীতে চেপে চলেছিলাম—এক জেলা থেকে আর এক জেলায়। দু' জেলার মাঝখানে পড়ে একটা বাঁওড় আর খানিকটা বন। বাঁওড় বাঁধা পড়েছে ভাসমান পুলের শিকলে—বন নির্ম্মূল হয়েছে পথের প্রয়োজনে। এখান দিয়ে পথ তৈরি করার কল্পনা কারও কোন কালে ছিল না—কিন্তু জাপানী সেনাকে পর্য্যুদস্ত করবার তাগিদে অখ্যাত এই মাঠের বুকে পথের নিগড় তৈরি হয়েছে।

এক জায়গায় দেখলাম—পথের দুধার ঢালু—পরিখার মত। নীলকুঠির স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু…কুঠির একখানি ইঁটও নেই—বনস্পতিরা তো নিশ্চিহ্ন। অত বড় কুঠির দেহ-অস্থি দিয়ে এ কালের বিশ্বকর্ম্মারা তৈরি করেছেন প্রশস্ত পাকা পথ— যা বিশ্বযুদ্ধের জয়-পরাজয়ে বৃহৎ একটা অংশ গ্রহণ করবে।

কালের স্রোত বয়ে চলেছে। সবাই জানে সে স্রোতের ভাষা—অথচ সবাই চেষ্টা করে প্রাণপণ শক্তিতে তাকে উপেক্ষা করতে। কুঠি আর বনকে পরাজিত করে পথ এসেছে এগিয়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে সুমসৃণ দেহ থেকে তার পিছলে পড়ছে নব জীবনের উদ্ধত হাসি।

মনে পড়ল—দু' যুগ আগে ঠিক এই জায়গাটিতেই গাছের ত্বকে ছুরি দিয়ে নিজেদের নামের আদ্যাক্ষর খুদে আমরাও একদিন অমন করে হেসেছিলাম।

আহ্বান

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

ধরণীর প্রান্তে বসি' চাহি নির্ণিমেষ।
গোধূলির রক্তরাগে ফুটিল যে ছবি,
কল্লোলে হিল্লোল তুলি গাহিল যে কবি,
কাকলীর কলকণ্ঠে তারি অবশেষ
দিগন্তে মিলায়। রক্তিম লীলায় শোভি
পশ্চিম গগন-প্রান্ত একটি নিমেষ
আনতা বধূর মত, এলাইয়া কেশ
রজনীর অভিসার। কুসুম-সুরভি
চুম্বন আঁকিয়া দেয় সর্ব্বদেহে তার।
তটিনী গাহিয়া চলে প্রেমপূর্ণ গান,
খদ্যোতের নৃত্য-ছন্দ তারি বন্দনায়,
মৌন ধরা খন্ড পাতি সঁপি দেয় প্রাণ
প্রণাম রাখিয়া যায় মধুপ-ঝঙ্কার;
আঁধারে আলোকে শুনি উদাত্ত আহ্বান

প্রাচীন অমৃত বাজার পত্রিকা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

২

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই বঙ্গদেশে অমৃতবাজার পত্রিকা স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন। পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ইহার কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও এই সময়কার পত্রিকা হইতে এমন কতকগুলি মন্তব্য সংযোজিত হইল যাহার দ্বারা ঐ সময়ের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বহুমুখীনতা আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইবে। পরাধীনতা মহাপাপ, ইহা সহ্য করা মানুষের পক্ষে একান্ত গর্হিত কার্য্য—পত্রিকা এ কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। কি উপায়ে পরাধীনতা-পাশ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি, মন্তব্যগুলির মধ্যে তাহারও সূত্র মিলিতেছে। নিরস্ত্র জাতির পক্ষে হিংসার পথে না গিয়া জমিদার-প্রজা, ধনী নির্ধন সকলেরই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাদ্বারা একদা যে আমাদের স্বাধীনতা লব্ধ হইবে পত্রিকা তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। শাসক ইংরেজ এই সময়েই হিন্দু-মুসলমানে কিরূপে ভেদ সৃষ্টি করিতে অগ্রণী হয় তাহাও আমরা ইহা হইতে জানিতে পারিতেছি।

[ভারতবর্ষের স্বাধীনতা]

ভারতবর্ষ এইরূপ যে সকল ঘটনাজালে পড়িয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বাধীনতা লাভের আর অধিক দিন বিলম্ব হইবে না। ইংরেজ শাসনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যন্ত্রস্বরূপ হইবে। সমুদয় ইংরেজ জাতি মাথা কুটিলেও ভারতের সে সৌভাগ্য ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন হইতে দুই ফল হইতে পারে। কোন না কোন রূপে দুই জাতির শক্তির তারতম্য দূরীভূত হইবে।···এখন স্বাধীনতা ইংলণ্ডে দৃঢ় রূপে মূলবদ্ধ হইয়াছে। এদিকে ভারতবর্ষে তাহার বিপরীত ভাব হইয়াছে। পুরাতন গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতবর্ষের সভ্যতা এক কালে আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে অধোগতি হইতে আরম্ভ হয়। শত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতের বীর্য্যবল লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তে পড়িয়াছেন। এবং যত দিন সেই আধিক্য থাকিবে, ইংলণ্ডের প্রভুত্ব অটল থাকিবে। কিন্তু এই তারতম্য আর থাকিতে পারে না। হয় ইংলণ্ড অধঃপাতিত হইয়া ভারতবর্ষের সমান হইবেন, কিম্বা ভারতবর্ষের উন্নতি হইয়া তিনি ইংলণ্ডের সমজুঠি হইবেন। ফলে দুয়েতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিশ্চিত।···

যে সকল ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আইসেন, তাঁহারা অধিকাংশই সিরাজদৌলার ছোট ভাই, ইংরেজ নামের যাহা গৌরব তাহা জাহাজে উঠিবার সময়েই তাঁহারা পশ্চাৎ রেখে আসেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা আমাদিগকে দাস মনে করিয়া আচরণ করেন। কিন্তু যে রূপ উপকারের দ্বিবিধ মঙ্গল, তেমনি অপকারের দ্বিবিধ অনিষ্ট—যে করে আর যার প্রতি করা যায়। দাসত্ব চাহিতে গেলেই দাস হইতে হয়। ইংরেজেরা মনে করেন, মরা ভারতবর্ষীয়দের উপর দেল পুরে প্রভুত্ব করিতেছেন কিন্তু ও দিকে আবার তাঁহাদের গৌরব যে বলবীর্য্য তাহা সেই সঙ্গে বিসর্জ্জিত হইতেছে। সুতরাং যাহার জোরে ভারতবর্ষকে অধীন রাখিয়াছেন, এইরূপ কুব্যবহারে ক্রমে তাহা হ্রাস হইতেছে। অতএব দুই উল্টা দিক হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। আর তাহা কাহারও সাধ্য নাই যে নিবারণ করে। (২৯ অক্টোবর ১৮৬৮)

[পাশ্চাত্য সংস্রবের কুফল]

আজ মাস আষ্টেক মধ্যে তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে এই কয়েকটি কাজ করিয়াছেন, অর্থাৎ আবিসিনিয়ার যুদ্ধের কতক ব্যয় আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, আমাদিগকে সিবিল সর্ব্বিসে প্রবেশের দ্বার প্রকারান্তরে রোধ করিয়াছেন, লাইসেন্স ট্যাকস প্রচলিত হইয়াছে, চিরস্থায়ী বন্দবস্তের উপর হস্তার্পণ করিয়া শিক্ষাকর বসাইতেছেন, চুক্তি ও বিবাহ সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে কয়েকজন ছাত্র প্রেরণের নিমিত্ত ১২টি স্কলার্শিপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার শেষোক্ত দুইটি ভিন্ন আর সমুদয়গুলি আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর, অতএব কেমন করিয়া সেগুলির জন্য আমরা তাহাদিগকে সুখ্যাতি করি।···

ইংরেজেরা আমাদের দেশের যেমন অনেকগুলি মঙ্গল সম্পাদন করিয়াছেন তেমনি অনেকগুলি দোষও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া ঢুকিয়াছে। ইংরেজ সমাজ আমাদের দেশের বর্ত্তমান সমাজ হইতে অনেক উচ্চ এবং দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি। তাঁহারা সহসা ইউরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করাইয়া আমাদিগকে অসুখী বই সুখী করেন নাই। হইতে পারে পরিণামে ইহাতে মঙ্গল হইবে, কিন্তু এখন ইহাতে আমাদের সমাজ বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিয়াছে এবং আমরা এখন ইংরেজ না হইলে এক মুহুর্ত্ত বাঁচি না। আমাদের মানসিক শক্তি বাড়িতেছে বটে, কিন্তু দিন২ শারীরিক শক্তির লোপ হইতেছে এবং জানি না শেষে শারীরিক শক্তির অভাবে মানসিক শক্তি থাকে কি না। এতদ্ভিন্ন মদ। ইংরেজেরা যত উপকার করিতেছেন সেগুলি, আর মদজনিত দোষগুলি, ওজন করিলে কোন্ দিকে যে ভারি হইবে তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমাদের বোধ হয়, ইংরেজেরা যে প্রণালীতে দেশের উন্নতি করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেটি সুখকর ও স্বাভাবিক নয়, তাহাতেই এত গোলযোগ হইতেছে। বিশেষতঃ দেশের উন্নতি প্রযোজক যে তিনটি প্রধান, সেই তিনটিতে আমাদিগকে বিমুখ রাখিতেছেন। আমাদের এখানে যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণ

শিক্ষার কোন বিভালয় নাই। এখানে সামান্য একটি কল চালাইতে হইলে, ইংলণ্ড হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনিতে হয়।... দ্বিতীয় অভাব বাণিজ্য বিষয়ক কোনরূপ শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট হইতে না দেওয়া।...তৃতীয়, শস্ত্র শিক্ষা না দেওয়া। এটি যত দিন ইংরেজেরা না দিবেন, তত দিন আমরা তাঁহাদিগকে স্বার্থপর মনে করিব। কল এ দেশীয়গণ যেমন নিরীহ ও রাজভক্ত, সেখানে বোধ হয় ইংরেজেরা অনায়াসে নিঃশঙ্কে তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে আপাতত এই লাভ যে, দেশীয়গণ যদি অস্ত্রশিক্ষায় তৎপর হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয়ে আর সৈন্য রাখিতে হয় না। (২৯ অক্টোবর ১৮৬৮)

[কি কর্তব্য ?]

নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা এ স্থলে গ্রহণ করিলাম।

গত সংখ্যক পত্রিকায় "একজন নিবেদক" স্বাক্ষর করিয়া এক ব্যক্তি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, শুনিলাম পত্রখানি বিখ্যাত ব্রাহ্ম বিজয় বাবু* লিখিয়াছেন।...

জাতি বিচার অন্যায়, অতএব ইহা না মানা কর্তব্য, কিন্তু উহা না মানিলে নিজের স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, বন্ধু বান্ধবের যাবদিক কষ্ট, এমতস্থলে কি করিতে হইবে ? সদাশয়, দয়ার্দ্রচিত্ত, দেশহিতৈষী ধার্ম্মিক যুবা পুরুষ বলিবেন, আপনি কষ্ট পাই পাব, স্ত্রী পুত্রে কষ্ট পায় পাউক, জাতি বিচার মন্দ, অতএব উহা দূরীকৃত করিতে যাহা প্রয়োজন সব করিব। আস্তে, অত উষ্ণ হবেন না। জাতি বিচার মন্দ কে বলিল ? সেটা কি ঠিক সাব্যস্ত হইয়াছে ? জাতি বিচার কিরূপে প্রথমে হইল তাহা জানা হইয়াছে ? কেন এরূপ করা হইয়াছিল জানা আছে ? জাতি বিচার ক্রমে ক্রমে উঠাইবার পন্থা যে আমাদের সমাজেই আছে তাহা কি জান ? যেন জাতি বিচার অন্যায় ইহা সাব্যস্ত হইল। তবে আমাদের দেশে আর একটি ইহাপেক্ষা গুরুতর অন্যায় দেখাইয়া দিতেছি। ইংরেজেরা আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, এটি সর্ব্বতোভাবে অন্যায়। এটি যাহাতে যাইয়া এদেশে সাধারণতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয় তাহা করা কর্তব্য। তাহা যদি হইল, তবে এরূপ অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া আমাদের কর্তব্য নয়। কালেক্টরীতে খাজনা দিও না, আদালতে মকদ্দমা করিও না, মহারাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহার করিও না। ইহাতে তোমার কষ্ট হইবেক, সংসারে থাকা দুষ্কর হইবে, তাহা হউক! কর্তব্য কর্ম্ম সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। শুদ্ধ ইহা করিলে চলিবে না, বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে তাড়াইয়া দাও। পারিয়া উঠিবা না ? তাহাতে কি ? তোমার কর্তব্য সাধন তুমি কর। ইংরেজগণকে তাড়াইতে গেলে অরাজক হইবে, তাহাতেই বা তোমার কি ? ফল দেখিবার অধিকার তোমার নাই, তাহা ঈশ্বর দেখিবেন।...* (৩ জুন ১৮৬৯)

সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের লড়াই

ইংরেজেরা ধনী, রাজকার্য্য সমুদায় ইংরেজদিগের হস্তে। সুতরাং ঐ বিষয়ক সংবাদ সমুদায় ইংরেজদিগের যত ঠিক ও শীঘ্র পাওয়ার সম্ভব এত বাঙ্গালীর নয়। ইংরেজ যেরূপ নিঃশঙ্ক চিত্তে মনের কথা বলিতে পারেন বাঙ্গালীরা তাহা পারে না। এই সকল কারণে ইংরেজী কাগজের সঙ্গে বাঙ্গালী কাগজের পারিয়া উঠা ভার। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রম করিয়া আস্তে২ একটি মস্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই পদের ভিত্তিভূমি আস্তে আস্তে গঠিত হওয়াতে উহা অতিশয় দৃঢ় হইয়াছে। ইংলিশম্যান বঙ্গকালের বলিয়া, মস্ত কাগজ বলিয়া, নীলকরদিগের স্বপক্ষ বলিয়া, বাঙ্গালীর বিদ্বেষক বলিয়া, ও ফ্রেণ্ড [অফ ইণ্ডিয়া] এই সমস্ত কারণে, তবে হীন সিবিলিয়ান ও মিসনারিদিগের গোঁড়া, সংবাদপত্রের মধ্যে প্রধানতম স্থান পাইয়াছেন।...

পাঠক ! আপনারা কখন হংসের যুদ্ধ দেখিয়াছেন ? হংসের মধ্যে যুদ্ধ প্রথমে দুইটিতে আরম্ভ হয়, ক্রমে সকলে প্রবেশ করে, পরস্পর পরস্পরকে দংশন করে। তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। যেটি কর্তৃক দংশিত হইতেছে, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেইটি আর একটি ধরে, এমনও হইতে পারে যে সে যাহাকে ধরিয়াছে সে তাহার শত্রুর শত্রু। সম্পাদকগণের লড়াই সেইরূপ। তবে একটু ভিন্ন আছে। ইংরেজী কাগজের সম্পাদকেরা এক সময় একজুট হইয়া থাকেন। এমনি শৃগাল কুকুরে কত বিবাদ, দেখা হইলেই ঝগড়া করে, কিন্তু একটি মড়া পাইলে তখন উভয়ের বিবাদ লোপ হইয়া উভয়ে মহা আনন্দে গলিত মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে। যদি বাঙ্গালী সম্বন্ধে কথা হয়, তখন সকলে একজুট, তা বেশ ঠিক আছে।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিভাগ কর, দেখিবে যে, উহা কয়েকটি ব্যবসাদার ইংরেজ ও সিবিলিয়ান দ্বারা গঠিত। ইংরেজী কাগজগণও ইহাদের পক্ষ সমর্থন করেন। এঁরা বেশ সুখে ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীরা এক্ষণে অনধিকার প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে। ইহার প্রধান সেনাপতি হিন্দু পেট্রিয়ট। ভ্রুকুটি, দন্ত দেখানতে, গর্জ্জনে আর সে পদটি যায় না, কাজেই হিন্দু পেট্রিয়ট ইংরেজদিগের চক্ষুশূল।

আবার রাজকার্য্য সম্বন্ধে আমরা কম জানি। কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্ সাহেবটি ভাল ইত্যাদি আমাদের

---

* বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

* পত্রখানি 'সম্পাদকীয়' বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ৮ই ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখের 'পত্রিকা'য় "হিন্দু সমাজ" শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পত্রোক্ত বিষয়টি মূলতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

হঠাৎ জানিবার যো নাই। আমাদের সে সমুদায় ইংরেজী কাগজেরা প্রকারান্তরে জানাইয়া থাকেন। তাঁহাদের যেটি ক্রোধের পাত্র, সেটি আমরা নিশ্চিত জানি, আমাদের বড় প্রিয় পাত্র। যে নিয়মটি তাঁহারা দোষেন, আমরা জানি যে সেটি বড় ভাল। এবারে এই উপায়ে আমরা গ্রে মহোদয়কে জানিয়া লইয়াছি। ফ্রেণ্ড ও ইংলিশম্যান লেং গবর্ণর গ্রে সাহেবকে গালি দিলেন, ও ডেলিনিউস সেই সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। আমরা জানিতাম না যে গ্রে সাহেব এত ভাল। পুরাতন কালের কথা, যখন হরকরা কাগজ ইডেন সাহেবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল তখন দেশ সমেত ভাবিতে লাগিল যে ইডেন সাহেব কত ভালই লোক। গ্রে সাহেবের বিপক্ষে তিনটি ইংরেজী কাগজ। গ্রে সাহেব তবে কি দেবতা? (২২ জুলাই, ১৮৬৯)

মুসলমানদিগের অবস্থা

কয়েক বৎসর গত হইল একজন ব্রাহ্ম একটি বক্তৃতায় এইরূপ মত ব্যক্ত করেন যে মুসলমানদিগের পক্ষে গবর্ণমেন্ট বড় নির্দ্দয়। বাঙ্গালীর কাছে আমরা প্রথম এইরূপ শুনি। এইক্ষণে জনকয়েক ইংরেজ সম্পাদক আবার এই কথা উত্থাপন করিয়াছেন। এইরূপ কথা উপস্থিত হইবার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত ন্যায়ের অনুরোধে, আর না হয় অত কোন দুষ্ট রাজনৈতিক অভিসন্ধির অনুরোধে। শেষেরটা আগে বলি, হিন্দু ও মুসলমানে এদেশের অধিবাসিগণ বিভক্ত। মুসলমানদিগের রাজ্য যাওয়াতে হিন্দুদিগের প্রাধান্য হইয়াছে। হিন্দুদিগের এত প্রাধান্য হইয়াছে যে, তাহারা রাজপুরুষদিগের সহিত রাজনৈতিক সমর করিতেছেন। শুদ্ধ তাহা নয়। রাজপুরুষগণের দল হইতে বহুতর প্রধান প্রধান লোক স্বীয় দলে আনয়ন করিয়াছেন। এখন দেখিবেন যে দুষ্ট ইংরেজেরা সহসা কোন অন্যায় করিতে পারেন না কি আমাদিগকে গালি দিতে পারেন না। সে যে শুদ্ধ হিন্দুদিগের ভয়ে তাহা নয়, তাহা করিলে অনেক মহাশয় ইংরেজেরা আমাদের পক্ষ হইয়া আমাদিগের সহায়তা করেন।...

যাঁহারা হিন্দুদিগের স্বার্থের বিরোধী তাঁহারা এইরূপে পদে পদে পরাজিত হওয়াতে একণে মুসলমানদিগের সহায়তা লইয়াছেন। হানিবলে ও সিপিওতে যখন যুদ্ধ হয় তখন হানিবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য সৈন্য সম্মুখে রাখেন, তাহার মানে এই যে ইহারা আর কিছু কাজে না লাগুক ইহাদিগের বধ করিতেও রোমানেরা ক্লান্ত হইতে পারে। মুসলমানদিগকে কোন২ ইংরেজ হিন্দুদিগের সম্মুখে ধরিতেছেন। আরো কারণ আছে। মুসলমানে ও হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ হইলে উভয়ে দুর্ব্বল হইবে। আপাতত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটগুলি ভাগ হইয়া গেলেও অনেক কাজ হইবে। একটি নিগূঢ় কারণ এক্ষণতক বলা হয় নাই। মুসলমানেরা ইংরেজদিগের কর্তৃক সম্প্রতি রাজ্যচ্যুত হইয়াছে, তাহাদিগের সে ক্রোধ অদ্যাপি যায় নাই। হিন্দুরা শান্ত স্বভাব, তাহারা বড় ক্রোধ করে মক্ মক্ করিবে, কিন্তু মুসলমানেরা আর কিছু করুক না করুক অনেক কষ্ট দিতে পারে। সিতানায় ও হাজারায় ও সিপাহী যুদ্ধ তাহারি প্রমাণ। অতএব মুসলমানদিগকে উৎকোচের স্বরূপ দুটা মিষ্টি কথা ও দুই একটি ভাল চাকুরী দেওয়া উচিত।...(১২ আগষ্ট, ১৮৬৯)

ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব

সিপাহী যুদ্ধ যে এক দল সৈন্যের যুদ্ধ এরূপ নয়, ইহা একণে সকলে স্বীকার করেন। পরাধীন অবস্থা অস্বাস্থ্যকর ও ভারতবর্ষীয়েরা স্বাধীনতার নিমিত্ত এক বার প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে তাঁহারা পরাজিত হয়েন, এই নিমিত্ত উহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া ইংরেজেরা ও এতদ্দেশীয়েরা উক্ত করেন। জয়ী হইলে উহাকে আর বিদ্রোহ বলা হইত না। পরাধীনতা মোচনের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়েরা চেষ্টা করিতে গিয়া একণে আরো অধিক অধীন হইয়া পড়িয়াছেন।

এখন যাঁহারা স্বাধীনতার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁহারা এক প্রকার নিরাশ অবস্থায় আছেন। উদ্যম হইলেই নিরুদ্যম হয় ও সেই নিমিত্ত সিপাহী যুদ্ধের উদ্যমের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয়দের অনেক কাল নিরুদ্যম অবস্থায় থাকিতে হইবে। তাহার পরে ইংরেজেরা আবার একটি যুদ্ধ না হয় তাহার সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।...

পূর্ব্বাপেক্ষা একণে ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরেজ এতদ্দেশে নানা উদ্দেশে আগমন করিতেছেন। যদিও ইহার মধ্যে অনেকে গবর্ণমেন্টের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু তবু বিপদকালে ইঁহারা গবর্ণমেন্টের চাকরের ন্যায় কাজ করেন। সিপাহী যুদ্ধে এরূপ লোকে অনেক কাজ করেন। কলের গাড়ি যদিও আমাদের দেশের বিস্তর উপকার করিতেছে, কিন্তু উহা তেমনি আবার ইংরেজদিগের বিপদকালের মহা ভরসাস্থল। ভারতবর্ষ রেলওএ দ্বারা খচিত হইতেছে। ভারতবর্ষের কোন এক স্থানে গোলের সম্ভাবনা হইলে তাবৎ স্থানের সৈন্য রেলওএ দ্বারা চক্ষের নিমিষে সেই স্থানে নীত হয়। তার কর্ত্তৃক এক মিনিটের মধ্যে তাবৎ স্থানের সংবাদ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয়েরা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে এ সমুদায় সুবিধা হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত থাকিতে হয়। তাঁহারা বড় পারেন, ইংরেজদিগকে কিয়ৎপরিমাণে এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।...

এই উপলক্ষে ইহার বিপরীত দিকে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। গবর্ণমেন্ট ইহাতে আমাদিগকে ধন্যবাদ করিবেন কিনা জানি না কিন্তু করা উচিত। উপরে যে সকল সুবিধার উল্লেখ করা গেল সীপাহী যুদ্ধের সময় সমুদয় না হউক ইহার অনেকটা ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটি থাকিলে তাহারা জয়ী হইতে পারিত। সেটি ঐক্যতা। সকলের স্বার্থ একরূপ হইলে সে স্বার্থ-সাধন অনায়াসে হয়। যদি সিপাহী-

দের কি তাহাদের বাদ্যকারীগণের সকলের স্বাধীনতার নিমিত্ত যত্ন থাকিত তবে সিপাহীরা নিশ্চিত জয়লাভ করিত।...

আসল কথা হইতেছে ঐক্যতা। যে দিবস ভারতবর্ষীয়েরা একবাক্য হইবেন, সেই দিবস ইংরেজদিগের এ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। কবে এরূপ ঐক্যতা হইবে কি আদৌ কস্মিনকালে এরূপ ঐক্যতা হইবে কিনা তাহা জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি এ ঐক্যতা হইতে দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা ইংরেজেরা। অত্যাচারেই এরূপ দেশের মধ্যে একবাক্য হয়। (৩১ ফেব্রুয়ারী ১৮৭০)

[ইংরেজ ও বাঙ্গালী]

আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে মকর্দ্দমা হইলে বাঙ্গালীর পারিয়া উঠা ভার। এমন সিবিলিয়ান প্রায় নাই যিনি বাঙ্গালীর নিকট দুই একটি অপরাধ না করিয়াছেন। আমাদিগের বৃদ্ধ জজ লকোর্ড সেলাম না করায় বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্রের উপর ভারি বিরক্ত হন, এ কথা আবার সংবাদপত্রে উঠে। লকোর্ড সাহেব যখন একটি সামান্য লাইবেল মকর্দ্দমায়* রাজকৃষ্ণ বাবুকে এক বৎসর কাটক দিবার হুকুম দেন, তখন কি তাঁহার ঐ সেলাম করার কথাটি মনে ছিল? মনে না থাকিতে পারারই সম্ভব, কিন্তু প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ লোকদিগের মধ্যেও এরূপ সমুদায় মনের ভাব। অতএব নব্য সিবিলিয়ানগণ যে কথায় কথায় এরূপ অপমান করিবেন তাহারই সম্ভব। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কে কোথায় কবে শুনিয়াছেন যে বাঙ্গালীর অভিযোগে একজন সিবিলিয়ান দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছেন? এই নিমিত্ত দেশ সমেত অনেক সময় ইংরেজদিগের উপর চটেন কিন্তু আমাদিগের বোঝা উচিত যে এরূপ পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ভিন্ন জাতির দেশ শাসন চলে না, অন্ত দেশাধিকার করা চলে না। অন্য দেশাধিকার করা কুকর্ম্ম, যদি একটা কুকর্ম্ম করা গেল তবে আর একটাও হউক। যখন আমাদের লাইবেল মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল তখন সকল ইংরেজ জুটিয়া আমাদিগকে হারাইয়া দিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন এ মকর্দ্দমায় বাঙ্গালী জয়ী হইলে, যশোহর কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে আর সিবিলিয়ানগণ টিঁকিতে পারিবেন না, এ কথাটি সত্য। অতএব আমরা এরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, ও ইংরেজেরা আমাদিগকে লইয়া এরূপ ঘোর বিপদে পড়িয়াছেন যে এমন একটি উপায় পাওয়া যায় না যাহাতে উভয়ের লাভ কি অন্তত একজনের ক্ষতি না হইয়া আর একজনের লাভ হয়। অতএব ইংরেজেরা অনেক সময় আমাদের ন্যায্য কথা শুনিতে বধির হয়েন, অনেক সময় তাঁহারা অত্যাচার করেন তাহার কারণ এই। তাঁহারা যত অত্যাচারই করুন আমরা কিছু দোষ দিতাম না, যাহা দেই কেবল তাঁহাদের বঞ্চনার নিমিত্ত। যতদূর ঔদার্য্য নাই তাহা দেখান, যতদূর ক্ষমতা নাই ততদূর দম্ভ করা, প্রতিজ্ঞা করা ও তৎক্ষণে ভঙ্গ করা হইয়াছে আমাদের গবর্ণমেন্টের দোষ। টাকা আর যশ-প্রার্থনা দুই একেবারে অন্যায়। যদি গবর্ণমেন্ট স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়া বলেন যে লাভের নিমিত্ত মনুষ্য চলাফেরা করে, লাভের নিমিত্ত তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের লাভ হয় তাঁহারা তাহাই করেন তবে অনেক গোলমাল চুকিয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা মুখে বলেন যে ভারতবর্ষের লাভের নিমিত্ত তাঁহারা এ দেশ শাসন করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়দের লাভই তাঁহাদের প্রধান স্বার্থ অথচ একটা ব্যতীত ষ্টেট স্কলারশিপ, আর সেটা দেওয়া মাত্র অমনি উঠাইয়া লইয়াছেন —এই এক শত বৎসরের মধ্যে নিজ স্বার্থ ব্যতীত এক পদও বিচরণ করেন নাই, ইহাতে কাজেই লোকে বিরক্ত হয়। ষ্টেট স্কলারশিপ স্থাপন করিয়া যেরূপ এদেশীয়গণকে সন্তুষ্ট করেন, উহা উঠাইয়া দিয়া তাহা অপেক্ষা শত গুণ বিরক্ত করিয়াছেন।

তবে ইংরেজেরা ইহা কতক পরিমাণে বুঝেন যে, যে পরিমাণে তাঁহারা নিজে লাভের দিকে দৃষ্টি করিবেন সেই পরিমাণে তাঁহাদের এদেশে স্থায়িত্বে প্রতি আঘাত করিবেন। আর দেশীয় লোকের ভালবাসায় তাঁহাদের যত বল বাড়িবে, লক্ষ স্নাইডরে তাঁহাদের সে প্রকার হইবে না। (২৪ মার্চ ১৮৭০)

গৃহবিচ্ছেদ

রাজায় প্রজায় যে পরিমাণে সদ্ভাবের হ্রাসতা হয় সেই পরিমাণে উভয়ের ক্ষতি ও অসুখ।...

কুড়ি কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়েরা নিতান্ত ইংরেজ-ভক্ত ছিলেন। সিরাজদৌল্লার অত্যাচারের জনরব তখন প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয় কম্পিত করিত। তখন ইংরেজেরা সুশাসন কাহাকে বলে প্রথমে দেখাইলেন। তখন ইংরেজেরা যে অত্যাচার করিতেন তাহাও লোককে তত আশ্চর্য্যান্বিত করিত না। ইংরেজেরা যে অত্যাচারই করুন কিন্তু তাঁহারা কখন গর্ভিণী রমণীর উদর বিভাগ করেন নাই। ইংরেজদিগের পরস্পর ঐক্যতা, তাঁহাদের প্রভুভক্তি, বীর্য্য, সাহস ও দেশ শাসনের পারগতা দেখিয়া লোকে মনের সহিত ইংরেজদিগের অনুগত হইল। ইংরেজদিগের ন্যায় সুখে আর হইবে না, এ তখনকার কথা ও অদ্যাপি বৃদ্ধেরা উহা বলিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরা তখন ইংরেজদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন।

এই সমুদায়ের ফল কি তাহা অনায়াসে বোঝা যায়। বাঙ্গালীর সাহায্যে ইংরেজেরা এ দেশ অধিকার করেন। বাঙ্গালীরা নিরীহ, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু ও তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত দেখিয়া ইংরেজেরা তখন বাঙ্গালীকে দয়া ব্যতীত ঘৃণা করিতেন না। যদি কোন ইংরেজে অত্যাচার করিতেন, আর একজন তখনে তাঁহাকে ধিক্কার করিতেন। যদি কোন মন্ত্রী বাঙ্গালীর কোন স্বার্থের কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইতেন তখন

* যশোহরে অমৃত বাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ মহকুমা-হাকিম রাইট সাহেব কর্তৃক আনীত।

আর একজন তদ্দণ্ডে বাঙ্গালীর সপক্ষ হইয়া দাঁড়াইতেন। ইংরেজী পড়াইতে যখন ইংরেজের এদেশে প্রথমে লাগিলেন, সে সময় অনেক ক্ষুদ্রাশয় ইংরেজেরা বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান কিন্তু তখন ভারতসভা [ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন] কোথায় ছিল ? যখন ১৮৩৫ সালের নীলকরদিগের কণ্ট্রাক্ট আইন রদ হয়, তখন সংবাদপত্র সমুদায় কোথায় ছিল ? সেদিনকার কথা, যখন ১৮৫৪ সালে প্রথম শিক্ষা সংক্রান্ত আদেশ প্রচার হয় তখন বাঙ্গালীরা কি নিদ্রিত ছিলেন ? এ সমুদায় ইংরেজেরা তখন নিজ ঔদার্য্যগুণে করিয়াছিলেন কিন্তু আর সেদিন নাই, আমরা উপাসনা করিয়া মাথা কুটিয়াও আর গবর্ণমেণ্টের মন গলাইতে পারি না।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মনের অনেক অমিল হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এখন যে কোন কায করেন, লোকে অগ্রে ভাবে ইহার মতলব কি। গবর্ণমেণ্ট সহস্র বার বলুন যে তাঁহাদের অন্য কোন অভিপ্রায় নাই, প্রজার মঙ্গলই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, কিন্তু তবু লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়। আবার গবর্ণমেণ্ট ভাবেন যে বাঙ্গালীরা সকলেই ইংরেজকে দ্বেষ করে যে, গবর্ণমেণ্টের উপরে তাহাদের দ্বেষ, তাহারা পারিয়া উঠে না বলিয়া মুখে রাজভক্তি দেখায়। এরূপ যে হইয়াছে, তাহা আর গোপন করিতে যাওয়া কেবল পাগলামি, একটি পীড়াকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। ইংরেজী কাগজে দেখ কেবল বাঙ্গালীর গালাগালিতে পরিপূর্ণ, আবার বাঙ্গালা কাগজে কেবল ইংরেজদিগকে গালাগালি। তবে যাহাদের গায়ে বল বেশী তাহারা যত অকুত ভয়ে গালি দিতে পারেন বাঙ্গালীরা তাহা পারিয়া উঠে না। এই মাত্র বিভিন্নতা। একটি কোন কায উপস্থিত হইলেই যে দিকে গবর্ণমেণ্ট সব ইংরেজী কাগজ সেই দিকে, আবার সব বাঙ্গালী এক দিকে।...গবর্ণমেণ্ট দোষী কি না সে বিষয় লইয়া তর্ক করিবার কিছু প্রয়োজন নাই, আমাদের দেখিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্টের সারল্যের প্রতি এরূপ সন্দেহ লোকের জন্মিয়াছে কিনা, যদি প্রকৃত এরূপ হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্টের যে প্রকৃত ভিত্তিভূমি তাহাতে কীট লাগিয়াছে। ইহাতে করিয়া হবে কি না বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না, গবর্ণমেণ্টের শান্তি থাকিবে না ও পরিণামে অনর্থ হইতে পারে। (১৪ জুলাই ১৮৭০)

বিদ্রোহসূচক ভাষা প্রয়োগের আইন

আজ বৎসর দুই আড়াই হইল একবার একটি জনরব উঠে যে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সম্বাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার সংকল্প করিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সম্বাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা আর গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা আমাদের কাছে এক কথা বলিয়া বোধ হয়। এবং আমরা তাহা গ্রাহ্য করি না, কিন্তু লর্ড মেয়োর রাজ্য শাসনে সকলই অদ্ভুত হইতেছে,...তিনি যে সম্বাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার যত্ন করিবেন তার বিচিত্র কি ? ভারতবর্ষীয়গণের অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়া থাকেন, তাহারা কষ্ট সহ্য করিবে, কিন্তু এরূপ ভয়ানক কঠোর আইনের আবশ্যক কি ? আজ ১০ বৎসর পর্য্যন্ত [সার বার্নস] পিকক্ সাহেবের পেনাল কোড দ্বারা রাজ্যের শান্তিরক্ষা হইতেছে, ইহার মধ্যে কয়েক জন রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছে এবং কয়েকজন বা গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বীতরাগ জন্মাইয়া গিয়াছে ? ইংরেজগণ এত বুঝেন কিন্তু এটি কি বুঝেন না যে, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটি সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক, তাঁহারা সহস্র উপকার করিয়াও যখন ভারতবর্ষীয়গণের স্নেহ ও ভালবাসা উপলব্ধি করিতে পারেন কিনা সেটি সন্দেহ, সেখানে এরূপ লৌহদণ্ড দ্বারা শাসন করিলে কি কখনই তাহারা তাঁহাদের অনুগত হইবে ? বাষ্পীয় যানের সেফটি বল্‌বের মুখ বন্ধ করিয়া বাষ্প বাহির হইতে না দেওয়া যেরূপ বিপদ, বল প্রয়োগ দ্বারা প্রজার মুখ বন্ধ করা তাহা অপেক্ষা কম বিপদ নহে, বিশেষতঃ এরূপ প্রজায় যাহার সঙ্গে রাজার স্বাভাবিক কোন সম্বন্ধ নাই। ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত অবিচারসমূহ এদেশের লোকে সহ্য করে তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে আমাদিগকে মুখে দুটি আবল-তাবল বকিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইতে দেন সেটিও ইহার একটি প্রধান কারণ। মুখ বন্ধ করিয়া ৩৵০ হারে ট্যাক্স বসাইলে প্রজারা এতদিন কি করিয়া উঠিত কে জানে ? ইংরেজগণের এটিও মনে করা উচিত যে, তাঁহাদের অনেক শত্রু, ইহার পরে ভারতবর্ষের ১৪ কোটি প্রজার বিরাগের ভাজন হওয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। লর্ড মেয়োর আর কি, ৩ বৎসর পরে ভারতবর্ষের ভাল মন্দের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ লোপ পাইবে, কিন্তু তাহা কর্তৃক বপিত বীজ পরিণামে যে কি বিষময় ফল ধরে তাহা কে বলিতে পারে ? ক্রমাগত কয়েকজন গবর্ণর জেনারেলের অদূরদর্শিতা নিবন্ধন সিপাহী যুদ্ধ হয় এবং জগদীশ্বর না করেন যে লর্ড মেয়োর ভ্রমে ভারতবর্ষ আবার রক্তে প্লাবিত হয়। ফল প্রজার প্রতি অবিচার হইলে সে রাজ-বিদ্রোহ না হইয়া মুখ আঁধার করিতে পারিবে না। এরূপ নিয়ম প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয়গণের ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ, কি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা, অথবা সবংশে বিনষ্ট হওয়া বই আর গতি থাকিবে না। এবং রাজভক্ত ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে যখন অস্ত্র ধরা অসম্ভব, এবং আর্য্যবংশ যখন নিপাত হইবার বংশ নয়, সেখানে তাঁহাদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভাবনা।* (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০)

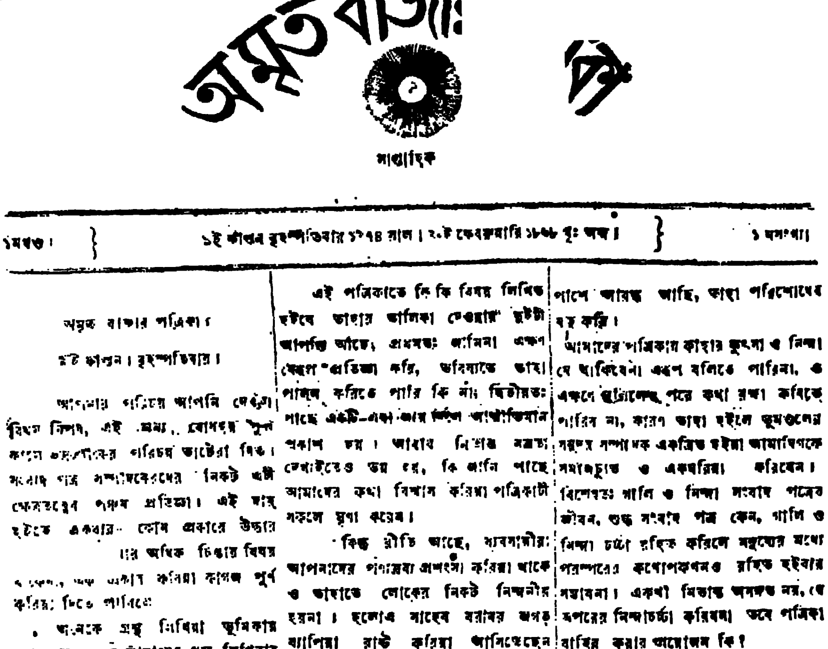
---

* ৮ ডিসেম্বর ১৮৭০ তারিখে 'পত্রিকা' লেখেন—

"The law is passed. Mr. Stephen has immortalized his name. History shall never forget him as it has not forgot Sir Metcalfe."

প্রজার বন্ধু কোথায়? (১)

প্রজাদিগের শেষ রক্তবিন্দু জমিদারেরা শোষণ করেন আবার সেস কর প্রভৃতি বসাইয়া তাহাদের প্রতি গবর্ণমেন্ট হস্ত প্রসারণ করিতেছেন, এবার গবর্ণমেন্টের লোভ তৃপ্তির নিমিত্ত তাহাদের অস্থিমাংস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইবে। জমিদারগণের নিকট হইতে রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্ট প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপে কলুষিত হইতেছেন। কিন্তু দরিদ্র প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করিলে গবর্ণমেন্ট তাহাদের মুখের অন্ন উচ্ছেদ করার মহা পাপ করিবেন। আমরা বলিতে পারি না সেস কর দ্বারা কত দুঃখী প্রজারা অকালে কালকবলে পতিত হয়। এক্ষণ ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে প্রজাদিগের আহার ও বসতির কষ্ট ও অস্বচ্ছন্দতার দ্বারা দেশে সংক্রামক জ্বর আসিয়াছে এবং এই নিমিত্ত দুঃখী লোকের মধ্যে জ্বরে অধিক অনিষ্ট করে। সেস করে প্রজার অবস্থা আরো জঘন্য করিবে। প্রজাদিগের এই বিপদ কিন্তু ইহা তাহারা কিছু জানে না। এই অজ্ঞান অবোধ বাকশূন্য অন্নকষ্টে জড়িত প্রজারা কিছুই জানে না যে, তাহাদের মস্তকোপরি বজ্র গর্জ্জন করিতেছে কিন্তু আমাদের দেশে কি এমন নিঃস্বার্থ মহাত্মা কেহ নাই যে এই আসন্ন বিপদ হইতে প্রজাগণকে রক্ষার যত্ন করেন। যে মহাশয়রা একবার প্রজার উন্নতি সাধন নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন তাঁহাদের হৃদয় কি কঠিন হইয়া গিয়াছে? মহাত্মা বিদ্যাসাগরের দয়া, দেশহিতৈষিতা, পরোপকার স্পৃহা কি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? ইনকম ট্যাক্সের সময় যাঁহারা বীর বৃকোদরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণ কোথায়?* যাহাদের অর্থ অস্বচ্ছল তাহাদের উপর কর ধার্য্য হইলে যাঁহারা সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অসময়ে মুমূর্ষু, পদতলে


অমৃতবাজার পত্রিকা

সাপ্তাহিক

১ম খণ্ড। } ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১২৭৪ সাল। ২০এ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ। } ১ সংখ্যা।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

৯ই ফাল্গুন। বৃহস্পতিবার।

অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রতিলিপি

[শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

* অমৃত বাজার পত্রিকা বরাবর ইনকম ট্যাক্সের সপক্ষ ছিলেন, কারণ ইহা দরিদ্র প্রজাকে স্পর্শ করিত না। ৯ মার্চ ১৮৭১ তারিখে 'পত্রিকা' লেখেন,—

"আমরা ইনকম ট্যাক্সের সপক্ষ। প্রেসিডেন্সি ডিভিজনের কমিশনার শ্রীযুক্ত…সাহেবের এই মত। তিনি বুঝিয়াছেন যে

দলিত, আশ্রয় বিহীন দীন হীন মলিন অজ্ঞান প্রজাদিগের উপরে যে ভয়ানক কর সংস্থাপিত হইতেছে তাহা কোথায় বসিয়া দেখিতেছেন ? আমরা এদেশীয় ইংরেজ সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের কথা ধরি না, তাহারা স্বার্থের দাস, কিন্তু যে মিশনারিগণ চিরকাল প্রজার দুঃখে কাতর, যাঁহারা চিরকাল নিঃস্বার্থ ভাবে প্রজার মঙ্গল দেখিয়াছেন এবং যাঁহাদের যত্নে এদেশের প্রজারা যে একটু উন্নতি করিয়াছে তাঁহারা এ বিপদ কালে কোথায় ? সেস কর বসিলে দেশে যে অত্যাচার হুতাশন প্রজ্জ্বলিত হইবে তাহা মনে করিলে আমাদের আতঙ্ক ও শরীর অবসন্ন হয়। হা জগদীশ্বর এ বিপদ কালে প্রজার বন্ধু কোথায় ?† (১ জুন ১৮৭১)

প্রজার বন্ধু কোথায় ? (২)

...ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে মূল করিয়া জেলায় জেলায় এক একটি সভার অধিবেশন করুন। সভার নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণের স্বার্থ বোধায় উহার এমন কোন নাম রাখা কর্ত্তব্য, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে লোকে জমিদারের সভা বলিয়া জানে সুতরাং ও নাম থাকিলে কাজ হইবে না, ফল যতদিন দেশ সমেত লোক্ একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারী কার্য্যের প্রতিরোধ না করিবে তত দিন দেশের মঙ্গল নাই। যে দেশ স্বাধীন সেখানে রাজনৈতিক দলাদলি দ্বারা মঙ্গল হয় বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজ শাসন দ্বারা যে দেশ শাসিত হয় সেখানে সকল রকম ঘরোয়া বিবাদই অনর্থের মূল হয়। এরূপ দেশে গবর্ণমেণ্টের ঘরোয়া বিবাদ করাইয়া দেওয়ায় ইষ্ট আছে। কারণ তাহা হইলে তাঁহারা যখন যে দিকে সুবিধা পান তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করিতে পারেন। জমিদারে এবং প্রজায় এখন যে এত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল এই এবং প্রজা ও জমিদারেরা যত দিন এ ভ্রম বুঝিবেন না তত দিন কেহ নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবেন না প্রত্যুত আপন অনিষ্ট আপনি করিবেন।...জমিদারেরা প্রজার সঙ্গে মিলিত হইলে তদ্ব প্রজাকে রক্ষা করা হইবে তাহা নহে তাহাদের বলও অসংখ্য গুণে বৃদ্ধি হইবে। যদি কখন গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য গতি প্রতিরোধ করিতে কেহ পারে তবে সে বাঙ্গলার নিরীহ প্রজাগণ। ইহারা নিস্তব্ধে, শান্ত ভাবে, অবিচলিত চিত্তে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে, বিনা অস্ত্রে, বিনা শোণিত পতনে যেরূপ যুদ্ধ করিতে জানে পৃথিবীর কোন জাতিতে তাহা জানে না।...

ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে যত গোলযোগ হইতেছে তাহার মূল ইংরেজেরা।"

নীল হাঙ্গামার সময় তাহাদের সে শান্তি ভাব ও অধ্যবসায় আমাদের যখন মনে হয় তখনই আমাদের বিশ্বাস হয় যে যদি তাহাদের সেইরূপ সাধু ও দেবভাব একবার উত্তেজন করা যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট হৃদয়ে নিশ্চয় দয়ার ও সুবিচারের আবির্ভাব হইবে। (২৫ জানুয়ারি ১৮৭২)

একজন মনুষ্যের বল

সময়েং এইরূপ ক্ষণজন্মা মনুষ্য [চৈতন্য, নেপোলিয়ন, রণজিৎসিংহ, শিবাজী] পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যদি এইরূপ এক একটি ক্ষণজন্মা লোক এখন আমাদের থাকিতেন তবে আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ থাকিত না, স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধ করিয়া যে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার যো আছে তাহা আমাদের বোধ হয় না। যুদ্ধ করিয়া আমাদের দেশ লওয়া একরূপ সাধ্যাতীত হইয়াছে কারণ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, উহা সংগ্রহ করিবার কোন উপায়ই নাই। গবর্ণর জেনারেলে ও ষ্টেট সেক্রেটারিতে তাড়িত বার্ত্তাবহ যোগে এখন দিবারাত্রও কথাবার্ত্তা চলিতে পারে, লৌহ পথে ভারতবর্ষ খচিত হইয়াছে, এমন কি যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে দুই মাসের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আসিয়া ভারতবর্ষের যেখানে ইচ্ছা সেখানে উপস্থিত হইতে পারে। অতএব যুদ্ধ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমরা কখন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি সে অন্য উপায়ে, যুদ্ধ করিয়া নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব অপহরণ করিয়া ইংরেজ জাতি এখন পরম সুখে ভারতবর্ষ ভোগ করিতেছেন। এই স্বত্বের এক একটি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, ও প্রত্যর্পণ করিয়া ইংরেজ জাতি দেখিবেন যে ভারতবর্ষ রাখিয়া তাঁহাদের কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি হইতেছে তখন কাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা তাঁহাদের স্বার্থ হইবে ও আমরা স্বাধীন হইব। ইংরেজেরা যাহা বলুন আমরা যে একদিনকাল স্বাধীন হইব, ইহা আমাদের মনে বলে, আর কি ঈশ্বরের নিকট আমরা এত অপরাধী যে পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমরাই পরাধীন থাকিব ? উপরে যে হেতুর কথা উল্লেখ করা গেল ঐ হেতুতে যে আমরা স্বাধীন হইব আমাদের আপাততঃ ইহাই বোধ হয়।*

[বিলাতে একজন উপযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধির স্থায়ী বসবাসের বিষয় আলোচনা করিয়া 'পত্রিকা' এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করেন যে,] আমরা আর কোনরূপ স্বত্ব চাই না। ইংলণ্ড আমাদিগের নিজের একটি পারলিয়ামেণ্ট দিউন। (১১ আগষ্ট, ১৮৭১)

† ১৫ জুন ১৮৭১ তারিখে 'পত্রিকা' লেখেন,—"হবে সেস কর নির্দ্ধারিত হইল। দেশকে ছারখার করিবার নিমিত্ত আর একটি আগুন প্রজ্জ্বলিত হইল।...প্রত্যেক টাকায় দুই পয়সা, ইহা বহন করা এদেশীয়দের পক্ষে অসাধ্য হইবে।"

* এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী ও তৎবর্ত্তিত অহিংস গণ-আন্দোলনের কথা স্মরণীয়।

ভবিষ্যৎ কাব্যের সম্ভাবনা ও ধারা

শ্রীসমরকান্ত গুপ্ত

আধুনিক এবং প্রাচীন কবিকুলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের কাব্য সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। মানুষের জীবনের গভীরতম উপলব্ধি, মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়েই ভবিষ্যতের কাব্য রচিত হবে। আধুনিকতার অগ্রদূত ফরাসী, ফরাসীর অত্যাধুনিক কবি পর্য্যন্ত বলছেন—যা ক্ষীণ দুর্ব্বলকে সৌন্দর্য্যে পরিবর্ত্তিত করে তোলে কাব্যশিল্প সেই রসায়ন।* এরূপ ক্ষেত্রে কোন কবি যদি বলেন—

জেগে আছে তারা তখনও যাদের জোটে নাই খদ্দের,
জুটেছে যাদের—পাখা খুলে দিয়ে ভূতের নৃত্য করে
মদে আর গানে, চাটে, বাঁয়া-তবলায়।
স্খলিত বচনে ঘন ঘন তারা পানওয়ালারে ডাকে,
অকারণে চুমু খায়, হাসে কাঁদে, গান গায় অকারণে।
বুদ্বুদ-সম কারেন্সি নোট হাওয়ায় মিলায়ে যায়।†

রসিকজন শ্রবণ আবৃত করবেন, আরাগঁ বলবেন (দেবভাষা যদি তাঁর জানা থাকে)—নৈতৎ পরতরং, এর পর আর নেই। প্রধান সমস্যা তা হলে সৌন্দর্য্য বলতে কি বুঝি? যা দৃশ্য, নয়ন-প্রতিভাত, স্থূল-ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর তাই কি সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য? আমি মনে করি প্রত্যেক বস্তু বা জীবের ভিতরে একটি সত্য রয়েছে, তার নিভৃত সত্তা; কবি অথবা শিল্পী তাকে আশ্রয় করে সত্যকে যখন প্রকাশ করতে পেরেছেন, অপসৃত করে দিয়েছেন তার সম্মুখ থেকে সেই হিরণ্ময় পাত্র—ধ্বনি, বর্ণ বা বাক্‌শক্তিতে তখনই তিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেছেন। কবি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তার উপর আরোপ করেন, তার সঙ্গে মিশ্রিত করে দেন আপনার নিজস্ব মানস-গঠনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, জীবনের ইচ্ছা, লিপ্সা ও আবেগ। এইরূপেই প্রত্যেক কবির বিশেষত্ব, নিজস্ব দেখা দেয়। এই হেতু সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মধ্যে—আমি কাব্যের সম্পর্কেই বলছি—এসেছে প্রকারভেদ, মাত্রাভেদ, শ্রেণীবিভাগ—সবই এক বর্ণের ও একই ভূমির নয়। কিন্তু তার পূর্ব্বে কাব্য রচনার প্রাথমিক অপরিহার্য্য একটা উপাদানের উল্লেখ করা প্রয়োজন। কাব্যের প্রাণ হ'ল অনুভূতি, উপলব্ধির উত্তাপ, আবেগ (স্মরণ করুন কালিদাসের: "হৃদয় মা উত্তাম্য")। প্রথম যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তার সঙ্গে একটা তুলনা গ্রহণ করলে বক্তব্য সহজ হতে পারে:

কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য…

পাঠকের আর অবকাশ নেই—ভাবের আবেগে কবি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

মধুসূদন যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, ভাব এবং ছন্দ গুণের উভয়তঃ, সেটি তাঁর বিশেষ ধর্ম্মেরই (ওজঃ গুণের—এখানে বলতে হয় প্রাণবন্যা-স্রোতের) পরিচায়ক। এই ভাবাবেগের অভাব হেতুই রাজারামের তীর্থমঙ্গলকে কাব্য হিসাবে মৃগলুব্ধের অপেক্ষা নিষ্প্রাণ ও বহু গুণে নিকৃষ্ট বলতে হয়। বস্তুতঃ তীর্থমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য যাই নির্দ্ধারিত হোক তাকে উত্তম কাব্যরসের নির্ঝরিণী বলতে সংকোচ হয়। মৃগলুব্ধের কবি যথার্থ কবি।

আমরা বলছিলাম সৌন্দর্য্যের প্রকারভেদের কথা, বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন মাত্রার সৌন্দর্য্যের কথা। এই পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ সন্দেহ নেই। তারপর বিতর্ক উঠতে পারে সকল সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য, তার মধ্যে উচ্চ-নীচের বিভাগ ও স্তর-বিভাস নিষ্প্রয়োজন, অন্ততঃ অসম্ভব যদি না-ই হয়। কথাটি তর্ক হিসাবে শুনতে সহজ কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা যাক সত্য হিসাবে এতে যথার্থ মূল্য কিছু আছে কি? কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করি এখানে,—

নজরুলের:

প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল!!

কবি সত্যেন্দ্রনাথের:

বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়দাতা! পৌঁছিয়ে দাও পরম অন্নদাতার চরণ-মূলে!

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের:

কালোয় ঢেকেছে আলো,—জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—

উদ্ধৃতিসমূহের মধ্যে কাব্যরসের সম্পর্কে বলা চলে সবগুলিই কবিত্বের পর্য্যায়ে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু এরই ভিতর একের সঙ্গে অপরের যে পার্থক্য তা পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রথম কবি এনেছেন বিপুল গতির একটা প্রবাহ, শব্দ শুধু মাত্র অর্থে পর্য্যবসিত হয়ে পড়ে নি, তা দিয়েছে প্রাণকেন্দ্রে এক অতিমানবিক জাগতিক শক্তির আভাস; কিন্তু আভাস মাত্রই। এই অতিমানবিক জগতের রহস্য কবির দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে দেখা দেয় নি—কবির উপলব্ধি যেন অনেকটা অস্পষ্ট ভাবে, একটা সত্যের বৃত্তের পরিধির ক্ষীণ স্পর্শ পেয়েছেন তিনি, কেন্দ্রের রহস্য বের করে নি তাঁর কবিদৃষ্টি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যরচনায় মস্তিষ্ক এবং বিচারের এত প্রাধান্য দিয়েছেন যে তারা প্রায় অলঙ্কারশাস্ত্রের

* L'art des vers est l'alchimie qui transforme en beautes les faiblesses.— *Louis Aragon.*

† "রাজহংস"—সজনীকান্ত দাস।

নীতিশুদ্ধের সমবর্তী হয়ে উঠেছে। আধুনিকের প্রধান ধারাই চলেছে এই পথে। তথাপি কবি যেখানে মননক্রিয়াকে সর্বেশ্বর বলে মনে করে রাখেন নি সেখানে খানিকটা কবিত্ব, সত্যকারেরই কবিত্ব, পরিচ্ছিন্ন শব্দের ভাষার মধ্যে এসে পড়েছে (কবির নিজের ভাষায় বলতে হলে 'মায়াবী সে মন্ত্রবাক' ত বটেই)—

বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে:…

রবীন্দ্রনাথে এসে একাধারে কাব্যের গভীরতা ও সমুচ্ছতা দেখতে পাই। আমরা প্রসঙ্গত 'বলাকা' ও 'উর্বশী' অংশের উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ ধারা প্রকাশ পেয়েছে 'গীতাঞ্জলি'তে, 'গীতালি'র মধ্যেও তার রেশ লক্ষ্য করা যায়—

আজো সময় হয়নি কি তা'র, কাজ কি আছে বাকি?
ওগো ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোর পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখী
আপন কুলায়মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের পরে?…

অথবা,

যেন আমার লাগছে মনে,
মন্দ মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আসছে আজি।

সমস্ত আধুনিক কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলে এ একটা অভিনব লোক আবিষ্কার বলে মনে হতে পারে। বস্তুতঃ কবি এখানে যে লোক জয় করেছেন তা অন্তর্লোক—আমি তার নাম দিতে চাই 'ভাবজগৎ'। এইখান থেকে প্রেরণা নিয়ে কবির যে সৃষ্টি তা হ'ল ইংরেজীতে যাকে বলে Psychic poetry। ভাবাত্মিক কবিতার মর্ম কি, বিশেষত্ব কি? যা সরল সহজ ভাবে হৃদয়ের গূঢ় অন্তস্তল থেকে বাহির হয়ে আসে; প্রেম, সৌন্দর্য্য, কোমলতা ("sweetness and light") তার স্বাভাবিক অলঙ্কার। ইংরেজী কাব্যে শেলী এবং ব্লেকের উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গভাষায় সমগ্র বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্য—পদাবলী—এই নিদর্শনে পরিপূর্ণ। ফরাসীরা এই দিকে তেমন লক্ষ্য দেয় নি। তবে মালার্মে আর এক ভাবে ফরাসীর ক্ষতি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মালার্মে আধ্যাত্মিক জগতেই এসে গিয়েছেন। ইংরেজী কাব্য ইয়েটস, এ.ই. আশ্রয় করে একই অভিমুখে চলেছে। এলিয়ট ভাবে ফিরে এসেছেন চিরন্তন সত্যের বাণীবাহক হয়ে, কিন্তু ভঙ্গীতে হতে চেয়েছেন উগ্র আধুনিক। পরিণামে তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটা দ্বিধভতা ভাষা ও ভাবের মধ্যে ব্যবধান গড়ে তুলেছে। বলছিলাম ইংরেজী ভাষা পেয়েছে এ. ই. এবং ইয়েটস। বাংলার পক্ষে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথে যে আধ্যাত্মিকতা তার মূল প্রেরণার ধারা চলে গিয়েছে উপনিষদ ঋগ্বেদ পর্য্যন্ত। উপনিষদ কাব্যের বৈশিষ্ট্য পরিমিততায় ও স্বচ্ছতা—গভীর অনুভূতির উপলব্ধির মধ্যেও একটা প্রোজ্জ্বল স্বচ্ছতা। বৈদিক কবির লেখনীতে যেন রহস্য ফুটে উঠেছে, একটা আবরণ—হয়ত স্বচ্ছ একটু আবরণই—সর্বদা মূর্তিকে ঢেকে ঢেকে চলেছে,—

দেবানাং চক্ষুঃ সুভগা বহন্তী
শ্বেতং নয়ন্তী সুদৃশীকমশ্বং।
উষা অদর্শি রশ্মিভির্ব্যক্তা
চিত্রামঘা বিশ্বমনুপ্রভূতা [বশিষ্ঠ]

আনন্দময় উষা দেবতাদের চক্ষু (দিব্যদৃষ্টি) এনেছে, অগ্রে নিয়ে চলেছে সুদৃষ্টিসম্পন্ন শ্বেত অশ্ব, উষা দৃশ্যমান সকল রশ্মিতে ব্যক্ত, বিবিধ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, সকল বস্তুতে তার আবির্ভাব প্রকট করে চলেছে সে।

ঋগ্বেদের কাব্য আধ্যাত্মিক কাব্য। ঋষি কবিগণ মানুষের জীবনের গভীরতম এবং সৃষ্টির নিগূঢ়তম সত্যগুলি অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এই উপলব্ধির বাণীমূর্তি তাঁদের ভাষাতেও যেন দৃষ্টিলাভ করেছে—তাই তারা হ'ল 'পশ্যন্তী বাক্', যে বাণী দেখে, চক্ষুষ্মান্। কার্য্যতঃ ঋগ্বেদের কবি বহু স্থূল প্রতীক আশ্রয় করেছেন যাদের মর্ম উপলব্ধি করলেই ভাবের বাণীবিহঙ্গ অসীমের স্পর্শ পেতে পারে। তথাপি ঋগ্বেদের প্রতীকরূপ ও অভিধার মধ্যে বর্ত্তমান একটা অচ্ছেদ্য এবং অবিভাজ্য সম্বন্ধ, এরা ভাষা-সৌকর্য্যের ও ভাব-লালিত্যের কৌশল হিসাবে, উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি; যেমন কালিদাসের—

গভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।

সাধারণতঃ ধর্ম্মসংক্রান্ত যা কিছু তাকেই আধ্যাত্মিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার এর অপেক্ষা ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। সচরাচর ধর্ম্ম যাকে বলি তা মনের একটা বিশেষ প্রবণতার বিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধর্ম্ম হতে পারে মানুষের অত্যন্ত স্থূল অঙ্গের—মনও বহুলাংশে এই পর্য্যায়ভুক্ত—ক্রিয়াকলাপ, আচার-বিচার, গতানুগতিক অভ্যাস পর্য্যন্ত। 'দুর্গামঙ্গল' 'গঙ্গামঙ্গল', 'জগদ্ধাত্রী মঙ্গল' মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কোথাও কবির গভীরতম আন্তর প্রদেশের আভাস পাই নে। দুর্গা, গঙ্গা, জগদ্ধাত্রীর গুণ-কীর্ত্তনেও কাব্য উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে নি। অন্যত্র যেখানে দান্তে অত্যন্ত পার্থিব বস্তু দুঃখের কথা বলছেন (Io no piangeva: si dentro impietrai…)—আমি কাঁদি নি, অন্তরে আমি শুধু পাথর হয়ে গিয়েছিলাম; অথবা ভর্জিল যখন বলছেন, সমস্ত জিনিষের মধ্যে অশ্রু জমাট বেঁধে রয়েছে, মৃত্যু কি একটা ভীষণ জিনিষ, মানুষের এমন যে মন তাকেও সে এসে আচ্ছন্ন করে (sunt lachrymae rerum et mentem mortalia

tangunt) সেখানেই বরং উত্তম কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই শুধু মাত্র ভগবানের নাম বা দেবদেবীর মহিমাকীর্ত্তনই কবিতাকে আধ্যাত্মিক গভীর করে তোলে না। মানুষের যেমন রয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয় তেমনি আবার তাদের মূলে রয়েছে আত্মা। অধ্যাত্ম বস্তু বলতে পারি আত্মাকে অতিক্রম করে আত্মারও উপরে—মানুষের মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ যে অংশ রয়েছে তাই। আধ্যাত্মিক কাব্য, যা এই গভীরতমের ঊর্দ্ধ্ব-তমের স্ফুরণ নিয়ে আসে, তার জন্ম অধিমানস লোক থেকে, মানসোত্তর চেতনার বাণী তার বাহক।

এখন একটা প্রশ্ন, এই কাব্যসৃষ্টির সম্ভাবনা কতখানি আশাপ্রদ? লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে কাব্যের একটা ক্রমোন্নতি চলেছে। এই ক্রমোর্দ্ধগতি ইংরেজীর মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশি পরিস্ফুট। 'বিউয়ুল্‌ফ'-এর গাথা, চসারের আরও পরিণত 'ব্যালাডে' সহজ প্রাণেরই স্পন্দন, ড্রাইডেন পোপে এসে মনের এক ধরণের তীক্ষ্ণ বিচারশীলতা, শেক্স-পীয়রের যেন একটা স্বচ্ছন্দ অপূর্ব্ব বিপুল প্রাণসমুদ্র—আর শেক্সপীয়রের ভাষার প্রকাশ শক্তির তুলনা হয় কি? মিলটনের আত্মস্থ মানসচেতনা, সংযত পরিমার্জ্জিত, এমন কি কোথাও কোথাও মনে হয় তার মধ্যে পড়েছে সম্বোধির আলো, এ. ই. বা ইয়েটসের হাতে রূপ নিয়েছে অন্ত অলৌকিক জগতের ইন্দ্রজাল। এ. ই. এবং ইয়েট্‌স ত আধ্যাত্মিক জগতের কথাই বলেছেন—নানা দেশজ উপকথা, কাহিনী, প্রতীক-সমারোহের মধ্যে। বাংলা কাব্যের মধ্যে ভাবের এরূপ একটা ধারাবাহিক পরিণতি ঘটে নি। গঠনের দিক থেকে দেখি আমরা এসে পড়েছি ক্রমেই বিচিত্র ও বৃহৎ পূর্ণতার নিকট। গোবিন্দদাসের পয়ার থেকে আজকের রবীন্দ্র-রচনার দিকে লক্ষ্য করলেই এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভাবের চিন্তানুভবের দিক দিয়ে আমাদের মধ্যে সেই লোকোত্তর জগতের এক চিরন্তন স্রোত বয়ে চলেছে। বাংলার প্রাচীনতম পল্লীগাথা অসংস্কৃত বর্ব্বরের আদিম প্রাণবৃত্তির আবেগময়তা (Bewulf-এর শৌর্য্যকাহিনী) নিয়ে রচিত হয় নি। বাঙালীর গভীর হৃদয়ে যেন চির দিন বিদ্যাপতি জাগ্রত ছিল; ঠাকুরের কথা ছেড়ে দিলেও, বাংলার নিভৃত অঞ্চলে যে কথা ও গান প্রচলিত ছিল তার ভিতরে যে প্রবাহ তা অধ্যাত্মপরায়ণতার প্রবাহ—অন্তর্মুখিতার প্রবাহ ("ঢেউ দিও না কেউ এ জলে, বলে কিশোরী")।

আধ্যাত্মিক কাব্যের লক্ষ্যই জীবনের সৃষ্টির গভীরতম সত্য, গভীরতম সৌন্দর্য্য, গভীরতম উপলব্ধিসমূহ ব্যক্ত করা—বিচারের সিদ্ধান্তের পর সিদ্ধান্ত টেনে দিয়ে নয়, তাকে পেতে হবে শ্রুতি দিয়ে, দেখতে হবে অন্তশ্চক্ষু দিয়ে, এই মন্ত্রের ভাষাকেই বোধ করি ঋষি-কবিরা বলতেন 'সত্য মন্ত্রাকৃতিঃ':

Let thy hue-winged lyrics hover like birds
Over the swirl of the heart's sea,
Touch into sight with thy fire-words
The blind indwelling deity.

(*Musa Spiritus*—শ্রীঅরবিন্দ)

ঋষি কুৎসের—

পরায়তীনামন্বেতি পাথ
আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়-
ন্ত্যুষা মৃতং কং চন বোধয়ন্তী

বিগতাতীতের লক্ষ্যে চলেছে যারা তাদের অনুগমন করছে ঊষা, ভবিষ্যতে যে অনন্ত ঊষার আগমন হবে এই ঊষা তাদের প্রথম। ঊষা প্রসারিত হয়ে চলেছে—জীবকে জাগ্রত করে, মৃত কেউ ছিল তাকে চৈতন্য দান করে।

আধ্যাত্মিকের লক্ষ্যই যেন চলে গিয়েছে লোকাতীতের দিকে। পার্থিব সৃষ্টির আকার ও আকৃতি ধরে কি কাব্যসৃষ্টি হতে পারে না—ইঁদুর, বাদুড়, গর্দ্দভ, চা, জেব্রা, জেটি ইত্যাদি নিয়ে আধুনিকেরা যেমন মুখর? আসল সমস্যার কথা বলছি। আসল সমস্যা বিষয়বস্তুকে নিয়ে ততখানি নয় যতখানি বিষয়বস্তুর দ্রষ্টাকে নিয়ে। অবশ্য উপাদান গ্রহণে একটা সংযম থাকা প্রয়োজন। রন্ধন-প্রণালী, ব্যায়াম-কৌশলের প্রক্রিয়াদি, মহকুমা বোর্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ-পদ্ধতি এতদ্‌সমুদয়ও কি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে? এরূপ চেষ্টার পরিণামে কি পরিমাণ সাফল্য নিহিত থাকতে পারে একমাত্র ভবিষ্যতের কালই তার নির্ভুল উত্তর দেবে। আমরা বলতে চাই বস্তুর আকার ও আকৃতিগত বাহ্যরূপ যেমন সত্য, তেমনি তার আর একটি রূপ রয়েছে যা আত্যন্তিক অলৌকিক, বস্তুর বা জীবের নিভৃত সত্তা; উভয়ই সত্য। উপনিষদের কবি, ঋগ্বেদের কবি বাস্তব মূর্ত্তি রূপ গ্রহণ করেছেন—ঊষা, অগ্নি, গো, অশ্ব, বিহঙ্গ সমুদ্র, নদী, আকাশ, চন্দ্র, তারকা, বৃক্ষ ইত্যাদি, কিন্তু এদের মধ্যে তাঁরা ভরে দিয়েছেন অন্তর্জগতের ইঙ্গিত অর্থ দ্যোতনা। ফরাসীর বোদেলের কি বীভৎস চিত্র এঁকেছেন, তবে তিনিও তার মধ্যে এনে দিয়েছেন রূপান্তরের যাদুদণ্ডের স্পর্শ—ফলে তাঁর শিল্প রসবস্তুর পর্য্যায়ে উঠে গিয়েছে। কবির এই শক্তিই কাব্যশক্তি।

এখন এক ধরণের কাব্য দেখা দিয়েছে যার নাম গদ্য-পদ্য —যার স্বভাব গদ্যও নয় পদ্যও নয়। অথচ এরই মধ্যে কিছু কবিত্বের অবকাশ থাকবে। এই গদ্য কাব্যের মূলে কবির যে মনোবৃত্তি সক্রিয় তা হল ঘটনাকে ঘটনার মতই নিঃশেষে ব্যক্ত করা—সাধারণের 'প্রাকৃতজনা'র মৌখিক ভাষার অনুগামী করে তোলার চেষ্টা তার মধ্যে। এই প্রকারের বাণী রচনা, যার একমাত্র শব্দ-গাম্ভীর্য্য ছাড়া কোন নিয়মিত ছান্দসিক ভিত্তি নেই, সুনিয়মিত সুনির্দ্দিষ্ট আকার নেই, তার যা কিছু মূল্য বা স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সে সমস্তই তার ভাব-পদার্থের (thought power) উপর নির্ভর করে। হুইটম্যান প্রাণের প্রবল শক্তিতে একটা সজীবতা রাখতে পেরেছেন। এলিয়ট একেবারেই বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব—আধুনিকের নাম রূপ স্বভাব তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ ফুটে উঠেছে। এলিয়টের শাণিত বুদ্ধি; তা যেন অনুসন্ধান করে

করে কোথায় চলেছে, তার মধ্যে পাই যে হুইটম্যান বা কার্পেন্টারের মত প্রকৃতির সুর, বৃষ্টির বিশালতা ও মানবাত্মার জয়গান। রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রোত্তর যুগের কথা আর নাই বললাম—পর্য্যন্ত গদ্যকাব্যের মধ্যে এসে গিয়েছেন। গদ্যকাব্য সর্ব্বদা নিয়মিত ছন্দকে এড়িয়ে চলতে চায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্য তাঁর ছন্দোবদ্ধ বাণীর সঙ্গে তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে।
এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।
(শেষ সপ্তক—চৌত্রিশ)

এর সঙ্গে দেখুন কবির নিজের প্রদত্ত একই ভাবের ভিন্ন রূপ কত গাঢ় হয়ে উঠেছে,—

দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্ত্ততলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধা তৃষ্ণা, বাসনা-প্রদীপ্ত ভালবাসা।
তবু করি অনুভব বসি' এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কাব্যের মধ্যে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এসে পড়েছে ছন্দ, একেবারে অতি স্পষ্ট ভাবে :

ভিড়ের দল | রব পেরিয়ে | আসছে গানের | আহ্বান···

রবীন্দ্রনাথ শুধু ছন্দকুশলী বলেই নন, তাঁর কবি-চেতনার সঙ্গে ছন্দ ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে রয়েছে—কবির পক্ষে তাই এই ছন্দের আবির্ভাব স্বাভাবিক, যেখানে তাঁর সতর্ক মন নির্লিপ্ত সেখানেই এসে পড়েছে ছন্দ। শ্রেষ্ঠ কাব্যের ছন্দ শুধু বাহিরের কারুকার্য্য নয়—তবে যথাযথ সুনিয়ন্ত্রিত শব্দবিন্যাসের উপর খানিকটা নির্ভর করে বটে। গ্যেটে বলেছেন—

Das wenige verschwindet leicht dem Blicke
Der vorwarts sieht, wie viel noch ubrig bleibt*—

সম্মুখে তাকালে দেখি আমাদের যে আরও কত কাজ করতে হবে তার তুলনায় সামান্য যেটুকু করেছি তা কতই অকিঞ্চিৎকর।

রচনার দিক থেকে গ্যেটের উক্তিতে ত্রুটি নেই, তবুও একটা অভাব কোথায় যেন থেকে গিয়েছে, এরই মধ্যে অন্তঃপ্রকৃতি পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে না। ছন্দ বলেছি কেবল স্থূল ধ্বনি-সজ্জা নয়। ছন্দ ভাবের গতির মর্ম্মের শৃঙ্খলা ; যে সত্য যে রূপ প্রকাশ হতে চায়, কবি যাকে আহ্বান করেছেন, তার নিজস্ব একটা সুর শৃঙ্খলা আছে। এই সূক্ষ্ম ছন্দটি যেখানে (বিশেষ করে শেলী, সুইনবার্ণ, ও ইয়েট্‌স-এর মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে) স্থূল ছন্দের ধ্বনির কাঠামোর ফাঁকে ফাঁকে ভরে ওঠে সেখানেই পরিপূর্ণ ছন্দের বিকাশ।

Love, a moment drop thy hands ;
Night within my soul expands.
(*Night by the Sea*—শ্রীঅরবিন্দ)

প্রচলিত ছন্দ অনেক সময় নূতন চেতনার নূতন ভাবধারণে সমর্থ হয় না—তখন অবশ্যই প্রয়োজন নূতন ছন্দের। প্রাচীনের হিরোয়িক কাপলেট ভেঙে দিয়ে শেক্সপীয়র সমুদ্রের মুক্ত কল্লোলিত প্রবাহ নিয়ে এলেন Blank Verse-এ, যেমন মধুসূদন করলেন বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন করে। শেক্সপীয়র বা দত্ত কবি ছন্দকে অবজ্ঞা করে তাঁদের অভিনব সৃষ্টি গড়ে তোলেন নি, তাঁদের গতিবিধি ছন্দের মধ্যে। এই দুই মহাকবির তুলনা কোথায় ? বাল্মীকি, ব্যাস, শেক্সপীয়র প্রমুখ প্রাচীন কবিদের মধ্যে এই যে গুণ পূর্ণমাত্রায় ছিল, আধুনিকের হাতে স্থানে স্থানে তার কথঞ্চিৎ নিম্নতর গ্রামের একটা প্রতিধ্বনি এখনও পাই :

আমার আরতি দীপ শূন্যতায় সাজায় শর্ব্বরী।
('ক্রন্দসী'—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

অথবা প্রাণচাঞ্চল্য যেখানে আরো সংহত শান্ত হয়েছে তার মধ্যে—

মহাসাগরের আবরণ শুধু অসীম আকাশ আছে
('রাজহংস'—সজনীকান্ত দাস)

কিম্বা নিশিকান্তের :

আলোর তলের কালো পাতালের বেলা হবে অবসান,
রূপান্তরের শুভ্র ময়ূর আসে।
সব অগোচর তামস-বিবর পাবে যে পরিত্রাণ—

আমরা যখন আধ্যাত্মিক কবিতার কথা বলছি তার অর্থ যেন কেউ মনে করি নে যে ঋগ্বেদ-উপনিষদ-গীতারই পুনরাবর্ত্তন, আক্ষরিক সুনিপুণ একটা অনুকরণই কাব্যের পরম সার্থকতা। ভবিষ্যতের কবির কাম্য হবে বৈদিক দৃষ্টির ও উপলব্ধির গভীরতা এবং পরিমিত-ভাষণ, বাল্মীকির এই রমণীয়তা,

সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।

আধুনিক কবির বাণীশিল্প এই উচ্চতম শিখরে আত্মপ্রকাশের পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দ অপেক্ষা করে আছে।

তবে একটা কথা। আধ্যাত্মিক কাব্য, বিরাগীরা বলেন, মনে হয় একটা স্বাদহীন দার্শনিক ভাষণ। ত্রুটি আধ্যাত্মিক

* "The little that is done seems nothing when we ook forward and see how much we have yet to do."

কাব্যের কি অপারগ রসগ্রাহীর সে-কথা নিয়ে আমি তর্ক তুলতে চাই নে। কাব্য সৃষ্টি মৃত্তিকা খনন বা পয়ঃপ্রণালী রচনা নয়—পেশীবল বহুর লভ্য হতে পারে, কিন্তু কাব্যরস বোধ—তার জন্য চাই সুকুমার রসবোধের অনুশীলন, তার জন্যে চাই স্থূল থেকে সূক্ষ্মতম স্পর্শ, বর্ণ, ধ্বনি চিনতে পারার জাগ্রত বুদ্ধি, ঋগ্বেদের ঋষি হয়ত বলবেন সত্যকে দেখতে হয় সহস্র দ্বার দিয়ে, সহস্র দ্বার দিয়ে সত্যের আগমন।

মানুষ ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—আজ যে ভূমি তার নিকট দূরের বস্তু বলে প্রতীয়মান হয়, কালের প্রবাহে দেখি অদূর ভবিষ্যতে তা চেতনার মধ্যে অধিগত হয়ে গিয়েছে। এক সময় শ্রোতা নিধুবাবুর টপ্পায় মুগ্ধ বিহ্বল ছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের নিকট দুরধিগম্য বলে মনে হয়েছিল। আজ রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যজগতে একচ্ছত্র সম্রাট্—দুরতিক্রম্যতার বাধা যেন কেটে গিয়েছে। মানুষের চেতনার মধ্যেই চলেছে ক্রমগতি—রূপ থেকে অরূপে, ঊর্দ্ধ থেকে তদূর্দ্ধে; মানুষের বাণীও তেমনি তার অনুগামী হয়ে চলেছে। মহত্তমের শ্রেয়ের বিকাশ সুন্দরতম বাণীর মধ্যে, একদিন তার নিকট পরম আত্মীয়ের মত পরিচিত হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। শুধু জীবনের মধ্যে নয়, বাণী-শিল্পের মধ্যে আছে যে বিভ্রান্ত দৃষ্টি ও পল্লবগ্রাহিতার যুগ চলেছে তার অন্তে কবির দ্রষ্টার মধ্যে জ্যোতির উন্মেষে দেখা দেবে সত্যবোধ ও শ্রেয়ঃ দৃষ্টির সুনিশ্চিন্ততা, তারই মধ্যে থেকে হবে এক নবযুগের সূচনা:

But a day may yet come when the tiger crouches
and leaps no more in the dangerous heart of
the forest,
As the mammoth shakes no more the plains of Asia;
Still then shall the beautiful wild deer drink from
the coolness of great pools in the leaves'
shadow.
The mighty perish in their might;
The slain survive the slayer.

(*The Tiger and the Deer*—শ্রীঅরবিন্দ)

ধনতন্ত্রী সভ্যতার সংঘাতে প্রাণিজগতের ধ্বংস

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সভ্যতার বৃদ্ধি ও দ্রুত উৎপাদনের লাভের আশায় পৃথিবীর সম্পদ আজ বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন দেশ বা কোন মণ্ডল, গ্রীষ্ম বা হিম মণ্ডলই হউক, এই বেপরোয়া উৎপাদন বা লুণ্ঠন এবং অপচয় হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না।

প্রথমে বনসম্পদের কথা ধরা যাউক। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উত্তর ভাগ ঘেঁসিয়া এই বিরাট বনভূমি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং ইউরোপে নরওয়ে হইতে সাইবেরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত এই বিশাল বনভূমি বিস্তৃত। দক্ষিণে চাষের জমিতে আসিয়া এবং উত্তরে হিমমণ্ডলের বরফের মধ্যে এই বনরাজির প্রসার শেষ হইয়া গিয়াছে।

বনের গাছগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একভাগকে 'নরম কাঠ' (soft wood) বলা হয়। এই কাঠ হইতেই কাগজ প্রভৃতি তৈয়ার হয়। অন্য প্রকার কাঠ অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং নানা শিল্পকার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

যদিও লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে, তথাপি কাঠের ব্যবহার কিছু মাত্র কমে নাই। বহুদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঠ জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়। নকল প্রকার রেশম ও কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপাদানও কাঠ। 'নরম কাঠ' এই সকল কাজে এতই ব্যবহৃত হইতেছে যে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই এই প্রকার কাঠের দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

পুরাতন মহাদেশগুলিতে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই বন নির্ম্মূল করার কাজ চলিয়াছে। বিশেষতঃ, ইংলণ্ডের মত শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে আদিম বনের অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। অবশ্য নিঃশেষে বন ধ্বংস করার কাজ অপেক্ষাকৃত অল্পকাল পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে দূর অঞ্চলের গভীর বনভূমির গাছ কাটা সুরু হইয়াছে।

রুশিয়াকে বাদ দিলে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এই দুইটি দেশই পৃথিবীর অর্দ্ধেক 'নরম কাঠ' এবং কাগজ তৈরির মণ্ড যোগাইয়া থাকে। গত আশী বৎসরে এই দুই দেশের সরবরাহ কমিয়া এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট লেক অঞ্চলে এই অরণ্য-সংহার-পর্ব্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। মিসিগান ষ্টেট হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাঠ পাওয়া যাইত। ১৯০০ হইতে ১৯১০ সনের মধ্যে এ স্থানের সরবরাহ কমিয়া অর্দ্ধেক হয়। ১৯২০ সালে এই সরবরাহ আরও অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। বর্ত্তমানে এই ষ্টেটে বাহির হইতে কাঠ আমদানী করিতে হয়। মিসিগানের কাঠ নিঃশেষ হইলে উইস্‌কন্‌সিন্ উহার স্থান গ্রহণ করে।

কিন্তু এখানেও কিছুদিন পরে বন নির্ম্মূল হয়। শেষে মিনেসোটা ষ্টেটে কাঠ কাটা সুরু হয় এবং সেখানেরও এই একই পরিণতি হয়। অতঃপর কাষ্ঠ-সংগ্রহকারীরা দক্ষিণ অঞ্চলের অরণ্যে তাহাদের কাজ আরম্ভ করে।

মানুষের হস্তক্ষেপ ব্যতীত দাবনল দ্বারাও অরণ্যের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। অবশ্য এই দৈবদুর্ব্বিপাক নিবারণের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুনই দাবানল অত্যধিক ক্ষতির কারণ হয়।

যে ভাবে 'নরম কাঠের' ধ্বংসযজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই ইহা নিঃশেষিত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে সাম্রাজ্য বন-সম্মেলনে (Empire Forestry Conference) মন্তব্য করা হয় যে, বনের কাঠ আহরণ সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম করিতে গেলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই তাহা মানিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ এরূপ বাঁধাবাঁধিতে কাঠের ব্যবসায়ীরা প্রবল ভাবে আপত্তি করিবে। এখন কাঠের ভবিষ্যৎ ভরসা সাইবেরিয়ার বিশাল অরণ্যানী।

গ্রীষ্মমণ্ডলের সিডার ও চন্দন গাছ প্রায় নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে। মহীশূর রাজ্যে গবর্ণমেণ্ট চন্দন গাছ ও উহা হইতে উৎপাদিত দ্রব্যাদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে একাধারে ধ্বংসের কবল হইতে চন্দন বৃক্ষ রক্ষা ও সরকারী আয়ের ব্যবস্থা উভয়ই হইয়াছে।

বেপরোয়াভাবে বন নির্ম্মূল করায় আর এক বিপদ বাড়িয়াছে। ইহাতে এক দিকে যেমন বর্ষায় জমির মাটি ধুইয়া ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, অন্য দিকে তেমনি বন্যার সৃষ্টি হইয়া কৃষির বিপুল ক্ষতি করিতেছে। যখন পর্ব্বতগাত্রের গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয় তখন বৃষ্টির জল আর মাটিতে বাধা পাইয়া জমিয়া থাকে না, সরাসরি পাহাড়ের গা বাহিয়া নিচের উপত্যকায় নামিয়া যায়। মাটি ধুইয়া যাওয়ায় পর্ব্বতগাত্র বৃক্ষহীন ঊষর জমিতে পরিণত হয় এবং নিম্নভূমিতে বন্যার সৃষ্টি হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রিটিশের রেল লাইন প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কাজের জন্য বিস্তর কাঠ দরকার হইলে হিমালয়ের উপত্যকায় বিরাট অরণ্য নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস করা হয়। ফলে বৃক্ষহীন পর্ব্বতগাত্র আর বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখে না বলিয়া নিম্ন-প্রদেশে বর্ষাকালে বন্যা ও অন্যান্য সময়ে জলাভাব দেখা দিয়াছে। ইহা ব্যতীত পাহাড়ের গা-ধোয়া বৃষ্টির জল পাহাড়ী বালুকা বহিয়া আনিয়া নিম্নাঞ্চলে যে বন্যার সৃষ্টি করে তাহাতে জমি চাষের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে চাষের ক্ষতি, গ্রামবাসিগণের গৃহাদি নির্ম্মাণের উপকরণ ও জ্বালানী কাঠের দুষ্প্রাপ্যতা, এবং চারণভূমির অভাবে ক্ষীয়মাণ গৃহপালিত পশ্বাদির খাদ্যের অপ্রতুল ঘটিয়াছে।

ঔপনিবেশিকেরা অষ্ট্রেলিয়ার মারে নদীর উপত্যকায় উচ্চ মালভূমিতে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করার দরুন, পাহাড় হইতে মাটি ধ্বসিয়া ও বন্যার সৃষ্টি হইয়া বহু উর্ব্বর চাষের জমি ও মেষচারণ-ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে আপেলিচিয়ান পর্ব্বতের অরণ্য ধ্বংস করিয়া ঔপনিবেশিকগণ কয়েক বৎসর তুলা, তামাক ও ভুট্টা চাষ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু পরে প্রবল বৃষ্টিতে জমি ধুইয়া গেলে উহা আর কৃষির উপযুক্ত রহিল না।

কিন্তু অরণ্য ধ্বংসে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হইতেছে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দেশ উত্তর চীনের। এখানে হোয়াং হো নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশের পাহাড়ী জমির মালিকগণ গাছ কাটিয়া খচ্চরের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। অবশ্য বাজার দূরে হইলে লাভের অনেকটা মজুরীতে খাইয়া যায়। চড়া দামের আশা থাকিলে বড় বড় ব্যবসায়ীরাও এ কাজে হাত দেয় এবং দূর হইতে কাটুরিয়া আনাইয়া কাজ করায়। গাছ কাটিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করা হইলে কৃষক এই উর্ব্বরা জমিতে ওট্ ও আলুর চাষ দেয়। বড়-জোর দশ বৎসর কাল এইরূপ চলে এবং ইহার মধ্যেই বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া জমি এরূপ অনুর্ব্বর হয় যে, সে জমির আয় হইতে আর খাজনা দেওয়া কুলাইয়া ওঠে না। অগত্যা কৃষক তখন নূতন জমিতে গিয়া চাষ আবাদ চালায়, এইরূপে নির্ব্বিচারে ক্রমাগত বনাঞ্চল ধ্বংসের কার্য্য চলিয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় অরণ্য ধ্বংসের সহিত কৃষির পতনের কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অথচ সভ্য মানুষ আজিকার দিনেও এই অবিবেচনার কার্য্য অবিরাম চালাইয়া যাইতেছে।

মানুষের হাতে প্রাণিজগতেও এই নির্ম্মম ধ্বংস-লীলা অবিরাম চলিয়াছে। কত জন্তু ও পাখী এইরূপে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার লেখাজোখা নাই। এক্ষণে বিশেষভাবে যে কয়েকটি প্রাণী মানুষের আর্থিক প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক তাহাদের বিষয় বিবেচনা করা যাক।

পৃথিবীর উত্তর হিমময় দেশগুলির জঙ্গলে বহু প্রকারের জন্তু বাস করে। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সকল জন্তুকে চামড়া ও 'ফারে'র (লোম) জন্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও রুশিয়ার লোকেরা ধ্বংস করিয়া আসিতেছে। 'ফারে'র ক্রয়-বিক্রয় একটি লাভজনক ব্যবসা। শ্বেত জাতির লোকেদের আগমনের পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোগণ এই সকল জানোয়ার ধরিত এবং যাহাতে ইহাদের বংশ নির্ম্মূল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিত। ইংরেজ এবং ফরাসীরা এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই সকল লোককে আরও গভীর বনে প্রবেশ করিয়া কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করিতে উৎসাহিত করিল। এই সমস্ত মূল্যবান 'ফার' ইউরোপীয় সভ্যতার বিলাস-দ্রব্যাদির বিনিময়ে স্বল্প মূল্যে অসভ্য লোকদের নিকট হইতে ক্রয় করা হইত। সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূলের এক দিক হইতে আর এক দিক পর্য্যন্ত ইংরেজ জাতি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়া 'ফার' সংগ্রহে ব্রতী হইল এবং 'ফারে'র বদলে সভ্যতার ঠুনকো দ্রব্যাদি অসম্ভব রকম উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। ফলে আদিবাসিগণ চিরদিনের মত ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পুঁজিপতিদের খপ্পরে পড়িয়া অন্য দেশেও যাহা হইয়াছে এখানেও তাহাই হইল। শ্রমিকগণ ধনতন্ত্রের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের মুখে চলিতে লাগিল।

ওদিকে অরণ্যের ধ্বংসে বিভিন্ন জীবকুলের ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। উহাদের আশ্রয় ও বাসস্থান লোপ পাওয়ায় ইহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করাও সহজ হইয়া পড়িল। অবশ্য পরে যাহাতে জন্তুগুলি একেবারে লোপ না পায় এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা চুক্তিদ্বারা 'ফার' ব্যবসায়কে সংহত করিয়া জীবজন্তু ধ্বংস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তবুও যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তাহা অপূরণীয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে বিবর নামক সুন্দর প্রাণী, লিন্‌ক্‌স্, ওটার এবং কালো ভল্লুক একেবারে লোপ পাইয়াছে।

অবশ্য বন্য জানোয়ারগুলিকে ধ্বংস না করিয়া এবং গৃহ-পালিত পশু হিসাবে এগুলিকে পালন করিয়া 'ফার' সংগ্রহ হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। 'ফারে'র চাহিদা হয়ত এই গৃহপালিত জন্তুর দ্বারা মিটিবে না, কিন্তু কিছু পরিমাণে জানোয়ার তো প্রাণে বাঁচিবে।

উত্তর-আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে ঠিক এইরূপ নির্ম্মমভাবেই বন্য মহিষ (বাইসন) নিপাত করা হইয়াছে। গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে মাত্র চারি বৎসরেই দক্ষিণ অঞ্চলের বহু লক্ষ বাইসনকে হত্যা করা হয়। দশ বৎসর পরে উত্তর অঞ্চলের বাইসন হত্যা শুরু হয়। চামড়ার জন্যই সাধারণতঃ বাইসন বধ করা হইত। লক্ষ লক্ষ চামড়া যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ কারখানায় চালান দেওয়া হইত। বাইসনের জিহ্বাগুলিও ছিল দামী—এক একটি ৫০ সেণ্ট দরে বিক্রয় হইত। ১৯০৬ সনে হিসাব করিয়া দেখা যায়, যাহারা এককালে সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ ছিল, সেই বাইসন জাতির মাত্র ৫০০টি প্রাণী জীবিত আছে। উহাদিগকে সংরক্ষিত জঙ্গলে (National Parks) আবদ্ধ রাখিয়া যাহাতে আর ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রেট শ্লেভ লেকের পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলেও ইহাদিগকে নিরুপদ্রবে বাস করিতে দেওয়া হইতেছে।

চামড়া ও মাংসের দিক দিয়া বাইসন গরু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আকারে বড় এবং অধিকতর সবল ত বটেই। বাই-সনের মাংসও বেশী দিন সংরক্ষণ করা চলে, সুতরাং খাদ্যা-ভাবের সময় ইহা বেশী উপযোগী এবং ইহা গোমাংস অপেক্ষা সহজপাচ্য। বাইসনের চামড়াও বেশী পুরু এবং শক্ত। উপরন্তু বাইসনের লোম হইতেও পশমী কাপড়ের ন্যায় বস্ত্র প্রস্তুত করা চলে।

জন্তুর মধ্যে উত্তর-আমেরিকার বৃহৎ হরিণ, সাধারণ হরিণ, পাখীর মধ্যে টার্কী (মুরগী) এবং অনেক রকমের বন্য হাঁস যে খাদ্যের জন্য কি পরিমাণ ধ্বংস হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ডক্টর হর্ণাডে বলেন যে এক আমেরিকারই, মানুষের কাজে লাগিতে পারে এরূপ স্তন্যপায়ী পশু ও পাখীর শতকরা ৯৫টি মানুষের হাতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আফ্রিকায় দাঁতের জন্য বেপরোয়া ভাবে যে পরিমাণ হস্তী ধ্বংস হইয়াছে তাহার তুলনা মেলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের আগমনের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সমস্ত গজদন্তের ব্যবসায় ছিল আরব কারবারীদের একচেটিয়া। সামান্য এক টুকরা মোটা কাপড়ের বিনিময়ে আরব ব্যবসায়ী বিশ বা ত্রিশ পাউণ্ড মূল্যের হস্তিদন্ত ক্রয় করিত। ইহাকে বিনিময়-প্রথা না বলিয়া লুণ্ঠন বা অনুরূপ অন্য কোন নাম দেওয়া চলে। কিন্তু দেশীয় লোকদিগের উপর আর কোন অত্যাচার হইত না। ইউরোপীয়েরা আরবদিগের নিকট হইতে রাইফেলের বিনিময়ে গজদন্ত ক্রয় করিতে লাগিল এবং বিনিময়ে আরও বেশী পরিমাণ মাল চাহিল। ব্যবসারও বাড়তির পথে চলিল।

বন্দুকের সাহায্যে আরবেরা আদিবাসীদিগের গজদন্তের আড়তসমূহ দখল করিয়া লইতে লাগিল এবং সেগুলির মালিক-গণকে কুলীর কাজ করিতে বাধ্য করিল। দীর্ঘ সারি বাঁধিয়া ক্রীতদাসের দল গজদন্তের বোঝা বহিয়া জাঞ্জিবারের বাজারে উপস্থিত হইতে লাগিল। যখন ব্যবসায়ের খুব মরশুম তখন বৎসরে ১,৫০,০০০ ক্রীতদাস এই মূল্যবান পণ্য বহন করিত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ জন প্রাণ লইয়া সমুদ্রোপ-কূলের বন্দরে পৌছিত।

আরবীয়গণের হাত হইতে বাণিজ্য চলিয়া গেলে ইউ-রোপীয় মূলধনের সাহায্যে হাতীর ধ্বংসলীলা চলিল। গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া, সকল শ্রেণীর হস্তীহত্যা নির্ব্বিচারে চলিয়াছে। আজ উৎকৃষ্ট হাতী লোপ পাইয়াছে, পূর্ণ-বয়স্ক হইবার পূর্ব্বেই হাতীগুলিকে মারিয়া ফেলা হইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ৮০।৯০ পাউণ্ড ওজনের হাতীর দাঁত পাওয়া যাইত; এখন ৫৫ পাউণ্ড ওজনের দাঁত পাইলে যথেষ্ট মনে করা হয়। বর্ত্তমানে বেলজিয়াম কঙ্গো ও উগাণ্ডা হইতে গজদন্ত রপ্তানী হইয়া থাকে। হস্তিযূথের অবশিষ্টাংশ পলাইয়া দুর্গম অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু ধ্বংসের বিরাম নাই।

উট পাখীর উৎকৃষ্ট পালকের চাহিদা ইউরোপের বাজারে খুবই প্রবল। অবশ্য ইহা বিলাসের সামগ্রী মাত্র। হাজার হাজার পাখীকে কেবলমাত্র পাখার লোভে মারা হইতে লাগিল। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা গেল উত্তর-আফ্রিকা অষ্ট্রিচ্ বা উটপাখীশূন্য হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রেও মানুষের বিলাস-সামগ্রী যোগাইতে গিয়া অনেক পাখীর বংশ লোপ পাইয়াছে।

মহাসমুদ্রের জানোয়ারদের উপরেও এই ধ্বংসলীলা অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। জাতিতে জাতিতে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও জাপান উত্তর ও দক্ষিণ মেরু-মহাসাগরে ব্যাপক ভাবে সীল হত্যা করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকেই দেখা গেল, ইহা-দের বংশ এত কমিয়া গিয়াছে যে, দক্ষিণ-মেরু মহাসাগরে সীল শিকার আর লাভজনক নহে। কয়েক বৎসরেই ফক্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের সীল-বংশ লোপ পাইল। নরওয়ের সীল-শিকারীগণ

গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব্ব-উপকূলের সীল-বংশ নিপাত করিল। এই সকল সীল গ্রীণল্যাণ্ডের অধিবাসিগণের জীবিকার অবলম্বন ছিল, এই কার্য্যের ফলে তাহারা নিঃস্ব হইল।

বহু বৎসর ধরিয়া আলাস্কার অদূরবর্ত্তী প্রিবিলফ দ্বীপ সীলদের বাচ্চা জন্মদানের স্থান ছিল। এই দ্বীপ ছিল আমেরিকানদের অধিকারে। গভীর জলেও সীলগুলিকে নির্ব্বিচারে শিকার করার দরুন ফল এই দাঁড়াইল যে, যেখানে বৎসরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ সীল বাচ্চা দিতে আসিত, ১৯১১ সনে সেখানে উহাদের সংখ্যা কমিয়া এক লক্ষ পঁচিশ হাজারে পৌঁছিয়াছে। যাহাতে সীল-বংশ একেবারে ধ্বংস না হয় এজন্য সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে সীল শিকার সম্বন্ধে এক চুক্তি হইয়াছে, ইহার বলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র শতকরা সত্তরটি সীল চর্ম্মের অধিকারী হইয়াছে।

কিন্তু সমুদ্রের বিরাট জীব তিমি-মৎস্য রক্ষার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। যখন নৌকায় করিয়া তিমি শিকার করা হইত তখন তিমিকুলের একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না। এখন তিমি শিকারের জন্য ২০,০০০ টনের ভাসমান কারখানা তৈয়ার হইয়াছে। এই সকল জাহাজে তিমি শিকারের জন্য কলের কামান ব্যবহৃত হয়। কাজে কাজেই তিমি শিকার ব্যাপক তিমি-হত্যায় পরিণত হইয়াছে।

গ্রীনল্যাণ্ড ও উত্তর-সাগর হইতে তিমি লোপ পাইলে শিকারীরা দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ঝুঁকিল এবং বৎসরে ২০,০০০ হাজারের বেশী তিমি শিকার করিতে লাগিল। সকল রাষ্ট্র মিলিয়া ধ্বংসের মাত্রা কমাইতেও চেষ্টা করিল। কিন্তু জাপানীরা নবাগত বলিয়া কোন চুক্তিতে রাজী হইল না, কেননা তাহাদের তিমির তেলের (whale oil) চাহিদা এত বেশী যে, যাহাতে তেলের পরিমাণ বার্ষিক ২৫,০০০ টন হইতে চতুর্গুণ বাড়ে সেই চেষ্টায় শিকারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। সুতরাং ধ্বংসের হাত হইতে তিমির রক্ষা পাওয়ার আশা কম। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তিমি বংশ আরও কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বিরাজমান থাকিবে আশা করা যায়।

মানুষের একটি প্রধান খাদ্য মাছ সম্বন্ধেও এই ধ্বংসলীলা বেপরোয়া চলিতেছে।

উত্তর-সাগরে, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের চতুর্দ্দিকের সমুদ্রে এবং উত্তর-জাপানের সমুদ্রে প্রচুর পরিমাণে হেরিং ও কড মাছ পাওয়া যায়। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার সহিত তাল রাখিয়া এই মৎস্য সরবরাহের পরিমাণও বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যে ভাবে ষ্টীমারের সাহায্যে প্রচুর মাছ ধরা হইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় ধনতান্ত্রিক বড় ব্যবসায়ের চাপে পড়িয়া এই দুইটি মৎস্যও দুর্লভ হইয়া পড়িবে।

বেপরোয়া মৎস্য শিকারের জন্য নদীর মাছও লোপ পাইতে বসিয়াছে। ছোট, বড় ডিমওয়ালা সকল রকম মাছ মারা হয় বলিয়াও মৎস্য জাতি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। এই বিষয় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার খুব প্রয়োজন আছে। বাংলা-সরকার এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়াই আপাততঃ কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট বেশী সজাগ বলিয়া মনে হয়।

আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে নদীর মধ্যে বহু পরিমাণে স্যালমন মাছ ধরা হয়। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম বলিয়া মৎস্য-রক্ষার জন্য ক্যানিং শিল্প কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নদীর মুখেই এই কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানেই জালধারা লক্ষ লক্ষ মাছ ধরা হয়। কিন্তু অনেক নদীর মাছ, বিশেষতঃ সেক্রামেণ্টো নদীর মাছ, ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হইয়াছে, অন্যত্র শতকরা ৮০।৯০ ভাগ কমিয়াছে। মাছ এত হ্রাস পাইলেও মৎস্যশিকার-প্রতিষ্ঠানগুলি কোনরূপে মাছ ধরা কমাইতে রাজী নয়। পূর্ব্বে নিউ ইয়র্কের উত্তর অংশে আটলাণ্টিক মহাসাগরগামী ছাব্বিশটি নদীতে প্রচুর স্যালমন মাছ পাওয়া যাইত, কিন্তু বেপরোয়া মাছ ধরার ফলে এখন মাত্র একটি নদীতে স্যালমন পাওয়া যায়। ইহা হইতেও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ কারবারীগণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে নারাজ। মানুষের অতি লাভের আশা এতই দুর্নিবার।

বাংলা দেশেও মৎস্য-সংরক্ষণ ও মৎস্যের চাষের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করিলে মৎস্যাহারী বাঙালীর ভবিষ্যতে খাদ্য বিষয়ক এক গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে।

পুশ্‌কিনের প্রতি

শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজো শৃঙ্খলিত রাত্রি বক্ষে আনে তোমার কবিতা।
এটিয়ারে নিরানন্দ সঙ্গীহীন গভীর বার্ত্তায়
মন যার বন্দীসম প্রতীক্ষিত মৃত্যু-বন্দনায়;
সে তোমারে খুঁজে পায়, ভিন্নতীর্থে চিরজীবী মিতা।
সাইবেরিয়ার স্তব্ধ তুষারেও খুঁজেছো সবিতা।
আশায় আকাশ তব হেসেছিলো প্রাণ-অঙ্গীকারে;
বুঝি আছে সর্ব্বোত্তম কোহিনুর শ্মশানে, অঙ্গারে।
নিদ্রাহীন অনন্তসাধন তাই সুস্থ সামগীতা।
তোমার সম্মুখে পথ, সূর্য্যস্নাতা প্রেয়সী বনিতা;
কত অন্ধকার রাত ছিঁড়ে তারে দিয়েছো প্রভাত।
পার্থের অবশ হাতে হেসে তুমি মিলায়েছ হাত;
নিরাশা ক্লীবের মন্ত্র; পৌরুষের সে নহে সংহিতা।
শৃঙ্খলিত দুই হস্তে তোমারেই করি প্রণিপাত;
যদিও এ মৃত্যু দেশে আজো জ্বলে দুর্ভাগ্যের চিতা।

বিপন্ন বাংলা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পঞ্জাবের একজন নামজাদা সাম্প্রদায়িক কিছু দিন পূর্ব্বে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের বাহিরে, বিশেষতঃ মার্কিনে, ইণ্ডিয়ার অধিবাসীগণকে "হিন্দু" নামে অভিহিত করা হয়।

ফ্রান্সের অধিবাসীকে লোকে ফরাসী, ইংলণ্ডের অধিবাসীকে ইংরেজ বলে। একই নিয়ম-অনুসারে ইণ্ডিয়ার অধিবাসীকে লোকে হিন্দুই বলিবে।

হিন্দুস্থান অথবা হিন্দ্‌ হইতেই Ind এবং India হইয়াছে। মহাভারতের যুগে এবং তাহারও পূর্ব্বে এ দেশ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত। এখনও সে নাম আছে।

ছয় সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের যে সভ্যতার পরিচয় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাই তাহা অপূর্ব্ব। সিন্ধু-নদতীরে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতা দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল।

সম্ভবতঃ হিন্দ্‌ সিন্ধুর অপভ্রংশ। আবেস্তাতেও সিন্ধু হিন্দু এবং সরযূ হরয়ু হইয়াছে।

ভারত-মহাসাগরের অগাধ জলরাশি যে উপদ্বীপের তিন দিক বেষ্টন করিয়া আছে এই সিন্ধু-সভ্যতা যদি সেই বৃহৎ ভূখণ্ডের নামকরণ করিয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

কেবল কোন ধর্ম্মবিশেষের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতি গঠিত হয় নাই। ভৌগোলিক সীমা, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, দেশাত্মবোধ এবং ইতিহাসের অবিচ্ছিন্ন ধারা—এইগুলিকে উপকরণ করিয়াই জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু নাম সম্পর্কিত উপরি-উক্ত ব্যাপারটি কৌতুকপ্রদ। কাহিনীটি কৌতুককর হইয়াই থাকিত যদি-না-কি উহার পিছনে যে মনোভাব রহিয়াছে সে মনোভাব অন্যের পক্ষে দুঃখ ও অনিষ্টের কারণ হইত।

সে মনোভাব এই।—তুমি আমি এক দেশে বাস করি বটে আমরা এক নই, তোমা হইতে আমি ভিন্ন, তুমি পর, আমার সহিত অসম্পর্কিত, তোমার নাম লইতে আমি লজ্জিত হই। এই মনোভাবের উপরই পাকিস্থানী আদর্শের প্রতিষ্ঠা।

নাৎসীবাদের মূলে ইহুদী-বিদ্বেষ। পাকিস্থানী মনোভাবও সেইরূপ হিন্দুর সহিত অনাত্মীয়তা-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেম ধীরে ধীরে কাজ করে, বিষের মত বিদ্বেষও অতি সহজে সঞ্চারিত হয়।

বিগত ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনের কিংস-ওয়ে হলে মহম্মদ আলি জিন্না এক বক্তৃতায় পাকিস্থানের ব্যাখ্যা-কালে বলেন, "ইতিহাস-অভিজ্ঞ লোকমাত্রই জানেন, আমাদের বরেণ্য বীরবৃন্দ, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, আমাদের সঙ্গীত, আমাদের স্থাপত্য, আমাদের বিধি-বিধান, আমাদের সামাজিক জীবন একান্ত পৃথক এবং স্বতন্ত্র।"*

তিনি আরো বলেন, "ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আমাদেরই বাসভূমি (our homeland)। সেখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—শতকরা সত্তর জন। সেই উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্বে আমরা পৃথক রাষ্ট্র চাই। সেখানে জীবন-সম্পর্কে আমরা আমাদের নিজেদের ধারণা অনুসারে বাস করিব।"†

কোন দেশের সীমা ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এ কথা ইতিহাসে লেখে না।—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কথা থাক্‌ উত্তর-পূর্ব্বের কথাই এখন বলি। বাংলা এই উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের মধ্যেই পড়ে।

বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উপর দিয়া যে ভীষণ ঝড় বহিয়া গেল ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। পঞ্চাশের মন্বন্তর পার হইতে না হইতেই কলিকাতায় তিপ্পান্ন সালের ভাদ্র-আশ্বিনের হত্যালীলা সুরু হইল। নোয়াখালির নৃশংসতা সে হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করিয়া দিল।

বাঙ্গালী আমরা বর্ত্তমানে যে-ভাবে আছি তাহাকে বাঁচিয়া থাকা বলা চলে না। এরূপ প্রাণধারণ জীবন্মৃত্যুর নামান্তর। আমাদের সামাজিক জীবন বিধ্বস্ত, রাষ্ট্রজীবন পরহস্তগত, অর্থনৈতিক জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ। আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন, গৃহ বিপন্ন, প্রাণ বিপন্ন। যে স্বাধীনতার সংগ্রামে বার বার আত্মবলি দিতে আমরা পরাঙ্মুখ হই নাই সেই স্বাধীনতা আজ সুদূর-পরাহত। যে বঙ্গ-সংস্কৃতি একদিন বিশ্বের শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়াছে সেই সংস্কৃতি আজ বিলুব্ধের বর্ব্বর আঘাতে হতশ্রী।

বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের ভাষা কি বিভিন্ন? বাংলা ছাড়া বাঙালী মুসলমান অন্য কোন্‌ ভাষায় কথা কয়? উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উর্দ্দুভাষী স্বধর্ম্মীদের কথা পূর্ব্ববঙ্গের পাকিস্থানী বীরেরা কি বুঝিতে পারে?

ওস্তাদেরা কোন্‌ সুরে কোন্‌ সঙ্গীত গায়? বাগেশ্রী, ভৈরবী কাহাদের রাগিণী? ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে কলাবিৎগণ ধ্রুপদ গায়ককেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করে। বাঙালী মুসলমানেরাও যে সুরে গান গায় তাহা হিন্দু-সঙ্গীত হইতে ভিন্ন নয়।

যে স্থাপত্যের গর্ব্ব বাঙালী করিতে পারে তাহা হিন্দু স্থাপত্য। তমলুকের বর্গভীমার মন্দিরে সে স্থাপত্যের নিদর্শন আছে। পূর্ব্বাঞ্চলের পাকিস্থানীরা তাজমহলের গর্ব্ব করিবে কি? তাজমহলও ইস্‌লামিক স্থাপত্যের নিদর্শন নহে, হিন্দু-সারাসেনিক স্থাপত্যের মিশ্রণ।

* "It is well-known to any student of history that our heroes, our culture, our language, our music, our architecture, our jurisprudence, our social life are absolutely distinct and different."

† "In the north-west and north-east zones of India, which are our homeland and where we are in a majority of 70 per cent. we say we want a separate state of our own. There we can live according to our own notions of life."

সামাজিক জীবন বলিতে যদি বহুপত্নীকত্ব, বিবাহচ্ছেদ, নারীর আত্মাকে অস্বীকার, পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বুঝায়, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে আমরা জানি, পল্লীর গার্হস্থ্য জীবন-সম্পর্কে বাঙালী মুসলমান ও বাঙালী হিন্দুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

বাঙালী মুসলমান যদি আরব-তুর্কি বীরের গর্ব্ব করে সে গর্ব্ব মিথ্যা গর্ব্বই হইবে।

বাংলা কাহাদের বাসভূমি? বঙ্কিমচন্দ্র ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত আমরাও বলি, বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙালী নিজের ইতিহাস স্মরণ করে না বলিয়া বাঙালী হিন্দু স্বদেশে পর-দেশী হইবার উপক্রম করিয়াছে। সে আত্ম-বিস্মৃত বলিয়াই বিদেশে পাকিস্থানী প্রচারকেরা অনায়াসে বলিতে পারে—The north-east zone which is our homeland…।

১

শুধু ঐতিহাসিক কাল ধরিলে বাঙালীর দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়, সে তুলনায় ইংরেজ বা ফরাসী মাত্র সেই দিনকার জাতি। বাঙালীর ঐতিহ্য আরও চারি সহস্র বর্ষের প্রাচীন।

পুরাণের কথা গ্রহণ করিতে অনেকের হয়ত ঐতিহাসিক সংস্কারে বাধে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জয়স্বাল পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান করিয়াছেন। পুরাণবিৎ গিরীন্দ্রশেখর বসু পৌরাণিক রাজবংশের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। জাতির জীবনে ইতিহাস অপেক্ষা ঐতিহ্যের গুরুত্ব অল্প নয়। মনের দিক দিয়া ঐতিহাসিক তথ্যের অপেক্ষা ঐতিহ্যের সত্য বলবত্তর।

সুতপাপুত্র বলি অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এই তিন প্রদেশ সুতল নামে অভিহিত হইত। সুতল পাতালের অন্তর্গত। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩৪৫৭ অব্দে বলি রাজত্ব করিতেন।•

ভগীরথ (খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৮৩৩) ভূতলে যে গঙ্গা আনয়ন করেন তাহার নাম ভাগীরথী। বর্ণাঢ্য পৌরাণিক বর্ণনার অর্থ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়।—গঙ্গার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ-ভূমে প্রবাহিত করিতে সগর নিজ পুত্রের কর্তৃত্বাধীনে ষষ্টি সহস্র কর্ম্মী ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। জ্বর-অধ্যুষিত নিম্নভূমিতে কাজ করিতে ষাট হাজার লোকই প্রাণ হারায়। সেই বংশের উত্তর পুরুষ ভগীরথ সগরের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করেন।—ইহা নিছক গল্প নয়। বাংলার নদ-নদী বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া Sir William Willcocks-এর মত খ্যাতনামা মিশরে-অর্জ্জিতযশা ইঞ্জিনীয়র বলিয়া গিয়াছেন, ভাগীরথী খনিত খাল, স্বাভাবিক স্রোতস্বতী নয়। ভাগীরথীর ঐতিহ্য প্রমাণ করে অতি প্রাচীনকালে যান্ত্রিক প্রতিভায় বাঙালী অগ্রণী ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ এবং পুণ্ড্রনগরের কথা এবং ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গগণের কথা পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারতেও পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং বঙ্গ জাতির বৃত্তান্ত পাই। বৈদিক সাহিত্যে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ব্রাত্য পণ্ডিতগণের উল্লেখ আছে। পতিত হইলেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য অল্প ছিল না।

পুরাণ হইতে ইতিহাসে আসিলে দেখি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে প্রতাপশালী গঙ্গারিডী এবং প্রাশিয়্যগণ (গঙ্গারাষ্ট্রী ও প্রাচ্যগণ) বাধাদান-কল্পে সজ্জবদ্ধ হইলে সেকেন্দরকে বিপাশা তীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় সেকেন্দরের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই এক পরাক্রান্ত সুসভ্য জাতি গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। তাহারা বর্ত্তমান বাঙালীর পূর্ব্বপুরুষ।*

কার্টিয়াস, প্লুটার্ক, সোলিনাস, ডিয়োডোরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক-লাতিন লেখকগণের বিবরণ হইতেও জানিতে পারি, সমগ্র বাংলার ব-দ্বীপে সে দেশের এক পরাক্রান্ত জাতি খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাস করিত। রাষ্ট্রজীবনে সুশৃঙ্খল এই প্রাচীন বাঙালী জাতির সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত চতুঃসহস্র হস্তী-সৈন্য ছিল। ইহাদের রাজধানী ছিল গাঙ্গে; বন্দর ছিল তাম্রলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তি হইতে বহির্গত হইয়া বঙ্গের বাণিজ্যতরী ব্রহ্ম-দেশ, মলয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, বালি এবং যবদ্বীপে গমন করিত।—বাংলার নৌ-বাহিনী ইতিহাস-বিখ্যাত।

বাংলার এক রাজপুত্র বিজয়সিংহ ভারতের দক্ষিণে তালী-নারিকেল-কুঞ্জশোভিত দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। সিংহল নামের সহিত সে স্মৃতি জড়িত।

মলয়ে-উৎকীর্ণ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর এক শিলালিপিতে রক্তমৃত্তিকা অর্থাৎ রাঙামাটির অধিবাসী মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নাম পাই।

বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গেই অবস্থিত ছিল। বঙ্গের সন্তান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে জ্ঞানবর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করেন। চীন রাজ্যে বাঙালী পণ্ডিত এবং বাঙালী বণিকের গতিবিধি ছিল।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনেও চতুর্থ শতাব্দীর সমতট স্বাধীন রাজ্য ছিল। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা হইয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

অষ্টম শতাব্দীর বাংলায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। মাৎস্যন্যায়-প্রপীড়িত বাংলা দেশের প্রজাগণ নিজেদের মধ্য হইতে এক নেতৃত্বগুণভূষিত পুরুষকে শাসক নির্ব্বাচিত করে। তাঁহার নাম গোপাল। পাল বংশের আদিপুরুষ গোপাল রাজা হইয়া সমগ্র বাংলায় শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আজি হইতে দ্বাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে জাতীয় স্বার্থের বৃহত্তর

• পুরাণ-প্রবেশ, গিরীন্দ্রশেখর বসু

* *History of Bengal*, Vol. I, Ed. R. C. Majumdar. Chap. I and II, by Prof. H. C. Raychaudhuri

প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জনে বাঙালী কাতর হয় নাই। অষ্টম শতাব্দীর বাংলায় যাহা ঘটিয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপেও তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব হয় নাই।

৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া তাঁহার পুত্র ধর্মপাল উত্তর-ভারতে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আরব পরিব্রাজক সুলেমানের ৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বৃত্তান্তে আছে, ধর্মপালের পুত্র রাজা দেবপাল পঞ্চাশ সহস্র হস্তী-সৈন্য লইয়া বিজয়-অভিযানে যাত্রা করিতেন।*

সেন-বংশের বিজয় সেনের (খ্রীঃ ১০৯৫-১১৫৮) রাজ্য মিথিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার পুত্র বল্লালসেনের নাম নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের সহিত জড়িত। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা জয়দেব, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন এবং হলায়ুধ অলঙ্কৃত করিতেন। যৌবনে বঙ্গের সর্ব্ব সীমান্তে এবং সীমান্ত হইতে বহু দূরে বিজয় অভিযান পরিচালনা করিয়া তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করেন। বার্দ্ধক্যে তাঁহার শাসনে কোন সূত্রে দৌর্ব্বল্য প্রবেশ করে। সেই সুযোগে ভাগ্যান্বেষী তুর্ক যোদ্ধা মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি অশ্বারোহী সৈন্য-সহ শৈল-অরণ্য-সঙ্কুল ঝাড়খণ্ডের জনবিরল পথের মধ্য দিয়া গোপনে সহসা নবদ্বীপে প্রবেশ করে। এই আকস্মিক বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করেন এবং তথায় রাজত্ব করিতে থাকেন। বারম্বার লুণ্ঠনে নবদ্বীপ জনশূন্য হইয়া পড়ে। তবুও পূর্ণ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের এই প্রাচীন নগরী তুর্কি অভিযান প্রহত করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ পর্য্যন্ত সেনবংশকে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। তাহার পর বঙ্গের ইতিহাসে সেনবংশের নাম লুপ্ত হয়।

ইহাই হইল বাঙালীর দুই সহস্র বৎসরের অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার পিছনে স্মরণাতীত কালের ঐতিহ্য বর্ত্তমান। এই ইতিহাস গৌরবের, ইহাতে লজ্জার কিছু নাই। যে প্রাচীন জাতি একদা প্রতাপে, জনবলে, সামরিক ঐশ্বর্য্যে এবং রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলায় দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, যে জাতি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে সার্ব্বজনীন কল্যাণ-কল্পে ব্যক্তিস্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া প্রজাগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, যে জাতির বৌদ্ধ শাসক ভিন্নধর্ম্মী প্রজার উপর অত্যাচার করিত না এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী রাজারা বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রজার প্রতি সমভাবে আচরণ করিত, যে জাতি দূরদূরান্তরে সমুদ্রযাত্রা করিত, যে জাতি প্রশান্ত এবং ভারত-মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, যে জাতি জ্ঞানবর্ত্তিকা-হস্তে তিব্বত চীন জাপান শ্যাম কাম্বোজে সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছিল, যে জাতির বাণিজ্যতরী দেশ-বিদেশ হইতে সমৃদ্ধির বহন করিয়া আনিত, যে জাতির তন্তে প্রস্তুত অতি-সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে সর্ব্বকালের এবং সকল মহাদেশের পরাক্রান্ত নৃপতিগণ গৌরব বোধ করিত, অতি দুর্দ্দশার দিনেও যে জাতির প্রতিভা নব নব বিষয়ে স্ফুরিত হইয়াছে, যে জাতির মধ্যে বারম্বার মহামানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে জাতির সাধনা ব্যর্থ হইবে না।

২

ইহার পর বাংলার ইতিহাসে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহাকে মুসলমানী আমল বলা হয়। সপ্তগ্রাম ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে, পূর্ব্ববঙ্গ ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দক্ষিণ-বঙ্গ ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজিত হয়। মোটামুটি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই চারি শত বর্ষ মুসলমানী আমল।

ইতিহাসের দুই হাজার বৎসর অথবা ঐতিহ্যের চতুঃসহস্র বর্ষের তুলনায় মুসলমানী আমলের মাত্র চারি শতাব্দী কতটুকু কাল? এই চারি শত এবং কোথাও কোথাও সাড়ে চারি শত বর্ষের শাসনকে বিধর্ম্মীর শাসন বলা যাইতে পারে, বিদেশী শাসন বলা চলে না। কেন না এইকালে যাহারা রাজত্ব করিয়াছে তুর্ক-মোগলের বংশধর হইলেও তাহারা এই দেশের অধিবাসী। পূর্ব্ববঙ্গে আজ ইসলামধর্ম্মীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তুর্ক অভিযানের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য পড়ে তাহা এই—১২০২ খ্রীষ্টাব্দের নবদ্বীপ আক্রমণেই পাঠান আগমনের সূচনা বটে, কিন্তু নবদ্বীপে নয় লক্ষ্মণাবতীতে বখতিয়ার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। "বখতিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী অধিকৃত হইলে সপাদ শতবর্ষ কাল সেন বংশীয় রাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে রাজ্যাধিকার ভোগ করিয়াছিলেন।"*

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অধিকৃত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান হইল কেন? বলিয়াছি বাংলায় তুর্ক-মোগলের শাসন-কাহিনী বাংলার পরাধীনতার ইতিহাস নহে। তুর্কেরা বাংলায় বিদেশী রহিল না। সত্য। কিন্তু ইতিহাসের ধারা একান্তভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। হিন্দু বৌদ্ধ আমলে বাংলায় রাষ্ট্রে ও সমাজে বিচ্ছেদ ছিল না। মুসলমানী শাসনে সমাজ স্বাধীন রহিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্র বিধর্ম্মীর করায়ত্ত হইল। রাষ্ট্রে ভিন্নধর্ম্মীর প্রাধান্যে সমাজের উপরও আঘাত পড়িল। রাষ্ট্রে ও সমাজে একটা সংঘর্ষ বাধিয়াই রহিল। যে জাতি সম-উপাদানে গঠিত ছিল তাহা বিষম হইয়া উঠিল। প্রথম দিকে যাহা ঘটিল তাহা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিধর্ম্মীর সহিত যুদ্ধ মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ, মুসলমান সেনা অবসর পাইলেই হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিত। কখনও সন্ধি স্থাপিত হইত না, সুতরাং মুসলমানরাজ্যের সীমান্তস্থিত হিন্দুরাজ্যে শান্তি ছিল না। মুসলমানগণ হিন্দুরাজ্যলুণ্ঠন অন্যায় মনে করিতেন না। বিশেষতঃ তুরুষ্ক জাতীয় মুসলমান ধ্বংসে ও লুণ্ঠনে বিশেষ পারদর্শী। মুসলমান রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হিন্দু রাজ্যের গ্রাম ও নগরগুলি অচিরে ধ্বংস হইত।"

এমনি করিয়া মুসলমান রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিল। রাজ্য

---

* *History of Bengal*, Vol. I, Chap. IV, V, VI by R. C. Majumdar.

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলার ইতিহাস", ২য় ভাগ, পৃ. ১২

বিস্তারের সঙ্গে ধর্মবিস্তারেও একটা যোগ রহিয়া গেল। বিদেশ হইতে ভাগ্যান্বেষণে আসিয়া যাহারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিল তাহাদের বংশবৃদ্ধির জন্য যে শাসকবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহা নয়, ধর্মান্তরীকরণ এবং ধর্মান্তরগ্রহণ ইহার মুখ্য কারণ।

বাংলাদেশ নানা ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইল। হিন্দু রাজা ও জমিদারগণও অনেক স্থানে প্রায় স্বাধীন হইয়া রহিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা গণেশ পরাক্রান্ত হইয়া গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনেকে তাঁহাকে দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত অভিন্ন মনে করেন। রাজা গণেশের নাম বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"রাজা গণেশের সময় হইতে গৌড়ে ও বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত চর্চ্চা আরব্ধ হইয়া ছিল এবং বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা হইয়াছিল। এই সকল কারণের জন্য গণেশ বাংলার ইতিহাসে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

"মুসলমান-বিজিত ভারতে বহুকাল পরে একজন হিন্দু রাজা পরাক্রান্ত হইয়া উঠায় গৌড়দেশের মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড় ও বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর জনসমাজ মুসলমান পীর ও ফকীরগণের অত্যাচারের ভয়ে, মুসলমান ধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মের কঠোরতার অভাব দেখিয়া এবং মুসলমান-শাসিত রাজ্যে উচ্চজাতীয় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ইতর শ্রেণীর ব্যক্তিগণের অধিকতর সমাদর দেখিয়া মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। এই সকল নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সমাজে রাজা অপেক্ষা পীর ফকীর মুরসিদ প্রভৃতি উপাধিধারী ধর্ম্মযাজকগণের প্রভাব অত্যন্ত অধিক ছিল।"*

অতএব উদ্ধৃতি হইতে পাই, নিম্নশ্রেণীর জনসমাজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কারণ—(১) অত্যাচারের ভয়, (২) রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা, (৩) প্রলোভন এবং (৪) ইসলামে হিন্দু ধর্ম্মের কঠোরতার অভাব। এই সঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট ঘটনাটি অজ্ঞাত নহে।

আরও এক-শ বছর পরের কথা। চৈতন্যদেবের কাল। হোসেন শাহ্ তখন গৌড়ের অধিপতি।

"জয়ানন্দ রচিত চৈতন্যমঙ্গলানুসারে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্ এক সময় শুনিয়াছিলেন যে প্রবাদানুসারে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে এবং গৌড়নগর অধিকার করিবে।" "বাদশাহের আদেশে পিরুল্যাগ্রামনিবাসী মুসলমানগণ নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল।"

"নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে।
ঘরদ্বার লোটে তার লৌহপাশে বান্ধে।
পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নব-দ্বীপের ব্রাহ্মণ।"†

সে কালেও বাঙালী প্রতিভা যে খর্ব্ব হয় নাই, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তাহার প্রমাণ। বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শন প্রমাণ করে, রাষ্ট্র হারাইয়াও হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ইসলামের প্লাবন হইতে বাঙালীকে রক্ষা করিয়াছে।

"দীনেশচন্দ্র সেনের মতানুসারে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা দেশের একটি সামাজিক সমস্যা পূরণ হইয়াছিল।...নব প্রচলিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম বিচার ছিল না। পূর্ব্বে সমাজভ্রষ্ট ও জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে আশ্রয় লাভ করিত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে এই সকল নরনারী নিরুপায় হইয়াছিল। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা দেশে নেড়া-নেড়ী নামে পরিচিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই সকল ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণকে নবীন বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।"†

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে এই অধঃপতিত বৌদ্ধগণ হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দলে দলে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলিম সংখ্যাধিক্যের ইহাও এক কারণ।

ব্রিটিশ যুগে একদা ইংরেজী-শিক্ষিতদের মধ্যে ক্রীশ্চান হইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ানিটির সেই গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। মুসলমানী আমলেও সমাজহারা বৌদ্ধগণকে আপনার আশ্রয়ে টানিয়া লইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দু সমাজকে ইসলামের প্লাবন হইতে রক্ষা করে।

পরধর্ম্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার দুটি মাত্র উপায় আছে। এক একান্ত সংরক্ষণশীলতা যাহার কঠিন আচ্ছাদন আঘাতকে প্রহত করিবার সামর্থ্য দেয়। আর-এক অতি উদারতা যাহার বলে নিজেদের মধ্যে সকল বিভেদ লুপ্ত হইয়া সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বাঙালী আত্মরক্ষার দুই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল। (১) তাহার সামাজিক কঠোরতা, বাধ্যতামূলক বিধি-নিষেধ এই রক্ষণশীলতার রক্ষাকবচ। (২) বৈষ্ণবের সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি এবং জাতিভেদবিলোপ এই উদারনীতির অপূর্ব্ব উদাহরণ।

মোগল যুগে বাংলার রাষ্ট্র ক্রমেই ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের অন্তর্বিরোধ ঘুচিল না। সমাজের গতি স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী হইয়াই রহিল।

পরধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা সেমিটিক জাতির একটি লক্ষণ। সেমিটিক আরবেই ইসলামের উদ্ভব। সেমিটিক না হইলেও

* বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ (১৩২৪), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

† "বাঙ্গালার ইতিহাস", পৃ. ৩০৭

এই ধর্ম গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেশের নবদীক্ষিত মুসলমানেরা সেমিটিক অসহিষ্ণুতার অধিকারী হইল। বল-পূর্ব্বক ধর্মান্তরীকরণ, বিধর্ম্মী-নিপীড়ন, স্বধর্ম্মীর প্রতি আত্যন্তিক পক্ষপাতিত্ব, দেবমন্দির-ধ্বংস প্রভৃতি এই অসহিষ্ণুতারই বিভিন্ন প্রকাশ।

আর্য্য হিন্দু ভাবিতে পারে, কোন ধর্ম্মই তুচ্ছ নয়, এক ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের তুলনায় হীন নয়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য আছে। গীতার সহিত বাইবেল এবং কোরাণকেও সে শ্রদ্ধা করিতে পারে। বেদ, আবেস্তা অথবা ত্রিপিটককে কোনরূপ মর্য্যাদা দেওয়া একান্তভাবেই সেমিটিক-মনোভাবাপন্ন মুসলমানের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বিধর্ম্মীর প্রতি বিরূপতাই তাহার স্বভাব।

বঙ্গবিজয়ের অভিযানে যাহারা এ দেশে আসিয়াছিল সন্ধবদ্ধ হইলেও পরিবার-পরিজন-সহ সংখ্যায় তাহারা কয়েক লক্ষ মাত্র। সেই সব তুর্ক-মোগলের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক শতাব্দীতে সমগ্র প্রদেশের জনসংখ্যার অর্দ্ধেক অতিক্রম করিতে পারে না। আদমসুমারীর বিবরণে দেখিতে পাই, মুসলিম কৃষিজীবী সংখ্যাবহুল; প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ ধর্ম্মান্তরিতদেরই বংশধর।

জেলা হিসাবে নোয়াখালি বিশেষভাবে মুসলিম-সংখ্যা-গরিষ্ঠ। পূর্ব্বে এই জেলা যে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুর আবাসস্থল ছিল গ্রামের নামগুলিই তাহার প্রমাণ। মহাত্মার পল্লী-পরিক্রমা উপলক্ষে যে সকল নাম সংবাদপত্রে প্রতি দিন দেখিতে পাই তাহাদের সবগুলিই সংস্কৃত; আর্বী, ফার্সী বা উর্দু নাম এ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করি নাই। পল্লীবাসীরা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল বলিয়া গ্রামের হিন্দু নামই রহিয়া গিয়াছে। শুধু জনসাধারণ তুর্ক-মোগলের আমলে ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সামাজিক ভাবে নিপীড়িত হিন্দু মোগল-যুগেও অল্প চেষ্টা করে নাই। সে সব বৃত্তান্ত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী। প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, সীতারাম রায়ের নাম বাঙালী চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের একত্র-বাস একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। ধর্ম্মবিদ্বেষ অতিক্রম করিয়া পরস্পরের প্রতি সহজ মানবিক সহানুভূতি ধীরে ধীরে জয়ী হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এ দেশকে জন্মভূমি বলিয়া, প্রতিবেশীকে বন্ধু বলিয়া এবং একই অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পরস্পরকে সমসুখদুঃখ-ভাগী বলিয়া মুসলমানেরা ভাবিতে শিখিয়াছিল।

এইরূপ মনোভাবের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শদাতা এবং পারিষদবর্গের চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার জীবন ও রাজত্বের অবসান হইল।

৩

রঙ্গের রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন হইল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল। যাহারা রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল এবং যাহারা সে অধিকারে বঞ্চিত ছিল তাহারা উভয়েই বিদেশী শাসনের অধীন হইল। পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ হইয়া হিন্দু-মুসলমানের চারি শত বৎসরের বিভেদ চূর্ণ হইয়া গেল।

পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পরে এই বিদেশী শাসন-পাশ হইতে নিজেদের মুক্ত করিবার যে যুক্ত চেষ্টা হয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাহাকে 'মিউটিনি' নামে অভিহিত করিয়াছে। সেই যুক্ত অভ্যুত্থান বাহিরে ব্যর্থ হইল বটে, মনের মধ্যে সে বিপ্লবের ক্রিয়া রহিয়া গেল। নীল-বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমানের এইরূপ একাত্মতা আর একবার দেখিতে পাই।

বিদেশী শাসক ইহা হইতে একটি শিক্ষালাভ করিল। উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে দেশের লোকের শক্তিবৃদ্ধি হয়। সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিতে গেলে প্রজা-সাধারণের মধ্যে ভেদসৃষ্টিই শাসন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রামমোহন রায়ের সময় হইতে বাঙালী ফরাসী-বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে বিপ্লবের প্রতি এই শ্রদ্ধা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রীর বাণী শিক্ষিত বাঙালী যেমন করিয়া গ্রহণ করিল এশিয়ার অন্য কোন জাতি তেমন করিয়া গ্রহণ করে নাই।

শিক্ষিত বাঙালী বলিতে এখানে বাংলার শিক্ষিত হিন্দুকেই বুঝিতে হইবে। আবহমানকাল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ছিল। যাহারা চাষ-বাস বা হাতের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত তাহারা কোনকালেই শিক্ষা-লাভে ব্যগ্র ছিল না। মুসলিম জনসাধারণ প্রায়শঃ ইহাদের মধ্য হইতেই ধর্ম্মান্তরিত।

অতএব হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে শিক্ষাহীনতা-বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। আজও নাই। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সংখ্যাধিক্য বশতঃ শিক্ষিতের সংখ্যাও অধিক। ব্রিটিশ যুগে গোড়া হইতেই উভয় সম্প্রদায় শিক্ষার সমান সুযোগ পাইয়াছিল। হিন্দু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে, মুসলমান করে নাই।

শাসন-যন্ত্রের সুপরিচালনার জন্য শিক্ষা-বিস্তারে সরকারই শুধু আগ্রহশীল ছিল না, শিক্ষাগ্রহণে মধ্যবিত্ত হিন্দুর ব্যগ্রতা সুবিদিত। সেই উৎসাহে এবং সেই প্রেরণায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই বাঙালী হিন্দু সর্ব্বত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া আসিয়াছে—সরকারী সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে, স্বীয় অর্থে এবং স্বীয় সামর্থ্যে। শিক্ষার জন্য হিন্দু বাঙালীর শতাব্দীব্যাপী বদান্যতার কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। মুসলমান দাতাদের মধ্যে একমাত্র মহম্মদ মহসীন ভিন্ন এ সম্পর্কে নাম করিবার মত কে আছে? আজও অধিকাংশ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিন্দু বাঙালীর অর্থে চলিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে হিন্দুর মনে সুপ্ত রাষ্ট্রচেতনা জাগিয়া উঠিল। দেশাত্মবোধে তাহার মন পরিপূর্ণ হইল। হিন্দু কবি কহিলেন,

দেশের কুকুর ধরি কত মত স্নেহ করি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

পরাধীনতার বেদনায় কাতর কবি বলিলেন,

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?

বিদেশী বণিক বাংলার মসনদ মুসলমান নবাবের হাত হইতেই কাড়িয়া লইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই, সার্দ্ধ-শতাধিক বৎসরের মধ্যে, ছলে-বলে-কৌশলে বিজয়ী ইংরেজের উপর বাংলার মুসলমান কোন দিনই রুষ্ট হয় নাই। তাহার ক্রোধ হিন্দুকেই বার বার সহিতে হইয়াছে। ইংরেজ যাহাকে 'পেট্রিয়টিজ্‌ম' বলে, আমরা যাহাকে দেশপ্রেম আখ্যা দিই, তাহার প্রকাশ উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কচিৎ দেখা গিয়াছে।

নীতি-নির্ণয়ে সাম্রাজ্যবাদীর ইহাতে বড় সুবিধা হইয়াছে। হিন্দু বাঙালীর এই রাষ্ট্র-চেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন কংগ্রেসের আকার ধারণ করিয়া সর্ব্ব-ভারতীয় হইবার উপক্রম করিল, সাম্রাজ্যবাদী তখন সজাগ হইয়া উঠিল।

ইংরেজের নীতি ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ-রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। 'পার্টিশনে'র গোড়ার কথা এই।—বিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতেই ইংরেজ স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী হিন্দুর প্রভাব হইতে হৃত-গৌরব রাজভক্ত মুসলমানকে সরাইয়া লইতে না পারিলে রক্ষা নাই। প্রদেশ বিভাগ করিয়া সুরু হইল কূট-নীতির কৌশলজাল-বিস্তার, কুনারী-কল্পনা-রঞ্জিত সুয়োরাণী দুয়োরাণীর খেলা, favourite wife policy-র প্রয়োগ। বিজেতা ইংরেজের সে আদরে নবাবী-স্বপ্ন-মুদিত-নেত্র রাজ-ভক্তেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বঙ্গদেশেই প্রথম উপ্ত হইল।

তারপর আসিল মর্লি-মিন্টো রিফর্ম। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রবর্তনের জন্য ১৯০৯ সালে বড়লাট মিন্টোর আজ্ঞায় আগা খাঁর নেতৃত্বে এক মুসলিম ডেপুটেশনের অভিনয়—এক command performance অনুষ্ঠিত হইল। বিষবৃক্ষে ফুল ফুটিল।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মে সে নীতি কায়েম হইয়া দেখা দিল। তারপর আসিল র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক নিষ্পত্তি—Communal Award। যিনি প্রধান মন্ত্রিত্বের মোহে জীবনব্যাপী সাধনা ও স্ব-দল ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অনিচ্ছুকের উপর এই নিষ্পত্তির আরোপ তাঁহারই উপযুক্ত। বিষবৃক্ষে ফল ধরিল।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে 'সাদা চেকে' সহি দিতে রাজী হইয়াও মহাত্মা গান্ধী সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলেন না।

দৃঢ় সঙ্কল্পের অভাব উদ্ভূত কংগ্রেসের না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতির ফলে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় রাষ্ট্র-ভিত্তির মূলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। ১৯৩৫ সালের অ্যাক্টে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিষবৃক্ষ মহাক্রমে পরিণত হইল। ক্যাবিনেট মিশনের দৌত্যেও এ নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিম পাকিস্থানের পরিবর্ত্ত-স্বরূপ মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ বি-গ্রুপ ও সি-গ্রুপের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভেদ-মন্ত্রের ফলে সাম্রাজ্যবাদীর প্রশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক পাকিস্থান অর্থাৎ বিভক্ত ভারতের দাবি তীব্রতর হইতে তীব্রতম হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রহণও করিলাম না বর্জ্জনও করিলাম না, ইহার কোন অর্থ নাই। যাহা মন্দ, যাহা অন্যায়, যাহা পাপ তাহার প্রতি নিরপেক্ষ থাকা তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়ারই নামান্তর। যাহা বর্জ্জন করিলাম না তাহা আপনিই গৃহীত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র অশ্বত্থ বীজ কোন ফাঁকে যখন দেউলের ফাটলে আশ্রয়লাভ করে তখন প্রাচীর যদি বলে, "তোমায় গ্রহণও করিব না ত্যাগও করিব না," তাহার ফল এই দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ যখন বাড়িয়া উঠে তখন শিকড়ের সাংঘাতিক বন্ধন হইতে সে আর আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না।

এই নেতিমূলক অদূরদর্শী নীতি দ্বিধা ও দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সমাজ-দেহের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ যে দারুণ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা ইহারই পরিণতি। দ্বিধা-সঞ্জাত বলহীনতার ফলভোগ করিতেই হইবে।

দুর্ব্বলের নিকট বলবানের দাবি বাড়িয়াই চলে। শক্তিহীন সেই বর্দ্ধমান দাবিকে কোন কালেই মিটাইতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদীর প্রশ্রয়ে পাকিস্থানের দাবি অতি উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে। বিদেশী শাসকের এ পক্ষপাত কেন? প্রথমতঃ, সে জানে কাঁটা দিয়াই কাঁটা তুলিতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের পথে হিন্দু কণ্টক-স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ, দেশকে ভালবাসা বিদেশী শাসকের চক্ষে অপরাধ। বিপ্লবী হিন্দু বাঙালীর শাস্তি এই, চিরদিন তাহাকে সংখ্যালঘিষ্ঠরূপে জাতীয়তা-বিরোধী লীগ-শাসনের নিকট মাথা নত করিয়া থাকিতে হইবে।

বিদেশী ইয়োরোপীয় বাংলার জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা ·০১ অর্থাৎ প্রতি দশ সহস্রে একজন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় তাহারা শতকরা দশ জন। অর্থাৎ ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২৫ জন ইয়োরোপীয়।

ইয়োরোপীয় প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্যের কারণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে, এখানে তাহাদের স্বার্থ বিপুল, সম্প্রদায় হিসাবে গুরুত্বও অধিক। সংখ্যানুপাতে তাহাদের মাপা চলিবে না। এ যুক্তি অন্য কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয় কি?

হিন্দু সমাজের দিকে চোখ ফিরাইলে কি দেখি? দেশের সার্ব্বজনিক ক্ষেত্রে হিন্দুর কৃতিত্ব অসাধারণ।

এ সম্প্রদায়ের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী। সম্প্রদায়গত স্বার্থ ভুলিয়া বিদেশী শাসকের হাত হইতে ক্ষমতা অধিকারের প্রবল প্রচেষ্টা যাহারা করিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই হিন্দু। স্বদেশী আন্দোলন হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন হিন্দ্ শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিন পর্য্যন্ত হিন্দু বাঙালী যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। জীবন, মান, যশ, অর্থ, সুখ, শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া সে দৈন্য বরণ করিয়াছে, দুঃখ বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে। এই অপরিসীম ত্যাগের ফলে নিখিল ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রিক অধিকার অর্জ্জনের পথ সুগম হইয়াছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালীর অবদান অতুলনীয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামগোপাল, হরিশ্চন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র শীল, অরবিন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রাসবিহারী, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র—জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে ইঁহাদের মত পুরুষ কোন দেশে এক শতাব্দীতে অল্পই জন্মিয়াছে। ধর্ম্মসংস্কারে, রাজনীতিতে, বাগ্মিতায়, শিক্ষায়, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কলায়, শাসন বিভাগে, বিচার বিভাগে, আইনে, চিকিৎসায়—জীবনের সকল ক্ষেত্রে হিন্দু বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, সেবা ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গঠনে বাঙালী হিন্দুই অগ্রণী হইয়াছে।

সারা বাংলায় চার ভাগের তিন ভাগ রাজস্ব ও কর একা হিন্দুই প্রদান করে।

আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এত গুরুত্ব সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভায় তাহার আসন ৮০ মাত্র, মুসলিম ১১৯। আদমসুমারীর গণনায় বর্ত্তমানে বাংলায় হিন্দু অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্প। মাইনরিটি হিসাবে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত তাহারই বেশী হওয়া উচিত ছিল। বাংলা সম্পর্কে ইহার বিপরীত ব্যবস্থাই দেখিতে পাই। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় হইয়াও অনুপাতের তুলনায় ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু অল্প, মুসলমান অধিক।

৪

বাংলা এক সমস্যাপীড়িত প্রদেশ। অন্যান্য সমস্যা গৌণ, বিদেশী শাসনের কল্যাণে সাম্প্রদায়িক সমস্যাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রধান প্রশ্নের সমাধান হইলে দেশের স্বাধীনতার পথ সরল হইত।

ইহা যদি একান্ত প্রাদেশিক ব্যাপার হইত তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। বাংলা নিখিল-ভারতের অংশ মাত্র নয়, তাহার অঙ্গ। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া বাংলার প্রশ্ন সমগ্র ভারতের প্রশ্ন। ভারতীয়তা-বোধ বাঙালীর মধ্যেই প্রথম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। বাঙালী কবি প্রথম ভারত-সঙ্গীত গাহিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ভাবিয়া মরে, বাংলায় এত দল কেন? বাংলার সমস্যাকে নানাভাবে সমাধান করিতে গিয়া নানা-মতাবলম্বীর সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলার সমস্যাকে এড়াইয়া যাইতে গেলে ভারতের প্রধান প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি মুদিত করিতে হয়। এই কথা উপলব্ধি করিতেন বলিয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নায়ক সুভাষচন্দ্র বলিতেন, বাংলা যদি মরে ত কে বাঁচিয়া থাকিবে, বাংলা যদি বাঁচে ত কে-ই বা মরিবে?

সর্ব্ব-ভারতের সকল নেতা এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না বলিয়া না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ভবি তাহাতে ভোলে নাই, কিন্তু এই ভ্রান্ত নীতি ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলিয়াছে। যেখানে সংখ্যাল্পতার প্রশ্ন প্রশ্নই নয়, সেই সব প্রদেশের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, সমস্যামুক্ত যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ যদি শাসনতন্ত্রের অধিকারী হয়, বাংলা ও পঞ্জাবের কথা পরে বিবেচনা করিলেই চলিবে। পৃথক নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে গোড়াতেই ভারতব্যাপী প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইলে আজিকার স্বাধীনতা-সমস্যা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিত না।

পৃথক নির্ব্বাচনের সুযোগে বাংলায় আজ দশ বৎসর লীগ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরে বাঙালী সর্ব্বহারা হইতে বসিয়াছে।

অযোগ্যতার অপেক্ষা শাসন-সম্পর্কে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শাসনতন্ত্রের সর্ব্ববিভাগে এই অযোগ্যতাই আজ জয়ী। রাষ্ট্র সুশাসিত না হইলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুষ্কর হইয়া উঠে। ব্যবস্থাপক এবং শাসকবর্গের সুযোগ্যতা সুশাসনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সাম্প্রদায়িক অনুপাতের জন্য যোগ্য কাজে যোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হয় না। সুযোগ্য না হইয়াও সম্প্রদায়-বিশেষের অন্তর্গত হইলেই শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ অথবা যে কোন বিভাগের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়। ফলে দুর্নীতি এতই প্রশ্রয় পাইয়াছে যে বাংলার শাসন সম্পর্কে ইহা আর ব্যতিক্রম নয়, নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। রোল্যাণ্ড্স্ কমিটির রিপোর্ট যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতি কতটা সুদূরপ্রসারী হইয়াছে।

বাংলার ঐক্যকে বিনষ্ট করিবার জন্য বঙ্গ বিভাগ করা হইয়াছিল। বিভক্ত বঙ্গ দৃশ্যতঃ যুক্ত হইল বটে, কিন্তু কূটনীতির কৌশলে পৃথক নির্ব্বাচনের ফলে সেই বিচ্ছেদ সাংঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। দশ বৎসরের লীগ-শাসন তাহারই পরিণতি।

পঞ্চাশের মন্বন্তর এই শাসনের প্রত্যক্ষ ফল। হিন্দু এবং মুসলমান—ত্রিশ লক্ষ বাঙালী এই মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে অনশনে প্রাণ হারাইল। শাসন-ব্যাপারে অযোগ্যতা এমনিই চরমে উঠিয়াছে যে এই লক্ষ লক্ষ লোকের অনশন-মৃত্যুর দায়িত্ব লাট হইতে মন্ত্রী পর্য্যন্ত কাহাকেও স্পর্শ করিল না। উডহেড কমিশনের রিপোর্টে বাংলার সর্ব্বব্যাপী দুর্নীতি এবং যোগ্যতাহীন শাসনের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শান্তির দিনে পুলিশের পিছনে অজস্র অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সময় আসিল, কলিকাতার সেই বীভৎস হত্যা-তাণ্ডবের দিনে পুলিশের অকর্ম্মণ্যতা যেরূপ নির্লজ্জভাবে প্রকট হইয়া উঠিল তাহা বিস্ময়কর। সে বিস্ময়কে অতিক্রম করিয়া, নোয়াখালির বর্ব্বরতায় অযোগ্য শাসনের নগ্ন রূপ উৎকটভাবে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। পৃথক নির্ব্বাচন এবং রাজকার্য্যে সাম্প্রদায়িক নিয়োগের ফল ইহাই।

বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত বাজেট, সরকার পক্ষের বক্তৃতা এবং প্রশ্নোত্তর আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, জনকল্যাণ এখানে তুচ্ছ, সম্প্রদায়গত স্বার্থই কাম্য। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে সহজেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয়, সাম্প্রদায়িক

প্রয়োজনে ব্যবস্থা-পরিষদে বিল আনা হয়, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে পতিত জমি খাস করিবার কথা উঠে, সাম্প্রদায়িক কারণে উচ্চতর পদে লোক-সংগ্রহ চলে।

আমড়া গাছে আম্র ফলে না। পৃথক নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে, এমন আশা করা বৃথা। এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইয়া কেনই বা কেহ ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত অপরিচিত জনগণের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট হইবে? এমন লোক সমগ্র জাতির প্রতিনিধি হইতে পারে না। 'যে কংগ্রেস বাংলার সমগ্র জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের প্রতিনিধি তাহাদের মতামত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই কেন,'—এই প্রশ্ন করিলে উত্তর প্রদত্ত হয়, 'শাসন ব্যাপারে কোন দলের সহিত মন্ত্রণা করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নয়।'

এই শাসনব্যবস্থার কৃপায় দরিদ্র আজ অন্নহীন, মধ্যবিত্ত অর্দ্ধাহার-ক্লিষ্ট, জনসাধারণ ভয়ত্রস্ত, অভাবগ্রস্ত। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয়—চাল, আটা, চিনি, তৈল, ঘৃত, বস্ত্র বাংলাদেশে এ সমস্তই দুর্লভ বস্তু। সুলভ শুধু অশান্তি, অনশন এবং অভিন্যাস।

এখন যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে তাহারই সূচনা করে। লীগ-শাসন পাকিস্থানের পূর্ব্বাভাস।—এই অবস্থার প্রতিকার কি?

নানা কারণে ভারতবর্ষকে আর অধিক দিন আয়ত্তে রাখা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। হয় এই মুহূর্ত্তে বাঙালী হিন্দুকে স্ব-প্রতিষ্ঠ হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে, না হয় রাজনৈতিক সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া চিরদিনের জন্য পরতন্ত্র হইতে হইবে। তাহার অর্দ্ধ শতাব্দীর আত্মত্যাগ, শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন, তাহার দুই সহস্র বর্ষের ইতিহাস এবং চারি সহস্র বর্ষের ঐতিহ্য অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। হয় বিলুপ্তি না হয় প্রতিষ্ঠা। হিন্দু বাঙালী কোন্ পথ বাছিয়া লইবে?

কাহারও কাহারও মতে বৃহত্তর বঙ্গ এই অবস্থা হইতে আমাদের উদ্ধার করিতে পারে। বঙ্গবিভাগ রদ হইবার পর নূতন করিয়া বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হইলে খাস-বাংলার কতক অংশ নূতন প্রদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইল। সিংভূম, মানভূম, পূর্ণিয়া, শ্রীহট্ট বঙ্গের সহিত পুনরায় যুক্ত হইলে, সংখ্যায় হিন্দু কিছু বাড়িলেও অনুপাতে সে সংখ্যালঘিষ্ঠই থাকিয়া যায়। তাহাতেও পাকিস্থান নিবারিত হয় না।

পাকিস্থান হইতে উদ্ধার না পাইলে বাংলায় হিন্দুর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। জিন্নার কথা লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছিলাম, উপসংহারে তাঁহার আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিলে এ কথার যাথার্থ্যে সন্দেহ থাকিবে না।

বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে মুসলিম সাংবাদিকদের সভায় ১২ই মার্চ্চ তারিখে তিনি বলিয়াছেন,

"আমাদের চিন্তাধারা, আদর্শ, লক্ষ্য, মূলনীতি ও কর্ম্মপন্থা হিন্দুদের হইতে শুধু পৃথক নয়—বিরোধী। অতএব উভয়ে মিলিত হইয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে যে কাজ করিতে পারে না ইহা সুস্পষ্ট। সহযোগের অথবা ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার কোন ক্ষেত্রই নাই।"*

ইহাই যদি সত্য হয়, হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলার একত্র অবস্থান অসম্ভব। সহযোগ যদি না সম্ভব হয় বিচ্ছেদই শ্রেয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ জাতীয়তাবাদীর সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশই জিন্নার হিন্দু-বিরোধী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ, পাকিস্থানী মনোভাবে উদ্দীপ্ত।

এই ভাবে ভাবিত হইয়া লীগ বাংলা শাসন করিতেছে। এবং ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে নিষ্কণ্টকে এই ভাবেই রাষ্ট্র শাসন করিবে।

পশ্চিম বঙ্গ হিন্দুপ্রধান। ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানকার হিন্দুদের লীগ-শাসন মানিয়া লইতে হইতেছে। একজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী বলিয়াছেন, "শাসিতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনই দাসত্বের একমাত্র সংজ্ঞা।"†

ব্রিটিশ-উদ্ভাবিত এই নূতনতর দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে বঙ্গ বিভক্ত করিয়া পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। হিন্দুত্ব ও জাতীয়ত্ব বিরোধী বস্তু নহে। একান্ত হিন্দু হইয়াও কি নেতাজী বসু একান্ত ভারতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী হইতে পারেন নাই?

আজ হিন্দুকে শুধু স্বাধীনতার স্বপ্নে মস্‌গুল হইয়া থাকিলে চলিবে না, কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে।

ঐক্য নষ্ট হইলে পাছে স্বাধীনতা-লাভে বাধা ঘটে বলিয়া বাঙালী এক দিন বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল লীগ স্বাধীনতার পথ বিঘ্ন-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই আজ সে বঙ্গ-বিভাগ চাহিতেছে। সে বুঝিয়াছে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে হিন্দুকে বাঁচিতে হইবে। বাঁচিতে হইলে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী হিন্দুকে পশ্চিম বঙ্গে সংহত হইতে হইবে।

বর্ত্তমান বাংলায় যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সম্ভাবনা থাকিলে বৃহত্তর বঙ্গের জন্য আন্দোলন করিলে চলিত। আমরা সাম্প্রদায়িক নই, জাতীয়তাবাদী। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।

জিন্না বলিয়াছেন, "আমরা পৃথক ও স্বতন্ত্র", "শুধু পৃথক নয় সম্পূর্ণ বিরোধী, অতএব হিন্দুদের সহিত সহযোগ অসম্ভব।"

বাংলার সকল সন্তানকে যে আপন মনে করে, বঙ্গভূমিকে

---

* "Our ideology, our goal, our basic and fundamental principles and programme are not only different from the Hindu organisations, but are in conflict. It is obvious, therefore, that the two cannot be put together and work in co-operation. There is no ground for co-operation or harmonious working."

† "Government against the will of the people governed is the only definition of slavery."—Grattan.

যে জন্মভূমি মনে করে, সেই দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তি—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, পার্শী হোক; খ্রীষ্টান হোক—সে আমার আপন, সে আমার আত্মীয়, তাহার শুভাশুভের দায়িত্ব আমাদের সকলের দায়িত্ব। যে তাহা মনে করে না তাহার দায়িত্ব আমার নয়। দেশের মাটির সহিত যদি তোমার যোগ না থাকে, দেশের লোকের সহিত যদি রক্তের সম্পর্ক না থাকে, তাহা হইলে বাংলা তোমার বাস্তু নয়, বাংলার মাটির উপর তোমার নৈতিক অধিকার নাই। যে আপন হইতে চায় সে আপন হোক, যে পর হইতে চায় সে পর হোক। যে আত্মীয়তা অস্বীকার করে দেশের সন্তান তাহাকে বহিরাগত পরই মনে করিবে।

অতএব, বঙ্গ-বিভাগ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, সে দায়িত্ব আমাদের নয়। ঐক্য, মিলন ও সহযোগ-বিরোধী লীগই তাহার জন্য দায়ী। ভারত-বিভাগ যাহারা চায়, প্রদেশ-বিভাগে তাহারা আপত্তি করিতে পারে না। বঙ্গ-বিভাগ অবাঞ্ছনীয় হইলে ভারত-বিভাগ আরো অবাঞ্ছনীয়।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ যদি মূলনীতি হয় হিন্দু বাঙালীর সে অধিকার আছে।

যে দিন এক সাহিত্য-সভায় এই প্রবন্ধ প্রথম পাঠ করি সে কয় দিনেরই বা কথা।* সে দিন বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে অনেকে সচকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। হৃদয়াবেগের নিকট যুক্তি স্থান পায় নাই। সময়ের দ্রুত পরিবর্ত্তনে বঙ্গ-বিভাগ আজ আর অপরিচিত ধারণা নয়। মিলনের পুরোহিত মহাত্মাও স্বীকার করিয়াছেন, "ভাই ভাই ঝগড়া করিয়া ঠাঁই ঠাঁই হয় ইহা অস্বাভাবিক নয়।" ঠাঁই ঠাঁই না হওয়া মিলন-কামী ভ্রাতার উপর নির্ভর করে না।

আর সত্যই কি ইহাতে আমরা বিভক্ত হইলাম? লীগ-শাসন কার্য্যতঃ পাকিস্থান। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে পাকিস্থান হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পশ্চিম বঙ্গ সম্মিলিত হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত হইবে। ইহা বিচ্ছেদ নয়,—মিলন।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি প্রদেশ আছে। আর একটি প্রদেশ বাড়িলে কি এমন আসিয়া যায়? ইহা বিভাগ নয়, আর একটি জাতীয়তাবাদী প্রদেশের সৃষ্টি। এই সে দিন মাত্র বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিহার নবপ্রদেশরূপে গঠিত হইয়াছে।

কোন অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে বাংলার ভাগ্য ফিরিয়া যাইতে পারে ভাবিয়া এই সঙ্কটকালে নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। পৃথক নির্ব্বাচনের ফলে বাংলা ত বিভক্ত হইয়াই আছে, প্রদেশরূপে বিভক্ত হইলে বরং অধিকারহীন অর্দ্ধাংশ আত্ম-নিয়ন্ত্রণে অধিকার পাইবে।

যে শক্তি বঙ্গ-বিভাগের আন্দোলনকে সার্থক করিবে সেই শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন। শক্তির মূল উৎস সংহতি। সমগ্র বঙ্গে জাতীয়তাবাদী হিন্দুর সংহতি চাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে আন্দোলন নিরর্থক। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরীতে, নগরীর প্রতি পল্লীতে সকল হিন্দুকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

আন্দোলন ও আত্মরক্ষার জন্য ব্রতীদল গঠন করা আবশ্যক। লীগের যদি ন্যাশনাল মুসলিম গার্ড থাকে জাতীয়তাবাদী ব্রতীদল থাকিলে অন্যায় হইবে না। এই দল প্রদেশব্যাপী হইবে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কার্য্য করিবে এবং পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে।

আজ বাঙালীর অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সে চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতার অধিকারী হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের ভয় নাই। যাহা বিভাগ বলিয়া মনে হইতেছে তাহা সাময়িক বিচ্ছেদ মাত্র। এ বিচ্ছেদ মিলনকে নিকটতর করিবে।

স্বাধীনতার যুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করিবার প্রয়োজন নাই। কোন্ দেশের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়াছে? শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে কোন্ দেশের সব লোক এক হইয়া দেশকে স্বাধীন করিয়াছে? আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম, ফরাসী বিপ্লব, রুষ বিপ্লব—কোন বিপ্লবই এ কথা সমর্থন করে না। স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধ করে। পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বাধীনতা-অর্জ্জন জলে না নামিয়া সাঁতার শেখার মত।

পরাধীনতার ফল দুঃখ। স্বাধীনতা সকল শুভ আনয়ন করে। লীগ-শাসন স্বাধীনতার পথে প্রকাণ্ড বাধা। এ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া পশ্চিম বঙ্গে জাতীয়তাবাদী বাঙালীকে সংহত হইতে হইবে। বৎসর ফুরাইতে না ফুরাইতে যে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতে চলিয়াছে তাহার অধিকারী হইতে হইবে। জাতীয়তার চরিতার্থতা চাই। স্বাধীনতা সকল চরিতার্থতা দান করে।

* রবি-বাসর, ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৩ অধিবেশনে পঠিত

আলোচনা

সত্যেন্দ্রনাথের 'সন্ধিক্ষণ'

শীর্ষক প্রবন্ধে, গত চৈত্র-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম যে, 'সন্ধিক্ষণ' পুস্তিকাখানি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। কবির সকল কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেখিয়াই ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলাম। ১৩২৯ সালে (১৫-৯-১৯২২) সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পদিন পরে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের এক খণ্ড 'বেণু ও বীণা' সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে; উহাতে 'সন্ধিক্ষণ' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে দেখিতেছি।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২৭

কাজের মধ্যে চিন্তায় উগ্রতাটুকু মিলাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু চিন্তাটা একেবারে যায় নাই। বাগান কোপানোই হোক, পড়াই হোক বা পড়ানোই হোক—সব কাজের মধ্যেই এক এক বার উঁকি মারিয়া অন্যমনস্ক করিয়া ফেলিতেছিল, টুলু আবার চাপা দিয়া অগ্রসর হইতেছিল, বৈকাল পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে কিন্তু হার মানিতেই হইল। মনে হইল একটু ঘুরিয়া আসিলে মনটা হয় তো সুস্থির হইতে পারে, রোদটা নরম হইলে বাহির হইয়া পড়িল।

এলোমেলো ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একবার বস্তির মধ্যে প্রবেশ করিল। মাঝে আরও বারদুয়েক আসিয়াছিল, পরিচয়টা বাড়িয়াছে, আরও বাড়িয়াছে ঔষধ দেওয়া আরম্ভ করা থেকে, কথাবার্তায় খানিকটা সময় গেল, যাহারা ঔষধ সেবন করিতেছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের খবর লইল। খানিকটা অন্যমনস্ক হইয়া কাটিল মন্দ নয়, তাহার পর বাসায় ফিরিবার জন্ত বটতলায় পথটা ধরিল।

খেলাটা এখন ওর ওখানেই জমে, বটতলাটা প্রায় খালি। একটা শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। গোরু ছাগল লইয়া দু' চার জন যে ছেলে ছিল তাহাদের সহিত একটু গল্পগুজব করিল—মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি হইতে যেন পলাইয়া বেড়াইতেছে। বেলা বেশ পড়িয়া আসিলে তাহারাও যখন চলিয়া গেল, আবার মাষ্টারমশাইয়ের চিঠি আসিয়া মনটা দখল করিল।...মাষ্টারমশাই তাহা হইলে বিপ্লবী!...স্থানে স্থানে আগুন জ্বালাইয়া বেড়াইতেছেন।

টুলুর যেন ভয় করিতেছে—তাহার মনেও জ্বলিয়াছে নাকি আগুন? এ ভয়ে কি?...আতঙ্কের মধ্যেই মনে হইল, যখন সিদ্ধবাবার আশ্রমের দিক থেকে তাহাকে কেরাম সে সময়েও ঠিক এই রকম একটা অশান্তির জ্বালা ছিল নাকি ওর মনে জাগিয়া? সে না ফিরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফিরিল তো শেষ পর্যন্ত। ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে-কথা ত এখন আসে না, আসল কথা, ও চেষ্টা করিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া হারিয়াছিল, হার মানিয়া ফিরিয়াছিল। মাষ্টারমশাই একটা অমোঘ শক্তি!...আতঙ্কের মধ্যেই টুলুর হঠাৎ আর একটা কথা মনে হইয়া সমস্ত শরীরটা যেন শিহরিয়া উঠিল—এ-ই মাষ্টারমশাইয়ের প্ল্যান নয় তো? প্রথম ধাপ ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরীহ সেবাকার্য, যখন সেটা বেশ সহিয়া আসিল তখন এই দ্বিতীয় ধাপ—বিপ্লব!...মাষ্টারমশাই ঘোর শাক্ত, বলি চান—তার আগে বলিকে তাঁর আরাধ্যার উপযোগী করিয়া লন।

সম্মোহিত পাখী সাপের অমোঘ, স্থির দৃষ্টিতে সামনে যেমন ভাবে চাহিয়া থাকে, টুলু মাষ্টারমশাইয়ের কাল্পনিক দৃষ্টির সামনে সেই ভাবে রহিল চাহিয়া। তাহার পর এক সময় সম্মোহিত পাখীর মতই মাথা নত করিয়া হইল অগ্রসর।

তর্কের ধারা গেল বদলাইয়া। দূরে স্কুল আর বাসা লইয়া টিলাটার উপর সূর্যের শেষ রশ্মির ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ দিকে চাহিয়া চাহিয়া ওখানকার জীবনের চিত্রটা ফুটিয়া উঠিতে চাহিল চোখের সামনে—অন্ধ ভিখারিণী, চম্পা, হীরক, ঐ একটা বিকৃতমস্তিষ্ক জীব বনমালী; খুব সুবোধ সুশীল স্বামী আর খুব গোছালো স্ত্রী লইয়া চম্পার মিতিমের সংসার, একটা যেন নিয়মবদ্ধ, যন্ত্রচালিত ব্যাপার; ঐ চরণদাস—নেশা ছাড়িয়া ভাল হইয়া আসার সঙ্গে যেন নির্জীব হইয়া আসিতেছে—এই এদের লইয়া সারা জীবনটা কাটাইয়া দিতে হইবে তাকে? না হয় এদেরই মত আরও দু'জন আসিল।... সিদ্ধবাবা ভুল, কিন্তু ওঁকে লক্ষ্য করিয়া যে জীবনের সন্ধানে নামিয়াছিল টুলু সেটা তো ছিল বিরাট। তাহার পরিবর্তে কি এই অকিঞ্চনবৃত্তি?

টুলু মনের চাঞ্চল্যে শিলাতল ছাড়িয়া জায়গাটাতে পায়-চারি করিতে লাগিল। চিন্তা একেবারে দিক পরিবর্তন করিয়াছে: না, সেই বিরাটের জায়গায় যদি অন্ত কিছুকে আনিয়া বসাইতে হয় তো সে বিপ্লবেরই মত বিরাট একটা কিছু, আর কিছুই মানায় না, আর কিছু আনিতে গেলেই জীবনে যেন একটা শূন্যতা, একটা হাহাকার থাকিয়া যায়। সহ্য হইবে না। বিপ্লবই চাই, মাষ্টারমশাইয়ের উদ্দেশ্যই ঠিক। কিন্তু উদ্দেশ্য ঠিক হইলেও পরিকল্পনায় খুঁত আছে—অত অল্প অল্প করিয়া ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া নয়, বিপ্লবীর আকস্মিকতায়ই বিপ্লবের মশাল লইয়া মাথা তুলিতে হইবে। বিপ্লব বজ্র—বজ্রের মতই সে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে হানিবে আঘাত।...আমি আসছি মাষ্টারমশাই, আপনার ওপর দিয়েই আমার বিদ্রোহ হবে আরম্ভ, আপনার অবাধ্য হয়ে, আপনারই রচা ঐ শেকল ভেঙে দিয়ে আমি আসছি। আপনার আত্মগোপনের চেষ্টা খাটবে না, বরিয়া কাংরাসগড় তন্ন তন্ন করে আপনাকে খুঁজে বের করব—করবই বের, তার পর আপনার মশালের পাশে আমারও মশালটা ধরব তুলে।

—উত্তেজিত চরণে টুলু স্কুলের দিকে চলিল—চিন্তার স্রোত হইয়া উঠিতেছে ফেনিল, আবর্তময়।

যখন স্কুলের কাছাকাছি পৌঁছিল, সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। দেখে ফটকের কাছে জটলা করিয়া বনমালী, প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের স্ত্রী, বুড়ীর নাতনী দূরে কোথায় দৃষ্টি ফেলিয়া কি দেখিতেছে। ও যে দিক হইতে আসিতেছে সেই দিকেই। একবার ঘুরিয়া দেখিয়া লইয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি যেন দেখছ তোমরা?"

বনমালী বলিল—"আগুন লেগেছে বটে।"

"আগুন! কোথায়?" বলিয়া পশ্চিমের দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, কিছু দেখিতে না পাইয়া আবার ঘুরিয়া বলিল, "কোথায়? দেখছি না তো।"

বনমালী, প্রহ্লাদ, মেয়েটি একসঙ্গে আঙুল দেখাইয়া জড়াজড়ি করিয়া বলিল—"হুই যে পাহাড়ে ডগনেভে…"

পাহাড়ে আগুন। সমতলের মানুষ, টুনুর কানে নূতন ঠেকিল। তাহার পর মনে পড়িল দাবাগ্নির কথা। দৃষ্টিটা ততক্ষণে ডঙনিয়ার উপর গিয়া পড়িয়াছে, দেখিল সত্যই এক জায়গার মধ্যে খানিকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে মনে হইল নিচে থাবলা থাবলা আলো চিকচিক করিতেছে। আর একটু দৃষ্টি ঘুরাইয়া দেখিল খানিকটা দূরে আর একটা ঐ রকম এত দূর থেকে মনে হয় বিশ পঁচিশ হাত তফাতে, কিন্তু বুঝিল দুটার মধ্যে অন্তত মাইল তিন চারের কম ব্যবধান নয়। একেবারে নূতন অভিজ্ঞতা, টুনু স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর মনের বিহ্বলতায় অবোধের মতই প্রশ্ন করিয়া বসিল—"পাহাড়েও আগুন লাগে নাকি এ রকম করে? আপনি লাগে?"

বনমালী বলিল—"হু লাগে, আপুনি লাগে, আপুনি যায়, ভাবতায় যখন পরিতুষ্টু হয়।"

কথাটার নূতনত্বে টুনু একবার বনমালীর মুখের পানে চাহিল, তাহার পর বিস্ময়ের ঝোঁকেই দৃষ্টি ফিরাইয়া আবার দূরলগ্ন করিল। সেই চিকমিকি—অস্বস্তিকর অথচ চোখ ফিরানো যায় না। এতদিন থাকিতে আজই এই যোগাযোগ কেন? মাষ্টারমশাইয়ের প্রথম চিঠিতে এক অদৃশ্য শক্তির কথা ছিল, তাঁহারই বিধানে নাকি সে হীরককে ওভাবে পায়। আজ তিনিই কি এই বহ্নিসঙ্কেতে আবার নূতন পথের নির্দেশ করিতেছেন? মনে বিক্ষোভ ভরিয়া কতক্ষণ যে একভাবে দাঁড়াইয়া ছিল হুঁস নাই, একবার যখন ফিরিয়া দেখিল, দেখে বনমালী প্রভৃতি সকলেই চলিয়া গেছে। সেই সময়ই আবার সামনে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখে অল্প দূরেই চম্পা বুড়ীর নাতির সহিত গল্প করিতে করিতে টিলার রাস্তা বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল, "আপনি এখানে—এখন!"

টুনু বলিল—"ডঙনিয়া পাহাড়ে আগুন লেগেছে।"

চম্পা ফিরিয়া চাহিল, বলিল—"তাই তো দেখছি। ক'দিন থেকে শুকনো হাওয়া বইছে কিনা।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"চমৎকার দেখতে কিন্তু।"

চম্পার কথাতে টুনু একবার ঘুরিয়া দেখিয়া লইল—নিকষ-কালো অন্ধকারের বুকে আগুনের মালা—শিখায় শিখায় ঝলমল চমৎকার বৈকি; কিন্তু মন তার আজ অতিরিক্ত চঞ্চল, একেবারে অন্য সুরে বাঁধা, দৃষ্টিটা ওতে আবদ্ধ হইতে পারিল না। হঠাৎ মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া চম্পার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"অন্ধ সংস্কার বলে একটা কথা আছে শুনেছ চম্পা?"

প্রশ্নটার অপ্রাসঙ্গিকতায় চম্পা মুহূর্তের জন্য একটু বিস্মিত হইল তাহার পর একটু হাসিয়াই বলিল—অত ভাল করে জানা আর কোন কথাই নেই আমার। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি দিনকতক একটা মিশনরি স্কুলে পড়তাম. আমাদের জাতের মধ্যে ঐ জিনিসটি ছাড়া যে আর কিছুই নেই বছর দুয়েক ধরে শুধু এইটুকু শিখিয়েছিল তারা।

উত্তরটায় টুনুর কৌতুক বোধ হইল, যে কথাটা বলিতে যাইতেছিল সেটা ছাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল—"বাঃ, তোমার ঘাড় থেকে তা হলে ওসব ভূত নামিয়ে ছেড়েছে।"

চম্পা আবার একটু বেশী করিয়া হাসিল, বলিল—"মোটেই নয়, আরও একরাশ চাপিয়েছে বরং, এত যে আছে জানতামও না; যেটার নাম করেছে সেইটেই এসে নতুন করে ঘাড়ে চেপেছে তার মধ্যে আবার কতকগুলো বিলিতি ভূত আছে, এখন তেরো নম্বর দেখলেও আঁৎকে উঠি।"

গম্ভীর আলোচনার পক্ষে বাতাসটা হালকা হইয়া গেছে, ওর মনে যে ঝড় বহিতেছে তাহার প্রসঙ্গটা আবার কি করিয়া আনিবে টুনু ভাবিতেছিল, চম্পা বলিল—"বেশী দূরে যাওয়ায় কি দরকার? এই এখনই তো একটা অন্ধসংস্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পাহাড়ে আগুন লাগা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে নাকি দেখতে নেই, এতখানি দেখে ফেলে ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছি…"

টুনু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল—তাই, দেবতায় খিদে পেয়েছে খাচ্ছেন, ওতে নজর দেওয়া নাকি উচিত নয়—তাতে, যে দেয় তার ওপর নাকি তাঁর নজর পড়ে।

যে ধরণের একটু হাসিল তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় এসব যুক্তিহীন বিশ্বাস কাটাইয়াই উঠিয়াছে। টুনু সেটা বুঝিয়াই ওর হাসির উপর একটু হাসিল, বলিল—"তাই ঘুরে দেখি বনমালী প্রহ্লাদের বৌ তারা সব কেউ নেই।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আনিয়া ফেলিল, বলিল—"কাকে দুষব? এই আগুন লাগা নিয়ে আমিই ত একটা ধোঁকায় পড়ে গেছি!"

কথাটা হতাশ ভাবে বলে কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য চম্পা মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। টুনুর মুখের ভাবটা এই টুকুতেই গেছে বদলাইয়া, মনটা যেন কোথা থেকে কোথায় গেছে চলিয়া, কতকটা আত্মগত ভাবেই আরম্ভ করিল—"চম্পা, কাল আমি মাষ্টারমশাইয়ের—"

এই পর্যন্ত বলিয়া সাড় হইল, চুপ করিয়া গেল। চম্পার মুখের পানে একবার চাহিল, এই রকম সব মুহূর্তে চম্পার মুখ একটা দেখিবার জিনিসই—বুঝিয়াছে কোন একটা গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিবার মুখে টুনু হঠাৎ থামিয়া গেল, এতটুকু কিন্তু কৌতূহল নাই, একটি আগ্রহের রেখা পর্যন্ত ফোটে নাই কোথাও মুখে। গোপন করিতে হইল বলিয়া টুনু নিজেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। তাহার পর সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আমি ভাবছিলাম চম্পা, মাষ্টারমশাই কি আমায় এই সবের জন্যেই এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন?"

চম্পার মুখটা একেবারে শুকাইয়া গেল, তাহার এদিককার এই নূতন জীবনে সবচেয়ে বড় আশঙ্কা যেন ফলিতে চলিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?—ও কথা বললেন যে?"

এই ক'টা কথা বলিতেই তাহাকে একবার ঢোঁক গিলিতে হইল।

টুনু বলিল—"তোমার বলে কি হবে তাও ত বুঝি না, তোমার মনে খানিকটা অশান্তি ঢেলে দেওয়া; আবার এও ভাবছি শোনা তোমার দরকার, কেননা যে করেই হোক আমার জীবনের মধ্যে তোমার জীবন খানিকটা এসেই পড়েছে, আমার ঘাড়ের বোঝা তুমি ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছ। কিন্তু এই যে বোঝা, কি হবে বলো দিকিন এসব বয়ে? তুমি ম্যানেজারের ওখানে মাষ্টারমশাইয়ের চিঠিটা শুনেছিলে, তাইতে তিনি আমার কতকগুলো কাজের কথা লিখেছিলেন—আপাতত তিনটে তোমার মনে আছে বোধ হয়। কিন্তু এও নিশ্চয় মনে আছে যে, মাষ্টারমশাইয়ের চিঠির গোড়ার কথা ছিল এদের অত্যাচার—শুধু এদেরই কেন?—এরা চোখের সামনে একটা উদাহরণ, চারদিকেই ত এই অত্যাচার—এক দল পিষছে এক দল পিষ্ট হচ্ছে; মজার কথা এই যে যারা পিষ্ঠ হচ্ছে তারাই পেষবার ক্ষমতাটা যাচ্ছে জুগিয়ে। একেবারে রাজা-প্রজার সম্বন্ধের কথা থেকেই ধরো না; যখন নিজের রাজা ছিল, একটা কথা ছিল; কিন্তু এরা তো বলতে পারবে না—আমরা সূর্য্যবংশ, বা চন্দ্রবংশ, আকাশ থেকে নেমে এসেছি তোমাদের শাসনের জন্য,—কিসের জোরে ওরা জেঁকে বসেছে আমাদের ওপর?—ওদের প্রবঞ্চনা আর আমাদের দুর্বলতার জোরেই ত? তার পর ক্রমাগতই পিষে যাচ্ছে।—খনির কথাতেই আসা যাক্—হীরুকের মা অমন ভাবে মরবে কেন? বরাবর ত ওই কোম্পানীর আয়ের ঘরে জমার অাঁক বসিয়ে এসেছে নিজের সুখ সচ্ছলতা দিয়ে—স্বামীর জীবন পর্য্যন্ত দিয়ে, একটা মাস কোম্পানী তার কথাটা একটু ভাবতে পারত না?"

উত্তেজনায় গলা কাঁপিয়া যাইতেছে, কথাগুলা মাষ্টার মশাইয়ের কালকের চিঠি থেকে টাটকা তোলা, কিন্তু সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিতেছে না; উত্তেজনায় মাথায় এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। শেষে যেন খেই হারাইয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

চম্পা মতমতকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

টুনু মনটাকে একটু গুছাইয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—অনেক কাজ আমি নিয়েছি, মা, হীরুককে মানুষ করে তোলবার; তার সঙ্গে ছুটো শিশুকে শিক্ষা দিচ্ছি,—কবে তারা বড় হবে। মানুষের মত নিজের কড়া-গণ্ডা বুঝে নিতে পারবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে। ততক্ষণ কত চরণদাস, কত হীরুকের মা যে নিঃশেষ হয়ে যাবে সেটা ত একবার ভেবে দেখছি না। না, এ চলবে না। এত ধৈর্য আমার নেই চম্পা। আগে অত্যাচারের পথ বন্ধ করতে হবে, তারপরে গড়ার কাজ। আজ দু'দিন থেকে আমি এই কথাই ভাবছি। তুমি জান কিনা বলতে পারি না। চারদিকে খনিতে ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে গেছে, খুনজখমও হয়েছে—তা হোক, অমন হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এতেই ভাল হবে, এই একমাত্র উপায়। আমিও এখানে এ-ই আরম্ভ করব—লোক ক্ষেপিয়ে দোব, নেহাত না পারি এখানে, যেখানে আগুন জ্বলেছে সেখানে যাব। আমি আজকে তার নির্দেশ পেয়েছি, তাইতেই অন্ধসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের কথাটা তুলেছিলাম তোমার কাছে।"

চম্পা তেমনই স্তব্ধ ভাবে মাথা নিচু করিয়া নিজের আশঙ্কা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার জানা কথা এই রকমটি হইবে;—একটু সেবা, সামান্য একটা শিশুর দুটি কচি হাতের বাঁধন দিয়া এ মানুষকে ধরিয়া রাখা যাইবে না; অথচ নিজের সব খোয়াইয়া ত সে এরই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—কত উচ্চ আশা, কত বড় একটা নূতন জগতের কল্পনা লইয়া। স্তব্ধ ভাবে শুনিয়া যাইতেছিল, শেষের কথায় মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল—"বুঝলাম না, অন্ধবিশ্বাসের কি আছে এর মধ্যে?"

"শুভদিনার ঐ আগুন। তোমার মনে আছে কিনা জানি না মাষ্টারমশাইয়ের সেই চিঠিটাতে এক জায়গায় কোন অদৃষ্ট শক্তির কথা লেখা ছিল। অবশ্য কার্য্যকারণ কোন সম্বন্ধ নেই, তবুও আমার যেন মনে হচ্ছে সেই শক্তি ঐ আগুন জ্বালিয়ে আমারও আগুন জ্বালাবার ইসারা দিলেন। বুঝছি দুটোর কোন সম্বন্ধ নেই—তবুও যেন মনে হচ্ছে, সময় হয়ে এসেছে, এভাবে এই বাড়িটুকু অাঁকড়ে বসে থাকা অন্যায় হবে।"

একটু থামিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"তুমি কি করবে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না পাইয়া এই প্রশ্নেরই জের ধরিয়া বলিল—"তোমায় আমি কতকটা জড়িয়ে ফেলেছি এই সব কাজে; তুমি ওদিককার পাট চুকিয়ে দিয়ে এসেছ, তাই তোমার কথাও মনে উঠছে বড্ড বেশী করে।"

চম্পার উত্তর ততক্ষণে ঠিক হইয়াছে, ম্লান হাসিয়া বলিল—"ভগবান আমায় মেয়েছেলে করে গড়েছেন, বাড়ি অাঁকড়ে পড়ে থাকাই তো আমার কপালের লেখন।"

কথাগুলিতে অভিমান যেন উপচিয়া পড়িতেছে, টুনু মুখের পানে চাহিল। চম্পা একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার একটা কথা শুনবেন কি?"

"বলো।"

"কথাটা একেবারেই আমার মনের কথা, ধর্ম সাক্ষী করে বলছি—আপনি না মনে ভাবেন আপনাকে ফেরাবার জন্যে আমি বাজে তর্ক করছি একটা। কথাটা হচ্ছে, আপনি বলছেন আপনার হাত দিয়ে আগুন জ্বালাবার জন্যে ভগবান ঐ একটা নিশানা দিয়েছেন আজ। কিন্তু এমনও কি হতে পারে

না, আপনার মনে যে কথাটা উঠেছে বলছেন কাল থেকে, তাই থেকে আপনাকে ফেরাবারই এ একটা উপায় তাঁর?—মনে একটা খটকা লাগিয়ে দিয়ে…”

“কি রকম?”

চম্পা একটু ভাবিল, তাহার পরে বলিল—“আসলে সে সব কিছুই নয়, এটা আপনিও বুঝছেন—মনের মধ্যে যখন যে খেয়ালটা ওঠে সেটাকে মানুষে বাইরের ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে দেখে; আগুন যেখানে লাগবার লেগেছে, তার সঙ্গে আপনার কি করা উচিত অনুচিত তার কিই বা সম্বন্ধ থাকতে পারে বলুন? তবু একবার ভেবে দেখুন—কি সর্বনাশটা না হচ্ছে আজ ঐ পাহাড়ের গায়ে—কি অপঘাত—কত হাজারে হাজারে মরছে সব!—পুড়ছে, আধপোড়া হয়ে বাঁচবার জন্যে মিছে ছুটে আবার সেই আগুনে পড়ছে বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে, কিম্বা হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচাতে তাদের আগুনের মধ্যেই ফেলে—যেগুলো হয় তো পারলে পালাতে প্রাণের ভয়েই, এমন দুশো চারশো হাত নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেল। …আপনার আগুন জ্বালা কি ধরণের ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে সব আগুনই তো আগুন, কমবেশী করে ফল তো এই। ভগবান মানুষকে কি জেনে শুনে এই রকম একটা কাজের দিকে ঠেলে দেবেন?—তবে আর কার কাছেই বা ভরসা মানুষের?…”

বুড়ীর নাতিটি পাশেই একটু পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, আঁচলের খুঁটটা ধরিয়া একটু টান দিতে চম্পার হুস হইল, ঘুরিয়া বলিল—“তুই এখনও দাঁড়িয়ে এখানে?…তা যা, আমি আসছি।”

ছেলেটি প্রশ্ন করিল—“কাপড়গুলো কাকে দিবো?”

হাতে খানকতক বাণ্ডিল একটা কি দিয়া বাঁধা, মনে হয় যেন রংচঙে ছিটের কাপড়। টুলু বলিল—“হীরার জন্য নাকি?” এত কাপড় একটা কচি ছেলের জন্যে?”

চম্পা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—“ওর নিজের গায়ের জন্যে নয়, তবে…”

কথাটা শেষ করিতে দিবার জন্য একটু অপেক্ষা করিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—“তবে…কি?”

“রাগ করবেন না, আপনি তো সবই দিচ্ছেন, বাবার ওদিক থেকেও বাঁচে আজকাল, তবে হীরার খরচের জন্যে…”

টুলু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিল, বলিল—“বুঝলাম না।”

“কিছু ছিট বাজার থেকে কিনে নিয়ে এলাম, জামা, পিরান সেলাই করে দোব, বিক্রির জন্যে; একটা দোকানও ঠিক করেছি…”

“হীরার খরচ জোগাবার জন্যে?…কিন্তু তার তো তাতা পাচ্ছ পরের টাকা করে…”

—একটু বিরক্ত কণ্ঠেই বলিল—“চম্পা, হীরা গরীবের ছেলে, গরীবের মতই তাকে মানুষ করতে হবে। তার খরচের জন্যে এত…”

গরীবের ছেলের মতই করছি মানুষ তাকে শুধু আপনার টাকার বদলে…মানে, ও টাকাটা পুষিয়ে দিতে…”

বদলে মানে! তোমায় দিচ্ছে না ও টাকাটা? কেন, কাজ ছেড়ে দিয়েছ বলে?”

চম্পা অল্প একটু হাসিয়া বলিল—“কাজের সঙ্গেও টাকাটার কোন সম্বন্ধ যে নেই জানেনই তো; কিসের সঙ্গে সম্বন্ধ তাও জানেন আপনি। কতদিন আর এ সব অপমান সইব? তাও; আর হীরা আগে যার ছেলেই থাক, এখন আপনার, এই পাপের টাকায় ওর শরীর গড়ে উঠলে সে পাপ কি এ জন্মে মিটবে কখনও?”

সঙ্গে সঙ্গেই এই বড় কথাটাকে চাপা দেওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল—“হ্যাঁ আমাদের যা কথা হচ্ছিল—গুণমের আগুন নিয়ে কথাগুলো বললাম বটে আপনাকে, কিন্তু একটুকুর জন্যেও ভাববেন না যে—

এইখানে বাধা পড়িয়া গেল। দেবতার খাওয়ার নজর পড়ার ভয়ে বনমালী এতক্ষণ দম বন্ধ করিয়া ভিতরে বসিয়া ছিল, আর পারিল না, বুড়ীর নাতনীকে সঙ্গে করিয়া কটকের বাহিরে আসিয়া বলিল—হুঁ, খাইছেঁ এখনও; উ খাবেক—উর পরিতুষ্ট না হলে…

তাহার পরই সামনে টুলু, চম্পা আর ছেলেটির উপর নজর পড়িল, টুলুকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল—এখনও তক্ দেখছেন আপুনি? নজরটি দিতে নাই গো!

টুলু হাসিয়া বলিল—এত ঢাক পিটিয়ে খেলে মানুষে নজর লুকোয় কোথায় বনমালী সেটা বলো। যাক্, আমার পেটেও ঢুকেছেন; একটু ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করোগে চম্পা।

নিজে বাসার দিকে পা বাড়াইল।

(৩০)

টুলুর মনটা অনেকখানি হালকা হইল।

চম্পার যুক্তির কাছে ঠিক যে পরাজয় মানিল এমন নয়, তবে যুক্তির কথাগুলা শুনিয়া যেন বাঁচিল। আসল কথা মানুষ নিজের মনকেই চেনে সবচেয়ে কম, অন্ততঃ খুবই কাছের জিনিস বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে মনে করিয়া প্রতি পদেই ধোঁকা খায়। অনেক সময় মন যেটা একেবারেই চায় না সেইটা লইয়াই সবচেয়ে বেশি লম্ফঝম্ফ সুরু করিয়া দেয়। টুলুর মন বিপ্লবী নয়, অন্ততঃ এখন পর্যন্ত তাহার স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলা ততটা নষ্ট হয় নাই, জীবনের সঙ্গে আরও প্রত্যক্ষ যোগ দরকার, আরও তিক্ততার অভিজ্ঞতা দরকার; তাই—বিপ্লবী নয় বলিয়াই বিপ্লবের সুরে অমন করিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল।…ফাঁকা আওয়াজে শুধু অপরকে ভয় দেখানোই হয় না, মন আবার এক এক সময় নিজেকে প্রবঞ্চনাও করে।

টুনু যেন বাঁচিল। সত্যই তো—বিপ্লবের আগুন শুভনিয়ার ঐ আগুনের মতো অযথাই ভয়ঙ্কর তো।। ওটা সেই অদ্ভুত শক্তির নিষেধ না হইয়া যদি নির্দেশই হয় তো সত্যই আর কাহার কাছে ভরসা মানুষের?

অনেক রাত পর্যন্ত রহিল জাগিয়া, তবে স্থিরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা লইয়া। মাষ্টারমশাই কি সত্যই তাহাকে বিপ্লবের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বলিয়াছেন? সমস্ত চিঠি-খানায় নিজের একটা পরিচয়ই তাহার সামনে মেলিয়া ধরা যেন তাঁহার উদ্দেশ্য—নিজের অতীত ও বর্তমানের কর্মজীবন, আর ভবিষ্যতের আশা-কল্পনা লইয়া যে তাঁহার জীবন। নিজেকে টুনুর কাছে আর গোপন রাখিতে চান না, তাহার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় এই যে—জানাইয়া দেওয়া কতদূর পর্যন্ত তিনি আশা রাখেন তাহার কাছে, প্রয়োজন হইলে টুনুকে কতটার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আপাতত টুনুকে কি করিতে হইবে তাহার নির্দেশ তো দিয়াছেন শেষের দিকে—"আরও শিশুকে তুমি বুকের কাছে টেনে নাও, আরও নারীর জীবনকে তুমি গ্লানিমুক্ত করো, চরণদাসের মতো আরও যারা তাদের এক এক করে নাও তুমি তুলে।"...

এই কাজে নামিয়া চম্পা হীরককে লইয়া টুনুর জীবন যে একটা বিশেষ রূপ লইয়াছে তাহার কথাও লিখিতে ভোলেন নাই।

এই গড়া জিনিস ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া?—উচিত? শুশুনিয়ার আগুনের কথায় চম্পার কথাই তো ফলে তাহা হইল। প্রথমে ত ইহারাই হইবে বিনষ্ট—ঐ শিশু, কি হইবে ওর পরিণতি? ভিখারিণী, তাহার নাতি-নাতনি দুটি—এই কয়টা দিনেই কত নিচু থেকে কত উঁচুতে আসিয়া উঠিয়াছে, আবার কোথায় তলাইয়া যাইবে। চরণদাসের জীবনের দিকচক্রবাল পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্গে ওর সঙ্গী আরও অনেকের। আর চম্পা, ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে, কি অন্ধকারের মধ্যে যাইতেছিল ডুবিয়া!—প্রথম দিনের সেই দেখা—দুয়ারের চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সজ্জায় ভঙ্গিমায় নরকের অভিসন্ধি লইয়া—তাহার পর বালিয়াড়ির পথের সেই অভিসার।...সেই চম্পা আজ, কলুষের ছায়া আছে বলিয়া হীরকের জন্য অন্ত করিয়া চাহিয়া লওয়া টাকাটার এক কথাতেই মায়া কাটাইয়া বসিল। মাষ্টার মশাই লিখিয়াছিলেন—"একটা নারী সুধরাইয়া গেলে একটা জাতি শুধরাইয়া যাইতে পারে।"...চম্পা সেই ধরণের নারী। শুধু তাহাকে বাঁচাইয়া তোলাই তো একটা জীবনের সাধনা হইতে পারে।...টুনু আজ গণ্ডিভিটি ছাড়িয়া যাক—চম্পা তাহার ঐ রূপ, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া কোথায় নামিয়া যাইবে—গভীর নিরাশায় হয় তো আরও কত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে তাহার কি কোন হিসাব আছে?

অথচ এক কথাতেই সমাধান হইল না, মনটা বিপ্লবের বিরাট প্রসার থেকে ফিরিয়া আসিয়া এই ছোট গণ্ডির মধ্যে যেন আরও হাঁপাইয়া উঠিল। অন্ততঃ আরও কিছু কাজ চাই, এই কয়টি প্রাণীকে লইয়া অল্প পরিসরের একঘেয়ে জীবন ক্রমেই যেন অসহ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার পর একদিন হঠাৎ একটা সামান্য ব্যাপারে টুনু খানিকটা নূতন কাজের সন্ধান পাইয়া গেল; কাজটুকু বেশ মনের মত, তা ভিন্ন বিস্তারেরও বেশ চমৎকার সম্ভাবনা আছে।

দিনকয়েক পরের কথা। আজকাল বস্তিতে নিয়মিত ভাবেই যায় একবার করিয়া। ওর হোমিওপ্যাথির যশ বাড়িয়াছে, অনেকগুলি রোগী হাতে, সখের চিকিৎসার সখের রোগীও আছে আবার প্রকৃত রোগীও আছে, একবার দেখিয়া শুনিয়া খবর লইয়া, খানিকটা বেড়াইয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া আসে।

ঔষধের সঙ্গে পথ্যেরও ব্যবস্থা করিতে হয় এক আধ জনের। গরীব হোক, কিন্তু প্রায় সবারই এদিক দিয়া একটা সঙ্কোচ থাকায় খুব যে বেশি খরচ হয় এমন নয়; অনেক সময় নিজেই জোর করিয়া হাতে দু'আনা এক আনা যাহা দরকার গুঁজিয়া দেয়। সেদিন এই ভাবেই একবার ব্যাগটা বাহির করিতে গিয়া দেখে সেটা নাই। একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল, তাহা ভিন্ন মনটা গেল খারাপ হইয়া। অনেক সময় একটু ভালোরকম রোগী দেখার সময় দশ বার জন ভিড় করিয়া দাঁড়ায় চারি দিকে, বেশির ভাগই ছেলেমেয়ের দল। তচিবাই নাই বলিয়া, বরং যেটুকু আছে সেটুকুকেও নির্মূল করিবার জন্য কিছু বলে না টুনু, অন্যেরা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও কিছু যায়ই থাকিয়া,—সাধারণতঃ যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে।

আজও এই রকম একটি দল ঘিরিয়া আছে। কেহ বাহির করিয়া লইল নাকি ব্যাগটা? রোগী একজন বৃদ্ধ, পাঁচ ছয় দিনের জ্বরে বিছানায় পড়িয়া আছে, মুখের ভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিল —"কি হইঁছে বাবুমশয়?"

সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় উঠিয়া বসিয়া রাগে চীৎকার করিয়া উঠিল—"বুঝেছি, পকেট মারলেক! তুরা দাঁড়া, আমি দিখব তুদের কাপড়, যত সব অধর্মো ভিড় করে দাঁড়াবে পকেট মারবার জন্যে!..."

এরা পলাইলেও গোলমাল শুনিয়া অন্য লোক জুটিল। বৃদ্ধ উঠিয়া তাড়া করিতে যাইতে টুনু তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল—'হয়েছে গো কর্তা, মনে পড়েছে, আমি বেরই করি নি ব্যাগটা, আনিই নি—ভুলে গেছলাম কথাটা।'

অনেক বলায় ঠাণ্ডা হইল। মনটা কিন্তু বড় অপ্রসন্ন হইয়া রহিল টুনুর। বেশ স্মরণ আছে বাহির করিয়াছিল ব্যাগটা, এই ভাবে গেল?—এদেরই উপকার করিতে আসিয়া!

পাছে চাপা দিতেছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করে সেইজন্য

রোজদিনের মতই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফিরিল একটু; তাহার পর কিন্তু বেড়াইতে গেল না, সোজা বাসায় চলিয়া গেল।

রাস্তায় ধারের জানালা দিয়া ভিতরে নজর পড়িতে দেখিল ব্যাগটা বিছানার উপর পড়িয়া আছে। বাড়িতে কিন্তু হট্টগোল, বুড়ীর ওদিকটায়। চরণদাসের মাতলামির হট্টগোল নয়, বুড়ীর নাতি-নাতনীদের যাহা পড়ায় তাহারই টুকরা-টাকরা আটদশটি ছেলেমেয়ের যুক্তকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া খিড়কি দিয়া দেখে বুড়ীর নাতনী একটি ছড়ি লইয়া একটা চেয়ারে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে, বাকি সবাই—ছেলেমেয়ের যত খেলুড়ে সার বাঁধিয়া দাসের উপর বসিয়া পড়ার মত—সবার সামনে এক একখানি করিয়া মোটা বই খোলা, মাষ্টার মশাইয়ের শিক্ষা, রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের বই, তাহার ঘর হইতে সংগ্রহ করা। তাহাকে দেখিয়া সবাই একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। বস্তি হইতে যে মেজাজ লইয়া আসিয়াছিল, সেটা থাকিলে বোধ হয় ধমক দিত, কিন্তু ব্যাগটা পাওয়ায় দৃশ্যটির কৌতুকের দিকটাই মনে লাগিল বেশী করিয়া, তা ভিন্ন মাথায় একটা আইডিয়াও আসিতেছে ধীরে ধীরে, মনটা হয়তো ভালো থাকার জন্যই।

বুড়ীর নাতি কতকটা বোধ হয় অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতাটুকু কাটাইবার জন্য দিদির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—'উ বুললেক বই আনতে।...বুললিক নাই তুই?'

টুলু অন্যমনস্কভাবে আর একটু দাঁড়াইয়া রহিল, কথাটা বোধ হয় কানেও গেল না তাহার। একটু পরে মেয়েটিকেই প্রশ্ন করিল—'চম্পা বাসায় আছে?'

নাই যে সেটা পাঠশালার ঘটা দেখিয়াই বোঝা উচিত ছিল, সাজার ব্যবস্থা মনে করিয়া মেয়েটি সঙ্কুচিতভাবে মাত্র একটু চোখ তুলিয়া চাহিল, ছেলেটি বলিল—'উ তো দাদুটির সাথে কুথায় গেল বটে।'

অন্যমনস্কভাবেই কিছু না বলিয়া টুলু ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু আগে চম্পা আসিয়া উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি—সেই ডাকিয়া আনিয়াছে, এই করিয়া টুলুর যতটা মন পাওয়া যায়। চম্পা একটু রাগতভাবেই প্রশ্ন করিল—'এরা নাকি আপনার বই টেবিল থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?'

টুলু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'সাজা দেবে নাকি?'

'দোষ প্রমাণ হলে পাবে বৈকি সাজা।'

'দোষের কাজ করেছে, কিন্তু সেটা দাঁড়াতে পারেনি দোষে। ...যাক ওকথা, চম্পা, আমি স্কুল খুলব ঠিক করেছি।'

'স্কুল খুলবেন! কোথায়?'

'ঐ স্কুলেই। এখন তো ছুটিই রয়েছে।'

চম্পা চুপ করিয়া মুখের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—'হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল যে?'

'কথাটা বরং একটু ঘুরিয়ে জিগ্যেস করো, অর্থাৎ এতদিন এ খেয়াল হয় নি কেন। আমিও সেই কথাই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম,—এইটিই আমার সবচেয়ে মনের মতন কাজ, এ ত সুবিধেও, অথচ এতদিন হয় নি কেন মনে। কিছুদিন আগেকার কথা—স্কুলের দুটি ছেলেকে বড় ভালো লেগেছিল আমার—বাসায় ডেকে এনে গল্পস্বল্প করতাম। হঠাৎ একদিন টের পেলাম তাদের এখানে আনা মানা। সেই থেকে সেকেণ্ড মাষ্টারের ভয়েই হোক বা তার ওপর ঘেন্নাতেই হোক, মনটা এমন গুটিয়ে গেল যে সেই জন্যেই হয় তো স্কুলের কথা মনে হয় নি।'

শেষের দিকটায় একটু হাসিল।

শেষের দিকটাতেই চম্পার ঠোঁটের একপ্রান্ত বিরক্তিতে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, মন্তব্য করিল—'এ নষ্টামি কি সেকেণ্ড মাষ্টারের?'

'না, ম্যানেজারের।...সেইজন্যেই তো ঘেন্নার কথা বললাম, যারকরা নষ্টামির ওপর নিজের মনুষ্যত্ব বিক্রি করে দেওয়ার শিলমোহর থাকে কিনা।...এই লোকটাই মাষ্টার-মশাইয়ের চেয়ারের অমর্যাদা করছে আজকাল।...যাক কি কথায় কি কথা এসে গেল। মোটের ওপর, স্কুলের কথা ভাবিনি, আজ ওদের স্কুলের ঘটা দেখে হঠাৎই মনে হ'ল—তবে আমি নিজেই বা একটা না বসাই কেন?'

ভিতরে ভিতরে একটি আনন্দের জোয়ার যেন কূল ছাপাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল চম্পার মনে। ভগুনিয়ার সেই আগুন লইয়া যে সেদিন কথা হইল তাহার পর হইতে একটা চাপা আশঙ্কায় তাহার মনটা ছিল ভরিয়া। টুলু যায় নাই কোথাও, আগুন লাগাইবার মত করে নাই কিছু, দিনগত কাজগুলি আগেকার মতই করিয়া যাইতেছে, তবে ভাবটা থমথমে, ভয় হয় যে-কোন মুহূর্তেই হয়তো বাঁধন ছিঁড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। যায় নাই, তবে চম্পার মুক্তি যে মনে বসিয়াছে এমন কোন প্রমাণও পায় নাই চম্পা। প্রসঙ্গটা নূতন করিয়া তুলিতে সাহসও হইতেছিল না, মুখ বুজিয়া প্রচ্ছন্ন শঙ্কিত দৃষ্টিতে গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল।

এ সব উল্লাস প্রকাশ করিতেও সাহস হয় না বরং ভয় হয় পাছে আপনা হইতে প্রকাশ হইয়া পড়ে। চম্পা নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল, "তা আমায় ডেকেছেন যে?"

"ছেলে জোগাড় করতে হবে, আড়কাঠি চাই না?"—একটু হাসিল।

বড় মিষ্ট লাগিতেছে চম্পার, এমনই এই সেবার আহ্লাদ-ভরা লাগে মিষ্ট, আজ আশঙ্কার অবসানে আরও মিষ্ট

লাগিতেছে, একটু ঘাঁটাইয়া কথা বাড়াইতে ইচ্ছা করিতেছে। বলিল—"আমার দ্বারা হবে মনে করেন ?"

"সে কি কথা ? তুমি আমার কেড়ে আনতে পার যে ছেলে।"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিল, চম্পাও হাসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—"হীরের বদনাম আমার যাবে না জীবন থেকে দেখছি। বেশ, দেখব আমি চেষ্টা, আমার কেড়ে আনা ছেলের যখন দর আছেও দেখছি। কিন্তু একটা কথা ওরা ও-স্কুলে জায়গা দেবে কেন ?"

"সেইটেই তো আমার উদ্দেশ্য।"

"বুঝলাম না।"

"জোর করে নোব জায়গা, আমার যা কাজ তাতে ও বোঝাপড়াটা তো এক সময় না এক সময় করতেই হবে এদের সঙ্গে চম্পা।"

চম্পার মুখের দীপ্তিটা যেন নিভিয়া গেল, সেই বিদ্রোহ, সেই শুশুনিয়ার আগুন মনে মনে ধিকি-ধিকি জ্বলিতেছে ; পড়ানো একটা অছিলা মাত্র।

সমস্ত আশঙ্কার কথাটা না বুঝিলেও টুনু আবার একটু নরম হইয়া গেল, হয় তো এই ভাবিয়া যে চম্পা এতটার জন্য প্রস্তুত নয়, সহায়তা দিয়া উঠিতে পারিবে না। বলিল—কিন্তু এখন সে ভয় নেই, স্কুল বন্ধ, আমি নিজে পড়াচ্ছি, এতে আর কার কি আপত্তি থাকতে পারে, বিশেষ করে ম্যানেজার নেই যখন।

চম্পা প্রশ্ন করিল—এর পরে—স্কুল খুললে ?

"আমার স্কুলটা হবে সকালে, কারুর স্কুলের ঘাড়ের ওপর তো স্কুল বসাতে যাচ্ছি না।"

কথাটা এমন একটু চাপা উষ্মার সহিত বলিল যেন চম্পা ও-পক্ষের উকিল, তাহার মারফতে ও-পক্ষকেই শুনাইয়া দিতেছে কথাটা।

চম্পা হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"আমার ওপর রাগের কিছু নেই, আমি তো ঘাড়ের ওপর স্কুল বসাতে চাইলেও ছেলে-মেয়ে এনে দোব আপনাকে, অন্ততঃ চেষ্টা করব। বলছিলাম চারদিক দিয়ে কথাগুলো একবার ভেবে দেখা ঠিক নয় কি গোড়াতেই ?

টুনু আবার নরম হইল, বোধ হয় একটু অপ্রতিভও, বলিল—"না, আমি যে ওদের ঘাড়ে পড়ে ঝগড়াই করতে চাইছি এমন নয়। তাতেও আপত্তি হয় ওদের, তখন এইখানে সরিয়ে আনব আমার স্কুল। বেঞ্চ ডেস্কগুলো যে এতই দরকারী এমন তো নয়…"

চম্পা একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল, তাহার পর একটু সঙ্কুচিতভাবেই বলিল—এইখানেও ঐ ভয় আসে না কি ?

টুনু এবার বেশ ভাল ভাবেই রাগিয়া গেল, বিছানার উপর গুটাইয়া বসিয়া বলিল—'না চম্পা, এখানে আমি কারুর অধিকার মেনে নোব না। আমি যে তার জন্যে কতদূর পর্যন্ত তোয়ের আছি, আর কেউ না জানুক তুমি তো জান সেকথা। এ মাষ্টারমশাইয়ের বাসা, আমার চোখে তাঁর মন্দির ; তাঁর জীবনের যা ব্রত—তার যতটুকু আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তা সাধ্যমত আমি পালন করবই—সে সাধ্যমতর মানে কি তুমি তা জানোও। তোমার সাহায্য আমি চেয়েছি এই বিশ্বাসে যে খানিকটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে এগুতে তুমি তোয়ের আছ, তা যদি না থাক তো…'

চম্পা ধীরে ধীরে মুখটা তুলিল, একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলিল—"খানিকটা কেন ? যতদূর আপনি নিয়ে যাবেন দয়া করে। বললাম তো ভয়ের জন্যে নয়, কাজ যাতে আপনার ভালো করেই হয় তাই জন্যেই চারদিক শুধু একটু ভেবেচিন্তে দেখা ; সেও কি আপনার চেয়ে আমি ভালো করে দেখতে পারি ?"

ক্রমশঃ

পান্থবীণা

এ এন এম বজলুর রশীদ

ধূসর ধুলায় পথ বেয়ে যায় পান্থ বাজায় বীণ—
অন্তরে তার কোন্ অতীতের বেদনা অন্তহীন।
বাজে বাজে সুর বিরহ-বিধুর তবু তা মধুর লাগে—
তারে তারে তার চির-সুন্দর অনন্ত অনুরাগে,
তনু মন ধন অঞ্জলি মাগি আপনি তাহারে নিয়া—
কত না লীলায় যুগ হতে যুগ ওঠে সে উচ্ছ্বসিয়া।
সে যে বীণ কার—জাগে সন্দেহ জাগে শত সংশয়
আপনার হাতে পান্থ বাজায়—কোথা সুর-তান-লয় ?
সঁপি দেয় দেহ-বীণাখানি তার সুন্দর আসি জাগে—
মধু গাঁথায়ে বেদনার তারে এ কি সংঘাত লাগে !

এত যে দুঃখ দৈন্য অপার তবুও তাহার মাঝে
চিরবন্ধুর প্রীতির বারতা নব বৈভবে বাজে—
বাজে বাজে সুর অজানা বঁধুর পান্থবীণার তারে—
ফুল ফোটে, তার পরাগপরাগ বিকশিত মধুভারে ;
শুধু অনুভূতি—নামে শুধু ফাঁকি শুধু কলকোলাহল
ডাকি—ডাকি তারে, তুমি যে আমার আনন্দ উচ্ছল।
বাজাও বুকের তারে তারে তব বিচিত্র সঙ্গীত,
আমি শ্রোতা তার—হারাই আমার দুঃখের সম্বিৎ।
তুমি তুলে লহ পান্থের বীণা, আনন্দ-বেদনায়
পথিক চলিবে অন্তর মথি যে সুরে ডাকিবে তায়।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা ও কিশোর আন্দোলন

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন মনোবৃত্তি বিকাশের অনুকূল এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা গভীর যোগ আছে। আমেরিকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা খুব ছোটবেলা থেকেই গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, ফলে শিক্ষায় ও কাজে তারা আদর্শ মানুষ হবার সুযোগ পায়। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তারা দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং নিজেদের আদর্শ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের দেশ ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গর্ববোধ করতে শেখে। তারা ভাবীকালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে জীবনের পথে চলে, বিধিনিষেধ এবং সংস্কারের জগদ্দল পাথরকে ভেঙেচুরে চলার পথকে সুগম করে তোলে। আজ আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা বলে কোন জিনিষ নেই বললেই হয়, শতকরা ৯৫ জন লিখতে পড়তে জানে। স্কুল-কলেজের সব রকম কাজে ও খেলায় মেয়েরা কোন অংশে ছেলেদের চেয়ে কম যায় না। গরিব ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে বৃত্তি পায়। তারা খুশীমত নিজ নিজ শিক্ষার বিষয় বেছে নেয়, স্কুল-কলেজেই ছাত্রেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সুযোগ লাভ করে।

আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থা অনুযায়ী নানা মত ও পথ অনুসরণকারীদের নিয়ে শিক্ষা আন্দোলন সুরু হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্য এই আন্দোলনকে নবজীবন দান করে। আমেরিকার সমস্ত প্রদেশেই ৬ থেকে ১৪ ও ১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বছরে তিন মাস ছুটি, বাকী নয় মাস সকাল নয়টা থেকে বেলা চারটা পর্য্যন্ত স্কুল। শীতকালে বিদ্যালয়সমূহে পড়ার চাপ একটু কম। সে সময় প্রত্যেক স্কুলে খেলাধুলার ধুম পড়ে যায়, তাতে স্কুলের সকল ছাত্রেরই সমান দাবি। আমেরিকার প্রায় ২,৪০,০০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে বেশীর ভাগই 'পাবলিক'-স্কুল। যে যে শ্রেণীর পাবলিক-স্কুল আছে, তাদের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল—

এই সমস্ত স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রকম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। তা ছাড়া হাতে কলমে কাজ শেখাবার কার্য্যকরী-স্কুল, বিশেষ বিশেষ শিল্প-বিদ্যালয়, বেসরকারী স্কুল ইত্যাদি আছে। দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথকভাবে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রোমান, ক্যাথলিক, কোয়েকার্স ও মার্মান্‌স্ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বিদ্যালয় বিদ্যমান। সাধারণতঃ এই সব প্রতিষ্ঠানে ১২ বছর বয়সেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়ে যায়। ১৮ বৎসর বয়সে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে নিতে হয়, তারপর আরো চার বছর ধরে চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা।



একটি উচ্চ বিদ্যালয়

আমেরিকার স্কুলের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় নার্সারি-স্কুলের (শিশু-বিদ্যালয়) কথা। এই সব স্কুলে দুই-তিন বছরের ছেলেমেয়েরা খেলার মধ্যে ডুবে থাকে। এখানে খরচ একটু বেশী দিতে হয়। তাদের জন্য আলাদা থাকবার জায়গা, চেয়ার টেবিল, বইপত্র ও খেলার জিনিষ

	বিদ্যালয়	বিদ্যালয়-সংখ্যা
১।	সাধারণ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় (কিণ্ডারগার্টেন সমেত)	২২৩,২৯৫ (লক্ষ)
২।	বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১,৩০৬ (হাজার)
৩।	বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়	৩,৫৬৮ („)
৪।	কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাদারী স্কুল	১,৭৫১ („)
৫।	বোর্ডিং-স্কুল	২৮১
৬।	বেসরকারী ব্যবসায় স্কুল	২,০৯৯ (হাজার)
৭।	নার্সিং-শিক্ষার স্কুল	১,৩১১ („)



স্কুলের একটি লাইব্রেরী-ঘর

এবং আলাদা ডাক্তার ও নার্স থাকে। এই সমস্ত নার্সারি-স্কুল (সংখ্যায় ১৫০০) সাধারণতঃ সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে। অবশ্য বেসরকারী ভাবেও অনেক স্কুল পরিচালিত হয়। প্রত্যেক স্কুলে ৩০ জন ছাত্র নিয়ে হয় এক একটি ক্লাস, তাতে তিন জন করে শিক্ষক থাকেন। খেলাধুলার ব্যবস্থাও যথেষ্ট থাকে। তারা যে জগতে বাস করে তাকে বাস্তবিকই বলা চলে আনন্দময় জগৎ।

আমেরিকার কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের বাহ্য দৃশ্য যেমন সুন্দর তেমনি সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিতও বটে। আমেরিকার সমস্ত কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল্ ও মাদাম মন্টেসরি উভয়েরই শিক্ষা-পদ্ধতি নাচ-গান, হাতের কাজ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়ে অনুসরণ করে।

শরীর ও মন উভয়েরই উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে সাম্প্রতিক প্রাথমিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে ওঠে। ৬ থেকে ১২ বছর পর্য্যন্ত তাদের প্রাথমিক শিক্ষার কাল। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় হ'ল—লেখা-পড়া, সংখ্যা ও রাশি-জ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজনীতি, চিত্রকলা ও সঙ্গীত, ভাষা-শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চ্চা। সর্ব্বত্র বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব স্কুলের কিশোরবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক একটি কিশোর-দল। এই দল ও দলের নেতাদের বিশেষ কদর আছে। তারা হাতে-কলমে কাজ করে নানা বিষয় শেখে, ছবি আঁকে ও লেখাপড়া করে, স্কুলের ক্লাস-রুমে পাশাপাশি বসে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। হালক্যাপানের যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, সেখানকার শিক্ষা-পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় যাতে প্রত্যেকটি ছাত্র যে-কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করে গুরু-তর বিষয়েও আলাপ-আলোচনা করতে পারে। তারা নিজে-দের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হয় আর স্ব-স্ব শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ দ্বারা পারিপার্শ্বিককে সুন্দর করে তোলে। আমেরিকার সর্ব্বত্র বিভিন্ন প্রদেশের শহরে বড় বড় স্কুল ও কিশোর-প্রতিষ্ঠান আছে। শহর থেকে দূরে কোথাও কোথাও দুয়েকটা মিশন-স্কুল বিদ্য-মান। পার্ব্বত্য অঞ্চলে 'বেরি-স্কুলে' প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি-ষ্ঠাতা মিস্ মার্থা বেরি আমে-রিকার কিশোর-শিক্ষা-আন্দোলনের একজন অধিনায়িকা। এখনও আমেরিকার গ্রামাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে দূর-বর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে অনেক ছেলেমেয়ে পড়তে আসে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২০ লক্ষ। এক একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানো হয়। খোলা মাঠের ধারে আলো-বাতাসপূর্ণ, কাঠের তৈরি স্কুল-বাড়ীতে তাদের ক্লাস বসে। এই সব ছোটখাটো গ্রাম্য বিদ্যালয় পরিচালনার ভার শহরের বড় বড় স্কুল-কমিটির ওপর ন্যস্ত।

আগে যে সকল বনাঞ্চলে কাঠের তৈরি ঘরে পাইওনিয়র দলের শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল আজকাল সে সব স্থানে শহরের পত্তন হয়েছে এবং সেগুলোতে সম্প্রতি অনেকটা জায়গা জুড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র ও ২২৮ জন শিক্ষক নিয়ে এক একটি আটমহলা 'আধুনিক' শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেই সব আধুনিক স্কুল-বাড়ীগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আছে—

১। গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য সাতখানি ক্লাস-রুম। ২। উদ্ভিদতত্ত্ব শিক্ষার বিশেষ মহল। ৩। চিড়িয়াখানায় জন্তু-জানোয়ারদের বাসস্থান। ৪। জামা-কাপড় পরিষ্কার করার দোকান। ৫। দপ্তরীখানা। ৬। বই ও আসবাবপত্র সমেত ব্যাঙ্কিং বিভাগ। ৭। ২০০ সেলাই কলের কাজের জন্য সাতখানি ক্লাস-রুম। ৮। ২০০ টাইপ-যন্ত্র সমেত ক্লাস-রুম। ৯। ব্যবসায়-বিভাগ। ১০। দোতলায় বাস্কেট-বল খেলার মাঠ। ১১। স্নানাগার সমেত চারখানি ব্যায়ামাগার।

অবশ্য সব জায়গাতেই এক রকম ব্যবস্থা নয়। সাধারণ



একটি কলেজ-লাইব্রেরী

স্কুল-বাড়ীর গাঁথুনি থাকে পাকা, দোতলা কি তেতলা বিদ্যালয়-গৃহ, বেশ আলো-বাতাস খেলে, প্রত্যেক ক্লাসে থাকে ডেস্ক ও টেবিল, দেয়ালে ছেলেমেয়েদের হাতে-আঁকা ছবি ও তাদের হাতে-গড়া মাটির ফুলদানি আর ফুলের তোড়া। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে নিজের নিজের কাজ ও পড়াশুনা করে।

শহর অঞ্চলের ছাত্রেরা সময় সময় দল বেঁধে মিউজিয়ম ও প্রদর্শনী দেখতে বেরিয়ে পড়ে, কারখানা ও বন্দরাদিতে গিয়ে কিছুকাল কাটায়। তারা স্কুলের ক্ষেতে কাজ করে, বাগান তৈরি করে—তাদের নিজস্ব ক্লাব, নাচ, গান ও অভিনয়ের আসর আছে। আমেরিকার সব বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যচর্চা ছাত্রদের একটা প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই খেলার মাঠ থাকে। খেলাধুলো সেখানকার শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। শীতের সময় স্কী, স্কেটিং ইত্যাদি খেলা এবং গ্রীষ্মের সময় সন্তরণাদি জলক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে।



স্কুলের 'সঙ্গীত-চক্র'

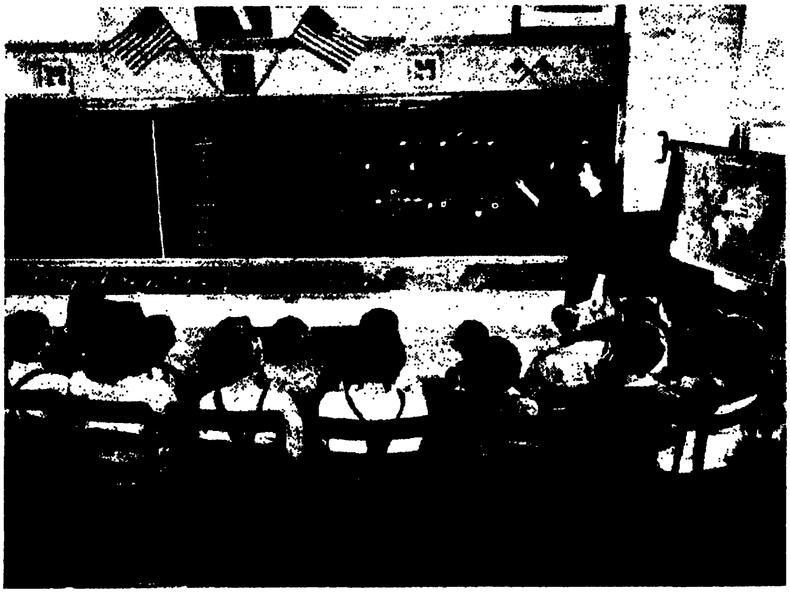
আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৪ থেকে ১৭ বছরের ছেলে-মেয়েরা প্রথমে নবম শ্রেণী থেকে পড়া সুরু করে, দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে পড়া শেষ হয়। কোন কোন প্রদেশে জুনিয়র বিদ্যালয়ে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণী এবং সিনিয়র বিদ্যালয়ে দশম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত থাকে। ১৯৪১ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৩,৩৪,০০০ জন।

এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ের বাইরে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে কাজ ও খেলার ভিতর দিয়ে তাদের পরিচয় ঘটে। তাদের নিজস্ব ষ্টেডিয়াম, বিতর্ক-সভা এবং বক্তৃতামঞ্চ ও নাট্য-মঞ্চ আছে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-প্রতিনিধিরা সভা-সমিতিতে যোগদান করে নানা সমস্যার আলোচনা করে। তাদের সেই সব বিতর্ক-সভায় শিক্ষকেরা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ তাদের বিতর্কের বিষয় থাকে—যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সমস্যা, আন্তর্জাতিক সমস্যা ইত্যাদি।

ছুটির দিনে ছাত্রদের নাচ-গানের আসর বসে। প্রত্যেকে স্কুল-লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ পড়বার এবং পড়ে শোনাবার ব্যবস্থা আছে। গ্রামাঞ্চলে মুটে-মজুরদের ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়ে। শহরের ছেলেমেয়েরা ছুটি পেলেই কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার ও কৃষি-প্রতিষ্ঠানাদি পরিদর্শন করতে বেরিয়ে পড়ে। এমন কি, দেশের ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে পর্য্যন্ত সেখানকার আলোচনা শোনে।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য-চর্চ্চার কেন্দ্র। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরিয়ে এসে যে-কোন ছাত্র এখানে আইনবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, বিজ্ঞান বা সাংবাদিকতা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে। সাধারণতঃ শিক্ষা-সমাপ্তির কাল চার বৎসর। কোন কোন জায়গায় মাহিনা অত্যন্ত বেশী, অবশ্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আমেরিকার জুনিয়র কলেজগুলো সম্প্রতি হাতে-কলমে শিল্প-শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এ-গুলোতে সাধারণতঃ শিক্ষার সময় দু'বছর। এ দেশের প্রায় ৫০০ জুনিয়র কলেজের ছাত্রসংখ্যা হ'ল ১০৬৬২৩।



গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত-শিক্ষা

সম্প্রতি আমেরিকার প্রগতিপন্থী শিক্ষায়তনগুলো খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে শিশু-মনের স্বাভাবিক বিকাশই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আসল লক্ষ্য। এখানকার ছাত্রেরা বই পড়ে যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশী শেখে কাজ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের আসল উদ্দেশ্য হ'ল শিশুদের এমনভাবে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমেরিকার শিল্পবিদ্যালয়গুলোতে কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, হাতের কাজ বয়নশিল্প, চিত্রকলা ও সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে পার্ট-টাইম (আংশিক সময়) ক্লাসের ব্যবস্থা। নিউইয়র্কের কলেজের ১৭ বছরের ছেলে-মেয়েরা পর্য্যন্ত এই সব বিদ্যালয়ে সপ্তাহে চার ঘণ্টা করে ক্লাস করে।

আমেরিকার বেসরকারী বিদ্যালয়গৃহসমূহ আধুনিক রুচি-সম্মত এবং তার পরিবেশও খুব সুন্দর। মেয়েদের জন্য বোর্ডিং-স্কুল, চার্চ-স্কুল ও আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় আছে। রোমান ক্যাথলিক 'সেপারেট-স্কুল' আরও জনপ্রিয়। তাদের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংখ্যা হ'ল—২৩,৮৫,০০০। বেসরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা—২,৫০,৫০০। ধর্ম্মযাজকেরাই সেই সব বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যে আমেরিকায় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাদের জন্যে আলাদা স্কুল, আলাদা শিক্ষার সরঞ্জাম। অন্ধ ছেলেমেয়েদের বোর্ডিং-স্কুলের সংখ্যা ৫০, বধির ছেলেমেয়েদের স্কুল ৭৯টি, মূক ও পাগল ছেলেমেয়েদের স্কুল ১০৪টি, দুর্বল ও রুগ্ন ছেলে-মেয়েদের স্কুল ১৪২টি। তা ছাড়া আরও প্রায় ৩২৫০০০ জন দুঃস্থ ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় আছে। তারাও রীতিমত লেখাপড়া করে, বেতের চেয়ার টেবিল ও মাদুর বোনে, জামা কাপড় তৈরি করে। বিভিন্ন শহরে এই শিক্ষা-কেন্দ্রের শাখা আছে। সেইসব শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্র- সংখ্যা হ'ল ১৪ হাজার ও শিক্ষক ১৫০ জন।

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ মহিলারাই শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। তাঁদের বার্ষিক বেতন সাধারণতঃ ১৬২৫ টাকা থেকে ৪৫৫০ টাকা পর্য্যন্ত। শহর অঞ্চলের শিক্ষকদের বার্ষিক বেতন হ'ল ৬৫০০ টাকা, গ্রামাঞ্চলের ২৭০০ টাকা। বেশীর ভাগ শিক্ষক গ্রামের সাধারণ বিদ্যালয়ে কাজ করেন। গ্রামের পুরনো শিক্ষকেরা (সংখ্যায় ১২ হাজার) বার্ষিক ৯৭৫ টাকা মাত্র বেতন পান। প্রতি বৎসরে আমেরিকার নর্মাল স্কুল থেকে প্রায় বিশ হাজার শিক্ষক নানা বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রায় ২৩,৩০,০০০ জন সভ্য নিয়ে যে 'জাতীয় শিক্ষক মহাসমিতি' গঠিত হয়েছে, তার প্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে কলেজ পরিদর্শন করা।

আমেরিকার বিদ্যালয়-বিভাগ প্রতিটি ছাত্রের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত। শিক্ষকেরা প্রত্যেক ছাত্রকে নানা ভাবে পরামর্শ দেন, নির্দেশ দেন, গবেষণায় সাহায্য করেন। বিদ্যালয়, স্কুল-মিউজিয়ম, পাঠাগার ও প্রদর্শনী—সকল ক্ষেত্রেই ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত শক্তি কাজ করে। শিক্ষা-বিভাগ থেকে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি, রেডিও, ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য অর্থসাহায্য করা হয়। শিক্ষা-বিভাগের সভ্যেরা পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করেন।

আমেরিকায় কৃষি ও ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ হয়। ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-সংখ্যা প্রায় ২৪,৩৪,৩৪১, কৃষি-বিদ্যালয়ের প্রায় ৫,৯৬,০৩৩, শিল্প ও বাণিজ্য-বিদ্যালয়ের প্রায় ৮,১০,১০২, ঘরোয়া বিদ্যালয়ের প্রায় ৮,৭১,৫৯১ এবং অন্যান্য শিক্ষালয়ের প্রায় ১,৫৬,৬১৫ জন। তাদের জন্য ৩০,০০০ শিক্ষক আছেন। সেখানকার, সর্বসমেত ১,১৭,০০০ জন শিক্ষকের জন্য



একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চলছে

১৭৫১টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। সেই সব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ১৯৫ কোটি টাকা। আমেরিকার ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা-দানের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে ১,৮৬,৫০০ জন বি-এ, ২৬৭৩১ জন এম-এ, আর ৩১৯০ জন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী।

সেদেশে পাবলিক স্কুলের ছাত্রদের খরচ অনেক কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার্ষিক বেতন ২৫৬ টাকা। যারা বোর্ডিং-হোষ্টেলে থেকে পড়ে, তাদের খরচ খুব বেশী। তাদের জন্য যে কি প্রচুর পরিমাণে টাকা খরচ হয়, তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। যথা—

১। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে— বার্ষিক ৩১৭০ টাকা
২। রোমান ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানে—" ২১২৫ "
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে— " ১৫৬০ "
৪। সরকারী প্রতিষ্ঠানে— " ১৪৭৫ "
৫। সরকারী শিক্ষক-প্রতিষ্ঠানে— " ১০২০ "
৬। নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ে— " ৮৪৫ "

আমেরিকার শিক্ষা-আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁদের নাম অমর হয়ে আছে, তাঁদের মধ্যে টমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন্, হেনরী বার্নার্ড ও হোরেসম্যানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজকের আমেরিকার 'ম্যান'-বিদ্যালয় ও বার্নার্ড-বিদ্যালয় খুব জনপ্রিয়। আমেরিকার কলেজের 'সমবায়-ভবন' আর একটি আনন্দ নিকেতন। প্রত্যেক বাড়ীতেই বিরাট শয়নাগার, রেস্তোরাঁ ও লাইব্রেরি আছে। তাদের সমস্ত কাজ সমবায়-নীতিতে পরিচালিত হয়। সম্প্রতি প্রায় ৪০০ 'সমবায়-ভবন' আছে। মাত্র পাঁচ বছর আগে শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমবায় আন্দোলন সুরু হয়। গোড়ার দিকে শহরে ও গ্রামে অনেক বাসগৃহ তৈরি করে ছাত্রদের থাকবার জন্যে ভাড়া দেওয়া হয়, পরে সেই ঘরভাড়ার টাকা প্রতিষ্ঠানের ভাণ্ডারে গিয়ে জমা হয়। বর্তমানে প্রতিটি সমবায়-ভবনে শোবার ঘর, কাজের ঘর, নাচের ঘর, স্নানাগার, আলো-বাতাসযুক্ত পাঠাগার এবং আসবাবপত্রে পূর্ণ বসবার ঘর আছে। কোন কোন কলেজের 'সমবায়-বাড়ী'র বিশেষ প্রতি-



সমবায়-বাড়ীর আধুনিক পঠাগার

নিধি-দল থাকে, তারা সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা করে টেলিফোনের সুইচ-বোর্ডের কাজ, বাগানের কাজ, টাইপের কাজ ইত্যাদি আরো হরেক রকম কাজ করে। অনেক কলেজের দশ বারটা 'সমবায়-বাড়ী' থাকে। বিবাহিত ছাত্রদের জন্যে আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের খেলাধুলোর প্রোগ্রাম সমিতির সভ্যেরা ঠিক করে। বিভিন্ন প্রদেশে যে সব সমবায় প্রতিষ্ঠান ও সঙ্ঘ আছে তাদের নিয়মিত বার্ষিক সম্মেলন হয়। এই সব 'সমবায়-বাড়ী'র প্রায় এক লক্ষ ছাত্র নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কাজ চালায়।

প্রেম-স্বপ্ন

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

বাসন্তী সন্ধ্যার কোনো তারারাও যদি নেমে আসে
তোমার ধূসর-নীল পৃথিবীর এই চারিপাশে,
যেখানে পলাশবন যৌবনেরে করে অনুভব—
মানুষের ভিড় যেথা করে গেছে বহু কলরব,
যেখানে পাহাড় আজো স্বপ্ন দেখে 'বরাক' নদীর,
তোমার কুমারী-চোখ তবু জানি হবে না অধীর।
তবু জানি তব মনে দোলা দেবে খুশীর বাতাস,
নিটোল দু'চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখিবে আকাশ।
সে আকাশ এ পৃথিবীর পাশে পাশে দেখেছে স্বপন,
সাগরিকা-মন নিয়ে কত প্রেম করেছে বপন
মানুষের সাধনায়। মৃত্তিকার করি তা সন্ধান
তাই আমি আনমনে তারি নীল-সমুদ্রের গান।
সে গান অনেক দূরে তব প্রেম করিবে প্রচার—
মোর কাছে চুপি এসে দেখা তুমি দেবে যত বার।

অন্ত্য ও আদ্য

শ্রীবিমলাচরণ দেব

মহাভারত, ১২, ২০১, ৮ (চি ভে) পাই (মনু প্রজাপতি-বৃহস্পতি সংবাদে) প্রজাপতি মনুর কাছে মহর্ষি বৃহস্পতি গিয়ে বলছেন—

"ঋক্‌সামসংঘাংশ্চ যজুংষি চাপি
ছন্দাংসি নক্ষত্রগতিং নিরুক্তম্।
অধীত্য চ ব্যাকরণং সকল্পং
শিক্ষাং চ ভূতপ্রকৃতিং ন বেদ্মি॥"

অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজুঃ, সমস্ত পড়লাম, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প, শিক্ষা সমস্ত। কিন্তু ভূতপ্রকৃতি, অর্থাৎ সংসারের হালচাল বুঝতে পারলাম না।

গভীর হতাশার ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "এত পড়লাম, এত খাটলাম, সংসারের রকমখানা বুঝলাম না।"

যেন নিজের অজ্ঞাতেই বৃহস্পতি আসল কথাটাই বলে ফেলেছেন, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭. ১. ১-৩-এ নারদ বলে ফেলেছেন সনৎকুমারের কাছে।

বৃহস্পতি যেন বলছেন—তাঁর সমস্তই পুঁথিপড়া বিদ্যা, সমস্তই theoretical, যাকে মহাভারতে অন্যত্র 'আগম' বলেছে, যা 'প্রত্যক্ষ', practical, থেকে একান্ত তফাৎ। বস্তুতঃ, 'আগম' বড় বেশী অনুশীলন করলে (অর্থাৎ 'প্রত্যক্ষ' দ্বারা যাচিয়ে না নিলে) সেটা প্রায়ই 'আগড়ম বাগড়ম্' হয়ে দাঁড়ায়। বোধ হয় এই ভেবেই শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১. ৭. ২০ বলেছেন—'প্রত্যক্ষ ও তৎপ্রসূত অনুমান'ই মানুষের সর্বশ্রেয়ঃ করে : 'আগম', 'শব্দপ্রমাণ' বাদ। মহাভারতেও আছে—"আগম শুনতে চাই না, প্রত্যক্ষ কি জান, বলো "।

এ হিসাবে, মহাভারতে এখানে যে বৃহস্পতিকে 'মহর্ষি' বলা হয়েছে, সেটা 'প্রৌঢ়ীবাদ' বলে মনে হয়। তাঁর বিদ্যা পুঁথিপড়া মাত্র, 'শ্রুত' মাত্র থেকে হওয়ায় তিনি 'শ্রুতর্ষি'। 'ঋষি' নহেন। কারণ, 'ধর্মে'র সহিত 'সাক্ষাৎকৃত' না হতে পারলে কেউ "ঋষি" পদবাচ্য হতে পারেন না। 'মহর্ষি' ত আরও উপরে। তাই বলছি, এখানকার বৃহস্পতি 'শ্রুতর্ষি' মাত্র।

বৃহস্পতি যে হতাশ হয়ে পড়েছেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক। সৃষ্টি যা বিরাট, তাতে রকমারিও এত; নানা বৈচিত্র্য; রাস্তা কত, গোলকধাঁধার মত; মত কত, পরস্পরের থেকে কত তফাৎ, অনেক জায়গায় পরস্পরবিরোধী। মাথা গুলিয়ে যাওয়া, 'বুঝতে পারলাম না' বলা আশ্চর্য নয়। বিশেষ করে চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে।

কিন্তু যদি এত পড়া, 'প্রত্যক্ষে'র সঙ্গে মিলিয়ে যাচিয়ে নেওয়া যায়, দেখা যায়—সৃষ্টিতে 'অগণ্যত্ব'র নীচে মূলগতভাবে 'একত্ব', অদ্বৈত' আছে। সৃষ্টিতে অসংখ্য প্রকারের বস্তু আছে বটে, যার সংখ্যা ভাবতে মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু শেষে দেখা যায় যে সমস্ত মূলতঃ 'এক'।

এই মূলতঃ 'এক'-এর কথা ভেবেই উপনিষৎ বলেছেন—'তদ্ নাত্যেতি কশ্চন' (কাঠকোপনিষৎ) আরও 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্' ছান্দোগ্য ৬. ২. ১.। 'সৎ'-এর ব্যাখ্যা শাঙ্কর-ভাষ্য করেছেন—'সদেব সদিত্যস্তিতামাত্রম্', অর্থাৎ যখনই তাঁর কথা উঠবে, তখনই বলতে হবে 'আছেন'। যেমন বাইবেলে ভগবান্ সম্বন্ধে বলা আছে—'I am that I am' অর্থাৎ যখনই আমার সম্বন্ধে বলবে, তখনই 'আছি' এই 'বস্তু' ছাড়া অপর যে-কোনও বস্তুর কথা বলো, সে এক কালে না এক কালে 'আছে', কিন্তু এমন কাল ছিল যে সময়ে সে বস্তু 'ছিল না', এবং এমন কাল আসবে যে সময়ে সে বস্তু 'থাকবে না'। এই ভাবে সর্বকালে 'আছে' বলা যায়, এ রকম দ্বিতীয় 'বস্তু' নাই। এই হ'ল একটা কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্', আনন্দগিরি বলছেন—'একম্···সজাতীয়স্বগতভেদহীনম্,' অর্থাৎ যাঁর 'সজাতীয়' কিছুই নেই, তাঁর 'জাতীয়' তিনি একা। তা ছাড়া তাঁর 'স্বগতভেদ' নেই। যেমন হাত সম্বন্ধে চেটো, পিঠ, আঙুল বা কোন দ্রব্য বা স্থানের দক্ষিণ, বাম, উত্তর, দক্ষিণ বলা যায়। এঁর সম্বন্ধে সে সব বলা যায় না, তিনি এ রকম 'বৃহৎ' যে সমস্ত সৃষ্টিকে একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে 'অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্'—তাঁর ডাইনে বাঁয়ে, উত্তর দক্ষিণ বলি কি করে? এই ত হ'ল 'একম্'।

তার পর 'অদ্বিতীয়ম্'। আনন্দগিরি বলছেন "বিজাতীয় ভেদশূন্যম্' অর্থাৎ একম্ ব্যাখ্যা করে বললেন যে তাঁর 'সজাতীয় কিছুই নেই ও তাঁর স্বগতভেদও নেই, বেশ, তাঁর থেকে অন্য জাতীয় কিছু থাকতে পারে ত? উত্তর হচ্ছে—'না তাঁর থেকে অন্য জাতীয়ও কিছু নেই'।

বোধ হয় এর চেয়ে 'আত্যন্তিক এক' (absolutely one) হতে পারে না।

সৃষ্টির চিত্তবিভ্রমকারী নানাত্বের মধ্যে মূলগত "একত্ব" দর্শন সম্বন্ধে ঈশাবাস্যোপনিষৎ ৭ বলেছেন—

"যস্ত সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

তা হলে দাঁড়াল—সৃষ্টিতে যত রকমই দেখ, মূলতঃ সমস্তই "এক"।

এখানে একটা কথা বলে নিই। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের

"সৃষ্টি"তে যে "একত্ব" দেখেছিলেন, আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যন্ত্র সাহায্যে সেই "একত্ব" দেখছে। তবে বোধ হয় ঋষিদের "একত্ব" সূক্ষ্মতর ভাবের।

এ সম্বন্ধে এক জন আমেরিকান লেখকের লেখা একটু উদ্ধৃত করছি—

"It is to J. J. Thomson (E) that Science is chiefly indebted for the experimental verification of the Electron theory. Thomson benefited from the invention (1897) by Wilson (E) of an extraordinarily ingenious instrument known as a cloud chamber, which makes it possible to photograph and actually see the tracks left by electrons and protons as they move about. In 1899, Thomson succeeded in detaching electrons from atoms by the use of the X-Rays, studied them in Wilson's cloud chamber, determined for the first time the charge of a single electron and showed that, regardless of what sort of matter they come from, the ultimate particles are the same. Thus did scientists finally demonstrate that the hypotheses advanced by Prout and Lorentz are true, and that all matter is composed of the same material."—(Erik Achorn, *European Civilisation and Politics Since 1815*, p. 687).

একজন বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর একখানি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করি—

"It (Chemistry) divides ponderable bodies into some seventy-eight elements, the relations of which to each other have been determined in the periodic system of the elements, and their probable common origin from some primitive matter (prothyl) been shown." (Ernst Haeckel, *The Wonders of Life*, Chapter XVIII, p. 151).

এঁরই আর একখানি পুস্তকে আছে—

"The recent speculations of Gustav Wendt, Wilhelm Preyer, Sir William Crookes, and others have pointed out how we may conceive the evolution of the elements from a simple primitive material, the prothyl." —(Ernst Haeckel, *The Riddle of the Universe*, Chapter XII, p. 79).

এতেও দেখছি—Some primitive matter বা material, কোনও আদি বস্তু এক প্রকার স্থূল দ্রব্য। কিন্তু ইনিই নিজের দ্বিতীয় পুস্তকখানিতে সূক্ষ্মতর ভাবে পৌঁছেছেন—

"Among the various modifications which the fundamental idea of substance has undergone in modern physics, in association with the prevalent atomism, we shall select only two of the most divergent theories for a brief discussion, the kinetic and the pyknotic. Both theories agree that we have succeeded in reducing all the different forces of nature to one common original force, gravity and chemical action, electricity and magnetism, light and heat, etc., are only different manifestations, forms, or dynamodes of a single primitive force (prodynamis)."—(*Riddle of the Universe*, Chapt. XII, p. 77).

দেখছি যে এই মনীষী প্রথমে স্থূল primitive matter বলে পরে এসে পৌঁছেছেন সূক্ষ্ম primitive force-এ—যা থেকে সারা সৃষ্টি উদ্ভূত হয়েছে।

এতে মনে পড়ে শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১.৬৩—

"যচ্চ কিংচিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা"

সৎই হোক, বা অসৎই হোক, যেখানে যা কিছু বস্তু আছে, তার শক্তি তুমিই। আদি শক্তি, যা থেকে সমস্তই উদ্ভূত।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সৃষ্টির আদি আকার বোধ হয় "বৃত্ত"। দেখি—বস্তু আদি শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়ে অনিবার্য্য গতিতে চেষ্টা করছে, বৃত্ত সম্পূর্ণ ক'রে, তার উৎপত্তি স্থানে (আদিশক্তিতে) ফিরে যেতে। এই কথাই সাংখ্যদর্শন ১.১২১ এ বলেছেন—"নাশঃ কারণলয়ঃ"।

বস্তুবিশেষ সময়বিশেষে আকারবিশেষ পরিগ্রহ ক'রে দেখা দেয়। তার পরে কোনও সময়ে সে বস্তু "নাশ" হলে দেখা যায় যে সে তার "কারণ"-এ ফিরে গেছে। স্থূল দৃষ্টান্তে বলি—জল জমে বরফ হ'ল, সেই বরফ যখন "নাশ" হ'ল, তখন সে জলে ফিরে গেল। আদি বস্তু বা শক্তিতে ফেরবার চেষ্টা। আদি "একত্ব" তাকে আকর্ষণ করে ফিরিয়ে আনছে!

আর এক রকমে এই "একত্বে" ফেরবার স্থূলভাবে চেষ্টা দেখি—কারণ, সেটা "আদি একত্ব" নয়। "জীব" নানা প্রকার বস্তু গ্রহণ করে। যথা, স্থাবর গাছ মাটি থেকে জল, সার প্রভৃতি, বায়ু থেকে নানা প্রকার বাষ্প, ও সময়ে সময়ে প্রাণিজ দ্রব্য নিজ শরীর-মধ্যে নেয় এবং জঙ্গম প্রাণী উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য নিজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করায়—উভয়ে একই উদ্দেশ্যে—তাদের নানাত্ব ঘুচিয়ে নিজ শরীরের সহিত তাদের একত্ব সম্পাদন করবার জন্য।

বস্তুতপক্ষে যত দিন "জীব" "জীবিত" থাকে, তত দিনই এইরূপে "নানা"কে নিজের ভিতরে গ্রহণ করে নিজের সহিত তাদের একত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। আবার—এরই বিপরীতরূপে নিজের "এক" থেকে "নানা"র উদ্ভূতি সম্পাদন করে। সমাজ সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সমাজও যত দিন "জীবিত" থাকে, তত দিন অব্যাহত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নিজ "শরীর" থেকে "নানা"র অভিব্যক্তি করে এবং আবার বাহির থেকে "নানা"কে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ শরীরের সহিত এক করে নিয়ে নিজ পুষ্টিসাধন করে। কোন "জীব" বা "সমাজের" বৃত্তাকারে এই উভয় কর্ম করতে অক্ষমতা প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে যে, সে "জীব" বা "সমাজ" মৃত বা মরণোন্মুখ।

কাজেই একটি বৃত্ত দেখছি, "এক" থেকে "নানা"র উদ্ভূতি এবং আবার, "নানা"র "এক"-এ প্রত্যাবর্ত্তন।

এখন এই বৃত্তের দ্বিতীয়ার্দ্ধের কথা বলব—

"নানা"র "এক"-এ প্রত্যাবর্ত্তন। এই দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখতে পাই, "ভূতপ্রকৃতি"র একটি বিশেষ অভিব্যক্তি,

যাকে দ্বৈত ও অদ্বৈতের খেলা বলতে পারা যায়। এই খেলাতেই "ভূতপ্রকৃতি"র সক্রিয়তম অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি দ্বারাই ভূত নিজের সত্তার রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করে, এবং সেই রক্ষা ও পুষ্টিসাধন সম্পন্ন হলে তবেই অপর সমস্ত অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। এই খেলা অপর সমস্ত অভিব্যক্তির মূলীভূত বলেই সক্রিয়তম হতে বাধ্য।

সারা সৃষ্টিকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রত্যেক দৃষ্টিকোণেই দ্বৈত দেখা যায়, অর্থাৎ সারা সৃষ্টি যেন দুটি পরস্পরবিলক্ষণ, পরস্পরবিরোধী দলে ভাগ হয়ে পড়ে,—যেমন, সত্য-মিথ্যা, দেব-অসুর, আলো-ছায়া, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। এই দ্বৈত প্রাচীন ঋষিদের দৃষ্টিতে খুবই এসেছিল, বুঝা যায়। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে একাধিক স্থানে আছে—"দ্বয়ং বা ইদম্", এবং তৎসহ পাওয়াও যায় "ন তৃতীয়মস্তি"।

উপরোক্ত সমস্ত অভিব্যক্তির মূলীভূত, সক্রিয়তম অভিব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে যে দ্বৈত দেখা যায়, তা হচ্ছে "অত্তা" ও "আদ্য"—অর্থাৎ খাদক ও খাদ্য। শতপথ ব্রাহ্মণ ১০.৬.-৩.১-এ আছে—

> "দ্বয়ং" বা ইদম্ অত্তা চৈবাদ্যং চ।
> তদ্ যদোভয়ং সমাগচ্ছতি অত্তৈবাখ্যায়তে নাদ্যম্"

ঐ রূপ মনু ৫.৩৩ বলেন—

> নাত্তা দুষ্যত্যদন্নাদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
> ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এব চ॥

সারা সৃষ্টি দুই ভাগে বিভক্ত—(১) যে খাবে এবং (২) যাকে খাবে। "ন তৃতীয়মস্তি"। ইংরেজীতেও বলে—"You must be either the hammer or the anvil এবং Kill or be killed."

এই দুয়ের মধ্যে যে প্রবলতর সেই "অত্তা" অর্থাৎ সে-ই খাবে। সেইজন্য "অত্তা" ও "আদ্য" যদি এক স্থলে সঙ্গত হয়, তা হলে "অত্তা"ই অবশিষ্ট থাকে, কারণ "অত্তা" "আদ্য"কে গ্রাস করে নিজের অংশ (অর্থাৎ নিজের সহিত একাত্মীভূত) করে নেয়, কাজেই "আদ্য"র আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তাহার নাম রূপ সমস্তই লোপ পেয়ে যায়। "দ্বৈত" থেকে "অ-দ্বৈত"তে আসা গেল। একেই বলছিলাম "দ্বৈত ও অদ্বৈতের খেলা"।

এই অত্তা-আদ্য, দ্বৈত-অদ্বৈত খেলা সমস্ত জগতে চলছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ত্র। যে শক্তিমান্ অর্থাৎ বুদ্ধিবল বা পাশবিক বল বা উভয়তঃ শ্রেষ্ঠ, সে-ই অত্তা। যে দুর্বল, সে-ই আদ্য। এই বলের সাময়িক তারতম্য হেতু আজ বা এই ক্ষণে যে অত্তা, কাল বা পরক্ষণে সে-ই আদ্য। একজনের কাছে যে অত্তা, অপর জনের কাছে সে আদ্য। এই কথাটি রাজতরঙ্গিণী ৫.৩০৫-এ সুন্দরভাবে দেওয়া আছে—

> তীর্থস্থিতঃ শকুলকাংস্তিমিরত্তি
> তুণ্ডে মৌনী বকস্তিমিমুপেত্য বসাত্তবাসী।
> ব্যাধো নিহন্তি তু বকং
> প্রভবন্তি তে তে পারাপ্যুপর্য্যুপরি
> বকলচুঞ্চুতায়াঃ॥

পুকুরে মাছ মাছকে খায়। (প্রথম মাছ অত্তা, দ্বিতীয় আদ্য) আবার সেই "অত্তা" মাছকে বক খায়। আবার সেই "অত্তা" বককে ব্যাধ মারে। বকনাশক্তিতে যে শ্রেষ্ঠ, সে নিকৃষ্টকে খায়:

এই কথাই ভাগবত ১. ৮. ৯-এ আছে, সংসার সম্বন্ধে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্।

"অত্তা"র কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আছে, মহাভারত ১. ১. ১১২তে "পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ বুদ্ধ্যা বিক্রমণেন চ।" পাণ্ডু বহু দেশ জয় করলেন কোথাও বা বুদ্ধি (diplomacy) দ্বারা, কোথাও বা বিক্রমণ (বলপ্রয়োগ, brute force) দ্বারা। এখানেও ন তৃতীয়মস্তি। ডিপ্লোমেসিতে হ'ল ত ভাল, নয় ত শেষে বলপ্রয়োগ।

এটাই প্রাকৃতিক, আদিম, চিরন্তন নিয়ম। মানুষ যতই তথাকথিত 'সভ্য' হোক না কেন, মূলে, ভিত্তিতে এই নিয়ম থেকে যায় এবং সর্বকালে সর্বস্থানে বর্তমান থেকে উপযুক্ত সময়ে আত্মপ্রকাশ করে।

এই নিয়মটি যে প্রাকৃতিক, আদিম ও চিরন্তন, তা একটু দেখলেই বুঝা যায়। বেশী কথা নয়—সামান্য একটু নড়েচড়ে বসা মানে কত পোকা-মাকড়ের মৃত্যুর কারণ হওয়া। তার উপর যদি নিজ প্রাণরক্ষা আবশ্যক হয়, তা হলে কত "জীবে"র সত্তাও প্রাণনাশ না করলে হয় না। ("জীব" অর্থে ভ্যা-ভ্যা, কোঁ-কোঁ বা ধড়ফড় করলে তবে সে "জীব" তা নয়; আলু, পটল, পুঁইশাক, লাউশাক, জীব। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ, মনু, ১. ৪৯) এইরূপে কৃষি করতে গেলে কত "জীবে"র প্রাণনাশ হয় বলে কৃষি নিন্দিত। (ম, ভা, ১২, ২৬২, ৪৫-৪৬) নিজের বৃত্তি অর্থাৎ সামান্য জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করতে হ'লে হিংসা (অর্থাৎ পরের প্রাণ অন্ত) করা ছাড়া গতি নেই।

> অতত্র রাজন্ হিংসায়া বৃত্তির্নেহাস্তি কস্যচিৎ।
> অপ্যরণ্যসমুত্থস্য একস্য চরতো মুনেঃ॥

ম. ভা ১২. ১৩০. ২৮ (চি)

সেহাৎ "প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত"। নিজের প্রাণ রাখতে হলে পরের প্রাণ অন্ত করতে হবেই। তা না করলে নিজের প্রাণ থাকবে না। আর আমার প্রাণটা যদি না রইল ত সারা সৃষ্টিতে কি রইল, না রইল বয়ে গেল। "আপ ডুবা তো জগ ডুবা।"

শুধু প্রাণটা রাখতেই এই অবস্থা, struggle for existence মাত্র। প্রতি জীবই যত দিন না মৃত হয়, তত দিন অক্লান্তভাবে অবিরত নিজ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, এটাই প্রাকৃতিক আদিম নিয়ম ও চিরন্তন নিয়ম।

এ পর্যন্ত হ'ল শুধু প্রাণটা কোনও ক্রমে রাখা।

কিন্তু শুধু প্রাণটা রেখেই ত লোকে ক্ষান্ত হয় না, হতে পারে না। "প্রাণটা ত রক্ষা হয়েছে, এই বার অবস্থার একটু উন্নতির চেষ্টা দেখা যাক। যখন এই ভাব আসে, তখন ব্যাপার আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। তখন পরের উপর চোট তীব্রতর ও ব্যাপকতর ভাবে আসতে বাধ্য। এই কারণেই ম. ভা. ১২, ১৫, ১৪ (চি) তে—

"নাচ্ছিত্বা পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্ম দারুণম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্॥"

যদি কেহ মহতী শ্রী পেতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ জীবনে খুব উন্নতি করতে চায়, তা হলে তাকে পরমর্ম ছিন্ন করতে হবে। অর্থাৎ পরকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতে হবে। অত্যন্ত ক্রূর কর্ম করতে হবে, মৎস্যঘাতী যেরূপ জাল, কাঁচা প্রভৃতি সাহায্যে নির্মমভাবে মৎস্যহত্যা করে, সেইরূপ ভাবে পরকে হত্যা করতে হবে। তা না হলে সে মহতী শ্রী পেতে পারবে না।

পরকে দাবাতে না পারলে, পরের সত্তা, এমন কি প্রাণ-নাশ করতে না পারলে, বুদ্ধি বা বিক্রম বা উভয়দ্বারা পরকে "আদ্য"তে পরিণত করতে না পারলে, তুমি "অত্তা" বা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না। ঐরূপে পরের শ্রী গ্রাস না করলে তোমার শ্রী বৃদ্ধি হতে পারে না।

এই ব্যাপার চারদিকে দেখা যায়, কাজেই বোঝা শক্ত নয়।

এখন দাঁড়াল দুই জনের মধ্যে "পাঁয়তারা"। এ বলে "আমি অত্তা হব, তুমি আমার আদ্য হও।" ও বলে "না, আমি অত্তা হব, তুমি আমার আদ্য হও।"

এখন আরম্ভ হয়, পরস্পরের প্রতি বুদ্ধি, বিক্রম বা উভয়ের প্রয়োগ। প্রথমে "মৃদুপূর্বম্", ক্রমে "দৃঢ়পূর্বম্"। যেমন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হ'ল প্রথমে Phoney War, দুই দলের হুঙ্কার, সিংহনাদাদি। আসল লড়াই হতে চায় না। পরে আরম্ভ হ'ল বিক্রম, তার কিছু পরে সুরু হ'ল ও চলল বিক্রমের সঙ্গে P. W. D. অর্থাৎ Psychological Warfare Division, যার মানে অজস্র নির্লজ্জ মিথ্যা কথার সৃষ্টি ও (এরোপ্লেন থেকে leaflet আকারে) বৃষ্টি। যারণার নির্মাণে খুবই বুদ্ধির দরকার। কিন্তু এই P. W. D. তে যে তা কোনও অংশে কম দরকার তা নয়। বুদ্ধি ও বিক্রম প্রয়োগের মাত্রা ও ব্যাপকতা বেড়ে চলে যতক্ষণ না বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, এক পক্ষ হার মেনে নিজের "আদ্যত্ব" স্বীকার করে।

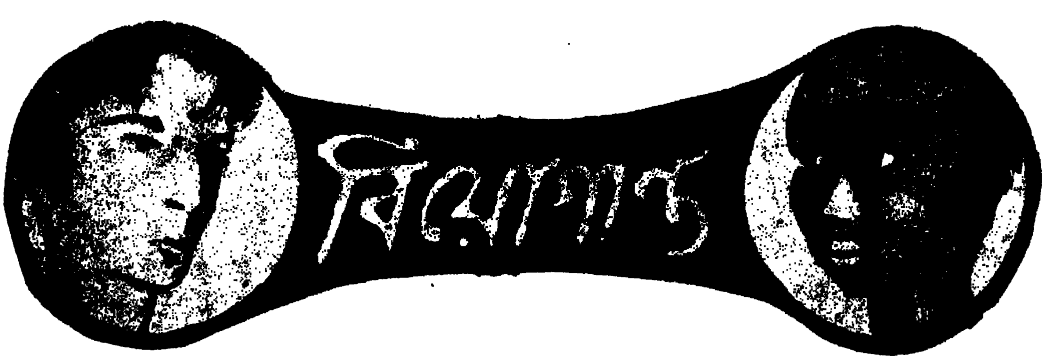
বলা বাহুল্য, এ সব ব্যাপারে অনেক নৈতিক ভাঁওতা ধুয়ো প্রভৃতির আবির্ভাব ও ব্যবহার হয়। কিন্তু দু'পক্ষই বোঝে তার মূল্য বা দৌড় কত। আসলে মূল অংশটুকু একেবারে অ-নীতিনিয়ন্ত্রিত (non-moral), কেবল মাত্র প্রাকৃতিক আদিম নিয়মানুসারে একে অপরের উপর আধিপত্যের চেষ্টা করছে।

এখানে প্রাকৃতিক নিয়মে বুদ্ধিবিক্রমের মরণান্ত দ্বন্দ্বই যে সত্য, এ কথা ভুললে মহা বিপদ। যদি কেউ এই সত্যকে উপেক্ষা বা অস্বীকার ক'রে এই দ্বন্দ্বের অন্য কোনও কাল্পনিক রূপ কল্পনা করে এবং তাতে নীতিমূলক ভাবের আরোপ করে যুধ্যমান অপর পক্ষের প্রতি প্রেম প্রভৃতি প্রয়োগের অবতারণা করে, তা হলে অবস্থা কি হয়, বোঝা বোধ হয় শক্ত নয়। বাস্তবকে অস্বীকার ক'রে কাল্পনিক একটা কিছুকে "সত্য" বলে দাঁড় করিয়ে সেই কাল্পনিক অবলম্বনে চলতে উপদেশ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সে উপদেশ অনুযায়ী যে চলে, তার শ্রেয়ঃ হওয়া কখনও সম্ভব নয়। তার শীঘ্রই "আদ্যত্ব" প্রাপ্তি ঘটে। এইরূপ উপদেশকে আমাদের বাংলায় বলে "বাঘকে কুঁড়োজালি দেখানো" ও ইংরেজীতে বলে "Singing psalms to lions."

স্বতঃই সন্দেহ হয়, এইরূপ পরামর্শদাতারা সাধু সরল বুদ্ধি-প্রণোদিত কিনা? অনেক সময়ই পূর্বাপর ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করলে সন্দেহ থাকে না যে এইরূপ উপদেশ (Junius-এর ভাষায়) "Coined by knaves to be made current among fools." এটা বুঝতে বৃহস্পতির বুদ্ধির আবশ্যক হয় না যে, যেখানে এক জন অপরকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে, সেখানে ঐ দুই পক্ষের মধ্যে কাকেও প্রেম দেখাবার উপদেশ দেওয়া তাকে আত্মঘাতী হবার পরামর্শ দেওয়ার তুল্য। উপদিষ্ট ব্যক্তি যাতে সত্বর নষ্ট হয়, এই যেন উপদেশের উদ্দেশ্য।

সমগ্র "ভূতপ্রকৃতি"র এইই মৌলিক অংশ—নিজ সত্তা-রক্ষা ও তার উন্নতি সাধন। "মৌলিক", কারণ এ হচ্ছে সব কিছুর মূলে। যদি সত্তা নাশ হয় বা তার উন্নতি নিরোধ হয়, তা হলে আর কিছুই হতে পারে না। যেন তেন প্রকারেণ এই মৌলিক অংশের সাধন করা চাই। এখানে নয় প্রাকৃতিক নিয়মই বলবৎ। এখানে তথাকথিত "নীতিকথা" "তত্ত্বকথা"র স্থান নাই। যুধ্যমান দুই পক্ষের মধ্যে যার শ্রেয়ঃ চাও, তাকে বলবে "বুদ্ধি ও বিক্রমের পূর্ণ প্রয়োগ কর। তোমার প্রতিপক্ষ যে পরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, তুমি প্রচণ্ডতরভাবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তর দিবে। না দিতে পারলে তোমার আদ্যত্ব প্রাপ্তি, সত্তানাশ, সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।"

অতীত ও বর্তমান মানবেতিহাস যথাসম্ভব পর্যালোচনা করে "ভূতপ্রকৃতি"র মূলগত অংশ সম্বন্ধে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল।



শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

(প্রথম পর্ব্ব)

বিহারের একটা ছোট শহরে সেদিন ঘনঘটা করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল, আমার বসিবার ঘরে গুটিকয়েক বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছেন। মেঘের ডাকের বোধ করি একটা মোহ আছে—তাই আসরে পরনিন্দা জমিতেছিল না। অনাথ সিগার টানিতে টানিতে লছমীনারায়ণকে কহিল, 'ইয়ার, একটা গান গাও।' লছমিনারায়ণ জৌনপুরের লোক, তাই পাছে সে আবহাওয়ার গুণে সত্য সত্যই গান ধরিয়া দেয় এই ভয়ে নিশীথ তাড়াতাড়ি কহিল, 'গানের দরকার নাই, কেউ একটা গল্প বল।' সোফার কোণে কাত হইয়া দেবেন সিগারেট টানিতেছিল, সে হজম-শক্তি বাড়াইবার জন্য কলিকাতা হইতে সম্প্রতি আমার এখানে আসিয়াছে। দেবেন হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বর্ষণরত মেঘের দিকে চাহিয়া কহিল, "তবে শোনো…

বছর চারেক আগে কেপটাউনে একটা চাকরি পাইয়া সাউথ আফ্রিকায় যাইতেছিলাম। মাদাগাস্কার দ্বীপের কাছা-কাছি আসিয়াছি এমন সময় কোন এক অজ্ঞাত বস্তুতে আঘাত লাগিয়া আমাদের জাহাজ ডুবিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক পরেই ডুবিয়া গেল, আমি এক লাইফ-বেল্ট বুকে করিয়া ভারত মহাসাগরের মাঝামাঝি ভাসিতে লাগিলাম। ভাসিতে ভাসিতে ভাবিতে লাগিলাম পূর্ব্বমুখে ভারতের দিকেই সাঁতার দিব—না—দক্ষিণে মাদাগাস্কার দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইব, কিন্তু একটু পরে সূর্য্য অস্ত যাওয়ায় দিক ঠিক করিতে পারিলাম না, ঢেউয়ের তাড়নায় ভাসিয়া চলিলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন বুঝিলাম আমি জলে নাই, স্থল-ভাগের কোন অংশে চিৎ হইয়া শুইয়া আছি। চোখ মেলিয়া চাহিলাম, দেখিলাম মেঘশূন্য নীল আকাশ, গুটি দুই সামুদ্রিক পক্ষী বহু উপরে পাক খাইতেছে, নারিকেল গাছের ডালে রৌদ্র ঝিকমিক করিতেছে—বড় ভাল লাগিল। আশা করিয়া-ছিলাম—এতক্ষণে সমুদ্রের তলায় অত্যন্ত অসংযত বেশে কোন এক বিশালকায় মাছের পেটে অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করিব। তাহা যে হয় নাই, আমি যে এখনও বাঁচিয়া আছি—সে জন্য ভগবানের চরণে শতকোটি প্রণাম জানাইলাম। মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইল। পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া একপাশে তাকাইলাম, মনের সেই অপার্থিব অবস্থাটা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। যাহা দেখিলাম তাহাতে শরীর ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া অন্য দিকে তাকাই-লাম, সেদিকেও সেই দৃশ্য, আমি আবার চোখ বুজিলাম। কি দেখিলাম? আমি দেখিলাম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিশালদেহ, পরি-পুষ্টঅধর, বিকশিতদন্ত উলঙ্গপ্রায় কতিপয় মানুষ আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। ইহারা কারা? ইহাদের উদ্দেশ্য কি, আমি কোথায় ইত্যাদি অনেকগুলি সমীচীন ও সময়োপযোগী প্রশ্ন যাহা আমার মনের মধ্যে তখন উদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা না হইয়া কেন যে হঠাৎ উঠিয়া দৌড় মারিবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার হইল তাহা মনস্তাত্ত্বিকগণই বলিতে পারিবেন।

ইতিমধ্যে সেই মনুষ্যসমাজে একটা হৈ চৈ কলরব উঠিয়াছে। আমাকে চোখ মেলিতে ও ঘাড় নাড়িতে দেখিয়া ইহারা যে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা চিৎকারের মাত্রা হইতে অনুমান করিলাম। হঠাৎ গুটিকয়েক সবল ও কঠিন হাত আমার দেহের কোন কোন অঙ্গ চাপিয়া ধরিল, আমি শূন্যে উঠিলাম এবং অনুভব করিলাম যে গতিবিশিষ্ট হইয়াছি। চোখ খুলিয়া দেখিলাম জন দুই অসভ্যের কাঁধে চড়িয়া আমি চলিয়াছি, সামনে ও পিছনে সারি বাঁধিয়া অন্যান্য অসভ্যগণ চলিয়াছে।

নিবিড় নারিকেল-বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গা, সেই-খানে একখানা কুঁড়েঘর। সেই কুঁড়েঘরের সামনে একটা নারিকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া আমাকে বসানো হইল। দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল, বিকটাকার পুরুষেরা, আরো বিকটাকার মেয়েরা এবং তাহাদের ক্ষুদ্র সংস্করণগুলি আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। কলরবের বিরাম নাই। ততক্ষণে আমার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছে, ভয় অনেকটা কমিয়াছে। ঘাড় না ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া এই জনতাকে একবার দেখিয়া লইলাম। দেখিলাম কেহ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে, কেহ ভ্রূকুটি করিতেছে, কেহ আঙুল দিয়া দেখাইতেছে, আর যেন মেয়েরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। কেহ একটা বড় রুই মাছ ধরিয়া হঠাৎ উঠানের মাঝখানে



নারিকেল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া আমাকে বসান হইল

আনিয়া ফেলিলে যেমন চারিদিক হইতে সকলে ছুটিয়া আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায় ও বহুবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে এ যেন কতকটা সেই রকম। মনের কোণে একটা সন্দেহের উদয় হইল, ইহারা নরখাদক নয় তো? দেহের কোন অংশ মাংসল, কোন্ অংশ খাইতে সুস্বাদু, কে জানে হয়ত তাহাই বিচার করিতেছে!

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, রোদের তাতও বাড়িতে লাগিল, আমি আমার রক্ষীদের দিকে আড়চোখে একবার তাকাইয়া গুটি গুটি কুটিরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। আড়ালে আসিয়া প্রাণ বাঁচিল, ভাঙা কুঁড়েঘরের ভিতরটাও যেন অত্যন্ত নিরাপদ মনে হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। একজন রক্ষী আসিয়া আমার হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া যাহাতে সারারাত শুইয়াই থাকি সযত্নে তাহার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেল।

নিঝুম রাত, মাঝে মাঝে বাতাসে নারিকেল গাছের শুকনো পাতা ঝরঝর করিয়া উঠিতেছে—সামান্য কয়েকটি কারণে আমি তখনও জাগিয়া আছি। প্রথম কারণ হইল নূতন স্থান, দ্বিতীয় কারণ শয্যার কাঠিন্য, তৃতীয় কারণ হাত-পা বাঁধা থাকায় মশা তাড়াইতে না পারা, চতুর্থ—চিন্তা। চিন্তা করিতেছিলাম আমার এ অবস্থাটা নিরাপদ কিনা। এ একটা দ্বীপ, দ্বীপের অধিবাসীরা অসভ্য, হয়ত নরখাদক। এমন স্থানে আসিয়া এবং এহেন পাত্রদের হাতে পড়িয়া আমি বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়াছি কিনা তাহাই বিচার করিতেছিলাম। ভাবিতে ভাবিতে বাকি রাতটুকু শেষ হইয়া গেল।

সকাল হইতে আবার সেই অসভ্য সমাগম, সেই ঘুরিয়া-ফিরিয়া চারি দিক দিয়া দাঁড়াইয়া উবু হইয়া বেশ করিয়া দেখা, সেই আলাপ ও আলোচনা। কিন্তু আজ ইহাদের বেশভূষার একটু পারিপাট্য লক্ষ্য করিলাম। বেশভূষা সম্বন্ধে ইহাদের ও আধুনিকতম য়ুরোপীয় মেয়েদের মতের একটা আশ্চর্য্য মিল দেখিলাম— অর্থাৎ স্বল্পতম আবরণ।

হঠাৎ নারিকেল ও তালবন কাঁপাইয়া একটা অদ্ভুত দামামা বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই খোলা জায়গায় স্ত্রীপুরুষ, ছোটবড় বহু অসভ্য আসিয়া জমা হইল, একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। তারপরে তাহারা সারি সারি বসিয়া গেল। বুঝিলাম আজ একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার আছে, উৎসুক হইয়া রহিলাম। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, হঠাৎ চিৎকারের মাত্রা বাড়িয়া গেল, দামামা জোরে বাজিতে লাগিল, দেখিলাম কয়েকজন অসভ্য পুরুষ দুটি তিনেক হাত-পা-বাঁধা মানুষকে টানিয়া আনিয়া সেইখানে ফেলিল। তারপরে মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড আগুন জ্বলিল, দামামা দ্রুততালে বাজিতে লাগিল, বন্দী তিনটিকে পিটাইয়া আধমরা করিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া হইল, উপযুক্তভাবে পোড়ানো হইলে অসভ্য পাচকেরা নিপুণ হস্তে তাহা কাটিয়া ছিঁড়িয়া খাদ্য তৈয়ার করিল, তারপর তাহা পরিবেশন করা হইল। কর্ত্তাগোছের অসভ্যেরা তত্ত্বাবধান করিলেন, একটু আধটু কলহ ও মন-কষাকষি হইল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়; এমন সব বৃহৎ ব্যাপারে অমন হইয়াই থাকে।

দেখিয়া শুনিয়া ইহারা যে নরখাদক সে বিষয়ে আমার সন্দেহ করিবার আর কিছুমাত্র অবকাশ রহিল না।

খাওয়ার হাঙ্গামা প্রায় মিটিয়া আসিয়াছে এমন সময় আমার রক্ষী অসভ্যটি একখানা কলুই আনিয়া আমার সামনে রাখিল। খাইতেছি না দেখিয়া সে হয়ত মনে করিল পরিমাণ কম হইয়াছে, তাই একটা বুড়াজুষ্ঠও ফেলিয়া দিল। আমি ঠেকুর তুলিয়া তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই উপরোধে পড়িয়া অতিরিক্ত খাইলে বদহজম হইতে পারে। তবুও তাহারা ছাড়ে না, বর্শার দু-একটা খোঁচা দিয়া বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। একজন দর্শক প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া ভোজন সম্বন্ধে আমাকে একটানা উপদেশ দিলেন, তাহার ভাষা যদিও বুঝিতে পারিলাম না, ভাবার্থ যাহা বুঝিলাম তাহা সংক্ষেপে এই—ওহে বাপু, না খাইয়া রোগা হওয়াটা কি উচিত হইতেছে? ভাল করিয়া খাইয়া দাইয়া তাড়াতাড়ি মোটা হও, তবেই না

আর এক দিন আমাদের বড়রকম একটা ভোজ হইবে। এ হেন সারবান উপদেশ সত্ত্বেও লজ্জার বিষয় এই যে, আমি সেই সুপক্ক সুস্বাদু নরমাংস খাইতে পারিলাম না। ব্যাপার দেখিয়া আমার উপদেষ্টা হোঁ মারিয়া কনুইখানা উঠাইয়া লইয়া দৌড় মারিলেন এবং আমার রক্ষীমহাশয় তাহার পিছনে পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কুঁড়েঘরের দরজায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম নরখাদকের পেটে যাওয়াটা শাস্ত্রীয় হইবে কিনা, এমন সময় দেখিলাম একটি অসভ্য তরুণী এক টুকরা হাড় চুষিতে চুষিতে আমার অদূরে আসিয়া বসিল। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে তাকায় আর হাড়ের টুকরা চোষে, হাড়ের টুকরা চোষে আর আমার দিকে তাকায়। তাহার তাকাইবার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগিল না, কুঁড়েঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িতে প্রবল ইচ্ছা হইল, কিন্তু পাছে নারীজাতির প্রতি কোনরূপ অসম্মান দেখানো হয় এই ভয়ে ঢুকিতেও পারিলাম না। অসহায় ভাবে বসিয়া বসিয়া তরুণীর ঊর্দ্ধাস্থি লেহন ও দৃষ্টির বিদ্যুৎস্ফুরণ দেখিতে লাগিলাম। তরুণীদিগের মনের কথা নাকি দেবতারাও জানিতে পারেন না, আমি কিন্তু এর মনের ভাব পরিষ্কার আঁচ করিতে পারিলাম, ভাবটা এই যে, 'আহা, তোমার অস্থি এই ভাবে কবে লেহন করিব।'

অনেকক্ষণ চাটিয়া চুষিয়া তরুণী হাড়খানা এক অসভ্য-বালকের হাতে দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল, আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্ম, তরুণী ফিরিয়া আসিল, আমার কুঁড়েঘরের চারি দিকে কয়েকবার পাক দিয়া পূর্ব্ববৎ সামনে আসিয়া বসিল। বাঘ যেমন শিকারের চারি-দিকে চক্রাকারে কয়েকবার ঘুরিয়া সামনে আসিয়া থাবা পাতিয়া বসে এ যেন কতকটা সেই রকম। নধরকান্তি পাঁঠা দেখিলে মানুষের মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয় হয়ত আমাকে দেখিয়া ঐ তরুণীর মনেও সেই রকম একটা পরমানন্দের উদয় হইয়াছে, তাই এত আনাগোনা! নিমন্ত্রণ-বাড়ীর উঠানে বাঁধা পাঁঠার মনের কথা কেউ কি কখনো কল্পনা করিতে পারিয়াছে? আজ আমি কিছু কিছু পারিতেছি, সে অজবিলাপ লইয়া একটা করুণ কাব্য লেখা যাইতে পারে।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে তরুণী এক পা এক পা করিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আমার রক্ষীমহাশয় আসিলেন এবং রজ্জুর বেষ্টনী দিয়া রাত্রের মত আমাকে নিরাপদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সকালবেলা কুঁড়েঘর হইতে আর বাহির হইলাম না। অনাহারে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। রক্ষীমহাশয়ের কৃপায় দিনে দুটি-দুই করিয়া নারিকেল খাইতে পাইতেছি, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। ভাবিয়া দেখিলাম আজ বাদে কাল আধপোড়া হইয়া অসভ্য সমাজের



এই জনতাকে একবার দেখিয়া লইলাম

পাতে পড়িব, অতএব এ শরীরকে তোয়াজ করিয়া লাভই বা কি? শুইয়া শুইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখিতেছি এমন সময় সেই ফাঁকে দুইটি গোলাকার চোখ উঁকি মারিল। দেখিয়াই চিনিলাম এ কাহার চোখ। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম, সেই চোখ ঘুরিয়া আবার সামনে আসিল; আমি চোখ বুজিলাম, অনেকক্ষণ বাদে যখন আবার তাকাইলাম তখনও দেখি সেই চোখ আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি অবশ্য ভয় পাইলাম না, কেবল একটু বিহ্বলের মত হইয়া গেলাম।

বিকালের দিকে আমার কুটিরের সামনে লোকসমাগম যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী হইল, ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে আসিয়া বসিলাম (বল্লমের খোঁচা দুই-একটা খাইয়াছিলাম বটে কিন্তু তাহাতেই যে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিলাম সে কথা আমি স্বীকার করি না।) দেখিলাম অনেকেই দয়া করিয়া আজ আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সবার চোখেই একটা প্রীতির ভাব। আমি সভ্য বলিয়া আমার প্রতি ইহাদের ঘৃণা নাই, ভারতবাসী বলিয়া উপেক্ষা নাই, হিন্দু বলিয়া বিদ্বেষ নাই, কিন্তু কিছু রোগা হইয়াছি বলিয়া কতই না আফসোস।

প্রাণী মাত্রই ইহাদের প্রিয়। আমার নব-যৌবনকে ইহারা অভিনন্দিত করিল।

ভাবিতেছি ইহারা একটা জাতি বটে, এমন সময় আমার পূর্ব্বপরিচিতা অসভ্য তরুণী আসিয়া সামনে বসিল ও একটা কাঠি দিয়া দাঁত খোঁচাইতে লাগিল। দাঁতের ফাঁকে বোধ হয় গতকল্যের খাদ্য কিছু কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাই সে পুনরুদ্ধার করিয়া হৃষ্টচিত্তে চিবাইতে লাগিল।

সেদিন সন্ধ্যায় রক্ষীমহাশয়কে আমার প্রতি একটু বেশী সদয় দেখিলাম। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন যে আমি যেন ভাল করিয়া ঘুমাই।

রাত্রি গভীর হইল, চারি দিক নিঝুম। ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া আকাশের তারা দেখিতেছিলাম। ক্রমে রাত্রি গভীরতর হইল, আকাশে খণ্ড চাঁদ উঠিল, একটা অচেনা পাখী নারিকেল গাছের ডালে বসিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, এমন সময় বাহিরে কাহার পায়ের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ক্রমে সেই পদশব্দ আমার কুঁড়েঘরের দরজায় আসিয়া থামিল, পরমুহূর্ত্তে এক ছায়ামূর্ত্তি ভিতরে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিলাম চিত্রগুপ্তের আদালতে হাজির হইতে হইবে, তাই কোন পেয়াদা যমদূত সমন জারি করিতে উপস্থিত হইয়াছে। ঘুষ চলিবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় ছায়ামূর্ত্তি আমার পায়ের বাঁধন খুলিতে লাগিল, বুঝিলাম, এ যমদূত নয়, মানুষ। এই মনুষ্য আমার পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল, কিন্তু হাতের বাঁধন খুলিল না, বাহু ধরিয়া টানিয়া আমাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল, আমি উঠিলাম। সে আমাকে বাহিরে লইয়া আসিল। বাহিরে আবছায়া চাঁদের আলো, সেই আলোয় ছায়ামূর্ত্তির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া চিনিলাম, চিনিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলাম। স্বগতোক্তি করিলাম—হায় নারী, তুমি লোভ সামলাইতে পারিলে না, যাহাতে আর কাহাকেও ভাগ দিতে না হয় সেইজন্য রাত্রির অন্ধকারে আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছ!

তরুণী আমাকে নারিকেল-বনের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, বুঝিলাম একটা নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া ধীরে-সুস্থে আমাকে ভোজন করিবে। ভাবিয়াছিলাম অসভ্যেরা আধপোড়া করিয়া তবুও কিছু মান রাখিবে, এখন দেখিতেছি তাহাও হইল না, একেবারে কাঁচা অবস্থায় পেটে যাইতে হইবে। দুঃখের অবধি রহিল না।

নারিকেল-বন শেষ হইয়া গেল, বালুকাময় সমুদ্রতট চোখে পড়িল, তরুণী আমাকে টানিয়া তটভূমি অতিক্রম করিয়া একেবারে সমুদ্রের তীরে লইয়া গেল। সেইখানে সে আমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল, বুঝিলাম আর দেরী নাই, এখনই ক্ষুধিতা বাঘিনীর মত আমার উপর লাফাইয়া পড়িবে, ঘাড় মটকাইয়া প্রথমে রক্তপান করিবে, তারপর মাংস খাইবে, তারপর হাড় চিবাইবে, তারপর সমুদ্রের জলে হাত-মুখ ধুইয়া সকালবেলা ঢেকুর তুলিতে তুলিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।

তরুণী এক পা আমার দিকে আগাইয়া আসিল, তারপরে হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া বাহু দিয়া আমার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া আমার দিকে চাহিল, নির্জ্জন সমুদ্রতটে আবছায়া জ্যোৎস্নার আলোয় তরুণীর দুই চোখে কি দেখিলাম? একদা সত্যবান সাবিত্রীর চোখে যাহা দেখিয়াছিলেন, দুষ্মন্ত শকুন্তলার চোখে যাহা দেখিয়াছিলেন, আমিও তাহাই দেখিলাম; বুঝিলাম তরুণী আমাকে ভালবাসিয়াছে।

সেইখানে সমুদ্রে একখানা ডোঙা বাঁধা ছিল, তরুণী সেই ডোঙায় উঠিল ও আমাকে উঠিতে ইঙ্গিত করিল। আমি ডোঙায় উঠিলাম, তরুণী ডোঙার বাঁধন খুলিয়া দিল। প্রেমের জন্য এক নরখাদক তরুণী কূল ছাড়িয়া অকূলে ডোঙা ভাসাইল।

হাই স্কুল ও শিল্পশিক্ষা

এস. এম. ছদরুদ্দিন

শিল্পশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাবে হাই স্কুলে জমেছে অসম্ভব রকমের ভিড়। চাকুরীর স্বর্গে পৌঁছবার এই হ'ল বৈতরণীপারের একমাত্র খেয়াতরী। ফলে পার যত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছে ভরাডুবি।

সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় এর প্রতিকারের কিছু চেষ্টা হয়েছে। বনিয়াদী শিক্ষায় স্কুলের শেষে যে বাছাই পরীক্ষা হবে, তার ফলে ছাত্রসম্প্রদায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে—এক দল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য শিল্পবিদ্যা-ভবনে প্রবেশ করবে এবং অন্য দল হাই স্কুলে সাধারণ শিক্ষা লাভ করবে। অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশের মত ভারতে নানা রকমের শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে শিল্পশিক্ষার দিকেই তিন-চতুর্থাংশ ছাত্র ঝুঁকে পড়বে। এতে দেশেরও যেমন শ্রীবৃদ্ধি হবে, হাই স্কুল ও কলেজের শিক্ষাও তেমনি সুষ্ঠু হবে।

সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় শিল্প-শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তার কতকটা রদবদল করে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। হাই ও টেকনিক্যাল উভয় প্রকার স্কুলেই যদি মাতৃভাষা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতি সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হলে

বর্তমান বি কোর্সের মত সার্জেন্ট-পরিকল্পনার আমলেও টেকনিক্যাল শিক্ষা মাঠে মারা যাবে। পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি সহজাত বিতৃষ্ণা অথবা অক্ষমতার জন্যই ছাত্রেরা হাই স্কুলে এত পরিমাণে ফেল করছে এবং অর্থের শ্রাদ্ধ ও সময়ের অপব্যয় হচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই যদি শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে টেকনিক্যাল স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি অতখানি জোর না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিল্পটিকে আয়ত্ত করার জন্য ছাত্রের ঐ বিষয়ে যতটুকু পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন, শুধু ততটুকুই শিক্ষা দেওয়া উচিত। অন্যথায় বর্তমান বি কোর্সের মত পুঁথির চোরা-বালিতেই শিল্পশিক্ষার সমাধি রচিত হবে।

পুঁথিগত বিদ্যার সামান্য একটু কমতি হলে বিশেষ ক্ষতি হবে না, বরং পুঁথির চাপে যে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে তা সোজা হবে। আমেরিকায় যদি "অধিকাংশ নাগরিক প্রাইমারী স্কুলের আটটি ধাপও না ডিঙিয়েই" বর্তমান নাগরিক জীবন যাপনে সমর্থ হয়, তবে এ দেশের সাত বৎসরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক সাধারণ শিক্ষার পর* টেকনিক্যাল স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যার কমতির জন্য অসুবিধা হবে কেন? বস্তুত, পুঁথির বেড়াজাল দিয়ে শিল্পশিক্ষা-ভবন ঘিরে রাখলে হাই স্কুলের মত সেখানেও সাধারণ ছাত্রের অধিকাংশই চিরতরে আটকা পড়বে; শিল্পশিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

টেকনিক্যাল স্কুলে প্রকৃত রূপে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকলে হাই স্কুলের শিল্পবিদ্যা হবে কতকটা চারুকলা জাতীয়। টেকনিক্যাল স্কুলে শিল্পশিক্ষা মুখ্যতঃ বৃত্তিমূলক, রুজি-রোজগারের পন্থা; হাই স্কুলে তা হবে কতকটা সংস্কৃতি-মূলক, অবসর-বিনোদনের পন্থা। অবসর-বিনোদনকে আমরা যতখানি তুচ্ছ মনে করি তা সত্যি ততখানি নয়। কর্মের পর আলস্য ও অকর্মণ্যতা এর উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন কর্মের দ্বারা শ্রান্তি দূর ও শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ করা—জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করা। সুন্দর জীবন যাপনের জন্য রুজি-রোজগার ও অবসর-বিনোদন উভয়ই তুল্যরূপে প্রয়োজন। একটির জন্য অন্যটিকে বলি দিলে জীবন হয়ে পড়ে কলুর ঘানিটানা ও গাধার খাটুনি। এডাম সত্যই বলেছেন, উপার্জনের জন্য যেমন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, জীবন যাপনের জন্যও ঠিক তেমনি; সুন্দর জীবন যাপনও একটি পেশা।

এর জন্য চাই টেকনিক্যাল স্কুলের সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি চারুকলা এবং হাই স্কুলের সঙ্গে কিছু ছুতোরের কাজ, কামারের কাজ, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা। হাই স্কুলের সঙ্গে ছোটখাট কারখানা ও টেকনি-ক্যাল স্কুলের সঙ্গে কলাভবন স্থাপন করে এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়েই বাংলাদেশের দু-চারটি স্কুলের সঙ্গে বি কোর্স অথবা হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। সুফল পেতে হলে প্রত্যেকটি হাই স্কুলের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে এক একটি টেকনিক্যাল স্কুল খুলতে হবে;—স্ব-স্ব বিষয় শিক্ষাদানে এগুলো হবে স্বতন্ত্র, অথচ একটি হবে অন্যটির পরিপূরক। হাই স্কুলের ছেলেরা নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী টেকনিক্যাল স্কুলের বিভিন্ন শিল্পবিদ্যায় যেমন অনুরাগী হতে পারবে, টেকনিক্যাল স্কুলের ছেলেরাও তেমনি যে-কোন কলাবিদ্যা শিক্ষা করার সুযোগ পাবে।

শিল্পশিক্ষাকে সার্থক করতে হলে আরো একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে—সেটি হ'ল শিল্পশিক্ষার সহিত দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সংযোগ সাধন। শিল্পপতিদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ব্যতীত শিল্পশিক্ষাকে সুচারুরূপে পরিচালন করা সম্ভবপর নয়। মিঃ এবটের কথায়, "শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসন বিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা সত্যিকার পরামর্শ-সভা গঠিত হবে। শিল্প ও বাণিজ্যে কোন্ শিক্ষার কতটা প্রয়োজন সে সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণ তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন, শিক্ষাবিদ্‌গণ স্কুলের অভাব-অভিযোগ পূরণ করবেন, এবং শাসনকর্তারা পরিচালন ও অর্থ সঙ্কুলানের উপায় উদ্ভাবন করবেন।" এই ভাবে শিল্প-বাণিজ্যের সহিত শিল্পশিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে পারলে অন্ন ও বেকার-সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হতে পারে।

* এ বিষয়টি "বাধ্যতামূলক শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে বিশদ-রূপে আলোচিত হয়েছে। মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন, ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য।

ভ্রম-সংশোধন

৭৩ পৃষ্ঠায় "ভবিষ্যৎ কাব্যের সম্ভাবনা ও ধারা" প্রবন্ধের লেখকের নাম 'শ্রীসমরকান্ত গুপ্তে'র স্থলে 'শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত' হইবে।

কুলপঞ্জীতে সেকালের সামাজিক চিত্র

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের পারিবারিক ও সামাজিক বিবরণ যে সকল হস্তলিখিত বিপুলকায় ঘটকগ্রন্থে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এযাবৎ কেহই তাহাদের মূল্য নির্ণয় করিতে অগ্রসর হন নাই। স্বর্গত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় ও নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রদ্ধাসহকারে বহু কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বিবরণাত্মক মূল্যবান্ গ্রন্থ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করার প্রবৃত্তি, যোগ্যতা ও অবসর তাঁহাদের ছিল কি না সন্দেহ এবং উভয়েই কুলগ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করিতে গিয়া জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কৃত্রিম রচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের পুস্তকের প্রামাণ্য ব্যাহত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বহু ভ্রান্ত ও কল্পিত বস্তু স্থান লাভ করিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের নামমালা ও বিবরণ পৃথক্ ঘটক-সম্প্রদায়ের হস্তেই চিরকাল ন্যস্ত ছিল, কুলীনেরা স্বয়ং তাহা জানিতেন না এবং লিখিয়া রাখার প্রয়োজনও বোধ করিতেন না। এক শত বৎসর যাবৎ ঘটক-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় কিরূপ বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে তাহার অতি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়াও নিজ নিজ অনতিদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পুরুষের নামমালা বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া গিয়াছেন এবং অদ্যাপি তাহা বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হয় নাই। গত এক শত বৎসর মধ্যে যে সকল বংশাবলী কুলগ্রন্থের সাহায্য-ব্যতিরেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রায় সমস্তই অল্পবিস্তর ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছে। এই সকল ভ্রম-প্রমাদ দ্বারা বিশাল সমাজদেহে হয়ত কোনরূপ ক্ষত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তত্তৎ পরিবারে সত্যের অপলাপজনিত কিঞ্চিৎ কলঙ্ক উপজাত হয় সন্দেহ নাই এবং তাহার সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু ধারাবাহিক নামমালা রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের অতি সামান্য অংশ মাত্র, কুলীনদের আদানপ্রদানাদির অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাদ্বারা সামাজিক মর্য্যাদা বিচারই ইহার প্রধান অংশ বটে। তন্মধ্যে কিরূপ বিচিত্র সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত আছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা নব-দৌয়াপ্যের বিবরণে দিয়াছি (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩, পৃ ৬০৪-৭)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কতিপয় বিস্ময়জনক সামাজিক চিত্রের পরিচয় মূল কুলপঞ্জী হইতে সংগৃহীত হইল।

স্বগোত্র বিবাহ :—১। মুখবংশীয় সুষেণ পণ্ডিত বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্র তাঁহার পুত্রদের পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়াছেন (মহাবংশাবলী, পৃ. ১৩৪)—দ্বিতীয় পুত্র ভবানীগোবিন্দ রায়ের অন্যতম পুত্রের নাম "রতিনাথ সুবুদ্ধি-রায়।" ইহার কুলবিবরণে পাওয়া যায় :

"পশ্চাৎ মুং লোকনাথ বসন্তরায়স্য প্রিয়ানাম্নীকন্যাবিবাহ, সা বসতিস্থাৎ প্রিয়ানগরী গ্রামখ্যাতিঃ। অত্র স্বগোত্র সর্ব্বনাশা-দ্যাদিঃ।" (সাকা ৩৮১।১ পত্র) অপর একটি পুথিতে (কামাল, ফুল্যাপ্রকরণ, ২৬।২ পত্র) উক্ত ঘটনা রতিনাথের পুত্র গন্ধর্ব্ব-রায়ের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে—"বলাৎ মুং কাঁচনা বসন্তরায়স্য কন্যা বিবাহঃ অত্র স্বগোত্রবিবাহদোষঃ।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতই প্রামাণিক, কারণ গন্ধর্ব্বরায় সংসদ্বাধি করিয়া পিতৃ-দোষের মার্জ্জনা করিয়াছিলেন ঘটক-সম্প্রদায়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে (লালমোহন বিদ্যানিধি : মেলপ্রকরণ পৃ. ২৪-৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে :—"গন্ধর্ব্বরায়ে…এতৌ করণাৎ এবং দানবিনয়াৎ পিতৃদোষমার্জ্জনং নিজনামে গন্ধর্ব্ব-রায়ীভাবঃ কৃতঃ (৩৮১।২পত্র)।" রতিনাথের অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ এবং তৎপুত্র গন্ধর্ব্বরায়ের "দানবিনয়" দেখিয়া পিতার স্বগোত্রবিবাহদোষও যখন মার্জ্জিত হইয়াছিল তখন বোধ হয় নবদ্বীপে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন জীবিত ছিলেন। শাস্ত্রমতে স্বগোত্রবিবাহ তৎকালে একান্তভাবে অসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সামাজিকগণ দায়ভাগকার জীমূতবাহনের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি "বচনশতেনাপি বস্তুনোঽন্যথাকরণাশক্তেঃ" অবলম্বন করিয়া তাহারও মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তৎকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের উদার দৃষ্টিভঙ্গী সূচিত হয়। উল্লিখিত "প্রিয়নগরী" গ্রাম রাঢ়দেশে এখনও বিদ্যমান আছে কিনা অনুসন্ধানযোগ্য। রতিনাথ ও তাঁহার শ্বশুর লোকনাথের উপাধি (সুবুদ্ধিরায় ও বসন্তরায়) হইতে অনুমান হয় উভয়েই প্রভাবশালী রাজপুরুষ ছিলেন। রতিনাথের বংশ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিল এবং বোধ হয় এখনও আছে।

২। খড়দহমেলের প্রবর্ত্তক ভরদ্বাজগোত্র মুখবংশীয় সুবিখ্যাত যোগেশ্বর পণ্ডিতের এক পুত্র জানকীনাথ ১০০ সমীকরণের কুলীন ছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ (মহাবংশাবলী পৃ. ১২৭) তাঁহার কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক পুত্র রামভদ্র। রামভদ্রের এক প্রপৌত্র কৃষ্ণবিহারীর কুল-বিবরণে পাওয়া যায়, তিনি এক কন্যা স্বগোত্রে বিবাহ দিয়া-ছিলেন।

"ততঃ কন্যা স্বগোত্র দিণ্ডী রঘুনাথ হাজরাকায় প্রদানাৎ সর্ব্বনাশঃ" (সাকা ৪৯৬।২, কামাল মুখপ্রকরণ ৮২।২, হুগলী ২৭২।১ প্রভৃতি)।

কৃষ্ণবিহারী ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ভরদ্বাজগোত্র শুভশ্রোত্রিয় বংশের গাঁঞি দিণ্ডী অধুনা ডিংসাই নামে পরিচিত।

বন্ধুবিবাহ :—স্বগোত্র বিবাহের ন্যায় পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু প্রভৃতি ভিন্নগোত্রীয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত বিবাহও শাস্ত্রমতে

অসিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপ নিষিদ্ধ বিবাহেরও বহু বিবরণ কুলগ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। আমরা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে স্বজনাবিবাহের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। খড়দহমেলের বিখ্যাত কুলীন চৈতন-চট্টবংশীয় চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের এক পুত্র রামনাথ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী। রামনাথের পুত্র গোপাল দুই বারই স্বজনা দোষ করিয়াছিলেন। যথা,

"গোপালস্য উচিত মুং মথুরেশগ্রহণাৎ মজেশ্বরজঃ অত্র স্বজনাদোষঃ—কাঞ্জ্যাড়ী কুমুদভায়বাগীশদৌহিত্র রামনাথ ভট্টাচার্য্যচক্রবর্ত্তী তস্য পুত্র চং গোপাল। কুমুদভায়বাগীশপুত্র সিদ্ধান্তবাগীশ অস্ত কন্যা—মুং মথুরেশ অস্ত কন্যা চং গোপালে অতএব চং গোপাল মুং মথুরেশকং স্বজনাদোষঃ। * * ততঃ পুত্রপর্য্যায় মুং দুর্গারামে প্রদানাৎ বিপর্য্যায় স্বজনাদোষঃ বিং রামনারায়ণজঃ—চং চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারস্য দৌহিত্র মুং রামনারায়ণ তস্য পুত্র দুর্গারাম, চং চন্দ্রশেখরস্য পৌত্র গোপাল অতএব স্বজনাদোষঃ এবং নপ্তীদোষঃ।" (সাক্ষা ৩৪৬।১) অর্থাৎ গোপাল প্রথম বিবাহ করেন পিতার সাক্ষাৎ মাতুল-ভগীর কন্যাকে এবং পরে কন্যা দান করেন পিসতুত ভাইয়ের পুত্রের হস্তে। গোপালের অভ্যুদয়কাল ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ, তাঁহার পিতার মাতুল রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ নবদ্বীপাধিপতি রাজা রুদ্ররায়ের গুরু ছিলেন। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইরূপ বিশিষ্ট পরিবারেও ঐ রক্ষণশীল যুগে দুইটি অশাস্ত্রীয় বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল। গোপালের বংশ নানাস্থানে বিদ্যমান আছে এবং তাঁহার এক পুত্র দুর্গাচরণ বিদ্যাপঞ্চানন উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন।

গন্ধর্ব্ববিবাহ : সমাজশাসন নর-নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া সাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাপকভাবে না হইলেও নিন্দনীয় গন্ধর্ব্ববিবাহ রাঢ়ীয় সমাজে বহুস্থলে সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থলেই অভিভাবকগণ জোর করিয়া তাহা ঘটিতে দেন নাই এবং গোপনীয় পারিবারিক কথা সামাজিক গ্রন্থে স্থান লাভের অবসর পায় নাই। যেগুলির উল্লেখ আমরা কুলপঞ্জীতে পাইয়াছি তন্মধ্যে একটি সরস ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ফুলিয়ার মুখবংশীয় শিবাচার্য্যের সন্তান গোপীশ্বরের এক পৌত্র মহাদেব। তাঁহার "ক্ষেম্য" (অর্থাৎ জামাতা) ছিলেন অবসথী চট্টবংশীয় কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র ধনঞ্জয় (সাক্ষা ৩৭৭।১)। ইনি "গালকাটা" ধনঞ্জয় নামে পরিচিত, খড়দহ মেলের রঘুনীকরীভাগের কুলীন—ইহার কুলবিবরণে আছে "ধনঞ্জয়ভার্য্যা মুং মহাদেব দুষ্টাকন্যাগ্রহণাৎ"। এই বিবাহের রহস্য একটি গ্রন্থে (কামাল, কুল্যাপ্রকরণ ১০।২ পত্র) মনোহরকারিকা উদ্ধৃত করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে :

"মহাদেবের কন্যা সে ক্ষেমা তার নাম।
গন্ধর্ব্ব বিভা করে বন্দ্য দেবীরাম॥
কমলের পুত্র সে তাদের হয় নাতি।
গর্ব্বপতিদলে স্থিতি ছিতা বৈদ্যনাথি॥
রামনাথ বলে শুন অরে ভাই ক্ষেমা।
বাহির হইলে এবার রক্ষা নাই আমা॥
কৃষ্ণপ্রসাদ পুত্র ধনঞ্জয় নাম।
"রাজা রামচন্দ্র" করে ক্ষেমা ভগ্নী দান॥
পাটুলি সমাজের লোক করে কানাকানি।
এক মেয়ের দুই বিভা কোথায় না শুনি॥

রামনাথ মহাদেবের পুত্র। রাজা রামচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি রুদ্ররায়ের পুত্র। তিনি অতি বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ভ্রাতা রামজীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ৩ বৎসর (১৬৮৭-৯০) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাটুলিসমাজে ঐ রহস্যজনক বিবাহ ঘটিয়াছিল বুঝা যায়।

শিশুবিবাহ :—গন্ধর্ব্ববিবাহের উল্লেখ দেখিয়া বুঝা যায়, তৎকালে অধিকাংশ বিবাহ অধিক বয়সে সাধিত হইত। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি অতি বিস্ময়কর বিবাহের বিবরণ উদ্ধৃত হইল। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন বিষ্ণুঠাকুরের পৌত্র সীতারামের কুলবিবরণে পাওয়া যায় :— "সীতারামস্য…উচিত বং রামানন্দগ্রহণাৎ। অত্র প্রবন্ধেন ত্রয়োদশ দিবসীয়া কন্যা পণস্য মুদ্রা সহিত দদে, সীতারাম বলাৎকারভয়েন স্বীকৃতং।" (সাক্ষা ৩৯০।১ পত্র) অর্থাৎ সীতারাম ভয়ে বন্দ্যবংশীয় রামানন্দের তের দিনের মেয়েকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন সমাজে গর্ভস্থ সন্তানের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু তের দিনের শিশু-বিবাহের দ্বিতীয় নিদর্শন সম্ভ্রান্ত সমাজে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সমসাময়িক ঘটক সীতারামের সম্বন্ধে কারিকা রচনাপূর্ব্বক ঘটনাটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যথা, (কামাল, কুল্যাপ্রকরণ, ৩৬।১ পত্র)

সমানে সমান কুল ধরাধরি তায়।
লোকে বলে সীতারাম তিন শ টাকা পায়॥
দিবসে আঁধার হ'ল পথ বেরাল চেয়ে।
সীতারাম বিহা করেন তেরো দিনের মেয়ে॥

ইহা প্রায় ১৭০০ সনের ঘটনা এবং দেবীবরকৃত মেল বন্ধনের কুফল তখন ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

অন্যপূর্ব্বা বিবাহ :—কুলপঞ্জীতে বহু অন্যপূর্ব্বা বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটির বিশদ বিবরণ উদ্ধৃত হইল। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পুত্র রামেশ্বর ঠাকুরের কুলবিবরণে পাওয়া যায় :—

"রামেশ্বর ঠাকুরস্য লভ্য বং রামচন্দ্র…রামচন্দ্রস্য দৌহিত্রী নিধুনাম্নী কন্যা আর্ত্তিপর্য্যায়েন শ্রীমন্তচট্টেন (চং অং কৃষ্ণবল্লভজ গদানন্দপৌত্র শ্রীমন্তঃ) দস্যুভয়া গঙ্গাতীরসমীপাদধিকাগ্রামাৎ বলাৎকারেণ নীতা, রাঢ়দেশে মলাই পরগণায়াং বজ্রপুরগ্রামে শুভাপসমীপে স্বীয়বাট্যাং স্থাপিতা। অতো বলাৎ রজনীকরী ভবানন্দমিশ্রদোষাণাং সম্ভবঃ। পশ্চাৎ রামেশ্বর ঠাকুরো বর্দ্ধমানং গত্বা রাজানং নিবেদ্য নানাচেষ্টয়া তাং কন্যামানীয়

সাগরদিয়া পৌত্রপর্য্যায় রুদ্ররামচক্রবর্ত্তিসুত গোবিন্দরামায় দত্তৌ। অতঃপূর্ব্বায়াং কন্যায়াং সুরাই মেল সম্পর্কীয়দোষোপি।" (পরিষদের ১৮১৫-খ পুথির ২৬।২ পত্র : সাকা ৩৯৪।১ পত্রে ইহার সারসংক্ষেপ আছে)

দস্যুবৃত্তিদ্বারা ধনরত্নাদি কিম্বা সুন্দরী রমণী অর্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য দস্যুবৃত্তির উদাহরণ অত্যন্ত দুর্লভ। মেলবন্ধনের শোচনীয় পরিণতিকালে উক্তরূপ ঘটনা বহু ঘটিয়াছিল। উল্লিখিত ঘটনাও প্রায় ১৭০০ সনে হইয়াছিল।

বিধবাবিবাহ :—বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত রাঢ়ীয়সমাজে অত্যন্ত বিরল। আমরা একটির উল্লেখ পাইয়াছি। সরবড় বন্দ্যবংশীয় ফুলিয়া মেলের কুলীন মথুরেশের একপুত্র রাজারামের সম্বন্ধে লিখিত আছে—"রাজারামস্য বিধবাবিবাহঃ চং রামজীবন রায়স্য কন্যা" (পরিষৎ ১৫।১ পত্র)। ইহাও প্রায় ১৭০০ সনের ঘটনা।

মৃতকন্যাবিবাহ :—এই অতি বিস্ময়কর ঘটনা ১৭০০ সনের কিছু পূর্ব্বে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঘটিয়াছিল। ফুলিয়া মেলের কুলীন শিবাচার্য্যের পুত্র রমেশ্বর গোষ্ঠীতে রাজবল্লভ ঠাকুরের পুত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণে পাওয়া যায় :—

"রামচন্দ্রস্যাদৌ পিতৃবরেণ বং কামদেবস্য মৃতাকন্যাগ্রহণং ইত্যাশ্চর্য্যং" (পরিষৎ, ৩০৩।২ পত্র)। "রামচন্দ্রে…বং কামদেবস্য মৃতাকন্যাবিবাহঃ" (সাকা ৩৭৩।২ পত্র)। এই রামচন্দ্রের এক পৌত্র নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জামাতা ছিলেন। কোন দেশের সামাজিক ইতিহাসে ইহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। মেলবন্ধনের ২০০ বৎসর পরে রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে কিরূপ অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সামাজিক মর্য্যাদার জন্য কুলীনদের কিছুই অকরণীয় ছিল না। ইহার অপর এক নিদর্শনও আশ্চর্য্যজনক।

বিমাতা-বিবাহ :—ঘটনাটি রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ফুলিয়া মেলের প্রবর্ত্তক গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামাচার্য্যের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পার্ব্বতীদাস ঠাকুর বীরভদ্র গোস্বামীর জামাতা ছিলেন। তাঁহার কন্যাবিবাহ কুলগ্রন্থে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—"পশ্চাৎ বং হরিতে বলাৎকারে কন্যাবিবাহং দত্তবান্, তৎসুত রামদাসে বাপীবিবাহং দত্তবানিত্যাশ্চর্য্যং। অতএব 'হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি" ইতি ঘটকাঃ।" (পরিষৎ, ৩৪১।২ পত্র) অর্থাৎ পার্ব্বতী বলপূর্ব্বক বন্দ্যবংশীয় হরির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করেন এবং সম্প্রদানের পর হরি পলায়ন করিলে বলপূর্ব্বক হরির পুত্র রামদাসকে ধরিয়া আনিয়া বলেন "তুমিই আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছ" এবং তদ্দ্বারা কুশণ্ডিকাদি করাইয়া লন। ঘটকদের রসাল কারিকাটি সম্পূর্ণ আকারে পুথিতে পাওয়া গিয়াছে :—

'হরি-বন্দ্যে বলে কন্যা দিল পার্ব্বতী।
হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি॥
বরের মাতা কন্যার মাতা দুই সহোদরা।
ভগিনী, বিমাতা, স্ত্রী কোথা আছে কারা॥
কুসুমশয়ন কালে রজবতী রাধা।
অঙ্গপর্শনে বলে "ইকি, দাদা! দাদা!"
পতিরমে সতী হয় তবে সে রণ্ডিকা।
যারে বাপে বিভা করে পুত্রে কুশণ্ডিকা॥"

(কামাল, বন্দ্যবংশ, ৮।১ পত্র)

ইহা ১৬০০ সনের কিছু পূর্ব্বের ঘটনা হইবে।

অসবর্ণবিবাহ :—ব্রাহ্মণসমাজে অসবর্ণবিবাহের দৃষ্টান্ত তৎকালে অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। আমরা একটির উল্লেখ করিতেছি। ফুলিয়া মেলের বিখ্যাত কুলীন সাগরদিয়া বন্দ্যবংশীয় রামকেশব চক্রবর্ত্তীর এক পুত্রের নাম মুনিরাম বা মণিরাম। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

"মুণিরামে…অর্ব্বাচীন শ্রোত্রিয় জয়কৃষ্ণচৌধুরিণঃ কন্যাবিবাহ হেতুঃ—অস্য পিতা পরত্তরামে ক্ষত্রিয়কন্যাবিবাহঃ কৃত ইতি লোকাপবাদ বোয়ালিয়াবাসী।" (সাকা ৮১।১ পত্র)

বিদেশিকন্যাবিবাহ :—ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, যাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নহে। সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে পাওয়া যায় :—"জলেশ্বর বাহিনীপতি ভট্টাচার্য্য অস্তার্ত্তি (অর্থাৎ শ্বশুর) চং হরিদেব পরমানন্দজঃ, পশ্চাৎ দক্ষিণে পক্ষান্তরে জাতিক্ষতিঃ।" (সাকা ১২১।১ পত্র) বাসুদেব উড়িষ্যা যাওয়ার পর তাঁহার পুত্র জলেশ্বর ঐ দেশের কন্যা বিবাহ করেন। ঘটকদের মতে তদ্দ্বারা তাঁহার 'জাতিক্ষতি' হইয়াছিল। বাহিনীপতির বহু কন্যা ছিল, আমরা এযাবৎ দশ কন্যার উল্লেখ পাইয়াছি। প্রত্যেকটি কুলীনের হস্তে সমর্পিত হইয়া কুলভঙ্গের কারণ হইয়াছিল। বাহিনীপতির এই সকল কুলক্রিয়ার ফলে রাঢ়ীয় সমাজে তাঁহার এতদূর খ্যাতি হইয়াছিল যে, কুলগ্রন্থে এই প্রসিদ্ধ বংশটি তাঁহার নামেই পরিচিত হইয়াছিল।

বিবাহবিষয়ে উল্লিখিত দশ প্রকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা যতই বিস্ময়জনক হউক না কেন, ইহাদ্বারা বিশাল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের শিষ্টাচার ও সামাজিকতার তৎকালীন আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। সহস্র সহস্র আচারপূত ঘটনার মধ্যে সমুদ্রে বারিবিন্দুর ন্যায় সামান্য তরঙ্গ তুলিয়াই ইহারা বিলীন হইয়াছিল, স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই সকল বাস্তব ঘটনার সমস্যা যেভাবে তৎকালীন সামাজিকগণ মীমাংসা করিয়াছিলেন তাহাতে উদারতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতায় স্বতন্ত্র মুস্‌লিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

জনৈক পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দু

সম্প্রতি কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য আলাদা একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা উঠিয়াছে। পরিকল্পনা নাকি প্রায় ঠিক—ইহার পূর্ব্বসূচনা হিসাবে কলিকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজের সম্প্রসারণের জন্য এক কোটি তের লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। আজ যদি ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অসাম্প্রদায়িক নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইত অথবা স্বসম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য মুসলমান ধনীগণ মুক্তহস্তে ধন দান করিয়া নিজস্ব সংস্কৃতির প্রচার বা প্রসারের জন্য মুস্‌লিম শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিতে উদ্যত হইতেন তবে কিছু বলিবার ছিল না। স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন আছে কিনা বিচার করিতে হইলে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে প্রবেশার্থী ছাত্রের সম্ভাবিত সংখ্যা জানা প্রয়োজন এবং সেই সংখ্যা হইতেই আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধেও আভাস পাওয়া যাইবে। নিম্নের তালিকায় ১৯৪৫, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ, বি-এস্‌সি উত্তীর্ণদের সংখ্যা এবং তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এবং শতকরা অনুপাত দেওয়া হইল।

বি-এ	মোট সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রছাত্রী	শতকরা
১৯৪৫	১,৭১৬	৩৫২	২০˙৫১
১৯৪৬	২,০৩৪	৩৫৮	১৭˙৫

বি-এসসি	মোট সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রছাত্রী	শতকরা
১৯৪৫	৮২৬	৫৬	৬˙৭৮
১৯৪৬	৯৯০	৮৭	৮˙৭৯

এই সংখ্যা হইতে সরকারী চাকুরিতে (যাহার নিম্নতম যোগ্যতা বি-এ ও বি-এস্‌সি পাস)—শতকরা ৫০˙/. হিসাবে সাম্প্রদায়িক হিস্সা বাদ দিয়া যে সংখ্যা থাকিবে তাহাদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয় না—উহা বুঝিতে কোন কষ্ট নাই। অবশ্য এই বৎসর সরকারী চাকুরিতে ঠিক কতজন গ্রাজুয়েট মুসলমান নিযুক্ত হইবেন—তাহার কত অংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যোগাইবেন অথবা বাংলার বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান অথবা অবাঙালী মুসলমান কতজন ঢুকিবেন ঠিক জানা না থাকায় আমাদের তথ্য অসম্পূর্ণ, স্বীকার করিলাম এবং আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিও না হয় মানিলাম। শুনিতেছি কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারা বর্জ্জন করিবেন না—তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্ব্বাচন। কলিকাতায় উহা স্থাপনের যৌক্তিকতা বিচার করিবার জন্য ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও বি-এসসি উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—

কলিকাতা	বি-এ	বি-এসসি
ইস্‌লামিয়া কলেজ	৫২	×
প্রেসিডেন্সী	২০	৯
রিপণ	১৩	১
স্কটিশচার্চ	৫	১
সেন্টজেভিয়ার্স	৫	১
লেডী ব্রাবোর্ণ	৪	×
আশুতোষ	৩	×
বঙ্গবাসী	২	৪
সেন্টপলস্	১	×
মন্‌কলেজিয়েট	৯	১
সিটি	×	২
	১১৪	১৯
প্রেসিডেন্সী বিভাগ		
বহরমপুর কলেজ	৮	৪
বাগের হাট	৪	×
কৃষ্ণনগর	২	২
দৌলৎপুর	১	১
যশোহর	৫	×
	২০	৭
বর্দ্ধমান বিভাগ		
হুগলী কলেজ	৮	২
বর্দ্ধমান	৭	×
বাঁকুড়া	২	×
বিশ্বভারতী	১	×
মেদিনীপুর	২	১
হেতমপুর	১	×
জনাই	১	×
বীরভূম (মন্‌-কলে.)	১	×
	২৩	৩
রাজসাহী বিভাগ		
রাজসাহী কলেজ	৩০	৬
রংপুর	১৩	৮
পাবনা	৮	৬
দিনাজপুর	৭	×
বগুড়া	৫	×
কুচবিহার	২	×
	৬৫	২০
ঢাকা বিভাগ		
ময়মনসিংহ	২৩	৭
বরিশাল	১৬	৮
করটিয়া	১১	×

ফরিদপুর	৮	×
মুন্সীগঞ্জ	৭	×
চাখার	৩	×
	৬৮	১৫
চট্টগ্রাম বিভাগ—		
কুমিল্লা	৯	৭
চট্টগ্রাম	৭	৪
ফেণী	৭	×
কানুনগো পাড়া	৩	×
	২৬	১১
আসাম—		
শ্রীহট্ট	৩২	৯
গৌহাটি	৬	৩
হবিগঞ্জ	১	×
শিলং	১	×
	৪০	১২

উপরের তালিকা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে প্রয়োজন ত নাই-ই—ইহা ব্যয়বহুলও বটে। সেইজন্যই বোধ করি, তাঁহারা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করিবেন না—অবশ্য বর্জন করিতে আমরা বলি না। কলিকাতা হইতে যে পরিমাণ ছাত্র বি-এস্‌সি পাস করিয়াছে তাহাদের জন্য ইস্‌লামিয়া কলেজেও বি-এস্‌সি ক্লাস খুলিবার আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই—কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে অনায়াসেই তাহাদের স্থান হইতে পারে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা যদি কিছু থাকে তবে সে বি-এ ও এম্‌-এ ক্লাসের জন্য। মফস্বল কলেজে বি-এ ক্লাসগুলিতে যথেষ্ট ছাত্র ভর্তি হইতে পারিবে।

উপরের তালিকা হইতে আরও দেখা যাইবে, কলিকাতার প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান ছাত্র ইস্‌লামিয়া কলেজ হইতে পাস করিয়াছে—অন্যান্য কলেজ হইতে পাস করিয়াছে অর্দ্ধেকের সামান্য বেশী। ভবিষ্যতে ঐ সব কলেজে মুসলমান ছাত্রদের পড়িতে কোন বাধা নিশ্চয়ই হইবে না। তবে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তিত পরিবেশে যদি তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা শুধু ইস্‌লামিয়া কলেজেই পড়িবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন করিবেন তবেই শুধু আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উঠে। অবশ্য কলিকাতা হইতেই বেশী মুসলমান ছাত্র পাস করিয়াছে, (বি-এ ১১৪) কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ এবং শ্রীহট্ট হইতে পাস করিয়াছে (বি-এ ১৯১ জন)। কলিকাতা হইতে যাহারা পাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় ছাত্র কম হইবে না।

সুতরাং কলিকাতার কলেজের সম্প্রসারণ জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করিয়া ভবিষ্যৎ বিশ্ববিদ্যালয়-সৃষ্টির আয়োজন না করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করিলে যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়। আরও মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি শুধু আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই হয় না—একেবারে গোড়ায় হাত দিতে হয়। তাই যাঁহারা আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দিকে মন দিলে ভাল করিতেন। তাহা হইলে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক প্রয়োজনেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হইবে।

অবশ্য আমরা ইহা ভুলি নাই যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে রাজনীতিক দলদ্বারা চালিত হইতেছে তাঁহারা কোন যুক্তিই মানিবেন না—কাজেই ইহা অরণ্যে রোদন।*

* সংখ্যাগুলি *India-To-morrow* পত্রিকা হইতে লওয়া হইয়াছে—ভুলভ্রান্তি কিছু থাকিলেও মূল বক্তব্যের পরিবর্ত্তন সামান্যই হইবে।

বাংলার খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ম্যালেরিয়া

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি.

প্রাইমারী স্কুল থেকে পড়ে আসছি স্ত্রীজাতীয় এনোফেলিস মশা কর্তৃক ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বেলেঘাটায় মশা ধরে এই তথ্য সপ্রমাণ করায় স্যর রোনাল্ড রস ১৯০২ সালে নোবেল প্রাইজ পেলেন ইত্যাদি। কুইনিন ম্যালেরিয়ার ঔষধ জানা থাকলেও বাংলাদেশে যে বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনিন দরকার তা আগে জানা ছিল না। তারপর যুদ্ধের আগেও অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালেও যে বাংলাদেশের চাহিদা সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ডের স্থলে মাত্র এক লক্ষ বার হাজার পাউণ্ড কুইনিন পাওয়া গেছে সে খবরও হয়ত সকলে অবগত নন। ম্যালেরিয়া গরিবের রোগ, কিন্তু তার চিকিৎসায় ধনীকেও হিমসিম খেতে হয় বলে একটি কথা আছে। যুদ্ধের আগেই বাংলাদেশের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র কুইনিন পাওয়া যেত। যুদ্ধের কয়েক বৎসরে কুইনিনের যে কিরূপ শোচনীয় অভাব ঘটেছে এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের লোকক্ষয় যে এর জন্য অনেকাংশে দায়ী তা বুঝে উঠাও শক্ত নয়। এখন ম্যালেরিয়ার সঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনের কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।

ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি পাড়ার চরেন সেখ,

রমজান সরদার, মহেশ মণ্ডল ও রামচরণ দাসের বাড়ির লোকেরা একে একে ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে উৎসন্ন হয়ে গেল। গ্রামে আরও অনেক কৃষক-পরিবারের এইরূপ প'ড়ো ভিটা পড়ে রয়েছে। আগে যে সব বাড়িতে দশ-পনর জন লোক ছিল, চার-পাঁচখানা হাল বের হ'ত সে বাড়িতে মরতে মরতে দু-এক জন মাত্র লোক অবশিষ্ট আছে। যারা বেঁচে আছে তারাও জীবন্মৃত। কলুবাড়ি, জেলেবাড়ি প্রভৃতিরও এই একই দশা। কল্পনা নয়, কঠোর সত্য। এখনও আশ্বিন থেকে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত জ্বরে না পড়ে এমন লোক গ্রামে নাই বললেই চলে। অথচ এই সব গ্রাম কলিকাতা থেকে বেশী দূরে নয়, কলিকাতার বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যেই এরূপ গ্রাম অনেক আছে। আগে মনে করতাম কলিমদ্দির পরিবার উৎসন্ন গেল এতে শুধু তাদেরই গেল, অপরের ক্ষতি কি? শশীদাসের উপযুক্ত ছেলে ও ভায়েরা মরে গেল তাতে বুড়োবুড়ী ও বিধবাদের আজীবন কষ্ট, অপরের কি ক্ষতি তাতে? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, এদের সঙ্গে শুধু গ্রামবাসীরই নয়, পরন্তু সমগ্র দেশের সুখদুঃখই নিবিড়ভাবে জড়িত। যে সব কৃষক-পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, জীবিতকালে এরা নিজেদের পরিশ্রমে উৎপন্ন চাল, ডাল, আনাজ তরকারি শুধু যে নিজেরাই খেত তা নয়, বরং উদ্বৃত্ত শস্যাদি গ্রামের জেলে, তাঁতি, কলু প্রভৃতি ভূমিহীন লোক খেয়ে বাঁচত, ভদ্রশ্রেণীর ত কথাই নাই। পাবনা জেলার মালিগাছা থেকে উত্তরে চাটমহর ও পশ্চিমে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের যাঁরা খবর রাখেন, রাণাঘাট-লালগোলা লাইন ও রাণাঘাট-যশোর লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এ কথা ভাল ভাবেই জানেন। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার কথা তো অনেকেরই সুবিদিত। পাবনায় যে অঞ্চলের উল্লেখ করলাম ঐ অঞ্চলের কত বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু-মুসলমান পরিবার যে উৎসন্ন হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নাই। চাষীর অভাবে মাঠের পর মাঠ অনাবাদী পড়ে আছে, পতিত জমি ক্রমশঃ বেতঝোপ, আসশ্যাওড়া, ভাঁট নাটা ইত্যাদির জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। যে সব গ্রামে দু-চার ঘর কৃষক-পরিবার আছে তারাও বছর বছর ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্লীহা-যকৃতের ব্যাধিতে প্রপীড়িত; নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সামান্য কয়েক বিঘা জমি কোনরূপে চাষ করে, শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে বেশী জমি চাষ করা বা চাষের জমির উপযুক্ত যত্ন লওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। এই ভাবে বাংলাদেশে অনেক উর্ব্বর জমি চাষের অভাবে পতিত পড়ে থাকে, ফলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষ চিরসহচর হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে চর অঞ্চলে—যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম, সেখানে লোকের এত ঘন বসতি যে স্থানীয় আবাদী জমিতে লোকের অন্নাভাব দূর হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ, কুষ্টিয়া, পাকশী, পাবনা, পাংসা এই চতুঃসীমানার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের অবস্থা দেখলেই এ কথা বুঝা যায়।

ধানবাদের নিকট সিঁদরিতে সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সংবাদে দেশবাসী, বিশেষতঃ কৃষক-সম্প্রদায়ের উল্লসিত হবারই কথা। তবে অনেকে অবগত আছেন যে, শুধু সালফেটে ফসলের ফলন ভাল হয় না। সন্তোষজনক ফসল পেতে হলে অ্যামন সালফেটের সঙ্গে ফসফেট সারেরও ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর যে সব অঞ্চলে প্লাবন বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প সেই সব অঞ্চলেই কৃত্রিম সার বেশী ফলপ্রদ হয়ে থাকে। বারিপাতের পরিমাণ বেশী হলে ঐ সার জলে দ্রবীভূত হয়ে ধুয়ে যায় অথবা জলের সঙ্গে চুঁইয়ে বেশী মাটির নীচে প্রবেশ করলে ফসল সেই সারের উপকার পেতে পারে না। এরূপ স্থলে 'হিউমাস' জাতীয় সার অর্থাৎ পচা ঘাস পাতা বা গোবরের সার থাকলে সেগুলির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রাসায়নিক সার সক্রিয় থাকতে পারে, ফলে শস্যের চারাগুলি তদ্দ্বারা পুষ্ট হবার সুযোগ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নিম্ন বাংলার ধানচাষারা রাসায়নিক সারের দ্বারা খুব বেশী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায় না। একমাত্র রবিখন্দের বেলাতেই রাসায়নিক সারের সুব্যবহার ও তজ্জনিত সুফল আশা করা যায়। কিন্তু এই রবিখন্দের চাষেই ম্যালেরিয়া বাঙালী চাষীর প্রধান প্রতিবন্ধকতা করছে। অনেকেই জানেন, উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম বাংলার উঁচু জমিগুলি রবিখন্দ চাষের সবিশেষ উপযোগী। আর এই সব স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রধান কয়েকটি অঞ্চলের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া প্রসঙ্গে গ্রাম্য কবি লিখেছেন—"কার্ত্তিকে জ্বরে পড়ি চৈতালী বোনা হ'ল না, ক্ষেত্র রহিল পতিত পড়ি।" এই কথাটি বিশ্লেষণ করলে কি দাঁড়ায় দেখা যাক্—বর্ষার শেষে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় কৃষক চৈতালী—অর্থাৎ রবিখন্দের চাষ করতে পারল না—এতে ডাল কলাই এবং সরিষার তেলের সংস্থান করা থেকে সে বঞ্চিত হ'ল। ধান বিক্রী করে তার ডাল ও তেলের সংস্থান করতে হবে। অথচ ধানও হয়ত সে সংবৎসরের জন্য পর্য্যাপ্ত পায় নি। সুতরাং বৎসরের শেষে তাকে মহাজনের দ্বারস্থ হতে হবে থালা ঘটি কিংবা জমি বন্ধক রেখে ধান কিনে খাবার জন্য। রবিখন্দ না পাওয়ায় তার গরুর খোরাকও জুটল না। মটর মসুর ছোলা খেসারী প্রভৃতির ভুষি গরুর পুষ্টিকর খাদ্য। এদিকে দুর্ব্বল গরু দিয়ে জমির চাষও সে সুবিধামত করতে পারবে না, পক্ষান্তরে চৈতালী বোনা হলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমির 'যো' থাকতে থাকতে চাষ করতে পারত, ফলে জমি অনেকটা 'পাট' হয়ে থাকত তার পর রবিখন্দের শিকড়-সংলগ্ন ব্যাক্টেরিয়ার ক্রিয়াতে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তিও অনেকটা বৃদ্ধি পেত। এখন মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে এই চাষী তার জমি-

চাষের সুযোগ পাবে, নতুবা শক্ত মাটিতে চৈত্রের বৃষ্টির আগে আর 'লাঙল ধরান' সম্ভবপর হবে না। এদিকে এই কয়েক মাস জমি পতিত থাকাতে কাশ, দূর্ব্বা প্রভৃতি ঘাস এত 'ঝোর ধরে' উঠবে যে সেগুলি মেরে ফেলবার আর সে সময় পাবে না, কারণ আউশ-ধা আমন ধান বোনার সময় এসে পড়বে। সুতরাং জমি ভালমত 'পাট' না হওয়াতে ধানের সন্তোষজনক ফসল পাওয়াও এই চাষীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। দুই এক বার এই ব্যাপার ঘটলে ঐ চাষীর 'লায়েক' জমি থাকলেও সে অভাব ও দেনায় ডুবে যাবে এবং অনশন-অর্দ্ধাশনে অকালে তার জবলীলা সাঙ্গ হবে। অতএব "বেশী ফসল ফলাও" বলে ফতোয়া দেবার আগে দেশের নেতৃবৃন্দকে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থাই যে সর্ব্বাগ্রে করতে হবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ম্যালেরিয়া নিবারণ করা যে অসম্ভব নয়—ইটালী দেশের ও পানামা অঞ্চলের খবরে তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ঐ সব স্থানের গবর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণ কুইনিনের ব্যবস্থা করায়, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত গৃহাদি নির্ম্মাণ করে দেওয়ায়, বাসস্থানের সন্নিকটস্থ ঝোপঝাড় ও জলা জায়গা নিয়ন্ত্রিত করায় এবং পাইরেথ্রাম প্রভৃতি প্রয়োগে মশার বংশবৃদ্ধি রহিত করায় সাফল্য লাভ করেছেন। আমাদের চোখের সামনেই ম্যালেরিয়া-প্রধান পানাগড়, কাঁচড়াপাড়ায় সৈন্য-শিবিরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হতে দেখা যায় নি। গত যুদ্ধের মধ্যে আসাম এবং ব্রহ্মদেশের জঙ্গলেও যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করায়, বিশেষ করে ডিডিটি প্রয়োগের ফলে সেখানে সৈন্যদের ম্যালেরিয়া হয় নি বলে প্রকাশ। সুতরাং দেশবাসী সত্য-সত্যই অবহিত হলে, বাংলার অবজ্ঞাত, নিরক্ষর দরিদ্র কৃষক-দের বাঁচাতে চাইলে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থাও তাঁরা নিশ্চয়ই করতে পারবেন। আজকাল কুইনিন ভাতা থেকেও পাওয়া যাবে। তার পর কুইনাক্রিন, পেলাড্রিন প্রভৃতি ম্যালেরিয়া-নিবারক নূতন নূতন ঔষধও দুষ্প্রাপ্য নয়। তবে গ্রামের কৃষকগণের অজ্ঞতা ও দরিদ্রতা অপরিসীম এবং সুচিকিৎসারও শোচনীয় অভাব বিদ্যমান। গ্রামের সঙ্গে যাঁদের যোগ আছে তাঁদের এ কথা বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গের প্লাবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক-বৃন্দের সাহায্যে দুর্দশা মোচনে যেরূপ সাফল্য লাভ হয়েছিল—ম্যালেরিয়া নিবারণেও অনুরূপ প্রয়াস আবশ্যক। প্লাবন-পীড়িত একটি কেন্দ্রে কয়েক দিন কাজ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সকালে সামান্য জলযোগান্তে আমরা তিন-চার জন এক একটি গ্রামে যেতাম। সেখানে প্রত্যেক বাড়িতে কয়খানি চালাঘর ছিল, তন্মধ্যে ক'খানা সম্পূর্ণ পড়ে গেছে, কয়খানির দাওয়া ধ্বসে পড়েছে বা বেড়া খসে গেছে, পরিবারের মোট লোকসংখ্যা, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ কত জন, আর্থিক সংস্থান প্রভৃতি টুকে নিয়ে আমরা বেলা আড়াইটা তিনটায় কেন্দ্রে ফিরে এসে রিপোর্ট দাখিল করতাম এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ গ্রামবাসীদের সাহায্য প্রদান করা হ'ত। ম্যালেরিয়া-বহুল অঞ্চলেও যদি অনুরূপ ভাবে কাজ আরম্ভ হয়—প্রত্যেকটি গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের মোট লোকসংখ্যা, ম্যালেরিয়াগ্রস্তের সংখ্যা, আর্থিক সংস্থান, বসতবাটীর কত গজ দূরে এঁদো ডোবা, বাঁশঝাড় বা পাট পচানোর ডোবা বিদ্যমান, বাড়ির বা পাড়ার জল নিকাশের বন্দোবস্ত, পানীয় জলের অবস্থা প্রভৃতি সুস্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ হয় এবং তদনুসারে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যো-ন্নতি-বিধায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা যথাযথ অবলম্বিত হয়, তবে বাংলার গ্রামগুলির ম্যালেরিয়া দূর করে তত্রত্য লোকেদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান হারে খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থাও সহজসাধ্য হবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক্ ম্যালেরিয়ায় কারা মরে বেশী? গরিব না ধনী? চিকিৎসার সুযোগ সমান ভাবে পেলেও ধনীর চেয়ে গরিব বেশী মরে। যারা সদ্য সদ্য মারা গেল, তারা ত গেলই, কিন্তু ভুগে মরে গরিবরাই বেশী। ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি রক্তকণিকা নষ্ট করে দেয় ফলে জ্বর সেরে গেলেও রোগীর দুর্ব্বলতা কাটতে সময় লাগে। এ সময় যদি পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে খেতে পায় তবে রোগী শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন। আজকাল কৃষকদের মধ্যেও বাবুদের দেখাদেখি একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার বিলোপ হেতু অধিকাংশ বাঙালী কৃষকের পক্ষেই হালের বলদ ছাড়া অতিরিক্ত গাই গরু পোষা সম্ভব হয়ে ওঠে না—তারপর পরিবারে একা থাকায় দুর্ব্বল শরীরেই মাঠের কাজে তাকে খাটতে হয়, ফলে শরীর চাঙ্গা করে তোলার আর সে সময় পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ লোক শীতের শেষে আমাশয় বা পেটের অসুখে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে। বাংলার কৃষক-পল্লীতে তাই আজকাল চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধের লোক বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ ম্যালেরিয়া-প্রধান অঞ্চলেও সচ্ছল অবস্থার লোকেদের প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়া হলেও স্বাস্থ্যের বৈলক্ষণ্য বুঝা যায় না। আমি নিজে এরূপ দু-একজন লোকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। ম্যালেরিয়া বিদূরিত হলে চাষের কিরূপ সুরাহা হবে তার কিঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। শস্যশ্যামলা বাংলাকেও যখন আমদানী খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে তখন উপযুক্ত সার প্রয়োগে জমখাদ্যের উন্নতি করে বাংলায় ধানের আবাদ ও ফলন বাড়ানো ছাড়া ব্যাপকভাবে আলুর চাষের প্রবর্ত্তন করাও অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে। উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-বাংলায় যে সব অঞ্চলে রবিখন্দের চাষ হয় সেই সব জায়গা ম্যালেরিয়ামুক্ত করতে পারলে, স্বাস্থ্যবান্ কৃষকদের ভাল আলুর বীজ ও উপযুক্ত সার সরবরাহ করলে

বাংলার অন্নাভাব অনেকটা প্রশমিত হতে পারে। কারণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুর্ব্বল চাষী এখন যেখানে তার পোষ দেওয়ার মত করে ছোলা মটর বা মুসুরী বোনে এবং বিঘা প্রতি বড়জোর চার-পাঁচ মণ মাত্র ফসল পায় সেখানে সে উপযুক্ত ভাবে চাষ করে বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণ গোল আলু ফলাতে পারে। পুষ্টির দিক থেকে গোল আলু ভাত বা রুটিরই সমকক্ষ। চাষীরা পর্য্যাপ্ত আলু জন্মালে এক বেলা ভাত ও অপর বেলা আলু ও মাছ ডাল খেয়ে অনায়াসে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। শুনতে পাই আয়র্ল্যাণ্ডে আলুই প্রধান ফসল। জার্মানীতেও রুটির চেয়ে আলুর প্রচলনই বেশী। সেখানে লোকে যত আটা ময়দা ব্যবহার করে গোল আলু ব্যবহার করে তার দ্বিগুণ। বেলজিয়মে গোল আলু ও আটা-ময়দা প্রায় সমপরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিলাতের লোকেরাও ৯ আনা আটা-ময়দা ও ৭ আনা আলু খেয়ে থাকে। ঐ সব দেশে গোল আলুর চাষও খুব বেশী হয়। জার্মানীর মোট আবাদী জমির শতকরা ২৫ অংশ ও বিলাতের চাষের জমির শতকরা ১৮ ভাগে গোল-আলুর চাষ হয়, আর ভারতবর্ষের আবাদী জমির হাজারকরা মাত্র তিন ভাগ জমিতে আলুর চাষ হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে যে এ দিকে এখনও বিশেষ কোনও চেষ্টাই হয় নাই তা সহজেই অনুমেয়। আমেরিকার বিখ্যাত মনীষী ডিকসন বলেছেন—"পূর্ব্বে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে প্রায়শঃ দুর্ভিক্ষ দেখা দিত কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলুর চাষ করায় ঐ সব দেশের দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে।" ভারতবর্ষ, তথা বাংলার দুর্ভিক্ষও ঐ একই ভাবে দূর করা যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ম্যালেরিয়ামুক্ত বঙ্গপল্লীর স্বাস্থ্যবান কৃষকদের সাহায্যে কৃষি-বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রচুর পরিমাণে গোলআলু উৎপাদনের উপরেই খাদ্য-সমস্যার সমাধান অনেকটা নির্ভর করছে।

আলোকে-আঁধারে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

[আলোকে]

আলো-রূপে চিত্ত জুড়ি ছিলে এক দিন।
আজিকার উচ্ছ্বাসবিহীন
সন্ধ্যার ম্লানিমা
তারে ঘেরি দিতে চায় অকারণ সীমা,
টানি' দিতে সোনার বিস্মৃতি,
সে দিনের স্মৃতি
ভরেছিল যে পূর্ণ আকাশে
শুভ্র-রূপে দেখাইতে তারে অবিশ্বাসে।

তুমি তাই আসন্ন আঁধারে
পাতো নি আসন তব বর্ণচ্ছটাহারে,
বিকলে করুণ ক'রে তোলো নি প্রদোষ,
করো নাই রোষ;
নিঃশব্দে এড়ায়ে তব ক্লান্ত কোলাহল
শোভিতেছ দীপ্ত ঝলমল
প্রসন্ন পুলকে
অশ্রুর কালিমা হতে বহু ঊর্দ্ধলোকে।

[আঁধারে]

আজিকার এই স্তব্ধ উচ্ছ্বাসবিহীন
নিস্পন্দ চাহিয়া থাকা তিমিরের পানে
মুক্ত বাতায়ন-পথে, আঁধারেতে লীন
অসীমের অনুভব উদার আহ্বানে—

এই শান্ত পথটির ধূসর প্রসারে
লক্ষ্যহীন খেয়ালেতে উদাস নিমেষে
চকিতে চমকি' ওঠা, মনে হয় কারে
যেন দূরে হেরিলাম পরিচিত বেশে—

এই শূন্য কক্ষকোণে মতদুখে ধীরে
অধরে মিলায়ে যায় একখানি নাম,
নীরবে নিমীলি' আঁখি স্মৃতিটুকু ঘিরে
অতীত জীবনতীর্থে চরম প্রণাম—

নিরন্ত আমার যত অশ্রুর সঞ্চয়
তার মাঝে পাই তব পূর্ণ পরিচয়।

এশিয়ার ঐক্য

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

এশিয়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি একদা সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার দ্রুত উন্নয়ন আজ এত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েছে যে প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা এশিয়ার বিভিন্ন অংশের উপর নানা ভাবেই কর্তৃত্ব করে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্কের অধঃপতনের সূচনা দেখা যায় এবং প্রায় সেই সময় থেকেই ইউরোপের শক্তিবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রবল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার অভ্যুদয় তার বহু পরে, কিন্তু তার অগ্রগতি বিস্ময়কর এবং সে দেশ আজ এত শক্তিশালী হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব তার প্রতাপে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

যে এশিয়া এক দিন সমগ্র ইউরোপ তথা অন্য বহু ভূভাগের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি রূপে পরিগণিত হয়েছিল তার বর্ত্তমান অবনতি ও দুর্দ্দশার মূল কারণটি কি আজকের দিনে সে কথা ভেবে দেখা একান্ত আবশ্যক।

ইউরোপের ঐক্যের সূত্রপাত হয় তখন থেকে, সেণ্ট পীটারের উত্তরাধিকারিগণ যখন সীজারের উত্তরাধিকারীবর্গ থেকে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠে, যদিও সে যুগ ছিল তমসাচ্ছন্ন। ইউরোপের সেই নবোত্থিত সভ্যতা ও উন্নয়ন রোম বা ইউনানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত নয়, বরং স্পেনবিজেতা মুরদের দ্বারা এই উন্নতির ক্ষেত্র রচিত হয়।

ইউরোপের ঐক্যের মূলে আরো একটা বিশেষ কারণ নিহিত রয়েছে। ইসলাম ধর্ম্ম-প্রচার-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবার জন্যেই বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি একদা একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল।

অবশ্য একথাও মেনে নিতে হবে যে, ধর্ম্মগত ঐক্যও ইউরোপের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দেশ এবং জাতিসমূহকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

তুরস্কের সুলতান সোলেমানের পরাক্রম ও ক্ষাত্রশক্তির প্রভাব এক সময়ে সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত ও অনুভূত হয়েছিল। বারবারোসার অধিনায়কত্বে তার নৌ-শক্তিও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সব অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার কথা।

রোম ও কার্থেজ রাজ্যের ইতিহাসও বিচিত্র। কার্থেজ প্রাচ্য রাজ্য ও রোম পাশ্চাত্ত্য রাজ্য। এ কথা সত্য যে, রোম কার্থেজকে পরাস্ত করেছিল, কিন্তু কার্থেজ তার অমিত পরাক্রমের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল তা আজও সকলের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তখনকার দিনে হানিবলের তার এমন সব সেনানায়ক জন্মেছিলেন যাঁদের বিক্রম সর্ব্বদেশে অনুভূত হয়েছিল।

এশিয়ার পূর্ব্বগৌরবের কথা বাদ দিয়ে এখন তার বর্ত্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক। কেমন করে এশিয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে নেমে গিয়ে চরম দুর্দ্দশার স্তরে উপনীত হয় তা বিস্তারিত ভাবে বলবার স্থান এটা নয়—কিন্তু আজ এশিয়ার দিকে তাকালে ঐক্যবোধের অভাবটা বিশেষ করে চোখে পড়ে। যেমন ধরা যাক চীনের কথা—চীনের গৃহযুদ্ধ তাকে সর্ব্বস্বান্ত করতে উদ্যত। বিরাট দেশ, বিপুল তার জনসংখ্যা কিন্তু হলে কি হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দলাদলি, মারামারি হানাহানির আর অন্ত ছিল না, এমনি সময়ে জাপানের সঙ্গে তার বাধল ঘোর সংঘর্ষ যা চলতে লাগল বহু বৎসর ধরে। চিয়াঙের নেতৃত্ব দশ আনা চীনারা মানে, দেশের বাকী জনসঙ্ঘ রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভিন্নপন্থী এবং এইটেই হচ্ছে চীনের গৃহবিবাদের মূল কারণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পড়ল হিরোসীমায় আণবিক বোমানিক্ষেপের পর। এই প্রচণ্ড আঘাতে জাপান পর্য্যুদস্ত হয়ে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল এবং পরাধীনতার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হ'ল।

বিদেশের কথা ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও দেখি, আমাদের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে বিদেশী বণিকরাজ পরাধীনতার শৃঙ্খলকে কায়েম করতে বদ্ধপরিকর।

আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল যে যদি এমনিধারা অবস্থা চলতে থাকে তা হলে প্রাচীর উত্থানের আশা হবে সুদূরপরাহত, পরবশ্যতার নাগপাশ থেকে এশিয়ার মুক্তিলাভ কস্মিন্ কালেও ঘটে উঠবে না। মহতী বিনষ্টির হাত থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এশিয়ার এই মর্ম্মন্তুদ দশা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগ যুগ ব্যাপী অমা রজনীর,
মিশেছে তোমার সুপ্তির তীর
মৃত্যুর কাছাকাছি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী।"

• • •

কিন্তু সুখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জাগরণের লক্ষণ দেখা দেয়। এশিয়ার

সেই গণচেতনা আজ ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ভারতে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কথা। দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহ সংগ্রামে জয়ী হয়ে ভারতবর্ষে এসে মহাত্মাজী কি অভাবিতপূর্ব্ব রাষ্ট্র-চেতনার সঞ্চারই না এদেশে করেছিলেন। আটাশ বৎসর ধরে অক্লান্ত সাধনার ফলে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন তাতে মনে হয় ভারতের, তথা সমগ্র এশিয়ার মুক্তি আসন্নপ্রায়।

প্রায় সব দেশেই দেখা গেছে, যে জাতির জীবনে এরূপ সঙ্কট-সময় আসে, যখন এমন একজন যুগ-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব ঘটে, যাঁর প্রভাব দেশকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে পরিচালিত করে। জাতি এমনি এক মহামানবের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় থাকে, যাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সাধনা তাকে বর্ত্তমান অবনত অবস্থা থেকে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উন্নীত করে। মহাত্মাজীকেও ভারতবর্ষ তার বড় প্রয়োজনের সময়েই পেয়েছিল। আজও সেই মহামানব জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি-কল্পে অক্লান্তভাবে সাধনা করে চলেছেন। আজও তাঁর কর্ম্মের বিরাম নেই। নোয়াখালি আর ত্রিপুরার পল্লীগ্রামের পথে পথে অহিংসা আর মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করে এখন তিনি বিহারের পল্লী অঞ্চলকে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করেছেন। আরও অনেক বাধা-বিঘ্ন তাঁকে অতিক্রম করতে হবে। এখনও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে জীইয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদ তার বনিয়াদ সুদৃঢ় করতে চায় তার ভুল ভাঙতে হবে।

ভারতের জাতীয় মহাসমিতির কণ্ঠে ব্রিটিশের উদ্দেশে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'কুইট এশিয়া'—এশিয়া ছাড়। সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে এই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সংঘবদ্ধ করতে হবে, এশিয়াকে পরিণত করতে হবে এক অমিত শক্তিশালী মহাদেশে। এশিয়ার মধ্যমণি ভারতবর্ষে আজ যে এশিয়ান রিলেশন্‌স কন্‌ফারেন্স হয়ে গেল তাকে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

আজকের দিনে প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রধান লীলা-নিকেতন ও বিকাশক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে অনুষ্ঠিত নিখিল এশিয়াবাসীর এই মহাসম্মেলনের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে সমগ্র এশিয়াবাসীকে আজ স্বাবলম্বী হতে হবে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে—নতুবা তার ধ্বংস যে অনিবার্য্য এ কথা আজ এশিয়ার প্রতিটি দেশের অধিবাসীদিগকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে হবে।

ষোড়শ শতাব্দীতে যারা বণিগ্‌বৃত্তির অছিলায় এশিয়াখণ্ডে সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করেছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে তাদের শোষণ-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধমান হয়ে উঠছে। ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতির সঙ্গে আজ আমেরিকার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদও (Commercial Imperialism) হাত মিলিয়েছে; রাশিয়ার কম্যুনিজমের আসল স্বরূপ কি তাই নিয়ে আজ অনেকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সমগ্র এশিয়া মহাদেশ জুড়েই চলছে সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের কূট চক্রান্ত আর তাণ্ডব-লীলা।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। ইন্দোচীনের মুখেও একই বুলি—"ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক।"

ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিসাধক ডাক্তার সুকর্ণ ও পরিষ্কার বলে দিয়েছেন—'We want a complete break with Holland'—হল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ আমাদের কাম্য। সমগ্র এশিয়ার সহানুভূতি ও সহযোগিতা যে ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনকে অদূর ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় মুক্তি-আন্দোলন আজ ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে আরব, মিশর, ইরাণ প্রভৃতি এশিয়ার অন্যান্য ছোটখাটো দেশসমূহের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে।

বৃটিশ স্বতন্ত্র শ্রমিকদলের নেতা মিঃ ব্রকওয়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার দাবি আর বিলম্ব না করে মেনে নেওয়া হোক।

এশিয়ার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এশিয়ার জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সদ্যোগত নিখিল-এশিয়াবাসীর সম্মেলনের অধিবেশনের গুরুত্ব অত্যধিক। সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতা অর্জ্জন ও সংরক্ষণ করতে হলে এশিয়ার বিপুল জনসঙ্ঘকে আজ সঙ্ঘবদ্ধ এবং একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতেই হবে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যাপারেও সমগ্র এশিয়ার সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

সুতরাং এশিয়াবাসীর এই সম্মেলন যে খুবই সময়োচিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা এই মহদনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তাঁদের আদর্শ জয়যুক্ত হোক—প্রত্যেক ভারতবাসী একান্ত মনে এই কামনাই করছে।

খাদ্য ও টনিক

আমরা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন সময়ে একটী উৎকৃষ্ট টনিকের প্রয়োজন বোধ করি। অসুখেই হউক বা সুস্থ অবস্থাতেই হউক, যখনি কোনো কারণে আমাদের জীবনীশক্তির ক্ষীণতা ঘটে তখনি অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ একটী টনিক নিয়মিত ব্যবহার করিতে বলেন। ইহার প্রধান একটী কারণ এই যে আমাদের দৈনন্দিন আহার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টিসাধনে দৈনিক আহার্য্যের এই অক্ষমতা টনিকের দ্বারা পূরণ হয়।

কিন্তু টনিক যত উৎকৃষ্টই হউক না কেন তাহার একটী দোষ এই যে উহাদ্বারা কোন স্থায়ী ফল লাভ হয় না। সাময়িক কোনো প্রয়োজন সাধনে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হইলেও উহার প্রভাব অল্পকালেই নিঃশেষিত হয়। একমাত্র সুনির্ব্বাচিত কোনো খাদ্যদ্বারাই দৈহিক পরিপুষ্টির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভবপর।

স্থানা-ভিটা এই সকল কারণেই একটী আদর্শ পানীয়-রূপে পরিগণিত। ইহা একাধারে একটী শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও টনিক। ইহাতে টনিকের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যকে আশ্রয় করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। তাই ইহার নিয়মিত ব্যবহারে দেহের প্রাত্যহিক ক্ষয় ও ক্ষতি পূরণ হইয়াও শক্তি ও উদ্যমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার গড়িয়া উঠে।

স্থানা-ভিটা সুনির্ব্বাচিত ও মূল্যবান উপাদানসমূহের সুষম সমন্বয়ে প্রস্তুত। ইহাতে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো, লেসিথিন, ভিটামিন "বি" কমপ্লেক্স, মল্টযুক্ত সয়াসীম ও অতি প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থসকল যথাযথরূপে বিদ্যমান। ইহা সুস্থ কি অসুস্থ যে কোনো অবস্থাতেই সমান উপকারী। বিশেষ করিয়া রোগান্তে, প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে, বার্দ্ধক্যে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শিশু ও মস্তিষ্কজীবীর পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ বলিয়া স্থানা-ভিটা রোগান্তে ও বর্দ্ধিষ্ণু শিশুদের পক্ষে একটী আদর্শ খাদ্য ও টনিক। রোগবিধ্বস্ত শরীরের দ্রুত সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করিতে ও শিশুদের বৃদ্ধির সহায়তা করিতে এই খাদ্য-গুণটির তুলনা নাই। এই অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাই প্রাত্যহিক খাদ্যের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। নিয়মিত স্থানা-ভিটা ব্যবহার করিলে অতি সহজেই আমরা এই ভিটামিন যথাযথরূপে পাইতে পারি। অধিকন্তু খাঁটি দুগ্ধ ও কোকো থাকাতে স্থানা-ভিটা মস্তিষ্ক, পেশী ও অস্থি গঠন ও দৃঢ় করিতে সবিশেষ সাহায্য করে।

স্থানা-ভিটার লেসিথিন সম্পদ মস্তিষ্কজীবীদের পক্ষে অপরিহার্য্য; বিশেষজ্ঞদের মতে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও শক্তি-বর্দ্ধনে লেসিথিনের জুড়ি নাই। মল্টযুক্ত সয়াসীম স্থানা-ভিটার আর একটি অপূর্ব্ব সম্পদ। বস্তুতঃপক্ষে সয়াসীম খাদ্যতত্ত্বের এক বিস্ময়কর অবদান। উদ্ভিজ্জ জাতীয় হইলেও ইহা আমিষ প্রোটিনে সবিশেষ সমৃদ্ধ। স্থানা-ভিটাতে এই সয়াসীমের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট কোকোর সারাংশ থাকাতে প্রোটিন-সম্পদে ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে প্রোটিন ব্যতীত যথার্থ দেহগঠন ও স্নায়ুমণ্ডলীর সুষ্ঠু পোষণ ও সংস্কার কিছুতেই সম্ভব নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত এই যে বয়স্কদের দৈহিক ওজনের সের প্রতি দৈনিক ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন হয় ও সেই অনুপাতে শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন ২·৫ গ্রাম প্রোটিন। প্রোটিনের এই অপরিহার্য্য দৈনিক বরাদ্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ১৫ ভাগ আমিষ প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি কাপ স্থানা-ভিটাতে অন্যান্য নানা মূল্যবান্ উপাদান ছাড়াও দুইটী ডিমের সমান প্রোটিন থাকে। প্রত্যহ দুই কাপ স্থানা-ভিটা পান করিলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় আমিষ-প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। উপরন্তু মল্ট ও সয়াসীম থাকাতে স্থানা-ভিটা কেবল যে সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হইয়াছে তাহাই নহে, অন্যান্য খাদ্য পরিপাক করিতেও এই অপূর্ব্ব খাদ্য পানীয়টি সবিশেষ সাহায্য করে।

প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে জননীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐ সময়ে নিয়মিত স্থানা-ভিটা ব্যবহার করিতে দিলে যাবতীয় অশুভ উপসর্গ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাওয়া যায়। স্থানা-ভিটাতে প্রচুর পরিমাণে খাঁটি দুগ্ধ, কোকো ও অন্যান্য মূল্যবান উপাদান থাকাতে ইহা দ্রুত মাতৃদেহের সংস্কার ও পুষ্টিবিধান করে। চর্ব্বি, প্রোটিন, লৌহ, শর্করা, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি দেহ-গঠনোপযোগী ও শক্তিবর্দ্ধক যাবতীয় খাদ্যগুণই নিতান্ত সহজপাচ্য অবস্থায় স্থানা-ভিটা হইতে পাওয়া যায়।

স্থানা-ভিটা কি সুস্থ কি অসুস্থ সকলের পক্ষেই সমান উপকারী। যে কোনো বয়সে ও যে কোনো সময়ে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। স্থানা-ভিটার মধুর গন্ধ ও সুমিষ্ট স্বাদ সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিদায়ক। ইহা গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো ভাবেই খাওয়া চলে। বিজ্ঞাপন

রাসায়নিক কার্ব্বোহাইড্রেটস্

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

সুখের বিষয় আজ এ দেশের সাধারণ মানুষও অজ্ঞাতসারে বহু রাসায়নিক শব্দ ব্যবহার করেন, যাহার প্রকৃত অর্থ তাহাদের বোধগম্য কিনা সন্দেহ। খাদ্যের দিক দিয়া প্রোটিন, কার্ব্বোহাইড্রেটস্ ও ফ্যাট বা চর্ব্বির নাম আজ সর্ব্বত্র প্রচারিত। এগুলি কোন্ কোন্ খাদ্যে আছে তাহারও সন্ধান অনেকে রাখেন। কিন্তু রাসায়নিক দৃষ্টিতে এ সমস্ত পদার্থের কি পরিচয় ও শরীরের সঙ্গে কি যোগাযোগ তাহার একটু জ্ঞান থাকা মন্দ নয়।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বোহাইড্রেটস্ই সাধারণতঃ বেশী থাকে। প্রোটিন, চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাইড্রেটসের মধ্যে শেষোক্ত পদার্থটিই সম্ভবতঃ দেহে শক্তি সরবরাহের প্রধান উপাদান। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের তিনটি প্রধান উপকরণই অজৈব রাসায়নিক পদার্থের সহযোগে উদ্ভিদরাজ্যে প্রকাশ পায় এবং ক্রমশঃ জীব-শরীরের শক্তি-উৎসের কারণ হইয়া থাকে।

সূর্য্যরশ্মি ও জলবায়ু গ্রহণ করিয়া সবুজ বৃক্ষপত্র, চিনি ষ্টার্চ বা শ্বেতসার ও সেলুলোজ প্রভৃতি কার্ব্বোহাইড্রেটস্ প্রস্তুত করে। এভাবে সৌরশক্তি ক্রমশঃ উদ্ভিদাদিতে সংমিশ্রিত হইয়া মনুষ্যের খাদ্যরূপে কার্ব্বোহাইড্রেটস্ রূপ পরিগ্রহ করতঃ জীবনীশক্তির প্রধান উপকরণ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

কার্ব্বোহাইড্রেটস্ শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, ইহা অঙ্গার ও জলের রাসায়নিক সংযোগ-ফল। ইহাতে আছে অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক মৌলিক তিনটি পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে জল মোটেই নাই, আছে জলের আনুপাতিক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। আবার দুই একটি কার্ব্বোহাইড্রেটসে তাহাও নাই। আজ পর্য্যন্ত সুগার, ষ্টার্চ ও সেলুলোজ এই ত্রিবিধ কার্ব্বোহাইড্রেটস্ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। উহারা উদ্ভিদ-শরীরের প্রধান উপাদান। কার্ব্বোহাইড্রেটস্কে আবার অপর নামেও ত্রিধা বিভক্ত করা হয়, যথা মনোস্যাকারাইড্স (Monosaccharides), ডাইস্যাকারাইড্স (Disaccharides) ও পলিস্যাকারাইড্স (Polysaccharides)। সাধারণতঃ আমরা শর্করা বলিতে চিনিকেই বুঝি। কিন্তু রসায়ন-শাস্ত্রে শর্করা বহুবিধ। জার্ম্মান রাসায়নিক এমিল ফিসার কৃত্রিম উপায়ে উহাদের প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ফিসারের আবিষ্কার রসায়নে ইহা নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি স্বভাব কারিগর ও কৃত্রিম কারিগরের মধ্যে একটি সুন্দর যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা যে শর্করা বা চিনি সর্ব্বদা গ্রহণ করি তাহার ইংরেজী নাম সুক্রোজ বা কেন্-সুগার। এইটা বাদ দিলেও আমরা আরও কয়েকটি সুগারের সঙ্গে মাঝে মাঝে পরিচিত হই। গ্লুকোজ, মল্টোজ, ল্যাক্টোজ ইহাদের নাম।

মনোস্যাকারাইড্সদের মধ্যে গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, গ্যালাক্টোজ ও ম্যানোজ আমাদের দেহে ক্রিয়াশীল হয়। ইহাদের মধ্যে গ্লুকোজ দেহের প্রাণস্বরূপ। ইহা বহু নামে পরিচিত,—যথা গ্রেপ সুগার, ষ্টার্চ সুগার, ডায়াবেটিক সুগার ইত্যাদি। ইহা বহুল পরিমাণে বৃক্ষাদির ফল এবং রসে সামান্য পরিমাণে জীবজন্তুর রক্তে বর্ত্তমান। আঙ্গুর ফলে ইহার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কার্ব্বোহাইড্রেটসগুলিও এসিডের সংস্পর্শে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এক প্রকার এনজাইমও এ পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। কাজেই প্রথম দ্বিবিধ কার্ব্বোহাইড্রেটস্ই দেহস্থ এনজাইমের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ গ্লুকোজ রূপ গ্রহণ করে। গ্লুকোজ তখন রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং যথাস্থানে দগ্ধীভূত হইয়া দেহের তাপ বা শক্তি রক্ষা করে। উদ্বৃত্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন নামক এক প্রকার শ্বেতসারে পরিণত হয়। এই গ্লাইকোজেনই শরীরের গ্লুকোজ রিজার্ভ ফণ্ড বা সংরক্ষিত ভাণ্ডার। ভবিষ্যতে প্রয়োজনমত ক্ষয় হইয়া ইহা গ্লুকোজ সৃষ্টি করে।

গ্লুকোজের কথা বলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইহার দোসর ফ্রুক্টোজের কথা মনে হয়। ইহার অপর নাম ফ্রুট সুগার বা লিভিউলোজ, প্রাকৃতিক রাজ্যে ইহা গ্লুকোজের অন্তরঙ্গ বন্ধু। ফল ও মধু উভয়েই বৃক্ষাদির রস বর্ত্তমান। আমাদের প্রিয় সুক্রোজ বা চিনিকে এসিড সংযোগে ভঙ্গ করিলে সম পরিমাণ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়। ফ্রুক্টোজ দেহাভ্যন্তরে ক্রমশঃ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। কাজেই ফ্রুক্টোজও পরিশেষে দেহের গ্লুকোজ সরবরাহের কারণ হইয়া থাকে। রাসায়নিক দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। উভয়ে সমসংখ্যক অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু বহন করে। আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর সামান্য ব্যতিক্রম থাকাতে দুইটির গুণাবলী সব সময় এক হয় না।

গ্যালাক্টোজ নামক অপর একটি মনোস্যাকারাইড দেহে ক্রিয়াশীল হয়। ইহা দুগ্ধ-শর্করার একটি পরিণতিবিশেষ। দুগ্ধ-শর্করা এসিড বা দেহস্থ এনজাইমের সংস্পর্শে আসিলে গ্যালাক্টোজে পরিণত হয়। ইহাও ফ্রুক্টোজের ন্যায় ক্রমশঃ গ্লাইকোজেন রূপে দেহে জমিয়া যায়। দেহের গ্লুকোজ বৃদ্ধির জন্য ইহাও একটি আয়োজন। গ্যালাক্টোজ ও গ্লুকোজের রাসায়নিক সংমিশ্রণে জীবদেহে দুগ্ধ-শর্করা প্রস্তুত হয়।

ডাইস্যাকারাইডসের মধ্যে সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মল্টোজ

বিখ্যাত। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই সংখ্যক অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান। ইহারা খাদ্যের প্রধান উপাদান। কিন্তু রাসায়নিক পরিপাক-ক্রিয়ার আওতায় আসিলে সকলেই ক্রমশঃ মনোস্যাকারাইডসে পরিণত হয়।

প্রকৃতির উদ্ভিদরাজ্যে সুক্রোজ বিস্তর পাওয়া যায়। সেখানে উহা সময় সময় গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। গাছের ফল ও রসে সাধারণতঃ ইহা বিদ্যমান থাকে। ইক্ষু, বিট, খেজুর-বৃক্ষ প্রভৃতি হইতে চিনি বিপুল পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ইহা হইতে গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ নামক মনোস্যাকারাইডস্ দুইটি পাওয়া যায়। এনজাইম সুক্রোজ বা ইনভারটেজ এ পরিবর্তন সাধন করে। এই এনজাইম সাধারণতঃ অন্ত্রে অবস্থান করে, মুখে বা পাকস্থলীতে উহারা থাকে না। পাকস্থলীর পাচনরসে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকার ফলে এখানেও উক্ত রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। চিনি আমরা যতই গ্রহণ করি না কেন ইহা পাকস্থলী বা অন্ত্রে যাইয়া গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়। মোট কথা সাধারণ চিনি অপরিবর্তিত অবস্থায় হজমের উপযুক্ত নয়।

সাধারণতঃ মনুষ্য-দুগ্ধে শতকরা ৬-৭ ভাগ এবং গরুর দুগ্ধে শতকরা ৪·৫-৫ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা বা ল্যাকটোজ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে এই শর্করা সৃষ্ট হয় স্তন-গ্রন্থি দ্বারা গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজের যোগাযোগে। সাধারণ চিনির তুলনায় ল্যাকটোজের মিষ্টত্ব ও দ্রাব্যতা কম। ইহা খাদ্যের সঙ্গে অন্ত্রে পৌঁছিলে ল্যাকটোজ, নামক এনজাইম দ্বারা গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজে বিভক্ত হয়। কাজেই এখানেও সেই গ্লুকোজই আমাদের লাভ। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ল্যাকটোজ সুক্রোজের চেয়ে পাকস্থলীর পক্ষে বেশী উপযোগী। তাঁহারা ইহাও বলেন যে—ল্যাকটোজ আহারের ফলে অন্ত্রে এক প্রকার জীবাণু সৃষ্ট হয়, যাহা অন্ত্রকে সুস্থ ও সবল রাখে।

মলটোজ নামক চিনি ষ্টার্চ হইতে গৃহীত হয়। ইহার প্রস্তুতিতেও এনজাইমের বাহাদুরি আছে। এ জাতীয় এনজাইমগুলিকে বলে এমাইলেজ। ইহা অঙ্কুরিত শস্য বা মল্টে পাওয়া যায়। আমরা যে ষ্টার্চ গ্রহণ করি তাহা দেহমধ্যে টায়ালিন (Pryalin) বা এমাইলোপেপসিন (Amylopeptin) নামক দুইটি এমাইলেজ দ্বারা ক্রমশঃ মল্টোজে পরিণত হইয়া সর্বশেষে গ্লুকোজ রূপ গ্রহণ করে। ষ্টার্চকে এসিডযোগেও মল্টোজে পরিবর্তিত করা যায়। মল্টোজ সোজাসুজি দেহের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কিনা বলা কঠিন। তবে সুক্রোজ বা ল্যাক্টোজের চেয়ে যে বেশী গ্রহণযোগ্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, দেখা গিয়াছে রক্তে ইহা অনুপ্রবিষ্ট করিলে উক্ত দুইটি শর্করা হইতে বেশী কার্যকরী হয়।

পলিস্যাকারাইডসের মধ্যে ষ্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কার্ব্বোহাইড্রেটস্ সাধারণতঃ জল বা স্পিরিটে দ্রবণীয় নয়। কোন কোনটি জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ঘোলাটে ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ষ্টার্চ ও গ্লাইকোজেন দেহ-পুষ্টিকারক। ষ্টার্চ উদ্ভিদ-জগতের ও গ্লাইকোজেন প্রাণিজগতের সঞ্চিত খাদ্য।

ষ্টার্চ উদ্ভিদ-শরীরে প্রায়শঃ সঞ্চিত থাকে এবং উহা বহুবিধ প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাণস্বরূপ। ইহা হইতে ডেক্সট্রিন, মল্টোজ, গ্লুকোজ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বীজ, মূল, কন্দ প্রভৃতিতে ইহা বর্ত্তমান থাকে। বীজের প্রায় অর্দ্ধেক হইতে তিন-চতুর্থাংশই ষ্টার্চ বা শ্বেতসার। অপরিপক্ব আপেল বা কলায় প্রচুর ষ্টার্চ আছে। ইহাই পাকিবার মুখে ক্রমশঃ চিনিতে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার রেণুগুলি ঠাণ্ডা জলে অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও উষ্ণ জলে স্ফীত হইয়া উঠে এবং অর্দ্ধতরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ডেক্সট্রিন ষ্টার্চেরই একটি পরিণতি। ইহা ষ্টার্চের উপর এসিড বা তাপের ফল। ইহা অঙ্কুরিত বীজে প্রচুর পাওয়া যায়। ডায়াষ্টেজ নামক এনজাইম ষ্টার্চকে আক্রমণ করিলে চারি ভাগ মল্টোজের সঙ্গে একভাগ ডেক্সট্রিন হয়। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ডেক্সট্রিন প্রস্তুতিতে এসিড বা তাপের সাহায্য নেওয়া হয়। ইহা ষ্টার্চের চেয়ে অনায়াসে দ্রবণীয়। তাতেই মনে হয় ইহার অণুগুলি ষ্টার্চের চেয়ে ক্ষুদ্র। ল্যাকটোজের ন্যায় ডেক্সট্রিনকেও অন্ত্রপুষ্টির উপযোগী মনে করা হয়।

বৃক্ষ-শরীরে যেরূপ ষ্টার্চ জীব-শরীরে সেরূপ গ্লাইকোজেন। এজন্য গ্লাইকোজেনের অপর নাম জীব-শ্বেতসার। ষ্টার্চের ন্যায় ইহাও শ্বেতবর্ণ চূর্ণ। ইহারও পরিণতি গ্লুকোজে। দেহের প্রায় সর্ব্বত্র ইহা অবস্থান করে কিন্তু যকৃতই ইহার বিরাম-স্থল। প্রচুর আহার ও বিশ্রাম ইহার বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু পরিশ্রমে ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

সেলুলোজ বা হেমিসেলুলোজ নামক দুইটি পলিস্যাকারাইডস্ জলে মোটেই দ্রবণীয় নয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহাদের বিভক্ত করাও কঠিন। ইহাদের দ্বারা সোজাসুজি দেহ-পুষ্টির সহায়তা হয় কম। কিন্তু উহাদের বিদ্যমানতায় হজমের সাহায্য হয়। পাচক-এনজাইম দ্বারা ইহারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া ইহাদের বলা হয় রাফেজ। রাফেজের প্রধান গুণ এই যে, উহারা কোষ্ঠ পরিষ্কারে সহায়তা করে। এজন্য প্রত্যেক খাদ্যে রাফেজরূপে কতকটা সেলুলোজ থাকা উচিত। কিন্তু রাফেজ কাহার পক্ষে কতকটা প্রয়োজন তাহা ব্যক্তিবিশেষের পরীক্ষণীয়। বিভিন্ন ব্যক্তি তাহার নিজস্ব শারীরিক অবস্থার প্রয়োজনানুসারে রাফেজের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিবেন।

পলিস্যাকারাইডস্ অঙ্গার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনক্ষেত্র হইলেও ইহা অতীব জটিল রাসায়নিক পদার্থ। ষ্টার্চ ও সেলুলোজের মৌলিক উপাদানগুলি অবগতির জন্য রাসায়নিকগণ সর্ব্বদা তৎপর আছেন। ষ্টার্চের মোটামুটি রাসায়নিক কাঠামোটা উহাদের বোধগম্য হইয়াছে। কৃত্রিম প্রস্তুতির ব্যবস্থাও কতকটা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি অতীব জটিল সেলুলোজের কাঠামোও উহাদের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গাছের আঁশ, তুলা, ছোবড়া ইত্যাদি সেলুলোজের সাধারণ রূপ। যেমন ষ্টার্চ হইতে গ্লুকোজ তৈয়ারের পদ্ধতি সহজসাধ্য হইয়াছে তদ্রূপ সেলুলোজ হইতে উহা প্রস্তুত করা যায় কিনা সে বিষয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। তখনই বৈজ্ঞানিকগণ কতকটা সফলকাম হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রণালীটা ততদূর আর্থিক লাভজনক নয় বলিয়া সে চেষ্টা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হয়। এবার আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ব্ব প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে এবং মনে হয় এ যাত্রা উহারা ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সফলকাম হইবেন। সামান্য কাষ্ঠখণ্ড ঘাঁটিয়া গ্লুকোজ পাওয়ার সম্ভাবনা আজ অতি নিকটবর্ত্তী।

—

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড (১৮৬১-১৯০১), পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বৈশাখ ১৩৫৩। পৃ. ৩৯২। মূল্য ৮৷৷০।

১৩৪০ সালে 'রবীন্দ্রজীবনী' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন যথোপযুক্ত উপকরণের অভাবে ইহাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান "পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ" সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন :—"'রবীন্দ্রজীবনী ও 'প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়' এই দুইটি কথা ছাড়া পুরাতন গ্রন্থের কিছুই বোধ হয় ছাপা হইতেছে না, কারণ বইখানি পনেরো আনাই নূতন করিয়া লেখা। তা ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি আকারেও প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি তখন কবি সম্বন্ধে কিইবা তথ্য জানা ছিল। সেই সামান্য উপকরণ অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রজীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হই। তারপর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষীয়েরা কবির জীবনী সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য ও উপকরণ লোকচক্ষুর গোচর করিয়াছেন।···এই জীবনচরিতের বহু তথ্য রবীন্দ্রভবন হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।···বিশ্বভারতীর বিশাল গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষতা করিবার সৌভাগ্য লাভ করায় আমি রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য ও তৎসংক্রান্ত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকাদি যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি।" নবাবিষ্কৃত এই সকল উপকরণ প্রভাতবাবু তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কাজে লাগাইয়াছেন, সুতরাং ফল যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালই হইয়াছে তাহা না বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষীর একখানি সুষ্ঠু জীবনচরিতের অভাব আমরা অনেক দিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম; আলোচ্য গ্রন্থ সে-অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে যিনিই বিশাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, প্রভাত বাবুর গ্রন্থ তাঁহার যে বিশেষ সহায়ক হইবে, একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সত্য প্রকাশিত হয়, ইহাই আমাদের কাম্য, এখানে ব্যক্তিগত মান অভিমানের স্থান নাই।" এই ভরসায় আলোচ্য গ্রন্থে যে-সকল তথ্যগত ত্রুটি আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহার কয়েকটি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি; স্থানাভাবে সকল কথা বলা সম্ভব হইবে না :—(১) পৃ. ২৬, আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম-মৃত্যু তারিখ—"১৮১৯-১৯০১ ?" ঠিক নহে। ৪ মে ১৯০০ তারিখে, ৯৬ বৎসর বয়সে, তাঁহার মৃত্যু হয়—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৮২২ শক দ্রষ্টব্য। (২) পৃ. ২৮, ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের মৃত্যু-সন "১৮৫৪" নহে,—১৮৪৬।—'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া', ৫ মার্চ ১৮৪৬ দ্রষ্টব্য। (৩) পৃ. ৩২, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের

'সুশীলার উপাখ্যান' পুস্তকের ৩ খণ্ডের প্রকাশকাল "১৮৬১-৬৫" নহে ; ইহার ১ম-২য় ভাগ ১৮৫৯ সনে এবং ৩য় ভাগ ১৮৬০ সনে প্রকাশিত হয়। (৪) পৃ. ৪২, রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু-তারিখ "১০ মার্চ ১৮৭৫" না হইয়া ১১ মার্চ হওয়া উচিত ছিল ; "ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে" মৃত্যু বলিয়া ইংরেজী তারিখ এক দিন বাড়িবে। (৫) পৃ. ৪৪। প্রভাত বাবু লিখিয়াছেন, "১৮৬১ অব্দে" রাজনারায়ণ বসুর Prospectus of a Society for the Promotion of national feeling among the educated natives of Bengal প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি 'রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত' পুস্তকের একটি মুদ্রাকর-প্রমাদের পুনরুক্তি করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। 'আত্ম-চরিতে' (পৃ. ১১০) রাজনারায়ণ কালানুক্রমিক ভাবে কর্ম্মস্থল· মেদিনীপুরে কৃত কয়েকটি কর্ম্মের এইরূপ হিসাব দিয়াছেন :—১৮৬১ সনে সুরাপান-নিবারিণী সভা সংস্থাপন, ১৮৬৪ সনে ব্রাহ্মমতে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ, "১৮৬১ সালে ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও Prospectus of a Society···Bengal প্রকাশিত হয়।" কালানুক্রমিক বিবরণে ১৮৬৪ সনের পর ১৮৬১ সন আসে কেমন করিয়া ? প্রকৃতপক্ষে "১৮৬১ সাল" মুদ্রাকর-প্রমাদ ; উহা যে ১৮৬৬ হইবে তাহার প্রমাণ রাজনারায়ণের উক্তির মধ্যেই রহিয়াছে,—'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' ও Prospectus···একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা'র প্রকাশকাল ইং ১৮৬৬, সুতরাং Prospectus···ও ঐ বৎসরেই প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ সনের প্রথম ভাগে আলোচ্য ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্রটি সর্ব্বপ্রথম নবগোপাল মিত্র-সম্পাদিত *National Paper*-এ মুদ্রিত ও তাহা হইতে ১৭৮৭ শকের চৈত্র (মার্চ ১৮৬৬) সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পুনর্মুদ্রিত হয়।

পৃ. ৪৪-৪৫, প্রভাত বাবুর মতে রাজনারায়ণ ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের "কয়েক বৎসর পরে (১৮৬৫) কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন করেন। অতঃপর ঠাকুরবাড়ির আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় এবং নবগোপালের প্রচেষ্টায় 'হিন্দুমেলা' স্থাপিত হয়।" প্রভাত বাবুর 'স্বাদেশিকদের সভা' নিশ্চয়ই 'ন্যাশনাল সোসাইটি' বা জাতীয় সভা। এই সভা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার "পূর্ব্বে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে" স্থাপিত হয় নাই। ১৮৬৭ সনে হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে, মেলার কার্য্যনির্বাহক-সভা হিসাবে, উহার উদ্ভব হয়। রাজনারায়ণও 'আত্ম-চরিতে' লিখিয়াছেন :—"হিন্দু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য [নবগোপাল] মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা স্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র আদর্শে গঠিত হয়।" প্রায় প্রতি মাসেই 'ন্যাশনাল সোসাইটি'র অধিবেশন হইত। ১৮৬৯ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থানকালে রাজনারায়ণ জাতীয় সভায় একাধিক বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

পৃ. ৪৫, প্রভাত বাবু লিখিয়াছেন, মেলার "১ম অধিবেশন হয় ১৮৬৭ এপ্রিল ১২। এই মেলার সম্পাদক হইলেন গণেন্দ্রনাথ, সহকারী-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। মেলার অধ্যক্ষগণ স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, স্বদেশী কুস্তি

প্রবৃত্তির পুনর্বিকাশে উৎসাহ দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই পূর্ণাঙ্গ স্বদেশীতার প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে নবগোপাল ঐ বৎসর 'ন্যাশনাল পেপার' নামে একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিকও প্রকাশ করিলেন।" উদ্ধৃত অংশের শেষ পংক্তিতে প্রভাত বাবু গুরুতর ভুল করিয়াছেন। "ঐ বৎসর" (অর্থাৎ, ১৮৬৭ সনে হিন্দু মেলা-প্রতিষ্ঠার বৎসর) 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশিত হয় নাই,—হইয়াছিল উহার দুই বৎসর পূর্ব্বে, ৭ আগষ্ট ১৮৬৫ তারিখে।—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য। (৬) পৃ. ৫৩, 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-রচয়িত্রীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে গিয়া প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, "নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বীরভূম জিলার কীর্ণাহারের অধিবাসী।" অথচ, নবীনচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, "আমার জন্মভূমি বুড়ার গ্রামে।" বুড়ার গ্রাম—বর্দ্ধমানের প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, নং ৪৪ দ্রষ্টব্য। (৭) পৃ. ৫৩, ডক্টর সুকুমার সেনের নজরে, কবি হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'বিনোদমালা'র ১ম সংস্করণের প্রকাশকাল "১২৮৯" মুদ্রিত হইয়াছে, উহা ১২৮৫ হইবে।—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা নং ৫৩ দ্রষ্টব্য। (৮) পৃ. ৫৭, প্রভাত বাবু লিখিয়াছেন, হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীত" "১৮৭০ আগষ্ট ১, ১২৭৭ শ্রাবণ ১৭ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়।" আমাদের কিন্তু জানা আছে, 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতাটির প্রকাশকাল—১৮৭০ জুলাই ২২, ১২৭৭ শ্রাবণ ৭। —সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা নং ৩৩ দ্রষ্টব্য। (৯) পৃ. ৬২, প্রভাতবাবুর মতে, ১২৮০ পৌষ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক সমালোচিত 'মানস বিকাশ' কাব্যখানির রচয়িতা—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' পুস্তকেও অনুরূপ উক্তি আছে। প্রকৃত পক্ষে 'মানস বিকাশ' পূর্ব্ববঙ্গের কবি দীনেশচরণ বসুর রচনা। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত পুস্তক-তালিকাতেও গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম আছে।—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা নং ৪২ দ্রষ্টব্য। (১০) রবীন্দ্রনাথের 'শৈশব সঙ্গীতে'র অন্তর্ভুক্ত "ফুলবালা" গাথা সম্বন্ধে ৭৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় "ভারতী ১২৮৫ কার্ত্তিক" এই নজীর মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতী'তে প্রকাশিত "ফুলবালা" ঐ নামীয় গাথারই শেষার্দ্ধ মাত্র, উহার প্রথমার্দ্ধ ১২৮৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'আর্য্যদর্শনে' "শ্রীর" স্বাক্ষরে "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" রূপে প্রথমে মুদ্রিত হয়,—এই সংবাদটি এত দিন আমাদের জানা ছিল না। সমগ্র গাথাটি 'শৈশব সঙ্গীতে' অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে। (১১) পৃ. ৮৬, বিহারিলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রকাশকাল "১২৮৭" নহে—১২৮৬ সাল। (১২) ৩৯২ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "গ্রন্থতালিকা—১২৮৫-১৩০৭" প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে 'আলোচনা' ও 'চিঠিপত্রে'র প্রকাশকাল যথাক্রমে ১২৯১ ও ১২৯৩ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উহা ১২৯২ ও ১২৯৪।

গ্রন্থখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল, তবে স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-

প্রমাণ আছে। ভূমিকায়, তাঁহার উদ্দেশে "তাঁহার উদ্দেশে" রূপ ধারণ করিয়াছে। কবি বিহারিলাল সর্কার (পৃ. ৫৯...) "বিহারীলাল" হইয়াছেন। ক্যানিং লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "মুখোপাধ্যায়ে" (পৃ. ৪৯) এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ "গিরিশচন্দ্র বসু"তে (পৃ. ২৬১) পরিণত হইয়াছেন, ইত্যাদি।

সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি নিষ্কাশিত হইয়া যাহাতে 'রবীন্দ্র-জীবনী'র পরবর্তী সংস্করণটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, এই সদিচ্ছা লইয়াই বর্ত্তমান আলোচনা লিখিত হইয়াছে;—নতুবা গ্রন্থকারের বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনার গুণাপকর্ষণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আশা করি শীঘ্রই আমরা আলোচ্য গ্রন্থের ২য় খণ্ড দেখিতে পাইব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী—শ্রীযুক্ত নলিনী কুমার ভদ্র। ১১৮ পৃষ্ঠা, সচিত্র, মূল্য দুই টাকা। মডার্ণ পাবলিশার্স, ৬ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই নাতিদীর্ঘ বইখানি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। লেখক আসাম ও সিংভূমের আদিবাসীদের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, আদিবাসীদের জীবন সম্বন্ধে তাহাদের সুখ দুঃখ ও তাহাদের পুরাণ উপাখ্যান আদি সম্বন্ধে নানা তথ্য দরদের সঙ্গে এই বইয়ে বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যে লেখক অপরিচিত নহেন—মণিপুরের কথা লইয়া ইঁহার একখানি সুপাঠ্য পুস্তকের দুইটি সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। দরদের সঙ্গে আদিম জাতির জীবনের কথা বাংলা ভাষায় বোধ হয় প্রথম লেখেন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত "পালামৌ" গ্রন্থে। তাহার পরে তাঁহার পদাঙ্ক ধরিয়া অনেকেই আমাদের প্রতিবেশী ও ভ্রাতা বাংলায় ও বাংলার প্রত্যন্ত দেশের আদিবাসীদের কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। প্রস্তুত পুস্তকের লেখক যে সহানুভূতিপূর্ণ পরিচয়ের দৃষ্টির সহিত এই সমস্ত অখ্যাত এবং বহুশঃ অবজ্ঞাত জাতির জীবনের ভিতরে নিহিত সারল্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। নলিনীবাবুর বইখানি বাংলা ভাষায় লেখা ভ্রমণবিষয়ক সাহিত্যে একখানি বিশেষ সুখপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। আশা করি অন্য বহু পাঠকও আমার ন্যায় এই বই পড়িয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাষ্টার—শ্রীতারাপদ রাহা। ভারতী-ভবন, ১১ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. সংখ্যা ১৪২। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

গল্পের বই। মাষ্টার; মানবিক-পাশবিক ও বাস্তবিক; কমিরুদ্দি; দক্ষিণ কাঁকুলিয়া নারী-সমিতি; বিজয়াদশমী; শ্রাদ্ধিক; ভুবি ও নেলী—এই সাতটি গল্প আছে। লেখক বাঙালী পাঠকসমাজে সুপরিচিত; অনাড়ম্বর কাহিনীর মধ্যে দিয়া নানারকম চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চমৎকার একটি ক্ষমতা আছে তাঁহার যাহাতে পরিচিতকেই একটি নূতন রসের মধ্যে পাইয়া পাঠকের মন সহজ কৌতূহলে গল্পের সঙ্গে যায় মিশিয়া। এই বইখানিতেও প্রায় সব গল্পেই লেখকের এই বিশিষ্টতা বজায় আছে, শুধু 'বিজয়াদশমী'তে—যেখানে খানিকটা রহস্যের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিল। গল্পগুলির মধ্যে মাষ্টার, শ্রাদ্ধিক, ভুবি ও নেলী বিশেষ করিয়া ভাল লাগিল। মাষ্টারি জীবনের

বা ট্র্যাজেডি এবং শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীর শোকের পরিবেশে ঈর্ষা, ক্রূরতা, দলাদলির জন্য যা বিড়ম্বনা, সূক্ষ্ম খুঁটিনাটির মধ্য দিয়া লেখক তাহাকে চমৎকার ফুটাইয়াছেন। 'তুমি ও নেলি' গল্পটিতে দুইটি কুকুরকে মাঝে রাখিয়া দুইটি কিশোর-কিশোরীর মনের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—তাহাদের ভালবাসা একই কেন্দ্রে সঞ্চিত হইয়া নিজেদের মধ্যে আবার কি জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে, লেখক বেশ কৌশলের সহিত দেখাইয়াছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতি—স্বামী অভেদানন্দ। বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪০০ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি টাকা মাত্র।

ইহা গ্রন্থকারেরই একখানা ইংরেজী বইয়ের বাংলা অনুবাদ। ভারতের বিভিন্ন দর্শন, সামাজিক প্রথা, রাজনৈতিক উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় কয়েকটি অধ্যায়ে যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। তবে, বইয়ের দুই-একটি ত্রুটির উল্লেখও আমরা না করিয়া পারিতেছি না।

'প্রসারতা' (৩০৯ পৃঃ) শব্দটি অশুদ্ধ। রমেশচন্দ্র দত্তের নামের আগে (১৭ পৃঃ ইত্যাদি) 'স্যর' উপাধি অপ্রযোজ্য, এই খেতাব তিনি পান নাই। ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ তাহা ভারতের বাহিরে খুব কম লোকেই জানে, এই ধরণের উক্তি (৬৭ পৃঃ) অনেকটা বালকের উক্তির মত শুনায়।

ভারতের ছয় শত বৎসর মুসলমান রাজত্বকে 'অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন তিমির যুগ' (৩৫৫ পৃঃ) বলা যায় কোন্ অর্থে? এই সময়ে শিখ, মহারাষ্ট্র ও রাজপুত জাতির উদ্ভব, দাদু, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির ধর্ম-সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বেদান্ত ভাষ্যের আবির্ভাব এবং তাজমহল প্রভৃতি স্থাপত্য নির্মাণ ঘটিয়াছিল, ইহা মনে করিলে কি সত্যই এই যুগটাকে 'তিমির যুগ' বলা যায়?

যে সকল ছাত্র আইন পড়ে তাহারা আর সমস্ত আইন পড়িয়া পরে হিন্দু আইন পড়ে (২৪০ পৃঃ), ইহা সত্য নয়। বাংলাদেশে অন্ততঃ হিন্দু আইন ছাত্রেরা প্রথম বৎসরেই পড়ে—এই সকল উক্তিতে গ্রন্থকারের একটু অসতর্কতা প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিশেষ রজনী—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড। ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

সমালোচ্য পুস্তকটিতে বিশেষ রজনী, চৌদ্দ মার্চ এবং পয়লা এপ্রিল এই তিনটি ছোট একাঙ্কিকা স্থান পাইয়াছে। ছোট গল্পে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক একদা 'নীলাঙ্গুরীয়' নামক উপন্যাসখানি রচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার একটা নূতন দিকের সহিত পাঠক-সাধারণের পরিচয় সাধন করাইয়াছিলেন। 'বিশেষ রজনী' পড়িয়া বুঝিলাম, নাটক-রচনায়ও তিনি অনধিকারী নহেন। বর্ত্তমান পুস্তকের চৌদ্দ মার্চ একটি রূপক-নাট্য এবং বিশেষ রজনী ও পয়লা এপ্রিল এই দুইটিই কৌতুক-নাট্য। হাস্যরসের প্রাচুর্য্য

সত্ত্বেও এগুলি প্রচলিত বাংলা প্রহসনের সগোত্র নহে। এই নাটিকা দুইটিতে অভিনব সিচুয়েশন সৃষ্টি করিয়া যে অনাবিল হাস্যরস পরিবেশন করা হইয়াছে তাহা শুভ্র, সংযত এবং পরম উপভোগ্য।

'বিশেষ রজনী' নাটিকাটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে। ইহার চরিত্রগুলি এত সজীব ও সংলাপ এত স্বাভাবিক হইয়াছে যে, মনে হয় ললিত খাকোহরি শঙ্কর প্রভৃতিকে লইয়া আমরাও যেন মফস্বলের সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়াছি। বিশেষতঃ স্ত্রী-চরিত্র অভিনেতা, নারীভাবাপন্ন খাকোহরি তো টাইপ চরিত্র হিসাবে একেবারে ষোল আনা সার্থক হইয়াছে। পয়লা এপ্রিল নাটিকাটি কৌতুক-মধুর। অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে যে এ ধরণের নাটকীয় উপকরণ নিহিত ছিল তাহা লেখক না দেখাইয়া দিলে আমরা জানিতেও পারিতাম না। বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের অভিনয়োপযোগী নাটক নাই বলিলেই চলে। বোর্ডিঙের মেয়েদের লইয়া লিখিত 'পয়লা এপ্রিল' সেই অভাব পূরণ করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রবীন্দ্রনামা। রবি-প্রশস্তি সংগ্রহ—শ্রীপ্রভাত বসু সম্পাদিত। দি বুকম্যান, কলিকাতা, ১৩। দাম দেড় টাকা। মাঘ, ১৩৫৩

আমাদের দেশের কবিরা অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল রবীন্দ্রনাথের মনীষার প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন, এই বইখানিতে তারই থেকে সঙ্কলন করা হয়েছে। সেই দিক দিয়ে এখানি পাঠকদের খুবই ভাল লাগবে। আমাদের বর্ত্তমান যুগের কাব্যরসিকেরা কত নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছেন, তারও পরিচয় এর মধ্যে পাওয়া যাবে। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে কবি-রচনার নমুনা হিসাবেও এর মূল্য কম নয়।

কিন্তু গিরিজাবাবু, উমা দেবী, অপরাজিতা দেবী প্রমুখ রবীন্দ্রকাব্যে যাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁদের অর্ঘ্য কই? গদ্যলেখকদের থেকেও আরও কিছু সংগ্রহ পেলে ভাল হ'ত।

আর একটা কথা, সংগ্রহকার কবিদের বয়সের অনুক্রমে প্রশস্তিগুলি সাজিয়েছেন, কিন্তু কোন্ কবিতা কখন লেখা, তারও একটা ক্রম থাকলে ভাল হ'ত—অর্থাৎ সম্ভব হলে কালানুক্রমে সাজালে রবিপ্রতিভার কদর দেশে কোন্ পথে ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখা যেত।

আজকের দিনে রবীন্দ্রনামা সকলেরই ভাল লাগবে বলে আশা করা যায়। কবিরা তো যুগবাণী উচ্চারণ করেন। জনগণের মনের কথা কেড়ে নিয়ে মুখে বলেন। সুতরাং কবিদের মুখে কবিসম্রাট-প্রশস্তি সমগ্র দেশের মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

চৈনিক ঋষি লাউৎজে—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। বিবেকানন্দ সংঘ, বজবজ, ২৪ পরগণা। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

চৈনিক ঋষি লাউৎজে প্রণীত 'তাও তে কিং' চীনে প্রচলিত তাও ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ। ইহার গভীরার্থপূর্ণ সরল উক্তিগুলি চীনের বাহিরেও মনীষিবৃন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ফলে নানা সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার এক প্রাচীন অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় ভাষায় ইহার কোনও অনুবাদ হয় নাই। অথচ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সহিত লাউৎজের উক্তির ঐক্য ও সাদৃশ্য বিস্ময়কর। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ আলোচ্য পুস্তকে এই মূল্যবান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া শিক্ষিত বাঙালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মুখবন্ধে ও পরিশিষ্টে স্বামীজী, লাউৎজে ও তাঁহার ভাষ্যকার চুয়াংজুর জীবনী ও উপদেশের সারমর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে স্বতন্ত্রভাবে চৈনিক সাধনার বৈশিষ্ট্য ও চৈনিক যোগ বেদনা সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে চুয়াংজুর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। আশা করি, চীনের আর এক মহাপুরুষ কনফুসিয়স্ সম্বন্ধে স্বামীজী অচিরকাল মধ্যে তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুরূপ আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

স্রোতের ঢেউ—শ্রীহরিহর শেঠ। কথা-ভারতী, ৩৫ নং, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

বইখানি কতকগুলি উপদেশ বা নীতিকথার সমষ্টি বলিলে ভুল করা হইবে। ইহা গ্রন্থকারের নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, সমাজ সংসার, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ মত ও চিন্তার সূত্রাকারে গ্রথিত লেখমালা, যাহা পাঠকের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে পথনির্দেশ করিবে ও শান্তিলাভের উপায়স্বরূপ হইবে। সামান্য অবস্থা হইতে গ্রন্থকার অর্থ ও যশের শিখরদেশে উপনীত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই পুস্তকের প্রত্যেকটি বাণী পাঠকের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

বাংলা সাহিত্যের কাহিনী—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

আটটি পরিচ্ছেদে সহজ ভঙ্গীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সন-তারিখের অরণ্যে অথবা তাত্ত্বিক জটিলতায় প্রবেশ না করে, লেখক অল্পবয়স্কদের জন্য বাংলা সাহিত্যের কথা ও কাহিনী বর্ণনা করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্য সাধু এবং গ্রন্থকার আংশিক সাফল্য লাভও করেছেন, কিন্তু সব সময়ে ছোট ছেলেমেয়েদের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা সম্বন্ধে আলোচনা তাদের পক্ষে অনাবশ্যক। আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখক কেউ কেউ বাদ পড়েছেন, অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত কোনো কোনো লেখক বর্তমান গ্রন্থে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। নাট্যসাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায়, শুধু এখানিতে নয়, সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থেই লক্ষ্য করেছি, গ্রন্থকারেরা ভুলে যান, মঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যিক প্রতিভা এক জিনিষ নয়।

আগামী কালের কবিতা—শ্রীরমাপতি বসু। শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ। ৫৭, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সমসাময়িক ভাবধারা বা ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লেখা কয়েকটি কবিতা। উজ্জ্বলতা আছে—প্রদীপের নয়, ধারালো ছুরির। দু' একটি কবিতায় সহজ কবি-দৃষ্টির পরিচয় মেলে, যেমন, 'কাঠবিড়ালী'।

আলোছায়া—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত। ফাইন আর্ট প্রেস, কুমিল্লা। দাম আট আনা।

রসহাস্যমধুর কয়েকটি কবিতা। শব্দচয়নে এবং ছন্দোবিন্যাসে লালিত্য এবং কোমল অনুভূতির স্পর্শ আছে।

অত্যাধুনিক—শ্রীমনোজমোহন রায়। চিত্রসেনপুর, হাওড়া। মূল্য চারি আনা।

মলাটে লেখা আছে, "ছেলেমেয়েদের অভিনয়-উপযোগী ব্যঙ্গ নাটিকা।" ব্যঙ্গ কিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু বইখানি 'নাটক' নয় এবং ছেলেমেয়েদের 'অভিনয়-উপযোগী' বলেও মনে হয় না। ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে এলোমেলো ভাবে কতকগুলো দাবি উত্থাপন করছে, এটাই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। প্রস্তাবকদের নাম সুভাষ, নাজিম, সরোজিনী প্রভৃতি। মেয়েদের প্রস্তাবে 'পিউবার্টি' কুমারী-মাতৃত্ব এবং ভ্রূণহত্যা সম্বন্ধীয় আলোচনাও আছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জাতীয়তার বাণীমূর্ত্তি হার্ডার—শ্রীদিলীপকুমার মালাকার ; ভূমিকা—ডক্টর বিনয় সরকার। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮০+৵০+৪৮, মূল্য এক টাকা।

জার্মান লোক-দার্শনিক হার্ডারের জীবন ও রচনাদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান চিন্তানায়কগণও জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন নাই, জনসাধারণের কথা ত বলাই বাহুল্য। ফরাসী ভাব, ফরাসী ভাষা, ফরাসী আচার-ব্যবহার তখনকার জার্মানদের মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহারা জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতাকেই সভ্যতার পরিচয় বলিয়া মনে করিত। বিদেশীয় এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করিয়া জার্মানদিগের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করাই হার্ডারের জীবন-সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহাতে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি জার্মানীকে আত্মসম্বিৎ লাভ করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান সঙ্কট-ক্ষণে হার্ডারের রচনার সমাদর হওয়া উচিত।

লেখকের ভাষা উচ্ছ্বাসপূর্ণ। আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত যে

পাঠকের পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। হার্ডারের কতকগুলি মূল্যবান ও চিন্তা-উদ্রেককারী বাণী সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

জাতীয় পতাকা—শ্রীসুধেন্দুশেখর দাসগুপ্ত। গ্রন্থকার কর্তৃক ১৯।৮, গড়িয়াহাট রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

পৃথিবীর সকল জাতির নিকট জাতীয় পতাকার মর্য্যাদা কতখানি, আজিকার দিনে সেই অনুভূতি আমাদের জাগ্রত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পৃথিবীর কয়েকটি শক্তিশালী জাতির জাতীয় পতাকার ইতিহাসের সহিত ভারতীয় জাতীয় পতাকার ইতিহাসটিও সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষে কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতও দেওয়া হইয়াছে। বইখানির আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অস্তগৌরব—শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য। কদমকুঁয়া, পাটনা হইতে শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শ্রীকৃষ্ণ, নেপোলিয়ন, টলষ্টয়, শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীমধুসূদনের সংক্ষিপ্ত জীবনী লইয়া লিখিত এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি বাস্তবিকই সুন্দর হইয়াছে। লেখকের রচনাভঙ্গী মনোজ্ঞ এবং বিশ্লেষণ হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চক্রবর্তী প্রণীত এবং কলিকাতা ১২০.২, আপার সারকুলার রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তিকায় শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণের স্তব, পূজার মন্ত্রাদি এবং স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে বর্ণিত ব্রতকথা অবলম্বনে সহজ সরল ভাষায় পয়ার ছন্দে পাঁচালীকথা স্থান পাইয়াছে। পুস্তিকাখানি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নরনারীর কাজে লাগিবে। চ.

দেশ-বিদেশের কথা

"অন্ধজনে দেহ আলো"

ভারতবর্ষে দৃষ্টিহীনদের সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশ হইতেই বেশী। ১৯৩১ সনে যে লোকগণনা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়, এদেশে এদের সংখ্যা ছয় লক্ষের উপর। নিখিল-ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতন (All-India Light-house for the Blind) গত ছয় বৎসর ধরিয়া লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিক্ষাদান করিয়া জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্বিশেষে প্রাপ্ত-বয়স্ক অন্ধ নরনারীকে (এদের সংখ্যাই সাড়ে পাঁচ লক্ষের বেশী) স্বাবলম্বী করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাথমিক লেখাপড়া ভিন্ন তাঁত-বোনা, বই-বাঁধান, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিখাইবার ব্যবস্থা এখানে করা হইয়াছে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্তও আছে। আলোক-নিকেতনের নিজস্ব একটি ছাত্রীনিবাস ইহার সঙ্গে যুক্ত আছে।

এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতেছেন মাননীয় লর্ড সিংহ ও সহ-সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ সাহায্যাদি নীচের ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নিখিল-ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতন। ২৯, রসা রোড, কলিকাতা।

বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতাল সপ্তাহ

বাঁকুড়া সম্মিলনী বাঁকুড়া শহরে একটি মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল পরিচালনা করিতেছেন। হাসপাতালে দেড় শত বেড্ আছে। প্রতি বৎসর এখানে হাজার হাজার রোগীর চিকিৎসা হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে নাম মাত্রই সাহায্য পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বদান্য দেশবাসীদের অর্থেই ইহার যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। সাম্প্রতিক অবস্থায় ইহার কার্য্য সম্প্রসারণের জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাঁকুড়া সম্মিলনী এই উদ্দেশ্যে ৫ই মে হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত হাসপাতাল সপ্তাহ পালন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সদুদ্দেশ্যে যিনি যাহা দিবেন সাদরে গৃহীত হইবে। সম্মিলনীর অনারারী কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, ৩, আশু বিশ্বাস রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—ঠিকানায় অর্থাদি প্রেরিতব্য।

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

মহাভারত (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯৲
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৶৹
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ	৵৹
চাটার্জির পিক্‌চার এলবাম (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে)	প্রত্যেক ৪৲
চিরন্তনী (শ্রেষ্ঠ উপন্যাস)—শ্রীশান্তা দেবী	৪৷৹
ঊষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ	২৲
সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী	২৷৹
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ	১৲
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ	২৲
উদ্যানলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২৷৹
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক	৪৲
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১৷৹
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১৷৹
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৷–
চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত	২৷৹
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	৪৷৹
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)— শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৲
পাথুরে বাঁদর রামদাস (সচিত্র)— শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১৷৹
জননা—শ্রীহেমলতা দেবী	১৷৹
খেলাধূলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৷৹
বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	১৶৹
ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৷৹

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

BOOKS AVAILABLE

	Rs.	As.
Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (*No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock*) each No. at	4	0
History of Orissa Vols. I & II —R. D. Banerji each Vol.	25	0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12	0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5	0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4	8
Emerson & His Friends— ditto	4	0
Evolution & Religion— ditto	3	0
Origin and Character of the Bible ditto	3	0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2	0
Prayag or Allahabad—(*Illustrated*)	3	0
The Knight Errant (*Novel*)—Sita Devi	3	8
The Garden Creeper (*Illust. Novel*)— Santa Devi & Sita Devi	3	8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3	0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3	8
India And A New Civilization— ditto	4	0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (*Illust.*)—P. N. Roy	4	8
Story of Satara (*Illust. History*) —Major B. D. Basu	10	0
My Sojourn in England— ditto	2	0
History of the British Occupation in India —[*An epitome of Major Basu's first book in the list.*]—N. Kasturi	3	0
History of the Reign of Shah Alum— W. Franklin	3	0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6	0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0	8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0	4
Indian Medicinal Plants—Major B. D. Basu & Lt.-Col. K. R. Kirtikar—Complete in 8 Vols. [Authoritative Work with numerous Superb Plates]	320	0

Postage Extra.

The Modern Review Office

120-2, Upper Circular Road, CALCUTTA

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন

বিগত ১৩৫১ সালের ৯ই পৌষ মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম ষ্টেশনের দুই মাইল উত্তরে রাধানগর নামক পল্লীপ্রান্তে শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ গিরিজী মহারাজের পৌরোহিত্যে ঝাড়গ্রাম সেবায়তন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। জনকল্যাণকল্পে ইহাতে চিকিৎসা, কৃষি ও গো-পালন ইত্যাদি বিভাগও খোলা হইয়াছে, সাধারণ বিদ্যালয় ও নৈশবিদ্যালয় ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য এখানে একটি যোগমন্দির নির্ম্মাণের আয়োজনও সুরু হইয়াছে। অর্থসাহায্যাদি ৬ বি, রড ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, এই ঠিকানায় সেবায়তনের কলিকাতা কেন্দ্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশমোহন মজুমদারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

সিংহগড় পল্লী-প্রতিষ্ঠান

পল্লী-সংস্কার ও গঠনমূলক কার্য্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রীহট্টের কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ সম্প্রতি স্বীয় জন্মপল্লী রাঁচুণালের নিকটে একটি পল্লী-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার আদর্শ হইতেছে: (১) আত্মনির্ভরশীল ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পল্লীবাসীরা যাহাতে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তাহার কার্য্যকরী পন্থা উদ্ভাবন, (২) পল্লীর জনশক্তিকে সমাজের ও দেশের কল্যাণকর্ম্মে নিয়োজিত করা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হইয়াছে সিংহগড় পল্লী-প্রতিষ্ঠান। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানটি পতিত অবস্থায় ছিল। পরে ১২৯৪ সালে লক্ষ্মীশ্বর বাবুর পিতা বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয় এই জায়গা ক্রয় করিয়া এখানে ইট ও টালির কারখানা স্থাপন করেন। ১৩২২ সালে তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করেন। তারপর প্রায় ২৮।২৯ বৎসর ইহা পরিত্যক্ত ও জনমানবশূন্য অবস্থায় ছিল। ১৩৫১ সালের শেষভাগে লক্ষ্মীশ্বর বাবু এখানকার জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ, বাস-গৃহ নির্ম্মাণ, ইঁট পোড়ানো, পুষ্করিণী সংস্কার ইত্যাদি কাজে হাত দেন। পল্লী-শিল্প, জনশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্মীশ্বর বাবুর প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দুই বারে সাত বৎসর কাল সুইডেনে থাকিয়া সেখানকার স্লয়ডপদ্ধতি,—গৃহজাত শিল্পশিক্ষা যাহার প্রধান অঙ্গ—সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে সেবাগ্রামে 'নয়ী তালিম' ভবনে পল্লী-শিল্পাদি সংক্রান্ত গবেষণামূলক কর্ম্মে বৎসরাধিককাল ব্যাপৃত থাকেন। এখানে কাজ করিবার সময় আচার্য্য বিনোবা ভাবের মৌলিক পল্লীগঠন-পদ্ধতি পর্য্যালোচনার সুযোগও তাঁহার হয়।

বহুদর্শিতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস সম্বল করিয়া লক্ষ্মীশ্বরবাবু পল্লীর পুনর্গঠন ও পল্লী-শিল্পোন্নয়নের দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। প্রাথমিক কাজ হিসাবে তিনি পল্লীর গৃহাদির ছাউনি-সমস্যা নিরাকরণার্থ টালি তৈরির কাজে হাত দিয়াছেন এবং সেবাগ্রামের ধরণে, সিংহগড়ে এবং নিকটবর্ত্তী পল্লী অঞ্চলসমূহে 'চলন্ত' পায়খানা চালু করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই পল্লীপ্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্রম নিম্নলিখিতরূপ: (১) প্রগতিশীল আদর্শ পল্লীগঠন, (২) বিজ্ঞানসম্মত শিল্পশিক্ষা-দানের ব্যবস্থা (৩) অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ভিত্তিতে উপযুক্ত সাহিত্য রচনা ও প্রচার, (৪) গবেষণাদ্বারা পল্লীবাসীদের জীবনে সচ্ছলতা ও সুখ-সমৃদ্ধি আনয়নকারী শিল্পসমূহের মান স্থিরীকরণ। এই পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ
সিংহগড়
পোঃ—রাঁচুণাল (জিলা শ্রীহট্ট)

ডক্টর প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পিএইচ-ডি

মেজর প্রবোধহরি চট্টোপাধ্যায়, এম এ, পিএইচ ডি, বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি Industrial Psychology (বাণিজ্য-শিল্প-বিষয়ক মনস্তত্ত্ব) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড



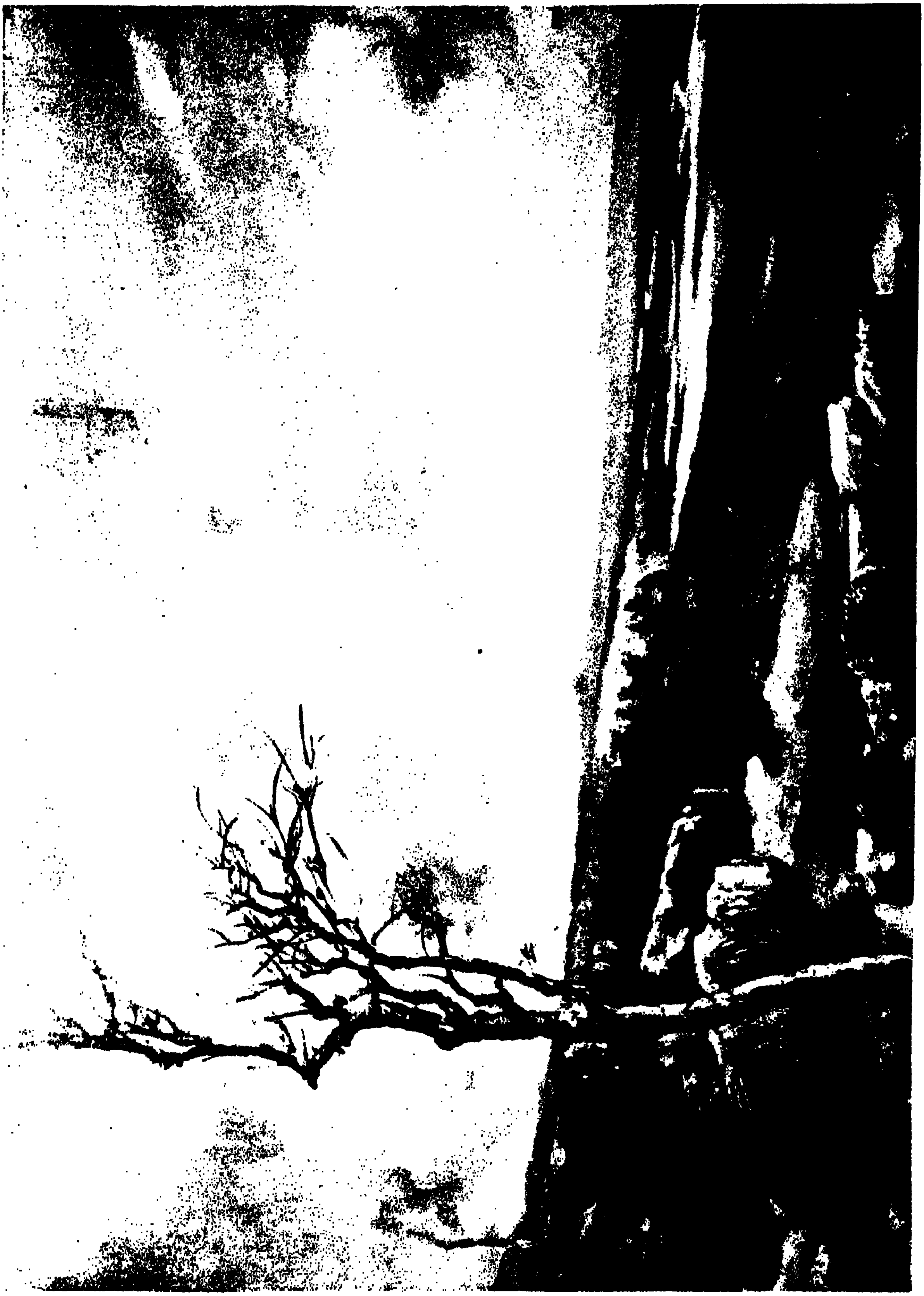
প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার তাঁহার উপর ছিল। তাঁহারই প্রযত্নে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পাঠ্যরূপে শরৎচন্দ্রের পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়।

নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি বিহার মেডিক্যাল সার্ভিসের নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, এম-বি, ডি, এম, আর, ই, মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মজঃফরপুরে সিভিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) ও ভেষজবিদ্যা (Medicine) এই উভয় বিষয়েই তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা,





[illegible] একটি [illegible] পরিদর্শন
পশ্চাতে [illegible]



[illegible] একটি [illegible] গান্ধীজী [illegible]
[illegible] করিয়াছেন

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

জয়-পরাজয়

'প্রবাসী'র এই সংখ্যা অত্যন্ত দেরিতে প্রকাশিত হইল। ইহা আরও এক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হইতে পারিত, কিন্তু বড়লাটের ও ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা আসন্নপ্রায় দেখিয়া আমরা তাহার প্রতীক্ষায় আরও অল্প দেরি করিলাম, কেননা পরের সংখ্যায় এ বিষয়ে লিখিতে হইলে অনেক দেরিতে সে বিষয়ের পুনরবতারণা হইত। বর্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামার অবস্থার কারণে ও এই ব্যাপারে আমাদের যে দেরি হইল, আশা করি আমাদের পাঠকবর্গ ত্রুটি লইবেন না।

বড়লাটের ও ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা এখন সর্বজনবিদিত। এই ঘোষণায় অবিমিশ্র শোক বা আনন্দ, কোনটারই কারণ নাই। অখণ্ড ভারত, অখণ্ড বাংলা ও অখণ্ড পঞ্জাব ইহা জাতীয়তাবাদী মাত্রেরই কাম্য। ভারত বিভাগ হইল কাহার দোষে সে বিষয়ে আলোচনা করা এখন বৃথা। বিদেশীর চক্রান্তে ভুলিয়া ভাই ভাইয়ের সঙ্গে যে কলহ বাধাইয়াছে তাহার ফলে দেশ এখন জর্জরিত, এমন কি স্বাধীনতার দিনও পিছাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে—এমত অবস্থায় এই ঘোষণা আসিল। আর সামান্য কয় দিনের মধ্যেই ইহা স্থির হইয়া যাইবে যে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইবে না অখণ্ডিত থাকিবে। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইলে বাংলা ও পঞ্জাবের বিভাগ প্রায় অবশ্যম্ভাবী। যদি এই দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে সুবুদ্ধির উদয় হয় তবে হয়ত দেশ ও প্রদেশ বিভাগ না হইতেও পারে, তবে সে আশা অতি ক্ষীণ।

দেশের ও প্রদেশের বিভাগে নিদারুণ মনঃকষ্ট অনুভব করিবে না এমন কোন জাতীয়তাবাদী আছে? ভারতের উজ্জ্বল গৌরবময় ভবিষ্যকালের কল্পনা কাহার মনে উদিত হয় নাই? দেশ বিভাগে ও প্রদেশ বিভাগে দেশের জনসাধারণের,—বিশেষতঃ বিভক্ত প্রদেশগুলির জনসাধারণের—দুঃখকষ্ট লাঘবের দিন পিছাইয়া যাইবে ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন। এই বিভাগের কার্যে যে দুঃখকষ্টের সাময়িক বৃদ্ধির আশঙ্কাও রহিয়াছে যথেষ্ট। বিভাগ হইয়া গেলে অনেক স্বাধীনতাকামী স্বার্থত্যাগী যোদ্ধার মনস্কামনা পূরণের দিন পিছাইয়া যাইবে ইহাও সত্য। সুতরাং দুঃখের কারণ রহিয়াছে অজস্র। কিন্তু উপায় কি, যখন ঘরের ভাই স্বার্থান্ধ ও প্রলুব্ধ হওয়ার ফলে গৃহবিবাদ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে এবং বিদেশী সে গৃহবিবাদের অনলে ইন্ধন যোগাইয়া তাহাকে সারা দেশে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিগত দশ বৎসরে এ দেশ যেরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া যে পথে চলিতেছিল, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল। সে পথে আর কিছু দিন চলিলে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব নিশ্চিত আসিত, কেননা "তৃতীয় পক্ষ" তাহার জন্যই চেষ্টা করিতেছিল এবং লীগ দল তাহাদেরই ক্রীড়নক পুত্তলিকারূপে কার্যসিদ্ধি করিতেছিল। ইহা নিশ্চিত যে যত দিন ইংরেজ শাসকের হাতে দেশ-প্রদেশের কলকাঠি নাড়িবার ক্ষমতা থাকিত ততদিন এ দেশে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে শাসকসম্প্রদায়ের সমস্ত শক্তি অতি অন্যায় এবং কুৎসিত ভাবে প্রযুক্ত হইত। কোথাও—যেমন সীমান্ত প্রদেশে—গবর্ণর এবং পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট সমস্ত প্রদেশের যত দুষ্ট দুরাচারদিগের প্রধান সহায়ক হইত, কোথাও বা পঞ্জাবের মত অত্যাচারীদের দমন না করিয়া অত্যাচারিতদের দমন চালাইতে গবর্ণর ও ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট উৎসুক থাকিত, অথবা কোথাও, বাংলাদেশের মত, অকর্মণ্য গবর্ণর রাষ্ট্রপদ্ধতির দোহাই দিয়া দুরাচার মন্ত্রীমণ্ডলী ও উৎপীড়ক শাসকের হস্তে দেশ ছাড়িয়া নিজের উদরপূর্তি এবং ভবিষ্যৎ সঙ্গতির চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিত।

এইরূপ অবস্থায় এই বিভাগ অন্ততঃ পক্ষে দেশের উন্নতির দুইটি প্রধান অন্তরায় দূর করার পথ সোজা করিয়া আনিয়াছে। ইংরেজ শাসক ভারতের তিন-চতুর্থাংশ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইবে এবং লীগ অধিকৃত দেশেও তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়ত, যে সকল অঞ্চলে ভারতের জাতীয়তাবাদের ধারার মুখে ক্রমেই জঞ্জালের বাঁধ জমিয়া যাইতেছিল সেই সকল দেশের দুই স্থলে ধারার নূতন মুখ কাটিয়া পরিষ্কার করার পথ পাওয়া যাইবে। আশা আছে স্বাধীনতা-আলোকের প্রভাবে সেই দুই মুখ ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত করিবার উপায় দেখা যাইবে। বাঙালী এত দিন অন্ধকারের মধ্যে চলিবার পর অন্ততঃ এক দিকে আলো দেখিতে পাইবে এবং সেই আলোতে মধ্যযুগের বিভীষিকার ভীষণ অন্ধকার

হইতে আংশিকভাবে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের আস্বাদ পাইবে। এত দিন সকল বাঙালীই নিজের পরিত্রাণ চেষ্টায় কূল পাইতেছিল না। অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ পক্ষে এক অংশ শান্তিতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অন্য ভাইবোনের কথা ভাবিবার অবসর পাইবে। বাঙালী স্বার্থপর, অদূরদর্শী এবং পরশ্রীকাতর এবং, অন্য পরাধীন জাতির ন্যায়, নিজের উন্নতির চেষ্টায় ব্যর্থমনোরথ হওয়ায় পরের অনিষ্টের চেষ্টায় সদা জাগ্রত এই অপবাদ আছে। স্বাধীনতার অমৃতময় স্পর্শে সকল কলুষ বিদূরিত হইয়া জাতি নূতন জীবন লাভ করিবে ইহাই আমাদের আশার কথা।

বস্তুতপক্ষে এই নূতন ঘোষণায় কাহারও লাভ ষোল আনা হইল না। লীগ যে পাকিস্থান পাইবে আশা করিয়াছিল, ঘোষণা অনুসারে তাহার সংক্ষিপ্ত অংশ মাত্র তাহারা পাইতে পারে। ইহাতে লীগদলের লাভ এইটুকু মাত্র হইবে যে, অখণ্ড ভারত খণ্ডিত হওয়ায় সমস্ত দেশের অপকার হইবে। লীগ-বর্জিত ভারত শান্তি পাইল, উন্নতির পথ পাইল শক্তিসামর্থ্য খর্ব্ব হওয়ার মূল্যে, এবং ভবিষ্যতে দুই অংশেরই বিপদের সম্ভাবনা রহিয়া গেল। ইংরেজের ক্ষতি হইল এইজন্য যে বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ শাসক ও শোষকবর্গের কীর্ত্তিকলাপ ভারতবাসীর মনে যত দিন থাকিবে তত দিন এ দেশবাসী ভালমনে ইংরেজের সঙ্গে কারবার করিতে পারিবে না।

কিন্তু দোষগুণ যাহাই হউক এখন আমাদের এই ঘোষণা অনুযায়ী কর্মপন্থায় অগ্রসর হইতেই হইবে। স্বাধীনতার দিন আরো পিছাইয়া দেওয়া কোনমতেই চলে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই পূর্ণ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইলেন তাঁহাদেরও পরিত্রাণের দিন তত শীঘ্র আসিবে যত শীঘ্র আমরা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পথে অগ্রসর হইয়া বল সঞ্চয় করিতে পারিব। দাসত্ব ও ক্লীবত্ব হইতে মুক্তির একমাত্র পথ স্বাতন্ত্র্যের সে যতই দুরূহ বা দুঃখকর হউক।

এখন আমাদের সজাগ থাকিতে হইবে যাহাতে কূলে আসিয়া বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ভরাডুবি না হয়। ঘোষণার ৭ ধারায় সেই ভয় যথেষ্ট আছে। দেশবাসীর পক্ষে নিজেদের প্রতিনিধিবর্গের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নিতান্তই প্রয়োজন।

ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণার পূর্ণ বিবরণ

ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্রিটিশ সরকার গত ৩রা জুন অপরাহ্ণে যে পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল :—

১। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতীয়দের হাতে বৃটিশ ভারতের শাসনভার তুলিয়া দিবেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে মন্ত্রী (কেবিনেট) মিশন যে পরিকল্পনা প্রস্তুত [illegible] তাহা কার্যকরী করা যাইবে এবং ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য শাসনতন্ত্র গঠন করা সম্ভবপর হইবে, এরূপ আশা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

২। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং দিল্লী, আজমীর-মাড়বার ও কুর্গের প্রতিনিধিবৃন্দ ইতিমধ্যেই একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কার্যে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছেন। অপরপক্ষে বাংলা, পঞ্জাব সিন্ধু প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং বৃটিশ বেলুচিস্থানের প্রতিনিধিসহ মুসলিম লীগ দল গণ-পরিষদে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৩। ভারতীয় জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর করাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ একমত হইতে পারিলে এই কাজ অনেক সহজ হইতে পারিত। ঐক্যের অভাবে ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা যাহাতে জানা যাইতে পারে, সে উপায় নির্দ্ধারণের ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপরেই পড়িয়াছে। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত পরিকল্পনাটি অনুসরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। একথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টরূপে জানাইয়া রাখিতেছেন যে, ভারতবর্ষের চরম শাসনতন্ত্র গঠন সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই; ভারতীয়েরা নিজেরাই তাহা করিবেন। এই পরিকল্পনায় এমন কিছুই নাই যাহাদ্বারা ভারতকে অবিভক্ত রাখিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ হইতে পারে। ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচনা দ্বারা ঐক্য স্থাপন এবং ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখার পথও এই পরিকল্পনাতে খোলাই রাখা হইল।

৪। বর্তমান গণ-পরিষদের কার্যে বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি প্রদেশ সম্পর্কে যখন বিশেষ ব্যবস্থা করা-হইতেছে, তখন এই ঘোষণার পরে যে সকল প্রদেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি বর্তমান গণ-পরিষদে ইতিমধ্যেই যোগদান করিয়াছেন সেই সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ প্রতিনিধিরাও উহাতে যোগ দিয়া উহার কাজে যথাযথ অংশ গ্রহণ করিবেন। সেই সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্ট যে, এই গণ-পরিষদকর্তৃক রচিত কোন শাসনতন্ত্র দেশের যে সকল অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

ঐ সকল অঞ্চলের জনসাধারণ তাহাদের শাসনতন্ত্র (ক) বর্তমান গণ-পরিষদ কর্তৃক রচনা করিবার পক্ষপাতী কিম্বা (খ) বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক অঞ্চলগুলির

মারফতে তাঁহাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে চাহেন, তাহা নির্ধারণের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল নিয়ে বর্ণিত পন্থাটি, এ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিঃসংশয়।

এই বিষয়টি স্থির হইয়া গেলে পরে কোন এক কিম্বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে, তাহা স্থির করা সম্ভব হইবে।

৫। বাংলা ও পঞ্জাবের প্রাদেশিক আইন পরিষদকে (ইউরোপীয় সদস্যদের বাদ দিয়া) দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিবেশন করিতে বলা হইবে; এক অংশে থাকিবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিগণ, অন্য অংশে থাকিবে প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের প্রতিনিধিবৃন্দ। জেলার লোকসংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১৯৪১ সালের আদমসুমারিকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হইবে।

এই ঘোষণার পরিশিষ্টে বাংলা ও পঞ্জাবের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। প্রদেশ বিভক্ত হইবে কিনা সে সম্বন্ধে মতামত দিবার ক্ষমতা উভয় প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের পৃথকভাবে মিলিত প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে।

বিভক্ত ব্যবস্থা-পরিষদের কোন একটি অংশ সাধারণ ভোটাধিক্যে প্রদেশ বিভাগের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেই প্রদেশ বিভক্ত হইবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হইবে।

৭। পরিণামে যদি প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়, তবে ঐ অবিভক্ত প্রদেশ কোন্ গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা প্রদেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বে প্রাদেশিক আইন সভার মুসলমান-প্রধান ও অন্যান্য জেলার প্রতিনিধিদের জানা দরকার। সুতরাং উভয় আইন-পরিষদের কোনও প্রতিনিধি যদি দাবি করেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সদস্যগণ বাদে আইন সভার সমুদয় সদস্যকে লইয়া এক পূর্ণ অধিবেশন বসিবে এবং সেখানে ভোটের দ্বারা স্থির হইবে প্রদেশ অবিভক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সমগ্র প্রদেশটি কোন্ গণ-পরিষদে যোগদান করিবে।

৮। প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে প্রদেশের নিজ নিজ অংশের প্রতিনিধিগণ স্থির করিবেন, উপরে লিখিত ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) ও (খ) এই ব্যবস্থার মধ্যে কোন্টি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন।

৯। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার সুবিধার জন্য বাংলা ও পঞ্জাবের আইন সভার সদস্যগণ মুসলমান-প্রধান (পরিশিষ্টে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে) ও অবশিষ্ট জেলার প্রতিনিধি হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে আইন সভায় বসিবেন। ইহা প্রাথমিক ব্যবস্থা এবং নিছক সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। উভয় প্রদেশকে পাকাপাকি বিভাগ করিতে গেলে ভৌগোলিক সীমা নির্ধারণের কাজে অনেক খুঁটিনাটি বিচারের প্রয়োজন হইবে। প্রদেশ দুইটির যে কোন একটি বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই মাননীয় বড়লাট একটি সীমা-নির্ধারক কমিশন বসাইবেন। এই কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি এবং সদস্য নির্বাচন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে। এই কমিশনকে পঞ্জাবের দুইটি অংশের সীমানা নির্দেশ করিতে হইবে, যাহাতে যে সকল অঞ্চল জনসংখ্যায় মুসলমান-প্রধান ও গায়ে গায়ে আছে সেগুলি এক অংশে এবং অমুসলমানপ্রধান ও গায়ে গায়ে সংযুক্ত অঞ্চলগুলি অন্য অংশে পড়ে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেও কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হইবে। বাংলার সীমা নির্ধারণ সম্পর্কেও সীমা নির্ধারক কমিশনকে অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে। কমিশনের রিপোর্ট কার্যে প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সম্প্রতি যেরূপ (পরিশিষ্টে উল্লিখিত) ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই মানিয়া চলা হইবে।

সিন্ধুর প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ (ইউরোপীয় সদস্যগণ বাদে) এক বিশেষ বৈঠক করিয়া পূর্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের (ক) ও (খ) বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

১১। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র ধরণের। এই প্রদেশের নির্বাচিত তিন জন প্রতিনিধির মধ্যে দুই জনই বর্তমান গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সমস্ত পঞ্জাব কিম্বা পঞ্জাবের কোনও অংশ যদি বর্তমান গণপরিষদে যোগদানে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে আর একবার পুনর্বিবেচনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী অর্থাৎ পঞ্জাব কিম্বা পঞ্জাবের অংশবিশেষ বর্তমান গণ-পরিষদে যোগ না দিলে পূর্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিকল্প প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্তমান আইন সভার নির্বাচনে ভোটদাতাদের মতামত জানিবার ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে মাননীয় বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে এই গণ-ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১২। বর্তমান গণ-পরিষদে বৃটিশ বেলুচিস্থানের নির্বাচিত প্রতিনিধি এক জন থাকিলেও তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করিয়া এই প্রদেশকেও তাহার অবস্থা পুনর্বিবেচনা এবং পূর্বোল্লিখিত ৪নং অনুচ্ছেদের বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাইবে। কি উপায়ে ইহা সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা মাননীয় বড়লাট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

১৩। আসাম বহুলরূপে অ-মুসলমান প্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার অন্তর্গত বাংলা দেশের সংলগ্ন শ্রীহট্ট জেলাটিতে মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশী। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলে শ্রীহট্টকে

বাংলার মুসলিম অংশের সহিত যুক্ত করিতে হইবে বলিয়া দাবি উঠিয়াছে। সুতরাং বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে শ্রীহট্ট জেলাটি আসামের সহিতই থাকিয়া যাইবে অথবা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের সম্মতিক্রমে ঐ প্রদেশের সহিত সংযুক্ত হইবে এ বিষয়ে শ্রীহট্টের জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে ইহা করা হইবে। জনমত যদি শ্রীহট্টকে পূর্ববঙ্গ প্রদেশের সহিত যুক্ত করার অনুকূল দেখা যায় তাহা হইলে পঞ্জাব ও বাংলার সীমা নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত কমিশনের ন্যায় শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান-প্রধান অঞ্চল ও উহার সংলগ্ন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য অঞ্চলগুলির সীমা নির্দ্ধারণের জন্য কমিশন নিযুক্ত করা হইবে। তাহার পর ঐ অঞ্চলগুলিকে আসাম প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইবে।

সকল অবস্থাতেই আসামের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমানে গণ-পরিষদের কাজে যেরূপ যোগ দিতেছেন সেরূপেই যোগ দিতে থাকিবেন।

১৪। বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থাই যদি সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে (১৯৪৬) পরিকল্পনার নীতি অনুযায়ী বিভক্ত অংশের জনসংখ্যার প্রতি দশ লক্ষের জন্য এক জন করিয়া প্রতিনিধি পুনরায় নির্বাচন করিতে হইবে। শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে সেখানেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে। এলাকা হিসাবে নিম্নলিখিত হারে প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে—

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলমান	শিখ	মোট
শ্রীহট্ট জেলা	১	২	—	৩
পশ্চিম বঙ্গ	১৫	৪	—	১৯
পূর্ববঙ্গ	১২	২৯	—	৪১
পশ্চিম পঞ্জাব	৩	১২	২	১৭
পূর্ব পঞ্জাব	৬	৪	২	১২

১৫। বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিগণ প্রাপ্ত নির্দেশ অনুসারে হয় বর্ত্তমানের গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন অথবা পৃথকভাবে নূতন গণ-পরিষদ গঠন করিবেন।

১৬। বিভক্তকরণ স্থির হইলে যথাসম্ভব সত্বর বিভক্ত অংশগুলির শাসন পরিচালনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা সুরু করা দরকার হইবে :—

ক। দেশরক্ষা, অর্থ, চলাচল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পরিচালিত অন্যান্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে ;

খ। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন শাসনকর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ;

গ। যে প্রদেশগুলি বিভক্ত হইবে সেগুলির বেলায় প্রাদেশিক কর্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি যথা দেনাপাওনার অংশ বিভাগ, পুলিস, হাইকোর্ট, প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিচালনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে।

১৭। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের সহিত কোন প্রকার চুক্তি সম্পর্কে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তরাধিকারী যথাযোগ্য শাসনকর্তৃপক্ষের মারফতে আলাপ-আলোচনা করিতে হইবে।

১৮। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি শুধু ব্রিটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখের মন্ত্রী মিশনের স্মারকলিপিতে যে নীতি নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবে না।

১৯। যাহাতে পরবর্তী শাসন কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমতা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন, সেজন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা-সমূহ যথাসম্ভব সত্বর কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এই পরিকল্পনার সর্তসমূহের বাস্তায় না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ বা উহাদের বিভক্ত অংশগুলি যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু করিতে পারিবে। বর্ত্তমান গণ-পরিষদ এবং নূতন গণপরিষদও (যদি গঠিত হয়) নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন। নিজেদের জন্য নিয়মকানুন প্রণয়নের অধিকারও তাঁহাদের থাকিবে।

২০। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি অবিলম্বে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি বারংবার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জানাইয়াছেন। এই দাবির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাঁহারা আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে অথবা সম্ভব হইলে তাহার আরও পূর্বেই ভারতবর্ষে এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়া শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করিয়া দিতে ইচ্ছুক আছেন। তদনুযায়ী যথাসম্ভব সত্বর ক্ষমতা হস্তান্তরের সর্বাপেক্ষা দ্রুত এবং প্রকৃতপক্ষে একমাত্র কার্যকরী উপায় হিসাবে তাঁহারা এক বা একাধিক কর্তৃপক্ষের হাতে (এই ঘোষণার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ স্থির করিবেন) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চলতি বৎসরেই আইন রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতের কোন অংশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রহিবে কি না তাহা স্থির করিবার যে অধিকার সেই অংশের গণ-পরিষদের আছে এই আইনের দ্বারা তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে না।

২১। উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করিবার জন্য অথবা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে মহামান্য বড়লাট প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিবেন।

১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশের মুসলমান-প্রধান জেলাগুলির নাম :—

পঞ্জাব

লাহোর বিভাগ :—গুজরানওয়ালা, গুরুদাসপুর, লাহোর, শেখপুরা ও শিয়ালকোট।

রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ : এটক, গুজরাট ও ঝেলাম, মিয়ানওয়ালি, রাওয়ালপিণ্ডি ও শাহ্‌পুর।

মুলতান বিভাগ :—ডেরাগাজিখান, ঝাং, লায়ালপুর, মণ্টগোমারি, মুলতান ও মজঃফরগড়।

বাংলা

চট্টগ্রাম বিভাগ :—চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা।

ঢাকা বিভাগ :—বাখরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, ও ময়মনসিংহ।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ :—যশোহর, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া।

রাজশাহী বিভাগ :—বগুড়া, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, রাজসাহী ও রংপুর।

বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনের বেতার ঘোষণা

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট-কর্তৃক ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ-পদ্ধতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটি বিবৃতি আজ আপনাদের কাছে পড়িয়া শুনান হইবে। কিন্তু তাহার আগে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু বলিতে চাই। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আমার যে সকল আলোচনা হইয়াছে এবং যাহার ফলে আমি সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে পরামর্শ দিয়াছি তাহারও একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই।

গত মার্চ মাসের শেষে এদেশে আসিয়া পৌঁছিবার পর আমি প্রায় প্রত্যহই নানা সম্প্রদায় ও দলের বহুসংখ্যক প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে যে সকল তথ্য এবং পরামর্শাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত পরিমাণে সদ্ভাব সহকারে বিভিন্ন সম্প্রদায় যদি একটি অবিভক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র বজায় রাখিতেন তবে তাহাই হইত সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত কয় সপ্তাহে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই।

গত এক শত বৎসরের অধিক আপনারা ৪০ কোটি লোক একসঙ্গে বসবাস করিতেছেন এবং ভারতবর্ষ একটি গোটা দেশ হিসাবেই শাসিত হইতেছে। ইহার ফলে এই দেশের জন্য একই চলাচল ব্যবস্থা, একই দেশরক্ষা, ডাক ও মুদ্রানীতির ব্যবস্থায় কাজ চলিতেছে। ইহার ফলে ইহার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শুল্ক- ও বাণিজ্য-ঘটিত কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই; ইহার জন্যই একটি অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে এই সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে না বলিয়া আমার মনে প্রবল আশা ছিল।

সেইজন্যই আমার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল মন্ত্রী-মিশনের ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবটি পুরাপুরিরূপে গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা। ঐ প্রস্তাবটিকে অধিকাংশ প্রদেশের প্রতিনিধিরাই মানিয়া লইয়াছেন এবং আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সমুদয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, মন্ত্রী-মিশনের কিম্বা ভারতের সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার অনুকূলে অন্য কোনও পরিকল্পনা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কিন্তু কোন একটি বৃহৎ অঞ্চল যেখানে এক সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে অঞ্চলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিশিষ্ট গবর্মেণ্টের অধীনে বাস করিতে বাধ্য করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; বলপ্রয়োগে বাধ্য করার পরিবর্তে যে উপায় আছে তাহা হইল অঞ্চল বিভক্তকরণ।

কিন্তু মুসলিম লীগ যখন ভারত বিভাগের দাবি তুলিল তখন কংগ্রেসের তরফ হইতেও ঠিক একই যুক্তির দ্বারা কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রদেশ বিভাগের জন্য দাবি উঠিল—আমার মতে এই যুক্তি অলঙ্ঘনীয়। বস্তুতঃ কোন পক্ষই নিজেদের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা বৃহৎ অঞ্চলকে অন্য সম্প্রদায়ের গবর্মেণ্টের অধীনে রাখিতে সম্মত হন নাই। অবশ্য আমি নিজে ভারত বিভাগেরও যেমন পক্ষপাতী নই, প্রদেশ বিভাগও তেমনি সমর্থন করি না; বলা বাহুল্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই আপত্তি করিবার কারণ এক।

সাম্প্রদায়িক মত-বিরোধের ঊর্ধ্বে যেমন ভারতীয় মনোভাব আছে বলিয়া আমার ধারণা, তেমনি বাঙালী ও পঞ্জাবী মানসিকতা বলিয়া একটা বস্তু আছে এবং ইহাই প্রদেশের প্রতি জনগণের আনুগত্যবোধ জাগাইয়াছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয় ভারতবাসীদের নিজেদেরই ভাগাভাগি-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা উচিত।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক শাসনক্ষমতা এক বা একাধিক গবর্মেণ্টের হাতে দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁহারা যাহাতে সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন তাহার উপায় এই বিবৃতিতে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা আপনাদিগকে পড়িয়া শুনান হইবে। কিন্তু সে সম্পর্কে দুই-একটি বিষয়ে একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

পঞ্জাব, বাংলা ও আংশিক ভাবে আসামের লোকের মনোভাব জানিয়া লইবার জন্য ঐ সকল প্রদেশের মুসলমান-প্রধান অঞ্চল ও বাকী অংশের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাবে জানাইতে চাই যে সীমা-নির্ধারণ কমিশনই উভয় এলাকার মধ্যে চূড়ান্তভাবে সীমা নির্দেশ করিয়া দিবেন। সাময়িক ভাবে নির্ধারিত এই সাম্প্রতিক সীমারেখা এবং চূড়ান্ত ভাবে স্থিরীকৃত সীমারেখা একই হইবে না ইহা প্রায় নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

শিখদের অবস্থা ভালভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা

হইয়াছে। এই বীর জাতির জনসংখ্যা সমগ্র পঞ্জাবের জনসংখ্যার প্রায় এক-অষ্টমাংশ। কিন্তু তাহারা এমন ছড়াইয়া আছে যে, পঞ্জাবকে যেমন ভাবেই ভাগ করা হউক না কেন, সকল অংশেই কিছু-না-কিছু শিখ থাকিয়া যাইবেই। আমরা যাহারা অন্তরের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মঙ্গলই কামনা করি, তাহারা ইহা ভাবিয়া দুঃখিত যে, শিখ সম্প্রদায়ের নিজেদেরই অভীপ্সিত পঞ্জাব বিভাগের ফলে তাঁহারা নিজেরাই অত্যধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। তাঁহারা কত কম বা বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন সীমা-নির্দ্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্তের উপরই তাহা নির্ভর করিবে। অবশ্য এই প্রতিনিধি কমিশনে শিখদের প্রতিনিধি থাকিবে।

আলোচ্য পরিকল্পনার সবটাই একেবারে নিখুঁত নাও হইতে পারে, অন্যান্য সকল পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনার সাফল্যও ইহার পরিচালনার সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে তাহা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত ইহাই আমার মত। কিন্তু মুশকিল এই যে, যদি সমগ্র ভারতের ব্যাপারে সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ যদি প্রদেশ বিভাগেরও সিদ্ধান্ত হয়। পক্ষান্তরে, গণ-পরিষদগুলি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিবার পূর্বেই যদি শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে দেখা যাইবে যে, দেশে কোনও শাসনতন্ত্রই নাই। এই সঙ্কটপূর্ণ সমস্যার সমাধানের জন্য আমি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছি যে, আবশ্যক ব্যবস্থাদি করা হইয়া গেলে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এখনই এক বা একাধিক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনশীল গবর্মেণ্টের হাতে ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার হস্তান্তর করিবেন। আশা করা যায়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা সম্ভব হইবে। সুখের বিষয়, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্টের বর্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করার জন্য এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইণ্ডিয়া অফিসের আর বিশেষ কিছু কাজ থাকিবে না। ভবিষ্যতে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ও ভারত গবর্মেণ্ট সম্পর্কিত কাজ-কর্মের ভার কোনও নূতন দপ্তরের উপরে দেওয়া হইবে।

সমগ্র ভারতের কিম্বা বিভক্ত হইলে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রস্তাবিত আইনে কোনও প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপ করা হইবে না। ইহা আমি বিশেষ জোরের সহিত বলিতে চাই।

আমাদের মধ্যে চরম আশাবাদীদের প্রত্যাশার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করিবার পথ এখন পরিষ্কার হইয়াছে। অথচ ভারতবাসিগণের উপরেই তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের ভার রহিল। ইহাই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ঘোষিত নীতি।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ ভারতেরই ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত বলিয়া আমি দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে কোনও কিছু বলি নাই। শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শেষ করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। গত কয়েক মাস যাবৎ যেভাবে বিশৃঙ্খলা ও বেআইনী ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে তাহা আর চলিতে দেওয়া ত দূরের কথা, এ সময় কোন প্রকার দ্বন্দ্বের বা মনোমালিন্যের প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত হইবে না। আমরা কিরূপ খাদ্যসঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিতেছি তাহা ভুলিয়া যাওয়া কাহারও উচিত নয়। হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া চলিতে পারে না—এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত।

ভারতবাসীদের সিদ্ধান্ত যে প্রকার হউক না কেন, আমার স্থির বিশ্বাস, ব্রিটিশ অফিসারদিগকে আরও কিছুদিন এদেশে অবস্থান করিতে বলিলে তাঁহারা এদেশে থাকিয়া ভারতীয়দের সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যে পরিণত করিতে তাঁহাদের যথাশক্তি সাহায্য করিবেন। মহামান্য সম্রাট ও ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমাকে ভারতীয়দের প্রতি শুভেচ্ছা জানাইতে বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে। বর্তমান ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমি ভারতীয়দের মধ্যে আছি বলিয়া গর্ববোধ করি। ভারতবাসিগণ বিশেষ বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হউন এবং মিঃ গান্ধী ও জিন্নার মিলিত আবেদনের পূর্ণ সম্মান রক্ষা করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় কার্যকরী করিয়া তুলুন আমি এই কামনা করি।

ব্রিটিশ পরিকল্পনা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত নেহরু বলেন, নয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই নয় মাস ধরিয়া আমাদিগকে দারুণ দুঃখকষ্ট ও উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে। কোন কোন সময় আমাদের হৃদয় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তবুও জনগণের এই অশেষ দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও আশার আলোও যথেষ্ট রহিয়াছে। জাতিগত-ভাবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে; আজ বিশ্বসঙ্ঘের নিকট ভারতবর্ষ মর্যাদালাভ করিয়াছে।

স্বরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিছু সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, যদিও সাধারণ মানুষ এখনও দারুণ গুরুভার-প্রপীড়িত রহিয়াছে, আজও লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন-বস্ত্র ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। উন্নতি সাধনের বহু বড় বড় পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, আমাদের বিরাট পরিকল্পনার অধিকাংশই এখনও বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে দেশকে আজ যে সব গুরু সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে তাহা আপনারা সকলেই জানেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ লক্ষ লক্ষ লোককে দারুণ দুঃখ-দুর্বিপাকের জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছে

এবং যাহাদের হস্তে দেশের শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাহাদিগকেও দারুণ গুরুভার বহন করিতে হইয়াছে। উপক্রুত অঞ্চলের বাসিন্দাদের দুঃখ-দুর্দশার চিন্তায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত, সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের স্ত্রীজাতিকে মৃত্যু অপেক্ষাও দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই সব বেদনাক্লিষ্ট পরিবার ও যাহারা নিজেদের বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া আজ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি আমার গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি। আমরা যথাশক্তি তাঁহাদের সাহায্য করিব। এইরূপ গুরুতর বিপর্যয় ভবিষ্যতে আর যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য চেষ্টা করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হইবে। শত বাধা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও ভারতের যে বিরাট ভবিষ্যৎ গঠিত হইতে যাইতেছে তাহাকে আমরা ভুলি নাই। আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই সময়ের মধ্যে আমি পূর্বের অভ্যাসমত ভারতের অসংখ্য শহর ও গ্রামবাসীদের সহিত মিলিত হইতে পারি নাই অথবা তাহাদের দুঃখের ইতিহাস ব্যক্তিগতভাবে জানিতে পারি নাই।

আজ আমি পুনরায় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিরাট এক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক মুহূর্তে আপনাদের নিকট উপনীত হইয়াছি।

এই মাত্র আপনারা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ঘোষণা শুনিয়াছেন। এই ঘোষণায় এক দিকে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যবস্থা ও এই অঞ্চলগুলি ভারতের সহিত আলাদা হইবার সম্ভাবনা আছে এবং অন্য দিকে এই ঘোষণায় পূর্ণ স্বাধীনতার পথ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই বিরাট পরিবর্তন ঘটিবার পূর্বে জনসাধারণের সম্মতি অবশ্যই লইতে হইবে এবং এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতবাসী স্থির করিবেন,—বাহিরের কর্তৃত্ব সেই কর্তৃত্ব যতই বন্ধুভাবাপন্ন হউক না কেন তাহার দ্বারা নহে।

এই প্রস্তাবগুলি শীঘ্রই জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। ইতিমধ্যে সময় চলিয়া যাইতেছে—সিদ্ধান্তের জন্য স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাহত করা চলে না। সুতরাং জনসাধারণ যাহা স্থির করিবেন তাহাই চরম স্বীকার করিয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তগুলিকে জনসাধারণের সম্মুখে সুপারিশ করিতে হইবে।

আমরা এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের বৃহত্তর কমিটিগুলির নিকট সুপারিশ করিতেছি যে তাঁহারাও ইহা গ্রহণ করিবেন। হৃদয়ে আনন্দ লইয়া এই প্রস্তাবগুলি আমি আপনাদের নিকট সুপারিশ করিতেছি না যদিও তাহাই যে উপযুক্ত পথ সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ নাই। যুগ যুগ ধরিয়া আমরা স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখিয়াছি—সংগ্রাম করিয়াছি। কতকগুলি অংশকে ভারত হইতে পৃথক করিবার প্রস্তাব আমাদের কাছে বেদনাদায়ক। তাহা সত্ত্বেও আমাদের বর্তমান সিদ্ধান্ত যে এমনকি বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষেও উপযুক্ত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য আমরা পরিশ্রম করিয়াছি সেই ভারত বাধ্যতামূলক অথবা জবরদস্তির উপর গঠিত হইবে তাহা নহে বরং ইচ্ছুক স্বাধীন জনসাধারণ লইয়া গঠিত হইবে তাহাই আমাদের আদর্শ। ইহাও হইতে পারে যে এই উপায়ে আমরা অপেক্ষাকৃত শীঘ্রই সেই ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করিতে পারিব এবং তখন আমাদের ভিত্তি আরও শক্তির উপর স্থাপিত হইবে।

আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা মহান্ আদর্শের সেবা করিতেছি কিন্তু যেহেতু আদর্শ মহান্ সেইজন্য সেই মহত্ত্বের কিছু অংশ আমাদের উপরও পড়ে।

আজ সমগ্র পৃথিবীতে এবং ভারতে এক বিরাট শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতে যে এক মহান্ যুগের সূচনা হইতেছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের ভৌগোলিক সমগ্রতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দ্বারা এবং ভারতবাসীদের মানসিক ও অন্তঃ-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে না। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের সকলেই যাহাতে মাতৃভূমির ও সমগ্র মানবজাতির সেবা করার অধিকারী হইতে পারেন সেইজন্য প্রার্থনা করা উচিত।

আমরা আজ অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। অতীতের যাহা কিছু হীন আজ আমরা তাহাকে সমাধি দিব এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও দ্বেষ-হিংসা ভুলিয়া যাইব। আমরা যাহা কিছু লিখিব এবং বলিব তাহার ভিতর দিয়া যেন আমাদের সহিষ্ণুতাই পরিস্ফুট হয়। আমাদের হৃদয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত তাহার জন্য আমাদের মনে আসুক শক্তি ও অনির্বাণ উদ্যম। সহজ নৈরাশ্যবাদ সন্তোষ কিংবা কোনও দুর্বলতারও ভিতর দিয়া নহে—বরং ভারতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা রাখিয়াই যেন আমরা ভবিষ্যতের সম্মুখীন হই।

দেশের বিভিন্ন স্থানে লজ্জাকর ও অতি অধম হিংসামূলক কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের অবসান নিশ্চয়ই চাই। আমরা ইহা বন্ধ করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে কোনও কালেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হিংসামূলক কার্য গ্রহণ করা চলিবে না।

ভারতের এই বিরাট পরিবর্তনের প্রাক্কালে, স্বচ্ছ দৃষ্টি, দৃঢ় সংকল্প, পরমতসহিষ্ণুতা ও সবল হৃদয় লইয়া আমরা নূতন পথে যাত্রা করিব। আমরা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বোধ করিব না, প্রত্যেক ভারতবাসীকে আমাদের ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়াই মনে করিব। ৪০ কোটি ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনই হইবে আমাদের চরম লক্ষ্য। অতীতে ব্রিটিশের যে

আচরণ আমাদের হৃদয়কে আজও ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়া তাহার সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সহ-যোগিতার ভিত্তিতে নূতন সম্পর্ক স্থাপন করিব।

আমাদের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তেই বড়লাট এখানে আসিয়াছেন এবং তখন হইতে আজ পর্যন্ত তিনি যে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়।

আমাদের যখনই বিপদ ও বিঘ্ন সমুপস্থিত হইয়াছে তখনই মহাত্মা গান্ধী আসিয়া অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদের পথ দেখাইয়া আনিয়া আজ মুক্তির সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমরা আজ সেই মহান নেতাকে স্মরণ করিতেছি এবং তাঁহার প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পুনরায় নিবেদন করিতেছি। যে গুরুত্বপূর্ণ সময় আসিতেছে, তাহার মধ্যে আমরা যেন কখনও তাঁহার আশীর্বাদ ও সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত না হই। ভবিষ্যতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আমি আপনাদের নিকটে এই আবেদন জানাইতেছি যে, আমাদের সম্মুখে যে বিপুল কর্তব্যভার রহিয়াছে তাহার সম্পাদনে আপনারা সাহায্যদান করুন এবং সমস্ত ভারতবাসীর মুক্তির তীর্থে একসঙ্গে যাত্রা করুন।—জয় হিন্দ্‌

সর্দার বলদেব সিংহের বক্তৃতা

অন্তর্বর্তী সরকারের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংহ বলেন, আপনারা এইমাত্র বড়লাট এবং আমাদের দুই জন বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মিঃ জিন্নার বেতার-বক্তৃতা শুনিয়াছেন। যে রাজনৈতিক অচল অবস্থা এতাবৎকাল আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে তাহার অবসানের জন্য বৃটিশ গবর্মেণ্ট নূতন করিয়া যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাও আপনারা বেতার মারফত জানিতে পারিয়াছেন। আজিকার এই মুহূর্ত ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জাতীয় জীবনের দুঃস্বপ্ন ও দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত করিয়া আজ একটি নূতন অধ্যায় রচিত হইতে চলিয়াছে। গতকালও যাহা স্বপ্নের মত সুদূরপরাহত ছিল আজ তাহাই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আজ আমরা আমাদের স্বকীয় ঐতিহ্যের রাজপথে পুনরায় যাত্রা সুরু করিতে চলিয়াছি, আমাদের এই স্বাধীনতার ঐতিহ্যকেই আমরা এতকাল আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়া দাবি করিয়া আসিয়াছি তবু আজিকার দিনকে উজ্জ্বল ও আনন্দময় বলিয়া অভিনন্দিত করিলে সত্যের অপলাপই করা হইবে। আমরা সর্বাংশে খুশী হইয়াছি একথা বলিলেও মিথ্যা বলা হইবে। এমনিতর পরিণতিকে এমন ভাবে বেদনা-মলিন হইতে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। আমাদের সংগ্রাম সুদীর্ঘ ও গুরুভার হইলেও স্বাধীনতার জন্য আমাদের সকলের সম্মিলিত আত্মোৎসর্গ এমনি করিয়া আমাদের বিভক্ত এবং পরস্পরকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছে। দাঙ্গার করালছায়া আমাদের সকলের মনে বেদনার ছায়া সঞ্চার করিয়াছে। ভারতের বহু স্থানে আজও আমরা পারস্পরিক বিরোধ ও বীভৎসতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রতিবেশী আজ প্রতি-বেশীর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সহস্র সহস্র নিরপরাধ তাহাদের প্রাণ হারাইয়াছে। নর-নারী-শিশু গৃহহীন, আশ্রয়-হীন অবস্থায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছে। বহু অঞ্চলে অকথ্য আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আজ আমরা নিজেরা পরস্পর পরস্পরকে শত্রুর দৃষ্টি লইয়া প্রত্যক্ষ করি। কেন করি তাহার কারণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের সকলেরই দোষ আছে—সে দোষ অকপটে স্বীকার করিয়া লওয়াই উচিত। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নবতম পরিকল্পনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই পরিকল্পনা মীমাংসা নহে—আমার মতে ইহাকে সমাধান বলাই উচিত। ইহা সকলকে সন্তুষ্ট করে নাই—শিখদের তো নয়ই।

তথাপি আমাদের পরিশ্রম কতকটা সার্থক হইয়াছে বলা যায়। আমাদের মাতৃভূমি আজ যে হতাশার বিপাকে পড়িয়াছে, এই দিক দিয়া বিচার করিলে আমরা এই পরিকল্পনার মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পাইব। আমাদের জাতীয় জীবনে যে সকল কাজ অসমাপ্ত রহিয়াছে তাহা সমাপ্ত করিবার পথ খুঁজিয়া পাইব। আমরা নিজেদের যে ক্ষতি করিয়াছি তাহা পূরণের জন্যই নহে, বিশ্বের চক্ষে আমাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এ সকল কাজ আমাদের করিতে হইবে। সাম্প্র-কলহ ও আনুষঙ্গিক অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তিক্ত অতীতকে ভুলিয়া আমাদের মহান্ ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

আমার বিশ্বাস অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদের ঐক্য বিদ্যমান, তাহারই ফলে আজ আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও আমাদের মধ্যে এই কৃত্রিম বিচ্ছেদ বেশী দিন স্থায়ী হইবে না।

সর্দার বলদেব সিংহ আরও বলেন, গত কয়েক সপ্তাহে দেশের বিভিন্ন অংশে বিশ্বস্ত সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অসামরিক বিভাগগুলিকে তাহারা সাহায্য করিবে। দেশবাসী এই সৈন্যদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করুন ইহাই আমার কামনা।

নাবিক, সৈন্য ও বৈমানিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—দেশে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইতেছে তাহা আপনাদেরও প্রভাবান্বিত করিবে। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বহু পরি-বর্তনের সহিত আপনাদেরও স্বার্থ জড়িত আছে। আপনাদের অযথা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই।

আমি আপনাদের পরিপূর্ণ আশ্বাস দিতেছি যে, কোনক্রমেই আপনাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া হইবে না। দক্ষতা দ্বারা আপনারা সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায়

জন্য আজ আপনারা অপ্রিয় কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের মাতৃভূমি আজ সঙ্কটের মধ্য দিয়া যাইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের স্বদেশপ্রীতি ও একনিষ্ঠতা বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে আপনাদের ঠিক পথে চালিত করিবে। মনে রাখিবেন, মাতৃভূমির সম্মানের সহিত আপনাদের সুনাম জড়িত আছে। মাতৃভূমির আপৎকালে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করুন। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের সর্বপ্রকার সহায়তা করিব সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

সীমানা নির্ধারণ কমিশন

বঙ্গ-বিভাগের দাবি স্বীকৃত হইয়াছে। যে সব জেলায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইগুলি লইয়া নব বঙ্গ প্রদেশ অল্পদিনের মধ্যেই গঠিত হইবে। কিন্তু নূতন বাংলার এই আয়তন ও সীমানা সাময়িক মাত্র। একটি সীমানা-নির্দ্ধারণ কমিশন পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সীমারেখা কি হইবে তাহা স্থির করিবেন। সুতরাং এই কমিশনের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং কমিশনের সমক্ষে যাহাতে হিন্দুপ্রধান বাংলার সীমানা যথাযথ ভাবে নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয় তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিঙের সহিত বর্দ্ধমান বিভাগের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। দিনাজপুর, মালদহ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলি নূতন বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিলেই এই সংযোগ সাধিত হইবে। আপাততঃ সাময়িক ভাবে জেলা হিসাবে সীমানা নির্দিষ্ট হইলেও জেলাগুলিকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অংশে বিভক্ত করিবার পথে কোন বিঘ্ন নাই। বর্ত্তমান প্রদেশ ও জেলার সীমানা ইংরেজ শাসনের সৌকর্যার্থে ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল, উহা কোন পবিত্র এবং অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু নহে। সুতরাং বর্ত্তমানে জেলা, মহকুমা, থানা প্রভৃতির সীমায় আবদ্ধ থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই। হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া উহার সহিত সংলগ্ন হিন্দু-প্রধান অঞ্চলগুলিকে গ্রাম হিসাবে সংযুক্ত করিয়া নূতন বাংলার সীমানা স্থির করা যাইতে পারিবে। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলা হিসাবে হিন্দু প্রধান হইলেও উহার কয়েকটা অংশে মুসলমান সংখ্যা বেশী। উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে নূতন পূর্ব বাংলার সহিত উহাদের সংযোগ থাকিলে সেগুলিকে উহার সহিত যুক্ত করা যাইবে। বাংলার পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশনকে পশ্চিম-বাংলায় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনকে পূর্ব-বাংলায় দিয়া এবং রাজশাহী ডিভিশনের হিন্দু গরিষ্ঠ অংশ পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্বাংশ পূর্ববঙ্গে সংযুক্ত করিলে সহজে সীমানা নির্দ্ধারণ করা যায় এবং ইহাতে উভয় প্রদেশই প্রাকৃতিক সীমারেখা লাভ করে ইহা আমরা পূর্বে বলিয়াছিলাম। এই বন্দোবস্তে পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান হয়। সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন এই সমাধান যদি গ্রহণ না করেন তাহা হইলে বিকল্প হিসাবে আমাদের পক্ষে contiguous area পদ্ধতিতেও হিসাব লইয়া প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। তদনুসারে দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা ও চব্বিশ পরগণা জেলা ভাঙিবার প্রয়োজন হইবে।

এই হিসাবে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ইহাদের আধুনিক ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। এই দুইটি জেলাতেই ১৮৮১ সালের সেন্সাসে হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশী। ১৯০১ সালের সেন্সাসেও মালদহে হিন্দু সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে বেশী ছিল। ঐ সাল হইতে বাহিরের মুসলমান ঐ জেলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করায় তাহাদের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং ১৯৪১ সালের সেন্সাসে দেখা যায় মালদহে মুসলমানের অনুপাত শতকরা ৫৬·৭-এ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদেরও ঐ অবস্থা। ১৮৯১ সালেও এই জেলায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের চেয়ে বেশী ছিল। ১৯১১ সাল হইতে মুর্শিদাবাদে মুসলমানের অনুপাত সুস্পষ্ট ভাবে বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৪১ সালে এই অনুপাত শতকরা ৫৬·৭-এ পরিণত হইয়াছে।

দিনাজপুর ও মালদহের হিন্দু মুসলমান অঞ্চল পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যায় দুইটি জেলাতেই বিস্তীর্ণ হিন্দু এলাকার পশ্চিমে ছোট ছোট গুটি তিনেক বিচ্ছিন্ন মুসলমান এলাকা (pocket) রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্র এলাকার মুসলমান অধিবাসীরা নূতন বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইতে না চাহিলে নূতন পূর্ববঙ্গ ঢাকা প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে অনুরূপ হিন্দু 'পকেট' রহিয়াছে তাহার সহিত উহাদের অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্ততঃ এই কয়টি মুসলমান পকেটের জন্য ঐ সব জেলার বিস্তীর্ণ হিন্দু এলাকাকে কিছুতেই পাকিস্থানে ঠেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

সীমানা নির্ধারণ কমিশন শীঘ্রই গঠিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হইবে। বিলম্বের অবসর নাই।

বাংলার জনসংখ্যার মানচিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন এবং সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক মানচিত্রটি প্রকাশিত হয়। উহাতে দেখা যায় যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভাগ করিলে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর ও বরিশালের কতকগুলি অংশ এবং খুলনা, কলিকাতাসহ চব্বিশ পরগণা ও বর্দ্ধমান বিভাগ লইয়া একটি হিন্দুসংখ্যাগুরু প্রদেশ অনায়াসে গঠিত হইতে পারে। এই মানচিত্র অনুসারে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির সহিত বর্দ্ধমান বিভাগের পরিষ্কার যোগাযোগ রহিয়াছে।

মানচিত্রটি প্রকাশের পর উহার কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। সমালোচনায় বলা হইয়াছে যে, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া অমুসলমানদের সীমানির্দেশক যে করিডোর অঙ্কিত হইয়াছে তাহা ভ্রমাত্মক। এই সমালোচনার উত্তরে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় জানাইতেছেন যে, লোকগণনা সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই মানচিত্রটি যত্নসহকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস কোন সীমানা নির্ধারক কমিশন নিযুক্ত হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে উত্তর বঙ্গের একটি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল উত্তর বঙ্গকে পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংযুক্ত করিতেছে। পূর্ব পূর্ব বৎসরের লোকগণনার হিসাব দিয়া ডাঃ চট্টোপাধ্যায় দেখাইতেছেন যে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা দুইটি প্রথমে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল, পরে পূর্বেকার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা হইতে কয়েকটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানাসমূহ সৃষ্টি করা হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কারণ কি তাহা কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডাঃ চট্টোপাধ্যায় ইংরেজবাজার থানার একটি অঞ্চলকে লইয়া জোলাহাট থানা গঠনের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন শাসনসৌকর্যের জন্যও এই প্রকার খামখেয়ালী সীমাপরিবর্তন ভূগোল-বিজ্ঞান সমর্থন করে না। নাচেলি থানায় হিন্দু অধিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের মানচিত্রে উহা ঐ ভাবে দেখানো হয় নাই। ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বাংলা বিভাগের আন্দোলনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া মানচিত্রটি প্রস্তুত করা হয় নাই। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহা অঙ্কিত হইয়াছে। মালদহ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের তিনটি অঞ্চলকে সমান ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই অঞ্চলের জনসংখ্যার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা	মুসলমান
প্রথম গ্রুপ			
হরিশপুর			
গোমস্তাপুর	২৭৬	১,১১,৩০২	৪২,৬৯৪
দ্বিতীয় গ্রুপ			
মালদহ			
ইংরেজবাজার			
জোলাহাট	২৩৩	১,৪০,৩৮৩	৬৫,৪৯০
তৃতীয় গ্রুপ			
নবাবগঞ্জ			
নাচেলি	২৫৯	১,৫৭,২৮৩	১,১১,০৭৪

এইজন্যই গোমস্তাপুর ও জোলাহাটকে হিন্দু বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং নাচেলি মুসলমান বাংলার অংশ হিসাবে গণ্য হইয়াছে। নবাবগঞ্জ থানায় হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা সমান নহে। এইজন্য মহানন্দা নদীকেই সীমারেখা হিসাবে ধরা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরের যে অংশ হইতে অতিক্রম করিয়া মালদহে পদার্পণ করা যায় সেই অংশ সম্বন্ধে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন যে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত রঘুনাথগঞ্জ থানা হিন্দুপ্রধান। এইজন্য ভাগীরথীকে সীমারেখা রূপে ধরা হইয়াছে।

বাংলায় মুসলমান গরিষ্ঠতা প্রকৃতির বিধান নয়

প্রধান মন্ত্রী মিঃ শহীদ সুরাবর্দীর মুখপত্র 'ইত্তেহাদ' লিখিয়াছেন, "বাংলা মুসলিম প্রধান দেশ। ইহা প্রকৃতির বিধান। কিন্তু প্রকৃতির বিধান হইলেও যেহেতু ইহা মুসলমান প্রধান দেশ, সেই হেতু ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" বাংলাদেশ সম্বন্ধে এই অপূর্ব গবেষণার সহিত ঐতিহাসিক সত্যের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশে মুসলিম প্রাধান্য প্রকৃতির বিধান নয়। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ এবং নারীহরণের প্রশ্রয় দান ইহার প্রধান কারণ। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ইহা অনেকটা চাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি কিছু কিছু সত্য তাঁহাদের রচনা হইতেও পাওয়া যায়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রচিত রিপোর্ট এবং প্রবন্ধ প্রভৃতিতেও এরূপ তথ্য অনেক আছে। 'ইত্তেহাদে'র ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে দৈনিক 'ভারত'-এ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ অনেকটা বুঝা যাইবে এবং সমগ্র বাংলা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইলে কি ঘটিবে তাহারও আভাস মিলিবে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী এই আক্রমণের কতকটা প্রত্যুত্তর দিতে পারিয়াছে কিন্তু কলিকাতা ও নোয়াখালীর ঘটনায় ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে তাহার উপায় আর থাকিবে না।

বিভার্লি এবং গেইট দুই জনেই দেখাইয়াছেন যে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে পাঠান-মোগলদের বংশধর সামান্য কিছু আছে বটে, তবে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর হিন্দু হইতে ধর্মান্তরিত হইয়াছে; বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে আরবীয়ের সংখ্যা অতিশয় নগণ্য। মৌলবী আবু গজনবী ময়মনসিংহের মুসলমানদের ইতিহাস লিখিয়াছেন। "বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই পাঠান-মোগলের বংশধর" খোন্দকার ফজলে রব্বির ন্যায় গজনবী সাহেবও এই মতে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁহার বিবরণীতে ইহা প্রমাণ করিতে না পারিয়া তিনি স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন যে, ময়মনসিংহের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মান্তরিত স্থানীয় হিন্দু।

ব্রায়ান হজসন, বুকানন হ্যামিলটন, ডাঃ ওয়াইজ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষীরা বাংলার বিভিন্ন স্থান পর্যটন ও পর্যবেক্ষণ করিয়া একবাক্যে এই কথাই বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ মুসলমান ধর্মান্তরিত স্থানীয় লোক। রিজলি, গেইট প্রভৃতি বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিকেরাও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ডাঃ ওয়াইজ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত তাঁহার

প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, বাহির হইতে বহুসংখ্যক মুসলমান বাংলায় বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছে এমন কথা কোন মুসলমান ঐতিহাসিকও লিখিয়া যান নাই। বাংলার মুসলমান আমলের একটি প্রামাণ্য ইতিহাস রিয়াজ-উস-সালাতিনেও এমন কোন কথা নাই। বরং মুসলমানের লেখা ইতিহাসে আমরা এই কথাই দেখিতে পাই যে, ভারতসম্রাটেরা বাংলায় কোন মুসলমান সেনাপতি বা সেনাদলকে পাঠাইতে চাহিলে তাহারা ঐ আদেশকে মৃত্যুদণ্ডতুল্য মনে করিত। তাহাদিগকে বাংলায় বসবাস করাইবার আশায় নবাবেরা নিষ্কর ভূমি দেওয়ার লোভ দেখাইয়াও তাহাদের আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই।

মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির সর্বপ্রধান কারণ বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। বাংলায় ব্যাপকভাবে বলপূর্বক মুসলমান করিবার অনেকগুলি প্রয়াসের বিবরণ পাওয়া যায়—তন্মধ্যে তিনটি সর্বপ্রধান: প্রথম, সুলতান জালালুদ্দীন, দ্বিতীয় যশোহরের খাঁ জাহান আলি এবং তৃতীয় মুর্শিদকুলী খাঁ। এই তিন জনই আবার ধর্মান্তরিত হিন্দু—জালালুদ্দীন রাজা গণেশের পুত্র যদু এবং অপর দুই জন ব্রাহ্মণ সন্তান। জালালুদ্দীনের ১৭ বৎসরের শাসনকালে যত হিন্দু মুসলমান হইয়াছে, পরবর্তী তিন শত বৎসরে তত হয় নাই। যশোহরের খাঁ জাহান আলি অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন। ইঁহারই দেওয়ান ছিলেন পীর আলি, যিনি গোমাংস রান্নার গন্ধ শুঁকাইয়া ব্রাহ্মণদের মুসলমান করিতেন। পরাজিত বাঙালী রাজাদের ধরিয়া মুসলমান করা হইত। আকবরের আক্রমণে গঙ্গাপুরের রাজা পরাজিত হইয়া মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহার রাজ্য রক্ষা পায়। তদবধি এই অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা বাড়িতে থাকে। চট্টগ্রামের আদাম আলি খাঁর পরিবার নোয়াপাড়ার রায়চৌধুরী পরিবারের বংশধর। শ্রীহট্টে শাহজালাল এবং পূর্ববঙ্গে আদম শহীদ ও কারফরমা সাহেবও বড় কম হিন্দুকে মুসলমান করেন নাই। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে নিয়ম ছিল যে কোন লোক যথাসময়ে খাজনা দিতে অপারগ হইলে তাহাকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে হইত। বরিশালে মগদের উপদ্রবে বহু লোক মুসলমান হইয়াছে। আরামবাগের খানাকুল থানায় ইসমাইল শাহ গাজী স্থানীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত লোককে মুসলমান করে।

বলপ্রয়োগ ছাড়া আর কোন্ কোন্ কারণে লোকে মুসলমান হইয়াছে সে সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ইহার জন্য অনেকটা দায়ী এ কথা অনেকেই বলিয়াছেন। হিন্দুসমাজ বর্জনই করিয়া আসিয়াছে, গ্রহণের চেষ্টা বড় একটা করে নাই। একমাত্র শ্রীচৈতন্য সমাজত্যক্ত এবং মুসলমান ধর্মাশ্রিত হিন্দুকে স্বধর্মে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য কারণও অনেক আছে। বার্নিয়ার লিখিতেছেন যে, মুসলমান শাসনকালে নরহত্যা অথবা নারীঘটিত অপরাধের শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভের একটি উপায় ছিল মুসলমান ধর্ম গ্রহণ এবং এই কারণে বহু হিন্দু মুসলমান হইয়াছে। গেইট লিখিতেছেন যে, কখনও কখনও মোল্লারা বুঝাইয়া-সুঝাইয়া দুই-একটি লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশই মুসলমান হয় পার্থিব লোভের বশে, বিশেষতঃ নারীঘটিত কারণে। জেলায় জেলায় পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গেইট উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। চব্বিশ পরগণা জেলার ধর্মান্তরকরণের ৪০টি দৃষ্টান্ত লইয়া তিনি দেখাইয়াছেন উহাদের মধ্যে ২৬টি প্রেমঘটিত, তন্মধ্যে ২০টি হিন্দু স্ত্রীলোক এবং ৯টির কারণ অর্থাভাব।

নিম্নশ্রেণীর মুসলমান পদস্থ হয় কেমন করিয়া তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। গেইট সাহেব লিখিতেছেন যে, ধর্মান্তরকরণের পর হয়ত একজনের নাম হইল মেহের উল্লা। কিছুদিন বাদে সে মেহেরউদ্দিন বলিয়া পরিচয় দিতে সুরু করিল। তারপর সে হইল মেহেরউদ্দীন মহম্মদ। আরও কিছুদিন পর নিজের নাম রাখিল মহম্মদ মেহেরউদ্দীন। যথাকালে আগে মৌলবী ও পাছে আহমদ লাগাইয়া বনিয়া গেল মৌলবী মহম্মদ মেহেরউদ্দীন আহমদ। এ বিষয়ে একটি প্রবাদবাক্যও গেইট সাহেব তুলিয়া দিয়াছেন—

আগে থাকে উল্লা তুল্লা
শেষে হয় উদ্দীন।
তলের মামুদ উপরে যায়
কপাল ফেরে যদ্দিন।

একটি ফার্সী প্রবাদবাক্যও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে

শেখ বুদাম সাল-এ-আওয়াল
খাঁ শুদাম সাল-এ-দিগর।
গোহ্ পর আরজান শওয়াদ
ইমসাল সৈয়দ মি শওয়াম।

অর্থাৎ—প্রথম বছরে ছিনু আমি শেখ, পর বৎসর হইনু খাঁ, সস্তা ফসল পাইলে এবার সৈয়দ না হয়ে ছাড়িব না।

বঙ্গ-বিভাগ সমর্থনে হরিজন আন্দোলন

অনুন্নত সমাজের লোকেরা বঙ্গ-বিভাগের বিরোধী এই ধারণা প্রচার করিবার জন্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কোন কোন স্থানে তিনি সভা করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু লোক আসে নাই। বিরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হইয়াছে। অপরপক্ষে এই সমাজের লোকেরা বহু সভা-সমিতিতে প্রস্তাব পাস করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সকলেই বঙ্গ-বিভাগ কামনা করেন এবং ইহার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেও তাঁহারা প্রস্তুত। গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুন্নত জাতি সম্মেলনের একটি বিরাট অনুষ্ঠান হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম এবং সভাপতির

করেন শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস। এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বঙ্গ-বিভাগ দাবি করা হয় এবং এই দাবির পিছনে অনুন্নত সমাজের সমর্থন নাই বলিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মণ্ডল যে প্রচার করিতেছেন তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস বলেন, "বাংলাকে সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য, জাতীয়তাবাদকে রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহাতে বাংলাদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায় তাহার জন্য এবং সকলের ধনপ্রাণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আজ জাতীয়তাবাদী বাঙালীরা বর্তমান বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া একটি নূতন পৃথক বাংলাদেশ সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। বাংলার পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি হইলে নূতন প্রদেশের শাসনযন্ত্র জাতীয়তাবাদিগণের হাতে আসিবে এবং দেশের প্রগতিশীল অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রভাব নূতন প্রদেশের শাসনকার্যে পূর্ণভাবে বর্তমান থাকিবে। কংগ্রেস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে, হিন্দু-মুসলমান তথাকথিত উন্নত, অনুন্নত সম্প্রদায়, খৃষ্টান, শিখ প্রভৃতি সকলেরই সমান মর্যাদা পাইবার অধিকার রহিয়াছে। প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশে যিনি বাস করিবেন তিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তিনি স্থির বিশ্বাস রাখিতে পারেন যে তাঁহার রাজনৈতিক, আর্থিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার স্বাধীনতাই অব্যাহত থাকিবে। মুসলিম লীগের শাসনাধীনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের স্বার্থ যে পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই তুলনায় কংগ্রেসের নিকট অনুরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। এতদ্ব্যতীত অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি কংগ্রেস কিরূপ মনোভাব পোষণ করে তাহার প্রকাশ গণ-পরিষদে গৃহীত মৌলিক অধিকার বিষয়ক প্রস্তাবে দেখা গিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে স্বাধীন ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পৃথক জাতীয়তাবাদী প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া নিখিল-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারিলেই তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকতর সুবিধা হইবে।" অতঃপর বিরুদ্ধ প্রচারকারীদের লক্ষ্য করিয়া সভাপতি বলেন, "অনুন্নত জাতির মধ্যেও কয়েকজন বিভীষণ আছেন। মুসলিম লীগের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহারা অনুন্নত জাতির ক্ষতিসাধন করিতেছেন। স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থবশেই তাঁহারা এরূপ দেশদ্রোহিতা করিতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা বাংলাদেশ নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্র হইতে পৃথক হইয়া থাকুক। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই দলের অগ্রণী। ইঁহারা মুসলিম লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হইতেছেন এবং স্বভাবতঃই মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছেন। মণ্ডল মহাশয় মুসলিম লীগের কল্যাণে ভারত-সরকারের আইন সচিব হইয়াছেন এবং এই কারণেই মুসলীম লীগের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। অনুন্নত জাতির প্রতি মুসলিম লীগের দরদ কিরূপ তাহা আর কাহারও অবিদিত না থাকিলেও ইঁহারা কিরূপে লীগের হইয়া ওকালতি করিতেছেন তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। পৃথক জাতীয়তাবাদী বাংলা সৃষ্টির সপক্ষে জনমত প্রবল হইতে দেখিয়া মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং মণ্ডল মহাশয়কে অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর প্রচার কার্যে লিপ্ত হইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কিভাবে সভা করিতেছেন তাহার বিবরণ দিয়া সভাপতি বলিতেছেন, "যোগেন বাবুকে দিয়া সভা করাইয়া লীগওয়ালারা বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, অনুন্নত হিন্দুরা কেহই বাংলায় পৃথক প্রদেশ চাহেন না, তাঁহারা মুসলিম লীগের সহিত একযোগে লীগের শাসনাধীনেই থাকিতে চান। আমরা জানি কিভাবে যোগেনবাবু সভা করিয়া বেড়াইতেছেন। সভার পূর্বে প্রচার করা হইতেছে যে, সভাক্ষেত্রে বিনামূল্যে কাপড় বিতরণ করা হইবে, অনুন্নত জাতির যে সব লোক সভায় উপস্থিত হইবেন তাঁহারা বিনামূল্যে একখানি করিয়া কাপড় পাইবেন। জানি না, অনুন্নত সমাজের লোকেরা এরূপ সভায় যোগদান করিয়া বিনামূল্যে কাপড় পান কি না। তবে এই রকম ভাবেই সভা আহ্বান করা হয়। তাহা সত্ত্বেও এসব সভায় অনুন্নত জাতির ভাইয়েরা যোগদান করেন না। সভায় বেশীর ভাগ লীগসমর্থক মুসলমান এবং মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা আসেন।"

অভিভাষণের শেষে শ্রীযুক্ত দাস দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "অনুন্নত জাতির ভাইয়েরা যে বাংলা ভাগ চাহেন না তাহা সর্বৈব মিথ্যা। আজ যদি নোয়াখালীর নমঃশূদ্র ভাইদিগকে বলা হয় যে তাহারা পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসুক তাহাদের জন্য পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের পৃথক প্রদেশের সরকার হইতে বাসস্থান ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে আমি অতিশয় দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি যে, যোগেন বাবু তাঁহার জাতি-ভ্রাতাদিগের মধ্যে একটিকেও নোয়াখালীতে আটকাইয়া রাখিতে অর্থাৎ মুসলিম লীগের শাসনাধীনে বা লীগের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিতে পারিবেন না। আজ যদি বাংলা বিভাগ দরকার হইয়া থাকে তবে বিশেষ ভাবে অনুন্নত হিন্দুদিগের জন্যই ইহা দরকার। অনেকে বলেন যে, ইহাতে অনুন্নত হিন্দুদেরই বেশী অসুবিধা হইবে। তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে ; তাহারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। একান্তই যদি পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ অপরিহার্য হইয়া উঠে তবে তাহারা তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়িয়া আসিতে পারিবে না, তাহাদিগকে পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থানে থাকিয়া যাইতে হইবে এবং তাহা হইলে তাহাদের আর কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই কথা বলিয়া অনুন্নত ভাইদিগকে পৃথক প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে

ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু আমি বলি যে, পৃথক প্রদেশ হইলে যদি দেখা যায় যে, হিন্দুরা কোন উপায়ে পূর্ববঙ্গে বসবাস করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে অনুন্নত হিন্দুরা সকলের আগেই পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া আসিতে পারিবে। পৃথক জাতীয়তাবাদী বাংলা থাকিলে তবেই ইহা সম্ভব হইবে। তাহাদের ঘরবাড়ী বলিতে আছে ছোট ছোট কুঁড়েঘর, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে তাহাদের বিশেষ মায়া বা অসুবিধা হইবে না যতটা হইবে অন্যান্য লোক-দিগের। সকল দিক বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে পৃথক প্রদেশ সৃষ্টির দ্বারা অনুন্নত জাতিদিগের সর্ববিধ মঙ্গল হইবে।"

জলপাইগুড়ি উত্তর বঙ্গ সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্মণও অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন যে বাংলা বিভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও হরিজনদের স্বার্থ কোন মতেই উপেক্ষিত হইবে না। শ্রীযুক্ত ঠাকুর বাংলার মানচিত্র ও সেন্সাস রিপোর্টের সাহায্যে গান্ধীজীকে ইহাই বুঝান যে প্রস্তাবিত হিন্দু বাংলার ফরিদপুর জেলার হরিজন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা গোপালগঞ্জ মহকুমা ও মাদারীপুর মহকুমার রাজৈর থানা এবং বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া পর্যন্ত তৎসংশ্লিষ্ট এলাকা যুক্ত করিবার দাবি জানান। হাইমচরে হরিজনদের যে দুর্দশা হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত এলাকা-সমূহের হরিজনগণ পাকিস্থানী বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুবরণও শ্রেয় মনে করিবে শ্রীযুক্ত ঠাকুর গান্ধীজীর নিকট ইহা ব্যক্ত করেন। বাংলার হরিজনেরা আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ঠিক পথই বাছিয়া লইয়াছেন, বঙ্গ-বিভাগের প্রশ্নের সহিত তাঁহাদেরও ভবিষ্যৎ যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ইহা তাঁহারা উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদী তপশীলী এসোসিয়েশনের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ সরকার এম-এল-এ এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সরকার এম-এল-এ এক বিবৃতিতে জানাইয়া দিয়াছেন যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা এবং গণপরিষদের তপশীলভুক্ত সদস্য-দের প্রায় সকলেই একযোগে বড়লাটের নিকট বঙ্গ-বিভাগ দাবি করিয়াছেন এবং সমগ্র বাংলাকে পাকিস্থানে পরিণত করার চেষ্টাকে তাঁহারা সর্বতোভাবে বাধা দিবেন।

আসামের জমি বে-দখলের চেষ্টা

আসামের বহিরাগত সমস্যা ক্রমশঃ পাকিস্থানী অভিযানে রূপান্তরিত হইয়াছে। ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি জেলা হইতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান আসামে প্রবেশ করিয়া সরকারী খাস জমি গায়ের জোরে অধিকার করিয়া উহাতে চাষবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সমস্ত জমির মধ্যে বহু গোচারণ-ভূমিও ছিল। বহিরাগত লোকেরা জোর করিয়া জমি দখল করিলে এক দিকে যেমন আইন ভঙ্গ হইত, অপর দিকে এই কার্যের দ্বারা স্থানীয় লোকদের প্রচুর অসুবিধাও সৃষ্টি করা হইত। আইনভঙ্গকারী বহিরাগত লোকেরা অনধিকার-প্রবেশ ও সরকারী সম্পত্তি বে-দখলের অপরাধে শাস্তি পাইত না বলিয়া উহারা ক্রমশঃ বেপরোয়া হইয়া উঠে এবং স্থানীয় লোকদের উপদ্রবের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই উৎপাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য আসামবাসীদের প্রার্থনা ব্যর্থ হইলে উহা ক্রমে আন্দোলনের আকার ধারণ করে এবং বরদলই মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর তাঁহারা অনধিকার-প্রবেশকারি-গণকে সরকারী জমি হইতে উচ্ছেদ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। অনধিকার-প্রবেশকারীদের প্রতি আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বনের পর লীগ ইহাকে নানাবিধ অত্যাচার ও অবিচারমূলক বিশেষণে ভূষিত করিয়া সরকারী জমি বলপূর্বক অধিকার করিবার জন্য বহিরাগতগণকে উত্তেজিত করিতে থাকে। ইহা হইতেই লীগের আসাম অভিযান আরম্ভ হয় এবং পূর্ব পাকিস্থান কিম্বা হইতে এই অভিযান পরিচালনার আয়োজন হয়। সার আকবর হায়দারী আসামের গবর্ণরপদে নিযুক্ত হওয়ার পর আসাম অভিযান সম্পর্কে স্থানীয় লোকেরা শঙ্কান্বিত হইয়াছিল ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ইহার কারণও আছে। পাকিস্থানী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হওয়ার পর হইতে নিরপেক্ষ ও উদার মনোভাব লইয়া দশের ও দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করেন এরূপ মুসলমান কর্মচারী প্রায় দেখা যায় নাই বলিলেই চলে। শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চ-তম পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান কর্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক-তার বিষ যে কিরূপ ভয়াবহভাবে সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার প্রচুর নিদর্শন পদে পদে মিলিয়াছে। ক্ষমতাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত মুসলমান কর্মচারীরা অমুসলমানদের বিশ্বাস অর্জন ও রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা তো করেনই নাই, বরং তাঁহাদের কার্য-কলাপে উহা শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে বিলীয়মান হইতে দেখিয়াও তাঁহারা সংযত হন নাই। এই অবস্থায় সার আকবর হায়দারী সম্পর্কে আগে হইতেই লোকের মনে বিরূপ ধারণা সঞ্চার হওয়া আশ্চর্য নহে। সুখের বিষয় সার আকবর সম্বন্ধে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

গৌহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সার আকবর হায়দারী আসামের ভূমি সমস্যা আলোচনা করিয়া বলেন যে, প্রদেশের সমস্ত জমির গবর্ণমেন্টের খাসে। কাজেই কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষ গবর্ণমেন্টের বিনানুমতিতে সরকারী জমি দখল করিয়া উহাতে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। এরূপ কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি তাহাদের নাই। বরদলই গবর্ণমেন্টের দৃঢ়তার ফলে আসামের লীগ অভিযান মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। গবর্ণর বহিরাগত সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি এবং প্রকাশ্যে উহা স্বীকার করায় মন্ত্রিমণ্ডলের কাজ আরও সহজ হইয়া আসিবে।

শিক্ষকের বেতন

শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি নিদারুণ কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিখিলবঙ্গ-শিক্ষক সমিতি কর্ত্তৃক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত সমিতির কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী যুদ্ধের কয় বৎসরে বাংলাদেশের শিক্ষকদের যে ভয়াবহ দুর্দশা হইয়াছে বিশেষ-ভাবে তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে শিক্ষাবিভাগে লীগ গবর্ণমেণ্টের অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতার অত্যাচার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও সমাজের অবজ্ঞাসম্ভূত অবিচারের ফলে বাংলায় শিক্ষা ও শিক্ষকেরা আজ প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, ইদানীং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালীর ছেলেরা আশানুরূপ ফল দেখাইতে পারিতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলায় শিক্ষকদের অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুরবস্থাই শিক্ষাবিষয়ে এই অধোগতির প্রধানতম কারণ। অধিকাংশ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের মাসিক বেতন সত্তর টাকা এবং সাধারণ গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতির দিনে এই সামান্য বেতনে সংসার প্রতি-পালনের দুর্ভোগ সহজেই অনুমেয়। আজ একজন পিয়নকে মাগ্‌গি ভাতা সমেত পঞ্চাশ টাকা বেতন দিতে হয়। কিন্তু যাঁহারা জাতির স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, বাংলা-সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা বাংলার সমাজ কেহই সেই শিক্ষকদিগের প্রতি অবিচারের প্রতিবিধানের জন্য আগাইয়া আসেন নাই। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যের স্বল্পতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাংলায় প্রায় ২ হাজার বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪৫টি বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থসাহায্য পাইয়া থাকে। আগামী বৎসরের বাজেটে মুসলমানদের শিক্ষার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের এই পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষাবিষয়ে নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত গোস্বামী বলেন যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে বাংলায় শিক্ষা যখন সঙ্কটের অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ শুধু নীরব দর্শকের ন্যায় হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন। শিক্ষকদের পক্ষ হইতে অনেক আবেদন-নিবেদনের ফলে গত বৎসর বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলর শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মফঃস্বলে একজন সাধারণ শিক্ষক ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সর্বনিম্ন মাসিক বেতন যথাক্রমে ষাট টাকা ও সত্তর টাকা হইবে। কলিকাতায় একজন শিক্ষকের সর্বনিম্ন বেতন হইবে আশী টাকা। কলিকাতায় যে সকল স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা দুই শত পঞ্চাশের কম, দুই শত পঞ্চাশ অথবা দুই শত পঞ্চাশের অধিক হইবে, সেই হিসাবে প্রধান শিক্ষকদের যথাক্রমে এক শত, এক শত পঁচিশ ও দেড় শত টাকা মাসিক বেতন হইবে।

পাকিস্থানী বাংলায় শিক্ষকদের এই ন্যায়সঙ্গত অনুরোধ রক্ষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাঙালীর বাংলায় সে সুযোগ আসিবে।

পে কমিশনের রিপোর্ট

পে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশগুলি ভারত-সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। রিপোর্ট আশানুরূপ না হইলেও উহার ফলে নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর কর্মীরাই যে বেশী উপকৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমিশনের সুপারিশ মানিয়া লওয়ার উদ্দেশ্য হইতেছে অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মচারীদের ন্যূনতম ও উচ্চতম বেতনের মধ্যে যে তারতম্য রহিয়াছে তাহা কতকটা কমাইয়া আনা। সরকার মনে করেন যে এই রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইলে চাকুরীক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ অনেক সহজ হইবে যদিও দেশবাসীর ইহাতে সন্দেহ আছে।

কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে একটি বেতার-বক্তৃতায় ভারত-সরকারের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ বলেন :—

আপনারা বেতন-কমিশনের সুপারিশ পড়িয়াছেন। যুদ্ধের সময় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির ফলে সরকারী কর্মচারীদের যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। সরকার তাহা সাময়িকভাবে পূরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুদ্ধের পরও অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই এবং আশঙ্কা করা যায় যে, এই অবস্থা আরও অনেক দিন থাকিবে। সুতরাং সরকার এই বিষয়ে একটি পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া সরকারী কর্মচারীদের কতকটা সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে বেতন-কমিশনে এমন সব লোককে নেওয়া হয় যাঁহারা শ্রমিক স্বার্থের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন।

কমিশন এক বৎসরেরও উপর ধরিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কমিশনের সদস্যগণ তদন্তের পর একটি বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া-ছেন যে, দেশের বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়াই কেবল সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। যে সব স্থানে অর্থনৈতিক চাপ বেশী, সে সব স্থানে প্রয়োজনানুরূপ ভাতার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং বেতন-কমিশন এইভাবে তাঁহাদের সুপারিশ পেশ করিয়াছেন :— (১) অতি স্বাভাবিক অবস্থায় অথচ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করিতে হইলে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন কর্মীর ভাতাসহ বেতন ৫৫৲ টাকার কম হওয়া উচিত নয়। সেই কারণেই ম্যাট্রিকুলেট ও সমশ্রেণীর কর্মীদের ন্যূনতম বেতন হওয়া উচিত ৯০ টাকা। (২) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কর্মচারীদের শ্রেণীবিভাগ-হিসাবে একই বেতন হওয়া উচিত। বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রদেশে যে বিভিন্ন হারের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহা বাতিল করা দরকার। যে সব শহরে খরচখরচা বেশী, সেই

সব শহরের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ভাতা ও গাড়ীভাড়া ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৩) বর্তমানে মূল বেতন ও ভাতার বৃদ্ধি করিতে হইবে। জীবনধারণের মান বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) উচ্চ বেতনভোগীদের ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাগুলি ধীরে ধীরে কমাইয়া একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে, কারণ তাঁহারা যে বেতন পান তাহাতেই তাঁহাদের কুলাইয়া যাওয়ার কথা। (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে ইমফিরিয়ার, মিনিয়েল ও সাবরডিনেট হিসাবে শ্রেণী বিভাগ প্রথা তুলিয়া দিয়া প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হিসাবে ভাগ করিতে হইবে।

সরকার এই সুপারিশগুলি মানিয়া লইয়াছেন এবং ছুটি, পেন্সন, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করিতেছেন ও এসম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সরকারী সিদ্ধান্তের ফলাফল হইতে আপনারা জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা প্রত্যক্ষভাবে নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীর কর্মীদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকার নিম্নবেতনভুকদের বেতন বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের ন্যূনতম ও উচ্চতম বেতনের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে তাহা কমাইয়া আনার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে ভারত-সরকারের অতিরিক্ত ৩৮ কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয় হইবে। এই ব্যয় বৃদ্ধিতে আমাদের উপর যে চাপ পড়িবে কয়েকটি সর্ত পূর্ণ করা হইলেই আমরা তাহা বহন করিতে সমর্থ হইব। সর্তগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে আন্তরিকতা, প্রত্যেক কর্মী যদি তাহার প্রাপ্য বেতনের মর্যাদা দিয়া আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়া যায় তবেই তাহার সম্মান তথা দেশের সম্মান ও কল্যাণ রক্ষা পাকে। অর্থনীতির প্রথম পাঠ এই যে, কেবল অর্থ ছড়াইয়া দিলেই দেশের সমৃদ্ধি হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধির উপরই দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। প্রয়োজনানুরূপ অর্থই শ্রমিকদের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট করিবে এবং যাঁহারা তাহাদের উপযুক্ত বেতন দিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত কাজ আশা করিবেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের শ্রমিকদের উৎপাদন-ক্ষমতা অনেক কম। আমরা প্রমাণ করিব যে, ভারতীয় শ্রমিকেরাও অন্যান্য দেশের সঙ্গে উৎপাদনক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

কমিশনের রিপোর্ট সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য হয় নাই সত্য, তবে উহার সুপারিশগুলি গৃহীত হওয়ায় অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের অনেকটা সুবিধা হইবে। কমিশনের রিপোর্ট প্রধানতঃ যে রেল ও ডাক বিভাগের কর্মচারীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রচিত তাঁহারা উহাতে সন্তুষ্ট হন নাই ইহা দুঃখের বিষয়। রেল ও ডাক বিভাগের কর্মচারীদের কাযে ও আচরণে দেশের লোকের অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। ইঁহারা আপনাদিগকে একটি স্বতন্ত্র বিশেষ শ্রেণীভুক্ত এবং জনসাধারণের বহির্ভূত একটি সম্প্রদায়বিশেষরূপে বর্তমানে যে ভাবে ভাবিয়া থাকেন তাহা দূর হওয়া তাঁহাদের এবং জাতির উভয়ের পক্ষেই কল্যাণজনক হইবে। সরকারী চাকুরীকে জাতির প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষেত্র বলিয়া ভাবিতে শিখিলে এবং সেই ভাবে আচরণ করিলে জাতিও কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিবে না। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিজস্ব প্রয়োজনে ভারতবর্ষে উচ্চ নীচ এবং ইংরেজ ও ভারতীয়দের বেতন নির্ধারণে যে বৈষম্য অনুসৃত হইয়াছিল স্বাধীন ভারতে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রমিকদের জন্য আলাদা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী এবং পৃথক নির্বাচনের যে ব্যবস্থা বিলাতী ভারতশাসন আইনে করা হইয়াছিল তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া শ্রমিক ও কর্মচারীরা আপনাদিগকে বৃহত্তর জনগণের সহিত এক করিয়া দেখিতে না শিখিলে তাঁহাদেরও উন্নতি ব্যাহত হইতে থাকিবে।

ভারতবর্ষে পুনরায় খাদ্যসঙ্কটের সম্ভাবনা

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, এ বৎসর ভারতবর্ষে মোট ৪৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাটতি পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। তবে তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রচলিত বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে না। ভারত সরকার আশা করেন যে, যে পরিমাণ খাদ্যশস্য দেশ হইতে পাওয়া যাইতে পারে তাহা সংগ্রহ ও বণ্টনের সুবন্দোবস্ত, অপচয় নিবারণ এবং বিদেশ হইতে কম্প্রম আমদানীর দ্বারা এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ১৯৪৫-৪৬ সালের তুলনায় বর্তমান বৎসরে চাউলের উৎপাদন সামান্য কিছু বেশী হইয়াছে। গত বৎসরে ২,৬৩,৫৪,০০০ টন ও বর্তমান বৎসরে ২,৭২,৮৬,০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। যদিও চাউলের উৎপাদন কিছু বেশী হইয়াছে, তথাপি চাউলে বরাবরই আমাদের কতকটা ঘাটতি হইয়াছে এবং উৎপাদন স্বাভাবিক হইলেও এই ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। যুদ্ধের পূর্বে ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইত। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে এ যাবৎ আর আমদানী আরম্ভ হয় নাই। গমের বেলায় বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের উৎপন্ন গমের তুলনায় ৯ লক্ষ টন ও গত পাঁচ বৎসরের গড় উৎপাদনের তুলনায় ২০ লক্ষ টন কম পাওয়া গিয়াছে। গম ও জোয়ারে মিলিয়া মোটামুটি ৩০ লক্ষ টন কম পড়িবে। ইহার সহিত সাধারণতঃ চাউলে আমাদের যে ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি হয়, তাহা যোগ করিলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি মোট ৪৫ লক্ষ টনের মত দাঁড়ায়।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, এই হিসাবের সময় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হইত, এখনও তাহাই হইবে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ ইহার পরিমাণ বাড়িবে না।

১৯৪৫-৪৬ সালে বর্ষার পূর্বে, বর্ষার সময় ও শীতকালে বারিপাতের অভাবে প্রচুর শস্যহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। এজন্য গবর্মেণ্ট ও জনসাধারণ প্রচুর ঘাটতির আশঙ্কা করিয়াছিল, এমন কি ঘাটতি যে হইবে তাহা তাহারা একরূপ ধরিয়াই

লইয়াছিল, কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে বর্ষায় ও শীতকালে বারিপাত মোটামুটি স্বাভাবিক হইয়াছে। দেশের সর্বস্থানেই চাউলের ফলন আশানুযায়ী ভাল হইয়াছে। রবিশস্যও বেশ ভালই হইবে আশা হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা রোগ দেখা দেওয়ায় বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে গম নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ হইতে এই ধরণের রোগের প্রথম সংবাদ পাওয়া যায়। যুক্ত প্রদেশের কোন কোন জেলায় এই ধরণের ব্যাপারের সংবাদ পাওয়া যায় মার্চ মাসের শেষভাগে ও এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে। কেহ যে সংবাদ দিতে দেরি করিয়াছিল তাহা নহে। রোগটাই ইহার পূর্বে দেখা দেয় নাই। রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া শস্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। চাউলের উৎপাদন ভালই হইয়াছিল, বৃষ্টিও ভালই হইবে আশা করা যাইতেছিল। যখন কিঞ্চিৎ সুরাহা হইবে বলিয়া মনে হইতেছিল, তখনই হঠাৎ এই ক্ষতি হইল।

এই বিপুল ঘাটতি মিটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ঘাটতি অঞ্চলে উহা পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া যতটা পারা যায় ততটা আমদানীর চেষ্টাও করা হইবে। তবে আন্তর্জাতিক খাদ্যবণ্টন পরিষদের ভাবগতিক দেখিলে মনে হয় আমদানীর ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া সম্পূর্ণ ঘাটতিটা দেশ হইতে মিটাইবার আয়োজন করা ভাল। বিপদের মুখে তৎপর হওয়ার পরিবর্তে একবার একাদিক্রমে বৎসর দুয়েক জোরের সহিত অধিক ফসল উৎপন্ন করিয়া একটি বড় রকমের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ গঠনের চেষ্টা হওয়া উচিত। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট আন্তরিক চেষ্টা করিলে ইহা সম্ভব হইবে। সঙ্কটত্রাণের জন্য আন্তর্জাতিক পরিষদসমূহের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকার অভ্যাস এবার দূর হওয়া উচিত। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালের এবং এবারকার খাদ্যসঙ্কটে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ আন্তর্জাতিক খাদ্য-বণ্টন পরিষদের নিকট যে উদাসীন ব্যবহার পাইয়াছেন তাহা ভারতবাসী সহজে ভুলিতে পারে না। পয়সা দিয়া খাদ্য কিনিতে গিয়াও ভারতবাসী সেখানে সুবিচার পায় নাই এবং প্রতিশ্রুত খাদ্যদ্রব্যেরও সবটা আনিতে পারে নাই।

ময়মনসিংহ সরবরাহ বিভাগের অকর্মণ্যতা

বার্ষিক ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে পুষ্ট বাংলার সিবিল সাপ্লাই বিভাগের অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি সর্বজনবিদিত। ইঁহাদের অযোগ্যতার জন্য রেশন-ব্যবস্থা কোনদিনই গ্রামাঞ্চলে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই, কলিকাতায় সামান্য যে পরিমাণে উহা সফল হইয়াছিল তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। চিনি, আটা ও কাপড় রেশনের দোকানে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি দৈনিক 'ভারত'এ ময়মনসিংহ জেলার সিবিল সাপ্লাই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের অকর্মণ্যতার যে দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ধনু নদীতে একটি পাহারাদার দল ধানবোঝাই কয়েকটি নৌকা আসিতে দেখিয়া মাঝিদিগকে নৌকাগুলি তীরে ভিড়াইতে বলে। প্রথমে তাহারা এই কথায় কর্ণপাত করে না। পাহারাদার দল তখন শূন্যে গুলি ছোড়ে, মাঝিরা তখন নৌকা তীরে আনিয়া লাগায়। ক্রমে ক্রমে সেখানে বহু নৌকা আসিয়া জড় হয় এবং বন্দুকের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে থামিতে বাধ্য করা হয়। এই ভাবে ৬০০০ নৌকা সেখানে জমা হয়। তারবার্তা প্রেরণ করিয়া আরও প্রহরী আনাইয়া লওয়া হয় এবং সশস্ত্র পুলিস বোঝাই একটি ষ্টীমলঞ্চ সেখানে আসে। জেলার সংগ্রহ বিভাগের কর্তারা সকলে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রত্যেকটি নৌকায় ৫০০ মণ হিসাবে অন্যূন তিন লক্ষ মণ ধান সেখানে ছিল। এই সমস্ত ধান আটক করিয়া উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলিং অফিসার মিঃ পার্কারও আসিয়া উপস্থিত হন।

মিঃ পার্কার না আসা পর্যন্ত প্রায় ২৫ হাজার মাঝিমাল্লাকে শান্তশিষ্টই মনে হইতেছিল কিন্তু পার্কার সাহেবের আগমনের পরেই তাহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। পরের দিন সকালবেলায় ৬ হাজার নৌকা প্রহরীদের বেষ্টনী ভেদ করিয়া নদীপথ বাহিয়া বেপরোয়া ভাবে চলিয়া গেল; মিঃ পার্কার বাধা দিবার কোন চেষ্টা করিলেন না, তাঁহার অধীনস্থ অফিসারবৃন্দ স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। গুলি ছোড়াও হইল না বা ষ্টীম লঞ্চের সাহায্যে উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করার চেষ্টাও করা হইল না। স্বয়ং ডিষ্ট্রিক্ট কণ্ট্রোলিং অফিসার মিঃ পার্কারের উপস্থিতিতে পাহারাদার ও বিভাগীয় কর্মচারীদের বেষ্টনী ভেদ করিয়া ২৫ হাজার লোকের দ্বারা চালিত ছয় হাজার নৌকার এক বিরাট বহর তিন লক্ষ মণ চোরাই ধান লইয়া নদীপথে চলিয়া গেল। কোন নৌকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টাও করা হইল না।

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অথবা গল্প লেখককে পুরস্কার ও পদক দানের প্রস্তাব করিয়া শরৎ-স্মৃতি কমিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ হাজার টাকা দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শরৎ স্মৃতি কমিটির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে বক্তা এবং কে পুরস্কার পাইবেন তাহা স্থির করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ-স্মৃতি কমিটির সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দুই জন প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত এক জন বঙ্গ ভাষার পণ্ডিত থাকিবেন। মনোনীত বক্তা এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী অন্যূন তিনটি বক্তৃতা দিবেন এবং তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে। পুরস্কারের জন্য যিনি মনোনীত হইবেন তিনি এক সহস্র নগদ টাকা এবং প্রায় এক শত টাকা মূল্যের একটি পদক পাইবেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস অথবা গল্প লেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেণ্ডার ও কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত হইবে।

বৈদিক আর্য ও ইরাণীয় আর্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

৩

পূর্বের প্রবন্ধে (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫৩) যতদূর সম্ভব যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে আবেস্তার আইরিয়ানা (Airyana) যাহার অর্থ করা হইয়াছে আর্যদিগের দেশ তাহা মোটামুটি ইরাণ, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি অঞ্চল লইয়া গঠিত। এই আইরিয়ানার উত্তর অংশ বোখারা-মার্ভ ও দক্ষিণ অংশ সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা। ভেন্দিদাদের তালিকা হইতে সাধারণভাবে এই সীমানা নির্দেশ করা যায়। এই মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাহার অনেকগুলির আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে দুই পক্ষের যুক্তি-প্রমাণের আরও কিছু আলোচনা করা হইবে এবং জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতি হইতে আর্যদিগের দেশের এইরূপ অবস্থান সম্বন্ধে কতখানি সমর্থন পাওয়া যায় তাহা দেখা যাইবে।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে আবেস্তার হারোয়ু (হিরাট) গ্রীক ঐতিহাসিকগণের নিকট আরিয়া এবং ইহার অধিবাসী আরিয়ান বলিয়া পরিচিত ছিল। প্লিনি প্রমুখ অনেক লেখক আরিয়া ও আরিয়ানা বা আইরিয়ানা অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। Strabo, Eratosthenes প্রমুখ লেখকগণ পূর্ব-ইরাণকে আরিয়ানা বলিয়া মনে করিতেন।

আবেস্তার সৃষ্টিকল্পে দেবধাম হারো-বোরজাইতি (Alborz) পর্বতে। মৃত্যুর পরে পুণ্যবানের আত্মা Chinvat সেতু অতিক্রম করিয়া এই পর্বতে আরোহণ করে। মিথ্র ও অন্য দেবগণ সেখানে বাস করেন। অহুরা মাজদা সেখানে বাস করেন। এই দেবধামে রাত্রি, অন্ধকার, কুজ্ঝটিকা, ধূম্র, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতির অধিকার নাই। আইরিয়ানা বেজো বা Aryan homeকে যাহারা সুগধার উত্তরে অবস্থিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন প্রাচীন ইরাণীয় স্বর্গের এই বর্ণনা তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে যায়। Gayomarathan কে ইরাণীয় পুরাণের মনু বলা হইয়াছে। তাঁহার দেহ হইতে অহুরা মাজদা আর্যদেশের মধ্যভাগ বা প্রধান ভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। Behram yasht-এ দেখা যায় জরাথুষ্ট্র একদা অহুরা মাজদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাবে বেহরামের উপাসনা করিতে হইবে? উত্তরে অহুরা মাজদা বলিলেন যে আর্যদেশসমূহে (airyao danhavo) বেহরামের তুষ্টির জন্য পশুবলিসহ বরসোম (Barsom) যজ্ঞ করিতে হইবে। ঈষৎ লাল বা পীত বর্ণের পশু বলি দিয়া উহার মাংস পাক করিতে হইবে। বেহরামের জন্য প্রস্তুত এই মাংস কোন পাপাচারী ব্যক্তি, বেশ্যা বা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের শত্রু বিধর্মীর দ্বারা ভুক্ত হইবে না। হইলে আর্য দেশসমূহ মহামারী ও শত্রুসৈন্যের দ্বারা বিধ্বস্ত হইবে। এই আর্যদেশগুলির নাম উল্লেখ না থাকিলেও ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাকট্রিয়া, পারস্য ও মিডিয়ার নাম করিয়াছেন।

ব্যাকট্রিয়া বর্তমানে আফগানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আফগানতুর্কীস্থান, বাদাকশানকে ব্যাকট্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক প্রদেশ করা হইয়াছে। পারস্য প্রাচীন ফার্শ বা পারশিস, বর্তমান ফার্সিস্থান। মিডিয়া বর্তমান পারস্য রাজ্যের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরের কয়েকটি অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, ইহার রাজধানী ছিল একবাটানা। দেখা যাইতেছে, ভেন্দিদাদের আর্য বসতিগুলির তালিকার সহিত ব্যাখ্যাকারগণের প্রদত্ত তালিকা মিলে না। সমগ্র পশ্চিম ও পূর্ব আফগানিস্থান, কিরমান, শকস্থান, বেলুচীস্থান, সিন্ধু উপত্যকা এবং উত্তরে সুগধা, মার্ভ প্রভৃতি অঞ্চল বাদ পড়িয়া যাইতেছে।

ভৌগোলিক পণ্ডিতগণ কুর্দীস্থান হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত সমগ্র উচ্চভূমিকে ইরাণের মালভূমি আখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীনকালে এক জাতি (race) ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক এই মালভূমিতে বাস করিত। এই সকল গোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট তাহাদের সগোষ্ঠীয় জাতিগুলি আপনাদিগকে আর্য নামে পরিচয় দিত। সুতরাং ভৌগোলিক পণ্ডিতগণের এই মতানুসারে ব্যাকট্রিয়া, ফার্শ ও মিডিয়ার মধ্যে আর্যদেশের সীমানা আবদ্ধ করা অযৌক্তিক। সে যাহা হউক, কুর্দীস্থান হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চভূমিকে ইরাণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক জাতির—এই জাতির নাম তাঁহাদের মতে ইরাণীয়—লোক এই অঞ্চলে বাস করিত বলিয়া। প্রাচীনকালে এই উচ্চভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে ও তাহার নিম্নে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসিগণ যে জাতিতে ও ভাষায় ইরাণীয় ছিল না তাহা বলা হয় না। সাসানীয় আমল হইতে সমগ্র পারস্য দেশ ইরাণ বলিয়া পরিচিত, ইরাণের বর্তমান রাজনৈতিক সংজ্ঞার উৎপত্তি সেই সময়ে হইয়াছিল। ইহার সাসানীয় রূপ Eran। রেজা শা পহলবী দেশের প্রচলিত পারস্য নাম পরিবর্তন করিয়া তাঁহার রাজ্যের নাম ইরাণ দিয়াছিলেন যদিও আধুনিক ইরাণের—আরব, ইহুদী, আর্মেনীয়ান, তুর্কম্যান প্রভৃতির মোট সংখ্যা প্রাচীন ইরাণীয় গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা অপেক্ষা বেশী দাঁড়াইবার সম্ভাবনা।

ইতিপূর্বে হেরোডোটাসের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে একটি প্রাচীন কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে মীডদিগের একটি নাম ছিল Arioi এই আরিওইকে আর্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মীডদিগের সম্বন্ধে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে, এখানে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

ঐতিহাসিক আমলে ইরাণীয় গোষ্ঠীভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে মীডদিগের অভ্যুদয় প্রথমে ঘটে। মীডদিগের অভ্যুদয়ের ফলে পশ্চিম-এশিয়ার রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র য়ুফ্রেটিস-টাইগ্রীস উপত্যকার সেমিটিক অঞ্চল হইতে পশ্চিমে মিডিয়ার ইরাণীয় অঞ্চলে সরিয়া যায়। ইহা খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। তারপর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবেরা এই কেন্দ্র পুনরায় সেমিটিক অঞ্চলে সরাইয়া লইয়া যায়। এই অন্তর্বর্তী বার শত বৎসর ইরাণীয় সাম্রাজ্য পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বর্তমান থাকিয়া ইরাণীয় জাতির শক্তি ও প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যে একবার চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া তীব্র, উজ্জ্বল উল্কার মত গ্রীকশক্তি হেলেসপণ্টের ওপারের আকাশ হইতে ছুটিয়া পূর্বে সিন্ধু-উপত্যকার আকাশে বিলীন হইয়া গেল। উহার প্রচণ্ড অগ্নি উদ্গীরণে হাকামনী সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। তারপর আরসিকিডান বংশের প্রতিষ্ঠিত নূতন ইরাণীয় সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া গ্রীসের স্থান অধিকার করিল রোম। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিল। দুর্ধর্ষ পার্থিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণে বার বার রোমের বাহিনী এশিয়া-মাইনরের উপকূল পর্যন্ত হটিয়া গিয়াছে। সাসানীয় বংশের আমলে গর্বিত রোমসাম্রাজ্যের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ঘটিয়াছে। প্রথম সাপুরের হস্তে পরাজিত, বন্দী রোমের সম্রাট বন্দীশালায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পরাজিত, বিপর্যস্ত রোম সাসানীয় সম্রাটকে কর দিয়াছে ককেশাসের দ্বার রক্ষা করিবার জন্য। তারপর একই শত্রুর হস্তে দুই সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল; এই নব-অভ্যুদিত শত্রু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিজয়ী আরববাহিনী। সাসানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া বিজয়ী আরববাহিনী পূর্বদিকে হিরাট পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ঘাটি প্রতিষ্ঠিত করিল।

মিডিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার পূর্বের এক প্রবন্ধে (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩৫৩) দেওয়া হইয়াছে। মধ্য ও উত্তর পারস্যের কিয়দংশ, আজারবাইজান ও কুর্দীস্থানের অংশ লইয়া মিডিয়া গঠিত ছিল। ইরাণীয় উচ্চভূমির পশ্চিম প্রান্তে ইহা অবস্থিত। ইহার উত্তর-পশ্চিমে আর্মেনিয়া, পশ্চিমে য়ুফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের উপত্যকা, দক্ষিণে সুসীয়ানা, পূর্বে কাস্পিয়ান এবং প্রাচীন হিরকানিয়া ও পার্থিয়া। ইহার মধ্যে সুসীয়ানা বাদ দিলে এক আর্মেনীয়ায় ভাষায় ও জাতিতে ইরাণীয় গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত অধিবাসী ছিল। মেসোপটেমিয়ায়, ককেশাস অঞ্চল, কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব-উপকূল, হিরকানিয়া, পার্থিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী ইরাণীয় গোষ্ঠীভুক্ত ছিল না। আর্মেনীয়া, মেসোপটেমিয়া, কাস্পিয়ান সাগর ও দক্ষিণ-পূর্বের মরু অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ এই দেশের ইরাণী গোষ্ঠীর অধিবাসী কোথা হইতে আসিল? সংস্থায়, প্রাধান্যের স্থায়িত্বে, ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক অবদানে, সংক্ষেপে তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসে মীডগণের এমন কোন বিশেষত্ব দেখা যায় না যাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ইরাণীয় গোষ্ঠীর মানুষ মিডিয়া হইতে পূর্বদিকে উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছিল। জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসও পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অভিযানের কথার সমর্থন করে না।

মিডিয়ার প্রকৃত রাজনৈতিক অভ্যুদয় হয় আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে। ফ্রাওর্তেস (Phraotes B. C. 647-625) পারস্য (ফার্সিস্থান) অধিকার করিয়া সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। তাঁহার পুত্র সিআক্সারেস (Cyaxares B. C. 625-585) নিনেভে ধ্বংস করেন। সিআক্সারেসের রাজত্বকালে মিডিয়া সিথিয়ান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। হেরোডোটাসের মতে এই সিথিয়ান বাহিনী ককেশাস ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যে দারবেণ্ড গিরিসঙ্কটের পথে মিডিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। সিআক্সারেসের সঙ্গে লিডিয়ার রাজার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে আনাতোলিয়ার হালিস (Halys) নদীর উত্তরের সমস্ত ভূভাগ মিডিয়ার দখলে আসে। এই ভূভাগ প্রাচীন হিটাইট জাতির আদি বাসভূমি বলা হয়। হালিস নদীর দক্ষিণের ভূভাগ ফ্রিজিয়া নামে পরিচিত ছিল। ঠিক এই সময়ে কিমেরীয়ানগণ (Cimmerians) ফ্রিজিয়া আক্রমণ করিয়া দখল করে। পরাজিত ফ্রিজিয়ারাজ মিডাস আত্মহত্যা করেন। কিমেরীয়ানদিগের উল্লেখ করিবার কারণ নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক মতে কিমেরীয়ান, ম্যাণ্ডাস, মীড এক জাতিভুক্ত এবং আর্যভাষাভাষী। ডাঃ হেডন বলিতেছেন,

"It has been suggested that Kimmerians. Mandas, Medes with their modern Kurd and Bakhtiari representatives were all one people and who were almost certainly of Aryan speech."

One people অর্থ ইহারা সকলেই ইরাণীয় গোষ্ঠীর জাতি। ইরাণীয় কৃষ্টির ইতিহাসে মীড ছাড়া অন্য জাতিগুলির বিশিষ্ট কোন স্থান নাই।

সে যাহা হউক, এইরূপ অনুমান করা হয় যে সিআক্সারেসের রাজত্বকালে জরাথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম মিডিয়ার রাষ্ট্রের ধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়। মিডিয়ায় জোরোয়াষ্ট্রিয়ান

ধর্মের এই প্রাধান্যের সহিত মাজি (Magi) সম্প্রদায় বিশেষভাবে জড়িত। হেরোডোটাসের মতে মাজিগণ মিডিয়ার একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (tribe). শুধু মিডিয়ায় নহে, হাকামনী আমলে ও তাহার পরবর্তীকালেও মাজিগণ জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পুরোহিত সম্প্রদায় হিসাবে প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। মাজিগণের সহিত জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুণ কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের উৎপত্তি-স্থান মিডিয়া। "But the fact that its sacred books know nothing of the Magi tells particularly against this view." অর্থাৎ জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থগুলি মাজিগণের সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতাই বড় প্রমাণ যে এই ধর্মের উৎপত্তি মিডিয়ায় হয় নাই। প্রশ্ন উঠে, মিডিয়া যখন এই ধর্মের উৎপত্তি-স্থান নহে তখন মিডিয়া ইহার বিশিষ্ট অভ্যুদয়ের এবং মিডিয়ার একটি সম্প্রদায়ের এই ধর্মের পুরোহিতের স্থান অধিকার করিবার মূলে কি কারণ আছে? শুধু মাজি নহে, মিডিয়ার নাম পর্যন্ত ভেন্দিদাদের তালিকায় স্থান পায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই কারণটি গুরুতর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই কারণের সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। মিডিয়ায় মাজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় একটি ঘটনা হইতে। সাইরাসের পরবর্তী সম্রাট ক্যাম্বিসেসের রাজত্বকালে মিশর অভিযানে সম্রাটের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গৌমত (Gaumata) নামক একজন মাজি প্রধান সম্রাটের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাকে পারস্যের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। হেরোডোটাসের মতে এই বিপ্লবের মূলে ছিল পারসীকগণের প্রতি মাজি সম্প্রদায়ের বিরোধিতা। গৌমতকে নিহত করিয়া প্রথম দারিয়ুস সিংহাসন অধিকার করেন।

মিডিয়া হাকামনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পরেও মাজিগণের আধিপত্যের কোন হানি হয় নাই। আরসিকিডান সাম্রাজ্যের আমলে মাজি ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের লইয়া দ্বিতীয় সভা (Senate) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সভা সম্রাট নির্বাচনে মত প্রকাশ করিত। ইহা হইতে মাজিদিগের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে যে আরসিকিডান সম্রাট টিরিডেটেস যখন রোম সম্রাট নীরোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য রোমে যান তখন তাঁহার মাজি গুরুগণ (Spiritual advisers) তাঁহার সঙ্গে রোমে গিয়াছিলেন। আরসিকিডান সম্রাট ভলসাজেসের (Volsages, ৭৫ খৃষ্টাব্দ) উদ্যমে আবেস্তার বিভিন্ন অংশ-সমূহ একত্র করিয়া সঙ্কলিত করা হয়। সাসানীয় আমলে মাজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সাসানীয় বংশের নাম হইয়াছে সাসান (Sasan) হইতে। ইস্তাকিরের আনাহেদ বা আনাহিতা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন সাসান। বজরঙ্গী বংশের রাজকন্যা রামবেহিশ্তকে বিবাহ করিয়া তিনি আপনার পরিবারের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন। এই প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সাহায্য। সাসানের পুত্র পাবক। পাবকের পুত্র বিখ্যাত আর্দশের সাসানীয়-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন শেষ আরসিকিডান সম্রাট আর্তাবানুসকে (Artabanus) পরাজিত ও নিহত করিয়া। সাসানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাস হইতে সাসানীয় আমলে পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তির কথা অনুমান করা যাইতে পারে।

বাইবেলে জেরেমিয়ার উক্তি (Jeremiah xxx ix,3) হইতে জানা যায় বাবিলোনের সম্রাট নেবুকাড-নেজ্জার যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার অনুগামীদিগের মধ্যে মাজি প্রধান (the chief of the Magi) ছিলেন। ইহার রাজত্ব কাল খৃঃ পূঃ ৬০৪-৫৬১। ইহার পরবর্তী নাবুনাইদের সময়ে (খৃঃ পূঃ ৫৩৯) সাইরাস বাবিলোন জয় করেন। জুডা বিজয়ী বাবিলোন সম্রাট নেবুকাডনেজ্জার মিডিয়ার সিয়াক্সারেসের পুত্র আষ্টিয়া-জেসের সমসাময়িক। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, মিডিয়ার সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মাজিসম্প্রদায়ের, অর্থাৎ জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রভাব মিডিয়া হইতে বাবিলোন পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইহা মীডগণের রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের পূর্বের ব্যাপারও হইতে পারে। তবে বাবি-লোনের সম্রাটের অনুগামী মাজিপ্রধান জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পুরোহিত না হইয়া বাবিলোনীয় ধর্মের পুরোহিতও হইতে পারেন। কারণ, পারস্য, বাবিলোন প্রভৃতি দেশের পুরোহিত সম্প্রদায় প্রাচীনকালে পশ্চিমদেশের নিকট মাজি নামে পরিচিত ছিল। New Testamentএও মাজি নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (St. Mathew ii, 1)। হেরোডোটাসের মাজিদিগের ধর্মের বর্ণনায় দুইটি উল্লেখ-যোগ্য বিষয় পাওয়া যায়। মাজিগণের সাহায্য ব্যতীত দেবতার পূজা হইতে পারিত না। তাহারা অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিত, কিন্তু আসিরীয় ও আরবগণের নিকট তাহারা স্ত্রী-দেবতা আফ্রোদাইতের পূজা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। হেরোডোটাসের এই আফ্রোদাইতি আনাহিতা বা আনাইতিস। ষ্ট্রাবো মাজিদিগের অগ্নি উপাসনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, আলেকজাণ্ডারের অনুচরদিগের মধ্যে ওসস্থানেশ নামে একজন মাজি ছিল। চীনের হানবংশের আমলে ব্যাকট্রিয়ার তুষারজাতির

নিকট হুণদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য পাইবার আশায় চ্যাংকিয়েন নামক রাজদূত প্রেরিত হন। তিনি মিডিয়ার (Tiaochi) মাজিদিগের প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

মাজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের এই প্রতিষ্ঠার কারণ সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁহার নিজস্ব অনুমান ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"The Magis were one of the ten tribes of the Medes who had possessed through centuries a whole mass of very ancient traditions and beliefs dating from pre-historic period when the ancestors of the Indo-Aryans and Iranians had not separated."

অর্থাৎ, ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয় আর্য জাতির পূর্বপুরুষগণ যখন একত্র বাস করিত সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে প্রবাহিত কৃষ্টি ও বিশ্বাসের ধারা মিডিয়ার মাজি গোষ্ঠী রক্ষা করিয়াছিল। তারপর আরও অগ্রসর হইয়া তিনি বলিতেছেন,—

"The position of the Magi in the Achamenid and of the Mobeds (মাজি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বা প্রধান ব্যক্তি) of the Sassanian period indicates that the establishment of a hereditary priesthood in Persia is due to the circumstance that the King and people of Persia adopted a form of ritual practice which was either originally not their own or had ceased to be so and which had been zealously guarded as the heritage of the Median tribe of the Magi."—(*Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley.*)

অর্থাৎ পারস্থের অধিপতি ও দেশবাসী যে ক্রিয়াকাণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল তাহা গোড়ায় তাহাদের নিজস্ব ছিল না অথবা থাকিলে লুপ্ত হইয়াছিল। এই ক্রিয়াকাণ্ড মিডিয়ার মাজিগোষ্ঠী উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিল এবং নিষ্ঠা-সহকারে রক্ষা করিয়াছিল। পারশ্যে পুরুষানুক্রমিক পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে এই ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচলন। চন্দ-মহাশয়ের এই সকল উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা করিবার স্থান এ প্রবন্ধে নাই, সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন।

প্রথম কথা এই যে, মাজি সম্প্রদায় জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পুরোহিত, তাহারা যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ করিত তাহা প্রধানতঃ ঐ ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড। এই ধর্মের উৎপত্তি সুদূর পূর্বাকালে ব্যাকট্রিয়ায়, ইহাই প্রচলিত মত। প্রাচীন জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মশাস্ত্রে মাজির উল্লেখ মিলে না। ইতিহাসে মাজির আবির্ভাব খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ঘটনা। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয় আর্য বিচ্ছিন্ন হয় নাই তখনকার ক্রিয়াকর্ম ও ঐতিহ্যের ধারা মাজিগণ আপনাদিগের মধ্যে রক্ষা করে এবং এই ভাবে রক্ষিত কৃষ্টিমূলক সম্পদ তাহাদের প্রতিষ্ঠার হেতু, এই উক্তির মর্মগ্রহণ করা কঠিন। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মাজিদিগের কোন না কোন বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার দরুণ তাহারা আপনাদিগের এই অসাধারণ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় কিন্তু একজন ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয়গণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বের প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিকট ঋণ স্বীকারের প্রশ্ন উঠাইয়া যে সমস্যা তিনি সমাধান করিতে চাহিয়াছেন তাহা সমাধান করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, হাকামনী ও সাসনীয় যুগে পারশ্যের রাজা ও সাধারণ লোক মাজিদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ও সযত্নে রক্ষিত যে ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করেন তাহা তাঁহাদের নিকট নূতন জিনিষ ছিল অথবা পূর্বে উহা প্রচলিত থাকিলেও লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী আরসিকিডান রাজগণ তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছেন। মীড ও পারশীকগণ একই গোষ্ঠীর লোক, পাশাপাশিই বাস করিত, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও আদানপ্রদান ছিল ইতিহাসের মত এইরূপ। মীডদিগের ধর্ম পারশীকদিগের নিকট অপরিচিত থাকিবার কথা নহে। যে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম মিডিয়ার রাষ্ট্রের ধর্ম ছিল তাহাই হাকামনী, আরসিকিডান ও সাসানীয় আমলে পারশ্যের রাষ্ট্রের ধর্ম ছিল। ইন্দো-এরিয়ান ও ইরাণীয় জাতি বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেকার ঐতিহ্য মাজি নামে মিডিয়ার একটি গোষ্ঠীকর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল এই মত মানিয়া লইতে হইলে প্রশ্ন উঠে, কোথায় এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল? প্রচলিত আর্যবাদ অনুসারে উত্তর হইবে মিডিয়ার আরও উত্তরে, অর্থাৎ ককেশাশ অঞ্চলে। আরও অনুমান করিতে হয় যে মীডগণ সকলের শেষে আর্যজাতির আদি বাসভূমি হইতে রওনা হইয়াছিল। অন্যথায় মীডগণের মধ্যে মাত্র একটি গোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব হয় না। বলা বাহুল্য, এই ধরণের অনুমানের পশ্চাতে কোন প্রকার যুক্তি নাই, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে প্রধানতঃ আর্যবাদের সমর্থনে নূতন যুক্তি বা ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের প্রয়াস। প্রচলিত আর্যবাদের প্রভাবে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসের সাক্ষ্য উপেক্ষা করা হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আর্য-ঐতিহ্যের কথা উঠাইবার অর্থ অস্পষ্ট অনুমান ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহা ছাড়া আর এক টা কথা উপেক্ষা করা হইয়াছে। মিডিয়ার মাজি-প্রসারিত ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে বাবিলোনীয় ও আসিরীয় প্রভাব কিছুটা আসিয়া পড়া আশ্চর্য নহে। হেরোডোটাস এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। দক্ষিণে কিজিল উজাইন বা সফিদরুদ নদী প্রাচীন মিডিয়া ও মেসোপটেমিয়ার সীমা নির্দেশ করিতেছে ইহা মনে রাখা যাইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ হগ ঋগ্বেদের উল্লিখিত "মঘবা" পদের সহিত মাজি শব্দের সম্পর্ক আছে অনুমান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত হেরোডোটাসের প্রদত্ত মাজিদিগের বিবরণ

মিলে না। তাঁহার মতে Maga হইতে Magava পদ আসিয়াছে। Maga শব্দের অর্থ Spiritual Power বা আত্মিক শক্তি। এই শক্তির অধিকারী যে তাহাকে Magava বলা হইত। এই অর্থে জরাথুষ্ট্রের প্রথম শিষ্যগণকে মগবা বলা হইত। তাঁহারা মাজদীয় ধর্ম প্রচার ও ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিতেন। গাথায় ইহাদিগকে পবিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানকারী (Performer of sacred rites) বলা হইয়াছে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে এই মগবা পরবর্তী কালের মাজি। মাজি বলিতে পরবর্তী কালের পারশীক পুরোহিত বুঝাইত। মাজি শব্দের প্রাচীন রূপ Magush (Cuneiform inscriptions)। দেখা যাইতেছে, মাজি পদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত গ্রহণ করিলে মাজিদিগকে মিডিয়ার একটি গোষ্ঠী বলিয়া স্বীকার করা চলে না, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পুরোহিত বলিয়া একটি সম্প্রদায় মাজি নামে পরিচিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করিতে হয়।

আবেস্তার এই মগবা ঋগ্বেদের মঘবা হইতে অভিন্ন বলিয়া ডাঃ হগ মনে করেন। এই সম্পর্কে তাঁহার মতের পুনরায় উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ইরাণীয় ও বৈদিক আর্যদিগের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত ও রাজনৈতিক কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রাচীন কবি শব্দটি, যাহা পূর্বে দুই দলের মধ্যেই প্রধানগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত, ইরাণীয়গণের অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামের সঙ্গে কবি পদ যুক্ত থাকায়, (যথা Kavi Vishtaspa) তাঁহারা ইহা বর্জন করিতে না পারিয়া রূপ পরিবর্তন করিয়া ইহাকে কবা করেন। এইভাবে কবি দেবধর্মের অনুগামী ও কবা দেবধর্মের বিরোধীদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে থাকে। দেবধর্মের বা ইন্দ্রের বিরোধীদিগের সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কবারি প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কবাসখ পদের অর্থ কবা বা কবের অনুগামী, ইন্দ্রের শত্রু ও সোমের বিরোধী। তার পর তিনি বলিতেছেন :—

"In one passage (*Rigveda*, V. 34, 3) Kavasakha is even called a Maghava by which name the disciples and earliest followers of Zarathustra are denoted in the *Gathias*. Indra is there said to turn out the Maghava, who follows the Kava party from his possession which refers to the settlements of the Iranians."

দেখা যাইতেছে, এই মতানুসারে ঋগ্বেদের রচনাকাল জরাথুষ্ট্রের পরে বা তাঁহার সমসাময়িক। যে ঋকটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

যো অস্মৈ ঘ্রংস উত বা য উধনি সোমং সুনোতি
ভবতি দ্যুমাঁ অহ।
অপাপ শক্রস্ততনুষ্টিমূহতি তনূশুভ্রং মঘবা যঃ কবাসখঃ।

(যে যজমান অহোরাত্র সেই ইন্দ্রকে সোম বর্ষণ করেন, তিনি দীপ্তিশালী হন। যে যজ্ঞ না করিয়া নিজ সন্ততি ও রূপের গর্ব করে ও ধনবান হইয়া নীচ ব্যক্তিগণের সহায়তা করে ইন্দ্র সেই ব্যক্তিকে অপ্রাপ্ত করেন।) এখানে কবাসখ পদ ও মঘবা পদ ইন্দ্রের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার পূর্বের ঋকে দেখা যায় যে মঘবা সোমরসে জঠর পূর্ণ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন (জঠরমপি প্রতামন্দত মঘবা মধ্বো অন্ধসঃ)। অন্যত্র দেখা যায় মঘবা (ইন্দ্র) ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন (রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি ইত্যাদি (৩।৫৩।৮)। ঋগ্বেদে মঘবা পদ ইন্দ্রের সম্বন্ধে প্রযুক্ত, মঘবন্ বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করা হইতেছে। ডাঃ হগের উল্লিখিত ঋকের ব্যাখ্যার দ্বারা ঋগ্বেদে মঘবা পদের অর্থসম্পর্কে তাঁহার মত প্রমাণিত হয় না এবং মঘবা ও মগবাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। কবাসখ পদের অর্থ কবির সখা। উশনার পুত্র কবি ইন্দ্রের সখা ছিলেন। কবি পদ অনেক দেবতা ও ঋষির সম্পর্কেও প্রয়োগ হইয়াছে।

সে যাহা হউক, গাথার মগ হইতে মগবা ও মগবা হইতে মাজি পদ আসিয়াছে এই মত মানিয়া লইলে মাজিকে মিডিয়ার একটি গোষ্ঠী বলিয়া মানিয়া লইবার প্রয়োজন দেখা যায় না একথা উপরে বলা হইয়াছে। এখন একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

ভেন্দিদাদের আর্যবসতিগুলির তালিকা হইতে দেখা গিয়াছে যে উহার অধিকাংশ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। জরাথুষ্ট্রের জন্মস্থান বাখধি বা ব্যাকট্রিয়া। ব্যাকট্রিয়ায় জরাথুষ্ট্রের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য ফ্রাসোষ্ট্রা।

"Frashoshtra the noble wished to see my highlands (*berckhda kehrpra*), to propagate there the good religion. May Ahuramasda bless the undertaking. Cry aloud that they may aspire af'er truth."—*Yasna* **li.**

কিন্তু বাখধি জোরোষ্ট্রীয়ান ধর্মের পবিত্র ভূমি হইলেও জরাথুষ্ট্রের ধর্ম এই অঞ্চলে পরবর্তীকালে যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছিল। এ কথা মনে করিবার কারণও আছে যে এই ধর্ম বাখধিতে স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভেন্দিদাদের তালিকার বর্ণনা হইতে এই ধারণা কতকটা সমর্থিত হয়। সে যাহা হউক, পরবর্তী কালে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দুই দলের উদ্ভব হয়, Mog ও Zendik. এই দুই দলের সম্বন্ধে বলা হয় যে, প্রথম দল আদি আবেস্তা মাত্র স্বীকার করিত, দ্বিতীয় দল জেন্দের ব্যাখ্যা অনুসরণ করিত। প্রথম দলের মতে দ্বিতীয় দল ছিল heretical. Mog দলের অভ্যুদয় হয় পারস্যে ও মিডিয়ায়, Zendik দলের উদ্ভব হয় পূর্বাঞ্চলের ব্যাকট্রিয়ায়। এই Mog পদের রূপান্তর Magi. যে অঞ্চলে

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল সেই অঞ্চলেই উহা আপনার প্রাধান্য হারাইল ইহা অর্থপূর্ণ ব্যাপার। মাজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ইহার কারণ মনে করা যাইতে পারে। এই প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল দেশের রাজশক্তির সহায়তা। ব্যাকট্রিয়ায় রাজশক্তি জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের অনুকূল ছিল না আবেস্তা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। পরে এ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাসে ব্যাকট্রিয়ার এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চিম অঞ্চলের সহিত ইহার রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসের সাক্ষ্য কিরূপ দেখা যাইতে পারে।

হাকামনী সম্রাট্ সাইরাস ও প্রথম দারিয়ুসের আমলে ব্যাকট্রিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার পর হইতে ব্যাকট্রিয়া নামে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া দাঁড়ান। সুগধা তাঁহার অধীন ছিল। আরিয়ার শাসনকর্তাও কার্যতঃ স্বাধীন ছিলেন। ব্যাকট্রিয়ার শাসনকর্তা বেসুস ও আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ, সুগধায় গ্রীকগণকর্তৃক বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও আরিয়ায় তাহাদের কঠোর শাসনের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে। গ্রীক আমলে বালখ, সুগধা, হিরাট, কান্দাহার, সিস্তান প্রভৃতি (ইহার সবগুলি ভেন্দিদাদের আর্যবসতির তালিকাভুক্ত) পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐতিহাসিকগণ বলেন ইহাদের এই আচরণ পারস্য ও মিডিয়ার আচরণের বিপরীত ছিল, এই দুই অঞ্চল বিনা প্রতিবাদে গ্রীকদিগের যোয়াল বহন করিতে থাকে।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইতে না হইতে সিন্ধু উপত্যকা হইতে গ্রীকগণ বিতাড়িত হইল। তারপর ভারতীয় বাহিনী মৌর্যনেতৃত্বে কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রম করিয়া আরিয়ায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিল। উত্তরে হিন্দুকুশের পশ্চিম কোহ্-ই-বাবা ও পশ্চিমে খোরাসানের সীমানা পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমানা বিস্তৃত হইল। ব্যাকট্রিয়া ও সুগধা সেলুসিড সম্রাটগণের অধীনে রহিল। সেলুসিড রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ব্যাকট্রিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল গ্রীক দিওদোতাসের নেতৃত্বে (খৃঃ পূঃ ২৪৬)। ইহার পরের অধ্যায়ে দেখা যায় যে শকগণ কাবুল উপত্যকা অধিকার করিয়াছে আর ব্যাকট্রিয়া অধিকার করিয়াছে ইয়ুচি বা তুখার নামে পরিচিত যাযাবর গোষ্ঠী। আরসিকিডান আমলে ব্যাকট্রিয়া, সুগধা প্রভৃতি পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, বরং দেখা যায় যে পূর্বাঞ্চলে যে সকল সিথিয়ান নামে পরিচিত গোষ্ঠীসমূহ আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহারা পুনঃ পুনঃ আরসিকিডান রাজাদিগের গৃহযুদ্ধে পক্ষ লইয়া পশ্চিম-ইরাণ আক্রমণ করে। সাসানীয় আমলে দেখা যায় যে ব্যাকট্রিয়া হাইতাল বা হেপথালাইট হুনদিগের অধিকারে। সাসানীয় সম্রাটদিগকে ইহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। সিংহাসন লইয়া সাসানীয় রাজাদিগের মধ্যে গৃহযুদ্ধে ইহারাও পক্ষ লইত এবং যেমন আরসিকিডান আমলের শেষের দিকে তেমনি সাসানীয় আমলের মধ্যভাগে পারস্যের সম্রাটগণকে পূর্বের এই প্রতিবেশীদিগকে কর দিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিতে হইত।

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে হাকামনী আমলের শেষের দিক হইতে ব্যাকট্রিয়ার সহিত এবং কার্যতঃ পূর্ব-ইরাণের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত ইরাণীয় মালভূমির পশ্চিম অংশের রাজনৈতিক বন্ধন দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীকপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে এই বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

ইহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, যে তিনটি পারস্য সাম্রাজ্যের কথা উপরে বলা হইয়াছে সেই তিনটিরই দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল পশ্চিমে। প্রথমটির আমলে এশিয়ামাইনর ও গ্রীস ছিল লক্ষ্যস্থল, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির আমলে এই লক্ষ্যস্থল হইল রোম। পূর্বদিকে হরিরুদের ওপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত না। বহু শতাব্দী পরে সুফাভী সম্রাটগণের আমলে কান্দাহার পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়, তাঁহাদের বিরোধী ছিল দিল্লীর মুঘল বা চাঘতাই সম্রাটগণ। ব্যাকট্রিয়া তখন উজবেকদিগের দখলে। ইহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাদির শাহ্ একবার ব্যাকট্রিয়া দখল করেন।

রাজনৈতিক ইতিহাস হইতে পূর্ব ও পশ্চিম ইরাণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার সহিত অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্যের প্রমাণ যোগ করা যাইতে পারে। পূর্বের এক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে গাথা ও আবেস্তার ভাষা পশ্চিম-ইরাণের ভাষা হইতে পৃথক ছিল। পণ্ডিতগণের মতে পশ্চিম-ইরাণের ভাষার যে পরিচয় দারিয়ুসের লেখনসমূহে পাওয়া যায় তাহা হইতে দেখা যায় যে, এই ভাষা চ্যাল্ডিক ভাষার সহিত মিশ্রিত। রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব-ইরাণ অতি প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম-ইরাণ হইতে বিচ্ছিন্ন। জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই ধর্মের কেন্দ্র তাহার উৎপত্তিস্থান হইতে ইরাণীয় মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে মিডিয়ায় সরিয়া গিয়াছে অনুমান খৃঃ পূঃ ছয় বা সাত শত বৎসর পূর্বে এবং পরবর্তীকালে পূর্ব-ইরাণের অধিবাসিগণ আর নিষ্ঠাবান জোরোষ্ট্রিয়ানরূপে পরিগণিত নহে। সাসানীয় আমল পর্যন্ত পারস্যের প্রাচীন

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই তিনটি তথ্য হইতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পূর্ব হইতে পশ্চিমমুখী গতি হইতে যে সূত্র পাওয়া যায় সেই সূত্র ইরাণীয় জাতির সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে; অর্থাৎ ইরাণীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন দল পূর্ব-ইরাণ হইতে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মিডিয়া পর্যন্ত পৌঁছে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দল আর্মেনিয়া, কুর্দীস্থান, মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র, কিন্তু একেবারে ভিত্তিশূন্য অনুমান নহে। প্রচলিত আর্যবাদ অনুসারে আর্যগোষ্ঠীর ইরাণ ও ভারতবর্ষের দিকে অগ্রগতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করা হইয়া থাকে তাহাও অনুমান মাত্র এবং এই অনুমান উপরের আলোচনা হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে যায়। বিরুদ্ধে গেলে যেরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা প্রয়োজন সেইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ধর্মসংক্রান্ত ও রাজনৈতিক বিবাদের ফলে ইরাণীয় বা ব্যাকট্রিয়ার আর্যগণের সহিত বৈদিক আর্যগণের বিচ্ছেদ ঘটে এবং জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের উৎপত্তি হয় এই বিবাদের ফলে, ডাঃ হগের এই ব্যাখ্যাসম্পর্কে আপত্তির কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর লোককে যাযাবর স্বভাবের, কৃষিকার্যে অনাসক্ত, ইরাণীয় বসতিসমূহের আক্রমণ ও লুণ্ঠনকারীরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। ডাঃ হগের মত কতকটা এইরূপ যে, ঋগ্বেদে শত্রুদিগের পুরী ও ধন লুণ্ঠন করিবার জন্য যে সকল অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যে সকল অভিযানের সফলতার জন্য ইন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা ইরাণীয় বসতির (gaethas) বিরুদ্ধে অভিযান আর্য গোষ্ঠীসমূহ যাযাবর বৃত্তি অনুসরণ করিয়া আমু দরিয়া ও সির দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং ব্যাকট্রিয়ায় উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে ইরাণীয় বলা হইত তাহারা ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল এবং কৃষিকার্য অবলম্বন করিল।

"In consequence of this change the Iranians estranged themselves from the other Aryan tribes, which still clung to their ancestral occupation, and assured by the hope of booty, regarded the settlements as the most suitable objects of their incursions and skirmishes." [illegible]

এই ব্যাখ্যাকে tendentious ব্যাখ্যা বলা যায় এবং ঋগ্বেদের প্রমাণ ইহার বিরুদ্ধে। সে যাহা হউক, ডাঃ হগের মতে এই রাজনৈতিক বিদ্বেষ হইতে লুণ্ঠনকারীদিগের দেব ধর্মের প্রতিও বিদ্বেষ জন্মিল। দেবধর্মের প্রতি বিদ্বেষ হইতে অহুরা ধর্মের অভ্যুদয় হইল। কিন্তু এই অহুরা ধর্ম জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্ম নহে। জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত মাজদাইয়াসনীয় ধর্ম এই প্রাচীন অহুরা ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ অহুরা ধর্মের মালমসলা লইয়া জরাথুষ্ট্রের ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে। অহুরা ধর্মের প্রকৃত প্রচারক সাওস্যান্তো (Saoshyantos) বা অগ্নি-উপাসনার পুরোহিত। ইহারা জরাথুষ্ট্রের পূর্ববর্তী। ইহাদিগকে অথর্বন ও আঙ্গিরস হইতে অভিন্ন মনে করা হয়। সম্ভবতঃ ইরাণীয় আর্য ও ভারতীয় আর্যদিগের বিবাদ আরম্ভ হইবার কয়েক শতাব্দী পরে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব হয়।

"The struggle between the two parties may have lasted for several centuries before Zarathustra appeared."

প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নিজের মতবাদের সামঞ্জস্য সাধন করা ডাঃ হগের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মের প্রথম পর্যায় অহুরা ধর্ম এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু গাথাগুলি হইতে এই ধর্মের সম্বন্ধে এমন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না যাহা জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বের বা যাহা হইতে ইহাকে দেবধর্মবিরোধী মনে করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত মাজদাইয়াসনীয়ান ধর্মমত। দেবধর্ম, সোম যাগ, দেবধর্ম ও সোম যাগের পুরোহিতগণের প্রতি আক্রমণ তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার পর আবার একটা পরিবর্তন আসিল। সোম যাগ সংস্কৃত হইয়া গৃহীত হইল, কয়েক জন দেবের অবস্থার উন্নতি হইল, বৈদিক ক্রিয়ার সহিত অভিন্ন এরূপ কতকগুলি ক্রিয়াকর্মের প্রচলন হইল, কিন্তু দেবধর্ম ও দেবধর্মের পুরোহিতের প্রতি বৈরভাব অপরিবর্তিত রহিল।

দেখা যাইতেছে যে ইরাণীয় ধর্মের ইতিহাসের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা মনে রাখিয়া জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের যে ঐতিহাসিক পটভূমি রচনা করা হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। স্বীকার না করিতে পারিবার আরও প্রবল কারণ আছে।

ইতিপূর্বে এক প্রবন্ধে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে জরাথুষ্ট্রের ও তাঁহার শিষ্যগণের আক্রমণের বিষয় বৈদিক আর্যগণের ধর্ম নহে, তাঁহাদের আক্রমণের লক্ষ্য ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম। উপরে জরাথুষ্ট্রের প্রচারিত ধর্মের পশ্চিমমুখী গতির কথা বিস্তারিত বলা হইয়াছে। এখন এই পশ্চিমমুখী গতির প্রকৃত হেতুর উল্লেখ করা যাইতেছে।

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এ কথা আবেস্তা হইতে জানিতে পারা যায়। রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত কলহের ফলে ইরাণীয় ও বৈদিক আর্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, এই মতবাদের বিরুদ্ধে আবেস্তার এই সাক্ষ্য মারাত্মক প্রমাণ।

পরবর্তী আবেস্তা ও জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মশাস্ত্রের অন্যান্য অংশের কথা ছাড়িয়া শুধু গাথাগুলির সাক্ষী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যাহাদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে

তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই তিনটি শ্রেণী—(১) অপদেবতা (Spirit of evil), (২) দেব ও দেবপূজক এবং (৩) প্রতিমা, প্রতিমাপূজক ও প্রতিমা পূজার পুরোহিত। Spirit of evil অহুরা মাজদার প্রতিপক্ষ আহরীমান বা আঙ্গ্রোমৈন্যুষ। দেবগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকালে কোন দেবের নাম করা হয় নাই। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহারা Evil spirit হইতে জন্মিয়াছে। (গাথা উষ্টাবৈতি ও অহুনাবৈতি)। দেব ও দেব ধর্ম বলিতে যে বৈদিক দেবতা ও বৈদিক ধর্ম বুঝায় এরূপ বলিবার কোন যুক্তি নাই। তার পর প্রতিমা বা idols সম্বন্ধে। প্রথম গাথা, গাথা অহুনাবৈতিতে প্রতিমাপূজা ও তাহার অনিষ্টকর প্রভাবের উল্লেখ দেখা যায়। গাথা উষ্টাবৈতিতে প্রতিমা ও প্রতিমাপূজক এবং সত্যধর্মীদিগের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গাথাতেই প্রতিমাপূজার ও পুরোহিতদিগের প্রাধান্যলাভের কথা বলা হইয়াছে।

"The sway is given into the hands of the priests and prophets of idols, who by their actions endeavour to destroy human life."—(*Yas* xlvi, 11).

প্রতিমাপূজার সমর্থনকারীদিগের প্রাধান্যের ফলে জরাথুস্ত্রের (বা তাঁহার শিষ্যদিগের) অবস্থা যে শোচনীয় হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ঐ গাথাতেই পাওয়া যায়।

"To what land shall I turn? Whither shall I go in turning? Owing to the desertion of the Master and his companions? None of the servants pay reverance to me, nor do the wicked rulers of the country. How shall I worship Thee further, O Ahuramazda? I know that I am helpless. Look at me being amongst few men, for I have few men; I implore Thee weeping. O Ahura?"—(*Yasna* xlvi, 1, 2.).

অর্থাৎ, নূতন ধর্মপ্রচারকের অনুচরগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, দেশের দুষ্ট শাসকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে, কেহই তাহাকে মান্য করে না। এই অবস্থায় কোথায়, কোন্ দেশে তিনি যাইবেন, কি ভাবে অহুরা মাজদার উপাসনা চালাইবেন?

এখন প্রশ্ন উঠে, এই প্রতিমাপূজক ও প্রতিমাপূজার পুরোহিত যাহাদিগকে দেশের দুষ্ট শাসকগণ সাহায্য করিয়াছিল ও যাহাদের প্রাধান্যলাভের ফলে অহুরার অন্তরক্ত ভক্তের এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল তাহারা কাহারা? ঋগ্বেদের ধর্ম প্রতিমাপূজার ধর্ম নহে, ঋষিগণ প্রতিমাপূজার পুরোহিত নহেন। সুতরাং অনুমান করিতে হয় যে প্রতিমাপূজার Priests and Prophets বৈদিকযুগের পরবর্তী কালের। তারপর দেশের দুষ্ট শাসকগণের বিরোধিতার কথা বলা হইয়াছে। এই দেশ অবশ্য জরাথুস্ত্রের নিজের দেশ, অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া। স্বদেশে শাসকগণের বিরোধিতায় ধর্মপ্রচারে বাধা না জন্মিলে অন্য দেশে যাইবার কথা উঠে না। দেখা যাইতেছে ব্যাকট্রিয়াতেও প্রতিমাপূজার Priest and Prophetদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং দেশের জনসাধারণ ও রাজা ইহাদের পক্ষভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং জরাথুস্ত্রের রচনা বলিয়া পরিচিত প্রাচীন গাথা অংশে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ব্যাকট্রিয়া হইতে নির্বাসনের প্রমাণ মিলিতেছে। ব্যাকট্রিয়া হইতে নির্বাসিত হইয়া জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল ইরাণীয় মালভূমির পশ্চিম অঞ্চল, কারণ, যে প্রতিমাপূজার ধর্ম ব্যাকট্রিয়া পর্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা দক্ষিণ অঞ্চল হইতে সিন্ধু উপত্যকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আফগানিস্থানের হিন্দুকুশের দক্ষিণভাগ প্লাবিত করিয়া তবে ব্যাকট্রিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। এই অবস্থায় ইরাণীয় মালভূমির পশ্চিম অঞ্চল ব্যতীত জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রচারকগণের নিরাপদ হইবার আর কোন সহজ আশ্রয় ছিল না।

জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতির কারণ বুঝা গেল। পশ্চিম অঞ্চলে ইহা প্রাচীন সুমেরো-বাবিলোনীয় ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, মীড, পারসীক ও বাবিলোনীয়ানগণের রাজনৈতিক সংযোগ হইতে একথা সহজে অনুমান করা চলে। সেমিটিক ধর্মের সংস্পর্শে মিথ্-আনাহিতা উপাসনার রূপান্তর ঘটিয়াছিল, মা (Ma, Mah), নানা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার উপাসনা সুমেরো-বাবিলোনীয় ধর্ম হইতে আসিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা হয়। সেখানে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান নাই।

এখন জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের পশ্চিমমুখী গতির সম্বন্ধে যাহা জানা গেল তাহার সহিত ভেন্দিদাদের তালিকায় আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির অধিকাংশ যে পূর্ব দিকে অবস্থিত এই তথ্য মিলাইতে হইবে।

যদি প্রাচীন আর্য বসতিগুলির অধিকাংশ ব্যাকট্রিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইরাণীয় মালভূমির পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত আর্য নামে পরিচিত গোষ্ঠিসমূহকে উপনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; যদি জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম যাহা সমগ্র ইরাণীয় মালভূমির অধিবাসীদিগকে প্রভাবিত করে তাহার উৎপত্তি পূর্বাঞ্চলে হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় উহা পশ্চিমে বিস্তৃত হয় তাহা বিবেচনা করা যায়; যদি পার্শ্বের বা ফার্সের হাকামনী সম্রাট ও প্রধানদিগের পক্ষে আইরিয়ানার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করা গৌরবের কথা ও প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবার যথার্থ কারণ কিছু ছিল অনুমান করিতে হয় তাহা হইলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে আর্য কৃষ্টির ও আর্য জাতির প্রাচীনতম কেন্দ্র উত্তরে সুগধা ও দক্ষিণে সিন্ধু গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত আইরিয়ানা বা আরিয়ানা। ব্যাকট্রিয়ার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা যাহা এলাম, সুমের ও সুগধাকে প্রভাবিত করিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা যাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার উদ্ভব হয় এই আইরিয়ানার মধ্যে, এই তথ্য স্মরণ রাখা যাইতে পারে।



দ্বিতীয় পর্ব

স্থান—নারিকেলকুঞ্জের মধ্যে একখানি কুটিরের সম্মুখ ভাগ, কাল—অপরাহ্ণ, পাত্রপাত্রী—নারিকেল গাছের ছায়ায় বসিয়া আমি কলা খাইতেছি এবং কুটিরের সামনে বসিয়া নরখাদক তরুণী প্রসাধন করিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতির সম্যক্ রসবোধ করিতে হইলে কয়েক ঘণ্টা আগের ইতিহাস জানা দরকার। সমস্ত রাত আমাদের ডোঙা সমুদ্রে ভাসিয়া সকালের দিকে এই দ্বীপে আসিয়া লাগিল, আমরা দুর্গানাম স্মরণ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম দ্বীপটি ছোট, চারিদিকে নারিকেল ও সুপারি-বন আর মাঝখানে এক বৃহৎ কদলীকুঞ্জ। দূর বিদেশে বহুকাল পরে হঠাৎ দেশের কাহাকেও দেখিলে মনের যে ভাবান্তর হয় কলাগাছ দেখিয়া আমার মনেও সেইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আহা, এ যে আমাদের অতি অন্তরঙ্গ কলা! গাছে গাছে পাকা কলার কাঁদি, আমি তাহাদিগকে সার্থক করিতে লাগিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে তরুণী নিকটবর্তী নারিকেল-বনে লতাপাতা দিয়া একখানি কুটির বানাইয়া ফেলিল—ঘরের কাজে মেয়েরা সর্বদাই পটু। কুটির বাঁধা শেষ হইলে তরুণী প্রসাধনে বসিল, আমি তখনও কলা খাইতেছি।

তরুণী প্রসাধন করিতেছে, এক খণ্ড পাথরের সাহায্যে হাতের দীর্ঘ নখগুলি অধ্যবসায়ের সহিত ঘষিয়া ঘষিয়া ধারালো করিতেছে। এ প্রসাধনের এই দিকটা অতি আধুনিক সভ্য নারীরা অসভ্যদের নিকট হইতে ধার করিয়াছে—না অসভ্যেরা সভ্যদের নিকট হইতে ধার করিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, তবে একথা বলিতে পারি যে নখর বিনা নারী অসম্পূর্ণা।

আমার কলার কাঁদি ফুরাইয়া গেল, হাতে কাজ না থাকায় বসিয়া বসিয়া প্রসাধনরতা তরুণীকে খুঁটিয়ে দেখিতে লাগিলাম। ইতিপূর্বে ইহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেও সাহস পাই নাই। এখন নির্ভয়ে শিল্পীর চোখ দিয়া, সমঝদারের চোখ দিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিলাম রূপ বটে! যৌবনের কালিন্দী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, অপ্রচুর কুঞ্চিত কেশ টানিয়া মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা, ভ্রূহীন গোলাকার চোখ দুইটিতে ঢলঢল লোলুপ চাহনি, উন্নত চিবুক, অধরোষ্ঠ যেন অভিমানে ফুলিতে ফুলিতে



আমি তখনও কলা খাইতেছি

অতিরিক্ত ফুলিয়া গিয়াছে। দেখিলাম, দেখিয়া মজিলাম। আমি কোন কালেই নিগ্রো আর্টের তেমন পক্ষপাতী ছিলাম না, আজ বুঝিলাম ভ্লামিনক কি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, দেরঁ্যা কি দেখিয়া নাচিয়াছিলেন আর কি দেখিয়া বেচারা পিকাসো একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। আর কোন সংশয় রহিল না, এই মুহূর্তে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিলাম মিলোর ভেনাসের চেয়ে হটেনটট ভেনাস বড়।



মিলোর ভেনাসের চেয়ে হটেনটট ভেনাস বড়

বেলা পড়িয়া আসিল, নারিকেল-বন জুড়িয়া ছায়া নামিল, আকাশে বাতাসে একটা 'জলকে চল'র সুর বাজিয়া উঠিল, প্রসাধনের সরঞ্জাম ফেলিয়া রাখিয়া আমার তরুণী প্রিয়া উঠিয়া পড়িল। আমি দেখিলাম মাথার উপর আঁচল টানিয়া কাঁখে কলসী লইয়া প্রেয়সী সমুদ্রের ঘাটে জল আনিতে চলিল, ভরা ঘট ছলংকার করিতে করিতে নারিকেলতলার পথ ধরিয়া ঘরে ফিরিল, নিপুণ হস্তে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিল, তার পরে তুলসীতলায় গড় হইয়া প্রণাম করিল। না—এসব আমি দেখিলাম না, কল্পনা করিলাম, কেননা গোড়াতেই প্রেয়সীর আঁচল না থাকায় শেষের দিকের কিছুই ঘটিতে পারে নাই।

সে রাত্রি এক ঘুমে শেষ হইল। কতিপয় রাত্রির অনিদ্রা পোষাইয়া লইলাম।

সকালবেলা আবার কলাবনে প্রবেশ করিলাম, ভাঙিলাম ছিঁড়িলাম, খাইলাম, তারপরে এক বোঝা কাঁধে করিয়া কুটীরে ফিরিলাম।

ফিরিয়া দেখি কুটীরের দরজায় প্রেয়সী গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। গতকল্য হইতে একটা সাংসারিক সঙ্কট ঘনাইতেছিল, বুঝিলাম আজ তাহা গুরুতর হইয়াছে। বাজারে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হইলে প্রত্যেক সংসারেই যে সঙ্কট দেখা দেয় এ সেই ধরণের সঙ্কট। দ্বীপটি ছোট, বাজার নাই যে ইচ্ছা করিলে দুই-একটা তাজা মানুষ বা পাত্রজাত নরমাংস কিনিতে পাওয়া যাইবে, জঙ্গলে প্রেয়সীর রুচিকর বন্য জানোয়ারেরও অত্যন্ত অভাব, আছে প্রচুর ঝিঁঝিঁ পোকা, ফড়িং এবং কাঠ-বিড়ালি। আঁচ করিলাম গালে হাত দিয়া প্রেয়সী আজ কি রান্না হইবে তাহাই ভাবিতেছে।

আহা, বেচারা সারাদিন উপোস করিয়া আছে, কয়েকটা কলা খাইতে অনুরোধ করিলাম। প্রেয়সী গোলাকার চক্ষু দুটি তুলিয়া বিপুল বিস্ময়ে আমার দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টিতে যুগপৎ ঘৃণা, অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল। আমি লজ্জায় (ভয়ে নয়)—এতটুকু হইয়া গেলাম, বুঝিলাম খুবই অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, নরখাদকবংশীয়া রমণী কলা খাইবে কি? আভিজাত্যের একটা মর্যাদা বোধ আছে তো! নাক চাহিয়া বিশেষ চিন্তিতভাবে আমি অদূরে বসিলাম।

বেলা বোধ হয় তখন দুপুর, নারিকেল গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে চোখে তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ এক বিকট আওয়াজে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম, দেখিলাম প্রেয়সী একটা কাঠবিড়ালিকে তাড়া করিয়া ছুটিয়াছে। কাঠবিড়ালি তিন লাফে একটা গাছে গিয়া উঠিল, প্রেয়সী হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া আবার গালে হাত দিয়া বসিল। প্রেয়সী অভুক্ত আছে ইহা আমার পক্ষে খুবই লজ্জার কথা। পৌরুষে আঘাত লাগিল, কাঠবিড়ালি শিকারে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রিক্ত হস্তে যখন কুটীরে ফিরিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রেয়সী বোধ হয় এতক্ষণ আমার জন্য ঘর-বাহির করিয়া এইবার কুটীরের সামনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। দুই হাত উল্টাইয়া ঝাড়িয়া কিছুই যে আনিতে পারি নাই তাহা বুঝাইয়া দিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলাম। দুই জন মুখোমুখী বসিয়া আছি, অথচ কাহারো মুখে শব্দ নাই, একটা থমথমে ভাব। এমন সময় নারিকেল গাছের উপর দিয়া মস্ত বড় চাঁদ উঠিল, কুটীরের প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হইয়া গেল, সেই প্লাবনে আমরা স্নান করিয়া উঠিলাম। ইহার পরেও কি স্থূল জগতের ক্ষুদ্র অভাব-অনটনের কথা মনে উঠিতে পারে! মাথার উপরে একটা পাখী গলা ছাড়িয়া গাহিয়া উঠিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল সুন্দর হইয়া গেল, যাহা কিছু গদ্য ছিল কবিতায় রূপান্তরিত হইল। এমন সময় দুইটি মুগ্ধ আত্মা মুখোমুখী বসিয়া বিরলে কি প্রেমালাপ করিল তাহা যতটুকু প্রকাশ করিতে পারা যায় করিতেছি। আমি কহিলাম, 'প্রিয়া, জ্যোৎস্নালোকে তোমাকে যা সুন্দর দেখাইতেছে তা আর কি বলিব।' প্রিয়া তাহার অপূর্ব অসভ্য ভাষায় অনেক কথা কহিল, তাহা না জানায় অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সভ্য জগতের প্রেমালাপের যে সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল তাহাই কাজে লাগাইয়া দিলাম, আঁচ করিলাম প্রিয়া গহনার কথা বলিতেছে। কহিলাম—সে আর বলিতে হইবে না, গহনা না পরিলে তোমার রূপ খুলিবে কেন? প্রিয়া প্রত্যুত্তরে বোধ করি কি

গহনা, কোন্ ধরণের হইবে সবিস্তারে তাহাই বর্ণনা করিল, পেষাপেষি খুঁতে অবস্থিত কোন এক অদৃশ্য বস্তুকে দুই হাতে ধরিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁকানি দিল। কহিলাম—'ঝাঁকানি না দিলে যে আমাদের ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির হয় না সেটা তোমরা অসভ্য নারীরাও জান দেখিতেছি!' শুনিয়া প্রিয়া হাসিল, সে মধুর হাসির শব্দে গাছের ডালে পাখীটা সভয়ে থামিয়া গেল। হাসিয়া হাসিয়া প্রিয়া অনেক মিষ্ট কথা কহিল ও একবার একটি কাল্পনিক ঘাড় মটকাইবার ভঙ্গী করিল। আমি পুলকিত হইয়া কণ্ঠস্বরে সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া কহিলাম, 'তাহার প্রয়োজন হইবে না, শীঘ্রই তোমার জন্য গহনার ব্যবস্থা করিতেছি, অন্ততঃ একছড়া মুণ্ডমালা তো গড়াইয়া দিবই'। এইভাবে অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের আত্মায় আত্মায় আত্মনিবেদন চলিল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল, উঠিয়া দেখি প্রিয়া কুটীরে নাই। বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক তাকাইলাম, দেখিতে পাইলাম না; পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে কোন দিকেই নয়নের আনন্দ সেই মূর্তি দেখিতে পাইলাম না। তখন উপরের দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম গাছের উঁচু ডালে বসিয়া প্রেয়সী আরো উঁচুতে উপবিষ্ট একটা কাঠবিড়ালিকে লোভ দেখাইয়া কাছে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। বাহিরের বন্ধুভাবের অন্তরালে মনের আসল ভাবটি বোধ হয় চালাক কাঠবিড়ালি টের পাইয়াছিল তাই কিছুতেই কাছে আসিতেছিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে প্রিয়া রাগ করিয়া নামিয়া আসিল, কিন্তু গাছতলা পরিত্যাগ করিল না, পরম ঔদাসীন্যের ভান করিয়া বসিয়া রহিল।

বেলা বাড়িয়া চলিল, ক্রমে বারটা বাজিল (অবশ্য অনুমান) প্রিয়া সেইখানে বসিয়াই রহিল। দুপুর গড়াইয়া বিকাল হইল, বিকাল গিয়া সন্ধ্যা লাগিল, প্রিয়া তবুও অচল। অবশেষে রাত হইলে প্রিয়া নিঃশব্দে কুটীরে ফিরিয়া আসিল, অন্ধকারে সেই অন্ধকার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, একটা আলোর অভাব খুবই অনুভব করিলাম, মনটা খারাপ হইয়া গেল।

রাত্রে আমার ভাল করিয়া ঘুম হইল না, প্রেয়সীরও সেই অবস্থা। সারারাত অনেক কথা ভাবিলাম। যদিও কথা নিতান্তই ঘরের তবুও পেটে রাখিতে পারিলাম না, আজ লইয়া চার দিন, প্রেয়সী অভুক্তা। লজ্জার কথা আর কি বলিব, ঘরে একটা নেংটি ইঁদুরও নাই যাহা মুখে দিয়া প্রেয়সী একটু জল খাইতে পারে।

আমি কিন্তু কলা খাইয়া খাইয়া এ কয়দিনে বেশ তাজা হইয়া উঠিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম ব্যাপারটা প্রেয়সীর নজরে পড়ে নাই, কিন্তু তা কি কখনো হয়? তাহার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া আমি মোটা হইব এও কি সম্ভব? একটু আড়ালে আড়ালে থাকিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু তা কি পারা যায়? মনের অবস্থাটা আর আগের মত সহজ রহিল না।

ভগবানের রাজ্যে যাহাদের ঘরে অন্ন নাই তাহাদেরও দিন কাটিয়া যায়, আমাদেরও দিন কাটিতে লাগিল। প্রেয়সী আজকাল কুটীর ছাড়িয়া বেশী দূর যায় না; কাজেই ঘোরাফেরা করে। কখনো কখনো গালে হাত দিয়া প্রহর কাটাইয়া দেয়। তাহার মনের আকাশে যে চিন্তার মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে আমার মত আনাড়ী মানুষটিও তাহা বুঝিতে পারে। নারিকেল গাছের আড়ালে বসিয়া অনেক সময় তাহার মনের কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করি, বুঝি-বুঝি করিয়াও যেন বুঝিতে পারি না। অলক্ষিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়া যায়, মনটা হাল্‌কা করিতে কলাবনের দিকে চলি। কিন্তু কিছুদূর গিয়া থামিয়া যাই, আমার দেহের উন্নতি দেখিয়া প্রেয়সীর সেই ভাবপূর্ণ চাহনিটা মনে পড়িয়া যায়। হায়, কে বলিয়া দিবে সে ভাবের জন্মস্থান হৃদয় না উদর?

বিকালবেলার ছায়া যখন নারিকেলকুঞ্জে ঘনতর হইয়া আসে, একটা স্নিগ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বহিতে সুরু করে, পাখীরা কলরব করিয়া বাসায় ফিরিতে থাকে, অলেহলে একটা ঘরে ফেরার সুর বাজিয়া ওঠে তখন হঠাৎ আমার উল্টাদিকে দৌড় দিবার ইচ্ছা হয়। বসিয়া বসিয়া ভাবি আমার নবীন যৌবন অথচ সংসারে এত বীতরাগ হইল কেন? এমন সময় বনের পথে দীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া কে আসিয়া পিছনে দাঁড়ায়। ফিরিয়া চাহিতেই চারিচক্ষে মিলন হয়, কম্পাসের কাঁটার মত মনের কাঁটা ঘুরিয়া আবার সংসারমুখো হয়।

দিন কোন রকমে কাটিয়া যায় কিন্তু রাত যেন কাটিতে চায় না। সন্দেহ হয় প্রেয়সীর প্রেমে ভাটা পড়িল নাকি? অতিতুচ্ছ পেটের চিন্তা কি শেষে এত বড় একটা স্বর্গীয় প্রেমকে মাটি করিয়া দিবে? দরজার সামনে উবু হইয়া বসিয়া প্রেয়সী আমার দিকে তাকাইয়া থাকে, আমার দেহে একে একে অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ ইত্যাদি প্রেমের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়।

সেদিন ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রেয়সী আমাকে চোখে চোখে রাখিল। গা ঢাকা দিবার চেষ্টা দু-একবার করিলাম বটে, তবে সে নিতান্তই খেলাচ্ছলে। এতটা আমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইল, এতকাল একসঙ্গে ঘর করিলাম অথচ এখনও চোখের আড়াল করিতে এত কষ্ট কেন রে বাপু।

দিনের শেষে রাত আসিল, প্রেয়সী কুটীরে পর্ণশয্যা বিছাইয়া দিল, আমি শুইলাম। বোধ হয় বিছানায় দুই-একটা কাঁটা ছিল তাই ঘুম হইতেছিল না। অন্ধকার রাত, অদূরে একটা পেঁচা ডাকিতেছে, আমরা দুইটি আত্মা পরস্পরের সান্নিধ্য নিবিড়ভাবে অনুভব করিতেছি। প্রেয়সীর চোখ দুটি আজ কত উজ্জ্বল। প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়, অন্ধকার গভীরতর হয়, পেঁচাটা ডাকিতে থাকে। কখন যেন একটু ঘুমাইয়া পড়ি, হঠাৎ জাগিয়া উঠি, মনে হয় মুখের উপর কাহার যেন উষ্ণ নিশ্বাস পড়িতেছে, কে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমাকে দেখিতেছে। ডাকিলাম "প্রিয়া, প্রিয়তমা,'—প্রিয়া উত্তর দিল না,

সান্ত্বনা দিবার জন্য একখানা হাত আমার বুকের উপর রাখিল। হাসিবার চেষ্টা করিলাম, হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়া অতি মধুর ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলাম, ভাবিলাম একবার যে হৃদয়কে জয় করিয়াছি হাসিয়া আবার সেই হৃদয়কে জয় করিব। পেঁচাটা ডাকিতেছে, গভীর অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারে প্রেয়সীর দুই পাটি দাঁত বিদ্যুতের মত চমকাইয়া উঠিল, তার পরে মুহূর্তের মধ্যে গিয়া সেই দাঁত আমার কণ্ঠনালীতে বসাইয়া দিল। আমি বোধ হয় আপত্তি করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু পারিলাম না। ইঁদুরের টুঁটি ধরিয়া বিড়াল যেমন করিয়া ঝাঁকানি দেয় তেমনি করিয়া প্রেয়সী জোরে গোটা দুই ঝাঁকানি দিল, তাহাতেই আমার প্রাণবায়ু আচমকা বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল, নিভিয়া যাওয়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া একটু ধরা গলায় দেবেন কহিল, 'পরে কি ঘটিল তাহা আর আমি বলিতে পারি না।'

রবীন্দ্র-সঙ্গীতসার

(২য় শতক)

শ্রীইন্দিরা দেবী

গত বৎসরের মত এ বৎসরও সেই একই সময়ে 'প্রবাসী' পত্রিকার সদয় মাধ্যমে রবীন্দ্র-সঙ্গীতসারের ২য় শতক গীতজ্ঞ পাঠকসমক্ষে উপস্থাপিত করতে ব্রতী হয়েছি। এ যেন তাঁর শুভজন্মদিনে নিবেদিত এক একটি গীতাঞ্জলি।

এবারকার সঙ্কলন করতে আর নতুন করে বাইরের লোকের দ্বারস্থ হই নি। সুগৃহিণীর মত সঞ্চিত তহবিল থেকেই কাজ চালাবার চেষ্টা করেছি। কারণ গত বারে সামান্য আয়েরও সবটা ত ব্যয় হয় নি; কিছু হাতে জমা ছিল। তবে অন্য একটি থেকে সাহায্য পেয়েছি, যেটা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, "সঞ্চয়িতা"র শেষ সংস্করণে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি থেকে কবি নিজে যে সংকলন করে গেছেন এবং গ্রন্থ-প্রকাশকরা যা করেছেন তা দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। যদিও সেগুলি কাব্য হিসেবেই সম্ভবতঃ নির্ব্বাচিত, তবু তার মূল্য কম নয়। দ্বিতীয়তঃ, একটা গানের তালিকা রবীন্দ্রভবনের সৌজন্যে দেখতে পেয়েছি, যেটা কবি নিজেই নির্ব্বাচন করে-ছেন বলে প্রসিদ্ধি আছে, তবে সে কথা কত দূর প্রামাণ্য তা বলতে পারি নে। গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁর গানের রেকর্ড করবার উপলক্ষ্যে নাকি এই নির্ব্বাচন করা হয়েছিল। আইন-সঙ্গত প্রামাণিকতা লাভ করা এখনই সম্ভব না হলেও 'অ' থেকে 'হ' পর্য্যন্ত এই রকম সুনির্ব্বাচিত প্রায় ৪০০ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটি তালিকা আমার বর্ত্তমান সাধনার সিদ্ধিলাভের পক্ষে যে অভাবনীয়রূপে সাহায্যপ্রদ, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?—দেখে খুশী হলুম যে আমাদের এই কর্ম্মে ধরা প্রায় সমস্ত গানই তাতে সমর্থন লাভ করেছে। তা ছাড়া আর এক মহা সৌভাগ্যের কারণ ঘটেছে। ভবিষ্যতে ৩য় শতকের গানও হাতের কাছে প্রস্তুত রইল, আর হাতড়ে বেড়াতে হবে না। কারণ উক্ত ৪০০টি গানের মধ্যে এই দুই ক্ষেপে ১৫০টি গানেরও কম গিয়েছে, হিসেব করে দেখলুম। তা হলে আর এক বৎসর অপেক্ষা না করে হয়ত শ্রাবণে তাঁর বার্ষিকীর মধ্যেই আরও এক শত গান প্রকাশ করতে পারব, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে। গত বৎসর একটি উৎসাহী পত্র-লেখক যে আমাকে বলেছিলেন তাঁর ১০০ গানে কি হবে, অন্ততঃ ৫০০টি গান চয়ন করে তার স্বরলিপি প্রকাশ করতে পারলে তবে তাঁর স্নেহঋণ কতক পরিশোধ হতে পারে, তাঁর সেই প্রস্তাবও কার্য্যে পরিণত করবার আশা নিতান্ত দুরাশা বলে এখন মনে হচ্ছে না। যদিও এখনকার দুর্দ্দিনে যেরকম প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছে তাতে গান নিয়ে মাথা ঘামাবার লোক কমই পাবার সম্ভাবনা; তবুও গুণী জনের মতামত ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি। শান্তিনিকেতন, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৪।

শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

পূজা

১। আগুনের পরশমণি
২। আজি প্রণমি তোমারে
৩। আমার প্রাণে গভীর গোপন
৪। এই লভিনু সঙ্গ তব
৫। এখনো গেল না আঁধার
৬। কত অজানারে
৭। কেমনে এই দুয়ারটুকু
৮। কে যায় অমৃতধাম যাত্রী
৯। কোন্ আলোতে প্রাণের
১০। জীবন-মরণের সীমানা
১১। জীবন যখন শুকায়ে
১২। জীবনে যত পূজা
১৩। তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
১৪। প্রভু আজি তোমায়
১৫। বক্ষে তোমায় বাজে বাঁশি
১৬। বল দাও মোরে
১৭। বিপদে মোরে রক্ষা কর
১৮। ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ম্ময়

১৯। মোর সন্ধ্যায় তুমি
২০। রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
২১। জানি গো দিন যাবে
২২। সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার
২৩। সীমার মাঝে অসীম তুমি যে
২৪। আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার
২৫। না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
২৬। কান্না হাসির দোল দোলানো
২৭। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
২৮। যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি
২৯। প্রভাতে বিমল আনন্দে
৩০। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু
৩১। মরণ-সাগর-পারে তোমরা অমর
৩২। আমি তোমার যত
৩৩। মন্দিরে মম কে
৩৪। যেথায় থাকে সবার অধম
৩৫। তোরা শুনিস নি কি
৩৬। মোরে ডাকি লয়ে যাও
৩৭। না গো এই যে ধূলা
৩৮। যায় যেন মোর সকল ভালবাসা
৩৯। আমার না-বলা বাণীর
৪০। হৃদয় বেদনা বহিয়া
৪১। তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো
৪২। তোমার সুর শুনায়ে
৪৩। তোর ভিতরে জাগিয়া কে

প্রেম

১। মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে
২। বঁধু কোন্ মায়া লাগল চোখে
৩। কোথা বাইরে দূরে
৪। হে নিরুপমা
৫। কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
৬। কেন বাজাও কাঁকন কন কন
৭। একদা তুমি প্রিয়ে
৮। তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
৯। আমার নয়ন তব নয়নের
১০। নূপুর বেজে যায়
১১। শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
১২। এই কথাটি মনে রেখো
১৩। আমি চিনি গো চিনি তোমারে
১৪। আমার মন মানে না
১৫। কার যেন এই মনের বেদন
১৬। জানি হল যাবার আয়োজন
১৭। বাজে করুণ সুরে

প্রকৃতি

১। নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়
২। বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা
৩। আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে
৪। পূব সাগরের পার হতে
৫। কেন পান্থ এ চঞ্চলতা
৬। আমরা চাষ করি আনন্দে
৭। আমি পথভোলা এক পথিক
৮। এতদিন যে বসেছিলেম
৯। বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক
১০। যখন মল্লিকা বনে
১১। মরুবিজয়ের কেতন উড়াও
১২। একটুকু ছোঁয়া লাগে
১৩। হে ক্ষণিকের অতিথি
১৪। আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে
১৫। আজি কমল মুকুলদল খুলিল
১৬। পূব হাওয়াতে দেয় দোলা
১৭। রোদনভরা এ বসন্ত
১৮। দিয়ে গেনু বসন্তের এই
১৯। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা
২০। হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
২১। এস এস হে তৃষ্ণার জল
২২। ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব
২৩। নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
২৪। বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল
২৫। এবার অবগুণ্ঠন খোলো খোলো
২৬। তুমি কিছু দিয়ে যাও
২৭। বেদনা কি ভাষায়

স্বদেশ

১। আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না
২। মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
৩। নাই নাই ভয়
৪। শুভকর্ম্ম পথে ধর নির্ভয় গান
৫। জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়

বিবিধ

১। প্রলয় নাচন নাচলে যখন
২। কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
৩। ঝর বায়ু বহে বেগে
৪। শুধু যাওয়া আসা
৫। আমরা লক্ষীছাড়ার দল
৬। সবারে করি আহ্বান
৭। ঐ মহামানব আসে
৮। নৃত্যের তালে তালে

মোট পূজা—	৪৩
ঐ প্রেম—	১৭
ঐ প্রকৃতি—	২৭
ঐ স্বদেশ—	৫
ঐ বিবিধ—	৮
সর্ব্ব মোট—	১০০

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

১৮৭০-১৯২১

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশ-পরিচয় ; শৈশব শিক্ষা

৩০ মার্চ ১৮৭০ (১৮ চৈত্র ১২৭৬) তারিখে কলিকাতায় সুরেশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি ; মাতা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী। সুরেশচন্দ্রের অগ্রজপ্রতিম পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "সুরেশচন্দ্রের পৈতামহ বাসস্থান নদীয়া কৃষ্ণনগর জেলায় আংশমালী গ্রামে ছিল। উহারা বাৎস্য গোত্রের ঘোষাল, শ্রোত্রিয় ; সমাজপতি উপাধি…। সুরেশচন্দ্রের জনক ৺ গোপালচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া করিতেন ; সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া পছন্দ করেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যাকে এই পাত্রেই দান করেন। তখন বিধবা-বিবাহের জোর হুজুগ চলিতেছিল, গোপালচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জামাতা হইয়া সামাজিক হিসাবে একটু গোলে পড়িয়া ছিলেন। তাই তাঁহাকে অধিকাংশ সময়ে শ্বশুরগৃহে বাস করিতে হইত।…অতি অল্প বয়সে গোপালচন্দ্র কাশী যাইয়া ওলাউঠা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুরেশ-যতীশ দুই ভাই, মাতামহের গৃহেই মানুষ হইয়াছিলেন।…সুরেশ আকারে অবয়বে তাঁহার জনকের অনুরূপই ছিলেন। নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ গোপালচন্দ্রের মতন খুব কম যুবকই তখনকার সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। সুরেশ তাহার জনকের এই গুণ পাইয়াছিল।" ('সাহিত্য', পৌষ-মাঘ ১৩২৭, পৃ. ৬৫৪-৫৫)

সুরেশচন্দ্রের শৈশব-শিক্ষা হয় গৃহে মাতামহের নিকট। বিদ্যাসাগর মহাশয় দৌহিত্রকে সংস্কৃত কাব্য, ছন্দ, অলঙ্কারাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং সুরেশচন্দ্র, ১৮৯০ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের স্মৃতিকথায়, এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"আমি এক দিন নুনীকে [জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আই. সি. এস] বলিলাম, "চল, বঙ্কিম বাবুর কাছে যাই।"…

'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্যে'র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিতচিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।…

বঙ্কিম বাবু 'সাহিত্য' সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রশ্ন করিলেন। নুনী বলিল, "সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি।"

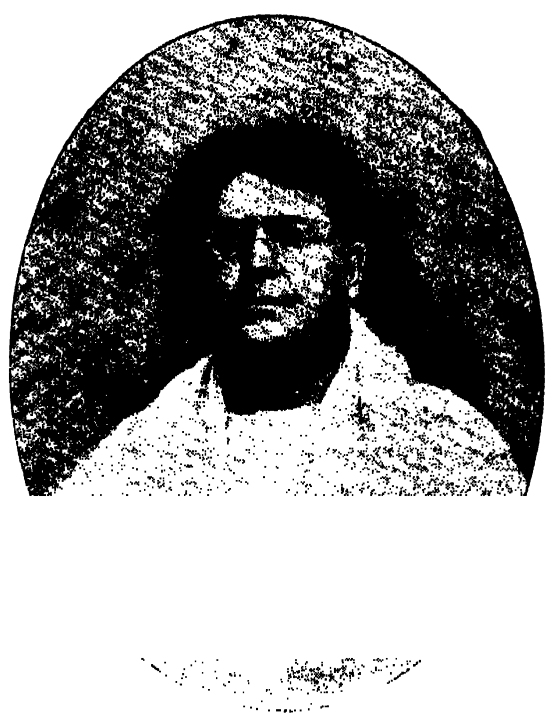
বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "তোমার দাদা-ম'শায় জানেন ?"

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-ম'শায় জানেন কি না, তাহা আমিও ঠিক জানিতাম না।…নুনী বলিল, "বোধ হয়, তিনি জানেন।" বঙ্কিম বাবু আমাকে বলিলেন, "সে কি ? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না ব'লে কাগজ বার ক'রে ফেল্লে। তিনি শুন্‌লে রাগ করবেন না ?"

আমি বলিলাম, "বোধ হয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "দেখ, লেখা টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়।…"

নুনী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ওদের দু'ভাইকে স্কুলে দেন নি। বাড়ীতে পড়ান।"



সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
[সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতির সৌজন্যে]

বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "কেন ? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতীদের স্কুলে পড়ান না ? এর মানে কি ?"

নুনী বলিল, "তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত প'ড়ে, প'রে ইংরেজী পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়ীতে পড়ে। তিনি বলেন, ভাল ক'রে পড়াশুনা করে ওরা বাঙ্গলা লিখ্‌বে। তিনি নিজে সময় পান নি, যা সাধ ছিল, লিখ্‌তে পারেন নি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।" 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩১২, ৩১৮-১৯।

বিবাহ

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) তারিখে ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা নলিনী দেবীর সহিত সুরেশচন্দ্রের বিবাহ হয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁহার "সাহিত্য-সেবকের ডায়েরি"তে ('সাহিত্য', শ্রাবণ ১৩১০) এই বিবাহের বিশদ উল্লেখ করিয়াছেন।

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

সুরেশচন্দ্র ১৪-১৫ বৎসর বয়স হইতেই বাংলা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। 'পতাকা', 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সুরভি ও পতাকা'র পৃষ্ঠাগুলিতে তাঁহার অনেক প্রাথমিক রচনার সন্ধান মিলিবে। তিনি কবিতাও লিখিতেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি মাসিকপত্র সম্পাদনে ব্রতী হন।

'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' :—১২৯৬ সালের শ্রাবণ (জুলাই ১৮৮৯) মাসে শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' নামে একখানি মাসিকপত্র ও সমালোচন প্রকাশিত হয়। ইহা ৩ নং বীডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রকাশিত হইত। প্রকাশক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সুরেশচন্দ্র ইহার ৭ম সংখ্যা (মাঘ ১২৯৬) হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, পত্রিকার সহিত তাঁহার কোন আর্থিক সম্বন্ধ ছিল না। ৯ম সংখ্যায় (চৈত্র) 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র বর্ষ শেষ হইলে "সম্পাদকের নিবেদনে" সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

> "এই পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন অন্য ব্যক্তি ইহার সম্পাদক ছিলেন। বিগত মাঘ মাসে, আমি প্রকাশক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করি।...
>
> পূর্ব্বতন সম্পাদক মহাশয় যে পথে গিয়াছিলেন, আমি, নানা কারণে একেবারে সে পথ পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ, সকল বিষয়ে, তাঁহার অনুসৃত পথেও চলিতে পারি নাই। এই উভয়-সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, নবম সংখ্যায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র প্রথম বৎসর শেষ করিতে হইল।...
>
> বহুদিন হইতে আমাদের ইচ্ছা ছিল, একখানি মাসিক-পত্র সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত করিব।...যখন আমরা মাসিক-পত্র প্রকাশিত করিব, সঙ্কল্প করি, তখন তাহার উদ্দেশ্য ও সম্পাদন প্রণালী অবধারিত, এবং নাম পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এ-স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, মথুর বাবু [মথুরানাথ সিংহ, বি. এ.] এই বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন। আমরা, আমাদের সঙ্কল্পিত মাসিকপত্রের, 'সাহিত্য' এই নাম নির্ব্বাচিত করি।
>
> আগামী বৈশাখ হইতে 'সাহিত্য' প্রচারিত হইবে, অবধারিত ছিল। কিন্তু, ইতিপূর্ব্বেই, আমি 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং মথুর বাবু প্রভৃতিকে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত 'সাহিত্যে'র পরিবর্ত্তে, 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছিলাম।
>
> সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু, এ জন্য একটি পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন, তিনি ইহাকে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম'—নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। আমাদের অতদূর উচ্চ আশা নাই। জগতে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় কি ? অতএব 'কল্পদ্রুমে'র ন্যায়, যিনি যাহা চাহিবেন, তাঁহাকে সেইরূপ 'সাহিত্য' দিয়া তৃপ্ত করিব, আমাদের এমন দুরাশা নাই। বিশেষতঃ, "সাহিত্য-কল্পদ্রুমে"র পূর্ব্ব উদ্দেশ্যও এখন ভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে। অতএব, নির্দ্ধারিত হইল যে, অতঃপর 'সাহিত্য' ঠিক প্রচারের মত আকারে, প্রতি মাসে ৫ পাঁচ ফর্ম্মা হিসাবে প্রকাশিত হইবে। কি ভাবে, কি উদ্দেশ্যে ও কি প্রণালীতে, এই অভিনব 'সাহিত্য' সম্পাদিত হইবে, তাহা দ্বিতীয় কল্পের প্রথম সংখ্যায় নিবেদিত হইবে।"

'সাহিত্য' :—১২৯৭ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৯০) মাস হইতে সুরেশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'কল্পদ্রুম'-কাটা 'সাহিত্য' প্রকাশিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ রহিলেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় "সূচনা"য় সম্পাদক লিখিলেন :—

> "বাঙ্গলা-সাহিত্যের সেবার জন্য, 'সাহিত্যের' জন্ম হইল। জাতীয় সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন, আমাদের এক-মাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।
>
> এদেশে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব, দিন দিন অধিকতর-রূপে বিস্তারিত হইতেছে। এই শিক্ষার ফলে, আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ, নানাবিধ নূতন ভাব ও অভিনব চিন্তার সহিত পরিচিত হইতেছেন। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, আমাদের বাঙ্গলা-সাহিত্য, তাঁহাদের সেই চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার ফললাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। এখন যাঁহারা ইংরাজী লেখেন, তাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা পড়েন না ; বাঙ্গলা লেখেন না। বাঙ্গলা-সাহিত্যের শৈশব-দশায়, যাঁহারা বাঙ্গলা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রাণপাত করিয়া-ছিলেন, এখনও প্রায় তাঁহারাই বাঙ্গলা-লেখক। তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কে তাহাতে জল সেচন করিবে ? তাঁহারা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, কে তাহাকে পূর্ণ পরিণতির পথে লইয়া যাইবে ? কারণ, তাঁহাদের পরে যাঁহারা বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের

দের সংখ্যা অতি অল্প। কৃতকার্য্য লেখকের সংখ্যা, আবার তদপেক্ষা আরও অল্প।

অথচ, সে কালের অপেক্ষা, একালে, দেশে চিন্তাশীলের সংখ্যা বাড়িয়াছে, জ্ঞানের জ্যোতিঃ অধিকতর বিকীর্ণ হইতেছে। তথাপি, শিক্ষার অনুপাত অনুসারে ধরিতে গেলে, সেকালের তুলনায়, একালের বাঙ্গলা-সাহিত্যকে অনেক দরিদ্র বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষিত যুবকগণের বাঙ্গলা-সাহিত্যে সেরূপ মনোযোগ ও অনুরাগ নাই, এইজন্যই সাহিত্যের এমন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

এখন চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লেখকগণের মতের সহিত, প্রায়ই বর্ত্তমান নবীন যুগের শিক্ষিত যুবকগণের মতবিরোধ উপস্থিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে তাহার মীমাংসা হয় না। সুতরাং, প্রাচীন ও নবীন মতের বিরোধে যে শুভফল প্রত্যাশা করা যায়, আমাদের সাহিত্যে, সে শুভফলের সম্ভাবনা নাই।

এইজন্য, আমরা শিক্ষিত যুবকগণকে এই নূতন 'সাহিত্যের' আসরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের পদবীর অনুসরণ করুন, আপনাদের শিক্ষার ফল, যাহাতে আমাদের জাতীয়-জীবনে অনুপ্রাণিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন।

জাতীয়-জীবনের উন্নতি, সাহিত্য-সাপেক্ষ, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি সেই জাতীয়জীবনগঠনের জন্য প্রাণপাত না করেন, তবে আর কে করিবে?

আমরা দেশের অনেক গণ্য ও মান্য ব্যক্তির নিকট উৎসাহ পাইয়াছি, সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত, অনেক গ্রন্থের লেখকের সাহায্য পাইয়াছি। এক্ষণে, শিক্ষিত যুবকগণ, 'সাহিত্যের' আসরে অবতীর্ণ হইলে, আমাদের আশা ও উদ্যোগ সফল হয়। আমাদের সে আশা কি বিফল হইবে?"

প্রথম বর্ষের 'সাহিত্য' যাঁহাদের রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাঁহাদের কয়েক জনের নাম :—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কবিতা ও "রৈবতক কাব্য" সমালোচনা), নবীনচন্দ্র সেন (কবিতা ও "প্রবাসের পত্র"), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা), প্রিয়নাথ সেন (কবিতা), নিত্যকৃষ্ণ বসু (কবিতা ও গল্প), গোবিন্দচন্দ্র দাস, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (উপন্যাস), নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় (হায়নের Reisbilder হইতে), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নীহারিকা-রচয়িত্রী—প্রসন্নময়ী দেবী (কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী ও সমালোচনা), সরোজকুমারী দেবী, কামিনী সেন, প্রমীলা নাগ (বসু)।

'সাহিত্য' দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'সাহিত্য-কল্পদ্রুমে'র আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইল। সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্যে'র স্বত্বাধিকারী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রনাথও ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ২য় বর্ষের 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে প্রচার করিলেন; "নববর্ষে নূতন কথা"য় লিখিত হইল :—"আমাদের 'সাহিত্যকল্পদ্রুমেরও' একটি বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে, 'সাহিত্য' আসিয়া, ইহার ছায়ার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। বটবৃক্ষ, যেমন ছেদককেও ছায়া দান করে, তেমনই 'কল্পদ্রুম'ও, নিজ জীবনের দ্বিতীয় বর্ষটি উদ্‌যাপন করিয়াছে। গত ১২৯৭ সালে 'সাহিত্য', 'কল্পদ্রুমের' ছায়ায় প্রতিপালিত হইয়া, এ বৎসরে বেশ শক্ত সমর্থ হইয়াছে, নিজে চলিতে ফিরিতে পারে, দু কথা বলিতে কহিতে ও পথ চিনিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে; তাই, এবার আর "আওতায়" না থাকিয়া, উপযুক্ত মালীদ্বারা সাহিত্য-উদ্যানের অপর এক পরিষ্কৃত স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।"

'সাহিত্য'-সম্পাদক যথোদ্যমে পত্রিকা-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। তিনি ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৯৮) সম্পাদন-প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি লেখেন :—

"আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—প্রাচীন ও নবীন মতের সম্মিলন। এ সম্বন্ধে, কয়েকটি কথা বলিয়া আমরা বিদায় হইব। কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেকের বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে হয়। সামাজিক বা অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে যদি কেহ স্ব স্ব মতের বিরুদ্ধ মতবাদ দেখিতে পান, আশা করি, সে জন্য আমাদের অপরাধী করিবেন না। নিরপেক্ষভাবে সকলের মতামত প্রকাশ করাই সম্পাদকের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কোনও সম্পাদকই সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। বলা বাহুল্য যে, সম্পাদকের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, যে কোনও আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা, 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইবে। যাহাতে সত্যের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে, যাহাতে সমাজের বা সাহিত্যের উপকার আশা করা যায়, সাধারণের অপ্রীতিকর বা আমাদের মতের বিরুদ্ধ হইলেও, তাহার প্রচার করিতে আমরা কখনও কুণ্ঠিত হইব না। এ জন্য যদি আমরা কাহারও অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করি, আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া, আমাদের ক্ষমা করেন।

বাঙ্গালার প্রতিভাশালী প্রবীণ আচার্য্যগণের পদবীর অনুসরণ করিয়া, আমরা সাহিত্যসেবাব্রত গ্রহণ করিতেছি। সেকালের লেখক মহাশয়গণের অনুগ্রহে ও একালের নবীন লেখকগণের উৎসাহে, 'সাহিত্য' আমাদের জাতীয় ভাব-প্রবাহের সহায় হউক। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুকম্পায়, একালের নবীন ভাব ও মত, সেকালের ভাব ও মতের কিরণে বিকশিত হইতে থাকুক, সকলের

সমবেত চেষ্টায়, আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সত্য ও সৌন্দর্য্যের প্রভায় পূর্ণ ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক।"

'সাহিত্য' দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অচিরাৎ প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকার গৌরব অর্জ্জন করিল। বাংলা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এমন অল্প লেখকই আছেন যাঁহাদের কোন-না-কোন রচনা 'সাহিত্যে'র পৃষ্ঠায় স্থানলাভ না করিয়াছিল। 'সাহিত্যে' রচনা প্রকাশ করিতে পারিলে অনেক লেখকই নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন,—'সাহিত্যে'র এমনই সুনাম ছিল।

সমাজপতি সত্যই সাহিত্য-সমাজের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার দ্বারা সমালোচনা-সাহিত্য বহুল পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্যে'র মাসিক সাহিত্য সমালোচনা পাঠ করিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

সংবাদপত্র সম্পাদন :—সুরেশচন্দ্র 'কল্পদ্রুম' ও 'সাহিত্য' ছাড়া অনেকগুলি সংবাদপত্রও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা' 'নায়ক', 'বাঙ্গালী' প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থাবলী

সুরেশচন্দ্রের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি :—

১। কল্কিপুরাণ (অনুবাদ)। কার্ত্তিক ১২৯৩ (ইং ১৮৮৬)। পৃ. ১২৬।

"মূল সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত"। অনুবাদকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কল্কিপুরাণের যে হস্তলিপি আছে, প্রধানতঃ তদবলম্বনে এই অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে এবং পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে স্থানে স্থানে টীকা সঙ্কলিত হইয়াছে।"

২। সাজি (গল্প)। আষাঢ় ১৩০৭ (১৫ জুন ১৯০০)। পৃ. ১৫৬।

'সাহিত্য' হইতে পুনর্মুদ্রিত আটটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি —প্রাইভেট টিউটার (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯), প্রভা (আষাঢ় ১২৯৯), বাঘের মত (শ্রাবণ ১৩০১), কমলা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩), প্রতিশোধ (আশ্বিন ১৩০৬), তীর্থের পথে (মাঘ ১৩০৬), শোকবিজয়, ও লালসা ও সংযম (কার্ত্তিক ১২৯৮)।

গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন :—"গল্পগুলি ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে একত্র সংগৃহীত হইল। 'শোক-বিজয়' ও 'লালসা ও সংযম' বাল্যকালে রচিত। নবীনবাবু 'অমিতাভে' 'শোকবিজয়ে'র আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; এবং রবীন্দ্র বাবু 'কথা'য় 'লালসা ও সংযমে'র কাহিনী দিয়াছেন। ইহাঁদের রচনা প্রকাশিত হইবার পর পূর্ব্বোক্ত গল্প দুটির পুনঃপ্রকাশের আবশ্যকতা ছিল না; তবু বাল্য-রচনার মায়া অতিক্রম করিতে পারিলাম না।"

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ভাদ্র ১৩২২) Olive Schreiner-র রূপকের অনুবাদ—'শিকারী' ('সাহিত্য', ভাদ্র ১৩০০) ও 'বহু যুগের কথা' ('সাহিত্য', কার্ত্তিক ১৩০০) নামে আর দুইটি রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'সাজি' "শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু"কে উৎসর্গীকৃত। এই সংস্করণে গ্রন্থকার পরলোকগত বন্ধুর মৃত্যুতে লিখিত একটি রচনা ১৩১৮ সালের ১৩ই শ্রাবণের 'বসুমতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন।

৩। রণ-ভেরী। ইং ১৯১৪ (২০ জানুয়ারি ১৯১৫)। পৃ. ৩০।

সার্ আর্থার কোনান্‌ডয়েলের To Arms-এর বঙ্গানুবাদ। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্ত্তৃক বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত।

৪। ইউরোপের মহাসমর (ইতিহাস)। ইং ১৯১৫। পৃ. ২১১।

ইহা ডবলিউ. এল. কোর্টনি ও জে. এম. কেনেডি প্রণীত How the War Began-এর অনুবাদ। "শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত" ও "হক্কার এণ্ড ষ্টাউটন কোম্পানার পক্ষ হইতে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস কর্ত্তৃক বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত।

৫। ছিন্নহস্ত (ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)। কার্ত্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৩৭৫।

সুরেশচন্দ্র কর্ত্তৃক "সম্পাদিত" এই উপন্যাসখানি প্রথমে ১ম-২য় বর্ষের 'ভারতবর্ষে' (১৩২০-২১) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, পরে বর্দ্ধিতাকারে পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৬। আগমনী (সম্পাদিত)। মহালয়া ১৩২৬ (ইং ১৯১৯)। পৃ. ২০৩।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত এই পূজা-বার্ষিকীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতির রচনা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে সুরেশচন্দ্রের "পেস্তার বরফী" নামে একটি গল্প মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। কবিতাপাঠ (সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তক)

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৮। বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (সঙ্কলিত)। ? (ইং ১৯২১)। পৃ. ৩৫৮+১৭।

এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত প্রভৃতির কতকগুলি পুরাতন রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সুরেশচন্দ্রের স্মৃতিকথা চারিটি প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে; এগুলি ১৩২১ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * *

সুরেশচন্দ্র কোন কোন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২৯৯ সালে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রবাসের পত্রে'র ও ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর ২য় সংস্করণ 'বিনোদমালা'র "বিজ্ঞাপন" এবং ১৩১৯ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার বড়ালের ৩য় সংস্করণ 'প্রদীপে'র "প্রশস্তি" অংশ উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

সুরেশচন্দ্রের অনেক রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি গদ্য-রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

কমা (বৌদ্ধ কাহিনী)…'সাহিত্য-কল্পদ্রুম', ১২৯৬, ভাদ্র-আশ্বিন
বড় কে (গল্প)… 'সাহিত্য', ১২৯৮, জ্যৈষ্ঠ
মেঘদূত (সমালোচনা)… ভাদ্র
উপাধি-উৎপাতে বধির বাবু… ১২৯৯, ভাদ্র
এ মাসের বহি ;—সঞ্জীবনী সুধা (সমালোচনা) ১৩০০, মাঘ
৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ‥ ১৩০১, জ্যৈষ্ঠ
শিশুপাঠ্য সাহিত্য (সমালোচনা)… ১৩০৬, ভাদ্র
সাহিত্য-পরিষদ্… ১৩১৫, অগ্রহায়ণ
নবীনচন্দ্র… ১৩১৬, বৈশাখ
নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়… ১৩১৮, ভাদ্র
গিরিশচন্দ্র… ১৩১৯, বৈশাখ
মহামতি ষ্টেড্… বৈশাখ
স্বর্গীয় জ্যোতিশ্চন্দ্র… মাঘ
রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর… মাঘ
'পিপলকা পেড়' (গল্প)… ১৩২১, শ্রাবণ
ভাগা (গল্প)… ১৩২৩, বৈশাখ
মহাকবি মধুসূদন… আষাঢ়
'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!'… শ্রাবণ
ওঁ স্বস্তি!… শ্রাবণ
বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উৎসব… ১৩২৪, পৌষ
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়… ১৩২৬, বৈশাখ
রামেন্দ্রসুন্দর… আশ্বিন
'সে কাল এ কাল' (সমালোচনা)… ১৩২৭, ভাদ্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা

সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া ইহার পরিচালন-কার্য্যে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ১৩০৫-১৮ ও ১৩২৪-২৭ সালে তাঁহাকে আমরা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহ-সভার সভ্যরূপে দেখিতে পাই। পরিষদের নিজস্ব মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। ১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯০৮) গৃহপ্রবেশ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-সভায় সুরেশচন্দ্র যে হৃদয়গ্রাহী রচনাটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আজ ২১শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালীর স্মরণীয় দিন ;—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে, জাগরণের উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে, ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ সুবর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। বাঙ্গালীর এই মাতৃমন্দিরে,—নবনির্ম্মিত সারস্বত-নিকেতন,—যার পবিত্র দেউল আমাদের জাতীয় তীর্থ, কে তাহা অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ এই মহাতীর্থে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি ও কাম্য ফল লাভ করিবে। আজ বাঙ্গালী যে কল্যাণকল্পতরু প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভবিষ্যতের কোনও মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে তাহার ফল ফলিবে। নবভাবে অনুপ্রাণিত,—নূতন আশায় উদ্দীপিত,—মনুষ্যত্বে প্রভাবিত,—নিষ্কাম-কর্ম্মের ও স্বদেশ-ধর্ম্মের পুণ্যমহিমায় সমুদ্ভাসিত ভবিষ্যতের বাঙ্গালী সেই অমৃত ফলের অধিকারী হইয়া মর-জগতে অমরতা লাভ করিবে। আজ সাধনার তপোবনে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যসাধকগণ যে 'অগ্নিশরণে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন,—এক দিন সেই পবিত্র সারস্বত আশ্রমে ভারতের ভারতী আবির্ভূত হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী এই সারস্বত মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন,—সারস্বত সাধনায় ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাবকেন্দ্রে—হোমশালায় পরিণত হউক। এই পবিত্র মন্দিরে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক বাঙ্গালী সেই মহাভাবের সাধনা করুন,—কন্যাকুমারী হইতে তুষারকিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।

বাঙ্গালা সাহিত্য নব-ভারতের ভাবগঙ্গার পবিত্র উৎস—গোমুখীর অমর নির্ঝর। মাতৃমন্ত্রের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রে আজ ভারতভূমি মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালীর 'আনন্দমঠ' তাহার মূল প্রস্রবণ; বাঙ্গালী সে জন্য আত্মপ্রসাদ, গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতে পারে।—হে বঙ্গের সাধক! বাণীর উপাসক! সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিপুল দায়িত্বও তোমার। তুমি যদি এই সাধনমন্দিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—তাহা হইলে, বাঙ্গালীর এই গৌরব যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর জাজ্বল্যমান থাকিবে। আর্য্যাবর্ত্ত আবার নব-গৌরবে উদ্ভাসিত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রভাবিত, সত্য ও সুন্দরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিবে। কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন, সত্যহীন ভারতবাসী জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও সত্যের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আবার বিশ্বের বিরাট-সভায় আপনার স্থান অধিকার করিবে।

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভে 'সাহিত্যে'র সূচনায় লিখিয়াছিলাম, —"জাতীয় জীবনের উন্নতি সাহিত্য-সাপেক্ষ।" যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। আজ

যৌবনের শেষে নবভারতের স্বদেশী যুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝিয়াছি, সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জাতির জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।—রাজনীতির রণক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান নাই। স্বার্থের সংঘর্ষ ও বিজেতা ও বিজিতের বিষম দ্বন্দ্বও জাতীয়তার উৎস নহে। বিশাল ও বিপুল, উদার ও পবিত্র সাহিত্যই মানবকে উদ্বুদ্ধ, উন্নত ও জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সাহিত্যই মানবের উন্নতির সোপান, মুক্তির পথ ;—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

যাহা সত্য ও সুন্দর, সাহিত্য তাহার রত্নাকর। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্যের সাধনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি জাতীয়তার, মানবতার ও মনুষ্যত্বের কারণ্ণেহু। যাহা সত্য ও সুন্দর নহে, তাহা কখনও 'শিব' হইতে পারে না। আমরা সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় বিরত হইয়া, সত্য ও সুন্দরের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, অধঃপাতের অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি,—অবসাদে মুমূর্ষু হইয়াছি। যাহা সত্য নহে, তাহা সুন্দর হইতে পারে না। যাহা সুন্দর নহে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। যাহা একাধারে সত্য ও সুন্দর,—তাহাই 'শিব'। সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভারতের বরেণ্য দেবতা ;—এবং সাহিত্যই সেই দেবতার সুবর্ণ-দেউল, আমরা যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হই। বাঙ্গালী! আবার সাহিত্যের তপোবনে সত্য ও সুন্দরের উপাসনায়, সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—সাহিত্যকে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' বলিয়া বরণ কর, অসত্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া, ভারতে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হউক,—কুৎসিতের চিতাগ্নিশিখায় উজ্জ্বল প্রভায় সুন্দরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।...

এই সাহিত্য-মন্দিরে আপনাদের প্রসাদে আমরা অতীত ইতিহাসের জীর্ণ সমাধি হইতে জাতীয় গৌরবের কঙ্কাল সংগ্রহ করি।—ভবিষ্যতে কোনও পুণ্যবান্—যাঁর প্রসাদে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র লাভ করিয়া, মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ হইয়া, সেই কঙ্কালে সুন্দর দেহের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।—তখন সেই নবপ্রাণ-বলে বলীয়ান্, মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ জাতীয় গৌরবের উদ্বোধনে ও আহ্বানে জাগরুক হইয়া নূতন বাঙ্গালী বাঙ্গালার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে, তখন তাহারা কোটি কণ্ঠে এই পুণ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও কমলার বরপুত্রগণের গৌরব-গাথা গান করিবে! সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া, হে বাঙ্গালী, হে পতিত বিধ্বস্ত আত্মবিস্মৃত, সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালী! তুমি আজ জগতের আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের ভাষায় গাও—

সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

বাগ্মিতা

সুরেশচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন। বক্তৃতায় তিনি কখনও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিতেন না, বরং এরূপ করাকে অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেন। সাধু ভাষায়, স্বল্প সময়ে বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া তিনি শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করিতে পারিতেন।

মৃত্যু

সুরেশচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। তিনি ১ জানুয়ারি ১৯২১ (১৭ পৌষ ১৩২৭) তারিখে, ৫১ বৎসর বয়সে, পরলোকগমন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৬ আষাঢ় ১৩৪১ তারিখে পরিষদ্-মন্দিরে সুরেশচন্দ্রের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য

অপেক্ষাকৃত সামান্য আয়োজন লইয়া বাংলা-সাহিত্যে যাঁহারা প্রভূত খ্যাতি ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা-সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগই প্রধানতঃ এই খ্যাতির কারণ। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সরস বাক্যবাণের সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী অর্জন করিয়াছিল এবং উত্তর কালে তাঁহার অন্য সকলবিধ রচনার স্মৃতি বিলুপ্ত হইলেও এই সমালোচনার জন্য রসিক-সমাজ তাঁহাকে বিস্মৃত হন নাই। সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে একত্র করিয়া প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রতিভা অনুযায়ী সৃষ্টিকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি তাঁহার ছিল; তিনি নিজে যতটুকু সাহিত্যসৃষ্টিই করিয়া থাকুন, সাহিত্যিক সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মোটের উপর এই কারণে আমরা সমাজপতিকে শুধু এক জন সাহিত্যিক রূপে গণ্য না করিয়া যুগ-হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্যে' এই যুগের পরিচয় অক্ষয় হইয়া আছে। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "সুরেশ-স্মৃতি" প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি :—

> 'সাহিত্যে'র একটা আসর ছিল। সুর ছিল বলিয়াই আসর ছিল। অর্থ ছিল না, প্রভুত্ব ছিল না, নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হইবার সামর্থ্য ছিল না। তথাপি 'সাহিত্যে'র আদর ছিল, কদর ছিল, সমঝদার ছিল। তাহার কারণ ঐ সুর। তাহা দেশের সুর, দশের সুর, ঐকতান বাদ্যের সম্মিলিত সুর। তাহাতে অপূর্ণতা ছিল না, অবসাদ ছিল না, 'হা হতোঽস্মি' ছিল না, প্রাণপূর্ণতা ছিল।
>
> কি ছিল, এক কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কি ছিল না, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করা যায়, ছিল না—

ভণ্ডামি। তাহা অশেষ মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিত।

প্রবন্ধনির্ব্বাচনের কড়াকড়ি 'সাহিত্য'কে এই অসাধারণ গৌরব দান করিয়াছিল। এখন লেখকের সংখ্যা অসংখ্য, বুঝি বা পাঠকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এমন দিনে যে কেহ লিখিতেছেন, যাহা ইচ্ছা লিখিতেছেন, বিষয়-বিন্যাসে ও বচনবিন্যাসে স্বেচ্ছাচার সমান ভাবে প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। এমন দিনে প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করা যে কত কঠিন, তাহা 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সর্ব্বদা স্বীকার করিতে হইত। তথাপি দৃঢ়তা তাঁহার রক্ষাকবচ ছিল।

এই দৃঢ়তা কেবল প্রবন্ধবর্জ্জনেই ব্যক্ত হইত না, প্রবন্ধসৃষ্টিতেও ইহা আর এক আকারে আত্মপ্রকাশ করিত, তাহা আশ্চর্য। সম্পাদক অনেক সময়ে নিজেই বিষয় নির্ব্বাচন করিতেন, লেখক নির্ব্বাচন করিতেন এবং লেখার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন! এই দৃঢ়তা 'সাহিত্যে'র আসরে যাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত টানাটানিতে না পড়িলে লেখনী ধারণ করিতেন না। ইহাতে অনেক নূতন পুরাতন লেখক জড়তা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য যে তাড়না ছিল, সে বড় মধুর স্নেহের তাড়না, তাহা কেমন করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, সমাজপতিই তাহা জানিতেন।

'সাহিত্যে' ভণ্ডামি ছিল না বলিয়াই গোঁড়ামি তাহাকে সঙ্কীর্ণ নীতিতে গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে নাই। এই উদারতা না থাকিলে প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে না। বিদেশের সাহিত্যে যাহা কিছু ভাল থাকিত হইত, বিদেশী বর্জ্জনের তুমুল আন্দোলনের দিনেও, তাহা সাদরে সাহিত্যে স্থান লাভ করিত।

সাহিত্যের সমালোচনা 'সাহিত্যে'র বিশিষ্ট গৌরব বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাহাতে অকুণ্ঠিতভাবে তিরস্কার পুরস্কার বিতরিত হইত। সাহিত্যকে অনাবিল রসের আধার করিবার আন্তরিক আকুলতাই 'সাহিত্য'-সম্পাদককে সমালোচনায় সীমাশূন্য, ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রকাশ করিতে অত্যন্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। মমত্ববোধ যত আন্তরিক হয়, অনধিকার চর্চ্চাকে সুশাসিত করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইয়া থাকে। আমার দেশ, আমার ভাষা, আমার সাহিত্য, এই মমত্ববোধ প্রবল হইলে, তাহার প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার নিবারণের জন্য স্বতই সীমাশূন্য ক্ষমাশূন্য কশাঘাত প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই,—লাভবান হইয়াছে।

সুরেশ শক্তিধর ছিল। বক্তৃতায় ও রচনায় তাহার অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মূল আন্তরিকতা। এই গুণ তাহার অনেক দোষ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, এই গুণে অনেক সময়ে তাহাকে তিরস্কার করিতে গিয়া ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত। সুরেশ চলিয়া যাইবে, আমাকে তাহার কথা লিখিতে হইবে, এমন কথা এক দিনও মনে হয় নাই। ইহাই আমার প্রধান শোক।"...'সাহিত্য,' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২১।

প্রতীক্ষা

শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র

রাতের আঁধার ঘনায় ধীরে আমার ঘরে,
দিনের আলো মিলায় যে দূর বনান্তরে।
তার আসার আশায় সারাবেলা
সকল কাজে অবহেলা,
অকারণে হাসির মেলা
পরাণখানি ঘেরে;
দূরের ছায়া নীল আকাশে—
ভাবি বুঝি ঐ সে আসে
অলস-মধুর পূব-বাতাসে
তরীটি তার বেয়ে।

ওরে, আঁধার হ'ল কই সে এল আজ
তবে কি মোর বৃথাই হ'ল সাজ?

ছড়িয়ে দিনু দিকে দিকে
আমার আকুল আবেগটিকে,
দ্বারের পানে ঝিমিঝিমে
রইনু নয়ন মেলি;
পথের 'পরে আভাস জাগে,
কি সুর যে তার চেনায় আগে
অবোধ হিয়ায় কাঁপন লাগে
সকল শাসন ঠেলি।

পায়ের ধ্বনি মিলিয়ে গেল, লগন গেল বয়ে,
"বৃথাই কাঁদ" পথিক, বাতাস আমায় গেল কয়ে

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৩১)

স্কুল আরম্ভ হইল।

চম্পার যুক্তির উপর শ্রদ্ধাটা আরও বাড়িয়াছে টুনুর, সেই জন্য গোড়া থেকেই বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়াই আরম্ভ করিল। সত্যিই ত, একটা প্রতিষ্ঠান গড়িতে গিয়া গোড়াতেই তাহার যদি ধ্বংসের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হয়—নিজের হাতেই, ত এমন অভিশাপ-মাথায়-করা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনই বা কি? নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও সংঘর্ষ যদি নিজে হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, উচিতমত তাহার ব্যবস্থা করার মানে হয়; সংঘর্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাহার সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ানো বাহাদুরির একটা বিলাস মাত্র নয় কি?

গোড়া থেকেই স্কুলটা মাস্টারমশাইয়ের বাসাতেই বসাইল। সংঘর্ষের দ্বিতীয় সম্ভাবনাও এড়াইয়া গেল। দুপুরটা বাদ ছিল। সকালে দুই ঘন্টা, বিকালে দুই ঘন্টা—গুরুমশায়ের পাঠশালার মত। এর আরও সুবিধা এই যে, বিকালের পড়াটা থাকিবে খেলার সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগানো, ক্লাস থেকেই ছেলেরা খেলার প্রাঙ্গণে নামিবে—খেলাটাও হইবে টুনুর দৃষ্টির নিচে, তাহারই বিধানমত। শেষ করিয়া যে-যাহার বাড়ি চলিয়া যাইবে।

আরও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিল—হুড়হুড় করিয়া একেবারে একপাল ছেলেমেয়ে আনিয়া ফেলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। বিকালে খেলার জন্য যে কয়টি ছেলেমেয়ে আসে তাহাদের লইয়াই আরম্ভ করিল, তাও খেলাচ্ছলেই; স্কুল আরম্ভ হইল বলিয়া কোন রকম আড়ম্বর না করিয়াই। ঐ কেন্দ্র থেকেই ধীরে ধীরে আপনার প্রেরণা আর প্রয়োজনে যেমন বাড়িবার বাড়িয়া চলিবে তাহার স্কুল।...টুনুর মনটা বড় বেশী করিয়া সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল এ পরিকল্পনায়, তাহার স্কুলের ছেলেরাই এক সময় হইয়া উঠিবে নিজের অধিকার, নিজের কল্যাণ সম্বন্ধে সচেতন, তাহার স্কুলের মেয়েরাই গ্লানিমুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিবে। মাষ্টারমশাই বিপ্লব দিয়া যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিতেছেন...তাহার জন্য মানুষ চাই না?—এরাই হইবে সে জগতের নূতন মানুষ।

অনাড়ম্বর ভাবে আরম্ভ করার আর একটা সুবিধা এই যে তাহাতে বৈরিতার সম্ভাবনা আরও গেল কমিয়া। মনটা কয়েক দিন অতিমাত্র উগ্র হইয়া উঠিয়া এই নূতন স্বপ্নে এত স্নিগ্ধ হইয়া গেছে যে এমন কিছুই খুঁৎ রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না যাহাতে সংঘর্ষ দূরের কথা, সামান্য একটু উত্তাপেরও সৃষ্টি হয়। চম্পাকে নিজের মনের কথাটা বলিল। চম্পা আরও যেন বাঁচিল, এমন লোকের এত সুমতি হইবে এ তাহার কল্পনারও অতীত। তাহা ভিন্ন আর একটা কথা ছিল, তখন কথাপ্রসঙ্গে উৎসাহ দেখাইল বটে, কিন্তু টুনুর স্কুলের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়া ছেলেমেয়ে যোগাড় করা তাহার পক্ষে কতটা ঠিক হইবে চম্পা পরে ভাবিয়া দেখিয়া বেশ ভালরকম বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বস্তিতে বা অন্য যেখানে যেখানে তাহার যাওয়া-আসা আছে, সবাই জানে তাহার ঠাকুরদাদা বুড়া হইয়াছে, অল্পতেই অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাই তাহার তদারকের জন্য সে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। টুনুর সম্বন্ধে যদি কোন আলোচনা হয়—আজকাল ক্রমেই বেশী করিয়া হইতেছে প্রশংসার আকারে—সে এমন ভাবটা দেখায় যেন মানুষটার সম্বন্ধে তাহারও কিছু কিছু জানা আছে—বনমালীর মারফতই হোক, চরণদাসের মারফতই হোক, বা ঐদিকেই অন্য কোথাও গল্প শুনিয়াই হোক।

স্কুল ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমে এক-আধটি করিয়া বস্তির ছেলেমেয়েই বাড়িল, তাহার পর আস্তে আস্তে খবরটা চারাইয়া পড়িয়া আশেপাশের ছেলেমেয়েও জুটিতে লাগিল। বস্তির পড়ুয়ারা বই পায়, শ্লেট পায়; বাহির হইতেও যাহারা পড়িতে আসে তাহাদের মধ্যেও যাহাদের তেমন অবস্থা নয়, চাহিলেই পায়। মাহিনা কাহারও লাগে না। অভিভাবকদের দিক থেকে এই সুবিধা, পড়ুয়াদের সুবিধা চারি দিক দিয়াই। লেখাপড়াটা যে এক ধরণের খেলাই এ অভিজ্ঞতাটুকু তাহাদের মাথা হইতে মস্ত বড় একটা দুশ্চিন্তা নামাইয়া যেমন একেবারে হালকা করিয়া দিল। এদিকেও হালকা,—একখানি করিয়া বই, একটি শ্লেট; যাহারা প্রাথমিক দুই তিনখানি বই শেষ করিয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে, পড়ুয়া হিসাবে মাতব্বর, তাহাদেরও দুই-খানির বেশী বই নয়। সাতটি লইয়া আরম্ভ করিয়াছিল। দিনটা ছিল বুধবার, পরের বুধবার পর্যন্ত ছেলেমেয়েতে দাঁড়াইল পনেরটি। চম্পা বলিল—"এক কাজ করেন ত আরও হু-হু করে বেড়ে যায়। মেয়েদের যদি বাদ দেন। আপনার স্কুলের যশ হয়েছে—শুনতে পাই ত; তবে ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে—ঐখানে একটু খুঁৎখুঁতুনি আছে অনেকের।"

টুনু বলে—"যশের আসল দিকটাই তুমি বাদ দিতে বলছ—অবশ্য আমার নিজের ধারণার দিক দিয়ে বলছি; বরং ছেলেদের বাদ দিয়ে মেয়ে রাখি বাবে ত রাজী আছি;—এদেরই দরকার বেশী।"

স্কুলই এখন টুনুর সমস্ত চিন্তা, সমস্ত সত্তাটিকে দখল করিয়া লইয়াছে। দুপুরের কয়েক ঘন্টা বাদ দিয়া সমস্ত দিনই জায়গাটি এখন কচি মুখের কলকাকলিতে থাকে ভরিয়া। আনন্দের মধ্যে দিয়া কচি মনের ধীরে ধীরে উদ্বোধন একটা আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় জাগায়। কি করিয়া

আরও ভালভাবে, আরও মাধুর্যের মধ্য দিয়া এদের ফুটাইয়া তোলা যায়? পড়ার চেয়ে মেয়েদের স্ফূর্তির দিকেই দিয়াছে বেশী ঝোঁক। দেয়াল-দিয়া-ঘেরা জমিটার অনেকখানি লইয়াছে কোপাইয়া। বনমালী, চরণ, প্রহ্লাদ তিন জনেই সাহায্য করে, তাহাদের মধ্যেও একটা উন্মাদনা আসিয়া গেছে; স্কুলের জন্য বাছিয়া কাজ চাহে। এখন বাগানটা হইয়াছে আরও অনেক বড়। পনেরটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ভাগ করা অঙ্কুরের হালকা সবুজে গেছে ঢাকিয়া—ওদের সঙ্গেই, ওদের স্কুলের সঙ্গেই সমস্তটার কেমন একটা মিল আছে। টুনু বলিয়াছে ফসল যাহা হয় ওরা সবাই ভাগ করিয়া লইবে; কাহাদের বাগান কত পরিচ্ছন্ন, কাহারা কত ফসল তুলিবে তাহা লইয়া একটা রেষারেষির খেলা পড়িয়া গেছে।

ওর স্কুলের একটা বিশিষ্টতা ছেলেমেয়েদের নিজেদের পরিচ্ছন্নতা। নিজের দেহ থেকে আরম্ভ করিয়া কাপড়, পিরান—যাহার পিরান আছে—নিজেকেই পরিষ্কার রাখিতে হয়। টুনু বলে এইটি বাপু আমার স্কুলের এক নম্বর নিয়ম। ছেঁড়া পড়ার লজ্জা নেই, বরং যখন বাপ-মা জোটাতে পাচ্ছে না, হাসিমুখে ছেঁড়া পড়াতেই বেশী বাহবা, নোংরামি কিন্তু একটা ভূত, তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে রাখতেই হবে সবাই মিলে। সুস্থ দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়াই উহারা সবাই ঠেলিয়া রাখে। টুনুর মুখের একটা কথা খুব চলতি হইয়া গিয়াছে, সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নোংরামি অনুসন্ধান করে। কাহারও দেহে বা বস্ত্রে সামান্য একটু দেখিলে মাষ্টারমশাইয়ের কথা লইয়া চাপা হাসি, ফিসফিসানি পড়িয়া যায়—"ভূতকে ঘাড়ে করে এনেছে ঐ। অবরোধের মধ্যে শিশুরা হাসি খোঁজেও বেশী, হাসেও বেশী। কথাটা ওষুধ মন্ত্রের কাজ করে। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করিল টুনু, ছিন্ন বস্ত্র—অর্থাৎ একেবারে জীর্ণ, তালি দেওয়া লোপই পাইয়াছে, সবাই আজকাল প্রায় একখানি করিয়া নূতনই পরে, একটি করিয়া পিরানও সবারই আছে। প্রথম দিনের সেই "তিকে তিকে" খেলায় রত একটি মেয়েকে প্রশ্নটা করিল। উত্তর হইল---"বাবা ই হপ্তায় তিন দিন দারুট খেলেক নাই - কাপড় কিনে দিলেক; · ই হপ্তা সে ছেড়ে দিবেক।"

একেবারে অতটা হয়তো আশা করিল না টুনু, তবু এই ভাবিয়া পুলকিতই হইয়া উঠিল যে, তাহার স্কুলের আলোর এতটুকুও বস্তির অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে।

সংখ্যাটা পনেরয় আসিয়া কয়েক দিন হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, আবার গতিশীল হইল, আঠার—বিশ—বাইশ; টুনু চম্পাকে বলিল—"ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে পড়তে দেওয়ার ভয়টাও ওরা কাটিয়ে উঠল এবার।"

আরও স্বপ্ন দেখে, নিজের পরিকল্পনায় আরও রং ফলায়। এত অল্পতে মন উঠিতেছে না, তবে আশার কথা এই যে, অল্প ক্রমেই পূর্ণতার দিকে আগাইয়া চলিতেছে, নিজের অন্তরের ঐশ্বর্যেই নিজের এক খণ্ড জমি লইবে—ছোট ছোট কুটীর তুলিয়া আশ্রম-বিদ্যালয় রচনা করিবে; আর, করিতেই তো হইবে—মাষ্টারমশাইয়ের সম্বন্ধ এই স্কুলের সঙ্গে যে বেশীদিন নয় এটা তো বোঝাই যায়। তখন ঐখানে গিয়া উঠিবে দুজনেই। মাষ্টারমশাইকে টুনু আর ওসব কাজে দিবে না কি যাইতে? এই বন্ধনে উঁহাকেও বাঁধিবে।

স্রোত শুধু উল্টাইলই না, উল্টা দিকে প্রবল বেগেই বহিতে লাগিল।

এই সময় দিনচারেকের মধ্যে হঠাৎ কয়েকটি ঘটনা টপটপ করিয়া ঘটিয়া গেল।

বস্তিতে টুনুর হাতে একটা রোগী ছিল। বেশ জোয়ান মরদ, বছর সাতাশ-আটাশ বয়স। এখানকার লোক নয়। যাহার বাসায় ছিল সে কুলিদের সর্দার গোবের। বৃদ্ধ, কিন্তু খুব সবল— সমস্ত শরীর সুপুষ্ট শিরা-উপশিরায় ভরা। লোকটা আগে অন্য কোথায় কাজ করিত, এখানে মাসকয়েক আসিয়াছে, তাহার পর কাজকর্মে দক্ষতার জন্য একটা বিশিষ্ট জায়গা পাইয়াছে। একটু গম্ভীর, কথাও কয় অল্প। মনে হইল যেন বস্তিতে বেশ একটু খাতির আছে। চরণদাসের মারফত খবর দিয়াছিল, টুনু চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হইতে রোগীর পরিচয় দিল—"আমার কেউ নয়, এক ভাগাড়ের গোলা এসে পড়েছে ঘাড়ে, কি করি? পেটের নিচে একটা ব্যথা বলছে।"

টুনুর মনে হইল যেন ওদের ওদিককার লোক— নমশূদ্র কি ঐ রকম কোন শ্রেণীর। পরীক্ষা করিতে ভিতরে যাইতেছিল, লোকটা বলিল---"কিন্তু একটা কথা বাবু, ওষুধের দামটা নিতি হবে, বিজিট নাই নেন।"

টুনু একটু হাসিয়া বলিল—"আমি নিই না।"

"নিতি হবে বাবু।"

মিনতির সঙ্গে বেশ একটা দৃঢ়তা আছে, যেন না লইলে অন্য লোক ডাকিবে। নূতন ঠেকিল টুনুর, আবার হাসিয়া বলিল-- "তা দিও—খোরাক পিছু দু' পয়সা করে; হোমিওপ্যাথিই তো।"

যুবাটি হঠাৎ মারা গেল। আজকাল স্কুল-পর্ব শেষ করিয়া একেবারে সন্ধ্যার সময় টুনু একবার বস্তিতে যায়, পথেই খবরটা শুনিল। গিয়া দেখে হৈ হৈ কাণ্ড। বাসার সামনে প্রাঙ্গণে খাটটা নামানো, তাহারই উপর মৃতের শিয়রের কাছে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ বক্তৃতা দেওয়ার মতই বলিয়া যাইতেছে—"লোকই আমরা—আমি আমার এই মরা পুতের শিয়রে দাঁড়িয়ে শপথ করছি আমরা ছাড়ব না—আমাদের সব লুটে ওরা আমাদের শুকনো হাড়ের রাস্তা বানিয়ে তার ওপর দিয়ে ওদের মোটর হাঁকাবে—আমরা সইব না আর···আমরা খেতে চাই, পরতে চাই, মানুষের মতন থাকতে

চাই, মানুষের মতন ঘর চাই—আমার ছেলে এই চাইতে গিয়ে মরেছে—একটা জান দিয়েছে ; কিন্তু দুটো জান নিয়ে তবে দিয়েছে—আমার বাহাদুর ছেলের শিয়রে দাঁড়িয়ে শপথ করছি—তোমরাও যারা বাঁচতে চাও মানুষের মতন এই বাহাদুরের পা ছুঁয়ে শপথ করো…"

টুলু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; সেই গম্ভীর শান্ত মূর্তি একেবারে উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, মুখে খানিকটা বিদ্যুতের আলো আসিয়া পড়ায় আরও দেখাইতেছে ভয়ঙ্কর · যতটুকু শুনিল তাহাতে মনে হইল এ ধরণের বক্তৃতা শোনা আছে, নিজেরও রপ্ত আছে কিছু কিছু। শ্রোতাদের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন-মন্তব্যে একটা মিশ্র কলরব হইতেছে। মনে হয় অনেক-ক্ষণই সুরু হইয়াছে লোকটার বক্তৃতা, বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে ; শপথের কথায় খাটটা স্পর্শ করিবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।

সবার এই সামনে নিচু হইয়া অগ্রসর হওয়ায় লোকটার দৃষ্টি হঠাৎ টুলুর উপর পড়িয়া গেল। উৎকট ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল —"তুমি কে ? ঐ পোশাকে এখানে ?"

দলটা সোজা হইয়া ফিরিয়া চাহিল। টুলু বেশ খানিকটা দূরে ছিল, দলের মধ্য দিয়া খানিকটা ভেতরে গিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমিও তো তোমাদেরই মধ্যে।"

আগাইয়া একেবারে খাটের মাথায় গিয়া দাঁড়াইল। কতকটা আলো-আঁধারির জন্য, কতকটা বোধ হয় মানসিক অবস্থার জন্য চিনিতে সামান্য একটু সময় গেল, তাহার পরই লোকটা এক রকম উপর থেকেই টুলুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—"ও ডাক্তার বাবু, রইল না, থাকল না, জোয়ান পোলা আমার !…"

গোলমালটা একেবারে থামিয়া গেছে টুলু বৃদ্ধের পিঠে হাত চাপিয়া চাপিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর কাছের কয়েকজনকে শব উঠাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া, তাহাকে লইয়া ফাঁকার দিকে চলিয়া গেল।

শব উঠিলে ফিরিবার সময় দেখে চম্পা কাছেই একটা বাসার বারান্দায় খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকেই দেখিতেছিল, চোখে তীব্র উৎকণ্ঠা ও ভয়।

তাহার পরদিন কি মনে হইল, বস্তিতে আর গেল না টুলু · চরণ আর প্রহ্লাদের মুখে শুনিল বৃদ্ধ আবার আজও বিকালে উত্তেজিত করিয়াছে সবাইকে। তাহার পরদিনও এই ব্যাপার চলিল ; প্রহ্লাদ গেল কাজে ; চরণ দাস গেল না, তবে অন্য একটা ছুতা করিয়া বসিয়া রহিল—কি জানি টুলু কি ভাবে লইবে। ভদ্রলোক·ভদ্রলোক একই তো সব।

ঘটনাটির তৃতীয় দিন চম্পা খবর দিল ম্যানেজার আসিয়াছে। বাজারে একটা কাজ ছিল বলিয়া টুলু বৈকালে আর স্কুল করে নাই। কাজ সারিয়া ফিরিতেছিল, বাজারের শেষের দিকের একটা চালাঘর হইতে একজন লোক বাহির হইতে গিয়াই তাহাকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল। এর আগে এর চেয়েও অল্প দেখা, তবু টুলু চিনিল—ম্যানেজারের সেই হাতসাফাইয়ের লোকটি, অর্থাৎ নিবারণ। চম্পাকে কথাটা বলিল।

পরদিন বস্তির সবাই উঠিয়া দেখিল বৃদ্ধের বাসায় তালা লাগানো, যেন রাতারাতি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বৈকালে চম্পাই খবরটা দিল টুলুকে। তাহার পর নির্বাক হইয়া দুজনে পরস্পরের মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল।…হাওয়াটা যেমন হঠাৎ ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিয়াছিল, একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এর পরেই আরও একটু ব্যাপার হইল। বৈকালেই ম্যানেজারের এক জন চর আসিয়া খবর দিল, পরদিন সকালে চম্পাকে গিয়া ম্যানেজারের সহিত একবার দেখা করিতে হইবে, বিশেষ জরুরি কাজ। টুলু স্কুলের ক্লাস শেষ করিয়া ছেলেমেয়েদের লইয়া বাগানের দিকে যাইতেছিল, চম্পা গিয়া বলিল—"একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে—ম্যানেজার আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।"

কথাটা বলিয়া—একেবারে যেন মর্মস্থলে দৃষ্টি প্রবেশ করাইয়া স্থির ভাবে চাহিয়া রহিল। টুলু বেশ যেন থতমত খাইয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—"ডেকে পাঠিয়েছে ?…তা যাবে…তার মানে এবার তা হলে এখান থেকেই ছেড়ে যাবার কথা তোমায় বলে আসতে হবে তো ?—যেমন এক এক করে সবাই কাটালে…"

"চান না তা আপনি ?"

"চাওয়া-না-চাওয়ার কথা নয়। এ কথা ভিন্ন তো উপায় নেই আর।"

তাহার পর নিজের মনের দুর্বলতা·সঙ্কোচ কাটাইয়া যেন একটু সোজা হইয়া বলিল—"চম্পা, তুমি নিজেকে– নিজের চরিত্রকে আস্তে আস্তে গড়ে তুলছ ; আমার স্বার্থের কাছে তাকে বলিদান দিতে বলব ?"

একবার ছেলেমেয়েগুলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু মৃদুর স্বরে বলিল—"অনেক কাজ হাতে নিয়ে বসেছি এই যা…"

পরদিন যথাসময়ে চম্পা গিয়া ম্যানেজারের বাসায় উপস্থিত হইল। রাত্রে বোধ হয় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, ম্যানেজারের চোখ দুইটা এবারে একটু বেশী লাল, একটু ঝিম ধরিয়া আছে এখনও। দৃষ্টি নিচু করিয়া কি একটা মোটা বই পড়িতেছিল, চম্পা ধীরে ধীরে খামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল—'আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ?'

ম্যানেজার দৃষ্টি তুলিতে তুলিতে বলিল—'কে, চম্পাবতী ? প্রাতঃপ্রণাম ; তোমার উপর কিন্তু অত্যন্ত চটেছি এবার—

অভ্যেস···ছুটির মধ্যেই তাই আমার আসতে হ'ল ছুদিনের জন্যে।'

'রাগও অ পনার দয়া ; কিন্তু কি অপরাধ আমার ?'

'অপরাধ ?···একটা অপরাধ ?···আসলে তুই ছোঁড়াটার দিকে চলেছিস···'

চেষ্টা সত্ত্বেও চম্পার মুখটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই একটা তিক্ত ঔষধ গলার নিচে নামাইয়া দিল।···তাহার পর, আজ এই রকম কদর্য কথায় বাড়াবাড়ি হইবে জানিয়াই নিজে হইতে সুরু করিয়া দিল—'অপরাধ—কাজ ছেড়েছি, খাঁচার ভাতা ছেড়েছি—এই তো ? তা, আজ থেকেই যাব কাজে, টাকাটাও আসব নিয়ে, কিন্তু স্কুল থেকে আমায় চলে আসতে হবে, অন্তত থেকে কোন ফল হবে না আর।'

ম্যানেজার রক্তাক্ত চক্ষু দুইটা তুলিয়া একটু তিগকভাবেই খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—'টীকা না করে দিলে তোর ভাষার মধ্যে মাথা গলিয়ে ভাবে পৌঁছানো রতিকান্তের বাবার সাধ্য নয় চম্পা ; একটু ভেঙে বল্।'

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, যাহা বলিতে যাইতেছে তাহার ভাবটাই যেন মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিতেছে না ; তাহার পর বলিল—'আমায় কাজ দিয়েছেন মানুষটাকে হাতে রাখা কোন রকমে ; সব মানুষেরই একটা পছন্দ-অপছন্দ আছে—ওর আবার তন্তং একটু বেশী এদিকে··· চায় না সে আর খনিতে কাজ করি, কিম্বা ছেলেটার জন্যে আপনাদের কাছে হাত পাতি। ···ছেলেটা তো ওরই—এটা তো মানতেই হবে ?'

ম্যানেজার মাথা নিচু করিয়া শুনিতেছিল, আবার একটু দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল—'তা তুই রেখেছিস হাতে ?'

'মনে তো হয়। না—কি করে বলুন।'

'হুঁ—ল্যাজে খেলছিস চম্পা ? আমার স্কুলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে স্কুল খুলেছে ও।'

'কোথায় আপনার স্কুল আর কোথায় ওর মন-ভোলানো ছটো ছেলে নিয়ে একটা পাঠশালা। তাও যে করেছে, আমারই মতলবে।'

'মতলবটা কি এ গরিব একটু শুনতে পায় না ?'

'পাগলামি নিয়ে ভুলে থাকবে ; আপনার কুলিমজুরদের ক্ষেপাতে যাবে না।'

ম্যানেজার যেন মোক্ষম অস্ত্র হাতে লইয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল—'চম্পা, পাগল তুই আমাকেই ঠাউরেছিস, নইলে এমন করে ভুলোতে চাইতিস না।···'ক্ষেপাবে না'—না ? তবে আমায় কাছেই শোন্—তরসুদিন বিকেলে রমণী ঘোষের ছেলেটা মারা যেতে ঘোর বর্ষার কত্তা কত্তা বক্তিমে ঝাড়ছিল, ও নিজের মুখে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে—আমি তোমাদেরই সঙ্গে। কত শুঁতো দিবি আর বল্ ?'

চম্পা একটু হকচকিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ম্যানেজারের দীর্ঘ বক্তব্যে সময় পাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে, উত্তরও ঠিক হইয়া গিয়াছে তাহার। প্রশ্ন করিল—'সেই জন্যেই কি আরও ওকে সামলে রাখা উচিত মনে করেন না ?'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ—স্বভাব কারও এক দিনে যায় না। আমিও ছিলাম সেখানে, ত্রিশ নম্বর বাসায় ; আপনি বলবেন কি, নিজের কানে সব শুনেছি আমি। আপনাকে যে লোক খবর দিয়েছে সে আমাকেও দেখেছে নিশ্চয়।···ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে একচোট হয়ে গেছে ওর।'

ম্যানেজার একটু সরস হাসিয়া বলিল—'প্রণয়-কলহ ?'

'যাই নাম দিন, গেছে হয়ে। এসবের মধ্যে আর থাকবে না। মানে, আমায় যদি ওখানে থাকতে বলেন ওর জিদ বরদাস্ত করেও ; আর হবে না, ও একটা ভুল করে বসেছিল রমণী ঘোষের কথায় ঝোঁকের মধ্যে পড়ে।···আর রমণী ঘোষও তো নেই যে আর···'

ম্যানেজার চকিত হইয়া মুখটা তুলিল, প্রশ্ন করিল—'কোথায় গেছে ?'

মন-বোঝাবুঝির যেন লড়াই চলিল একটু। চম্পা ইচ্ছা করিয়াই মাথাটা একটু নত করিল, তাহার পর একটু টানিয়া টানিয়াই বলিল—'গেছে মানে, ভয়ে পালিয়েছে হয়তো··· আপনি চটলে যে পালায় সে তো ফেরে না আর।'

চোখ তুলিয়া দেখিল ম্যানেজার স্থিরদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে ; শুধু একটু টানিয়া বলিল—'হুঁ খোঁজ রাখিস তো !···'

তাহার পর হঠাৎই সে আর একটা নূতন গোপন রহস্যের মধ্যে চম্পাকে টানিয়া লইল এইভাবে ও কথাটার উপর আর কোন মন্তব্য না করিয়া বলিল—'তা হলে দাগাবাজি করছিস না তো চম্পা ? যেমন বললি তাতে তো মনে হয় খাঁটি আছিস। তবে কি জানিস দেবতাতেও তোদের চরিত্রের হদিস পায় না।···বেশ, যা তা হলে।'

চম্পা সিঁড়ি দিয়া নামিতে বলিল—'তবে কি জানিস ?— আমি গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দা বসাই।'

চম্পা ঘুরিয়া বলিল—'আপনি গোয়েন্দা দিয়ে ঘিরে রাখুন না আমায়। তাতেও নিশ্চিন্দি না হন, রেহাই দিন না, বড় সুখের কাজ দিয়েছেন।'

ম্যানেজার অল্প হাসিয়া আঙুল কয়টা হেলাইয়া বলিল— 'যা।'

ফিরিয়া আসিয়া চম্পা টুলুকে বলিল—'কোনমতেই ছাড়লে না, আরও দিনকতক জোগাই মন, ফলত: তত দিন আপনার জন্যে উঠুক আর একটু।"

টুনু একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"তোমার কাজ হীরকের টাকা ?..."

"ও নিয়ে জোর করলে ছেড়েই আসতাম ।"

(৩২)

চরিত্রের যে মর্যাদায় চম্পা নিজেকে টানিয়া তুলিয়াছিল—খনির চাকরি ছাড়িয়া, হীরকের খোরপোষের টাকাটা ছাড়িয়া সেখান থেকে আবার একটু নামিয়া পড়িল। তাহা না হইলে ম্যানেজারের কাছে যে অভিনয়টা করিয়া আসিল তাহা পারিত না। ম্যানেজার যদি তাহাকে কাজ করিতে বাধ্য করিত, টাকাটাও আবার লইবার জন্য জোর করিত, চম্পার রাজী না হইয়া উপায় ছিল না, তাহার জন্য তৈয়ার হইয়াই গিয়াছিল। টুনুকে সে বলিল—"ও নিয়ে জোর করলে ছেড়েই আসতাম।"—সেটা একেবারে মিথ্যা কথা।

আসল কথা টুনুকে কেন্দ্র করিয়াই এখন ওর যা কিছু সব। যতক্ষণ এইখানে ছিল ততক্ষণ ও নির্বিবাদে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে—পরেশের ছায়া এড়াইয়া গেছে, কাজ ছাড়িয়াছে, হীরকের ভাতা ছাড়িয়াছে—এক কথায় খনির সঙ্গে কোন সম্পর্কেরই বালাই সে রাখে নাই আর। এখন কিন্তু চম্পার সেইখানেই হইয়াছে ভয়, অর্থাৎ টুনুকে হারাইবার ভয়। ভয়টা প্রথম পায় যেদিন তুগুনিয়ায় আগুন লাগে। তাহার পর আবার টুনু ধীরে ধীরে স্কুলের কাজে মাতিয়া উঠিল, চম্পা আবার নিশ্চিন্ত হইয়া হীরককে লইয়া পড়িল, দোকানে জামা-পিরান জোগাইয়া উপার্জনে মন দিল। তাহার পর আসিল রমণী ঘোষের ছেলের মৃত্যুর সেই দৃশ্য—চম্পা অন্তরাল হইতে সবটা দেখিয়া গেল। বুঝিল সব দুরাশা মাত্র, অন্তর দিয়া কোন বন্ধনকেই স্বীকার করিবার মানুষ নয় ও।

তীব্র আতঙ্কে চম্পার মনটা গেল ভরিয়া, আর তাহা হইলে উপায় কি ? এ প্রশ্নের উত্তর চম্পা একদিনেই পাইল না। শুধু তাহাই নয়—একেবারে চরম উত্তরটিতে পৌঁছিতে অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তরের রাশি ঠেলিয়া আসিতে হইল তাহাকে, সময় লাগিল। কিন্তু পাইল উত্তরটা ; চম্পা একটুখানি নামিয়াছিল, আরও নামিল, আবার একেবারে প্রায় নীচুতে।

উদাসীনের সংসর্গে চম্পা উদাসীন হইয়া গিয়াছিল, আবার নিজের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। সন্ধ্যার সঙ্গে রং মিলাইয়া যে শাড়ীটি পড়িত সেটি আবার পড়িল। খুব হালকা আর মিহি করিয়া আলতার টান দিল। তাম্বুলরাগে হাসিটিকে রাঙাইয়া আরও করিয়া তুলিল মদির। ভ্রূমূলে খয়েরের টিপ দিয়া ছোট কপালটি করিয়া দিল আরও সঙ্কীর্ণ।...এক দিনেই সব নয়, অল্পে অল্পে, দৃষ্টি সহাইয়া অথচ অনিবার্যভাবেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া—কৈশোর থেকে যৌবনের সাধনায় যে সূক্ষ্ম ক্ষমতাটি অধিগত হইয়াছে ওর।...তাহার পর এই অঙ্গকে ঘিরিয়া উঠিল খুব হালকা একটি গন্ধ—একটি অস্পষ্ট স্বপ্নের মত বেড়িয়া রহিল। এত হালকা যেন সবার নাকেও যায় না। এ যেন যাহাকে মুগ্ধ করিতে হইবে কিম্বা মুগ্ধ হইবার লালসাতেই যে যাচিয়া কাছে আসিবে তাহারই জন্য।...বেশী করিয়া নজর গেল মিতিনের। বনমালীকে হাসিয়া বলিল—"উয় বর দিখো গো বুড়া ; তু সবার লজোরটি কুথায় থাকে ? বয়েস হইছেঁ না লাতনীর ? আলতার ঘটা, কোঁপার ঘটা দিখেও বুঝবেক না তো উ মুখ ফুটে বুলবেক নাকি গো ?—দিখো !..."

বনমালী মাথা চুলকাইয়া বলিল—"দিখছি সব, দিখবো নাই ক্যানে ?...যে মানুষটি কথা ক'য়ে গেলোক, আর আসে নাই ক্যানে বুঝি না। তা দিচ্ছি তল্লাস, তুর মিতিনকে বৈধ্য ধরতে বল্, বয়েস যাবার আগেই আমি গেঁথে দিবো বটে।"

চম্পা আবার মোহজাল বিস্তার করিতেছে, কি করে সে ? নিরুপায়ের এই শেষ সম্বল।

কাঞ্চনতলায় আর বসে না সন্ধ্যায়, কাজের অছিলা দেখায়। টুনুর ঘর পরিষ্কার করিতে কিন্তু এমন সময়টিতে আসে যাহাতে নামিবার পর টুনুর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা হয়। আজকাল যত কথাবার্তা সবই প্রায় স্কুল লইয়া, যদি অন্য কথাই পাড়ে টুনু, চম্পা স্কুলের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলে, তাহাতে সময় পায়। সময়ই দরকার এখন, আস্তে আস্তে নিজের সান্নিধ্য দিয়া ছোট ঘরটি পূর্ণ করিয়া তোলা, তাহার পর মনের দুর্গে আঘাত, সূক্ষ্ম কৌশলের সঙ্গে অটুট ধৈর্যের দরকার, সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সময়ের।

এতটুকু কি সচেতন হইয়াছে টুনু ? শাড়ী, কবরী তো খুবই চোখে পড়িবার কথা, পড়ে নাই ? যেগুলা সূক্ষ্ম—কপালের টিপ, মুখের হাসি ?...বোঝা যায় না, শুধুই স্কুল আর স্কুল—স্বপ্নময় দৃষ্টি কাছে থাকিয়াও যেন থাকে কোন্ সুদূরে, কি তাহার লক্ষ্য ঠিক বোঝা যায় না। একদিন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ঘরটাতে চমৎকার একটা মিষ্টি গন্ধ পাই চম্পা, মাঝে মাঝে, কখনও...কিসের বল তো।"

চম্পা রাঙিয়া উঠিল, যদিও হারিকেনের আলোয় টুনুর সেটা নজরে পড়িল না—হয় তো বিদ্যুতের আলোয়ও পড়িত না ; বলিল—"গন্ধ ?—ও ! বোধ হয় হীরাকে যেটা মাখাই মাঝে মাঝে, সেইটে বিছানায় লেগে গিয়ে থাকবে।"

কৈ, হীরকের গায়ে ছিল নাকি কোন গন্ধ ? তাহাকে লইয়া তো অত নাড়াচাড়া করে টুনু, পাইয়াছে নাকি কখনও ? ...কিন্তু গন্ধের মর্ম লইয়া মাথা ঘামাইবে—এত সময় নাই টুনুর।

স্কুল বাড়িয়া চলিয়াছে। আটাশ জন ছেলেমেয়ে এখন, টুনু যেন সামলাইতে পারে না। কাজ করিয়া না সামলাইতে পারার মধ্যে এক ধরণের উন্মাদনা আছে, যখন কাজটা হয় আনন্দের, এ যেন আনন্দকেই বুকে ভরিয়া কুলাইতে না পারা। তবুও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে বৈকি। এটা তো ঠিক যে এ বাসায় কুলাইবে না বেশী দিন। টুনু তৎপর হইয়া

উঠিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া জায়গা দেখিয়া ফেলিয়াছে অনেক, শেষ পর্য্যন্ত একটা ঠিকও করিয়াছে। সেই বটতালাটা সুদ্ধ প্রায় বিঘাখানেক জায়গা, একটা দিক অল্পে অল্পে খোয়াইয়ের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, সামনে প্রায় পোয়াটাক দূরে বস্তি। এই স্কুলের সৌন্দর্য যেমন সব চেয়ে উঁচু জায়গায় বলিয়া ওর স্কুলের সৌন্দর্য হইবে তেমনি সব চেয়ে নীচু জমিতে হওয়ার জন্য—দক্ষিণ পশ্চিম আর পূর্ব দিকে থাকে থাকে উঠিয়া গেছে—বস্তি, তাহার পরই গঞ্জভিহির বাজার, তাহার পর কর্ত্তাপাড়ার রং-চঙে পরিচ্ছন্ন বাড়িগুলা রাত্রে বিজলী বাতিতে ঝলকাইতে থাকে। পূর্ব দিকে বালিয়াড়ির ঢেউ-খেলানো রাস্তা ক্রমোচ্চ, তাহার শীর্ষে স্কুল, বাসা। ঠিক উল্টা দিকে চড়াই ঢলিয়া ঢলিয়া একটা বন্ধুর রেখায় গিয়া শেষ হইয়াছে—অনেক দূরে —নামটা জলতরঙ্গের পাহাড়—কবি-দৃষ্টি ছিল—এমন কেহ নামটা দিয়াছে কোন সময়।

জায়গাটার মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্তও ঠিক হইয়া গেছে। টাকার জন্য মায়ের কাছে লিখিয়াছে, জানে পাইবে, সংসার না করুক, সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার জন্য মায়ের কাছে এ প্রশ্রয় পায়ই।

প্রবল উৎসাহে লাগিয়া গেছে।

এই সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার হইল যাহাতে উৎসাহের জোয়ারটা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

এবারে গরমটা পড়িয়াছে খুব বেশী, এতটা যে খোলার মুখে স্কুলের আরও পনের দিন ছুটি বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুই দিন থেকে আবার গুমট হইয়া এত বেশী গরম পড়িয়াছে যে টুলু বিকালের ক্লাসটা ঠেলিয়া সন্ধ্যার কাছাকাছি লইয়া গেছে। পড়াইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা এলো-মেলো হাওয়া ঘরে, উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া একটু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া বাহির হইয়া গেল। টুলু ঘুরিয়া পশ্চিম আকাশের পানে চাহিয়া দেখে ধূলায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ক্লাস হয় বাহিরের দুইটি বারান্দায়, ঝড়বৃষ্টি আসিতেছে দেখিয়া টুলু ছেলেমেয়েদের দুইটি ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া জানালাগুলা বন্ধ করিতেছে, ততক্ষণ ঝড়টা আসিয়া পড়িল, তাহার একটুখানি পরেই বৃষ্টিও। বাড়ির বাহিরের দিকে বুড়ীর ঘর, সেটারও জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরের মধ্যে বুড়ীর মাতনিকে খিল আঁটিয়া বলিতে বলিতে নিজের ঘরে যখন আসিল তখন ঝড়বৃষ্টি তুমুল বেগে আরম্ভ হইয়া গেছে। উঠানটুকু পার হইতে বেশ একটু ভিজিয়া গেল। ঘরটার সব এলোমেলো হইয়া গেছে, রাস্তার দিকে জানালা দিয়া বৃষ্টি ঢুকিয়া বিছানাটা ভিজাইয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করিতে গিয়া কিন্তু টুলুকে থামিয়া যাইতে হইল—বালিয়াড়ির দিক থেকে একটা ছই-দেওয়া গোরুর গাড়ি এই দিকে আসিতেছে। পথটা ঢালু, কিন্তু হাওয়া আর বৃষ্টির এত জোর যে বলদ দুইটা যেন আগাইতে পারিতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বলদগুলা ভড়কাইয়া ঢালু দিয়া নামিয়া পড়িতেও পারে, গাড়োয়ান যেন সামলাইতে পারিতেছে না। টুলু মুহূর্ত্তখানেক ভাবিয়াই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল এবং ঢালুর দিকের বলদটাকে আটকাইয়া ফেলিল। গাড়োয়ানও নামিয়া পড়িল এবং দুই জনে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া গাড়িটাকে বাসার সামনে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণ গাড়ি সামলাইবার দিকেই সমস্ত মনটা ছিল, টুলু ছিলও ছইয়ের পাশটাতে, লক্ষ্য করিতে পারে নাই—গাড়ি থেকে আরোহীরা যখন নামিল তখন বেশ আশ্চর্য হইয়া গেল—শাঁকরেলের সেই ছেলে দুটি আর তাহাদের সঙ্গে একটি আন্দাজ আঠারো-উনিশ বৎসরের মেয়ে।

টুলু একবার দেখিয়া লইয়া বড় ছেলেটিকে বলিল—"তোমরা আমার ঘরে চলে যাও—যাও তাড়াতাড়ি, ভিজে যাচ্ছ, আমি আসছি বলদ দুটোকে স্কুলে তুলে দিয়ে, একলা সামলাতে পারবে না ও।"

যখন ফিরিল, দেখে তিন জনে ঘরের দরজায় বাইরেটিতে দাঁড়াইয়া আছে; এইটুকু আসিতে দেয়ালের আড়াল সত্ত্বেও বেশ ভিজিয়া গেছে—বোধ হয় সেইজন্যেই। ঝড় খুব প্রবল, টুলু মেয়েটিকেই বলিল—"ভেতরে চলুন।" তাহার পর কারণটা বুঝিতে পারিয়া বলিল—"ভিজে গেছেন তো কি হয়েছে? ঘর মুছে নিলেই হবে; আসুন।"

নিজে আপাদমস্তক ভিজিয়া একশা হইয়া গেছে, পথ দেখাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়া বলিল—'আসুন, আর তো ঘর শুকন রৈল না।'

তিন জনে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। টুলু একটু যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—'আপনারা ঐ কোণটায় গিয়ে দাঁড়ান। কি দুর্যোগ! এলো তো একেবারে…'

কোণের দিকে বাক্স, টেবিল, বই; বড় ছেলেটি বলিল—'তার চেয়ে দোরটা বন্ধ করে দিই।' ঘুরিয়া দরজাটার হুড়কা লাগাইয়া দিল।

টুলু এইবার খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল, ছেলে দুইটির পানে চাহিয়া বলিল—'এবার কি উপায় করি? ভিজে গেছ তোমরা, অথচ আমার বাসায় তো সব দশ হাতের কাপড়।…আর শাড়ি তো একেবারেই নেই।'—বলিয়া মেয়েটির পানে চাহিল।

মেয়েটি বলিল—'আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভিজেছেন তো আসলে আপনি।'

আর কোন কথা হইল না, বাহিরের দুর্যোগের দিকে কান পাতিয়া চার জনেই নিজের নিজের চিন্তা লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড়বৃষ্টি যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং প্রায় তেমনি হঠাৎ

ওদিককার দুই ঘরের দুয়ার খুলিয়া ছেলেমেয়েরা একেবারে হৈ-হৈ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তিন জনেই চকিতভাবে ঘাড় উঠাইয়া টুলুর পানে চাহিল, টুলু একটু হাসিয়া মেয়েটিকেই বলিল—'আমার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সব, চলুন, দেখবেন ?'

বাহিরে আসিতে সবার অস্বচ্ছন্দতাটুকু একেবারেই কাটিয়া গেল, শুধু তাহাই নয়, মেয়েটির মুখে চোখে যেন একটা নূতন আলো আসিয়া পড়িল। কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে টুলুর মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশ্ন করিল—'আপনার স্কুল আছে নাকি ? কই রতন তো আমায় বলে নি !'

বড় ছেলেটির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'বলো নি তো তুমি আমায় রতন !'

রতন টুলুর পানে চাহিয়া বলিল—'আগে ছিল না তো।'

তাহার পর এতক্ষণ যেন কথাটা বলিবার জন্য পেট ফুলিতেছিল এই রকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিল—'আমার দিদি, আপনাকে বলেছিলাম না ? এঁরই কথা।'

মেয়েটি অল্প হাসিয়া বলিল—'আপনার কথাও বলেছে আমায় এরা দুজনেই। স্কুল তখনও তা হলে করেন নি, কিন্তু এর মধ্যে…থাক, আপনি আগে কাপড় ছেড়ে আসুন, অসুখে পড়ে যাবেন নইলে।'

—বলিয়া সমস্ত প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া এমন চুপ করিয়া দাঁড়াইল যেন কথাটা না শুনিলে আর একটি শব্দ মুখ দিয়া বাহির করিবে না। অনুরোধ, অথচ তাহার সঙ্গে জিদ আর আদেশ এমন অদ্ভুতভাবে জড়ানো যে টুলু কোনমতেই এড়াইতে পারিল না। ঘরের চৌকাঠ পার হইয়া শুধু একবার বলিল—'আপনারা কিন্তু ভিজে কাপড়েই রইলেন।' গা হাত মুছিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে যেটুকু বিলম্ব হইল তাহার মধ্যে এরা সবাই বাগানের দিকে চলিয়া গেছে। টুলু উপস্থিত হইলে মেয়েটি বলিল—'এরা বলছে এ বাগান এরাই করেছে, সত্যি নাকি ?'

টুলু হাসিয়া বলিল—"আর আমাকে একেবারে বাদ দিয়েছে ?"

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর করিল—'বাদ দিলেও, আপনি যে আছেনই এটা ধরে নিতাম আমি।…বড় চমৎকার লাগছে আমার—স্কুলের সঙ্গে বাগান—ছেলেরা নিজেই করে আবার।…ছেলেমেয়েরাও সব চমৎকার দেখছি…কিন্তু বলছে মাইনে নেন না আপনি, কি করে চলে ?'

আসল উত্তরটা এড়াইয়া যাইবার জন্য টুলু হাসিয়া বলিল—'মাইনে নিলেও তো অনেক স্কুল চলে না …'

মেয়েটি মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটু ভাবিল, বোধ হয় কথাটার অর্থগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল—"ভুলেই গেছলাম। রতন আর কানন—এই যে আমার ছোট ভাইদুটি, দুজনেই আমায় ওদের স্কুলের কথাটা বলেছিল…"

মুখটা হঠাৎ গম্ভীর আর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল, টুলু প্রশ্ন করিল "কি কথা ?"

রতন একটু সরিয়া গিয়া কতকগুলা গাছের চারা লক্ষ্য করিতে লাগিল, মেয়েটি বলিল—"সেই যে ওরা এদের দুজনকে আপনার কাছে আসতে বারণ করেছিল।…এ রকম স্কুল থাকার চেয়ে না থাকা ভালো তো। কি করব আমরা, আর স্কুলও নেই এ তল্লাটে।'

'আপনার স্কুলে নিন না এদের দুজনকে।'

রতনের এই দিকেই কান ছিল নিশ্চয়, একবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইয়া তখনই আবার চারাগাছে মনোনিবেশ করিল।

টুলু বলিল—বোধ হয় ঠিক হবে না, ভাববে ছেলে ভাঙাচ্ছে।

রতন উঠিয়া আসিল, দিদির দিকেই চাহিয়া বলিল—এ স্কুল কিন্তু রোজ এই রকম বিকেল বেলাতেও হয় দিদি, এরা বলছিল।

মেয়েটি একবার টুলুর দিকে চাহিয়া লইয়া ভাইদের দিকে একটু হাসিয়া বলিল—"কিন্তু আমার হাতে তো নয় ভর্তি করা তোমাদের।"

আবার টুলুর মুখের পানে চাহিল। টুলুর মনের মধ্যে লোভ-সংযমে ছোটখাটো একটু দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, খানিকক্ষণ একটু চিন্তিত রহিল, তাহার পর বলিল—"আমি নোব ওদের ; কিন্তু দিনকতক যাক। মানে এ বাড়িটার ওপর তো আমাদের কোন অধিকার নেই।"

"নিজের বাড়ি করবেন ?"

—খুব উৎসুক দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"এখনও আকাশ-কুসুম বলতে পারেন, তবে ইচ্ছে আছে।"

তাহার পর নিজের কল্পনাটা আস্তে আস্তে শোনাইয়া গেল। স্কুল লইয়া এই প্রথম মনের দোসর পাইয়াছে, বড় আনন্দ বোধ হইতে লাগিল এই ভাবে নিজের আশার কথা শুনাইয়া যাইতে। গাড়োয়ান গাড়ি লইয়া আসিয়াছে, বাহিরে গিয়া টুলু বটবৃক্ষসংলগ্ন জায়গাটাও দেখাইয়া দিল, দরদস্তুর যে হইয়া গেছে সে কথাও বলিল।

মেয়েটি আর কোন কথাই বলিল না, শুধু অন্তরে কিসের পূর্ণতায় যেন সমস্ত মুখটা রাঙা হইয়া গেছে। ছইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল—"গঞ্জের বাজারে আমাদের একটু কাজ ছিল তাই এসেছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম, ঝড় দেখে আবার ফিরতে হ'ল।'

হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, ছেলে দুটিও করিল।

ফিরিয়া আসিয়া বাগানে হাত দিয়াছে, রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল—একবার উঠবেন ?

টুলু তাহাকে লইয়া উঠানে আসিলে বলিল—"দিদি

জিগ্যেস করলেন, আপনার স্কুলে তাঁকে পড়াতে দেবেন, স্কুল হলে? আপনার স্কুলে তো মেয়েও আছে।"

টুনু বিস্মিতভাবে বলিল—তোমার দিদি পড়াবেন?

"দিদি ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছেন—বাবা পড়াতেন। পরীক্ষাও দেবেন···আরও পড়বেন।"

"তোমার মা এখানে এসে পড়াতে দেবেন?"

"মা তো দিদিকে কিছুতে বারণ করেন না, বাবা মারা যাবার সময় মানা করে গিয়েছিলেন কিনা, তা ভিন্ন···"

ছেলেটি থামিয়া গেল। টুনু প্রশ্ন করিল—তা ভিন্ন?···

ছেলেটি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে উত্তর দিল—"তা ভিন্ন দিদি তো পড়াবেনই, নিজে আরও প'ড়ে। বিয়ে করবেন না কিনা।"

"কেন?"

"দুটি ভাই আমরা ছেলেমানুষ, আর মা—তাঁর শরীরও ভাল থাকে না, কে দেখবে?"

টুনু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটু, তাহার পর হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"সত্যি তোমার দিদি পড়াবেন? চলো আমি নিজে যাই তাঁর কাছে, কোথায় তিনি?"

"চড়াইয়ের মাথায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রয়েছেন।"

দুয়ার পর্যন্ত আসিল টুনু তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—আচ্ছা এখন থাক, এর পর এক দিন পারি তো সাঁকরেলেই যাব। তোমার দিদিকে ব'লো, তিনি যদি আমার স্কুলে পড়ান, সে তো আমার স্কুলের মস্ত বড় ভাগ্যি। যত তাড়াতাড়ি হয় আমি চেষ্টা করছি এদিকে। যাও জলটা দেখছি তোমাদের গায়েই শুকিয়ে গেল।

তীর্থপথিক

শ্রীসুবোধ রায়

বারে বারে সুর সমে ফিরে আসে
 নূতন বিহার-ছলে,
ছন্দের যতি, ক্ষণিক বিরতি
 গতিরে পাইবে ব'লে।
যে-রাগিণী বাজে জীবনের সুরে,
রণিত হ'ল কি ছন্দ-নূপুরে?
গানের পাখী কি সন্ধ্যা-প্রদোষে
 কুলায় আসিল ফিরে,
পাখা মেলি' পুন উত্তরিতে কোন্
 নব প্রভাতের তীরে?

শতবার ক'রে শুধায়ে নিজেরে
 উত্তর নাহি পাই,
তবু সে গহন গোপনচারিণী
 অধরারে আমি চাই।
আলো-ছায়া-মাঝে চকিত চমকে
দেখা দিয়ে সে যে লুকায় পলকে,—
ক্ষণিক-মরণ-পরশ-আলোকে
 পুলকাঙ্কিত প্রাণে
নিরুদ্দেশের সরণী বাহিয়া
 চলি তারি সন্ধানে।

চলিতে চলিতে ঘনমেঘছায়
 দিবসেই নামে নিশা,
তীর্থপথের ইঙ্গিতহারা,—
 খুঁজিয়া না পাই দিশা।
সহসা সে-মেঘ-বক্ষ বিদারি'
বজ্র হাঁকে যে আলোক বিথারি',
সচকিত চোখে, ক্ষণিক আলোকে
 পাই পথ-সন্ধান,
শুনি আঁধারের মর্মবাণীটি,—
 আলোকের বীণাতান।

পাইয়া হারাই, হারাইয়া পাই,
 ফিরে ফিরে আসে সুর,
জীবনের দিগ্‌বলয়ে যে হেরি
 নামে ছায়া মৃত্যুর।
সে ছায়ার পারে জানি আছে জ্বালা
সবিতাদীপ্তি, তারকার মালা—
সেই বিশ্বাসে চলিয়াছি পথে
 তীর্থের পানে চেয়ে,
সুখে-দুখে আর আঁধারে-আলোকে
 আনন্দ-গান গেয়ে।

অরণ্যপথের ডায়ারি

শ্রীপরিমল গোস্বামী

৪

৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬। আজ সকালে কয়েক মিনিট মাত্র রোদ হয়েছিল, তার পরেই পাহাড়ের চূড়া থেকে আবার গাঢ় নীল অন্ধকার নেমে এল। হাওয়া ভিজে এবং ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছিল সে হাওয়া জামার নিচে প্রবেশ ক'রে গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। সে এক অদ্ভুত রকমের অনুভূতি। ভিজে ঠাণ্ডার এ রকম অভিজ্ঞতা একমাত্র দার্জিলিঙে দু-এক বার পেয়েছি। একটু একটু বৃষ্টিও হ'ল, কিন্তু সমস্ত দিন মেঘ কাটল না।

জইন্তীতে প্রথমে এসেই মন ভিজেছিল—আজ গা ভেজা সুরু হ'ল।

অশোক সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেল জঙ্গলে বন্দুক নিয়ে। সঙ্গে গেল সুধাংশুপ্রকাশ। উদ্দেশ্য, বাঘ মারার জন্য জঙ্গলে কোথায় মাচা বাঁধা সুবিধাজনক তাই দেখা। ঘণ্টা দুই বাদে ওরা ফিরে এল এক রোমাঞ্চকর খবর নিয়ে। ওরা যেখানে গিয়েছিল তার খুব কাছেই নাকি বাঘের ডাক শুনতে পাওয়া গেছে।

অশোকের মুখের চোখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। মানুষের সাহচর্য আর তার ভাল লাগছে না, মন ছুটে গেছে বাঘের দেশে। ওখানে মাচা বাঁধা থাকলে রাত্রে আর তার ফেরা হ'ত না, তা তার চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কান সর্বদা পেতে রেখেছে জঙ্গলের দিকে, কোনো ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ যদি শোনা যায়। জঙ্গল থেকে কখন কি শব্দ উঠছে আমরা তা শুনতে পাই না, কিন্তু অশোকের কাছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বিবিধ অর্থপূর্ণ। পশুপাখীদের ভাষার 'কোড' তার জানা। "ঐ যে বার্কিং-ডিয়ার ডাকছে!"—হঠাৎ বলে উঠল অশোক। শ্রবণ-যন্ত্রকে যত্নের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে সত্যই শুনতে পেলাম সেই ডাক। "ওর অর্থ কি জান?" অর্থ দূরের কথা, শব্দের সঙ্গেই কখনও পরিচয় ছিল না। অশোক বলল, "ও হচ্ছে ধোঁয়া---ওর থেকে বুঝতে হবে পর্বত বহ্নিমান।"—বুঝলাম এ বহ্নি ওর অন্তরেও লেগেছে।

শীতলাবাবু আমাকে ক'দিন একটি হ্রদের কথা বলছিলেন। হ্রদটি না কি বেশি দূরে নয়—এবং পাহাড়ের মধ্যে। ঠিক হ'ল পরদিন সকালেই আমরা রওনা হব সে দিকে। তবে অশোককে যে কাল পাওয়া যাবে না সে এক রকম ধরেই নিলাম।

৫ ডিসেম্বর। আজ বেলা দশটায় হ্রদ দেখতে রওনা হলাম। বলা বাহুল্য, শীতলাবাবু আমাদের নেতৃত্ব করলেন। বাংলো থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে চলেছি। প্রথমেই পেলাম নেপালী-হিন্দুস্থানীদের এক পল্লী। একটি নেপালী মেয়ে বারান্দায় বসে লেস বুনছে। পাশের বাড়িতে এক বৃদ্ধা কাঠের ডোঙায় বসে শাক বাছছে, সামনে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়ানোতেও তাদের কোনো চাঞ্চল্য দেখলাম না।

শীতলাবাবু ইতিপূর্বে আরও দু-এক বার সেই হ্রদে গেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই অরণ্যজগতে পদচিহ্নহীন পুরনো পথ মনে রাখা সহজ নয়। তাই তিনি এক ভুটিয়া কুলিকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে একটা ভাল পথের নির্দেশ দিল, কিন্তু শীতলাবাবুর তা মনঃপুত হ'ল না, তাঁর ইচ্ছা তাঁর পূর্বপরিচিত সোজা পথে যাবেন। নির্দেশিত পথ ফেলে তিনি এক নদীর ঢালু বুকে নেমে বললেন, "আসুন এই পথে।" আমরা সেই পথেই এসে নামলাম নদীর 'গর্ভ'-এ। সেখানে প্রকাণ্ড এক একটা পাথর। দুধারে পাহাড়, মাঝখানের পথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং তার গতি অত্যন্ত কুটিল। এক পাথর থেকে আর এক পাথরে অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলেছি। এ পথ এমনই খারাপ যে আমাদের দুজনেরই রীতিমতো কষ্ট হলেও শীতলাবাবু কিন্তু তাঁর অভ্যস্ত পা বেশ দ্রুত চালাচ্ছিলেন। বলা বাহুল্য, আমার পা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় অবসন্ন হয়ে এল। সোজা পথ হলেই যে সহজ পথ হয় না, এ কথাটা শীতলাবাবুকে বোঝাতে বোঝাতে চলেছি, কিন্তু তিনি সম্প্রতি নিজেই পাথর হয়ে গেছেন, কথা কানে তুলছেন না।

পনেরো মিনিট এই ভাবে চলার পর নদী-পথ ছেড়ে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। ইতিমধ্যে জঙ্গলে কিছু চলাফেরা ক'রে সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। এ দিকের বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে না এ কথা সবাই বলেছে, তবু বাঘেদের এলাকার মধ্য দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে চলা সম্ভব নয়। অবস্থাবিশেষে কত ভদ্রলোক ছোটলোক হয়ে যায়, একমাত্র বাঘই তার রীতি সব সময় বজায় রেখে চলবে এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া গোখুরো সাপও এখানে আছে।

তবে আপাতত একটা ভরসা ছিল এই যে, আমাদের সঙ্গে শীতলাবাবুর একটি পোষা ভুটিয়া কুকুর ছিল। মিশমিশে কালো, নাক থ্যাবড়া। উঁচু হবে বোধ হয় আট-দশ ইঞ্চ। সে যতক্ষণ নীরব আছে ততক্ষণ আমরাও নিরাপদ। এদের ঘ্রাণশক্তি খুব তীব্র। আশেপাশে কোথায়ও বাঘ থাকলে ডাকবেই। সেটা অবশ্য খুব ভরসার কথা নয়, তবে সে যতক্ষণ না ডাকছে ততক্ষণ অকারণ ভয় পেয়ে লাভ নেই।—কুকুরটির নাম জিমি।

মনুষ্যপদচিহ্নহীন সেই অরণ্যে ছোট ছোট গাছের এমন ঝোপ যে তা ঠেলে ঠেলে চলতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তা

ছাড়া শীতলাবাবুর পক্ষে দিক ঠিক ক'রে চলাও খুব সহজ হচ্ছে না। একটা দিক ধরে কিছু দূরে গিয়ে আবার সেখান থেকে অন্য দিকে ঘুরছি—এইভাবে জঙ্গল ভেদ ক'রে অনেক বার আমরা সেই নদীর বুকে এসে নামছি—এবং নদীর পথ ধরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে আবার ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করছি। ঘণ্টাখানেক চলে এক মাইলও এগিয়েছি কি না সন্দেহ। পাহাড়-পথের গ্রেডিয়েণ্ট বা ক্রমোচ্চতা যে খুব বেশি তা নয়, কিন্তু পাথর-পথের দুর্ভোগে আমার দুখানা পা সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে এল।

হঠাৎ জিমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার এ রকম মূর্তি এর আগে দেখি নি। কি হ'ল হঠাৎ? সে ছোঁক ছোঁক ক'রে মাটি শুঁকছে আর ছুটছে। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ নক্ষত্র-বেগে বাঁ ধারের জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই জঙ্গল ভেদ ক'রে দশ-বার হাত আগে (আমরা ততক্ষণ দশ-বার হাত এগিয়েছি)—আমাদের সম্মুখে বেরিয়ে এসেই দু-তিন পাক ঘুরে আবার ঢুকে গেল ডান ধারের জঙ্গলে। সেখান থেকে বেরিয়ে আবার বাঁয়ের দিকে ঢুকল। আমরা তো অবাক গেলাম ওর এই ব্যবহারে। কিন্তু কোনোমতেই তার গতি নিয়ন্ত্রণ করা গেল না। শীতলাবাবু জিমি জিমি করে ডাকতে লাগলেন। স্বাভাবিক অবস্থা হলে জিমি সে ডাক অগ্রাহ্য করতে পারত না, কিন্তু এখন তার মনোভাব অনেকটা এই যে, "মশায়, এখন আমাকে বিরক্ত করবেন না, এখন আমি নিজের একটি বিশেষ তালে আছি।"

জিমির এই রকম ছুটে বেড়ানোর চেহারা দেখে তাঁত চলার সময়কার মাকুর কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু তার এই ছুটে বেড়ানো ইঙ্গিতপূর্ণ হলেও আমাদের পক্ষে যে সেটা ভয়ের ইঙ্গিত নয় তা বোঝা যাচ্ছিল তার নীরবতায়। হিংস্র জন্তুর গন্ধ পেলে জিমির ব্যবহার অন্য রকম হ'ত। চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এবারে সে অতর্কিতে আমাদের বাঁ দিক থেকে ডান দিকের জঙ্গলে ছুটে যেতেই আমাদের অলক্ষ্যে ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করতে করতে কয়েকটি বন মুরগী প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল, জিমিও কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল বিষণ্ণ মুখে। সমস্তটা ঘটনা নাটকের মধ্যবর্তী একটা হাল্কা দৃশ্যের অভিনয়ের মতো মনে হ'ল যদিও দৃশ্যটি বিয়োগান্ত হতেও আটক ছিল না।

আমরা ক্রমেই গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করছি। পায়ের শক্তি লুপ্ত, তবু জোর করে চলেছি। কত পরিচিত-অপরিচিত গাছের ঝোপ। কত বাসকের গাছ, পিপুল-লতা, গাঁদাল, শতমূল, এই বিশাল অরণ্যে আশ্রয় পেয়েছে। আরও যে কত রকম গাছ আছে তার নাম জানি না।

শীতলাবাবুকে বললাম, "আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব নয়।" তিনি বললেন, "আর বেশী দূর নয়—এতখানি এসে ফিরে যাওয়া কি উচিত হবে?"

সুধাংশুকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কি বল?"

সে বলল, "আমি পারব।"

আমার পক্ষে সেখান থেকে ফিরে আসার প্রস্তাব আমার পক্ষেই বেশি দুঃখের, কারণ হ্রদ দেখার উৎসাহ আমারই বেশী ছিল, এবং আমার অনুরোধেই আজকের এই অভিযান। উৎসাহের আরও কারণ ছিল এই যে, পাহাড়িয়া হ্রদে আমার ছবির বৈচিত্র্য বাড়বে; অন্যদিনের জন্যে বাইরে এসে সেই উপলক্ষ্যে যতগুলো অভিনব বস্তু দেখা যায় তারও একটা তাগিদ ছিল। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি শক্তি ফুরিয়ে আসছে, এর পর জোর ক'রে হাঁটতে চাইলে হয়তো ফিরে আসাই শক্ত হবে।

শীতলাবাবু বার বার আমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ক'রে আমাকে লজ্জা দিতে লাগলেন, বার বার বলতে লাগলেন অত্যন্ত কাছে এসে ফিরে যাওয়াটা কেমন হবে?

আমি আরও একবার সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় ক'রে প্রশ্ন করলাম, "ঠিক ক'রে বলুন তো আর ঠিক কত দূর আছে?"

শীতলাবাবু বললেন, "এই যে পাহাড়ে এখন উঠছি—তখন একটা পাহাড়ে উঠতে সুরু করেছি—এই রকম আরও মাত্র তিনটি পাহাড় পার হলেই হ্রদ। তবে সে তিনটি পাহাড় এর চেয়ে একটু বেশী খাড়া।"

মুহূর্তে আমার মন থেকে নবসঞ্চিত সাহস, এবং পা থেকে অবশিষ্ট শক্তি অন্তর্হিত হ'ল। আমি বললাম, "থাক।"

তখন পাহাড়টির পিঠে উঠে বসেছি।

শীতলাবাবু বললেন, "এইখানে কিছু বিশ্রাম ক'রে চলুন।" কিন্তু তখন আমার পা কাঁপছে।

এ রকম ক্লান্তি যে হতে পারে তা কল্পনা করি নি। এক দিন পূর্বে হাতী-খেদার মাচায় সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে যে ক্লান্তি অনুভব করেছি, তার পর অন্তত তিন দিন বিশ্রাম নিলে তবে হয়তো সব ঠিক হয়ে যেত, কিন্তু মাত্র এক দিনের বিশ্রামে সে ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারি নি। তদুপরি আজকের পথের বড় বড় পাথরখণ্ড যখন একে একে পার হচ্ছিলাম তখন প্রত্যেকটি পদপাতে একটা ক'রে ডন দেওয়ার পরিশ্রম হয়েছে। উবু হয়ে একটা পাথর ধরে আর একটা পাথরে এগিয়ে যাওয়ার সময় সেই রকমই মনে হচ্ছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম বাড়ি ফিরে দৈনিক দু'শো ডন দেওয়া অভ্যাস ক'রে ভবিষ্যতে আবার আসব এখানে। 'ইয়ারো' এবারে অদেখাই রইল।

যে পাহাড়টায় বসেছি সেটাকে মনে হচ্ছে যেন প্রকাণ্ড একটা রোঁয়াওয়ালা আদিম অতিকায় জানোয়ার, তার ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে।

ইতিপূর্বে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটেছি, কিন্তু এ রকম ভয়াবহ জায়গায় এতক্ষণ বসে কাটানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বসে আছি লোকালয় থেকে বহু—বহু দূরে—প্রাচীন অরণ্যের মাঝখানে।

চারদিক নিস্তব্ধ। চারদিক নীরন্ধ্র—সূর্যের আলো প্রবেশের পথ নেই। দূরে কোথাও উঁচু গাছের ডালে যে এক টুকরো রোদ দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ ক'রে তুলেছে, সেই আলোটুকুতেও যেন একটা ভৌতিক অবাস্তবতা। কি ভীষণ নিস্তব্ধতা! সমস্ত বনভূমি থেকে যেন একটা অপার্থিব উদাত্ত সুর ধ্বনিত হচ্ছে। এক অদ্ভুত অনুভূতি। মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্বে প্রকৃতি হতে এই মাটির বুকে আবির্ভাব ঘটেছে এই অরণ্য জগতের। এখানে কত বিচিত্র প্রাণী যুগযুগান্তর ধরে বাস ক'রে গেছে। আজ তাদের চিহ্ন নেই, কিন্তু তাদের স্পর্শ এসে লাগছে গায়ে।

এক একটা গাছ কি দীর্ঘ। একটুখানি রৌদ্রালোক, একটুখানি হাওয়া, আর আকাশের একটুখানি নীলিমার জন্যে পরস্পরের উর্দ্ধমুখী প্রতিযোগিতা। এক দল শাখা দেখা দিতে না দিতে তার উপরের স্তরে আর এক দল শাখা বেরিয়েছে। নীচের বঞ্চিত শাখাদল শুকিয়ে গেছে আলোর অভাবে। সেই উপরের শাখাদলও প্রচুর রোদ পেয়ে পুষ্ট হবার আগে, তাদের উপরে আর এক দল নতুন শাখা বেরিয়ে এসে তাদের বঞ্চিত করেছে। এইভাবে শাখার পর শাখার প্রতিযোগিতা চালিয়ে গাছ হু-হু ক'রে বেড়ে গেছে যতদূর বাড়তে পারে। এখন কেবল উপরের শাখাগুলোই তার সহায়, নীচের শাখারা কোন মর্য্যাদা পেল না। তারা মরে ঝরে গেছে। গাছেরা প্রত্যেকেই বাঁচবার অধিকার দাবী করেছে পরস্পরের কাছে। তারা সবাই মাথা তুলেছে বহুদূর আকাশে—সেইখানে তাদের ছুটে চলার প্রান্তসীমায় আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

নীচের ধাপের ছোট গাছগুলো আলো থেকে বঞ্চিত বটে, কিন্তু মাটির রস থেকে নয়। বনস্পতিরাই সূর্যকে আড়াল ক'রে রেখে মাটিকে একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয় নি, ছোট গাছেরা শুধু এই টুকুতেই খুশী হয়ে নিজ নিজ ভাগ্যের সঙ্গে একটা রফা করে নিয়েছে। অরণ্য-সমাজে সবারই স্থান আছে, অথচ কেউ কারও উপর নির্ভরশীল নয়—একমাত্র পরগাছা ছাড়া। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখলে মোষের পিঠে-বসা মশার মতোই মনে হয়।

আর অরণ্য আশ্রয় দিয়েছে অগণিত জীবজন্তুকে। মানুষও এক দিন অরণ্যেই ছিল, কিন্তু সেখান থেকে সরে এসেছে ধীরে ধীরে। জঙ্গল কেটে খোলা জায়গায় ঘর বাঁধতে শিখেছে, কিন্তু হিংস্র পশু জঙ্গলেই রয়ে গেছে। তাদের রক্তলোভী হিংস্রতা সত্ত্বেও তারা মানুষকে ভয় করে যেমন মানুষ ভয় করে তাদের। যে মানুষের মধ্যে আজও জন্তুদের সঙ্গে লড়াইয়ের দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি রয়ে গেছে তাদের পক্ষে অরণ্য এক মহা আকর্ষণ। অরণ্যের মায়ায় তারা আচ্ছন্ন।

অশোকও তাদেরই দলে। সে সন্ধ্যা-সকাল জীবনের মায়া তুচ্ছ ক'রে বন্দুক নিয়ে একা বেরিয়ে যাচ্ছে বড় হাতী বাঘের লীলাভূমিতে। সন্ধ্যা হলে তাকে কোনো মতেই ধরে রাখা যায় না। তখন তার দ্বিতীয় আর একটা সত্তা জেগে ওঠে। মুখ-চোখের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। মুখাংশু ঠাট্টা ক'রে বলে, বাঘ না পেলে হয় তো আমাদেরই গায়ে ডোরা কেটে গুলি চালাবে।

—এই বাঘের রাজত্বে বসে এই কথাগুলোই বেশী ক'রে মনে পড়ল।

আমাদের সঙ্গে কিছু কমলালেবু ছিল—কোথাও যেতে হলে লেবু সব সময়েই সঙ্গে থাকে—সেগুলো বসে বসে সবাই মিলে খেলাম। আশেপাশে কতকগুলো ভাঙা শুকনো ডাল পড়ে আছে আর সেই সব ডালে একটার পর একটা ব্যাঙের ছাতা লাইন করে সাজানো। সেগুলোও শুকিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটা ছিল বেশ বড়, বাচ্চা হাতীর কানের মতো দেখতে—সেটা আমরা কেটে নিলাম ব্যাঙের ছাতা-বিশারদ গোপাল ভট্টাচার্যের জন্যে।

আমরা যে পাহাড়টায় বসে আছি তার নিচে দিয়ে সঙ্কীর্ণ একটি নদীর চিহ্ন। এখন সে শুভ্র উপলখণ্ডের শ্বেত পতাকা বুকে নিয়ে অরণ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষর করে পড়ে আছে। তার বুক এখন ঝরা-পাতার আশ্রয়। বর্ষার আরম্ভে তার সন্ধিকাল ফুরিয়ে যাবে। তখন নেমে আসবে উন্মত্ত স্রোতের অতি প্রবল ধারা। তখন সে পাহাড় থেকে গাছপালা ভেঙে প্রকাণ্ড এক একটা পাথরখণ্ডকে ঠেলে ভেঙেচুরে গর্জন করতে করতে নিচে ছুটতে থাকবে। স্রোতের সঙ্গে অন্ধ বেগে ছুটে চলবে গাছপালা আর পাথর। দুই তীরের সমস্ত গাছ ভয়ে কাঁপতে থাকবে। শিহরণ জাগবে মাটি-পাথরের অন্তরে।

গভীর অরণ্যে এই সব শুকনো ছোট ছোট পাহাড়িয়া নদীর একটা অবর্ণনীয় রূপ আছে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শুধু সাদা পথ। জল নেই, স্রোত নেই, শুধু সাদা সাদা পাথর। অপরিচিত দুর্গম অরণ্যের সঙ্কীর্ণ নদী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে আছে, তবু এর যোগাযোগ মহাসমুদ্রের সঙ্গে। তাই এখানে বসে এর দিকে চাইলে এর সঙ্গে মন ছুটে যায় এর আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বহির্বিশ্বের আলোকিত উন্মুক্ত আকাশের নিচে। বর্ষায় অরণ্যের অন্তরে এসে এর নৃত্যছন্দ দেখবার উপায় নেই। তখন আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ। মানুষের সাধ্য নেই তখন এইখানে প্রবেশ করে। তখন এখানে জোঁকের রাজত্ব।

পাহাড়ে এ রকম কত নদী! বর্ষায় এরা মানুষের পথে যে কি রকম বাধা সৃষ্টি করে তা বোঝা যায় এ অঞ্চলের যাবতীয় পথে। সেখানে এই সব নদীর আপাত শান্ত বুকের উপর অগণিত সুদৃঢ় সেতু বাঁধতে হয়েছে।

আমরা প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রাম করলাম এখানে। মন অনেকটা স্নিগ্ধ হ'ল কিন্তু পায়ের ব্যথা আরও বেড়েছে।

কিন্তু শীতলাবাবুর উৎসাহ অদম্য। ভদ্রলোক আমাদের খুশী করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বলেন, "আমি যদি এখানে নূতন-আসা বাঙালী ভদ্রলোকদের একটু সাহায্য না করি তা হলে তাঁরা যে নিরুপায়।" আশ্চর্য মানুষ। বলেন, "এখানে কোনো বাঙালী যদি আসেন আমার সাহায্য সব সময়েই পাবেন। কোনো ব্যবসা উপলক্ষে এলেও তাঁকে যথাসম্ভব সাহায্য করব।" আমি ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে একবার কথায় কথায় বলেছিলাম এমন চমৎকার পটভূমিতে সিনেমাওয়ালারা এলে তাঁদের কাহিনী সহজেই জমিয়ে তুলতে পারেন। শীতলাবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, "আপনি প্রস্তাব করুন কোনো সিনেমা কোম্পানীর কাছে—আমি সব রকমে তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

কিন্তু এত সহৃদয়তা সত্ত্বেও তিনি আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছেন না, আমাকে হ্রদে বিসর্জন তিনি দেবেনই। তিনি বারবার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে এত দূরে এসে ফিরে যাওয়া উচিত হচ্ছে না। কিন্তু বিশ্রাম নেবার পরেও যখন আমার মতিগতি ফিরল না তখন অগত্যা তিনি চুপ করলেন।

ওখান থেকে রওনা হয়ে কিছু দূরে এসে চমৎকার একটা পথ পাওয়া গেল। এটা সত্যিই পথ এবং সম্পূর্ণ সমতল। ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে এসেছে। প্রথম থেকেই যদি এই পথের সন্ধান পেতাম তা হলে আজ হ্রদ দেখা কেউ বন্ধ করতে পারত না। আসবার মুখে ভুটিয়া কুলি এই পথের কথাই বলেছিল, কিন্তু তখন শীতলাবাবু তা গ্রাহ্য করেন নি।

কোনো কষ্টই হচ্ছে না এ পথে ফিরতে। অবশ্য এ পথটুকু হ্রদপথের আরম্ভ মাত্র। এ পথে এলেও চারটি পাহাড়ে ওঠার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত না।

জঙ্গল পার হয়ে পথ অনেকখানি ফাঁকা। একটা পাশে আসাম লতার ঘন ঝোপ। বড় গাছ এ দিকে বেশি নেই। মিনিট পঁচিশ এ পথে চলেই নদীর কলধ্বনি শোনা গেল। বুঝলাম জইন্তী নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। সন্দেহ রইল না যে আজকের মতো দুর্ভোগের সীমারেখা ভেদ করে বেরিয়ে এসেছি।

আমরা জঙ্গল-পথ পার হয়ে নদীর ধারে রেল-লাইনের কাছাকাছি একটা বস্তীতে আসতেই আট-দশটা দেশী কুকুর বিভিন্ন বাড়ি থেকে আচমকা ছুটে বেরিয়ে এল হাঁ-হাঁ ক'রে। তারা জিমির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। ব্যাপার বুঝে অনেকগুলো লোক লাঠি নিয়ে ছুটে এসে জিমিকে ওদের নির্দিষ্ট সীমা পার করিয়ে দিল। জিমি কিন্তু এমন ভাবে চলতে লাগল যেন কিছুই হয় নি।

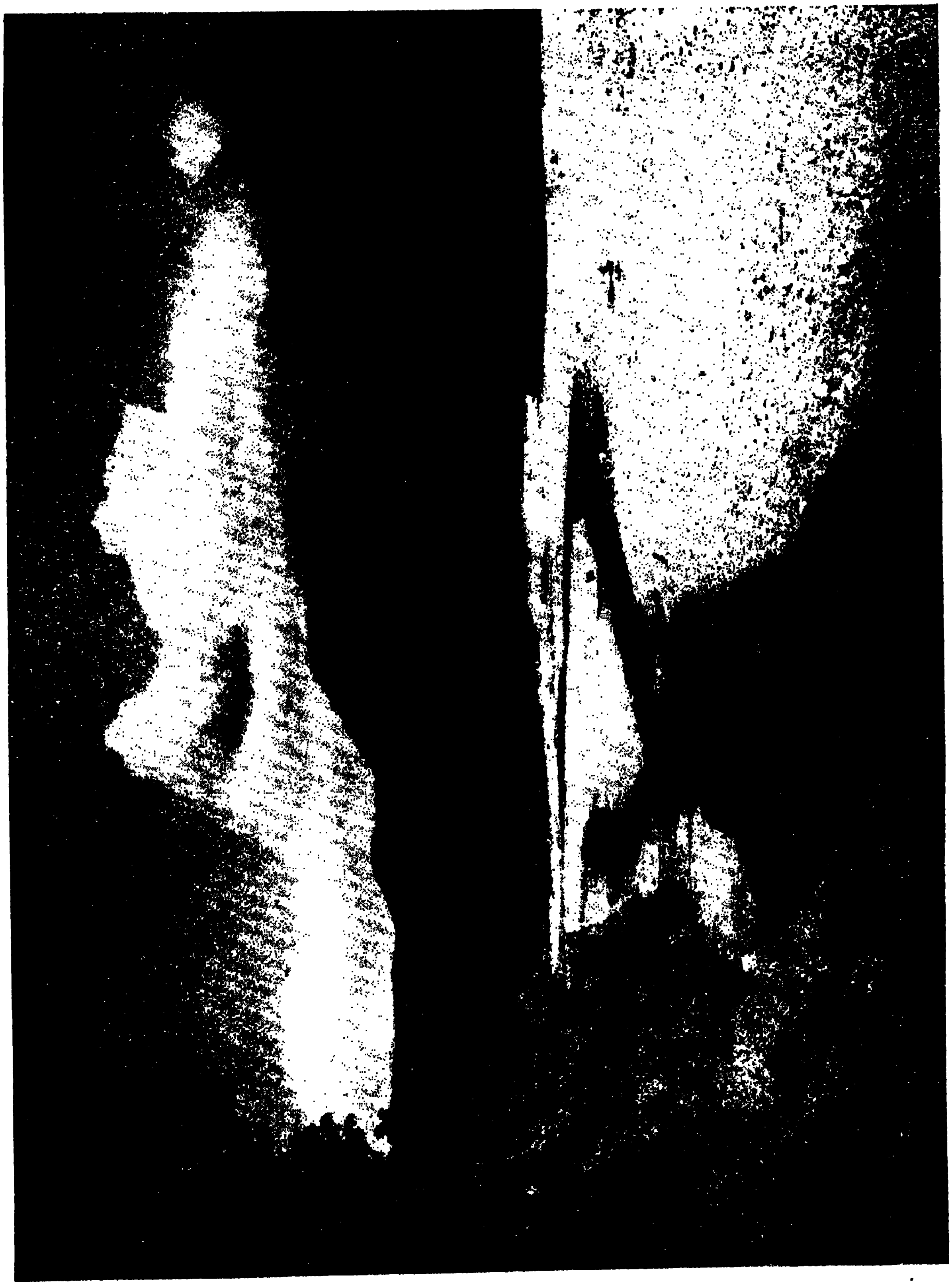
৬ই ডিসেম্বর। আমরা এখানে ক'দিনেই প্রায় জংলী হয়ে উঠেছি—কারণ আমাদের সবার কানের পিঠে এবং মাথায় ঝাঁটুলি ধরে গেছে। সকালে বসে বসে আজ নাপিতের সাহায্যে সেগুলো ছাড়ানো গেল। কাল ঠিক হয়েছিল আমরা সবাই মিলে ভুটান ঘাট দেখতে যাব এবং ঘাট পার হয়ে ভুটানের জমিতে পদার্পণ করব। কি ভাবে সেখানে যাওয়া যায় তাই আলোচনা করছিলাম।

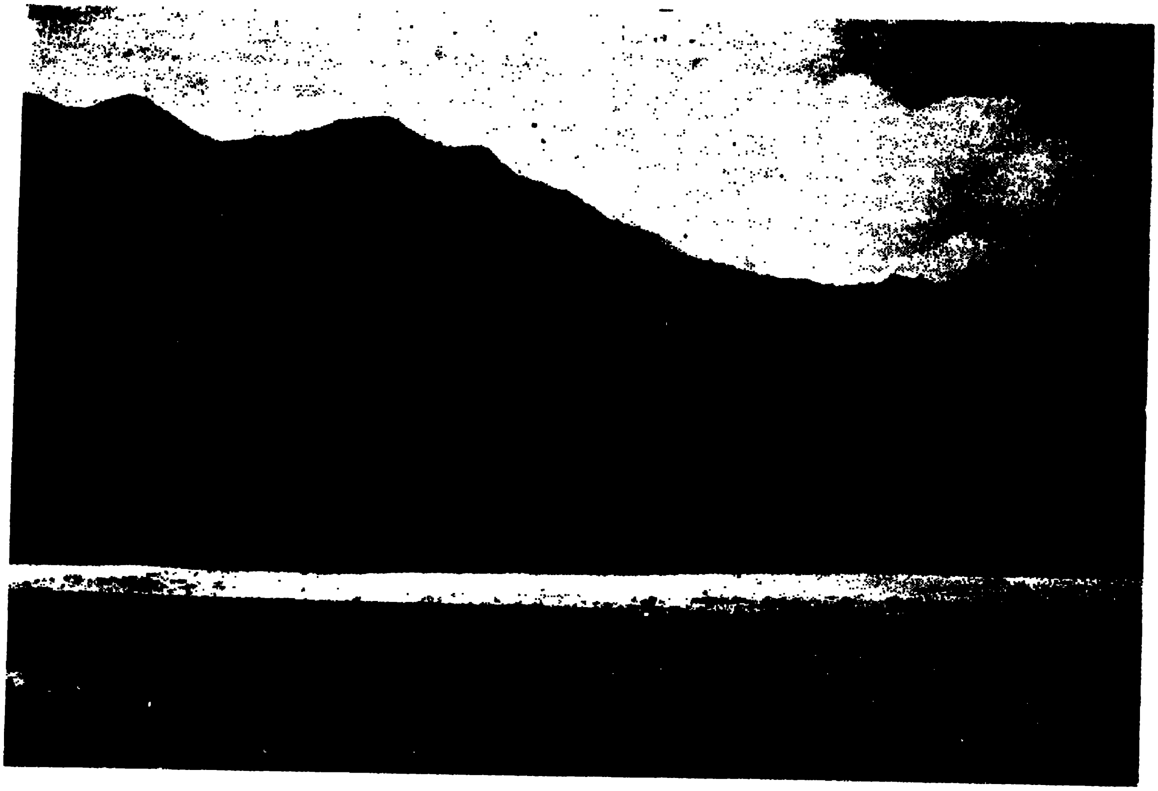
আমরা যে ট্রাকে এসেছিলাম সেখানা তিন তারিখে ফিরে গেছে— সুশীল পোদ্দার এবং লাদুও নেই—এখন আমাদের সঙ্গে আছে কেবল বাহাদুর নামক নেপালী পাচক। ট্রাকের সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াতে দূরে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে, কিন্তু ভুটান-ঘাটে না গেলে ভ্রমণ-বৈচিত্র্যে একটা বড় অভাব থেকে যাবে এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। রেডিও-সেট চলে যাওয়ায় বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন, এমন অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকা অস্বস্তিকর। তাই কি করে ভুটান-ঘাটে যাওয়া যায় সে এক সমস্যা হয়ে উঠল। কিন্তু ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল। জইন্তীতে একটি বড় চুণের কারখানা আছে। এই কারখানার মালিক বি. কে. রায় মহাশয়ের ট্রাকখানা এক দিনের জন্যে পাওয়া যাবে— হঠাৎ এই খবরটি শুনে আমাদের মানসিক বিমর্ষতা দূর হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই।

আজই রওনা হবার দিন—বেলা দশটায়, কিন্তু রওনা হতে বেলা সাড়ে বারটা পার হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে দুটি ক্যামেরা ও দুটি বন্দুক—ও যুক্ত-খাদ্য-ও-পানীয় কমলা নেবু। খুকলঝোরায় যে পথে গিয়েছিলাম সেই পথেই চলেছি। রায়-ডাক নদী পর্যন্ত যেতে হ'ল না, তার কিছু আগে মধুন পাড়া নামক জায়গা থেকে ভুটান ঘাটের পথ সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। সে পথ খুবই খারাপ। চষা জমির মাঝখান দিয়ে উঁচুনিচু এবড়ো-খেবড়ো পথ। পাড়াগাঁয়ে বর্ষায় গোরুর গাড়ির চাকা ক্রমাগত কাদার মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের ফলে যে রকম গর্ত হয়ে যায় এবং বর্ষার পরে শুকিয়ে শক্ত মাটির দাঁত বেরিয়ে থাকে তেমনি। তার মধ্যেও আবার পাহাড়িয়া জমির চড়াই-উতরাই।

পথের দুধারে সরষে ক্ষেত। হলদে ফুলে মাঠের পর মাঠ ছাওয়া। সুমিষ্ট উগ্র গন্ধ। এই গন্ধে একটা মাদকতা আছে। বাল্যকালে এই গন্ধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল—হঠাৎ আজ সেই পুরনো পরিচিত গন্ধে কি আনন্দ যে হ'ল। দুচোখ ভরে মাঠের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিছনে ঘন নীল পর্বতশ্রেণী, কুয়াশায় অর্ধবিলীন। নীল আকাশের গায়ে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ। তারই পটভূমিতে এই সুবিস্তীর্ণ হলুদ সমুদ্র। দুই বিপরীত বর্ণ পাশাপাশি, তাতে দুটি রঙই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সরষে ফুলের উগ্রমধুর গন্ধে মন অবসন্ন হয়ে এল।

মাঠের মাঝে মাঝে কৃষাণদের দু-একখানা ক'রে চালা-ঘর। পথের থেকে অপেক্ষাকৃত কাছে, তিনখানা চালাঘরের একটি উপনিবেশ। ঘরগুলো অত্যন্ত জীর্ণ—সব দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরাও নয়। শীতকালেও এই ঘরে লোক বাস করে, আশ্চর্য!





রায়ডাক নদীর অপর পারে ভুটান পাহাড়ের দৃশ্য



ভুটান সীমানায় যাইবার খেয়া

আমরা এই রকম মেঠো পথ প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম ক'রে ভুটান-ঘাটের বাংলোর কাছে গিয়ে থামলাম। বাংলোটি দেখতে খুব চমৎকার। কিন্তু খোলা জায়গায় নয়। তার তিন দিকেই অরণ্য—একটা দিক মাত্র নদীর দিকে খোলা—কিন্তু তবু বাংলোর উপরতলায় না উঠলে নদী দেখা যায় না। এখানে যে শালবন দেখলাম তার অধিকাংশই নূতন গাছের। ফরেস্ট বিভাগ থেকে অরণ্য-রক্ষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা হয়। কোন্ জমিতে কোন্ বছরে নূতন গাছ লাগানো হ'ল তা লেখা থাকে জমির সঙ্গেই।

বাংলোর পৌঁছনোর কিছু আগে ট্রাকে যাবার সময় জঙ্গলের মধ্যে কাশফুলের একটি চমৎকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। জঙ্গল ভেদ ক'রে যত দূর চোখ যায়, কেবল সাদা আর সাদা! আর তার উপর রোদ লেগে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে চোখ ঝলসে যায়। বাংলোয় পৌঁছে যখন বুঝলাম দৃশ্যটি বেশি দূরে নয়, তখনই মনে হ'ল ফেরবার পথে অরণ্য ভেদ ক'রে ঐ শ্বেত হ্রদে একবার ডুবতে হবে। ক্যামেরার পক্ষে এ এক অভিনব দৃশ্য।

আমরা ট্রাক থেকে নেমেই উঁচুনিচু পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। খুরুলবোরার পথে যেখানে এই নদী খেয়া-নৌকোয় পার হয়েছিলাম তার তুলনায় এখানকার প্রশস্ততা কিছু কম। তবে এখানে নদীর মাঝখানে কোনো চর নেই। জলের দুধারে অনেকখানি ক'রে বালুকাপূর্ণ তীরভূমি। জলভাগের প্রশস্ততা পঞ্চাশ গজ হবে। ডান দিকে কিছু দূরে নদীবক্ষ খানিকটা ঢালু, তাতে স্রোত সেইখানে গিয়ে নীচের দিকে সশব্দে ভেঙে পড়ছে। ওপারে ভুটানের জমি।

নদীতীরের বালি আর পাথর পার হয়ে হয়ে আমরা খেয়াঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নৌকো ওপারে ছিল, দেখে মনে হ'ল এপারে আসতে দেরি হবে। নদীর উঁচু পাড়ে যেখানে জঙ্গল শেষ হয়ে নীচু জমিতে বালির চর আরম্ভ হয়েছে সেই সীমান্ত-রেখা বরাবর কাশের ঝোপ। আমরা তার ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম।

বাঁ দিকে দুটি বড় পাহাড়ের ভিতর দিয়ে নদী বেরিয়ে এসেছে। পাহাড়গুলার উপরিভাগ অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় একটানা সমান। কাজেই একমাত্র নদীর জন্যেই এ দৃশ্য যেটুকু ভাল লাগে। নদীপথে উজান বেয়ে নৌকোয় যাওয়া সম্ভব হলে হয় তো এই আবহাওয়া বেশী উপভোগ করা যেত।

আধঘন্টা পরে খেয়া-নৌকো ওপার থেকে রওনা হ'ল। তার আগে এপার থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম মাঝি তার ভিতর থেকে জল ছেঁচছে। অর্থাৎ ফুটো নৌকো। তার পর নৌকো যখন এ পারে এসে গেল তখন তার চেহারা দেখে বিস্মিত হলাম, ভয়ও হ'ল বেশ। সে এক অদ্ভুত নৌকো, আস্ত একটা শালকাঠ কুঁদে কুঁদে তৈরি। বাংলাদেশে কোনো কোনো জায়গায় তালগাছ কুঁদে যেমন ডোঙা তৈরি হয়, তেমনি। তার মধ্যে 'ফিট' ক'রে গায়ে গায়ে লাগিয়ে জন দশেক লোক দাঁড়াতে পারে। একটু কাত হলেই ডুবে যাবে।

সাহস ক'রে উঠে পড়লাম এতেই। এতগুলো লোকের চাপে নৌকোয় ক্রমাগত জল উঠতে লাগল, আমাদের জুতো ভিজে গেল। নড়াচড়া নিষেধ, তা হলেই নৌকোডুবি—সতর্ক করছিলাম সবাইকে—চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক সবাই মাথা ঠিক ক'রে, কিন্তু তবু নৌকো ভীষণ দুলতে লাগল। দেখি আমিই কাঁপছি বেশী।

যা হোক, কোনো রকমে গিয়ে তো ভুটানের সীমানায় পদার্পণ করা গেল। একটা মস্ত বড় দুঃসাহসিক কাজ করার উত্তেজনা জাগল সবার মনে। কারণ নৌকো যদি ওখানে ডুবত, তা হলে স্রোতের টানে আমরা কোথায় যে ভেসে যেতাম তার ঠিক নেই। একটু দূরেই জলপ্রপাতের মত ঢালু স্রোত খাড়া নিচে গিয়ে ভেঙে পড়ছে—সে দিকে তাকিয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম।

তীরভূমিতে আমাদের প্রধান কাজ হ'ল নানা রঙের পাথর-সংগ্রহ। তা দেখলে নিতে ইচ্ছা হবেই, বহন করা সাধ্য হবে কিনা সে কথা তখন মনে আসবে না। প্রত্যেকেই এত পাথর সংগ্রহ করলাম যে একমাত্র সেগুলোতেই ঐ নৌকোখানা ডুবতে পারে। ফেলে আসতে কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কারণ এমন চমৎকার সব রং আর আকার যে সেগুলো যেন কেউ যত্ন ক'রে ঘষে ঘষে তৈরি ক'রে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত পকেটে যে ক'খণ্ড ধরে, তাই নিয়েই খুশি থাকতে হ'ল।

ছবি নেওয়ার দিক দিয়ে এখানে বিশেষ কিছুই ছিল না, তাই বাংলোয় ফিরে এসেই সুধাংশু ও আমি সেই কাশবনের উদ্দেশে রওনা হলাম। হাঁটা পথে প্রায় আধ মাইল আসতে হ'ল। কাছে এসে দেখি সেখানে প্রবেশের কোন পথ নেই। ঘন জঙ্গল ভেদ ক'রে না গেলে কোনো দিক দিয়েই সেখানে যাওয়া যায় না। আমরা পর পর তিনটি জায়গায় চেষ্টা করলাম। সমস্ত পথে দুর্ভেদ্য কাঁটা—আর মাকড়সার কঠিন জাল। কাঁটা এবং জালে আটকা পড়ে তা থেকে মুক্তি পাওয়াই হ'ল এক বিষম দায়। জাল এমন শক্ত যে সমস্ত গায়ে সাপের মত জড়িয়ে গেল। যত টানি, রবারের মতো বেড়ে যায় এবং আঠার মতো এঁটে ধরে। উপরন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত শোঁয়া-ফলে ভর্তি হয়ে গেছে।

এই ফলগুলোর গায়ে কাঁটা থাকার উদ্দেশ্য যাতে এরা অন্যের আশ্রয়ে নানা জায়গায় বাহিত হয়ে বংশ বিস্তার করতে পারে। প্রকৃতি থেকে ওরা এই বিধান পেয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি থেকে নিয়মিত পশুপাখী বা মানুষ ওদের কাছে সরবরাহ হয় না। মনে হ'ল বহুকাল ওরা নিজেদের বিস্তার করবার সুযোগ পায় নি—তাই দুটি নিরীহ বাঙালী সন্তানকে

পেয়ে ওরা অতি উৎসাহে হাজারখানেক ধাপিয়ে পড়ল আমাদের গায়ে। এমন অবস্থাতেও আমি ঠেলেঠুলে সেই কাশবনের প্রায় পনর হাতের মধ্যে যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু প্রতারিত হলাম। প্রথমত, যত দূর গিয়েছিলাম তার পরেও



জইতীতে বৃদ্ধা নেপালী কাঠের তোঙায় বসিয়া শাক ব'ছিতেছে

জঙ্গল ছিল, দ্বিতীয়ত কাশফুলগুলো এত উঁচুতে মাথা তুলেছে যে দূর থেকে ছবি না নিলে তার একটাও ক্যামেরায় ধরা পড়বে না। তৃতীয়ত, কাশবন আর এদিকের এই জঙ্গলের মাঝখানে শুকনো নদীর অতি গভীর এক 'গর্ত'। কাজেই কোনো দিক দিয়েই কোনো সুবিধা হ'ল না। বাধা দুর্লঙ্ঘ্য—অভিযান ব্যর্থ হ'ল।

আমরা পরদিনই কলকাতায় ফিরে যাব এই রকম কথা, তাই অল্প দিনের জন্তে প্রবাসে এসে যা-কিছু দেখছি চারদিকে, তাই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করছি। এত অভিনবত্ব, এমন সজীব সুন্দর স্নিগ্ধ বৃক্ষরাজি বাংলার মধ্যেই আছে, অথচ বাংলাদেশে বাস ক'রে এসব কোনো দিন দেখার সুযোগ হয় না। খাস বাংলা থেকে এদেশের বৃক্ষ কত তফাৎ তা বোঝা যাবে এখানকার একটি নারকেল গাছের ব্যাপারে। আমরা এদিকে এসে শালবন দেখে মুগ্ধ হচ্ছি, কিন্তু এখানকার লোকেরা শীতলাবাবুর বাড়ির অতি যত্নে রোপিত এবং পালিত একটি নারকেল গাছ দেখে মুগ্ধ হয়। কি ক'রে পাহাড় অঞ্চলে নারকেল গাছ জন্মানো যায় সে কথা অনেকেই জানতে আসে।

আমরা সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরে চলেছি। যাবার সময় বিস্তীর্ণ সরষে-ক্ষেতের ধারে দেখলাম এক কৃষক দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে চেয়ে। দারিদ্র্যের চরমতম মূর্তি। গায়ে বহু পুরনো ছেঁড়া নোংরা একটি কোট—পরনে তেমনি নোংরা ছেঁড়া এক টুকরো কাপড়। এই সুন্দর পটভূমিতে সেই দরিদ্র রুগ্ন কৃষকের বিষন্ন মুখখানি বড়ই করুণ হয়ে ফুটে উঠল। এই আমাদের বাংলাদেশের প্রকৃত রূপ। এই সমস্ত ভারতবর্ষের রূপ। এখানে কোটি কোটি নিরক্ষর নিরীহ চাষী এমনি দুরবস্থায় ভাঙা ঘরে ভাঙা স্বাস্থ্যে বাস ক'রে সমস্ত দেশকে এবং বিদেশকে অন্ন যোগাবার ভার গ্রহণ করেছে।

লোকটি বিস্মিতদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমাদের দিকে। তার চোখে আমরা কত ভাগ্যবান। আমরা গাড়িতে চড়ে মাটির স্পর্শ থেকে সযত্নে নিজেদের রক্ষা ক'রে চলেছি ওদের বুকের উপর দিয়ে। তাই ওরা অবাক হয়ে শুধু আমাদের দেখে, কাছে আসতে সাহস করে না।

কিন্তু ঐ যে দীনহীন মানুষটি মূঢ়ের মত আমাদের দিকে চেয়ে আছে, ও কি জানে যে ও যাদের কৌশলে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন থেকেও বঞ্চিত হয়ে জীবনটা প্রায় শেষ ক'রে এনেছে আমরা তাদেরই স্বগোত্র? হয়তো জানে না। হয়তো আরও জানে না যে ওর ঐ হতভাগা জীবনের বাইরেও খোলা আকাশের নীচে ঐ দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে ঘিরে ওর যেটুকু আনন্দ অবশিষ্ট আছে তাকেও আমরা ঈর্ষা করি।

ও কত বড় শিল্পী—সে কথা স্মরণ ক'রে ওর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হ'ল।

সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ঐ করুণ বিষন্ন মূর্তিটি। কিছুক্ষণের জন্যে মনটা একটু দমে গেল, তারপর ভুলে গেলাম ওকে। মনের মধ্যে কোনো কিছু ধরে রাখবার সময় নেই। গাড়ী উঁচু-নিচু পথের উপর যেন লাফাতে লাফাতে চলেছে। সমস্ত সৌন্দর্যের সুর মনের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। গাড়ীর এই অস্থির গতির সঙ্গে আমাদের জীবনের গতি একসুরে বাঁধা, তাই হয়তো কোন ছবিই মনের মধ্যে সম্পূর্ণ ছবি হয়ে ওঠে না।

—কিন্তু যাক সে কথা।

সন্ধ্যায় আমরা জইতী বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। একটু পরেই অশোক একটি সাহসী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে চলে গেল বাঘের সন্ধান নিতে। ক্ষুধিত পাষাণের ডাক—সন্ধ্যা হলে তাকে ঠেকানো দুঃসাধ্য।

ওরা ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে, এবং এসেই এক উত্তেজক খবর দিল। এক জায়গায় একটা হরিণকে ক্রত ছুটে যেতে

থেমে ওরা দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ওদের পাশ দিয়ে গাঁ গাঁ করতে করতে একটা বাঘ বেরিয়ে গেল। সে ঐ হরিণকে অনুসরণ করছিল, মানুষের মধ্যস্থতা তার ভাল লাগে নি, তাই একটু প্রতিবাদ জানিয়ে গেল। ছেলেটি মহা উত্তেজিতভাবে তাদের এই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিল এবং এমন চমৎকারভাবে বলছিল যেন আমরা সেই বাঘটিকে সম্মুখে দেখছি।

৭ ডিসেম্বর। আজই আমাদের ফেরবার কথা, কিন্তু অশোকের অনুরোধে যাওয়া স্থগিত রাখতে হ'ল। অশোক এবং সুধাংশু আজ প্রায় শেষরাত্রে জঙ্গলে বেরিয়ে গেছে, এখন সকাল আটটা, এখনও ফেরে নি। আমি বসে বসে এখানকার দৃশ্য উপভোগ করছি। মেঘের সঙ্গে পর্বতচূড়ার খেলা চলছে। নিশ্চল পর্বত মেঘের স্পর্শে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই সময় এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত আরামপ্রদ। আমি দুর্বল দেহ নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। তবু তো এখানে বিশ্রামের অবকাশ পাই নি বললেই হয়। এ রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য মনের উপরেও দ্রুত ক্রিয়া করে। আমার মতে বাংলাদেশের বাইরে না গিয়ে যদি কেউ স্বাস্থ্যমনের দ্রুত উন্নতি কামনা করেন তা হলে তাঁর এই অঞ্চলে একবার আসা উচিত।

অশোক ও সুধাংশু একটা হরিণ শিকার করে ফিরে এল সাড়ে আটটায়। এবারে আরও একটি অদ্ভুত খবর শুনলাম ওদের মুখে। বহুদূর জঙ্গলের একটা জায়গায় এক জোড়া জুতো পড়ে আছে, আর তার পাশে এক বাণ্ডিল দড়ি। মানুষের কোনো চিহ্ন নেই। জুতো জোড়া কোনো পাহাড়ীর পায়ের, সদ্য পরিত্যক্ত নয়। ওরা অনুমান করল অন্তত পনর-ষোল দিনের, কারণ জুতোর নিচে উই ধরেছে।

খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। আমরা সবাই মিলে শারলক হোমস্-এর রীতিতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে লাগলাম।—

কোনো লোক আজকের দিনের দামী জুতো ইচ্ছে ক'রে ফেলে যায় নি। ভুল ক'রে ফেলে যাওয়া আরও অসম্ভব, কারণ জুতোর-অভ্যস্ত লোক জুতো ফেলে পাহাড়িয়া পথে খালি পায়ে হাঁটতে যাবে কেন? নিশ্চয় তাকে বাঘে ধরেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে তা হলে জুতো জোড়া পাশাপাশি সাজান অবস্থায় পড়ে থাকবে কেন? বাঘে ধরলে জুতো ওভাবে থাকতে পারে না। হয়তো সে বাঘের সাড়া পেয়ে জুতো খুলে আত্মরক্ষার জন্যে গাছে উঠেছিল।—গাছে না উঠে, পালিয়ে গেলে, জুতো-পায়েই পালিয়ে যেত। গাছে ওঠা যদি ঠিক হয়, তা হলে সে সেখান থেকে গেল কোথায়? বাঘ গাছে উঠে তাকে ধরে নি, কারণ বাঘের পক্ষে গাছে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু লোকটি গাছে উঠে থাকলে গাছ থেকে যে নামে নি এবং নেমে ঘরে ফিরে যায় নি তার প্রমাণ



হগ ডিয়ার

তার জুতো। তা হলে এক এই হতে পারে যে সে গাছে ওঠবার মুখেই ধরা পড়েছে, আর না হয় যখনই সে গাছ থেকে নীচে নামা নিরাপদ মনে করেছে তখনই নেমে প্রাণভয়ে ছুটে পালিয়ে গেছে জুতোর মায়া ত্যাগ ক'রে। আর এক হতে পারে গাছে ওঠা সত্ত্বেও সে আত্মরক্ষা করতে পারে নি, কোনো বড় হাতী শুঁড় দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে কোথাও ছুঁড়ে ফেলেছে। এ রকম ঘটনা যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ ২রা ডিসেম্বরের সেই দুর্ঘটনা—হাতীর হাতে কুলির মৃত্যু।

আমাদের চিন্তাধারা যে সব সূত্র অবলম্বন ক'রে এই সব সিদ্ধান্ত করছিল, তার সমস্তই এর একটা কিংবা অন্যটার অনুকূলে। তার কারণ জুতোর পাশে ক'দিন পূর্বেকার হাতীর পায়ের, এবং কাল কিংবা আজকের বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু যাই হোক এটি যে একটি দুর্ঘটনা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না, এবং জুতোর মালিকের দুর্ভাগ্য স্মরণ ক'রে মনে আতঙ্ক এবং দুঃখ হ'ল।

এখানকার আকাশ বাতাসে এই জাতীয় সব উত্তেজনা। হয়তো এখানে আরও কিছু দিন বাস করলে আমিও বাঘ

ভিন্ন অন্য কিছু ধ্যান করতে পারব না, কেননা এ ক'দিনে একটি বাঘ না দেখেও বাঘ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল মেটে গিয়েছিল। আমরা থাকতে অশোক একাগ্রমনে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে বাসা বাঁধতে পারছে না, নইলে এ দিকে



রায়ডাক নদীপারে ভুটান সীমানায় যাইবার অদ্ভুত খেয়া নৌকা

বাঘের উপদ্রবের কথা যা শুনছি তাতে শিকারীর পক্ষে এত দিন লোকালয়ে থাকা প্রায় অসম্ভব। আমরা থাকতেই ভিতর দূর জঙ্গলে ক্যাম্প করার একটা প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখা গেল তাতে আমাদের জঙ্গল-বাসের অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ হলেও শিকারীর কোনো লাভ নেই। এ রকম অবস্থায় লাভ যদি কারও হয় তবে সে বাঘ-সমাজের। সুতরাং আমরা চলে যাবার পরই জঙ্গলে মাচা বাঁধা হবে সেই রকম বন্দোবস্ত হ'ল। অশোক একটি বাঘ না মেরে এবার ফিরবে না এই প্রতিজ্ঞা এবং সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষাও করেছে, পরে শুনেছি। (শিকারী ক্লাবের সভ্যদের একটি করে বাঘ মারার অনুমতি আছে)।

জঙ্গলে বসে বাঘের ছবি তোলা সম্পর্কে বোঝা গেল এই যে উপযুক্ত আয়োজন থাকলে এবং ভাগ্যে থাকলে কাজটি কঠিন নয়। উপরন্তু ক্যামেরাধারীর স্বাস্থ্যটি একটু ভাল হওয়া দরকার। শীতকালে রাত কাটাতে হবে মাচায় বসে, বিনা নিদ্রায়, বিনা শব্দে। একাধিক রাত এই ভাবে কাটানোর মতো উৎসাহ থাকা চাই। কারণ কখন যে বাঘের দেখা মিলবে তার স্থিরতা নেই। এতখানি সাহস, ধৈর্য, উৎসাহ এবং নিষ্ঠা থাকলে তবে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। তবে আমার পক্ষে যে এই সব সর্তে রাজি হওয়া সম্ভব নয় তা আমি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু বাঘের সম্মুখে ক্যামেরা খোলার সুযোগ না পেলেও অরণ্য প্রদেশকে উপভোগ করেছি সমস্ত সত্তা দিয়ে। শহরের একঘেয়ে পাকখাওয়া মনের সমস্ত পাক এখানে খুলে গেছে। এই ক'দিনের স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে। অশোক আমাদের এখানে টেনে আনতে যে ভাবে প্রলুব্ধ করেছিল সেজন্যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই উপলক্ষ্যে এখানকার জীবনযাত্রাও দেখলাম। ঘন বসতি কোথায়ও নেই। প্রত্যেকেই এখানে কোনো না কোনো কাজ উপলক্ষ্যে এসে ঘর বেঁধেছে, কিন্তু বাধ্য হয়েই সবাইকে দূরে দূরে থাকতে হয়। ফরেস্ট আপিসের লোকদের তো প্রায় নির্বাসন বললেই হয়। এখানে সমাজজীবন বলে কিছু নেই, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুলও নেই, থাকা সম্ভব বলেও মনে হ'ল না। তবু এই অরণ্যজীবন এক দিক দিয়ে ভাল। চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষ্যে ভিটের মায়া ছেড়ে বাইরে যাওয়ার শিক্ষা সাধারণভাবে বাঙালীর নেই। সেই শিক্ষা বাঙালী পাচ্ছে এই অরণ্যপ্রবাসে।

৮ ডিসেম্বর। আজই বিকেলে আমরা জইন্তী ছেড়ে যাচ্ছি। ছেড়ে যেতে দুঃখ হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। অশোক একা রয়ে গেল, এবং তার প্রতি মমত্ব বশতই তাকে বাঘের মুখে রেখে আমরা দুজনে পূর্বদিনের ভুক্তাবশিষ্ট বলসানো হরিণমাংসের প্রকাণ্ড এক বোঝা নিয়ে জইন্তী থেকে বিদায় নিলাম।

চিঠি

শ্রীরাণী চট্টোপাধ্যায়

আমার মন্দির শূন্য ; আবর্জনা ভরেছে প্রাঙ্গণ।—
সেখানে বর্ষণ এলো ; অতীতের বিস্মৃতির মিতা।
সাথে তার এলোমেলো একখানি অর্থহীন চিঠি,
পাঠায়েছে ক্লান্ত হাতে পলাতক দিনের সবিতা।

সূর্য্য পাঠায়েছে লিপি। বৃষ্টিভেজা ভাদ্রের দুপুরে
অক্ষর গিয়েছে ধুয়ে ; অবান্তর অগত্যা মনন।
তবু শূন্য মন্দিরের আঙিনায় আমি পথচারী
চেয়ে চেয়ে দৃষ্টিহীনা ;—কি ছিল সেখানে নিমন্ত্রণ ?

প্রাচীন অমৃত বাজার পত্রিকা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

৩

বাঙালী তথা ভারতবাসী পূর্ব্বে প্রচুর শক্তির অধিকারী ছিল। দৈহিক শক্তির চর্চ্চা দ্বারা ইহা অব্যাহত রাখা হইত। ইংরেজ আমলে এই শক্তিসাধনার কেন্দ্রগুলি লোপ পাইয়াছে। সুশাসনের ফলে আমরা নিবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি। বীর্য্যবান তেজীয়ান জাতির পক্ষেই স্বাধীনতার গুরু দায়িত্বভার বহন করা সম্ভব। এই হেতু পত্রিকা ক্রমশঃ জনগণকে শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিতে তৎপর হইলেন।

মুসলমানসমাজ সম্পর্কিত কয়েকটি নিবন্ধে এক দিকে যেমন সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ দ্বারা হিন্দু-মুসলমানে ভেদসৃষ্টির সূত্র মিলিতেছে অন্য দিকে তেমনি মুসলমান-সমাজের বৈশিষ্ট্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। মুসলমানের ঐক্যবোধ অসাধারণ। এই ঐক্যবোধ সকল ভারতীয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অধোগতির অবসান ঘটাইতে পারে। মুসলমানের তেজ হিন্দুর বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইলে এ জগতে উভয়ের পক্ষে অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। ইহা বুঝিয়াই বোধ হয় শাসক-জাতি ঐ সময় হইতেই দুইয়ের মধ্যে ভেদবৈষম্য উদ্রেক করিতে লাগিয়া যায়। প্রায় শতাব্দী ব্যাপী এইরূপ হীন প্রয়াসের বিষময় পরিণতি আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে আজ সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। পত্রিকা মূলেই উহা নষ্ট করিবার জন্য মিলিত প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেন।

আমরা রাজনৈতিক দিক দিয়া পরাধীন হওয়ায় শাসক-জাতির অবাধ শোষণের ফলে আর্থিক হিসাবেও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই তিনের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা আমরা বৃটিশের শোষণ-কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণেও ব্যাহত করিতে পারি। বাণিজ্য ব্যাপদেশে স্বাধীন জাতি ও দেশসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া স্বাধীনতা লাভের পথও কতকটা উন্মুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। একারণ ভারতবাসীর পক্ষে অবিরত রাজদ্বারে চাকুরির জন্য না ঘুরিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করারও বিশেষ আবশ্যক হয়। ইহা আমাদের উদ্ধারের অন্যতম প্রধান উপায়—পত্রিকা এই মর্ম্মেও প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন।

কর্তৃপক্ষ রাজ্যশাসনের নামে যে সব নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতবাসীদের দাবাইয়া রাখিতে চান, শেষ পর্য্যন্ত হয় তাঁহারা বিরুদ্ধ জনমতের নিকট, নতুবা নিজেদের কর্ম্মজালে জড়াইয়া পড়িয়া প্রায় প্রত্যেকটিই বাতিল করিয়া দিতে বা উহার প্রয়োগজনিত ফলভোগ করিতে বাধ্য হন। পত্রিকা এরূপ কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া জনমতের জয় ঘোষণা করেন।

জাতীয় মেলা

আর কয়েক দিবস পরে আমাদের জাতীয় মেলা উপস্থিত হইবে। পূর্ব বৎসর যে স্থলে হয়, এবারও সেইখানে* মেলা হইবে স্থির হইয়াছে। এ মেলাটির উদ্দেশ্য আমোদ নয়, ইহার উদ্দেশ্য টাকা দেওয়া নয়, ইহার উদ্দেশ্য একটি সম্প্রদায় করা নয়, ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এরূপ একটি উৎসব করিবার নিমিত্ত যশোহরের একটি পরিবার উন্মাদ হন, কিছু অর্থব্যয় করেন এবং অনেক স্থলে ভ্রমণ করেন, সম্বাদপত্রেও ঐ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হয়, কয়েকখানি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবিষয় বিজ্ঞপ্তি করা হয়, কিন্তু হয়ত ব্যাপারটি যত বৃহৎ, ইহার উদ্যোগকারীরা তত যোগ্য ছিলেন না, অথবা তাঁহারা অসময়ে উদ্যোগ করেন বলিয়া ইহাতে কয়েকজন বড় বড় লোককে ব্রতী করা ব্যতীত আর কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হন না। যাহা হউক বর্ত্তমান মেলার উদ্যোগী পুরুষগণের প্রসাদাৎ আমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহাদের যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ, তাহাতে ইহার উদ্দেশ্য যে একদিন সফলতায় পরিণত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ফল এরূপ গুরুতর যাহার উদ্দেশ্য, সেরূপ উৎসাহে দেশ সমেত সকলের যোগ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয়। মেলার এই তৃতীয় বৎসর, কিন্তু এক্ষণ পর্য্যন্ত কলিকাতার কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ইহাতে তাদৃক উৎসাহ কি যত্ন দেখায় নাই। আমরা মেলায় গিয়া কোথায় এত লোকের সমাগম দেখিব যে গমনাগমনের পথ পাইব না, আর এক্ষণ কলিকাতায় একটি সামান্য তামাসে চিৎপুরের রাস্তায় যত লোকের ভিড় হয়, ইহাতে তাহাও হয় না।

দেশে নূতন গবর্ণর জেনারেল আইলে জমিদারগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ধাবিত হন, ডিউকের † উপস্থিতকালে দেশসমেত ধনী নির্ধন মূর্খ পণ্ডিত সকলে নগর পরিপূর্ণ করিলেন, কিন্তু জাতীয় মেলা যে মেলার উদ্দেশ্য আমাদের মুমূর্ষু দেশে পুনর্জীবন সঞ্চার করা, তাহা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে কাহার স্পৃহা হয় না। দেশীয়গণ কি এটিও মনে করেন না যে, মেলাটি আমাদের নিজের? এখানে আমরা কর্তৃত্ব করি, এখানে আমাদের সমাদর, আমরাই উচ্চ ও প্রধান আসনে উপবেশন করি। আর এখানে উপস্থিত, ইহাতে যোগ দিতে তাঁহাদের ঔদাস্য। গবর্ণর জেনারেলের আগমনকালে কি সে দিবস ডিউক যখন

---

* আশুতোষ দেবের বেলগেছিয়া উদ্যানে ১৮৭০ সনের ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় বা হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

† ভিক্টোরিয়া-পুত্র ডিউক অফ এডিনবরা ১৮৬৯, ২৯এ ডিসেম্বর কলিকাতায় পদার্পণ করেন।

আইসেন তখন রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক জাতি পক্ষপাতিতা নিবন্ধন আমাদের যেরূপ অপমানিত হইতে হয় তৎকালে যেরূপ পদেৎ আপনারদিগের দুরবস্থার কথা মনে উদয় করিয়া দেয়, সেরূপ এখানে হইবার কোন কারণই নাই।

যিনি কখনও ভারতবর্ষের হীনাবস্থার কথা মনে করিয়া বেদনা পাইয়াছেন, যিনি কখন আপনারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বীর্য্য শৌর্য্যের বিষয় মনে করিয়া আপনাদিগকে তদ্বংশোদ্ভূত বলিতে লজ্জাবোধ করিয়াছেন, যিনি কখন স্বাধীন অবস্থার মধুরতা চিন্তা করিয়াছেন, যিনি কখন বীররস পান করিয়াছেন, যিনি কখন দেশীয়গণের হীনবল বুদ্ধি ক্ষমতা দেখিয়া চক্ষুর জল ফেলিয়াছেন, অথবা যিনি আপনার সন্তান সন্ততি পৃথিবীতে উচ্চপদারূঢ় হয় বাসনা করেন, যিনি আপনার যে কোন অহংকার, আশা ও স্বার্থ চান তাঁহার কর্ত্তব্য ইহাতে যোগ দেওয়া। এ মেলাটিতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আছে। যিনি যে উদ্দেশ্যেই ইহাতে যোগ দিবেন, তাঁহারই মনস্কাম সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।* (১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০)

জষ্টিস ফিয়ার ও বাঙ্গালী

মনুষ্যকে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিয়া সৎ কর্ম্মে রত করা, সমাজকে কুৎসিত আচার ব্যবহার হইতে সংস্কার করিয়া অপেক্ষাকৃত পবিত্র ও উন্নত পদবীতে উত্তোলন করা, অথবা নির্জ্জীব উদ্যমশূন্য মনুষ্যেরে আত্মোৎসর্গ নিমিত্ত উত্তেজনা করার দুইটি পৃথক পথ আছে। এক তাহার দোষ সমুদয় ও তৎসম্ভাবিত অনিষ্ট সমুদয় ভীষণ ও কুৎসিতরূপে তাহার সম্মুখে চিত্রিত করিয়া দুষ্কর্ম্মের উপর তাহার গাঢ় ও অবিচলিত ঘৃণা উৎপাদন করা অথবা তাহার অন্তর্নিহিত মহৎ গুণ সমুদয়ের গৌরব করিয়া করিয়া তাহাকে মহৎ বলিয়া বর্ণন করিয়া এবং তাহা কর্ত্তৃক কত মহৎ কর্ম্ম হইয়াছে ও হইবার সম্ভব তৎসমুদয় তাহার স্মরণদ্বারা দুষ্কর্ম্মের প্রতি তাহার ঘৃণা ও মহদিচ্ছার বলবতী করা। প্রায় সমাজ সংস্কারক মাত্রেই ইহার এক না এক উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজ হইতে দুষ্কর্ম্ম সমুদয় তিরোধান করিবার যত্ন পাইয়াছেন। চৈতন্যের ও যীশুর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে এই দুইটি লক্ষণ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। চৈতন্য যেরূপ লোককে বলেন যে, মুখে "হরিনাম" বলিলে তাহাকে আর পাপের স্পর্শ করার সাধ্য থাকে না, যীশুও তেমনি বলেন যে, মনুষ্য এরূপ পাপী যে ঈশ্বর অনুগ্রহ ভিন্ন তাহাদের পাপ হইতে নিস্তারের আর উপায়ান্তর নাই। এই দুটি পদ্ধতির দোষ গুণ উভয় আছে। চৈতন্যের শিক্ষাতে মনুষ্যকে গর্ব্বিত করিয়া তুলে এবং যীশুর উপদেশে মনুষ্যকে আর উঠিতে দেয় না। তবে সমাজ সংস্কারের এই দুই পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট ও প্রয়োগ করিতে জানিলে অশেষ মঙ্গলদায়ক। এক্ষণ আমাদের সমাজের ইহার কোনটি উপযোগী? আমাদের সমাজের প্রকৃতি বিচিত্র ও অত্যন্ত জটিল। ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেও ইহার সমুদয় নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করা কঠিন। তবে একটি আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি। আমাদের জনসমাজ জীবনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল বিদেশীয় রাজার পদতলে দলিত হইয়া ইহার না আছে আত্মগৌরব, না আছে স্বাধীনতা, না আছে অহংকার। ইহার আর উঠিবার শক্তি নাই ও সে স্পৃহাও ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং বিস্তার দিয়া, কি হীনতার চিত্র সম্মুখে অঙ্কিত করিয়া আমাদের ঘৃণার উদ্রেক, কি আত্মগৌরবকে আঘাত করিবার সময় আর নাই। যিনি এইরূপে বঙ্গসমাজকে তুলিতে চান, তিনি লাভের মধ্যে উহার শরীরে যে শোণিতটুকু আছে, তাহা শোষণ করেন এবং উঠাইতে গিয়া বঙ্গসমাজ আরও হীনতার গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। জষ্টিস ফিয়ার এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ। আমাদের মঙ্গল করেন সেটিও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা, তবে তিনি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভ্রমমূলক। বাঙ্গালীকে গালি দেওয়া, তাহার দোষ ভিন্ন গুণের প্রসঙ্গ না করা আজকালি একরূপ প্রথা হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আমাদের আর উহা শুনিবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ কখন কখন নীচাশয় ব্যক্তিগণ শুদ্ধ আমাদিগকে মনোবেদনা দেওয়ার নিমিত্ত আমাদের দোষকীর্ত্তন করায় তিরস্কার শুনিতে এক্ষণ কিছু যন্ত্রণাও বোধ হয়, সুতরাং ফিয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য এত নিঃস্বার্থ ও মহৎ হইলেও তিনি যে আমাদের সকলের প্রিয় হইতে পারেন নাই সে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ফিয়ার সাহেব যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহার এদেশের মঙ্গল করিবার যেরূপ ক্ষমতা ও সুযোগ আছে এবং সে বিষয়ে তাঁহার যত্ন যেরূপ অকৃত্রিম, তাহাতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্যই সফল না হওয়ার কারণ এই। তিনি যদি প্রকৃতই আমাদের মঙ্গল চান, তবে বাঙ্গালী যুবকগণের অন্তর্নিহিত মহৎ প্রবৃত্তি সমুদয়ের উত্তেজনা করুন, তাহাদের গুণের প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করুন ও কত মহৎ কাজ তাহাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবার সম্ভব, তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া তাহাদের মহদিচ্ছা বলবতী করুন। তাহা হইলে দেখিবেন বাঙ্গালীরা কোন বিষয়ে অক্ষম নন, ইঁহারা কৃতজ্ঞতা জানেন এবং বঙ্গ জনসমাজ অনুর্ব্বরা ক্ষেত্র নহে।* (৫ মে ১৮৭০)

---

* এই প্রসঙ্গে "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত" পুস্তকে জাতীয় মেলার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* বিচারপতি ফিয়ার 'সোসায়েল সায়াল এসোসিয়েশনে' একটি বক্তৃতায় বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নিন্দা করিতে গিয়া তৎসঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীদেরও ভর্ৎসনা করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইহার সমুচিত উত্তর দেন। বীটন সোসাইটির ১৮৭০ সনের মার্চ মাসের অধিবেশনে ফিয়ার সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টের তীব্র নিন্দা করিয়া পূর্ব্ব মতই সমর্থন করিলেন। এই অধিবেশনে সভাপতি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার মতের পোষকতা করেন।

মুসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ইংলিশম্যান সম্পাদক

যে অবধি নরাধম আবদুল্লা বিচারপতি নরম্যানের প্রাণনাশ করিয়াছে,* সেই হইতেই মুসলমানগণের উপর আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। বোধ হয়, ইহারা তাহাদের উপকারও বর্ষিতে পারে। সকলেই মনে করিতেছেন, মুসলমানেরা তো বিদ্যার অনাদর করে না, বরং শাদীনামা বিখ্যাত পারস্য কবি কহিয়াছেন, "বিদ্যোপার্জ্জন ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে জানা যায় না" তবে কেন তাহারা আপন আপন সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে এত আপত্তি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে অনেক কথা কহিতেছেন,…।

ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মুসলমানদিগের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঔদাস্য জানিতে পারিয়া বিগত ২৩শে অক্টোবরের পত্রিকাতে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া সে ঔদাস্যের নিরাকরণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি কহেন, আমরা বিশেষরূপ দেখিলাম মুসলমানেরা আপনা হইতে এ পর্য্যন্ত উত্তমরূপ শিক্ষাযত্ন পাইল না। ভবিষ্যতে পাইবে এমনও বোধ হয় না। এমতাবস্থায় যাহাতে তাহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে বিদ্যার প্রচার হইতে পারে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার বিহিত উপায় করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও বলেন, হিন্দু বা খৃষ্টীয়ান সম্পর্কীয় বিদ্যালয়েতে তাহারা আপত্তি করে, তাহাদের সে আপত্তি নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধও নহে; ইংলণ্ডেও খৃষ্টধর্ম্মের এক সম্প্রদায়ভুক্ত বালকেরা অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না; অভিভাবকগণ তাহাতে সম্মত নহেন। এমত স্থানে মুসলমানেরা তদ্রূপ আপত্তি করিতে পারে। অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে এমত কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক যাহাতে কেবল মুসলমান ভিন্ন হিন্দু বা ফিরিঙ্গি শিক্ষক কি ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। সহযোগী বিবেচনা করেন, তাহা হইলে মুসলমাদিগের সে আপত্তি থাকিবে না।

একণ বিবেচনা করা যাউক, সহযোগীর প্রস্তাব কতদূর কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। প্রথমতঃ কেবল মুসলমান শিক্ষক দ্বারা বিদ্যালয়ে কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে এমন দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভালরূপ ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন এমন মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; যে কয় জন আছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আনিয়া এই ক্ষণ শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে অধিক বেতন দিতে হইবে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের গবর্ণমেণ্টের এই ক্ষণ বিষম অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত, এমন সময়ে এই কার্য্যে এত অধিক অর্থ ব্যয়িত হইতে পারিবে কি না, আমরা বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ যদি অর্থের অনটন বশতঃ মহম্মদীয় ধর্ম্মের গোঁড়া মুন্সি মৌলবীদিগের হস্তে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়-গুলির ভারার্পণ করা যায়, তাহাতে ব্রিটিশ শাসনের বা পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি মুসলমানদিগের ভক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তৃতীয়তঃ মুসলমানেরা এই ক্ষণ যাহা চাহিবে, গবর্ণমেণ্ট যদি বাধ্য হইয়া তাহাই দিতে প্রস্তুত হন, ভবিষ্যতে তাহাদের দাবি আরও বাড়িতে থাকিবে।…

গবর্ণমেণ্ট কোন শ্রেণীস্থ প্রজার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে বাধ্য নহেন, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের শিক্ষার কোন রূপ সুবিধা করিয়া দিলে হিন্দুদিগের মনকষ্ট হইতে পারে; অপক্ষপাতিতাই গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান গুণ অতএব আমাদের বিবেচনায় এই বিষয়ের ভার গবর্ণমেণ্টের উপর চাপাইয়া দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত। (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭১)

ওহাবী ও ব্রিটিশ রাজ্য

…ওহাবী দল অদৃশ্য। কোথায় তাহারা আছে ও কোথায় যে নাই তাহা কাহার জানিবার সাধ্য নাই। যদি ডাক্তার হাণ্টার সাহেবের কথা সত্য হয়, তবে ওহাবীরা ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে।* এ দেশের জনসংখ্যার আট ভাগের এক ভাগ মুসলমান, সুতরাং তাহাদের নির্ম্মূল করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার আর কাহার না হউক, ইংরেজদিগের মুসলমান ব্যতীত এক মুহূর্ত্ত চলে না; এমন কি, প্রকৃত যদি তাহারা ঐক্য হইয়া সকলে সাহেবদিগের কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দেয়, তবে ইংরেজদিগের এ দেশে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহাদের দেশ হইতে ভৃত্য আনিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। মুসলমানেরা দেশে এইরূপ প্রবল, বিশেষতঃ ইংরেজেরা তাহাদের এত অধীন, আবার অনেক বিজ্ঞ লোকে অনুমান করেন যে, তাহারা ক্রমে ক্রমে একটী ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। সিতানা যুদ্ধের সময়† প্রথম ইংরেজেরা ওহাবীদিগের বিষয় প্রকাশ পাইলেন, কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতে তাহারা দেশে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করে। যখন সিতানার যুদ্ধ হয় তখন তাহারা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজদিগের সঙ্গে অস্ত্র যুদ্ধ করিতেও সাহসী হয়। সিতানা যুদ্ধে তাহারা পরাস্ত হইল। তাহারা দেখিল যে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজদিগের সঙ্গে পারা কঠিন সুতরাং যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া, গোপনে আবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল এবং আমীর খাঁর মকদ্দমায়‡ সমুদয় বিষয়গুলি

হিন্দু পেট্রিয়ট ২ মে, ১৮৭০ তারিখে একটী দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়া বক্তা এবং সভাপতি উভয়েরই মত খণ্ডন করেন। কিয়ার সাহেবের বক্তৃতা ও এই সব আলোচনা উপলক্ষ্য করিয়া পত্রিকায় এই নিবন্ধ লিখিত হয়।

* ১৮৭১,২০শে সেপ্টেম্বর।

* ডাক্তার উইলিয়ম হাণ্টার প্রণীত *Indian Musalmans* পুস্তকে প্রদত্ত 'ওহাবী' আন্দোলনের ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য।

† ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

‡ ১৮৭০ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার হয়।

যদি সত্য হয়, হাণ্টার সাহেব যাহা লিখিয়াছেন যদি সত্য হয়, তবে তাহারা নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে যেরূপ দেশে বিস্তৃত ও বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা অসম্ভাবনীয়। গবর্ণমেণ্ট ইহা অবগত হইয়া যে ইহাদিগকে শাসন করিবারও উদ্যোগ করিলেন, আর দেশের দুইটি প্রধান ব্যক্তি* প্রাণ হারাইলেন। পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, এক স্বরে না এক স্বরে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওহাবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি অথচ উহা ধরিবার যো নাই। এই ষড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অবাক হই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সবল সাহসী ধর্ম্মোন্মত্ত, অকাতরে প্রাণ দিবে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে না এরূপ লোক এক কোটির মধ্যে এক জন পাওয়া কঠিন। এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আমাদের রাজপুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তর সত্বেও ইহার নিগূঢ় কারণ তাঁহারা বাহির করিতে পারিলেন না। যে ষড়যন্ত্র এরূপ লোক দ্বারা সৃষ্ট যাহা কল্পনা চক্ষেও অদৃশ্য, যাহার প্রকৃতি এরূপ অভেদ্য, এবং যাহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাপ্তেন বারটন বলেন যে আইন সম্বন্ধে কিছু পরিবর্ত্তন করিলে উহারা অনুগত হইতে পারে, কিন্তু ক্যাণ্ট (?) সাহেব মুসলমানদিগকে চিনেন না। তাহারা এরূপ সামান্য সুবিধার লক্ষ্য করে না, ইহাতে হিন্দু প্রজারা সন্তুষ্ট হইতে পারে। কোন পার্থিব সুখ যে ওহাবীদিগের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলমানেরা অতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বর্গ সুখ তাহাদের ইন্দ্রিয়সুখের পরাকাষ্ঠা, তাহারা ইংরেজী অভ্যাস করে না। কোরানে তাহাদের অবচলিত বিশ্বাস এবং শুদ্ধ কাফের হত্যা করিলে বিশেষতঃ উচ্চ পদস্থ কাফেরকে যাহারা হত্যা করিবে তাহারা স্বর্গ সুখ তত অধিক ভোগ করিবে এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা এক একটি হত্যাকে অনন্ত সুখের দ্বার বিবেচনা করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহারা লক্ষ্য করে না। প্রত্যুত নিগ্রহের ন্যায় শাসনেও তাহাদিগকে আরও অধিক প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উৎসাহী করিতে পারে। (২৫ এপ্রিল ১৮৭২)

বিজ্ঞান চর্চ্চা

আমরা কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম ক্যাম্বেল সাহেব ইংলণ্ড হইতে দুইজন পণ্ডিত আনয়ন করিতেছেন। ইঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিবেন।...ক্যাম্বেল সাহেব এ দিকে আমাদের শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে যেরূপ বলিষ্ঠ দৃঢ়িষ্ঠ ও কর্ম্মঠ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, আবার ওদিকে যদি বিজ্ঞান শাস্ত্রের শিক্ষা দ্বারা জগতের নিহিত রত্নরাশি আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেন তবে যে একদিন ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতির জয় পতাকার সঙ্গে ভারতবর্ষের পতাকা উড্ডীন হইবে তাহা অনায়াসে আশা করা যাইতে পারে।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা এত দুর্ব্বল ছিল না, রক্তপাত দেখিলে তাহাদের মূর্চ্ছা হইত না, শত্রুর নাম শুনিলে আতঙ্ক উপস্থিত হইত না, গ্রামে ২ ব্যায়াম চর্চ্চার স্থান ছিল, গ্রামে ২ এক একজন বিখ্যাত সর্দ্দার ছিল, ভদ্রলোকেরা পালোয়ান আখ্যা গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইতেন না। কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত ও মাথা ফাটাফাটি এবং হস্তপদ অস্ত্রাঘাত দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হওয়া লোকের নিকট তত গুরুতর বিষয় বলিয়া বোধ হইত না। প্রতিরাত্রে ভদ্র অভদ্র সকলে একত্রিত হইয়া লাঠি, তরবার, বল্লম প্রভৃতি খেলা শিখিত। দশ জন একত্রিত হইলে কেবল ঐ গল্প ঐ কথা হইত। সকলের গৃহে দুই চারিখান তরবার, দশ বার গাছা বল্লম থাকিত, বাটীর একজন না একজন লাঠি তলোয়ার বা বল্লম খেলিতে জানিতেন। ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে এদেশের সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু তখন সমাজে যে জীবনীশক্তি ছিল সেটা সেই সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছে।

মনুষ্যের মন নিষ্কর্ম্মে থাকিতে পারে না। এটি গিয়া তাহার স্থলে মিথ্যা, জাল, মকর্দ্দমা, অধর্ম্ম প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। আবার ইংরেজী শিক্ষার চর্চ্চা ক্রমে দেশে প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ইহাতে দেশের বিস্তর মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু ইহার সঙ্গে আবার বিষ উৎপত্তিও হইয়াছে। বাঙ্গালীর যুবকেরা অসীম বুদ্ধি শক্তি সম্পন্ন। ইংরেজী শিক্ষা এ পর্য্যন্ত যে প্রণালীতে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মনে নানা ভাবের অঙ্কুরকণা রোপিত হইয়াছে, অথচ কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহার কোন উপদেশ তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা এইরূপে ভাব আকাশে ক্রমশঃ উড্ডীন হইয়া শেষে অকূল রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাহাদের মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যাইতেছে। চারিদিকে নিরাশ দেখিতেছে, হতাশ হইতেছে এবং এইরূপে সংসারে ক্রমে নাস্তিকতা প্রবেশ করিতেছে। ক্যাম্বেল সাহেব যদি বিজ্ঞান চর্চ্চা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, যদি ইহাতে তিনি আমাদের মন উদ্দীপন করিতে পারেন তবে একটি বিশেষ মঙ্গল হইবে। (৫ ডিসেম্বর ১৮৭২)

আমাদের ভরসা নাই

...হা ঈশ্বর! আমরা এই কয়েক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পুরুষ পুরুষানুক্রমে রিপু দমন করিয়া আসিতেছি, এখন আমাদের তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সে অপরাধ মার্জ্জনা কর, করিয়া আমাদের রিপুগুলি আমাদের প্রত্যর্পণ কর। আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রবল করিয়া দেও যে আমরা একটু সজীব হই।

---

* বড়লাট লর্ড মেও ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।

আমরা মৃতপ্রায়, আমাদের কিছুতেই সাধ নাই, আমাদের সাধগুলি একটু উত্তেজিত করিয়া দেও। একটু বেশী কাম, একটু বেশী ক্রোধ, একটু বেশী লোভ ইত্যাদি হইলেই আমাদের ভদ্র, নতুবা আমাদের ভদ্র নাই। (৫ ডিসেম্বর ১৮৭২)

ইংরেজদিগের কীর্ত্তি

ইংরেজরা আবিসিনীয় যুদ্ধে* প্রবৃত্ত হইয়া সোনার রাজ্য ছারখার করিয়া আইসেন। আবিসিনিয়ার রাজা থিওডোর অতি সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক রাজ্য সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে সেখানে যে সমুদয় আত্মকলহ বিবাদ বিসম্বাদ ছিল তাহা সমুদয় দূর করিয়া সমুদয় রাজ্যে তিনি শান্তি সংস্থাপন করেন। দেশে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের আবির্ভাব হয়। সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল এমন সময় ইংরেজেরা সেখানে গিয়া সমুদয় উচ্ছিন্ন দিয়া আইসেন। আবিসিনিয়া ইংরেজেরা গ্রহণ করিলেন না, সেখানে যে অনিষ্ট করিলেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিপূরণ করিলেন না, যে অর্থব্যয় পড়িল তাহার কতক আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হইল, এবং যুদ্ধাগ্রগণ্য ইংরেজজাতির বীরত্ব প্রকাশ পাইল। আবার লুসাই যুদ্ধে ইংরেজেরা আর এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন। এই যুদ্ধটি করা কর্ত্তব্য ছিল কিনা সে বিষয় লইয়া তর্ক করার সময় গিয়াছে, কিন্তু সেখানে যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে ইংরেজ জাতিকে চিরকলঙ্কিত করিবে। আমরা গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত কাগজপত্রে দেখিতেছি যে সৈন্যগণের নিষ্ঠুরাচরণে শত শত গ্রাম উচ্ছিন্ন গিয়াছে, শত শত গৃহ সমভূম হইয়াছে। খলেন নামক একখানি গ্রামে এক সহস্র লোকের বসতি ছিল, সেখানে এক শত লোকের অধিক এখন আর নাই, সমুদয় নিপাত হইয়াছে। কোথায় মৃতদেহ রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের সমাধি ক্রিয়াও হয় নাই। অনেক গ্রামে এখন অন্নাভাবে লোক মরিতেছে। ঢাকার কমিশনার তাহাদের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সেখানে ২০ হাজার মণ ধান্য পাঠাইবার অনুমতি করিয়াছেন। লুসাইরা বন্য পশুর সমান এবং তাহাদের সঙ্গে ইংরেজের ন্যায় উন্নত জাতির যুদ্ধ করা গ্লানির বিষয়। তাহার উপর আবার এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ। আবার ইংরেজেরা যে গ্রামে যখন প্রবেশ করিয়াছে, তখন হয় তাহারা শরণাগত হইয়াছে, নয় দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করা কিরূপ নিষ্ঠুরতার কাজ। কেবল ইহাও নয়, যাহারা ইংরেজদিগের মিত্র তাহাদের উপরও নিষ্ঠুরাচরণ করা হইয়াছে, ইংরেজেরা এইরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের ন্যায় পদানত জাতির নিকটই যেন লজ্জিত না হইতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীস্থ জাতিরা তাহাদের বিষয় কি মনে করিবেন। তাঁহারা আমেরিকান, ফরাসীস, প্রুসিয়ান ও রুসিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া যদি পরাজিত হন তবু তাহাতে যশ আছে, কিন্তু কাছাড়বাসী বন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহস্রবার জয়লাভ করিলেও জনসমাজে আদরণীয় হইতে পারেন না।… (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩)

আমাদের উদ্ধারের উপায়

…উচ্চ বেতনের রাজকার্য্যে ইংরেজেরা নিযুক্ত হইয়া আমাদের দেশ হইতে অতি সামান্য টাকা লইয়া যান। গবর্ণমেণ্ট হোমচার্জ বলিয়াও বিস্তর টাকা দেশে প্রেরণ করেন না। ইংলণ্ড কেবল আমাদের দেশে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অসীম ধনশালী হইয়াছেন। আমরা ইচ্ছা ও যত্ন করিলে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ইংলণ্ডে যে ধনস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার বেগ কমাইতে পারি। এ দেশে যদি চিনি, সোরা প্রভৃতি পরিষ্কৃত হয়, এ দেশে যদি যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমাদের দেশের বিস্তর টাকা আমাদের থাকে। আবার আমরা তুলা, পাট প্রভৃতি ভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়া লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে কৃষি ব্যবসায়ীগণ ক্ষেত্রে কাজ করিয়া যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে সেইরূপ মধ্যবর্ত্তী লোকে কারখানা ও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত আর ইংরেজদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, আমাদের ইংরেজদিগের হাউসে কর্ম্মকাজ করিয়া কথায় কথায় জীবনকে ধিক্কার দিতে হয় না, ইংরেজের সংখ্যা দিন দিন এ দেশ হইতে কমিয়া যায় ও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অত্যাচারও কমে এবং আমরা একটু স্ফূর্ত্তির সহিত বেড়াইতে পারি। ইংরেজেরা ভারতবর্ষ কঠোর শাসন দ্বারা আর দাসত্বশৃঙ্খলে চিরকাল আবদ্ধ রাখিবার যত্ন করেন না। ইংরেজদিগের নিজের স্বার্থ কমিয়া গেলে মহৎ ভাবের উদয় হয় এবং তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তাঁহাদের যত্ন হয়। আমাদের ধন বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদের নিকট আমাদের সম্মানও বৃদ্ধি হয়। আমরা তাঁহাদের নিকট চাকরির প্রার্থনা না করিলে আমাদিগকে তাঁহারা আর চাকর ভাবেন না। আবার যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাদের কারবারের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমরা ইংরেজ চাকরও রাখিতে পারি। আমরা ইংলণ্ডে যাইয়া কাগজ, চামড়া, চিনি, সোরা প্রভৃতি চালান দিতে পারি এবং সমুদয় না হউক আবার দেশের অর্থ কিয়ৎ পরিমাণ দেশে আনিতে পারি। ইংরেজেরা লুঠপাট অত্যাচার প্রভৃতি দ্বারা দেশে বিস্তর টাকা লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার সহস্রাংশের একাংশ যদি আমরা আবার দেশে আনিতে পারি তাহা হইলে আমাদের সকল দুঃখ দূর হয়। বাঙ্গালীরা কারখানা খুলিলে ইংরেজেরা সম্ভবতঃ এখানে আসিয়া আবার কারখানা আরম্ভ করিবেন। তাহাতেও দেশের বিস্তর উন্নতি হইবে,—ইংলণ্ডের বিস্তর ধন এখানে আসিবে। আর একটি উপকার হইবার সম্ভাবনা, ব্যবসায় বাণিজ্যের নিমিত্ত ইউরোপের ও আমেরিকার অনেক সভ্য জাতির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হইলে আমরা ইংরেজ ও অন্যান্য উন্নত জাতির সহায়ে ক্রমে উদ্ধার পাইতে পারিব। (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)

মুসলমান ও বাঙ্গালী

গত জনসংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বিস্তর অধিক।

---

* ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়।

এই মুসলমানেরা ভিন্ন-দেশবাসী নন, ইঁহারা ইংরেজ বণিক কি কর্মচারীদিগের ন্যায় কিছু দিন এখানে অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ইঁহাদের গৃহ, সম্পত্তি, সহায়, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, সমুদয় এদেশে। ইঁহারা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই মানবলীলা সংবরণ করেন। শুদ্ধ ইহা নহে। ইঁহারা হিন্দু সমাজের মজ্জাগত হইয়াছেন। এদেশীয় যত শ্রেণীর লোক আছে সকল শ্রেণীতেই মুসলমান প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এ দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, বিপ্লব হইলে আমাদের ন্যায় বিপদে পড়েন। এদেশের উন্নতি হইলে সেই সঙ্গে ইঁহারাও উন্নত হন, সুতরাং সংখ্যা অনুসারে যদি গণনা করা যায় তবে বাঙ্গালা হিন্দু কি মুসলমানদিগের দেশ সে বিষয় সাব্যস্ত করা কঠিন। তবে এ দেশ যে উভয়েরই এবং উভয়েরই এ দেশের উন্নতি অবনতির সঙ্গে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত দেশের উন্নতি করিতে হইলে যে উভয় মুসলমান ও বাঙ্গালীর ঐক্য হওয়া কর্তব্য সে বিষয় বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে মুসলমান ও বাঙ্গালীর অবস্থার যত তারতম্য থাকুক, এক্ষণ আমরা সকলেই পরাধীন, সকলেই সমান দুরবস্থাপন্ন। যখন মুসলমানদিগের সুখের সময় ছিল, তখন তাঁহারা আমাদিগকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেন, আমরাও তাঁহাদিগকে ঈর্ষা ও দ্বেষ করিতাম, কিন্তু এখন তাঁহারাও দাস আমরাও দাস, যে শৃখলে তাঁহাদের হস্ত আবদ্ধ আছে আমাদের হস্ত সেই শৃখলে আবদ্ধ রহিয়াছে, যে বেত্রের আঘাত দ্বারা আমাদের পৃষ্ঠের চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করা হয়, তাঁহারাও সেই বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হন, আমরাও যে ইংরেজদের নিকট কম্পিত কলেবর হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হই, তাঁহাদেরও সেখানে সেই অবস্থাপন্ন হইতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বে অনৈক্যের যে কারণ ছিল এক্ষণ আর তাহা নাই, মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের এখন সে সুখের দিন আর নাই, প্রত্যুত বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির দ্বারা হিন্দু বাঙ্গালীরা অনেক উন্নত হইয়াছেন। এক্ষণ মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন না, আমাদিগকে যত্ন ও আদর করেন, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে গেলে তাঁহারা আদরপূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালীরা দীর্ঘকাল হইতে দাস, মুসলমানেরা এক শত বৎসরের কিছু অধিক পরাধীন হইয়াছেন। বাঙ্গালীরা নিরীহ, সহিষ্ণু, তেজহীন, আবার মুসলমানেরা উগ্র, অহংকারী, অভিমানী এবং তেজীয়ান। সুতরাং অবস্থা অবনতির নিমিত্ত আমরা যত কষ্ট পাই, ইঁহারা সম্ভবতঃ তাহার সহস্র গুণ কষ্ট সহ্য করেন। মুসলমানদিগের একটি বিশেষ গুণ আছে এবং কেবল এই গুণটি না থাকায় আমাদের দুর্দশা। ইঁহারা ঐক্য হইতে জানেন, ইঁহাদের অধ্যবসায়, উৎসাহ, জীবন আছে, ইঁহারা যে কোন কাজে আগ্রহের সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারেন এবং প্রবিষ্ট হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এবং ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা সমাধা করিবার যত্ন করেন। নীল বিদ্রোহের প্রধান প্রবর্তক মুসলমান প্রজারা। অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে দমন করিয়া নীল বুনাইবার নিমিত্ত কাটকে দিয়া অনাহারে রাখিয়াছিলেন। অনেক কুঠিয়ালগণ তাহাদিগকে হৃৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা নীল বুনিবে না যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে তাহা কোন মতেই পরিত্যাগ করিয়াছিল না। এই সময় একদিন লেফটেনেন্ট গবর্ণর* নৌকাযোগে গোড়ই নদী দিয়া গমন করিতেছিলেন। নদীর দুই ধারে অসংখ্য প্রজা উচ্চৈঃস্বরে নীলের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিতে থাকেন। প্রজারা গবর্ণরের তাচ্ছিল্য দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়ই নদী ভয়ানক, তাহার স্রোতের বেগে ষ্টীমার স্থির ভাবে গমন করিতে পারে না, আবার কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। কূল এত উচ্চ এবং অসমান যে যত্নপূর্ব্বক কেহ নদী হইতে উপরে উঠিতে পারে না। প্রজারা ইহা লক্ষ্য না করিয়া প্রাণের আশঙ্কা কিছুমাত্র না করিয়া এই ভয়ানক নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গবর্ণর নৌকা হইতে দেখিলেন শত২ প্রজাঃ জলে ঝম্প দিয়া তাঁহার নৌকাভিমুখে গমন করিতেছে এবং দেখিয়া অবাক হইলেন। তিনি আর গমন করিতে পারিলেন না, তিনি কূলে নৌকা লাগাইলেন, প্রজারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আপনাদিগের দুঃখের কাহিনী বলিল, তিনি সমুদয় শুনিলেন এবং প্রজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

পাবনার গোলযোগও† মুসলমান প্রজারা আরম্ভ করিয়াছে এবং যেখানে অধিক মুসলমান সেই জেলার প্রজারা এইরূপ ঐক্য হইয়া জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। সে দিন কলিকাতায় গাড়োয়ানগণের জোট কি অদ্ভুত বিষয়। হয়ত এক দিনে এবং একজন মুসলমানের যত্নে ইহারা সমুদয় ঐক্য হইল। যে জাতির এই গুণ আছে লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, সৌভাগ্য তাহাদিগকে বিস্মৃত হন না। মুসলমানদিগের এই গুণের সঙ্গে যদি আমাদিগের বুদ্ধি কৌশল একত্রিত করা যায়, তাহাদের উগ্রতা যদি বাঙ্গালীদিগের বিবেচনা, বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাবের সঙ্গে একত্রিত করা যায় তবে আমরা যাহা প্রার্থনা করিব ঈশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। স্থানীয় যে সমুদয় সভা হইতেছে তাহারা যেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মুসলমান ও বাঙ্গালীর সদ্ভাব ও ঐক্যতা যাহাতে হয় তাহার যত্ন করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবেন। (২৩ অক্টোবর ১৮৭৩)

---

* স্যার জন পিটার গ্রান্ট

† জমিদার-প্রজার বিরোধ

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালী

...যে দেশে ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ডাকাইতের ভয় ছিল, যে দেশে ইংরেজদিগের ও বন্দুকের প্রতি লোকে ভ্রুক্ষেপ করিত না, সে দেশ এই। আমরা সেই দেশে এইক্ষণ বাস করিতেছি এবং সেই দেশে এক্ষণ একজন ইংরেজ দেখিলে কি একটি বন্দুকের শব্দ শুনিলে লক্ষ লক্ষ লোক ভয়ে পলায়ন করে। ইংরেজদিগের এইরূপ সুশাসন, তাহাদিগের এইরূপ আধিপত্য। এই সমুদয় ডাকাইত আমাদের সমাজের কণ্টক ছিল, আমরা ইহাদিগের ভয়ে অহরহ কম্পিতকলেবর থাকিতাম। ইহাদিগের নিপাতে দেশে যে কত মঙ্গল হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু তথাচ আমাদের দেশের ডাকাইতের গল্পগুলি শুনিতে আমাদের কত উৎসাহ ও আনন্দ হয়। ইংরেজদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ ডাকাইত ছিলেন, ফরাসিসদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ডাকাইত ছিলেন, রোমান রাজ্যের ভিত্তিভূমিও এইরূপ ডাকাইতেরা পত্তন করে, মুসলমানদিগের ব্যবসায় ছিল ডাকাইতি। আমেরিকার মহাদেশ ডাকাইতদের দ্বারা বিজিত হয়। ইঁহারা সকলেই পরদ্রব্য লুণ্ঠন দ্বারা একরূপ জীবন যাপন করিতেন ও নররক্তে দেশ কলুষিত হইত। ইঁহারা কোন রাজ নিয়মের বাধ্য ছিলেন না, নৃশংস স্বভাবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কোন বাধাকেই লক্ষ্য করিতেন না, আমরা পূর্ব্বকালের কথা পরিত্যাগ করিয়া যে সময় স্পেনীয়, ফরাসিস, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি আমেরিকায় প্রবেশ করেন সে সময়ের কথাও যদি স্মরণ করি তাহা হইলেও আমাদের হৃৎকম্প হয়, আমাদের লোমাঞ্চ হয়। কিন্তু ডাকাইতেরা যে শক্তি প্রভাবে সমাজের কণ্টকস্বরূপ হয় সে শক্তি পরিশোধিত হইলে তাহা দ্বারা আবার সমাজ পরিশোধিত ও উৎকর্ষিত হয়। কাল সহকারে ক্ষমতা ও বৈভব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের নৃশংস স্বভাব, ইঁহাদের পরদ্রব্য লুণ্ঠন-স্পৃহা, ইঁহাদের অধর্ম্মাচরণ, ইঁহাদিগের রক্ত পিপাসা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ইঁহারা বাহুবলে বীরাগ্রগণ্য হন, দেশ বিদেশ জয় করেন, অসভ্য দেশকে সভ্য করেন, দুষ্ট দমন করেন ও ধর্ম্মের প্রচার করেন। যে ইংরেজ, ফরাসিস, আমেরিকাবাসী প্রভৃতির নাম শুনিলে জনসমাজ চমকাইয়া উঠিত তাহারা আজ পৃথিবীর রাজা, সভ্যতার আধার, জ্ঞানের ভাণ্ডার, তাহারা সকলের পূজনীয়, আদর্শস্বরূপ ও বল ভরসা। আমাদের দেশীয় ডাকাইতেরা যদি অপ্রতিহত ভাবে থাকিতে পারিত, যদি ইংরেজদিগের কঠোর শাসনে শাসিত ও নির্ম্মূল না হইত, কারাগারে যাবজ্জীবন অতিবাহিত না করিত এবং উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ না করিত তবে, কে জানে, আমরাও একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বলবীর্য্যে, সাহসে, রণদক্ষতায় দিগ্বিজয়ী হইতাম, আমরাও রাজ্যস্থাপন করিতাম এবং আজ হয়ত অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বাঙ্গালীরা স্বদেশীয় রাজার অনুরাগ ও গৌরব সর্ব্বত্র প্রচার করিতেন। ইংরেজেরা যদি এ সমুদয় ডাকাইতদিগকে নিপাত না করিয়া তাহাদিগকে এবং ডাকাইত ভিন্ন এদেশে আরো অনেক লোক ছিল যাহারা বীরত্বে, সাহসে, পৃথিবীর কোন জাতিকে লক্ষ্য করিত না, তাহাদিগকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় ও উৎসাহ দিতেন তাহা হইলে আমরা এক্ষণ যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া বাঙ্গালী জাতির গৌরব করি, সেইরূপ বাঙ্গালীর যুদ্ধ নিপুণতা, বীরত্ব, সাহস, বলবীর্য্য প্রভৃতি লইয়া গৌরব করিতে পারিতাম। (২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৩)

জয় না পরাজয় ?

কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষে ভারি অত্যাচার আরম্ভ করেন। স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্য কলে বলে কৌশলে অধিকার করিতে থাকেন। ইংরেজদিগের চির মিত্র অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করেন। সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। নররক্তে দেশ প্লাবিত হয়। কোম্পানি বাহাদুর রাজ্যচ্যুত হন। স্বাধীন রাজাদিগের রাজ্যে ইংরেজেরা হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করেন। ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের জিত হয় না আমাদের জিত হয় ?

নীলকুঠিয়ালগণ ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রজারা উচ্ছিন্ন যায়, জমিদার ভদ্রলোক অস্থির হইয়া পড়ে। লোকের মান সম্ভ্রম বাঁচান দুষ্কর হয়। শেষে অসহ্য হইয়া বাঙ্গালার মুমূর্ষু প্রজারাও ক্ষেপিয়া উঠিল। নীলকুঠিয়ালের কুল ধ্বংস প্রায় হইল। ইংরেজেরা অপমানিত হইলেন। দেশের লোক আপনার স্বত্ব রক্ষার নিমিত্ত যত্নশীল হইল এবং ইহাতে নীলকুঠিয়ালগণের না আমাদের জিত হয় ?

লর্ড মেও উচ্চশিক্ষা উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। দেশের লোক সমুদয় ক্ষেপিয়া উঠিল। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ইহার নিমিত্ত সভার অধিবেশন হইল। লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মের প্রতিবাদ করিল। ষ্টেট সেক্রেটারি আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। গবর্ণর জেনারেল পরাস্ত হইলেন। আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল। গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব্ব হইল। প্রজারা জানিতে পারিল যে কায়মনোবাক্যে সংকল্প করিলে গবর্ণর জেনারেলকেও পরাস্ত করা যায়, সুতরাং লর্ড মেও জনসাধারণের মতের বিপরীত কাজ করিয়া হারেন না জিতেন ?

সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব যখন মিউনিসিপ্যাল বিলের প্রবর্ত্তনা করেন, তখন ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্যেরা ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। দেশের লোক ক্ষেপিয়া গেল। নানা স্থান হইতে ইহার প্রতিবাদ হইল। বিল আর পাশ হইল না। সেই দিন অবধি ক্যাম্বেল সাহেবের দুগ্রহ আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত তাঁহার প্রত্যেক কাজ আমরা নির্ভয়ে প্রতিবাদ করিতে লাগিলাম। তিনি শঙ্কা দেখাইতে লাগিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অসীম ক্ষমতা অর্পণ

করিলেন। নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে গ্রাহ্য করিলাম না। তিনি একবার পরাস্ত হওয়ায় আমরা তাঁহার উপর অধিকার প্রাপ্ত হই, তাহা হইতে তিনি আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষে পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন। সুতরাং ক্যাম্বেল সাহেব স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে কর্ম্ম করিয়া জিতিলেন না হারিলেন?

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইংরেজেরা পদচ্যুত করিলেন। ইহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে শেষে কে হারে কে জিতে বলা যায় না। এখন সুরেন্দ্রের প্রতি অবিচার হয় নাই ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের কত সিবিলিয়ানকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে? সুরেন্দ্র যদি কর্ম্মচ্যুত না হইতেন তাহা হইলে রংপুরের জজ সম্ভবতঃ এরূপ বিপদে পড়িতেন না। লেবিন সাহেব আজ ১৪।১৫ বৎসর কর্ম্ম করিতেছেন এবং চিরকাল এইরূপে কাজ করিয়া থাকেন। রংপুরেরও আজ কয়েক বৎসর কাজ করিতেছেন। এত কাল দেশীয় লোকে কিছু বলে নাই এবং সুরেন্দ্র যদি অবিচারে কর্ম্মচ্যুত না হইতেন তাহা হইলেও বোধ হয় লেবিন সাহেবের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। গবর্ণমেন্টে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই সুতরাং তাঁহারা ইংরেজদিগের সময় অন্তরূপ বিচার করিতেও পারেন। যে অপরাধ সুরেন্দ্র করিয়াছেন সেই অপরাধ কোন ইংরেজ করিলে হয়ত গবর্ণমেন্ট তাহাতে কোন দোষ দেখিতেন না। কিন্তু তাহাতেও আমাদের জিত। ইংরেজেরা শুদ্ধ বাহু বলে ও বুদ্ধি বলে আমাদিগকে শাসন করেন না। আমাদের দেশীয় লোকের অনেকের বিশ্বাস আছে যে ইংরেজেরা ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, সুবিচারক এবং তাঁহাদের উপর লোকের এই বিশ্বাস ও ভক্তি আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদের উপর এত আধিপত্য করেন, কিন্তু যে দিন আমরা দেখিব যে তাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের কোনরূপ ধর্ম্মজ্ঞান নাই, তাঁহারা ন্যায় অন্যায় গ্রাহ্য করেন না, সেই দিন অবধি ইংরেজদিগের প্রতি আমাদের ভক্তি কমিয়া যাইবে এবং ঘৃণার উদ্রেক হইবে এবং যে দিন অবধি তাহাই হইবে সে দিন অবধি এদেশে ইংরেজের পতন আরম্ভ হইবে। ইংরেজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া থাকিবেন, আমরা সে বিষয় সন্দেহ করি না, তাঁহারা আমাদের প্রতি আধিপত্য করিবেন তাহাও আমরা সন্দেহ করি না, কিন্তু ইংরেজ দেখিলে আর আমাদের পা কাঁপিবে না, হৃদয় দুর দুর করিবে না, ইংরেজের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতে আশঙ্কা হইবে না, ইংরেজেরা অপমান করিয়া কি অত্যাচার করিয়া আর বাঁচিয়া যাইতে পারিবেন না, সুতরাং সুরেন্দ্রকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া ইংরেজেরা হারিলেন কি জিতিলেন?
(৪ জুন, ১৮৭৪)

পুনর্বসতি কার্যে আমাদের গলদ কোথায়?

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালী ও ত্রিপুরা সম্পর্কে বহু বিবরণ সংবাদ-পত্রে ও মাসিক, সাপ্তাহিকে নানা লোকে নানাভাবে লিখেছেন—কেউবা সংবাদপত্রের ফাইল ঘেঁটে, কেউবা বিধ্বস্ত এলাকার ওপর দিয়ে বিমানযোগে গমনকালে অগ্নিশিখা ও ধূম্রজাল দেখে, কেউবা বিধ্বস্ত অঞ্চলের স্থান-বিশেষের ওপর খানিকটা মোটর ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা থেকে।

নোয়াখালী এবং ত্রিপুরাবাসী কেবল যে ধনেপ্রাণে বিনষ্ট হয়েছে তা নয়, নীতি ও ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও তাদের এক প্রকার অপমৃত্যুই ঘটেছে। তাতেও যে লোকের কিছু শিক্ষা হয়েছে এমন নজির আমাদের চোখে পড়ে না।

নোয়াখালীর ব্যাপারে বাংলা কংগ্রেসের মান রক্ষা করেছেন গান্ধীজী। এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা সুচেতা দেবীর সেবাকার্য্যও কম নয়। রাষ্ট্রপতি কৃপালনীকে অবশ্য দীর্ঘ দিন আমরা পাই নি—নিখিল ভারতীয় ব্যাপারের জন্যে তাঁর পক্ষে পূর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল থাকা সম্ভব হয় নি, সুচেতা দেবীর সেবাপরায়ণতার কথা নোয়াখালীবাসী যে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

মহামানবের পেছনে পেছনে এক দল নামপাগল বা যশপাগল ঘুরে বেড়ায়; তারা সংবাদপত্রে নিজের বা নিজ দলের ছবি ও নাম প্রচারে ব্যস্ত। তারা বিবৃতি দিয়ে নাম জাহিরে ওস্তাদ।

আজকালকার নেতাগিরি কাগজে কলমে, কাজের বেলায় কিছু হোক বা না হোক। বিপদের কালে এবং পরেও যাদের শিক্ষা হয় না, অনুদার স্বার্থপরতা যারা ছাড়তে পারে না, মিলনের পথ যারা নেতৃত্বের কূটচক্রে জটিলতর করে তুলতে বেদনা অনুভব করে না, সেই সব অযোগ্য স্বার্থপর নেতাদের কাছে দেশ কি আশা করতে পারে?

যারা নামপাগল নয়, কাজ-পাগল, যারা নেতা নয়—দিবারাত্রি যাদের বিশ্রাম নেই, যাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কেউ করে না, করে নি, তাদের একজনের কথা এখানে আমি উল্লেখ করব। এঁর সেবা ও কর্মপরিচালনা-শক্তির

উল্লেখ না করলে নোয়াখালীতে গান্ধীজীর আগমনের ও গ্রাম-পরিক্রমার ইতিহাসে ফাঁক থেকে যাবে।

ইনি নেতা নন, কর্মী ও কর্মপরিচালক। নেতা নন বলেই তাঁকে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই নে। ইনি শ্রীযুক্ত চারুভূষণ চৌধুরী—সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ ব্যবস্থাপক। এমন আরো বহু কর্মী আছেন যাঁদের সেবার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করব। আজকের দিনে তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই নে। নেতা নন বলে তাঁদের সেবা ও কাজের প্রকৃত কদর হয় নি, কিন্তু তাঁদের সেবা যে অপরিহার্য। তাদের কর্মশক্তির ওপরই নেতৃবৃন্দের নেতাগিরি নির্ভর করছে। যাই হোক, প্রকৃত সেবক যারা যাদের নিকট দেশবাসী প্রকৃতপক্ষে ঋণী, যাঁরা নাম-যশের প্রত্যাশী নন তাদের নাম আজ প্রকাশ করব না, কেননা সে সময় এখনো আসে নি, কবে দেশে শান্তির বাতাস বইবে তা অন্তর্যামীই জানেন। নেতাদের দৃষ্টি কিন্তু যথাস্থানে পড়ে নি। যে পথে গান্ধীজী গ্রাম পরিক্রমণ সুরু করেছেন তারই সহায়ক কর্মসূচী প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা দরকার। ভারতের সত্যিকার কল্যাণ তাতেই নিহিত আছে। নেতাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে; তাই তাঁরা পথভ্রান্ত হয়েছেন।

গান্ধীজীর অহিংস-কর্মকে আমরা অবিশ্বাসীর বিকৃত দৃষ্টিতে দেখি, তাই ভীরুতার প্রকাশকেই অহিংসা আখ্যা দিয়ে হিংসার চির-অশান্তিময় কর্মপ্রণালীকে সমর্থন করতে চেষ্টা করি; কিন্তু হিংসার পথেই বা দেশ কত দূর এগিয়েছে? গান্ধীজী বলেন, বাংলা সন্ত্রাসনবাদের স্রষ্টা হলেও জনসাধারণের মধ্যে সাহস সংক্রামিত করতে পারে নি; বরং অহিংস প্রচেষ্টার ফলে যত অসম্পূর্ণভাবেই হোক না কেন, ভারতের জাতীয় চরিত্র অনেক পরিমাণে উন্নত হয়েছে—একথা আজ একান্ত ভাবেই সত্য।

গান্ধীজী প্রচণ্ড শীতে নগ্ন পদে গ্রামের পথে ধানক্ষেত আর পাটক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে লোকের সঙ্গে পরিচয় করেছেন, প্রাণের কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একার কথা কয়টি পল্লীগৃহে গিয়ে পৌঁছবে? সেখানে প্রয়োজন ছিল সংস্কারমুক্ত সেবাপরায়ণ বহু লোকের।

গান্ধীজী একাধারে নেতা ও কর্মী, তাঁর পক্ষে অসাধ্য সাধন করাও অসম্ভব নয়। কেননা তিনি পূর্বাপর কথা ও কাজে এক। কাজ ও সেবার ভেতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ।

বহু সেবা-প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংস্থা অক্লান্ত ভাবে নোয়াখালীর সেবা করে চলেছেন—কোনো সংস্থা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে, কোনোটি বা বিপন্নের ব্যথায় ব্যথিত হয়ে, কর্তব্য জ্ঞানে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। খাদি প্রতিষ্ঠান, ২। অল্‌-ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স, ৩। রিলিফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, ৪। ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি, ৫। ফ্রেণ্ডস্‌ এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট, ৬। আই. এন. এ., ৭। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ৮। রামকৃষ্ণ মিশন, ৯। প্রবর্তক সংঘ, ১০। মারওয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি ১১। হিন্দু মহাসভা, ১২। নোয়াখালী রিলিফ রেসকিউ এ্যাণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন কমিটি, ১৩। ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউশন, ১৪। আর্য সমাজ।

আজ যে পুনর্বসতি ও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াস চলছে এই প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই।

পুনর্বসতির সমস্যা এক মস্ত বড় জটিল সমস্যা। তাকে যথার্থ ভাবে রূপ দিতে গেলে চাই বিরাট আয়োজন। এই আয়োজনের ভার একমাত্র গবর্ণমেণ্টই নিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান গবর্ণমেণ্টের যা হালচাল তাতে গবর্ণমেণ্টই সব করবেন ব'লে নিশ্চিন্ত থাকলে ও সরকারী ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই গান্ধীজী নোয়াখালীতে উপস্থিত থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের পুনর্বসতি-কার্যে অর্থাৎ বাড়ী-ঘর আসবাবপত্রাদির পুনর্নির্মাণ দ্বারা গৃহহারা সর্বহারাদের স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে বাংলা-সরকারকে বাধ্য করতে, তথা বাংলা সরকারের সহিত সহযোগিতা করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর কর্মশক্তি বাইরে অনেক সময় অনুভব করা যায় না, কিন্তু তা যে অদ্ভুত ফলপ্রদ সে পরিচয় অনেকেরই অবিদিত নেই।

নোয়াখালীতে কাজের অন্ত নেই; কর্মীর অভাব। নোয়াখালীতে এসে গান্ধীজী সর্বাগ্রে পানীয় জলের সুব্যবস্থার অভাব বোধ করেন। তিনি বলেন গ্রামবাসী কেমন করে পুকুরের অপরিস্রুত জল পান করে আর এদেশের শিক্ষিত স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌ চিকিৎসকগণ কেমন করে এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন তা তিনি বুঝতে অক্ষম। কয়েক দিনের মধ্যেই পানীয় জল সম্বন্ধে তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের পরিস্রুত জল প্রাপ্তির কোন সহজ উপায় আছে কি না তা চিন্তা করে দেখবার জন্যে তিনি শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়কে তাঁর আগ্রহ জানান। সতীশবাবু কয়েক দিনের চেষ্টায় একটি অতি সাধারণ অথচ খুবই উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করেছেন। গান্ধীজীরও তা পছন্দ হয়েছে। একে "ফিলটার কূপ" বলা যেতে পারে। সতীশবাবুকে "পুকুর কূপ" বলতে শোনা গেছে। পুকুরের জল পরিস্রুত হয়ে যাতে প্রয়োজনানুরূপ জল কতক পরিমাণেও সঞ্চিত হতে পারে এজন্যে পুকুরের মধ্যেই ফিলটার কূপের সহিত একটি সঞ্চয়-কূপও সংযোজিত করা হয়েছে। গ্রামের অতি সাধারণ লোকেরাও এই নমুনা দৃষ্টে নিজ নিজ পুকুরের ভিতরে এই 'ফিলটার কূপ' তৈরি করে বসাতে পারেন, সম্ভবত দশ-পনর টাকার বেশী খরচ এতে হবে না।

গ্রামের লোকের পুনর্বসতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের আবশ্যকতাও খুব বেশী। গ্রামবাসীদের যদি প্রায় সব বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে হয় তবে স্থানীয় কয়েকটি কুটীরশিল্পের ক্রমোন্নতি সাধনের ওপরে জোর দিতে হয়। যেমন বস্ত্রশিল্প—চরকা ও তাঁত। চট্টগ্রাম বিভাগে পাহাড়ী মিহি তুলোর অভাব নেই। ফেণী মহকুমায় খাদি প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায়, কুমিল্লায় চরকা সঙ্ঘের চেষ্টায় পঁচিশ বৎসর পূর্বেই চরকার প্রচলন হয়েছিল। নোয়াখালীর প্রায় সর্বত্রই নাথ-সম্প্রদায়ের বাস, ঘরে ঘরেই তাঁত। বস্ত্রশিল্পের সব রকম আয়োজনই ছিল, অক্টোবর হাঙ্গামায় সবই নষ্ট হয়েছে তাকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

বিগত দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ টাকার খাদি কলিকাতার বাজারে ও অন্যত্র এই নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলা সরবরাহ করেছে।

এ ছাড়া নারিকেল এ জেলার কুটীর-শিল্পের উপযোগী একটি বড় সম্পদ। নারিকেলের তেল ও উপাদেয় খাদ্যাংশ বাদ দিলেও ছোবড়া থেকে দড়ি, মাদুর পাপোষ ইত্যাদি, নারিকেলের মালা ও গাছ হতে অত বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব। এর থেকে বিস্তর অর্থাগমের আশাও লোকে করতে পারে। মাদ্রাজ ও সিংহলের নারিকেল-শিল্পজাত বহু পণ্যদ্রব্য আমরা কিনে ব্যবহার করি, বিদেশ থেকেও আমদানী করি। এ বিষয়ে মনোযোগী হলে নোয়াখালীই আমাদের সে অভাব পূরণ করতে পারে।

সুপারি এ জেলার আর একটি বড় সম্পদ। তা ছাড়া এ জেলার মাটি এমন উর্বরা যে চেষ্টা করলে সোনা ফলানো যায়। সরকারী এবং বেসরকারী অনেক লোকই আছেন, এদিকে যাঁদের মাথাও খেলে, সরকার ইচ্ছা করলে এই জেলাকে স্বাবলম্বী আদর্শ জেলা হিসাবে গড়ে তোলার কাজে তাঁদের নিয়োগ করতে পারেন।

পুনর্বসতি কমিশনার মিঃ টি. আই. এম্ নুরন্নবী আই. সি. এস মহোদয় স্বয়ং কুটীর-শিল্পের উন্নয়নের অনুরাগী, তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনেরও পক্ষপাতী। বস্তুত এইরূপ গুণী ব্যক্তি থাকলেও বর্তমান সরকার যে তাঁদের শক্তিকে কাজে লাগাতে আগ্রহশীল নন সে কথা সকলেরই জানা আছে।

গান্ধীজীর আগমনে ও খাদি প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে গ্রাম-সেবাদল সংগঠিত হয়েছে। যদিও সেগুলো সর্বত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয় নি। তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই আশাপ্রদ কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। চণ্ডীপুর মাসিমপুর, আভাখোড়া, রামদেবপুর, করপাড়া প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর গ্রাম-পরিক্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রাম-স্বেচ্ছাসেবকদল সংগঠিত হয়। বর্তমানে এই সেবকদলগুলিই নিষ্ঠা ও সেবার দ্বারা 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কোথাও কোথাও মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরাও যোগদান করেছেন। এইরূপ সংস্কারমুক্ত হিন্দু ও মুসলমান যুবকবৃন্দ দলে দলে যোগদান করলে দেশের দুঃখদৈন্য ও পারস্পরিক হানাহানি অনেক পূর্বেই বিদূরিত হ'ত। পরিতাপের বিষয় আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ অনেকে অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানবিকতার পথকে বিসর্জন দিয়েছেন। তাই মহত্তর কর্মানুষ্ঠানে তাদের অধিকাংশকেই পাই না।

গান্ধীজী গ্রাম-পরিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র গঠনমূলক কার্য্যের প্রতি জোর দিচ্ছেন। অস্পৃশ্যতা দূর করতে, স্ত্রীলোকদের সীতা ও দ্রৌপদীর আদর্শ গ্রহণ করতে ও নির্ভীক হতে, স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দিচ্ছেন। শিক্ষা ও সদাচার—উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন ও শুদ্ধি দিয়ে আনার জন্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ছিল তাঁর সস্নেহ ও ব্যাকুল আবেদন। সে আবেদনে সাড়া কোথায়?

যে গ্রামের সব কয়টি বাড়ীর প্রায় সমস্ত গৃহই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যে বাড়ীতে দুটি-তিনটি প্রাণী নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে, সে গ্রামের সে বাড়ীর হিন্দু বাসিন্দাদের মধ্যে আজও শ্রেণীকৌলিন্য নিয়ে লাঠালাঠি চলেছে। আজকার দিনে নোয়াখালীর গ্রামে এমন আত্মাভিমান বড় অদ্ভুত লাগে। কে কায়স্থ, কে নাথ, কে ধোপা, কে নমঃশূদ্র এই শ্রেণী-বৈষম্য বোধ বর্তমান মুমূর্ষু অবস্থাতেও তারা ছাড়তে পারে নি, পারছে না। এরা বাঁচবে কেমন করে? অথচ কোন কোন গ্রামে মুসলমান চাষীরা হিন্দুদের 'বয়কট' করেছে। তাদের জমি তারা চাষ করবে না, হিন্দু বাড়ীতে মজুরীও করবে না ইত্যাদি। এই সংকল্প বুদ্ধিমানের নয়। এতে বিপদ কেবল হিন্দুদের নয়, মুসলমানদেরও; বরং শেষোক্তদের বেশীই বলব। যাই হোক, এমনই যদি ঘটে তা হলে হিন্দুরা পরস্পর যৌথব্যবস্থায় শ্রমবিনিময় দ্বারা পরস্পরের জমি চাষের ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু হিন্দুরাই যদি পরস্পরে হাত মিলিয়ে, মন মিলিয়ে চলতে না পারে তবে এদের বাঁচোয়া কিসে?

তাই অতি দুঃখে বলতে হয় এ দোষ তো আজকের নয়। সমাজবিধির মধ্যে দোষত্রুটি অনেক আছে, থাকলেও এর মধ্যে যেটুকু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবিচার ছিল—যার দ্বারা সমাজের হিত আশা করা যেত, তার বিলোপ ঘটেছে। লোক অতিরিক্ত স্বার্থপ্রবণ হয়ে আপন আপন আরাম অনুসন্ধানে অন্ধপ্রায় হয়ে পড়েছে সমষ্টির প্রতি। এখন এ থেকে মুক্তি পেতে হলে চাই উপযুক্ত ও ব্যাপক লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে শিশু বালক বৃদ্ধ—স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকেই সব রকমে উপযুক্ত করে তুলতে হবে।

অন্ন-বস্ত্র-গৃহহীন হয়ে মানুষ এমনই দিশেহারা হয়ে গেছে যে মিথ্যা বলা ও অসদাচরণ করা যেন কিছুই নয়। অভাবে স্বভাবতই যে পতন হয় আমরা সর্বত্রই এখন তা

দেখতে পাচ্ছি। গান্ধীজী যা বলছেন তা সাধারণের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে অহিংসার পথে বিচরণ করছেন তাঁরাও অনেক সময় তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন না। কাজেই সাধারণের পক্ষে বাপুজীর মহা মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ করা ও প্রতিদিনকার জীবনে তদনুযায়ী চলা অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। বুঝতে না পেরে লোকে ভীরুতার আশ্রয় নেয় ও মনে করে সে অহিংসার পথেই চলছে। বস্তুত অহিংস তারা নয়। ভগবানে যাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে তিনিই কেবল অহিংস আচরণে সক্ষম। সংশয়ীর পক্ষে অহিংস-আচরণ ভীরুতার নামান্তর, দুর্বলতা ঢাকবার যুক্তিমাত্র।

কেবল কথার দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা লোককে সংস্কারমুক্ত করা যাবে না, তাদের যথোচিত শিক্ষাও হবে না, প্রতিদিনকার জীবনের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্তে গ্রামবাসীদের সহিত কর্মীদের দীর্ঘকাল বাস করা দরকার। কিন্তু বাংলা দেশের কংগ্রেস-নেতারা কি সে পথ নিয়েছেন? দরিদ্র গ্রাম্য হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের সত্যিকার কি কল্যাণ তাঁরা করেছেন, গ্রামের লোকে তা আজও প্রশ্ন করে জানতে চায়। নেতাদের এ থেকেও দৃষ্টি খুলে যাওয়া উচিত।

গান্ধীজী নোয়াখালীতে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম-সাধনের জন্তে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—গৃহে গৃহে ঘুরে ঘুরে ব্যাকুল আগ্রহে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের হৃদয়-দ্বারে সেবার অর্ঘ্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর সেবা, অন্তর থেকে উৎসারিত কিনা, সংশয়ী মুসলমান বন্ধুগণ তিলে তিলে পরীক্ষা করে দেখেছে। কিন্তু এই পরীক্ষা তাঁর কাছে নূতন নয়। সারা জীবনই তিনি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সাধনা একই ধারায় একই পথে চলেছে, আজ নয় দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরে।

গান্ধীজীর নোয়াখালীতে অবস্থান, বাংলা-সরকার তথা মুসলীম লীগ মহল পছন্দ করেন নি। গান্ধীজী তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে অবিচল ও অকপট, তাই বাংলা-সরকার ও মুসলীম লীগের বিরাগভাজন হওয়াকে তিনি উপেক্ষা করে পরম শ্রদ্ধা, আশা ও নিষ্ঠা নিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্তে শান্ত মনে আপন কর্তব্য করে গেছেন। তাঁর দীর্ঘকাল অবস্থান ও গ্রাম-পরিক্রমণের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও প্রত্যয়ের ভাব ধীরে ধীরে ফিরেও আসছিল। কোন কোন গ্রামে কিছু লোক যে দুষ্কার্যের ফন্দিতে থাকবে তা তো আশ্চর্য নয়। রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার ও দুষ্ট বিচারবুদ্ধির ফলে তারা বিভ্রান্ত। মানবিকতার দিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সভ্যতা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হোক বা নাই হোক, তা তাদের দেখবার নয়। তাই তারা বেপরোয়া ও প্রগতির শত্রু।

মুসলমান এখানে হিন্দুদের ধর্মাচরণ সহ্য করতে পারে না। একদিন গান্ধীজীর প্রার্থনাকালে যখন "রামধুন" ভজন গীত হচ্ছিল তখন মুসলমানদের অনেকেই প্রার্থনা-সভা পরিত্যাগ করে উঠে যায়। গান্ধীজী জানতে পারেন রামধুনে তাদের আপত্তি। পর দিবস ধর্ম সম্পর্কে পারস্পরিক উদারতা ও সহিষ্ণুতার বিষয়ে তিনি সমবেত জনতাকে জানান। তিনি বলেন ধর্মাচরণ সম্পর্কে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা থাকা দরকার। এ বিষয়ে গায়ের জোরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। প্রকৃত ধার্মিকের কোনো ধর্মের প্রতিই বিদ্বেষ থাকতে পারে না। সকল ধর্মই তার কাছে শ্রদ্ধার বস্তু। সেই থেকে রামধুন সম্পর্কে আর কোনো মুসলমান কোনো আপত্তি উত্থাপন করেন নি।

এই ধরণের প্রতিদিনের ছোটখাটো ঘটনার ভিতর দিয়ে লোকশিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের কাজ করা দরকার। তবেই কোনো না কোনো দিন আমরা সত্যই একটা স্থায়ী মিলনের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে পারব। নেতাদের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ তাঁরা অকপট সেবার ভার মাথায় নিয়ে গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের প্রত্যক্ষ সেবার ভেতর দিয়ে উভয়কে একই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলুন।

সাঁওতাল আইনে নারীর স্থান

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল

সাঁওতালদের মধ্যে নারীর স্থান ও সম্পত্তিতে তাহার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এই বিষয়টাই প্রথমে নজরে পড়ে যে, কি করিয়া একান্ত অধিকারহীন, আদিম সমাজের স্ত্রী-জাতি ধীরে ধীরে, পরোক্ষভাবে, সামাজিক আইনের কল্পনার বলে (by indirect legal fictions) সম্পত্তিতে স্বত্ব লাভ করিয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের নারী-জাতি সম্বন্ধীয় সামাজিক আইনের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

সাঁওতালী উপকথা ও কাহিনীর পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ইহাদের মতে প্রায় সব নারীই তুকতাক ও ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী।* আদিম সাঁওতালদের মতে নারীদের এত ক্ষমতা

আছে যে, তাহারা "বোকা"দেরও ঠেকাইতে পারে। খ্রীষ্টানরা যেমন বিশ্বাস করেন যে আদি মাতা ঈভের দেহ স্বামী আদমের বাঁ পাশের পাঁজরার হাড়ে গঠিত হওয়াতে, নারীর স্বভাব হইয়াছে বাঁকা, সাঁওতালদের বিশ্বাসও মূলতঃ প্রায় সেই ধরণের। "নারীকে বিশ্বাস করিও না," এ কথাটি গানের ধুয়ার মত তাহাদের লোক-সাহিত্যে দেখা যায়।

আজকাল অবশ্য সাঁওতাল নারী আইনঘটিত কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু গোড়ায় কেন যে সাঁওতালী আইনে নারীর স্থান এত নীচে ছিল তাহা বুঝিতে হইলে তাহার সামাজিক মূল্য কি তাহা জানা দরকার। স্ত্রী হিসাবে তাহাকে ক্রয় করা হয় মূল্য দিয়া (পণং — bride-price), উদ্দেশ্য বিবাহ ও বংশরক্ষা। কাজেই, সাঁওতালরা মনে করে, নারী বিধাতার এক খামখেয়ালী, দায়িত্বজ্ঞানহীন সৃষ্টি। সে মানবের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু বড়ই বখাটে সঙ্গিনী। তাই সম্পত্তিতে অধিকার ত দূরের কথা, সাঁওতালদের সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর যথোপযুক্ত কোন স্থানই স্বীকৃত হয় নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, নারী গ্রামের পঞ্চায়েতে বসিতে পারে না, অবশ্য সেই বিচার-সভায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়।

নানা কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রধান কারণ এই যে, আদি সাঁওতালেরা ছিল যাযাবরধর্ম্মী, প্রধানতঃ মৃগয়া করিয়া চলিত তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন। যৌথ ব্যবস্থায় ক্ষুৎপিপাসার সামগ্রী উৎপাদন ও বন্টন করিয়া তাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যাযাবর জীবন অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমান কৃষি-যুগের প্রজা হিসাবে সাঁওতালরা সমাজে তাহাদের প্রকৃত স্থান গ্রহণ করিয়াছে অনেক পরে। কাজেই স্থাবর সম্পত্তিই যখন ছিল না, সেই প্রাচীন কালে নারীর উত্তরাধিকার লইয়া কাহারও মাথা ঘামাইবার কোন দরকার হয় নাই। তাহাদের সে প্রয়োজন আসিয়াছে কালের বিবর্ত্তনে, নূতন সামাজিক পরিবেশে, গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করিয়া।

আজকাল সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। আদিম কালে যাহাই থাকুক না কেন, গার্হস্থ্য জীবনে গৃহিণীর আসনে নারী আজ বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ, হিন্দু-সমাজের আদর্শ ও খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাব সাঁওতাল-সমাজে নারীর অধিকার সম্বন্ধে পূর্ব্বতন আদর্শের রূপান্তর ঘটাইতেছে।

সমস্যাটি ভাল করিয়া বিচার করিতে গেলে মনে রাখা দরকার যে, সাঁওতালরা মনে করে নারীর সৃষ্টিই হইয়াছে বিবাহের জন্য। জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তাহাকে পাইতে হইলে, মূল্য দিয়া কিনিতে হয় এক টুকরা সম্পত্তির মত। আমাদের যেমন সপ্তপদী গমন, ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদের যেমন বর-কনের এক থালাতে আহার, সাঁওতালদের কন্যা-পণ (পণং) তেমনি বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গ। ইহার অভাবে বিবাহই অসিদ্ধ, কাজেই সামাজিক আইনের চোখে সাঁওতাল স্বামী তার 'কড়ি দিয়া কেনা' স্ত্রীর স্বামী, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ষোল আনা প্রভু।

আদালতে সাঁওতালদের বিবাহচ্ছেদের মামলায় অনেক চিত্তাকর্ষক ঘটনা দেখা যায়; কনে'-পণ স্থির করা ও ফেরত দেওয়াই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কাজ। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী দোষী প্রমাণিত হইলে, ক্ষুব্ধ স্বামী কন্যা-পণের টাকা ফেরত পায়। স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বিবাদী উপপতিকে দ্বিগুণ কনে'-পণ (পণং) দাখিল করিতে হয়, খেসারত পায় সেই নারীর স্বামী। তবে যদি স্বামীই দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহার দেওয়া 'পণং' বাজেয়াপ্ত হয়।

সাঁওতাল নারী নাবালিকা অবস্থায় সম্পত্তি হিসাবে থাকে পিতামাতার আশ্রয়ে. এই ভাবেই মূল্য দিয়া যৌবনে তাকে ক্রয় করে তার স্বামী এবং যদি সেই স্বামীর মৃত্যু হয়, তার উপর অধিকার বর্ত্তায় তাহার পূর্ব্বতন মালিক পিতামাতার। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহারাও জীবিত না থাকেন, আত্মীয়-স্বজনরাও যদি এই অসহায় বিধবাকে না দেখে তাহা হইলে নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত আশ্রয় হইতে আশ্রয়ান্তরে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। সমাজ-ব্যবস্থায় তাহার স্থান সুদৃঢ় ভাবে স্বীকৃত না হওয়ায়—সাধারণের কৃপাই হইয়া উঠে তাহার একমাত্র সম্বল। অতএব নারী যদি প্রাচীন আমলের ক্রীত-দাসীর মত সম্পত্তিবিশেষ বলিয়াই সমাজে গণ্য হয়, তো সেক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারের প্রশ্নটাই যে অবান্তর।

আধুনিক কালের দৃষ্টিতে সাঁওতাল নারীর এ অবস্থা অত্যন্ত করুণ ঠেকিলেও তাহার উন্নতির আভাস যে বর্ত্তমান পরিবর্ত্তিত সমাজ-ব্যবস্থায় দেখা যায় সে ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। মনে হয় আস্তে আস্তে যেন সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে সাঁওতাল-সমাজের মনোভাব বদলাইতেছে। অন্ততঃ স্থাবর সম্পত্তির সাম্প্রতিক উত্তরাধিকার-প্রথায় ইহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। আজকাল তাহারা আইনতঃ টাকাকড়ি, গবাদি পশু ও তৈজসপত্রের মালিক হইতে পারে। এই সকল বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার দাবি সমাজে স্বীকৃত। সে যে কেবল এই সম্পত্তির অছি বা জিম্মাদার (trustee) তাহা নহে, সম্পূর্ণভাবে মালিকও বটে। ইদানীং প্রায়ই দেখা যায় যে, সম্পত্তি বন্টনের সময় কোনও কোনও স্নেহময় পিতা কন্যাকে একেবারে ভুলিয়া যান না, আর কিছু না হইলেও অন্ততঃ কয়েকটি গৃহপালিত পশু ও কিছু টাকাকড়ি দেন। গহনাপত্রও নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে উহা যাহাকে ইচ্ছা দান বা বিক্রয় করিতে পারে। তবে যদি মেয়েরা পরিবারের টাকাকড়ি রক্ষার ভার নেয়, তবে আইন-মতে তাহার অবস্থা (status) ক্যাশিয়ারের মত; এই সঞ্চিত অর্থের উপর তাহার কোন দাবি খাটে না। কেহ স্ত্রীকে বিনা

ঘোষে তালাক দিলে, সামাজিক বিচারে সেই স্ত্রীলোক কিছু ধান, তৈজসপত্র ও গরুবাছুর পাওয়ার ভাগীদার। আইনের চোখে এসব তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। পৌষ-পার্ব্বণের (বাঁদনা বা সোহরাই) সময় সাঁওতাল মেয়েরা সামাজিক প্রথামত যে ধান তোলে, স্বকীয় সম্পত্তি হিসাবে তাহারা তাহা আলাদা করিয়া রাখিয়া দেয়। উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপরও তাহাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত। আজকাল এমনও দেখা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর যদি কোন বিধবা পিতৃগৃহে চলিয়া যায়, তবে তাহাকে কিছু স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যা দাঁড়ায়, যদি কোন স্ত্রীলোক বাহিরে খাটিয়া বা মজুরনীর কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। এইরূপে অর্জ্জিত অর্থ কি তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, না পরিবারের প্রাপ্য? এই সমস্যার সমাধান-কালে পঞ্চায়েত নিম্নোক্ত দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখেন :— (ক) নারী যে টাকা রোজগার করিল তাহাতে কি শুধু তাহার ব্যক্তিগত ভরণপোষণ কুলায়, না, কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত হয়? (খ) সে যে কাজ করে তাহা কি এত সাধারণ যে, বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের কাজের তুলনায় তাহাতে বেশী খাটিতে হয় না? প্রথম ক্ষেত্রে, নারীকে তাহার খোরপোষের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য মেয়েদের মতই খাটুনি হইলে সেই টাকা যায় পারিবারিক তহবিলে।

এ পর্য্যন্ত আমরা অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু জমিজমার মালিকানা ও উত্তরাধিকার বিষয়েও সাঁওতালদের সামাজিক প্রথা নারীদের পক্ষে বড়ই কঠোর মনে হয়। অস্থাবর সম্পত্তিতে দায়াধিকার ত দূরের কথা, সাঁওতাল নারী তাহা ভোগদখল করিবারও অধিকারিণী নয়। ইহার কারণ বেশ সহজ, সরল। সাধারণ সাঁওতাল প্রজার ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু নারীরা সে সব অধিকার হইতে বঞ্চিত। তবে আইনের শৃঙ্খলের বাহিরেও মানুষের হৃদয় বলিয়া একটা বস্তু আছে। সেইজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় স্নেহপ্রবণ পিতা কোন কোন কন্যাকে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার দিতে চাহেন। আবার কাহারও কাহারও পুত্রই নাই, আছে মাত্র কন্যা। এ ক্ষেত্রে গৃহস্থ দেখে তাহার ভূসম্পত্তি চলিয়া যাইতেছে জ্ঞাতির ভোগে, তাহার প্রিয়তমা কন্যা সজল চোখে তাহা দেখিতেছে। সাঁওতাল সামাজিক আইন এক অভিনব উপায়ে এই মর্ম্মান্তিক অবস্থা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। পদ্ধতিটি এইরূপ :—পিতা এক ঘরজামাইয়ের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিল। জামাই হইল বাড়ীর ছেলের মত। তাহাকে কনে-পণ (গণং) দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হইল না। সে শ্বশুরবাড়ীতে প্রায় পাঁচ বছর জন খাটিয়া এই টাকা শোধ করিবে। তাহার পর সে যথা ইচ্ছা তথা চলিয়া যাইবে।

এই ঘরজামাইয়ের অধিকার একমাত্র তাহার স্ত্রীর উপর, শ্বশুরশাশুড়ীর মৃত্যুর পর তাহাদের সম্পত্তিতে তাহার নিজের কোন উত্তরাধিকারের দাবি নাই। বিবাহের ফলে তাহার নিজের কোন স্বত্ব হয় না। তবে যদি তাহার শ্বশুরের এমন ইচ্ছা থাকে যে ঘরজামাই ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হইবে, তাহা হইলে বিবাহের সময় সমবেত দশজনের সমক্ষে এ বিষয় তাহাকে (শ্বশুরকে) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে হয়। এই ভাবে, সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত ইচ্ছা সামাজিক আইনের দৃষ্টিতে মৌখিক 'উইলে'র সামিল।

বস্তুতঃপক্ষে ঘরজামাই রাখিলে উত্তরাধিকার অর্শে কন্যাতে। দশের চোখে জামাতা একজন সামাজিক জীবমাত্র। সে তাহার স্ত্রীর মালিক; কিন্তু ইহার বেশী কিছু অধিকার তার নাই। সে যদি আজ শ্বশুরালয় ছাড়ে, কাল সেখানে তার কোন দাবি-দাওয়া টিকিবে না। তথাকথিত কোন আত্মীয়ের সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব নাই। এইরূপ বিবাহের ফলে জাত সন্তানরাই একমাত্র ভবিষ্যতের ফলভোগী। তবে যদি ঘরজামাইয়ের জীবদ্দশায় তাহার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে, সেক্ষেত্রে সাঁওতাল-সমাজ সম্পত্তিতে তাহার জীবন-স্বত্ব স্বীকার করে—অবশ্য সে যদি পুনরায় বিবাহ না করে। এইরূপে এক আইনগত কল্পনার (legal fiction) আশ্রয় নিয়া সাঁওতাল সমাজের আভ্যন্তরীণ বিচার-বুদ্ধি কন্যার উত্তরাধিকার পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছে। আইনজ্ঞগণ জানেন স্মরণাতীত কাল হইতে আইনের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য কত না ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করিয়াছে। সাঁওতাল নারীর অবস্থার উন্নতিতে হিন্দু সমাজ ও খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রভাব ত আছেই, আদালতের বিচারকগণও সুবিধা পাইলেই তাহাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলেন। তাই আমরা দেখি, সাঁওতাল পরগণার অনেক সেট্‌লমেন্ট কোর্ট খাস জমিতে সাঁওতাল কন্যা-সন্তানের জীবন-স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং অনেক শিক্ষিত সাঁওতাল বিবাহিতা কন্যার উত্তরাধিকারের দাবি নীতি হিসাবে স্বীকার করেন।

কিন্তু আজও বিধবার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। স্বামীগৃহে সে অস্থাবর সম্পত্তি পাইতে পারে বটে, কিন্তু স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার কোন দাবি নাই। সন্তানেরা মায়া-মমতা বা কৃতজ্ঞতার বশে বিধবা মাকে আশ্রয় দিতে পারে; নিঃসন্তান স্ত্রীলোকের সম্বল পিত্রালয় অথবা শ্বশুরালয়ের আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়। সেখানেও ঠাঁই না মিলিলে এ বাড়ী ও বাড়ী, মুক্তভল ত আছেই। সাঁওতাল বিধবার এই মর্ম্মন্তুদ অবস্থার প্রতিকারের জন্য শিক্ষিত সমাজে চেষ্টা চলিতেছে; অনেক সভা-সমিতিও হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য, যে সমস্ত বিধবা পুনর্বিবাহ করে না, মৃত স্বামীর সম্পত্তি হইতে তাহাদের খোরপোষের দাবি স্বীকার করা। কিন্তু এই সব আদিম সমাজের রীতিনীতি বড়ই অচল, অনড়।

সাঁওতাল-সমাজে সংস্কারের চেষ্টা অতি আধুনিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই কল্যাণ-প্রচেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত কি ফল হইয়াছে তাহা দেখা যায় ১৯৩৮ সালের "সাঁওতাল পরগণা এন্‌কোয়ারি কমিটি রিপোর্টে"র ৪৯ পৃষ্ঠায়। "দান অথবা উইলে হস্তান্তর" সম্বন্ধে আলোচনা কালে কমিটির সভ্যগণ বলিয়াছেন, "অনেক বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে এমনি একটা মত শিকড় গাড়িয়া বসিতেছে যে, সাঁওতাল নারীর অবস্থার পরিবর্ত্তনসূচক আইন প্রণয়ন করা হউক। কিন্তু এ সম্বন্ধে সব সাঁওতাল একমত নয়। এ বিষয়ে কমিটি অনেকের সাক্ষ্য লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সাঁওতাল 'মাঝকো (টৌ ?) সভা'র সভাপতিও ছিলেন। কিন্তু এই প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠানও স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ছাড়া উইল করিয়া সাঁওতালদের অন্য কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী নহে। আবার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিতে আইনতঃ বোঝা যাইবে সেই জমি যাহা সেই প্রজা নিজে আবাদ করিয়াছে। কারণ সাঁওতাল পরগণায় জমি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে আইন আছে। কাজেই আইন পরিবর্ত্তনেও বিশেষ ফল হইবে না।" এই সব বিবেচনা করিয়া কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আইন করিয়া এ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা যুক্তিসঙ্গত নয়; সামাজিক প্রথা ধীরে ধীরে, স্বাভাবিক নিয়মে প্রগতি-মূলক আদর্শের দিকে যাইবে। পরিশেষে, কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, উত্তরাধিকার আইনঘটিত মামলাগুলি যেন যথাসম্ভব সাঁওতালদের কাছে সালিশের জন্ম দেওয়া হয়। এইরূপ কার্য্যক্রম নূতন নূতন সামাজিক শক্তির সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে।

শেষ অধ্যায়

শ্রীতারাপদ রাহা

শ্রীকোলের পাঁচু কুণ্ডু দেশে ফিরল—একেবারে পাক্কা দশ বছর পর। দেশে হয়ত সে ফিরতই না, কিন্তু দেশের ভাগ্য ভাল—রেঙ্গুনে বোমা পড়ল। তাই দেশের মাটি এবার পাঁচুর চরণধূলি পেল।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে—বিশ বছর বয়সে যখন সে প্রথম কলকাতায় যায় তখন তার পৈতৃক ভিটেয় দুখানি শণ ঘাসে ছাওয়া ঘর ছিল—সে ঘর ভেঙে চুরে পচে কবে মাটি হয়ে গেছে—তবে জায়গাটা এখনও একটু উঁচু আছে। সেখানে তার ভাগ্‌নে রসময় বেগুন চাষ করতে সুরু করে দিয়েছিল। মামার দু'চার বিঘে ধানের জমিও সে-ই ভোগ করত।

পাঁচু এসে প্রথমে ভাগ্‌নের বাড়িতেই উঠল—কিন্তু এ পোড়া যুদ্ধ কবে থামবে কে জানে? জীবনের বাকি ক'টা দিন হয়ত দেশেই কাটাতে হতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে পাঁচু ঠিক করলে—বাপের ভিটেতেই আবার চালা তোলা যাক।

প্রস্তাবটা যথাসময়ে ভাগ্‌নের কানে গেল। মামা দীর্ঘ কালের জন্ত অন্ন ধ্বংস করতে এসেছে বুঝে রসময়ের মনটা তেমন ভাল ছিল না—তার পর বেগুনের ক্ষেতটাও হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে সে রীতিমত খাপ্পা হয়ে উঠল। মনের আগুন মনে চেপে সে মামাকে অনেক বোঝালে, অনুরোধ জানালে, আবদার করলে, কিন্তু পাঁচু অটল। ভাগ্‌নের অতটুকু ঘরে—অতগুলো কাচ্চাবাচ্চার মাঝে শোয়া তার ধাতে সয় না। হাজার হোক এতদিন সে কলকাতায়—

করত অবশ্য সে এমন কিছু নয়—কিরি—তবু অনটন আর ঝামেলা সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না—কারণ সে বিয়ে করে নি।

সুতরাং পাঁচু নিজের ভিটেয় ঘর তুলবে এতে আর কেউ বাধা দিতে পারলে না। ভাগ্‌নে-বৌ বিরক্ত হয়ে স্বামীর কাছে বললে, তুমিও যেমন—বনের পাখী কি কখনও পোষ মানে—এতকাল কলকাতায় কি করে কাটিয়েছে জানি ত সব!

এ সব কথা অবশ্য পাঁচুর কানে আর গেল না—সে নির্বিকার চিত্তে শ'খানেক টাকা খরচ করে শণের ছোট্ট এক খানা শোবার ঘর ও একখানা রান্নাঘর তুলে নিলে। সেখানে দুবেলা দুটি নিজের জন্ম ফুটিয়ে নেওয়া—বাস্—তার পরই ছুটি। মাঝে মাঝে সে কাজও করতে হ'ত না তার—রসময়ের বড় মেয়ে রাধা এসে দুটি রেঁধে দিয়ে নিজেও খেয়ে যেত—পাঁচুর কেবল তাস, পাশা, গল্প আর পাড়া বেড়ানো।

পাঁচুর প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠেছে বিহারী। বন্ধুত্ব অবশ্য তাদের আগেও ছিল; ছেলেবেলায় খেলার সাথী—দীর্ঘ অদর্শনে সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে কথা দুজনাই জানে, তবু দেখা যখন হ'ল—

বিহারীরও করবার কিছু ছিল না। বউ কবে মরে গিয়েছে, একটি মাত্র মেয়ে। গ্রামেই বিয়ে হয়েছে তার। বিহারী নিজের জমিজমা মেয়েজামাইকে দিয়ে তাদের বাড়ীতেই থাকে, খাওয়া-দাওয়া করে। কাজেই পাঁচুর বাড়ীতে আড্ডা দিতে তার সময়ের অভাব নেই।

তাস, পাশা আর তামাক—এই তিনটিই প্রধান। খেলার সাথী না জুটলে মাঝে মাঝে তারা প্রাণ খুলে পরনিন্দা পর-চর্চা করে—নিজেদের জীবনের অতীতকে টেনে আনে।

জগতে এই তিনটি জিনিসের অভাব বড় কখনও হয় না—বিশেষ করে এখন। রেঙ্গুনে বোমা পড়ায় শুধু পাঁচু কুণ্ডু দেশে ফেরে নি—ফিরেছেন অনেক মহা মহা রথী, যাদের ছেলেপিলে জীবনে প্রথম এই তাদের পিতৃপুরুষের ভিটে দেখলে। একেবারে ছোট থেকে আরম্ভ করে বিশ-বাইশ বছরের ছেলেমেয়ে, প্রথমে এসে এদিকে ওদিকে খুব ছুটাছুটি করলে, নৌকো চাপলে, সাঁতার কাটলে, গাছে চড়ল—দক্ষিণের মাঠে হাওয়া খেতে গিয়ে মটরের শাক তুলে আনলে। বয়স্কা মেয়েরা সব হাটে গিয়ে টাটকা সব্জী ফলমূল সব কিনে আনলে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় জায়গাটা খুবই মনে লেগে গেছে তাদের, এতদিন এখানে আসে নি কেন তারই জন্যে যেন আপশোষ।

পাঁচু আর বিহারী এদের কাণ্ড দেখে আর হাসে, এত তুচ্ছ জিনিসগুলোকে কত বড় করেই না দেখছে এরা! পাঁচুর না হলেও বিহারীর মনে একটু রোমাঞ্চও লাগে। কলকাতা থেকে এসে গ্রামকে ভাল লাগা সে কি সোজা কথা? হবে না—তাদের গ্রাম কি কম! এ গ্রামের ফল মিঠে, জল মিঠে, মিঠে গরুর দুধ। এমন টাটকা মাছই বা কোথায় পাবেন?

তাস আর পাশা শেষ হলে অন্য খেলোয়াড় সব চলে গেলে এই সব গল্পই চলে তাদের। কোন কোন দিন শহর থেকে আগত তরুণতরুণীদের প্রসঙ্গ।

বিহারী বলে, আর দেখেছিস পাঁচু চক্কোত্তি বাড়িতে যে দুটো ধিঙ্গী মেয়ে এসেছে তাদের কাণ্ড! হাটে গিয়েছে একটা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলের সঙ্গে—

তাতে কি! কলকাতায় মেয়েরা ত আজকাল হরদম বাজার করতে যায়—চাকর সঙ্গে করে গিয়ে নিজের খুশি মত বাজার করে নিয়ে আসে।

না, না—তাই বলছি না কি আমি?

তবে?

বলছি—শোন না কেনে—

বল্।

বলছি—বাজার করতে যাবি যা—তা বাপু অমনি বেহায়াপনা কেন?

কেন কি করলে?

আরে ভাই—সব্জী বাজারে কিনছে সব্জী, আমি দেখলাম, তখন বেগুন কিনছিল ওরা—সঙ্গে কলকাতা থেকে আনা চাকরটা। সঙ্গের ঐ ধেড়ে ছেলেটা হেসে হেসে কি যেন ফিস্ ফিস্ করে বললে ঐ বড় মেয়েটার কানে কানে—অমনি মেয়েটা ফিক্ করে হেসে বসিয়ে দিলে ছেলেটার পিঠে আচ্ছা করে এক কিল। অতগুলো মানুষের সামনে। দেখে আমার মনটা এমন খারাপ হয়ে গেল—

পাঁচু শুনে বললে, হুঁ—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলে—তা তোর মন এতে খারাপ হতে গেল কেন?

বিহারী ক্ষণকাল কিছুই বললে না, তারপর কি ভেবে বললে, না তোর কাছে বলব তাতে আর কি—সরলার মা বেঁচে থাকতে— মানে যদি কোন দিন কোন রহস্যের কথা বলতাম তা'লে সেও অমনি করে,…কি হাসছিস তুই…তুই এর কি বুঝবি বল—বিয়ে ত করলি নে কোন দিন?

পাঁচু তবুও হাসছে: বিয়ে না করলেই বুঝি কিছু বোঝে না কেউ—না?

বিহারী এবার মাথা দুলিয়ে নিজেও হাসল: তাই ত আমি যে ভুলেই গেছলাম—তুই ত এতদিন কলকাতা কাটিয়ে এলি।…হাঁরে—এখনও কেউ তোর…

পাঁচুর একটা দাঁত পড়ে গেছে—তবুও বাকিগুলো বের করে—চোখ মিট মিট করে কেমন এক অদ্ভুত হাসি হেসে সে বললে—আর কি যৌবন আছে, দাদা। তারপরই বিহারীর দিকে চেয়ে চোখ টিপলে—বিহারী কি বুঝলে সে-ই জানে!

এমনি করে সুযোগ পেলেই দুই বন্ধু মনের কথা খুলে বলতে চেষ্টা করে। কলকাতা থেকে আগত তরুণতরুণীই তাদের আলোচনার রসদ জোগায় বেশী।

এদিকে কলকাতার ছেলেমেয়েদের পল্লীবাসের উৎসাহ ক্রমেই নিভে আসছে যেন। মাঘ মাসে অবশ্য তারা আড়ম্বর করে ঠাকুর গড়িয়ে সরস্বতী পূজা করলে—চৈত্রে নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি। কিন্তু সে তাদের কতক্ষণ? দু-দিন যেতে না যেতেই তাদের সুর পালটে গেল। একজন বললে—বাপ্‌স্। কি গ্রাম—আর পারছি না—দমটা পর্য্যন্ত যেন আটকে আসছে।

একটা চায়ের দোকান পর্য্যন্ত নেই।

সিনেমা যে কবে লাষ্ট দেখেছি, তা ভুলেই গেছি বলতে হয়।

সত্যি কি সুখে যে লোকে এখানে বাস করে বুঝি না। একটা ক্লাব পর্য্যন্ত নেই।

রাস্তায় আলো আছে?

বই-টই পড়ে যে দু'দণ্ড কাটাবো—তা কি কোন লাইব্রেরি আছে?

লাইব্রেরি ত দূরের কথা—গ্রামে ক'খানা খবরের কাগজ আসে বল ত?

সংক্রামক ব্যাধির মত আলোচনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহর থেকে আগত প্রত্যেক লোকের মুখে শোন, গ্রাম একেবারে বাসের অযোগ্য: আনন্দের লেশমাত্র নেই গ্রামে—এ গ্রামে থেকে লোকের সময় কাটে কি করে?

যথাসময়ে বিহারী ও পাঁচুর কানে ওঠে আলোচনা। শুনে পাঁচুর কি মনে হয় ঠিক বুঝা যায় না, বিহারী কিন্তু একেবারে মর্মাহত হয়ে পড়ে। সারা জীবন সে এ গ্রামে বাস করে এল—এ গ্রামকে সে ভালবাসে। গ্রামে আনন্দের এত রসদ থাকতে এরা কিছু খুঁজে পায় না!

চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ কেটে গেছে, আষাঢ়ও যায় যায়। নদীতে নূতন জল এসেছে, স্ফীত হয়ে উঠেছে কুমারের বুক। গ্রামের মাঠ ঘাট থেকে ধুলো-বালি কবে উধাও হয়েছে—পথ পিচ্ছিল, মাঝে মাঝে কর্দমাক্ত। তাই নিয়ে শহুরে লোকের নাক সিটকানির কথা শুনে বিহারী দুঃখ পাচ্ছে কয়েক দিন

থেকে। এই জল-কাদার মাঝেই ত কত আনন্দ করে কাটিয়েছে তারা ছেলেবেলা।

মঙ্গলবার, খামারপাড়ার হাটের দিন। পাড়ার লোক সব বেসাতি নিয়ে হাটে গিয়েছে, ফিরতে রাত হবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, আজ রাত্রে যে থামবে তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বিহারী পাঁচুর বাড়িতে এসে তামাক সেজে বাঁশের মাচার উপরে পাতা বিছানায় গিয়ে বসল: পাঁচু, আয় শোন্--

পাঁচু বারান্দার উনুনে একটা বাটিতে করে একটু জল গরম করছিল, চা খাবে। কলকাতা থেকে এই বদ অভ্যাসটি সে অর্জন করেছে। নিজের এক কাপ এবং বিহারীর জন্য আর এক কাপ চা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। নাও--একটু চাঙ্গা হয়ে নাও।

বিহারী হুঁকোটা রেখে চায়ের বাটি হাতে করে বললে—শুনলে গা জ্বালা করে রে ভাই--এদের সব নাক সিঁটকানি দেখে!

পাঁচু একটু হাসল। কলকাতার লোক সব—ওদের কথা আলাদা—

হোক, কিন্তু আমাদের গ্রামের নিন্দা কেন? ও বয়সে আমাদের দিনগুলো এখানে কি খারাপ কেটেছে শুনি?

পাঁচু বিহারীর কথার অনুমোদন করে বললে—হুঁ--

হুঁ—না—ভেবেই ত্যাখ না—চৈত্র মাসে জলে ঝাঁপাঝাপি—নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে আমের গুটি কুড়োবার জন্য কি রকম ছুটতাম সব।

পাঁচু শুনে মৃদু মৃদু হাসে।

তার পর বৈশাখ থেকে কেমন ঘুড়ি উড়োবার ধুম পড়ে যেত!

পাঁচু এবার মুখ খোলে, বলে—আর ঘুড়িই ছিল কত রকম। কোঁড়ে পতং চিলে—মানুষ—ঢোল—ছিল আরও কত কি। কলকাতার লোকে এ সব ঘুড়ির নামই জানে না—চোখে দেখা ত দূরের কথা। ঘুড়ি বললে বোঝে—ওরা কেবল পতং—

তবেই বোঝ্!

পাঁচু চা শেষ করে এবার আবার তামাক সেজে বসল। নানা কথা চলতে লাগল। তরুণ বয়সের স্মৃতি উথলে উঠেছে দু'জনের।

পাঁচু তামাক টানতে টানতে বলে শীতের মাঠে সে মটরের শাক তোলা মনে আছে—মাঘের শেষে পাকা মটরের পোড়া খাওয়া?

খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বিহারীর মুখ। মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে সে বলে—আছে না?—আর শীতের কথা কেন—এই যে বর্ষা এল—এতে কত আনন্দ করেছি না? বিলের জলে ভোঙা ভাসিয়ে শাপলা তোলা—কলমি তোলা!

দুই বন্ধুই একেবারে সেই অতীত দিনে ফিরে গেছে।

পাঁচু উৎসাহিত হয়ে বলে—শুধু বিল কেন—আমাদের এই গাঙ?—এই গাঙেই কি কম কাণ্ড করেছি আমরা; কম মাছ ধরেছি?

আর যন্ত্রই বা ছিল কত। দোয়াড়ি—পাগড়া—বিত্তি—এক নালা, ঘুং—

কেন, বড়শি—?

হাঁ, বড়শি--তা ছাড়া বাঁশের চোঙা পেতে পেতে--সেই এক হাত দেড় হাত বান মাছ ধরা—মনে নেই?

আছে—কিন্তু দোয়াড়িতেই মাছ পড়ত বেশী না? একবার মনে আছে, দোয়াড়িতে আমি এক ধামা ডিমওয়ালা চিংড়ী পেয়েছিলাম।

বিহারী ফোকলা দাঁত বের করে হেসে বললে--বাড়ীতে ত বসে বসে অন্নধ্বংস করছি, এবার আবার মাছ ধরার চেষ্টা করে দেখা যাক—কি বলিস?

পাঁচু হুঁকোটা বিহারীর হাতে এগিয়ে দিয়ে বললে--কিন্তু অত সব হাঙ্গামা কে করবে বল্? সেই বাঁশ কাটো—বেতি চাঁচো—পাগড়া কেনো—দোয়াড়ি বানাও--মরা হাতে কি ওসব পোষাবে ভাই—

আরে ও সব কেন--বড়শি বড়শিতে ত খাটুনি কম। হাট থেকে ডজন দুয়েক ধনেখালির বড়শি কেন, সুতো বাঁধ—কয়েকটা ছিপ বানাও--বাস্।

বিহারীর যুক্তিটা পাঁচুর মন্দ লাগল না। এই করা যাবে—হাঙ্গামা নেই—অথচ ধরলে ধরবে বড় বড় মাছ—রুই, কাতলা, বোয়াল, আড়—

পাঁচুর চোখের সামনে যেন বড়শিতে ধরা ডাঙায় তোলা বড় বড় বোয়াল, আড় সব আছাড় খাচ্ছে।

সে দিন অনেক রাত্রি ধরে দুই বন্ধুতে মাছ ধরার আরও অনেক গল্প হ'ল—অনেক সলা-পরামর্শ। বড়শি পাততে হলে কোথায় পাতা যায়?

পাঁচু বললে--কাছারির ঘাটে--ওখানে মাছ একটু ওঠেও বেশী—তা ছাড়া কাছেও হয়।

বিহারী বলে, পাগল হয়েছ—ওখানে বড়শি পেতে সারা রাত বাবলা গাছের নীচে ঘুপটি মেরে বসে থাকতে হবে।

কেন?

কেন—নেকা! ওখানে বড়শিতে মাছ ধরলে--সেই মাছ পাবে তুমি মনে করেছ? কত লোক আনাগোনা করে। জেলেরা, বাগদীরা নৌকো নিয়ে ঘোরাফেরা করে—চোখে পড়লেই—অমনি—

তবে?

বড়শি পাতব আমরা ভাঙাকুঠির ভাটি—জায়গাটা ভাল—মাছ ধরে খুব—তা ছাড়া—লোকের আনাগোনা কম!

ঠিক বলেছিস—মাছ ওখানে ধরবেই। আগে কত মাছ ধরেছি ওখানে। রাত জেগে বটগাছের নীচে বসে থাকতাম

—তার পর মাছের ছড়াৎ ছড়াৎ শুনে···আচ্ছা বড়শি পেতে রাত জেগে বসে থাকতে হবে ত আমাদের ?

অসহায়ের মত চোখ দুটি করে কেমন একটু হাসলে বিহারী। সে কি আর হবে—তবে যেতে হবে খুব সকাল সকাল। খুব ভোরে—রাত চারটের সময়—বুঝলি না।

মাথা দুলিয়ে পাঁচু জানালে—বুঝেছে সে। খুশিতে তার দুই চোখ ভরে উঠেছে। মাছগুলি যেন এখনই তাদের হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

পরের দিনই শ্রীকোলের হাটবার। পাঁচু ও বিহারী দু'জনাই হাটে এসে বেছে বেছে দু'ডজন ধনেখালির বড়শি কিনলে, আর সুতো কিনলে দু'কেট।

পরের দিন দুপুরের তাসখেলা কামাই করে—সুতো পাকিয়ে বড়শি বাঁধলে অন্তত বিশটা। তার পর বাঁশঝাড় থেকে ছিপ কাটা আছে—বাঁশ কাটা আছে। একটা লম্বা দড়ি বোনা আছে—কাজ কি কম!

বাঁশ কেটে ছিপ তৈরি আর সাজসরঞ্জাম করতে বিহারী আর পাঁচু হাঁপিয়ে উঠল। বিহারী মৃদু হেসে বলে—আগেকার মত আর পেরে উঠি না যেন রে!

পাঁচু বলে—বড় বড় মাছ ধরে যখন ছড়াৎ ছড়াৎ করবে তখন দেখিস—পারিস কি না।

দুই-তিন দিন খেটে আয়োজন এক রকম শেষ হ'ল। এবার চাই 'জিয়ালা'। তাজাতোজা ছোট মাছ বড়শিতে গেঁথে বড় মাছের জন্য টোপ ফেলা হয়—গ্রামের লোকে তাকে বলে 'জিয়ালা'।

সকালে বাগ্দীরা যখন বিত্তি তোলে তখন দুই বন্ধু একটা ঘটিতে করে তাজা জিয়ালা কিনে আনলে। পথে আনবার সময় তাজা পুঁটি, চ্যাং, আর খয়রা মাছের খলবলানি দেখে—আর দুই বন্ধু পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসে। আজ রাত্রে!

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তাস খেলা আর সে দিন তেমন জমল না—দুই বন্ধুর চোখে সেদিন বিরাটকায়, বোয়াল, চিতলের পুচ্ছ-আন্দোলন।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যার কাছাকাছি দুই বন্ধু বেশ করে তামাক খেয়ে—মনে মনে মা দুর্গাকে খানিকক্ষণ ডেকে সাজ সরঞ্জাম নিয়ে রওনা হ'ল ভাঙা কুঠির ঘাটে।

জায়গা বাছতে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল,—তারপর গামছা পরে নামল দু'জনা জলে। প্রায় বিশ হাত তফাৎ করে দুটো লগি পোতা হ'ল, তাতে বাঁধা হ'ল একটা দড়ি—অন্তত এক ডজন বঁড়শি জিয়ালা বেঁধে এই দড়িতে ঝোলাতে হবে, বাকি বড়শি ছিপে।

জিয়ালার মাছ কয়েকটা মরে গিয়েছিল, তা যাক, এখনও যা আছে তাতে তাদের বেশ কুলিয়ে যাবে। কুড়িটা মাছ কুড়িটা বঁড়শিতে গেঁথে যথাস্থানে ঝুলিয়ে, ছিপে লাগিয়ে যখন তারা কাজ শেষ করলে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

শুক্ল পক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ আকাশে অস্ত যাচ্ছিল, তারই আব্ছা আলোতে দুই বন্ধু দেখছিল গাঙের বুকে তাদের টোপের মাছের খলবলানি, দেখে চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে আসছিল। কত কত বছর আগে তারা এমনি করে বঁড়শি পেতে মৎস্য-শিকারের আশায় বসে থাকত। শহরে ছেলেরা এসে বলে কিনা গ্রামে আনন্দ নেই!

তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গেল। বিহারী বলে, চল পাঁচু বাড়ি চল—কাল আবার সকাল সকাল ওঠা আছে।

হাঁ, চল—

হঠাৎ একটা বড় মাছের আস্ফালনের শব্দ শোনা গেল, পাঁচু বলে—আচ্ছা দাঁড়া আর একটু দেখে যাই, ধরে যদি—

আরে ওরা ত সারা রাতই এমনি করতে থাকবে—ও দেখতে গেলে আর বাড়ী যাওয়া হয় না।

পাঁচু এক রকম মিনতির সুরেই বলে—একটুখানি দাঁড়া ভাই—এইটে দেখে যাই।

কেমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের মত যেন শোনাল বিহারীর উত্তরটা: আমি আবার রাত্রে আগেকার মত চোখে দেখতে পাই নে কি না।

পাঁচু নদীর দিকে চোখ রেখেই উত্তর দিলে—প্রভাতে আলো আনতে ভুলিস্ নে যেন!

পাগল!

নদীতে আর মাছের সাড়া নেই। দুই বন্ধু এবার বাড়ী রওনা হ'ল। বিহারী সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পাঁচুর পিছনে পিছনে চলেছে: একটু আস্তে আস্তে চলিস্, ভাই!

হাঁ—তুই আয়!

আজ আর তোর ওখানে আড্ডা দেব না, একেবারে বাড়ী গিয়ে খেয়েই শুয়ে পড়ব।

হাঁ, কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে।

একটু সজাগ থাকবি,—উঠতে দেরী হয়ে না যায়।

তুই আগে উঠলে আলো জেলে আমার ওখানে চলে আসবি—সময় থাকলে একটু চা খেয়ে যাওয়া যাবে।

তুই যদি আগে উঠিস তবে আমার ওখানে এসে বিহারী দা বলে ডাকিস—বুঝলি!

এমনি করে কথা বলতে বলতে তারা দিয়েড়পাড়া ছাড়িয়ে বাড়ীর কাছে এসে গেল। হারাণের মা'র গাবতলায় এসে উভয়ের ছাড়াছাড়ির পালা।

পাঁচু বলে—তবে ঐ কথা রইল—চারটে—কেমন?

হাঁ—চারটে, বড় জোর সাড়ে চারটে—তার চেয়ে দেরী হবে না।

আবার সাড়ে চার কেন—চারটেয় আসতেই চেষ্টা করিস, কেমন?

আচ্ছা—

আচ্ছা—

দুই মৎস্য-শিকারী রাতের মত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে।

ধ্রুবকে উত্তরে প্রহরী রেখে আকাশের তারারা মিটু মিটু করে সরে সরে যাচ্ছে—বর্ষার গাঙে মাঝে মাঝে বড় মাছের পুচ্ছ আন্দোলনের শব্দ শোনা যায়। ডাঙাকুঠীর ঘাটে ঢাং খোয়ালের চলাফেরা।

আকাশের তারা অপসৃত হচ্ছে।...শুকতারা উঠেছে আকাশে। ডাঙাকুঠীর ঘাটের উপরে দূর্ব্বাদল—শিশির-সিক্ত...পুব আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে—দূর্ব্বায় পদচিহ্ন পড়ে নি কারও।

...আরও ফরসা হ'ল। নিতাই আর ছিদাম জেলে খেপলা জাল নিয়ে ডাঙাকুঠীর ঘাট দিয়ে যেতে, বঁড়শিতে দুটো বড় মাছ দেখে তাড়াতাড়ি নৌকো কাছে ভিড়ালে।

ওরে, ও নিতাই—দা-টা দে ত শীগ্‌গির—সুতোটা কেটে দিই—

নিতাই দা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, মুন্সিদির ভাই—বঁড়শি পেতেছেন—বঁড়শি পাতলেই অমনি মাছ খাওয়া যায়।

...আরও ফরসা হয়ে গেল—সূর্য উঠে উঠে—ডাঙা কুঠির ঘাটের উপর শিশিরভিজা দূর্ব্বাদলে তখনও কারও পদচিহ্ন পড়ে নি।

অশ্বঘোষের বজ্রসূচী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সাকেতের এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বেদাদি শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া পরে তিনি বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার রচিত সৌন্দরনন্দ ও বুদ্ধচরিত অপূর্ব কাব্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বুদ্ধচরিতের একাধিক অনুবাদ হইয়াছে। কিছু দিন হইল শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অশ্বঘোষের দার্শনিক ও অন্যান্য নিবন্ধাদির মধ্যে "নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা" ও বজ্রসূচীর মূল (সংস্কৃত) পাওয়া গিয়াছে। নৈরাত্ম্যপরিপৃচ্ছা ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হয়। বজ্রসূচীও ছাপা হইতেছে। এই বজ্রসূচী সম্বন্ধে পূর্বে প্রবাসীতে (আশ্বিন, ১৩৫২) আলোচনা করিয়াছি। এখন ইহার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

বজ্রসূচী

ওঁ মঞ্জুনাথকে প্রণাম করি।

কায়মনোবাক্যে জগদ্‌গুরু মঞ্জুঘোষকে প্রণাম করিয়া আমি অশ্বঘোষ বজ্রসূচী গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছি।

বেদসমূহ প্রমাণ। স্মৃতিসমূহ প্রমাণ এবং ধর্ম্মার্থযুক্ত বচনসমূহও প্রমাণ। প্রমাণ যাহার নিকট প্রমাণ নহে, তাহার বাক্যকে কে প্রমাণ মনে করিবে?

আপনাদের মত হইতেছে এই যে সর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রধান। এখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে—কে এই ব্রাহ্মণ? আত্মা ব্রাহ্মণ না জাতি ব্রাহ্মণ? শরীর ব্রাহ্মণ না জ্ঞান ব্রাহ্মণ? আচার ব্রাহ্মণ না কর্ম্ম ব্রাহ্মণ—না বেদ ব্রাহ্মণ? কে এই ব্রাহ্মণ?

আত্মা বা জীব তো ব্রাহ্মণ নয়। যদি বলেন কেন? তাহার উত্তর১ এই যে এ বিষয়ে বৈদিক প্রমাণ রহিয়াছে। বেদে কথিত আছে—ওঁ সূর্য পশু ছিলেন। সোম পশু ছিলেন। ইন্দ্র পশু ছিলেন। পশুগণ দেব হইলেন। আদিতে এবং অন্তে তাঁহারাই দেবতা এবং তাঁহারাই পশু। শ্বপাকও ব্রাহ্মণ হন।২

অতএব বেদের প্রামাণ্য হেতু আমরা মনে করি আত্মা ব্রাহ্মণ নয়। (মহা)-ভারতের প্রমাণ হইতেও ইহা জানা যায়। ভারতে উক্ত হইয়াছে:—

দশার্ণের সপ্ত ব্যাধ, কালঞ্জর গিরির মৃগগণ, শর (বা সরিৎ) দ্বীপের চক্রবাকগণ, মানস সরোবরের হংসগণ, কুরুক্ষেত্রে বেদ পারগ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে।৩

অতএব ভারতের প্রামাণ্য হেতু ব্যাধমৃগহংসচক্রবাকে ব্রাহ্মণ্য দর্শন হওয়ায় আমরা মনে করি জীব ব্রাহ্মণ নয়। মানবধর্ম্মের প্রামাণ্য হেতুও ইহা সিদ্ধ হয়। মানবধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে:—

সাঙ্গোপাঙ্গ চারি বেদ অর্থসহ অধ্যয়ন করিয়াও শূদ্র হইতে প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ গর্দ্দভরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

১। বাজসনেয়সংহিতা, ২৩।১৭; শতপথ ১৩।২।৭।১৩-১৫; তৈত্তিরীয়, ৫।৭।২৬ কাঠ, অশ্ব, ৫।৪।

২। তুলনীয়:—যে-জীব শূদ্রযোনিতে, চণ্ডালযোনিতে এবং তির্যক-যোনিতেও জন্ম গ্রহণ করে, কৃষ্ণ কৃমি প্রভৃতির রূপও গ্রহণ করে, সেই জীব ব্রাহ্মণ হয় কিরূপে? ভবিষ্য পুরাণ, ব্রাহ্ম, ৪০।২৩-২৯।

অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে অনেক প্রকারের দেহ গ্রহণ করা সত্ত্বেও আত্মা সবসময় একরূপই থাকে। তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। একই আত্মা কর্মবশে নানা দেহ (শূদ্র চণ্ডাল ও পশুদেহও) গ্রহণ করে। অতএব আত্মা ব্রাহ্মণ নহে।—বজ্রসূচী-উপনিষদ।

৩। হরিবংশ, ২৪।২০-২১; ভবিষ্য, ৪০।২৩-২৯।

দ্বাদশ জন্ম গর্দভ, ষষ্টি জন্ম শূকর এবং সপ্তিতি জন্ম তিনি কুক্কুর হইয়া থাকেন। মনু এইরূপ বলিয়াছেন।৪

অতএব মানবধর্মের প্রামাণ্য হেতু জীব ব্রাহ্মণ নয়।

জাতিও ব্রাহ্মণ নয়। স্মৃতির প্রামাণ্য হেতুও তাহা সিদ্ধ হয়। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে :—

হস্তিনী হইতে অচল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উলূকী হইতে কেশপিঙ্গল (কণাদ), অগস্তি পুষ্প হইতে অগস্ত্য, কুশ হইতে কৌশিক, কপিলা হইতে কপিল, শরগুল্ম হইতে গৌতম (কৃপাচার্য) এবং দ্রোণাচার্য কলস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিত্তিরি তিত্তিরীর (পক্ষীর) সন্তান। রেণুকা (ক্ষত্রিয়া) রামকে জন্ম দিয়াছিলেন। হরিণী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে, কৈবর্তিনী ব্যাসকে, শূদ্রিকা কুশিককে, চণ্ডালী বিশ্বামিত্রকে (পরাশরকে ?) এবং উর্বশী বশিষ্ঠকে জন্ম দিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাতা ব্রাহ্মণী নহেন, কিন্তু লোকাচারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ।৫

অতএব স্মৃতি-প্রমাণ হইতে আমরা মনে করি জাতি ব্রাহ্মণ নয়। যদি আপনারা মনে করেন মাতা ব্রাহ্মণী না হইলেও পিতা ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত দাসীপুত্রগণও ব্রাহ্মণ হয়। কিন্তু ইহা আপনাদের (ব্রাহ্মণদের) অভীষ্ট নয়।

আর কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপুত্রই যদি ব্রাহ্মণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাভাব ঘটে। আজকালকার ব্রাহ্মণগণের পিতৃবিষয়ে সন্দেহ আছে। কেন না, পৌরব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণীগণের শূদ্র সহবাস দেখা গিয়াছে।৬ অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নয়।

মানবধর্মের প্রামাণ্যবশতও তাহা সিদ্ধ হইতেছে। মানবধর্মে কথিত আছে :—মাংস ভক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সত্ত-সত্তই পতন হয়। লাক্ষা ও লবণ বিক্রয়ের দ্বারাও পতন হয়। দুগ্ধবিক্রয়ী ব্রাহ্মণ তিন দিনের মধ্যে শূদ্র হয়।৭

আকাশচারী (শক্তিসম্পন্ন) ব্রাহ্মণগণও মাংসভক্ষণবশত পতিত হয়। বিপ্রগণের পতন দেখিয়া মাংস বর্জন করা উচিত।

অতএব মানবধর্মের প্রামাণ্যহেতু জাতি ব্রাহ্মণ নয় কারণ যদি জাতি ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে পতনে শূদ্রত্ব সম্ভব নয়। অশ্ব দোষযুক্ত হইলে কি শূকর হইয়া যায় ? অতএব জাতি ব্রাহ্মণ নয়।

শরীরও ব্রাহ্মণ নয়।৮ কেন ? যদি শরীর ব্রাহ্মণ হয় তাহা হইলে অগ্নি ব্রহ্মঘ্ন হন। এবং ব্রাহ্মণ-শরীর দাহকারী আত্মীয়গণেরও ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। ব্রাহ্মণ শরীরজাত ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রগণও ব্রাহ্মণ হয়। কিন্তু ইহা দেখা যায় না। আবার ব্রাহ্মণ-শরীর নষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে উৎপন্ন যজনযাজন অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান প্রতিগ্রহাদির (পুণ্য) ফলও (তৎক্ষণাৎ) নষ্ট হইয়া যায়। তাহা তো আপনাদের অভিপ্রেত নয়। অতএব শরীরও ব্রাহ্মণ নয়।

জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নয়। কেন ? জ্ঞান বাহুল্যহেতু। যাহারা জ্ঞানবান্ শূদ্র তাহারাও তাহা হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া যান। শূদ্রও কখনো কখনো বেদ-ব্যাকরণ-মীমাংসা-সাংখ্যবৈশেষিক-লগ্ন আজীবকাদি সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ হইয়াও তো দেখা যায়। কিন্তু তাঁহারা তো ব্রাহ্মণ (বলিয়া গণ্য) হন না। অতএব আমাদের মত এই যে জ্ঞানও ব্রাহ্মণ নয়।

আচারও ব্রাহ্মণ নয়। কেন ? যদি আচার ব্রাহ্মণ হয় তবে যাঁহারা আচারবান্ শূদ্র তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়া যান। নটভট কৈবর্তভণ্ড প্রভৃতি প্রচণ্ডতর নানারূপ আচারবান্ বহু শূদ্র দেখা যায়—কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ হন না। অতএব আচারও ব্রাহ্মণ নয়।

কর্মও ব্রাহ্মণ নয়। কেন না, দেখা যায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যজনযাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপন-দান প্রতিগ্রহসম্পর্কীয় বিবিধ কর্ম করিলেও তাঁহারা আপনাদের মতে ব্রাহ্মণ হন না। অতএব কর্ম ব্রাহ্মণ নয়।

বেদের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয় না। কেন ? রাবণ নামে এক রাক্ষস ছিলেন তিনি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এই চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রাক্ষসগণের গৃহে গৃহে বেদ ব্যবহার বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ নন। অতএব আমরা মনে করি বেদের দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয় না।৯

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য কি ভাবে হয় ?

শাস্ত্রের দ্বারা, সংস্কারের দ্বারা, জাতির দ্বারা, বংশের দ্বারা বেদের দ্বারা এবং কর্মের দ্বারাও ব্রাহ্মণ্য হয় না।১০ সর্বপাপ-

৪। মহাভারত, অনু ১১১।৪৫-৪৬। মনুতে ইহা নাই, তবে ১০।১০৯-১০ শ্লোকে এইরূপ ভাব আছে।

৫। এইরূপ কোন স্মৃতি দেখি নাই। মহাভারতে ও পুরাণে ইহা পাওয়া যায়। মহাভারত, শল্যপর্ব, ৩৯।৩৭, ৪০।১১ ; অনুশাসন ৫।৪৮। বন, ১১৬।১, শান্তি, ২৯৬।১৪-১৬। মহাভারত (ভাণ্ডার সং) অনু, ২১ অধ্যায়।

হরিবংশ, ২৭।১৭, ৪২ ; ৩২।১৫-২০, ৭২-৭৪। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৭।৩-৬, ১৬।১৯।১০, ১৬, ১৭। বায়ুপুরাণ, উত্তরাংশ, ২৯।৮৬-৮৭, ১১১। ভাগবত, ৯।২২।৩৬ শিবপুরাণ, ধর্মসংহিতা, ১২।৭৬। ভবিষ্য পুরাণ, ৪২।২২-২৪।

৬। মহাভারত মাতঙ্গোপাখ্যান দ্রষ্টব্য। অনুশাসন ২৭ অধ্যায়। স্মৃতির মতে "ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল।" ইহা হইতেও ব্রাহ্মণীগণের শূদ্রসহবাস প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ গোপন সহবাসে উৎপন্ন সন্তানসমূহের অনেকেই সমাজপতিগণের অজ্ঞাত রহিত। এইরূপ শূদ্রজাত অজ্ঞাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই সমাজে চলিয়া যাইত।

৭। মনু, ১০।৯২। যাজ্ঞবল্ক্য, ৩।৪০। বশিষ্ঠ, ২। অত্রি, ২১ শ্লোক।

৮। ভবিষ্য, ব্রাহ্ম, ৪১।৫৩-৫৬। দ্রষ্টব্য।

৯। ঐ ৪১।১-৬।

১০। মহাভারত, অনুশাসন—১৪৩।৫০।

জাতির দ্বারা বা বংশের দ্বারা যে ব্রাহ্মণাদি হয় না তাহার উদাহরণ : হরিবংশ ২৯।৮ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ, ৮।১ বায়ু, উত্তরাংশ, ৩০।৪। হরিবংশ ২৯,

কর্মের নিরাকরণই হইতেছে ব্রাহ্মণ্য। এই ব্রাহ্মণ্য কুন্দ ও ইন্দুর ন্যায় শুভ্র।

কথিত আছে—ব্রত তপঃ নিয়ম উপবাস দান দম শম সংযম আচরণ হইতেও ব্রাহ্মণ্য হয়। বেদেও তাহা উক্ত হইয়াছে:—

যিনি নির্মম নিরহংকার নিঃসঙ্গ নিষ্পরিগ্রহ রাগদ্বেষ-বিনির্মুক্ত তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

সকল শাস্ত্রেই ইহা কথিত আছে:—

সত্য ব্রহ্ম, তপঃ ব্রহ্ম,[11] ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। সর্বজীবে দয়া ব্রহ্ম. ইহাই ব্রাহ্মণলক্ষণ। সত্য নাই, তপঃ নাই, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নাই, সর্বজীবে দয়া নাই—ইহা চণ্ডালের লক্ষণ।[12]

দেবযোনিতে নরযোনিতে এমন কি তির্যগযোনিতে জন্ম লইয়াও যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত হন না, তাঁহারাই বিপ্র, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

শুক্রও বলিয়াছেন:—

জাতি দেখা যায় না—গুণই কল্যাণকর। চণ্ডালও যদি গুণবান হন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ জ্ঞান করেন।[13]

অতএব জাতি, জীব, শরীর, জ্ঞান, আচার, কর্ম, বা বেদ ব্রাহ্মণ নয়।

আপনি আর এক কথা বলিয়াছেন:—শূদ্রের প্রব্রজ্যার বিধান নাই। ব্রাহ্মণশুশ্রূষাই তাহার ধর্ম। চারিবর্ণের সকলের শেষে শূদ্র শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা নীচ।

তাহা হইলে তো ইন্দ্রও নীচ। কেন না সূত্রে আছে—শ্বযুব মঘোনামতদ্ধিতে।[14] শ্বা অর্থাৎ কুকুর। যুবা—যুবাপুরুষ। মঘবা অর্থাৎ ইন্দ্র। তাহা হইলে এই সূত্রের উক্তি হইতে দেখা যায় কুকুর ও পুরুষ (মানুষ) এর অপেক্ষা ইন্দ্রই নীচ। (যেহেতু ইন্দ্র শব্দ সকলের শেষে উচ্চারিত হইয়াছে)। কিন্তু ইহা তো সংসারে দেখা যায় না। বচনমাত্রে অর্থাৎ আগে পিছে বলাতেই কি দোষ হয়? "উমামহেশ্বর" 'দন্তৌষ্ঠ'—এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা হইতে দন্ত বা উমা (আগে আছে বলিয়া) আগে উৎপন্ন হইয়াছে (বা দন্তের চেয়ে ওষ্ঠ বা উমার চেয়ে মহেশ্বর নিকৃষ্ট) এইরূপ বলা যায় না। ব্রহ্ম ক্ষত্র বিট্‌শূদ্রাঃ—এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কেবলমাত্র সমাস করা হইয়াছে। অতএব আপনাদের যাহা 'প্রতিজ্ঞা'—"ব্রাহ্মণশুশ্রূষাই তাহাদের (শূদ্রদের) ধর্ম," ইহা ঠিক নয়।

এই ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ অনিশ্চিত। মানবধর্মে আছে:—

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রীকে চুম্বন করে, শূদ্রীর নিঃশ্বাস যাহার দেহে লাগে (শূদ্রীর সহিত যে এক শয্যায় শয়ন করে), শূদ্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহার শুদ্ধি হয় না।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রীহস্তে এক মাস একাদিক্রমে ভোজন করে সে জীবিতাবস্থায় শূদ্র হয় এবং মৃত্যুর পর কুকুর হয়।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রীপরিবৃত, শূদ্রী যাহার গৃহিণী, সে পিত্র্য ও দৈব্য কার্য-বর্জিত; সে রৌরব নরকে গমন করে।[15]

অতএব এই প্রামাণ্য বচনের দ্বারা, ব্রাহ্মণত্বের অস্থিরত্বই প্রমাণিত হইতেছে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। কেননা, মানবধর্মে অভিহিত[16] হইয়াছে:—

অরণীগর্ভসম্ভূত মহামুনি কঠ তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

কৈবর্তীগর্ভসম্ভূত মহামুনি ব্যাস তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

উর্বশীগর্ভসম্ভূত মহামুনি বশিষ্ঠ তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

হরিণীগর্ভসম্ভূত মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন,[17] অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

চণ্ডালীগর্ভসম্ভূত মহামুনি বিশ্বামিত্র (পরাশর?) তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

তাণ্ডুলীগর্ভসম্ভূত মহামুনি নারদ তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন,[18] অতএব জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

পঙ্কযোনিতে যিনি জিতেন্দ্রিয় সেই জিতাত্মা ব্যক্তি যতি বলিয়া গণ্য হন। মানব তপস্যার দ্বারা তাপস ও ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ হন। ঐ পূর্বোক্ত মহাত্মাগণ ব্রাহ্মণীর সন্তান নহেন—কিন্তু তাঁহারা ইহলোকে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম (বা ব্রাহ্মণ) হইতেছেন শীলশৌচপূর্ণ। সুতরাং কুল বা জাতি ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে।

শীলেরই প্রাধান্য। কুলের নহে। শীলবিবর্জিত কুলে হইবে কি। বহু ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও শীললাভ করতঃ জ্ঞানী হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।

আর এই কঠ-ব্যাস-বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গ-বিশ্বামিত্রাদি ব্রহ্মর্ষিগণই বা কে? নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহারা লোকের নিকট ব্রাহ্মণ হইলেন। অতএব ঐ পূর্বোক্ত শাস্ত্রবচনের প্রামাণ্য-

---

৩২।৪০-৪১। বিষ্ণু—৪র্থ ৮।৯। বিষ্ণু, ৪র্থ, ১।৫-১৫। হরিবংশ, ১১।৯-১০। বিষ্ণু, ৪র্থ, ১৯। ভাগবত—৯।২১।১৯। বিষ্ণু, ৪র্থ, ১৯।১৬। ভাগবত, ৯।২১।৩৩। বিষ্ণু, ৪র্থ, ১৯।২-১০।

১১। মহা, শান্তি, ১৯০।৯

১২। অত্রি, ৩৭৪ শ্লোক।

১৩। "যতিধর্মসংগ্রহ" পুস্তকে ইহা ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। যতিধর্ম, পৃ ৩৭। শুক্রনীতিতে এইরূপ আছে: জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, ক্ষত্রিয় হয় না, বৈশ্য হয় না, শূদ্র হয় না। এমন কি ম্লেচ্ছ পর্যন্ত জাতির দ্বারা হয় না। গুণকর্মের দ্বারাই ইহা নির্ণয় হয়। গুণ ও কর্মগত এই ভেদ। শান্ত দান্ত ও দয়ালু ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। গুণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ করা হইয়াছে। শুক্রনীতি, ১।৭৫-৮০ (পংক্তি)

১৪। পাণিনি সূত্র—৬।৪।১৩৩

১৫। অঙ্গিরা, ১।৪৮; আপস্তম্ব, ৮।৭; ব্যাস, ৪।৬৭-৬৮; মনু, ৩।১৭, ১৮, ১৯; মহা, অনু, ৪৭।৯।

১৬। মহা, অনু, ১১৯।১২। মনুসংহিতায় ইহা পাওয়া যায় না।

১৭। ভবিষ্য, ব্রাহ্ম, ৪২।২২-২৪।

১৮। নারদ—দাসীপুত্র, ভাগবত ১।৬।৬-৭।

হেতু এই ব্রাহ্মণত্ব বিষয় অনিশ্চিত, অস্থির, (অর্থাৎ ইহার অনবরত পরিবর্তন হয়; আজ যে ব্রাহ্মণ, কাল সে শূদ্র। সেইরূপ আজ যে শূদ্র, কাল সে ব্রাহ্মণ)।

আপনাদের অন্য আর এক মত আছে যে—(ব্রহ্মার) মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্রাহ্মণ তো বহু (বা বহুপ্রকারের) রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কাহারা মুখ হইতে জন্মিলেন, তাহা তো জানা যাইতেছে না। কৈবর্তরজক ও চণ্ডালকুলেও তো দেখিতেছি ব্রাহ্মণ জন্মিতেছেন। তাঁহাদেরও তো দেখিতেছি চূড়াকরণ এবং মুঞ্জ-দণ্ডকাষ্ঠাদির দ্বারা (উপনয়নাদি) সংস্কার হইতেছে এবং ব্রাহ্মণসংজ্ঞা হইতেছে। এইরূপে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়াদিও (নানা জাতি হইতে) হইতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, চতুর্বর্ণ নাই—বর্ণ এক।

আর একই ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মা) হইতে উৎপন্ন সন্তানদের চতুর্বর্ণ বা চারি জাতি হয় কিরূপে?১৯

দেবদত্ত নামে কোনো পুরুষের এক স্ত্রী হইতে চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে তো 'জাতিভেদ' হয় না। তাহাদের মধ্যে তো কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র হয় না। কেননা তাহাদের একই পিতা। তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদিরই বা চারি জাতি হয় কিরূপে? (তাহাদেরও তো একই পিতা—ব্রহ্মা)।

আরো দেখুন, গোঅশ্বহস্তিসিংহব্যাঘ্রমৃগাদির পদচিহ্নে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইহা গোপদচিহ্ন, ইহা অশ্বপদচিহ্ন, ইহা হস্তিপদচিহ্ন, ইহা সিংহপদচিহ্ন, ইহা ব্যাঘ্রপদচিহ্ন, ইহা মৃগ-পদচিহ্ন—সমস্ত বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি জাতির পদচিহ্নে এইরূপ বৈশিষ্ট্য নাই। ইহা ব্রাহ্মণপদচিহ্ন, ইহা ক্ষত্রিয়পদচিহ্ন, ইহা বৈশ্যপদচিহ্ন, ইহা শূদ্রপদচিহ্ন এইরূপ জানা যায় না। অতএব পদচিহ্নের ঐরূপ বৈশিষ্ট্যের অভাববশতও আমরা দেখিতেছি বর্ণ এক—চারি নহে।

গো মহিষ অশ্ব কুঞ্জর গর্দভ বনের ছাগ-মেষাদির ভগলিঙ্গ-বর্ণ-মলমূত্র-গন্ধ-ধ্বনিতে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির সেইরূপ বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। এইরূপ বৈশিষ্ট্য না থাকায় বর্ণ একই।

হংস পারাবত শুক কোকিল ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের যেমন রূপ বর্ণ লোম চঞ্চুতে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, ব্রাহ্মণাদির সেইরূপ কোনো বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। এইরূপ বৈশিষ্ট্যের অভাববশতও বর্ণ এক।

দেখুন বট বকুল পলাশ অশোক তমাল নাগকেশর শিরীষ চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষের দণ্ডে, পত্রে, পুষ্পে, ফলে এবং ত্বগস্থি বীজ রসগন্ধেও বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অথবা শুক্রশোণিত অস্থি চর্ম মাংস মল বা বর্ণে অথবা প্রসব বিষয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না।২০ এই সব বিষয়ে বৈশিষ্ট্যের অভাববশতঃ বর্ণ বা জাতি এক।

হে ব্রাহ্মণ, সুখ-দুঃখ-জন্ম-মরণ, জীবন-বুদ্ধি-ব্যাপার-ব্যবহার ভয়-মৈথুনাদির সমতা বশত ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কোনো বৈশিষ্ট্য নাই।২১

আর এক কথা জানিয়া রাখুন। এক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন ফলসমূহের বর্ণভেদ বা জাতিভেদ হয় না। উডুম্বর ও পনস বৃক্ষের উদাহরণ দেখুন। উডুম্বর ও পনসের কোনো ফল শাখাতে হয়, কোনো ফল দণ্ডে হয়, কোনো ফল স্কন্ধে হয়, কোনো ফল মূলে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ব্রাহ্মণ ফল, ইহা ক্ষত্রিয় ফল, ইহা বৈশ্য ফল, ইহা শূদ্র ফল, এইরূপ কেহ বলে না। কেননা, তাহারা একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপ এক পুরুষ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় (তাহা চরণ হইতে হউক অথবা মস্তক হইতেই হউক) মনুষ্যগণেরও জাতিভেদ সম্ভব নহে।২২

এইরূপ মতবাদে আরও দোষ আছে। প্রশ্ন করি, ব্রাহ্মণ যদি মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণীর জন্ম কোথা হইতে হইল? নিশ্চয় মুখ হইতেই। তাহা হইলে তো আপনাদের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্ক হইল। দেখা যাইতেছে, আপনাদের মধ্যে আর গম্যা অগম্যার প্রশ্ন নাই। ইহা তো অত্যন্ত লোকবিরুদ্ধ ব্যাপার।

পুনরায় বলি, ব্রাহ্মণ্য অনিশ্চিত। ক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা কৃত হয়।

যুধিষ্ঠির নামে পাণ্ডুর প্রসিদ্ধ পুত্র বৈশম্পায়নের নিকট আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রশ্ন করিলেন২৩: ব্রাহ্মণ কাহারা? ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? ইহা আমি জানিতে চাই, আপনি দয়া করিয়া ইহা বলুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন২৪: 'যিনি ক্ষমাদি গুণসম্পন্ন, যিনি হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি নিরামিষাহারী—কোনো জীবকেই যিনি আঘাত করেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ।' ইহা ব্রাহ্মণের প্রথম লক্ষণ।

'যিনি অদত্ত পরদ্রব্য—তাহা গৃহে থাকুক, অথবা পথে থাকুক—কখনো গ্রহণ করেন না, ২৫ তিনিই ব্রাহ্মণ।' ইহা ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় লক্ষণ।

১৯। ভবিষ্য, ব্রাহ্ম, ৪১।৪৫।

২০। ঐ, ৪১।৩৫—৪৩। মহাভারত, শান্তি, ১৮৮।৭-৮; বন ১৮০।৩২ ইহা সিদ্ধাচার্য অশ্বঘোষ কৃত। ইতি শুভম্।

২১। মহা, বন, ১৮০।৩২; শান্তি, ১৮৮।৭-৮।

২২। ভবিষ্য, ব্রাহ্ম, ৪১।৪৩।

২৩। যুধিষ্ঠিরের সহিত বৈশম্পায়নের এইরূপ বার্তালাপ কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে বৈশম্পায়ন বচনের অনুরূপ বচন মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়।

২৪। মহা, বন, ২০৫।৩২-৩৯। শান্তি, ১৮৯।৪৮

'যিনি ক্রূরতা বর্জন করিয়া নির্মম (মমত্বজ্ঞান বর্জিত) নিষ্পরিগ্রহ ও মুক্ত হইয়া বিহার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।' ইহা ব্রাহ্মণের তৃতীয় লক্ষণ।

দেব ও মনুষ্য-যোনিতে এমন কি তির্যগ্-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যিনি ইন্দ্রিয়োপভোগ সতত পরিত্যাগ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।' ইহা ব্রাহ্মণের চতুর্থ লক্ষণ। (যিনি শুচিতা সম্পন্ন তিনিই ব্রাহ্মণ। শুচিতা কি ?) সত্যই শুচিতা, দয়াই শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই শুচিতা, সর্ব জীবে করুণাই শুচিতা এবং তপস্যাই শুচিতা২৬। ইহা ব্রাহ্মণের পঞ্চম লক্ষণ।

যে দ্বিজ এইরূপ পঞ্চলক্ষণসম্পন্ন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি, হে যুধিষ্ঠির, বাকি সকলেই শূদ্র।

হে যুধিষ্ঠির, কুলের দ্বারা, জাতির দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারাও ব্রাহ্মণ হয় না, চরিত্রবান্ চণ্ডালও (জাতি-উৎপন্ন পুরুষ) ব্রাহ্মণ।২৭

যাঁহার মধ্যে অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য রহিয়াছে, যিনি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যক্তি হইতেই প্রতিগ্রহ লইয়া থাকেন…হে যুধিষ্ঠির! তিনিই ব্রাহ্মণ।

বৈশম্পায়ন পুনরায় এইরূপ বলিলেন :

হে যুধিষ্ঠির পূর্বে সমস্তই এক বর্ণ ছিল। কর্ম ও ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা চতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল।

সমস্ত মানবই যোনিজ এবং মরণধর্মী। সকলেই মূত্র-পুরীষযুক্ত। সকলেরই ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু এক এবং অভিন্ন। অতএব শীল ও গুণের দ্বারা দ্বিজ হয়।

শূদ্রও শীলসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইলে ব্রাহ্মণ হন এবং ব্রাহ্মণও ক্রিয়াহীন হইলে শূদ্র হইতেও হীন হন।২৮

২৫। মহা, অনু, ১৪৪।৩৩।

২৬। পদ্মপুরাণ, উত্তর, ২৩৭।১২-১৫।

২৭। মহা, বন, ৩১৩।১০৮।

২৮। মহা, শান্তি, ১৮৮।১০; ভাগবত, ৭।১১।৪৮। মহা, অনু, ১৪৩।৪৬-৪৭, ৫১। মহা, বন, ২১৫।১৩; ৩১৩।১১১। মহা, বন, ১৮০।২৫।২৬। শান্তি ১৮৯।৮।

ইহাও বৈশম্পায়নেরই বচন :—

এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ ঘোর অর্ণব, যদি শূদ্রও উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, হে যুধিষ্ঠির, তাহা হইলে তাঁহাকেই অপরিমিত দান প্রদান করিবে।

হে রাজন্, জাতি দুষ্ট হয় না, গুণই কল্যাণকর। জীবন যাঁহার ধর্মের জন্য, জীবন যাহার পরের জন্য, যিনি দিবারাত্র ক্ষমা করিতেছেন, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

যাঁহারা গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষাকাঙ্ক্ষী রূপে অবস্থান করেন, যাঁহারা ভোগে অনাসক্ত, হে যুধিষ্ঠির! তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

অহিংসা, মমত্ব ত্যাগ (লোভহীনতা) অবিধেয় কর্ম বর্জন, রাগ-দ্বেষের নিবৃত্তি, ইহাই হইল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ক্ষমা, দয়া, দম, দান, সত্য, শৌচ (শুচিতা) স্মৃতি, করুণা, বিদ্যা ও বিজ্ঞানাধিক্য হইল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।২৯

চতুর্বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও সর্বভক্ষী, সর্ববিক্রয়ী হইয়াও, গায়ত্রীমাত্র অবলম্বন করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত, জিতেন্দ্রিয় হইলেই বিপ্র হন।৩০

যিনি এক রাত্রিও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন—তাঁহার যাহা গতি, তাহা অন্যেরা (ব্রহ্মচর্য-বিহীনেরা) সহস্র যজ্ঞের দ্বারাও প্রাপ্ত হন না।৩১

যিনি সর্ববেদে পারদর্শী, সর্বতীর্থে অভিষিক্ত, যিনি আসক্তিমুক্ত হইয়া ধর্ম আচরণ করিতেছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

তিনি যখন কায়মনোবাক্যে কোনো জীবেরই প্রতি ক্রূর কর্ম করেন না—তখনই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৩২

হতবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণের মোহ ধ্বংস করিবার জন্য আমরা যাহা বলিলাম—যদি তাহা যুক্তিযুক্ত হয় তবে সজ্জনগণ গ্রহণ করুন, আর যদি তাহা অযৌক্তিক হয়—তবে পরিত্যাগ করুন।

ইহা সিদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষকৃত। ইতি শুভম্।

২৯। মহা, শান্তি, ২৪৪।২৩। বন, ১৮০।২১। শান্তি, ১৮৯।৪, ২৪৫।১৪; ২৬৯।৩৩; ২৪৪।২৪।

৩০। মনু, ২।১১৮।

৩১। "যতিধর্ম্মসংগ্রহ" গ্রন্থে উদ্ধৃত বিষ্ণুবচন, যতিধর্ম, পৃ ২০।

৩২। মহা, শান্তি, ১৭৪,৫৪; ২৫১।৬; ২৬১।:৭।

সেদিন মিলায়ে গেছে

শ্রীকরুণাময় বসু

স্মরণে এনো না আর সে দিনের শীর্ণ শশিলেখা
উঠেছিল বনপ্রান্তে, তরুচ্ছায়ে তুমি ছিলে একা
মুগ্ধা বিরহিণী সম। কহিলাম মুখপানে চেয়ে,
চিনিতে পারো কি মোরে ? আজ আর চিনিবে না মেয়ে।
সে দিন পূর্ণিমা ছিল, রাত্রি ছিল বিহ্বল মদির,
কুসুম মঞ্জরী প্রান্তে চৈত্র বায়ু আছিল অধীর,
মৌমাছি গুঞ্জন স্তব্ধ সেই সন্ধ্যা, স্তব্ধ নীলাকাশ,
করুণ জলের রেখা, নব নীল মেঘের আভাস,
দূরের অরণ্য-ছায়া, দু'একটি গৃহ-দীপ জ্বালা,
জগতে ছিল না কেউ, তুমি আমি আছিনু নিরালা।

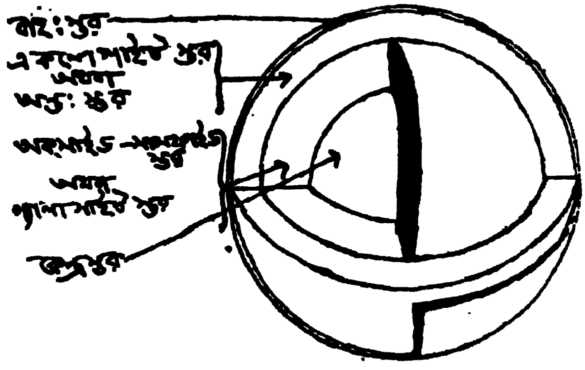
ভাষায় ছিল না কথা, কথা ছিল শান্ত দুটি চোখে,
পৃথিবী চিনেছি আমি উৎসারিত প্রেমের আলোকে।
মানুষের প্রেম খোঁজে মানুষের হৃদয়ের পথ,
যেখানে হৃদয় মেশে মিশিয়াছে অনন্ত জগৎ।

সে দিন মিলায়ে গেছে, তুমি সখি লয়েছ বিদায়,
তোমার আঁখির আভা আভাসিয়া ওঠে নিরালায়,
আভাসিয়া ওঠে মোর জীবনের নিঃশব্দ অতলে,
যে পথ চিনেছি আমি সেই পথে দূরে যাব চলে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত, এম্-এস্‌সি

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী মানবের পক্ষে প্রত্যক্ষ-গম্য নহে। ক্ষুদ্রশক্তি মানব খনন করিয়া মাত্র দেড় মাইল পর্য্যন্ত পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। খনিজ তৈলের অন্বেষণে যে সকল নলকূপ খনন করা হইয়াছে তাহাও তিন মাইলের অধিক যাইতে পারে নাই। ইহা পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের (প্রায় ৪০০০ মাইল) তুলনায় এত নগণ্য যে এই সকল হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের কোন খবর পাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীর অভ্যন্তরের কথা জানিতে হইলে তাই অন্য উপায়ের সাহায্যে অনুমান করিতে হয়।



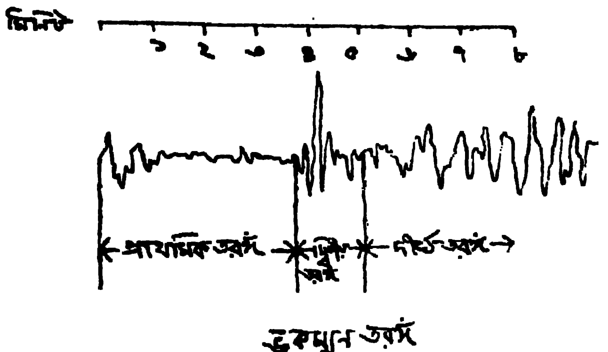
পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ স্তর বিন্যাস

পৃথিবীর অভ্যন্তরটা যে অতিশয় উষ্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যতই খনির ভিতর নামা যায় ততই আমরা এই ক্রমবর্দ্ধমান উত্তাপের পরিচয় পাইয়া থাকি। তদ্ব্যতীত পৃথিবীর নানা স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও আগ্নেয়গিরি আছে। এই-গুলি হইতে যে উত্তপ্ত জলধারা বাহির হয় ও অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর অতিশয় উত্তপ্ত। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে প্রতি ৬০ ফুট নিম্নে গমন করিলে ১ ডিগ্রি ফারেন হাইট তাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উহা হইতে গণনাদ্বারা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রে তাপ হইবে ৩৫০,০০০ ডিগ্রি ফারেন-হাইট। অবশ্য তাপ বহু নিম্নে ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্ত্তী স্থানের ন্যায় বৃদ্ধি পাইবে না।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেমন তাপ অত্যধিক তেমনই চাপও খুব বেশী। হিসাব করিয়া জানা যায় যে ১ মাইল নিম্নে প্রতি বর্গ ফুটে চাপ হয় ৪৫০ টন। তাহা হইতে জানিতে পারি যে পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপ হইবে ২০ লক্ষ টন। তাপের ধর্ম্ম যেমন পদার্থ মাত্রেরই আয়তন বৃদ্ধি করা, চাপের ধর্ম্ম তেমনই পদার্থ মাত্রেরই আয়তন হ্রাস করা। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই দুই বিপরীতধর্ম্মী শক্তি সর্ব্বদাই কাজ করিতেছে। প্রবল চাপের জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরটা নমনীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত হওয়া সম্ভব, তবে উহার তরল হইবার কথা নহে।

পৃথিবীর উপরিভাগে বহু স্থানে পলি দ্বারা গঠিত শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নিম্নে আছে আগ্নেয় শিলা (igneous rock)। এই সকল প্রস্তরের ঘনত্ব হইতেছে ২·৭৫ হইতে ৩·১ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ইহারা সম আয়তন জলের তুলনায় ২·৭৫ হইতে ৩·১ গুণ ভারী। সমগ্র পৃথিবীর ঘনত্ব হইতেছে ৫·৫। উহা হইতে প্রমাণ হয়, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পদার্থের ঘনত্ব খুব বেশী—প্রায় ৭ কিম্বা ৮। শুধু চাপের দ্বারা পদার্থের ঘনত্ব এতদূর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। সেই হেতু অনুমিত হয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরটা কোন গুরু ধাতব পদার্থে গঠিত। উল্কাগুলি সাধারণতঃ লৌহ ও নিকেলের যৌগিক পদার্থে নির্ম্মিত। ইহারাও সৌরজগতের অঙ্গীভূত। সুতরাং ইহাদের গঠন হইতে অনুমান করা যায় পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ লৌহ ও নিকেল দ্বারা নির্ম্মিত।

গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল ও তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থা পৃথিবী পাইয়াছে। অনেকের মতে পৃথিবীর উপরি-ভাগটাই শুধু কঠিন হইয়াছে—কিন্তু ভিতরটা রহিয়াছে তরল। এই ধারণা ভুল; কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তর প্রদেশ যদি তরল হইত তবে সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে যেমন সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা দেখা যায়, তেমনই ভূপৃষ্ঠেরও বিস্ফীতি দেখা যাইত। সেইরূপ কিছু দেখা যায় না বলিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল মনে করিবার কোন কারণ নাই।

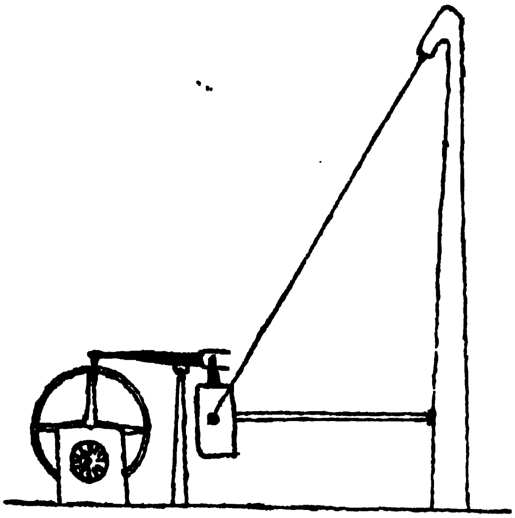


ভূকম্পন তরঙ্গ

আধুনিক কালে ভূকম্পন পরীক্ষা করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা জানিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং তাহা হইতেই এ বিষয়ে কতক পরিমাণে জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারিয়াছি। আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত অথবা ভূগর্ভে কোন স্থানের অপসরণের ফলে ভূকম্পন হইয়া থাকে। কোন স্থানে আরম্ভ হইয়া উহা তরঙ্গাকারে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সিসমোগ্রাফ (Seismo-graph) নামক যন্ত্রে উহা ধরিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভূকম্পন-তরঙ্গের তিনটি বিভাগ আছে—প্রাথমিক তরঙ্গ, মাধ্যমিক তরঙ্গ ও দীর্ঘ তরঙ্গ। দীর্ঘ তরঙ্গগুলিই প্রধান।

অপর দুই প্রকার তরঙ্গ দীর্ঘ তরঙ্গের অগ্রে উদ্ভূত হইয়া থাকে। প্রধান তরঙ্গের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃদু কম্পন অনুভূত হইয়া থাকে। শেষে একেবারে উহা থামিয়া যায়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গগুলি কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে। দীর্ঘ তরঙ্গগুলি শুধু কঠিন পদার্থের বহির্ভাগ দিয়াই গমন করিয়া থাকে।



সিস্‌মোগ্রাফ (Seismograph)

বিভিন্ন স্থানের ভূকম্পন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গগুলির তিনটি প্রকারভেদ পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এই রকমের হইলেও ইহাদের গতিবেগ বিভিন্ন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গগুলির এই প্রকারভেদের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর বহিরাবরণে তিনটি স্তরের কল্পনা করিয়াছেন।

নিম্নের প্রস্তরগুলি বর্দ্ধনশীল চাপের প্রভাবে উপরের প্রস্তর অপেক্ষা ঘন হইয়া থাকে। ভূকম্পনের পর্য্যালোচনা দ্বারা যে কয়েকটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়, উহা কিরূপ প্রস্তরে গঠিত হইতে পারে তাহা নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিয়াছেন। অনুমান করা গিয়াছে যে, পৃথিবীর বহিরাবরণের প্রথম স্তর গ্র্যাণাইট জাতীয় (Granite) প্রস্তরে দ্বিতীয় স্তর ব্যাসল্ট (Basalt) জাতীয় প্রস্তরে ও তৃতীয় বা সর্ব্বনিম্ন স্তর ডিউনাইট (Dunite) অথবা পেরিডোটাইট জাতীয় আগ্নেয় শিলায় গঠিত। ইহাদের বেধ (thickness) সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও উহা যথাক্রমে ১৮,৬ ও ১২ মাইল হইবে অনুমান করা হয়।

দীর্ঘ তরঙ্গগুলি স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের নিকট দিয়া যাইবার সময় অধিক গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে স্থলভাগের গ্র্যাণাইট জাতীয় প্রস্তর সমুদ্রের তলদেশে নাই।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তরঙ্গগুলির গতিবেগ ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৮০০ মাইল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চাপের প্রভাবই ইহার কারণ। ১৮০০ মাইলের নিম্নে গতিবেগের বৃদ্ধি কমিতে থাকে। এই গতিবৃদ্ধির হ্রাস ৬০০ মাইলের নিম্ন হইতেই ধরা পড়ে। ১৮০০ মাইলের নিম্নে এই তরঙ্গগুলির গতিবৃদ্ধির পরিবর্ত্তন হইতে অনুমান করা হয় যে, ১৮০০ মাইলের নিম্নের পদার্থ ভূপৃষ্ঠের সাধারণ প্রস্তর-জাতীয় নহে। উল্কাগুলির গঠন হইতে প্রতীতি হয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্রাঞ্চল ধাতব এবং উহা লৌহ ও নিকেল দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তরগুলি সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

ত্বক অথবা বহিস্তর বেধ ৩৬ মাইল

প্রথম স্তর—গ্র্যাণাইট জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। ঘনত্ব ২·৭৫। বেধ ১৮ মাইল।

দ্বিতীয় স্তর—ব্যাসল্ট জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। ঘনত্ব ২·৯। বেধ ৬ মাইল।

তৃতীয় স্তর—ডিউনাইট অথবা পেরিডোটাইট জাতীয় প্রস্তরে গঠিত। ঘনত্ব ৩·১। বেধ ১২ মাইল।

অন্তস্তর—ঘনত্ব ৩·১ হইতে ৪·৭৫ পর্য্যন্ত। বেধ প্রায় ১০০ মাইল।

প্যালাসাইট (Pallasxite) স্তর—ঘনত্ব ৪·৭৫ হইতে ৫·০ পর্য্যন্ত। (লৌহ ও নিকেল নির্ম্মিত যৌগিক পদার্থ) বেধ প্রায় ১১০০ মাইল।

কেন্দ্রস্তর—লৌহ ও নিকেল নির্ম্মিত। ঘনত্ব ১১·০। বেধ প্রায় ২২০০ মাইল।

ভি. এম্‌. গোল্ডস্মিথ (V. M. Goldsmidt) তাম্র-নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করিয়া অন্যরূপ স্তরবিন্যাস করিয়াছেন। লৌহ নিষ্কাশনের সময় যেমন লৌহের উপর একটি অক্সাইড ও সালফাইডের (Oxide and sulphide) স্তর পড়ে গোল্ডস্মিথও তেমনই পৃথিবীর কেন্দ্রের লৌহ-নিকেল স্তরের উপর একটি অক্সাইড ও সালফাইড স্তরের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ স্তরবিন্যাস এইরূপ:—

বহিঃস্তর—ঘনত্ব ২·৮। বেধ প্রায় ৭৫ মাইল। একলোগাইট (Eclogite) স্তর

(এক প্রকার আগ্নেয় শিলা)—ঘনত্ব ৩·৬ হইতে ৪·০ বেধ প্রায় ৬৫০ মাইল। অক্সাইড-সালফাইড স্তর—ঘনত্ব—৫·০ হইতে ৬·০। বেধ প্রায় ১১০০ মাইল।

কেন্দ্রস্তর—ঘনত্ব ৮·০ হইতে ১১·৫। বেধ প্রায় ২২০০ মাইল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঘনত্ব অনুযায়ী সাজান কয়েকটি স্তর পর পর রহিয়াছে। পৃথিবীর তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় আসিতে এইরূপ হইয়া থাকিবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই।

সন্তান

শ্রীজীবনময় রায়

স্ত্রী মারা গেল—একটি সন্তান রেখে।

লেমোনিয়ে বিয়ে করলে না আর। বিয়ের পর বৌকে সে ভালবাসতে লাগল প্রাণ দিয়ে। বড় মধুর সে প্রেম; যেন সে স্ত্রীর প্রেমের পূজারী। জীবনে তার পদস্খলন হয় নি। নিতান্ত সরল সহজ খাঁটি মানুষ—মনে হিংসা নেই, আর সকলের উপরই বিশ্বাস।

পাড়ার একটি গরীব মেয়েকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। বেশ দু'পয়সা আয় ছিল ওর—পাইকারী কাপড়ের কারবারে। তাই বলে এক মুহূর্তের জন্যেও একথা তার মনে হয় নি যে, তার স্ত্রী, তার নিজের জন্যে ছাড়া, অন্য কারণে তাকে বিয়ে করতে পারে।

স্ত্রীও সুখী করেছিল তাকে। সেই ছিল ওর সর্বস্ব; অক্লান্ত চোখে স্ত্রীর দিকে চেয়ে থাকত ও—ওর সেই পূজার দৃষ্টি দিয়ে। বৌয়ের মুখের থেকে চোখ সরাতে পারত না বলে কত সময় কত রকম ভুল যে করে বসত! বোতলের মদ প্লেটে, আর নুনের বাটায় জল ঢেলে ফেলে ছোট ছেলের মত হেসে উঠত, বলত "দেখেছ, ভালবাসার চোটে মাথার আর ঠিক নেই।"

শান্ত অলস চোখে চেয়ে হাসত মেয়েটি। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিত—বড় অপ্রতিভ লাগত মনে মনে স্বামীর এই অর্চনায়। তাকে দিয়ে অন্য কথা পাড়াবার চেষ্টা করত। স্বামী কিন্তু টেবিলের তলা দিয়ে নিজের হাতে ওর হাত নিয়ে ধরে রেখে, কানে কানে বলত "জীবন আমার, মাণিক আমার, বুকের ধন আমার।"

ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলত এক এক সময় মেয়েটি; বলত, "ছাড় ত! ছাড়, পাগলামি করো না। নাও, খাও এখন; আর আমাকেও খেতে দাও।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লোকটি একগাল রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে আনমনে চিবোতে থাকত।

পাঁচ বছর ওদের ছেলেপিলে কিছুই হয় নি। তারপর হঠাৎ একদিন মেয়েটি ওকে বললে যে ওর ছেলেপিলে হবে। আর বেশী দিন নেই। আনন্দে পাগল হয়ে ওঠে ও। এরপর থেকে একমিনিটও বৌকে ও আর চোখের আড় করে না। শেষে, ওকে মানুষ করেছে যে বুড়ী দাই, সে গুঁতিয়ে বাড়ীর বার করে দেয় ওকে—একটু হাওয়া খেয়ে আসবার জন্যে।

সহরের ক্রিকেটের সেক্রেটারী এক নওজোয়ান ছোকরার সঙ্গে ওর ভারী ভাব হ'ল। ছেলেবেলা থেকেই ওর বৌয়ের সঙ্গে জানাশুনো ছিল ছেলেটির। লেমোনিয়েদের সঙ্গে হপ্তায় তিন দিন ডিনার খেত সে; ওর বৌয়ের জন্য ফুল নিয়ে আসত; আবার কখনও বা থিয়েটারে বক্স ভাড়া নিত ওদেরই জন্যে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রাণ খুলেই বলত লেমোনিয়ে "সংসারে তোমার মত স্ত্রী আর ওর মত বন্ধু পেলে দুনিয়ার মানুষের সুখের আর সীমা থাকে না।"

সন্তান হতে মেয়েটি মারা গেল। সে ধাক্কায় ও প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল, কিন্তু ছেলেটার মুখ চেয়ে ও বুক বাঁধলে—রোগা ছিঁচকাঁদুনে ছেলেটা।

ছেলেটাকে ও ভালবাসল। তীব্র সে ভালবাসা, আর গভীর শোকে তার জন্ম। সে ভালবাসা মরণের স্মৃতিতে বিধুর বিমূঢ় আতুর। সে ভালবাসায়, মরা মায়ের উপর ওর যে পূজার ভাব ছিল তা ফুটে উঠত। তার স্ত্রীর রক্তে-মাংসে-গড়া, সে-ই যেন রয়ে গেছে ওর মধ্যে। পত্নীর সত্তার সার অংশ যেন এক রকম। পত্নীর প্রাণই যেন অন্য একটা দেহে সঞ্চারিত করা হয়েছে, এই মাত্র। তার তিরোধান হয়েছে—এ যেন বেঁচে বর্ত্তে থাকে, এইজন্যেই। চুমায় চুমায় নাকাল করে দেয় ওকে ওর বাপ। কিন্তু—এই বাচ্চাটাই ত মেরে ফেললে তাকে! ওই চুরি করেছে তাকে। তার প্রাণের মূল্যেই ওর প্রাণ। ভাবতে ভাবতে দোলায় শুইয়ে দিয়ে বাচ্চাটার দিকে সে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি করে ওর দিকে তাকিয়ে বসে সে হাজার রকমের সুখ দুঃখের স্বপ্ন দেখে। তারপর ঘুমন্ত শিশুর উপর ঝুঁকে পড়ে ওর চোখের জল আর বাধা মানে না।

* * *

শিশু বড় হতে থাকে। এক ঘণ্টার জন্যেও ওকে ছেড়ে ওর বাপ আর বাইরে থাকতে পারে না। সারাক্ষণ ওর কাছে কাছে থাকবে, ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবে; নাওয়ান ধোয়ান, সাজান গোজান, খাওয়ান দাওয়ান সব নিজে করবে। বন্ধু দুয়েভুও ছেলেটাকে ভালবাসত। বাপমায়ে স্নেহের উচ্ছ্বাসে যেমন আকুল হয়ে ওঠে তেমনি করে সেও ওকে নিয়ে পাগলের মত চুমু খেতে থাকত এক এক দিন। ওকে কোলে নিয়ে লুফত, হাঁটুর উপর বসিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলাত। এমনিতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর খুশীতে ভরপুর হয়ে লেমোনিয়ে নিজে নিজেই বলতে থাকত—চমৎকার, না? ভারি চমৎকার মানুষ! আর দুয়েভু খোকাকে বুকে চেপে ধরে, গোঁফ দিয়ে ওর ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিত।

শুধু বুড়ী দাই সেলেস্তে বাচ্চাটাকে দেখতে পারত না। ক্ষেপে উঠত খোকার নষ্টামি দেখে ও, আর ঐ দুই বুড়ো মদ্দকে অমনি করে আহ্লাদ দিতে দেখে। চেঁচিয়ে মেচিয়ে বলে উঠত, "অমনি করে ছেলেটাকে মানুষ করবে কি করে? একেবারে বাঁদর বানিয়ে তুলবে ওকে।"

বছরের পর বছর যায়। ছেলেটার ন'বছর বয়স হ'ল।

পড়তে শিখল না। লাই দিয়ে এত মাথা খাওয়া হয়েছিল তার, যে, যা তার খুশী তাই সে করত। স্বেচ্ছাচারী, একগুঁয়ে আর বদরাগী হয়ে উঠেছিল ছেলেটা। সব সময় তার জেদের কাছে তার বাপকে হার মানতে হ'ত ; আর তার যা খুশী তাই তাকে করতে দিত।

যদিও তার আবদার মত খেলনা কিনে দিত তাকে, কেক লজঞ্চুস খাওয়াত, আর সেলেস্তে চটেমটে গিয়ে চ্যাঁচামেচি করত—বলত, লজ্জা হওয়া উচিত মশায় আপনার, লজ্জা হওয়া উচিত। ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিতে বসেছেন। কিন্তু চলবে না এসব বেশী দিন, হ্যাঁ, চলবে না বলছি ; বেশী দিন আর নয়, তা বলে রাখলুম।"

সেমোনিয়ে একটু হেসে বলত, "কি আর করব, বল, বড্ড যে ভালবাসি ওকে, সামলাতে পারি নে। অভ্যেস করে নাও এ সব সয়ে নিতে।"

* * * *

কেমন একটু কাহিল মত ছিল জীন। ডাক্তার বলত ওর গায়ে রক্ত কম। ব্যবস্থা দিত, লৌহঘটিত ওষুধ আর কচি মাংসের স্যুপ। ছেলেটা কিন্তু কেক ছাড়া আর কিছু খেতে চাইত না ; কেকটাই তার পছন্দ। হাল ছেড়ে দিয়ে, বাপ তাকে কেবল ক্ষীরপাক আর চকোলেট ঠোসাত।

একদিন রাত্রে সকলে খেতে বসেছে। সেলেস্তে স্যুপ এনে হাজির করলে—মুখের ভাবটা বেশ একটু ভীষণ তার—শাসন আর জেদের এমনতর কড়া একটা ভাব সাধারণত সে দেখায় না। ঢাকনা খুলে, পাত্রে চামচ ডুবিয়ে সে বললে, "এমন স্যুপ কখনো আর রাঁধি নি। এবার এর থেকে খোকাকে একটু খেতেই হবে কিন্তু।"

ভয় পেয়ে সেমোনিয়ে মাথাটা নিচু করলে। বুঝতে পারলে একটা ঝড় ঘনিয়ে উঠছে।

বাপের প্লেট নিজের হাতে ভরে সেলেস্তে তার সামনে রেখে দিলে। স্যুপটা একটু চেখে বাপ বললে "বাঃ! সত্যি ত ; চমৎকার!"

ধাই তখন ছেলেটার প্লেট নিয়ে এক চামচ স্যুপ তাতে ঢালল ; তারপর একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল জীন কি করে।

জীন, খাবারটা শুঁকে, মুখ বেঁকা করে প্লেটটাকে ঠেলে দিলে। হঠাৎ সেলেস্তের মুখ রাগে বিবর্ণ হয়ে গেল। ধাঁ করে এগিয়ে এসে, ছেলেটার হাঁকরা মুখের মধ্যে এক চামচ ঝোল ঢেলে দিল।

দম আটকে, কেশে, হেঁচে, বমি করে, চেঁচিয়ে, গেলাসটা তুলে নিয়ে মারলে ছুঁড়ে ধাইয়ের গায়। লাগল গিয়ে দম করে সোজা তার পেটে। তারপর একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বগলের তলে ছেলেটার মাথাটা চেপে ধরে, চামচের পর চামচ ঝোল সে ওর গলায় ঢালতে সুরু করলে। টকটকে রাঙা হয়ে উঠল ছেলেটার মুখ। বিষম খেয়ে, হাত পা ছুঁড়ে, মোচোড় মেরে একসা করতে লাগল সে।

বাপ, প্রথমটায় এত হকচকিয়ে গিয়েছিল যে তার হাত পা সব যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তারপর, হঠাৎ পাগলের মত ছুটে গিয়ে, ধাইয়ের ঘাড় ধরে দেয়ালের গায় ঠেসে ধরল ; আর তোৎলাতে তোৎলাতে বলতে লাগল, বেরোও! বেরোও। জানোয়ার কোথাকার! বেরিয়ে যাও!"

ধাই তাকে এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল। পিঠের উপর চুল তার এলানো, চোখ দুটো ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। গলা কাটিয়ে বলতে লাগল, "ভূতে পেয়েছে নাকি তোমায়? আমাকে মারতে এলে তুমি ছেলেটাকে স্যুপ খাওয়াচ্ছি তাই! আর মেঠাই ঠোসাচ্ছ নিজে তোমরা ওকে!"

বাপ—পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করে কাঁপছে তার, আর বারবার শুধু বলছে, "বেরোও, বেরোও! জানোয়ার কোথাকার! বেরিয়ে যাও!"

তখন পাগলের মত ওর দিকে ফিরে, ওর মুখের দিকে মুখটা সোজা করে তুলে—গলা কাঁপছে ওর—সেলেস্তে বললে "ও, ভেবেছ অমনি যাচ্ছেতাই করার অধিকার আছে তোমার আমার উপর, এ্যাঁ! হুঁ, তা কিছুতেই নয়। আর কার খাতিরে শুনি? ঐ ছোঁড়াটার? তাও তোমার ছেলে ও নয়। না, তোমার নয়। ও ছেলে তোমার নয়। সবাই জানে সে কথা—শুধু তুমি ছাড়া। মুদী কসাই রুটিওয়ালা যাকে খুশী জিজ্ঞেস করগে।"

গর্জ্জাচ্ছে ও, রাগে গরগর করছে, গলা বন্ধ হয়ে আসছে ওর ; হঠাৎ এক সময় থেমে গিয়ে ও চেয়ে দেখলে লোকটার মুখের দিকে।

নিথর হয়ে গেছে ওর শরীর ; নীল হয়ে গেছে ওর মুখ ; হাত দুটো শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে দু'পাশ দিয়ে। একটু-খানি অপেক্ষা করে থেকে—গভীর ব্যথায় কাঁপছে ওর স্বর ; লোকটা বলতে লাগল "তুমি বলছ? তুমি! এসব কি বলছ তুমি?"

ওর মূর্ত্তি দেখে ধাই চুপ করে রইল ভয় পেয়ে। আর, ও আর এক পা এগিয়ে এসে বার বার বলতে লাগল "তুমি বলছ? কি বলছ এ সব তুমি?"

স্থির শান্ত কণ্ঠে ধাই বললে "যা জানি, সকলেই যা জানে, তাই বলছি।" ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত পাগল হয়ে, ধাইকে চেপে ধরে ও আছড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু বুড়ো হলে কি হয়, বুড়ীর ক্ষমতা কম না, আর চটপটেও খুব। পিছলে বগলের তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে গিয়ে, ও টেবিলের ওধারে গিয়ে দাঁড়াল ; আর আবার ক্ষেপে উঠে চেঁচাতে লাগল "দেখ, দেখ! একবার চেয়ে দেখ লোকটার দিকে! হাঁদারাম কোথাকার! ছোঁড়াটা হুবহু একেবারে জলজ্যান্ত প্রতিমূর্ত্তি, তা চোখেও পড়ে না? চেয়ে দেখত ওর চোখের দিকে? দেখত,

ওর নাকটা ? তোমার কি ঐ রকম ? আর ওর চুল ? ওর বাপের মত নাকি ? শুনে রাখ, সবাই জানে এ কথা। তুমি ছাড়া আর সকলে। শহরে একটা ঠাট্টাই দাঁড়িয়ে গেছে এ নিয়ে। দেখ একবার চেয়ে লোকটাকে—।"

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে যাই বেরিয়ে চলে গেল। স্যুপের প্লেট সামনে নিয়ে চুপটি করে বসে আছে জাঁদ, ভয়ে থতমত খেয়ে।

* * *

ঘণ্টাখানেক পরে শান্ত হয়ে চুপি চুপি যাই ফিরে এল দেখতে, যে ব্যাপারটা গড়াল কতদূর। দেখে যে, ছোঁড়াটা সমস্ত কেক্ খেয়ে ফেলেছে, এক বাটি দই শেষ করেছে, তারপর এক বোতল সিরাপ সবাড় করে স্যুপের চামচ দিয়ে জ্যামের বোতল উজাড় করতে লেগেছে।

বাপ চলে গেছে বেরিয়ে।

সেলেস্তে ছেলেটাকে চুমু খেয়ে কোলে করে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে শুইয়ে দিলে; দিয়ে খাবার ঘরে ফিরে এল আবার। টেবিলটা সাফ করলে, সব জিনিষ গোছগাছ করে রাখল। সর্ব্বক্ষণ মনে ভারি একটা অস্বস্তি।

একটি শব্দ নেই, বাড়ী একেবারে চুপচাপ। মনিবের ঘরের দরজায় গিয়ে কান পেতে শুনলে। কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। দরজার ফুটোয় চোখ দিয়ে দেখলে, দেখল লোকটা লিখছে—খুব শান্ত, সমাহিত লাগছে দেখে।

তারপর রান্নাঘরে গিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল—যদি কোনো দরকারে ডাক পড়ে। চেয়ারে শুয়েই ঘুমল আর সকাল হতেই উঠে পড়ল। রোজকার মতই ঘরদোরের কাজ সে করলে, ঝাঁট দিলে, ধুলো ঝাড়লে। আটটা নাগাদ লেমোনিয়েরের প্রাতরাশ প্রস্তুত করে রাখল।

কিন্তু মনিবের কাছে তা নিয়ে যেতে ভরসা পেল না—জানে অভ্যর্থনাটা কেমন জুটবে। ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকবে 'খন, বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ঘণ্টা আর বাজল না। ৯টা ১০টা বেজে গেল।

কী ব্যাপার, কিছু বুঝতে না পেরে, সেলেস্তে থালায় করে খাবার সাজিয়ে নিয়ে চলল—বুক দুরদুর করছে তার।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল কোন আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। সব চুপচাপ। দরজায় ঘা দিলে, কোন জবাব নেই। তখন সাহস করে দরজা খুলে সে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল, ঝনাৎ করে পড়ে গেল খাবারের থালা হাত থেকে।

ছাদের একটা আংটায় দড়ি লাগিয়ে লেমোনিয়ে গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝুলছে ঘরের মধ্যেখানে। তার জিভটা বেরিয়ে পড়েছে বীভৎস ভাবে। ডান পায়ের চটিটা মেজের উপর পড়ে আছে, বাঁ পায়েরটা তখনও পায়ে লটকে রয়েছে। একটা চেয়ার উল্টে গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে বিছানায়।

সেলেস্তের আর জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নেই—চ্যাচাতে চ্যাচাতে ছুটে পালিয়ে গেল সে। পড়শীরা সব ভীড় করে এল। ডাক্তার এসে বললে মাঝ রাতের কাছাকাছি ও মারা গেছে।

আত্মঘাতীর টেবিলের উপর ক্রেসুকে লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেল। এই কটা কথা তাতে লেখা ছিল:

"খোকাকে আমি তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম।"

[মোপাসাঁর 'দি চাইল্ড' গল্পের অনুবাদ]

বিহারের লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

রোগগ্রস্ত হলে মানত রাখার রীতি ভারতের সর্ব্বত্রই আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিহারের যে সমস্ত লোকসঙ্গীত দেওয়া হ'ল তাতে আছে বন্ধ্যার সন্তান কামনার প্রকাশ। সন্তানের রোগ-মুক্তিকল্পে যে মানত করা হয় তাতেও এ গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলোতে বিভিন্ন প্রকারে দেবদেবীদের তুষ্ট করা হচ্ছে সন্তানলাভের আশায় এবং তার দীর্ঘজীবন কামনায়। গানগুলির মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তা আছে—যেমন করেই হোক, দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষাই যেখানে একমাত্র কাম্য সেখানে অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করার প্রশ্ন ওঠে না।

নিম্নে প্রদত্ত করুণ গানটিতে অদৃষ্টের বিরুদ্ধে একটি বন্ধ্যা নারীর বড় নিদারুণ অভিযোগের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। দেবীমণ্ডপে পূজা দিতে যাবার সময় গাওয়া হয় গানটি-

"কিথর বাঁশ বাঁশরীয়া
কিথর কদলীকে বনওয়া,
আর কিথর হে মাতাকে মণ্ডপওয়া
রতন দীপওয়া জরে।
কৈসন হে বাঁশ বাঁশরীয়া
কৈসন কদলীকে বনওয়া,
কৈসন হে মাতাকে মণ্ডপওয়া
কৈসন দীপওয়া জরে।
লহ্ লহ্ লহ্ লহ্ বাঁশ বাঁশরীয়া
ঢুরু ঢুরু কদলী বনওয়া
মহ্ মহ্ মহ্ করে মাতাকে মণ্ডপওয়া
রতন দীপওয়া জরে।

উত্তর মাহে বাঁশ বাঁশরীয়া
পূরব কদলী বনওয়া
বিচবে শীতলাকে মণ্ডপওয়া
রতন দীপওয়া জরে।

অবল পূজৈতে মাইয়া
পাথর ন পসিজলো হে
অহে তৈরো না ছোড়াওলে মাইয়া
বাঝিনিয়া কে নাম হে।

হোমিয়া দৈতে মাইয়া জরল চুটকীয়া
তৈরো না ছোড়াওলে মাইয়া
গরীবকে রীতওয়া হে।"

"কোন দিকে বাঁশবন, কোন দিকে কদলীর বন আর কোন দিকেই বা মায়ের মণ্ডপ যেখানে রত্নদীপ জ্বলে? সেই বাঁশঝাড় কেমন, কদলীর বনই বা কেমন, মায়ের মন্দির কেমন, আর যে দীপ জ্বলছে তাই বা কেমন?

লক্ লক্ করছে সুন্দর বাঁশঝাড়, কদলীর বন হাওয়ায় দোল খাচ্ছে, রত্নদীপ উজ্জ্বল, মায়ের মন্দির সুগন্ধে ভরা। উত্তর দিকে বাঁশঝাড়, পূর্ব্ব দিকে কদলীর বন এবং তার মাঝে আছে মায়ের মণ্ডপ।"

তারপর পূজারিণী অনুযোগ করছেন—

"কত পূজাই করলাম, কিন্তু পাথর গল্‌ল না, আমার বন্ধ্যা নাম আর ঘুচল না। হোম করতে করতে কেশ পর্য্যন্ত পুড়ে গেল, কিন্তু দারিদ্র্য আর দূর হ'ল না।"

"সেই দিন শীতলা মাই
অটরী পসরী হে
নীতি উঠি মাচু মাই
লহঠী বেসাহি
নীতি উঠি মাচু মাই
সিন্দূর বেসাহি।
পহরি ওঢ়হি শীতলা
ভেলো অনুকূল
লপকি দুলারী লাল
চরণ বটোর
বকস দেহ মাতা বালক হমার।
জনে জনে বৈবে মাতা
তমে তমে বৈবু হব
লোচন কবুতর বনকে
চরণ মাবৈব মার।"

"শীতলার কৃপা ভিক্ষা করে নিত্য লাহি (গালার চুড়ী) ও সিন্দূর কিনে শীতলাকে চড়াই। সেই সব গ্রহণ করে শীতলা কৃপা করে সন্তান দিলেন, কিন্তু আমার আদরের পুত্র শীতলার চরণ ছুঁয়ে দিলে। তাকে ক্ষমা কর, তার জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করে আমি শীতলার অনুচরী হব, যেখানে দেবী যাবেন আমিও সেখানে যাব, পায়রার দৃষ্টির মত দৃষ্টি দিয়ে সর্ব্বত্র আমি তাঁর চরণে লক্ষ্য রাখব।"

যে সন্তানের জন্ত মানত রাখা হয়, পূজা দেবার সময় তাকে মণ্ডপ বা মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির কাছে নামিয়ে দেওয়ার রীতি আছে। অবোধ শিশু মূর্ত্তি স্পর্শ করে তাঁকে অপবিত্র করে ফেলেছে। তাই জননী তার হয়ে দেবীর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছেন।

ভেলো হে সন্ধ্যা কে বেরিয়া
সন্ধ্যৌতি দেহো ভগত।
ঘরে নাহি ঘরণী হে মাই
ভাণ্ডারে নাহি ঘিয়ারা।
কৈসে হে সন্ধ্যা দেখাইও
সন্ধ্যাইত কে বেরিয়া।

দেবী বলছেন "ভক্ত সন্ধ্যা হ'ল, সন্ধ্যা দাও।" ভক্ত উত্তর দিচ্ছে—"আমার ঘরে নেই ঘরণী, আমার ভাণ্ডারে নেই ঘি— কে সন্ধ্যা দেবে এবং কি দিয়েই বা প্রদীপ জ্বলবে?"

উত্তর হ'ল :—

ঘরে তোর ঘরণী
ভাণ্ডারে তোর ঘিয়ারা,
সোনেকে দীয়ারা ভগত
রেশম কে বাতিয়া।"

যোরই গাইয়া ঘিয়ারা
জরৈবো সারি রাতিয়া।

দেবী প্রসাদিত হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন—"তোমার গৃহে ঘরণী আসবে, তোমার ভাণ্ডারে আসবে ঘি, সোণার প্রদীপে রেশমের বাতি জ্বলবে। ধোলনী গরুর (দুগ্ধজাত) ঘৃতের প্রদীপ সমস্ত রাত্রি ধরে গৃহ তোমার আলোকিত করে রাখবে।"

জর গেলো দীয়া মাতা
সম্পূরন ভেলো বাতিয়া
খেল লাগৈলো মাতা
চৌপহর রাতিয়া।

"দীপ জ্বলল, দেবীর আশীর্ব্বাদ সফল হ'ল, আলোকিত ঘরে সমস্ত রাত্রি ধরে দেবী খেলা করতে থাকেন।"

খেলৈতে কুদৈতে থাকি' গেলা
নিন্দিয়া রলৈলে হে মাতা।
কিয়া তুঁহি নিন্দ রসৈলে মার
কোচিয়া কসোলিয়া দুয়ারাহি ঠাঢ়।
অন্তর কে আঁখি দিহা কোচিয়া কে কাব
নিরধন কে ধনওয়া
বাঝি তিরিয়া কে মাতা দিহো হে লাল
হাসৈতে খেলৈতে ঘর যায়।

দীপোজ্জ্বল ঘরে খেলা করতে করতে দেবী পরিশ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। তখন তাঁকে বলা হচ্ছে—"কি গাঢ় নিদ্রা তোমার দেবী! তোমার দুয়ারে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তেরা পড়ে আছে! অন্ধকে দৃষ্টি দান কর, কুষ্ঠীকে দেহ দাও, দরিদ্রকে ধন দাও এবং বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দাও, সকলে প্রসন্ন হয়ে ঘরে ফিরে যাক্।" এখানে দেবীকে একটি ছোট মেয়ে রূপে কল্পনা করা হয়েছে, যিনি সমস্ত রাত্রি আলোকিত ঘরে খেলা করে, শ্রান্ত হয়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েন। উপরন্তু কর্তব্য পালনের জন্য তাঁকে সচেতন করা হচ্ছে মৃদু ভর্ৎসনার দ্বারা—"এত কিসের নিদ্রা?"

"মাইরা দয়ারাহি হরিয়র পিপর
নীল ধ্বজা পহরাণী মাতা
মোহনী ভবানী।
জগত চরণ তোর পুজৈ মাতা
সবহি তোহার হে লাল
হমর বাঝিয়া নাম ছোড়াহ মাতা
জনম দুখিয়া রহি হায়্।"

"দেবীর মন্দির দ্বারে প্রবেশপথে আছে সবুজ পিপুল গাছ; মন্দির নীল পতাকায় শোভিত, দেবী হচ্ছেন মোহিনী ভবানী অর্থাৎ দুর্গা। জগৎ তোমার চরণ পুজা করে, সকলেই তোমার সন্তান। হে দেবি! আমি আজন্ম দুঃখিনী, আমার বন্ধ্যা নাম দূর করে দাও।"

"সবকে মজরিয়া নিমিয়া ফল ফুলহি,
মাই হমর ডেলৈ পাতঝর্
হোয়েহে বিহান নিমিয়া পসরত হাট
চাঁছিয়া বৈসাবো হে নিমিয়া কাটৈবো।
জড়সে কাটৈবি নিমিয়া খোরবৈ খোরাম
তাক পর লাগেবো মাই পান ভঁটার।
পানওয়া খৈবে মাই পিরকী ফেঁকিহো
লাল আঙ্গনে খেলত্ বালক হমার।"

আমার ফল-ফুলে ভরা নিম গাছটির ওপর সকলের নজর তাই আমি হয়েছি ফলহীনা বন্ধ্যা। ভোর হোক, বাজার বসলে কুড়ুল কিনব। নিমগাছটি শিকড় সমেত কেটে তাই দিয়ে বেড়া দেব। সেই বেড়ায় লাগাব পানের গাছ। দেবী পান খেয়ে আমার অঙ্গনে পিক ফেলবেন, আর আমার বাছা সেই পিক্ রাঙা অঙ্গনে খেলা করবে—অর্থাৎ পান খেয়ে দেবী তুষ্ট হবেন তা হলে আমি সন্তানবতী হব।"

নিম গাছেও শীতলাদেবী তুষ্ট হন, কিন্তু দুষ্ট লোকদের নজর পড়েছে বলে তাতে দেবীর তুষ্টিসাধন হচ্ছে না, তাই এবার পান দিয়ে দেবীকে পরিতৃপ্ত করা ছাড়া উপায় কি। পানও দেবী খাবেন এত প্রচুর পরিমাণে যে সমস্ত অঙ্গন তাঁর চর্ব্বিত তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হয়ে যাবে।

দেবীর প্রতি সুগভীর আস্থার পরিচয় আছে এ সঙ্গীতে। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে আছে দেবতাকে তুষ্ট করাও বিধি:

"ভেলোই বিহান পারাতে কে, বেরিয়া
অহে পসরভি হাটিয়া
ধোতীয়া বৈসাহি দৈরে'। ভাই
তোহার চরণে দৈবো
ধুথুরা খোজিয়ে ভাই
তোহার চরণে দৈবো।
সিন্দুর পিয়ারীয়ে হোইহো সুলখন
বালক তোহার জীয়ো সুখী তনমন।"

প্রাতে যখন বাজার বসবে কিনব ধুতী, আনব ধুতুরার ফুল, শিবের মন্দিরে পূজা দেব। শিব সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন—"সিন্দুর আর হরিদ্রারঞ্জিত কাপড়ে সুলক্ষণা হও, তোমার বালক দীর্ঘায়ু হোক, সুখী হোক।"

সামান্য ধুতি ও ধুতুরায় দেবতাকে তুষ্ট করে যে আশীর্ব্বাদ লাভ করা হচ্ছে তাই বলে দিচ্ছেন পূজারিণী। তবে কি না শিব ঠাকুর অতি অল্পেই তুষ্ট, শুধু ধুতুরা হলেই চলে, ধুতিখানি উপরি পাওনা তাঁর।

ভারতে দিয়াশলাই শিল্প

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

সেই আদিম যুগে যখন বর্ত্তমান যুগের সভ্য ও উন্নত মানুষের পূর্ব্বপুরুষগণ বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত তখনও তাহারা আর কিছু না জানিলেও, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে খাদ্যের প্রয়োজন তা জানিত। এটাও তাহাদের অজানা ছিল না যে, অগ্নির সাহায্যে কাঁচা মাংস অনেক পরিমাণে সুস্বাদু হইয়া ওঠে, কারণ সুখের স্বাদ প্রাণীমাত্রেরই স্বভাবজাত। কাজেই তাহারা পাথরে পাথরে ঘষিয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিত। তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—মানুষ আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে যে সামান্য পরিমাণে দিয়াশলাই উৎপাদন হইত তাহা হইত কুটিরশিল্প হিসাবে এবং জিনিষও তত উৎকৃষ্ট ছিল না। ইহাদ্বারা ভারতের চাহিদার (বছরে প্রায় ১৫০ লক্ষ গ্রোস) একাংশও মেটানো সম্ভবপর হয় নাই। সুইডেন ও জাপানই তখন ভারতে

সমপরিমাণে দিয়াশলাই রপ্তানী করিত। জাপানী দিয়াশলাই ছিল দামে সস্তা, কাজেই উহার প্রচলন ছিল বিশেষভাবে ভারতের গ্রাম্যাঞ্চলে ; সুইডেনের দিয়াশলাইয়ের দাম অধিক বলিয়া সহরেই বেশী চলিত। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময়ে জাপান ও সুইডেনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে। জাপানী দিয়াশলাইয়ের সস্তা দাম ও ইউরোপ হইতে ভারতে মাল রপ্তানীর বেশী ভাড়ার জন্য ১৯১৭ সালের মধ্যে ভারতের দিয়াশলাইয়ের বাজার জাপানের করতলগত হয়।

প্রথম মহাসমরের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন ও জাপানের মধ্যে প্রতিযোগিতা পুনরায় আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সময় ভারত-সরকার বিদেশ হইতে আমদানী দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক বর্দ্ধিত করায় ভারতে দিয়াশলাই-শিল্প-উৎপাদন প্রচেষ্টা অনেকাংশে সম্প্রসারিত হয়। ফলে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ভারতে দিয়াশলাই উৎপাদনের পরিমাণগত হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৯২২ সালই হইল ভারতীয় দিয়াশলাই শিল্পের একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময় হইতেই ভারতের নিজস্ব শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিদেশী আমদানী হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। ১৯২১-২২ সালে প্রায় ১৩৭ লক্ষ গ্রোস দিয়াশলাই ভারতে আমদানী হইয়াছিল ; ১৯২৬-২৭ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ৬১ লক্ষ গ্রোসে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালে ভারতে যে পরিমাণ দিয়াশলাই উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদ্বারা ভারত ও ব্রহ্মদেশের সমস্ত চাহিদাই মেটানো হইয়াছিল। নিম্নে কয়েকটি ভারতীয় দিয়াশলাই-কারখানার নাম ও প্রতিষ্ঠাকাল দেওয়া হইল :—

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
ইসাবী ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, কলিকাতা,	১৯২৩
আবদলী হাজী দাযুদ এ্যাণ্ড কোং, রেঙ্গুন,	১৯২৬
মহালক্ষ্মী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী, লাহোর,	১৯২৫-২৬
বেরিলি ম্যাচ্ ওয়ার্কস্, বেরিলি	১৯২৫-২৬

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৪ সালের পূর্ব্বে ভারতের দিয়াশলাই শিল্প স্বয়ংপূর্ণ ছিল না। কাঠিগুলি ও বাক্স জাপান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়া কাঠির অগ্রভাগে যে রাসায়নিক পদার্থটি থাকে তাহা সংযোজিত করাই ভারতীয় কারখানাগুলির প্রধান কার্য্য ছিল। ১৯২৪ সালেই সর্ব্বপ্রথম কাঠি ও বাক্স প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হয়। সুইডিস ম্যাচ কোম্পানী ১৯২৪ ও ২৫ সালে অম্বরনাথ, কলিকাতা, বোম্বাই, ধুবড়ী, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে নিজেদের কারখানা স্থাপন করে। পরে অবশ্য কোম্পানী তাহাদের ব্যবসায় সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া 'ম্যানেজিং এজেন্সি' পদ্ধতিতে কার্য্য চালায় ; উহাদের ম্যানেজিং এজেন্ট হইল ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী। উহারা বর্ত্তমানে ভারতীয় চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ মাল উৎপন্ন করিতেছে।

১৯২৬ সালে ভারত-সরকার ভারতে দিয়াশলাইয়ের আমদানী-রপ্তানী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন। সেই হিসাবমতে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সালে ভারতে সর্ব্বসমেত ২৭টি দিয়াশলাইয়ের কারখানা ছিল ; তাহারা দৈনিক প্রায় ৫০০ গ্রোস দিয়াশলাই উৎপন্ন করিত। বৎসরে উৎপাদন-সংখ্যা ছিল ১৮০ লক্ষ গ্রোস। তন্মধ্যে সুইডেনের কারখানাগুলিই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাল উৎপন্ন করিত। ১৯২২-২৩ সালে আমদানী মালের উপর ট্যাক্সবাবদ পাওয়া গিয়াছিল ১,৫৪,০০,০০০ টাকা ; ১৯২৫-২৬ সালে পাওয়া যায় ১,১৮,০০,০০০ টাকা। দেখা যায়, ক্রমেই মাল আমদানীর পরিমাণ কমিতেছে। ১৯২৯ সালের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে ভারতীয় দিয়াশলাই-শিল্পীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা যায়, ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত দিয়াশলাই উৎপন্ন হইতে থাকে। এযাবৎকাল দিয়াশলাইয়ের দাম ছিল খুব সস্তা। কিন্তু ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য কাঁচামালের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ায় দিয়াশলাইয়ের মূল্য বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত মালের ঘাটতি পড়ায় চোরাকারবার, কালোবাজার প্রভৃতি বিশেষভাবে চলিতে থাকে। ফলে সরকার ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে দিয়াশলাইয়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ৪০ কাঠিযুক্ত দিয়াশলাইয়ের দাম সাড়ে চার পয়সা ও ৫০ কাঠিওয়ালা দিয়াশলাইয়ের ছয় পয়সা করা হইল। তারপর ১৯৪২ সালের এপ্রিল ও আগষ্ট মাসে দিয়াশলাইয়ের মূল্যের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা হয়। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে ৬০ কাঠি দিয়াশলাইয়ের দাম তিন পয়সা ধার্য্য হয়।

যে সমস্ত কাঁচামালের সাহায্যে দিয়াশলাই তৈয়ারী হয় তন্মধ্যে কাঠ, কাগজ ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রধান। কাঠ দিয়া কাঠি ও বাক্স তৈয়ারী হয় বলিয়া কাঠই এই শিল্পের প্রধান উপাদান। ভারতীয় দিয়াশলাইয়ের সমস্ত কাঠিই 'এ্যাসপেন' (aspen) নামক বিদেশের আমদানী কাঠ হইতে নির্ম্মিত হইত। ইহা বিশেষভাবে সাইবেরিয়া, বাল্টিক দেশসমূহ ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া হইতেই আসিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সমস্ত দেশ হইতে কাঠ আমদানীর ভাড়া অত্যন্ত বেশী পড়ায় বিশেষজ্ঞগণ যাহাতে ভারতীয় কাঠ দিয়া দিয়াশলাই তৈয়ার করা সম্ভব হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, শিমুল বা শওয়ার (sawar) নামক বৃক্ষের কাঠ হইতে কাঠি ও বাক্স তৈয়ার করা যাইতে পারে। বাংলা, ব্রহ্মদেশ, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মালাবার প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে শিমুল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তা ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যে শিমুলসদৃশ একপ্রকার নরম কাঠ জন্মে তাহা দ্বারাও ভালভাবে দিয়াশলাই তৈয়ার করা চলিতে পারে। মাত্র ৭·৩ কিউবিক ফুট এ্যাসপেন হইতে প্রায় ১০০ গ্রোস

দিয়াশলাইয়ের কাঠি নির্মিত হইতে পারে, উক্ত পরিমাণ কাঠির জন্ত প্রায় ১০'৫ কিউবিক ফুট শিমুল কাঠের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অ্যাসপেন কাঠের আহরণ-ভাড়া সমেত যাহা খরচ পড়ে তাহা শিমুল কাঠের তিনগুণ; কাজেই শিমুলকাঠ ব্যবহার অনেকাংশে সুবিধাজনক। এ ছাড়া বিদেশের মালের অনিশ্চয়তার উপরও নির্ভর করিতে হয় না। হিমালয়ের জঙ্গলে শিমুল অপেক্ষাও ভাল কাঠ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আনয়ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কদমকাঠও এ কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শিমুলকাঠ বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বাক্সের জন্ত ও কদম বা এই জাতীয় কাঠ ব্যবহৃত হয় কাঠির নিমিত্ত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভেই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় সেখান হইতে কোন কাঠ পাওয়া সম্ভব হইল না। কাজেই তখন ভারতীয় দিয়াশলাই শিল্পের উন্নতির জন্ত ভারতীয় কাঠের উপরই নির্ভর করিতে হয়। একটি বড় কারখানায় মাসে প্রায় ১০০০ টন কাঠের প্রয়োজন হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ কোম্পানী মাসে প্রায় ৫০০০টন কাঠ ব্যবহার করে। সুতরাং এই সময় শিমুল কাঠের দাম বিশেষ ভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

কাঠের পরেই অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হইল রাসায়নিক দ্রব্যাদি। এর মধ্যে আবার পটাসিয়াম ক্লোরেট ও রেড ফসফরাস প্রধান। তা ছাড়া গন্ধক; ম্যাঙ্গানীজ ডায়ক্সাইড (Manganese dioxide), জিঙ্ক অক্সাইড, বাতির কালি (Dampblack), শিরীষ (Glue), এন্টিমনি সালফাইড, কাচচূর্ণ প্যারাফিন প্রভৃতি কম বেশী প্রয়োজন হয়। এন্টিমনি সালফাইড, বাইক্রমেট অব পটাস ম্যাঙ্গানীজ ডায়ক্সাইড, জিঙ্ক অক্সাইড প্রভৃতি পদার্থগুলিকে বলা হয় 'ফিলার্স' (Fillers); সাধারণ অবস্থায় যাহাতে আগুন ধরিয়া না যায় তজ্জন্যই এগুলির ব্যবহার। ঘর্ষণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় কাচ-চূর্ণ। শিরীষ সকল রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে একত্রিত রাখে, বাতির কালির প্রয়োজন শুধু রং করিবার নিমিত্ত। অন্যান্য রাসায়নিকগুলিরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দিয়াশলাইয়ের বাক্সগুলি আচ্ছাদিত করিবার জন্ত কাগজেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তবে এ নিমিত্ত অতি সস্তা দামের কাগজেই কাজ চলে। তারপর প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইল 'লেবেল'। ভারতের মত দেশে, যেখানে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর—সেখানে লেবেলের বিভিন্নতার উপর কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, কারণ নানা রঙের ছবি দেখিয়াই ইহারা দিয়াশলাইয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া থাকে। তা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মগত পার্থক্য হেতুও ভিন্ন ভিন্ন লেবেলের প্রয়োজন হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর অন্ত কোন দেশেই এত বিভিন্ন রঙের লেবেলের প্রচলন নাই।

প্রতি মিনিটে যেখানে কয়েক ডজন দিয়াশলাই তৈয়ার হয় সেখানে কারখানার সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে সুদক্ষ কারিগরের উপর। দেখা গিয়াছে, ভারতীয় কারিগরগণ অতিশয় দক্ষতার সহিত দিয়াশলাই-কারখানার সকলপ্রকার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। তা' ছাড়া ইউরোপ প্রভৃতি দেশ অপেক্ষা এদেশীয় কারিগরগণের মজুরী অনেক কম।

কারখানার সকল কার্য্যাদিই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে-কোন আয়তনের কাঠের গুঁড়িগুলি ছাল ছাড়াইয়া পিলিং যন্ত্র-সাহায্যে (Peeling machine) কাঠগুলিকে খুব পাতলা অংশে বিভক্ত করিয়া উপযুক্ত আকারে কাটা হয়। তারপর এগুলিকে দেওয়া হয় 'চপিং' যন্ত্রে (Chopping machine)। এখানে বাক্সের ভিতরকার বিভিন্ন অংশ ও বহিরংশ নির্দিষ্ট আয়তনে কর্তিত হইয়া বাক্স-নির্মাণ যন্ত্রে বিভিন্ন অংশ সংযোজিত হইয়া বাক্সগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। কাঠিগুলিও বিভিন্ন যন্ত্র-সাহায্যে তৈয়ার হয়; তৎপর সেগুলিকে শুকাইয়া তরল প্যারাফিনে নিমজ্জিত করিয়া অগ্রভাগে রাসায়নিক দ্রব্যাদির মিশ্রণ লাগানো হয়। তৎপর কাঠিগুলিকে ড্রাইং চেম্বারে শুকাইতে দেওয়া হয়। তারপর যন্ত্রের সাহায্যে বাক্স ভর্ত্তি, বাক্সের উভয়দিকে রাসায়নিক দ্রব্য লাগানো, লেবেল আঁটা সকল কাজই সম্পন্ন হয়। সাধারণ অবস্থায় প্রধানতঃ দুই আয়তনের দিয়াশলাইয়ের বাক্স থাকে; (১) ৫৮×৩৬×১৮ মিলিমিটার ও (২) ৪৬×৩৩×১৫ মিলিমিটার। কাঠির দৈর্ঘ্য থাকে সাধারণতঃ ৫০ ও ৪০ মিলিমিটার। প্রতি বাক্সে কাঠি থাকে ৮০টি ও ৪০টি করিয়া। যুদ্ধের সময় অবশ্য উপরোক্ত দুই আকারের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

ভারতের লোক-সংখ্যা চল্লিশ কোটি। কিন্তু ভারতবাসীর অপরিসীম দারিদ্র্য হেতু অন্যান্য দেশের তুলনায় দেয়াশলাইয়ের ব্যবহার এখানে অনেকাংশে কম। যুদ্ধের জন্ত যে সমস্ত দেশে ভারত হইতে দিয়াশলাই রপ্তানী হইত সে সব দেশ হয়ত যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশ হইতে মাল আমদানী করিবে; ফলে ভারতীয় দিয়াশলাই শিল্পের যথেষ্ট ঘাটতি হইতে পারে। কিন্তু আশা করা যায়, ভারতে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ধরণের নরম কাঠ আছে তাহা আহরণের সুবন্দোবস্ত করা হইলে ভারতীয় দিয়াশলাই শিল্পের ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইবে।

দ্রষ্টব্য :— ১২৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'বিয়োগান্ত' গল্পের লেখক শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত।

"সুখে আছি"

শ্রীশঃ

কর্ম্মজীবনে একবার নাটকীয় ভূতাবিষ্ট হইয়াছিলাম—প্রতিবেশ প্রভাবে। নাটকে মৃতসৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই রঙ্গমঞ্চে কয়েকবার অবতীর্ণ হইয়াছি—প্রমোশন আর পাই নাই। যে বারের কথা উল্লেখ করিতেছি সেবার কর্ম্মসচিবের গুরু দায়িত্ব অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। "সাজাহান" নাটক অভিনীত হইবে স্থিরীকৃত হইল, কিন্তু ভূমিকা-নির্ব্বাচনের সময়ই সব বানচাল হইয়া গেল। প্রত্যেকেই নাম-ভূমিকায়, নচেৎ ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে আগ্রহশীল। কিন্তু সকলকেই তো আর এই দুই ভূমিকা দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই আমার সচিবত্বও আকালমৃত্যু বরণ করিল।

আমাদের এই হতভাগ্য দেশে ধর্ম্মঘটের বান ডাকিয়াছে। কর্ম্মসচিবের ভূমিকা লইয়াই যত গণ্ডগোল। ফেডারেশন অব পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী Dr. George Noronha সাহেবের সঙ্গে বেঙ্গল ষ্ট্রাইক একশ্যন কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ের যে 'ডন কি হোতীয়' (Don Quixotic) ধরণের মসী-যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল—তাহা সকলেরই জানা আছে।

এই মসীযুদ্ধ কিছুকাল চলিতে থাকায় পরে আমরা অকস্মাৎ জানিলাম ডাক-তার বিভাগের ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে এবং সব সমস্যার "সন্তোষজনক সমাধান" হইয়াছে—এই সুখবরে আমরা উৎফুল্ল হইলাম। কিন্তু ইষ্টসিদ্ধির পর ধর্ম্মঘটীদের কর্ম্মতৎপরতা তদনুপাতে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে কি না তাহাই বিবেচনাযোগ্য। ২১শে শ্রাবণ বিশাখা নক্ষত্রে বারবেলায় তাঁহারা নিজেদের কর্ম্মে পুনরায় যোগদান করিয়া আমাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপখণ্ডনে লাগিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে পিওন মহাশয়েরা বাড়ীতে বাড়ীতে আসিয়া চিঠি-পত্র বিলি করিতেন, এখন তাঁহাদের কেহ কেহ তৃতীয় ব্যক্তির জিম্মায় চিঠিখানি ছাড়িয়া দিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন। ফলে চিঠিপত্রাদি রীতিমত বিলি হইতেছে না। অতঃপর তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যদি বাহানা ধরেন যে, চিঠিপত্র মণিঅর্ডার পার্শেল বিলি করিবার নিমিত্ত প্রত্যেককেই এক একখানি জীপ গাড়ী দিতে হইবে, না দিলে তাঁহারা মিঃ দালভী, মিঃ বসু প্রমুখ ধর্ম্মঘট-বিশারদদের নেতৃত্বে আবার ধর্ম্মঘট সুরু করিয়া দিবেন, তবে আমাদিগকেই তো তাল সামলাইতে হইবে? শ্রাদ্ধ যেমন গড়াইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ডাক-তার বিভাগের কর্ম্মচারীরা সত্বরে এক একটি 'রবট' Robot হইয়া সিংহাসনে সমাসীন থাকিবেন, আর তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্মুখে আমেরিকা হইতে সদ্য আমদানী এক একটি নবাবিষ্কৃত কল থাকিবে। পোষ্টকার্ড, টিকেট, খাম প্রভৃতি বিক্রয় করিবে রবটগুলি; মণিঅর্ডার, সেভিংস ব্যাঙ্ক, রেজিষ্ট্রেশান, পার্শেল প্রভৃতি লইয়া ডাক-বিভাগের আর কোন কর্ম্মচারীর সঙ্গে বাক্যালাপের প্রয়োজন হইবে না—কলটিতে প্রয়োজনানুযায়ী মণিঅর্ডারের ফরমখানা, সেভিংস ব্যাঙ্কের বহিখানা, রেজিষ্ট্রেশানের জিনিষগুলি ও পার্শেলগুলি টুক করিয়া ফেলিয়া দিলেই রবট সুচারুরূপে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে—অবশ্য ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদের পকেটে থাকিবে কলের চাবি আর টেবিলে থাকিবে কার্লটন্‌স ষ্ট্রেইট ভার্জ্জিনিয়া সিগারেট।

যাঁহারা খাদ্য-দ্রব্য এবং বস্ত্রাদির বর্ত্তমান সমস্যা নিরাকরণের চেষ্টা না করিয়া সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে কেবলই বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া দেশের ও দশের নেতৃত্বের দাবি করেন, তাঁহারা বাহাদুর বটেন। এ দেশে যুদ্ধ হয় নাই, অথচ অন্ন বস্ত্র চিনি তৈল প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য সামগ্রীর দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। ইহার অন্তর্নিহিত গূঢ় তথ্যের সন্ধান পূর্ব্বক প্রকৃত হেতু নির্ণয় করিতে এ-সব নেতাদের না আছে আগ্রহ, না আছে পারদর্শিতা—সুতরাং এদের দ্বারা প্রতিকার হওয়া তো দূরের কথা।

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এখন হয়ত খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের পক্ষে অপরিহার্য্য বহু সামগ্রী দুর্লভ হইয়াছে এবং অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু এই অবস্থা সাময়িক—চিরদিন এরূপ থাকিতে পারে না। শনৈঃ শনৈঃ দ্রব্যাদির মূল্যও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে এবং ব্যবহারিক জীবনও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। দ্রব্যাদির বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যতাই যদি ধর্ম্মঘটীদের ষ্ট্রাইকের একমাত্র ভিত্তি হয় তবে সে আবদার রক্ষিত হইলে, সামাজিক জীবনে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মঘটের প্রতীক্ষায় অনেকেই আছেন—আজ রেল-কর্ম্মচারী, কাল ব্যাঙ্কের, তারপর কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের অন্যান্য বিভাগের, ক্রমে দোকানের, ছাপাখানার—একে একে সকলেই আবদার করিয়া বেতনবৃদ্ধির দাবি করিবেন, কিন্তু এই সব কয়েক লক্ষ চাকুরে লইয়াই তো দেশের জনসমাজ নহে? চাকুরির গণ্ডীর বহির্দ্দেশে যাঁহারা আছেন, সেই পেন্সনভোগী রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতির কি দশা হইবে? তারপর বাড়ীর চাকর, পাচক, ধোপা, নাপিত, ড্রাইভার, মজুর প্রভৃতি একে একে সকলেই বেতন-বৃদ্ধির দাবি পেশ করিবে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হারে মাসহারা পাইয়া আসিতেছেন, যুদ্ধের বাজারে রাতারাতি "বড় মানুষও" হন নাই কিংবা ধর্ম্মঘট করিবারও উপায় যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কি ব্যবস্থা হইবে? সুতরাং ধর্ম্মঘট-সমর-নায়কগণ দল পাকাইয়া ও অসন্তোষের আগুনে ইন্ধন যোগাইয়া সামাজিক জীবনে কেবল বিপর্য্যয়সাধনই করিতেছেন। রেলভাড়া, ডাকের মাশুল বৃদ্ধি পাইলে, ব্যাঙ্কের সুদের হার হ্রাস পাইলে বা নূতন রকমের টেক্স ধার্য্য হইলে পর্য্যুদস্ত হইবে দেশের কোটি কোটি নরনারী, ফলে সমাজদেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

বাঙালীর হিন্দী শিক্ষা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

উচ্চশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বহুভাষাবিদ্ অল্পই আছেন। মনে হয় ইহার কারণ ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবগত ঔদাসীন্য। হয়ত অনেকে ভাবিয়া থাকেন, ইংরেজী জানিলে সভ্যজগতের সমস্ত জ্ঞানই তাঁহাদের আয়ত্ত হয়; আর বাংলা জানিলে ভারতের অন্যান্য ভাষা না জানিলেও চলে—সেইজন্য আমরা অন্য ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে ততটা সজাগ নই। ফরাসী, জার্ম্মান, ল্যাটিন, গ্রীক, রুশীয়, নরওয়েজীয়ান ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকিলেও ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ঐ সকল ভাষার কিছু না কিছু বই বহু শিক্ষিত বাঙালী পাঠক নিশ্চয়ই পড়িয়াছেন, কিন্তু শতকরা একজনেরও ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা জানা আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন এমন হয়? আমার এক শ্রদ্ধেয় ফরাসী বন্ধু আমায় বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় তিনি ফরাসী ভাষা শিখাইবার জন্য ক্লাস খুলিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথম তাঁহার ক্লাসে আসিলেন নব্বই জন ছাত্র, কিন্তু একমাস যাইতে না যাইতে সংখ্যা কমিয়া দাঁড়াইল মাত্র পাঁচটি ছয়টিতে। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'মসিয়ে, ফরাসী শিখিলে যদি কিছু পয়সা আসিত তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইত অন্য রকম। বিত্তহীন ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত বাঙালী সন্তান পয়সা খরচ করিয়া ফরাসী শিখিতে আসিবে না।' এতো গেল বিদেশী ভাষার কথা।

ভারতের ভাষাগুলির উপর আবার আমাদের একটা তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার ভাব আছে। 'হিন্দী বা তামিল প্রভৃতি ভাষায় পাঠের যোগ্য কিই বা আছে' এ কথা অনেকেই বলেন। যদি হিন্দী বা তামিল জানিয়া আমরা এ ধরণের উক্তি করিতাম তাহা হইলে কতকটা শোভন হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত ভাষার অ আ ক খ না জানিয়াই অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী এই অনুদার মন্তব্য করিয়া থাকেন। ইহা কোন মতেই সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়।

হিন্দী ভাষা শেখা শিক্ষিত বাঙালীদের পক্ষে দরকার। ইহার প্রথম কারণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী ভাষা-ভাষীরা সংখ্যার দিক দিয়া সর্ব্বপ্রথম। প্রায় নয় কোটি লোক হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে। ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার বলিয়াছেন, পূর্ব্ব হিন্দী ও পশ্চিমী হিন্দী ভাগ করিলে অবশ্য হিন্দীর এ গৌরব থাকে না; তখন বাংলাকেই ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রাধান্য দিতে হয়; কারণ বাংলা পাঁচ হইতে ছয় কোটি নরনারীর কথ্য ভাষা। নয় কোটি নরনারীর কথ্য ভাষা হিন্দীকে ভারতের সাধারণ ভাষা বলিয়া চালাইতে যাওয়া অসঙ্গত দাবি বলিয়া মনে করা চলে না। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা বলিয়া চালাইতে চাহেন। এখন যে ইংরেজী চলিতেছে তাহার কারণ দেশের রাজা ইংরেজ; ইংরেজী সাহিত্যের গৌরব ইহার মুখ্য বা একমাত্র কারণ নয়। ভারত স্বাধীন হইলে ইংরেজের এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষার রাজনৈতিক প্রাধান্য যাইবে; তখন সভাকার্যের কৃষ্টিমূলক কাজ ইংরেজী ভাষার সাহায্যে করিবার প্রশস্ত সময় আসিবে। একজন ইংরেজ লেখক বলিতেছেন,

> "That English, even in an Indian form, can ever be more than a second language to the future educated classes of India, it is quite impossible to believe."

এই লেখক হিন্দী-উর্দ্দু-হিন্দুস্থানীকেই ইংরেজীর স্থানে বসাইতে চাহিয়াছেন।

হিন্দীশিক্ষার দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক। ভারতের একটা সাধারণ রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকা দরকার। এ প্রয়োজন বিদেশী ইংরেজী ভাষা মিটাইতে পারিবে না। গণতন্ত্রের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়া হিন্দীর স্থানই প্রথম। অবশ্য তাহার পরই আসে বাংলা। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী না হইয়া বাংলা হইবে ইহা বাঙালী চাহিতে পারে। নিজ ভাষার প্রতি বাঙালীর এই মমত্ববোধকে কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব বলা সমীচন নয়। শুধু সংখ্যাগুরুত্ব একটা আকস্মিক ব্যাপার; তাহার উপর নির্ভর করিয়া একটা বিরাট মানবগোষ্ঠির ভাষা চিরদিনের জন্য ঠিক করিয়া দেওয়া খুব সহজ কথা নয়। হিসাব করিয়া এই কাজ করা দরকার। কিন্তু যখন সমগ্র ভারতের জন্য একটি সাধারণ ভাষা স্থির করিতে হইবেই ও ইংরেজী ছাড়িতে হইবেই তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক যে-কোনও একটা ভাষা লওয়া চাই। যাহাই লই না কেন, অন্যান্য ভাষাভাষীরা ধুয়া তুলিবেন—'আমাদের ভাষা কম কিসে?' জাতীয় স্বার্থের কারণে সংখ্যার দিক চাহিয়া যদি আমাদের বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার আশা ত্যাগ করিতে হয় সে ত্যাগ স্বীকার মহত্বের পরিচায়ক। আমরা হিন্দী শিক্ষার জন্য বাংলার চর্চ্চা তো ছাড়িয়া দিতেছি না। প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ও সাহিত্যের ভাষা হিসাবে বাংলা থাকিবেই।

এইখানে আর একটি কথা বিচার্য্য। অনেকে বলিতে পারেন ভাষা লইয়া যখন এত গোল ও হিন্দী চলিলেও যখন কৃষ্টির তাগিদে আমাদের এক আধটা ইউরোপীয় ভাষা শিখিতেই হইবে তখন ইংরেজী ছাড়িয়া লাভ কি? ইংরেজী শিখিয়া লাভ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ইংরেজী আজও জাতির

বর্গে প্রবেশ করে নাই ও করিতে পারে না। ভাষার দিক দিয়া ইংরেজী সম্পূর্ণ বিদেশী; সে দিক দিয়া হিন্দী অতি সহজেই শিখিতে পারা যায় ও ইহার গঠন-প্রণালী অন্ততঃ ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবে। আর কৃষ্টির জন্য সকলেরই ইংরেজী, ফরাসী, রুশীয়, জার্মান প্রভৃতি ভাষার একটি বা দুইটি বা সম্ভব হইলে সব ক'টিই আয়ত্ত করিবার অধিকার থাকিবে। উপরোক্ত ইংরেজী লেখক বলিয়াছেন—

> "Every cultured man needs a second and perhaps a third foreign language—but he need not be bilingual. The unilingual have the advantage, and the bigger the cultural community in that language the bigger the language. As a first principle, pin your faith to the mother-tongue.

অর্থাৎ প্রতি কৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরই দুইটি বা তিনটি ভাষা জানা প্রয়োজন। অবশ্য দুইটি বা তিনটি ভাষা যে সমভাবে শিখিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত নয়। যাঁহারা এক ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহাদের সুবিধা অনেক; বিশেষতঃ সেই বিশেষ ভাষাভাষীদের সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহা হইলে তাহাদের সুবিধাও হইবে বেশী। প্রাথমিক নীতি হিসাবে স্বদেশী ভাষাকেই চালাইতে হইবে। আজকাল জ্ঞানবিজ্ঞান কোন সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া নহে, এজন্য দেশী ভাষাকেই জনসাধারণের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করাই উচিত। আজকাল দুইটি ধুয়া উঠিয়াছে—self-determination বা আত্মকর্তৃত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর সকল মানুষেরই সমান দাবি। এই উভয় কারণেও বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের কথা উঠিতেই পারে না। উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে—অথবা অঙ্কশাস্ত্র রসায়নবিদ্যা ইত্যাদির বেলাতেও—বিদেশী ভাষার প্রয়োজন নাই।

তৃতীয়তঃ, যে ভাষা সর্ব্বভারতীয় হইতে চলিয়াছে তাহার সাহিত্য কতখানি সমৃদ্ধ তাহা দেখা দরকার। বাঙালীর হিন্দী গ্রহণ ও ব্যবহারে এইখানেই ঘোরতর আপত্তি। আমি হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তবুও এ কথা বলিলে বোধ হয় দূষণীয় হইবে না যে বর্ত্তমান যুগের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র—কিন্তু প্রাচীন হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিশেষ পার্থক্য হইবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে একটি প্রদেশে এতগুলি বিরাট সাহিত্য-স্রষ্টার জন্ম অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। ইঁহাদের তুলনায় আধুনিক হিন্দীভাষার সাহিত্য-স্রষ্টারা নিশ্চয়ই মলিন হইয়া যাইবেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-স্রষ্টার জন্ম বিশেষ কোনো দেশে সীমাবদ্ধ নহে। যাহা আজ বাংলাদেশে ঘটিতেছে তাহা যে কাল বিহার বা যুক্ত প্রদেশে ঘটিবে না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বর্ত্তমানে অবশ্যই বাংলা ভাষা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা; কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহ্য কম গৌরবময় নয়; ইহার ভবিষ্যৎও হয় ত তুচ্ছ নয়। সুতরাং বাঙালী যদি রাজনৈতিক ভাষা হিসাবে হিন্দীকে গ্রহণ করে তাহা হইলে বাংলা ভাষার ক্ষতি নাই; অবশ্য সর্ব্বভারতীয় ভাষার গৌরব সে পাইবে না—ইহাই হইবে তাহার দুঃখের কারণ। কিন্তু হিন্দী ছাড়া সকল ভাষারই এই দুঃখ থাকিবে। আমরা যে আজ ইংরেজী ভাষা শিখিয়াছি তাহা রাজনৈতিক কারণে; তাহার স্থলে ফরাসী ভাষা শিখিলেও আমাদের যে বিশেষ ক্ষতি হইত তাহা মনে হয় না। আমাদের ইংরেজী শেখাটা আকস্মিক। সুতরাং হিন্দীও আকস্মিক ভাবেই সর্ব্বভারতীয় ভাষা হইতে চলিয়াছে, এ সম্বন্ধে দুঃখ করা চলে না।

চতুর্থ কারণ, প্রত্যেক সমৃদ্ধিশালী ভাষার মত হিন্দীর একটা নিজস্ব ঐশ্বর্য্য আছে। কৃষ্টির দিক দিয়া বা liberal education বা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থার দিক দিয়া সকল ভাষাই শিখিবার মত বস্তু। এই হিসাবেও হিন্দী সাহিত্য শিখিবার মত জিনিষ। ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হিন্দী সাহিত্যের মধ্য দিয়া খানিকটা হইয়াছে। অনেক সুখদুঃখের কাহিনী এই ভাষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই হিসাবে এই ভাষার একটা মর্য্যাদা আছে। ভারতীয় কোনও একটি ভাষা যদি আমরা শিখিতে চাই তো আমাদের পক্ষে হিন্দী শেখাই ভাল। ইহার যেমন একটা ব্যবহারিক দিক আছে তেমনি ইহার কৃষ্টিমূলক ও রাজনৈতিক দিকও আছে। অবশ্য ইহার মধ্য দিয়া বাঙালী যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টা করিবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। কেননা, যে ভাষায় আমরা হাসি-কাঁদি, ভালবাসি, সুখ-দুঃখের কথা বলি সচরাচর সেই ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকি। মনীষী আনাতোল ফ্রাঁস বলিতেন—Esperanto কখনই সাহিত্যের ভাষা হইবে না। হিন্দী ভাষায় বাঙালীর মনোভাবের প্রকাশ না হইলেও ক্ষতি নাই; ইংরেজীতেও আমাদের মনের যথাযথ প্রকাশ হয় না। তবুও আমরা ইংরেজী শিখিতেছি প্রয়োজনের তাগিদে। অবশ্য দুই এক জন মনীষী বা স্রষ্টা যেমন ভারতীয় হইয়াও ইংরেজী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন তেমনি ভবিষ্যতে কোন কোন বাঙালীও হয়ত হিন্দী লিখিয়া যশস্বী হইবেন। না হইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। হিন্দী শিখিলে বহু দিক দিয়া আমাদের লাভই হইবে। আজ বাঙালীর মনে রাখা কর্ত্তব্য হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষায় পরিণত করিবার যে আংশিক দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে তাহা তাহাকে বহন করিতে হইবে।

গৈরী দেশে

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

আমি তোমার মাটির যত অতিথ্
নহ বন্দনা মোর বীরভূমি,
তুমি বাংলা-মায়ের লক্ষ্মীর আসন
আছ অজয় নদের তীর চুমি'।

ওগো, দেখছ কি আজ মূর্ত্তি তব
মোর মরুতপন মরুচোখ,
তব লালআসনপল্লবতলে
আজ আমার জীবন ধন্য হোক।

শিরে নীল গগনের চন্দ্রাতপ ঐ
সাদা মেঘের ঝালোর ঝুলিয়েছে,
কোন্ শিল্পী তোমার গ্রামগুলিতে
নানা রঙের তুলি বুলিয়েছে।

হেথা ছোট্ট কুটীর শান্তিভরা
বুকে আ'ল্ বাঁধা ওই মাঠখানি,
যেন লাল সবুজের ওর্ণা টানা
দেছে হলদে সুতোর ছক্ টানি'।

দূরে নীল পাহাড়ের ঢেউতোলা ঐ
বুকে তালবনেরা অচঞ্চল,
যত কল্পলোকের গন্ধপরীর
সেথা সুন্দরেরি খাসমহল।

মধু ছন্দ এবং সঙ্গীতেরি
ওরে মর্ত্তেরি এই দেব-নিবাস,
করি নত মাটি নানুরেরি
যেথা পদ রচেছেন চণ্ডীদাস।

বধূ সুন্দরীরা পুণ্য হৃদয়
মাঠে স্বচ্ছশীতল দীঘির জল,
নিতি বৈকালেতে কুম্ভকাঁখে
ডাকে কুলবালারা জলকে চল্।

ওরে জয়দেবেরি ছন্দপুর এই
সারা বাংলা দেশের জয়কেতন,
জানে দম্পতিরা বাসতে ভালো
এ যে রামীর প্রেমের বৃন্দাবন।

আজো কেন্দুলিতে ছন্দ শুনি
পদ- পল্লবেরি বসন্তের,
ওগো তোমার বুকে যত তারাই
পে'ল স্পর্শ পদপল্লবের।

হেথা বক্রেশ্বর রুদ্রহরির
যেন ক্ষুদ্র রূপের নিদর্শন,
তার প্রস্রবণের উৎসার ঐ
যেন চক্র ঘোরায় সুদর্শন।

ওরে মন্দিরেরি চৌদিকে তার
আর করছি অবাধ রৌদ্রে স্নান,
মহা শ্মশান মাঝে শান্তিগভীর
খোলা ঊর্দ্ধে বিরাট পরিত্রাণ।

কোন্ শিল্পীমনের আলতাতে তোর
হ'ল টুকটুকে লাল পথখানি
যত সাঁওতালেরি দল চলেছে
পিঠে গৃহস্থালীর ঘর টানি'।

বুকে নেইক কোনো চিন্তাভীতি
তারা অল্পে খুশী হাল্কা মন,
হাসে প্রাণ খুলে' কি সাঁওতালীরা
সাথে বাজছে বাঁশী অনুক্ষণ।

ওরা বাঁশের বাঁশীর ছন্দ দিয়া
আজ করল সবার পথ রঙীন,
ওরে যাত্রাপথে যার বাঁশী নাই
এই জীবন তাদের ছন্দহীন।

তোরা আয় রে সব আজ পল্লীদুলাল
যত দুঃখ-বেদন ভাগিয়ে দে,
ওরে এদের মতন বাঁশীর গানে
সব ছন্দহারায় জাগিয়ে দে।

ওই ভুবনডাঙার মাঠখানি আজ
মোরে হাতছানি দেয় অবিশ্রাম
সেথা শান্তিনিকেতনের বুকে
জ্বলে বিদ্যাজ্ঞানের শান্তিধাম।

ওরে জগৎ-রবি এরই বুকে
তার ষাটটি বছর কাটিয়েছে,
ওরে হেথায় থেকেই বিশ্বসভায়
সে যে জয়ের লিপি পাঠিয়েছে।

যার এক কোঁটা পাদপদ্মরেণু
মেখে ধন্য হ'ল কবির দল,
ওরে যার জনমের ছোঁয়াচ লেগে
হ'ল বাংলা দেশ আজ লাল কমল।

এই মাটির বুকেই জন্মেছে যে
কত সিদ্ধ তাপস বীর তনয়,
সারা ভারতভূমির গর্ব্ব সে আজ—
এই রাঢ় মাটি তাই খর্ব্ব নয়।

ওরে দারুকা কোপাই ছোট্ট দু'ভাই
তীরে ধূসর বালুর আস্তরণ,
ওই স্বচ্ছ ময়ূরাক্ষী বুকের
চল্ হাল্কা জলে কর গাহন।

ওরে তার পরে চল শালবনে যাই
করি সেথায় গিয়ে প্রাণ শীতল,
সেথা তা   দু শালিক টিয়া
পাতা কোন্ উদাসীর শয্যাতল।

আজ এই জীবনের বৈকালী মোর
ওই গৈরী হিয়ায় পাতবে কোল,
এস গঙ্গাতীরের অতিথ হেথায়
মাগো পল্লীবালা দুয়ার খোল্।

প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা ঃ জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ গায়েনা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

অতীত গৌরবের দিনে ভারতবর্ষ ছিল বিশ্ব-সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছুরিত জ্ঞান এবং সভ্যতার আলোকরশ্মি বিশ্বের তমসাচ্ছন্ন দেশসমূহে সভ্যতার দীপশিখা জ্বালিয়াছিল। সুদুস্তর গিরিদরী অতিক্রম করিয়া ভারতীয় প্রচারকগণ দূরদূরান্তে অবস্থিত জনপদসমূহে সভ্যতার হোমানলশিখা প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন। সেই যুগে প্রবাসী ভারতীয়ের মর্য্যাদার আসন ছিল সর্ব্বজনস্বীকৃত।

তারপর কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তিত হইল। ভারতবর্ষ পরপদানত হইল। দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ জাতির প্রতিভা সুপ্তিমগ্ন হইয়া পড়িল। বিশ্বের দৃষ্টিতে সে মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হইল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আজিও বহু প্রবাসী ভারতীয় রহিয়াছেন। কিন্তু তে হি নো দিবসা গতাঃ। প্রবাসী ভারতীয়গণ আজ সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত, উপেক্ষিত এবং পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া থাকেন। ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচনের পূর্ব্বে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জ্যামেকা, গ্রেনাডা, ত্রিনিদাদ এবং ব্রিটিশ গায়েনাতে প্রবাসী ভারতীয়ের সংখ্যা ১৪০,০০০-এরও অধিক (১৯৩২ এবং ১৯৩৬।৩৭ সালের আদমসুমারি অনুসারে)। এই সমস্ত উপনিবেশের প্রত্যেকটিতেই প্রবাসী ভারতীয়গণ তত্রত্য অ-শ্বেতকায় জাতিগুলি যে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে, সে সমুদয় অধিকার ভোগ করেন। কিন্তু ত্রিনিদাদ, জ্যামেকা এবং ব্রিটিশ গায়েনা প্রবাসী ভারতীয়গণের ব্যবস্থা-পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকিলেও খুব অল্প-সংখ্যক ভারতীয়ই সেই সেই দেশের অন্যান্য অধিবাসীর সহিত সমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে দুই-চারি জন সম্পন্ন ভূ-স্বামী, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী ইত্যাদি না আছেন এমন নহে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের বৃহত্তর অংশই একান্ত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং নিরুপায়।

ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত বলিয়া এই সমস্ত উপনিবেশের প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদির প্রতি অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতীয় জনসাধারণ বা ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। স্বদেশ এবং স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন এই ভারতীয়দিগের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ভাষা-ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ আচার-ব্যবহার এবং চালচলনেও ইঁহারা সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। গ্রেনাডা এবং ত্রিনিদাদ প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় বা পূর্ব্বভারতীয় (East Indian) বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। তুলনীয়—

"The Hindu is an East Indian as much as the Moslem. Inter-racial marriages are very rare indeed. but marriages between Hindus and Moslems are quite common. In fact, if one were to be picked out by name and traced to his ancestor's community and told that he was either a Hindu or a Moslem, he might wonder at the distinction. Even the names do not matter, for instance, my parents are Hindus and one of my brothers is named Yusuf. Until I came to India I never knew that Yusuf was a Moslem name!"—Mrs. Narissa P. Singh (a Trinidad-born Indian) in *The Modern Review*. March, 1932.

একাধিক ধর্ম্মপ্রচারক এবং ধর্ম্মযাজক অভিযোগ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত উপনিবেশসমূহে প্রবাসী ভারতীয়-গণের নৈতিক আদর্শের মান বড়ই অবনত। ত্রিনিদাদ, জ্যামেকা এবং ব্রিটিশ গায়েনা প্রবাসী সহস্র সহস্র ভারতীয় শ্রমিক প্রকৃতপ্রস্তাবে সমঅবস্থাপন্ন অন্যান্য জাতীয় শ্রমিকের তুলনায় মোটেই অসৎ বা চরিত্রহীন নহে। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কর্ম্মহীনতা এবং বাসস্থানের অপ্রাচুর্য্যই ইহাদের প্রকৃত সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইলে তাহাদের নৈতিক আদর্শের মান স্বতঃই উন্নত হইয়া যাইবে।

১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিব ত্রিনিদাদ, জ্যামেকা এবং ব্রিটিশ গায়েনায় সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ রয়্যাল কমিশন' নিযুক্ত করেন। ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দেওয়া এবং প্রবাসী ভারতীয়দিগকে সাক্ষ্যদান বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও উপদেশ দেওয়ার জন্য জে. ডি. টাইসন সাহেবকে পাঠান হয়। ১৯৩৯ সালে টাইসন সাহেব ভারত-সরকারের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে ত্রিনিদাদ, জ্যামেকা এবং ব্রিটিশ গায়েনা প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা যথাযথ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট তথ্য প্রধানতঃ এই রিপোর্ট হইতেই আহরণ করা হইয়াছে।

জ্যামেকার অধিবাসী সংখ্যা ৮৫৮,১১৮। ইহার মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮,৬৬৯ এবং ১৪,৪৭৬ জন (১৯৩৬ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী)। ১৮৪৫ সালের প্রথম দিকে ৪০০০-এরও কিছু বেশী ভারতীয় শ্রমিক সর্ব্বপ্রথম জ্যামেকায় যায়। ইহাদের মধ্যে কোন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (Indentured Labourer) ছিল না। কয়েক বৎসর পর 'ইণ্ডেঞ্চার'-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

যে সমস্ত ভারতীয় অন্যূন দশ বৎসর কাল জ্যামেকাতে বাস করিয়াছে, তাহারা স্থানীয় অধিবাসীদের মতই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিলেও ত্রিনিদাদ এবং ব্রিটিশ গায়েনা-প্রবাসী ভারতীয়দিগের তুলনায় জ্যামেকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা শোচনীয়। এই দ্বীপের অধিবাসী অন্যান্য জাতি ভারতীয়গণকে

বহিরাগত এবং অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া মনে করে। আইন সভা, জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এবং যেখানে যেখানে জ্যামেকাবাসিগণ কর্তৃত্ব পরিচালনা করে সর্ব্বত্রই ভারতীয়গণের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। মিঃ টাইসন বলেন যে, জ্যামেকাতে ১২ জন ভারতীয় বণিক এবং অন্তবিধ সম্ভ্রান্ত বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্যক্তি আছেন কিনা সন্দেহ। প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে কোন শিক্ষক এবং সরকারী কর্মচারী নাই বলিলেও চলে। জ্যামেকার রাজধানী কিংষ্টনের বাহিরে কোন ভারতীয় নেতা বা প্রতিষ্ঠান নাই।

জ্যামেকা প্রবাসী ভারতীয়গণ প্রধানতঃ শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবী। জ্যামেকার সর্ব্বত্রই বেকার সমস্যা উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষিক্ষেত্রসমূহের প্রধানগণ (headmen) সাধারণতঃ অ-ভারতীয়। কাজ দিবার সময় ইহারা স্বভাবতঃই স্বজাতীয় শ্রমিকদিগের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া থাকে। ইহার ফলে অনেক ইক্ষু এবং কদলী ক্ষেত্রেই ভারতীয় শ্রমিকের অদৃষ্টে সপ্তাহে দুই দিনের বেশী কাজ জোটে না। এদিকে আবার কিংষ্টন মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক জল-সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শাক-সব্জী বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হওয়ায় যে সমস্ত ভারতীয় সব্জী উৎপাদন এবং বিক্রয় করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, তাহারা বৃত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। জ্যামেকার সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক হইলেও ভারতীয় বালক-বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬০জন লেখাপড়ার ধার ধারে না। পুস্তক এবং বিদ্যালয়ে যাইবার উপযোগী পরিচ্ছদ ক্রয়ের অসামর্থ্যই ইহার কারণ। তুলনীয় :—

"Inability to provide books and suitable clothings was a reason commonly given to me by poor Indian parents for not sending their children to school . . . I do not doubt its validity in many cases."—*Tyson Report.*

আইনের দৃষ্টিতে জ্যামেকা প্রবাসী ভারতীয়গণের কোন বিশেষ অক্ষমতা না থাকিলেও ১৯৩২ সালের হিসাবে দেখা যায় যে ১৮000 প্রবাসী ভারতীয়ের মধ্যে ৬০০ জনের নামও ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকায় স্থান পায় নাই ; ফলে একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতেও কোন ভারতীয় অথবা ভারতীয়দিগের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কোন নির্ব্বাচনপ্রার্থীর নির্ব্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জ্যামেকা প্রবাসী প্রায় সকল ভারতীয়েরই আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাদের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি পরিবার আছে (১৯৪০ সালের হিসাবে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৭৫০টি) যাহারা একেবারে নিঃস্ব। ইহারা এতই দরিদ্র যে পরিধেয় বস্ত্র এবং দৈনন্দিন আহার্য্যও ইহারা সব সময় জুটাইতে পারে না। মাথা গুঁজিবার জন্য মাটির ঘর ছাড়া আর কিছুই ইহাদের অদৃষ্টে জোটে না।

ত্রিনিদাদ একটি ক্রাউন কলোনি। ইহার মোট ৪১২,৭৮৩ অধিবাসীর মধ্যে ১৫৪,০৮৫ জন ভারতীয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়গণ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরূপে ত্রিনিদাদে আসে। ত্রিনিদাদ প্রবাসী ভারতীয়গণের আইন-পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে। হিন্দী বলিতে এবং লিখিতে পারিলেই তাহাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়।

ত্রিনিদাদ চিনি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ হইতে 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ রয়্যাল কমিশনে'র নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে মিঃ এফ্. এ. রবিন্‌সন বলেন—

"If an extension of franchise were granted in Trinidad, Indians would rule the country. Trinidad is not fit for any extension of franchise at present. There is solidarity only among Indians. The Indian supports an Indian for election and the Negro likewise a Negro, not because of his particular qualifications for a seat but just because he happens to be Indian or Negro."

অর্থাৎ ভোটাধিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইলে ভারতীয়গণ ত্রিনিদাদের ভাগ্যবিধাতা হইয়া দাঁড়াইবে। বর্ত্তমানে ত্রিনিদাদে ভোটাধিকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা সমীচীন হইবে না। কেবলমাত্র ভারতীয়গণের মধ্যেই একতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা আছে। নির্ব্বাচনকালে প্রার্থীর যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই ভারতীয় ভোটদাতাগণ ভারতীয় নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে এবং নিগ্রো ভোটদাতাগণ নিগ্রো নির্ব্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দিয়া থাকেন। ত্রিনিদাদের শ্বেতাঙ্গ ক্ষেত্রস্বামিগণ প্রবাসী ভারতীয় এবং অশ্বেতকায় জাতিসমূহকে কি দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন মিঃ রবিন্‌সনের উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

ত্রিনিদাদের মোট অধিবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয়। গবর্ণরকে বাদ দিয়া ইহার ব্যবস্থা-পরিষদে ২৫ জন সদস্য আছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১২ জন সরকারী কর্মচারী এবং ৬ জন সরকার-কর্তৃক মনোনীত। সরকারী এবং মনোনীত সদস্যদের মধ্যে একজনও ভারতীয় নাই। অবশিষ্ট ৭ জন নির্ব্বাচিত সদস্য। ইঁহাদের মধ্যে ৩ জন ভারতীয়, গবর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের (executive council) ৪ জন সদস্যের মধ্যে কেহই ভারতীয় নহেন। ভারতীয়গণ কোন বিশেষ সুবিধা বা অধিকার দাবি করিতে পারেন না। ক্রাউন কলোনি সরকার তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকার করিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন। তুলনীয় :—

"Indians neither desire nor demand preferential treatment. All they ask for is to be treated by Government with that consideration which their numbers and the important part they have played and continue to play in the colony's history, entitle them to expect."—
—*Memorandum of the United Body of Indians in Trinidad before the Royal Commission.*

কিন্তু সরকার বরাবরই প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ভারতীয় শ্রমিকদিগের বাসস্থানের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ব্যারাক-প্রথার বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। সরকারী চাকুরিতে নিয়োগকালে যোগ্যতা সম্পন্ন স্ত্রী এবং পুরুষ ভারতীয় প্রার্থীর দাবি বার বার উপেক্ষিত হইয়াছে। ব্রিনিদাদের অন্যান্য জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রদত্ত করের পরিমাণ অধিক এবং সংখ্যায় তাহারা জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ হইলেও সরকারী কর্মচারীদিগের মধ্যে প্রতি ২০ জনে ১ জনও ভারতীয় আছেন কিনা সন্দেহ। ব্রিনিদাদের শাসকসম্প্রদায় ভারতীয়গণের উন্নতিকে ঈর্ষ্যা এবং ভীতির দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। উপরে যে মিঃ রবিন্‌সনের কথা বলা হইয়াছে, একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"Thirty-five years ago there was not an Indian solicitor or Barrister. There was not one representative in the Legislative Council, there was not a doctor; in fact, the Indian was a drawer of water and the hewer of wood. But now to the great surprise and dismay of his people, the Indian is met in every single profession."

অর্থাৎ ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয়দিগের মধ্যে একজনও উকিল, ব্যারিষ্টার, চিকিৎসক, অথবা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন না। কিন্তু আজ তাহাদিগের মধ্যে দুই-চারি জন আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য দেখা যায়।

ব্রিটিশ গায়েনা আয়তনে প্রায় ইংলণ্ডের সমান হইলেও ১৯৩৭ সালের আদম সুমারি অনুসারে ইহার লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫৭,০৫৯। ইহার মধ্যে শতকরা প্রায় ৪২ জন অর্থাৎ ১৪২,৯৭৮ জন ভারতবর্ষ হইতে আগত। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৩৫ সাল হইতে ব্রিটিশ গায়েনা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক আমদানী করিতে আরম্ভ করে। কিঞ্চিদধিক শতাব্দী কাল মধ্যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বুদ্ধিসাধ্য বৃত্তিতে সফলতা লাভ করিলেও প্রবাসী ভারতীয়গণ এখন পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ইংরেজ মালিকের ইক্ষুক্ষেত্রে শ্রমিকের কার্য্য করে। নারিকেল, কফি, ধান এবং ইক্ষু ব্রিটিশ গায়েনার প্রধান কৃষি-সম্পদ। ইহাদের মধ্যে ইক্ষুই আবার সর্ব্বপ্রধান। কয়েক বৎসর হইতে ব্রিটিশ গায়েনার ইক্ষু-ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। পারিশ্রমিকের স্বল্পতার জন্য এবং কাজ জোটানো দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই প্রধানতঃ এই অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। অসন্তোষের আর একটি কারণ এই যে, শ্রমিকগণ ন্যায্য অভি-যোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অভিযোগকারী শ্রমিকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থানে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়।

ব্রিটিশ গায়েনার অধিবাসী ১৪২,৯৭৮ জন প্রবাসী ভারতীয়ের মধ্যে ৫৩,০০০-এর বেশী ইক্ষুক্ষেত্রে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সঙ্ঘবদ্ধ নহে বলিয়া ইহারা একান্তই দুর্ব্বল এবং সম্পূর্ণভাবে ক্ষেত্রস্বামীদিগের মুখাপেক্ষী। কর্ম হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে ইহারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্তভাবে কাল কাটায়। ১৯১৭ সালে 'ইণ্ডেঞ্চার' প্রথার বিলোপ সাধনের পর বহিরাগতদের তত্ত্বাবধানের জন্য যে সরকারী বিভাগ (Immigration Department) ছিল তাহা তুলিয়া দেওয়া হয়। শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন সরকারী ব্যবস্থা ব্রিটিশ গায়েনাতে নাই। শ্রমিকগণ সর্ব্ব বিষয়েই অনুন্নত এবং সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে একান্তই শক্তিহীন। ব্রিটিশ গায়েনার 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলন আজ পর্য্যন্ত শৈশব অতিক্রম করে নাই। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত 'লেবার ডিস্‌প্যুটস্ কমিশন'-এর রিপোর্টে বলা হয়,

"During our investigation, no resident estate labourers came forward voluntarily to give evidence. We believe the cause of this to be the fear of retaliatory action and possible eviction from house and subsistence plot, with but 3 days' notice, as provided under the Employers' and Servants' Ordinance, and the knowledge that no alternative means of earning a livelihood is readily available."

অর্থাৎ আমাদের তদন্তকালে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিক-দিগের মধ্যে যাহারা ক্ষেত্রে বাস করে, তাহারা কেহই স্বেচ্ছায় আমাদের নিকট সাক্ষ্য দিতে আসে নাই। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার ভীতি, বাস্তু এবং জীবিকার উপায় স্বরূপ জমি হইতে উৎখাত হওয়ার সম্ভাবনাই এইজন্য দায়ী। "এম্প্লয়ার্স এণ্ড সার্ভেণ্টস্ অর্ডিন্যান্সের" (Employers & Servants Ordinance) বলে মাত্র ৩ দিনের নোটিশ দিয়াই যে কোন শ্রমিককে তাহার অধিকৃত জমি হইতে উঠাইয়া দেওয়া চলে। শ্রমিক ভাল করিয়াই জানে যে জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন সহজলভ্য উপায় তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই।

সুসভ্য (!) বিংশ শতাব্দীতে ততোধিক সুসভ্য (!) ইংরেজ শাসনাধীন কোন দেশে মাত্র তিন দিনের নোটিশে কাহাকেও বাস্তু এবং অধিকৃত জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার আইন প্রচলিত আছে ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ব্রিটিশ গায়েনা ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহু দিন হইতেই ব্রিটিশ গায়েনাতে ভারত-সরকার কর্ত্তৃক একজন প্রতিনিধি (Resident Agent-General) নিয়োগের কথা বলিয়া আসিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত এই কথায় কর্ণপাত করা হয় নাই।

নানা প্রকার বিধিনিষেধের মধ্যেও ব্রিটিশ গায়েনা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। বার্ব্বিচের ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নিজেকে রাজ-নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান

বলিয়া মনে করেন। এসোসিয়েশন কর্তৃক একখানা মাসিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। ইযুক্তে নিযুক্ত ভারতীয় মজুরদিগের অবস্থায় উন্নতি সাধনের প্রতি এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ যত্নবান।

আইনের দৃষ্টিতে প্রবাসী ভারতীয়গণের ভারতীয় বলিয়াই কোন অক্ষমতা নাই এবং তাঁহারা আইন-পরিষদে ও মিউনিসিপালিটিসমূহের নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী। কিন্তু নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা একান্তই অপ্রচুর। ব্রিটিশ গায়েনার ব্যবস্থা-পরিষদের ১৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে তিন জন মাত্র ভারতীয়। ইহাদের মধ্যে এক জন গবর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। সত্যের খাতিরে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশবাসী ভারতীয়গণের তুলনায় ব্রিটিশ গায়েনা প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা সন্তোষজনক। কিন্তু একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ গায়েনাতে ভারতীয়গণের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্যমূলক এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে বর্ণবৈষম্যমূলক কোন আইন বিধিবদ্ধ না হইলেও ব্রিটিশ গায়েনার রাজনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের মতামতের কোন মূল্যই নাই।

কাব্য ও জীবন

শ্রীআশুতোষ সানাল

ভুল ক'রে ভেবেছিনু কাব্য বড়ো জীবনের চেয়ে।—
অলস কল্পনাস্রোতে সারাদিন তাই তরী বেয়ে
চলেছিনু অবিশ্রাম। অপরূপ স্বপন-কুহেলী
বিথারিয়া চারিপাশে—সংসারের সব অবহেলি'
গেঁথেছিনু ঘটা ক'রে ছটা-ভরা ছন্দের মালিকা
শূন্যগর্ভ যশোলোভে—লভিবারে দীপ্ত জয়টীকা
মৃত্যু দেবতার। আজি একা এই ধূসর সন্ধ্যায়—
এই ঝিল্লী-কলতানে কি গভীর বিষাদ ঘনায়
ভরি' চিত্ততল! হায়, জীবনেরে শুধু ফাঁকি দিয়া
ভাবের ভুবনে বসি' ভেবেছিনু দিব কাটাইয়া
নিরালায় দিনগুলি! অকস্মাৎ রক্ত-আঁখি দিয়া
শিয়রে আজিকে মোর ভীম রবে উঠে গরজিয়া
বাস্তব জীবন! ওগো নাহি দয়া—নাহি মায়া তার—
কল্পনার কুঞ্জবন মুহূর্ত্তেই করে ছারখার
অনল-নিঃশ্বাস তাপে। এ মোহন স্বপ্নজাল ছিঁড়ি'
তাই ভাবি একবার সংসারের মাঝে যাই ফিরি'—
উদ্দাম জীবনস্রোতে তীব্র বেগে পড়ি ঝাঁপাইয়া;
কবোষ্ণ প্রাণের সুরা আকণ্ঠ তৃষিতসম পিয়া
ধন্য করি মানব জনম! অয়ি চিরকুহকিনি,
নিখিলের কবিচিত্ত-রক্ত-কোকনদ-বিহারিণি,
এ অক্ষম অসহায় মৃত্যুধর্ম্মী মানুষের বুকে
যশোলিপ্সা-বাড়বাগ্নি নিশিদিন জ্বালি' সকৌতুকে।
এ কি তৃপ্তি তোর! বসি' মরণের সাগর-বেলায়
অমৃত-পিয়াসা মাগো, মোর কভু নাহি শোভা পায়
এ জগতে। তার চেয়ে লক্ষ কোটি মানুষের প্রায়
ক্ষুদ্র আশা-তৃষা নিয়ে এক প্রান্তে এ জীবন হায়,
যদি যেত কেটে কোনো স্নিগ্ধ শান্ত পল্লীবাট 'পরে
জীব-ধর্ম্ম পালি' শুধু গ্লানিহীন প্রসন্ন অন্তরে
চিরদিন! হে ঈশ্বর, ক্ষমা কর মোর অপরাধ—
জীবন-যৌবন-মধু—ভুলে যার লই নাই স্বাদ—
বারেক আমারে দাও। হায়, কল্পনার ছায়ালোক হ'তে
মুক্তি দাও—ফিরে দাও আজি মোরে বস্তুর জগতে!

খুলনার ইতিহাসে রণবিজয়পুর

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

বাগেরহাট শহরের অনতিদূরস্থ রণবিজয়পুর পল্লী খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দুর্দ্ধর্ষ মগজাতির বিহারক্ষেত্র। মগদের অত্যাচার-ভয়ে এ অঞ্চল এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদের দমন করিবার জন্য এবং দক্ষিণ প্রদেশে প্রজা-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, দক্ষ সৈন্যসামন্তসহ খানজাহান আলি দিল্লী হইতে এ দেশে উপস্থিত হন। দুর্দ্ধর্ষেরা নানাস্থানে তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করে। পিলজঙ্গ (পিল—হাতী, জঙ্গ—যুদ্ধ), ফতেপুর (ফতে—বিজয়, পুর—গৃহ) বিজয়পুর প্রভৃতি জনপদের সামরিক উপাধি এ উক্তির সমর্থক।

খানজাহান আলি অধিকৃত স্থানের যে অংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় নিদর্শনগৃহ নির্ম্মিত করেন উত্তরকালে তাহাই রণবিজয়পুর নামে আখ্যাত হইতেছে। গ্রামখানির পরিমাণ ফল ছয় বর্গ মাইল। প্রাচীন গণ্ডগ্রামের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্ত কাঁঠাল ও দীঘির পাড় নামে বর্ত্তমানে পরিচিত। এই গ্রামের প্রতি বস্তুই ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। কাঁঠাল গ্রাম খানজাহানের অমাত্য কামাল খাঁর কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এখানকার স্রোতস্বিনীসমূহের গতিপথ রুদ্ধ করিয়া তিনি মানুষের স্বচ্ছন্দ বাসোপযোগী ক্ষেত্র তৈয়ার করেন। ইহাদের চিহ্ন পল্লীবক্ষে অদ্যাপি বিদ্যমান। দীর্ঘ বক্রগতি বিস্তৃতগহ্বর পরিখা, গাজি নামে পরিচিত জলাশয়, গোপন্নপে নদীকঙ্কাল অতীত জলপ্রবাহের স্মৃতি জাগরূক করে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও আরব্য স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত গম্বুজযুক্ত কামাল খাঁর বাস-ভবন এবং প্রাচীর-বেষ্টনীর অস্তিত্ব ছিল। খনিত্রের আঘাতে সেই প্রাচীন কীর্ত্তি আজ বিধ্বস্ত। আভ্যন্তর ও বহিঃপ্রদেশস্থ জীর্ণকলেবর জলাশয় দুইটি গতবৈভবের সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। মসজিদ বাড়ীর পুকুর নামে ইহাদের এখন পরিচয়। মসজিদ বাড়ীর প্রাঙ্গণে একাধিক কবর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যত্নের অভাবে, সেগুলিও এখন বিপর্য্যস্ত।

সাত পুকুরিয়া চিহ্নিত নাতিবৃহৎ জলময় গভীর স্থান কামাল খাঁর বাপী-শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক। একই ভূমিখণ্ডে স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত সাতটি জলাশয় সাত প্রকার জলের আধার ছিল। ভুবনেশ্বরে এই জাতীয় 'তিন পুকুরিয়া' দৃষ্ট হয়।

কাঁঠাল গ্রামের শেষসীমায় কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রে শেতোর পুকুর, কেদোর পুকুর, পাটকে বমের পুকুরগুলির ক্ষীণ রেখা তাঁহার জলদান-কীর্ত্তি বিঘোষিত করে। নাথের পুকুর, ঠাকুরুণ তলার পুকুর, রমাই নাথের পুকুর, কার্ত্তিকের পুকুর, মুখুজ্যের পুকুর প্রভৃতি কামাল খাঁর সমসাময়িক হিন্দু-বসতি নির্দ্দেশক।

কামাল খাঁর বৃহৎ দীর্ঘিকা এ গ্রামের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহার পরিমাণ আট দশ বর্গ বিঘা। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে এটি এখন সংস্কৃত হইতেছে। কাটানি জারাণীর মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থান কোন পরিচারিকার বাসভূমির স্মারক। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি বিগত ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ। ইহার পার্শ্বস্থ কণ্টকলতাপূর্ণ ইষ্টকনির্ম্মিত পুরাতন রাস্তার কঙ্কাল, হস্ত্যশ্বাদি রাজোচিত যানবাহনাদির গমনাগমনের বিষয় সূচিত করে।

দীঘির পাড়ে খানজাহান আলি সাহেবের নিকট-আত্মীয়-গণের বাস ছিল। গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য তিনি পীর উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। খানজাহানের ঘনিষ্ঠ স্বজনগণও প্রায় সকলেই পীর বিশেষণে বিশেষিত। জেন্দাপীরের সহিত খান-জাহানের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কথিত আছে, খানজাহানের খুল্লতাত-ভ্রাতার জীবিতাবস্থায় কবর হয়। এ কারণ তাঁহার প্রকৃত নাম লুপ্ত হইয়া জেন্দাপীর হইয়াছে। ধর্ম্মকামী ব্যক্তিগণ অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় এই পবিত্র ক্ষেত্রে আত্মনিবেদন করেন, রোগমুক্তির জন্য মানত করেন, শান্তির আশায় ধন্না দিয়া থাকেন। পুষ্প, ধূপ, দীপ মিষ্টদ্রব্যে আত্মার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে কবরে পূজা দেওয়া হয়। সমাধি-মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে নমাজাদি হইয়া থাকে।

ন'গুম্বজ মসজিদ, দীঘির পাড় গ্রামের অন্যতম প্রধান গৌরব। এই সুরম্য হর্ম্ম্যতলে খানজাহান-সম্পর্কীয়েরা সুখে বাস করিতেন। সুদূর অতীতের ভাস্কর্য্য, কালের কঠোর হস্তে এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। বিবিধ কারুকার্য্যখচিত প্রাসাদ-গাত্র তৎকালের রুচিপ্রিয়তা ও শিল্পনিপুণতার পরিচায়ক।

স্বভাবজাত হ্রদসদৃশ সু-উচ্চ পাহাড়সম্বলিত ঠাকুর দীঘি একটি শ্রেষ্ঠ পুরা-গৌরব। মগদের উপাস্য দেবতা বুদ্ধ-বিগ্রহ এইস্থানে আবিষ্কৃত হয়। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর ন্যায় ঠাকুরদীঘির জল জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই নিকট পবিত্র। সু-সন্তান-কামনায় বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা নারীগণ ঠাকুরদীঘির জলে অবগাহন স্নান করেন—শুদ্ধচিত্তে পূজা ভোগ মানত করেন।

উত্তর তীরের পশ্চিম পার্শ্বে খানজাহান আলি-প্রতিষ্ঠিত ভজনালয়। আঙ্গিনায় তাঁহার পাচকের প্রস্তরময় শবাধার। একটির গাত্রে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের অনুকরণে প্রাচীন আরবী অক্ষরে কোরাণের পবিত্র বাণী লোকশিক্ষার্থ উৎকীর্ণ।

খানজাহানের সমাধিভবন সংরক্ষিত পুরাকীর্তিতালিকাভুক্ত গৃহটি ইষ্টক ও কৃষ্ণ-প্রস্তর সংযোগে নির্মিত। এই সমাধির উপরেও আরবী ভাষায় ধর্মনীতি খোদিত। গৃহবেষ্টনী কারুকার্য্যপূর্ণ। দুইটি সিংহদ্বার অতিক্রমণের পর মন্দির-প্রবেশদ্বার। প্রতি চৈত্রী পূর্ণিমায় এখানে একটি বিরাট মেলা হইয়া থাকে।

কয়েক শত বৎসরেরও অধিককালের বেষ্টনীর কতকাংশ এখনও অবিকৃত, অপরাংশ চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত। ইহার সান্নিধ্যে অপরাপর গৃহের ভগ্নাবশেষ অনেক গৃহত্যাগীর আশ্রয়-স্থল। সর্ব্বপ্রথম সিংহদ্বার জীর্ণদেহে দণ্ডায়মান। এখানকার অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপ কালের কুক্ষিগত।

রণবিজয়পুরের উত্তর সীমানায় ভৈরবের পরিত্যক্ত গহ্বর এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত। পদ্ম পুকুরিয়া নামক একটি বৃহৎ জলাশয় ইহাতে এক সময় সৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে দিন দিন ইহার আয়তন ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে।

গ্রামের প্রথমেই নারীর বাগ—খানজাহানের প্রিয় উদ্যান-বাটিকার স্মৃতি বহন করিতেছে। অধুনা এই স্থান সব্জী উৎপাদনের ক্ষেত্র। ইহারই অদূরে জলাশয়সম্বলিত দপ্তরদ মসজিদ। কিঞ্চিৎ ব্যবধানে আহম্মদ খাঁর দীঘি। গ্রামাভ্যন্তরে কাজি পরিবারের বাটির সান্নিধ্যে সমাধি-ক্ষেত্র।

অনুরূপ সাত পুকুরিয়া এখানেও বিদ্যমান ছিল। সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এখন একটি অনতিবৃহৎ জলাশয়ে পরিণত। ঠাণ্ডা পীরের কবর গ্রামের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

ইতিহাসজ্ঞগণের মতে রণবিজয়পুর খানজাহানের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্থানে স্থানে জলাশয় ও বাসগৃহচিহ্ন জনবসতি সূচিত করে। প্রধান প্রধান রাজপুরুষ অধ্যুষিত অংশের জলাশয়গুলি তাঁহাদের নামে পরিচিত।

খানজাহানের স্থপতিগণ সম্ভবতঃ গৃহরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একারণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জনপদে এই জাতীয় হর্ম্ম্যের বাহুল্য।

পুস্তক-পরিচয়

'নেতাজীর বাণী'—এম. সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১ সি কলেজ স্কোয়ার। পৃঃ ১৯২ + ১৯৩ ডবল ক্রাউন। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

সংকলন-গ্রন্থ। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত নেতাজীর বেতার-বক্তৃতা, বিবৃতি এবং ভারতের বাহিরের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য বইখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংকলন একেবারে সম্পূর্ণ কিনা বলা কঠিন, তবে সংগ্রাহকেরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন একথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে নেতাজীর বক্তৃতা, দ্বিতীয় খণ্ডে সংবাদপত্রের বিবৃতি ও মন্তব্য। সব শেষে দুইটি পরিশিষ্টে আই-এন্-এ, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি বিবৃতি আছে।

বইখানি যে একটি মূল্যবান সম্পদ হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। নেতাজী জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীদের আদর্শপুরুষ, বিশেষ করিয়া তাঁহাদেরই দৃষ্টিতে—যাঁহারা তাঁহারই মত আত্ম-প্রতিষ্ঠায় বাহুবলে বিশ্বাসী এবং স্বাধীনতা বিষয়ে কোনরকম আপোষেরই বিরোধী। ১৯৪২ হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়টা ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ; এই সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নেতাজীর অভিমত অতিশয় মূল্যবান, আর ভারতের বাহিরে পূর্ব-এশিয়ায় তাঁহার যা কীর্তি, আধুনিক ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তাহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। এই সব বিষয়ের একটি সময়ানুক্রমিক ইতিবৃত্ত বইখানিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে এই জাতীয় গ্রন্থের ভিত্তির উপর আরও পূর্ণতর ইতিহাস রচিত হইবে। বইখানি বাহির করিয়া সংগ্রাহকেরা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

'ফানুস'—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। মডার্ণ পাবলিশার্স; ৬ কলেজ স্কোয়ার পৃঃ ১৩৬। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

একটি ছুটির দিনের অভিজ্ঞতায় "ক্ষণদীপ্তিময় ফানুসের বাতি"র মত যাহারা খানিকটা আলো বিকীরণ করিয়া আবার বিস্মৃতিতে মিলাইয়া গেল, তাহাদের খণ্ড-কাহিনী গাঁথিয়া এই উপন্যাস। ঠিক উপন্যাস বলাও চলে না; কতকগুলি চরিত্র,—সুমিত্রা, রেখা, সীতা, সমীর, সুবল প্রভৃতি, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া কিছু সাধারণ, দিনগত-ঘটনা, তাহাদের জীবনদর্শন, আর এই সবের উপর এই একটি দিনের নায়ক অনুপমের মনের প্রতিক্রিয়া—এরই ইতিহাসকে যতটুকু উপন্যাস বলা যায়, ততটুকু।

দিনটি তেরশ' পঞ্চাশের একটি রবিবার। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, তাহার পাশেই যুদ্ধকৃত অর্থনীতির জন্য আয়েস বিলাসিতা—এক দিকে হাহাকার, দ্বারে দ্বারে "একটু ফেন দাও মা!" তাহারই পাশে মনে-ঘাঁটা-পড়া অসংস্কৃত সমাজের লঘুছন্দের জীবনযাত্রা—পার্টি, সিনেমা, নৃত্যবীথি, সাহিত্য, সঙ্গীত—"ঢেউয়ের মাথার ফেনার" ফুলের মতই ভাঙিয়া যাওয়া—তেরশ পঞ্চাশের বাংলার এই ছবি। বাংলার সমস্ত ইতিহাসে বাঙালী মৃত্যুকে বোধ হয় এমনভাবে আর কখনও ব্যঙ্গ করিতে পারে নাই, এমন হালকা-ভাবে, এমন কুৎসিতভাবে, এমন ভীষণভাবে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তবুও এ একটা অবস্থার, একটা দৈবদুর্বিপাকের পরিণতি মাত্র। তাই লেখক যেন একটা মার্জনার দৃষ্টিতে সব দেখিয়া গেছেন, একটা দরদের সঙ্গে সমস্ত কাহিনীটা বলিয়া গেছেন।

লেখাটি খুব ঝরঝরে, পরিচ্ছন্ন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট বড় অনেক কিছুই ঘটিল, কিন্তু কোথাও ঘটনায় ঘটনায় ঠোকাঠুকি নাই; মন্তব্যগুলি যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সহৃদয়, কড়ি-কোমলে সুন্দর। বইখানি যুদ্ধ-মহামারীর বাংলার একটি চমৎকার, অনাড়ম্বর আলেখ্য।

বইয়ের ছাপায় কয়েক স্থানে বিশ্রীরকম ভুল থাকিয়া গেছে, পাঠে বিঘ্ন ঘটায়; কাগজ, বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার পৃথিবী—শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। দি বুক সিণ্ডিকেট, ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। দাম—১৸৹।

দরিদ্র ঘরের ছেলেদের জীবনের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, উপার্জনের জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও কোনমতে বাঁচিয়া থাকা এই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই ধরণের কয়েকটি চরিত্র লইয়া আমার পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে। লেখক নবাগত, কাজেই সামান্য পরিসরে নূতন কিছু বলিতে পারিবেন সে আশা লইয়া উপন্যাস পড়িতে বসি নাই। পড়িতে পড়িতে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রথম আকর্ষণ—ঝরঝরে ভাষা। গল্প বলিবার বিশিষ্ট ভঙ্গীটুকুও ভাল লাগিল। সামান্য কথার মধ্যে প্রচুর ইঙ্গিত এবং সঙ্কীর্ণ 'আমার পৃথিবী'তে বহির্জগতের রশ্মি আসিয়া পড়াতে কাহিনী উজ্জ্বল হইয়াছে এবং পড়িতে কৌতূহল জাগে। পরাধীন দেশের ছেলেদের মনে যে সব প্রশ্ন জাগে, যে অনুভূতি প্রবল হইয়া উঠে—দক্ষ তুলিকাপাতে লেখক তাহা অবিকল প্রতিফলিত করিয়াছেন। কল্পনার উচ্ছ্বাসে ভাষা কোথাও ফেনিল হয় নাই, নূতন লেখকের পক্ষে এটি কম প্রশংসার কথা নহে। কাহিনীর পরিসমাপ্তি ভালই হইয়াছে, তবে গল্পের প্রারম্ভে নায়কের পরিণতি না দেখাইলে—ইহা পাঠকমনে গভীর রেখা টানিয়া দিতে পারিত। আর একটি বিষয়ে লেখকের অনবধানতা দেখা যায়। বানানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করা সত্ত্বেও—ষত্ব ণত্ব বিধি বহুস্থলে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে।

মেলুর পাঁচালী—শ্রীনির্ম্মল ভাই। ১৬ এ, ডক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

তোমাদেরই একজন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গল্প শুনিতে ভালবাসে বলিয়াই তাহাদের গল্প শোনানো ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। আর যে সব গল্প মুখে বলিয়া শ্রোতার মনোরঞ্জন করা সহজ—লেখার হরফে সেগুলি যে সম পরিমাণে আনন্দ দান করিবে—তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। বলিবার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীই শ্রোতৃ-মনোরঞ্জনের অন্যতম উপাদান। প্রশ্ন হইতেছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি ধরণের গল্প শুনিতে ভালবাসে? রাক্ষস দৈত্য ভূত প্রেত হইতে আরম্ভ করিয়া চুরি-ডাকাতি খুন-জখম এডভেঞ্চার প্রভৃতির কাহিনী তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। হাসি-কৌতুকের গল্পেও তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসে। নিতান্ত ঘরোয়া কথা—যেগুলি প্রতিদিন ঘটিতেছে—যাহাতে রঙের উগ্রতা নাই—ঘটনায় রোমাঞ্চ নাই—অবিশ্বাস্য অভিযানের নেশায় মশগুল হইয়া আহারনিদ্রা ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপার নাই—তেমন সাদাসিধা ঘটনাগুলিও—গল্পের আকারে শিশু-আসরে পরিবেশনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তবে এইগুলি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে পরিবেশিত হইলে গল্প এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা—দুইটি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। এইজন্য ঘরোয়া জিনিসকে ছেলেদের আসরে পরিবেশনের পূর্ব্বে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ছেলে-ঠকানো কতকগুলি সস্তা ঘটনাকে হাস্যরস বলিয়া চালাইয়া দিলে ছেলেরা হয়ত সাময়িক ভাবে আনন্দ পায়—হাসে, কিন্তু রুচি তাহাদের বিকৃত হইয়া যায়।

আলোচ্য বই দুখানি এই ধরণের সাদাসিধা ঘরোয়া কাহিনী। মেলুর পাঁচালীর গল্পগুলি বেতারে পরিবেশন-কালে ছেলেমেয়েদের ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন। গল্পগুলি হাল্কা কৌতুকরস মিশ্রিত। কিন্তু কোন কোন গল্পে কৌতুকরসই নাই, অযথা বাগাড়ম্বর প্রকাশ পাইয়াছে। তা ছাড়া গল্পাংশ কম থাকায় কাহিনীকে টানিয়া টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টায় কৌতুকও কেমন ফিকা হইয়া গিয়াছে। হাস্যরস পরিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য—কৌতুককর ঘটনার সন্নিবেশ, রঙ চড়া হইলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু কোন অংশে সে কাহিনী যেন অবাস্তব ও বাক্‌চাতুরী-ভরা না হয়। ছেলেরা কথার মারপ্যাঁচ ভালবাসে না—ভালবাসে গল্প। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া—প্রতিদিনকার সাধারণ ঘটনাগুলিকে একটু সাজাইয়া গুছাইয়া শিশু-আসরে পরিবেশন করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল বলা যায়।

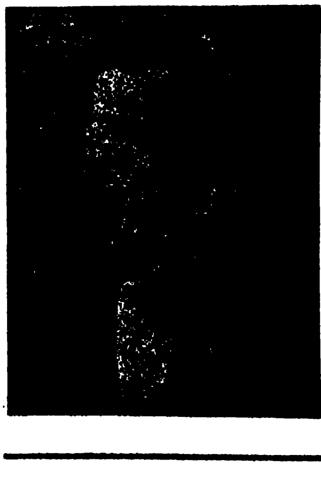
দ্বিতীয় বইখানি ছেলেদের জন্য লিখিত একখানি উপন্যাস। মানুষ হইবার জন্য একটি সহায়-সম্বলহীন ছেলের অদম্য অধ্যবসায় তার বিচিত্র জীবন-প্রবাহের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরল অনাড়ম্বর কাহিনী—ভালমন্দ কয়েকটি চরিত্রের সংমিশ্রণে ও ঘটনার সংঘাতে বিচিত্র ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য এই ধরণের সুস্থ ও স্বাভাবিক কাহিনী শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর পরপারে—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য। ইষ্ট্ভেন্টস্ লাইব্রেরী, ৭৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ৫৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ টাকা।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি নূতন ধরণের বই। প্রেতের দেহের ওজন, তাহার মাথার খুলি ও দাঁত, দুধ ও চা খাওয়া, গাছের ছালের কাপড় পরা, কাঠের বাড়ীতে বাস, গ্রহান্তরে ভ্রমণ, জওয়াহরলালের বক্তৃতা শোনা ইত্যাদি অনেক রোমাঞ্চকর বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলো-ধরণের বাড়ীতে আছেন, হিটলার ইংরেজী শিখিয়াছেন, ফ্লজেন্ট রেড্ ক্রসের কাজ করিতেছেন, বিবেকানন্দ ভলাণ্টিয়ার তৈয়ার করেন এবং অভেদানন্দ দুষ্ট প্রেতদিগকে শাসন করেন,—এ সব কথাও আমাদিগকে জানান হইয়াছে। আরও জানান হইয়াছে যে, প্রেতলোকে সিনেমা আছে কিন্তু ইংরেজী ছবি নাই, খেলার মাঠ আছে, স্ত্রীপুরুষের পৃথক বাস হয় এবং নরকে বড় শীত ও অন্ধকার। এই সব পড়িতে পড়িতে মনে হইবে ইহা কি প্রেততত্ত্ব না পুরাতত্ত্ব, গলিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত না অভিনব আরব্য উপন্যাস?

বিবেকানন্দ সারাজীবন অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিয়া এখনও



ব্রহ্মে লীন হন নাই, ইহা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের পরিপোষক নহে। আর, প্রেতেরা এখানকার নামগোত্র রক্ষা করিলে দেহান্তর প্রাপ্তি অস্বীকৃত হয়। তাঁহাদের তত্ত্ব প্রত্যক্ষলব্ধ বলিয়াই বোধ হয় প্রেত-তাত্ত্বিকেরা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলাইতে চেষ্টা করেন কদাচিৎ। শোনা বা দেখাটা সত্য হইলেই শ্রুত শব্দ বা দৃষ্ট বস্তু সত্য হয় না; এই সোজা কথাটা প্রেত-তাত্ত্বিকেরা সব সময় মনে রাখেন না। অথচ মনে করাইয়া দিলেও অসন্তুষ্ট হন। প্রেতে বিশ্বাস শোকে সান্ত্বনা দেয় নিশ্চয়ই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণে প্রমাণিত সত্য না-ও হইতে পারে। আমাদের এই সন্দেহের নিরসন কোন প্রেততত্ত্বের পুস্তকেই এখন পর্যন্ত পাই নাই।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন বাংলার গৌরব—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩২।৩৩ বৎসর পূর্বে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হয় তাহার সভাপতি হিসাবে স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বাংলা ও বাঙালীর নানা কীর্তি ও গৌরবের বিবরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় এই অভিভাষণটি পুনর্মুদ্রিত করিয়া অনতিপরিচিত ও অপ্রলভ একটি মূল্যবান বস্তু পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সরল ও অনন্যুকরণীয় রচনার সহিত পরিচিত হইয়া আধুনিক পাঠকসমাজ যথেষ্ট তৃপ্তি ও উপকার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

অজানা দেশের যাত্রী—শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

ইউরোপের যে দুর্ব্বার প্রাণশক্তি ও অনির্ব্বাণ জ্ঞানপিপাসা বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক গহনতম ও দুর্গম প্রদেশ আবিষ্কার করিয়া সমগ্র পৃথিবীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও জনবল আয়ত্ত করিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আপনাকে স্বীয় মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও জয়গৌরবে মণ্ডিত করিয়া বিশ্বজনের বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে, তাহার পূর্ণ রহস্য জানিতে হইলে এই বইখানি প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্যপাঠ্য। আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জ, ইহাদের দুর্গম ও গভীরতম প্রদেশও আজ ইউরোপীয়গণের অজানা নহে। মধ্যযুগের মার্কো পোলো হইতে আরম্ভ করিয়া ভাস্কো ডা গামা, কলম্বস, ম্যাগেলন, বালবোয়া, কোর্ডেস, পিজারো, হাডসন, লা সালে, মঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন, ক্যাপ্টেন কুক প্রভৃতি বরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের আবিষ্কার-কাহিনী গল্প ও উপন্যাস হইতে রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ। এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

হিন্দুর বাংলা—ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত এবং ৪৪নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে লেখক সেই সময়ে এই পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভঙ্গের আবশ্যকতা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মুস্লিম লীগ মন্ত্রী-সভার কু-শাসন যে সাময়িক ব্যাপার নয়, ইহা যে মুসলমানদের মনোবৃত্তির একটি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি লেখক তাহা এক রকম নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। *Tritton: The Caliphs and the Non-Muslim Subjects* পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"মিশরের ইতিহাসে দেখি—ইসলামের শাসন ছিল তার স্বরূপ।...দ্বিতীয় ওমরের সময় খ্রিষ্টদের সাজ পোষাকের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হইল। সরকারী চাকরী হইতে তাহাদের বিতাড়ন আরম্ভ হইল; জনতা গির্জ্জা ও মঠ লুণ্ঠনের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ ছিল। শাসনকর্ত্তার খেয়াল ও মর্জ্জি এবং মুসলমান জনতার উগ্রত ব্যবহার সহ্য করিয়া তাহাদের দয়ার উপর খ্রিষ্টদের জীবন যাপন করিতে হইত। বলিতে

কি, লোকের মনোভাব ছিল এই যে মুসলমানদের অপ্রয়োজনীয় উচ্ছিষ্টই হিন্দুদের পক্ষে যথেষ্ট।" কলিকাতা ও নোয়াখালীর ঘটনার সঙ্গে এই বর্ণনার মিল নাই কি?

আমরা সকল হিন্দুকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

ইহাই সত্য—শ্রীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। কমলা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫১। মূল্য তিন টাকা।

উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বেও লেখক বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন কিন্তু, আলোচ্য উপন্যাসখানি পড়িয়া হতাশ হইয়াছি। কতকগুলি অনাবশ্যক ঘটনা টানিয়া আনিয়া অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিলেই লেখক ভাল করিতেন। যথা, রমেশ প্রভৃতিকে 'টাইপ' চরিত্ররূপে সৃষ্টি করিতে গিয়া বহুস্থানে তিনি যে অস্বাভাবিক ও নগ্ন চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ঠিক সুরুচির পরিচয় দেয় না। বরুণা এবং লেখা এই দুইটি চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে যদিও তাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রসাদবাবুর লেখায় গতি বেগবান, বলার ভঙ্গীটিও ভাল কিন্তু তুচ্ছ কতকগুলি ঘটনাকে বাদ দিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারায় উপন্যাসের গতি অত্যন্ত শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ছাপায় সামান্য দোষত্রুটি আছে।০ প্রচ্ছদপট মনোরম।

অক্রুর সংবাদ—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৪ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅবনী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—কাত্যায়নী বুকষ্টল, ২০৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৸০ আনা।

গল্পের বই। বিশু মিস্ত্রীর ইঞ্জিন ডিপার্ট, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, গৃহিণীর নিষ্ঠা, ছিট মহল, পুরুষস্য ভাগ্যং, হাকিমের হ্যাপা, পুষ্পাঞ্জলি, বিমান আক্রমণ বিভীষিকা এই আটটি গল্প আছে। গল্পগুলিতে অনাড়ম্বর কাহিনীর মধ্য দিয়া নানাপ্রকার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস আছে। প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই চারিটি গল্প ভাল লাগিল। কিন্তু অবশিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিবার যথেষ্ট অবকাশ রহিলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই বলিয়া মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করে না। লেখক সাহিত্যের আসরে নবাগত হইলেও তাঁর ভাষা এবং বলার ভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। বিষয় নির্ব্বাচন প্রশংসনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সাতনরী—সম্পাদক শ্রীরাধাকিঙ্কর রায়চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থানঃ বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১।০ টাকা।

শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, রমেশ সেন এবং সম্পাদক স্বয়ং — এই সাতজন লেখকের সাতটি গল্পধারা এই সপ্তনরী হার গ্রথিত হইয়াছে। অন্নদাশঙ্করের ১৭১ হেনরিয়েটা রোড এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। যে সংযম এবং মাত্রাবোধ ছোট গল্পকে শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টির পর্য্যায়ে উন্নীত করে এই মিতবাক গল্পটিতে তাহার সার্থক পরিচয় রহিয়াছে। প্রবোধকুমারের দেবতার গ্রাস গল্পটিও ভাষার মাধুর্য্যে এবং বর্ণনা-চাতুর্য্যে পরম উপভোগ্য। কিন্তু লেখক শরৎচন্দ্রের প্রতি সুবিচার করেন নাই। তাঁহার যে গল্পটি এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, সেটি তাঁহার শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। নিজের গল্পটি বাদ দিবার প্রলোভন লেখক সম্বরণ করিতে পারিলে ভাল করিতেন, কেননা গল্পটিতে রস দানা বাঁধিতে পারে নাই। যাই হোক, লেখক নানা জায়গা হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের একটি সাজি পূর্ণ করিয়া গল্পামোদী পাঠকপাঠিকাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

রক্তের লেখা—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি একাঙ্ক নাটিকা। গ্রন্থারম্ভে 'নিজের কথা'য় লেখক জানাইয়াছেন, "১৯৪৬ ইংরেজীর ১১ই থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর কলকাতাকে চোখ দিয়ে অনুভূতি দিয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

তারই ছবি এই রক্তের লেখা।" "অনুভূতি দিয়ে প্রত্যক্ষ করা" কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে বিষয়বস্তু লইয়া সুন্দর একটি ছোট গল্প রচিত হইতে পারিত তাহাকে নাট্যরূপ দিতে গিয়া লেখক মূলেই ভুল করিয়াছেন, তদুপরি আড়ষ্ট সংলাপ নাটকের গতিকে পদে পদে ব্যাহত করিয়াছে। মাত্র ৬৮ পৃষ্ঠার পুস্তকে ছাপার ভুল, বানান এবং ইডিয়মের ভুল ৬৮টিরও অধিক। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণাশুদ্ধিমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—অনুভুতি, ক্রন্দন, নির্য্যাতীত, অদ্ভুত, পুঞ্জিভূত—ইত্যাদি। বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে থাকিয়াও যে লেখক বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু নাটক-রচনায় তাঁর আরও একটু সাবধানী হওয়া উচিত ছিল।

বাঁধ ভেঙে দাও—শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম লাইব্রেরি। ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ইতিপূর্ব্বে 'হে বীর পূর্ণ করো' এবং 'শব ও স্বপ্ন' নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়া শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী নাট্যকাররূপে বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। 'বাঁধ ভেঙে দাও' মাত্র তিনটি দৃশ্যে সমাপ্ত একটি একাঙ্ক নাটিকা। মন্মথকুমার সমাজ-সচেতন লেখক। যুদ্ধোত্তর বাংলার বিপর্য্যস্ত সমাজ-জীবন হইতেই তিনি বর্ত্তমান নাটকের উপকরণ আহরণ করিয়াছেন। ইহার পাত্রপাত্রীদের প্রায় সকলেই বাক্‌সর্ব্বস্ব। মুখে ইহাদের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠনের লম্বা-চওড়া বুলি, কিন্তু আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট দেশের ও দশের স্বার্থকে বলি দিতে ইহারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। নাট্যকার ইহাদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছেন এবং ইহাদের ভণ্ডামিকে তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন। অতুলানন্দ, চিত্তপ্রিয়, তমোনাশ প্রভৃতি এই নাটিকার অধিকাংশ পাত্রই টাইপ চরিত্র, কিন্তু নাট্যকারের চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্যে এবং বিশেষভাবে সংলাপ-রচনার কৌশলে, সেগুলি যেন রক্তমাংসের জীবে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্ষমতার পরিচায়ক। 'অনন্ত' এই মিথ্যাচারী স্বার্থপর পাত্রপাত্রীদের ব্যতিক্রম। ইহাদের ভণ্ডামির প্রতি তাহার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি যেন স্থানে স্থানে শাণিত তরবারির মত ঝকঝক করিতেছে। মানুষের প্রতি যে দরদ সকল রচনাকে সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সার্থক করিয়া তোলে নাটিকার উপসংহারে অনন্তের জবানীতে তাহার আবেগময় অথচ সংযত প্রকাশ পাঠকের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। গ্রন্থে সংযোজিত শ্রীমহেন্দ্রলাল সেনের গানটিও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

শত্রু পক্ষের মেয়ে—শ্রীমনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

এখানি লেখকের পরিকল্পিত যুগান্তর পর্য্যায়ের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জমিদারশাসিত প্রত্যন্ত প্রদেশের একটি নিপুণ আলেখ্য পাঠকের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সে যুগের বাঙালীর সঙ্গে এ যুগের বাঙালীর আকাশপাতাল পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বাহুতে শক্তি ছিল, সেকালের নীতি ছিল 'যার লাঠি তার মাটি।' সে যুগের আজ অবসান হইয়াছে, সেকালের মানুষগুলি আর নাই, শুধু তাহাদের কীর্ত্তি-কাহিনী লোকগাথায় আর অনাবিষ্কৃত ইতি-

হালের পাতার আত্মগোপন করিয়া আছে। মনোজবাবু সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মালক নদীকে আর তার তট-ভূমিকে পটভূমিকা করিয়া যে রোমান্টিক কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন তাহা এতই সত্য ও জীবন্ত হইয়াছে যে, মনে হয় যেন বাংলার সেই সকল বীর সন্তানরা আবার প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছে—সেই বিস্মৃত বিগত যুগ যেন তার সকল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিষ্ঠুরতা বীভৎসতা স্নেহ প্রেম আনন্দ বেদনা হিংসা যেন সব কিছু লইয়া আমাদের চমক লাগাইয়া দিয়েছে। সেকালের শিবনারায়ণ, নরহরি, কীর্তিনারায়ণ, সৌদামিনী, সুবর্ণলতার সঙ্গে বর্ত্তমানের বাঙালী স্ত্রীপুরুষের যেন মিল নাই, যুগান্তরে জীবনসম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের প্রকৃতি এ যুগে বদলাইয়াছে সত্য কিন্তু বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তো পরিবর্ত্তন হয় নাই, যুগে যুগে এক এক দল মানুষ সেই প্রকৃতির পটভূমিকায় এক এক ধরণের জীবনলীলার অভিনয় করিয়া যাইতেছে মাত্র। বাংলার মাঠ বন নদী ইত্যাদির বর্ণনায় মনোজ বাবুর হাত বড় নিপুণ। বর্ত্তমান পুস্তকের মালক নদী, চিতলমারি ও মাককাটির খাল, বটতাসির চক, ডাকাতের বিল ইত্যাদির বর্ণনা পড়িয়া বহু কাল পরে আবার নিসর্গ-চিত্রণে নিপুণ মনোজ বসুর মিঠা হাতের পরিচয় পাইলাম।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বুদ্ধলীলামৃত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী। বহরমপুর হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঝা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খঃ (৷৶০+২৬২) পৃঃ এবং ২য় খঃ (১৷৶০+ ৩০৩+ ৫৪) পৃঃ—মূল্য উল্লেখ নাই।

গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে বুদ্ধজন্ম হইতে তৎপুত্র রাহুলের সন্ন্যাস গ্রহণ এবং দ্বিতীয়খণ্ডে পিতৃব্যতনয় আনন্দের বৈরাগ্য হইতে ভক্তিমতী সুজাতার প্রতি উপদেশ পর্যন্ত তথাগতের পুণ্যজীবনকথা এবং তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম প্রচারের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয়খণ্ডের মুখপত্রে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে নবম অবতার শ্রীশ্রীভগবান বুদ্ধদেব ও তাঁর বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। ছন্দের দোষত্রুটি স্থানে স্থানে থাকিলেও তাহা বেশ সহজ এবং ধর্ম-পিপাসুদের প্রাণে আনন্দ পরিবেশনের উপযোগী বহুল তথ্যে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ : বাঁকুড়ায় হিন্দু-সম্মেলন

গত অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে বাঁকুড়া সহরে ৭, ৮ ও ৯ই বৈশাখ ডাক্তার শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট হিন্দু-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উৎসবের প্রথম দিবস জলবেদিয়া, তিলাবেদিয়া, সোনামুখী, কেন্দুয়াদিহি, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের মিলন-মন্দিরের সমবেত রক্ষীদলের এক সম্মেলনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলন চালাইয়া যাইতে আবেদন করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী অদ্বৈতানন্দজীও সভায় বক্তৃতা করেন। সঙ্ঘের সহ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী সম্মেলনে



ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত বাঁকুড়া মিলন-মন্দিরে রক্ষীদল পরিবৃত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বামে মিলন-মন্দিরের সভাপতি শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা, বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

ফটো— পি, দালাল

উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ সমাগত বিভিন্ন খেলোয়াড়দের লাঠি ও ছোরাখেলা প্রভৃতি আনন্দকামূলক ক্রীড়াদি পরিচালনা করেন। সম্মেলনে প্রায় দশ হাজার নরনারী উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভার বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিঃ আর. জি. মুখার্জ্জি

মিঃ আর. জি. মুখার্জ্জি এম-এসসি; এ, এম, আই, ই, ই, (লণ্ডন) সম্প্রতি আমেরিকান ইনষ্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জীনিয়ার্স নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বাংলা সরকারের অধীনে 'ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিং ডিপার্টমেণ্টে' ইলেকট্রিক্যাল এক্সিকিউটিভ এঞ্জীনিয়ারের পদে নিযুক্ত আছেন। মিঃ মুখার্জ্জি লণ্ডনে বিখ্যাত অধ্যাপক সিলিন এস. কয়টেসক্যুর নিকট ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জীনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বার্লিনে এবং নুরেমবার্গে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষালাভ করেন। 'মেসার্স ব্যাব্‌কক এণ্ড উইলকক্স লিমিটেড কোম্পানি'র টেষ্টিং ডিপার্টমেণ্টেও তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। দেশে ফিরিয়া কিছুকাল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারের কাজ করিয়াছিলেন।

মিঃ মুখার্জ্জি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্কস এণ্ড বিল্ডিংস ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করেন। অধিকতর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনমানসে কিছুকাল পরে তিনি পুনরায় য়ুরোপে গমন করেন এবং 'সাউথ-ইষ্ট ইংলণ্ড ডিষ্ট্রিক্ট অব দি সেণ্ট্রাল ইলেকট্রিক-সিটি বোর্ডে'র সহিত সংশ্লিষ্ট হন। 'ব্রিমসডাউন পাওয়ার ষ্টেশনে' তিনি আধুনিকতম প্লাণ্টসমূহ পরিচালনা সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেন। বহু বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মিঃ মুখার্জ্জি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জীনিয়ারিং সম্বন্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

এটম চরকা

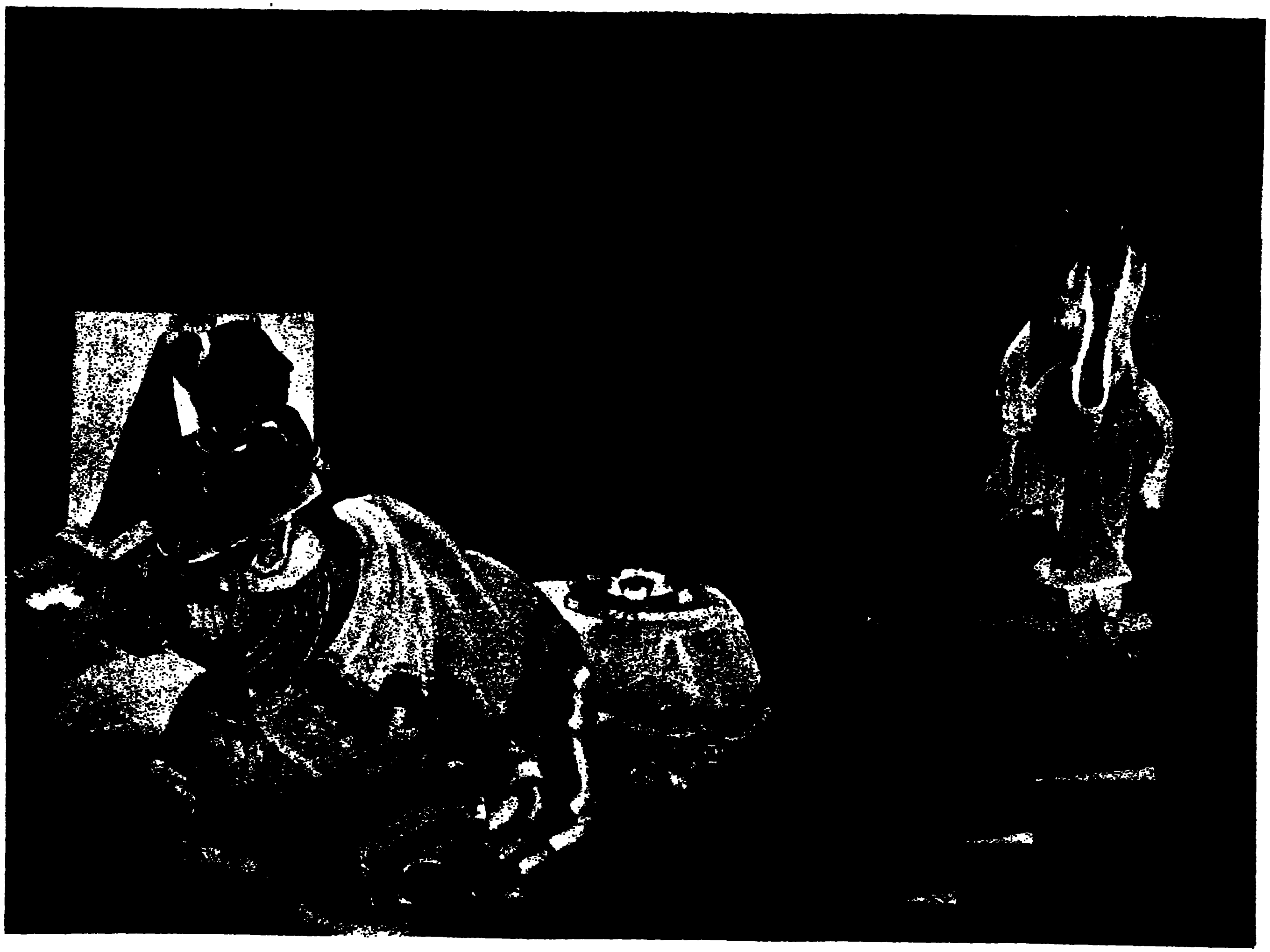
বিগত ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে এটম চরকা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চরকা ইতিমধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এটম চরকার আবিষ্কারক, মেদিনীপুরের বলগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক গান্ধীভবনের (কৃষ্ণনগর, বৈত্যা, মেদিনীপুর) রচনাত্মক কার্য্যের জন্যে এই চরকার নমুনার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে গান্ধীভবনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। দেশবাসী এই চরকা ব্যবহার করিলে নিজেরা উপকৃত হইবেন এবং গান্ধীভবনেরও সম্পদ্‌লভ্য বৃদ্ধি পাইবে। বুনিয়াদি শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে চরকা ব্যবহৃত হইলে এটম চরকা যে বিশেষ উপযোগী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক, বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক প্যারীমোহন সেনগুপ্ত সম্প্রতি একটি ট্রাম দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। প্যারীমোহন হুগলী জিলার অন্তর্গত গোপীনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কয়েক বৎসর প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। প্রবাসীতে তাঁহার বহু কবিতা এবং অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' নামক তাঁহার মনোরম শিশুপাঠ্য পুস্তকখানিও ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসীর 'ছেলেদের পাততাড়ি' বিভাগে প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সাল হইতে প্রবাসীর কাজ ছাড়িয়া প্যারীমোহন বঙ্গবাসী কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন। তিনি আমৃত্যু ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপক সেনগুপ্ত বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৌলিক কাব্যগ্রন্থ 'অরুণিমা' এবং মেঘদূতের অনুবাদ এক সময় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। তিনি কিছুকাল উদয়ন নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনও করিয়াছিলেন। তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী পরিচালনা করিতেন। মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। সম্প্রতি তিনি শিশুদের পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। মাত্র কুড়ি দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

পূজ ী
শ্রীনী িররঞ্জন সেনগুপ্ত



উপেক্ষিতা



ঝড়ের যাত্রী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৫৪ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার অবস্থা ও ব্যবস্থা

বাঙালীর ভাগ্যপরীক্ষার এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। অনেকের মনে এই ধারণা যে, এই অধ্যায়ের সঙ্গে বাংলার ও বাঙালীর সকল "ফাঁড়া" কাটিয়া গিয়াছে, আমাদের ভবিষ্যৎ এখন ক্রমেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইবে, সুতরাং অন্য সকল চিন্তা ছাড়িয়া প্রত্যেকের নিজের প্রাপ্য অথবা অপ্রাপ্য গণ্ডা আদায়ের চেষ্টা করাই যথাযথ কাজ। বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণায় অতি মারাত্মক ফল ফলিতে পারে। আমাদের নিকট ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার, এতদিনে পথ প্রদর্শনের জন্য একটি ক্ষীণ আলোকরেখা মাত্র দেখা দিয়াছে। আমাদের চতুর্দিকে বিপদ, সম্মুখে অতি কঠোর ও দুরূহ পথ, সহায়তা বা সাহায্যের আশা নাই বলিলেও চলে। উপরন্তু আমাদের ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন যাঁহারা বিষম বিপদের মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্থানে রহিয়া যাইবেন তাঁহাদের সাহায্য করার বিষয়, তাঁহাদের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করার বিষয় আমাদের ভাবিতেই হইবে, কেননা দুইটিই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপ সন্ধিক্ষণে উচিত ছিল যে দলাদলির কথা ভুলিয়া দেশের যোগ্যতম ব্যক্তিদের হাতে পথপ্রদর্শকের ও কার্য্যোদ্ধারের ভার দেওয়া। বাংলার কংগ্রেস তাহার বদলে ছেলেখেলা করিয়া "কালনেমীর লঙ্কাভাগ" করিয়াছে এবং কংগ্রেসের ঊর্দ্ধতম পরিষদ তাহাদের এই অপরূপ কীর্ত্তির সমর্থন করিয়া এই অভাগা দেশের বিপদ বাড়াইয়াছে ইহা আমরা বলিতেই বাধ্য। সম্প্রতি গণপরিষদ এবং মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস যে কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছে তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। বাংলার এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশের অপেক্ষা শতগুণে না হউক দশগুণ যোগ্যতর ব্যক্তি যে বাংলায় পাওয়া যাইত না একথা আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। প্রফুল্লবাবুর উচিত ছিল যে দেশের দারুণ সঙ্কট ও দুরবস্থার কথা ভাবিয়া, তাঁহার চেলাচামুণ্ডা ও চাটুকারবর্গের স্তোকবাক্যে না ভুলিয়া চতুর্দ্দিকে যোগ্য লোকের সন্ধান করা। তিনি তাহা না করিয়া যে পাপের পথে আজ চব্বিশ বৎসর চলিয়া বাংলার কংগ্রেস দেশকে ডুবাইয়াছে, সেই পথে চলাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন। দেশের মন ও দেশের হৃদয় এখনও ঠিক আছে, তাই শত কুকীর্ত্তি ও শত নীচ কাজ করা সত্ত্বেও দেশের লোক কংগ্রেসের ছাপ দেখিয়াই সকল কথা ভুলিয়াছে। কিন্তু আর কয় দিন পরে দেশের লোকে বুঝিবে যে অনেক মহাপ্রভুই 'ত্যাগ' ও 'কারাবরণে'র নামে দেশের নিকট হইতে কেবল গ্রহণই করিয়াছেন, যথার্থ দান বিন্দুমাত্রও করেন নাই। ত্যাগের সঙ্গে যদি কামনা থাকে, তপস্যার পিছনে যদি লালসা থাকে তবে সেই ত্যাগ বা তপস্যার মূল্য এক কপর্দ্দকও নহে, এ তো সহজ কথা। দেশের লোক এ কথা কখনও বুঝিবে না এরূপ ধারণা মূর্খতার পরিচায়ক। এতদিন এ দেশের যত দুঃখ-কষ্ট, যত বিপদ-আপদ তাহার দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের উপর চাপাইয়া যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্যে দারুণ অবহেলা করিয়াছেন, দেশের দুঃখকষ্ট মোচনের কোনই চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র ব্রিটিশ সরকারকে উচ্চকণ্ঠে গালি দিয়া এবং ব্যবস্থা-পরিষদে পুতুলনাচের মত ভোট নাচাইয়া নিজের বা নিজের দলের স্বার্থ চিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন, তাঁহারা ১৫ই আগষ্টের পর দেশের লোকের চোখে ধূলা দিবার কি আর নূতন ফন্দী বাহির করিবেন? প্রফুল্লবাবুর মত লোকের ঐরূপ ব্যক্তিদের কথায় ভুলিয়া তাহাদের সঙ্গে যাওয়া কি উচিত হইয়াছে?

প্রফুল্লবাবুর এবং তাঁহার প্রকৃত সহকর্মীদের উচিত ছিল গ্রামে, নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া দেশের লোকের মনে চেতনা-জাগৃতি আনিয়া দেওয়া। তাঁহাদের সম্মানের স্থান ছিল পথের ধূলায়, গ্রামের কাদায় ভরা বাংলার হৃদয়ে। মন্ত্রিত্বের আলেয়ার পিছনে তাঁহারা ছুটিলেন কেন? "যার কর্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে" এ প্রবাদবাক্য কি তাঁহারা কখনও শোনেন নাই? এই আলেয়ার মায়ায় পড়িয়া তাঁহারা যাহাদের গণপরিষদে পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের কোনও উপকার হইবে এ কথা যদি তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন তবে তাহা বৃথা। তাঁহাদের গঠিত মন্ত্রিসভার ক্ষমতা কি আছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। প্রফুল্লবাবুর দল যে আসনের লোভে পড়িয়াছিলেন, দেশের লোক তাঁহাদের তিলক-টিকা পরাইয়া সেই আসনে ছয় সপ্তাহের জন্য বসাইয়াছে। আশা করা যায়, ছয় সপ্তাহ পরে কিছু অভিজ্ঞতা লাভের পর সেই মোহমায়া কাটাইয়া তাঁহারা ঐ আসন ছাড়িয়া তাঁহাদের উপযুক্ত কাজে মন দিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন। দেশের এখন সমূহ বিপদ, যথাস্থানে যোগ্যতম ব্যক্তি না থাকিলে বিপদ ঘনীভূত হইবে। বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদে, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে, গণ-পরিষদে ও মন্ত্রিসভায় অযোগ্য, অকর্ম্মণ্য এমন কি অসৎ লোকে ভরিয়া যাওয়াতেই দেশের এই চরম দুর্দ্দশা। স্বাধীনতার আলো আসিবার পরও যদি ঐরূপ অবস্থাই থাকে তবে বাংলার ধ্বংস ও সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। বাস্তবিক বাংলাদেশের সর্ব্বনাশ তিন শত্রুতে করিতেছিল—ব্রিটিশরাজ ও লীগ দল প্রকাশ্যভাবে ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সকল ক্ষমতা দখল করিয়া যাহারা আছে তাহারা প্রচ্ছন্নভাবে। এতদিনে বাংলার এক অংশ দুই প্রকাণ্ড শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার পাইতে চলিয়াছে। এখন ঘরের শত্রু বিতাড়ন করিতে পারিলে, পরে দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবে।

গণপরিষদে বাংলার প্রতিনিধি

ভারতীয় গণপরিষদে পশ্চিম-বাংলা হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ কংগ্রেসকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন	শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ
শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র
শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত	শ্রীবসন্তকুমার দাস
শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন
শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান	শ্রীডম্বরুসিং গুরুং
ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়

মিঃ আর ই প্ল্যাটেল।

নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ পাকিস্থান গণপরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীধনঞ্জয় রায়	শ্রীপ্রেমহরি বর্ম্মা
শ্রীবিরাটচন্দ্র মণ্ডল	শ্রীহরেন্দ্রনাথ সুর
শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মজুমদার	শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী

শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ সান্যাল।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নূতন গণপরিষদের মোট ১২টি আসনের মধ্যে ১১টিতে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছেন।

গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে আগের বারের ন্যায় এবারও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। এবার আমাদের আপত্তির আরও বেশী কারণ আছে এইজন্য যে গণপরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব ভারতীয় ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর অত্যধিক রূপে বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান গণপরিষদই ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হইবে এবং নবরচিত রাষ্ট্রবিধি অনুসারে নূতন নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত এই পার্লামেন্টই বহাল থাকিবে। ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে যাঁহারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পার্লামেন্টারি কার্য্যে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান দুই জন ব্যতীত কাহারও নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে একজনের বিশ্বস্ততা মোটেই সন্দেহের অতীত নহে। পূর্ব্বে একাধিকবার দেখা গিয়াছে এই ব্যক্তি অতি গুরুতর সঙ্কটপূর্ণ ভোটাভুটির সময় কেন্দ্রীয় পরিষদে রহস্যজনক ভাবে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। এই ব্যক্তিকে বঙ্গীয় কংগ্রেস প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিলেন কিরূপে এবং কংগ্রেসের উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষই বা তাঁহাকে সমর্থন করিলেন কোন্ যুক্তিতে আমরা তাহা বুঝিতে অসমর্থ।

বাংলার অবস্থা বর্ত্তমানে নানা দিক দিয়া বিচিত্র। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তে পরিণত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বেই একটি শত্রুভাবাপন্ন ভিন্ন রাজ্য গঠিত হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান এগ্রিমেন্টের ফলে ভারত বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং আর বিরোধের কারণ নাই বলিয়া যাঁহারা স্বস্তিলাভ করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা বাস্তবজীবনের উর্দ্ধে ধূম্রলোকে বিরাজ করিতেছেন। ভারত বিভক্ত হইয়াছে এবং কংগ্রেস উহাতে সম্মতি দিয়াছে সত্য, কিন্তু মুসলিম লীগ যাহা লাভ করিয়াছে তাহা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে নাই। গত চল্লিশ বৎসরকাল ইংরেজের এজেন্টরূপে ভারতীয় স্বাধীনতার পথে কাঁটা দিয়া দেশদ্রোহিতার পুরস্কারস্বরূপ তাহারা ভারতবর্ষের ছয়টি সম্পূর্ণ প্রদেশ দাবি করিয়াছিল। ১৬ই মে তারিখের মন্ত্রীমিশন-ঘোষণায় তাহা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় লীগ দেশব্যাপী ভয়াবহ গুণ্ডামির সৃষ্টি করে এবং ভারতস্থিত ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের পরোক্ষ সমর্থনে উহা ভীষণাকার ধারণ করে। অতঃপর এই গুণ্ডামিকে রাজনৈতিক আন্দোলন রূপে স্বীকার করিয়া ইংরেজ ভারত বিভাগের করমূলা উপস্থিত করে এবং কংগ্রেস অনন্যোপায় হইয়া তাহা গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ তরা জুনের প্রস্তাবে আপাততঃ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু কোন এগ্রিমেন্টে আসে নাই। বাংলা ও পঞ্জাব বিভাগ লীগ-প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় নাই এবং লীগ-নেতা ও পত্রিকাদির পরবর্ত্তী বাক্যে ও লেখায় স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে পাকিস্থানের আয়তন বৃদ্ধির অভিপ্রায় তাহাদের রহিয়া গিয়াছে। তরা জুনের প্রস্তাব লীগ সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নাই কংগ্রেস ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু উহা পরিষ্কার করিয়া লইবার কোন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। ইহাতে ভবিষ্যতে লীগের পক্ষ হইতে গোল বাধাইবার পথ খোলা রাখা হইল।

লীগের মনোবৃত্তি যেখানে এই প্রকার সেখানে ভবিষ্যতে বাংলার সীমান্তে গোলযোগ এবং তৎসহ সমগ্র বাংলায় অশান্তির

সম্ভাবনা প্রবলভাবেই রহিয়া গেল। বাংলার স্বার্থ এখন আর তাহার একার নয়, ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য ভারত-সরকারের সহিত বাংলাকে সর্ব্ববিষয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই কার্য্যে বাংলা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিলে আমাদের ক্ষতি অনিবার্য্য। অবাঙালী নেতারা বাংলাকে সাহায্য করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিয়াছেন কি না আমরা তাহা জানি না, তবে এটুকু সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে বাংলার যে সব নেতা মেরুদণ্ডবিহীন তাহাদিগকেই ওয়ার্কিং কমিটিতে বসাইয়া প্রতিষ্ঠাদানের চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, শক্ত লোককে দূরে রাখিয়াছেন এবং যে সব লোক দলগত চক্রান্তের সাহায্যে বঙ্গীয় কংগ্রেস মুষ্টিগত করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদেরই কুপরামর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট এখন প্রায় দুই বৎসর কাজ করিবে এবং বাংলার ভাগ্য অনেক বিষয়ে এই পার্লামেণ্টে নির্দ্ধারিত হইবে। বাঙালীর জীবনের এই পরম সন্ধিক্ষণে যেখানে সামান্য দুই-এক জন ছাড়া এমন একদল লোক পাঠান হইয়াছে যাঁহারা জীবনে চরকা কাটা এবং মাঝে মাঝে জেলখাটা ছাড়া আর কিছু করিয়াছেন অথবা পৃথিবীর কোন সংবাদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীসভা

গবর্ণরের বক্তৃতার পরদিন পশ্চিম-বাংলার জন্য একটি সাক্ষীগোপাল মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং মন্ত্রীদের নাম প্রকাশিত হয়। উহা এইরূপ :—

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—স্বরাষ্ট্র—
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন
শ্রীকমলকৃষ্ণ রায়—সমবায়, পূর্ত্ত ও সাহায্য
শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা—ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দপ্তর—
ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমিক
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—শিক্ষা, সেচ ও জলের কল
শ্রীরাধানাথ দাস—সিভিল সাপ্লাই
শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—আইন ও বিচার
শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—কৃষি, মৎস্যচাষ ও বন
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব ও কারাগার।

মন্ত্রীদের নামের তালিকায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম আছে কিন্তু তিনি বর্ত্তমানে আমেরিকায়। যে সকল সর্ত্তে এই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে তাহা জানিবার পর ডাঃ রায় সাক্ষীগোপাল রূপে বারোজ ও সুরাবর্দীর তাঁবেদারী করিতে রাজী হইবেন কি না সে সম্বন্ধে দেশবাসীর যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নাম বাদ যাওয়ায় দেশের লোক গভীর বিস্ময় অনুভব করিয়াছে। মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি বলেন, "এই সন্ধিক্ষণে আমি ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে আমাদের সহকর্ম্মী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি রাষ্ট্রপতির সম্মতিতে যে সকল সর্ত্তে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সম্মত হইয়াছি সেই সকল সর্ত্ত তিনি গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই।" ডাঃ ঘোষের এই উক্তির পরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ কেন মন্ত্রীসভায় যোগ দান করিতে পারিলেন না তাহা জানাইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :—

"প্রদেশের শাসন ব্যাপারে সরাসরি কর্তৃত্ব না থাকিলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল জনসাধারণের কোন কল্যাণই করিতে পারিবেন না। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্তৃত্ব লীগ মন্ত্রীদের হাতেই থাকিবে। শাসন ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিগণ শুধু সুপারিশ করিতে পারিবেন। কোন বিষয়ে মতানৈক্য হইলে উভয় মন্ত্রিসভার যুক্ত বৈঠকে মীমাংসার চেষ্টা করা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে উভয় মন্ত্রিসভাই দলগত ভিত্তিতে ভোট দিবেন। ফলে গবর্ণরই কার্য্যতঃ সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিবেন।

নীতি নির্দ্ধারণ সম্পর্কীয় ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা যে সিদ্ধান্তই করুন না কেন, তাহা কার্য্যকরী করিবার ভার লীগ গবর্ণমেণ্টের উপর পড়িবে।

শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী এখানে সমগ্র বাংলার উপর কর্তৃত্ব করিবেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের শাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারে নূতন মন্ত্রিসভার কোনই কর্তৃত্ব থাকিবে না। এই ব্যবস্থা শুধু অদ্ভুত নহে, ক্ষতিকরও বটে।

কি ভাবে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্নীতিমূলক শাসনযন্ত্রের কবল হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় বাংলার জনসাধারণ বিশেষ করিয়া কলিকাতার অধিবাসীদের সম্মুখে ইহাই প্রধান সমস্যা। সরাসরি ক্ষমতার ধারক না হইয়া কোন নূতন মন্ত্রীই এই সমস্যার সমাধান করিয়া বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির অবসান করিতে পারিবেন না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে দুইটি দাবী উত্থাপন করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে যদি উভয় মন্ত্রিসভার মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শ করিয়াই গবর্ণরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হইবে। প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রী এবং নাগরিক বিনা দ্বিধায় এই ধরণের শাসনতান্ত্রিক অধিকার দাবি করিবেন। গবর্ণর স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া বিষয়টিকে পরিষ্কার করিতে পারেন, অথবা ডাঃ ঘোষ তাঁহাকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করিতে পারেন।

যত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যৌথ শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে তত দিন পূর্ব্ববঙ্গের শাসন-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা

পরামর্শ দিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি সুবিচার করা হইবে এবং দুই মন্ত্রী-সভার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহাও তিরোহিত হইবে।

ক্ষমতাহীন যে দায়িত্ব, তাহা অর্থহীন এবং ইহাতে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কাহারও নিকট আমরা স্বাধীনতা ভিক্ষা করিতেছি না। বাংলার জনমত আমাদের পিছনে রহিয়াছে, কাজেই কাহারও সাধ্য নাই আমাদের দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নিখুঁত হইবে এমন আশা কেহই করে না; তবে আমাদের দাবি, বাংলার উভয় অংশের প্রতিই ন্যায়বিচার করিতে হইবে এবং উভয় অঞ্চলের দুই মন্ত্রিসভাকে সমমর্যাদাসম্পন্ন করিতে হইবে।

বাংলার বহু শোচনীয় ঘটনাবলীর নায়ক মিঃ সুরা-বর্দীকে এখনও বাংলার প্রধান মন্ত্রী পদে রাখা হইয়াছে; প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ হওয়া উচিত। বাংলার যে অংশ সুরাবর্দী ও তাঁহার মন্ত্রিসভার উপর প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই অংশের শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের কর্তৃত্বের কোনই অধিকার নাই। পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার এই অঞ্চলের জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতেই তুলিয়া দেওয়া উচিত।

গবর্ণর, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই তিন জনের কথা হইতে দেখা যাইতেছে ডাঃ ঘোষ নিম্ন-লিখিত সর্তগুলি জানিয়া শুনিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন:

(১) পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা স্বতন্ত্র ক্যাবিনেটরূপে স্বীকৃত হইবে না, মিঃ সুরাবর্দীকে প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার ক্যাবিনেটের বৈঠকে যোগদানের এবং শুধু পশ্চিম বঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার অধিকার মাত্র তাঁহারা পাইবেন।

(২) লীগমন্ত্রীদের পশ্চিমবঙ্গের উপর পূর্ণ এক্তিয়ার থাকিবে কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পূর্ব্ব-বাংলার হিন্দুদের সম্পর্কে একটি কথাও বলিবার অধিকার থাকিবে না।

(৩) লীগ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মিলিত বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে ডাঃ ঘোষ উহা গবর্ণরকে জানাইতে পারিবেন, গবর্ণর উহাতে সালিশী করিবেন। অর্থাৎ ডাঃ ঘোষকে ফাইল লইয়া মিঃ সুরাবর্দীর নিকট দাঁড়াইতে হইবে, তিনি উহা গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া ফেরত দিলে কংগ্রেস প্রতিনিধি ডাঃ ঘোষকে তৃতীয় শ্রেণীর মনোবৃত্তিসম্পন্ন একজন ইংরেজের নিকট গিয়া ন্যায়বিচার ভিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) নিজ দায়িত্বে কোন কাজ করা গবর্ণর বারোজ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং 'আন্-কনষ্টিটিউশনাল' বলিয়া মনে করেন, বিশেষতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে, এই যুক্তিতে তিনি ৯৩ ধারা প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেন না কিন্তু মিঃ সুরাবর্দীর সহিত ডাঃ ঘোষের মতভেদ হইলে ডাঃ ঘোষের এলাকা সংক্রান্ত ব্যাপারে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। মিঃ সুরাবর্দী এবং অন্যান্য লীগ মন্ত্রীদের পরামর্শ লাট বারোজ গ্রহণ করিবেন কিন্তু ডাঃ ঘোষ বা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ডাঃ ঘোষ এই সর্ত্তে সম্মত হইয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন এবং আচার্য্য কৃপালনী ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

(৫) ডাঃ ঘোষ এবং তাঁহার সহকর্মীর দল নীতিগত প্রস্তাবমাত্র করিতে পারিবেন, শাসনযন্ত্র পরিচালনায় তাঁহাদের হাত থাকিবে না। তাঁহাদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন মিঃ সুরাবর্দীর দল। 'প্রস্তাব বিবেচনাধীন' বলিয়া উহা দেড় মাস ফাইল চাপা দিয়া রাখিয়া দিলে ডাঃ ঘোষ কি করিবেন তাহা উল্লেখ করা হয় নাই।

(৬) পশ্চিমবঙ্গের কোন সরকারী কর্মচারীর নিয়োগ এবং বদলীর উপর ডাঃ ঘোষের কোন হাত থাকিবে না। কলিকাতার পুলিস কমিশনার পরিবর্ত্তন অথবা পাঞ্জাবী পুলিস অপসারণের ন্যায় বড় কাজ ত দূরের কথা, একটি থানা অফিসার পরিবর্ত্তন সম্পর্কেও তাঁহাদের হাত থাকিবে না ইহা মানিয়া লইয়াই ডাঃ ঘোষ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং রাষ্ট্রপতি কৃপালনী উহাই অনুমোদন করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষের দলের প্রধান সাফাই এই যে, তাঁহারা লীগ মন্ত্রীদের ছায়ারূপে সেক্রেটারিয়েটে যোগদান না করিলে এই দেড় মাসে আরও ক্ষতি হইত। যুক্তিটা লীগের নিকট ধার করা, তাঁহাদের নিজস্ব নয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লীগ মন্ত্রীরা সদর্পে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা মন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে চাউলের মণ একশো টাকা হইত। বাংলার দুর্ভিক্ষে অর্দ্ধকোটি লোকের মৃত্যুর জন্য যে ব্যক্তি দায়ী, গত আগষ্ট মাস হইতে যাহাদের অত্যাচারে হাজার হাজার লোক আততায়ীর হাতে নিহত ও আহত হইয়াছে, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, শত শত নারীর সতীত্ব নাশ হইয়াছে, সেই দলের অধীনে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে গেলেন কেন ইহা জানিতে চাহিবার অধিকার দেশবাসীর অবশ্যই আছে। আমরা না গেলে আরও ক্ষতি হইত এ কথা কেহ শুনিবে না। লীগ অসংখ্য জরুরী সরকারী ফাইল সরাইতে পারে, হয় ত সরাইতেছে, তাহাদের কুকীর্ত্তির সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপ করিবার জন্য। ইহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা ডাঃ ঘোষের নাই। কলিকাতায় মুসলমান দারোগা এবং পাঞ্জাবী পুলিসের অত্যাচার যেমন চলিতেছিল তেমনি এখনও চলিতেছে, ইহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা আবার যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা তো বহু দূরের কথা, তাহাদের সম্পর্কে কোন কথাটি পর্য্যন্ত বলিবার

অধিকার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা উপরোক্ত ঘোর অপমানজনক সর্ত্তগুলি মানিয়া লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলেও ইহাই চলিত, বড় জোর কলিকাতায় আর দেড় মাস গোলযোগ থাকিত।

মন্ত্রী-নির্ব্বাচন পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের নাম দেখিয়া আশঙ্কা হইতেছে যে কংগ্রেস-নেতারা বোধ হয় মন্ত্রী-সভা দখলকেও কংগ্রেস কর্ম্মিদের সমপর্য্যায়ে ফেলিতে চাহিতেছেন। তালিকায় ডাঃ বিধান রায়ের নাম দেখিয়া 'দৈনিক বসুমতী' উহাকে 'গোবরের নৈবেদ্যের উপর ভীমনাগের সন্দেশে'র সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরা অবশ্য এতটা করিতে চাহি না।

মন্ত্রীদের নাম দেখিয়া দেশের লোকে স্বভাবতঃই জানিতে চাহিবে যে যোগ্যতার কোন্ মাপকাঠি অনুসারে এই নয় জনকে বাছাই করা হইল? ইঁহারা কংগ্রেসসেবক এবং গান্ধীবাদী, কংগ্রেসের আদেশে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছেন। তাহার কাজে ইঁহারা সামান্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন কিন্তু সভার কাজে দেখাইতে পারেন নাই। ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ নিখিল-ভারত গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের অন্যতম অধিনায়ক। উক্ত সঙ্ঘের অর্থবলের অভাব নাই। তাঁহার পরিচালনায় এই সঙ্ঘের সাহায্যে বাংলার কয়টি গ্রামের দুঃখ ও দুর্দ্দশা আংশিক ভাবেও মোচন করা হইয়াছে তাহা তিনি বলিবেন কি? আর যাঁহারা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একজনও গঠনমূলক কার্য্যে প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। চরকার নাম করিলে চলিবে না। খদ্দর তাঁহারা পরেন, কিন্তু চরকা তাঁহারা নিজেরাও গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ২৫ বৎসরের প্রাণান্তকর চেষ্টা ও কোটি কোটি টাকা অর্থব্যয়েও দেশবাসীকে চরকা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই।

গঠনমূলক কার্য্যে প্রতিভার বিকাশ যদি ইঁহাদের নির্ব্বাচনের কারণ না হয় তবে কি ত্যাগ ও দুঃখ বরণের দাবিতে ইঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন? যদি তাই হয়, তবে উহারই বা মাপকাঠি কি? জেল খাটার সময়কে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের পরিমাপ-স্বরূপ ধরা হইলে কি একমাত্র উঁহারাই তাহাতে উত্তীর্ণ হন? এমন তো বহু লোক রহিয়াছেন যাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে গিয়াছিলেন এবং ২৫ বৎসর সেখানে কঠোরতম বন্দীজীবন কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা তবে মন্ত্রীপদে গৃহীত হইলেন না কেন? ব্যক্তিগত কারাবরণের মাপকাঠিতে মাপিলে দেখা যাইবে মন্ত্রী যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহাদের চেয়ে বেশী জেল খাটিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এমন বহু লোকই বাদ পড়িয়া গিয়াছেন।

তবে কিসের মাপকাঠিতে এই মন্ত্রিনির্ব্বাচন হইয়াছে, দল—না উপদল? কেন্দ্রে কংগ্রেস অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্মেণ্টে যোগদান করিয়াছেন, উহাতে কংগ্রেসের বাহির হইতে উপযুক্ত লোক গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলায়ও কি ঐরূপ হইতে পারিত না। কংগ্রেস নিজের হাতে প্রধান মন্ত্রীর পদ এবং ক্যাবিনেটে মেজরিটি রাখিয়া বাহির হইতে তিন-চার জন উপযুক্ত লোক কি লইতে পারিতেন না? মন্ত্রিসভার প্রধান কর্ত্তব্য শান্তি-রক্ষা এবং দেশের লোকের দুঃখমোচন। এই কর্ত্তব্যপালন যে পদ্ধতিতে করিতে হইবে তাহার সহিত কংগ্রেসের এতাবৎকালের কার্য্যপদ্ধতির কোন মিল নাই। বাংলার মন্ত্রী-সভায় স্বরাষ্ট্র সচিবরূপে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষাসচিবরূপে ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অথবা অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অর্থসচিবরূপে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতিকে পাইলে দেশবাসী সন্তুষ্ট চিত্তে মন্ত্রিসভাকে নিজস্ব গবর্মেণ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত। বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাহা করিতে পারেন নাই, দেশের জন্য আজীবন ত্যাগ ও দুঃখবরণের গৌরব যাঁহারা দাবি করিয়া থাকেন, ব্যবস্থা-পরিষদের সামান্য সদস্যপদ অথবা মন্ত্রীপদ দখলের লোভ তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন না বাঙালীর পক্ষে ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যরূপে যাঁহারা সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, গণ-পরিষদের সদস্য হইয়া গিয়া যাঁহারা বাংলাকে ভিন্ন প্রদেশের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়াছেন নিজেদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বিচার না করিয়া লোভের বশে মিঃ সুরাবর্দ্দীর অধীনে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা আবারও বাঙালীকে লীগ ও ইংরেজের নিকট হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিলেন। মন্ত্রিত্বে সাফল্য অর্জ্জনের আশা তাঁহাদের সুদূরপরাহত, কিন্তু তাঁহাদের এই অন্যায় লোভের জন্য বাঙালীর দুর্নাম ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত

২০শে জুন বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:

> "মন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলার পরিকল্পনাকে পশ্চাৎ হইতে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছে এবং বাংলা শীঘ্রই দ্বিখণ্ডিত হইবে। বাংলার মুসলমানদের ইহাতে অনুশোচনার কিছু নাই। আমরা যদি একত্র থাকিতে পারিতাম তাহা হইলে বিশ্বের মধ্যে এক প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশীল জাতিতে পরিণত হইবার সুযোগ পাইতাম। কিন্তু একত্র অগ্রসর হইবার সৌভাগ্য আমাদের নাই। মুসলিম বঙ্গকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে এবং উন্নতির চরম সীমায় উঠিতে হইবে। পাকিস্থানের অংশরূপে মুসলিম বঙ্গের খাদ্য সরবরাহ হইবে প্রচুর। পাটের জন্মস্থান রূপে সমগ্র বিশ্বকে মুসলিম বঙ্গ তাহার পদপ্রান্তে পাইবে এবং ইহার শিল্পোন্নতির সম্ভাবনাও অফুরন্ত। পাকিস্থান আইনসভায় মুসলিমবঙ্গে

প্রভূত প্রভাব থাকিবে এবং পাকিস্থানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও নীতি নির্দ্ধারণে তাহার যথেষ্ট হাত থাকিবে। পাকিস্থানের সমৃদ্ধির জন্য প্রতি মুসলমানকে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এখন আর আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের উপর নির্ভরশীল নহি। আমাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও শিল্পসম্পদ আমাদিগকে বিশ্বসভায় একটা বিশিষ্ট স্থান দান করিবে।

যাহা হউক, এই বিভাগ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক যে, যে বঙ্গ-বিভাগের দাবি হিন্দু মহাসভা কর্তৃক তীব্রভাবে উত্থাপিত হয় এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বাঙালী জাতিকে যাহা গলাধঃকরণে বাধ্য করেন তাহা প্রতিশোধস্পৃহা, ঘৃণা ও নৈরাশ্য হইতে উদ্ভূত। আশা করি, উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এই মনোভাব দূরীভূত হইবে। ইতিমধ্যেই আমি দেখিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমানদের কিভাবে চূর্ণ করা যায় সম্ভাবিত হিন্দু মন্ত্রিসভাকে তৎসম্পর্কে আভাষ দানের জন্য প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে সংযত হইতে অনুরোধ করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গে যে মন্ত্রিসভা জনগণের কল্যাণের ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহারা উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিবেন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষা করিবেন না। ঘটনাচক্রে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় কেহই সুখী হইতে পারে নাই। ভারতের সর্ব্বত্র সংখ্যালঘুদের মনে বৈষম্য ও প্রতিশোধের যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে এখন আমাদিগকে তাহা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। ভারত বিভক্ত হইলেও হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পূর্ব্বের মতই পাশাপাশি বাস করিতে হইবে। কাজেই মুসলমান ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমাদের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং চুক্তি করিতে হইবে।"

উপসংহারে তিনি বলেন যে, বাংলার দুইটি অংশের পুনর্মিলনও অসম্ভব নহে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

যাহা অবশ্যম্ভাবী ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্গভঙ্গই ছিল হিন্দুর সংস্কৃতি, ধর্ম, ধন ও মান রক্ষার একমাত্র উপায় এবং ইহাতে হিন্দুর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবে। বাংলার উত্তর খণ্ডের পুনর্গঠন এক দুরূহ কাজ। রাজনৈতিক মতবাদ ও অন্যান্য সকল প্রকার বিভেদ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক দল ও সম্প্রদায়ের প্রতিভা ও সহযোগিতায় ইহা সম্ভব। এক তুলনাহীন সাম্প্রদায়িক নিপীড়নে বাঙালী হিন্দুর অস্তিত্ব ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল। তাহারা এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। ২০শে জুন হিন্দুদের পক্ষে এক মুক্তির দিন। সাধারণ মানুষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ রচনাই বর্ত্তমানে তাহাদের কাজ।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে কয়েক কোটি হিন্দু তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্থান অঞ্চলে পড়িতে বাধ্য হইয়াছে, এই সকল হিন্দুর রক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব নূতন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর পড়িয়াছে। পাকিস্থানে এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি অধিকার পাইবে তাহা নির্ণয়ার্থ পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের অবিলম্বে এক সম্মেলনে মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সম্মেলনে দাবির যে খসড়া প্রস্তুত হইবে তাহা গণ-পরিষদ ও দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যদি বঙ্গভঙ্গকে নিজেদের নিরাপত্তার উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ভ্রাতা ও ভগ্নীদের ভবিষ্যতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তবে তাহা আত্মপ্রতারণারই সামিল হইবে। ইহা আশা করা যায় যে, বঙ্গের উভয় খণ্ডই সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইবেন এবং এইভাবে ভবিষ্যতে যাহাতে কোন অশান্তির উদ্ভব না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে সর্ব্বভারতীয় সমস্যার প্রতি নজর না দিয়া বঙ্গের দুই খণ্ডের মধ্যে যাহাতে সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার জন্য চেষ্টা করিব।

মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিবৃতিতে তাঁহার চিরন্তন দাম্ভিকতা ও অপরের প্রতি দোষারোপের ভাব সুস্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের যে মুসলমানেরা হিন্দুদের রক্ষণাবেক্ষণে নিরাপদে বাস করিয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া যাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই, তাহারাও বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে লীগ পক্ষে একযোগে ভোট দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের চূর্ণ করিবার চেষ্টা এখনই আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া নাকি মিঃ সুরাবর্দ্দী বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যেন উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলেন এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ উপেক্ষা না করেন। অথচ মুসলমান সংখ্যাগুরু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার চলিতেছে তাহার অবসানের কোন চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না এবং মিঃ সুরাবর্দ্দীও সে সম্বন্ধে নীরব। বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে-সব সংবাদ আসিতেছে তাহা বস্তুতই উদ্বেগজনক। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ট্রেনের হিন্দু যাত্রীদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় করা হইতেছে;ময়মনসিংহের গ্রামে ঢোল পিটাইয়া হিন্দুদের গ্রামত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে; পাবনায় হিন্দুর শবদাহে আপত্তি করিয়া কবর দেওয়ার জন্য হুমকী দেওয়া হইতেছে—ইত্যাদি সংবাদ সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের নিদর্শন বলিয়া সুরাবার্দ্দী সাহেবও আশা করি ব্যাখ্যা করিতে চাহিবেন না।

সীমানা কমিশন

বিভক্ত বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশের উভয় অংশের সীমানা নির্দ্ধারণের জন্য দুইটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তাহার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। চেয়ারম্যানের নাম স্যর সাইরিল র‍্যাডক্লিফ, ইনি ইংলণ্ড হইতে আসিয়া এক সঙ্গে বাংলা ও পঞ্জাব উভয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইবেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী মিঃ জাষ্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, মিঃ জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ জাষ্টিস আবু সালে মহম্মদ আকরম ও মিঃ জাষ্টিস এস এ রহমানকে বাংলার সীমানা কমিশনের সদস্যপদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, বাংলার গবর্ণর কমিশনের সদস্যচতুষ্টয়কে আগামী ৭ই জুলাই, সোমবার অথবা যত শীঘ্র সম্ভব উহার পরবর্ত্তী কোনও তারিখে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

কমিশনের বিচার্য্য বিষয়াবলীর মধ্যে সংলগ্ন মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান এলাকাসমূহের ভিত্তিতে পঞ্জাব ও বাংলার উভয় অংশের সীমানা নির্দ্ধারণ এবং উহা করিবার কালে "অন্যান্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার" জন্যও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এতৎসম্পর্কে রিফর্মস কমিশনারের আপিস হইতে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৭ সালের ৩রা জুনের ঘোষণায় ৫ম হইতে ৮ম অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুযায়ী বাংলা ও পঞ্জাব প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় গবর্ণর-জেনারেল উক্ত ঘোষণায় ২১শ অনুচ্ছেদ অনুসারে উহার ৯ম ও ১৩শ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিয়াছেন :

(১) বাংলা ও পঞ্জাবের জন্য নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া দুইটি সীমানা কমিশন গঠিত হইবে—

বাংলার জন্য :—চেয়ারম্যানের নাম পরে ঘোষিত হইবে। সদস্যদের নাম মিঃ জাষ্টিস বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, মিঃ জাষ্টিস সি, সি, বিশ্বাস, মিঃ জাষ্টিস আবু সালে মহম্মদ আকরম ও মিঃ জাষ্টিস এস, এ, রহমান।

পঞ্জাবের জন্য—চেয়ারম্যানের নাম পরে ঘোষিত হইবে। সদস্যদের নাম : মিঃ জাষ্টিস দীন মহম্মদ, মিঃ জাষ্টিস মহম্মদ মুনির, মিঃ জাষ্টিস মেহের চাঁদ মহাজন ও মিঃ জাষ্টিস তেজ সিং। (উভয় কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগের সঙ্কল্প করা হইয়াছে)

(২) সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহের গবর্ণরেরা যথাশীঘ্র সম্ভব উভয় কমিশনের বৈঠক আহ্বান করিবেন এবং কমিশন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের বিবরণ দাখিল করিবে।

(৩) উভয় কমিশনের বিচার্য্য বিষয়াবলী এইরূপ হইবে :

বাংলার সংলগ্ন মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান এলাকাসমূহের ভিত্তিতে বাংলার বিভক্ত অংশদ্বয়ের সীমানা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা করিবার কালে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গণভোট গ্রহণের ফলে শ্রীহট্টের যদি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সীমানা কমিশন শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান প্রধান এলাকাসমূহ এবং উহার সংলগ্ন আসামের অন্যান্য জেলার মুসলমান প্রধান এলাকারও সীমানা নির্দ্ধারণ করিবে।

পঞ্জাবের সংলগ্ন মুসলমান ও অমুসলমান প্রধান এলাকাসমূহের ভিত্তিতে পঞ্জাবের উভয় অংশের সীমানা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং এতৎসঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য দিতে হইবে।

১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যাহাতে কমিশনের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার সদস্যবৃন্দকে কার্য্য সমাধা এবং রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

সীমানা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে বাংলার কর্ত্তব্য

বাংলার সীমানা কি হইবে সে সম্বন্ধে মন স্থির করিবার আর বেশী সময় অবশিষ্ট নাই। অথচ এখনও এ সম্বন্ধে সকলে একমত হইতে পারেন নাই ইহা দুঃখের বিষয়। এক বৎসরের গুণ্ডামির জোরে ষাট বৎসরের সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া যাহারা রাজ্যলাভ করিয়াছে, আক্রমণাত্মক মনোভাব তাহাদের বিন্দুমাত্র কমে নাই, বরং অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভের পর আরও লোভ বাড়িয়াছে। ইংরেজের সাহায্য এবং সহানুভূতি উভয়ই তাহাদের পক্ষে। অপর পক্ষে হিন্দু নেতাদের অনেকের মধ্যেই পরাজিতের মনোভাব সুস্পষ্ট।

বাংলার সীমা নির্দ্দেশ একটি গুরুতর সমস্যা। বাংলা হইবে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত, তাহার পার্শ্বে থাকিবে পাকিস্থানের এক খণ্ড। দুইটি ভিন্ন সার্ব্বভৌম রাজ্য একটি সাধারণ সীমারেখার এপার ওপার অবস্থান করিবে। পাকিস্থান রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা গোপন করে নাই। ক্ষুদ্রতম পাকিস্থানকে ঘাঁটি করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়া উহাকে 'দীনিয়া'তে পরিণত করিবার স্বপ্ন পাকিস্থানীরা দেখিয়াছে, প্রকাশ এবং প্রচারও করিয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা না পাইলে তাহারা উহার উপর দাবি ছাড়িবে না এবং ভবিষ্যতে শহরটি অধিকার করিবার চেষ্টা তাহারা করিবে ইহাও শাসাইয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের দুইটি অংশ অন্যায় ভাবে কাড়িয়া লইয়া পাকিস্থানীদের দেওয়া হইয়াছে ইহা যেমন ভারতবাসী ভুলিতে পারিবে না, তেমনি ছোরা নাচাইয়া যাহারা ইংরেজের সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়াছে ভবিষ্যতে অস্ত্রবলে এবং ইংরেজের সাহায্যে তাহারা আবারও ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না ইহাও বলা যায় না। সুতরাং উপযুক্তভাবে বাংলার সীমা নির্দ্ধারণ যেমন বাঙালার নিকট একটি সুবৃহৎ ও জটিল প্রশ্ন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশও

তেমনি উহা উপেক্ষা করিতে পারে না। বাংলার সীমানা কার্জ্জনী বঙ্গ বিভাগের রকমফের অথবা চন্দননগর হুগলীর অপর সংস্করণ বলিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন বাস্তবের কঠোর আঘাতে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবেই। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণাবশে আজ যদি ভুল পথে পা দেওয়া হয় তবে ভবিষ্যতে সংশোধনের পথ থাকিবে না। বাঙালীর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যাহাতে আজিকার সীমানা নির্দ্ধারকদের উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ না করে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পাকিস্থানীরা গঙ্গানদীকে সীমারেখা করিতে চাহিতেছে। ইহাতে তাহাদের দুইটি লাভ আছে — প্রথম, অনেকগুলি হিন্দু এলাকা পাকিস্থানে পড়িয়া যায়; দ্বিতীয়, কলিকাতা শহর পাকিস্থানে যায়। কিন্তু ইহা বাঙালীর স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বাঙালী তাদের অস্তিত্ব এবং সংস্কৃতি রক্ষা করিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া বঙ্গ-বিভাগে রাজী হইয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস হইতে বাঁচানো। বাংলার উপর দাবি বাঙালীর সর্ব্বাগ্রে। মুসলমানেরা বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে এবং সংখ্যায় বাড়িয়াছে তিন শতাব্দীর মধ্যে। তার পূর্ব্বের তিন হাজার বৎসরের বাঙালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলা বাঙালী জাতির দেশ। এক দল বিধর্ম্মী ও বিদেশীকে উদারতাবশে স্থান দিয়া এবং বাড়িতে দিয়া বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল স্বদেশের অর্দ্ধেকের বেশী ভূমিখণ্ড তাহাদিগকে ছাড়িতে বাধ্য হইয়া বাঙালী তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। আর কোন দুর্ব্বলতা বাঙালীর মনে যেন না জাগে।

বাংলার উভয় অংশের মাঝখানে প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকা উচিত এবং উহা একটি বড় নদী হওয়াই ভাল, মূলনীতি হিসাবে লীগ ইহা স্বীকার করিয়াছে। বড় নদীকে সীমারেখা করিতে গেলে ভিন্ন সম্প্রদায় অধ্যুষিত বৃহৎ অঞ্চলও নূতন রাজ্যের অন্তর্গত হইতে পারে ইহাও লীগ নীতি হিসাবে মানিয়া লইয়াছে। এই দুইটি মূলনীতি অবলম্বনে লীগের সুরাবর্দ্দী দলের মুখপত্র বাংলার একটি পূর্ণ পৃষ্ঠা মানচিত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে গঙ্গানদীকে সীমা হিসাবে দেখান হইয়াছে, ফলে কলিকাতা শহর এবং নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশপরগণা, ফরিদপুর এবং বরিশালের পরস্পর সংলগ্ন বিরাট হিন্দু এলাকা পাকিস্থানে পড়িয়া গিয়াছে। এই মিথ্যা যুক্তি ভাঙিয়া সহজ সত্য কি তাহা দেখা যাক। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের সীমানা গঙ্গা হইতে পারে না। মনকে চোখ না ঠারিয়া সহজ সরল সত্য স্বীকার করিলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে ভারতবর্ষ এবং তৎসহ বাংলা ও পঞ্জাব ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভাগ হইয়াছে। মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করিবার এবং প্রকাশ্যে গোকোরবানীর দাবি লইয়া মুসলমানেরা যে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল, ভারত-বিভাগ তাহারই পরিণতি। গঙ্গা উভয় রাজ্যের সীমানা হইলে ভবিষ্যতে অন্য আকারে এবং আরও সাংঘাতিকভাবে ঠিক এই ব্যাপার চলিতে থাকিবে। ভারতে সাত শত বৎসরের মুসলমান রাজত্বে দেখা যায় হিন্দুর মন্দির ভাঙা এবং বিগ্রহ লইয়া গিয়া উহার দ্বারা ঘরের সিঁড়ি তৈরি করা তাঁহাদের অন্যতম মূলনীতি ছিল। ইহার একমাত্র কারণ পৌত্তলিকতাবাদী হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ইসলামের আন্তরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা। ভারতে ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের আগমনের পর ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে মুসলিম লীগের যে কনভেনশন বসে তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবে হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শনের প্রতি যে অনাবশ্যক বিদ্বেষ অযাচিত ভাবে বর্ষিত হয় তাহা এই মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। প্রস্তাবের উক্ত অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"Whereas in this vast sub-continent of India a hundred million Muslims are the adherents of a faith which regulates every department of their life (educational, social, economic and political), whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies which stands in sharp contrast to the exclusive nature of Hindu Dharma and Philosophy which has fostered and maintained for thousands of years rigid caste system resulting in the degradation of 60 million human beings to the position of untouchables creation of unnatural barriers between man and man, and super imposition of social and economic inequalities on a large body of the people of this country, and which threatens to reduce Muslims, Christians and other minorities to the status of irredeemable helots, socially and economically;

"Wheras the Hindu caste system is a direct negation of nationalism, equality, democracy and all the noble ideals that Islam stands for;

"Whereas different historical backgrounds, traditions, cultures, social and economic orders of the Hindus and the Muslims have made impossible the evolution of a single Indian nation inspired by common aspirations and ideals and whereas after centuries they still remain two distinct major nations; . . ."

ইত্যাদি। সম্পূর্ণ প্রস্তাব উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই, হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও আদর্শ সম্পর্কে পাকিস্থানীদের মনোভাব কতখানি বিদ্বিষ্ট এবং ঐতিহাসিক মিথ্যাবাদে কলুষিত তাহা দেখাইবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যেখানে দুই পক্ষ পৃথক হইতেছে সেখানে গঙ্গানদী সীমানা হইলে নিত্য বিরোধ এবং অল্প দিনের মধ্যেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। পুণ্যসলিলা গঙ্গার এক তীরে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নান করিবে, অপর তীরে গরু কাটিয়া গঙ্গাবক্ষ রঞ্জিত হইবে, ইহা অলীক কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভারতীয় মুসলমানেরা এ যাবৎ যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহাতে এই আশঙ্কা সমূলক তো বটেই, সীমানা নির্দিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ঘটিবে মনে করিলে অন্যায় হইবে না। এই সব ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া উভয় পক্ষে গুলিগোলা চালনা এবং প্রকাশ্য সংঘর্ষ বিচিত্র নয়। এই আশঙ্কা দূর হইতে পারে একটি মাত্র উপায়ে, তাহা হইতেছে, পদ্মা নদীকে উত্তর বাংলার সীমারূপে নির্দেশ করা। মেঘনাকে সীমানা না করিয়া বরং আড়িয়ল খাঁ'কে করা যাইতে

পারে। এই সব নদীর সঙ্গে ধর্মগত কোন স্মৃতি জড়িত নাই, সুতরাং পদ্মা, মেঘনা বা আড়িয়ল খাঁ লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত না হইতে পারে। বড় প্রাকৃতিক নদীকে সীমারেখা করিতে গেলে পাকিস্থানে বৃহৎ হিন্দু অঞ্চল পড়িলে যদি দোষ না হয়, তবে ঠিক ঐ যুক্তি অনুসারে পদ্মা এবং মেঘনা বা আড়িয়ল খাঁ সীমানা করিতে গেলে বাংলার মধ্যে কতকগুলি মুসলমান অঞ্চল পড়িবে, লীগের পক্ষে আপত্তি করিবার মুখ থাকিবে না। বাঙালী গঙ্গা নদী ছাড়িতে পারে না। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে গৌড়, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা গঙ্গাতীরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। গঙ্গার জলধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য জলঙ্গী ও মাথাভাঙা বাংলার মধ্যে রাখা দরকার। নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং চব্বিশ পরগণার সামাজিক ও বৈষয়িক প্রাণকেন্দ্র এবং শিক্ষা-কেন্দ্র কলিকাতা বলিয়া এই ছয়টি জেলা বাংলার অন্তর্ভুক্তই থাকা উচিত।

পরস্পর-সংলগ্ন হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল পৃথক হইবে সীমানা কমিশনের নিকট ইহাই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এ সম্বন্ধেও একটি গুরুতর বিচার্য্য বিষয় রহিয়াছে। প্রথমেই মূল নীতি হিসাবে স্থির করিয়া লওয়া দরকার যে দুইটি বৃহৎ পরস্পর-সংলগ্ন অঞ্চলের মাঝখানে ভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র পকেট পড়িয়া যদি উভয়টির সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে উক্ত পকেট বৃহৎ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বড় পকেট কাটিয়া তাহার ভিতর দিয়া করিডোর সৃষ্টি করা চলিবে না কিন্তু কোন ছোট পকেট ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুইটি বৃহৎ অংশের সংযোগ-পথে বাধা-স্বরূপ দাঁড়াইয়া গেলে তাহা অপসারিত হইতে পারিবে, ইহা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। এই প্রকার পকেটের আয়তন ২০, ৩০ বা ৫০ বর্গমাইলের বেশী হইবে না এমন একটা পরিমাপ আগে হইতে স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উত্তর বাংলার রেলপথের অবস্থিতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একই রেল-লাইন উভয় অঞ্চলের ভিতর দিয়া যাহাতে না যায় তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখা দরকার। সান্তাহার-পার্বতীপুর লাইন পাকিস্থানে গেলে লালগোলা-গোদাগাড়ী লাইন বাংলায় রাখিতে হইবে। বাংলার উত্তর ও দক্ষিণে যোগাযোগ রক্ষার জন্য যে রেল-লাইন থাকিবে তাহার কোন অংশ যাহাতে পাকিস্থানের মধ্যে না পড়ে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভবিষ্যতে শত্রুতা করিয়া পাকিস্থান যাহাতে লাইন আটকাইয়া নষ্টামি করিবার সুযোগ না পায় তাহা এখনই দেখিতে হইবে। ভিন্ন রাজ্যের সীমা নির্দেশের সময় ভবিষ্যতে উহার শত্রুতা করিবার কি কি পথ থাকিতে পারে তাহা আগেই দেখিয়া লওয়া দরকার এবং তদনুসারে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। বাংলার রাজধানী কলিকাতা হইতে পাকিস্থানের সীমানা যাহাতে কম পক্ষে ৩০ মাইল দূরে থাকে তাহাও দেখা দরকার।

মুসলিম লীগ সমগ্র বাংলা গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল। বাংলাকে পাকিস্থানে পরিণত করিবার জন্য তাহারা বাঙালী হিন্দুকে পিতৃপুরুষের বসবাটী ছাড়িয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্থান সংগ্রহের জন্য নোটিশও দিয়াছিল। বঙ্গ-বিভাগের দ্বারা বাঙালী পাকিস্থানীদের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, বাংলার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল লীগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া পাকিস্থানীদের শক্তি হ্রাস করিয়াছে। পাকিস্থান খাঁটি করিয়া লীগ ভারত জয়ের স্বপ্ন দেখিলে বাংলাকে খাঁটি করিয়া যাহাতে তাহা দমনের জন্য আয়োজন করা সম্ভব হয় —সীমানা নির্ধারণের সময় তাহার ব্যবস্থা করিতে যেন আমরা মুহূর্তের তরেও ভুলিয়া না যাই।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব

পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু পরিবার সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ। শ্রীযুক্ত সতীন সেন প্রমুখ পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দ স্থানীয় হিন্দু-গণকে স্থানত্যাগে নিষেধ করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তার সমস্যার প্রতি পশ্চিম-বাংলা এবং ভারত-সরকার উভয়েরই এখন হইতে অবহিত থাকা এবং কোনরূপ বিপদ ঘটিলে তাহার প্রতিকারে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। এ বিষয়ে পাকিস্থান প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আহূত জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

> "নবগঠিত ভারতীয় সরকার ও পাকিস্থানের বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য অঞ্চলগুলির গুরুতর কর্তব্য হইতেছে পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখদের রক্ষা করা। আমাদের মূলনীতিতে ভুল করিলে চলিবে না। পাকিস্থান স্থাপিত হইবার পরেও সমস্যার সমাধান হইবে না। পাকিস্থানের স্বপ্ন যাহারা দেখিতেছেন তাঁহারা ইসলামের পতাকা উড়াইবার উদ্দেশ্যে সমগ্র হিন্দুস্থানের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন। সুতরাং পাকিস্থানের বাহিরের অঞ্চলগুলিতে যদি মিথ্যা মুস্লিম তোষণের ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধে আমরা পরিচালিত হই তবে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত করিব।
>
> অদৃষ্টের পরিহাসে যে পাকিস্থান ভারতীয় জাতীয়তা-বোধকে চূড়ান্ত আঘাত করিয়াছে তাহার প্রতিবাদ আজ হিন্দুসভা যাহাকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে সেই প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক হিন্দু ও শিখের নিকট অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সহযোগিতার আবেদন করিয়াছিলাম। শিরোমণি আকালী দল আমাদের সহিত সহযোগিতায় সম্মত হইয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।
>
> পাকিস্থান সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবে না। বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া গোলমালের প্রশ্রয় হইবে। সম্পূর্ণ ইস্লামিক নীতিতে পাকিস্থান রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে এবং এখনই সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর ধীরে ধীরে অত্যাচার

করিবার যে নীতি আমাদের নিকট প্রকট হইতেছে তাহাতে পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ স্বরূপ বুঝা যায়। আজ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিতে হইবে যে কোন জাতীয় চুক্তি লইয়া পাকিস্থান আসিতেছে না—জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও পাকিস্থান স্থাপিত হইতে যাইতেছে, ইঙ্গ-মুসলিম ষড়যন্ত্র জোর করিয়া ইহা আমাদের উপর চাপাইয়া দিতেছে এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে, কংগ্রেসের আত্মঘাতী তোষণ নীতির জালে কংগ্রেস নিজেই ধরা পড়িয়া পরাজিত হইয়াছে। সমগ্র হিন্দুসমাজ এই বিষয়ে এক হইতে পারে নাই।

পাকিস্থানকে আমরা নিশ্চিত ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইব না। আমরা আশা করিব যে, পাকিস্থানের সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি অবস্থার চাপে বিভক্ত ভারত পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইবে। ভারতবর্ষ অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হইবে। কোন অবস্থাতেই পঞ্চমবাহিনী-দের তাহাদের দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে দেওয়া হইবে না।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ভয়ে চলিয়া আসিবার কোন প্রয়োজন নাই, বিশেষ যাঁহারা সেইস্থানে থাকিতে পারেন। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থ যাহাতে রক্ষা পায় তজ্জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করা হইতেছে। ভারতীয় গণ-পরিষদ পাকিস্থানের হিন্দু ও শিখদের বিদেশী বলিয়া কোনমতেই গণ্য করিতে পারিবে না। আমি আশা করি যাঁহারা ভারতের নাগরিক অধিকার চূড়ান্তভাবে স্থির করিবেন তাঁহারা অবিলম্বে এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

আমাদের চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। যদি ব্রিটিশ কূটনীতি ও মুসলমানদের হুমকি ভারতে সাম্প্র-দায়িক নীতি জাগাইয়া তুলিয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা আমাদের শক্তি ও সংহতির দ্বারা সেই বিভেদ দূর করিব।

ভারত ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ন বিল

চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য যে ভারত স্বাধীনতা বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা পার্লামেন্টে পেশ করা হইয়াছে। এই বিল অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়া ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন গঠিত হইবে।

১৫ই আগষ্ট তারিখে যে সমস্ত অঞ্চল পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে সেই সমস্ত অঞ্চলকেই পাকিস্থান ডোমিনিয়ান বলা হইবে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে যে বাংলা গঠিত হইয়াছিল তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ নামে দুইটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে।

প্রত্যেক ডোমিনিয়নের আইন সভা যদি স্থির না করেন যে একই ব্যক্তি উভয় ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেল হইতে পারিবেন তাহা হইলে প্রত্যেক ডোমিনিয়নের জন্য আলাদা একজন করিয়া গভর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করা হইবে।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রত্যেক নূতন ডোমিনিয়নের আইন সভাকে দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ আইনের বিরোধী হইলেও কোন আইনকে বাতিল করা হইবে না। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ত্যাগ করিবেন।

কোন প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত আইন ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুসারে রাজার অনুমোদনের জন্য রাখা চলিবে না। রাজা কোন প্রাদেশিক আইনকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আইনের বিভিন্ন ধারাকে কার্য্যকরী করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা বড়লাটকে দেওয়া হইবে। বড়লাট দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সৈন্যবাহিনী ভাগ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। সৈন্যবাহিনী বিভাগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত বড়লাট সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার পরও ডোমিনিয়নে যে সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য থাকিবে তাহাদের উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বর্ত্তমানে ভারতসচিব যে কাজ করিতেছিলেন কিছু সময়ের জন্য মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্যকে ঐ কাজ চালাইবার ভার দেওয়া হইবে।

বাংলার ন্যায় বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশেরও কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। পশ্চিমপঞ্জাব ও পূর্ব্বপঞ্জাব নামে দুইটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে। বড়লাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বাটোয়ারা কমিশন নূতন প্রদেশের সীমানা নির্দ্ধারণ করিবেন।

শ্রীহট্টের অধিবাসিগণ যদি পাকিস্থান ডোমিনিয়নে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে আসামের শ্রীহট্টকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইবে।

ভারত-বিভাগের পর পার্লামেন্টের কোন আইন নূতন ডোমিনিয়নে কার্য্যকরী করা হইবে না।

এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, এই বিলের উদ্দেশ্য হইতেছে যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ইহার প্রত্যেকটি বিধানই সন্তোষজনক নয়। ইহার মধ্যে অনেক গলদ থাকিতে পারে, কিন্তু সমস্ত শাসনতন্ত্রেই কিছু-না-কিছু গলদ থাকিয়া যায়। অবস্থার চাপেই কোন শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হইয়া থাকে। ভারতের অনেক ঘটনাই ইহাতে জটিলতা সৃষ্টি করিবে। এই সমস্ত জটিলতা দূর করা কোন শাসনতন্ত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কিন্তু একটা কথা ঠিক যে, ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীন হইবে। ভারতে ইহাই মহত্তম ব্যবস্থা। একথাও বলা যায় যে, কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অন্যতম

শ্রেষ্ঠ কার্য্য। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের ইতিহাসে এইভাবে কোন বিল আর উত্থাপিত হয় নাই। বিলটি খুব সত্বর গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বড়লাটের আহ্বানে সাংবাদিক বৈঠকটি হয়। তিনি সর্দার প্যাটেলকে ইহাতে সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করেন। রিফর্মস কমিশনর মিঃ ভি, পি, মেনন ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন।

মিঃ মেনন বিলটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, এই বিলের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে নূতন ডোমিনিয়ন দুইটির আইন সভার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হইয়াছে। সুস্পষ্ট ভাষায় এই বিলে ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। এখন প্রত্যেকটি ডোমিনিয়নের গণ-পরিষদ অনায়াসে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। গণ-পরিষদকে ডোমিনিয়নের পার্লিয়ামেন্ট রূপে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ মেনন বলেন, ডোমিনিয়নদ্বয়ের যে নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ইচ্ছাক্রমে।

বিলে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার ফলে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের পক্ষে আর কোন ডোমিনিয়নকে স্বীকার করিয়া লওয়া নিষিদ্ধ কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে সর্দার প্যাটেল বলেন, দৃশ্যতঃ ইহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের উপর ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না।

প্রশ্ন—ধরুন, হায়দরাবাদ যদি ডোমিনিয়নের মর্য্যাদার জন্য দরখাস্ত করে, তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াইবে?

মিঃ মেনন—হায়দরাবাদ এইরূপ দরখাস্ত করিতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা মঞ্জুর করিবে কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা।

প্রশ্ন—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কি যে, তাঁহারা আর কোন ডোমিনিয়নকে স্বীকার করিবেন না?

মিঃ মেনন—দুইটি ডোমিনিয়নকে প্রত্যাখ্যান করা, আর একটিকে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা দেওয়া খুব কঠিন হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। বর্ত্তমান বিলে বেরারকে ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

প্রশ্ন—ইহার অর্থ কি এই যে, নিজাম যদি বর্ত্তমান ব্যবস্থা স্বীকার না করেন তবে বেরার হায়দরাবাদের মধ্যে যাইবে?

মিঃ মেনন—না, যাইবে না, কারণ ভৌগোলিক দিক হইতে বেরার মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; আইনের দিক হইতে বেরারের প্রতিনিধিদের গণ-পরিষদে যাইবার অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তব দিক হইতে অবস্থা স্বতন্ত্র। বেরারের সমগ্র প্রশ্নটি আলাপ-আলোচনার ব্যাপার, ব্যাখ্যার ব্যাপার নয়। নিজাম এ ব্যাপারে অযৌক্তিক মনোভাব অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যদি নিজাম ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোন মীমাংসা না হয় তবে বেরার একটা অচল অবস্থায় পড়িবে।

সর্দার প্যাটেল এই সময় বলেন, নিজাম যাহাই বলুক না কেন, ব্রিটিশ সরকারের সহিত নিজামের যে সকল সন্ধিসর্ত্ত ছিল, ১৫ই আগষ্টের পর তাহা আর থাকিবে না।

প্রশ্ন—তাহা হইলে বেরারের ভাগ্য কে নির্দ্ধারণ করিবে?

সর্দার প্যাটেল—বেরারের জনগণ। অন্য কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থাই চলিতে থাকিবে।

মিঃ মেনন বলেন, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দুইটি ডোমিনিয়নের আন্তর্জ্জাতিক সভা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন পার্লিয়ামেন্টের আইনের দ্বারা ইহা চূড়ান্তভাবে স্থির করা যাইবে না। এ সম্পর্কে বিশ্বসভা এবং অন্যান্য রাষ্ট্রই যাহা করার করিবে। ভারতের বহু প্রতিনিধি এখন পৃথিবীর নানা স্থানে রহিয়াছে। এইরূপ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় ডোমিনিয়নই ভারতের বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদা ভোগ করিতে থাকিবে এবং পাকিস্থান হইবে নূতন একটি দেশ।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া আপিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতসচিব লর্ড লিষ্টোয়েল দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে বলেন,

"হায়দরাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুর—মাত্র এই দুইটি দেশীয় রাজ্য আজ পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। আমরা আশা করি যে, তাহারা যে কোন একটি গণপরিষদে যোগ দিবে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি রাজ্য যোগ দিয়াছে, অন্যান্য রাজ্যগুলি শীঘ্রই যোগদান করিবে। ৬০০টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি রাজ্য পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আমরা অন্যান্য রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করিতে চাহি না বলিয়াই ঐ দুইটি রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমরা এখনও কিছু স্থির করি নাই, যে কোন এক ডোমিনিয়নের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলি যোগদান করুক ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

মাত্র দুইটি দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে ইহা ঠিক, কিন্তু মূলনীতি হিসাবে দুই জনের এই কার্য্য লইয়াই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের এ বিষয়ে মন পরিষ্কার থাকিত। হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ঘোষণার পিছনে ইংরেজের গূঢ় সমর্থন আছে ইহা মনে করা অন্যায় হইবে না। সার ওয়াল্টার মঙ্কটন নিজামের শাসনতান্ত্রিক পরামর্শদাতা এবং ঘন ঘন দিল্লী যাতায়াত করিয়া রাজধানীর ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়াই তিনি নিজামকে উক্ত পরামর্শ দিয়াছেন ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বেরার হাতে রাখিয়াছেন ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতবর্ষকে ভাঙিয়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে পরিণত করা হইয়াছে।

গবর্ণরের বক্তৃতা

বাংলার গবর্ণর সার ফ্রেডারিক বারোজ পশ্চিম-বাংলার অত ক্ষমতাবিহীন একটি সাক্ষী গোপাল মন্ত্রিসভার গঠন ঘোষণা করিয়া বেতার যোগে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন:

আজ হইতে এক মাসের কিছু পূর্ব্বে আমি আপনাদের নিকট বেতার-বক্তৃতা করিয়াছিলাম। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কিরূপে ভারতবাসীর হস্তে চূড়ান্তভাবে এবং দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে, তৎসম্পর্কে গত ৩রা জুন তারিখে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ব্রিটিশ পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছায় সেই পরিকল্পনা লইয়া অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। ২০শে জুন তারিখে বঙ্গ-বিভাগের সিদ্ধান্ত করা হয়। নূতন ডোমিনিয়ন এবং প্রদেশগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি ভাবে বাংলার শাসন-কার্য্য পরিচালনা করা হইবে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করাই আমার বেতার-বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য পরিচালনার জন্য সরকারী দপ্তরগুলিকে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনারা সংবাদপত্রেই তাহার বিবরণ দেখিয়াছেন। মিঃ এইচ, এস, সুরাবর্দী, খাজা নাজিমুদ্দীন, মিঃ এস, আর, সরকার ও মিঃ ডি, এন, মুখার্জ্জীকে লইয়া যে বণ্টন-পরিষদ গঠন করা হইয়াছে, তাহাও আপনারা শুনিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই উক্ত পরিষদের তিনটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে প্রত্যেক গুরুতর বিষয়েই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে। তদারকের ভিত্তিতে বর্ত্তমানে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা হইলেও এবং বণ্টন-পরিষদের হস্তে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইলেও প্রাদেশিক সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

বেশ কিছুদিন হইল আমি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কোন পক্ষই ইহা চাহে নাই। যখন বঙ্গ-বিভাগ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানা গেল, তখন আমি বিকল্প প্রস্তাব হিসাবে, আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের কথা তুলিয়াছি, কিন্তু এক পক্ষ ইহাতে রাজী হয় নাই।

ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগের প্রস্তাবও অনেক মহল হইতে করা হইয়াছে। ৯৩ ধারা কেন প্রয়োগ করিব না, তাহার দুইটি প্রধান কারণ রহিয়াছে। প্রথমটি ব্যক্তিগত, আমার যে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং মতবাদ রহিয়াছে তাহা আমাকে কোন এক ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় কারণটি সাধারণ, ভারতবাসীর হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আমাকে যদি তাহাদের হাত হইতেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে হয়, তবে তাহা শোচনীয় নীতি-বিরুদ্ধতার কাজ হইবে। কিন্তু গত ২০শে জুন তারিখে বাংলাকে দুইটি প্রদেশে ভাগ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের অসঙ্গতি আমি পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা বিভক্ত বাংলার একাংশের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

আমাদের সমস্যা হইল এমন একটা সমাধানের উদ্ভাবন করা, যাহা দুইটি দলই মানিয়া লইবে এবং তদনুসারে কাজ করিতে রাজী হইবে। এক্ষণে এই সমস্যার একটা সমাধান করা গিয়াছে।

বাংলা বিভাগ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার শাসন-কার্য্য পরিচালনার জন্য এখানে এবং নয়াদিল্লীতে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সম্মতি অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী দলের নেতা ডাঃ পি. সি. ঘোষকে বাংলার অমুসলিম অঞ্চলের জন্য একটি মন্ত্রিসভা মনোনয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছি।

এই মন্ত্রিসভার জন্য যাঁহাদিগকে মনোনীত করা হইবে, তাঁহারা মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবেন এবং মন্ত্রিসভার সকল বৈঠকেই যোগ দিতে পারিবেন কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের হস্তেই বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা যে সকল নীতির উদ্ভাবন করিবেন, তাহা কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গে প্রযোজ্য হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সম্মতি হইলে তবে এই সকল নীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা যাইবে। যে সকল প্রশ্নের সহিত পশ্চিমবঙ্গ জড়িত থাকিবে, সেই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। কোন বিষয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তাহা মন্ত্রি-সভার বৈঠকের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের মন্ত্রিগণ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইতে পারেন, কোন বিষয়ে মন্তব্য করিতে পারেন এবং তাঁহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই যে কোন প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য দপ্তরকে অনুরোধ করিতে পারেন। কেবল মাত্র পশ্চিমবঙ্গের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন নীতি ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহাদের থাকিবে এবং তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিবেন, সরকার তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবেন।

বর্ত্তমানের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য সমাধান বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে সকলেরই সদিচ্ছার প্রয়োজন। গত কয়েক মাস ধরিয়া সকলের যে সদিচ্ছার পরিচয় পাইয়াছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বাংলার দুইটি স্বতন্ত্র সরকার চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অল্প সময়েও তাহা অম্লান থাকিবে।

কলিকাতায় অশান্তি

গত ২৬শে মার্চ্চ হইতে কলিকাতায় আবার যে গোলযোগ সুরু হইয়াছে তাহা আর কিছুতেই শেষ হইতেছে না। এমন

দিন প্রায় যায় না যেদিন কোন না কোন ঘটনা না ঘটে। অতর্কিতে পথচারীর উপর ছুরিকাঘাত, ট্রাম চড়াও হইয়া যাত্রী টানিয়া নামাইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ, বাসের উপর আক্রমণ প্রায়ই চলিতেছে। এরূপ কোন কোন আক্রমণ পুলিস পিকেটের চোখের উপর ঘটিয়াছে তথাপি তাহারা আততায়ীদের গ্রেপ্তার করিতে অথবা আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ষা করিতে অগ্রসর হয় নাই এরূপ অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাইতেছে। বন্দুকহাতে শান্তিরক্ষায় মোতায়েন হইয়াও কর্তব্যপালনে এইরূপ অবহেলা সম্বন্ধে পাঞ্জাবী পুলিস এবং গোরা সৈন্যের নামই বেশী উঠিতেছে।

শান্তিরক্ষার জন্য কলিকাতা শহর এত দিন দুইটি পুলিস জেলায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক জেলায় ভার ছিল এক এক জন ডেপুটি কমিশনারের উপর। জুন মাস হইতে শাসন-সৌকর্য্যের জন্য কলিকাতা তিনটি পুলিস জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরবিভাগের অধীনে আছে নিম্নলিখিত থানাগুলি :—শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, বটতলা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কাশীপুর, চীৎপুর, মাণিকতলা এবং বেলিয়াঘাটা। এই বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মিঃ হাফিজুদ্দীন এবং আটটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে পাঁচজন মুসলমান। বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, বহুবাজার, হেয়ার ষ্ট্রীট, মুচিপাড়া, তালতলা ও ইণ্টালি এই সাতটি থানা লইয়া মধ্য কলিকাতা জেলা গঠিত হইয়াছে। উহার ডেপুটি কমিশনার মিঃ মজুমদার এবং সাতটি থানার মধ্যে পাঁচটিতেই অফিসার ইন-চার্জ্জ মুসলমান। দক্ষিণ জেলায় আছে আটটি থানা :—পার্ক ষ্ট্রীট, হেষ্টিংস, ওয়াটগঞ্জ, আলিপুর, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ ও ভবানীপুর। এই জেলার ডেপুটি কমিশনার মিঃ লুইসন এবং ইহাদের চারিটির ভারপ্রাপ্ত অফিসার মুসলমান। যে শহরে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা তিন-চতুর্থাংশ এবং মোট সম্পত্তির ৯০ ভাগের মালিক হিন্দু সেই শহরের শান্তিরক্ষা কার্য্যে হিন্দুদের কোন স্থান নাই।

হিন্দুদের বাদ দিয়া লীগ যদি শহরে শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেন তবে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু থাকিত না। সহরের লোক নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে পারিবে, দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহে কাহাকেও বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইবে না; আততায়ীর অতর্কিত ছুরিকাঘাতের ভয় থাকিবে না, মুসলমান ডেপুটি কমিশনার ও দারোগাদের কর্ম্মদক্ষতার ফলে এরূপ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে আমরা কিছু বলিতাম না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত। শহরের উপদ্রুত এলাকাগুলি দেখিলেই কাহারা উপদ্রবকারী তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না, উহা প্রকাশ করিবার উপায় না থাকিলেও শহরবাসীদের মধ্যে যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহাদের জানিবার ও বুঝিবার পক্ষে বাধা নাই। আক্রমণের স্থান প্রকাশ বন্ধ করায় আক্রমণ কমে নাই, শুধু কতকগুলি নিরীহ অজ্ঞ লোক না জানিয়া ঐ সব অঞ্চলে গিয়া মারা পড়িতেছে।

মধ্য-কলিকাতায় ডেপুটি কমিশনার মিঃ মজুমদার অল্প কয়েক-মাস হইল ঐ পদে প্রমোশন পাইয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা অথচ বহু অভিজ্ঞতর ও তাঁহা অপেক্ষা দক্ষ লোককে বাদ দিয়া এই ব্যক্তিকে সাম্প্রদায়িক কারণে মধ্য-কলিকাতার ভার দেওয়া হইয়াছে। ইনি মধ্য-কলিকাতার ভার গ্রহণের পরদিন হইতেই নূতন করিয়া গোলযোগ এই জেলায় সুরু হইয়াছে। উত্তর ও মধ্য-কলিকাতার শান্তিরক্ষাকার্য দুই জন মুসলমান ডেপুটি কমিশনারের অধীনে কি ভাবে চলিতেছে নিম্নে প্রদত্ত জুন মাসের হিসাব হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে। এই দুইটির মধ্যে আবার মধ্য-কলিকাতার অবস্থা অনেক খারাপ। ১লা জুন হইতে যে সব থানার এলাকায় লোক আক্রান্ত হইয়া আততায়ী কর্ত্তৃক আহত বা নিহত হইয়াছে তাহাদের নাম :

১লা জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—বড়বাজার, জোড়াসাঁকো।
দক্ষিণ—পার্ক ষ্ট্রীট।

২রা জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

৩রা জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—বড়বাজার, বহুবাজার।
দক্ষিণ—বেনিয়াপুকুর।

৪ঠা জুন : উত্তর—মাণিকতলা।
মধ্য—বড়বাজার।
দক্ষিণ—নীরব।

৫ই জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—মুচিপাড়া।
দক্ষিণ—নীরব।

৬ই জুন : উত্তর—মাণিকতলা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, চীৎপুর
মধ্য—নীরব।
দক্ষিণ—নীরব।

৭ই জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—জোড়াসাঁকো।
দক্ষিণ—নীরব।

৯ই জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—বহুবাজার।
দক্ষিণ—পার্ক ষ্ট্রীট।

১০ই জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—বহুবাজার, মুচিপাড়া, তালতলা, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

১১ই জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বড়বাজার।
দক্ষিণ—নীরব।

১৩ই জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—বড়বাজার, মুচিপাড়া, তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

১৪ই জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—বড়বাজার, বহুবাজার, তালতলা, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

১৫ই জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—বহুবাজার
দক্ষিণ—টালিগঞ্জ।

১৬ই জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—মুচিপাড়া, তালতলা, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

১৭ই জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—নীরব।
দক্ষিণ—ওয়াটগঞ্জ।

১৮ই জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—জোড়াসাঁকো।
দক্ষিণ—নীরব।

১৯শে জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—হেয়ার ষ্ট্রীট।
দক্ষিণ—নীরব।

২০শে জুন : উত্তর—নীরব।
মধ্য—বড়বাজার, হেয়ার ষ্ট্রীট, তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

২১শে জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বড়বাজার,হেয়ার ষ্ট্রীট,মুচিপাড়া, তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

২২শে জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বহুবাজার, জোড়াসাঁকো, মুচিপাড়া, তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

২৩শে জুন : উত্তর—শ্যামপুকুর, বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—হেয়ার ষ্ট্রীট, মুচিপাড়া, তালতলা,ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

২৪শে জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—বহুবাজার, মুচিপাড়া,তালতলা, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

২৫শে জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, মুচিপাড়া।
দক্ষিণ—বেনিয়াপুকুর।

২৬শে জুন : উত্তর—আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বহুবাজার, জোড়াসাঁকো, মুচিপাড়া, তালতলা, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

২৭শে জুন : উত্তর—মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা,আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—বহুবাজার, জোড়াসাঁকো, ইণ্টালী।
দক্ষিণ—নীরব।

২৮শে জুন : উত্তর—বেলিয়াঘাটা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—নীরব।
দক্ষিণ—বালিগঞ্জ।

২৯শে জুন : উত্তর—কাশীপুর, চীৎপুর, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা।
মধ্য—বহুবাজার, জোড়াসাঁকো, মুচিপাড়া, তালতলা।
দক্ষিণ—নীরব।

৩০শে জুন : উত্তর—চীৎপুর, মাণিকতলা, বেলিয়াঘাটা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
মধ্য—ইণ্টালী।
দক্ষিণ—ওয়াটগঞ্জ।

শ্রীহট্টের গণভোট

শ্রীহট্টে গণভোট সম্বন্ধে ভাবাবেগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধীরে-সুস্থে চিন্তা করিয়া শ্রীহট্টবাসীকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অগ্রসর হইতে হইতেছে। ৭ই ও ৮ই জুলাই গণভোট গ্রহণের তারিখ, সুতরাং সময় মোটেই নাই। শ্রীহট্ট আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানে যুক্ত হইলে ঐ জেলার অধিবাসীদের শুভ হইবে কি অশুভ হইবে গণভোটের প্রাক্কালে ইহাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। লীগ পক্ষ হইতে যে প্রচারকার্য্য চলিতেছে তাহাতে পাকিস্থানে যোগদান করিলে ইসলামিক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটিবে এবং হিন্দুস্থানে থাকিলে গোলামী করিতে হইবে এই ফাঁকা বুলি ভিন্ন সারগর্ভ কোন যুক্তি নাই। পাকিস্থানী স্বর্গ বা হিন্দুস্থানী নরক দেখাইয়া প্রবল কোলাহল সৃষ্টি করিলেই শ্রীহট্টবাসীরা আসিয়া পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিবে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্ব পাকিস্থান ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রদেশ রূপে সৃষ্ট হইতেছে না, ভারতের একাংশ কাটিয়া লইয়া বিদেশী রাজ্যরূপে উহা গঠন করা হইতেছে। শ্রীহট্টবাসী উহাতে যোগদান করিলে পরে যখন অনুতাপ করিবার সময় আসিবে তখন তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। শ্রীহট্টবাসীর প্রতি দরদ পাকিস্থানীদের মনের কথা নয়, শ্রীহট্টের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের উপর লোভ লীগকে শ্রীহট্ট কুক্ষিগত করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

খাদি প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার দাশগুপ্ত একটি বিবৃতিতে শ্রীহট্টবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ চাষী গৃহস্থের অবস্থা তুলনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে শ্রীহট্টের চাষী গৃহস্থ অন্নাভাবে না খাইয়া দলে দলে মরে না, কাপড়ের অভাবে গলায় দড়ি দেয় না।

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক অনশনে মরিয়াছে। প্রত্যেক বৎসরই কিছু-না-কিছু লোক পূর্ববঙ্গে না খাইয়া অথবা অনশনজনিত রোগে মরে, এইবারও মরিতেছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান উপার্জনস্থান ছিল আসাম। প্রতি বৎসর হাজারে-লাখে আসামে গিয়া জন খাটিয়া অর্থোপার্জন করিত। এবার লীগ নেতাদের আসাম অভিযানের ভাঁওতায় পড়িয়া তাহারা সমগ্র আসামবাসীকে এমন ভাবে চটাইয়াছে যে আর তাহাদের আসামে স্থান হইবে কিনা সন্দেহ। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালী প্রভৃতির মজুরেরা এত অভাবগ্রস্ত যে তাহারা অতি অল্প মজুরীতে কাজ করে। শ্রীহট্টেও ইহারা কাজ করিতে আসে এবং বহু স্থলে অল্প মজুরীতে কাজ লইয়া শ্রীহট্টবাসীদের ক্ষতি করে। শ্রীহট্ট পাকিস্থানে যোগ দিলে আসাম গমনে বাধাপ্রাপ্ত এই সব দল শ্রীহট্টে আসিয়া হানা দিবে এবং ইহাদিগকে বাধাদানের শক্তি শ্রীহট্টবাসীর থাকিবে না।

পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা জমির তুলনায় অত্যধিক। অথচ কলকারখানা নাই, অতিরিক্ত লোকের উপার্জনের কোন পথও খোলা নাই। সম্বল একমাত্র পাট। এই পাট লইয়া লীগ নেতারা স্বপ্নসৌধ গড়িতেছেন। বাস্তব জীবনে উহা সৌধ হইবে না, হইবে তাসের প্রাসাদ। লীগ নেতা সুরাবর্দ্দী সাহেব বলিয়াছেন যে পাকিস্থানের পাটের জন্ত সমগ্র বিশ্ব তাঁহার পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু যুদ্ধের সাত বৎসর সমগ্র বাংলার পাট তাঁহারই হাতের মুঠায় ছিল এবং সমগ্র বিশ্বকে পাট ক্রয় ব্যাপারে তিনি সত্যই হাতের মুঠায় পুরিবার সুযোগও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সদ্ব্যবহার তিনি করেন নাই। পাটের জন্ত যাহারা তাঁহার পায়ে লুটাইতে বাধ্য হইত, ভোটের জন্ত তিনিই তাহাদের বুটের ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছেন। পাকিস্থানে ইহাদের সৈন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং এই সৈন্যসাহায্যের জন্ত ভবিষ্যতেও তিনি তাহাদের নিকট হইতে পাটের ন্যায্য দাম আদায় করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া হিন্দুস্থান এলাকাতে পাটের জমি যে পরিমাণ থাকিয়া যাইবে তাহাতে ত্রিশ লক্ষ গাঁইট পাট জন্মিতে পারিবে। পাটের মোট বার্ষিক চাহিদার পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ গাঁইট।

পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের অসহ্য দারিদ্র্যের কারণ অত্যধিক জনসংখ্যা এবং তদনুপাতে চাষের জমির অভাব, কলকারখানারও অভাব। সে কারণ উপার্জনের জন্ত তাহাদিগকে বিদেশে যাইতে হয়। শ্রীহট্ট পূর্ববঙ্গের সহিত মিলিত হইলে পূর্ববঙ্গের অতিরিক্ত অধিবাসী শ্রীহট্টে আসিবেই। উহা বন্ধ করিবার কোনই পথ থাকিবে না এবং শ্রীহট্টবাসীদের যাওয়ার কোন স্থান থাকিবে না। অথচ শ্রীহট্ট আসামে থাকিলে আসামের বহু ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসবাসের আইনসঙ্গত পথ তাহার সামনে খোলা থাকিবে। পাকিস্থানে ভিড়িলে শ্রীহট্টবাসীর অবস্থাও নোয়াখালীর মত দাঁড়াইবে। তখন নোয়াখালীর ভূমিহীন, উপার্জনের পন্থাবিহীন দরিদ্র মুসলমানের মত শ্রীহট্টের বর্তমান হিন্দু-মুসলমানের বংশধরদিগকেও কোদাল টুকরী মাথায় করিয়া পেটের ধান্দায় বাহির হইতে হইবে। কিন্তু বাহির হইয়া যাওয়ার পথ শ্রীহট্টবাসীর আর থাকিবে না। আসামের দরজা একবার নিজ হাতে বন্ধ করিয়া দিবার পর আবার উহা খুলিবার জন্য দরবার করা চলিবে না। বেলুচিস্থানের মরুভূমিতে গিয়া মরুদস্যুর শিকার-সামগ্রী হওয়া ছাড়া অন্য পথও থাকিবে না। শিলচর যাইতে হইলে পাসপোর্ট লাগিবে। হিন্দুস্থান সরকারের মাটি-কাটার লোকের প্রয়োজন হইলে তবেই শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলমান বিদেশীকে ঢুকিতে দিবে, না থাকিলে দিবে না। ঢুকিতে না দিলে অবস্থাটা কি হইবে সেটা উপলব্ধি করা দরকার। চাষের জমি থাকিবে না, উপার্জনের পথ থাকিবে না, খাটিবার স্থান থাকিবে না। ফল নিশ্চিত মৃত্যু। সাধারণ লোকে অনেকে ভাবিতে পারেন যে হিন্দুস্থান পাকিস্থান বাংলার সুরাবর্দ্দী সরকার বা আসামের বরদলই সরকারের মতই একটা কিছু হইবে। জনসাধারণ অবাধে এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াত করিতে পারিবে। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তাহার ঠিক উল্টা। পাকিস্থান হইতে হিন্দুস্থানে বিনা অনুমতিতে যাতায়াত করা অসম্ভব হইবে। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খানাতল্লাসী হইবে, শুল্ক আদায় হইবে, পাকিস্থানের টাকা হিন্দুস্থানে চলিবে না, সুতরাং বাট্টা দিয়া টাকা বদলাইতে হইবে। আসা-যাওয়া সহজসাধ্য তো হইবেই না, অধিকন্তু খরচ এবং ঝামেলায় একশেষ হইবে।

আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

কেন্দ্রীয় খাদ্য বিভাগের জনৈক সরকারী মুখপাত্র সংবাদ-পত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "আমরা বর্তমানে যে খাদ্য-সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছি গত তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এত বড় সঙ্কট আর দেখা দেয় নাই। সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই সঙ্কট চলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সময়টা উত্তীর্ণ হইলে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য ভারতে পৌঁছিতে আরম্ভ করিবে। উত্তর-ভারতে গম সংগ্রহের হিসাবে দেখা যায় যে সেখানে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। মধ্য-ভারতে এবং পঞ্জাবে আশানুরূপ ফসল জন্মে নাই। ভারত-সরকার নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিতেছেন: (১) দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি, (২) বর্তমান মজুত খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, (৩) বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী।"

সরকারী প্রতিনিধি অতঃপর বলেন যে, প্রত্যেক খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলের শাসনকর্তৃপক্ষকে খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিবার জন্ত প্রত্যেক অঞ্চলের আগামী তিন মাসের হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তাহাতে বর্তমান

মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ, আভ্যন্তরীণ খাদ্যসংগ্রহের সম্ভাব্য পরিমাণ ও প্রত্যাশিত খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক অঞ্চলকে আভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য-সংগ্রহ-কার্য্যের যথাসম্ভব উন্নতি করিবার জন্যও বলা হইয়াছে।

গত বৎসর মাদ্রাজে খাদ্যশস্য-সংগ্রহ-কার্য্য হইয়াছিল চমৎকার। এ বৎসর সে তুলনায় সেখানেও আশানুরূপ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা যায় নাই। পঞ্জাবে হাঙ্গামার দরুণ স্থানীয় খাদ্যশস্য সংগ্রহ-কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই, বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে, সিন্ধুপ্রদেশে চমৎকার কাজ হইতেছে, এবং যুক্তপ্রদেশেও সংগ্রহের কাজ চলিতেছে।

প্রত্যেক ঘাটতি অঞ্চলকে এই উপদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যাহাতে তাহাদের মজুত খাদ্যশস্য নিঃশেষ হইয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে মজুত মাল হইতেই আরও কিছুকাল খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উপদেশ অনুযায়ী কোন কোনও অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে তাঁহাদের খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ ইতিমধ্যেই হ্রাস করিয়া দিয়াছেন; অন্যেরাও শীঘ্রই এইরূপ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানের দৈনিক ১২ আউন্স হইতে যে পরিমাণ বরাদ্দ কমাইয়া দেওয়া হইবে তাহা কতকটা পূরণ করিবার জন্য ঘাটতি অঞ্চলসমূহে ছোলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই অভাবের সময় আমাদের মাসে সাড়ে তিন লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন। কিন্তু আমরা জুন মাসে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার টন, জুলাই মাসে এক লক্ষ ঊনাশি হাজার টন এবং আগষ্ট মাসে মাত্র এক লক্ষ এগার হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি। আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত বরাদ্দ ছাড়াও আগামী তিন মাসের জন্য জরুরী বরাদ্দের আবেদন আন্তর্জ্জাতিক জরুরী খাদ্যপরিষদের নিকট করা হইয়াছিল এবং পরিষদ অনুরূপ একটি বরাদ্দ করিয়াছেনও বটে, কিন্তু উহা আমাদের জরুরী প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ভারতের জন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। তাহার ফলাফল সংক্ষেপে নিম্নে জানান হইল :

আর্জ্জেন্টিনা :—একটি চুক্তির জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আগষ্ট মাসের শেষ ভাগের পূর্ব্বে সরবরাহ ভারতে পৌঁছিতে পারে না।

অষ্ট্রেলিয়া :—অবিলম্বে অতিরিক্ত গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইতে এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে অষ্ট্রেলিয়া পাঠান হইয়াছে।

আমেরিকা :—গম সরবরাহের কথাবার্ত্তা চালাইতে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের এক প্রস্তাব বিবেচনা করা হইতেছে, এবং এই বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। আরও ময়দা পাইবার ব্যাপারে কানাডা আমাদিগকে পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

তুরস্ক :—তুরস্কের অনাবৃষ্টির দরুণ আমাদের বরাদ্দ ৮৫ হাজার টনের স্থলে মাত্র ১৪ হাজার টন গম পাইব বলিয়া তুরস্ক সরকার আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শস্য সংগ্রহের জন্য আবিসিনিয়া ও ইরাকে আমরা এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছি এবং পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, সেখানে মাঝে মাঝে যে অল্প খাদ্যশস্য পাওয়া যায় তাহা তিনি ক্রয় করিতে পারিবেন।

ওয়াশিংটনস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের খাদ্যসংক্রান্ত উপদেষ্টা মিঃ অত্তরকর জানাইয়াছেন যে আমেরিকান জাহাজের ধর্ম্মঘটের জন্য ভারতে খাদ্যশস্য রপ্তানীতে দারুণ বাধা পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অসুবিধা তো আছেই। তিনি বলেন যে, ১৯৪৭-৪৮ সালের প্রথম তিন মাসে বাহির হইতে প্রেরণযোগ্য মোট বরাদ্দ খাদ্যশস্য ৬ লক্ষ টন না করিয়া ৯ লক্ষ টন করা হউক বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক ফুড কাউন্সিলে দাবি করা হইয়াছিল। কিন্তু কমিটি ইহাতে অসম্মত হইয়াছে। তবে এটুকু আশ্বাস দিয়াছে যে আর্জ্জেন্টিনা, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে অতিরিক্ত ফসল পাওয়া গেলে ভারতের দাবি সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে। মিঃ কে এল পাঞ্জাবী দেশে ফিরিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় আন্তর্জ্জাতিক ফুড কাউন্সিলে মৌখিক সহানুভূতি যে পরিমাণ মিলিতেছে খাদ্য তদনুপাতে পাওয়া যাইতেছে না। তা ছাড়া এই কাউন্সিল মারফৎ ভারতের খাদ্যাভাবের সুযোগ লইয়া চট ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতি সস্তা দরে আদায় করিবার জন্য দরকষাকষির মনোবৃত্তিও বেশ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

জাপানী যুদ্ধের সময় হইতে ভারতে খাদ্যাভাব যেন চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪২ সালে গ্রেগরী কমিটি খাদ্যাভাব দূরীকরণের উপায়স্বরূপ যে-সব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রায় কোনটিই কার্য্যে প্রযুক্ত হয় নাই। ফসল বৃদ্ধি আন্দোলন প্রভৃতির ভার কয়েকটি খরচের দফা বাড়িয়া লইয়া কোটি কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে মাত্র, কাজ কিছুই হয় নাই। সময় থাকিতে দশ লক্ষ টনের একটি রিজার্ভ গড়িবার প্রয়োজনীয়তার উপর গ্রেগরী কমিটি খুব বেশী ঝোঁক দিয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালের প্রাচুর্য্যের বৎসরে ভারত-সরকার এবং বাংলার ন্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রাদেশিক সরকারেরা উহা করিতে পারিতেন; কিন্তু করেন নাই। দুর্ভিক্ষ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলে তাঁহারা হাহাকার করিতে থাকেন কিন্তু সময় থাকিতে মনপ্রাণ দিয়া ফসল উৎপাদন বাড়াইয়া দুর্ভিক্ষের স্থায়ী ও প্রকৃত প্রতিকারের চেষ্টা তাঁহারা করেন না। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও তাই কোনদিনই ঘুচে না।

গণশিক্ষা : ইহার উদ্দেশ্য ও আয়োজন

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

শিক্ষা শক্তির উৎস, একথা মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সত্য, সমষ্টিগত জাতীয় জীবনে তেমনই সমভাবে সত্য। দেহের এবং মনের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটাইয়া পূর্ণতা দান করিতে পারিলে অর্থাৎ সক্ষম বলিষ্ঠ দেহ ও সবল সক্রিয় উন্নত মন একত্রে গড়িয়া তুলিতে পারিলে তবে শিক্ষার সার্থকতা। এইভাবে পূর্ণশিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ শক্তির আধার ; এইরূপ মানুষের সমষ্টি দেশের শক্তিস্তম্ভ। বর্তমানের শিক্ষিত সভ্যদেশ বুঝিয়াছে যে, জাতির শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে শুধু মারণাস্ত্রের ধ্বংসকারী ক্ষমতা বাড়াইলেই চলিবে না, দেশের জনগণকে বিদ্যাবলে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে হইবে। কেননা বিদ্যার আলোকপাতে মানুষের মধ্যে যে শক্তি-সঞ্চার করা যায় মারণাস্ত্র তাহার তুলনায় তুচ্ছ। এ শক্তি শুধু যে শত্রুর দানবীয় দম্ভ চূর্ণ করিতে সমর্থ তাহা নয়, ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সৃষ্টিধর্মী। শিক্ষায় শক্তিমান্ জনগণ বাহিরের আঘাত প্রতিরোধ করিতে যেমন সক্ষম, মানুষের মত বাঁচিতে এবং নিজেদের সংস্কৃতি, সভ্যতা রচনা দ্বারা বিশ্বসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতেও ইহারাই অগ্রণী। বিদ্যা মানুষকে সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন করে ; বিদ্যা-হীনের মধ্যে পশুবলের প্রাধান্য, কিন্তু জ্ঞানের দৈবী শক্তির কাছে পশুবল চিরদিনই পরাভূত হইয়াছে। প্রধানতঃ দৈহিক বলের দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করিতে হয় সেখানেও পেশীর শক্তির সহিত জ্ঞানের শক্তি, বুদ্ধি ও সুরুচি যোগ করিলে কাজটি অধিক শোভনভাবে নিষ্পন্ন হয়। মানুষের জীবনকে সুন্দর সার্থক ও মহান করিতে দৈহিক এবং মানসিক উভয় শক্তির সামঞ্জস্য প্রয়োজন।

সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণ হইতে জীবনের উচ্চতম আদর্শ লাভ পর্যন্ত যে-কোনও কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য জ্ঞান বুদ্ধি অধ্যবসায় নৈতিক বল ও আত্মিক শক্তির আবশ্যক। বিদ্যাই মানুষকে এ সকলের অধিকারী করে। বর্তমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ তাই দেশের প্রতিটি লোককে শিক্ষিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে দেশের এবং সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিতেছে। যে সকল ব্যক্তি বাল্যে প্রতিকূল অবস্থার জন্য বিদ্যার্জন করিতে পারে নাই সেরূপ বয়স্ক লোকদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়াছে গণশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইহার উদ্দেশ্য প্রত্যেক লোকের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনব্যাপী ধারাবাহিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যাহাতে সকলেই উপকৃত হইতে পারে। বলা হইয়াছে যে—

"... the role of adult education is to make every possible member of a state an effective and efficient citizen and thus to give reality to the ideal of democracy."

অর্থাৎ—প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যক্ষম ও উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিয়া গণতন্ত্রের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়াই গণশিক্ষার উদ্দেশ্য। নাগরিকগণ যদি তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন না হয়, তাহারা যদি স্বাধীন মতামত প্রকাশের দ্বারা রাষ্ট্রের পরিচালন-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারে তাহা হইলে গণতন্ত্রের আদর্শই ব্যর্থ হইয়া যায় ; রাজ-নৈতিক চেতনাহীন কতক লোকের অন্ধ সমর্থনের সহায়তায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া অল্পসংখ্যক লোক কর্তৃক গণতন্ত্রের মুখোসে চতুর-লোকতন্ত্র স্থাপিত হয়। যত দিন না জনসাধারণ নাগরিকের অধিকার ভোগ এবং দায়িত্ব-পালনের যোগ্য হইয়া উঠে তত দিন পর্যন্ত গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

যাহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে গণশিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহারা এখন রাজনৈতিক স্বপ্নকে সফল করিবার চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে। আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র হইলেও গণশিক্ষার প্রয়োজন অন্য কাহারও অপেক্ষা কম নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিতে যে দেশ প্রস্তুত হইতেছে তাহার জনগণকে অসীম ধৈর্য, ত্যাগ, সাহস, ঐক্য ও সংঘ-শক্তির পরিচয় দিতে হইবে। চরম দুঃখদাহনকে অম্লানবদনে বরণ করিয়া লইবার যে শক্তি তাহা পশুশক্তি নহে, তাহা আদর্শানুরাগ, স্বদেশ-প্রীতি ও নিষ্ঠাসঞ্জাত নৈতিক বল। শিক্ষা মানুষের মনে এই অপরাজেয় শক্তি সঞ্চার করে।

অবস্থা-বিপর্যয়ে আমাদের দেশে শিক্ষার সঙ্গে, পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা পরমকাম্য সাধনা তাহার—অর্থাৎ দাসত্ববন্ধন মোচন-প্রয়াসের সাক্ষাৎ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই, বরং ইহার বিপরীত চেষ্টা চলিয়াছে। ছাত্রসমাজ ও বিদ্যায়তনকে সর্বপ্রকার রাজনীতির সংস্রব হইতে দূরে রাখিয়া দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নাগরিক গড়িয়া তোলার উদ্যোগ চলিয়াছে শিক্ষাবিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীনে। প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী ইংরেজ শাসনকালের শিক্ষার ফল কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে গত ১৯৪১ সালের আদমসুমারির বিবরণীতেই তাহার পরিচয় মিলিবে।

আমাদের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ জন অশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। অশিক্ষা এবং তৎসহ মানসিক জড়তা, উচ্চ আদর্শের অনুসরণে নিষ্ঠার অভাব, অনৈক্য ও অনুদারতা জাতীয় জীবনে শ্বাসরোধকারী পাষাণের মত চাপিয়া রহিয়াছে। জাতির সর্বস্তরে শিক্ষার আলোকসম্পাত এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা ও মানবতাবোধ সঞ্চার করিতে না পারিলে বহু সমস্যার কণ্টকজালে সমাচ্ছন্ন দেশে প্রকৃত কল্যাণের সম্ভাবনা কোথায়? 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

"...দুর্গম দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যেই ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।..."

এই মূঢ়তার ভার হইতে মুক্ত করিয়া দেশকে জ্ঞান কল্যাণ ও বীর্যের পথে চালিত করার দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রের; মুক্তিপথের অগ্রদূত যাঁহারা তাঁহাদিগকেও এই শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে, কেননা জ্ঞানের ভিতর দিয়াই দেশমাতৃকার বোধন হয়।

সার্জেন্ট শিক্ষা-পরিকল্পনায় বয়স্কদের শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কারণ শিক্ষাকে জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া ইহার প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ জাগাইতে না পারিলে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন, শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা কম। বয়স্ক লোকদিগের শুধু অক্ষর পরিচয় করানোই নয়; তাহাদের দৈহিক মানসিক নৈতিক শক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিয়া তাহাদিগকে যোগ্য ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলা এ শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা-পরিকল্পনায় এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"Literacy is a means and not an end in itself. The end is that whole education of the individual's personality which will develop to the highest degree his physical, intellectual and moral faculties, raise him to the full stature of a man and transform him into a conscious and useful member of society.

কোনও রকমে বর্ণপরিচয় শিক্ষা করিয়া টিপসহি দেওয়ার পরিবর্তে নাম স্বাক্ষর করার কৌশল আয়ত্ত করিলেই বয়স্কদের শিক্ষা সার্থক হইয়াছে ইহা কখনই বলা চলে না। শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন, জ্ঞানের দীপ্তিতে মনের কুসংস্কার দূর করা, মানসিক সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া মানুষকে উদার করা, সুস্থ শোভন জীবনযাপনে সমর্থ করা। এই উদ্দেশ্যে গণশিক্ষাকে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে এবং গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে জনমত এখনও জাগ্রত হয় নাই, সরকারী কর্মপ্রচেষ্টাও আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। পঞ্জাব, বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যাপক চেষ্টা সুরু হইয়াছে এবং তাহার সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর সরকারের এক রিপোর্টে প্রকাশ:

শিক্ষার দিক দিয়া ত্রিবাঙ্কুর ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। এখানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৭'৪৪ জন, কোচিনে ৩৫'৪৩ জন, দিল্লীতে ২৫'৭ জন এবং বরোদায় ২৩'০১ জন।

প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলার শিক্ষিত জনসংখ্যার হার যথাক্রমে শতকরা ১৩'১, ১৯'৫ এবং ১৬'১২ জন।

১৯৩৯-৪০ সনে পঞ্জাবে বয়স্কদের শিক্ষার প্রসার দেখা যায়। এই আন্দোলনের আদর্শসূচক বাণী হইল—Each one teach one, 'পড় আর পড়াও' এই উৎসাহবাণী জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। ফলে ঐ বৎসরেই ৫০,৭৯৯ জন নিরক্ষর বয়স্ক-পুরুষ লেখাপড়া অভ্যাস করে। বিহারের 'তোমার গৃহ শিক্ষিত কর' (Make your home literate) এই আদর্শ বাণীর প্রচারক স্বেচ্ছাকর্মিগণ গণশিক্ষাকে অনেকখানি আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহাদের চেষ্টায় ১৯৪১-৪২ সালে ২৪,২৮৯ জন নিরক্ষর লোক সাক্ষর জ্ঞানের প্রথম আলোক লাভ করে। গণশিক্ষাকে দেশের এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকৃৎ ব্যবস্থায় পরিণত করিতে হইলে ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

জনশিক্ষার পরিচালকদের প্রধান প্রয়াস হইবে জনগণকে এমন শিক্ষা দান করা যাহাতে তাহারা স্বাস্থ্য-নীতি পালন, পৌর শাসন ও রাজনীতি, দৈনন্দিন জীবনে সুরুচি অভ্যাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়। তাই নিরক্ষরদিগকে এই সকল বিষয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া তাহাদের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য জ্ঞান দান করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, স্বাস্থ্যের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। স্বাস্থ্যরক্ষা, সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় নির্দ্ধারণ সুরুচির পরিচায়ক ও স্বাস্থ্যকর গৃহাদির নির্মাণ-পদ্ধতি প্রভৃতির জ্ঞান বয়স্ক লোকদের কাছে আকর্ষণের বস্তু। এই স্বাভাবিক কৌতূহলের পথ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে দেশের বাস্তব অবস্থা বুঝাইতে হইবে।

বাস্তবের রূঢ় সত্যই তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবে। আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের শোচনীয়তার মূলে রহিয়াছে দেশব্যাপী অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। জাতীয় জীবনের এই দুই প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সফল অভিযান ব্যতীত স্থায়ী মঙ্গল আশা করা যায় না। ডাক্তার জে. বি. গ্রাণ্টের 'ভারতের স্বাস্থ্য' (*Health of India*) নামক পুস্তিকার প্রথমেই ভারতবাসীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অবসাদগ্রস্ত ছাড়া আর কেহই চিন্তাকুল না হইয়া পারিবে না। ডাক্তার গ্রাণ্ট লিখিয়াছেন :

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য নিম্নস্তরের। বসন্ত, টাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা প্রভৃতি প্রতিষেধ্য রোগ এখানে বহু-বিস্তৃত। ব্রিটিশ ভারতে ১৯৩৯ সালে ৬১,৬৫,২৩৪ জনের মৃত্যু হয়। ইহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ১৪,১১,৬১৪ জন, বসন্ত রোগে ৪৮,১০০ জন, কলেরায় ৯৭,৫৬১ জন এবং উদরাময় ও আমাশয়ে ২,৬০,৩০০ জন। যক্ষ্মা প্রতি বৎসরই বিস্তার লাভ করিতেছে এবং ক্রমেই নিদারুণ ভীতিপ্রদ সমস্যা হইয়া উঠিতেছে।

চার্ট, ছবি, মডেল প্রভৃতির সহায়তায় জনসাধারণকে সুস্থ সবল হইতে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ম্যাজিক লণ্ঠন ও বেতার যন্ত্র একাজে বিশেষ উপকারে আসিবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার—এবং তাহাকে নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনের আদর্শকে সার্থক করার প্রয়াস হইবে গণশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশশাসনের মূলনীতি, রাজস্বের প্রধান উৎসগুলি অর্থাৎ কিভাবে বিভিন্ন কর সংগৃহীত হইয়া রাজস্বভাণ্ডার পূর্ণ হয় তৎসংক্রান্ত মোটামুটি জ্ঞান, কিভাবে রাজস্ব ব্যয়িত হয় সে সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রত্যেক বয়স্ক নাগরিকেরই থাকা উচিত। প্রত্যেকেই যে কোন-না-কোন প্রকারে সরকারের রাজকোষে কর দিতেছে এবং গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহাদের হিতার্থে সে অর্থের ব্যবহার হইতেছে ইহা জানিলে তাহারা সরকারের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ও নিজ নিজ কর্তব্য এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইবে।

তৃতীয়তঃ, যে বিদ্যা সাক্ষাৎ ভাবে অর্থ উপার্জনের সহায়তা করে না তাহার উপর জনসাধারণের আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। নিছক বিদ্যার জন্য বিদ্যার্জন তাহাদের কাছে অর্থহীন। কাজেই বয়স্ক ব্যক্তিদের এমন শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই যাহা তাহাদের উপার্জনক্ষমতা বাড়াইয়া শিক্ষার সাক্ষাৎ উপকারিতা কতকটা সপ্রমাণ করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, নিরক্ষর চাষীর মধ্যে সার-প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণনা করিয়া ফসল বাড়াইবার উপায় নির্দেশক প্রচার-পুস্তিকা বিতরণের দ্বারা সুফল ফলে নাই। বাস্তব-সমস্যা লইয়া বয়স্কদের কারবার ; এই বাস্তব-সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াই তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, দেশ-বিদেশের ইতিহাস-ভূগোলের কথা, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনী, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে মানুষের বহুবিচিত্র কর্মজীবন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির কথা বয়স্কদের মনে বিস্ময়বোধের সৃষ্টি করিবে। তাহারা বুঝিবে যে, এই বিচিত্র পৃথিবীতে বিরাট মনুষ্যসমাজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক জাতি গড়িয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক সর্বমানবীয় ঐক্যবোধ বিদ্যমান। এই ঐক্যবোধ জাগ্রত হইলে মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর ভাঙিয়া যায় ; সে হয় উদার, অন্য সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন। আমাদের বহু-ধর্মের দেশে মনের উদারতা ও পরস্পরের প্রতি প্রীতির অভাবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতি যখন ব্যাহত হইয়া উঠিতেছে তখন এইরূপ শিক্ষারই একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমতঃ, সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার আলোক ছড়াইয়া দিতে হইলে ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ শিক্ষিত লোক, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারিগণ সকলকেই অনুরাগের সহিত তৎপর হইতে হইবে। এই প্রচেষ্টা হইবে অশিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম। বয়স্কদের জন্য সরল ভাষায় রচিত নানা বিষয়ক পুস্তক জনসাধারণের সহজলভ্য করিতে হইবে। ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ইহার মারফতে পুস্তক পাঠের সুযোগ দান করিয়া, বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্রে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণশিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন উদ্যমের সূচনা করিয়াছে। শিক্ষার সাহায্যে সমাজের সকল স্তরের লোকের জীবনকেই সমৃদ্ধতর, সার্থকতর, শোভনতর করিবার ব্যাপক আয়োজন জগতের সকল জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। দেশের আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তন করার বিষয় কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৩৩

বড় অদ্ভুত লাগিল মেয়েটিকে। প্রথমটা মনে হইয়াছিল গম্ভীর, ব্রীড়াময়ী ; তাহার পর মনে হইল চপল যদি নাও বলা যায় ত মুক্ত প্রকৃতির ত বটেই। প্রথম হয়ত একটা আকস্মিক বিপদের মধ্যে নূতন পরিচয়ে, তাহার পর যে অবস্থায় কাটাইতে হইল প্রথমটা তাহার সঙ্কোচে ওরকম করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর মুক্ত জায়গায় আসিয়া একেবারেই মনের মত জিনিষ সামনে পাইয়া প্রকৃত স্বরূপটি ফুটিয়া বাহির হইল।

যাই হোক, যেন জোয়ারের সঙ্গে বান ডাকিল, এই রকম শিক্ষয়িত্রী পাওয়ার সম্ভাবনায় টুনু যেন উদ্দাম হইয়া স্কুলের নেশায় মাতিয়া উঠিল। এমন যে, ওর প্রকৃতিটাও হঠাৎ যেন বড় লঘু হইয়া পড়িল— ঠিকমত মন বসাইতে পারিতেছে না কোন জিনিষে, কেমন একটা চঞ্চল হ'ল না হ'ল না ভাব। মায়ের টাকাটা আসিতে দেরি হইতেছে ; আসিবেই দুই-এক দিনে, কিন্তু তর সহিতেছে না।

দুই দিন পরের কথা। কি হইয়াছে, স্থিরভাবে বসিয়া পড়াইতে পারে না। ছেলেমেয়েরা পড়িতেছে, টুনু বুকে হাত দু'টা জড়াইয়া পায়চারি করিতেছে, হঠাৎ বুড়ীর নাতনীকে বলিল—"চম্পাকে একবার ডেকে আন ত বিন্দু।"

মেয়েটি ডাকিয়া আনিলে উঠানে নামিয়া আসিল, বলিল—"চম্পা, জায়গাটা বোধ হয় হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

চম্পা একটু বিস্মিত হইয়াই বলিল—"কোন নতুন জমি দেখলেন নাকি আবার ?"

"না, ঐ বটতলারটার কথাই বলছি।"

চম্পা একটু হাসিয়াই বলিল—"আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, হাজার বছরেও বোধ হয় ও জমি হাতফের হয় নি। এখানে ভেতরে কয়লা থাকলে দাম, ও জমিকে কে পোছে ?"

"তা বটে, তা ঠিক বলেছ···" বলিয়া টুনু একটু অপ্রতিভ ভাবেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এ ভাবটা টিকিল না। বোধ হয় মনে মনে তর্কের পথ খুঁজিতেছিল, একটা পাইয়া বলিল—"তুমি বলেছ ঠিক, তবে কি জান ? একটা জমি পড়ে আছে ত পড়েই আছে, যেই একজনের নেবার কথা উঠল, অমনি পাঁচ জনের নজর গিয়ে তার উপর পড়ে। হয়ত ভেবেই বসবে ওর মধ্যে কয়লার সন্ধান পেয়েছি আমি···"

"এখানকার সব জমি ভালরকম জরিপ হয়ে গেছে, কাছাকাছি আর কোথাও কয়লা নেই।"

টুনু যেন একটু বিরক্ত হইল, কতকটা নির্লিপ্তভাবে বলিল, "তা যদি হয় ত থাক্···"

—চম্পা একটু কি ভাবিয়া বলিল—"নৈলে করতেই বা কি পারেন আপনি ? মার টাকা ত আসেনি।"

টুনু বলিল—"সেই ত ভাবনা, কবে আসবে কিছু ঠিক আছে ? জমি বিকিয়ে না যাক সময় ত চলে যাচ্ছে। তাই মনে করছিলাম জমিটা কিনে নি, কিন্তু টাকা ত অত নেই। শ' আড়াইয়েক চাইছে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমার কাছে দু'শ হতে পারে, বাকি পঞ্চাশ টাকা···অথচ ঐ যে বলে গেল···দেরি হয়ে যাচ্ছে···"

যেন তর্কের ভয়ে গড় গড় করিয়া সবটা বলিয়া গিয়া চুপ করিল। চম্পাও একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "আমি যোগাড় করে দিলে হয়ত দেখতে পারি না হয়।"

"তুমি চেষ্টা করবে ?"

—এই আশাতেই ডাকাইয়া আনিলেও টুনু প্রশ্নটা করিল বেশ একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়াই। এটা ইচ্ছা করিয়াই করিল, কিন্তু এর পরের প্রশ্নটা কেমন যেন আপনা হইতেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"ম্যানেজার কিংবা পরেশের কাছে হাত পাতবে না ত ?"

চম্পার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, বিষণ্ণকণ্ঠে বলিল—"ম্যানেজার অবশ্য নেই এখানে, তবুও বিশ্বাস করেন যে ওদের কাছে টাকা চেয়ে স্কুলের কাজে লাগাতে দেব ?"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলিল—"তা নয় মার খানকতক গয়না আছে রুপোর, আমারও খানকতক দিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদা আর বাবাই মিলে—চিরকালটা ত আর এ রকম ছিলেন না বাবা—তাই থেকে কিছু কারো কাছে রেখে এনে দিতে পারি টাকা, বোধ হয় আপনার সবগুলো নাও বের করতে হতে পারে ; কাজ কি হাত একেবারে খালি করে ?"

চাপা উন্মাদনায় টুনুর ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তবুও ঠাট বজায় রাখিবার জন্ত বলিল—"নেহাৎ গয়না বন্ধক দিয়ে আনবে টাকা ?···তা বেশ, ভাল কাজে···কিন্তু একটা সর্তে রাজি হতে হবে—সুদ নিতে হবে···"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"তা তো নেবেই, সে যখন আমায় ছাড়বে না···"

"সেটা ত দিতেই হবে, তা ভিন্ন তুমি যে আমায় দিচ্ছ তার জন্তও সুদ নেবে।"

চম্পা এবার বেশ ভালভাবেই হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"বেশ, কিন্তু আপনি টাকা এলেই ত দিয়ে দিচ্ছেন—দু-চার দিনের মধ্যেই জমতে আর পারছে কোথায় আমার এত ঘটার সুদ ?"

টুনু তাড়াতাড়ি খুব গম্ভীরভাবে বলিল—"তা সঙ্গে সঙ্গে

দিয়ে দোব, তুমি নিশ্চিন্দি থেক, টাকা তোমার আটকে রাখব না—সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবে।"

পর দিনই চম্পা টাকাটা আনিয়া হাতে দিল। টুলু বুঝিল অভাব হইল, তা যতই সুদ দেওয়ার ঘটা দেখাইয়া ব্যাপারটাকে মহাজনী লেনদেনের আকার দিক না কেন। কিন্তু এ সব চিন্তা স্থায়ী হইতে পারিতেছে না, ঐ একটা সর্বগ্রাসী চিন্তা—স্কুল বসাইতে হইবে, আর সময় নাই, এখন আর সব ভুলিয়া একটি মাত্র নেশা! জীবনে ওকে এর আগে এমন করিয়া পাইয়া বসে নাই। পরদিন রৌদ্র মাথায় করিয়া পাঁচ মাইল দূরে রেজেষ্টারি অফিসে গিয়া রেজেষ্টারি করাইয়া আসিল।

ফিরিবার সময় মনে হইল একবার কাকার বাসাটা হইয়া যায়। অনেক দিন আসে নাই এদিকে, দিন তিনেক আগে কাকীমার বাপের বাড়ি থেকে আসিবার কথা ছিল। ওদিকে কাকার সঙ্গে দেখা করিতে খানিকটা সংকোচও হইত, ম্যানেজারের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া তাঁহার ব্যবসার কতকটা বিপন্ন করিতেছে বলিয়া। আর ত সে ভাবটা যাইতে বসিয়াছে; জমি কিনিয়াছে, নিজের ঘর বাঁধিয়া স্কুল গড়িবে, যত শীঘ্র পারে ছাড়িয়া দিবে ও বাসা, ম্যানেজারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। ওর জীবনটা যে এই ভাবেরই সেটা ওঁরা জানেনই, ওদিক দিয়া ওঁদের মন ভাল করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে—বাড়ির সবারই; আজ জানাইয়া দিবে, তাহারই পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিল।…বেশ প্রফুল্ল ভাবেই বাসায় প্রবেশ করিল।

কাকীমা আসিয়াছেন; একটি বোন, বড় হইয়াছে, তাহার নিচে একটি ভাই। টুলু কাকীমার আসার খবরটা বাহিরেই চাকরের কাছে পাইয়া বেশ হৈ হৈ করিয়া প্রবেশ করিল—"এই দেখ! তোমরা এসে গেছ কাকীমা, অথচ আমায় বলে পাঠাও নি। বলবে—কেন, তোর ত জানা উচিত ছিল।…উচিত ছিল আর জানতামও, কিন্তু কি হাঙ্গাম নিয়ে যে পড়েছি!… লিলি, তুই বেবাক মোটা হয়ে গেছিস মামার বাড়ির ভাত আর আদর খেয়ে…বলবি দাদা এসেই খুঁড়লে…তা স্বীকার করছি, কিন্তু খুঁড়ে খুঁড়ে তোকে সাবেক চেহারায় আনতে অনে—ক দিন লাগবে, কি বল কাকীমা?…ও কি, মুখ ভার করলে যে গো!—তুমি স্কুলে-পড়া মেয়ে হয়েও এসব বোঁড়া নজর দেওয়া এখনও মানো না কি কাকীমা?"

কাকীমা মেয়ের চুল বাঁধিতেছিলেন; মুখটা যেন কাঠ হইয়া আছে। একবার চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কে রে কে আছিস, টুলুকে একটা আসন দে। ঐ মোড়াটা না হয় টেনে নিয়ে বোস টুলু।"

কন্যা দাঁতে ফিতা কামড়াইয়া আছে, কথা কহিবার বালাই নাই; ফিরিয়া চাহিয়াই হাসিল, তাহার পর বিনুনিতে টান ধরাইবার জন্য মাথাটা নিচু করিয়া রহিল।

টুলু মোড়ায় বসিলে কাকীমা প্রশ্ন করিলেন—"তারপর, আছিস কেমন বল্।"

ধাক্কা খাইয়াও টুলু প্রসন্নতাটুকু ফিরাইয়া আনিবার আর একবার চেষ্টা করিল, হাসিয়া বলিল—"এই আধ মিনিট আগে পর্যন্ত তো বেশ ভালই ছিলাম, কি ব্যাপার বলো দিকিন, এ কি ভাব! লিলিরই বা এ কি অভ্যর্থনা।"

লিলি ফিতার খুঁট দুইটা হাতে লইয়া হাসিয়া বলিল—"আমার অভ্যর্থনার খাটতি পাবেন না। মামার বাড়ি থেকে কি সব মেওয়া জিনিস এনেছি দেখো, সন্তোষের নজর থেকে বাঁচিয়েও রেখেছি এখনও, তুমি মাড়াবেই না এদিক তো?…"

"তাই রাগ? তা যা নিয়ে আয় শীগ্‌গির; আগে ওঠ্, খিদেও লেগেছে খুব—পাঁচ মাইল পাঁচ মাইল দশ মাইল পথের হিসেব নিয়ে আসছি।…যা ওঠ্, তোর বেণী দেখলে আমার পেট ভরবে না; ছেড়ে দাও খুড়ীমা ওকে।"

লিলি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। কাকীমা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, এদিক ওদিক চাহিয়া অস্বস্তিটা মিটাইবার চেষ্টা করিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন—"তুই বাড়ি চলে যা টুলু।"

এবার টুলুর কণ্ঠস্বরে একটু পরিবর্তন হইল, প্রশ্ন করিল—"কেন?"

কাকীমা আবার একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"কেন আবার!…অনেক দিন বাইরে আছিস। চিরকালটা এইভাবে কাটাতে হবে?"

—টানিয়া টানিয়া এমন ভাবে বলিলেন কথাগুলা যে স্পষ্ট বোঝা গেল, আসল কথাটা এর অতিরিক্ত আরও কিছু। টুলুও গম্ভীর হইয়া গেছে, মাথাটা নিচু করিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন আমি বলব কাকীমা? উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বলিল—কারণ আমি ছোট লোকদের ছেলেমেয়ে নিয়ে রয়েছি। বলো তা নয়। তাদের পড়াচ্ছি, তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করছি…"

কাকীমা খানিকক্ষণ নিরুত্তরই রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন—"ধর যদি সেইটুকুই, তার জন্যেই বা এত মাথাব্যথা কেন তোর?

"সেইটুকুই" কথাটার উপর বেশ একটু জোর দিলেন। কিন্তু এই সময় লিলি খাবার লইয়া আসিয়া পড়ার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, টুলুর সেটা কানে লাগিল না; অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা যেন চাপা দেওয়ার জন্যই বলিল—থাক্, ও রোগ যখন আমার ঘুচবেই না; নিয়ে আয় লিলি, কি এনেছিস।

আহারের সময় যে একটু আধটু কথা হইল সে নিতান্ত নিস্তব্ধতাটা ঘুচাইবার জন্য। আহার শেষ করিয়া টুলু প্রশ্ন করিল—কাকা কোথায়?

কাকীমা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর আবার বলিলেন—ঘুমুচ্ছিলেন ওপরে খোকাকে নিয়ে…বোধ হয় ওঠেন নি এখনও।

বলিবার ভঙ্গিতেই টুলু বেশ স্পষ্টভাবে বুঝিল একটা অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার নিবারণ করিবার জন্যই একটা মিথ্যা ভাষণ করিলেন। বলিল—তা হলে যাই আর ওঠাব না।

শিশির হাত হইতে পান লইয়া দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতে বলিলেন—যা বললাম মনে রাখবি। আর, আসবি মাঝে মাঝে টুলু।

এই অভিজ্ঞতার আস্বাদটুকু কিন্তু মনে বেশীক্ষণ লাগিয়া রহিল না। বাহিরে পা দিতেই মনে পড়িয়া গেল মেয়েটির কথা,—তাহার স্কুলে পড়াইতে আসিবে বলিয়াছে, নিজে হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছে। তাহার নিজের স্কুল, তাহার জন্যই জমি কিনিয়া ফিরিতেছে। জমিটা একবার দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল—ছেলেমানুষের মতই ইচ্ছা একটা,—নিজের জমি, একবার ঘুরিয়া ফিরিয়া বেশ ভালো করিয়া মাড়াইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে। বস্তির মধ্যে দিয়া যাওয়াই স্থির করিল, আজ আর সন্ধ্যার সময় আসিতে পারিবে না।···বস্তিতে গিয়া আজ পর্যন্ত যাহা করে নাই তাহাই আরম্ভ করিয়া দিল--ক্যানভাসিং—তোমার এ মেয়েটিকে তো কৈ দেখি না আমার স্কুলে ; পাঠিয়ে দেবে—নিশ্চয় দেবে···এটি তোমার নাতি ? স্কুলে পাঠাও বাপু ; তোমাদের জন্যে স্কুল খুললাম অথচ···আর স্কুল তোমাদের তো ঘরের কাছেই এনে ফেলেছি, মাইতোর কাছ থেকে বটতলার জমিটা কিনে নিলাম।···ওগো বাছা, তোমার ছেলেটিকে স্কুলে দাও আমার স্কুলে। তোমার মতন তোমার ছেলেও বস্তিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে এইটিই চাও ?···একটা ছেলের মধ্যে কত কি হবার সম্ভাবনা রয়েছে তা জান ? —কালে এই ছেলে হয় তো জেলার জজ হয়ে আসতে পারে ··"

একটা নবতর উন্মাদনার মধ্যে শরীরমন যেন পালকের মত হালকা বোধ হইতেছে, এক পাল ছেলেমেয়ে পরিবৃত হইয়াই বাসায় ফিরিল, সমস্ত স্বপ্নটাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ছেলেমেয়ে হু হু করিয়া এক ঝোঁকে বাড়িয়া গেছে, এখন বিয়াল্লিশটি। সামলানো যায় না, তবুও সুবিধা পাইলেই ক্যানভাসিং করে টুলু। সামলাইতে না পারার কথাটা মনে থাকে না। জায়গা হইয়াছে এই আনন্দেই সবাইকে ডাকিয়া আনে। তাহা ভিন্ন আরও একটা ব্যাপার আছে। কাকীমার কথাটা প্রায় মনে পড়ে—সেই খোঁটাটুকুর প্রতিক্রিয়া-স্বরূপই আরও বেশী করিয়া, আরও নিবিড় করিয়া এদের কাছে টানিতে ইচ্ছা করে।···কেন, মগ্ন পিষ্ট বুভুক্ষিত বলিয়া ওরা আর মানুষ নয় যেন ?

এইজন্যই আজকাল হীরক আর প্রহ্লাদের ছেলেটিকে বেশী করিয়া আমাইয়া লয়—কখনও একটিকে, কখনও বা এক সঙ্গে দুইটিকেই। চমৎকার হইয়াছেও হীরক ; খুব হাসে—এক এক সময় হাসাইয়া ঘাঁটিয়া খেলাই করে টুলু। এক এক সময় ওর হাসিটা বড় করুণ বলিয়া মনে হয়—হীরকের মুখেও হাসি !—বোঝে না তাই তো—এক ধরণের মূঢ় আত্মপ্রবঞ্চনা ; বোঝার সঙ্গে সঙ্গে কি মিলাইয়া যাইবে না এ হাসিটুকু ?

তৃতীয় দিনের কথা—পঁয়তাল্লিশটি ছেলেমেয়ের হট্টগোলের মধ্যে একটু চিন্তান্বিত হইয়া বসিয়া আছে। কাজ আরও অগ্রসর হইয়াছে, বনমালী বাঁশখড়ের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছে পাহাড়ের নীচে। কিন্তু এদিকে সত্যই সামলাইতে পারা যাইতেছে না। আর একজনের দরকার। বেশ ছিমছাম হইয়া কাজ করা অভ্যাস, এ হট্টগোলটা মাঝে মাঝে কানে বড্ড বাজে। পড়াও ঠিক হইতেছে না।

একটু অন্যমনস্ক হইবার জন্য বুড়ীর নাতনীকে বলিল—"হীরাকে নিয়ে আয় তো বিন্দু।"

চিন্তার ধারাটা মনে মনে বহিয়া চলিয়াছে—সাঁকরোলের মেয়েটি পড়াইতে আসিবে। কিন্তু সে তো এখন দেরি আছে। টুলুর ভ্রূ দুইটি হঠাৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল— একটা নূতন দিকে চিন্তার মোড় ফিরিয়াছে—

তাহাকেই ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় ?—পড়ানোর সখ ছেলেমেয়ের সঙ্গে—ছেলেমেয়ে বাড়িয়াছে—ওই স্কুলেই পড়াইবে এমন শপথ করে নাই তো···চিন্তা হঠাৎ আর একটা মোড় ফিরিল—কেন, চম্পা—সে তো স্কুলে পড়িয়াছে—সে-ই পড়াক না তত দিন—তত দিন কেন ? বরাবরই তো পড়াইতে পারে !

এত বড় আবিষ্কার টুলু জীবনে করে নাই—বিস্মিত হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে, এত সহজ কথাটা এতদিন একেবারে মনে পড়ে নাই। আর, চম্পার জীবনের ওপরেও যে এর একটা মস্ত বড় প্রভাব আছে।

একটি ছেলেকে বলিল—"যা চম্পাকেও ডেকে আনবি—তাকেই নিয়ে আসতে বলবি হীরাকে।"

পাঠাইবার প্রয়োজন ছিল না। আজকাল চম্পা চায়ই একটা ছুতানাতা করিয়া কাছে আসিতে—উহারই মধ্যে সাজ-গোজের একটু তারতম্য করিয়া লইয়া। হীরককে কোলে করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—"একে ডেকেছেন ?"

গাল দুইটা টিপিয়া বলিল—"হীরা বাবুকে ?"

নূতন আবিষ্কারের আনন্দে টুলুর শরীরটা যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিতেছে। মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"ডেকেছি আসলে তোমায়।"

"আমায় ?—কেন !"

—প্রশ্নটা করিয়া বিস্মিত ভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"তোমায় একটু স্কুলের কাজে নামতে হবে।"

চম্পার মুখের সব রক্ত যেন নামিয়া গেল, কতকটা ভীত এবং বিরক্ত ভাবেই অনুযোগের সুরে বলিল—"না, আমায়

মাপ করুন, আমি পারব না—ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে…সে আমার দ্বারা হবে না…"

টুনু একটু হাসিয়া বলিল—"তোমায় ক্যানভাসিঙে পাঠাচ্ছি না, ভয় নেই; আমার একলার ক্যানভাসিঙেই এত হয়েছে যে সামলাতে পারছি না—সেইজন্যেই ডাকা। তোমায় পড়াতে হবে।"

চম্পার ভয়ের ভাবটা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, তাহার জায়গায় আসিয়া পড়িল গভীর চিন্তার ভাব, মস্ত বড় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া গেছে যেন—কি করিবে বুঝিতে পারিতেছে না। একটু পরে মুখ তুলিয়া অল্প হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"খুব মাষ্টারনি ধরেছেন তো!"

"কেন, তুমি তো মিশন স্কুলে পড়েছিলে দু'বছর।"

আবার একটু ভাবিল চম্পা, তাহার পর সেই ভাবেই দৃষ্টি তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল—"মস্ত বড় বিদুষী করে ছেড়ে দিয়েছে ওরা! তা বেশ, যদি মনে করেন পারব পড়াতে, পড়ানো যাবে।"

৩২

পর দিন সকাল হইতেই আরম্ভ করিয়া দিল।

মিশনারিদের পদ্ধতিটা কতক কতক জানা আছে, তাহার উপর যেটা করে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই করে; বেশ চমৎকার করিয়াই পড়াইল। স্কুল ভাঙিয়া গেলে টুনু বলিল—"আমার ইচ্ছে নিজে তুমি আরও পড় চম্পা।"

চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল—"কেন, পারলাম না বুঝি পড়াতে?"

"এত ভাল পেরেছ যে আমার ইচ্ছে তুমি এই নিয়ে থাক। আজ তোমার একটা নূতন দিক আমার চোখে পড়ল, নতুন একটা সম্ভাবনার দিক।"

রহস্যের হাসিটুকু চম্পার মিলাইয়া গেল, যেন গভীর একটা বেদনার উপর স্পর্শ দিয়াছে টুনু, ব্যথার আর্তিতেই মুখ দিয়া আপনি যেন বাহির হইয়া গেল—"কিন্তু কে পড়বে আমার কাছে?"

টুনু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"তার মানে?"

"দেখতেই পাবেন…"

সঙ্গে সঙ্গেই এ ভাবটা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আবার হাসিয়া বলিল—"বাঃ, মাষ্টারি করবার লোভ দেখিয়ে ডেকে এনে আপনি আমায় স্কুলে পোক্ত করে নিতে চান, মতলব ভাল নয় ত?"

কথাটা এখন বাড়াইতে গেলেই চম্পা এই ভাবে হালকা করিয়া ফেলিবে বুঝিয়া টুনুও আপাতত হাসিয়া চুপ করিয়া গেল, তবে সংকল্পটা তাহার ভিতরে ভিতরে ঠিকই রহিল। চম্পার ভবিষ্যতে একটা নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে আজিকার এই আবিষ্কারটা; সেই আলোকে ওর জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিয়া ফেলিল টুনু। শুধু চরিত্রে নয়—সেদিক দিয়া চম্পা ত নিখুঁত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—জ্ঞান-বিদ্যার দিক দিয়াও টুনু নিজের শিষ্যাকে অনবদ্য করিয়া তুলিবে। পাঁকের চম্পা শতদলে বিকশিত একটি পদ্মের মতই হইয়া উঠিবে সবার বিস্ময়, তবে ত …।

সাঁকরেলের মেয়েটি মনে পড়িয়া গেল। টুনু দু-একবার ওর কথা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই অন্য একটা কথা আসিয়া বাধা পড়িয়া গিয়াছে, ঠিক করিল আর তুলিবেই না তাহার কথা। প্রথমত, গোড়ায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেও ভাবিয়া দেখিল অত দূর থেকে আসিয়া পড়ানোর অসুবিধা, বাধা দুই-ই আছে বিস্তর। দ্বিতীয়ত, ব্যবস্থাটা শোভনও হইবে কিনা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। এ অবস্থায়, যখন চম্পাকেই হাতের কাছে পাওয়া যাইতেছে তখন ও সঙ্কল্প ত্যাগ করাই যেন ভাল। তা ভিন্ন, সুবিধাজনক আর শোভন হইলেও অনিশ্চিত ত বটেই, তাহার চেয়ে সুনিশ্চিতকে ধরিয়া থাকিয়া গোড়া থেকেই একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া সুবিবেচনার কাজ। তুলিল না প্রসঙ্গটা। তবে চম্পাই তুলিল। স্কুলের জীবনে মস্ত বড় একটা ঘটনা, বিনু আর তাহার ভাই জীবনের কাছে সবিস্তারে শুনিয়াছে, প্রশ্ন করিয়া করিয়া মেয়েটির চেহারার পর্যন্ত একটা চিত্র তুলিয়া লইয়াছে মনে; বিকালে পড়াইতে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"পরশু কে একটি মেয়ে নাকি এসে পড়েছিল ঝড়বৃষ্টির সময়?"

টুনু বলিল—"হ্যাঁ, সাঁকরেলে বাড়ি। তার দুটি ভাই স্কুলে পড়ে এখানে।"

চম্পা অনাসক্তভাবে বলিল—"ও:!…বিনু তাই বলছিল।"

একটু চুপ থাকিয়া হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আর আসবে নাকি?"

টুনু হাসিয়া বলিল—"কি করে বলব?…এমন যদি হয় আবার কখনও সে এই স্কুলের সামনে এসেই ঝড়বৃষ্টির মাঝে পড়ে যায়? আসতেও পারে।"

চম্পা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—"না সেজন্যে নয়, বলছিলাম—বলছিলাম এবার যদি আসে আমায় ডেকে পাঠাবেন কাউকে দিয়ে, পরিচয় করে নোব।"

টুনু আবার হাসিয়া বলিল—"তা দোব, কিন্তু ঐ যে বললাম—অত ঝড়ের হিসেব করে সে বাড়ি থেকে বেরোয় তবে ত?"

এক একটি দিন যেন সফলতার ডালি সাজাইয়া আসে। বনমালীর দেরি হইতেছিল, সন্ধ্যার সময় বাঁশ, খড় প্রভৃতি গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইল। পাহাড়তলী হইতে নিজের বাড়ি গিয়াছিল, সেখানে নিজের বাগান থেকেও এক গাড়ি বাঁশ কাটিয়া আনিয়াছে, তাই বিলম্ব হইয়া গেল। বনমালীর মনেও উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগিয়া গিয়াছে,

বলিল—আমারও এক গাড়ি বাঁশ রইল ছোটবাবু, সাগর বাবুতে কাঠবেড়ালির পিঠে করে একটু ধুলো ঝেড়ে আসা আর কি।

পরদিন খানিকক্ষণ স্কুল করিয়া টুলু বটতলা চলিয়া গিয়াছিল, কি রকম কুলি খাটিতেছে দেখিবার জন্য, কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"চম্পা, একবার দেখবে চলো ব্যাপারটা।"

চম্পা একটু হাসিয়া সহজ কণ্ঠেই বলিল—"এখন দেখবার মতন এমন কি হয়েছে? মোটে তো বাঁশ, খড় এসে পড়ল।"

"বস্তির লোক একেবারে ভেঙে পড়েছে, যে যেমন জানে কাজে হাত লাগিয়ে দিয়েছে—জমি খোঁড়া, বাঁশ কাটা, বাতা চেরা, খড়ের আঁটি বাঁধা, দড়ি পাকানো—যে যেমনটি পারে। শুধু যে কুলি-খরচের দিক দিয়ে সুসার তাই নয়—সেটা তো সামান্য কথা—ম্যানেজারের ওপর আমার জিতটা স্বচক্ষে দেখবে চল চম্পা, এ যেন প্রত্যেকটি লোক নিজের নিজের কাজ বলে ধরে নিয়েছে; চল দেখবে, ওঠো।"

"এদের পড়া রয়েছে যে, আপনিও নেই…"

"থাক না একটু…আর ঠিক তো, মনে পড়ে গেছে—স্কুলের বুনেদ দেওয়া হচ্ছে, আজ ছুটি থাকবে না ওদের?"

চম্পা হাসিয়া বলিল—"স্কুলের বুনেদ পড়বার দিনই পড়া বন্ধ?"

টুলু যেন একটু উত্যক্ত হইয়াই হাসিয়া বলিল—"আবার সেই কথা কাটাকাটি!…না চম্পা, আমি যে অমন একটা প্যাঁচোয়া লোককে কিভাবে হারিয়ে চলেছি দেখতে ইচ্ছে হয় না তোমার? জানই তো গোড়া থেকে সব কথা।"

চম্পা এবার একটু বিষণ্ণ ভাবে হাসিয়া বলিল—"হারটা বজায় থাকতে দেওয়াই ভাল নয়?"

সঙ্গে সঙ্গে টুলু আবার বিরক্ত হইয়া উঠিবার পূর্বেই উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"বেশ, চলুন।"

ছেলেমেয়েদের বলিল—"আজ তোদের ছুটি, নতুন স্কুল হচ্ছে তোদের।"

বাহিরে রাস্তার উপর আসিয়া যেন একবার শেষ চেষ্টা করিল। খুঁটিনাটিগুলা বুঝা না গেলেও বহু লোকের চঞ্চল কর্মব্যস্ততার একটা অস্পষ্ট ছবি চোখে পড়ে, চম্পা একটুখানি দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছি; দু-পাঁচ দিনের মধ্যে ঘরগুলো দাঁড় করিয়ে দেবে।"

টুলু ততক্ষণে ঢালু দিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"নেমে এস, থামলে যে আবার?"

"এই যে, চলুন না।"—বলিয়া চম্পা নামিয়া পড়িল।

সত্যই সবার উৎসাহটা দেখিবার জিনিসই বটে। কিছু রোজে-খাটা মজুরও আছে, তবে বেশীর ভাগই বস্তির লোক। কাজের সময় প্রায় সকলেরই জানা চম্পার, দেখিল সকালের দিকে যাহার যাহার ছুটি সবাই আসিয়াছে, কয়েকজন কামাই করিয়াও যোগদান করিয়াছে। বনমালী যেন মাতিয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ঘুরিয়া, তদারক করিয়া, উৎসাহ দিয়া কর্মমুখর জায়গাটাকে যেন আরও সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। মাঝে মাঝে কি যে বলিতে হইবে বা করিতে হইবে যেন হঠাৎ ভুলিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, মাথা চুলকাইতেছে, আবার নূতন একটা কিছু ঠিক করিয়া এক দিকে আগাইয়া যাইতেছে। ওর দুর্বল মস্তিষ্ক এত প্রবল উৎসাহের সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে পারিতেছে না।

চম্পা টুলুর পিছনে পিছনে আসিয়া এক জায়গায় দাঁড়াইল, যতটা সম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিত দৃষ্টিতে একটা অভিনবত্ব আছে।

চম্পার বাহিরটা প্রশান্ত, কিন্তু অন্তরে যে কি বিক্ষোভ তাহার সন্ধান কে রাখিবে? নিজেই কি সে বিক্ষোভের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে?…টুলু জানে কিছুদিন পর্যন্ত আগেকার চম্পাকে, নিশ্চিন্ত আছে—চরিত্রের দিক দিয়া চম্পা নিখুঁত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চরিত্র কি এতই সোজা? মন কি ছাঁচে-ঢালা লোহার মত একটা নির্দিষ্ট আকার লইয়া থাকিবার জিনিস?…এর মধ্যে চম্পার জীবনে যে অনেক কিছুই ঘটিয়া গিয়াছে, গুণ্ডাদিয়ার আগুনের আগের দিন পর্যন্ত ছিল এক চম্পা, আজকের যে চম্পা সে সম্পূর্ণ পৃথক।…হয়তো টুলু পারিত পরিবর্তনটুকু ধরিতে—বেশ-ভূষায়, হাসিতে, চাহনিতে চম্পা এর অনেকখানি পরিচয় দিয়া গিয়াছে এ ক'টা দিন; কিন্তু নিতান্তই উন্মাদের মত এক লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া ছুটিয়াছে বলিয়া টুলুর নজর পড়ে নাই এদিকে; সে জানে চম্পা নিখুঁত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, নিখুঁতই আছে।

তবুও, আজকের যে চম্পা সে তো সেই প্রথম দিনে দেখা বস্তির চম্পাও নয়; তাই অন্দর-মন্দর অন্তর তাহার বিক্ষুব্ধ। তাহার খুলে আসার পরিণাম সে জানে। সবার দৃষ্টির অন্তরালে বলিয়া তবুও একটু ভরসা করিয়া রাজী হইয়াছিল, কিন্তু আজ টুলুর সঙ্গে এখানে আসার যে কি পরিণাম সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ। তবুও বার কয়েক এড়াইবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত আসিল,—টুলুর বিরক্তিকে আজকাল ওর বড় ভয় হয়।

টুলু নিজের মনের উল্লাসে প্রবল উৎসাহে বকিয়া যাইতেছে, চম্পা মুখে একটা নির্বিকার হাসি টানিয়া রাখিয়াছে—টুলুকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, কিন্তু মন তাহার অন্যদিকে—দেখিতেছে—এক জন দুই জন করিয়া সবার দৃষ্টি তাহাদের দিকে আসিয়া পড়িতেছে—পাশাপাশি সে আর টুলু…দু'এক জন ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল—দূরে কাছে—ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, দৃষ্টিতে বিস্ময়। টুলু বকিয়া যাইতেছে—বেশীর ভাগই চম্পার দিকে চাহিয়া—নিজের নিষ্কলুষ মনের আনন্দে এসবের দিকে দৃষ্টি নাই, এ সবের অর্থ বুঝিবারও ক্ষমতা নাই।

চম্পার মনের ভিতরটা মাঝে মাঝে অসহ্য মোচড় দিয়া

উঠিতেছে। আবার তাহার মাঝে মাঝে আছে একটা দুরন্ত উল্লাস—খ্রীলোক যখন মাবে তখন নিজের কলঙ্কেই পায় আনন্দ—বেশ তো, দেখুক না সবাই—এক সঙ্গে সে আর টুনু —সবাই তো চায় নিজরই—ম্যানেজার চায়, টুনু চায়, চম্পা চাহিলেই কেন দোষ হইবে ?…পরিণাম ?—তাহার তো একটি মাত্র পরিণাম—টুনুকে পাওয়া ; আর সবই তো এর পরের কথা।

তবুও অসহ্য বেদনা, একেবারেই অসহ্য…কত উঁচুতেই না উঠিয়াছিল চম্পা ! হয় না দু'দিক রক্ষা কোন রকমে ? টুনুকেও পায় আর টুনুর ব্রতও থাকে অটুট। পরদিন টুনু সকালবেলাই বাহির হইয়া গেল, চম্পার হাতে স্কুল ছাড়িয়া। যখন ফিরিল, চম্পা যেন মুখাইয়া ছিল, প্রশ্ন করিল—"কত লোক এসেছিল আজ ?"

টুনু উৎসাহের মাথায় বলিল—"অত লক্ষ্য করি নি, তবে এসেছিল বইকি। হঠাৎ এ কথা জিগ্যেস করলে যে ?"

চম্পা একটু ম্লান হাসিয়া বলিল—"বড্ড অন্যমনস্ক আছেন আপনি, যাকে বলে মেতে আছেন, সবাই আসে নি। কাল যাদের দেখেছিলাম তাদের অনেকেই নেই আজ।"

—দশ-বারো জনের নাম করিয়া গেল।

টুনু প্রশ্ন করিল—"এল না কেন ?"

চম্পা তিনটি ছেলেকে একত্রে লইয়া পড়াইতেছিল, উঠিয়া পড়িল, বলিল—"এদিকে আসুন।"

উঠানের সদর দিকের যে দরজা, দুই জনে সেই দিকে চলিয়া গেল, চম্পা চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একবার স্কুলের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"সত্যিই আপনি মেতে রয়েছেন, স্কুলের অবস্থা দেখেও বুঝছেন না ?"

টুনু এতক্ষণে যেন অন্য দৃষ্টিতে দেখিল, একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"তাই তো, প্রায় অর্ধেক ছেলেমেয়ে আসে নি ; কেন, আজ দিনটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কাল রাত্তিরে বৃষ্টিটা হয়ে…"

"দিন ঠাণ্ডা থাকলেই যে মানুষের মেজাজ গরম হবে না তার কি মানে আছে ?"

"বুঝলাম না।"

"মনে আছে আপনার ?—যেদিন প্রথম এখানে এসে থাকবার কথা ওঠে আমার, রাজী হই নি ; কালও আপনি যখন আমার আপনার সঙ্গে বটতলায় যেতে বললেন ম্যানেজারের হারটা দেখবার জন্যে, আমি বলেছিলাম—বন্যার থাকতেই দিন হারটা। আপনি শুনলেন না। হার বন্যার রইল না, ওই শেষ পর্যন্ত জিতল, ওর কূট চালটাই কলল শেষ পর্যন্ত—আমার যে উদ্দেশ্যে ওর পাঠানো এখানে…"

টুনু শূন্যে একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতেছিল, দৃষ্টিটা ফিরাইয়া আনিয়া বলিল—"বলছ কলল,—এতদিন কলে নি কেন ?"

"এই দু'চার দিনের মধ্যে যে ভুলটা হ'ল তা এতদিন হয় নি বলে। আমি এখানে আছি বটে কিন্তু বাইরের সবাই জানত আমাদের মধ্যে পরিচয় নেই তেমন, এত মাখামাখি তো দূরের কথা। এর ওপর আপনিই আর একটা বড় চাল দিয়ে রেখেছিলেন নিস্তিনকে আনিয়ে—লোকে জানত দু'জন মেয়েছেলে এখানে রয়েছি আমরা, আমি রয়েছি বুড়ো ঠাকুর-দাদার হেফাজতে, নিস্তিন রয়েছে দীদার হেফাজতে।…প্রথম ভুলটা হ'ল আমার স্কুলে পড়াতে ডেকে এনে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন আমি খুশী মনে রাজী হই নি ; তবুও একটা আশা ছিল যে সবার চোখের আড়ালে, ততটা ক্ষতি হবে না ; কাল কিন্তু আমার সঙ্গে করে বটতলায় নিয়ে যাওয়ার মত বড় ভুল হয়ে গেল। আমি টের পেয়েছিলাম—আমি স্কুলে আসতেই ছেলেমেয়েদের মুখে কথাটা শুনে, বস্তিতে একটা কানাঘুষা উঠেছিল, বটতলায় আপনার পাশে আমায় দেখে কারুর আর সন্দেহ রইল না যে…"

টুনু প্রশ্ন করিল—"ম্যানেজার এসেছে ?"

"না, শুনছি চারদিকে যে হাঙ্গাম চলছে তা নিয়ে কলকাতায় নাকি বড় বড় কোম্পানীর মাতব্বরদের মিটিং হচ্ছে ক'দিন ধরে। হয়তো দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবে, তবে আমাদের ম্যানেজার তো অনেকটা নিশ্চিন্তই আছে বলে মনে হয়, জানে একদিন ওর কূট চাল সফল হবেই। আমি এই জন্যেই আসতে চাই নি, বড় সূক্ষ্ম চাল ওর, কখনও বাতিল হতে দেখি নি। জানে একটু এদিক ওদিক হলেই বাজি মাৎ হবে, আর একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটু এদিক ওদিক হয়েই পড়বে কোন-না-কোন সময়—কত সাবধানে থাকতে পারে মানুষে ?"

টুনু চিন্তায় যেন ডুবিয়া যাইতেছে, চম্পা থামিলে বলিল—"সবটা যেন ধরে নেওয়া হচ্ছে ; বস্তিতে গিয়ে একবার বলো না সবাইকে কত বড় কাজটা হচ্ছে আমাদের।"

এত বড় একটা অবিবেচকের মত কথা বলিবে চম্পা যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"এর ওপর আবার এতটা ভুল করবেন ?"

টুনুর মুখটা ধীরে ধীরে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, খুবই অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে, দুশ্চিন্তাটা চম্পার উপর বিরক্তি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াই বেশ ঝাঁঝিয়া বলিল—"তোমাদের মেয়ে-ছেলেদের একটা স্বভাব দেখেছি চম্পা, খারাপ দিকটা দেখতেই ভালবাস ; বেশ, তুমি না যাও, আমি নিজেই যাব —আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে যদি ওদের সবার মন উল্টে যায়, বুঝিয়ে বলতে হবে, উপায় কি ?"

৩৫

সাঁকরেলের কথাটা চম্পা হঠাৎ আসিয়া পড়ায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার মনে পড়িয়া গেল। হন্ হন্ করিয়া চড়াইয়ের পথ ধরিয়া চলিল। চম্পা হাত দুইটা সরাইয়া

খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

সাঁকরেল টুনুর আরও অপরিহার্য ভাবে দরকার হইয়া পড়িয়াছে। চম্পাকে ত্যাগ করিতে হইল না, চম্পা নিজেই গেল। এ যে কত বড় নৈরাশ্য টুনু যেন হিসাব করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এ নৈরাশ্যের অতলতার মধ্যে বুদ্ধির যেন পথ হারাইয়া যায়। ফুলের সবে এই আরম্ভ ছিল। আশাই ছিল না হয় প্রচুর। কিন্তু তবু তো অনিশ্চিতই; কিন্তু চম্পা যে ছিল তাহার তপস্যার সিদ্ধিমূর্তি একেবারে; শুধু তাহাই নয়, নিজের তপশ্চর্যায় চম্পা যে টুনুর ধারণাকেও গিয়াছিল ছাড়াইয়া, তাহার চারি দিকের শুচিতা দিয়া টুনুকেও পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেছিল বলিয়া মনে করিতেছিল টুনু।...সব ভুয়া; তিল তিল করিয়া এই লালসাই সঞ্চিত হইতেছিল এত দিন—ব্যর্থ যৌবনের এই হা-হুতাশ?

টুনু যেন জোর করিয়াই মনটাকে এই চিন্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।...সাঁকরেলের সেই মেয়েটিকে গিয়া বলিবে, কতদূর অগ্রসর হইয়াছে জানাইবে, তাহার মাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহারও সম্মতি লইবে।...বেশ একটি আনন্দ ছাইয়া আসিতেছে মনে—সমস্ত ব্যাপারটি শুভ্র, পরিচ্ছন্ন, দিবালোকের মত স্বচ্ছ। না রাজী হন ওর মা, টুনু সাঁকরেলে গিয়াই নিজের স্কুল বসাইবে। পর পর দুইটা আঘাতে মনটা একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আবার যেন জোর পাইতেছে। শুধু এইটুকুই নয়, মনের উপর হইতে যেন মস্ত বড় একটা বোঝা নামিয়া গিয়াছে।...ঠিক তো, একটা বোঝাই তো ছিল চম্পা, নিত্য খোঁজ রাখে, নিত্য সতর্ক থাকে, যদি ম্যানেজারের ওখানে গেল তো চোখে কি দৃষ্টি লইয়া ফিরিল—যে-পথ ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে, আবার সেই পথে নামিয়া যাইতেছে না তো?

শুধু চম্পা নয়, আরও যত কিছু সমস্যা লইয়া সারা শহর-তিহিটাই দূরে হইয়া যাইতেছে প্রতি পদক্ষেপেই;—নক্ষত্র-লোকের নীচে স্তব্ধ রজনীর এই আত্মসমাহিত মুক্ত রূপটি ধীরে ধীরে টুনুর মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যাক্, শহর-তিহি যাক্, ও নূতন জায়গায় নূতন করিয়া সব গড়িবে।

টুনু পা চালাইয়া দিল। রূঢ় দুইটা আঘাতের পরেই এই নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া দেহে মনে উৎসাহের জোয়ার আসিয়াছে, এই নূতন আলোর সামনাসামনি হইয়া দাঁড়াইতে যেন বিলম্ব সহিতেছে না; মনটা হইয়া উঠিয়াছে একেবারে উদগ্র।

এর পরই একটা ব্যাপার হইল যাহাতে জীবনের সমস্ত ধারাটাই একেবারে বদলাইয়া গেল।

সামনে, প্রায় শত পঞ্চাশেক দূরে একটা ছইওলা বলদের গাড়ি যাইতেছে, চড়াই-উৎরাইয়ের মুখে কয়েকবার চোখে পড়িয়াছে, নির্জন পথে একটা সঙ্গী হিসাবে মন্দ লাগিতেছিল না, তবে মানুষের অতি-সান্নিধ্য এতক্ষণ ভাল লাগিতেছিল না বলিয়া এই ব্যবধানটুকু কমাইবার কোন চেষ্টা করে নাই টুনু; বন থেকে বেনটা কাটিয়া যাইতে এই জনহীন জায়গায় ঐ একটি মানুষকে (হয়তো একাধিকই) কেমন যেন বড় আত্মীয় বলিয়া মনে হইল। গতিবেগ বাড়াইয়া গিয়া গাড়ির পিছনে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাবে গো কর্তা?"

একা গাড়োয়ানই, চকিত হইয়া হঠাৎ বলদ দুইটার রাশ টানিয়া দিল, ছইয়ের পাশ দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া একটু ভীত কণ্ঠেই সাহস আনিয়া প্রশ্ন করিল—"কে বটে?"

"চলো, ভয় নেই, আমি রাহী একজন। কোথায় যাওয়া হবে?"

"চাপাডাঙা।...মশায়?"

"সাঁকরেল।"

"সাঁকরেল যাবেন?—তা বসেন ক্যানে ছইয়ের ভেতরকে, আমিও উর কাছ দিয়েই যাব বটে, শিবতলার তেমাথা থেকে ডাইনে ঘুরব, আপুনি বাঁয়ে যাবেন।"

মন্দ নয়, পা দুটি ভারিয়া আসিয়াছে, গাড়ি দেখিয়া বোধ হয় আরও। টুনু পকেটে হাত দিল, একটা মনিব্যাগ থাকে সর্বদা, ঠিক আছে। বলিল—"তা আপত্তি নেই, তবে কিছু পয়সা নিতে হবে বাপু; নয় তো হেঁটেই যাই গল্প করতে করতে। তোমার নামটি কি?"

পয়সা কাড়ার জায়গায় দেওয়ার কথায় আরও একটু ভরসা হইল বোধ হয়, গাড়োয়ান বলিল—"নামটি আমার নটবর আজ্ঞে, নটাই দাস বলে ডাকে সবাই, তা পয়সা ক্যানে গো?—গাড়ি তো আমার উই পথেই যাবেক।"

"তা হোক, পয়সা নিতে হবে; তোমার বলদের একটু মেহনৎ হবে ত?"

"হুঁ, ভারী মেহনৎ বলদের! আপুনি উঠেন।"

পিছন দিক দিয়া উঠিতে উঠিতে টুনু বলিল—"উঠছি, পয়সা কিন্তু নিতে হবে।"

"তা দিবেন গো, দিলে কেলে দিবোক নাকি?"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া লইল, টুনু উঠিয়া বসিলে একটা বলদের লেজ মলিয়া অপরটার পিঠে চাপড় দিয়া বলিল—"চল্, বাবুমশায়কে পৌঁছিয়ে দিবি ঘরে।...পয়সা দিবেন ত ঘরেই নামায়ে দিয়ে আসি গো, চলেন। কার বাড়ি যাবেন?"

টুনু একটু সমস্যায় পড়িল, একটা প্রশ্ন করিয়া উত্তরটা এড়াইয়া গেল—"তুমি সাঁকরেলের সবাইকে চেন?"

"সবাইকে কি করে চিনবোক মশায়?—আমার ঘর হুথায়, আর হুথায় সাঁকরেল!—মাঝখানে দুকোশ পথ। তবে চিনি বৈকি, গাঙ্গেদের চিনি; বিনোদ্ গাঙ্গু মশায়, রাণীগঞ্জ কয়লা আপিসে বড় চাকুরি করতোক তিনি। আমি তাঁর বাড়িতে চাকর থাকলাম কি না; চিনি, তা তিনি ত নাই এখন, মারা গেলোক, সেই থাকাদ আমিও এই বলদ

দুটা লইয়ে কাটাছি মশায়।…হ্যাট রে হাট্! আপুনি না চললে, সেকটি বলে বলে কখনও চালাম যায় মশায়? কত বলবেন আপুনি—হাবে' ব্যাখাটি ধরে যাবেক নাই?… হ্যাট্!…"

লেজে হাত দিয়া বলদ দুইটাকে আর এক চোট তাড়া দিল।

টুনু উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, প্রশ্ন করিল—"তা হলে চেন তাদের তুমি?"

"হুঁ, চিনি না?—তাঁর পরিবারটি আছেন—গিন্নিমা, বড় অসুখ হইঁছে, কাল দেখাটি করতোক এসে…দুইটি ছাওয়াল, একটি মাইয়া; তা আপুনি নাই ত পরিবারই কি, ছাওয়ালই কি, মাইয়া কি?"

"আমি ওদের বাড়িতেই যাব।"

"কে বটে আপুনি উদের?"—ছইয়ের মধ্যে ঘুরিয়া দেখিল।

নিজের পরিচয়টা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু থামিয়া গেল, বলিল—"এমনি জানাশোনা আছে। তুমি তা হলে এখন এই কাজ কর? বাড়ি চাঁপাডাঙা বললে না?—সেখানেই থাক?"

"উখানে কি রোজগার হবেক মশায়? থাকি গঞ্জডিহির বাজারে, ই গাড়িটি খাটাই…"

টুনুর বুকটা ধক করিয়া উঠিল, আপনা হইতেই ছইয়ের গা ঘেঁসিয়া একটু গুটাইয়া বসিল। গাড়োয়ান নিজের মনেই কাহিনী বলিয়া যাইতেছে,—ঘরে তিনটি ছাওয়াল-আছে—পরিবার আছে—দুইটি মাইয়া—কত শক্ত যে সবার মুখে একমুঠা অন্ন দেওয়া…টুনুর কিন্তু কান নাই সেদিকে বিশেষ, মনে নূতন চিন্তার ঢেউ উঠিয়াছে, ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মুখটা বাহিরের দিকে একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"তিনটি ছেলে দুটি মেয়ে বললে না? বেশ…তা এদের লেখাপড়া শেখাবার কি ব্যবস্থা করছ?—অন্তত ছেলে তিনটির ত দরকার?…

"গঞ্জডিহিতে ত সুবিধেও আছে বেশ…"

মুখটা ফিরাইয়াই রহিল উল্টা দিকে, কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্য কান দুইটা খাড়া করিয়া।

নটাই দাস একটু ভেবাচ্যা হইয়া বসিল—"লেকাপড়া? হ, বুলেছেন বটে!…বিড়ি দিবেন একটা? আছে?"

"আমি খাই না বিড়ি।"

"সিকরেট?"

"না, ও পাটই নেই।"

"একটু রদ্ ক্যানে, তামুকটা বনায়ে' লি?…লেকাপড়া! হুঁ!…"

গাড়িটা থামাইয়া ছইয়ের গায়ে ঝোলানো একটা হুঁকা থেকে কলিকাটা নামাইয়া লইয়া তামাক সাজিতে লাগিল। টুনু হঠাৎ এই ভাব-পরিবর্তনে একটু বিস্মিত হইল, তবে সাজার মধ্যে আপন মনেই বার দুয়েক—"লেকাপড়া হুঁ!…লেকাপড়া—হুঁ!…" বলায় বুঝিল প্রশ্নটা ওর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। ব্যাপারটা কিভাবে বিস্তারলাভ করে চুপ করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

তামাক সাজা হইলে নিজেই গোটাকতক টান দিয়া নটাইদাস গাড়িতে উঠিয়া বসিল। বাঁ হাতে হুঁকাটা মুখে সংলগ্ন করিয়া বলদ দুইটাকে চালু করিয়া বেশ একটু উত্তেজনার সঙ্গেই বলিল—"লেকাপড়া! হুঁ!…লেকাপড়ার কথা আর বুলবেন না বাবু মশায়!"

"কেন গো? আজকাল সবাই ত পড়াচ্ছে ছেলেমেয়েদের—মেয়েদেরও—"

—উত্তরটা যেন জানা-ই, শুধু কিসের সম্মোহনে ওর মুখ দিয়া যেন বাহির করিয়া লইতেছে টুনু; বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতেছে, কণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে শুষ্ক।

নটাইদাস তিন-চারটা খুব ঘন ঘন টান দিয়া লইয়া বলিল—"হুঁ, পড়াইছেঁ। আমিও তো দিতাম শিখতে—দুকানের মায়েরে বুললাম—পয়সা কুথায় পাব ইস্কুলের—পেট চলাটিই ভার, তা মাষ্টার মশায় বাসায় এক বাবুটি ইস্কুল খুললেক, পয়সা লাগে নাই, সিলেট দিইঁছে, বই দিইঁছে, তুর দুকানকে আর হারানকে দে, বিদ্যা করে দিই তেনাকে, উদের বাপের মতন বলদ ঠেলতে হবেক নাই…উদের মা বুললেক—তা নিয়ে যাও ক্যানে, পেটে দুটো কেতাবের হরফ ঢুকুক, দুটো ইন্-জিরী গান শিখলেও মানুষ বনে' যাবে।…এই-ই থেপে নিয়ে আসব মশায়, ভেতরের কেচ্ছা বেইরে এলোক আজ্ঞে—পাপ তো ঢাকা থাকে নাই মশায়—আগুনটি তো চাপা থাকবেক নাই!…"

টুনুর কপালে ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে, সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে, নিজের মৃত্যুর রায় শুনিতেছে টুনু। তবু শোনার একটা আগ্রহ—আরও স্পষ্ট করিয়া শোনার; বলিল—"ঠিক বুঝলাম না—কেচ্ছাটা কিসের?"

"সে আপুনি বুঝবেন নাই; আপুনি কুলবধূ ভদ্দর লোক, উসব কেচ্ছা আপুনি বুঝবেন কেমনটি করে মশায়?"

ইহার পর চম্পা-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা শাখাপ্রশাখায়, অলঙ্কারে এবং 'কুলবধূ ভদ্দর লোক'-এর বুঝিতে বেগ পাইতে না হয় এই রকম উপযোগী ভাষায় বর্ণনা করিয়া গেল, চম্পার পূর্বকাহিনী সম্বন্ধে যথোপযুক্ত টীকাটিপ্পনী সমেত।

টুনুর এতক্ষণে আর একটা সন্দেহ হইল, আগেই হওয়া উচিত ছিল, মনটা নিতান্তই উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া হয় নাই, ছইয়ের ভিতরকার অন্ধকারেই যতটা পারিল দেখিল ছইটা, বাহিরে বলদ দুইটিকে এবং গাড়োয়ানকেও বেশ ঠাহর করিয়া দেখিল, সন্দেহের ভাবটা কাটিয়া গিয়া যাহা আন্দাজ করিয়াছিল সেটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তবু সব স্পষ্ট করিয়া শোনার মোহেই প্রশ্ন করিল—"তুমি দেখেছ বাবুটিকে নটাই? বয়ো যদি

বুড়ো মানুষই হয়, মিথ্যে হওয়াই তো সম্ভব এ সব অপবাদ—বলো না গো ?…

নটাই দাস হুঁকায় টান দিতে দিতে একটু ঘাড় বাঁকাইয়া শুনিতেছিল, মুখটা ফিরাইয়া লইয়া আবার খানিকটা তেরছা হইয়া বসিয়া বলিল—"দেখি নাই !—কি বুলছেন আপুনি মশায় ? পান মশয় ছেলে মাইয়ারে আনতে আনতে সিদিন বড় বিহারে উই ইস্কুলে গিয়া উঠলাম নাই গাড়িসুদ্ধ ?—উ গাড়িটি ছুলে তুলে দিলেক নাই ?…পান মশয় ছেলে মাইয়া উয় বাসাটিতে গিয়া উঠলোক নাই ?…বুড়া মানুষ আছে !—আপুনির চেয়েও লোতুন জোয়ান—দিখি নাই আমি ! বুড়া মানুষ—হঁ !…"

উত্তেজনায় ঘুরিয়া খুব কষিয়া বলদ দুইটার লেজ মলিয়া এক ঝোঁকে দৌড় করাইয়া দিল, তাহার পর ঘুরিয়া বসিয়াই আবার হুঁকায় মনোনিবেশ করিল।

যে-কোন কারণেই হোক, টুনুকে চিনিতে পারে নাই ; সে দিন প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দেখা, আজ দুর্বল জ্যোৎস্নায়—হয়তো সেইজন্যই। টুনু নিজেকে আরও যতটা সম্ভব প্রচ্ছন্ন করিয়া বসিল। প্রশ্ন করিল—"পানেদের বাড়িতেও জানে নাকি ?"

"জানে না ?—বুলেন কি মশায় ! সাতখানা গেরামে চি চি পড়ে গেলোক ; ঘটা করে বাড়ি করছিলোক, এখন ভাবেন গিয়া তখুনি পড়ছেঁক !…জানে না কি গো !…কি বুঝছেন আপুনি ?…"

এর পর আর কোন প্রশ্ন করিল না টুনু। মনটা এমন অবশ হইয়া গেছে, বেশ ভাল করিয়া কিছু যেন ভাবিতে পারিতেছে না। নটাই দাস বকিয়া যাইতেছে, কখনও একটু স্তিমিত, কখনও উত্তেজিত, এক একটা কথা কানে আসিয়া বাজিতেছে। বাকিগুলা হাওয়ায় ভাসিয়া যাইতেছে। এক সময় গাড়িটা একটা তেমাথার মুখে আসিয়া পড়িতে টুনুর চমক ভাঙিল, সিধা হইয়া প্রশ্ন করিল—"শিবতলায় মোড় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

টুনু অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল, মাথায় কোন বুদ্ধি আসিতেছে না।…গাড়িটা বাঁ দিকের রাস্তায় ঢুকিয়া পড়িল। টুনু একটু হামাগুড়ি দিয়া ছইয়ের পিছন দিকে হঠাৎ খানিকটা আগাইয়া গেল—একটা বিপদ হইতে যেন ছুটিয়া পলাইতে চায়। তাহার পর প্রাণপণে নিজের মনটাকে গুছাইয়া লইয়া একটু ভাবিয়া বলিল—"নটাইদাস মাথা ঘুরলে না ?…একটু থামো তো…"

গাড়ি থামাইয়া নটাই ঘুরিয়া চাহিল। টুনু বলিল—"ইয়ে মাথাটা একটু ধরেছে ছইয়ের গরমে…ভাবছি হেঁটে যাব—তুমি নিয়ে যাও গাড়ি…"

"মাথা ধরল তো একটু শুয়ে পড়েন ক্যানে, এখনও তিন পোয়া রাস্তা বটে…"

টুনু যেন তর্কের ভয়েই তাড়াতাড়ি গাড়ির পিছন দিয়া নামিয়া পড়িল, বলিল—"না, খানিকটা হেঁটে গেলেই ঠিক হয়ে যাবে—মাথায় হাওয়া লেগে ; আমি নামলাম।"

"তা সঙ্গে চলি, ঠিক হয়ে গেলেই আবার উঠবেন গো…তিন পোয়া রাস্তা…"

"না, তুমি যাও ; তিন পো আবার রাস্তা, আমি হেঁটেই যাব—ঘুরিয়ে নাও গাড়িটা।"

মাথা ধরুক না ধরুক, মাথায় গোলমাল আছে, নটাইদাস ছইয়ের মধ্য দিয়াই একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ডানদিকের বলদের রাশ টানিয়া গাড়িটা ঘুরাইয়া লইল। খানিকটা গেছে, টুনুর মনে হইল পয়সাটা দেওয়া হয় নাই। একবার পকেটে হাত দিল, তাহার পর কি ভাবিয়া আর ডাকিল না।

টুনুর মনে আর এতটুকুও মাধুর্য অবশিষ্ট নাই, উদারতা তো দূরে থাক।

৩৬

দ্বিতীয় দিনের কথা। অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে, বট-তলায় খোয়াইয়ের ধারে একটা শিলাখণ্ডের উপর টুনু বসিয়া-ছিল। কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ উঠিবে, পূর্বাকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে। ঈষদুজ্জ্বল অন্ধকারে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে টুনু। বাঁশ, বাতা চারি দিকে ছড়ানো, কতকগুলা খুঁটি এখানে-ওখানে আধ-হেলা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আজ বৈকালে একটা দমকা হাওয়া উঠিয়াছিল, খড়ের আঁটিগুলা লইয়া যেন লোকালুফি করিয়া গিয়াছে ; গোটা তিন বড় আঁটি গড়াইয়া খোয়াইয়ের গর্তে পড়িয়াছে।

কাল বিকালে আরও কম লোক আসিয়াছিল, আজ সকালে আসিয়াছিল মাত্র রোজে-খাটা মজুররা ; বিকালে কে আসিয়াছিল, না আসিয়াছিল টুনু জানে না, সে নিজে আসে নাই এদিকে।

বনমালী এক প্রস্থ যোগাড় দিয়া আবার সরঞ্জাম আনিতে গিয়াছে ; কবে যে ফিরিবে সেই জানে, অথবা হয়তো বিধাতা-পুরুষও জানেন না। কাজের উত্তেজনায় সময়ের গোলমাল হইয়া যাইতেছে ; পাঁচ দিন পরে ফিরিয়া তিন দিনের হিসাব দিল, বাকি দুই দিন হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

বিকালে টুনু যখন বাহির হয়, চম্পা বিন্দু জীবন আর গুটি চারেক অন্য ছেলে লইয়া বসিয়াছিল—বস্তির নয়, বাজারের ওদিকের ; টুনুর দিকে একবার বিমূঢ় দৃষ্টি তুলিয়া চাহিল, কিন্তু প্রশ্ন করিবার সাহস যোগাইল না।

চম্পার কথাগুলা টুনু প্রথমটা অগ্রাহ্য করিতেই চাহিয়াছিল, তাহার পর যেমন সময় গেছে, অল্প অল্প শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেগুলা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। সত্যই সে

পরাজিত, বিকালে স্কুল, বটতলা—দুই জায়গারই এই রূঢ় দারুণ সত্যটুকু স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আজ সকালে আরও বেশী করিয়া ; তাহার বস্তি শ্মশানে পরিণত হইয়া গেছে, কাল থেকে আজ পর্যন্ত দুইটা দিন যেন একটা ঘূর্ণির মধ্যে কাটাইয়া ক্লান্ত শরীরে, অবসন্ন মনে টুনু সেই শ্মশানের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে। তাহারই হার, খুব সূক্ষ্ম তুলি দিয়া ম্যানেজার রতিকান্ত তাহার ললাটে কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া দিল, এত সূক্ষ্ম যে টুনুকে একবার টের পাইতেও দিল না।

কাল থেকে টুনুর আহার নাই, নিদ্রা নাই, কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কি কি করিয়া, ভাল ভাবে মনে পড়ে না। শুধু একটা জ্বালা,—আক্রোশে, ঘৃণায় মনটা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যতই সময় গিয়াছে সে দাহ গিয়াছে বাড়িয়া। …একবার ম্যানেজারের বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, গিয়া কিছু একটা করা দরকার, না হইলে বাঁচা যায় না ; বাড়ির বাহির হইবার আগেই মনে পড়িল ম্যানেজার নাই ; ব্যর্থ আক্রোশটা নিজেকেই দ্বিগুণ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল।… তাহার পর যত আক্রোশ, যত ঘৃণা একসঙ্গে গিয়া পড়িল বস্তির উপর—এই ইহাদের-ই জন্য সে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছিল—একবার ভাবিয়া দেখিল না, খোঁজ লইয়া দেখিল না, চম্পা শুধু তাহার পাশে আছে বলিয়া এমন একটা কুৎসিত সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া তাহাকে এক কথাতেই পরিহার করিয়া বসিল।—দুই দিন আগে যেমন না খোঁজ লইয়াই তাহাকে দেবলোকে তুলিয়া ধরিয়াছিল। টুনু চম্পাকে বলিয়াছিল সে নিজেই বস্তিতে যাইয়া সবাইকে বুঝাইবে। প্রস্তাবটা যে কতটা হেয়, কতটা লজ্জাকর সেটা নিজের কাছেই প্রতীয়মান হইতে দেরি হইল না। যাওয়া দূরের কথা, বস্তির পানে চাহিতেও যেন গা ঘিনঘিন করিতেছে।

দুইটা দিন এইভাবেই গিয়াছে—ঘৃণা, আক্রোশ, লজ্জা, অভিমান, সবার উপর দারুণ আশা-ভঙ্গ, তাও আশা-উন্মাদনা যখন একেবারে চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছিল,—সব মিলিয়া একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া শুষ্ক পত্রের মতই উড়াইয়া লইয়া ফিরিয়াছে টুনুকে।…তাহার পর, এই একটু আগে এইখানে আসিয়া বসিল।

এই প্রথম এক জায়গায় বসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা একটু স্থির মনে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। প্রথমে কলঙ্কের বিভীষিকাটাই গেল হঠাৎ বাড়িয়া, শুধু ত বস্তি পর্যন্ত নয়, আরও ঢের কাছে, লজ্জাকে আরও গভীরতর করিয়া কলঙ্ক পড়িয়াছে ছড়াইয়া,—সেদিনে কাকীমার কথাগুলা, তাঁহার ব্যবহার নূতন অর্থযুক্ত হইয়া উঠিল। শুষ্ক, বিরস কণ্ঠস্বর, এতটুকু হৃদ্যতা নাই কথার মধ্যে।…“তুই বাড়ি চলে যা টুনু”…“কেন ?”…“কেন আবার, চিরকালটা এই ভাবে কাটাতে হবে ?”…নির্দোষ মনের নির্বিকারত্বে টুনু বলিতেছে —“কেন, খারাপ খুড়ীমা ? কারণ, আমি ছোটলোকদের ছেলেমেয়ে নিয়ে রয়েছি, তাদের পড়াচ্ছি, তাদের মানুষ করবার চেষ্টা করছি।”…“বস্ বদি সেইটুকুই, তার জন্যেই বা তোর এত মাথাব্যথা কেন ?”

কত লজ্জাই না জমা হইয়াছিল কথাগুলার মধ্যে! ভগবানকে ধন্যবাদ, যে নিজের মনের শুভ্রতার প্রাচীর কষাঘাত সদ্য সদ্য লাগে নাই তাহার মনে ; কিন্তু এবার ত কাকার বাড়ি চিরতরেই তাহার নিকট বন্ধ হইয়া গেল। শুধু তাহাই কেন ? সমস্ত ব্যাপারটা এই বস্তীতেই নিপ্ত হইয়া কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায় নাই ? আর এ জন্মে কি বাড়িতেই মুখ দেখাইবার অবস্থা রহিল টুনুর ?

পূর্বাকাশে চাঁদ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। একটা ঝিরঝিরে হাওয়াও উঠিল। শ্মশানটাও যেন একটু স্নিগ্ধ রূপ ধারণ করিল। টুনু আর একবার শেষ চেষ্টা করিল, মনটাকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া লইয়া, একটু গুছাইয়া ভাবিতে লাগিল কি দোষ বস্তির এদের ?—নিজেরা এত নিচে পড়িয়া থাকিলেও চরিত্রকে সবার উপর এতটা মর্যাদা দেওয়াটাই একটা মস্ত বড় আশার কথা নয় কি এদের পক্ষে ? যতক্ষণ ঐ বিশ্বাসটুকু ছিল, টুনুকে দেবতার আসন দিয়াছে, যেই সেটা গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে—বিশ্বাসটা যে গেল সেটা ত ওদের দোষ নয়। ওদের ত্যাগ করিবে কেন টুনু ? ওরা খোঁজ নেয় নাই, তাহার কারণ সব ব্যাপারকেই একটু স্থূলদৃষ্টিতে দেখা অভ্যাস ওদের—পাইবেই বা কোথায় দৃষ্টির অত সূক্ষ্মতা ? না, ত্যাগ করা চলে না ওদের, এত অল্পে নিরাশ হওয়া চলে না ; একটা ঙত—উদ্যাপনের মুখে যদি এত অল্পে ছাড়িয়া দেয় তাহা হইলে এ পথে নামিয়াছিলই বা কেন ?…ওদের মনের মত হইয়া ওদের সামনে আবার দাঁড়ান যায় না ?

অনেকক্ষণ ভাবিল টুনু, কিন্তু একটা উত্তরই পাওয়া গেল—বোধ হয় যায় না দাঁড়ান আর। সেই এক কারণ—ওরা স্থূল দৃষ্টিতে দেখে, এর পর যেভাবেই টুনু ওদের সামনে দাঁড়াক, যাচাই করার মানদণ্ড ওদের বদলাইবে না, ওরা ভুলিবে না, চম্পা একদিন ওর পাশে বসিয়া ওর স্কুলে পড়াইয়াছিল, একদিন ওর পাশে দাঁড়াইয়া ওদের কাজ তদারক করিয়াছিল। কেন ?—এই প্রশ্নটা আর তাহার অতি সহজ উত্তরটা ওদের মন থেকে কখনই দূর হইবে না।

তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখা চলে, কিন্তু তাহার মানে ত চম্পাকে ত্যাগ করা ? কেন ত্যাগ করিবে ? বস্তির ওরা, সে নিজে আর চম্পা—এই তিনের মধ্যে সব চেয়ে নিরপরাধ ত চম্পাই। টুনু বরং এত বড় একটা ভুল করিয়া বসিয়াছে—ভুল এক ধরণের অপরাধই—চম্পা ত এদিক দিয়াও মুক্ত, স্থিরভাবে একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা রাখে, এ মূঢ়তার পরিণাম আন্দাজ করিয়াছিল, নামিতে চাহে নাই এসব ব্যাপারে।

তর্কের জের ধরিয়া আরও একটা কথা মনে হইল,—যদি

করেই ত্যাগ চম্পাকে, এখান থেকে বেরই সরাইয়া, ওদের সকলেরই ভাল করিয়া পুষ্ট করা হইবে না কি ?

স্থিরভাবে ভাবিতে গিয়া নিরাশার অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল। এই সময় পাঁকরেলের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে কাঁকরের উপর কাহার পায়ের শব্দ শুনা গেল ; টুনু ফিরিয়া দেখিল চম্পা।

চম্পা বিস্মিত হইল না, আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—"জানি শেষ পর্যন্ত এইখানেই পাব আপনাকে, তিন বার খুঁজে গেছি এর আগে। এ কি ছেলেমাহুষি হচ্ছে ? বাসায় যাবেন না ? রাত কত হ'ল কিছু আন্দাজ আছে ?"

টুনু সামনের দিকে হাতটা সম্প্রসারিত করিয়া বলিল—"নিজের চোখেই দেখো চম্পা—কার জন্যে করছিলাম এসব ? আজ একটি লোক আসে নি, অথচ হৈ-চৈ করে এসে আমার জিনিষপত্রগুলো তচনচ করে দিয়ে গেল।"

চম্পা একবার দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া আনিয়া বলিল—'এ আক্কেলটা আপনার হওয়া দরকার ছিল,—কাদের জন্যে করছিলেন ভাল করে বুঝুন এবার।"

চম্পা সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে, কবরীতে একটা জুঁইয়ের মালা পর্যন্ত,—একদিন সে মালাকে এই খোয়াইয়ের মধ্যে দুই পায়ে মাড়াইয়া দিয়াছিল ফেলিয়া, আবার শেষ পরীক্ষায় জয় তুলিয়া লইয়াছে। জুঁইয়ের গন্ধের সঙ্গে সেই হালকা এসেন্সের গন্ধটা আছে, পরণের শাড়িটা রং করা, রাত্রিতে একটু মলিন মনে হওয়ায় ওর গায়ের মাজা মাজা রংটাকে আরও উজ্জ্বল বোধ হইতেছে।...পাশে দাঁড়াইয়াছিল, কথাটা বলিয়া একটু লীলায়িত ভঙ্গিতে সামনে একটা বড় ধরের গাদায় গিয়া বসিতে যাইতেছিল, টুনু বারণ করিল, বলিল—গরমকাল যেখানে সেখানে বোস না।

চম্পা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটা দুরন্ত সাহসের কাজ করিয়া বসিল, কাছাকাছি চারি দিকটা একবার দেখিয়া লইয়া অল্প একটু হাসিয়া ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল—এখানে বসবার জায়গা ত তাহলে দেখছি একটি—যে পাথরটার ওপর আপনি বসে আছেন।

—বেশ লম্বা সমতল গোছের পাথরটা, জনতিনেক বেশ বসিতে পারে। তখনই কিন্তু দাঁড়াইয়া উঠিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—নিন্, বাজে কথা রেখে উঠুন তো ; দয়া করে যদি একখানা ঘর বেঁধে দিয়েও যাচ্ছেন ওরা তো তাইতে না হয় রাত কাটাতেন।

একটু আড়চোখে চাহিয়া দেখিল—অতি সাহসের কথাটা টুনুর কানে পৌঁছিয়া থাকিলেও মনে পৌঁছায় নাই মোটেই—সেটা বহু দূরে কোথাও পড়িয়া আছে। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—বেশ চল।

পথে কথা হইল খুব অল্প। টুনু একবার প্রশ্ন করিল—"কোথাও গিয়েছিলে তুমি ?"

"না, কেন বলুন তো ?"

"না, এমনি, হীরার গায়ের গন্ধটা পাচ্ছি, ভাবলাম দিয়ে খেলা করছিলে বুঝি।"

আবার নিজের চিন্তায় রহিল ডুবিয়া।

বাসার প্রায় কাছাকাছি আসিয়া হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল,—"আমি সহ্য করতে পারছি না চম্পা, এই গঞ্জতিহিতে এসে আমার মনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে, সয়ে গেছি, শুধু সয়ে যাওয়া নয়, দেখেছি শেষ পর্যন্ত যরেই দাঁড়িয়েছে সেগুলো। আমার মনে কিন্তু কেমন একটা ভয় হচ্ছে এটা একটা অভি-শাপ ; আমি এমনভাবে ভেঙে পড়ি নি কখনও। ঠিক বলতে পারছি না, কিন্তু সত্যিই আমার মনে কোথায় যেন মস্ত বড় একটা ধস্ নেমে গেছে, একটা যেন সর্বনাশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি। আর সবই দিয়ে এরাই শেষ পর্যন্ত আমার জীবন এমনভাবে ব্যর্থ করলে।"

চম্পা মাথা নিচু করিয়া শুনিতেছিল, উত্তর দিল কয়েক পা যাওয়ার পর ; মাথা নিচু করিয়াই বলিল—"ব্যর্থ যে হয়েছেই এমন ভাবছেন কেন ? সার্থক করা তো নিজের হাতে।"

"কি করে ?"

"অনেক রকম পথ আছে ; যেটা ধরেছিলেন সেইটেই কি সার্থক করবার পথ জীবনকে ? বরং ঠিক উল্টা নয় কি ? ভেবে দেখুন না ভাল করে।"

যে ভাবনায় অন্তঃশীলা প্রবাহ চলিয়াছে তাহারই জের ধরিয়া টুনু বলিল—"কিন্তু আমি তো ওদের জন্যে নিজের বলে কিছু রাখি নি চম্পা, সবই দিয়েছি বিলিয়ে—দিচ্ছিলামও..."

চম্পা দাঁড়াইয়া পড়িল, চোখ দুইটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ক্রোধে নয়, টুনুর পরিচিত কোন কিছুতেই নয় যেন, বলিল—"কিন্তু এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া, নিজেকে এইভাবে বঞ্চিত করাই কি সার্থক করা জীবনকে ? জীবনের নিজের দাবি নেই মনে করছেন নাকি ? আপনি আপনার খেয়াল নিয়ে রয়েছেন মত্ত, যারা চাইছে না আপনাকে, যারা উপকারের বদলে করছে অপমান, তাদের পেছনেই পাগলের মতন ছুটে চলেছেন আপনি—নিজের সর্বনাশের সঙ্গে আরও কারুর সর্বনাশ করছেন কিনা একবার চোখ ফিরিয়ে দেখবার ফুরসত নেই আপনার—কিন্তু একদিন জীবন কি এর জবাবদিহি চাইবে না ভেবেছেন ? নিজে ফাঁকি পড়ার সঙ্গে—এই রকম করে ফাঁকি দিয়ে যাবার..."

টুনু আতঙ্কে একেবারে হাপুর মত নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, চোখ দুইটা চম্পার চোখের উপর ফিরাইতে পারিতেছে না ; পুষ্পশীর্ষ একটা লতা যেন হঠাৎ সর্প হইয়া চক্র ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কোথা দিয়া কি হইল, শেষের কথাগুলা বলিতে বলিতে দুই হাতের অঞ্জলিতে মুখটা ঢাকিয়া চম্পা একেবারে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

টুনুর তখনও সম্বিৎ ফিরিয়া আসে নাই ; চম্পা দুই হাতে

মুখ ঢাকিয়া সামনে দাঁড়াইয়া, কান্না রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় শরীরটা দুলিয়া উঠিতেছে। শাড়ির আঁচলের খানিকটা মাটিতে লুটাইতেছে, মাথাটা নীচু করা, চাঁদের আলো পড়িয়া খোঁপার মালাটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সম্বিৎ হওয়ার পরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সমস্ত দৃশ্যটায়—আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটারই ট্র্যাজেডি ওর মনটাকে মথিত করিয়া দিয়াছে। স্থিরভাবে বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর এক পা আগাইয়া গিয়া স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়া বলিল—"আমি কাউকে কাঁকে পড়তে দোব না; কথা দিচ্ছি তোমায়, আমার ভুল ভেঙেছে। তুমি বাসায় যাও, আমি এক জায়গায় যাচ্ছি এখন, —কোথায় তা জিগ্যেস কর না, সঙ্গও নিও না আমায়, লক্ষ্মীটি। কাল সকালেই ফিরে এসে নিজেই তোমায় ডেকে পাঠাব। বকিত হতে হবে না কাউকে চম্পা, আমি কথা দিচ্ছি।" ক্রমশঃ

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীন

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গ্রহনক্ষত্র-নীহারিকাদি-সম্বলিত বিশ্বের রূপ মানুষের কাছে যতটা উন্মুক্ত হইয়াছে তাহা সবই দূরবীনের দৌলতে। যন্ত্রের নলে চোখ রাখিয়া মানুষ জানিয়াছে অদৃশ্য বহির্বিশ্বের রকমারি খবর, সুদূরের সীমান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছে সৃষ্টির মহান ও গরিমাময় স্বরূপ। সেই বিরাটের মেলায় পৃথিবী ডুবিয়া গিয়াছে নিতান্ত নগণ্যের দলে। কিন্তু দূরবীন যত রহস্যঘন তথ্যের সন্ধানই দিয়া থাকুক না কেন, যন্ত্রটি নিজে একান্ত ভাবে জটিলতাবর্জিত, দাম তাহার যত বড়ই হউক দেহোপাদান নিতান্ত সামান্য।

লম্বা একটা নল বা চোঙ, তাহার দুই প্রান্তে দুইটি লেন্স—ইহাই দূরবীনের সর্বস্ব। পুঁজিপাটা যত কমই হোক না কেন, দূরবীনের ক্ষমতা অভাবনীয়, মানুষের দৃষ্টির পরিধি সে অনন্তে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টির বাহিরেও যে সমস্ত আকাশচারী নক্ষত্রাদি বহুকাল ধরিয়া রহিয়াছে, দূরবীনের সন্ধানী দৃষ্টির জালে তাহাদের অনেকে ধরা পড়িয়াছে। খালি চোখে আকাশের গায় আমরা যে তারার মেলা দেখি এক এক করিয়া গণনা করিয়া গেলে তাহাদের সংখ্যা হাজার দুয়েক হইতে পারে। পৃথিবীর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অবশ্য আকাশের সবটুকু দেখা যায় না। সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আকাশকে দেখিলে চোখের দেখায় বড় জোর হাজার দশেক তারার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশের তারার দল সংখ্যায় হাজার হাজার নহে, কোটি কোটি। নক্ষত্রগোষ্ঠীর এই সংখ্যা ধরা পড়িয়াছে দূরবীনের বেড়াজালে। ক্রমে সে বেড়াজালের পরিধি বৃদ্ধি করায় সীমান্ত দূর হইতে দূরান্তরে সরিয়া গিয়াছে।

খালি চোখের ক্ষমতা আর কতটুকু! কাছে রাখিলে যে প্রদীপকে আমরা চোখে দেখিতে পাই, দুই-তিন মাইল দূরে লইয়া গেলেই সে চলিয়া যায় দৃষ্টির বাহিরে। প্রদীপ হইতে আলোর ঢেউ আসে, চোখের পর্দায় সে যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাহাই দর্শনানুভূতির হেতু। প্রদীপ যত দূরে যায় সেখান হইতে ঢেউ আসে তত দুর্বলতর ভাবে, অবশেষে চোখকে উত্তেজনা দিবার ক্ষমতা আর তাহার থাকে না। এমনই অবস্থা ঘটিলেই জ্যোতিষ্মান বস্তুও অদৃশ্যের দলে পড়িয়া যায়। দূরবীনের সহায়তা কিন্তু এই রকম আপাত-অদৃশ্যকে দৃশ্যমান করিয়া তুলিতে পারে।

দূরবীনের সামনের দিকে যে লেন্সখানা থাকে তাহার কার্যকারিতায় এই ব্যাপার সম্ভব হইয়া থাকে। এই লেন্সের



২০০-ইঞ্চি দূরবীনের দর্পণাংশ মডেল

উপরে যেখানে যত আলোর রশ্মি পতিত হয় তাহাদের সবগুলি লেন্স ভেদ করিয়া আসিবার পর একই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত বা মিলিত হয়। লেন্সের বিভিন্ন অংশে বহু



ঢালাই করিবার পর কাচের চাকতির খুণরিকাটা পশ্চাদ্‌ভাগ পালিশ করা হইতেছে

আলোকরশ্মি পতিত হইলেও সব রশ্মি এক বিন্দুতে আসিয়া জমাট বাঁধে। যে ক্ষীণ রশ্মি একক ভাবে চোখের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সাড়া জাগাইতে অক্ষম, তাহারাই অনেকে যখন লেন্সের কৃপায় একত্রিত হইবার সুযোগ পায়, তখন শক্তি-বৃদ্ধির জন্য দৃশ্যমান হইতে পারে। সূর্যের রশ্মিধারা সাধারণত আগুন জ্বালানো সম্ভব না হইলেও এক খণ্ড আতসী কাচ সূর্যের দিকে ধরিলে তাহার নীচে যে আলোক-বিন্দু জমাট বাঁধে তাহারই প্রভাবে আগুন জ্বলিতে পারে। অনেক-গুলি রশ্মির সম্মিলিত শক্তিই এই প্রকার উত্তাপ ও অগ্নির স্রষ্টা।

দূরবীনের কাজ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার সম্মুখস্থ লেন্সখানা দূরের জিনিসের একটা সদ্‌বিম্বকে চোখের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে যেটা মূলবস্তু হইতে আকারে ছোট হইলেও আলো-সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বলতর। দূরবীনের পিছনের দিকে যে লেন্স থাকে সে এই সদ্‌বিম্বকে আকারে বড় করিয়া তোলে। সম্মুখের লেন্সখানার আকার যত বড় হইবে কোন বস্তু হইতে নির্গত রশ্মি উহার উপরে তত বেশী সংখ্যায় পতিত হইবে এবং সদ্‌বিম্ব তত বেশী উজ্জ্বল হইবে। এই লেন্সখানা যেন আলো ধরিবার ফাঁদ, ফাঁদের পরিধি যত বড় হইবে উহার কার্যক্ষমতা তত বেশী হইবে। তাই আকাশের অদৃষ্ট নক্ষত্রলোকের সন্ধানকার্যে বিজ্ঞানীর লক্ষ্য হইয়াছে দূরবীনের লেন্সের আকার বাড়ানো।

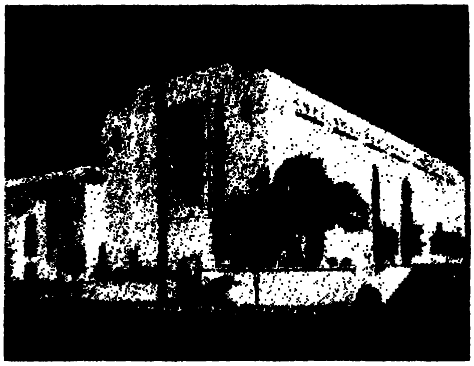
এখানে একথাও উল্লেখ করা কর্তব্য যে দূরবীন দুই জাতীয়। আলো ধরিবার ফাঁদ হিসাবে লেন্স ব্যবহার না করিয়া বৃত্তাকৃতি দর্পণ (spherical mirror) ব্যবহার করিলেও প্রতিফলিত আলোকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। বড় দূরবীনে লেন্সের পরিবর্তে দর্পণ ব্যবহার করা সুবিধাজনক হইয়া থাকে।

বর্তমানে সর্বাপেক্ষা বড় দূরবীন আছে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে স্থিত উইলসন পাহাড়ে। ইহার দর্পণের ব্যাস এক শত ইঞ্চি। প্রথম মহাসমরের পরে এই দূরবীন নির্মিত হইয়াছিল। ইহারই কল্যাণে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দূরবীন মানুষের চোখের চেয়ে আড়াই লক্ষ গুণ বেশী শক্তিশালী। ইহার মধ্যবর্তিতায় ক্ষীণতম যে আলোর উৎসকে দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব, তাহাকে খালি চোখে দেখিতে হইলে ঐ উৎসের জ্যোতি অন্ততঃ আড়াই লক্ষ গুণ বাড়াইতে হইবে। উইলসন পাহাড়ের দূরবীনে ১৫০ কোটি নক্ষত্রের সন্ধান জানা গিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত নীহারিকার অভ্যন্তরে নক্ষত্রের অস্তিত্ব ও দ্বীপবিশ্বের অস্তিত্ব এই দূরবীনে প্রাপ্ত সত্যকে অবলম্বন করিয়াই কল্পিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সুদূর আকাশের অজ্ঞাত রাজ্যে হানা দিবার উদ্দেশ্যে আরও বড় দূরবীন নির্মাণের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।



যন্ত্রগৃহে কাচের চাকতির উপরিভাগ ঘষিয়া বৃত্তাকৃতি করা হইতেছে

উইলসন আনমন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ জর্জ হেল অতিকায় দূরবীনের সার্থকতা বিষয়ে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্ত 'হারপার ম্যাগাজিনে' এক প্রবন্ধ লেখেন (১৯২৩)। এই প্রবন্ধে তিনি ২০০ বা ৩০০ ইঞ্চি দূরবীন পাওয়া গেলে কি



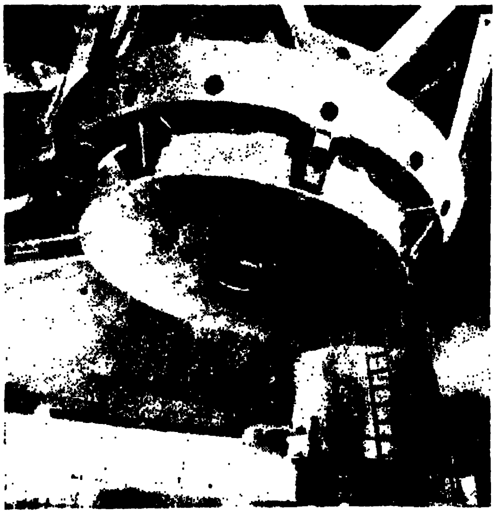
যন্ত্রগৃহের বহির্দৃশ্য

করিয়া উহা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিতে পারে তাহার উল্লেখ করেন এবং এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞানীদের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্ত ধনকুবেরদিগকে উৎসাহী হইতে অনুরোধ জানান। অনতিকাল মধ্যেই এই অনুরোধে কাজ হইল। উক্ত প্রবন্ধের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া আন্ত-র্জাতিক রকফেলার শিক্ষা-সমিতির সভাপতি ডাঃ উইক্লিফ রোজ সমিতির পক্ষ হইতে ২০০ ইঞ্চি একটি দূরবীন নির্মাণকল্পে ষাট লক্ষ ডলার (প্রায় দুই কোটি টাকা) দান করিবার অভিমত জ্ঞাপন করেন।

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে এতদুদ্দেশ্যে প্রাথমিক পরিকল্পনা স্থিরীকরণার্থ ডাঃ হেলের নেতৃত্বে আমেরিকান, জার্মান ও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের লইয়া এক সমিতি গঠিত হইল। প্যাসাডেনার ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এতদ্বিষয়ে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হইল। বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নির্মাণ করিবার জন্ত যন্ত্রগৃহ (Machine shop) স্থাপিত হইল (১৯৩০, অক্টোবর) এবং এই কাজের জন্ত বিশেষ গবেষণাগারও প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক পরীক্ষা ও আলোচনার পর প্যাসাডেনা হইতে ৯০ মাইল দূরবর্তী প্যালোমার পাহাড়ে (৫৫০০ ফুট) এই দূরবীন বসানো হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

দর্পণের জন্ত যে সুবৃহৎ কাচখণ্ড প্রয়োজন হইবে তাহা নির্মাণ করিবার ভার দেওয়া হইল নিউ ইয়র্কের কর্ণিং গ্লাস কোম্পানীকে। এই অতিকায় কাচের চাকতির উপাদানের জন্ত নূতন ধরণের পাইরেক্স কাচ উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই সব প্রাথমিক পরীক্ষা ও পরিকল্পনা করিতে লাগিয়া গেল দুই বৎসর। পরীক্ষামূলক ব্যাপার হিসাবে ৩০, ৬০ ও ১২০ ইঞ্চি ব্যাসের কাচখণ্ড ঢালাই করিয়া দেখা হইল। ১৯৩৪ সনের প্রথম ভাগে পৃথিবীর-বৃহত্তম কাচখণ্ডের (২০০ ইঞ্চি) ঢালাই কার্য আরম্ভ হইল। যেমন অতিকায় কাচ তার নির্মাণের সরঞ্জামও তেমনই বিরাট। দশ দিন ধরিয়া ৩০ ফুট ব্যাসের এক গ্যাসের চুল্লীকে উত্তপ্ত করা হইল। উহাতে হাজার বার শত মণ মালমশলা ধরিতে পারে। তিন সপ্তাহকাল ক্রমাগত উত্তাপ পাইয়া ২৮০০ ডিগ্রী (ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় সব জিনিস গলিয়া গেল। এইবার ঢালাই করিবার পালা। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ রবিবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে, ছয় হাজার লোক এই বিরাট ব্যাপার দেখিতে সমবেত হইয়াছিল। ঢালাই করিবার ছাঁচ আগে হইতেই তৈরি ছিল এবং ইহাকেও গরম করা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই ছাঁচে দশ ঘণ্টা ধরিয়া গলিত কাচ ঢালাই হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে এক অঘটন ঘটিল। প্রচণ্ড তাপে ছাঁচের গা হইতে খানিকটা অংশ খুলিয়া তরল কাচের উপরে পড়িল। ইঞ্জিনিয়ারগণ ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি ভাঙা অংশগুলি তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তবুও সংশয় ঘুচিল না। আবর্জনার সংমিশ্রণে কাচের কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মনে দ্বিধা রহিল। সুতরাং পাছে সকল শ্রম ও অর্থব্যয় পণ্ড হয় সেজন্ত আরও একটা চাকতি ঢালাই করিবার প্রস্তাব হইল।

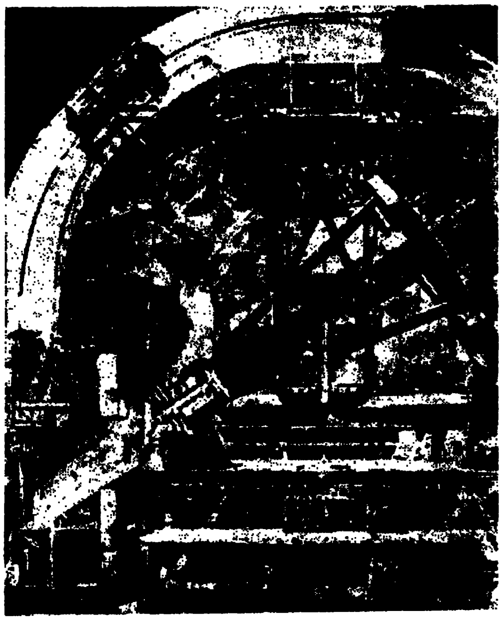
দীর্ঘ দিন ধরিয়া কাচখণ্ডকে ঠাণ্ডা করিতে হইবে। প্রথম দুই মাস অপরিবর্তনীয় উত্তাপে রাখিবার পর আট মাস ব্যাপিয়া প্রত্যহ দেড় ডিগ্রী হিসাবে ইহাকে একটু একটু করিয়া ঠাণ্ডা না করিলে কাচে দোষ থাকিয়া যাইবে এবং উহা দ্বারা দূরবীনের নির্ভুল ও সূক্ষ্ম কাজ চলিবে না। বিশেষ ভাবে তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর দিয়া কাচখণ্ডকে তরল অবস্থা হইতে জমাট অবস্থায় আনায় প্রয়োজন আছে।



কাচের চাকতির অনুরূপ সিমেন্ট-চাকতি

প্রথম যে কাচখানা ঢালাই করা হইয়াছিল উহাকে পরি-কল্পিত সময়ের পূর্বেই (সাত মাস পরে) বাহির করিয়া লইয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার একখানা কাচ আবার ঢালাই করা হইল। এখানা দশ মাস ধরিয়া ধীরে

ধীরে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ঠাণ্ডা করিবার কথা ছিল। কিন্তু সাত মাস পরে অপ্রত্যাশিত এক বিপত্তি দেখা দিল। কারখানার পার্শ্ববর্তী নদীতে বন্যা আসিল এবং ইহারই ফলে কারখানা-গৃহে জল প্রবেশ করায় জন্য তিন দিন উত্তাপ দিবার ব্যবস্থা বন্ধ



২০০-ইঞ্চি দূরবীনের পরিকল্পিত রূপ

রাখিতে হইল। তার পর আবার আসিল ভূমিকম্প। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর চুল্লী হইতে বাহির করিয়া দেখা গেল কাচের কোন ক্ষতি হয় নাই। এই কাচের প্রতিখানার মূল্য অন্তত পনর-বিশ লক্ষ টাকা।

ওজন কমাইবার জন্য কাচখানা একবারে নিরেট না করিয়া উহার পিছনের দিকটায় মৌচাকের মত খোপ খোপ গর্ত রাখা হইয়াছে। দেড় হাত পুরু হইলেও কাচখানার নিরেট অংশ পাঁচ ইঞ্চি মাত্র। ইহার ওজন প্রায় ৫৫০ মণ এবং ব্যাস ২০০ ইঞ্চি অর্থাৎ ১১ হাতের সামান্য বেশী।

ঠাণ্ডা হইবার পর এই অতিকায় কাচের চাকতিকে পাঠানো হইয়াছে নিউ ইয়র্ক হইতে প্যাসাডেনায়, তিন হাজার মাইল দূরে। রেলগাড়ী অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে (ঘণ্টায় ২৫ মাইল) চালাইয়া এবং রাবার-প্যাড সম্বলিত লোহার ফ্রেমে আঁটিয়া অতি সতর্কতার সহিত ইহাকে আনিতে হইয়াছে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল ইহা প্যাসাডেনায় পৌঁছিয়াছিল। সেখানকার আলোবিজ্ঞানের যন্ত্রাগারে ইহাকে প্রয়োজনীয় রূপ দিবার জন্য যন্ত্রাদি পূর্ব হইতেই তৈরি ছিল। কাচ-চাকতির মাঝখানটায় নীচু করিয়া উহাকে বৃত্তাভাসে পরিণত করিতে হইবে। নিখুঁত ও সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে খুবই ধীর গতিতে এই কাজ করিতে হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ করিয়া ক্রমশ কাচের ক্ষয় করিতে হইবে, ইহা করিলেও এ কাজ দ্রুত করা চলিবে না। ইহাতে অন্তত তিন বৎসর সময় লাগিবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহা-সমরের জন্য সকল কার্য চাপা পড়িয়া গেল। যুদ্ধান্তে আবার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। একটু একটু করিয়া কাচের উপর হইতে শ' দেড়েক মণ ওজনের জিনিস বাহির করিয়া ফেলিতে হইয়াছে। বৃত্তাকৃতি করিয়া পালিস করিবার পর কাচের উপরে এলুমিনিয়মের পাতলা আস্তর লাগাইয়া দিলে দর্পণ তৈয়ারী হইবে।

প্যাসাডেনার পাহাড়ে আবশ্যক গৃহাদি ও দূরবীনের অন্যান্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি নির্মিত হইতেছিল। কার্যের সুবিধার জন্য প্রকৃত দূরবীনের এক-দশমাংশ আকৃতির একটি অবিকল মডেল আগে তৈয়ারী করা হইয়াছে। যে ফ্রেমে দর্পণ আঁট-কানো হইবে ফিলাডেলফিয়ার ওয়েষ্টিং-হাউসে সেটি নির্মিত হইবার পর জাহাজে করিয়া প্যাসাডেনায় আনা হইয়াছে। আসল দর্পণখানা যথাস্থানে বসাইবার পূর্বে কাঠামোর সঙ্গে দর্পণের অনুরূপ আকৃতি ও ওজনের একটা সিমেণ্ট-নির্মিত চাকতি আটকাইয়া যন্ত্রের অংশাদি যথাস্থানে বসানো হইতেছে। কাঠামোসুদ্ধ গোটা যন্ত্রের ওজন হইবে প্রায় পনর হাজার মণ। কিন্তু যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই বিরাট যন্ত্রকে অনায়াসে অর্দ্ধ-অশ্বশক্তির এঞ্জিনের সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে যথাইচ্ছা স্থাপন করা যাইবে। দূরবীনের কাঠামোর দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট ও ইহার ব্যাস ২২ ফুট। মূল নল বা কাঠামোর তলদেশে থাকিবে দর্পণখানা এবং এই নলের উপরিভাগে পর্যবেক্ষণার্থ আবশ্যক যন্ত্রাদি সহ পর্যবেক্ষকের আসনের জন্য ৬ ফুট ব্যাসের একটি সংরক্ষিত স্থান বা প্রকোষ্ঠ। যে গৃহে এই দূরবীন রাখা হইবে সেই মানমন্দিরের গম্বুজের ব্যাস ১৩৭ ফুট। এই মান-মন্দিরের জন্য পাহাড়ের উপরে আধুনিক সকল রকম ব্যবস্থা সম্বলিত বিরাট এক ভবন নির্মিত হইয়াছে।

আশা করা যাইতেছে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিলে বর্তমান বৎসরের (১৯৪৭) শেষভাগে এই দূরবীন কার্যকরী হইবে।

এই বিশাল ও অমিত শক্তিধর যান্ত্রিক চক্ষুদ্বারা দশ হাজার মাইল দূরে রাখিলেও ছোট এক প্রদীপশিখাকে দেখা সম্ভব হইবে। মানুষের দৃষ্টি আকাশে এক শত কোটি আলোক-বৎসর (১ আলোক বৎসর = ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল) দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। বর্তমানে বিশ্ব-গোলকের যে আকৃতি আমাদের কাছে উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার আকৃতি আরও ৮ গুণ বর্ধিত হইবে। বিজ্ঞানীরা আশা করিতেছেন বিশ্বসৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত যে ব্যাপারগুলি রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে এই দূরবীনের কৃপায় হয়ত তাহার সমাধান হইবে। নক্ষত্ররাজ্যের প্রসার কি সত্যই অসীম?—বিশ্ব কি সত্যই প্রসরণশীল—এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। এই অতিকায় যন্ত্রের দ্বারা বিশ্বের কোন্‌রূপ প্রকটিত হইবে কে জানে? এমনও হইতে পারে যে মহাবিশ্ব সম্বন্ধে আমরা এখন পর্যন্ত যাহা কিছু জানি ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি তাহার সব কিছুই বদলাইয়া যাইবে।

ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙালী হিন্দু আজ যে মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহা অনেকাংশে আত্মকৃত অপরাধের ফল সন্দেহ নাই। যে দেশে প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্যের সমুচিত সমাদর লোপ পাইতে বসিয়াছে সে দেশের কৃষ্টিসংরক্ষণের মৌখিক আড়ম্বর অনেক সময়ে এক প্রকাণ্ড উপহাস বলিয়া মনে হয়। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যিনি বাংলার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন, ত্রিবেণী নিবাসী সেই জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম সম্প্রতি বিশিষ্ট সমাজেও উল্লেখ করিয়া আমরা কেবল বাঙালীর আত্মবিস্মৃতির বিচিত্র রূপ দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছি। আজ পর্য্যন্ত সাহেবের সার্টিফিকেট সম্বল করিয়া যে সকল বাঙালী কার্য্যক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতেছেন তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়াম জোন্স সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে গিয়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং জোন্স-পত্নী "আবাং ম্লেচ্ছৌ" বলিয়া জগন্নাথের চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে সাহস পান নাই। আজ আমরা তৎকালীন সরকারী দলিল হইতে জগন্নাথের কীর্ত্তি খ্যাপন করিতে বিরত থাকিলাম। বাঙালী নিজে তাঁহাকে কি চোখে দেখিতেন একবার জানা যাক।

শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বৎ-সেবী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে "নবরত্ন" সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত "মাধব-মালতী" গ্রন্থে নবকৃষ্ণের "নবরত্ন" সভার বর্ণনা এই :—

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সে রূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিবরাম গসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥ (পৃ. ৪)

সাক্ষাৎ সরস্বতীপুত্র জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথ যে সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন রূপে খ্যাতিলাভ করেন, অন্যান্য রত্নদের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে তাহার সমুজ্জ্বল চিত্র এখন পরিস্ফুট হইবে না। দ্বিতীয় রত্ন মহাকবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার—চিত্রচম্পূ, রহস্যামৃত মহাকাব্য, চন্দ্রাভিষেক নাটক ও বহু খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। তাঁহার বিবরণ আমরা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ৪৩-৫৪)। চিত্রচম্পূ মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙালীর কীর্ত্তি-রক্ষায় বাঙালী চিরকালই পরাঙ্মুখ, নতুবা খাঁটি বাঙালীর উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনার নিদর্শনস্বরূপ চিত্রচম্পূর অংশবিশেষ আমরা বাংলার বিবিধ সংস্কৃত পরীক্ষায় পাঠ্যমধ্যে দেখিতে পাইতাম। তৃতীয় রত্ন 'নদের শঙ্কর' অর্থাৎ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ। ১২২৩ সনে প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। এক সময়ে ইঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রায় ৩০০ ছাত্র



জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

অধ্যয়ন করিত, অথচ ইনি নিরবচ্ছিন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বাংলা হইতে এখন লোপ পাইয়াছে, ছাত্রাভাবে লুপ্তাবশিষ্ট নৈয়ায়িকগণ এখন কাব্যশাস্ত্র কিম্বা আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চায় রত হইয়াছেন। কালে হয়ত কাশী কিম্বা মাদ্রাজে গিয়া বাঙালীকে নব্যন্যায় পড়িতে হইবে। "নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক" পদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিগ্রহ করিতে শিক্ষিত বাঙালী আজ একান্ত ভাবে অসমর্থ। চতুর্থ ও পঞ্চম রত্ন বলরাম তর্কভূষণ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেব বিদ্যা-বাচস্পতি কামালপুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় এবং চিরবিলুপ্ত কুমার-হট্ট নৈয়ায়িক সমাজের নেতা ছিলেন। এক সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে কুমারহট্টের শিবের গলির নৈয়ায়িকগণের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কথাটা হয়ত গভীর পরিহাস বলিয়া অনেকে এখন মনে করিবেন। শিবের গলি এখন শৃগালাকীর্ণ

একটি অরণ্যমাত্র। ষষ্ঠ রত্ন গদাধরের পরিচয় অজ্ঞাত। সপ্তম রত্ন শিবরাম তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বোক্ত বলরামের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং নৈয়ায়িক। জগন্নাথ হইতে শিবরাম পর্য্যন্ত সকলেই প্রধানতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন। অষ্টম রত্ন হুগলী জেলার পসপুর নিবাসী স্মার্ত্ত কৃপারাম তর্কবাগীশ। ১২১০ সনে ১১০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। নবম রত্ন শান্তিপুর নিবাসী নানাশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য। নব রত্নের মধ্যে তিনিই বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ১২৩০ সনেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও তিনি তখন অতিবৃদ্ধ।

রাজা রামমোহন রায় জগন্নাথের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

Jagannath was universally acknowledged to be the first literary character of his day, and his authority has nearly as much weight as that of Raghunandana. (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৭০১ পাদটীকা।)

অর্থাৎ—জগন্নাথ তাঁহার সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন এবং তাঁহার প্রামাণ্যগৌরব প্রায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমান ছিল।

জগন্নাথের জনৈক ছাত্র একটি ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রতিলিপিতে জগন্নাথের স্তুতি করিয়াছেন,—"বিদ্যাবিত্তবয়ঃকুলাদিবিভবৈঃ খ্যাতো দ্বিতীয়ঃ স্বয়ং"। অর্থাৎ জগন্নাথ বিদ্যায়, বিত্তার্জ্জনে, বয়সে এবং কুলমর্য্যাদাদিতে "অদ্বিতীয়" ছিলেন। জগন্নাথ পিতৃশ্রাদ্ধের পর একটি "অমৃতী" মাত্র সম্বল করিয়া সংসার আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুকালে নগদ লক্ষাধিক টাকা এবং বহু সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। কুলাংশে তিনি স্বয়ং "সিদ্ধশ্রোত্রিয়" ছিলেন এবং তিন কন্যাই কুলীনে সম্প্রদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার এক জামাতার নাম রামগোপাল মুখোপাধ্যায়, তাঁহার সম্বন্ধে একটি কারিকা পাওয়া যায়:—

আধুনিক জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।
তার সুতা লইয়াছিলেন গোপাল ব্রাহ্মণ॥

জগন্নাথের ছবি: বর্ত্তমান প্রবন্ধে জগন্নাথের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। এই দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির বিবরণ এই। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৮০৫ সালে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গাজীপুরে পরলোকগমন করেন। কলিকাতার সাহেবেরা সভা করিয়া চাঁদা তুলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে গাজীপুরে তাঁহার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-মধ্যে কর্ণওয়ালিসের প্রস্তরখোদিত দক্ষিণাভিমুখী মুখাকৃতির (Medallion bust) সম্মুখে এক ব্রাহ্মণের ও পশ্চাতে এক মুসলমানের দণ্ডায়মান অধোমুখ পূর্ণপ্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চিরন্তন প্রবাদ অনুসারে এই ব্রাহ্মণই বাঙালী শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। খোদিত লিপিতে কিম্বা সরকারী কাগজপত্রে ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর পরিচয় লিপিবদ্ধ নাই বটে, কিন্তু সোম-প্রকাশে এক পত্রলেখক নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যে উহা জগন্নাথের মূর্ত্তি বলিয়াই লিখিয়াছেন (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৭৩৫)। মূর্ত্তিগুলির খোদিতার নাম Flaxman (Fisher: N. W. P. Gazetteer, Gazipur, 1883, pp. 122-3 দ্রষ্টব্য)।১ জগন্নাথের চরিতকার প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট জানিয়া জগন্নাথের শরীরের বর্ণনা করিয়াছেন—"জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন গৌরাঙ্গ ছিলেন না—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার দেহ সুগঠিত ও লোমশ, বাহু দীর্ঘ, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত এবং চক্ষু উজ্জ্বল ছিল।" (উমাচরণ ভট্টাচার্য্য-রচিত জীবনী, পৃ. ১৫)। বর্ত্তমান ছবির সহিত এই বর্ণনার মিল রহিয়াছে। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে "লোমশ মুনি" আখ্যা দিয়াছিলেন। জগন্নাথের বিস্ময়কর জীবনাখ্যানের মূলকথা আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি।২

বাল্যজীবন: ১১০১ সালের আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীতে (১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার জন্ম হয়।৩ তাঁহার পিতৃপুরুষের

১। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র শ্রীমান্ বসন্তদেব আমাদের অনুরোধে গাজীপুর গিয়া অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থিত মূর্ত্তির ছবি কৌশলে তুলিয়া আনিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

২। জগন্নাথের জীবনী কালীময় ঘটকের প্রথম চরিতাষ্টকে, উমাচরণ ভট্টাচার্য্য রচিত গ্রন্থে (১৮৮০, পৃ. ৬০), রজনীগুপ্তের চরিত-কথায়, বিশ্বজীবন পত্রিকায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথায় ২য় খণ্ডে (পৃ. ৭২৯–৩৫) এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৪৯, পৃ. ১-১৪) দ্রষ্টব্য।

৩। ১৭৮৯ সালে সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ "Fatal Ring" নামে প্রকাশ করেন। ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে লিখিত আছে যে নাটকখানা জগন্নাথের কণ্ঠস্থ ছিল—"The venerable Compiler of the Hindu Digest, *who is now in the eighty-sixth year* has the whole play of Sacontala by heart as he proved when I last conversed with him to my entire satisfaction." এতদনুসারে জগন্নাথের জন্ম হয় ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যুকালে বয়স হয় ১০৩ মাত্র—ইহা সমস্ত বিবরণের বিরোধী। জোন্স ৯৬ স্থলে ভ্রমক্রমে ৮৬ লিখিয়াছেন। কারণ, ১৭০৪ সালে আশ্বিনী শুক্লা পঞ্চমীর সহিত তুলারাশির সংযোগ ছিল না—জগন্নাথের রাশ্যাশ্রিত নাম 'রাম রাম' তুলারাশি সূচনা করে। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথের কনিষ্ঠ-পুত্রের মধ্যম পুত্র গদাধরের জন্ম সন ১১৬৪ সালের পরে নহে, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—ঐ সনে, সম্ভবতঃ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে, গদাধর নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন (নদীয়ার ২২৮০২ সং তায়দাদ দ্রষ্টব্য)। জগন্নাথের প্রথম পৌত্রের জন্মকালে সুতরাং তাঁহার বয়স হয় মাত্র ৪৫—দরিদ্র ভট্টাচার্য্য বংশে ইহা প্রায় অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, জগন্নাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাসের জন্ম ১১৯৯ সনে কি কিছু পূর্ব্বে এবং একপুরুষের গড়পড়তা হয় ২৪ বৎসরেরও কম—ইহাও প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ভ্রম-সংশোধন পূর্ব্বক ১১০১ সনেই (১১১৫ নহে) তাঁহার জন্ম-সন নির্ণীত হইল (সা-প-প, ১৩৪৯, পৃ. ২-৩)।

পরিচয়াদি প্রবন্ধান্তরে দ্রষ্টব্য (সা-প-প. ১৩৪৯, পৃ. ৪-১৪)। দুই-একটি নূতন সংবাদ লিখিতেছি। এই বংশ ত্রিবেণী-সমাজের মৌলিকবংশ নহে। জগন্নাথের আদিপুরুষ "দীননাথ ঠাকুর" যশোহর হইতে এখানে আসেন। "ত্রিবেণ্যাং রঘুরাঘবৌ" প্রবাদ-বাক্যে ত্রিবেণীর দুই জন প্রাচীন পণ্ডিতের নাম আছে, ইঁহারা জগন্নাথের বংশ নহেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ও রাঘব সার্ব্বভৌম উভয়েই জগন্নাথের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন- রাঘবের বংশ এখনও বিদ্যমান। জগন্নাথের অলৌকিক প্রতিভায় ত্রিবেণীর প্রাচীন বংশগুলি অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া যায়। জগন্নাথের বংশে একটি বিস্ময়কর প্রবাদ প্রচলিত আছে—এক পুরুষ অন্তর এই বংশে প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে। জগন্নাথের পিতা ও জেঠা অপেক্ষা পিতামহ ও জ্যেষ্ঠ পিতামহ (চন্দ্রশেখর বাচস্পতি) অধিক প্রতিভাশালী ছিলেন এবং চন্দ্রশেখরের পিতা অপেক্ষা পিতামহ প্রসিদ্ধ ছিলেন। অপরদিকে জগন্নাথের পুত্রাপেক্ষা পৌত্র ঘনশ্যাম এবং ঘনশ্যামেরও পৌত্র রামদাস প্রতিভার অবতার ছিলেন।

বাল্যে জগন্নাথের মাতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়েন। তাঁহার পঠদ্দশার দুইটি প্রতিভাসূচক ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি পিতার নিকট পড়িয়া জেঠা ভবদেব ন্যায়ালংকারের বাঁশবেড়িয়াস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র পড়েন। "একদিন ভবদেব তাঁহার পিতা হরিহর তর্কালঙ্কারের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুবিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বিদ্যাবাচস্পতি-প্রণীত প্রসিদ্ধ দ্বৈতনির্ণয় নামক স্মৃতিগ্রন্থ অনেক কৃতবিদ্য ছাত্রকে পড়াইতেছিলেন; বহু চিন্তাতেও এক স্থানে আর্থিক-আপত্তির উপপত্তি করিতে না পারিয়া বলিলেন, "এই স্থানটি জেঠা মহাশয় ভাল বুঝিতে পারেন নাই।" অদূরবর্ত্তী জগন্নাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "মহাশয়ের জেঠা উত্তম বুঝিয়াছিলেন, আমার জেঠা বুঝিতে পারিতেছেন না।" (উমাচরণ, পৃ. ৯-১০।) দ্বৈতনির্ণয় স্মৃতিশাস্ত্রের কূটবিষয়ের মীমাংসাগ্রন্থ এবং তাহার দুরূহ পঙ্‌ক্তি বিশেষের অর্থসঙ্গতি করা সহজ নহে। জগন্নাথের ন্যায়গুরু ছিলেন রঘুদেব বাচস্পতি, ইনি কামালপুরের ভট্টাচার্য্য বংশের তৎকালীন প্রধান নৈয়ায়িক এবং ত্রিবেণীতে তাঁহার টোল ছিল। ন্যায়শাস্ত্র আরম্ভ করার এক বৎসর পরে জগন্নাথ নবদ্বীপের রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করেন (উমাচরণ, পৃ. ১২-১৫)। রমাবল্লভ দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধপ্রপৌত্র (পৌত্র নহে)।

অধ্যাপনা : ২৪ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর অতি নিঃস্ব অবস্থায় তিনি টোল করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং মৃত্যুর এক মাস পূর্ব্বে তাহা হইতে বিরত হন। অর্থাৎ পূর্ণ ৯০ বৎসর (১৭১৮-১৮০৭ সন) তিনি অবাধে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। জগতের সারস্বত ইতিহাসে এই বিস্ময়কর ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে ঘটে নাই বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় ছিল "ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, সাহিত্য, অলঙ্কার ও আয়ুর্ব্বেদ" (উমাচরণ, পৃ. ১৭)। তন্মধ্যে ন্যায়ের ছাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তদ্ভিন্ন বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রেও তিনি কৃতবিদ্য ছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশে তৎকালে এই সকল শাস্ত্রের পৃথক অধ্যাপনা প্রচলিত ছিল না। কালক্রমে বর্দ্ধমান-রাজ, নবকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির পোষকতায় তিনি বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন এবং পূর্ণ অভ্যুদয়কালেও নবদ্বীপকে নিষ্প্রভ করিয়া দেন। নবদ্বীপের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিতে বাঁশবেড়িয়া, কুমারহট্ট প্রভৃতি সমাজ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র জগন্নাথই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই উক্তির মধ্যে কতটা কৃতিত্ব সূচিত হইয়াছে শিক্ষিত বাঙালী আজ তাহা বুঝিতে অসমর্থ। বাংলার ও নবদ্বীপের সারস্বত ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালী তাহার বিরাট অজ্ঞতা দূর করিতে সমুৎসুক নহে। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে ৫০০ বৎসরে (১৪০০-১৯০০ সাল) যত শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সমষ্টি-সংখ্যা হইতেও ন্যূন কি-না সন্দেহ। বাংলার শাস্ত্রচর্চ্চার এই বিস্ময়কর প্রসার জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। অলৌকিক প্রতিভা, অদ্ভুত মেধা ও সুদীর্ঘজীবনবলে জগন্নাথই প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া লক্ষাধিক পণ্ডিতের শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তেজস্বিতার নিদর্শন-স্বরূপ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার অদ্ভুত বিরোধের কথা উল্লেখ করা যায় (উমাচরণ, পৃ. ২৩-৩৪)। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপেক্ষা করিয়া জগন্নাথ সমাজভ্রষ্ট এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া "বাজপেয়" যজ্ঞের ১৫ দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানকালে জগন্নাথকে বাদ দিয়া নানাদেশীয় বহুতর পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করেন। সুবৃহৎ পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত হইতে উদ্‌গ্রীব হইয়া জগন্নাথ অনিমন্ত্রিত অবস্থায়ই যজ্ঞের পঞ্চম দিবসে এক শত ছাত্র সহ রাজবাটীতে গমন করেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বব্যয়ে অবস্থান করেন। যজ্ঞশেষে কৃষ্ণচন্দ্র জগন্নাথকে প্রশ্ন করিলেন "যজ্ঞ কিরূপ হইল?" জগন্নাথ উত্তর করিলেন "যাহাতে জগন্নাথ অনাহূত, সে যজ্ঞের মহিমার সীমা কি?" পরে, জগন্নাথের সাহায্যে বিপন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে "গলদেশে স্বর্ণ-কুঠার বন্ধন পূর্ব্বক" জগন্নাথের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

গ্রন্থরচনা : যৌবনে জগন্নাথ "রামচরিত" নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা লোপ পাইয়াছে। তাঁহার নব্যন্যায়ের উপরি পত্রিকাও এখন দুষ্প্রাপ্য। ফলতঃ গ্রন্থরচনায় তিনি কমই কালক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সার্ উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে হিন্দুর ব্যবহারশাস্ত্র "বিবাদভঙ্গার্ণব" রচনা

করিয়া চিরযশস্বী হইয়াছেন। এই বিরাটগ্রন্থ রচনা করিতে ৪ বৎসর (১১৮৮-৯২ সাল) লাগিয়াছিল এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু আইনঘটিত বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়াছে। গ্রন্থসমাপ্তিকালে জগন্নাথের বয়স ছিল ৯৮। রাজা রাধাকান্তদেবের গ্রন্থাগারে ইহার যে প্রতিলিপি আছে তাহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৭০। বাঙালী প্রতিভার সমুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া সুরক্ষিত হওয়া কর্তব্য।

মৃত্যু :—১২১৪ সনে (১৮০৭) খ্রীঃ বিজয়াদশমী দিন বিসর্জন দেখিয়া জগন্নাথ আর গৃহে গমন করেন নাই। ৯ দিন গঙ্গাবাস করিয়া আশ্বিনী কৃষ্ণা তৃতীয়ার গঙ্গালাভ করেন, (৪ কার্ত্তিক—১৯ অক্টোবর) তখন তাঁহার বয়স সৌর-মানে ১১৩ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া কিঞ্চিদধিক এক মাস হইয়াছিল। তাঁহার পারিবারিক জীবনের চিত্র অতি বিস্ময়কর। তিনি অন্যূন ৫০ বৎসর বিপত্নীক ছিলেন। কথায় বলে, "নাতির নাতি স্বর্গে বাতি"—জগন্নাথ বহুবারই স্বর্গে বাতি জ্বালিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১২০৯ সালের ৬ চৈত্র (১৮০৩ খ্রীঃ) তিনি ভূসম্পত্তির যে বিবরণ প্রদান করেন তন্মধ্যে দখলকার স্থলে ৩০ জনের নাম আছে—তিনি স্বয়ং, এক পুত্র রামনিধি বিদ্যাবাচস্পতি (বুঝা যায় জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তখন স্বর্গী হইয়াছেন), ১০ পৌত্র, ১৫ প্রপৌত্র ও ৩ বৃদ্ধপ্রপৌত্র। তাঁহার জীবনের বাকী চারি-পাঁচ বৎসরে প্রপৌত্র ও বৃদ্ধপ্রপৌত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছিল। ইহাদের পত্নী ও কন্যা সন্তান সহ টোলের ছাত্র ও ভৃত্যাদি স্বজনের সমষ্টি ৩০০ ব্যক্তি প্রতিদিন একান্নে আহার করিত। দুই মাসে ছয় দিন করিয়া এক এক সাতবৌয়ের রান্নার পালা ছিল; বৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আবশ্যক হইত না, তিন পুরুষ একত্র বসিয়া আহার করিতেন। বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতির উপনয়ন সংস্কারে জগন্নাথ স্বয়ং অন্যূন ১১০ বৎসর বয়সে "আচার্য্য" পদে বৃত হইয়া-ছিলেন। আজ স্বাধীনতা ও প্রগতির যুগে একান্নভুক্ত পরি-বারের এই উজ্জ্বল চিত্র স্বপ্নের অগোচর হইয়াছে। ১৯ কিম্বা ২০ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলে জগন্নাথ শতবর্ষজীবী হইতে পারিতেন না, সাংসারিক চিন্তায়ই তাঁহার আয়ুক্ষয় হইত। ১১০ বৎসর বয়সেও মধ্যন্যায়ের কূটপ্রশ্ন সমাধান করার শক্তি জগন্নাথের ছিল। বর্ত্তমানে এতাদৃশ অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব স্বপ্নেরও অগোচর হইয়াছে কেন, ভাবিবার বিষয়।

প্রসঙ্গ-কথা :—জগন্নাথের সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে এবং চরিতকারগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দুই-একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত গল্প এখানে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

(১) রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র লাভের জন্য জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত কবি কবিচন্দ্রকে জগন্নাথের নিকট সুপারিশ করিতে বলেন। কবিচন্দ্র নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত (মহাকবি বাণেশ্বরের পৌত্র) চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নকে ধরিতে উপদেশ করেন। পণ্ডিতটি বলিলেন এ ব্যাপারে চতুর্ভুজের হাত নাই। কবিচন্দ্র উত্তর করিলেন :—

"চতুর্ভুজে তুষ্টো নাস্তি নিভুর্জঃ কিং করিষ্যতি।"
(পুরীর জগন্নাথ নিভুর্জ)
(রামগতি ন্যায়রত্নের গোষ্ঠীকথা, ৫৬ গল্প)

(২) নবদ্বীপে প্রবাদ আছে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্ততঃ একক্ষণের জন্যও নবদ্বীপে সরস্বতী অধিষ্ঠান করেন। শুনিয়া জগন্নাথ বলিলেন, ত্রিবেণীতে সরস্বতী দিবারাত্র প্রত্যক্ষ। শ্লেষ অলঙ্কারদ্বারা সরস্বতীপদে নদীকে বুঝাইতেছে। (ঐ, ৯৬ কথা)

(৩) জগন্নাথের কৃপণতার খ্যাতি ছিল। ডাকাত-সর্দার ভাদু মল্লিক এক প্রান্তে রীতিমত দক্ষিণা দিয়া জগন্নাথের নিকট ব্যবস্থা চাহিলেন, "লুঠের দ্রব্যে ডাকাতের স্বত্ব আছে কি না?" জগন্নাথ স্বত্ব আছে বলিয়া লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন এবং ঐ রাত্রিতেই তাঁহার বাড়ীতে ডাকাতি হয়। আমরা "বিবাদভঙ্গার্ণব" হইতে এই অতি বিস্ময়কর অথচ শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর,

পাশকদ্যূতচৌর্য্যাদিপ্রতিরূপকসাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জ্জিতং যচ্চ তৎকৃৎস্নং সমুদাহৃতম্॥

ইতি বচনেন চৌর্য্যস্য স্বত্বজনকত্বম্। অতএব তদ্ব্যয় ঋণদানেঽপি চৌরস্য বৃদ্ধিলাভঃ এবং তদ্ধনেন পুণ্যকর্মানুষ্ঠানেন কিঞ্চিৎ ফলং ভবতি। পিতামহচরণাশ্চ চোরিতদ্রব্যে চৌরস্য স্বত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি।" (পৃ. ৭৬)

১২০৯ সনের তায়দাদে জগন্নাথ ডাকাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন "আমারদিগের বাটিতে ডাকাতি হইবাতে এবং কোটা পড়িয়া কাগজপত্রাদি ও পুস্তক অনেক তছরূপ হইয়াছে।"

বংশধর :—উপসংহারে আমরা জগন্নাথের অব্যবহিত বংশের শ্রেষ্ঠপুরুষগণের নামকীর্ত্তন করিলাম। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্রের ধারায় ন্যায়শাস্ত্র এবং কনিষ্ঠ রামনিধির ধারায় স্মৃতিশাস্ত্র পূর্ব্বাপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় স্বয়ং জগন্নাথকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়শাস্ত্রে ও ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করেন এবং বিবাদ-ভঙ্গার্ণব রচনায় জগন্নাথের অন্যতম সহকারী ছিলেন। ১৮০১ সনে সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা হইলে প্রথম বাঙালী পণ্ডিত নিযুক্ত হন রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। রাধাকান্তের মৃত্যুর পর ১৮০২ সনে কোলব্রুক সাহেবের অনুরোধে ঘনশ্যাম উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৬ সনে ঘনশ্যামের পরলোকগমনের পর উক্ত পদে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনেকে অবগত নহেন, সতীদাহের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ঘনশ্যামই

ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে ইহা শাস্ত্র ও সদাচার বিরুদ্ধ। ৪।৩।১৮০৫ তারিখে প্রেরিত নিজামত আদালতের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোর্ট-পণ্ডিতরূপে ঐ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন (জন্মভূমি, ফাল্গুন ১৩০০, পৃ. ১৬৯-৭০)। ঘনশ্যামের পৌত্র রামদাস তর্কবাচস্পতি (মৃত্যু ১২৭৫ সন) তাঁহার সময়ে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। ত্রিবেণীর শেষ নৈয়ায়িক রামদাসের পুত্র অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ১৩১৯ সনের চৈত্রমাসে স্বর্গী হন।

রামনিধির মধ্যম পুত্র স্মার্ত্ত গদাধর তর্কভূষণও বিবাদভঙ্গার্ণব রচনায় সহকারী ছিলেন। ১৭৯৩ সনের (ডিসেম্বর মাসে) তিনি নদীয়ার জজ R. Rocke সাহেব কর্তৃক নদীয়ার জজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৭ সনে জগন্নাথের পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গী হন। তিনিও অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। সর্ব্বোপযুক্ত পৌত্র ঘনশ্যাম ও গদাধরের অকালমৃত্যু জগন্নাথের পরম দুঃখের কারণ হইয়াছিল, নতুবা হয়ত তিনি শাস্ত্রোক্ত ১২০ বৎসরই পরমায়ু লাভ করিতে পারিতেন।

স্মৃতিরক্ষা:—আশ্বিনের শুক্লা পঞ্চমী (অর্থাৎ বোধনের পূর্ব্বদিন) জগন্নাথের জন্মতিথি উপলক্ষে, কিম্বা আশ্বিনের কৃষ্ণা তৃতীয়া তাঁহার শ্রাদ্ধতিথিতে ত্রিবেণীতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হওয়া উচিত। আশা করি আমাদের এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও প্রবৃত্তির অভাব হইবে না।

সেতু

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আশীষ সেনের পারিবারিক জীবনে সহসা এক প্রবল ঝড় উঠিল। ইহার প্রচণ্ডতা তাহাকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। এই আকস্মিকতার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঝড় উঠিল। ধুলা-বালি উড়াইয়া আনিয়া তার চোখে-মুখে সবেগে ঝাপ্টা মারিল। বিহ্বলতা কাটাইয়া চোখ চাহিতে সে দেখিল তার চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনার স্তূপ জমিয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে আবর্জ্জনা সরাইতে গিয়া সে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল যে ময়লার সহিত সঙ্গোপনে জড়াইয়া আছে তীব্র হলাহল। আশীষ সক্রোধে হাত গুটাইয়া লইল। এ অসহ্য। চেষ্টা করিয়া নিজেকে সে দমন করিল। শান্ত কণ্ঠে স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, এত ছোট চিন্তা যে তোমার মনে স্থান পেতে পারে এ কথা ভাবতেও আমি মরমে মরে যাই। দিন দিন কি হচ্ছ তুমি সুমিতা!

সুমিতা জ্বলিয়া উঠিল। বাঁকা সুরে কহিল, তা ব'লে নিজের চোখ কানকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারে না।

আশীষ স্ত্রীর এই অকারণ অভিযোগে যুগপৎ বিস্মিত এবং আহত হইল। ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, অবিশ্বাস করতে তোমায় আমি বলছিও না। গায়ের জোরে ওকাজ করানো যায় না, সে জ্ঞান আমার আছে। কিন্তু তোমার চোখ কানকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সুমিতা অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, পুলিস সাহেবকে সাধুবাদ…

আশীষ গর্জ্জিয়া উঠিল, সুমিতা…পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে সে কহিল, নিজেকে অনেক ছোট করেছ কিন্তু আর বাড়িও না এ আমার অনুরোধ।

সুমিতা এতটুকু না দমিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, তোমার কথা আমার মনে থাকবে।

আশীষ বিস্মিত চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল। সুমিতাকে এত কুৎসিত তার কাছে কোন দিন মনে হয় নাই। মিথ্যা বাদানুবাদ করিবার স্পৃহা তার নাই। আশীষ বাহিরে পা বাড়াইল। ঘরের আবহাওয়া যেন তার শ্বাসরোধ করিয়া ধরিয়াছে।

সুমিতা আর একবার জ্বলিয়া উঠিল, আপিসের কাজ বুঝি আরও কিছু বাকী রয়ে গেছে? আর কারুর আসবার কথা আছে বুঝি?

আশীষ তীব্র কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল, হ্যাঁ আরও দুটি বান্ধব মেয়ের আসবার কথা আছে। সে আর দাঁড়াইল না। এমনি এক নোংরা ব্যাপার লইয়া সুমিতার সহিত বচসা করিতে সে ঘৃণা বোধ করে। কিছুদিন হইতেই সুমিতার একটা পরিবর্ত্তন আশীষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দিবার মত কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পায় নাই। বস্তুতঃ এমনই একটা অকারণ সন্দেহ যে সুমিতার মনে কখনও দেখা দিতে পারে ইহা তার স্বপ্নের অতীত। অথচ এই স্বপ্নাতীত ব্যাপার আশীষের জীবনে সত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুমিতার এই চিত্তবিকারের সূত্র ধরিয়া যতই সে ভাবিয়া দেখিতে চায়, মন তার বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে। আত্মসম্মানবোধ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায়।

অদ্ভুত এই মেয়ে জাতটা। এদের এতটুকু যদি বুঝিবার উপায় থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে এদের বিলাসের ঢেউ দুকূল ছাপাইয়া পড়ে এক দুর্নিবার বেগে। রূপে, রসে, মাধুর্য্যে তারা অতুলনীয়। চলায়, বলায়, ঔদার্য্যে সুগভীর। অথচ বিবাহের পরে কেমন করিয়া এরাই যে নিজেদের চতুর্দ্দিকে এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টানিয়া দিতে পারে ইহা পুরুষের কাছে নিতান্তই

অবোধ্য। তথাপি ভাবিয়া দেখিতে হয়। সংসারকে আশীষ ভালবাসে। এর শোভন একটি রূপের ছবি তার মনে গভীর ভাবে আঁকা। সহজ এবং সুন্দর পরিবেশ তার একান্ত কাম্য; তাই সংসারের এই বিকৃত রূপ দেখিয়া আশীষ বিস্মিত হইল। তার মন বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল সুমিতার উপর। কত বড় মানসিক অধঃপতন আজ তার ঘটিয়াছে। এতটুকু উদারতা নাই। হিংস্র কুটিল আত্মসর্ব্বস্ব এক নারী। নিজের কথা ছাড়া কোন যুক্তি মনে স্থান পায় নাই। অথচ এমন এক দিন ছিল যখন সুমিতার নির্ভরপরায়ণতার অন্ত ছিল না। স্বচ্ছ নির্ম্মল ভালবাসার মূর্ত্তিমতী কল্যাণীরূপে তার জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির সহিত সে ছিল অভিন্ন। সেখানে কোন অনাবশ্যক প্রশ্নের প্রবেশ-পথ ছিল না। আশীষ সারা দেহে ও মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই আশীষ, সেই সুমিতা বাহিরের দিক দিয়া আজও তেমনি রহিয়াছে। বরং বিবাহের সামাজিক বন্ধন তাদের আরও নিকটতম হইয়া উঠিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। অথচ সে দিনের সে উদার মনোভাব স্বাধীন চিন্তার প্রশস্ত পথ যেন আজিকার বন্ধনের আবেষ্টনীতে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে পলাইয়া রক্ষা পাইবার উপায় নাই, নিঃশব্দে উপেক্ষা করাও অসম্ভব। শক্ত কথা কহিতেও তার ভদ্র মন দ্বিধায় পড়ে। কিন্তু মনকে যে সে আয়ত্তে আনিতে পারিল না তার ছাপ তাহার চোখে-মুখে প্রকাশ পাইল।

ইতিমধ্যে এক সময় ফিরিয়া আসিয়া নামমাত্র দুইটা নাকে-মুখে গুঁজিয়া পুনরায় আশীষ বাহির হইয়া গেল। সুমিতার সহিত দেখা হইল না। ভালই হইল। ব্যবহারটা কতকটা যেন তার চোরের মত। সুমিতার মিথ্যা অভিযোগের বোঝা তাকে যেন ঢের বেশী ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। এ যেন তাদের দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত অপমান। চরম লজ্জা।

অন্তরাল হইতে সুমিতা সবই লক্ষ্য করিল। কিন্তু কাছে আসিল না। তাহাকে ত একবারও কেহ ডাকে নাই। তাহার খাওয়া হইয়াছে কিনা সে খবরটা নেওয়া পর্য্যন্ত কেহ আবশ্যক বোধ করিল না। যে কাজটা স্বামীর একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে আজ এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটিল। না হয় তার বলার ভঙ্গী একটু বাঁকা এবং রূঢ় হইয়াছে। কিন্তু সে একেবারে মিথ্যা বলে নাই ত। ঐ বিদেশী মেয়েগুলোর আসা-যাওয়া···ওদের নিয়ে স্বামীর অমন মাতামাতি ··। সুমিতা ইহার অধিক ভাবিতে পারে না ··। চায়ও না।

সুমিতার প্রতিবিম্ব রূপসজ্জার দীর্ঘ আরশিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুমিতা সহসা আরশির সম্মুখে নিবিড় হইয়া দাঁড়াইল। নিজের রূপ, আর যৌবনকে সে যেন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। কোথাও কি এতটুকু মরিচা ধরিয়াছে? সুমিতা অবাক হইয়া গেল। এ কেমন তার চিত্তবিভ্রম। এই খিকিখিকি মনোভাব তার কেন হইল! নিজেকে নিজে সে সহস্র রকমে জিজ্ঞাসা করে। নিজেকে সে শাসন করে। মন বিকারে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু মনের কথা সব সময় প্রকাশ করা যায় না। জীবনের বিফলতা সেইখানেই।

আপিসের কাজকর্ম্ম শেষ করিতে আশীষের আজ অপেক্ষাকৃত বিলম্ব ঘটিল। অথচ সোমনাথের সহিত আজ দেখা হওয়া তার নিতান্ত আবশ্যক। আশীষ সোমনাথের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। একলা মানুষ সোমনাথ। বিবাহ করে নাই। গৃহিণী বলিতে, সহচর বলিতে আছে বৃদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র। বাহিরের ঘরেই সোমনাথের সাক্ষাৎ মিলিল। একাগ্রভাবে সে একখানা মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। আশীষের আগমনে পত্রিকাখানি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া সোমনাথ তাহাকে সাদরে আহ্বান করিল,—এস। এত রাত্রে যে?

আশীষ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, রোঁদে বেরিয়েছি। সারারাত ডিউটি পড়েছে। ভাবলাম ডিউটিটা তোর এখানেই আজকের মত দিয়ে যাই।

সোমনাথ কিছুক্ষণ আশীষের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাসিমুখে কহিল, পুলিস সাহেবের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আসল ব্যাপার কি বল ত। তোমাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না।

আশীষ হাসিয়া কহিল, ওটা তোমার একলার দোষ নয় সোমনাথ।

সোমনাথও হাসিল।

আশীষ অন্য প্রসঙ্গে আসিল, খাওয়াদাওয়া শেষ করে ফেলেছ নাকি? কৃষ্ণচন্দ্র কোথায়?

সোমনাথ কহিল, তিনি রন্ধনশালায় আহার্য্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। কিন্তু ব্যাপার কি আশীষ? সত্যিই রোঁদে বেরিয়েছ, না অন্য কোন দরকার আছে? রাতের কাজ তুমি বরাবর এড়িয়ে চল বলেই জানি।

আশীষ কহিল, বলছি কিন্তু তার আগে কেষ্টকে আর এক-জনার ব্যবস্থা করতে বলে এস।

সোমনাথ একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তা না হয় করছি কিন্তু এত বড় অনিয়ম তোমার সহ্য হবে ত? তা ছাড়া এ কথা শুনলে সুমিতা আমায় কোন দিন ক্ষমা করবে না।

আশীষের কণ্ঠস্বর তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন একটু কঠিন হইয়া উঠিল, সুমিতার মান-অভিমানকে তুমি যে ভাবে খুশি দেখতে পার, কিন্তু নিজের ইচ্ছাই আমার কাছে যথেষ্ট।

সোমনাথ হঠাৎ হাসিয়া উঠিল, কহিল, তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। একটু থামিয়া পরিহাস-তরল-কণ্ঠে সোমনাথ পুনরায় কহিল, আহারাদির পর শয়নের ব্যবস্থাও কি এখানেই করতে হবে বন্ধু!

আশীষ সোমনাথের পরিহাসের ধার দিয়াও গেল না।

কহিল, তোমার অনুমান মিথ্যে নয়। ও ছুটোরই আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

সোমনাথ এতক্ষণে গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, অনুমান করে নিলাম যে তোমাদের মধ্যে মান-অভিমানের পালা বেশ জমে উঠেছে কিন্তু তার জন্যে বিবাগী হয়ে গৃহত্যাগের তাৎপর্য্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আশীষ কহিল, সংসার যখন কর নি তখন ও প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই তোমার।

সোমনাথ কহিল, সংসার না করলেও সংসারীদের আমি জানি। তোমাদের বৈরাগ্য যে সাময়িক চিত্তবিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। তোমাদের জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বলেই এ কথা বলতে ভরসা পাচ্ছি। বড় কোন্ পথে এসেছে তা বুঝতে আমার বাকী নেই।

একটু থামিয়া সোমনাথ পুনশ্চ কহিল, ন্যায়-অন্যায়ের কথাই যদি ধরা যায় তবে সুমিতার অন্যায়কে ছাপিয়ে তোমার অশোভন কার্য্যাবলী চের বেশী উগ্র হয়ে উঠেছে।

আশীষ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, যা জান না তা নিয়ে মিথ্যে ওকালতি করো না। সুমিতা যে আমার কতখানি সে তুমি জান। বিয়ের পূর্ব্বের কথাও তোমার অজানা নয়।

সোমনাথ শান্ত হাসিমুখে কহিল, তা নয় বলেই তোমার আজকের ব্যবহারে আমি বিস্মিত হয়েছি।

আশীষ কহিল, সেইখানেই তুমি মস্ত বড় ভুল করেছ। আজকের সুমিতা আগাগোড়াই নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। পূর্ব্বের সঙ্গে তার এতটুকু মিল নেই।

সোমনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আশীষের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। আশীষ পুনরায় কহিল, সুমিতা আমায় আজকাল সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করেছে। আমার চলাফেরা থেকে কথা বলার উপর পর্য্যন্ত তার সজাগ প্রহরা।

সোমনাথ সহজ কণ্ঠে কহিল, তোমার অপরাধ?

আশীষ কহিল, সেইটেই ত আজও বুঝে উঠতে পারছি নে। গোল বেধেছে সেইখানেই।

সোমনাথ কহিল, গোল কি নিছক অকারণেই বেধেছে আশীষ?

আশীষ কহিল, অকারণে না হলেও তাকে কারণ বলা চলে না। দিন কয়েক ধরেই আমার আপিসে গুটিকয়েক বর্ম্মী মেয়ের আনাগোনা সুরু হয়েছে। ওদের উপর সরকারের সুনজর পড়েছে। তাইতেই নিত্য তিরিশ দিন হাজিরার ব্যবস্থা। সূচনাটা এই পথ ধরেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু পরিণতিটা হয়েছে আমার নিরুপদ্রব জীবনে এক তুষ্টগ্রহের মত। সুমিতার সহজ বুদ্ধি আজ মোহাচ্ছন্ন, দৃষ্টি সন্দেহ-কুটিল। তার অনুযোগ আর আক্রমণ আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

সোমনাথ একটুখানি হাসিয়া কহিল, আর তুমি সেই অভিযোগ নিঃশব্দে মেনে নিয়ে চোরের মত পালিয়ে এসেছ। তাকে তার ভুলটা বুঝিয়ে দাও নি কেন?

আশীষ উষ্ণ কণ্ঠে কহিল, কারণ সে তার নিজের ভুলটা স্বীকার করতে চায় না। তার ভাষা আরও রূঢ় হয়ে ওঠে। বিয়ে করেছি বলে কি হাসি-ঠাট্টাকে ভুলে যেতে হবে!

সোমনাথ হাসিয়া ফেলিল।

আশীষ কহিল, তুমি হাসছ কেন?

সোমনাথ কহিল, ভাবছিলাম হাকিম বড় কড়া। সওয়াল জুতসই না হলে উদ্ধারের উপায় নেই।

ইহার পরে দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল এবং এক সময় আশীষ প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিল, সোমনাথ, সংসারী না হলেও আমার চেয়ে সংসারকে তুমি ঢের বেশী চিনেছ এ কথা আমায় স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু এর পরে তুমি গিয়ে আর সুমিতার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে ত?

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, না পারার হেতু?

আশীষ কহিল, সব সময় কার্য্য এবং কারণের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না বলেই এ কথা বলছি।

সোমনাথ কহিল, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ও কথা খাটে না। ব্যক্তিগত ভাবে কারু কাছেই আমায় দোষী হয়ে থাকতে হবে না। না তোমার কাছে না সুমিতার কাছে। কিন্তু আর না, এবারে তুমি যাও। সাবধান, যেমনটি বলেছি তার এতটুকু ব্যতিক্রম করো না। কাল যথাসময় আমার দেখা পাবে।

আশীষ বাসায় ফিরিয়া আসিল। দূর হইতে সে লক্ষ্য করিল সুমিতার অপেক্ষমাণ মূর্ত্তি। বারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। আশীষ কাছে আসিতেই সুমিতা অদৃশ্য হইয়া গেল। শয়নঘরে আসিয়া দেখিল সুমিতা ঘুমাইতেছে। একটু পূর্ব্বেই সে বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। আশীষ কথা কহিল না। যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল জামা কাপড় বদল করিয়া তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল। মনে মনে সে একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ব্যবহারে তার লেশমাত্র প্রকাশ পাইল না। বরং প্রকাশ্যে সে সুমিতাকে উপেক্ষা করিল। তার নিয়মিত জীবনযাত্রায় কোথাও এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এমন তার ভাবে বোঝা গেল না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। যত বড় আঘাতই সুমিতা তাহাকে দিক না কেন তার একান্ত নির্ভরশীল ভালবাসায় আশীষের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আশীষ তার এই দুর্ব্বলতাকে মনে মনে শাসন করিল। যে ক্ষত আজ সুমিতার ব্যবহারে দেখা দিয়াছে তার চিকিৎসা প্রয়োজন। সোমনাথ ঠিকই বুঝিয়াছে তার অত্যধিক প্রশ্রয় হয়ত সুমিতাকে এই পথে টানিয়া আনিয়াছে। কথাটা সুমিতার জানা দরকার।

তাদের দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাসের যে রেখাপাত হইয়াছে অঙ্কুরেই তার নিরসন আবশ্যক। তাদের উভয়ের জন্যই আশীষকে শক্ত হইতে হইয়াছে। আশীষ মনকে বুঝাইল। একবার আড়চোখে সুমিতার মুখের প্রতি সে চাহিয়া দেখিল। সুমিতা নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিলেও সে যে নিদ্রিত নয় এ কথা আশীষের বুঝিতে বাকি নাই। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিয়াছে যে, শরীরের দোহাই দিয়া সকাল বেলা সুমিতা কিছু খায় নাই এবং এখন পর্য্যন্ত সে অভুক্ত। আশীষ অন্তরে বেদনা বোধ করিল। একবার সুমিতাকে খাইতে যাইবার অনুরোধ করিতে গিয়াও নিজেকে সম্বরণ করিল। অকারণে যে আত্মনিপীড়ন করিতে চায় তাকে বাধা দিয়া কি হইবে। কিন্তু বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গী হৃদয়ের কোমলবৃত্তির মুখে ভাসিয়া গেল।

মৃদু কণ্ঠে আশীষ ডাকিল, সুমিতা—

সুমিতা সাড়া দিল না।

চেষ্টা করিয়াও আশীষ তার কণ্ঠস্বর সহজ এবং স্বাভাবিক করিতে পারিল না। আবেগের পরিবর্ত্তে কণ্ঠস্বরে কতকটা যেন বিরক্তি প্রকাশ পাইল। আশীষ পুনরায় ডাকিল, ঠাকুর তোমার জন্যে বসে রয়েছে।

সুমিতা তথাপি নিরুত্তর।

আশীষ বলিয়া চলিল, সকালবেলা খাও নি। শুনলাম শরীর খারাপ। শরীর যে তোমার খারাপ নয় সে আমি জানি। রাত না ক'রে খেয়ে এস। মিথ্যে লোক হাসিও না।

সুমিতার এতক্ষণের ঘুম নিমেষে টুটিয়া গেল। তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠে সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, আমার খাওয়া নিয়ে কাউকে মাথা ঘামাতে আমি ডাকি নি। আমার খাওয়া না-খাওয়াটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার ত হয়েছে।

সুমিতা এক মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোনদিকে দৃক্পাত না করিয়া বাহির হইয়া গেল, এবং ইহারই কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল, তুমি যে বললে বড়বাবু এলে খাবে। তখন শরীর খারাপ বললে ত খানকয়েক লুচি ক'রে দিতে পারতুম না।

সুমিতা তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিতেছিল, তখন কি জানতুম শরীরটা আবার খারাপ হবে। তুমি খেয়ে নাও, আমার জন্য ভাবতে হবে না।

সুমিতা পুনরায় শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। তার পদক্ষেপ হইতে আরম্ভ করিয়া দরজায় অর্গল রুদ্ধ করা বিজলি বাতির 'সুইচ-অফ' করিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত যেন এক কঠিন স্পর্শে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কোথাও এতটুকু ছন্দ নাই, বেতালা এবং বেসুরো। আশীষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখিয়া সুমিতার প্রতিটি কার্য্যকে অনুভব করিল। কিন্তু একটি কথাও আর সে কহিল না। মনের কোণে ধীরে ধীরে যে কোমলতা দেখা দিয়াছিল তার আর কণামাত্র অবশিষ্ট রহিল না। বরং তার মনোভাব কঠিনতর হইয়া উঠিল। কিসের এত তেজ—এতখানি দম্ভ!

দুই জনে পাশাপাশি শুইয়া আছে। কাহারও চোখে ঘুম নাই। শুধু মাঝে মাঝে দুই তরফ হইতেই এক একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে আরও ভারী করিয়া তুলিল। অভিযোগ দু'জনারই আছে। যারা তার ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

পরদিন সুমিতার ঘুম ভাঙিল বিলক্ষণ দেরিতে। সারারাত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং আত্মগ্লানিতে সে ঘুমাইতে পারে নাই। শেষরাত্রে কখন এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙিয়া দেখে আশীষ তার বহু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সুমিতার মন বলে সে স্বামীর প্রতি অসঙ্গত এবং অশোভন ইঙ্গিত করিয়াছে। সে তার অনুতপ্ত মন লইয়া স্বামীর অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। একটি সহজ স্নেহপূর্ণ ডাকের প্রত্যাশায় সে পথ চাহিয়া ছিল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত ঘটিল। স্বামী আসিল, নিঃশব্দে কাপড় জামা পরিবর্ত্তন করিয়া আহার করিল অথচ একবার ডাকিয়া বলিল না খাইতে চল, অথচ ইহা তাহার বিবাহিত জীবনের রোজকার অভ্যাস। ইহাতে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক। সুমিতা নিজেকে নিজে বুঝাইতে চায়। কিন্তু মন বলে, কাজটা ভাল হয় নাই। স্বামীর ধৈর্য্য হারানোর যথেষ্ট কারণ আছে যার ইন্ধন সে নিজেই যোগাইয়াছে। নইলে কি এমন ঘটিয়াছিল যাহার জন্য স্বামীকে সে অমন নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিয়াছিল। তার আন্তরিক ভালবাসার উপর নির্ম্মম ভাবে সে আঘাত করিয়াছে। এ যেন কেমন এক প্রকার নেশা তার। এর মধ্যে কেমন একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের মধুর স্বাদ পাওয়া যায়। নিক্তির ওজনে চুলচেরা হিসাব লওয়া···ব্যবহারে কমপ্রাপ্ত হইয়াছে কিনা!

সুমিতা যখন এমনি ভাবে নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে ব্যস্ত, সোমনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সুমিতা অকারণে চমকাইয়া উঠিল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ও···সোমদা তুমি?

তার জিজ্ঞাসার ধরণে সোমনাথ হাসিয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি আর কাউকে আশা করছিলে নাকি? কিন্তু সে যাক···তোমার শরীর কি ভাল না? চেহারাটা তেমন ভাল ঠেকছে না যেন?

সুমিতা মৃদু প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, ভাল আছি ত। শত চেষ্টা করিয়াও সে তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন চাপা দিতে পারিল না। ইহার উপর ঠাকুর আসিয়া আর এক গোল বাধাইল। কাল সুমিতার কিছুই খাওয়া হয় নাই, বুড়ো ঠাকুর তাই সুমিতার জন্য খানকয়েক লুচি ভাজিয়া লইয়া আসিয়াছে। কথাটা তার মনে ছিল। বড়বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুকে দেখিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুমিতা ধমক দিতে

সে চুপ করিল এবং আহার্য্য টি-পয়ের উপর রাখিয়া ভীতভাবে প্রস্থান করিল। যদিও সে বুঝিল না অন্যায়টা তার কোথায়।

সোমনাথ কহিল, মুখ দেখেই সন্দেহ হয়েছিল কোথাও একটা গোল বেধেছে। শরীর যখন অসুস্থ নয় তখন ভাতের উপর এ রাগ-অভিমান কেন। ঝগড়া করেছ বুঝি?

সুমিতা মৃদু একটুখানি হাসিল, কহিল, অত কথায় তোমার দরকার কি সোমদা!

সোমনাথ হাসিমুখে কহিল, তা বটে…কিন্তু সোমনাথ তোদের অনেক ব্যাপারে জড়িত কিনা তাই এ বিড়ম্বনা। আশীষ বলে, অন্যায় তোর, তুই হয়ত বলবি ঠিক তার উল্টো। আমি কিন্তু বলি, দোষ কারুর নয়। দোষ দাম্পত্য জীবনের, যার গতি মোটেই সহজ এবং স্বচ্ছন্দ নয়। নইলে এ সহজ কথাটা তোদের কেউই বুঝতে চাইবি না কেন? অবিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি মানুষকে শুধু পীড়া দিতেই সক্ষম; তার গতি কেউ রোধ করতে পারে না, যদি সত্যিই সে অবিশ্বাসী হয়। তবু মিথ্যা কেন এ মন কষাকষি একথাটা আমি কিছুতেই বুঝি না।

সুমিতা সহসা জ্বলিয়া উঠিল, খবরটা তোমার কাছেও গিয়ে পৌঁছেছে তা হলে। তাই বুঝি দয়া করে তোমার এত সকালে এখানে আসা হয়েছে। সোমদা এমনি করেই তোমরা মেয়েদের বিচার কর। তারা যা জানতে চায় তার এমনি বিকৃত ব্যাখ্যাই তোমরা করে থাক।

সোমনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। সস্নেহে দুইখানি হাত সুমিতার দুই কাঁধের উপর স্থাপন করিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, কথার জাল বুনে আমায় বিভ্রান্ত করতে পারবে না সুমিতা। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো তোমার মনে একটুও ময়লা ছিল না? আমি হাসিমুখে হার স্বীকার করে ফিরে যাচ্ছি।

সুমিতা মস্তক অবনত করিল।

সোমনাথ পুনরায় কহিল, আমি অবিবাহিত—হয়ত তোমাদের জীবনধারার কোন ধারণাই আমার নেই, তবুও আমার মনে হয় দৈত জীবনে প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল বিশ্বাস! যার অভাব জীবনে অভিশাপ…

পশ্চাতে পদশব্দ হইল। আশীষ ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া মুহূর্তের জন্য থামিল। সোমনাথের হাত দুখানি তখনও সুমিতার কাঁধের উপর। আশীষের মুখের চেহারায় যেন একটু পরিবর্তন দেখা গেল। এই ভাবপরিবর্তনটুকু কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। সোমনাথ ধীরে ধীরে হাত দুখানি নামাইয়া লইল। আশীষ ততক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সুমিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাইল চাঞ্চল্য। কহিল, তোমার বন্ধু অমন মুখ কালো করে চলে গেল কেন সোমদা?

সোমনাথ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, আশীষের মুখ কাল করে চলে যাবার কি কোন কারণ ঘটেছে সুমিতা? মিথ্যের আতঙ্কে অত সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছ কেন? ওকে যা খুশী ভাবতে দাও।

সুমিতা কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিল না। বার বার শুধু একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। সোমনাথ যেন একটু রূঢ় কণ্ঠেই কহিল, সত্যিই এ জানলে আমি এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতাম না। তোমরা দিন দিন শব হচ্ছ কি!

সোমনাথ যেন অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ, সুমিতার কথা বলার ধরণ, তার মুখের পাংশুবর্ণ চেহারা দেখিয়া সোমনাথ আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিল না। নিজে সে পলাইয়া বাঁচিল। কিন্তু সুমিতার চতুর্দ্দিকে যেন দুশ্চিন্তার বেড়াজালের সৃষ্টি হইয়াছে। দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সে যেন আর ভাবিতে পারিতেছে না।

সুমিতা বারান্দার একটি বিশেষ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে স্বামীর আপিস-ঘরের সব কিছুই তার দৃষ্টিপথে পড়ে। নিয়মিতভাবে আশীষ কাজ করিয়া চলিয়াছে। বড় জমাদার আসিয়া গোটাকয়েক ফাইল তাঁর টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। এর পরে তার সহকারীদের আগমন হইবে। তাদের সঙ্গে কাজ শেষ হইলে জমাদারের পুনরায় আবির্ভাব ঘটিবে। তার পরে আশীষকে ডেপুটি কমিশনারের কাছে যাইতে হইবে গত দিনের কাজের কিরিস্তি দাখিল করিতে। তার পরে এ বেলার মত ছুটি। কিন্তু আজ উহাদের কি হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আশীষের সহকর্মীদের দেখা নাই। ঘড়ির কাঁটা আজ সুমিতার দ্রুত চিন্তাধারার সহিত তাল রাখিয়া চলিতেছে না। সুমিতা পুনরায় তার শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। লুচিগুলি সব শুকাইয়া গিয়াছে। ঐ দিকে দৃষ্টি পড়িতে তার গা বমি বমি করিতে লাগিল। নিজেকে যেন বড় অসহায় বড় দুর্ব্বল মনে হইতে ছিল। সুমিতা শয্যার আশ্রয় লইল। ক্লান্ত দেহ এবং ভারাক্রান্ত মন লইয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল এবং হয়তো এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

আশীষ ডাকিল, সুমিতা…

সুমিতা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বিস্মিত বিহ্বল চোখে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আশীষ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজও কি খাবে না ঠিক করেছ?

সুমিতার বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। কি দুশ্চিন্তায় না তার এতক্ষণ কাটিয়াছে। অথচ স্বামী ত তাকে একটা প্রশ্নও করিল না। সুমিতা নিজের কাছে নিজেই যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল।

আশীষ পুনরায় কহিল, টেবিলের উপর লুচির থালা দেখে ভাবলুম আমার অসমাপ্ত কাজ হয়তো সোমনাথ শেষ করবে তাই আর দাঁড়ালাম না। কিন্তু ফিরে এসে দেখি থালায় খাবার তেমনি পড়ে আছে। সত্যিই এমনি পাগলামি আর কত দিন করবে। ছিঃ সুমিতা!

আশীষ সুমিতার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া খেলা করিতে করিতে কহিল, ওঠ—সোমনাথের এতক্ষণ হয়তো অর্দ্ধেক খাওয়াই হয়ে গেছে।

সুমিতা আর একবার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া হঠাৎ যেন আবেগের আতিশয্যে তার হাতখানি সবলে চাপিয়া ধরিল।

আশীষের চোখ-মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

১৮৬১—১৯৩০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মকথা

"জেলা নদীয়া থানা মওয়াপাড়ার অধীন সিমলা গ্রামে ইংরাজী ১৮৬১ সালের ১লা মাঘ* [মার্চ] শুক্রবার অপরাহ্ণে আমি জন্মগ্রহণ করি। প্রসবান্তে আমার মাতা আমাকে মৃত বলিয়া ত্যাগ করেন। পোড়াদহর সন্নিকট মীরপুর রেলওয়ে



অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ষ্টেশনের নিকট একটা পুরাতন কুঠী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুঠীর সাহেবদের এক বিলাতী ধাত্রী ছিলেন। তিনি নানারূপ প্রক্রিয়াদ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করেন।

আমার পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর রোহিলা পটির কুলীন। রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগচী নামে একজন প্রধান লোক ছিলেন। সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার মাতা তাঁহারই কন্যা। আমরা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের মৈত্রেয় বংশ। আমাদের মধ্যে কামদেব মৈত্রেয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী মেঘনা গ্রামের জমিদার বংশে বিবাহ করেন। সেই হইতে রাজসাহীর বাসস্থলী পরিত্যক্ত হয়। ফরিদপুর জেলায় রুক্মিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতামহ গোপীকৃষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী করিতেন। পিতামহ উমাকান্ত কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন না। তিনি তিন বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাঁহার প্রথম পক্ষের সন্তান। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যে রুক্মিণী গ্রাম হইতে পিতামহী পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি গ্রামে পলায়ন করেন। সেই হইতে আমরা কুমারখালিতে আসি। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও আমার পিতা মথুরানাথ বাল্য-সুহৃদ্ এবং কুমারখালির অধিকাংশ উন্নতির মূল। নীল-বিদ্রোহের সময়ে এই দুই জনের নিকট হইতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'প্রভাকর'-সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—মফস্বলের অনেক সংবাদ পাইতেন।

এই সময় মথুরানাথ, কুমারখালি ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তখন হরিনাথ, মথুরানাথ এবং তাঁহাদের সমবয়স্ক কুমারখালির যুবকগণ অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পাঠ করিতেন এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা একটি বঙ্গবিদ্যালয় এবং একটি বালিকা-বিদ্যালয় কুমারখালিতে স্থাপিত করেন। হরিনাথের 'বিজয়বসন্ত' গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সূচনা হয়।

এই সকল বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মথুরানাথের প্রথম সন্তান আমি। আমি ইহাঁদের সকলের স্নেহের পাত্র হই। "এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি করে, এইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে," এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণে আমার নামও অক্ষয়কুমার রাখা হয়। হরিনাথই আমার এই নামকরণ করেন এবং তিনিই আমার সাহিত্য-পথের গুরু।

আমার জন্মের পর পিতা ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী গমন করেন। সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত হয় না। পিতা রাজসাহীতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া রাজসাহীবাসী হন। গত অর্দ্ধোদয়ের পূর্ব্ব অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমি রাজসাহীতে নীত হই।

বাল্যকালে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন কুমার-

* "মাঘ" মুদ্রাকরপ্রমাদ—"মার্চ" হইবে। ১৩২৭ সালে প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বিবরণ)' পুস্তকে অক্ষয়কুমারের লিখিত নিজ বংশ-পরিচয় দ্রষ্টব্য। 'বিশ্বকোষ', 'মহাকোষ' প্রভৃতিতে ভুলক্রমে অক্ষয়কুমারের জন্মতারিখ "১লা মাঘ ১২৬৮" (ইং ১৮৬২) বলা হইয়াছে।

খালিতে কখন বা রাজসাহীতে থাকিতাম। হরিনাথের বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত জলধর সেন এবং আমি এক সঙ্গে বিদ্যারম্ভ করি। আমরা তিন জনেই হরিনাথের নিকট বিদ্যা ও রচনা শিক্ষার উপদেশ পাইয়াছি।

১৮৭১ সালে বোয়ালিয়া-গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে আমার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৭৪ সাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, আর রামকুমার বিদ্যারত্নের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকদিগের মধ্যে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী এবং পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,—ইহাঁরাই এক্ষণে জীবিত আছেন।

১৮৭৮ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হই এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকার বৃত্তি পাই। তখন বোয়ালিয়া গবর্মেণ্ট স্কুল রাজসাহী কলেজে পরিণত হইয়াছে। ঐ কলেজে এফ-এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, গবর্মেণ্ট হইতে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাই। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দর-নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয় কন্যা হৃদ্‌কমল দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কলেজে রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করি। অধ্যয়নশ্রমে ক্রমে অসুস্থ হইতেছি বলিয়া, পিতা আমাকে এম-এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করিয়া, ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাজসাহীতে লইয়া যান। রাজসাহী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া,* ১৮৮৫ সাল হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছি। শৈশবে যে পাঠানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়াছে।

প্রথম আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্ব্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় 'বঙ্গবিজয়' নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পুড়িয়া গিয়াছে। বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড লিটন প্রেস এক্ট পাস করায় বৃদ্ধ হরিনাথকে অবসর দিয়া, আমি, জলধর ও প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হরিনাথের অনেক ছাত্র 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। এই কালের মধ্যে স্বদেশের নানা ঐতিহাসিক বিবরণ ঐতিহাসিক চিত্র নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা করি। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে 'সমর সিংহ' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে অতি অল্প সময়েই বিক্রীত হইয়া যায়। ইহার লভ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত হয়। এফ-এ পড়িবার সময়ে মেকলের ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধানকার্য্য দীর্ঘকাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রাণী ভবানীর জীবনচরিত উপলক্ষ করিয়া, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করি। কতকগুলি বিশেষ ঘটনায় "রাণী ভবানী" প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, "সিরাজ-উদ্দৌলার" ঐতিহাসিক চিত্র কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রেরিত হয়। কিয়দংশ প্রকাশিত হইবার পর 'সাধনা' বন্ধ হইয়া যায়। "সিরাজ-উদ্দৌলার" অবশিষ্টাংশ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'সাহিত্যে' সীতারামের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে 'সাহিত্যে' রাণী ভবানীর প্রথমাংশ ও 'ভারতী'তে "মীরকাশিম" সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। মীরকাশিমের কিয়দংশ মীরজাফর নামে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ভারতী পত্রের সম্পাদনতার গ্রহণ করিলে, তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রভাবে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনতার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।

বড়লাট লর্ড কর্জ্জন যখন গৌড় দেখিতে যান, তখন তিনি হিন্দুদের সময়ে গৌড় কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অনুরোধে লর্ড কর্জ্জনের পাঠের জন্য আমি Gauda, under the Hindus [Rajshahi, 20 Feb., 1902, pp. 24) নামক এক ইংরাজী প্রবন্ধ রচনা করি। এ গ্রন্থ কেবল বিতরণার্থ মুদ্রিত হয়। আমি এশিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে আমি লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপি প্রকাশ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতে স্বদেশ-হিতের জন্য নানারূপ সভা-সমিতির সহিত আমার যোগ ছিল।* আমি রাজসাহী ছাত্র-

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে জানা যায়, অক্ষয়কুমার ১৮৭৮ সনে বোয়ালিয়া স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে রাজসাহী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তৃতীয় বিভাগে বি-এ, এবং ১৮৮৫ সনে রাজসাহী কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এল পাস করেন।

* ১৮৯০ সনে অক্ষয়কুমার 'শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি'র সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সমিতি "শিক্ষা-পরিচর্য্যা এবং জাতীয়

সভা, কলিকাতা ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন নামক ছাত্রসভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং রাজসাহী এসোসিয়েশনের সভ্য। সাত বৎসর কাল রাজসাহী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলাম। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটি, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছি। আমি কখন নির্ব্বাচক হইবার জন্য প্রার্থী হই নাই। প্রতিবারই গবর্ণমেণ্ট আমায় মনোনীত করিয়াছেন।"

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ১৩১১ সালে (ইং ১৯০৪) প্রকাশিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' পুস্তকে এই আত্মকথা স্থান পাইয়াছে। ইহার সহিত 'বঙ্গ-ভাষার লেখক'-সম্পাদক অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা এই :—

"ভারতও জুবিলির সময়ে [১৩০৪ সাল] বক্তৃতায় বত্রিশ হাজার টাকা উঠে। এই টাকায় রেশম-শিল্প-বিভালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ইনি পাঁচ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতায় যে-বার কংগ্রেসের অধিবেশন হয় [ইং ১৯০১], সে-বার ইনি স্বয়ং বহু লোকের সমক্ষে প্রদর্শনীতে রেশম-শিল্পের নানা অঙ্গের প্রদর্শন করেন।

রাজসাহীতে সংস্কৃত নাটক—যথা শকুন্তলা, বেণীসংহার প্রভৃতির অভিনয়ের ইনি সূত্রপাত করেন। ইঁহার উদ্যোগে রাজসাহীতে যে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়, তাহা দেখিয়া পরলোকগত ছোটলাট বাহাদুর পরম প্রীতি লাভ করেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—যথা মদনগোপাল গোস্বামী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বর্দ্ধমান-রাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ,—এই অভিনয় দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোক-নিবদ্ধ অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন।

ক্রিকেট-খেলা এবং চিত্রাঙ্কনে ইনি সুপটু। রেশম-শিল্পের সকল বিষয়েই ইনি অভিজ্ঞ। প্রত্যহ স্নানের পর ইনি মাতৃ-প্রণাম না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। গবর্ণমেণ্ট দুইটি বিষয়ে ইঁহার প্রতি সুবিবেচনা করিয়াছেন। যে-সরকারী বহু লোকে গবর্ণমেণ্টের জন্য খাটিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই সরকারী রিপোর্টে তাঁহাদের স্পষ্ট নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু ইনি রেশম-শিল্প সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রিপোর্টে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

সংস্কৃত, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় ইনি তুল্যরূপ ব্যুৎপন্ন।"

'ঐতিহাসিক চিত্র' সম্পাদন

১৩০৫ সালে রাজশাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশের সঙ্কল্প অক্ষয়কুমারের মনে উদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবনাপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত 'ভারতী' পত্রে ("প্রসঙ্গ কথা," ভাদ্র ১৩০৫) এই প্রস্তাবনাপত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই "সহায়তায় এবং তাঁহারই প্রভাবে" 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র জন্ম হয়। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—"জানুয়ারি ১৮৯৯" (পৌষ ১৩০৫)। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রের "সূচনা" লিখিয়া দিয়াছিলেন ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র ১৩৫৩ দ্রষ্টব্য)। "সম্পাদকের নিবেদনে" অক্ষয়কুমার পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।

ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষবিষয়ক উপদেশযুক্ত পূর্ব্ববৃত্ত কথার নাম ইতিহাস,—ইহাই অস্মদ্দেশের প্রাচীন সংস্কার। তদনুসারে রামায়ণ মহাভারত কাব্য হইলেও ইতিহাস-মধ্যে পরিগণিত। তদ্রূপ —সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত কীর্ত্তনের জন্য যে সকল পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাস। কিন্তু এই সকল গ্রন্থে যে কেবল বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তই বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে;—পুরাণ-বক্তাকে সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কথা আরম্ভ করিতে হইয়াছে; যে যুগের সংবাদ মানবজ্ঞানের অনধিগম্য, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া পদে পদে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পরবর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলী নানা সময়ে নানারূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাদি সংযোগ করায় এই সকল গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ইহাতে যে আমাদের ইতিহাসের উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

সকল দেশেই আদিযুগের ইতিহাস যেরূপ নিরতিশয় অন্ধতমসাচ্ছন্ন, আমাদের দেশেও তাহাই। আমাদের ইতিহাসের আদিযুগ 'বৈদিক যুগ' এবং 'পৌরাণিক যুগ' নামে অধুনাতন পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। তাহার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস সংকলন করিবার উপযুক্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিবার উপায় না থাকিলেও, তৎসাময়িক আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস সংকলন করা একেবারে অসম্ভব নহে। তজ্জন্য বেদাদি প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্র এবং পুরাণাদি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী পুস্তকাবলীর কালনির্ণয় করা আবশ্যক।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাহিত্যগুরু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সকলের শীর্ষস্থানীয়। তিনি শীর্ণশরীরে জীর্ণস্বাস্থ্যে বহু দিবসের অধ্যবসায়বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজের যুক্তি

সাহিত্য-বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত" হয়। ১২৯৭ সালের পৌষ সংখ্যা 'শিক্ষা-পরিচয়' পত্রে প্রকাশ :—"পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, শিক্ষা-পরিচয়ের পরিচালন এবং উন্নতি-বিধানে সম্পাদককে [শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ] সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে কয়েক জন কৃতবিদ্য হিতৈষী বন্ধু সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন।...শিক্ষা-পরিচয়-সমিতির অধিবেশন-স্থান বোয়ালিয়া, রাজসাহী; বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল।"

তর্কের সমালোচনা করিয়া যে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসানুরাগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তিনি যেরূপ স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অনুসন্ধান-পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছিলেন,—বাঙ্গালী না হইলে অথবা উপেক্ষিত বঙ্গভাষায় গ্রন্থরচনা না করিলে,—তাহাতেই তাঁহার নাম পাশ্চাত্যসমাজে চিরস্মরণীয় হইত।

আর্য্যসভ্যতা কত পুরাতন নিঃসংশয়ে তাহার কালনির্দ্দেশ করা যায় না। আর্য্যসাহিত্যের ধ্বংসাবশিষ্ট পুস্তকাবলী যে বহু পুরাতন তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু প্রাচীন হইলেও এই সকল গ্রন্থের সকল অংশ তুল্যরূপ প্রাচীন নহে;—কালসহকারে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাবলী তন্মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রক্ষিপ্তাপবাদ অধুনা নূতন আবিষ্কৃত হয় নাই। রামানুজকৃত রামায়ণের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের সময়েও রামায়ণের বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্তাপবাদে অনাদৃত হইত। এই সকল গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত দোষ দুষ্ট এবং কোন্ কোন্ অংশ যথার্থই প্রাচীন, তাহার নির্ণয় করিতে না পারিলে ইতিহাসের উপকরণের সন্ধান লাভ করিলেও উপকারলাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় এ বিষয়ে তথ্যনির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উদাহরণস্থলে যে দুই চারিটি কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছে; আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থের সমগ্র প্রক্ষিপ্তাংশের নির্ণয় করিবার আয়োজন করি নাই। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

আর্য্যাধিকৃত ভারত সাম্রাজ্যে যে বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতসমাজে ভারতেতিহাসের গৌরবের যুগ বলিয়া পরিচিত। তাহার আদ্যন্তের ইতিহাস বহুভাষায় সঙ্কলিত হইতেছে। এই যুগে এশিয়া খণ্ডের অধিকাংশ সভ্যজনপদ ভারতবর্ষের পাদমূলে শিষ্যরূপে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিয়াছিল। এই যুগে গ্রীক জাতির সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয়; এই যুগে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ জলে স্থলে দ্বীপে উপদ্বীপে নানা-দিগ্দেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বহির্গত; এই যুগে ভূমধ্যসাগর তীরস্থ সিরিয়ারাজ্য হইতে পূর্ব্বোপসাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বৌদ্ধমন্ত্র বিঘোষিত; এই যুগে তিব্বৎ ব্রহ্ম শ্যাম সিংহল মহাচীন প্রভৃতি অনার্য্যজনপদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ শিক্ষার্থ ভারতবর্ষে সমাগত; এবং এই যুগে দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়স্তম্ভ সংস্থাপিত ও অহিংসা পরমোধর্ম্মের বিশ্বপ্রেমমহিমা স্তম্ভগাত্রে সযত্নে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

ইহার অবসানে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে পুনরায় অন্ধকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালেও আরব্য বণিগ্বর্গ ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিতে যত্নশীল ছিলেন;—নবোদ্গত মোসলমান-সাম্রাজ্যের খোলাফাধিপতির আগ্রহে ভারতবর্ষীয় বহুশাস্ত্র অনুবাদিত হইয়া এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং তথা হইতে ইউরোপে নীত হইয়াছিল।

পরাক্রান্ত মোসলমানসেনা ভারতসীমান্তে সমুপস্থিত হইলে হিন্দু মোসলমানের মধ্যে বহুবৎসর বাহুবলের পরীক্ষা হইয়াছিল। সে পরীক্ষায় কত বীরসন্তান অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিবার পর মোসলমান-সেনা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, মোসলমানের ইতিহাসে এবং চাঁদকবির অপূর্ব্ব সমর কবিতায় তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মোসলমানেরা যেখানে গিয়াছেন, সযত্নে সে দেশের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নে ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বেরও কিছু কিছু পুষ্টোদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য না হইলেও আমাদের ইতিহাসের বিশিষ্ট উপকরণ। অতঃপর ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ এদেশে উপনীত হইয়া নানা ভাষায় যে সকল ভারতবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছেন, তাহার স্রোত অদ্যাপি রুদ্ধ হয় নাই।

আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই। স্বদেশীয় গ্রন্থাদির ইতিহাসাংশের নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, বিদেশীয় লেখকবর্গের ভারতবিবরণীর সমুচিত সমালোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্যোদ্ধার করিতে পারিলে, এখনও আমাদের ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে।

তাহা বহুজনসাপেক্ষ বহুব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাঁহারা ললাটকলঙ্ক অপসারিত করিয়া সভ্যসমাজে মানব পদবীতে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ব্যাকুলতা যদি আন্তরিক হয়, তবে এই কঠিন ব্যাপার একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বৌদ্ধযুগ হইতে ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করিলে তাহাও সামান্য হইবে না। তাহাও দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের কথা। এত দিনের কথাই বা কত দেশের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়?

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত সহস্রাধিক বৎসর নানা দিগ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের সংকলিত ভারত-বিবরণীর অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মেগাস্থিনীস্, এরিয়ান এবং টলেমীর গ্রন্থাদির কিয়দংশ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাচীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধশ্রমণগণের সংকলিত ভারত-বিবরণী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে কেবল ফা হিয়ান্ এবং হিয়ন্ থসঙ্গের নামই সাধারণ্যে সুপরিচিত; কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও কত পণ্ডিত এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ অপ্রাপ্ত নহে। ইঁহাদের একখানি গ্রন্থও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই।

বাণিজ্যোপলক্ষে পূর্ব্বোপসাগরে যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ প্রভৃতি অনার্য্যনিবাসে যে সকল আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তত্তংস্থানে অদ্যাপি কত গ্রন্থে ভারতবিবরণী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার সারাংশমাত্রও স্থান লাভ করে নাই।

কত পুরাতন তাম্রফলকলিপি, প্রস্তরফলকলিপি এবং স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইতেছে; তাহাতে হিন্দুর কথা, অহিন্দুর কথা, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কথা, বৌদ্ধধর্ম বিনাশের কথা,—কত ঐতিহাসিক কথাই প্রকাশিত হইতেছে! কিন্তু তাহা বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করে নাই।

ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্বতগাত্রে এখনও যে সকল দেবমন্দির জীর্ণকলেবরে ধ্বংসকালের প্রতীক্ষায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, কেবা তাহার ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনার্থ গ্রন্থরচনা করিয়াছেন? অথচ আমাদের ইতিহাস নাই বলিয়া গদ্যে পদ্যে কবিতায় উপন্যাসে সংবাদপত্রে সাময়িক সাহিত্যে কে না আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন?

পুরাতন রাজবংশের এবং জমিদারবংশের কত পুরাতন কাগজপত্র নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে, কখন বা স্থানাভাবে আবর্জনারাশির সহিত অনাদরে অনলসাৎ হইতেছে, কে তাহার প্রতিলিপি রক্ষার জন্য যথাযোগ্য আয়োজন করিতেছেন?

ইতিহাসের উপকরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, তদর্থে যথাযোগ্য আয়োজনও আরব্ধ হয় নাই;—অথচ শিশুপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিরাম নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে একশ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষের ছায়ামাত্রই পুনঃপুনঃ অঙ্কিত হইতেছে। তাহাতে কত ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ অল্পবয়সের বালকবালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিতেছে! তাহারা যাহা বহুযত্নে বহুক্লেশে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জন করিতেছে, তাহার চরম ফল—আত্মাবমাননা! বাঙ্গলার ইতিহাসেই ইহা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতেছে।

এই দুর্দশা লক্ষ্য করিয়া 'বঙ্গদর্শনে'র সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর এক সময়ে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন:—"সাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই!"

অধিক উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া বলা যাইতে পারে,—যে দেশের শিল্পগৌরবে গ্রীস, রোম, মিশর, কার্থেজ বিস্ময়াপন্ন হইত, যাহাদের বাণিজ্যপোত দ্বীপে উপদ্বীপে নিকটে এবং সুদূরে আর্য্যগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিত; যাহাদের বাহুবল এক সময়ে কাশী, কান্যকুব্জে, উৎকলে সমুদ্রসৈকতে বিজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, যাহাদের সহিত বহু বৎসর রণশ্রমে গলদঘর্ম্ম হইয়াও বাহুবলোন্মত্ত পাঠানসেনা সমগ্র দেশ পদানত করিতে পারে নাই, বরং সুযোগ পাইবামাত্র বংশ রাজা মোসলমানের সিংহাসনে আরোহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই; যাহারা অদ্যাপি জ্ঞানগৌরবে কাহারও নিকট হীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না; তাহাদের ইতিহাস নাই ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালীর লজ্জার কথা আর কোথায়?

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই লজ্জা দূর করিবার জন্য বঙ্গসাহিত্যসমাজে কিয়ৎপরিমাণে হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। তাহার পরিচয় 'বঙ্গদর্শনে' এইরূপ লিখিত আছে, "এক্ষণে বাঙ্গালীর ইতিহাসের উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমতাবান বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী কি ইংরেজ সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর একে একে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন—"এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গলার ঐতিহাসিকতত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সকল কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একজনের চেষ্টায় এ অভাব কদাচ দূর হইতে পারে না। যতই প্রতিভাশালী হউন, কেহ যে উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া ইতিহাস সংকলন করিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? যে দেশের ইতিহাসের উপকরণ বহুভাষায় লিখিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে, সে দেশের কোনও একজন ব্যক্তি সমস্ত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। পারেন না বলিয়াই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কথা উঠিয়াও,

অদ্যাপি ইতিহাস সংকলিত হয় নাই ; এত দিনের সাহিত্যশ্রম বিষয়ান্তরেই সমধিকরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। অনুরাগের অভাব ছিল না, প্রতিভারও অভাব ছিল না ; কেবল উপকরণগুলি অনায়াসলভ্য ছিল না বলিয়াই পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিলে অতীতে যাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাই হইবে,—কখন কখন ইতিহাস রচনার জন্য উদ্বেগ অনুভূত হইবে, এবং প্রতিভাশালী লেখকবর্গ হয় সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন, না হয় "মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিতে" বাধ্য হইবেন।...

বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক চিত্র কোন ব্যক্তি, বংশ বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র হইবে না। ইহা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিবে। সে উপকরণের কিয়দংশ যে সকল পুরাতন রাজবংশে ও জমিদারবংশেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের সহিত এদেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কথারও আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা আধুনিক রাজা বা জমিদার, তাঁহাদের কথা নানা কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইবে। সে ভার ভবিষ্যতের ইতিহাস-লেখকের হস্তে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই,—পুরাতত্ত্ব সংকলন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।...

গ্রন্থাবলী – রচিত ও সম্পাদিত

অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গৃহীত।

১। সমরসিংহ (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩ ?)।

২। সিরাজদ্দৌলা (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১৩০৪ সাল (২১ জানুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ৪১৯।

'সাধনা' (১৩০২) ও 'ভারতী'তে (১৩০২-০৩) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১৩১৫) "ক্লাইব-কীর্ত্তিস্তম্ভ" নামে একটি রচনা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহা প্রথমে ১৩১৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

২৪ মার্চ ১৯১৬ তারিখে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির হলে, ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক আহূত সভায় অন্ধকূপহত্যা-কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে বিতর্ক হয়, তাহাতে অক্ষয়কুমার একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা ১৯১৬ সনের জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা (পৃ. ১৩৬-১৭১) *Bengal: Past and Present* পত্রে মুদ্রিত, এবং 'সিরাজদ্দৌলা'র পরবর্তী একটি সংস্করণে পরিশিষ্টরূপে পুনর্মুদ্রিত হয়।

৩। সীতারাম রায় (ঐতিহাসিক চিত্র)। বৈশাখ ১৩০৫ (১০ মে ১৮৯৮)। পৃ. ৮০।

ইহা প্রথমে ১৩০২ সালের কার্ত্তিক-চৈত্র সংখ্যা 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সীতারাম-প্রশস্তি পঠিতব্য।

৪। মীরকাসিম (ঐতিহাসিক চিত্র)। ১৩১২ সাল (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ২৩৬।

'সাহিত্যে' (১৩০৩) প্রকাশিত "মীরজাফর" ও 'ভারতী'তে (১৩০৪) প্রকাশিত "মীরকাসিম" প্রবন্ধ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৫। ফিরিঙ্গি বণিক্। শ্রাবণ ১৩২৯ (২০ জুলাই ১৯২২) পৃ. ১৮৮।

'সাহিত্যে' (১৩১১-১২) প্রকাশিত "ফিরিঙ্গি-বণিক্" শীর্ষক প্রবন্ধটি সংশোধিত কলেবরে এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে।

৬। অজ্ঞেয়-বাদ (সমালোচনা)। ? (ইং ১৯২৮)। পৃ. ৭৮।

১২৯৮ সালের 'ধর্ম্মবন্ধু' পত্রিকায় ইহার কিয়দংশ এবং পরে রাজশাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহে' (বৈশাখ-চৈত্র ১৩০৪) পরিবর্ত্তিত আকারে আদ্যন্ত, মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকের দীর্ঘ 'অবতরণিকা' জলধর সেন লিখিত।

৭। গৌড়লেখমালা, ১ম স্তবক। ১৩১৯ সাল (১ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ১৫১।

"প্রথম স্তবকে পাল-নরপালগণের তাম্রশাসন ও তাঁহাদিগের শাসন-সময়ের কতিপয় শিলালিপি প্রকাশিত হইল।"

* * *

অক্ষয়কুমার লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত দুইখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথমখানি রমাপ্রসাদ চন্দ-প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' (১৩১৯ সাল, ১ জুন ১৯১২), দ্বিতীয়খানি অক্ষয়কুমার বড়াল-রচিত গীতিকাব্য 'কনকাঞ্জলি' (৩য় সং. ১৩২৪ সাল)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

অক্ষয়কুমারের প্রাথমিক রচনাগুলি রাজশাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালীর 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে তিনি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রীতিমতভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩০২ সালে তাঁহার লিখিত "সিরাজদ্দৌলা"র প্রথমাংশ রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সাধনা'য় (ভাদ্র-কার্ত্তিক) ও "সীতারাম" 'সাহিত্যে' (মাঘ-চৈত্র) প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁহার রচনায় সন্ধান প্রধানতঃ 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়), 'প্রবাসী', 'বঙ্গভাষা', 'মানসী',

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ও 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। এই সকল রচনার অতি অল্পমাত্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; অধিকাংশই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি* একত্র করিয়া একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

পত্রাবলী

গৌড়শিল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত অক্ষয়কুমারের দুইখানি পত্র ১৩৩৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হইয়াছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি অক্ষয়কুমারের অক্ষয় কীর্ত্তি। তাঁহাকে সারথি করিয়া, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় ১৯১০ সালে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির চিত্রশালা (মিউজিয়ম) অক্ষয়কুমারের বড় আদরের সামগ্রী ছিল; তিনি বহুল পরিমাণে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন:—

"রাজসাহীর কতিপয় যুবক প্রাচীন ভারত ইতিহাস অনুশীলনের অবকাশ লাভ করিয়াছে জানিয়া শেষ জীবনে তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "I am now ebbing away, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আশা পোষণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে এখন মরিতে পারিব।" তিনি বলিয়াছিলেন, "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাকালে ভাবিতে পারি নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আলোচনা হইবে ও রাজসাহীর কোন সন্তান এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিবে।" এই বলিয়া Martin Luther-এর সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ পংক্তিযুগল উদ্ধৃত করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,

"Is it man's? It shall fade away
Is it God's? It shall ever stay."

('প্রবাসী', চৈত্র ১৩৩৬)

* এই শ্রেণীর রচনার একটি তালিকা আমি ১৩৫০ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছি।

প্রতিভার সম্মান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অক্ষয়কুমারকে ১৩১১ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ১৩১৮ সালে 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্ব্বাচিত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজসরকারও তাঁহাকে 'কৈসর-ই-হিন্দ্ সুবর্ণ-পদক' ও সি. আই. ই. উপাধি দান করিয়া তাঁহার প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যু

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ (২৭ মাঘ ১৩৩৬) তারিখে অক্ষয়কুমার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

অক্ষয়কুমার একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী ছিলেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন:—

"অক্ষয়কুমারের মৌলিক গবেষণার ধারা ছিল অভিনব, প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও প্রাঞ্জল প্রতিভার সংযোগই সম্ভবতঃ তাঁহাকে সর্ব্বতোমুখী গতি দান করিয়াছিল। কি সাহিত্যে, কি কলাবিদ্যায়, কি বাগ্মিতায় সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী-যুগে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার বজ্রনির্ঘোষ বক্তৃতা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার শেষজীবন রাজোপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই জানেন স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তাঁহার কত প্রগাঢ় ছিল, ভারতবাসীর উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার আগ্রহ কত ঐকান্তিক ছিল। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া একবার কোন বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষার্থীকে কৃত্রিম পণ্যে পরিণত করিয়া দিবার জন্য দেশের ইতিহাসের মর্য্যাদা অপেক্ষা কাহারও স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া একখানি স্কুলপাঠ্য ভারত-ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুরোধ জানাইলে, তদুত্তরে দরিদ্র অক্ষয়কুমার তেজস্বিতার সহিত জানাইয়াছিলেন,—"আত্মবিক্রয় করিয়া স্বদেশের অসত্য ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা তাঁহার অসাধ্য। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"—'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৩৬।

উচ্চশিক্ষার সমস্যা

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমাদের উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার সমালোচনা আজিকার দিনে অপ্রাসঙ্গিক বা অবাস্তব নহে। ইংরেজেরা যখন প্রথম আমাদের দেশে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। ফল যাহা হইয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ। ইউরোপে যখন নব নব গবেষণাদ্বারা জাতীয় কল্যাণ, জাতীয় সম্পদ, জাতীয় সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন আমরা সরকারী চাকুরী করিয়া ইংরেজের শাসনকার্য্যে সহায়তা করিতেছিলাম। শাসনকার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যে শিক্ষা তাহা অবহেলার বিষয়, এরূপ ইঙ্গিত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু এই শিক্ষাকেই উচ্চশিক্ষার মূলাভিষিক্ত করা কখনই যায় না; এবং উচ্চশিক্ষার সমালোচনা বলিয়া এই শিক্ষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

ইহার পর ক্রমে আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত উচ্চশিক্ষাও প্রসার লাভ করিয়াছে। সরকারী চাকুরীর লোভে আমরা নূতন নূতন কলেজ স্থাপন করিয়া দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর ইহারই ফলে বিপুল হইতে বিপুলতর হইয়া চলিয়াছে। মনে হয়, এই প্লাবনের প্রারম্ভে স্যার আশুতোষের যোগ্য হস্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার আসিয়া পড়ে। বাঙালীর পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্য। এই সময় যে উপায় অবলম্বন করিলে, তখনকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রকৃত উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন করা সম্ভব ছিল, আশুতোষ—আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়া নহে, বাধ্য হইয়া—তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা উপযুক্ত অর্থ ব্যতিরেকে হয় না। আমাদের শাসনকর্ত্তাগণ আজিও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মুক্তহস্ত হন নাই, সে সময় একেবারেই ছিলেন না। তাই আশুতোষ এই উপাধিলোভের প্রাবল্যের সুযোগ লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডার পুষ্ট করেন এবং স্নাতকোত্তর (Post-graduate) শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ হস্তে স্থাপন করেন। ইহা দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে প্রকৃত উচ্চতম শিক্ষার ও গবেষণার পত্তন হয়।

আশুতোষের সংস্কারের আগেকার উচ্চশিক্ষার প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন, ইহার বিস্তারের একটি সুফল হইয়াছিল এই যে পাঠ্যপুস্তকের আবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া বহির্জগতের আলোক শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল এবং উচ্চশিক্ষার একটা রূপ তাঁহাদের মনে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারাই পরবর্ত্তীকালে শিক্ষাসংস্কারের জন্য একটা সুস্পষ্ট জনমত সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য জনমতের সমর্থনই যথেষ্ট নহে; দেশের শাসকবর্গের সমর্থনও প্রয়োজন। তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট যে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এমন লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। জনকল্যাণ বা জাতীয় উন্নয়নের দিক তখন গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে নিজ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। দেশের খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের সংবাদ রাখিবার জন্য দুই-চারি প্রকার "সার্ভের" ব্যবস্থা অবশ্য ছিল। কিন্তু এই সকল সীমাবদ্ধ গবেষণা পরিচালনার জন্য বিলাত হইতে লোক আমদানী করা হইত। অবস্তন কর্ম্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত দেশীয়েরাই হইতেন। এই ব্যবস্থার পক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত উচ্চশিক্ষা অনুপযোগী ছিল না। প্রয়োজনানুরূপ লোকের অভাব না হওয়ায়, তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের উচ্চশিক্ষা সংস্কারের কোন প্রেরণা ছিল না। জনমতের অনুসরণ করিয়া আশুতোষের সংস্কারের অনুমোদন করিলেও উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করেন নাই। এই জন্য উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন আদর্শের অনুরূপ হইতে পারে নাই। আশুতোষের সংস্কার উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার সূচনা মাত্র এবং অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ উভয়েই উচ্চশিক্ষার প্রকৃত রূপ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন। জনকল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্র যে ব্যাপকতর করিতে হইবে ইহা উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছেন। ভূগর্ভে কোথায় কোন্ বিভব লুক্কায়িত আছে, কোথায় জলধারার মধ্যে নিহিত ঐশ্বর্য্য আমাদের অক্ষমতায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে বা প্লাবনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে, কোথায় কোন্ শিল্প উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বিনষ্ট হইতেছে, অর্থের বণ্টন-ব্যবস্থা কোথায় সুনিয়মের অভাবে সমাজদেহকে ক্লিষ্ট করিতেছে, কোন্ ব্যাধির প্রকোপে দেশ জনশূন্য হইয়া যাইতেছে—সকল দিক দিয়া আমাদের দেশের প্রকৃত রূপ কি, প্রকৃত সম্পদ কি—এই সব অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা আজ জাগ্রত হইয়াছে। বিদেশী দ্বারা ইহা করা সম্ভবও নহে, সমীচীনও নহে। দেশেই উপযুক্ত লোক গড়িয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বত্র যেমন, আমাদের দেশেও সেইরূপ। ইহাই উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য কি পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে তাহা দ্বারা যে-কোন শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার্য্য। বাংলাদেশে

দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বাস্তবক্ষেত্রে কোন্‌টির কার্য্যকারিতা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। সকল স্থানেই সকল সময়েই এমন দুই-চারি জন অসাধারণ ব্যক্তি থাকেন যাঁহারা অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তদ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা বিচার্য্য নহে। শিক্ষা-ব্যবস্থার দিক দিয়া—শাসন-ব্যবস্থার দিক দিয়া নহে—উপরোক্ত দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্‌টির কর্ম্মপন্থা উল্লিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল কেবলমাত্র তাহারই আলোচনা করিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষত্ব এই যে স্নাতকপূর্ব্ব (undergraduate) ও স্নাতকোত্তর স্তরের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক ব্যবধান নাই। একই অধ্যাপকমণ্ডলী উভয় স্তরেই অধ্যাপনা করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজনানুরূপ পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করেন। দ্বিতীয়তঃ, স্নাতকপূর্ব্ব স্তরের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা অত্যধিক হয় না বলিয়া পরীক্ষাপ্রণালী আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এই বিশেষত্বের ফল কি তাহার সম্যক্‌ আলোচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে করিব। এক্ষণে এই মাত্র বলিতে চাই যে প্রধানতঃ এই কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত উচ্চশিক্ষা পরিচালনা করিবার পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী। তথাপি যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শিক্ষাব্যবস্থায় নহে, শাসনব্যবস্থায় ত্রুটির অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবে উহা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে নানা বিষয়ে যে মূল্যবান গবেষণা চলিতেছে তাহা বলাই বাহুল্য তবে আশুতোষ সূচনায় যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহাকেই চরম বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে।

সর্ব্বত্রই উচ্চশিক্ষার দুইটি স্তর ধরিয়া লওয়া হয়:—(১) স্নাতকপূর্ব্ব ও (২) স্নাতকোত্তর। শতাব্দীর প্রায় চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া প্রথম স্তরে কর্ম্মজীবন নিয়োগ করিয়াছি। এই স্তরের সকল দোষত্রুটি, ব্যর্থতা আমাদের নিকট যত প্রত্যক্ষ, অন্য কাহারও নিকট ততদূর প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নহে। আমরা জানি, এই স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্য আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীই অধীত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে না; তাহা অপেক্ষাও দুঃখের বিষয় এই যে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে চাহে না। তাহারা অধীত বিষয়গুলির জ্ঞান বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারে না বা করিবার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে কখনও জাগ্রত হয় না।

এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে? সমালোচক ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্ত্তা।" স্নাতকপূর্ব্ব স্তরের প্রশ্নকর্ত্তা কখনও বরং সেই স্তরে শিক্ষকতা করেন না। কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়ের তালিকার সহিত তিনি পরিচিত। কিন্তু এরূপ তালিকাদ্বারা কখনই সুস্পষ্টরূপে অধীত বিষয়ের হদিস পাওয়া যায় না। পাঠ্য-তালিকায় যদি কেবলমাত্র ইউক্লিডের কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধকে স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে-কোন উপপাদ্য প্রমাণ করিতে বলিলে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। অপর পক্ষে পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পাঠ্যবিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নশিক্ষার স্তরে এইরূপে পাঠ্যবিষয় সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতির কারণ নাই। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকে তাহা করা সঙ্গত নয়। পাঠ্যপুস্তকের লেখক যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যে কয়টি বিষয় যেরূপভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাই সকল সময় অনুসরণ করিয়া চলিলে উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মে। জ্ঞান স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। পাঠ্যবিষয়ে পরিবর্ত্তনের সুযোগ না থাকিলে সময়ের সহিত তাল রাখিয়া চলিবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সর্ব্বত্রই পাঠ্যপুস্তক দ্বারা পাঠ্যবিষয় নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রথা থাকা সমীচীন নহে। আপাতদৃষ্টিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সাধারণ নিয়মই মানিয়া চলে। এমন অবস্থায় প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নপত্র রচনা করিতে গিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী প্রশ্নপত্রগুলির অনুসরণ করিয়া থাকেন। বাঁধাপথের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে, প্রদেশের কোন না কোন অঞ্চল হইতে বিষম কলরব উঠে। এরূপ হইবার কথাও বটে। কারণ সকল শিক্ষকই একই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অধ্যাপনা করিবেন এরূপ আশা করা অন্যায়। তাই প্রশ্নপত্রের মান সর্ব্বনিম্ন স্তরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং বাঁধাধরা কতকগুলি প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। শিক্ষার্থী, এবং বাধ্য হইয়া শিক্ষক ইহার সুযোগ লইতে দ্বিধা বোধ করেন না। ফলে, বিষয়বস্তু কিছু না বুঝিয়াও কেবল স্মরণশক্তি চালনা করিয়া উপাধি লাভ করা সম্ভব হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই অবস্থার জন্য প্রশ্নকর্ত্তা দায়ী নহেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রণালীর দোষ। শিক্ষকতাকার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়া, উচ্চশিক্ষার স্তরে স্বাধীনভাবে প্রশ্নপত্র রচনা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত পরিধির জন্য, স্নাতকপূর্ব্ব স্তরে কোন একজন শিক্ষকের সহকারিতায় প্রশ্ন রচনা করিলেও সকল সমস্যার সমাধান হয় না। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব আছে; প্রশ্নপত্রে এই ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাওয়াতে, স্বীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে কতকটা সুবিধা ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে কিঞ্চিৎ অসুবিধা সৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন কলেজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র রচনা করিবার ব্যবস্থা প্রচলন করিতে হয়। অন্ততঃপক্ষে, যদি নিকটবর্ত্তী কয়েকটি কলেজের মধ্যে অধ্যাপনাক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের সুযোগ থাকে, তবে কয়েকটি কলেজ একত্র করিয়াও এক প্রশ্নপত্র রচনা করা যাইতে পারে।

পরীক্ষা-প্রণালীর আর একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করিব।

আজ কাহারও অবিদিত নাই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রণালী যান্ত্রিক ক্রিয়ার মত। ইহাতে বিচারের অবকাশ নাই। নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট অংশের উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর দিতে হইবে। এক প্রশ্নের সহিত অন্য প্রশ্নের, এমন কি একাংশের সহিত অপরাংশের উত্তরের কোন সংযোগ নাই। পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সমগ্রভাবে তাহার জ্ঞানের নিদর্শন বলিয়া বিচার করা নিষিদ্ধ। তাই কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়াও কেবল স্মৃতিশক্তি পরিচালনদ্বারা দুই-চারিটি প্রশ্ন বা প্রশ্নাংশের উত্তর করিতে পারিলেই ডিগ্রী লাভ করা যায়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করাও সহজসাধ্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বিপুল। একই পরীক্ষা-কার্য্যে নানা অনাচারের কথা লোকের মুখে মুখে গুঞ্জরিত হইয়া থাকে। তাহার উপর পরীক্ষককে স্বাধীনভাবে বিচারের নির্দেশ দিলে সুফল হওয়া দূরে থাকুক, কুফল হওয়াও আশ্চর্য্য নহে। এই উভয় সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক। পরীক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত থাকিলে সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভক্ত হইলে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক উভয়েই স্বাধীনভাবে কর্তব্য করিবার সুযোগ পান এবং পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরীক্ষা সম্ভব হয়; অথচ প্রত্যেক কেন্দ্রে সকল পরীক্ষার্থীরই পরীক্ষা সমরূপ হওয়ায়, পক্ষপাতের সম্ভাবনাও থাকে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই ব্যবস্থায় সকল কেন্দ্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা তৎস্থানীয় ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান ও সহকারিতা শুধু প্রয়োজনীয়ই নহে, আবশ্যিকও বটে।

প্রথমেই পরীক্ষা-প্রণালীর ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কর্ম্মপন্থার পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কারণ, পরীক্ষা-প্রণালীর ত্রুটিই প্রথমে চোখে পড়ে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আদর্শ অনুযায়ী করিতে হইলে আর একটি বিষয়ের সংস্কারও প্রয়োজন। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-পূর্ব্ব ও স্নাতকোত্তর এই দুই স্তরের মধ্যে স্পষ্ট একটা ব্যবধান আছে। এই ব্যবধানের অপকারিতা হয়ত তত প্রত্যক্ষ নহে; তথাপি ইহার প্রভাব বিস্তর। স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরে শিক্ষার্থীকে নির্ব্বাচিত কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে হয়। এই স্তরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের জন্য এবং বিশেষ করিয়া কোন এক বিষয়ের গবেষণায় লিপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা। বিভিন্ন বিষয়ে জগতের যত জ্ঞান-ভাণ্ডার আছে তাহার বোঝা শিক্ষার্থীর ঘাড়ে চাপাইয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অগ্রগতির যুগে কাহারও জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা সম্যক্ পরিতৃপ্ত হইবার নহে। কোন্ কোন্ বিষয়ের জ্ঞান পরবর্তী স্তরে কোন একটা বিশেষ বিষয়ে আধুনিকতম গবেষণার জন্য প্রয়োজন, তাহাই বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক এক জন অধ্যাপক এক এক বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। এই গবেষণায় তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এক দল গবেষক সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। এই কার্য্যের এক অংশ স্নাতক-পূর্ব্ব স্তরে শুরু। উভয় স্তরের ব্যবধানের কুফল এই যে, নিম্নস্তরের শিক্ষকগণ উচ্চস্তরের সহিত, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক-গণের সহিত, সংযোগের অভাবে, পরবর্তী স্তরের প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন না। পাঠ্য-তালিকার প্রয়োজনীয় সংস্কার করিলে, তাহার উদ্দেশ্য নিম্ন স্তরের শিক্ষকের নিকট অবোধ্য রহিয়া যায়। নির্ব্বিকার ভাবে তাঁহাকে কতকগুলি শুষ্ক বিষয় শিক্ষার্থীর গলাধঃকরণের চেষ্টায় বিরত থাকিতে হয়। উদ্দেশ্য না বুঝিলে কোন কার্য্যেই অনুরাগ জন্মে না এবং অধ্যাপনায় প্রাণের স্পন্দনের অভাব হইয়া থাকে। কোন গবেষণাকার্য্যে লিপ্ত হইবার বা সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ না থাকায়, নিম্নস্তরের শিক্ষকের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। জ্ঞানের আধুনিক প্রগতির সহিত পরিচিত না হওয়ায় তাঁহার লঘুগুরু-বোধ বিপর্য্যস্ত হয়; তাঁহার পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানের প্রয়োগ করিবার সুযোগের অভাবে জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপলব্ধি মন্দীভূত হইয়া যায়। শিক্ষকের এই জড়তা, প্রত্যক্ষভাবে নহে, পরোক্ষ ভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। ইহার অপকারিতা সামান্য নহে। আজ যে দেখিতে পাই বাঙালী যুবক অমূল্য সময় ও অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে যে শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশ করে, কার্য্যতঃ তাহার প্রতি তাহার অবহেলা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পায়—ইহার কারণ কি? এই শিক্ষা উদ্দেশ্যহীন ও অবাস্তব এই ধারণা তাহার অবচেতনায় বদ্ধমূল হইয়া যাওয়াই কি এই বিপরীত আচরণের কারণ নহে? প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে উদ্দীপনা লইয়া আমরা উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলাম, উপেক্ষায় অবিশ্বাসে তাহা ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে না? এখনও শিক্ষিত সমাজ উচ্চশিক্ষার সমর্থক। কিন্তু সে সমর্থনে যেন উপলব্ধি-জাত আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। উচ্চশিক্ষার সমর্থন করা যেন একটা প্রাণহীন সংস্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে উচ্চশিক্ষাকে অনাবশ্যক বলিয়া নিন্দা করিতে, উচ্চশিক্ষা হইতে বিমুখ হইতে, আর কত দিন বাকী তাহা কে বলিবে? অবিশ্বাসের কুয়াশা দূর করিতে হইলে, উচ্চশিক্ষার প্রকৃত আদর্শ, প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার করা প্রয়োজন। ইহার পরিকল্পনা বিবৃত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সংস্কার যে আবশ্যক কেবলমাত্র ইহাই প্রতিপাদ্য।

স্নাতকোত্তর স্তরের সম্বন্ধেও দুই একটি বিষয় উল্লেখ করিব। এই স্তরের সহিত আমার প্রত্যক্ষ সংযোগ

নাই। অনুমান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই সমালোচনা করিতে হইবে। ইহাতে ত্রুটির সম্ভাবনা অনেক। সুতরাং মন্তব্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে ও অক্ষরে অক্ষরে বিচার না করিয়া সমগ্রভাবে ও সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পাঠকদের অনুরোধ করি। যাহা বক্তব্য তাহা প্রমাণিত না হইলেও প্রমাণযোগ্য কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

এই স্তর সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, অধ্যাপনা কোন একটি বিশিষ্ট ধারার গবেষণার সহিত সংযুক্ত হয় না। যে সকল বিষয় অধীত হয় তাহার কোন অংশই কোন একটি ধারার গবেষণার প্রতি লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাচিত হয় না—তাহার প্রসার অধিক হইলেও কোন একটি লক্ষ্যের দিকে চালিত করে না। অধ্যাপকও হয়ত তাঁহার স্বকীয় গবেষণা ও অধ্যাপনা মনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

এই স্তরের শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন এক ধারার গবেষণার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মৌলিক প্রবন্ধের মধ্যে যে উপকরণ থাকে, তাহা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে কেহ পাইতে পারেন না। কি অবস্থায় কোন্ বিষয়ের অনুসন্ধানের স্পৃহা জন্মিয়া কোন্ অতুল সম্পদ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা না জানিতে পারিলে এই স্তরের শিক্ষা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুই চরম কথা নহে। কেমন করিয়া নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইল, তাহার সহিত পরিচিত না হইলে উচ্চশিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। সকল জ্ঞানের উৎসের সংবাদ রাখিতে বলি না; তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু স্নাতকপূর্ব্ব স্তর হইতে ক্রমে ক্রমে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষার্থী যে ধারার দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহার উৎসের সহিত পরিচয় অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা না হইলে কেহ গবেষণাকার্য্যের জন্য উপযুক্ত হইতে পারেন না। মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া—সাধারণ শিক্ষার্থী স্বয়ং প্রকৃত গবেষণাকার্য্যে অধিকারী হইতে পারেন না। তাই আমরা দেখিতে পাই, দ্বিতীয় স্তরের উপাধি লাভ করিয়াও শিক্ষার্থী গবেষণার জন্য আগ্রহান্বিত হন না এবং গবেষণা-কার্য্যে নিযুক্ত হইবার মত সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করেন না।

অধ্যাপকের অধ্যাপনা ও স্বকীয় গবেষণা এই উভয়ের মধ্যে সংযোগ না থাকায় এক এক ধারার গবেষণার জন্য এক একটি সম্প্রদায় (school) সৃষ্ট হয় না। এরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভব না হইলে কোন উচ্চস্তরের গবেষণা হওয়া প্রায় অসম্ভব। জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নূতন নূতন আবিষ্কারের তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহার সহিত সমান তালে চলিবার মত ক্ষমতা এই গবেষক-মণ্ডলী সৃষ্টির উপরই নির্ভর করে। আজিকার দিনের উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা সাধারণতঃ সমবেত চেষ্টায় ফলে হয়। এরূপ গোষ্ঠী সৃষ্টি করিতে না পারিলে জাতীয় কল্যাণসাধনে আমাদের অবদান উল্লেখযোগ্য হইতে পারে না।

এক এক ধারার গবেষণার জন্য যে এক এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে না এবং দ্বিতীয় স্তরের উপাধি লাভ করিয়াও শিক্ষার্থী যে গবেষণাকার্য্যের সহায়তা করিতে পারেন না ইহাদারা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার যথোপযুক্ত পরিবেশের অভাব সূচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদার কর্ম্মধারার ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর নিম্নস্তরে বিপুল হইলেও, সর্ব্বোচ্চ স্তরে অত্যন্ত অপরিসর। অধ্যাপক এবং তাঁহার দুই-এক জন সহকারী যে মৌলিক গবেষণা করেন, তাহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার, তাহার সমালোচনা করিবার, সে সম্বন্ধে নানা দিক হইতে প্রশ্ন উত্থাপন করিবার মত লোক এই অভিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষে একটিমাত্র গবেষণার কেন্দ্র থাকায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পাইতে পারে। অধ্যাপকের পক্ষে এমন একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করা সম্ভব যে তাঁহার অনভিপ্রেত কোন সমালোচনা বা স্বাধীন গবেষণা অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। তিনি গবেষণার সহায়ক না হইয়া প্রতিরোধক রূপে বিরাজ করিতে পারেন। এই অভিযোগ ব্যক্তিগত বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ পরিধির মধ্যে একটি মাত্র কেন্দ্র স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা এই সকল কারণে অনিষ্টকর। একাধিক প্রতিষ্ঠান না থাকিলে গবেষণার বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গবেষণাকার্য্য চালিত হইতে পারে না। এমন অবস্থায় নূতন নূতন উৎসের অভাবে গবেষণার ধারা ক্ষীণ ও নগণ্য হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র গবেষণা পরিচালনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাও ইহার সহিত হইলে এরূপ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কোন কোন কলেজে এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন করা বর্ত্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয়। যে সকল কলেজ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী সেগুলির পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রের সহিত সংকতিগত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব। এরূপ সংযোগ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ও অব্যাহত থাকে, শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে তাহার ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষ উভয়েরই কর্ত্তব্য। কিন্তু দূরবর্ত্তী কলেজের পক্ষে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব নহে। সুতরাং নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইলে, দূরবর্ত্তী কলেজগুলির প্রয়োজনই অগ্রগণ্য। কোন কোন বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার পরিবেশ পূর্ব্ব হইতেই কোন কোন স্থানে রহিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা তত ব্যয়সাধ্যও নহে। এই সকল কথা মনে

রাখিয়া দুই-একটি নির্বাচিত কলেজে কয়েকটি পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিলে তাহা প্রকৃত উচ্চশিক্ষার সহায়ক হইবে এবং যে ব্যর্থতা আজ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা কতক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। আশুতোষের সংস্কারের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কলেজে বিচ্ছিন্ন ভাবে দুই-একটি বিষয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। আশুতোষ সকল বিষয়ের শিক্ষা, স্নাতকপূর্ব্ব স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার পরিস্থিতিতে, সম্পূর্ণ নূতন কারণে, বিকেন্দ্রীকরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা অতীতের পুনরাবৃত্তি মাত্র নহে। উচ্চশিক্ষাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের প্রয়োজন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে আর্থিক সম্পদের বিনাশ

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

শিল্পের কাঁচা মাল হিসাবে কতকগুলি ধাতুবস্তর গুরুত্ব খুব বেশী। ধাতুদ্রব্যের বিশেষত্ব এই যে, পৃথিবীর নানা দেশে ভূগর্ভে ইহারা ছড়াইয়া থাকিলেও একবার খনি হইতে উত্তোলন করিলে সে স্থান আর পূর্ণ হয় না। সুতরাং খনিকে সম্পূর্ণ ভাবে রিক্ত করিয়াই এইগুলির ব্যবহার চলে। এজন্য ইংরেজীতে এই সকল শিল্পকে robber অর্থাৎ দস্যু-শিল্প বলা হয়। কয়লা, খনিজ তৈল (petrolium) যাহা হইতে শিল্পে শক্তি (power) সরবরাহ হয়, ধাতু-প্রস্তর (metallic ores) এবং কতকগুলি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ, যথা লবণ এবং জমির সার প্রভৃতি এই পর্য্যায়ে পড়ে।

প্রথমেই আসিয়া পড়ে কয়লার কথা। কারখানার বয়লারে ও চুল্লীতে এবং গৃহস্থের উনানে সর্ব্বত্রই ইহার ব্যবহার। কয়লার খনির মালিকানার উপরই বর্ত্তমান জগতের পুঁজিপতিদের শিল্প-প্রতিযোগিতার জয়-পরাজয় অনেকটা নির্ভর করে। অবশ্য শক্তি সরবরাহের আধার হিসাবে হাইড্রো-ইলেকট্রিক যন্ত্রাদি ও খনিজ তৈলের স্থানও খুবই উচ্চে এবং প্রতিদিনই ইহাদের গুরুত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ আকাশ-যানের আধিক্যের যুগে খনিজ তৈল শিল্প-জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে অনেক সময় এই সকল সম্পদ অধিকারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়লা যেদিন জ্বালানি কাঠের স্থান দখল করিল সে দিন হইতে যে সকল দেশ কয়লা-সম্পদে সমৃদ্ধ তাহাদের ভাগ্য ফিরিল। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপ্রাধান্য উহাদের কয়লা-সম্পদ হইতে সম্ভব হইয়াছে।

অবশ্য পূর্ব্বে যে সকল দেশ বাহির হইতে কয়লা আমদানী করিত এখন তাহারা নিজ নিজ দেশেই তাহা উত্তোলনের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহাও আবার অনেক সময় বিদেশের আমদানী কয়লার উপর অতিরিক্ত কর বসাইয়া সম্ভব হইয়াছে। এইরূপে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম নিজেদের কয়লা-শিল্পের উন্নতি করিয়াছে। ইটালী, হাঙ্গেরী ও অন্যান্য দেশও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল। ব্রিটেন ও জার্ম্মানীর মধ্যে ইউরোপের কয়লার বাজার দখল লইয়া বহুকাল ব্যবসায়-প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। রপ্তানী কয়লার জন্য ব্রিটিশ সরকার অর্থসাহায্য করিত এবং এইরূপে সরকারী সাহায্যপুষ্ট কয়লা খাস জার্ম্মানীতেও বিক্রয় হইয়াছে। জার্ম্মানরাও পাল্টা ভাবে রেল ও অন্যান্য যানবাহনের খরচ কমাইয়া দিয়া দেশের কয়লা-শিল্পকে সাহায্য করিয়াছে। কোন কোন রপ্তানীকারক দেশ —যথা ইংলণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি, আমদানীকারক দেশের সহিত কতকগুলি বাণিজ্যিক সুবিধার বিনিময়ে কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু সবগুলি দেশের সঙ্গে আপোষ বা চুক্তি-ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। কে কাহাকে ব্যবসা-ক্ষেত্রে হটাইবে ইহাই হইতেছে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহের একমাত্র চেষ্টা। সকল চেষ্টার মূলেই রহিয়াছে পুঁজিপতিদের অতিরিক্ত লাভের অদমনীয় আকাঙ্ক্ষা।

যখন পরস্পরের মধ্যে রফানিষ্পত্তি সম্ভব হইল না তখন ব্রিটিশ ও জার্ম্মান কয়লাখনির মালিকগণ শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস ও খাটুনির সময় বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইল। আমেরিকার কয়লার খনিগুলির মালিকদের মধ্যে ছিল দেশের বাজার দখলের প্রতিযোগিতা, সেখানেও কম মজুরির ও বেশী খাটাইবার প্রয়াস চলিল। কিন্তু এত করিয়াও কোন দেশেই কয়লা-শিল্পের লাভের মাত্রা বজায় রহিল না।

বেপরোয়া প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় অর্থনীতি কেবল উৎপাদনে অপচয়েরই প্রশ্রয় দিল না, কয়লা ব্যবসায়ে বড় রকমের মন্দা আনিয়া দিল। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৫ সনের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেনে কয়লাখনির শ্রমিকের সংখ্যা ১১ লক্ষ হইতে কমিয়া ৪ লক্ষ ২০ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার কয়লা-মজুর সাময়িক বা পাকাপাকি ভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি চারি জনে একজন কর্ম্মহীন হইয়াছিল। বৎসরে মাত্র ২০০ দিন কয়লার খনিগুলির কার্য্য চলিত।

ব্রিটেনে কয়লাখনির মালিকানা ব্যক্তিগত হওয়ায় যত অনর্থ

থাকিতেছিল। যে সকল খনির অভ্যন্তরে কয়লার স্তর নিম্নমান সেই সকল খনির মালিকেরা বৎসরে ৪০ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী রয়েলটি পাইত। কেহ কেহ একাই বড় বড় খনির রয়েলটি উপভোগ করিত। এই সকল মালিকানার জন্যই তাহাদের মর্জি অনুযায়ী খনির কার্য্য চালাইতে হয়। অনাবশ্যক স্থানে গহ্বর খুঁড়িতে বহু অর্থ অপব্যয় হয় এবং খনি-শ্রমিককে খনির মধ্যে অনেকটা পথ হাঁটিয়া কর্মস্থানে যাইতে হয়। মালিকগণকে জমির সীমা-নির্দেশক স্থান হিসাবে বিস্তর কয়লা না কাটিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। তাহা ছাড়া এই সকল মালিকের খামখেয়ালীর জন্য অনেক সময় কয়লার খনির মধ্যেকার পয়ঃপ্রণালীর জলনিঃসরণ-কার্য্যও ব্যাহত হয়। ১৯২৫ সনের কয়লা-কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার জন্য কয়লা-শিল্পের অন্ততঃ চৌদ্দ দফা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বহুজনের স্বার্থরক্ষা করিয়া আমেরিকার কয়লার খনির কাজ চলে। ইহাদের মধ্যে এক দিকে আছে ছোট ছোট মালিক। অন্য দিকে, যুক্তরাষ্ট্র ষ্টীল কর্পোরেশনের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান নিজের মালিকানায় এবং ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্বাধিকারী হিসাবে সমস্ত দেশের কয়লার জমির উপর অধিকারী হইয়া আছে।

কয়লার ক্রয়-বিক্রয় কেবলমাত্র অল্প কয়েকজন দালালের মারফতে হয় বলিয়া তাহারা প্রচুর লাভ করে। এজন্য খাদের মুখের কয়লার বিক্রয়-মূল্য ও সর্ব্বশেষে ইহা যে দরে কেনা হয় তন্মধ্যে ব্যবধান খুবই বেশী।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, কয়লাখনির নিকটেই লৌহ নিষ্কাশনের ও ষ্টীলের কারখানাগুলি স্বাভাবিক কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে এই সকল খনি-এলাকা চির-দিনের মত অ-সুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। নমুনা-স্বরূপ ইংলণ্ডের ব্লাক-কান্ট্রি ও জার্ম্মাণীর রুঢ় জেলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়লার খনিতে মনোরম কিছুই দেখা যায় না—ক্ষতবিক্ষত ভূখণ্ড, ইতস্ততঃ প্রসারিত রেলপথ ও সারি সারি খনি-শ্রমিকদের কুটীর ইহার বৈশিষ্ট্য। যেখানে প্রভূত সম্পদের সৃষ্টি হইতেছে সেখানকার শ্রমিকগণের দুঃখ ও দৈন্য দেখিলে কাহার না মনে আঘাত লাগে। কয়লা কমিশন ১০০ গ্রামে শ্রমিকদের অপরিচ্ছন্ন বাসগৃহ উপযুক্ত জলসরবরাহের অভাব ও স্বাস্থ্যহানিকর অভাব বন্দোবস্ত দেখিয়া অতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। অথচ এই সকল বাসগৃহ ও যাবতীয় দুর্ব্যবহার জন্য দায়ী কয়লাখনির মালিক কোম্পানী-গুলি। এত অসুবিধার উপরে আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি শ্রমিকগণের নিকট বাজার-দর অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয় করিয়া কোম্পানীগুলি প্রচুর লাভ করিয়া থাকে।

কয়লাশিল্পে কয়লার পরেই খনিজ তৈল বা পেট্রো-লিয়মের স্থান। মোটর ও এরোপ্লেন চালাইবার জন্য জ্বালানী তৈল, গ্রীজ, কেরোসিন প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য ইহা দরকার। খনিজ তৈল, কয়লার মত পৃথিবীর বহুদেশে ছড়াইয়া নাই। ভূগর্ভের নিচেকার স্তরের সঞ্চিত তৈলকে নিষ্কাশন করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। একা যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ খনিজ তৈলের মালিক।

১৮৫৯ সনে যখন প্যানেসিলভেনিয়ায় তৈলের খনিতে কার্য্য আরম্ভ হয় তখন এই একই এলাকায় শত শত তৈল-কূপ খনন করা হয়। ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত তৈলের উপরকার জমিতে মালিকের কোন স্বত্ব ছিল না বলিয়া প্রত্যেকেই যতগুলি পারা যায় গর্ত খুঁড়িয়া যত বেশী সম্ভব তৈল নিষ্কাশনের চেষ্টা করিত এবং যাহাতে অপর কেহ পাম্প করিয়া বেশী তৈল না লইতে পারে সেজন্য দ্রুতভাবে তৈলসংগ্রহ কার্য্য চালাইত। ইহাতে তৈল-স্তরের ঊর্দ্ধে সঞ্চিত গ্যাস প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইত, অথচ জ্বালানী হিসাবে এই গ্যাস খুবই মূল্যবান ছিল। বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় তৈল-খনির কাজ চালানো হইত বলিয়া অসম্ভব রকম উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে অতি বিরাট অপচয়ও চলিয়াছিল। ক্যালিফোর্ণিয়া ও প্যানেসিলভেনিয়া এই উভয় স্থানের তৈলের খনিতে কিছুকালের জন্য খুব লাভ হইবার পর তৈলের ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল এবং দাম কমিয়া গিয়া শূন্যে ঠেকিল।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া তৈলের কারবার একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের হুকুমে চলিয়াছে। অথচ এই কোম্পানী উৎপাদনের উন্নতির দায়িত্ব বহু ছোট প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কেবল ক্রয়-বিক্রয়ের কলকাঠি নাড়িয়া মুনাফার কড়ি গণিয়াছে। এই বিরাট প্রতিষ্ঠান সকল ছোট কোম্পানীকে ইহার নিকট তৈল বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে, রেল-মালিককে হাত করিয়াছে, তৈলের পাইপ-লাইন কিনিয়া লইয়াছে এবং যে কেহ ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াছে তাহাকেই দেউলিয়া হইতে হইয়াছে। ১৯০৬ সনেই এই কোম্পানী মোট 'ক্রুড' (অশোধিত) তৈলের শতকরা আশী ভাগ কিনিয়া লইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ উৎপাদকগণকে নিজেদের খুশীমত দাম দিয়া তৈল ক্রয় করিত কারণ তৈলের আর কোন ক্রেতা ছিল না এবং যে দামে তৈল বিক্রয় হইত তাহা অপেক্ষা ⅓ হইতে ⅙ বেশী দামে সাধারণের নিকট বিক্রয় করিত।

পরে এই প্রতিষ্ঠানকে ভাঙিয়া কয়েকটি ছোট ছোট কোম্পানী তৈয়ার করা হয়। এগুলি অর্দ্ধেকের উপর তৈলের খনি দখল করিয়া আছে। পরে কান্সাস্ হইতে পশ্চিমে টেক্সাস্ ও দক্ষিণে আরকান্সাস্ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বৃহৎ তৈলের খনিগুলি আবিষ্কৃত হইলে ব্যাপক ভাবে তৈল নিষ্কাশন সুরু হয়; অনেক নূতন কোম্পানীও গঠিত হয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অনেক ভূয়া এবং দেউলিয়া কোম্পানীও ছিল। এত বেশী পরিমাণে ক্রুড তৈল তোলা হইত যে সমস্ত কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি দ্বারাও তাহা পরিষ্কার করা সম্ভব হইত না। আবার দেখা দিল অতিরিক্ত উৎপাদনের দোষগুলি—অসম্ভব

রকম মূল্যহ্রাস, কারণ অর্থকষ্ট ও প্রাকৃতিক সম্পদের অযথা অপচয়।

এইরূপ উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি, মূল্যের উত্থানপতন ব্যবসায়ের স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোটি কোটি গ্যালন বাড়্‌তি তৈল বাজার প্লাবিত করিতেছে। এই সকল নিয়ন্ত্রণ করিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে।

বর্তমান তৈলের ব্যবসা অল্প কয়েকটি অতিকায় প্রতিষ্ঠানের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলিই সর্বতোভাবে তৈলের উৎপাদন, পরিস্রুতকরণ, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। ইহারা পৃথিবীর সমস্ত তৈলের খনি, পাইপ-লাইন, পরিস্রবণকারী কারখানা, তৈলরক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি দখল করিয়া আছে। যে-কোন দেশের তৈলের খনিতেই ইহারা হাত বাড়ায় এবং সুবিধাজনক সর্ত আদায় করিয়া লয়। রুশিয়া তৈলের ব্যাপারে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। রুশিয়াকে বাদ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত খনিজ তৈল আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মূলধন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ভিনিজুইলা ও মেক্সিকোর তৈলের খনিতেও অপচয়ের বিরাম নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতেই বৃটিশ পুঁজিপতিগণের চেষ্টা চলিতেছিল কিরূপে অপর দেশের তৈলের খনি দখল করা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের কেহ হস্তক্ষেপ করিতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকাপাকি রকম আছে। ইরাণের তৈলের খনিতেও ব্রিটিশ প্রভুত্বই ছিল, সম্প্রতি রুশ তাহাতে ভাগ বসাইয়াছে। ইরাকের খনিতেও ব্রিটিশের বিপুল স্বার্থ রহিয়াছে। তৈলের খনির কয়েকজন মালিকের মধ্যে কতকটা প্রতিযোগিতা এখন থাকিলেও, শেষ পর্য্যন্ত পারস্পরিক চুক্তির বলে ইহাদের সকলের মিলিত স্বার্থ এক অতিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই।

আমেরিকার লৌহ ও তৎসংশ্লিষ্ট কয়েকটি শিল্পও বিশেষ ভাবে একটা প্রতিষ্ঠানের দখলে গিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান লৌহ-প্রস্তর, কয়লার খনি, জাহাজ, রেলপথ, ব্লাষ্ট ফার্নেস্ ও ষ্টীল প্লান্টের মালিক। ফ্রান্সের লোরেন প্রদেশ লৌহের জন্ত বিখ্যাত। যুদ্ধে কয়েকবার এই প্রদেশের ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়াছে। লোরেনের লৌহসম্পদের জন্তই ফরাসীদেশ সমৃদ্ধ। ভারতে লৌহসম্পদও কম নহে, কিন্তু সবই বঙ্গদেশ ও বিহারের মধ্যেই প্রায় সীমাবদ্ধ। বর্তমানে মাত্র তিনটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন করিতেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র জাপানই লৌহসম্পদে হীন। চীনের লৌহসম্পদ যথেষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। চীনের লৌহ ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের আশায় জাপান চীনে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সুরু করিয়াছিল, কিন্তু চূড়ান্ত পরাজয়ে তাহার সকল আশা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর লৌহসম্পদ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা খুবই কম। এক দেশের লৌহসম্পদ কমিবার পূর্বেই পুঁজিপতিরা অপর দেশের উপর লোলুপ দৃষ্টি দিতে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই চিলি ও ব্রেজিলের উপর নজর দিয়াছে।

লৌহের পরে তাম্র। ইহা বিদ্যুৎসংক্রান্ত কাজে প্রচুর পরিমাণে লাগে। বৈদ্যুতিক কারখানা প্রভৃতির সংখ্যা প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাম্রের ব্যবহারও খুবই বাড়িয়া চলিয়াছে। এক যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ তাম্র যোগাইয়া থাকে। আরিজোনা ষ্টেট হইতেই বেশী তামা পাওয়া যায়। মাত্র একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানই খনির প্রস্তর হইতে ধাতুশোধনের কাজে পৃথিবীর এক শত ভাগের নব্বই ভাগ রপ্তানী-বাণিজ্য দখল করিয়াছিল। এই একচেটিয়া কারবারের জন্তই ইহা তাম্রের মূল্য বহু উচ্চে তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। এজন্ত কাজের লোকসানের দরুন যে সকল খনির বহু পূর্বে বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেগুলিও লাভে চলিতে লাগিল। কিন্তু যখন মজুত মালের পরিমাণ অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল এবং আফ্রিকার নূতন তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইল তখন প্রচুর পরিমাণে তাম্র বাজারে আসিল। তখন একচেটিয়া কারবারও ভাঙিয়া গেল এবং ব্যবসায়ের মহাদুর্দিন উপস্থিত হইল।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার মূলধন তাম্রের ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। চিলিতে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন খাটিতেছে, চিলি তাম্র উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। সম্প্রতি বেলজিয়ান কঙ্গোর অন্তর্গত কাটাঙ্গা এবং উত্তর-রোডেসিয়ায়, বেলজিয়ান ও ব্রিটিশ মূলধন দ্বারা পরিচালিত তাম্র-ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা চলিতেছে; কিন্তু সেখানেও আমেরিকার মূলধন কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

সীসা, দস্তা ও এলুমিনিয়মের উৎপাদনেও আমেরিকা প্রধান। সমগ্র পৃথিবীতে এগুলির উৎপাদনের শতকরা ২৫ হইতে ৪০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। কিন্তু রাঙের (tin) উৎপাদনে ব্রিটেন আমেরিকাকে একেবারে হটাইয়া দিয়াছে। যদিও শিল্পের (Industry) ক্ষেত্রে রাঙ খুব বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয় না তবু টিনপ্লেট প্রভৃতি শিল্প ইহা ছাড়া সম্ভব নহে। এক ব্রিটিশ মালয়ে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ রাঙ উৎপন্ন হয়। দুইটি ব্রিটিশ কোম্পানী এই মোট উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ দখল করিয়া আছে। যখন যুক্তরাষ্ট্রে রাঙ প্রস্তুতের জন্ত কারখানা বসান হইল তখন ব্রিটেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চালানী রাঙের (tin-ore) উপর অসম্ভব চড়া রপ্তানী-কর বসাইয়া দিয়াছিল। রাঙ বলিভিয়ায় যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাও ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণের অধিকারে। রাঙের দ্বিতীয় সরবরাহ স্থান পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—ইহা ওলন্দাজদিগের অধিকারে। বর্তমানে নব-প্রতিষ্ঠিত দেশীয় সাধারণতন্ত্রের সহিত ওলন্দাজের সংঘর্ষ চলিতেছে।

রাঙের উৎপাদন তাম্র উৎপাদনের মত একই পথ ধরিয়া

চলিয়াছে। ইংরেজ পুঁজিপতিরা প্রথমে নিজেরা, পরে ওলন্দাজগণের সহিত সহযোগিতায়, রাঙের দাম অসম্ভব রকম চড়াইয়া যাহাতে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর খনিগুলিতেও লাভজনক ভাবে কাজ করা যায় সে ব্যবস্থা করিয়াছে। বলিভিয়া ও নাইজিরিয়ার খনিগুলি এইজন্যই লোকসান এড়াইয়া চলিয়াছে। এক সুদূর প্রাচ্যই অর্দ্ধেক দামে রাঙ বিক্রয় করিয়া পৃথিবীর সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারে।

অতঃপর লবণের কথা বলা দরকার। সমুদ্রের নোনাজল, নোনাহ্রদ ও কূপের জল হইতে লবণ প্রস্তুত হয়। মানুষের এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া এবং কর বসাইয়া ভারতের দরিদ্র জনগণের বিপুল দুঃখের কারণ হইয়াছে। লবণ-সম্পদে ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রধান ছয়টি দেশের অন্যতম হইলেও (উৎপাদন ২০ লক্ষ টন) ইংরেজের লবণ-নীতির ফলে তাহাকে চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

এখন বাণিজ্যিক সারের (Commercial fertilisers) কথা আলোচনা করা যাক। বহু বৎসরের ক্রমাগত চাষে জমির উর্ব্বরতা কমিয়া যায়, সুতরাং সারের ব্যবহার দ্বারা উর্ব্বরতা ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু ধনতন্ত্রের আওতায়, বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষ ও চীনে কৃষকের এরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে তাহার পক্ষে জমিতে উপযুক্ত সার দেওয়া সম্ভব নয়।

সারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা ফসফেট্, পটাশ এবং নাইট্রেট্। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় এবং উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে বিপুল পরিমাণে ফসফেট্ সার মজুত আছে। জার্ম্মানীর ষ্টাস্‌ফুর্ট (Stassfurt) খনি ফ্রান্সের আল্‌সাস্ হইতে মোট সরবরাহের ১/৬ অংশ পটাশ পাওয়া যায়। নাইট্রেট্ পূর্ব্বোক্ত দুইটি সার হইতে উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহার সরবরাহ পৃথিবীর একটি দেশের একচেটিয়া। উত্তর চিলিতে প্রায় ৪৫০ মাইল দীর্ঘ এক উচ্চ মরুভূমিতে (Pampa) এই নাইট্রেট্ পুঞ্জীকৃত। এক সময় চিলির মোট রপ্তানীদ্রব্যের অর্দ্ধেক ছিল নাইট্রেট্। চিলির নাইট্রেট্ ব্যবসায়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল মূলধন খাটিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও চিলি-সরকার নাইট্রেটের রপ্তানী-কর হইতে যথেষ্ট আয় করিয়া থাকেন।

এক সময় আশঙ্কা হইয়াছিল, এই বিরাট নাইট্রেট্ স্তূপ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু জার্ম্মানী ও যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রেট্ তৈরি হইতে আরম্ভ হওয়ায় সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে। স্বাভাবিক নাইট্রেটের সহিত প্রতিযোগিতায় রাসায়নিক নাইট্রেট্ই জয়ী হইয়াছে। ফলে চিলির যে সকল কৃষক নাইট্রেট্ ব্যবসায়ের মজুরগণকে খাদ্য সরবরাহ করিত—তাহারা এবং যে সকল রেলপথ এই ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল ছিল সেগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে এই কারবারে মন্দা পড়ায় ৪৪,০০০ জন শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারবর্গ একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল।

আইয়োডীন একটা মূল্যবান ঔষধ। খুব অল্প খরচেই ইহা সমস্ত পৃথিবীতে সরবরাহ হইতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য ইহার যথেষ্ট অপচয় হয় এবং বেশী মূল্যে বিক্রয় হয়।

আর এক প্রকার সারের নাম গুয়ানো (guano)। ইহা অবশ্য কোন ধাতু নহে—নানা প্রকার পাখীর বিষ্ঠা হইতে ইহার সৃষ্টি। চিলির নাইট্রেটের মতই ইহাতেও খুব নাইট্রোজেন আছে এবং একজন্যই জমির সার হিসাবে ইহা ত্রিশ গুণ বেশী উপকারী। পেরুর উপকূলের অদূরে চিন্‌চা এবং লোবো দ্বীপে নানা জাতীয় অসংখ্য পাখী ডিম তা দিতে আসিয়া যে পুরীষ ত্যাগ করে তাহা হইতে সেখানে গুয়ানোর বৃহৎ পাহাড় সৃষ্টি হইয়াছে। যে পদ্ধতিতে এই সার প্রস্তুত হয় তাহাতে চিরদিনের মত ইহার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকিবার কথা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ জাতি ও অন্যান্য দেশের পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন এই সস্তা সার যোগাড় করিতে আরম্ভ করিল তখন প্রতিযোগিতার দরুন সংগ্রহের নামে চলিল লুণ্ঠন। কুড়ি বৎসরে মাত্র ছোট কয়েকটি দ্বীপ হইতেই এক কোটি টন গুয়ানো সংগৃহীত হইয়াছিল। গুয়ানো সরাইয়া লইবার জন্য একটি দ্বীপের উচ্চতা এক শত ফুট কমিয়া গিয়াছিল। খাদ্যের জন্য ডিম সংগ্রহকারীরা পাখীগুলিকে তাড়াইয়া দিত বা অন্যরূপে উদ্ব্যস্ত করিত এবং দরকার হইলে হত্যাও করিত।

গুয়ানো-স্তর কাটিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ চীনা কুলী আমদানী করা হইয়াছিল। চাবুক হাতে নিগ্রো সর্দ্দারগণ এই কুলীদের কাজে খাটাইত। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন, এই কুলীদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা ছিল কুকুরের মত। ইহাদের মধ্যে আত্মহত্যা লাগিয়াই ছিল। একজন ভ্রমণকারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহারা কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকিত তাহারা সকলে শীর্ণদেহ, তাহাদের পরণে ছিন্ন বাস এবং সকলেরই দৃষ্টি ছিল উদাস-করুণ, অর্থাৎ ইহারা ছিল মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতম ব্যবহারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই পেরুবাসীরা দেখিল গুয়ানোর যোগান অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সারের অভাবে নিজ দেশের কৃষিরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত গুয়ানো তখন বিদেশী পুঁজিপতিগণের করতলগত। পেরুর গবর্ণমেণ্ট উঁহাদের হাত হইতে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তবে গুয়ানোর ব্যবসায়কে রক্ষা করিল। কিন্তু গত অর্দ্ধশতাব্দীর অপচয় পূরণ করিতে বহু বৎসর লাগিবে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইচাবো (Ichabo) দ্বীপে এক সময় ২০০০ জন লোক ৬০০ গজ দীর্ঘ এবং ২০০ গজ প্রস্থ এক দ্বীপের গুয়ানো দখলের জন্য বিবাদ করিয়াছিল। অবশেষে এখানে ব্রিটিশ অধিকার কায়েম করা হয় এবং বিদেশীয়দের গুয়ানো সংগ্রহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যখন খুব গুয়ানো সংগ্রহের মরশুম তখন এই ক্ষুদ্র দ্বীপে এক এক সময়ে ৩০০ জাহাজে গুয়ানো বোঝাই করা হইত। এক বৎসরেই ইচাবো দ্বীপ ঊষর প্রস্তর-দ্বীপে পরিণত হইল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বের দ্বীপগুলিও প্রায় গুয়ানো-শূন্য দেখা গেল। পেরুর মত দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট এখন এই দ্বীপগুলি খাস করিয়া লইয়াছে এবং গুয়ানো রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

সরস্বতীর কুলের কথা

শ্রীসুরজিৎ শাস্ত্রী

কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা, শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা, বীণাবর-দণ্ড-মণ্ডিতকরা, শ্বেত-পদ্মাসনা, সর্বদেব-বন্দিতা ভগবতী সরস্বতীকে জাড্য অপহরণ জন্য এই যে বর্ষে বর্ষে আমরা অর্চনা করি, ইনি কে?

সরস্বতী শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে সরস্-বতী হয়। সরস্ শব্দের আভিধানিক অর্থ জল। সরস্বৎ অর্থ প্রভূত জল-বিশিষ্ট। তাহার স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী। এই অর্থে সরস্বতী নদী বুঝায়।

সরস্ শব্দের আর একটি অর্থ জ্যোতি। এই অর্থে সরস্বত মানে জ্যোতির্ময়। সূর্যের একটি নাম সরস্বত। এই অর্থে সরস্বতী মানে—জ্যোতির্ময়ী।

আজকাল যে সমস্ত স্ত্রী-দেবতা আমাদের নিকট পূজা পান তাঁহাদের মধ্যে সরস্বতীই বৈদিক দেবী।

বৈদিক যুগের দেব-সমাজ আধুনিক হিন্দু সমাজের মত ছিল। তাহাতে নারীর প্রাধান্য ছিল না। আজকাল অবজ্ঞাত নারী-সমাজের মধ্যেও যেমন কদাচিৎ দুই-এক জন প্রকাশ পাইয়া উঠেন, বৈদিক দেব-সমাজেও সেইরূপ পূজা পাইয়াছিলেন—ঊষা ও সরস্বতী।

বেদে সরস্বতীর চারিটি নাম দেখিতে পাই, সরস্বতী, ভারতী, ধীষণা ও বাগ্‌দেবী। বৈদিক সরস্বতীর কোনো মূর্তি নাই, তিনি জ্যোতিমাত্র।

সরস্বতীকে সূর্যের কন্যা বলা হইয়াছে। সূর্যালোকের ন্যায় জ্ঞানালোক ধারণ করেন বলিয়া কি?

আর এক সরস্বতী নদী। এই সরস্বতীকে স্তব করিয়া ঋগ্‌বেদের তিনটি সম্পূর্ণ সূক্তে আরও ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে তাঁহার উল্লেখ আছে।

বর্ধ শুভ্রে স্তবতে রাসি বাজান। (৭ম, ৯৫সূ ৬ ম)

শুভ্রবর্ণে দেবী, তুমি বর্ধিত হও। তোমার স্তবকারীকে অন্ন দান কর। (রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ)

উতে যন্তে মহিনা শুভ্রে অন্ধসী
অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ সা নো বোধ্যবিত্রী।

(৭ম, ৯৬সূ, ২ম)

হে শুভ্রবর্ণা (সরস্বতী) তোমার মহিমা দ্বারা মনুষ্যগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও। (দত্তকৃত অনুবাদ)

সরস্বতী বাজেভিঃ বাজিনীবতী ধিয়াবসুঃ।

(১ম, ৩সূ, ১০ম)

অন্নযুক্ত-যজ্ঞ-বিশিষ্টা যজ্ঞ ফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন। (দত্তকৃত অনুবাদ)

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতংতী সুমতীনাম।

(১ম, ৩সূ, ১১ম,)

সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, সুমতি লোকদিগের উৎপাদয়িত্রী সরস্বতী আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন।

(দত্তকৃত অনুবাদ)

—ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।

(১ম, ৩ সূ, ১২ম)

এবং সকল জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছেন।

(দত্তকৃত অনুবাদ)

শুচির্দেবেষ্বর্পিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী।
ইলা সরস্বতী মহী বর্হি সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ॥

(১০ম, ১১সূ, ৮ম)

এই মন্ত্রে সরস্বতীকে ইলা এবং ভারতী এই দুই স্ত্রী-দেবতার সহিত যুক্ত দেখিতেছি।

ভারতী দেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। ইলা দেবী এই যজ্ঞের বিষয় স্মরণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকারিণী দেবী পুরোবর্তী সুখকর কুশাসনে আসিয়া উপবেশন করুন।

(দত্তকৃত অনুবাদ)

এই সরস্বতীকে ঋষিগণ কেবলমাত্র জল-প্রবাহ মনে করেন নাই। ইহার মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় দেবতার সাক্ষাৎ পাই। বৈদিক যুগে ইহার অধিক আর সরস্বতীকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণ্য যুগে ইনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তখনও তিনি বিশেষ ভাবে পূজিতা হন নাই।

সূত্র-যুগে অন্যান্য দেবদেবীর উল্লেখ থাকিলেও সরস্বতীর উল্লেখ নাই। বর্তমানের আমাদের এই বীণাপুস্তকরঞ্জিত-হস্তা সরস্বতীর জন্ম পৌরাণিক যুগে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ যুগের পর হইতেই ভারতবর্ষে আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার ফলে মানব-সমাজে বর্ণসাঙ্কর্য আসিয়াছিল। তাহাতে দেব-সমাজও বাদ যায় নাই। এই মিশ্রণের ফলে বৈদিক আর্য রুদ্র, অনার্য শিবের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর বৈষ্ণব ধর্মের সহিত অনার্য আভির জাতির দেবলীলা প্রবাদ মিলিত হইয়াছিল।

কথাটা কাহারও কাহারও অপ্রিয় হইতে পারে। শিব যে অনার্যের দেবতা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। দক্ষের যজ্ঞে সর্বদেবতার সহিত শিবের নিমন্ত্রণ না হওয়া তাহার একটি ইঙ্গিত। শ্মশানে বাস, বৃষভবাহন, ভস্মের অঙ্গরাগ, নাগভূষণ, ব্যাঘ্রচর্মবসন ইত্যাদি দ্বারা অনার্যের চিহ্ন সূচিত হইতেছে।

"লক্ষ্মী শিব এমন কি বিষ্ণুও সর্বাংশে বৈদিক দেবতা নহেন।

ইঁহাদিগকে পাই পরবর্ত্তী যুগে। কনিষ্কের মুদ্রায়, গরুড় স্তম্ভের লিপিতে, পার্থিয়ান যবনদিগের মুদ্রায়, ভরহুত, সাঁচি গান্ধারের অপূর্ব্ব প্রস্তর-শিল্পে। বৈদিক দেবতা সূর্য্যকেও বিশেষ ভাবে পাই, কিন্তু সরস্বতীকে কোথাও পাই নাই। মনে হয় বৈদিক সরস্বতী পরবর্ত্তী যুগে কোথাও বিশেষ আসন পান নাই, যত দিন না পৌরাণিক যুগে তাঁহার হৃতসম্পদ ফিরিয়া আসিয়াছিল।" (সরস্বতীর রূপপর্য্যায়—শ্রীযুক্ত নীহার-রঞ্জন রায়) নীহার বাবুর এই উক্তি প্রতিবাদযোগ্য। বৈদিক যুগে প্রতিমা-নির্ম্মাণ-প্রথা ছিল না। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন—

ন তস্যাস্তি প্রতিমা।

পাণিনিতে প্রতিকৃতি সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিয়া এক সম্প্রদায় বলেন, বৌদ্ধ যুগের আগেও প্রতিমা-নির্ম্মাণ-প্রথা ছিল। কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে পাণিনির আবির্ভাব-কাল খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে। পাতঞ্জলে কোনো কোনো দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে প্রতিমা-নির্ম্মাণ-প্রথা থাকিলেও ভাস্কর-শিল্পের চরম উন্নতি বৌদ্ধ যুগেই হইয়াছিল। বৌদ্ধগণ নির্ম্মিত স্তূপ, চৈত্য ও বুদ্ধের নানা-রূপ মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কাল খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তৎকালীন খোদিত অনেক মূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায়। তাহার পূর্ব্বের কোনো পাষাণ-মূর্ত্তির পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহা দ্বারা বলা যাইতে পারে বৌদ্ধযুগে প্রস্তর-শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়া মূর্ত্তি-শিল্প ও প্রতিমা নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে ব্রাহ্মণ্য যুগের অনেক দেবদেবী স্থান পাইয়াছেন—কেহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কেহ বা বিকৃতরূপে, যেমন ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য লক্ষ্মী ইত্যাদি। কিন্তু বৌদ্ধযুগে সরস্বতীর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গান্ধার হইতে একটি বীণাবাদনরতা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি সিংহবাহিনী। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত আর একটি মূর্ত্তি পাওয়া যায়, কমল চরণতলা, চতুর্ভুজা, ইনি সিংহবাহিনী নহেন। উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন। কিন্তু নিম্নে একটি সিংহ। ইঁহারা বাগীশ্বরী মূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। আধুনিক হংসবাহিনী মূর্ত্তির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বাগীশ্বরী বৌদ্ধ দেবতা মঞ্জুশ্রীর পত্নী। ব্রাহ্মণ্য যুগের ব্রহ্মাই পরিবর্ত্তিত হইয়া বৌদ্ধ যুগে মঞ্জুশ্রী হইয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুদিগের এক সম্প্রদায় যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বৌদ্ধ হইলেন, তেমনই অন্য সম্প্রদায় হিন্দুই রহিয়া গেলেন; ব্রাহ্মণ্য যুগের দেবতাগণের মধ্যেও এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ দেবতায় পরিবর্ত্তিত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র হইলেন বজ্রপাণি, বিষ্ণু অবলোকিতেশ্বর, ব্রহ্মা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষ। আবার অনেক অনেক দেবতা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেলেন। কোনো কোনো বুদ্ধমূর্ত্তিতে দেখা যায় ব্রহ্মাদি হিন্দু দেবগণ বুদ্ধের স্তব করিতেছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের বন্যায় যে সমস্ত হিন্দু দেবতা প্রচ্ছন্ন ভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মার রূপান্তরিত মূর্ত্তি মঞ্জুশ্রীর পত্নী হইতেছেন বাগীশ্বরী। বৈদিক যুগের ব্রহ্মা বেদবিদ্যাপারদর্শী ঋষি। পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদ নিঃসৃত হইয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মার সহিত বাগ্‌দেবীর সম্বন্ধ সংঘটন করা অশোভন হয় নাই।

এক্ষণে পৌরাণিক যুগে আসা যাক। পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেখানে সরস্বতী দেবীর কোনো প্রাধান্য নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপে ভ্রষ্টজ্ঞান হইয়া সূর্য্যের স্তব করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মৎস্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মার দশ জন মানসপুত্র। নয় জন শারীর পুত্র ও একটি কন্যা। এই কন্যার নাম সরস্বতী, গায়ত্রী, সাবিত্রী ও শতরূপা। সরস্বতী জন্মলাভের পর যখন পিতাকে প্রদক্ষিণ করিত তখন কন্দর্প ঠাকুরটি একটি বিসদৃশ কাণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কন্যার রূপে মুগ্ধ ব্রহ্মার তিন দিকে তিনটি এবং ঊর্দ্ধে আরও একটি—এই চারিটি মুখ গজাইয়া উঠিল। তিনি পঞ্চ মুখে—অহো রূপং অহো রূপং ইতি প্রাহ পুনঃ পুনঃ।

(মৎস্যপুরাণ ৩য় অধ্যায়)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাই, আদ্যাপ্রকৃতির পঞ্চমী মূর্ত্তি—সরস্বতী।

গণেশ জননী—দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টি বিধৌ প্রকৃতি পঞ্চমী স্মৃতা॥
বাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণ কণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥

বৈদিক সরস্বতী বৌদ্ধ প্রভাবে শত শত বৎসরের আত্ম-প্রচ্ছন্নতার পর পৌরাণিক যুগে আবার আত্মপ্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেই আমাদের সরস্বতীর প্রভাব পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ হইলেও সে সময় রাধাগত প্রাণ ছিলেন। তিনি পাণিপ্রার্থিনী সরস্বতীকে সদুপদেশ দিলেন। তিনি তাঁহার অন্যতর স্ব-রূপ বিষ্ণুকে বরণ করিতে বলিলেন। এবং সরস্বতী পূজা—

"মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভ দিনেঽপি চ।"—

বিধান করিয়া দিলেন।

এদিকে আবার নারদীয় পুরাণ, ধর্ম্মপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে শিবের কন্যা বলা হইয়াছে। বেদে মরুৎগণ রুদ্রের সন্তান। মরুৎগণ সরস্বতীর সখী এই সূত্রে হয় ত শিবকন্যা বলা হইয়াছে।

সরস্বতী যে শিবকন্যা তাহা অন্যত্রও বর্ণিত হইয়াছে শিব

স্বশক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ সঞ্জাত হইয়াছিল।

কা পুনঃ স্রষ্টুঃ সুস্নেহা সদাভিপ্রভিপন্ন শ্রিং।
তস্যাঃ শক্তিং দ্বিতীয়াঞ্চ স্বামি অপরাজিতাম।
দেবীপুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে—অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তির নারীভাগ বিভক্ত হইয়া লক্ষ্মী সরস্বতী উমা হৈমবতী ষষ্ঠী প্রভৃতি উৎপন্ন হন।

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেখিতে পাই—

ভবাজ্ঞায়া মহালক্ষ্মীরহং বৈকুণ্ঠবাসিনী।
সরস্বতী চ তত্রৈব বামপার্শ্বে হরেরপি।

বরাহপুরাণ বলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হইতে ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই তিন শক্তির সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মী শক্তির নাম সৃষ্টি। এই সৃষ্টি সর্বাক্ষরা বাগেশ্বরী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তাঁহার বর্ণ শ্বেত, তিনি সর্বাঙ্গ-সুন্দরী।

আবার শিবপুরাণে আছে—

সরস্বতী চ বল্মীকে স্মৃতি বৈপায়নে তথা,
"বিষ্ণোর্জিহ্বা সরস্বতী।"
(বামনপুরাণ ৩২ অঃ)

শিবপুরাণ বলেন—

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে বাগ্‌দেবী দণ্ডিতা হইয়াছিলেন, শিব তাঁহাকে অন্ন দান করেন।

দেবীপুরাণে সরস্বতী মূর্তি—

ততো দ্যোতিতবান শম্ভুঃ স্বশক্তিং কিরণোজ্জ্বলাম্।
হংস স্কন্দ আরূঢ়া স্বকীয়ায়ুধধারিণী॥

এই হংসবাহন সরস্বতী দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। রবিবর্মার ছবিতে অনেকে এই মূর্তি দেখিয়া থাকিবেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে—শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বীণাপুস্তকহস্তা শুক্লবর্ণা এক দেবী আবির্ভূতা হন। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তিনি বাক্যবুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি পুস্তক রচনাকারিণী এবং সঙ্গীতের কারণ-স্বরূপ। সেজন্য তিনি বীণাপুস্তকধারিণী। তাঁহার বর্ণ শ্বেতপদ্মাভ।

বৈদিক সরস্বতী নদীর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য পৌরাণিক একটি কিংবদন্তী আছে:

বিষ্ণুর বহু-বিবাহ ছিল। লক্ষ্মী সরস্বতী ও গঙ্গা তাঁহার এই পত্নীত্রয় ছিল। স্বর্গেও সপত্নীবিদ্বেষ আছে। একদা গঙ্গার সহিত কলহ হওয়ায় গঙ্গা সরস্বতীকে অভিশাপ দেন। সেই শাপের ফলে সরস্বতী নদীরূপ ধারণ করেন।

মৎস্যপুরাণ মতে সাবিত্রী ও সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তকার বলেন—সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নীই ছিলেন। বিষ্ণু ছিলেন উদার। পঞ্চ পাণ্ডবের মত পত্নীর অংশ ব্রহ্মাকে অকুণ্ঠিত ভাবে ছাড়িয়া দিলেন।

এ সম্বন্ধে শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায় সরস্বতীর কুলপরিচয়ে লিখিয়াছেন—

"এই যে সরস্বতীর পত্নীত্ব লইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা এ সম্বন্ধে আমি একটি বিশিষ্ট মত পোষণ করিয়া থাকি। আমরা জানি বৈদিক যুগের অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণে ও ক্ষত্রিয়ে একটা প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এবং সেই বিরোধ বহুকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে আদর্শেরও ভেদ ছিল। সেই আদর্শ-ভেদের মূর্তি পরিকল্পনা রূপে দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন তন্ত্রমন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। এই দুই দেবতাকে লইয়া সামাজিক বিপ্লব কম হয় নাই।

এই বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণব ধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন, এই কাহিনীর মধ্যে একটা বিরোধের ইতিহাস সংহৃত হইয়া আছে।

দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে পূজার আসনে বৈদিক ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই ক্রমে তাঁহার স্থানকে অধিকার করিলেন।

ব্রহ্মার ও বিষ্ণুর বিচ্ছেদটুকু কোথায় দেখিলাম। দেখিব এই বিচ্ছেদের মধ্যেই সরস্বতীর পত্নীত্ব লইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারার তত্ত্বটুকুও বিধৃত হইয়া আছে। আমার মনে হয় সরস্বতী প্রথমে ব্রহ্মার পত্নী বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছিল। সে কথার প্রমাণ আছে। ব্রহ্মা বেদগুরু বলিয়া কথিত। তাঁহার মুখ হইতেই বেদ নিঃসৃত হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্র বলে। সরস্বতী দেবী বাগ্‌দেবী রূপে কথিত বলিয়া ব্রহ্মার সঙ্গে তাঁহার যুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া মৎস্যপুরাণে সরস্বতীকে ব্রহ্মাপত্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণ যে সর্বপ্রাচীন পুরাণগুলির অন্যতম সে কথা সর্বজন-সম্মত। এইজন্য মনে হয় বৈদিক ব্রহ্মার সঙ্গে বৈদিক সরস্বতীর মিলন ইতিহাস হিসাবে সত্য। কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণুতে প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধের আসনে বিষ্ণু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু যখন ক্রমে ব্রহ্মার সমস্ত সম্মান ও প্রতিপত্তি কাড়িয়া লইলেন তখন তিনি যে ব্রহ্মার পত্নীর উপরও ভাগ বসাইতে সচেষ্ট হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমার মনে হয় প্রকৃত পক্ষে হইয়াও ছিল তাহাই। কারণ এক ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রাচীন পুরাণগুলিতেই দেখিতে পাই বিষ্ণুর পত্নী হইতেছেন পুষ্টি ও লক্ষ্মী। তন্ত্রের মতে ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মী ও বসুমতী; কোথাও সরস্বতী নহেন। সরস্বতীকে পত্নী করিবার লোভ দেখা দিয়াছিল পরে, যখন বিষ্ণু ক্রমে ব্রহ্মার অনেক প্রাচীন কীর্তি নিজে আত্মসাৎ করিলেন। সেইজন্যই আমার এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে ব্রহ্মার প্রতিপত্তি বিষ্ণুর অত্যাচারে কমিয়া আসিল, তখনই সরস্বতী

বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া হিন্দুর মূর্তিমন্দিরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মার আর তখন ইন্দ্রের দরবারে বিষ্ণুর বিরুদ্ধে পত্নীহরণের মামলা করিবার শক্তি ও সাহস ছিল না।

আমরা যে আজকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদের কথা বলিয়া থাকি তাহা শূন্যগর্ভ নহে। লক্ষ্মী ছিলেন বিষ্ণুর আদি পত্নী। সেই হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে ব্রহ্মার এবং তাঁহার পত্নী সরস্বতীর বিবাদের কারণ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু পরে যখন বিষ্ণু সরস্বতীর উপর প্রলুব্ধ হইলেন, তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন তখন লক্ষ্মী যে সরস্বতীর উপর বিরূপ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

একণে তন্ত্রে সরস্বতীর সম্বন্ধে কি আছে দেখা যাক। বৃহৎনীলতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র ও সারদাতিলকতন্ত্র মতে সরস্বতী শিবের কন্যা।

তন্ত্রমতে চণ্ডীপূজায় চণ্ডীর ত্রিভাবে ধ্যান করিতে হয়, তাঁহার তামসী মূর্তি মহাকালী। রাজসী মূর্তি মহালক্ষ্মী, সাত্ত্বিকী মূর্তি সরস্বতী।

কাত্যায়নী তন্ত্রে সরস্বতীর মূর্তি—

গৌরীদেহ সমুৎপন্না, একমাত্র সত্ত্বগুণাশ্রয়া শুম্ভাসুর-বিনাশিনী। তিনি অষ্ট-হস্তা, তাঁহার প্রহরণ বাণ মুষল শূল চক্র শঙ্খ ঘণ্টা হল ও ধনু।

তন্ত্রে বাগীশ্বরী দেবীর মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে, ললাটে তরুণ শশিকলা, শ্বেতবর্ণা শ্বেতপদ্মোপবিষ্টা, হস্তে লেখনী ও পুস্তক—এই মূর্তির সহিত আধুনিক সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে।

তন্ত্রে পারিজাত সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ইনি হংসারূঢ়া শুভ্রবর্ণা। স্মিততরমুখী এবং মৌলীবদ্ধেন্দু লেখা। ইঁহার হস্তে পুস্তক বীণা অমৃতময় ঘট ও অক্ষমালা।

তন্ত্রে মাতৃকাদেবীকেও বাগ্‌দেবতা বলা হইয়াছে। মাতৃকা দেবীর শরীর অকারাদি বর্ণমালাময়। ইঁহার ললাটে চন্দ্র, চারি হস্তে মুদ্রা অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও পুস্তক।

একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় বাগীশ্বরী পারিজাত সরস্বতী ও মাতৃকাদেবী সরস্বতীরই বিভিন্ন মূর্ত্যন্তর মাত্র।

নীলতন্ত্রে তারাদেবীকে নীল সরস্বতী বলা হইয়াছে।

মাতর্নীল সরস্বতী প্রণমতাং সৌভাগ্য সম্পদপ্রদে
প্রত্যালীঢ় পদস্থিতে শিবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবর লোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে
খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥

তিনি—

"বাচামীশ্বরী ভক্তকল্পলতিকে সর্বজ্ঞসিদ্ধিপ্রদে
গদ্যপদ্যপ্রাকৃত-পদ্যজাত রচনা সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদে।"

তাঁহার অর্চনা করিলে—

"—সুরাপি বাচস্পতি।"

এই স্তবের ফলশ্রুতিতে আছে—

লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ ভবেৎ।

আজকাল আমরা যে সরস্বতীর অর্চনা করি তিনি—

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।
শ্বেতাক্ষী শুভ্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারশোভিতা॥

এই সর্বশুক্লা সরস্বতীর পূজা আমরা প্রথমে দেখিতে পাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ে।

এই মূর্তিপরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য আছে, সরস্বতী নদীকে বেদে সর্বত্রই শুভ্রে বলা হইয়াছে। "যশসি ধবলতা বর্ণতে হাস কীর্ত্যোঃ"—যশ হাস্য ও কীর্তিকে শুভ্র বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাই যশ ও কীর্তির মূর্তীভূত দেবী সরস্বতীকে শুভ্রবর্ণা বলা হইয়াছে। হস্তধৃত লেখনী ও পুস্তকের দ্বারা সাহিত্যের চিহ্ন সূচিত হইতেছে। বীণাদ্বারা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সূচনা করিতেছে। পদ্মদ্বারা শিল্পের জ্ঞাপন করিতেছে। পদ্ম কবিদিগের অতি প্রিয় বস্তু। আবার হৃৎপদ্মেরই প্রতিরূপক শ্বেতপদ্ম।

পক্ষান্তরে পদ্ম হংস কচ্ছপের জলের সহিত সম্বন্ধ। বীণার নামান্তর কচ্ছপীযন্ত্র। এইরূপে বৈদিক নদী সরস্বতীর সহিত সামঞ্জস্য স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৩২৯ সালের বৈশাখের প্রবাসীতেও দৃষ্ট হয়:—

"হার্মিস দেবদূত বাগ্মিতার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তিনি বুদ্ধি দেবতা, বীণা বংশী সঙ্গীত কবিতা জ্যোতিষ ও অক্ষরের স্রষ্টাকর্তা। সরস্বতীর সহিত গ্রীক দেবতা হার্মিসের অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হার্মিস পুরুষ, সরস্বতী স্ত্রী। গ্রীকদের জ্ঞান ও শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনা বা মিনার্ভা দেবরাজ জিউসের কন্যা তাঁহার মস্তক হইতে উদ্ভূতা। সরস্বতীও পরমাত্মার মুখোদ্ভূতা। গ্রীক দেবতা আর্টেমিসের সহিত সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে।"

এই সর্বশুক্লা সরস্বতী বাংলার বাহিরে বিশেষ সমাদৃতা নহেন।*

---

* ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে সারস্বত সম্মিলনে পঠিত।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী হিন্দুদের বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালী হিন্দুদের সম্বন্ধে বলিতে চাই এইজন্য যে, ব্রহ্মে অধুনা যে সমস্ত প্রবাসী বাঙালী মুসলমান আছে তাহাদের মধ্যে শতকরা আশী জনই এদেশীয় রমণীদের পাণিগ্রহণ করিয়া "বার্ম্মা মুসলিম" নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। সাধারণের নিকট তাহারা "জেরবাদী" নামে পরিচিত। বাংলা দেশের সঙ্গে তাহারা প্রায় সম্পর্কবিহীন। নিজেদেরও তাহারা বাঙালী বলিয়া পরিচয় দেয় না। তাহারা তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের বর্ম্মী নামকরণ করিয়া থাকে।

বাঙালী হিন্দুরা কিন্তু বহু দিন যাবৎ এদেশে বাস করিয়াও নিজের দেশকে ভুলিতে পারে নাই। কেবল দেশই নহে, আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদেও তাহারা খাঁটি বাঙালীই রহিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সমস্ত রকম পরিবর্ত্তন ও আন্দোলন তাহারা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকে। বাংলাদেশের সৌভাগ্যে তাহারা উল্লসিত হয়—দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হয়। ভারতীয় একাধিক নেতা এদেশ ভ্রমণে আসিয়া বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন, ভারতীয়দের এদেশে থাকিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু প্রবাসী হিন্দুরা নেতাদের এই উপদেশবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারে নাই।

বাঙালী হিন্দুরা অবশ্য বর্ম্মীদের পূজা-পার্ব্বণে, আমোদ-উৎসবে প্রাণ খুলিয়াই যোগ দিয়া থাকে, তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তাহারা সহানুভূতিশীল, তবু বাঙালী বাঙালীই রহিয়া গিয়াছে—বাঙালীত্ব বিসর্জ্জন দিয়া বা বর্ম্মী-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বর্ম্মী বা জেরবাদী হইয়া যায় নাই। প্রবাসী বাঙালী হিন্দুরা যদি ব্রহ্মদেশকেই নিজেদের দেশ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিত তবে হয়ত তাহারা বর্ত্তমানে যে দুর্ভোগ ভুগিতেছে তাহা হইতে রেহাই পাইত কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রীতিই তাহাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে—শুধু বিদেশেই নয়, স্বদেশেও।

প্রধানতঃ চাকুরীর উদ্দেশ্যেই শিক্ষিত বাঙালীরা এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি বহু অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী হিন্দুরাও জীবিকার অন্বেষণে এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাপানী আক্রমণের পূর্ব্বে বাঙালী হিন্দু সন্তানগণ কত বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মধারা যে অর্থোপার্জ্জন করিত তাহা অবগত হইলে বিস্মিত হইতে হয়। বাংলা-দেশের বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে এত অধিক সংখ্যক বাঙালী এত বিভিন্ন প্রকার কার্য্যধারা জীবিকা অর্জ্জন করিত না, বর্ত্তমানেও করে কিনা সন্দেহ। চাকুরীয়াদের মধ্যে হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া পোষ্ট আপিসের ডাকপিওন পর্য্যন্ত বাঙালীদের মধ্যে দেখা যাইত। অ-চাকুরীয়া বাঙালীদের মধ্যে যেমন ছিল ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকীল, তেমনি ছিল ঠিকাদার, দুধওয়ালা, নাপিত এবং আরও কত কি। ব্রহ্মদেশের গত লোক-গণনায় দেখা যায় ব্রহ্মে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষ সতর হাজার আট শ' পঁচিশ। তন্মধ্যে তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার বাঙালী। সরকারী মতে মোট তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাত শ' পঁয়ত্রিশ জন ভারতীয় জাপানী আক্রমণের ফলে ভারতে পলাইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ৩০০২৮৫ জন পুরুষ এবং ৯৩৪৫০ জন স্ত্রী। পথে প্রাণ হারায় দশ হাজার লোক। মাদ্রাজে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা ১৫৩৪৪০, বাংলাদেশে ১২১৬০৯। মাদ্রাজ ও বাংলাদেশের আশ্রয়প্রার্থীরা যথাক্রমে সকলেই হয়ত মাদ্রাজী বা বাঙালী ছিল না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় বাংলাদেশে যাহারা গিয়াছিল তাহারা সকলেই বাঙালী তবে দেখা যায় আড়াই লক্ষের উপর বাঙালী ব্রহ্মদেশেই রহিয়া গিয়াছিল। আমাদের কিন্তু মনে হয় গবর্ণমেন্টের পক্ষে তৎকালীন পরিস্থিতিতে যথাযথ হিসাব রাখা সম্ভবপর হয় নাই। গবর্ণমেন্টের হিসাবের বাহিরেও আরও বহু লোক ভারতে পলাইয়া গিয়াছিল। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল, জাপানী শাসনের প্রথমাবস্থায় তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছিল। এই সময়ে বর্ম্মী গুণ্ডাদের দায়ের আঘাতে বহু লোককে প্রাণ হারাইতে হইয়াছে। দায়ের মুখ হইতে যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহাদের কতককে মরিতে হইয়াছে রোগে শোকে ও খাদ্যাভাবে, আর কতককে বোমা ও মেশিনগানের গুলিতে। কাজেই পূর্ব্বে যেখানে ব্রহ্মদেশের অতি ক্ষুদ্র শহরেও দুই-চারিটি বাঙালী পরিবার দেখা যাইত বর্ত্তমানে সেখানে অপেক্ষাকৃত বড় শহরেও কদাচিৎ বাঙালীর মুখ চোখে পড়ে।

যে সমস্ত বাঙালী সরকারী কর্ম্মচারী বাংলাদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন ব্রহ্ম পুনরধিকারের পর একে একে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেছেন। উকীল, ডাক্তার, ঠিকাদার অনেকেই ফিরিয়া আসেন নাই। ব্রহ্মদেশের প্রায় সমস্ত সহরেই এই সকল ব্যক্তির নিজস্ব বাড়ীঘর ছিল। এইসব বাড়ীঘর বোমা বর্ষণে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কাজেই এই দেশের উপর আর তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই। ইহাদের মধ্যে যে দুই-এক জন ফিরিয়া আসিয়াছে তাহারা রেঙ্গুনেই রহিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুন বড় শহর—অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া পূর্ব্ব হইতেই যাহাদিগকে বিভিন্ন ভাবে রেঙ্গুনের বাহিরে থাকিতে হইতেছে, অথবা বর্ত্তমানে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রেঙ্গুনের বাহিরে যাইতে হইতেছে তাহাদের

অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। ভারত-প্রত্যাগত রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগকে বার্ম্মা রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট তাহাদের দেনা-পাওনা মিটাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই লোকদের বেশীর ভাগকেই, বিশেষ করিয়া যাহাদের বয়স কম—যুদ্ধের সময় ভারতীয় রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট চাকুরী দিয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোকদিগকে বার্ম্মা গবর্ণমেণ্ট ছাড়ে নাই, তিন-চার বছর তাহাদিগকে অর্দ্ধ বেতন দিয়া হাতের মুঠোর ভিতর রাখিয়া দিয়াছে। ইহারাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মুশকিল হইয়াছে ডাক-কর্ম্মচারীদের। তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও এমন স্থানে যাইতে হইতেছে যেখানে পৌঁছিতে রেঙ্গুন হইতে তিন চার দিন সময় লাগে। স্থলপথে কোন কোন স্থানে যাইতে হয়, মাইলের পর মাইল পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে বা মোটর বাসে, জলপথে নৌকায়। এই সমস্ত স্থানের অর্দ্ধ সভ্য অধিবাসীরাই প্রধানতঃ তাহাদের প্রতিবেশী। বাঙালীর মুখদর্শন দূরে থাকুক, দ্বিতীয় কোনো ভারতীয়ের মুখ দেখাও এই সমস্ত স্থানে আশা করা যায় না একটি বিশেষ কারণে এই সকল স্থান বর্ত্তমানে বিপৎসঙ্কুল। পলায়নপর জাপানীরা যে সমস্ত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছিল তাহার বেশীর ভাগই স্থানীয় গুণ্ডাপ্রকৃতি লোকদের হাতে পড়িয়াছে। এই অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে তাহারা যথেচ্ছ লুঠতরাজ করিয়া ফিরিতেছে। পুলিস ইহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্রহ্ম-দেশের বড় বড় শহরে অবশ্য এখনও প্রচুর মিলিটারী মোতায়েন আছে, কিন্তু তাহাদের নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া মনে হয় গুণ্ডাদমন মিলিটারী কর্ত্তব্যের বাহিরে। সুদূর গ্রামাঞ্চল ও অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্যপ্রদেশের ত কথাই নাই—ছোট ছোট পাহাড়গুলিতেও এখন প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইতেছে। অ-চাকুরীয়া অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাঙালী হিন্দুদের আর একটি কারণেও এদেশে টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে যে সমস্ত হিন্দু দুধের ব্যবসা, ক্ষৌরকারের কাজ অথবা অন্যান্য ছোটখাটো কারবার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারাও আস্তে আস্তে হাত গুটাইতে বাধ্য হইতেছে। পূর্ব্বে নাপিতের ব্যবসা বাঙালী হিন্দুদের এক-চেটিয়া ছিল। কিন্তু বিগত যুদ্ধ ব্রহ্মদেশে একটা চমকপ্রদ পরি-বর্ত্তন আনিয়াছে। পূর্ব্বে বর্ম্মীরা ধোপা-নাপিতের কাজ করিত না, বর্ত্তমানে তাহারা ঝাড়ুদার মেথরের কাজ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। পূর্ব্বে দুধ দোহন করিতেও তাহারা জানিত না, বর্ত্তমানে দই ক্ষীর হইতে আরম্ভ করিয়া মিঠাই মণ্ডা পর্য্যন্ত তৈরি করিতে শিখিয়াছে। এই জাতীয় চেতনা অবশ্য শুভ লক্ষণ, কিন্তু জগতের নিয়মই এই এক জনের পক্ষে যাহা শুভ আর এক জনের পক্ষে তাহা অশুভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার উপর বর্ম্মীদের এই জাতীয়তাবোধ অনেকটা যেন বিজাতীয় বিদ্বেষ বা ভারতীয় বিদ্বেষের নামান্তর মাত্র। তাহারা নিজেরা ছোট ছোট কাজ করিতেছে ইহাতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু সমস্যা হইতেছে এই যে তাহারা বে-আইনীভাবে ভারতীয়দিগকে এই ছোট ছোট কাজগুলি করিতেও বাধা দিতেছে। কোন কোন স্থলে তাহা-দের এই ভারতীয় বিদ্বেষ মারাত্মক রূপে আত্মপ্রকাশ করি-তেছে। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও গবর্ণমেণ্ট এদিকে দৃষ্টিদেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। কাজেই যে অল্পসংখ্যক বাঙালী হিন্দু বর্ত্তমানে এই দেশে আছে তাহারাও সরিয়া পড়িবার সুযোগ খুঁজিতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে, আজ যদি বর্ম্মা গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে অর্দ্ধ পেন্সন দিয়াও বিদায় করিতে রাজী হয় তবে তাহারা খুশীমনেই ভারতে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত। বাঙালী হিন্দু কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইবার জন্য যে ব্যগ্র ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এক-যোগে সকলে চলিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট অচল হইবে বলিয়াই হয়ত গবর্ণমেণ্ট ইহা করিতে চাহে না, অথচ এই লোকদের যথোপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থাও ব্রহ্ম-সরকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

বাঙালী সরকারী কর্ম্মচারীদের শতকরা নিরানব্বই জন বর্ত্তমানে ব্রহ্মদেশে স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। বাসগৃহের অভাব, চুরি-ডাকাতির ভয় এবং জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে কারণে স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এখানে থাকা অসম্ভব তাহার মধ্যে প্রধান হইল পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা-সমস্যা।

এ দেশে ভবিষ্যৎ চাকুরীর পথ যখন বন্ধ তখন এদেশের শিক্ষাগ্রহণও নিষ্ফল। পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এহেন দূর প্রবাসে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন বাঙালী হিন্দুর পক্ষে একটা অভিশাপের মত। রেঙ্গুনের বাহিরে কোন প্রবাসী বাঙালী অসুখে ভুগিয়া মরিয়া গেলেও বাংলাদেশে তাহার পরিবারবর্গের নিকট খবর পৌঁছিতে পনর বিশ দিন সময় লাগিবে—অবশ্য খবর দিবার যদি লোক থাকে। বর্ত্তমানে রেঙ্গুন ও মান্দালয়ের মধ্যে গোটা দিনরাত্রিতে মাত্র দুইখানা যাত্রী গাড়ী চলাচল করিয়া থাকে—একখানা যায় মান্দালয়ের দিকে, আর একখানা যায় রেঙ্গুনের দিকে। রেল-লাইনের অবস্থা এতই খারাপ যে গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে, তখন হয়ত সপ্তাহখানেকের মত গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়।

সমগ্র ব্রহ্মদেশে মাত্র চারিটি বড় শহর ছাড়া আর কোথাও এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কাজ আরম্ভ হয় নাই। রেঙ্গুন হইতে কলিকাতাগামী জাহাজ ছাড়িবার কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। ব্রহ্মদেশ হইতে বাংলাদেশে একখানা সাধারণ চিঠি পৌঁছিতে তিন সপ্তাহের মত সময় লাগে—উড়ো জাহাজে লাগে দশ-বার দিন। উড়ো জাহাজে মণি অর্ডার পাঠাইলেও বাংলাদেশে তিন-চারি সপ্তাহের পূর্ব্বে তাহা বিলি হয় না। এই

সমস্ত দুর্ভোগের জন্যই বাঙালী হিন্দু তল্পীতল্পা গুটাইয়া বাংলা-দেশে ফিরিয়া যাইতে চায়। মাসিকপত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙালীদের এই প্রবাস জীবনের গ্লানি হইতে মুক্ত করা যাইবে না জানি তবে যাহারা এককালে ব্রহ্মদেশে ছিলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন এবং আবার ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া ছাড়পত্রের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন তাঁহারা হয়ত ইহা পড়িয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

অলস অশ্রু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কত অজানা ও অচেনার লাগি
করিছি অশ্রুপাত,
বুকে লাগিয়াছে কোন্ সুদূরের
শত ঘাত-প্রতিঘাত।
কেঁদেছি 'ক্রন্তী' ক্রুবেরার লাগি,
বীর 'বোয়ারে'র এত অনুরাগী
পরাধীন দেশে পল্লীবালক
জেগে কাটায়েছি রাত।

এখনও জীবন-সন্ধ্যায় দেখি
বদল হয় নি কিছু।
আঁখি—জার্মানী, জাপানের দুখে
জলভারে হয় নীচু।
সমরনায়কগণের ব্যথায়—
শ্বাস রোধ হয়, বুক ফেটে যায়,
তাদের কঠোর দণ্ডদাতারে
বার বার ডাকি পিছু।

তাদের শোভন সজ্জিত ছবি
মন আলো করি জাগে,
গুরু অপরাধ স্মরণ হয় না
অকারণ ভাল লাগে।
শোভার 'ধাকা'র অসুর কেশরী,
তা দিকেও মোরা নমি' পূজা করি,
ভাদিতে নিষেধ—নিরঞ্জন যে
তারও করি' অনুরাগে।

তেজঃপুঞ্জ যারা মহারথী
হোক না প্রবল অরি,
মরণ তা'দিকে সকল সময়
গৌরবে লবে বরি'।

সত্য বলিয়া করি মোরা জাঁক—
আদিম যুগের, সে আদিম রাগ,
নর জীবণ সেই আক্রোশ—
বেদনায় সাথে মরি।

আদিও যা ছিনু তাই রয়ে গেছি
কেন কাঁদি নাহি জানি?
কোথায় বিপুল বিশ্বরাষ্ট্রে
কোথা এ ক্ষুদ্র প্রাণী?
আদিম যুগের শিশুর মতন—
করি অকারণ অলস রোদন,
চাঁদ ডুবে যায়—শিশু কেঁদে কেঁদে—
তাকে দিয়া হাতছানি।

মেঘমল্লার

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

কখনো বাদল রাতে ঝরঝর বাতায়নে দু'দণ্ড হৃদয় লয়ে
বসেছ কি কেউ?
কাজল মেঘের সনে হৃদয় ভাসায়ে দিয়ে বসে বসে
হৃদয়ের গণেছ কি ঢেউ?
ঝরঝর ঝরঝর বাদলের ধারা সনে ভিজে চলে অবিরাম
নিশীথের বন—
ঝরঝর ধারাসনে নিরজন বাতায়নে ভিজে ভিজে
উঠে নাকি তোমারও মন!

তখন হৃদয় দিয়ে একি ব্যথা, একি জ্বালা,
একি যে সমুদ্র-ঢেউ হৃদয়-বেলায়,
তখন নিরালা ঘরে সাগর-তরঙ্গাঘাতে হায় রে হৃদয় লয়ে
খাকা বুঝি দায়!
কলসী ভাসায়ে জলে সে কোন রাজার মেয়ে সে কবে
আসিয়াছিল প্রাণ-যমুনায়—
বহুদূর বহুদূর সে মুখ ত ভেঙে চুর! তবে ওঠে তবু আঁখি
বোবা-বেদনায়!
যে চাঁদ ডুবিয়া গেছে শাওন-মেঘের তলে,
যে মালা শুকায়ে গেছে মরু সাহারায়
তবু তারি কান্না কাঁদে! কেন কাঁদে? কেন কাঁদে?
উত্তর মেলে না কোন বাদল-হাওয়ায়!

লবণ-ব্যবসায়ের ইতিকথা

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী তাহার প্রয়োজনীয় লবণ নিজেই তৈয়ারি করিয়া লইত; রাজসরকারে হিন্দু রাজত্বকালে কোনরূপ কর সেইজন্য দিতে হইত না। 'নুন-ভাতে'র জন্য কোন কালেই ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী ছিল না, সকলেই স্বাবলম্বী ছিল। মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাট্‌ সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তে সর্ব্বপ্রথম 'নিমক-মহালে'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সময়ে ভারতের যাবতীয় লবণের কারবার জমিদারদিগের দ্বারা নবাবের কর্তৃত্বাধীনেই পরিচালিত হইত (Firminger's Fifth Report, vol II)। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশের হিজলী নামক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইত এবং মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বেও হিজলী লবণ প্রস্তুতের জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। যে সকল স্থানে ভাল লবণ উৎপন্ন হইত না, সেই সকল স্থানে ভাল লবণ প্রেরণের জন্য কাশ্মীরী, শিখ, ভাটিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীবৃন্দ বঙ্গদেশে আগমন করিতেন এবং এই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাদিগের নিকট লবণ বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। শালতী (ছোট নৌকা) করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হিজলী হইতে সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত তৎকালে একটি খাল খনন করা হইয়াছিল; উহা "নিমকীর খাল" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত।

হিজলী ৯৭৫ হিজরি বা ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া 'আকবর-নামায়' লিখিত আছে। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন; বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয়। সেকালের প্রাচীন কাগজপত্রে "হিজলী প্রদেশ হুগলী কালেক্টরীর অন্তর্গত ছিল" বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় (মেদিনীপুরের ইতিহাস)। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মেদিনীপুর ইংরেজদিগের অধিকারে আসে এবং ইংরেজগণ মীরকাশিমকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মীরকাশিম সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা প্রদান করেন। আধুনিক হুগলী ও হাওড়া জেলা তৎকালে বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে রাজস্ব কমিটির নির্দ্দেশানুসারে হিজলী প্রদেশকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি নূতন কালেক্টরী গঠন করা হয় এবং ইহার সাতাশ বৎসর পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ব্বার হিজলীকে হুগলী কালেক্টরীর অধীন করা হয়। পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইহাকে হুগলী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মেদিনীপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তদবধি ইহা মেদিনীপুরের মধ্যেই আছে।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানগুলিতেই যে কেবলমাত্র লবণ উৎপন্ন হইত তাহা নহে; লবণাক্ত ভূমি হইতেও তৎকালে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখের 'সমাচার-দর্পণে' এই সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে উক্ত সংবাদটি উদ্ধৃত হইল:

"কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকাও কূপ হইতে যে জল উঠান যায় সে জল ঐ মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্ত হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলি পরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এইরূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ লোকসান কোম্পানী বাহাদুরের অধীন। অতএব এইরূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির লোকসান হয়।"

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত লবণের উৎপাদন-কার্য্য চলিত এবং যে সমস্ত জমি জোয়ারের জলে ধৌত হইয়া যাইত, সেই সকল জমিতেই ভাল লবণ প্রস্তুত হইত। উক্ত জমিগুলিকে 'চর' বলিত; 'চর'গুলি আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল, উহাকে 'খালাড়ী' বলিত। যাহারা 'খালাড়ী'তে লবণের কার্য্য করিত, তাহাদিগকে জনসাধারণ 'মলঙ্গী' বলিয়া অভিহিত করিত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন যে হিজলীর প্রত্যেক 'খালাড়ী'তে সাত জন করিয়া লোক নিযুক্ত থাকিয়া, গড়ে দুই শত তেত্রিশ মণ করিয়া লবণ উৎপন্ন করিত। লবণ ইজারাদারগণ এই 'মলঙ্গী'দের কিছু টাকা দাদন দিয়া, পরে তাহাদিগকে বেগার খাটাইয়া লইত। নীলকরদিগের অত্যাচারের ন্যায়, এই লবণ ইজারাদারদের অত্যাচারে উৎপীড়িত মলঙ্গীগণ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট আবেদন করে; তিনি লবণের চুক্তির মূল্য বৃদ্ধি ক'রয়া দেন, ফলে "হিজলী ও তমলুকের নিমকমহালে ১৩,৩৮৮ জন মলঙ্গী যাহারা তিন শত বর্ষ ধরিয়া এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে, তাহারা বাঁচিয়া যায়।"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত একখানি সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করেন, উক্ত পুঁথিতেও লবণ ব্যবসায় এবং 'মলঙ্গী' নামটির উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল:

"কোচদামলকে দেশং গায়ন্তি দেশবাসিনঃ।
লবনামাকরস্তত্র তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ। ৪৮
প্রণালী দ্বি ত্রকা তত্র সদা বহতি ভূমিপ।
মালঙ্গণা মনুষ্যাণাং নিবাসং বহতি কিল। ৫০"

মুসলমান রাজত্বকালে লবণের ব্যবসায় জমিদারদের দ্বারা পরিচালিত হইত এবং সরকার হইতে 'মলঙ্গী'গণের বেতন-

স্বরূপ প্রতি এক শত মণ উৎপন্ন লবণের উপর ২২ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক ধার্য্য ছিল। জমিদারগণ উক্ত "মলঙ্গী"দের ছয় মাসের বেতন দিতেন এবং বাকী ছয়মাসের বেতন তাঁহারা নিজেরা গ্রহণ করিতেন ও তাহাদিগকে কিছু আবাদী জমি বিনা খাজনায় ভোগ করিতে দিতেন। বলা বাহুল্য উক্ত আবাদী জমির অর্দ্ধেক ফসল আবার তাঁহারা লইতেন। এক শত মণ লবণ সেই সময় ষাট টাকা মূল্যে মহাজনদিগকে বিক্রয় করা হইত এবং খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা জমিদার ও নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ গ্রহণ করিতেন; 'মলঙ্গী'গণ কেবল খাটিয়াই যাইত (Fifth Report—Firminger vol II)। সেই সময় প্রধান লবণ ব্যবসায়ীগণ "মালীক-উল-তজ্জর" অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের রাজা উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে বাণিজ্যের ফরমান প্রাপ্ত হইয়া কয়েকটি কুঠী স্থাপন করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন সেই সময় খুবই অল্প ছিল বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত লাভার্থে ব্যবসা করিতেন। জমিদারগণ লবণের ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান হন দেখিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারিগণ তৎকালীন নবাবকে বাধ্য করিয়া এই দেশের লবণ, তামাক ও সুপারির সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রচার করেন এবং ক্লাইভ ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতের ডিরেক্টরগণের নিষেধ সত্ত্বেও, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে "ট্রেডিং এসোসিয়েশন" নামে একটি বণিক-সভা, কলিকাতায় স্থাপন করেন। কোম্পানীর সমুদয় ইংরেজ কর্মচারী উক্ত সভার সভ্য হইলেন এবং নিয়ম হইল যে এই দেশে যত লবণ উৎপন্ন হইবে, তাহা প্রতি শত মণ পঁচাত্তর টাকা হিসাবে ইংরেজ বণিকগণকে বিক্রয় করিতে হইবে, পরে বণিক-সভা উহা পাঁচ শত টাকা মূল্যে দেশীয় মহাজনদের বিক্রয় করিবেন; তাঁহারা উহার উপর লাভ রাখিয়া দেশবাসীকে বিক্রয় করিবেন। মহাজনগণ বণিক-সভা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবেন না বলিয়াও নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সম্বন্ধে William Bolts-এর *Consideration on Indian Affairs*" নামক পুস্তক হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল:

"The first was the private monopoly in partnership which commenced in the beginning of June, 1765, between Lord Clive, Messieurs Summers, Sykes and Verelst, each one quarter part for purchasing large quantities of salt that was in the hands of private merchants and in August, 1765, the monopoly of inland trade in salt, betelnut and tobacco was established."

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার জমিদারগণের নিকট নবাব এক পরোয়ানা বাহির করিয়া হুকুম দেন যে, যত লবণ প্রস্তুত হইবে তাহা ইংরেজ বণিক-সভাকে (The English Society of Merchants for buying and selling all the salts, Betel-nut and Tobacco in the Provinces of Bengal, Behar and Orissa) বিক্রয় করিতে হইবে বলিয়া মুচলেকা দিতে হইবে। নবাবের পরোয়ানার অংশ-বিশেষের ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"Until the contracts for salt are settled, no salt shall be made, or got ready in any District; . . . having given a bond, he may then proceed to his business and make salt; but till the bond be given to the Governor and the gentlemen of the Committee and Council, they should make none. Therefore, give your bond and settle your business; and then proceed to the making of salt."—(*Bolts' on Indian Affairs*).

চণ্ডীচরণ সেন লিখিয়াছেন, ইংরেজ বণিকগণ এই নিয়মানুসারে ব্যবসা করায় দেশের সর্ব্বনাশ আরম্ভ হয়; চতুর্দ্দিক হইতে প্রজাদের হাহাকার উত্থিত হয় এবং দেশীয় প্রজাগণের কষ্টের লাঘব করিবার আর কোন উপায় ছিল না। (মহারাজা নন্দকুমার)।

বোল্ট সাহেব লিখিয়াছেন:

"We now come to consider a monopoly the most cruel of its nature, and most destructive in its consequences, to the Company's affairs in Bengal, of all that have of late been established here. Perhaps it stands unparalleled in the history of any government, that ever existed on earth, considered as a public act. . . ."

নবাবের পরোয়ানা অনুযায়ী দেশের জমিদারগণ, কলিকাতার ইংরেজ বণিক-সভায় লবণ প্রস্তুতের জন্য যথারীতি মুচলেকা দেন; উক্ত মুচলেকায় লিখিত ছিল যে বণিক-সভা ভিন্ন আমি কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিব না, যদি প্রমাণ পাওয়া যায় যে ইংরেজ বণিক-সভা ব্যতীত অন্য কাহাকেও লবণ বিক্রয় করিয়াছি, তাহা হইলে প্রতি মণে পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা দিব। নিম্নে উক্ত মুচলেকার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

"I will on no account trade with any person for the salt to be made; and without their order I will not otherwise make away with, or dispose of a single grain of salt; but whatever salt shall be made within the dependencies of my zamindary, I will faithfully deliver it all, without delay, to the said society and I will receive the money according to the agreement which I shall make in writing and I will deliver the whole and entire quantity of salt produced and without the leave of the said Committee, I will not carry to any other place, nor sell to any other person a single measure of salt. If such a thing should be proved against me, I will pay to the Sarcar of the said society a penalty of five rupees per every maund."
—(*Bolts on Indian Affairs*)

ক্লাইভের প্রতিষ্ঠিত বণিক-সভার কার্য্যপ্রণালী ও লবণের একচেটিয়া অধিকার বিলাতে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করিলেন না, বরং বিরক্ত হইয়া তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারিগণকে উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন হইতেছে দেখিয়া, কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর এবং কাউন্সিলের সভ্যবৃন্দ কিছুতেই লবণ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন না। বিলাত হইতে বারংবার লেখা সত্ত্বেও, যখন তাঁহারা এই লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ

করাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা প্রতি মণ লবণ পাঁচ টাকা হিসাবে বিক্রয়ের পরিবর্তে দুই টাকা করিয়া বিক্রয়ের নির্দেশ দেন। কলিকাতার বণিক-সভা অধিকন্তু বিলাতের কর্তাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য, যত লবণ বিক্রয় হইবে, তাহার উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে মাশুল দেওয়া হইবে বলিয়াও স্থির করেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র লবণের মাশুল হইতে ১৩ লক্ষ টাকা কোম্পানীর আয় হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন আইনদ্বারা দেশের জনসাধারণের পক্ষে লবণ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ হয়। নিম্নে কোন্ বৎসরে কোম্পানীর কত রাজস্ব একমাত্র লবণ হইতেই পাওয়া গিয়াছিল, তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

১৭৮০ খ্রীঃ ৪০ লক্ষ টাকা।
১৮১০ খ্রীঃ ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত টাকা।
১৮১২ খ্রীঃ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।
১৮২১ খ্রীঃ ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৮ শত টাকা।
১৮২৬ খ্রীঃ ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা।
১৮২৯ খ্রীঃ ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

হিকি (James Augustus Hickey) নামক এক সাহেব ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র, "বেঙ্গল গেজেট" কলিকাতা হইতে বাহির করেন। তিনি সাধারণ শ্রেণীর লোক হইলেও নির্ভীক ভাবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন এবং লবণ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেও দরিদ্র প্রজাদের হইয়া লিখিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। উক্ত কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকিত 'A weekly political and commercial paper open to all parties but influenced by none.' হেষ্টিংস লবণের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা অর্জন করেন; তিনি হেষ্টিংসকেও আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। হিকির 'বেঙ্গল গেজেটের' প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' বাহির হয়। উহার পরিচালক মিঃ পিটার রীডকে হেষ্টিংস সহায়তা করিতেন এবং রীড সাহেবও হেষ্টিংসের সহিত লবণের ব্যবসা করিতেন, বলিয়া হিকি সাহেব তাহাকে 'বেঙ্গল গেজেটে' পিটার রীডের পরিবর্তে (Peters Nimuk) আখ্যা দেন। মহারাজা নন্দকুমারের জাল মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী কমলউদ্দীন হিজলীর লবণের ইজারাদার ছিলেন। হিকি এবং নন্দকুমারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া, হেষ্টিংসের ষড়যন্ত্রেই যে জাল মোকদ্দমা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত হয় এবং যাহার জন্য তাঁহার ফাঁসি হয়, ইতিহাস পাঠকগণ তাহার ইতিবৃত্ত সবিশেষ অবগত আছেন। হিকি সাহেব নন্দকুমারের ফাঁসীর পর 'বেঙ্গল গেজেটে' লেখেন যে জাল করিবার জন্য ক্লাইভকে 'লর্ড' উপাধি দেওয়া হয়, কিন্তু অদৃষ্টচক্রে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। নিম্নে হিকির কথাগুলি 'বেঙ্গল গেজেট' হইতে উদ্ধৃত হইল :

"Clive was made a peer in England though he committed in Bengal the same crime for which we hanged Maharaja Nanda Coomer."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গবর্ণর হইতে আরম্ভ করিয়া কাউন্সিলের প্রত্যেক সভ্যকে আক্রমণ ও তাহাদের কার্য্যাদি সমালোচনা করিবার জন্য হেষ্টিংস হিকি সাহেবকে ছাড়িলেন না; তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কলিকাতার জেলের মধ্যেই সত্যনিষ্ঠ হিকি সাহেব পরলোকগমন করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। হিকির প্রতি হেষ্টিংসের বিগ্রহের কারণ সম্বন্ধে *Original Inquiry* নামক গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, নিম্নে তাহার মর্ম উদ্ধৃত হইল :

"It cannot be doubted that the files of Hickey's *Bengal Gazette* must throw singular light on the nature of the contentions which then agitated the public mind and the character of the men who then held the highest stations; not without access to such can a just view of that period ever be obtained."

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গের জমিদারগণ বণিক-সভাকে মুচলেকা দিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেন এবং একটি নির্দ্দিষ্ট হারে তাহারা কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে লবণ সরবরাহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় জমিদারগণই লবণের ইজারাদার ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিক্রীত লবণের উপর শতকরা পঁয়ত্রিশ টাকা হিসাবে কমিশন পাইত। উক্ত বৎসর লবণের কমিশন হইতেই কোম্পানী চল্লিশ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল। লবণ ব্যবসায়ের এইরূপ লাভ দেখিয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি লবণ-বিভাগ (Salt-Department) প্রতিষ্ঠা করেন এবং জমিদারদিগকে লবণ প্রস্তুতের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজ হস্তে ইংরেজ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে লবণ-প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করেন। হুগলী, তমলুক, হিজলী ও চট্টগ্রামে কোম্পানীর লবণের এজেন্সী ছিল এবং প্রত্যেক স্থানে লবণ-এজেন্ট (Salt-Agent) উপাধিধারী ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং তাঁহারা কোম্পানীর লবণ ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ব্যতীত উক্ত স্থানের ফৌজদারী মোকদ্দমা বিচার ও রাজস্ববিষয়ক কার্য্যাদিও নির্ব্বাহ করিতেন। এজেন্টগণ কোম্পানীর লাভের উপর শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিশন পাইতেন, পরে তাহা কমিয়া তিন টাকা, শেষে আড়াই টাকা করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। লবণ-এজেন্টদিগের অধীনে কর্ম করিয়া তৎকালে বহু শিক্ষিত বাঙালী প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন; তাঁহারা সাধারণতঃ সেরেস্তাদারী, দেওয়ানী, কেরাণী প্রভৃতির কার্য্য করিতেন। এই সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন—"ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিলেন না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট-বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।" (সেকাল আর একাল, পৃ. ৬৮)

জমিদারগণকে লবণ প্রস্তুত করিতে বঞ্চিত করা হয় বলিয়া, কোম্পানী ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের একটি মাসহারা দিবার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর উক্ত মাসহারার টাকা পরিবর্ত্তিত হইতে থাকায়, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি নির্দ্দিষ্ট জমা ধার্য্য করিয়া সমস্ত 'খালাড়ী' জমি বন্দোবস্ত করিয়া লন। কোম্পানীর দেয় 'খালাড়ী' খাজনা জমিদারদিগের রাজস্ব হইতে বাদ দেওয়া হইত।

এই সম্বন্ধে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দাংশ উদ্ধৃত হইল :

"১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দপ্তরের কার্য্য বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাঁবে হইল কিন্তু ইউরোপীয় এজেণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের সরবরাহকারী কর্ম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের তদারক করিতে লাগিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কার্য্য দুই প্রকারে চলিতেছিল। প্রথমতঃ আজোরা নামক(১) মলঙ্গীদের দ্বারা জবরদস্তিতে নিমক প্রস্তুত করা যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ হইতেছিল। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরা লবণের নিমিত্তে যে মূল্য পাইতেছে তাহার কেবল অর্দ্ধেক মূল্য আজোরারা পাইতেছিল, এবং এই অল্প বেতনে তাহাদের অতিশয় কষ্টে প্রাণধারণ হইতেছিল। ঐ সাহেবদিগের কর্ণগোচর হইল যে হিজলী ও তমোলুকের নিমক মহালে ১৩৩৮৮ পরিজনসমেত আজোরা মলঙ্গীরা আছে এবং তাহারা দুই তিন শত বৎসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে। বিবেচনাকরণানন্তর বোর্ডের সাহেবেরা ইহা ঠাহরাইলেন যে ইহার পূর্ব্বে অল্প মূল্যে নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে ঐ আজোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্করূপে অথবা অতিশয় ন্যূন খাজনায় ভোগ করিল কিন্তু কালক্রমে জমিদারেরা নানা ছলে লবণের মূল্যের কিছু বৃদ্ধি না করিয়া সেই সেই ভূমির খাজনা সম্পূর্ণরূপে ঐ বেচারা মলঙ্গীদের স্থানে লইতে লাগিলেন।

বোর্ড ত্রেডের সাহেবরা ইহা অবগত হইবামাত্র আজোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীদের লবণের তুল্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন এবং অবিলম্বে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবরা গবর্ণমেণ্টকে আরও এই নিবেদন করিলেন যে ঠিকা মলঙ্গীরদের স্থানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে তাহারদের উপযুক্তরূপে গুজরাণ হয় না। ঐ সাহেবেরদের পরামর্শক্রমে নিমকের চুক্তির মূল্য শতকরা ৫৫ টাকা অবধি ৭৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা গেল। নিমকের মূল্য এইরূপে বৃদ্ধি হইলে এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার এবং সরকারেরও লাভ হইল।"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা—১ম খণ্ড)

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের 'পার্লামেণ্টারী-কমিটি' ভারতে লবণ প্রস্তুতের কারবারগুলি তুলিয়া দিয়া লিভারপুল হইতে বিলাতী লবণ আমদানী করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন (ultimate displacement of the Government manufacture by imported salt)। ইহার সাতাশ বৎসর পর, ১৮৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের ছোটলাট স্যর সিসিল বিডনের সময়ে ইংরেজ সরকার এই দেশে লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, বিলাতী লবণ ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। ইংরেজদের লবণের একচেটিয়া ব্যবসা উঠিয়া গেলে কতিপয় দেশীয় ব্যক্তি সরকারকে লবণ-কর দিয়া কিছুদিন এই ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার এই দেশে প্রস্তুত লবণের উপর অধিক কর গ্রহণ করায় বিলাতী লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় কেহই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরিশেষে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত রহিত করিয়া দেওয়া হয়। হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical Account of Bengal (vol. III) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে লবণের ব্যবসায়, এই দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়ায় এই প্রদেশের অধিবাসীদের শ্রী, সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে বাকল্যাণ্ড সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"One of the most important administrative changes of the year 1862-63 was the abandonment by Government of its salt manufacture and its final disconnection with the so-called monopoly. . . . With this object in view, in deciding upon the course to be adopted in the manufacturing season of 1862-63, it was determined that the Chittagong salt agency should be closed; the Hooghly and Tamluk agencies were united under one officer: the manufacture of *karkach* or solar evaporated salt was stopped; and of boiled salt, the manufacture was limited to 9,00,000 maunds. The manufacture of the season was ordered to be closed as speedily as possible, and it was announced that it would not be reopened in the current year. . . . Government thus definitely abandoned a system which, from its first establishment by Lord Clive, in the shape of a pure monopoly, had lasted various modifications almost a century . . ."—(*Bengal Under the Lieutenant Governors*).

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লবণ-কর রহিতকল্পে ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া কারাবরণ করেন; সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন হয় এবং আইন অমান্য পূর্ব্বক লবণ প্রস্তুত করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি কারাবরণ করেন। লবণ প্রস্তুত করিতে খরচ কিছুই নাই বলিলে চলে, অথচ ইংরেজ

---

(১) 'আজোরা' অর্থাৎ যে সব কুলীকে বিনা পারিশ্রমিকে লবণের কার্য্যে বেগার খাটাইয়া লওয়া হইত।—লেখক

সরকার ভারতবাসীকে আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত বা লবণের কারবার নিষিদ্ধ করিয়া দেন। লবণের পাইকারী দর প্রতি মণ পাঁচ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণে দেড় টাকা হিসাবে ট্যাক্স আদায় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রায় আট কোটি টাকা রাজস্ব লাভ করিতেন।

বর্ত্তমান ১৯৪৭ সন হইতে কংগ্রেসের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের মত লবণ-কর ভারতবর্ষ হইতে রহিত হইয়াছে। লবণ-কর রহিত হইলেও লবণ-শিল্প পূর্ব্বে যেরূপ সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ছিল, সেইরূপ এই শিল্পকে সমৃদ্ধিশালী করিতে ভারতবাসীকে সচেষ্ট হইতে হইবে, তবেই ভারতের আর্থিক উন্নতি হইবে এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

অন্ধকারের মানুষ

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

মানী চলতে চলতে পথে থেমে দাঁড়াল। পথের দু-ধারে সবুজ-ঘন লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে টুন্-টুনি পাখীর কিচির-মিচির শব্দ, ছায়া-ঘন বনপথে কলসী কাঁখে কুলবধূর ভীরু কাতর চাহনি, অস্তায়মান সূর্য্যের শেষ তির্য্যক রশ্মির সোনালী আভায় সারা মাঠটা করুণ, অশ্বত্থ গাছের নীচে দিয়ে ফিরছে সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে ঊর্দ্ধমুখী ধেনু—সঙ্গে রাখালছেলে আর তার আড় বাঁশীর মিঠে আওয়াজ। মানীকে যেন কোন এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। মন যেন পাখা মেলে অশ্রান্ত বেগে দুরন্ত ঘোড়ার মত বল্গাছাড়া হয়ে চলে। উঃ—আজ কতদিন এ পথ মাড়ায় নি সে—সেই মা মারা যাওয়ার পর থেকে.. মানীর হঠাৎ মাকে মনে পড়ে যায়।

সেই তার মা—। টুকটুকে রঙ—ছোটখাটো মানুষটি। বড্ড ভাল মানুষ ছিল মানীর মা। ঠাকুরমা তাকে বকত না এমন দিন খুব কমই ছিল। মায়ের ছিল বড্ড শান্ত স্বভাব—আর সব সময়ই এক মুখ হাসি।

ঠাকুরমা বলত—মেয়েমানুষের আবার অত হি হি করে হাসি কি গো—অমন হাসির মুখে আগুন। তিন-চার ছেলের মা হয়ে আবার হাসতে ইচ্ছে হয়, লজ্জা করে না।

সত্যি মানীর মায়ের ওটা ছিল স্বভাব—না হেসে সে এক মিনিটও থাকতে পারত না। তারপর এক দিন সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এল। পাখীরা ভয় পেয়ে কিচিরমিচির করতে করতে আপন আপন বাসায় ফিরল—দু-একটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকতে আরম্ভ করলে, তুলসীতলার মাটির প্রদীপটা দু-এক বার মিট মিট করে নিবে গেল, তবু মানী মায়ের সাড়া পেলে না। ভয়ে মানীর মুখ শুকিয়ে গেল—মানী ডাকল—মা—মা—

ঠাকুরমা বললে—আঃ মর, মেয়ের ঢং দেখ না—সন্ধ্যের সময় অমন গলা ছেড়ে চেঁচাচ্ছিস কেন লা—মা কি যমের বাড়ী গিয়েছে নাকি—মা আঁতুড় ঘরে—

ও—তাই তো, মানীর মনে ছিল না—আবার তার ভাই হবে। রাত্রি ক্রমশঃ বাড়ল। আঁতুড় ঘরের আশেপাশে মানী দু-চারবার ঘোরাফেরা করে গিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে মানী কেবলই ভাবতে লাগল মায়ের কথা—মা তার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মায়ের এই কষ্টটা মানীর মনে ভয়ানক লাগল—কিন্তু উপায় কি।

রাত্রি অনেক। হঠাৎ মানীর ঘুম ভেঙে গেল গোলমাল আর কান্নার চীৎকারে। কি ব্যাপার—হঠাৎ মানী ঠাওর করে উঠতে পারল না। তাদের বাড়ীতে এমন কি বিপদ হতে পারে—যার জন্য চীৎকার আর কান্না আরম্ভ হয়েছে। তবে কি তার ভাই হয়ে মারা গেল—হবেই বা—কিন্তু ঠাকুরমার চীৎকারে তো সে রকম মনে হয় না—ও মা তুমি কোথায় গেলে মা—এ কান্না তো সাধারণ নয়। মানী চোখ মুছে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

তার পর মানী যা দেখল তা আর সে জীবনে কোন দিন ভুলবে না। খাটুলির ওপর মাকে তার শুইয়ে রেখে বাবা মাথায় হাত দিয়ে পাশে বসে। সিঁথিতে সিন্দূরের রেখা তখনও লাল আগুনের মত স্পষ্ট—মুখে সেই প্রশান্ত হাসি। মনে হয় মরবার আগে হেসেছিল, নিটোল গোল মুখের দিকে চাইলে মনে হয়—কথা বুঝি তার তখনও বন্ধ হয় নি, নিপ্রভ দুটো লাল টুকটুকে ঠোঁট, মাথায় একরাশ এলো কালো চুল—পরনে লালপাড় শাড়ী—পায়ে আলতার রেখা।

মানী এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পর মা—মাগো—বলে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কত কান্নাই কেঁদেছিল—কিন্তু তবু তো তার মা—ওর এত কান্নাতেও সাড়া দেয় নি, শুধু ঠাকুরমা ওকে মায়ের বুকের ওপর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর কান্না যেন তার মাকে কোথায় নিয়ে গেল—কোথায় তারা রেখে এল আর জীবনে কোন দিন সে মাকে দেখতে পেল না—মা আর তার ডাকে কোন দিনই সাড়া দিলে না। যে মা তাকে এত ভালবাসত সে মা তার কোথায় গেল—কেন গেল—এ প্রশ্নের কোন উত্তরই কেউ কোন দিন দিলে না।

মানীর সে সব কথা মনে পড়লে আজ আবার নূতন করে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। সেই যে মা তার মারা গেল—তারপর থেকে মানী আর কোন দিন একলা এই রকম ভাবে গাঁয়ের পথে বার হয় নি। মা মারা যাওয়ার পর থেকে ঠাকুরমা সব সময়ে নাতনীকে চোখে চোখে রেখেছেন, কোনখানে বাইরে বিনা কাজে বেড়াতে যেতে দেন নি। তারপর এক দিন সে আগলও ত ভাঙল—মানী তখন যেন পড়ল আরও অতল সমুদ্রে। মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবা তার সেই যে বিছানায় গিয়ে শুল, আজও সে ভাল করে সেখান থেকে আর উঠতে পারল না।

তাই আজ মানীকে অনেক দিন পরে বাইরে বেরুতে হ'ল। বাপ তার শয্যাশায়ী কয়েক মাস ধরে। আত্মীয় বন্ধু বা পাড়াপড়শী কেউ একবার ভুলেও এদিকের ছায়া মাড়ায় না। শুধু গ্রামের বুড়ো কবিরাজ দয়া করে রোজই একবার মানীর বাবাকে দেখে যান। ওই একটি মাত্র লোকের কাছে মানী ঋণী, চিরকৃতজ্ঞ। বাবার সঙ্গে কবিরাজ-কাকার ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। তাই আজও সেই বন্ধুত্বকে অটুট রেখে কবিরাজমশায় কোন কোন দিন দিনে দুবারও আসেন, ভাল করে দেখে যান, ওষুধ দেন—পথ্য দেন। শুধু কি তাই? মানী দিনরাত যখন একা একা বাইরের আলো আর বাতাসের সঙ্গে কথা কয়ে আর হাত নেড়ে আদর করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তাকে একটু সঙ্গ দিয়েও ত কবিরাজ-কাকা কম আনন্দ দান করেন না? সারা দিন একা একা একটা শয্যাশায়ী পঙ্গু লোককে নিয়ে মানী কোন্ আশায় আর কোন সাহসে বাঁচবে।

মানী কবিরাজ-কাকাকে ডাকতে গিয়েছিল। এক একদিন যখন কবিরাজমশায় বাইরে কোথাও যান তখন মানী ভারি একা আর অসহায় বোধ করে। তা ছাড়া বাবা আজ কেমন যেন বেশী রকম হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, বোধ হয় অসুখটা বেড়েছিল। একটানা একঘেয়ে এভাবে বাবা তার বাঁচবে না। বাইরে অজস্র আলো এবং মুক্তির হাওয়া আর তারই সঙ্গে জীবনের উপভোগ্য সব কিছুকে পিছনে ফেলে একটা মানুষ কত দিন এ ভাবে বাঁচতে পারে?

বেলা পড়ে আসতেই মানী ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল বাবাকে। তারপর ওষুধ খাওয়া শেষ হলে মুখটা মানী সস্নেহে মায়ের মত করে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল—এবারে তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর বাবা, আমি ততক্ষণে তোমার বালিটা জাল দিয়ে নিয়ে আসি। মানী কেবল বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল—উঁহু মানু, তুই যাস নে, আমায় ফেলে তুই কোথাও যাস নে মানু—ছেলেমানুষের মত বাবা তার আঁচলটা টেনে ধরেছিল। মানু জানে বাবা এ রকম ছেলেমানুষের মত আবদার সময় সময় করে।

মানী পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। এ কি, বাবা যেন হাঁপাচ্ছে, কি হ'ল। চোখ দুটো যেন ভয় পেয়ে বড় হয়ে উঠেছে—মুখ দিয়ে ভাল করে কথা বেরুচ্ছে না। 'কি হ'ল বাবা' বলে মানু ফিরে তাকাল। বাবা তার দু'হাতে মানুকে আঁকড়ে ধরে—মানুর একটা হাত হাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। মানু দেখেছিল বাবার বুকটা সমুদ্রের মত তোলপাড় করছে—ভিতরে যেন কিসের একটা প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

'শরীরটা খারাপ লাগছে, কবরেজ-কাকাকে ডাকব বাবা? তুমি একটু থাক আমি তাঁকে ডেকে আনি।' আস্তে মানু বাবার বুকে হাত বুলিয়ে কবিরাজ কাকাকে ডাকতে গিয়েছিল—

কবিরাজ কাকা বাড়ী নেই।—মানু বাড়ী আসতে নিজেকে রাস্তার মাঝে যেন হারিয়ে ফেললে। বাইরে মুক্তির এত কোলাহল, এত আনন্দ মানীর কাছে অনেক দিন পরে নূতনের স্বাদ এনে দিলে। ভুলে গেল ক্ষণিকের জন্য বাবা তার বিছানায় পড়ে, ভুলে গেল তাকে এখুনি বাড়ীতে ফিরতে হবে। খাঁচাছাড়া পাখীর মত আনন্দে তার কল্পনাকে অনন্ত আকাশের মাঝে ছেড়ে দিলে। অবাধ মুক্ত হাওয়ায় খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

কোথায় গিয়েছিলে মানু?

মানী চকিতে ফিরে দাঁড়াল।

"ওঃ! আপনি! কবরেজ-কাকা, আমি এক্ষুনি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম—হঠাৎ বাবার অসুখটা যেন বেড়ে উঠেছে। ওষুধ খাইয়ে দেওয়ার পর হঠাৎ কেমন যে হয়ে গেলেন, চোখ মুখ লাল হয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন! আমার কাপড়টা টেনে ধরে বললেন—'আমাকে তুই একলা ফেলে কোথাও যাস নে মানু।' তারপরে আমার হাতটা নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। দেখলাম বাবার বুকটা যেন ধড়ফড় করছে, কি হবে কবরেজ-কাকা, বাবা কি তবে বাঁচবে না"—মানু ছোট্ট মেয়ের মত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে—

আরে না না—কিছু ভয় নেই মায়ুমা—তোমার বাবা দুদিনেই সেরে যাবে, ভয় পাচ্ছ কেন! ছিঃ, কাঁদবার কি হয়েছে—তুমি কিছু ভেবনা মায়ুমা, সব ঠিক হয়ে যাবে। বুড়ো মানুষ কিনা তাই অসুখটা চট্ করে সারছে না—নইলে অমন অসুখ ত আমাদের দুবেলা হয়, কিছু ভেব না তুমি। এত অল্পে ভয় পেলে কি চলে—তুমি বাড়ি যাও মায়ুমা, আমি এখনই যাচ্ছি। অনেক দূর থেকে এলাম কিনা, তাই বাড়ি না গিয়ে ত তোমার ওখানে যেতে পারি না—কিছু ভয় নেই, তুমি যাও—কবিরাজ-মশায় আস্তে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন।

আপনি ত জানেন কবরেজ-কাকা—আমার আর কেউ নেই বাবা ছাড়া। আজ যদি বাবা মারা যান তাহলে আমি কোথায় যাব—আমার যে আর কেউই নেই, আমি যে একা।

কিছু ভয় নেই মা—সব ঠিক হয়ে যাবে, ভগবান আছেন, তাঁকে ডাক, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

আপনি তা হলে তাড়াতাড়ি আসুন কাকা—আমি যাই দেখি গে বাবা হয়ত এতক্ষণে—মানী ভয় ভয় করে পা চালিয়ে দিল বাড়ির দিকে।

মাণীর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সারা আকাশ আর বাতাস জুড়ে রঙের খেলা, দিগন্তপ্রসারী মাঠ শুধু সবুজের বন্যায় টলমল করছে—মাঝখান দিয়ে দিয়ে মেঠো পথ আর আল। নীল আকাশের বুকে সাদা পাখা মেলে রাজহাঁসের ঝাঁক—বুড়ো অশথ গাছে পাখীদের কিচিরমিচির, চারদিক থেকে ঘনিয়ে আসা আলোর মায়া মাণীকে যেন অনেক দূরে টেনে নিয়ে যায়—দুঃখ সুখের বাইরে। মাণীর মনে হয় এখুনি নামবে আকাশ জুড়ে অন্ধকার, এত হাসি আর এত আনন্দ-কল্লোল সব যাবে মুছে। এমনি এক অন্ধকারে তার মা গিয়েছিল পালিয়ে চিরজন্মের মত ফাঁকি দিয়ে। তারপরে চলবে এই একঘেয়ে আর একটানা রাত্রি।

মাণীর চমক ভাঙল। বাবা ছোট ছেলের মত হামাগুড়ি দিয়ে চৌকির নীচের দিকে চলেছে—মানুষ নয়, যেন বিশীর্ণ কঙ্কাল। মানী একরকম দৌড়েই যাচ্ছিল—কেন কিসের জন্য বাবার এত দুঃখ এত কষ্ট—কিন্তু কি যেন ভেবে মাণী হঠাৎ থেমে গেল। যে মানুষটা আপনা থেকে পাশ ফিরে শুতে পারে না—সে মানুষ কেমন করে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে।

মাণী যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না—বাবা তার চৌকির নীচে গিয়ে মাণীর ভাতের থালার ঢাকা খুলে সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে দুহাতে খেতে আরম্ভ করেছে। একমুঠো ভাত পাওয়ায় তার বাবা যেন অমৃত পেয়েছে। পরম উল্লাসে খেয়ে চলেছে মুঠোর পর মুঠো। ভাত নয়, এ যেন অমৃত—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে সে খেতে সুরু করেছে, মানী ভয় পেয়ে গেল।

বাবা! তুমি ভাত খেয়ো না বাবা—তা হলে তোমার অসুখ সারবে না বাবা—। মাণুকে দেখে তার বাবা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। মুখের ভেতরে ভাত, বললে—তুই চুপ কর্ মাণু—আজ আর তুই কোন কথা বলিস নে—উঃ, আর কত দিন এই ভাবে না খেয়ে থাকব বল্ত মাণু,—আমার ক্ষুধা কি দিয়ে মেটে। শুধু একটু বার্লির জল—ওতে যে একটা ছোট শিশুরই পেট ভরে না।

শুকনো ভাত তুমি খেতে পারবে না বাবা—তোমার গলায় আটকে যাবে—তোমার অসুখ আবার বাড়বে—মাণু তাড়াতাড়ি গিয়ে ভাতের থালাটা সরিয়ে নিলে। তার বাবা অসহায় শিশুর মত ক্যাল ক্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু বললে—'বড্ড খিদে মাণু—তুই আমাকে আরও চাট্টি ভাত দে।' শেষে ভাত না পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল বুড়ো।

মাণুও বাবার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার পর তাকে জল খাইয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাইরে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল।

আবার সেই অন্ধকার—আবার সেই একাকিত্ব। এই ভাবে একা একা—শুধু একটা পঙ্গু, চিররুগ্ন কঙ্কালকে নিয়ে তার সারা জীবন কাটাতে হবে—বাইরে এই আলো আর এই বাতাস কোন দিন মাণুকে ডাকবে না খেলা করতে। এই আনন্দময় পৃথিবী থেকে মাণুর চিরনির্ব্বাসন। রাত্রির পর দিন আসবে—গাছে আবার ফুল ফুটবে, আবার পাখীরা গান গাইবে—কিন্তু মাণুর জীবনে কোন দিন আর আলো আসবে না। চির অন্ধকারের মানুষ মাণু, অন্ধকারেই চিরদিনের মত তার সকল আনন্দের সমাধি ঘটবে।

মাণীর হঠাৎ কেন যেন মনে পড়ে গেল—কই এমন তো ছিল না। পাড়ার আর পাঁচ জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সেও এক দিন বনে বনে, আর বাগানে বাগানে বৈঁচির মালা গেঁথে বেড়িয়েছে, মনের আনন্দে সেও খেলা করেছে। পুকুরের ধারে আমগাছের ছায়ায় তলে শুলঞ্চ লতার কোলে বসে কত দিন দোল খেয়েছে। কোথায় গেল সে সব দিন, কারা কেড়ে নিলে সে সব দিনকে, সে কি শুধু স্বপ্নের মত?

ধীরে ধীরে আকাশের কোণে চাঁদ উঠল—চিরদিনের মত দুঃখ আর অন্ধকারকে মুছে ফেলে আলোর বন্যা যেন ভেসে এল। দূরে কোন্ বৃক্ষশাখায় ডেকে উঠল পাপিয়া—মাণী ব্যাকুল হয়ে উঠল। জীবনের এই মধুর স্বাদ থেকে কেন তাকে বঞ্চিত করলে পৃথিবী—কেন তার আনন্দ আর পুলকের মাঝখানে এমন যবনিকা টানলে।

হঠাৎ মাণী ঘরের মধ্যে বাবার কাসির শব্দ পেল। বিরামহীন কাসি—একবার উঠলে আর থামে না। কাসতে কাসতে হঠাৎ একটা অস্পষ্ট চাপা আওয়াজ এল। মাণী ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল। দমকা হাওয়ায় হঠাৎ ঘরের প্রদীপ নিভে গেল।

পশ্চিম ঘাটের প্রান্তে

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

বহুদিন আগের কথা, তখন সবে মহারাষ্ট্রে এসেছি। মহারাষ্ট্রের চালচলন, বেশভূষা, রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক পড়েছিলাম, কিন্তু তখনই প্রথম স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হ'ল। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রে কোলাপুর একটি বড় দেশীয় রাজ্য, সেখানকার রাজা ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর। আমি তখন সেই রাজ্যের রাজধানী কোলাপুর শহরে ছিলাম। কোলাপুর থেকে ৪০ মাইল পশ্চিমে দাজীপুর বলে একটি পার্ব্বত্য গ্রাম আছে; সেখানে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত শেষ হয়ে, গ্রামের শেষপ্রান্ত থেকে সমতলভূমি আরম্ভ হয়েছে এবং তা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম।

এক দিন সেখানে বেড়াতে যাওয়া স্থির হল। আমাদের সব বিষয়ের ভার নিলেন একটি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার। সেখানে জঙ্গলে ষ্টেটের একটি কারখানা আছে, তাতে কাঠ থেকে স্পিরিট, আলকাতরা এসব তৈরি করবার ব্যবস্থা ছিল। সে পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন তার পরিচালক। বনের মধ্যে একটি সরকারী বাংলোতে তিনি বাস করতেন। তাঁর সেই পার্ব্বত্য গৃহে তিনি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করলেন। একটি বড় লরী ঠিক করা হ'ল, আমাদের সঙ্গে তিনি সস্ত্রীক চললেন, আর চললেন আমাদের অপর একটি বিশিষ্ট মারাঠি বন্ধু। যাত্রার প্রথমেই আমাদের সমস্যা দাঁড়াল মহিলাটির সঙ্গে কথা বলা। তিনি মারাঠি ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানতেন না। আমারও মারাঠি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ছিল অতি সামান্য, কিন্তু বলা বাহুল্য, তাতে আমাদের কথাবার্তা আটকায় নি। যেখানে ভাষার অভাব, সেখানে হাত মুখ নেড়ে মূকবধিরের মত মনের ভাবের আদান-প্রদান হতে লাগল।

গাড়ী কোলাপুর শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। অধিকাংশই শুধু ঘাসে ঢাকা পাথুরে জমি, মাঝে মাঝে ছোট ঝরণা। মোটর চড়াই-উৎরাই করে চলতে লাগল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাহাড়ের নীচেকার সহর রাধানগরী দেখা গেল। ছোট জায়গা, পাথরের ঘরবাড়ী, মাঝে মাঝে লাল টালি। সেই শহর পাশে রেখে আমরা পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ পরই দাজীপুরের জঙ্গল আরম্ভ হ'ল। এ জঙ্গল খুব গভীর, এতে বাঘ ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু থাকে। এখানে খুব বৃষ্টি হয়, তাই গাছপালার প্রাচুর্য্য। গাড়ী ক্রমে মাঠ ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরল। সে রাস্তা ক্রমশঃ পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে চলতে লাগল। এই পাহাড়ের চূড়ার উপর দাজীপুর, তার পরেই রাস্তা, তার পরেই রাস্তা পাহাড় বেয়ে নীচের দিকে চলেছে। পাহাড় থেকে নীচে নামবার গিরিসঙ্কটের নাম ফোণ্ডাঘাট। জঙ্গলের পথে কিছুদূর চলে লরী একটি ছোট টিলা থেকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে থামল। সে টিলার উপর ভদ্রলোকের বাড়ী। গাড়ী ছেড়ে পায়ে হেঁটে চললাম। দু'দিকে ঝোপ-জঙ্গল, তারি ভিতর দিয়ে পায়ে চলার পথ। সে পথের কোনদিকে অজস্র গোলাপ ফুটে আছে। ফুলগুলি দেখতে সুন্দর, কিন্তু তাতে কোন গন্ধ নেই। চারদিকে ছোট বড় নানারকম গাছ—শাল আর বাবলা ছাড়া অন্যগুলোকে চিনিই না। এক জাতের গাছের মধ্যে কালো কালো এক রকম ফল ধরেছিল। গৃহস্বামিনী বললেন যে সেই ফলের নাম 'করবন্দ'। আমাদের পেড়ে খেতে দিলেন----বেশ সুস্বাদু, অনেকটা করমচার মত খেতে। কোথাও অজস্র কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ঢেকে আছে, কোথাও নাম-না-জানা কোন ফুল চারদিক আলো করে রেখেছে। মাঝে মাঝে পাখীর মধুর কাকলি শুনা যাচ্ছে। দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ের উপর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে এই অপরূপ সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল।

বেশ খানিকটা গিয়ে তাঁদের বাড়ী পৌঁছলাম। বাড়ীটা অদ্ভুত ঠেকল। জঙ্গলের মাঝে একটা মস্ত লম্বা ঘর, তার ছাউনি খাপরার। দুধারের দেওয়াল কাল পাথরের, দু'পাশ মাটির। এই মাটির দেওয়াল এত সুদৃঢ় যে তা পাথরের দেওয়াল থেকে খুব বেশী নিকৃষ্ট নয়। বাড়ীতে জানালা নেই বললেই চলে। সমুদ্র খুব কাছে, তাই পশ্চিম থেকে বৃষ্টির তোড় আসে, সেই বৃষ্টির জন্যেই বাড়ীর দুটো দেওয়াল পাথরের তৈরি। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এরা ঘরে বেশী জানালা রাখবার পক্ষপাতী নয়। ঘরের সামনে লম্বা বারান্দা—আমরা সবাই শতরঞ্চি পেতে বসলাম।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে করে কোলাপুর থেকে জিনিষপত্র, সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিলেন। এখানে জঙ্গলের মধ্যে কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি চা করে দিলেন, আর দিলেন একটা অদ্ভুত জিনিস—গোলাপের পাপড়ির মোরব্বা। আসবার সময় ঝি জঙ্গল থেকে তাজা গোলাপ পেড়ে এনেছিল। ভদ্রমহিলা গোলাপের পাপড়িগুলো পদ্মার মত চিনিতে পাক করে খেতে দিলেন। বেশ লাগল খেতে।

মহিলাটি রান্না করতে বসলেন। ঝি কুটনা কুটে দিলে। তরকারি সব আলাদা আলাদা রান্না হ'ল; আমাদের মত পাঁচমিশালী তরকারি একটাও হ'ল না। আস্ত বেগুনের ভিতর মসলা পুরে তা দিয়ে "ওয়াঙী ভাত" (এক রকম পোলাও) রান্না করলেন। মারাঠি ব্রাহ্মণরা মাছমাংস খান না। নানারকম তরিকারী রান্না করে বেলা তিনটে নাগাদ খেতে ডাকলেন।

মারাঠি ব্রাহ্মণ-পরিবারে প্রথম নিমন্ত্রণ খাচ্ছি, তাই তাঁদের সমস্ত রীতিনীতি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলাম। খাবার জায়গায় জোড়া জোড়া পিঁড়ি পাতা হল। একটিতে বসলাম, অন্যটার উপর বড় থালা রেখে গেল। জলের গ্লাসের

ঘরলে প্রত্যেকের পাশে এক ঘটি জল, ঘটির মুখে গ্লাসের আকারে বাটি। বড় থালার মাঝখানে অন্ন ভাত বাটির ছাঁচে ফেলে ঠিক বাটির মত করে সাজানো। চার পাশে ডাল, তরকারি, পাপড় আর দইয়ের রায়তা, একটু আচার, ছোট এক বাটি ঘি, এক বাটি দই। সব জিনিস এক সঙ্গে সাজিয়ে দিলে, যে যার রুচিমত খেতে পারে, খেতে বসে কি রান্না হয়েছে ভাববার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। আমি ত বেগুন, পাপড়, চিচিঙ্গা এসব বাজে তরকারী জুটতে দেখে খাওয়া সম্বন্ধে একটু নিরাশ হয়ে গেছলাম, কিন্তু সেই সাধারণ তরিতরকারীগুলো ও সুগন্ধি মসলা আর রান্নার কৌশলে যে কি সুস্বাদু হয়েছিল তা বলবার নয়। পরিতৃপ্তির সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় আহার সমাধা করে আমরা খানিকটা বিশ্রাম করলাম। তারপর রাজীপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোণ্ডা-ঘাটের দিকে চললাম। সে পাহাড়ের উপর আমাদের বিশেষ দর্শনীয় ছিল "লক্ষ্মীতলাও" বলে বিশাল হ্রদ। একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর এই রাধানগরী, দুধারে জঙ্গল, মধ্যে অল্পপরিসর টকটকে লাল রাস্তা। খুব সম্ভব মাটিতে লোহা মেশানো আছে তাই রাস্তা এত লাল। পাহাড়ের উপর সোজা মোটর চলতে পারে না, তাই মোটর চলাচলের রাস্তাটি পাহাড় ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে। আমাদের গাড়ি সাপের মত এঁকে বেঁকে সেই রাস্তায় চলতে লাগল। রাস্তা বন্ধুর আর বিপজ্জনক কোথাও বা একদিকে নিবিড় জঙ্গল, অন্যদিকে গভীর খাদ। চালক একটু অসতর্ক হলেই বিপদের সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সমস্ত রাস্তা কাটল। নানারকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে হ্রদের পাশে এসে পৌঁছলাম। সে হ্রদ প্রাচীন নয়। তার ইতিহাস এই—কোলাপুর রাজ্যে ভাল জমি আছে, কিন্তু জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ভাল নেই। ইঞ্জিনীয়ারের পরামর্শে রাজা স্থির করলেন পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ দিয়ে হ্রদের সৃষ্টি করবেন। বর্ষার জল পাহাড়ের গা বেয়ে বর্ষাকালে হ্রদ ভরে ফেলবে, সেই জল সারা বৎসর কোলাপুর রাজ্যের নানাদিকে সরবরাহ করা যাবে। রাজা তার পরামর্শ অনুসারে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে হ্রদ বাঁধিয়ে দিলেন। রাণীর নামে হ্রদের নাম হল "লক্ষ্মীতলাও", আর রাজকন্যার নামে পাহাড়ের নীচের শহরের নাম হল "রাধানগরী"। রাজার সঙ্কল্প অপূর্ণ রয়ে গেল, কারণ বাঁধ বহু উঁচু করে বাঁধবার দরকার, আর তাতে বিপুল অর্থব্যয়, কিন্তু ফল হয়ত তত কার্য্যকরী নাও হতে পারে। তাই সমস্ত পরিত্যাগ করা হ'ল, কিন্তু যে বাঁধ বাঁধা হ'ল, তার ফলে বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হ'ল।

হ্রদটি ভারি সুন্দর। পার্ব্বত্য পরিবেশের মধ্যে হ্রদের দৃশ্য অতি উপভোগ্য। কালো পাহাড়ের সারি দৈত্যের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে নিবিড় জঙ্গল, সারি সারি অসংখ্য বনপাদপ, আরণ্য বৃক্ষ তাদের অজস্র পুষ্প ও পত্র-সম্ভারে এক নিবিড় মায়া সৃষ্টি করেছে। আর তারি মধ্যে বিস্তৃত প্রশস্ত নির্ম্মলনীল লক্ষ্মীতলাও মৃদু বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। অপরাহ্ণের অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা তার উপর ছড়িয়ে পড়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে। আমরা বহুক্ষণ সে হ্রদের পাশে কাটালাম। হ্রদের পাশে সবুজ মাঠে মোষ চরছে। আশেপাশের লোকেরা হ্রদ থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখান থেকে শেষপ্রান্তে কোণ্ডাঘাটে গেলাম। সেখানে হঠাৎ পাহাড় শেষ হয়ে গেছে, বহু নীচে সমতল ভূমি সুদূরে সমুদ্রের কুয়াশায় ঢেকে আছে।

হ্রদের তীরে ঘোরায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, বাড়ী এসে চা পান করা হ'ল। আমরা দুপুরে অনেক বেলায় খেয়েছিলাম। তাই গৃহকর্ত্রী সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, রাত্রির রান্নাবান্না হবে কিনা। গৃহস্বামী বললেন, "হবে না। কেউ রাত্রে খাবেন না।" এ কথা শুনে আমরাও বললাম, "খাব না।" ক্ষুধা কিন্তু যথেষ্ট ছিল, ব্যাপারটা হয়েছিল—এই ভদ্রলোক সঙ্গে করে কোলাপুর থেকে যে রসদ এনেছিলেন তা সুদীর্ঘ ভ্রমণের পর বুভুক্ষু অতিথিরা দুপুরেই শেষ করে দেয়। জঙ্গলের মধ্যে তো আর কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই এই দুরবস্থা। পেটে ক্ষুধা নিয়ে সবাই যে রকম আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহস্বামিনীকে বললেন, একেবারেই ক্ষুধা নেই, তা দেখে আমার বড় হাসি পেয়েছিল।

সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতির কথা ভুলব না। তাঁরা অতি সাদা-সিধে আর অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা বিদেশী, আমাদের যাতে কিছুমাত্র কষ্ট না হয় তার জন্য তাদের যত্নের অন্ত ছিল না। তাদের দুটি ছোট ছেলে ছিল। এই পরিবারের সব জিনিসই আমার চোখে নূতন। মহিলাটির মাথায় ঘোমটা নেই, পরনে কাছা দেওয়া শাড়ী, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, সহজ সুন্দর গতিবিধি। স্বামী স্ত্রীকে "তারু" (তারাবাঈর সংক্ষিপ্ত রূপ) নাম ধরে ডাকছেন, ছেলে দুটিও মাকে "তারু গো" বলে ডাকছে। ছেলেরা দেখলাম বাবাকে 'কাকা' বলে ডাকে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অন্যেরা যা ডাকে ছেলেরাও তাই ডাকতে শেখে, তাই ওদেশে মা বাবাকে নানাভাবে ডাকা হয়। মাকে ছেলেমেয়েরা কাকী, দিদি, বৌদি, সব কিছু ডাকে। বাবাকে সাধারণতঃ কাকা বা দাদা ডাকে। আমার কাছে এই ডাকবার প্রথা বড় অদ্ভুত আর কৌতুককর মনে হ'ল। আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করলাম, যে সেখানে 'আপনি' সম্বোধনের ব্যবহার অতি বিরল। শুধু বিশেষ সম্মানিতদের আপনি বলে। সাধারণ-ভাবে সম্মানিতদের 'তুমি' বলে, বাকী সব 'তুই'। স্ত্রী স্বামীকে 'তুমি' বলে, ছেলেমেয়েরা বাবাকে 'তুমি' বলে। কিন্তু মাকে 'তুই' বলে, স্বামীও স্ত্রীকে 'তুই' বলে।

সবাই ক্লান্ত। তাই সন্ধ্যার পরই শোবার বন্দোবস্ত হতে লাগল। মারাঠি দেশে লোকে সাধারণতঃ খাট-পালঙ্কে শোয়া

বিশেষ পছন্দ করে না। মাটির উপর মাদুর ও তার উপর মোটা গদি বিছিয়ে বিছানা পাতে। আমাদেরও সেই বন্দোবস্ত হ'ল। মেয়েরা এক ঘরে শুয়েছিলাম, পুরুষেরা পাশের ঘরে। মহিলাটি নানা গল্প করতে করতে বললেন যে, সেখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে। কয়েক মাস আগে তাদের একটা বাছুরকে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে অবশ্য বন্দুক আছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। বাঘের কথা শুনেই ত আমার ভয় লেগে গেল। এ জংলী বাড়ীটা বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার পক্ষে কি পরিমাণে নিরাপদ তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শেষ রাতে হঠাৎ কি রকম একটা চাপা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। আমার শোবার ঘরটা অন্ধকার, কিন্তু পাশের ঘরে লণ্ঠনের আলো, আর লোকের পায়ের আওয়াজ। দরজার ফাঁক দিয়ে একজনের হাতে লাঠিও দেখতে পেলাম। তবে কি বাঘ এসেছে? আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল। শেষটায় কি মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য সৌন্দর্য্য দেখতে এসে বেঘোরে বাঘের কবলে প্রাণটা যাবে। পাশের বিছানায় হাত দিয়ে দেখি মহিলাটিও নেই। আমি নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলাম। পাশের ঘরে হঠাৎ লাঠির ধপাধপ আওয়াজ শোনা গেল, তারপর দুর্ব্বোধ্য মারাঠি ভাষায় কথাবার্ত্তা। আমি চুপ করে পড়ে রইলাম। চার-পাঁচ মিনিট পরে মহিলাটি ফিরে এলেন। আমি জেগে আছি দেখে বললেন, 'যাক্ মারতে পেরেছে।' আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, "বাঘ মেরেছে?" মহিলা তো হেসে কুটি-কুটি। বললেন, "বাঘ কোথায়? চলো দেখে আসবে কি মেরেছে।" পাশের ঘরে গিয়ে দেখি মাটির দেওয়াল খুঁড়ে সুড়ঙ্গের মত হয়েছে, সেই সুড়ঙ্গের মুখে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে নেউলের মত একটা প্রাণী। চেহারাটা দেখতে একটি অতিকায় ইঁদুরের মত। মহিলাটি বললেন এই প্রাণীটার নাম 'ঘুস'। এগুলির উৎপাতে ঘরের মেঝে ও দেওয়াল ঠিক রাখা যায় না, নীচ থেকে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এসে মাটি তুলে সব নষ্ট করে দেয় ও লোককে কামড়ায়। এই জন্তটার জন্যই আমি এত ভয় পেয়েছিলাম ভেবে আমার নিজেরই হাসি পেল।

ততক্ষণে ভোরের আলোয় আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। মোটর লরী এল। আমরা বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমের শেষ প্রান্তের পাহাড়ের চূড়ায় রোদের আভা পড়েছে, দেখা গেল সে চূড়ার উপর একটি মন্দির।—জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কোন দেবতা?' গৃহস্বামী বললেন "এ উনায়া দেবীর মন্দির।" প্রভাতে যখন সূর্য্যের "উগব" বা উদয় হয়, তখন সবার আগে সে চূড়ায় তার রশ্মি পড়ে। তখন দেবতার পূজা হয়। ভোরে পাহাড় বেয়ে উপরে চড়ে গিয়ে সে দেবতার পূজা দিতে হয়।

কল্পনায় দেখলাম, সেই ভোরে সূর্য্যোদয়েঃ সময়ে যে উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াবে, সে পূর্ব্বে দেখবে অনন্ত নীল আকাশ, আর তার নীচে সুদূরবিস্তৃত তরঙ্গায়িত পর্ব্বতমালা; উত্তর দক্ষিণে দেখবে নিবিড় পার্ব্বত্য অরণ্য, আর যদি পশ্চিমে তাকায় তবে দেখতে পাবে যে পাহাড় শেষ হয়ে, জমি হঠাৎ মাইল দুই নীচু হয়ে গেছে, আর তার প্রান্তে কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রবেলা দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আমাদের গতি পূর্ব্বদিকে। আবার আঁকাবাঁকা পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে নীচে নামলাম। তারপর প্রভাতের নির্ম্মল রৌদ্রের মধ্যে মেঠো রাস্তার উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল জনবিরল পথ অতিক্রম করে কোলাপুরে ফিরে এলাম।

বসন্তের গান

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

তরুর রাজ্যে জাগে শিহরণ দখিনা বায়ুর আলিঙ্গনে,
এত কাল পরে এল কি সত্য বহু-চাওয়া সেই নতুন দিন—
নব বাসন্তী হাওয়ায় হাওয়ায় এল কি জয়ের পাখ্না মেলে—
উজান ঠেলে'?

এল কি শান্তি—এল কি তৃপ্তি—এল কি মুক্তি বাধাবিহীন,
এল কি প্রথম কাব্য-চেতনা ঘুমে অচেতন বনের মনে?
গন্ধে গন্ধে বকুল আকুল, বর্ণে আকুল গোলাপ-বাগ,
আম্রশাখায় ধরেছে মুকুল, রক্তনেশায় শিমুল জাগে,
হঠাৎ অজানা আবেগে ব্যাকুল হয়েছে শীতের পত্ররাজ
অকালে আজ,

মাধবীলতার অঙ্গে অঙ্গে নতুন রূপের ভঙ্গী লাগে,—
তরুর রাজ্যে নবজীবনের নবচেতনায় ধরেছে দাগ!

তবু তুমি কেন পত্রবিহীন, বর্ণহীন হে বনস্পতি?
এখনো ঘুমাও শতরূপা এই কুসুমের মাসে নিম্ফুল,
দূরের আকাশে চেয়ে চেয়ে আছো ভূতের মতন কেন ঝিমাও?
ফুল ফোটাও,—

রামধনু রঙে রেঙে যাক্ আজ বনীকাননের মনোহফুল,
মুছে যাক্ সব কঠিন মাঘের অতি অকরুণ যা কিছু ক্ষতি।
নতুন আলোর চুম্বনে আর মধু বাতাসের স্পর্শ লেগে
রয় না ক' যেন বাকী আর কোনো অতীত ক্ষতির অসহ জ্বালা;
বনস্পতি গো, ঘুম ভেঙে আজ জেগে ওঠো শ্যাম আড়ম্বরে,
শাখার 'পরে

আশা-বিহঙ্গ মধু রাগিণীতে বিজয় গানের ধরুক পালা,
নব বসন্তে বনের সভায় বনস্পতি গো, ওঠো না জেগে।

হিটলার ও চার্চ্চিলের পতন

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান বিশ্বরাজনীতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা পাশাপাশি থাকিয়া ইতিহাসের গতি নির্দ্ধারিত করিতেছে। উহাকে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের দুইটি দিক বলা যায়: একটি হিটলারের এবং অপরটি চার্চ্চিলের পতন। হিটলারের পতনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অর্দ্ধ সাফল্যে নাৎসী সাম্রাজ্যের বিপর্য্যয় এবং চার্চ্চিলের পতনে মামুলী সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ সূচিত হইতেছে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি অন্ত শক্তিগুলিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতেছে এবং একাধিপত্য-স্থাপন দ্বারা অন্যান্য ক্ষুদ্রশক্তিগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা এখন বিশ্বরাজনীতির কর্ণধার তাঁহারা যদি এখনও ঐ দুই পন্থাই অনুসরণ করিতে থাকেন, তবে বিশ্ববিপ্লবের দ্বিমুখী গতি যে ব্যাহত হইবে সেরূপ লক্ষণও কতকটা দেখা যাইতেছে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের কার্য্যাবলীর উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের সহিত সমন্বয় রাখিয়া আমাদের দেশের ব্যক্তিগণের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বিচার করা দরকার। রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৫ সন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। যুদ্ধ-পরিচালনে সফলকাম নেতা হইলেও তিনি তাঁহার চিরাভ্যস্ত সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিত্যাগে অনমনীয়। ইহার বিরোধিতার জন্য আমূল পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষী হিটলারের আবির্ভাব হইল। বলপূর্ব্বক চাপানো ভের্সাই সন্ধির চুক্তিগুলির বিলোপ সাধন করিয়া জার্ম্মানীকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জার্ম্মান জনগণ হিটলারকে তাঁহাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

হিটলার ও চার্চ্চিলের পতনের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে আমাদের মনে সর্ব্বপ্রথম যে প্রশ্নগুলির উদয় হয় তাহা এই: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ বা জনযুদ্ধের যুগ শেষ হইয়াছে কি? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ তাহাদিগকে বাধা দিতে পারিবে কি? আণবিক বোমার আবিষ্কার এবং বিশ্বনিরাপত্তা-পরিষদ উহাতে বাধা জন্মাইতে পারিবে কি? যদি শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নৈতিক শিক্ষা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত না হয়, যদি বৃহৎ জাতির জনগণের ভীতি ও নৈরাশ্য বিদূরিত না হয়, যদি এমন একটি বিশ্বমঙ্গলকামী অদম্য শক্তির আবির্ভাবে পূর্ব্ব নীতিজ্ঞান ও উচ্চাভিলাষ সংযত না হয় তাহা হইলে আমরা পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিলুপ্তির আশা করিতে পারি না।

হিটলার ও চার্চ্চিল উভয়েই প্রথমে সাধারণ সৈনিক ছিলেন। উভয়েই নূতন জগতের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া মান্ধাতার আমলের শাসন ও দমননীতি প্রয়োগে সকলকে দাবাইয়া রাখিতে ইচ্ছুক; উভয়েই যুদ্ধপ্রিয় এবং জীবনের সুরু হইতেই দুর্ব্বলকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন। উভয়েই ট্যাঙ্ক, বোমাবর্ষী বিমান, কামান ও বোমাকে সংগ্রাম-বিজয় ও ক্ষমতারক্ষার অস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। নিজ নিজ দেশে তাঁহারা স্বজাতীয়দের মঙ্গলসাধন ও নিরাপত্তা-রক্ষাই প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন; পররাষ্ট্রের প্রতি মামুলী শাসন ও ক্ষমতা-প্রাধান্য স্থাপনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্বদেশে তাঁহারা আভিজাত্যপূর্ণ রক্ষণশীল একনায়কত্ব এবং বিদেশে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে জাতীয়তাবাদসমর্থক সাম্রাজ্যবাদী শাসন চাহিতেন। সর্ব্ববিষয়ে সংগ্রাম, বিজয় ও অপরের অধিকার-হরণ-নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের কৃষ্ণকায় ও অনুন্নত জাতিগুলির মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের ভাব গ্রহণে সক্ষম কয়েকটি বাছাই-করা জাতি ও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পরিবার থাকিবে-- এইরূপ কতকগুলি নীতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহিমাকীর্ত্তন এবং পরদেশ আক্রমণাত্মক দুঃসাহসিক কার্য্যের গৌরব করিতেন। বংশগত জাতীয়তাবাদ ও শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের সুষ্ঠু কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান ভগবানে যথেষ্ট বিশ্বাস রাখিতেন এবং আরও বিশ্বাস রাখিতেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ রক্ষণাধীনে আছেন। ইউরোপে কর্ত্তৃত্ব ও বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব লাভেচ্ছায় দিগ্বিজয়ীর সুযোগ-সুবিধার দাবি বলবৎ রাখিতে চাহিতেন। অন্যের কৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রমের উপর তাঁহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উপনিবেশ স্থাপনের ইচ্ছায় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থানে,—অপরের দেশ ও দ্বীপসমূহ, মহাসাগরের উপকূলস্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত দেশ, ঘাঁটি, রাস্তা ও অবস্থান-স্থল অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেন এবং আবশ্যক হইলে 'রণং দেহি' ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা স্বদেশে সাম্যবাদ এবং বিদেশে জাতীয়তাবাদবিরোধী। তাঁহারা নিজেদের ভাগ্যবান ও ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা উভয়েই যে দুই প্রকার নীতিবাদের সমর্থক তাহার একটি হইতেছে—স্বজাতির মঙ্গলসাধন ও নিরাপত্তাবিধান এবং অপরটি বিজিত ও অ-শ্বেতজাতির শাসন-সংরক্ষণ এবং কল্যাণ বিধান। কিন্তু তাঁহাদের রাজনৈতিক সীমাবন্ধন ও লক্ষ্যবস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল; সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালীও বিভিন্নমুখী। চার্চ্চিলের সম্পাদ্য বিষয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষা-ব্যবস্থা আর হিটলারের লক্ষ্য ছিল জার্ম্মানগণের মুক্তি ও ঐক্যসাধন। রাজনৈতিক জীবনে উভয়েই সুপরিচিত। উভয়েই কিছু পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, কতক পরিমাণে ব্যর্থ-মনোরথও হইয়াছেন। চার্চ্চিলের জীবনদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ আর হিটলারের আকাঙ্ক্ষা হইতেছে উন্নত ধরণের বংশপরম্পরাগত জাতীয়তাবাদ।

হিটলার ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক-বাণী প্রচারে তৎপর ছিলেন এবং অপরাপর অনুন্নত জাতিগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে একই ব্যক্তির ও একই রাষ্ট্রের অধীনে একত্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি জার্ম্মান উপনিবেশগুলি পুনরুদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব-ইউরোপে বসবাসের উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে এবং সমগ্র ইউরোপকে জার্ম্মানীর কর্তৃত্বাধীনে আনিতে চাহিয়াছিলেন। হিটলারের দৃষ্টিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেকার জার্ম্মানী বহির্বিশ্বের উপনিবেশ-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল ; ভের্সাই চুক্তিতে স্বকীয় রাষ্ট্রগুলির উপর আধিপত্য, ঔপনিবেশিক অধিকার ঐশ্বর্য্য, মানমর্য্যাদা, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। জার্ম্মানী বহুধাবিভক্ত, নিরস্ত্রীকৃত, অধঃপতিত ও চতুর্দ্দিকে শক্তিশালী শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ভের্সাই চুক্তির বিলুপ্তি, জার্ম্মানজনগণকে একত্রীকরণ, শ্রেণীগত ও দলগত বৈষম্য দূরীকরণ, রাষ্ট্রের অধীনস্থ রাজ্যগুলি ও শিল্প-গুলির উচ্ছেদসাধন, বিদেশী ও অকেজো লোকদের বিতাড়ন, খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা যথোপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান জাতির সামাজিক ও শৈল্পিক জীবনের উৎকর্ষসাধনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতারক্ষার প্রতিশ্রুতিতে সৈন্যদলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা এবং উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাই তাঁহার বিপ্লবের আদর্শ ছিল। বর্ত্তমানে কোন বাস্তববাদী ঐতিহাসিকই এই মত পোষণ করিবে না যে, জার্ম্মানী সমগ্র বিশ্বে কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য ১৯১৪ সনে একটি বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে নিজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং অপরকেও প্ররোচিত করিয়াছিল। সুতরাং হিটলার যে মূল-নীতি যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভের্সাই সন্ধি জার্ম্মানীর পক্ষে নিতান্ত অপমানকর ও অসঙ্গত হইয়াছিল।

যাহা হউক, চার্চ্চিল বরাবরই ইউরোপে শক্তিসাম্যনীতি রক্ষার জন্য জার্ম্মানীকে বিভক্ত, শত্রুপরিবেষ্টিত ও শক্তিহীন করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ইঙ্গ-ফরাসীর অনুকূলে সার্ব্বভৌম প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ভের্সাই চুক্তির ফলে ইউরোপের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে তিনি জার্ম্মানীর দুঃখদুর্দ্দশা কতকটা লাঘব করিবার পক্ষে ছিলেন। ব্রিটিশসাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপর একই অবস্থায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। আধুনিক একজন দুর্য্যোধনের মত তিনি জার্ম্মান উপনিবেশগুলি কোনক্রমেই ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার রক্ষণশীল অর্থনৈতিক আদর্শ ও পরিকল্পনার জন্য তিনি রাশিয়া, জার্ম্মানী, তুরস্ক ও জাপানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য পদানত দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দানের বিরোধী ছিলেন। তথাকথিত হীন ও অনুন্নত জাতিগুলিকে চিরতরে ব্রিটেনের অভিভাবকতায় ও শাসনাধীনে রাখাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

যাহা হউক, হিটলার একটি নূতন সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিবার পর ক্ষমতা হাতে পাইয়া অপরাপর সমস্ত দল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। হিটলারের এই নাৎসী সমাজতন্ত্রবাদ চার্চ্চিলীয় টোরী গণতন্ত্রবাদেরই অনুরূপ ছিল। চার্চ্চিলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কৌশল সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সমতুল্য। তিনি কোন নির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন না এবং কাহাকেও আক্রমণ করিতে নিরস্ত হইতেন না।

হিটলারের পতন কোন আভ্যন্তরিক বিপ্লবের দরুণ ঘটে নাই ; তাঁহার পতনে ইউরোপীয় ঐক্যের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে, ইহার কেন্দ্রীভূত স্বাধিকার এবং পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি বিনষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে আবার সংকীর্ণ উচ্চাভিলাষ ও পৃথক আদর্শবাদমূলক জাতিগত দলাদলি দেখা দিয়াছে। ইহা পুনরায় প্রাচীন গ্রীস ও আধুনিক বলকান রাষ্ট্রগুলির মত ভৌগোলিক সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু হিটলারের পতনের ভিতর দিয়া বিশ্বের অপরাপর অংশে প্রভুভৃত্য-সমাজের বংশগত শাসনপদ্ধতির ধারা বেমালুম অদৃশ্য হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে চার্চ্চিলের পতন হইয়াছে। বহির্জ্জগতের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কে ও যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন বটে, কিন্তু স্বদেশে তিনি শ্রমিক-দল কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন। জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর তাঁহার সামরিক একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটিয়াছে।

চার্চ্চিল যুদ্ধপ্রিয়, শান্তিকামী নহেন। মন্ত্রী ও রাজনীতিক রূপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে সামাজিক সংস্কারে তিনি প্রশংসা-ভাজন হন নাই। ব্রিটিশসাম্রাজ্য রক্ষায় এবং তাহার অনুকূলে যুদ্ধ পরিচালনায় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহে ও দলগঠনে তাঁহার সমস্ত উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল। হিটলার ও চার্চ্চিল,—তথা জার্ম্মানী ও ব্রিটেনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জার্ম্মানীতে জার্ম্মানজাতির সাম্রাজ্যশাসন-শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে আলোচিত, যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, প্রচারিত এবং সর্ব্বশেষে রণক্ষেত্রে শক্তিপরীক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে ঐ একই সত্য অতীত ইতিহাসে সপ্রমাণিত ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া জনগণের মধ্যে বিনা আলোচনায় নীরবে গৃহীত হইয়াছে। জার্ম্মানী উহা নূতন রণকৌশলদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল আর ইংলণ্ড ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ, পররাজ্য জয়, উপনিবেশ স্থাপন ও দেশ অধিকারদ্বারা উহা প্রমাণিত করিয়াছিল।

ইহা সকলের বোধগম্য নহে যে, ভের্সাই সন্ধি যেরূপ জার্ম্মানীর জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের, এমন কি উহার নিরাপত্তা ও মর্য্যাদার পক্ষেও বিপজ্জনক হইয়াছিল, আগাদির সন্ধিও ইংলণ্ডের পক্ষে পরিণামে সেইরূপ হইয়াছিল। আগাদিরও ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে, উহা জার্ম্মানীরই অন্তর্ভুক্ত

ছিল। জার্মানীকে দুর্ব্বল ও হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইংলণ্ড তাহাকে তাহার সমস্ত উপনিবেশ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। এ তুলনা ছাড়িয়া দিয়া মানবতার দিক দিয়া ধরিলেও হিটলারের পতন আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যক্রম প্রবল অত্যাচারমূলক ছিল। ইহুদী, অ-নাৎসী, সাম্যবাদী ও অপরাপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার যে অপরাধ তাহা সমগ্র ইউরোপের মানবতা এবং মানবোচিত নীতিজ্ঞানবিরোধী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অশ্বেত ও বিজিত মানবগোষ্ঠির দিক দিয়া ধরিলে চার্চ্চিলের পতনও তুল্য অর্থবোধক। ১৯৪২ সনে, তৎপূর্ব্বে ও পরবর্ত্তী সময়ে চার্চ্চিলের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালে ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের নৃশংসতা হিটলারের বিজিত দেশসমূহে তাঁহার কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের তুলনায় ন্যূন নহে। ঐ সমস্ত উৎপীড়নের কাহিনী ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে। সাম্রাজ্যের মধ্যে চার্চ্চিলকে কোনও যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হইতে হয় নাই বটে, কিন্তু নথিপত্রে তাঁহার কোন উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকাশ পায় নাই।

হিটলারের অভ্যুদয়ে ও শাসনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পৃথিবীর নৈতিক মানচিত্র তথা বিশ্ব-ইতিহাসের ধারাই বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত ও অনুভূত হইতে পারে না বটে, কিন্তু এমন এক সময় আসিবে যখন ইহা ইতিহাসে অর্থপূর্ণ ও ধারাবাহিক ঘটনায় পরিণত হইবে। মিত্রপক্ষের সাফল্যের ফলে জার্ম্মানী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছে। কিন্তু চার্চ্চিলের অভ্যুত্থান ও শাসন-পরিচালনায় তাঁহার দেশে সামাজিক মঙ্গল বা সংস্কারের বংশানুক্রমিক উপায় বিধান করা হয় নাই। যুদ্ধের পটভূমিকায় তিনি যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার একমাত্র দান। যাহা হোক, জার্ম্মান ঐক্য, অর্থনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা-সংস্কার, নব নব সামরিক অস্ত্রশস্ত্রাদি আবিষ্কার ও সংগঠনের যে ধারা হিটলার রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিতে গভীর অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন। অধিকারচ্যুত জার্ম্মান উপনিবেশগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জার্ম্মান জনগণের মন হইতে নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভীতি বিদূরিত করাই ছিল তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে প্রধান। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁহার ঐ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং বিশ্বজগতের বিরোধিতায় তাঁহার পতন ঘটিয়াছিল।

জার্ম্মানীর তৎকালীন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক এবং লক্ষ্যের অনুপ্রেরণায় কেবলমাত্র সময়ের সুযোগ গ্রহণ করায় হিটলার কি এক জন দুঃসাহসিক বীর ও অত্যাচারী দস্যুরূপে পরিণত হইয়াছিলেন, না বাস্তবিকই তিনি জার্ম্মানীর একজন কল্যাণকামী ব্যক্তি ছিলেন? যদি আমরা এই যুক্তি ধরিয়া লই যে ভের্সাই সন্ধি, রুশবিপ্লব এবং রাজনীতি জার্ম্মানীকে "একতা-বদ্ধ হইব অথবা ধ্বংসবরণ করিব" এই নীতি গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহা হইলে জার্ম্মানীর উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়িয়াছিল, হিটলারের অভ্যুত্থান ও শাসনাধিকার তাহারই যুক্তিসঙ্গত ফল। তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য সাধন, জাতির পুনরভ্যুত্থান, শিক্ষা, সৈন্যদলগঠন ও শিল্পবিজ্ঞান-চর্চ্চা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মন কেবল যুদ্ধপ্রবণ ছিল না, তাহা জাতিগত স্বদেশহিতৈষণায় পূর্ণ ছিল। সুতরাং জার্ম্মানীর জাতীয় ইতিহাসে হিটলারের বিপ্লবাত্মক নীতি উহার জনগণের জীবনে নূতন শক্তি ও সম্পদ আনয়ন করিয়াছিল। এইরূপে উহার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে একটি নূতন পন্থার উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বিজয়ী হইলে ইউরোপে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সমর্থ হইতেন; কিন্তু মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় এবং আন্তরিক মিলনসাধনে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। ঐ ভিত্তির উপর পরবর্ত্তী যুগে হয়ত ইউরোপে নব নেতৃত্ব ও উচ্চ আদর্শবাদ, সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্ভব হইত। এ সম্বন্ধে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ বলেন,

"১৯১৮ সনে জার্ম্মান বিজয়ের পর জার্ম্মানীর যুদ্ধবন্দীদিগকে যেরূপ সযত্নে স্বাতন্ত্র্য করা হইয়াছিল জার্ম্মান জাতির প্রতিও যদি মিত্রপক্ষ সেইরূপ করিতেন এবং বিজয়ের অপব্যবহার না করিতেন তবে এতদ্রুপ হিটলারের অভ্যুত্থান অসম্ভব হইত। আমরা এবং আমাদের মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মানীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া আনিয়া এবং হিটলারকে এরূপ শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়া নির্বুদ্ধিতা ও কাপুরুষোচিত কার্য্য করিয়াছি। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়াই হিটলার তাঁহার দেশের জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

জার্ম্মানীর ধ্বংস বিশ্ব-পটভূমিতে একটি বিয়োগান্ত ব্যাপার। সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পে গরীয়ান্, স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপ্ত ঐক্যবদ্ধ আট কোটি নরনারী অধ্যুষিত বিরাট্ দেশ। এই আট কোটি লোককে স্থায়ীভাবে নিপীড়িত বা পদানত করিয়া চতুঃশক্তি কি ইউরোপে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা, শান্তি ও মঙ্গল বিধান করিতে পারে? সমস্ত ইউরোপকে সমষ্টিগতভাবে ধরিয়া তাহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলি মানিয়া লইতে হইবে ও উহার সমাধান করিতে হইবে। অতীতে বহুবিধ কারণে জার্ম্মানী নানা দুর্ভোগ ভুগিয়াছে। তাহার ভৌগোলিক অবস্থান ইউরোপের কেন্দ্রে হওয়ায় এবং কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা না থাকায় বৈদেশিক আক্রমণকারিগণও তাহার ভিতরকার রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পায়। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং রোম সাম্রাজ্যের সহিত দীর্ঘকাল নানাবিষয়ে বিজড়িত থাকায় তাহার স্বার্থ এবং নেতৃত্বও ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে।

গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের যুগে রাজনৈতিক একতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রুশিয়া তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার প্রগতিশীল বিজ্ঞান ও শিল্পের সাহায্যে সে যে গভীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দুঃসাহসিক কার্য্যের অধিকারী হইয়াছিল তাহা তাহার গৌরবের বিষয়। তাহার শক্তি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ঈর্ষা ও ভয়ের কারণ হওয়ায়

১৯১৯ সনে উহারা প্রুশিয়ার ভাবাবস্থার জন্ত দায়ী হইয়াছিল। শান্তিকালে তাহার উপর যে সর্ত্ত আরোপিত হইয়াছিল তাহাতে তাহার দেশের কোন কোন অংশকে পররাজ্যভুক্ত, পরপদানত, নিরস্ত্রীকৃত ও ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা হইল। অধিকন্তু তাহার উপনিবেশসমূহও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া ফরাসী ও ইংলণ্ড পরাজিত জার্ম্মানীর প্রতি এমন ব্যবহার করিয়াছিল যে পরিণামে জার্মান-জাতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কার্থেজেনীয় শান্তির ফল এই হইয়াছিল যে, সমস্ত ইউরোপে ভীতি, সন্দেহ, পরাজয় ও আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও জাতিসমূহের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির নূতন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছিল তথাপি লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ লইতে, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ ও জার্ম্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করিতে ত্রিশক্তির বলদর্পিত নীতি প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বৃহৎ শক্তিগুলির জাতীয় স্বার্থ অব্যাহত রাখিতে এবং তাহাদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিতে ইহা কেবল ছদ্মবেশরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার অনুমোদন নিরর্থক হইয়াছিল। শান্তি বৈঠকের সদস্যেরা ইহার আদর্শ ও মূলনীতিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সন্ধিচুক্তি এবং জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশাবলী নিয়মানুগ হইতে পারে নাই। আন্তর্জ্জাতিক-সঙ্ঘ জাতীয় বিদ্বেষ-দ্বন্দ্বের কাছে মাথা নত করিয়াছিল। শক্তিসাম্যের মূলনীতি, বিভেদ, জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সর্ব্বময় শক্তি পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান ছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রায় সমস্ত উপনিবেশ গ্রাস করিয়া কেলায় ইউরোপ ও এশিয়ায় ছোট ছোট দেশ ও জাতির মধ্যে সীমা নির্দ্ধারণের গোলযোগ পাওয়া গিয়াছিল।

১৯৪৫ সনের পটসডাম চুক্তিটি কার্থেজেনীয় সন্ধিপত্র। ইহা কোন প্রণালীবদ্ধ সন্ধিপত্র নহে, ইহা জার্ম্মানীর মৃত্যুবাণস্বরূপ। ইহাতে তাহার দেশগুলি বিভক্ত ও পদানত করা হইয়াছে। তাহার স্বায়ত্ত শাসন, কেন্দ্রীয় শাসন, আর্থিক সংস্থান বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম, গবেষণাগার ও যন্ত্রপাতি হস্তচ্যুত হইয়াছে। তাহার বৈজ্ঞানিকদিগকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার সৈন্যগণকে নিরস্ত্রীকৃত ও পদানত করা হইয়াছে। এইরূপে তাহাকে জনশূন্য ও ধনৈশ্বর্য্যে বঞ্চিত করিয়া একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা হইতেছে। ইহা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৮১৫ সনের ভিয়েনা চুক্তি, ১৮৭৮ সনের বার্লিন চুক্তি এবং ১৯১৯ সনের ভের্সাই চুক্তি কোন স্থায়ী শান্তির দিকে ত পরিচালিত হয়ই নাই, এগুলি কেবলমাত্র বিশ্বব্যাপী বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটাইয়াছিল। শান্তি সংস্থাপনে হলি এলায়েন্স, গ্রাণ্ড এলায়েন্স, মহাদেশিক সংযোগ, আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদ এবং জাতিসঙ্ঘ ব্যর্থকাম হইয়াছে। এখন এই ১৯৪৫ সনের নূতন বিজয়-চুক্তি এবং স্বাধীনতা-সনদও উপযুক্ত সুখশান্তি আনিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কোন শান্তিচুক্তি ও আনুষঙ্গিক আদর্শের পরমায়ু মোটামুটি বিশ বৎসরের বেশী নয়। যত দিন না একটি ঐক্যবদ্ধ শাসনশক্তি ও সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শবাদ দেখা দিবে তত দিন যুদ্ধ ঘটিবেই। কার্য্যকরী শান্তিচুক্তি ও আদর্শ শান্তিচুক্তির মধ্যে আধিক বাধাবিঘ্ন দৃষ্ট হয়। ইহা সাময়িক ভারসাম্যনীতি বজায় রাখিয়া চলিতে পারে না। এইরূপ নীতিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে প্রাচীন জার্ম্মানীর সংস্কার সাধিত হইবে না। হয়ত এখন সে অধোগামী হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা সাময়িক। তাহার দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য্য এখনও রহিয়াছে। তাহার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা তাহার নৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। জার্ম্মানীর ও জনগণের প্রতি আনুরক্তি সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র জাতি ও দেশ লইয়া কোনমতে টিকিয়া থাকা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সে অদম্য তেজ, ভাবপ্রবণতা ও বিশ্ববোধের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। জার্ম্মানরা এখনও যুবকসদৃশ উদ্যমশীল, দুঃসাহসী, উদ্ভাবনক্ষম, ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন। তাহাদের এই বৈশিষ্ট্য সহজে ধ্বংস করিতে পারা যাইবে না। এমন একটি নূতন সংগঠন-ব্যবস্থা—স্বাধীনতা ও সাম্য, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি যদি তুল্যভাবে রক্ষিত না হয় তবে উদার-দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নূতন এক জার্ম্মানীর আশা করা বৃথা।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে জিনিষটি একান্তভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং আসল চারটি বৃহৎ শক্তি দুনিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারসাম্যশক্তি অক্ষশক্তির হাত হইতে মিত্রশক্তির হাতে চলিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র জার্ম্মানী, জাপান ও ইটালী বৃহৎ শক্তির পর্য্যায় হইতে বাতিল হইয়াছে। ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইয়াছে; চীন প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলিয়া ভান করে। রুশিয়া এশিয়া ও ইউরোপ, আমেরিকা প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরীয় অঞ্চল, ব্রিটেন ভূমধ্য-ও-ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল শাসন করিতেছে। এই প্রকারে বৃহৎ শক্তিগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কূটনৈতিক সম্পর্কে মূলগত পরিবর্ত্তনের উদ্ভব হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক আইনের অচল অবস্থা এবং মানবিক নীতিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই পররাষ্ট্রভুক্ত হইয়াছে বা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জাগিয়াছে। লোভলালসা ও বলপূর্ব্বক শোষণেচ্ছার ব্যাপকতা ঘটিয়াছে। রুশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকা প্রধান পাণ্ডারূপে এই পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে। সমস্ত দেশে প্রাচীন দলগুলির মধ্যে রেষারেষি চলিতেছে।

যদিও হিটলার ও চার্চ্চিলের পতনে সমাজতন্ত্রের প্রভাব বাড়িয়া গিয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তবুও

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ আদর্শবাদ ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে উহার ভবিষ্যৎ সম্যক্‌রূপে উজ্জ্বল হইবে না। ইহা কার্য্যতঃ জাতীয়তাবাদী দলের প্রভাব। নূতন পদ্ধতি অনুসারে সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় ইহা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের যুগ। জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ সামরিক ও বেসামরিকের মধ্যে কোন তারতম্য করে না—ইহার আদর্শানুযায়ী সকলেই সমাজতন্ত্রের কর্ম্মী। সমাজতন্ত্র দলভুক্ত জাতি ও তাহার গঠনমূলক উদ্দেশ্যের মধ্যে সকলকেই এক গোষ্ঠীভুক্ত কর্ম্মী বলিয়া মনে হয়। ইহাতে জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক বিধি মানিয়া লওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিধান যখন কোন জাতির মঙ্গল ও নিরাপত্তার বিঘ্নস্বরূপ হয় তখন সেই জাতীয় সরকার আর উহা মানিয়া চলে না—চলিতে পারেও না। উদাহরণ-স্বরূপ, যুদ্ধকালে এবং উহার পূর্ব্বে, পরে রুশিয়া ও জার্ম্মানীর নীতি লক্ষ্য করা যাক। স্বদেশ হইতে লোক বিতাড়ন, অর্থনৈতিক শিল্প ও সম্পদ ধ্বংস, দেশের বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রপাতি বিনষ্টীকরণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর হস্তক্ষেপ—এই সকল জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদী আদর্শের বৈশিষ্ট্য। উহা বিজয়ী সমাজতন্ত্রবাদী জাতিগুলির মধ্যে উদ্ভূত হইতেছে। মহর্ষি ব্যাসদেব মহাযুদ্ধের পরিণাম সম্বন্ধে তাই এই মর্ম্মে বলিয়াছেন: জয়ই পরাজয়ে পর্য্যবসিত হয়।*

* ১৯৪৬ সালের মার্চের 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক এস. ভি. পুন্তাম্বেকর-লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

চোখ

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বলতে পারো পলাতক, পলাতক-ই বুঝি।
পল্লব প্রচ্ছন্ন দুটি চোখের গভীরে
ছায়াপ্রদ নীড়টিরে খুঁজি।
আদিম অরণ্য-স্বাদ দুর্নিবার আজো মনে হয়,
হৃদয়-কন্দরে যেন স্বচ্ছ কত নদীটির মতো
গুপ্ত হয়ে রয়;
আকাশের নীলমাখা দুটি চোখ আবেগনিবিড়,
ছায়াপ্রদ নীড়টিরে সেইখানে খুঁজি।

মরুভূর দগ্ধপ্রান্ত পার হয়ে আসি।
বারুদের কঙ্কালের শোণিতের ঘ্রাণে
দীর্ঘস্থায়ী অধীরতা প্রাণে;
হৃদয় অধীর হয় অকস্মাৎ গন্ধবহ ফুলের আহ্বানে,
তাই তো নীলিম চোখ আজো ভালোবাসি।
দু-চোখের ঘননীল নিবিড় গহ্বরে
বিন্দুমাঝে সিন্ধু যেন কাঁপে;
হাওয়া বয় শীত আসে তারি প্রতীক্ষায়
অরণ্য অনেক রাত ঘড়িহীন মাপে।

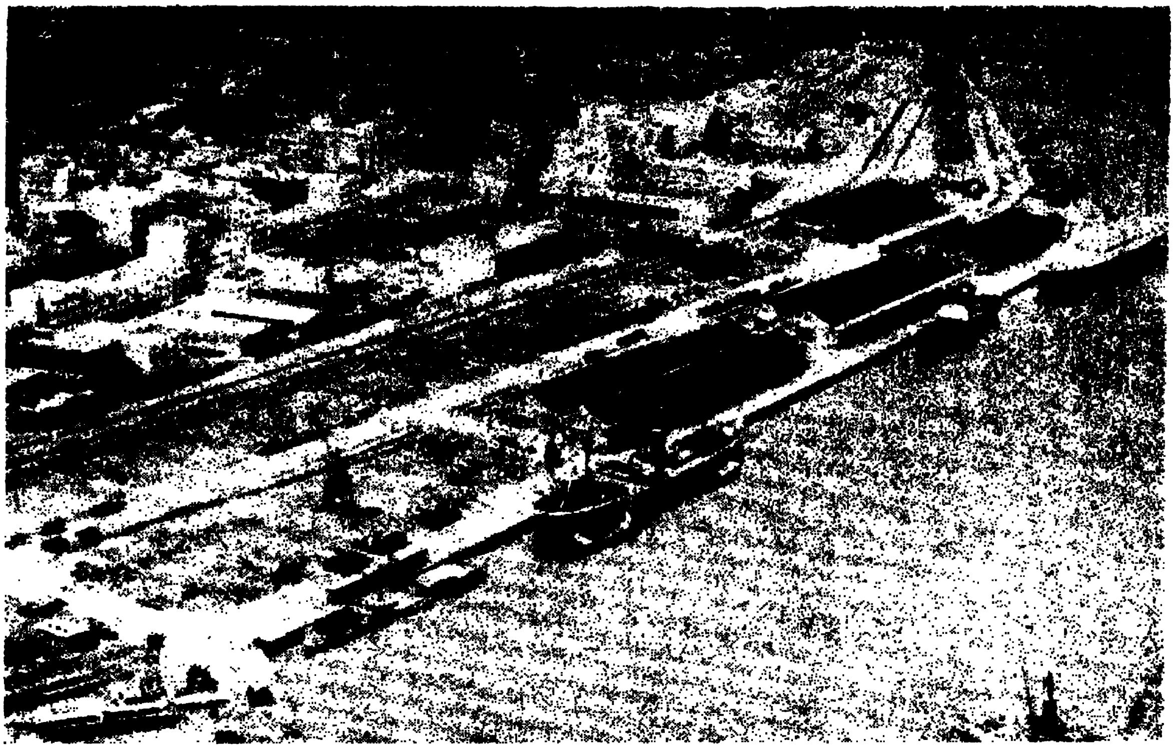
মনে হয় কত স্বপ্ন আলাদীন মায়ায় প্রদীপ
তোমায় চোখের নীলে জ্বালে শত দীপ।
কত রাজ্য ভগ্নপ্রায় ছত্রভঙ্গ কত যে বাহিনী,
ক্লিয়োপেট্রা হেলেনের চোখের কাহিনী।

ছলনা

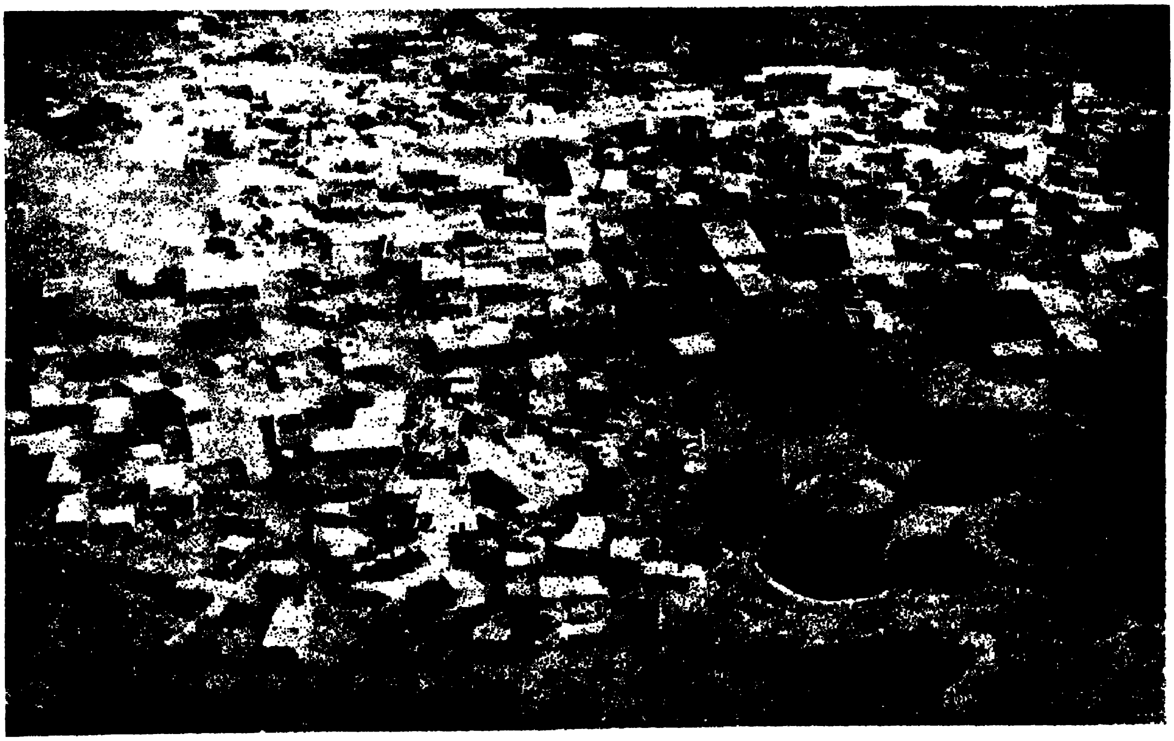
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

চলতি পথের ধারে মালাখানি নিয়ে
একদা ডাকিলে তুমি। আনত আঁখিতে
সে ডাক ছিল যে আঁকা। পা খানি রাখিতে
পথের ধূলায় দিলে আঁচল বিছিয়ে।
নূতন দিনের গান মোর ধমনীতে
রহিয়া রহিয়া রণিয়া উঠিল প্রিয়ে;
চিনি নি তবুও। তুমি না দিলে চিনিয়ে
পারিতাম আমি কভু তোমারে চিনিতে?
উড়িল অলক তব সোহাগ-লীলায়,
অধরে ফুটিল হাসি কি জানি কি বুঝি,
বাহুটি দুলিল মত্ত আপন খেলায়,
চটুল চাহনি ফিরে কি জানি কি খুঁজি।
পারি নি শুধাতে আমি—কোন ছলনায়
ছলিতে এসেছ তুমি আঁখি দুটি বুজি?

আধুনিক প্যালেষ্টাইন—ইহুদী ও আরব অঞ্চলের তারতম্য



হাইফা নগরী। ১২৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে নবনির্মিত ইরাক তৈল-পাইপের মুখ



আরব পল্লী—দারিদ্র্যের নিদর্শন



জর্ডন নদী র্বব ক্ষয়প্রাপ্ত জমি



কাশ হই করা মর দৃশ্য উপরে জেরুজালেমে ইহুদী র্ণ

আধুনিক প্যালেষ্টাইন ও ইহুদী-আরব সমস্যা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইন নানা কারণে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই অঞ্চলটি লইয়া অতীতেও এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার জন্য ইহা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের লীলাক্ষেত্র বলিয়া এই প্রদেশটি খ্রীষ্টান জগতের নিকট অতি পবিত্র। ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য খ্রীষ্টান সমাজের পক্ষে যুগে যুগে এখানে ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ পরিচালনা করা হইয়াছে। ইউরোপের বহু ভাষায় এই স্থানটির নানা কাহিনী লইয়া বহু পুস্তকাদিও লেখা হইয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইহা আবার বিশ্ববাসীর কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্রেক করিয়াছে।

আরবের মানচিত্রে দেখা যাইবে, প্যালেষ্টাইন বা ফিলিস্তিন ইহার পশ্চিম প্রান্তে মাত্র এক ফালি জায়গা। এ অঞ্চলটি ইহুদীদের আদি বাসভূমি। পরে এখানে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীদের আধিপত্য স্থাপিত হইলে তাহাদের অধিকাংশই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়ে। যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার দরুন সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজই ইহুদীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও তাহারা কিরূপ ঘৃণার্হ ছিল, সেক্সপীয়রের মার্চ্যান্ট অফ ভেনিসে ইহুদী শাইলকের প্রতি খ্রীষ্টানদের নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ হইতে তাহা বুঝা যায়। নাৎসী জার্ম্মানী, পোলাণ্ড ও অন্যান্য দেশের ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সাম্প্রতিক ঘটনা। জারের আমলে রুশিয়ায়ও ইহারা উৎপীড়ন সহ্য করে। অথচ জগতের বহু প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, ধনী, ব্যবসাদার এই ইহুদী জাতির মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেও কিছু কিছু ইহুদী প্যালেষ্টাইনে বসবাস করিত। বর্ত্তমান শতাব্দীর সূচনা হইতে ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে অল্প অল্প করিয়া আসিতে থাকে। কিন্তু বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেকার বালফুর চুক্তির দ্বারা তাহারা প্যালেষ্টাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদী-আবাস প্রতিষ্ঠার ভরসা পায়। ইহুদী-নেতা ডক্টর হ্বাইস্‌ম্যান এবং আরবদের পক্ষে আমীর ফৈজলের মধ্যে যে চুক্তি হয় তাহাতেও বিদেশাগত ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে গিয়া বসতি স্থাপনের সুযোগ লাভ করে। ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ ইহুদী সমাজ ধন জন দিয়া প্যালেষ্টাইনের মরুপ্রায় অঞ্চলকে শস্যশ্যামল প্রান্তরে পরিণত করে, বিস্তর পরিচ্ছন্ন নূতন নূতন নগরী গঠিত হয় এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ইহা আর আরবদের সহ্য হইল না। ইতিপূর্ব্বে যে আরবরা ইহুদীদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিল, যাহাদের নিকট চড়া দামে অনাবাদী জমি বিক্রয় করিয়া ক্রমশঃ লাভবান হইতেছিল, এতাদৃশ সমৃদ্ধি এবং প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহাদের উপর একেবারে তাহারা খাপ্পা হইয়া উঠিল। তদবধি উভয়ের মধ্যে মারামারি, হানাহানি সমানে চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভু ইংরেজদের ছাড়াইয়া এখন সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রে (U.N.O.) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত বালফুর ঘোষণা এবং প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে ইহুদীগণ মিত্র শক্তিবর্গকে বিশেষ সাহায্য করে। ইহার প্রতিদান ও পুরস্কারস্বরূপ উক্ত মহাসমরের মধ্যেই ১৯১৭ সালের ২রা নবেম্বর যে বালফুর ঘোষণা প্রচারিত হয় তাহাতে এইরূপ লিখিত থাকে,

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of that object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."

অর্থাৎ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের একটি জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহুদী ছাড়া যে-সব অধিবাসী সেখানে আছে তাহাদের নাগরিক বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকারের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। ইহুদীরা অন্যান্য দেশে যে-সব অধিকার ভোগ করে প্যালেষ্টাইনে আসার দরুন তাহারও কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। মিত্রশক্তিবর্গ কর্ত্তৃক ১৯২০ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে বিধিবদ্ধ সেভার্স সন্ধিতে এই ঘোষণাটি অনুমোদিত হইয়া যায়।

প্রথম মহাসমর কালে প্যালেষ্টাইন তুরস্কের অধীন ছিল। ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড এলেনবি ইহা উদ্ধার করেন। তদবধি কিছুকাল ইহা ব্রিটিশের সামরিক শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ইহাকে 'ম্যাণ্ডেট' (Mandate) শাসনও বলে। রাষ্ট্রসংঘ প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্ব ১৯২২ সনের ২৪শে জুলাই মানিয়া লন। পর বৎসর ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ইহা একটি পুরাপুরি ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেটে পরিণত হইল। এই সময় ইহুদীরা কিরূপে অধিক সংখ্যায় প্যালেষ্টাইনে গিয়া জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করিতে থাকে তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি এবং একটু পরেও বিশদভাবে পাওয়া যাইবে। তবে বিদেশী শাসকের কর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রবল সেখানে ভেদনীতির পূর্ণ সুযোগ লওয়া স্বাভাবিক। ইহুদী ও আরবদের মধ্যে বিবাদে ইংরেজ এই নীতির সুযোগ লইতে ইতস্ততঃ করে নাই। গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়্যাল কমিশন গঠন করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদের কারণ ও মীমাংসার উপায় নির্ণয়ের ভার দেন। কমিশনের রিপোর্ট যথাসময়ে বাহির হইল এবং যথারীতি বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের উপরই দোষক্রটি চাপানো

হইল। এই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত এবং প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে ব্রিটেনের নীতি ১৯৩৯ সনে একটি White Paper বা শ্বেতপত্রে ঘোষিত হয়। এই ঘোষণার ফলে ইহুদীরা ব্রিটিশ সরকারের উপর ভয়ানক চটিয়া যায়, কারণ তাহারা মনে করিতে থাকে যে, ইহাদ্বারা পূর্ব্বেকার বালফুর ঘোষণার যথেষ্ট হানি করা হইয়াছে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইল। নাৎসী জার্ম্মানী তথা হিটলার কর্ত্তৃক ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা তাহারা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। নাৎসী জার্ম্মাণীর বিরোধী ব্রিটিশ তথা মিত্রশক্তিপুঞ্জকেই তাহারা ধন জন দিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিল। কিন্তু এবারেও যুদ্ধান্তে দেখা গেল, ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ সনের নীতিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে, ইহার কোন পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইতেছে না। তখন তাহারা বেপরোয়া হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেই জোর আন্দোলন চালায়। আন্দোলন মোটেই অহিংস নয়, যুদ্ধান্তে গোলাগুলী, বন্দুক প্রভৃতি যে-সব সমর-সরঞ্জাম ইহুদীরা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল সবই একে একে তাহারা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে লাগিল। সংবাদপত্র-পাঠকের এ সমুদয় নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। ব্রিটিশ সরকার বেগতিক দেখিয়া আরব ও ইহুদী প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি আলোচনা-বৈঠকের আয়োজন করেন, কিন্তু উঁহারা যোগ না দেওয়ায় তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার অগত্যা প্যালেষ্টাইন সমস্যার মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের উপর ভার দিয়াছেন।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্যালেষ্টাইন সমস্যা আলোচনা ও মীমাংসার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারত-সরকারের প্রতিনিধি মিঃ আসফ আলি এই বিশেষ কমিটির সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। এই বিশেষ কমিটির কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে জাতিসঙ্ঘের আমন্ত্রণক্রমে ইহুদী ও আরব মুখপাত্রগণ নিজ নিজ বক্তব্য ইহার সম্মুখে উপস্থিত মতে পেশ করিয়াছেন। ইহুদীদের পক্ষে ছিলেন মিঃ শের্টক ও মিঃ বেন-গারিয়ন এবং আরবদের পক্ষে ছিলেন মিঃ খোরি। উভয়ের উক্তি হইতে প্যালেষ্টাইন সমস্যার মূল কারণগুলি জানা আমাদের পক্ষে কতকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহুদী ও আরবগণ প্যালেষ্টাইনকে কি চক্ষে দেখিতেছে এবং প্রত্যেকের দিক হইতে এই সমস্যার সমাধান কিরূপে হওয়া সম্ভব তাহার আঁচ আমরা ইহা হইতে পাই। এ কারণ উঁহাদের মূল বক্তব্য এখানে দেওয়া আবশ্যক।

ইহুদী-নেতা মিঃ শের্টক প্রথমেই জুইস্ এজেন্সীর (Jewish Agency) উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা করেন। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা এই এজেন্সীর প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে ভিন্ন দেশবাসী ইহুদীদের এখানে আনয়নাদি ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রিটিশ সরকার ও স্থানীয় সরকার উভয়েই ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় মহাসমর কালে এই এজেন্সী আড়কাঠির কার্য্য করিয়াছে ব্রিটিশ বাহিনীকে তেত্রিশ হাজার সৈনিক জোগাইয়াছে, প্যালেষ্টাইন রক্ষা করিয়াছে এবং এখানকার দ্রব্যসম্ভার সামরিক প্রয়োজনে লাগাইয়াছে। ইহুদী স্বেচ্ছা-সৈনিকগণ মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও ইউরোপের রণক্ষেত্রে সমানে লড়িয়াছে।

ইহুদীদের কোনও জাতীয় আবাসভূমি ছিল না, অথচ আদিভূমি প্যালেষ্টাইনের প্রতি তাহাদের গভীর টান ও আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই আজ ইহাকে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। প্যালেষ্টাইনে আজ ছয় লক্ষ ইহুদী বসবাস করিতেছে। তাহারা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে আরবদের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে নারাজ। এই কারণে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ ইহুদীর জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রবল স্পৃহার দরুনই আজ তাহারা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে সুবিচারের প্রত্যাশায় উপস্থিত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে ১৯০০ সনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ৫০,০০০, ১৯৩০ সনে ১৬৫,০০০, ১৯৩৯ সনে ৪৭৫,০০০ এবং বর্ত্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৩০,০০০। অর্থাৎ, প্রথম মহাসমরের শেষে প্যালেষ্টাইনে আরবদের সংখ্যা যাহা ছিল আজ ইহুদীদের সংখ্যা তাহার চেয়ে অধিক। ১৮৮০ সনের পর হইতেই রুশিয়া, রুমানিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ-আরব হইতে ইহুদীরা আদিভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বল্পসংখ্যক ইহুদী সমাজকে পুষ্ট করিতে থাকে। ইহার পর হইতে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আগমন অবিরাম চলিয়াছে। ইহুদীদের আদিভূমি প্যালেষ্টাইনে বসতি স্থাপনে তাহাদের যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহা তাহারা যেমন বিশ্বাস করে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ইহা স্বীকৃত। ম্যাণ্ডেট না থাকিলেও ইহুদীদের এ অধিকার বলবৎ থাকিত। তাহারা বহিরাগত মোটেই নহে, তাহারাই এখানকার সত্যিকার বাসিন্দা। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে, আরবরা যে মনে করে তাহারা বিদেশী ইহা একেবারেই নিরর্থক।

সুমহান্ অতীত ইহুদীদের রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহুদী জাতির তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ষাট লক্ষকে অকালে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু অতীতের কথা বলিয়া লাভ নাই; এই মাত্র ১৪৯২ সনে, সুদীর্ঘ সহস্র বৎসর বসবাসের পর স্পেন হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়াছে, মাত্র যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সেখানে থাকিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পোলাণ্ডে প্রায় পাঁচ-ছয় শত বৎসর বসবাসের পর সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রুশিয়ায়ও অনুরূপ অত্যাচার চলে, এবং শেষে গত মহাসমরে তাহাদের চরম দুর্গতি ঘটে—প্রায় ত্রিশ লক্ষ ইহুদী নাৎসীদের অত্যাচারে আত্মাহুতি দেয়। জার্ম্মানীতে চতুর্থ শতাব্দী হইতেই ইহুদীদের বাস, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের ইহুদী-দমনের হিড়িকে

এখানকার ইহুদীদেরও নিপাত সাধন হয়। পুনরায় বিংশ শতাব্দী নাগাদ জার্ম্মান ইহুদীরা যখন সকলরকম স্বাধীনতাই ভোগ করিতেছিল তাহারই মধ্যে আসিল নাৎসী-উৎপীড়ন। ইহার ফল কি ভয়াবহ হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইহুদীরাও এই উৎপীড়ন হইতে রেহাই পায় নাই। যুদ্ধের পরেও যে ইহুদী নির্য্যাতনের অবসান হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

গৃহহারা, সর্ব্বহারা ইহুদীদের একমাত্র আবাসস্থল তাহাদের আদিভূমি প্যালেষ্টাইন, এই অঞ্চলটির দ্বার রুদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে মৃত্যুরই সামিল। আরবেরা এখন বহিরাগত ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে আগমন একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে চায়, কিন্তু তাহাদের এই দাবি আদৌ ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত নহে। ১৯১৯ সনের শান্তি সম্মেলনে ফৈজল-হ্বাইসম্যান চুক্তি এখনও বলবৎ আছে। আরবরা যে এখন দাবি করিতেছে সার হেনরি ম্যাকমাহনের চুক্তিতে প্যালেষ্টাইন আরবদের দেওয়ার কথা ছিল তাহাও ঠিক নহে। বালফুর ঘোষণায় ট্রান্স-জরডানকেও প্যালেষ্টাইনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি ইহুদী-নিবাস করার কথা ছিল, কিন্তু প্রথমোক্তটিকে একণে আলাদা আরব-রাষ্ট্রই করা হইয়াছে। ইহুদীদের আদিভূমি প্যালেষ্টাইনকে স্বাধীন একটি ইহুদী-রাষ্ট্র করারও কথা ছিল। মাত্র দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ব্রিটিশ চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার সার হিউ ডালটন বলিয়াছিলেন, ইহুদীদের জন্য প্যালেষ্টাইনে একটি সুখী, এবং স্বাধীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্র গঠন করার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে ("for a policy which will give us a happy, free and prosperous Jewish state in Palestine")। ম্যাণ্ডেট অন্তে ইহুদীদিগকে এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে দিতে হইবে। স্বাধীন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু আরবদের ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহুদীরা এরূপ করিতে বাধ্য, কেননা পার্শ্ববর্ত্তী এবং দূরের সকল রাষ্ট্রেই ইহারা সংখ্যালঘু থাকিবে। পরন্তু সংখ্যালঘু ইহুদীদের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। পার্শ্ববর্ত্তী আরবরাষ্ট্রসমূহে ইহুদীদের উপর যে সুবিচার হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা তাহাদের নাই। সুতরাং একটি বিষয়ে অবহিত না হইলে প্যালেষ্টাইন স্বাধীনতা পাইলেও তাহা ইহুদীদের পক্ষে নিরর্থক হইবে। অন্য রাষ্ট্রেও যাহাতে তাহারা নাগরিকের পূর্ণ অধিকার লাভ করে তৎপ্রতি সচেষ্ট হইতে হইবে। আরবদের সঙ্গে সংস্কৃতিগত মিলনের চেষ্টাও ইহুদী সমাজ করিতেছে। সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আরবী পড়ান হইতেছে। একচল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে মিঃ শেরটক বলেন যে, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে মূলগত এমন কোন বিভেদ নাই যাহাতে তাহাদের মিলন হওয়া অসম্ভব।

মিঃ খোরি 'আরব হায়ার কমিটি অব প্যালেষ্টাইন'-এর পক্ষে জাতিসঙ্ঘের সম্মুখে নিজ বক্তব্য পেশ করেন এবং প্রকারান্তরে ইহুদী মুখপাত্রের উক্তির জবাব দেন। তিনি বলেন যে, আরবরা বালফুর ঘোষণা কখনও মানিয়া লয় নাই, কাজেই ইহারারা শুষ্ঠ প্যালেষ্টাইনের শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য জুইস এজেন্সী বা অন্য কিছু তাহারা স্বীকার করিতে আদৌ রাজী নয়। পূর্ব্বে আরব ও ইহুদীরা একযোগে সম্প্রীতিতে বসবাস করিত। কিন্তু বালফুর ঘোষণার পর হইতেই যে নীতিতে দেশ শাসন ও অন্যবিধ কার্য্য চলিয়াছে তাহাতে এই সম্প্রীতি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। ইহুদীরা তাহাদের রাজনৈতিক মতলব বা আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেই ইহা পুনরায় প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইবে। ইহার জন্য প্যালেষ্টাইনে এমন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে বহিরাগত সংখ্যালঘুদের কোন প্রকার অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য কার্য্যকরী করা হইবে না। প্যালেষ্টাইন আরব দেশ, এখানে আরবদের অধিকার বহাল থাকিবে। শুধু ইহুদী কেন, বহিরাগত যে কোন জাতির আধিপত্যই ইহারা অস্বীকার করিতে বাধ্য।

মিঃ খোরি অতঃপর বলেন যে, প্যালেষ্টাইনের দাঙ্গাহাঙ্গামায় শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিনষ্ট হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৯ সনে যখন দাঙ্গা হয় সে সময় ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ আচরণ করিয়াছেন এবারে তাহার বিপরীত লক্ষ্য করা যাইতেছে। এবারে আরবগণ দাঙ্গায় লিপ্ত হইয়া পড়ে নাই, তবে তাহাদের এই নির্লিপ্ততা কেহ যেন দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে না করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন যে, বালফুর ঘোষণা আরবগণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তথাপি তাঁহাকে যখন ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে স্বতন্ত্র জাতীয় আবাস এবং স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে তখন শিষ্টাচার পালন করিতে হইলে তিনি উত্তর দিতে বাধ্য। খোরি বলেন, এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। জাতীয় আবাস স্থাপন আর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এক কথা নহে। ১৯২২ ও ১৯৩৯ সনের ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের একটি জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠিত হইবে, জাতীয় রাষ্ট্র নহে। তিনি বলেন, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন সেইরূপই বলিতেছেন। ইহাদ্বারা তিনি এ সম্পর্কে পূর্ব্বেকার মত ছাড়া অন্য কোন মত প্রকাশ করিতেছেন এরূপ যেন ধরিয়া না লওয়া হয়।

প্যালেষ্টাইনে বিভিন্ন সময়ের ইহুদী বাসিন্দাদের কথা পূর্ব্বে জানা গিয়াছে। ১৯২০-৩০ সনের মধ্যে, খোরি বলেন, ১০৫,০০০ ইহুদী বিদেশ হইতে প্যালেষ্টাইনে আসিয়াছে, ১৯৩১-৩৯ সনে আসিয়াছে ২১৮,০০০; এই বিশ বৎসরে মোট আসিয়াছে ৩২৩,০০০ জন। ১৯৩৯ সনের শ্বেত-পত্রে ঘোষণা করা হয় যে, সেখানে ইহুদী জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার পরেও এক লক্ষ ইহুদী সেখানে ঢুকিয়াছে। এই সকল বহিরাগত ইহুদীর অল্পসংখ্যকই হিব্রু ভাষা জানে, তাহারা

ইডিশ (Yiddish) বা অনুরূপ মিশ্র কোন ভাষায় কথা বলে। ইহা তাহাদের জন্মভূমির ভাষা। প্যালেষ্টাইনকে ইহারা কোন মতেই স্বদেশ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না।

বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য যদি প্যালেষ্টাইন বিভাগের প্রস্তাব হয় তবে আরবরা তাহা কোনক্রমেই মানিয়া লইবে না। তাহারা প্যালেষ্টাইনে একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করিবার পক্ষপাতী। ইহার কমে কিছুতেই তাহারা রাজী হইতে পারে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনে গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই তাহাদের সত্যিকার অভিপ্রায়। এখন প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের বিচারাধীন। এই সময় ইহুদী আগন্তুকদের স্থান দান একেবারেই অসঙ্গত হইবে। এ সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘের বিশেষ অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহুদীদের সর্ব্বস্ব যে নষ্ট হইয়াছে এজন্য আরবরা দায়ী নয়। ইহাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে অন্য কোন দেশ ব্যতিরেকে একমাত্র প্যালেষ্টাইনকেই কেন বাছাই করিয়া লওয়া হইবে তাহা তাহাদের ধারণার অতীত। এ ব্যাপারেও আরবগণ সম্মতি দিতে পারে না। অনুসন্ধান-কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্যালেষ্টাইনে নবাগত ইহুদী-প্রবেশ এখনই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য অবিলম্বে নির্দ্দেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। খোরি বলেন, আরবগণ সর্ব্বপ্রকারে ইহুদী আগন্তুকদের প্যালেষ্টাইন-প্রবেশে বাধা দিবে।

সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের সম্মুখে ইহুদীদের পক্ষে মিঃ বেন-গারিয়ান যে-সব কথা বলেন তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইন-সমস্যা সমাধানে অপারগ হইয়া ব্রিটেন জাতি-সঙ্ঘের নিকট ইহা উপস্থাপিত করিয়াছে। এ সম্বন্ধে সভ্যদের কিছিং ভুল ধারণা জন্মিতে পারে, এ হেতু বেন-গারিয়ন তাঁহাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, প্যালেষ্টাইন যে ইহুদী আবাসভূমি ইহা পূর্ব্বেই ব্রিটেন, মিত্রশক্তিবর্গ, আমীর ফৈজলের মাধ্যমে আরব জাতি এবং সিরিয়ার আরব কমিটি মানিয়া লন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এহেন প্যালেষ্টাইনকে ম্যাণ্ডেট হিসাবে শাসনের জন্য ব্রিটেনের উপর ভার দেন, কোন সমস্যা মীমাংসার জন্য ভার দেন নাই। ১৯৩৯ সনের শ্বেত-পত্রে এই ব্যবস্থা যে ভঙ্গ করা হইয়াছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ম্যাণ্ডেট কমিশন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রিটেনের বহু রাজনৈতিক নেতাও তখন এইরূপ মত প্রকাশ করেন। সর্ব্বহারা ইহুদীদের আশ্রয়দানে ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্যও এই শ্বেত-পত্র দায়ী। এই কারণেই আজ প্যালেষ্টাইনে পুলিস-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং জাতি-সঙ্ঘের পক্ষে প্রথমেই আবশ্যক, বিভিন্ন জাতির পক্ষ হইতে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বসবাসের স্বাভাবিক অধিকার মানিয়া লওয়া।

দ্বিতীয় কথা হইল, প্যালেষ্টাইন ইহুদী জাতির একটি স্বতন্ত্র দেশ। অন্যান্য দেশের ইহুদীদের অপেক্ষা এখানকার ইহুদীদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করিতে হইবে। পিতৃভূমির সঙ্গে সাড়ে তিন হাজার বৎসরের সংস্রব এবং দীর্ঘকালের ইতিহাস ইহার সঙ্গে বিজড়িত। যুগে যুগে এই ক্ষুদ্র দেশটি পরপদানত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহুদী জাতি বরাবরই ইহাকে স্বদেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছে। ইহার পুনর্গঠনে তাহাদের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুই কারণে এই পুনর্গঠন-কার্য্য অব্যাহত রাখা প্রয়োজন—একটি হইল, গৃহহারা ইহুদীদের এই দেশটি একমাত্র আশ্রয়, অপরটি, এখনও প্যালেষ্টাইনের দুই-তৃতীয়াংশ অনাবাদী রহিয়াছে। আরবরা যদিও ইহাকে কর্ষণযোগ্য বলিয়া মনে করে না, তথাপি গত সত্তর বৎসরের চেষ্টায় ইহুদীরা দেখাইয়া দিয়াছে যে, তৎপর হইলে এখানেও প্রচুর ফসল ফলান যাইতে পারে।

আরবরা আর একটা কথা বলে যে, বিদেশে যে-সব ইহুদী অত্যাচরিত নিপীড়িত হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা তো দায়ী নহে। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, ইহুদীরা আরব রাজ্যে গিয়া তো আশ্রয় লইতে চাহিতেছে না, তাহারা ইহুদী-নিবাস প্যালেষ্টাইনেরই বাসিন্দা হইতে ইচ্ছুক। আরব-অধ্যুষিত শহর ও গ্রামে বহিরাগত একটি ইহুদীও আশ্রয় লয় নাই, তাহারা সকলেই গিয়াছে ইহুদী-অধ্যুষিত তেল-আভিভ, হাইফা, জেরুজালেম, নেগেভ প্রভৃতি শহর ও গ্রামসমূহে। এ-দিক দিয়াও আরবদের কিছুই বলিবার নাই।

বেন-গারিয়ন উপসংহারে বলেন, আরব জাতির সঙ্গে ইহুদীদের কোনরূপ বিবাদ নাই। ইতিহাসের দিক হইতে দেখিতে গেলে উভয়েরই স্বার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা বরাবর এক রূপই রহিয়াছে। ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনের উন্নতিকল্পে কৃষি ও শিল্পের দিক দিয়া যাহা করিতেছে তাহাতে তাহারাও যেমন উপকৃত, আরবরাও তেমনি উপকৃত। ইহুদী ও আরব জাতি যদি স্বাধীন ভাবে মিলিত হয় তাহা হইলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেরই আশু নবজীবন লাভ ঘটিবে। বিশ্বে ইহুদীদের স্বদেশ বলিয়া কোন স্থান নাই। তাহারা আজ পূর্ব্বেকার যে স্বদেশের সন্ধান পাইয়াছে তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়া আরবদের পক্ষে আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তাহারা সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের সভ্য হইবার দাবি রাখে। তাহারা নিজেরা স্বাধীন হইয়া স্বাধীন আরবদের সহযোগে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে তৎপর হইবে। একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র এবং ইহুদী-আরব মিত্রতা প্রতিষ্ঠাদ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া বেন-গারিয়নের বিশ্বাস।

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা মীমাংসার জন্য জাতি-সঙ্ঘের বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি প্যালেষ্টাইনের অবস্থা সাক্ষাৎ ভাবে অবগত হইবার জন্য বিশেষজ্ঞদের সেখানে পাঠাইয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের ইহুদী-আরব সমস্যার সত্বর সমাধান হউক ইহাই কাম্য।

হে আষাঢ়, তোমারে প্রণাম

শ্রীমহাদেব রায়

ধরায় আসে তো বারো মাস,
মিলন-সাধনে অবকাশ
নাহি হেন তুমি বিনা কারো—
হে আষাঢ়, তুমি শুধু পারো
বিরহীর বার্তা বহিবারে,
যেথা প্রিয়া মানসের পারে
প্রতীক্ষায় যাপিতেছে দিন,
ক্ষীণ তনু বিরহে মলিন।
মিলনের সাধনা তোমার,
প্রিয় তুমি তাই তো হিয়ার।
বসন্তের মধুর মলয়
লঘুতায় মানে পরাজয়,
স্বল্প-প্রাণ,—শক্তি কোথা তার?
একা তুমি পার এ ধরার
শূন্য প্রাণ পূর্ণ করিবারে,
কবি তাই বরিল তোমারে;
হে আষাঢ়, তুমি বরণীয়,
তাপ দগ্ধ পরাণের প্রিয়।
সহবেদনার বাষ্পভার
মেঘ বক্ষে বহ অনিবার,
বিসর্জিয়া সেই বাষ্পভারে
ধারাসারে সিক্ত এ ধরারে
দাও তুমি বিপুল গৌরব
রস-রূপে ভরি উঠে সব—
পূর্ণ তার মনোহর রাগে,
হৃদয়ে-হৃদয়ে তাই জাগে
ব্যবধান দূর করিবার
প্রেমে-পূর্ণ বাসনা অপার।
এ বিশ্ব-বিরহ-মাঝে তুমি
এসে যদি স্নেহে ধরা চুমি'
কণ্ঠে ধ্বনি' মহামিলনের
মহাগীত মহৎ প্রেমের,
জগতেরে বাঁধ' একসুরে,
বঞ্চিতের দুঃখ যাক দূরে—
সে মিলনে বিচ্ছেদের ভার
কণ্ঠ হ'তে নামুক ধরার।
আনো শান্তি-ধারা অবিশ্রাম,
হে আষাঢ়, তোমারে প্রণাম।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

এ এন এম বজলুর রশীদ

হে বিরহী শ্যামল সুন্দর,
তোমার রূপের রূপ আবরণখানি
উন্মোচিয়া দিলে আজি। দেখিলাম অনন্ত বিরহী তুমি
একান্ত একেলা। আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে
বেদনা-সজল তব এই লীলা এই লুকোচুরি
আমার বিরহী মনে বাজাইল বাদলের একতারাটিরে
সুগভীর নিশীথ বেলায়।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
বিরহী কবির বুকে বাজে তার বাজে সুর
অতীতের অকারণ বেদনা-বিধুর।
বাতায়ন-প্রান্তে মেঘদূত—
তৃষ্ণাহরা বর্ষণের অবিশ্রান্ত সুরে
অশান্ত মর্মরে কহে কথা।
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—
যেথা শিপ্রা বেত্রবতী নির্বিন্ধ্যার তীরে
কেয়াফুল-গন্ধবাসে জাগে বিরহিণী
ঘনপক্ষ্মরুক্ষ নেত্র তার—প্রসারিত সুদূরের মেঘে
অবন্তী বিদিশা বিন্ধ্য উজ্জয়িনী পানে—
কৈলাসের তুষার চূড়ায়।
আষাঢ়ের প্রথম দিবস—
সৃষ্টি করে মর্মবুকে অনন্ত বিরহলোক—
অপার বেদনা আর নিঃসঙ্গ জীবন
পথে পথে চলে অভিসার—
মালতী-মল্লিকা-বনে মাধবীর কুঞ্জ-বীথিকায়
কদম্ব নিকুঞ্জতলে।
ঝরে পড়ে তৃণবুকে সুগন্ধি কেশর
আষাঢ়ের রোমাঞ্চ পুলক।
আষঢ়ের প্রথম দিবস—
পুঞ্জীভূত নীলাঞ্জন মেঘ দলে দলে
নীলাভ আকাশ ফেলে ছেয়ে। কে যেন মধুর
কোন্ সুদূরের পান্থ কাছে এল প্রাঙ্গণে আমার
শুনি তার চরণের ধ্বনি।
শাল তাল আমলকীর ব্যাকুল পল্লব
শিহরিল আনন্দ উচ্ছ্বাসে—
যৌবনে জাগিল নদী অকস্মাৎ বিপুল উল্লাসে
রজনীগন্ধার মধুবাসে।
বিরহের ব্যথা আজি সর্বাতীত করি
অভিসারিকার বুকে উঠিল ঝঙ্কার
বাজিল গম্ভীর রবে আনন্দের সুমন্দ্র মল্লার।

বাংলার অন্নসমস্যা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

গত ২০শে জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'বাংলা' বলিতে সমগ্র বাংলা হিন্দুস্থানী বাংলা, পাকিস্তানী বাংলা, সওয়া ছয় কোটি বাঙালীর দেশ বলিয়া ভাবিয়াছি ; আমার নিজের, পরিবার-বর্গের, প্রতিবেশীর, দেশবাসীর কথা মনে হইয়াছে। সেই হিসাবে চিন্তা করিয়াছি, প্রবন্ধ লিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল ভিন্ন প্রদেশের লোক নই, দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমরা ভিন্ন স্বার্থে চলি, বিভিন্ন পতাকা অভিবাদন করি। হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ, এক দিন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দুই সম্প্রদায়ের স্থায়ী বিচ্ছেদে পরিণত হইতে পারে। প্রদেশে প্রদেশে যে ঈর্ষ্যা-দ্বন্দ্ব থাকে, স্বার্থপ্রণোদিত দুই রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদ তদপেক্ষা হয়ত অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। এ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে, তাহা কখনও কল্পনাও করি নাই। আজ বাস্তবের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া দেখিতেছি, আমরা এক বাঙালী ত নহই। আমরা এক বাঙালী, কতক বাস করি বিহার প্রদেশে, কতক বাস করি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বাংলা ও আসামে আর বাকি বাস করি পাকিস্তানে। এক জাতি এত ভিন্ন অংশে পড়িয়া আমরা বাঙালীত্বের পরিচয় হারাইতে বসিয়াছি। বিহার বাংলা আসামে বত্রিশটি জেলায় বিভক্ত বাঙালী নানা প্রদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র নামে পরিচয় লাভ করিবে। আমরা বাঙালী বলিয়া যে গৌরবলাভ করিতাম, তাহা অংশতঃ ক্ষুণ্ণ হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অথবা পাকিস্তানে দ্বিধাবিভক্ত বাঙালীর পক্ষে যোগ্য আসন লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা তাহা ভবিতব্যতাই বলিতে পারে।

আজ বাঙালীর অন্নসমস্যার অর্থ, হয় পশ্চিম বঙ্গের এগারোটি আর না হয় পূর্ব্ববঙ্গের জেলা কয়টির কথা দাঁড়াইতেছে। এ চিন্তা করিতেও ক্লেশ আছে, কিন্তু তাহা দূর করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বে আমাদের কতকটা জানা থাকিলেও, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ কিন্তু আমাদের অর্থাৎ সারা বাংলার, অভাবটা পরিস্ফুট করিয়া তুলে। আমরা বুঝিতে পারি, পরের সাহায্য না পাইলে বাংলার পেট ভরে না, অর্থাৎ মানুষের সর্ব্ব প্রাথমিক অভাবের জন্য আমরা পরনির্ভরশীল। সারা বাংলার খাদ্যে বাঙালীর চলিত না, এখন পূর্ব্বাঞ্চলের ধান পশ্চিমে আসিবার পথে বহু বিঘ্ন, বহু অন্তরায় ঘটিবে। বালুচিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাকিস্তানী রাষ্ট্রবিভাগে অন্নশস্যের প্রয়োজন থাকিলে, বর্ত্তমানের এক জেলা দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িলে, এ অঞ্চলের লোক পাশের অঞ্চলকে সাহায্য করিতে পারিবে না। পাকিস্তানী রাজধানী করাচী হইতে পরোয়ানা বাহির হইলে তবে পূর্ব্ব-যশোহর পশ্চিম যশোহরে চাউল দিতে পারিবে। মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি জেলার অবস্থা গুরুতর হইতে চলিয়াছে। স্বতন্ত্র দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের কোনও সম্ভাবনা থাকিলে, পূর্ব্ব মালদহের ভ্রাতা, পশ্চিম মালদহের ভ্রাতাকে এক সের চাউল দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না ; কারণ তাহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। পূর্ব্বাঞ্চলের অতিরিক্ত খাদ্য পশ্চিমে আসিবে না, এই কথা স্মরণ করিয়া আজ বাংলার বিভিন্ন অংশের অন্নসমস্যার কথা ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ সারা বাংলার জন্য বাংলার বাহির হইতে ১,৩২,০০০ টন চাউল এবং ২,৪৯,০০০ টন গম আমদানী করিতে হয়। তাহা ছাড়া আসাম ও আরাকান হইতে যে চাউল আসে তাহা হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। আমাদের ধারণা বিহার হইতে, অথবা যুক্ত প্রদেশ হইতে আমরা বহু খাদ্যশস্য পাইয়া থাকি। হয়ত কখনও কোনও সময় বাংলায় দাম অত্যন্ত চড়া থাকিলে, গম অথবা চাউল কিছু আসে, কিন্তু তাহা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, কারণ বিহার প্রদেশ দুই লক্ষ টন চাউল, ৭১,০০০ টন গম আমদানি করে। তাহা ছাড়া তাহাকে নেপাল হইতে ১৪,০০০ টন চাউল আমদানি করিতে হয়। যুক্তপ্রদেশ সরিষা, চিনি প্রভৃতি দিলেও খাদ্য দিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কারণ সে বিষয়ে তাহার নিজের প্রায় ৫০,০০০ টন ঘাটতি আছে। ভারতের মধ্যে পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, সিন্ধু, উড়িষ্যা ও আসামে কিছু খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়। তন্মধ্যে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রধান। পঞ্জাবের অধিকাংশ এবং সিন্ধুর সমস্তটাই পাকিস্তানে রহিয়াছে। নিতান্ত বিপাকে পড়িলে উড়িষ্যা কিছু চাউল দিতে পারে। আসাম হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা ছাড়াও আমাদের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে।

বাংলাদেশের ২৮টি জেলার মধ্যে খুলনা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি এই দশটি জেলায় (১৯৩১-এর হিসাবে) চাউল উদ্বৃত্ত হয়। বাকি ১৮টি জেলায় (কলিকাতায় কিছুই জন্মায় না) কম বেশী ঘাটতি আছে।

উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনকারী জেলাগুলির মধ্যে চারটি ভারতীয় ইউনিয়নে, চারটি পাকিস্তানে এবং খুলনা ও মুর্শিদাবাদ ভাঙিয়া দিলে দুই ডোমিনিয়নে চলিয়া যাইবে। সুতরাং ভারতীয় ইউনিয়নই হোক আর পাকিস্তানই হোক, এই বাংলা বিভাগে খাদ্যশস্যের হিসাবে কাহারও পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। কিন্তু পাকিস্তানী বাংলার সুবিধা এই যে তাহার পক্ষে সিন্ধু ও পঞ্চনদ রহিয়াছে। সিন্ধুর উদ্বৃত্ত, উৎপন্ন শস্যের শতকরা ত্রিশ ভাগেরও বেশী। পঞ্চনদের যে অংশে অধিক গম উৎপন্ন হয়, তাহা পাকিস্তানী অঞ্চল। ছয় লক্ষ একরের অধিক পরিমাণ জমিতে গম চাষ হয়, ফিরোজপুরে ; তাহাই কেবল ভারতীয় ইউনিয়নে। তাহার পর পাঁচ লক্ষ একরের উপর চাষ হয় আটক ও মুলতানের প্রত্যেক জেলায় ; চার লক্ষ একরের উপর জমিতে চাষ হয়, শাহাপুর ও মন্টোগোমারী জেলায় এবং অন্যান্য যে কয়টি জেলায় খুব বেশী চাষ হয়, যথা —গুরুদাসপুর, গুজরানওয়ালা, ঝঙ্গ, লাহোর প্রভৃতি, ইহাদের প্রত্যেকটিই পাকিস্তানে ; সুতরাং ভারতীয় পঞ্চনদে খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিতে পারে ; তাহাদের পক্ষে বাংলাকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে না।

মধ্য প্রদেশ ও বেরারে যেমন উদ্বৃত্ত আছে, সেইরূপ বোম্বাই, মাদ্রাজ এমন কি যুক্তপ্রদেশে ঘাটতি আছে। তাহা ছাড়া সারা ভারতে খাদ্যাভাব আছে। তাহার মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করি না। মোট ভারতের ৬ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন, তন্মধ্যে চাউল ২ কোটি ৯০ লক্ষ টন, গম ১ কোটি টন, জোয়ার বাজরা প্রভৃতি ১ কোটি ১৪ লক্ষ টন, যব ২৬ লক্ষ টন, ছোলা ৪৪ লক্ষ টন, কলাই ৩১ লক্ষ টন প্রতি বৎসর উৎপাদিত হওয়ার সম্ভাবনা। তন্মধ্যে বীজ শতকরা ১০ ভাগ ও অপচয় শতকরা ২·৫ ভাগ বাদ দিলে মোট ৫ কোটি ১০ লক্ষ টন পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনের অধিক খাদ্যশস্য পাওয়া যায় না ; ১৯৪৪-৪৬ সালে ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টন পর্য্যন্ত কমিয়াছে। সুতরাং সারা ভারতের ঘাটতির পরিমাণ ৬০ লক্ষ টন না হইলেও অন্ততঃ ৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াইতেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের অপরাপর অঞ্চল হইতে কত কদল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবিবার কথা।

ভারতের বাহির হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়া প্রয়োজন মিটিতেছে কিন্তু তাহাতে সর্ব্বদা আশঙ্কা আছে। হয়ত ঠিক প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে না। অপরে তাহাদের সুবিধামত দিবে। আমরা সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস হইয়া থাকিতে বাধ্য হইব।

বহু কোটি অর্থব্যয়ে শস্যের পরিমাণবৃদ্ধির আন্দোলন চলিতেছে। তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। কৃষি-পণ্যের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে কৃষক নিজ চেষ্টায় চাষ বাড়াইয়াছে, সরকারী প্রচারপত্র-পত্রিকার পরিমাণ বাড়িয়াছে, ফসল বাড়ে নাই। যত বৎসর যাবৎ ভারতে খাদ্যশস্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জমির উন্নতি, ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক এবং স্থায়ী পরিকল্পনার কথা হয়ত আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হয় নাই।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই অংশে বিভক্ত বাংলাদেশের পক্ষে আর কালহরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কৃষির উপযুক্ত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা চলিতে পারে, কিন্তু কোনও কোনও জেলায় তাহা সমাজের ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। বন, পতিত জমি মানুষের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। তাহার কতটা কোথায় থাকা দরকার, তাহা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত। চাষের উন্নতির জন্য সার সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা আছে, কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই। উন্নত কৃষির পরিকল্পনা আছে, কিন্তু যন্ত্রাদি এবং যন্ত্রাদি চালাইবার জ্ঞানের অভাব। তাহা ছাড়া জমি এত বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাতে বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত যন্ত্রাদি দ্বারা চাষ করিবার অসুবিধা হইয়া পড়িয়াছে।

বাংলার চাষের জমির শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ রায়তের অধিকারে, এবং তাহারা যে স্বত্বে স্বত্ববান, তাহার মধ্যে দরফুট করিবার ক্ষমতা নাই। বড় জমিদার পত্তনীদার, জোতদার মিলিয়া বাকী ৩০ ভাগ জমির মালিক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রথা রদ করিয়া বাংলার কৃষির উন্নতি ও সরকারী আয় বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা সত্য সত্যই উভয় উদ্দেশ্যের পক্ষে কত উপযোগী একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিতে হইলে জমিদারের সহিত রায়তের স্বত্ব লোপ করা দরকার, কারণ সমস্ত চাষের উপযোগী জমির দুই-তৃতীয়াংশের প্রকৃত মালিক তাঁহারাই। কেবল জমিদারী প্রথা লোপ করিলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বহু জমিদার এক হিসাবে চাষী, সুতরাং তাহাদের চাষের জমি প্রয়োজন। যাঁহারা মধ্যস্বত্বভোগী, জমির চাষের সহিত সংস্রববিহীন, তাঁহারা এক হিসাবে সেই স্বত্ব বা সম্পত্তির মালিক, সুতরাং কাহারও সম্পত্তি লইতে গেলে, তাহাকে ন্যায্য মূল্য দিতে হয়। সাধারণতঃ প্রজা হইতে খোদ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আন্দাজ ১৬ কোটি টাকার হাত-ফের হইয়া থাকে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ হইলেই এই টাকা সরকারী আয় হিসাবে বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা রক্ষণাবেক্ষণের সংশ্লিষ্ট ব্যয়, বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের আদায়ী খাজনা, সেস্, ট্যাক্স প্রভৃতি বাদ দিয়া ধরিলে পরিমাণ কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া আদায়ের ব্যয় আছে ; শতকরা দশ টাকা হারে ধরিলে, সে পরিমাণ আরও কমে। মোটের উপর কেবলমাত্র চিরস্থায়ী প্রথা বিলোপ করিবার কল্পনা করিয়া বসিয়া থাকিলে, চাষের

উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া বাস্তবিকই কাহার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, তাহাও তলাইয়া দেখা দরকার। আমার মনে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা আমূল পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন আছে এবং সে বিষয়ে কি করা যাইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা এখনই ঠিক করিয়া ফেলা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বৃহৎ শিল্প যাহাতে গবর্ণমেণ্টের হাতে আসে, সে ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিতে হইবে। জমিদারীর ব্যাপারে খরচ বাদে বাৎসরিক আন্দাজ পাঁচ কোটি টাকা লাভের অঙ্ক লইয়া আমরা ভাবিয়া আকুল হইতেছি; কিন্তু তাহা বহু লক্ষ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। তদপেক্ষা কম লোকের উহা অপেক্ষা বেশী লাভের অঙ্ক যেখানে আছে, তাহাও সাধারণের দখলে আনা প্রয়োজন।

কিন্তু দ্রুত কার্য্য পরিচালনার কথা ভাবিতে গেলে, অন্য পন্থা আবিষ্কার করা দরকার। ফসলী জমির পরিমাণ অত্যধিক সঙ্কীর্ণ হওয়ার চাষের উন্নতি ও ফলনবৃদ্ধির পথে বহু অন্তরায় দেখা দিয়াছে। তাহার উপর চাষীর দারিদ্র্য, অজ্ঞতা চাষের উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব চাষের উন্নতির পরিপন্থী। একেবারে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইলে, সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া সাধারণের জন্য বিরাট কৃষিক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু সে কত দিনের কথা? তাহা ছাড়া একটা গুরুতর বিপ্লব না হইলে রায়তদের নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়া লওয়ায় অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। বহু জমিদার কংগ্রেসের সভ্য এবং কংগ্রেসের আদেশ মানিয়া চলেন। তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া কোনও নির্দ্দেশ দিতে হইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কি দেওয়া যায়, কংগ্রেস তাহাও ভাবিয়া দেখিবে। কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার শাসনভার হাতে লইতেছে, সুতরাং জমিদার রায়ত ও কৃষকের জমি লইয়া কি করিবে, তাহার একটা নির্দ্দেশ দিলে তবে জমির মালিক বা স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে জমির অধিকার লইতে অসুবিধা হইবে না।

জমির উন্নতি বা ফলন বৃদ্ধি করিতে যে সকল উপায় অবলম্বন করা দরকার, তাহার মূলে অর্থ ও উৎসাহ প্রয়োজন। অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট নিজে জমিদার, উক্ত জমিদারীর নাম খাসমহল। এই সকল জমির মধ্যে বৃহদায়তন অংশ লইয়া যন্ত্রপাতি অথবা সবল পশুর সাহায্যে প্রভূত উন্নত ধরণের চাষ করিতে পারিলে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রের চাষীরা উৎসাহিত হইয়া নিজেরা সেইরূপ চাষে মন দিবে।

কিন্তু জমির আয়তনের স্বল্পতা উন্নতির পথে অপর একটি বাধা। ইহা দূর করিতে না পারিলে, দ্রুত ফললাভের কোনও আশা নাই। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে জমি চাষ হয়, প্রজারা সম্মিলিতভাবে চাষ করে, জমি সমস্তই গবর্ণমেণ্টের। কিন্তু ইটালী, বেলজিয়ম, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন প্রজার একত্রীভূত জমিতে ব্যাপক ভাবে চাষ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং তাহারা সে বিষয়ে সফলকাম হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র প্রজাদের চেষ্টায় হয় নাই। প্রজারা চাহিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। সেখানে গবর্ণমেণ্ট আইনদ্বারা তাহাদের সহায়তা করিয়াছে। বহু খণ্ডিত জমি মিলিত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছে; লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় চাষ হইয়াছে, তাহারা আশাতীত ফললাভ করিয়াছে।

বাংলার এখন প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্য উৎপাদনে মনোযোগী হওয়া উচিত। পূর্ব্ববঙ্গের পাট আছে তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা খাদ্য ক্রয় করিতে পারে; পশ্চিম বঙ্গের তাহাও নাই। উপরন্তু পাটের জন্যও এখন তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যদি খাদ্য ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সে অবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমরা তৈলবীজ অথবা তৈল, চিনি, তুলা, কাপড় ও লোহা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অপর প্রদেশের উপর নির্ভর করিয়া আছি, কিন্তু এ সকল না হইলেও বিগত যুদ্ধের আমল হইতে অভাবগ্রস্ত হইয়াও মরি নাই, কিন্তু চাউল পাওয়া না গেলে কি হইতে পারে, তাহার নমুনা আমরা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে হাতে হাতে বুঝিয়াছি। যাহারা অন্ন দিতে সম্মত হইবে, তাহারা নিজের নির্দ্ধারিত দামে আমাদের শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিবে, তাহাতে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যাহাতে আমরা অন্ন বিষয়ে অন্ততঃ কতকটা স্বাবলম্বী হইতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা হওয়া উচিত। অন্যথা বাংলা বিভক্ত হইয়া যদি-বা মুসলিম লীগের অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকি, আমাদের অলসতা এবং অদূরদর্শিতার জন্য প্রকৃতির মার হইতে বাঁচিতে পারিব না। সময় থাকিতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

কোরানে 'আল্লা' বা ভগবানের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম. এ

কোরানের 'সুরৎ-অল্-ফতিহ্' নামক প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের প্রশংসা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, "অল্-হম্‌দুলিল্লাহি রব্বিল্-'আলমিয়ন ; অর্-রহমানি, অর্-রহীমি ; মালিকি য়ুমি-দ্দীনি ; ইয়াক ন'অবুদু র ইয়াক নস্ত'ইয়ুনু ; ইহ্‌দিনা অস্-সিরাৎঅল্-মুস্তকিম ; সিরাৎঅল্-ল্লজীন অন্-'অম্‌ত 'অলয়হিম ; গয়রিল্-মগ্‌দুবি 'অলয়হিম্ র লা অদ্-দ্দাল্লিয়ন।"—সকল বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক ভগবানকে (আমাদের) সকল প্রশংসা অর্পিত হউক। (তিনি) পরম দয়াশীল ও অপরিসীম দয়ালু ; (এবং) শেষ-বিচারের দিনের সর্ব্বময় প্রভু। (হে ভগবান) আমরা সকল সময় আপনাকেই উপাসনা করিতেছি, এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি,...আপনি অনুগ্রহ করিয়া (স্বর্গের) সরল পথ দেখান, যে পথে আপনি অজস্র (মহাত্মাদের) উপর দয়াবান হইয়াছেন ; (এবং) যাহাদের উপর আপনার অভিসম্পাৎ পতিত হইয়াছে, অথবা যাহারা বিপথগামী হইয়াছে, এইরূপ পথে আমাদের চালিত করিবেন না।"—এই আয়াৎ (বা শ্লোক) সমূহ মুসলমানগণ তাহাদের সকল উপাসনায় ভক্তিভরে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই প্রথম অধ্যায় অনেক সময় 'উম্মুল্-কোরান্' (বা কোরানের সার) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতেও পাইব যে, সমস্ত কোরানে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এই সাতটি শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি বিশ্ব-জগৎ বা তাঁহার সৃষ্টির প্রতিপালক (রব্বিল্-'আলমিয়ন্)—এখানে 'আলমিয়ন্, 'আলম্ শব্দের দ্বিবচন ; ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি ইহজগৎ ও পরজগৎ, এই উভয় জগতের সর্ব্বময় প্রভু ও পালনকর্ত্তা এবং 'আলম্' ('ইল্‌ম্ হইতে) এর শব্দগত অর্থ, যাহার সাহায্যে জানা যায় অর্থাৎ এই পৃথিবীই একমাত্র স্থান যেখানে জন্মলাভ করিয়া মানুষকে ভগবৎ-উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সম্পর্কে হজরৎ মহম্মদের একটি উক্তি (বা হদীস্) প্রসিদ্ধ আছে, "কুন্‌তু কন্‌জান্ মখ্‌ফিয়ান্ ফাহ্‌বব্‌তু অন্-অ'রফু ফখলক্‌তু অল্-খল্‌ক—" আমি (ভগবান) একটি অজ্ঞাত রত্ন ছিলাম ; আমি ইচ্ছা করিলাম যে প্রকাশিত হই, সেই হেতু, এই সৃষ্টির সৃজন করিলাম।" ভগবানকে প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করিবার জন্যই আমাদের এই জন্ম। কাজে কাজেই, আমাদের সকল প্রার্থনা কেবল তাঁহার প্রতিই হওয়া উচিত। এই প্রার্থনা আমাদের চিরসহায়, কারণ ইহার সাহায্যেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই প্রকৃষ্ট রূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব। ভগবানের নিজের কোন প্রশংসার দরকার নাই। সেই পরমেশ্বরকে প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া, আমাদের ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য বার বার তাঁহাকেই প্রার্থনা করিতে হইবে। 'রব্ব্'-এর অর্থ প্রতিপালক না বলিয়া সর্ব্বময় প্রভু বা পরমেশ্বর বলিলেই অনেকটা শব্দগত অর্থের প্রকাশ পায় ; তিনি চিরজীব ও চিরন্তন, যাঁহার চিরস্থায়ী অস্তিত্বের মধ্যেই আমাদের অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব ওতঃপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

'তিনি পরম দয়াশীল ও অপরিসীম দয়ালু।'—এবং তাঁহার এইরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া ব্যতিরেকে উপায় নাই ; কারণ, তিনি যে সকল জীবের পোষণকারী ও পালনকর্ত্তা। কাজে-কাজেই, সেই পরমেশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে এক অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রেম অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। এই সম্পর্কে অন্য একটি হদীসের (বা হজরৎ মহম্মদের উক্তির) উল্লেখ আছে, 'কেবল তোমার (হজরৎ মহম্মদ) জন্যই আমি (ভগবান) এই অস্তিত্বসমূহের সৃষ্টি করিয়াছি' (লউলক...)। এবং প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ও দার্শনিক মৌলানা রুমী ফারসী কোরান নামে প্রসিদ্ধ তাঁহার বিখ্যাত মসনবীতে এই উক্তির বিশ্লেষণ সম্বন্ধে গাহিয়াছেন, 'পবিত্র প্রেম হজরৎ মহম্মদের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল ; ভালবাসার জন্যই ভগবান তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কেবল তোমার জন্যই।'...যদি ইহা পবিত্র প্রেমের জন্যই না হইত, তাহা হইলে আমি (ভগবান) কি করিয়া এই অস্তিত্বসমূহের প্রকাশ করিতে পারিতাম। আমি এইজন্যই স্বর্গের ন্যায় মনোরম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি প্রেমের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার।...আমি পৃথিবীকে এত নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তুমি প্রেমিকদের নীচতা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পার। আমি পৃথিবীতেই (আবার) সজীবতা ও সতেজতা দান করিয়াছি, যাহাতে তুমি সাধুদের (আধ্যাত্মিক) উন্নতির কতকটা আভাস পাইতে পার। (এবং) প্রশান্ত পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতহৃদয় সাধুগণ প্রেমিকদের মনের অবিচলিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যদিও সেই অবস্থাই প্রকৃত সত্তা এবং বর্ণনা কেবল রূপকমাত্র ; (কিন্তু এই বর্ণনা এইজন্য করা হয়) যাহাতে (প্রকৃত সত্তার) কতকটা তোমার হৃদয়ঙ্গম হয়। (মসনবী, ৫ম খণ্ড)। কোরানে 'অর্-রহমান্' ও 'অর্-রহীম্' পরম দয়াশীল ও অপরিসীম দয়ালু, ভগবানের প্রতি আরোপ্য এই দুইটি স্তুতিবাক্য এইরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় যে ভগবান এই দুইটি গুণের মধ্য দিয়াই যেন আমাদের নিকট বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।

সেই পরম দয়াশীল ও অপরিসীম দয়ালু ভগবান, তাঁহার প্রেম ও দয়া দ্বারা তাঁহার সৃষ্ট জীবকে এইরূপভাবে প্রতিপালন করিতেছেন যে সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসী'ই শেষ বিচারের দিনে তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কৃত হইবে, এবং তিনিই এই বিচারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। 'য়ুমি-দ্দীন (বিচারের দিনের) য়ুম্ (দিন বা ক্ষণ) সম্বন্ধে কোরানে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে এই

দিনকে খুব অল্প মুহূর্ত বলিয়াও ধরা যাইতে পারে, আবার অতি বিস্তৃত কালেরও অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এবং কোরানের ইংরেজী অনুবাদক মহম্মদ আলী এইরূপ অর্থ করিয়াই 'বিচারের দিন' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে আমাদের এমন ধারণা করিবার নাই যে এই শেষ বিচারের দিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে আসিবে না। প্রকৃতপক্ষে এই বিচার সকল সময়ের জন্যই আমাদের উপর প্রযোগ হইতেছে এবং তিনি সকল সময়ই আমাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন এবং যে পর্য্যন্ত না আমরা তাঁহার প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিয়া এই ধর্ম্মপথে চলিতে পারিব, সেই পর্য্যন্ত আমাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে সকলকাম বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে রহিয়া যাইব, অথবা বিপথগামী হইব।

যখন আমরা তাঁহার সহিত আমাদের এই নিকট সম্বন্ধ জানিতে পারিয়াছি ও দেখিতে পাইতেছি যে তিনি সকল সময়ই আমাদের প্রতি করুণাময় ও দয়াবান, তখন সকল সময়ই তাঁহার নিকট আমাদের মাথা নত করা দরকার এবং তাঁহারই স্তুতি করা অবশ্যকর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদের অজ্ঞানতা ও পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইতে পারি, এবং সেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রের উপযুক্ত হইতে পারি, এবং সেই সহজ, সরল ও সত্যপথে চালিত হইয়া তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

কোরানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'আয়াৎ-উল্-কুর্সী' নামক শ্লোকে ভগবান সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ; আল্লা (বা ভগবান)—তিনি ছাড়া আর কোন শক্তিমান নাই। তিনি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী, কোন নিদ্রা বা জড়তা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি এই পৃথিবী ও স্বর্গের সকল জিনিষের অধীশ্বর, এবং এমন কে আছে যে তাঁহার আদেশ ছাড়া তাঁহার হইয়া মধ্যস্থতা করিতে পারে ? তিনি তাহাদের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন। সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ধারণাতীত ; কেবল তিনি ইচ্ছা করিয়া যতটুকু প্রকাশ করেন, (ততটুকুই তাহারা ধারণা করিতে পারে)। তাঁহার রাজত্ব স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, এবং তিনি ইহাদের উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না।

বাস্তবিক ভগবানের কোন বর্ণনা হইতে পারে না ; তিনি কেবল তাঁহাদের দ্বারাই বোধগম্য, যাঁহারা সেই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বা উপলব্ধির পথে অনেকটা ধাবিত হইয়াছেন। সেই পরমসত্তাকে কোরানে 'আল্লা' শব্দ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লার শব্দগত অর্থ 'পরমশক্তিশালী' (বা ভগবান) এই অর্থে বস্তুতঃ পরমসত্তার ধারণাকে অনেকটা সঙ্কীর্ণ করা হয়। সেইজন্য এখানে তাঁহাকে 'হু' (সে বা তিনি) এই সর্ব্বনামদ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং 'তিনি' অর্থে সকলগুণবিশিষ্ট সেই এক ভগবান বা আল্লাহ্‌কেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরন্তন, সেই পরমসত্তা আবহমান কাল হইতে বিরাজমান। তিনি চিরজীব, তাঁহার কোন ধ্বংস নাই। তিনি স্বয়ম্ভূ (কয়ুম্),—তিনি তাঁহার পরমসত্তা হইতে নিজে নিজেই উদ্ভূত ; তাঁহার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছু বা কাহারও উপর নির্ভর করিতে হয় না। তিনি কাল বা পাত্রের গণ্ডীর সম্পূর্ণ ঊর্দ্ধে। এবং তাঁহার হইতেই সকল সৃষ্টজীব বা বস্তু অস্তিত্ব লাভ করিতেছে। তিনি পূর্ণ ; কাজে কাজেই পূর্ণ তাঁহার কার্য্যকলাপও পূর্ণ ; সেইজন্যই তিনি নিদ্রা বা জড়তা দ্বারা কখনও অভিভূত হন না। এই সকল দেহসম্পর্কিত গুণবিশেষ সৃষ্ট জীবের পক্ষেই কেবল প্রযোজ্য হইতে পারে। সকল জীব ও জগৎ তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান, কারণ তিনি ছাড়া আর কেহই নাই। তিনিই কেবল একমাত্র বিচারক,—এবং তিনি আমাদের সকল দোষগুণ বা অধোগতি ও উর্দ্ধগতি বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন এবং তদনুযায়ী আমাদের প্রকৃষ্টরূপে বিচার করিতেছেন। এই ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি করিবার নাই। তবে তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কাহাকেও তাঁহার মধ্যস্থ করিয়া পাঠাইতে পারেন ; এবং আমাদের পয়গম্বর্ (ভগবৎবাণী-বাহক) হজরৎ মহম্মদ মানুষকে সৎপথে চালিত করিবার জন্য ভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি ভগবৎপ্রেরিত কোরানের আদেশবাণীসমূহ দ্বারা ভগবদ্বিশ্বাসী বা ভক্তদের (মুসলমান) সৎপথে চালিত করিয়া গিয়াছেন। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ; তিনি আমাদের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন। কারণ, তাঁহা হইতেই আমরা উদ্ভূত, এবং আবার তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইতেছি। তাঁহার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সঠিক ধারণা করা অতি কঠিন ব্যাপার। যখন ভগবানের ইচ্ছা বা অনুগ্রহানুসারে আধ্যাত্মিক পথে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে, তখনই কেবল তাঁহার সম্বন্ধে মানুষ কতকটা সঠিক ধারণা করিতে পারিবে। তাঁহার প্রভুত্ব সকল বিশ্বজগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার এই প্রভুত্ব মানুষের প্রভুত্বের ন্যায় নহে। তিনি সকল সময়ের জন্যই সকল জীবকে আধ্যাত্মিক পথে ক্রমশঃ ধাবিত করিতে সাহায্য করিতেছেন, এবং ইহাতে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না। কারণ তিনি যে সকল দুর্ব্বলতা ও অপূর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে।

কোরানের ৩য় অধ্যায়ের একস্থানে (২৫নং আয়াতে) বর্ণিত হইয়াছে, "(হে পয়গম্বর্, তুমি) এই প্রার্থনা কর, হে ভগবান, তুমি সকল রাজ্যের অধিপতি ; তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজ্য প্রদান করিতেছ ; আবার যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর রাজ্য কাড়িয়া লইতেছ ; এবং যাহাকে ইচ্ছা কর সম্মান দিয়া থাক, আবার যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করিয়া থাক। তোমার হাতেই সকল কল্যাণ ন্যস্ত, কারণ, তুমিই সকল জিনিষের উপর ক্ষমতাশালী।"—ভগবান সকল জিনিষের

অধীশ্বর, এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী সকল জিনিষের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু এইজন্য আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে তিনি খামখেয়ালী ও স্বেচ্ছাচারী। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন সত্য, কিন্তু তিনি সকল সময়ই যাহা কিছু করিতেছেন, আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন; কারণ তাঁহার হাতেই যে সকল কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। তিনি যে পরম সৎ এবং তাঁহার ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে কেবল প্রকাশমান এবং আমাদের সকলেরই সেই ভগবৎ ইচ্ছার সম্মুখে মাথা নত করা দরকার। ইহাই প্রকৃত ইসলাম, যাহার দ্বারা মানুষ সেই পরম সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারে।

কোরানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, "তাঁহার নিকটই অজ্ঞাত বিষয়ের (খয়িব্) চাবি রহিয়াছে; তিনি ছাড়া আর কেহ এই সকলের প্রকৃত খবর রাখেন না। জলে ও স্থলে যাহা আছে তাহার সকলই তিনি জানেন; তাঁহার ইচ্ছা ছাড়া একটি পত্রও (বৃক্ষ হইতে) পতিত হয় না। মাটির নীচের অন্ধকারে এমন একটি শস্য নাই, অথবা কোন সজীব বা শুষ্ক জিনিষ নাই (যাহার খবর তিনি জ্ঞাত নহেন)।—এই সকলই সুস্পষ্ট খাতায় (লিখিত) রহিয়াছে।" এই বিশ্ব ও ইহার সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ভগবান ছাড়া কেহই সঠিক জানে না; তবে তিনি যদি ইচ্ছা করেন, মূল রহস্য যাহার নিকট খুশী উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ীই পৃথিবীর সকল খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতেছে। ইহার গূঢ় রহস্য যাঁহারা ভগবৎ ইচ্ছানুযায়ীই কেবল চালিত হইতেছেন, তাঁহাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এবং ভগবৎ-ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত সকল সতেজ সৃষ্ট জীব ও তাহার বিপথগামী সকল জীবেরই খবর তিনি রাখেন।

কোরানের ৫৯তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তিনি আল্লা ("অর্থাৎ পরম শক্তিমান) (এবং) তিনি ছাড়া আর কেহ শক্তিমান নাই। তিনি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিষয়ই জ্ঞাত আছেন। তিনি পরম দয়াশীল ও অপরিসীম দয়ালু।...তিনি পরম অধিপতি (বা পরমেশ্বর) পরম পবিত্র, পরম শান্তিদাতা, পরম বিশ্বাস্ত, পরম নির্ভরশীল, পরম ঐশ্বর্য্যশালী এবং অতিশয় প্রবল, পরাক্রান্ত এবং অসীম শক্তিশালী। সেই আল্লাকে সশ্রদ্ধ নিবেদন; যিনি কোন প্রকার অংশীত্ব হইতে বহু উর্দ্ধে। সেই পরম শক্তিমান ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা, মুক্তিদাতা ও (সৃষ্ট-জীবের) রূপ প্রদানকারী। তাঁহার প্রতিই কেবল সুন্দর সুন্দর (গুণবিশিষ্ট) নাম প্রয়োগ হইতে পারে। এই বিশ্ব-জগতের সকলই তাঁহারই প্রশংসা গাহিতেছে। বস্তুতঃ তিনি পরমজ্ঞানী ও মহাশক্তিশালী।" ভগবানই কেবল শক্তিমান; এবং এইরূপ মনে না করার কোন কারণ নাই। কারণ, কোথাও দুই জন শক্তিধর একসঙ্গে বসবাস করিতে পারে না। এই বিশ্বসংসারে আমরা দেখিতেও পাই যে এক মহান নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সমতা সকল সময় বিরাজ করিতেছে। যখনই কোন বিশৃঙ্খলা ও অসমতা দৃষ্ট হয়, তখনই মনে করিতে হইবে যে দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি এক সঙ্গে কাজ করিতে চাহিতেছে; এবং এই বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশযুক্ত সৃষ্ট জীব সেই পরম শক্তিশালী সত্তার নিকট সর্ব্বতোভাবে মাথা নত করিতে পারিতেছে না। ভগবান সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন; তিনি দৃশ্য, অদৃশ্য প্রভৃতি সকল জগৎ বা লোক সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন—এই সকল লোক বা জগৎ বলিতে ভূলোক ('আলম-নাছৎ), তপোলোক (জবরৎ), জনলোক (লাহুৎ) প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে, এবং ইহাদের সকল লোক সম্বন্ধে ভগবান সকল খবরই রাখেন," কিন্তু সৃষ্ট জীব ভূলোক ছাড়া আর কোন লোক বা জগৎ সম্বন্ধেই সাধারণতঃ বিশেষ কোন খবর রাখে না।

ভগবান সকল বিষয়ের অধিপতি এবং ইহাদের উপর সর্ব্ব-ময় প্রভুত্ব করিয়া থাকেন; কিন্তু এই প্রভুত্বের মধ্যে সৃষ্ট-জীবের প্রভুত্বের ন্যায় কোন দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত হয় না; কারণ, তিনি যে পরম পবিত্র। তিনি পরম শান্তিদাতা, অর্থাৎ তাঁহার মধ্যেই সকল শান্তি নিহিত রহিয়াছে, এবং যে তাঁহার প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখে এবং তাঁহাকেই একান্ত ভাবে নির্ভর করিতে পারে, সে পরম শান্তি ও সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই পরম শান্তির একমাত্র পথ তাঁহার নিকট নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করা, এবং যিনি এইরূপ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই খাঁটি মুসলমান (ভক্ত বা উৎসর্গীকৃত)। এই ইসলামের (বা বলি-দানের) পথে যে যতটুকু নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারিবে, সে ততটুকু শান্তি বা সুখ পাইবে। সকল ঐশ্বর্য্যের তিনিই এক মাত্র প্রভু এবং সে তাঁহাকেই কেবল এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, তাহার এই সকল ঐশ্বর্য্য আপনা হইতেই করায়ত্ত হইবে। সেইজন্য তাঁহাকেই কেবল আমাদের ভক্তি বা শ্রদ্ধা করা দরকার। তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কোন অংশীদার নাই এবং যিনি এইরূপ সঠিক ভাবে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল ভগ-বানকে একান্তভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে পারেন, এবং তাঁহার মন আর কোন কিছুতেই ধাবিত হয় না।

ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আবার আমা-দের এই সৃষ্টির মোহ হইতে ঠিক সময়ে উদ্ধার করিবেন, এবং আমরা যাহা কিছু রূপ বা আকৃতি দেখিতে পাইতেছি, তাহার কোন কিছুরই নিজস্ব অস্তিত্ব নাই, ভগবানের ইচ্ছায়ই এই সকল আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। সকল গুণের তিনিই একমাত্র আধার, এবং তাঁহার গুণেই পৃথিবীর সৃষ্টজীব বা বস্তু গুণান্বিত; এবং সকল জিনিষ বা জীব তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পথে কেবল তাঁহাকেই প্রশংসা করিতেছে, কারণ, পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য ও রূপ যে তাঁহারই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। তিনিই একমাত্র জ্ঞানী এবং আমাদের এই জ্ঞানও তাঁহার সেই পরম জ্ঞান হইতেই উদ্ভাসিত।

কোরানের 'ইখ্লাছ' নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, "(হে মহম্মদ, তুমি) বল যে সেই আল্লা একক, তিনি নিজেই পূর্ণ (অস্-সমদ্)। তিনি জন্মদান করেন না, আবার জন্ম-

গ্রহণও করেন না এবং তাঁহার তুল্য কেহ নাই।"—সেই পরম পবিত্র ও অতি মহৎ একক ভগবানের বর্ণনা আমাদের মানুষের সীমাবদ্ধ ধারণার অতীত। আমাদের এই সময়, স্থান ও কালের সীমাবদ্ধ ধারণার গণ্ডীদ্বারা সেই পূর্ণ, স্বয়ংসিদ্ধ, একক ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করা দুষ্কর। 'অস্-সমদের' প্রকৃত অর্থ অসীম, অনন্ত ও স্বাধীন, এবং সেই পরম সত্তা, যাঁহার কোন তুলনা হয় না, চিরস্থায়ীভাবে বিরাজমান। জীব, বৃক্ষলতা ও পার্থিব অন্যান্য সকল বিবিধ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত এবং কালে তাহাদের মৃত্যুও সুনিশ্চিত, কিন্তু সেই ভগবান জন্মমৃত্যুরহিত।

এইরূপে কোরানের অনেক আয়াৎ বা শ্লোকেই ভগবানের বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে সকল আয়াতের উল্লেখ করা সম্ভব নয়, যদিও ইহাদের মধ্যে একই বর্ণনার যথেষ্ট পুনরুল্লেখও আছে। সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে তিনি সকল গুণসম্পন্ন; কিন্তু এই সকল গুণদ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করিলেই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে না। তাঁহাকে প্রকৃষ্টভাবে বুঝিতে হইলে, কোরানের আদেশানুযায়ী পবিত্রভাবে জীবনযাপনদ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার ধারণা করিতে পারা যাইবে। বস্তুতঃ ভগবান বুঝাইবার বস্তু নহেন, সাধনদ্বারা ক্রমশঃ তাঁহাকে হৃদয়ে অনুধাবন করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ কবি রুমী বলিয়াছেন, "সকল ধারণাই গুণ-প্রসূত ও সীমবাদ্ধ, কিন্তু ভগবান প্রসূত নহেন, তিনি 'লম্‌য়ুলদ্' (জন্মরহিত)।"

রহম্ জাযিদ ব অটবাক্‌ রা হবস্ত ;
হক নজায়িদস্ত উ লম্ য়ুলদস্ত।

ভগবানকে সকল গুণসম্পন্ন বলিতে গিয়া, এরূপ কতকগুলি গুণে ভূষিত করা হয়, যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। লোকচক্ষে এই সকল গুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও সেই পরমগুণশালীর নিকট কোন অসামঞ্জস্য নাই। তিনি সৃষ্টিকর্তা, আবার তিনিই মুক্তিদাতা। তিনি পালনকর্তা, আবার তিনিই ধ্বংসকারী। এই সকল গুণ আমাদের নিকট বস্তুতঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও সেই পরম কারুণিক ভগবানের নিকট ইহাদের কোনটাই বিরুদ্ধভাবাপন্ন নয়। ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইলে কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব বা জন্মরহস্য বিবৃত করা দরকার; কিন্তু এখানে স্থানাভাব। রুমী এক কথায় জন্মরহস্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'আদম প্রবৃত্তির পথে একপদ অগ্রসর হইলেন, এবং পশুপ্রবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ স্বর্গধাম হইতে তাঁহার বিচ্যুতি হইল।' অর্থাৎ পাপই আমাদের জন্মের মূল কারণ এবং যতক্ষণ আমরা পাপময় কলুষিত জীবন যাপন করিতেছি, তাঁহার পরমসত্তা হইতে বিচ্যুতিরূপ শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। কোরান (৪, ৭৯) এই সম্বন্ধে বলিয়াছে, "যাহা কিছু ভাল, তাহার সকলই ভগবান হইতে উদ্ভূত, যাহা কিছু মন্দ, তাহার সকলই প্রবৃত্তির আধিপত্য-জনিত।"

তাহা হইলে এই প্রবৃত্তিজনিত সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? এই অসৎ সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে রুমী গাহিয়াছেন, 'ইহাও জানিয়া রাখ যে অসৎও তাঁহা হইতেই উদ্ভূত।' (আন্ বদীয়া দান্ কমাল্-ই-উ অস্ত্ হম্)। এবং ইহা তিনি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "একজন চিত্রকর তাঁহার নিপুণতাদ্বারা ইউসুফ ও অন্যান্য সুন্দর আকৃতিবিশিষ্টদের এবং শয়তান ও অন্যান্য কুৎসিত আকৃতিবিশিষ্টদের অঙ্কন করিলেন, যাহাতে তাঁহার নৈপুণ্য পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। ইহাতে চিত্রকরের অপূর্ণতা সূচিত হয় নাই, বরং তাঁহার জ্ঞানের পূর্ণতাই প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্যই তিনি (চিত্রকর, রূপকভাবে ভগবান) বিশ্বাসী (ভাল) ও অবিশ্বাসী (মন্দ) উভয়েরই সৃষ্টিকর্তা।" কোরানেও এই সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, 'যদি তাহাদের উপর কোন ভাল বর্ষিত হয়, তাহারা বলিয়া থাকে, 'ইহা ভগবান হইতে (প্রাপ্ত হইয়াছি); এবং যদি তাহাদের উপর কোন মন্দ বর্ষিত হয়, তাহারা বলিয়া থাকে, 'তোমার (অর্থাৎ হজরৎ মহম্মদ) হইতে;' জানিও যে সকলই তাঁহার (ভগবানের) হইতেই উদ্ভূত (কুল্লুন্ মিন্ 'ইন্দি আল্লাহি)।" কবি তাঁহার আখ্যানে আরও বলিয়াছেন, "তাহারা (বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী) উভয়েই তাঁহার মহান্ শক্তির নিকট মাথা নত করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু জানিবে যে প্রকৃত বিশ্বাসী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে, কারণ তাহার উদ্দেশ্য কেবল ভগবান প্রীত্যর্থে অবিশ্বাসীও তাঁহারই উপাসনা করিতেছে, কিন্তু উদ্দেশ্য নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য।" এবং কোরানে (৩, ৭৮) এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, 'পৃথিবী ও স্বর্গের সকলই ইচ্ছা করিয়া বা অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহারই নিকট মাথা অবনত করিয়া রহিয়াছে।"

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমরা তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি, আবার তাঁহার সহিতই মিশিয়া যাইব। কোরানে (২, ২৬-২৭) বর্ণিত হইয়াছে, "তোমরা নির্জীব ছিলে, পরে ভগবান তোমাদের প্রাণ দান করিলেন; আবার তোমাদের তিনিই মৃত্যু দান করিলেন। পুনরায় তোমাদের পুনর্জীবিত করিলেন, অবশেষে তাঁহার নিকটই ফিরিয়া যাইতে হইবে।" কোরানের সকল আদেশ ও নিয়মাবলী তাঁহার নিকট পৌঁছিবার জন্যই, অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রকৃষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এবং 'ভগবান আমাদের জন্যই পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন।' কাজে কাজেই আমাদের একমাত্র কর্তব্য, কোরাননির্দিষ্ট পথে চালিত হইয়া ভগবৎ উপলব্ধি করা এবং কোরান এই সম্বন্ধে বলিয়াছে, "ভগবান তাঁহাদেরই ভালবাসেন, যাঁহারা সৎপথে চালিত হন (ইন্নাল্লা-য়ুহিব্বু অল্-মুত্তকীন)। প্রকৃতপক্ষে, ভগবানই কেবল বিরাজমান, আমরা তাঁহার ছায়ামাত্র; তাঁহার সত্তাতেই অস্তিত্ব লাভ করিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশলাভ করিয়াছি মাত্র। রুমী গাহিয়াছেন, "সেই ভালবাসার পাত্রই (ভগবান) কেবল বিরাজমান, প্রেমিক তো তাঁহার ছায়া মাত্র; তিনিই কেবল জীবিত, প্রেমিক তো মৃতের ন্যায়।"

শ্রীহট্ট ও সংস্কৃত সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র দাস, এম. এ

যুগাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের দান সাহিত্যের ক্ষেত্রে মোটেই নগণ্য নয়। বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত, গৌরীশঙ্কর (গুড় গুড়ে) ভট্টাচার্য্য, বিপিনচন্দ্র পাল, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, ঈশান নাগর, মৌলভী আবদুল করিম, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রভৃতি সাহিত্যরথীরা শ্রীভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সংস্কৃতসাহিত্যের ক্ষেত্রেও শ্রীহট্টের দান কম নয়।

নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক পণ্ডিতপ্রবর রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টেরই অন্যতম কৃতী সন্তান। দাসগ্রাম ও ভূমিউড়াতে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। রঘুনাথ শিরোমণির এক ভ্রাতা ইটার রাজবাড়ীতে বিবাহ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। পঞ্চখণ্ডের "রঘুনাথ মহেশ্বর চতুষ্পাঠী" তাহার এবং মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের স্মৃতি বহন করিতেছে। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের 'কাব্যপ্রকাশ', 'ভাবার্থচিন্তামণি', 'সিদ্ধান্ত প্রদীপ', 'অষ্টাবিংশতি প্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে। রঘুনাথ শিরোমণির 'দীধিতি' টীকা নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার নিম্নলিখিত টীকাগুলি খুব প্রসিদ্ধ—'অনুমানখণ্ডদীধিতি', 'অনুমানচিন্তামণিদীধিতি', 'সিদ্ধান্তলক্ষণদীধিতি', 'বৌদ্ধমূলগ্রন্থব্যাখ্যা', 'প্রামাণ্যদীধিতি', 'পক্ষতাদীধিতি', পরামর্শদীধিতি', 'আচার্য্যানুমান', 'বিশেষব্যাপ্তি', 'অনুমিতিদীধিতি', 'অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিদীধিতি,' 'সংপ্রতিপক্ষদীধিতি', 'সামান্যাভাবদীধিতি', 'সামান্যনিরুক্তিদীধিতি' 'সাধারণদীধিতি', 'ব্যাপ্তিগ্রহদীধিতি', 'অতএবচতুষ্টয়ীদীধিতি', 'ব্যাপ্তিপঞ্চকদীধিতি', 'পূর্ব্বপক্ষদীধিতি' ইত্যাদি। এইগুলির হস্তলিখিত পুঁথি 'শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ' গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। 'ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ।

মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও সুপ্রসিদ্ধ জাগদীশী টীকার রচয়িতা জগদীশ তর্কালঙ্কারকে শ্রীহট্টের লোক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনি 'শব্দশক্তি প্রকাশিকা' ও 'তর্কামৃত' নামে দুইখানা মূলগ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া শিরোমণিকৃত দীধিতি টীকার টিপ্পনী গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত 'অনুমানময়ূখের ভাষ্য', 'দ্রব্যভাষ্যের ও লীলাবতীর টীকা', 'সিদ্ধান্তলক্ষণ', 'অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিজাগদীশী টীকা', 'ব্যাপ্ত্যনুগমজাগদীশী টীকা', 'সব্যভিচারজাগদীশী টীকা' 'বিশেষব্যাপ্তি জাগদীশী টীকা' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকারে'র মতে নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হবিগঞ্জ মহকুমার মান্দারকান্দির অধিবাসী ছিলেন। তবে তাঁহার সঠিক বাসস্থান কোথায় ছিল তাহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা শক্ত। হবিগঞ্জের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রঘুনন্দন পাহাড়ের নামের সঙ্গে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের নামের কোন সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। তিনি 'প্রতিষ্ঠাতত্ত্বং' 'শুদ্ধিতত্ত্বং' 'বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বং' 'মলবাসতত্ত্বং' 'মলমাসতত্ত্বং' 'আহ্নিকতত্ত্বং' 'গ্রহযোগপ্রমাণতত্ত্বং' 'কৃত্যতত্ত্বং বা প্রয়োগতত্ত্বং' 'উদ্বাহতত্ত্বং' 'বাস্তুযাগপ্রয়োগঃ' 'গৃহোৎসবতত্ত্বং' 'মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বং' 'মঠাদিপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগঃ' 'দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বং' 'ব্রততত্ত্বং' 'তিথিতত্ত্বং' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বং' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির হস্তলিখিত গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি 'শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ' গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে।

দেবীপুর নিবাসী কাশীচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি লিখিয়াছেন।—'শ্রীহট্টসাম্প্রদায়িকনির্ণয়ঃ' 'প্রেতশ্রাদ্ধবিধিঃ' 'উদ্ভটকবিতাকুসুম' 'তীর্থরত্ন' 'মৈথিলদীপিকা' বৈদিকসংবাদিনী'র 'বৈদিকনির্ণয়ঃ' নামক টীকা ইত্যাদি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পার্শ্বচর বুরুঙ্গানিবাসী মুরারি গুপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' নামে চৈতন্যদেবের জীবনীসংবলিত গ্রন্থ রচনা করেন। উহা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানা ১৪৩৫ শকাব্দাতে লেখা।

কবি কর্ণপুরের জন্মস্থান কাঞ্চনপল্লী হইলেও পরে তিনি শ্রীহট্টের অন্তর্গত আদপাশা গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। উক্ত গ্রামে বর্ত্তমানে তাঁহার বংশের ইন্দ্রসেন অধিকারী মহাশয় বসবাস করিতেছেন। সাত বৎসর বয়স্ক বালক পরমানন্দ দাস যখন ব্রজাঙ্গনাদের কর্ণভূষণের বর্ণনা দিয়া শ্লোক পাঠ করিলেন তখন চৈতন্যদেব তাহার নাম দিলেন কর্ণপুর। তাঁহাকে পুরীদাস বলিয়াও মহাপ্রভু সম্বোধন করিতেন। "প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান কর্ণপুর সংস্কৃত কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।" ইনি প্রথমে 'চৈতন্যচরিত মহাকাব্য' রচনা করেন। পরে ক্রমে 'অলঙ্কার কৌস্তভ', 'আর্য্যাশতক', 'আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ' 'চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক' রচনা করেন।

মহাদেবী বড়কাপন নিবাসী শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ত্রিপুর রাজের ভূমিদান ব্যাপার সংবলিত 'বৈদিক সংবাদিনী' শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর কৃত 'রাজমালা' ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার লিখিয়াছেন— "বিখ্যাত 'অষ্টাবিংশতি প্রদীপ'-প্রণেতা পঞ্চখণ্ডবাসী মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, ত্রিপুর রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা'-কার শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর প্রভৃতি এই সময়েই আবির্ভূত হইয়া শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।"

বালাগঞ্জ কাদিপুর নিবাসী দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ 'অনুমান

চিন্তামণি', 'গোভিলগৃহ্যসূত্র' ও 'প্রত্যক্ষ চিন্তামণি'র টীকা লিখিয়াছেন। গোভিলগৃহ্যসূত্রের টীকা সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিলশমা নিবাসী রসময় কাব্যতীর্থ কৌশক নামক ব্রাহ্মণের প্রচলিত গল্প অবলম্বনে 'প্রবুদ্ধ কৌশিকং' নামে একখানা নাটক রচনা করিয়াছেন। ১।১।৪৩ ইংরেজী তারিখে শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক এই নাটকখানি অভিনীত হয়। নাটকখানা ৬টি অঙ্ক ও ১৩টি দৃশ্যে বিভক্ত। ইহাতে পতিব্রতা স্ত্রী কল্যাণী ও তাহার পিতৃভক্ত স্বামী দেবরাতের চরিত্র অত্যন্ত সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পাত্রপাত্রীর মুখে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর শ্লোক সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা নাটককে অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব ও মাধুর্য্য দান করিয়াছে।

এক্ষণে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখকের রচিত গ্রন্থসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব।

ভুবনেশ্বর নিবাসী জয়কুমার তর্কষড়দর্শনতীর্থের 'ব্রহ্মজগৎকারণম্', খাসা নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রামনাথ বিত্তারত্নের 'স্মৃতিসন্দর্ভঃ', লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ-রচিত অদ্বৈতাচার্য্যের জীবনী সংবলিত 'বাল্যলীলাসূত্রম্,' বানিয়াচুঙ্গ নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ সরস্বতী এম-এ, বিত্তাভূষণের 'গীতাভাষ্য,' আখালিয়ার রাজেন্দ্রকুমার সাংখ্যতীর্থের 'প্রকৃতিজগৎকারণম্' 'বিধবাবিবাহস্য কর্ত্তব্যতা', ভুজবলের গোবিন্দবল্লভ গোস্বামীকৃত কাব্যব্যাকরণতীর্থের "দীক্ষাবিধিঃ", "দুর্গাপূজাপদ্ধতিঃ", "বৈদিকনিত্যকর্ম্মপদ্ধতিঃ", "সরস্বতীপূজাপদ্ধতিঃ"; দেওপাড়া নিবাসী নরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, সাংখ্যবেদান্ততীর্থের "বলিদানব্যবস্থা"; মহাসহস্র নিবাসী মহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থের "পঞ্চমহাযজ্ঞ"; দাসপাড়ার রামনন্দন দর্শনরত্নের "মন্ত্রবোধঃ", "মানবজীবনতত্ত্বং"; বাউরকাপনের রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর "সটীকভাগবতম্" ও রাধাচরণ গোস্বামীর "সটীক মহাভারতম্" "সটীক দুরত্তরীতত্ত্বং", ভলা নিবাসী কৈলাস তর্কসিদ্ধির "শ্রাদ্ধপ্রদীপঃ", "ত্রিসন্ধ্যাবিধি"; পঞ্চখণ্ডের রামকুমার ন্যায়ভূষণের "যজুর্ব্বেদীয় অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিঃ"; বাগুটিয়ার প্রতাপস্মৃতি রত্নের "ব্যবহারদর্পণম্", "ত্রিবেদীয় একোদ্দিষ্টবিধিঃ", "দুর্গোৎসবপদ্ধতিঃ"; ঈশাখপুরের সুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থের "হিন্দুধর্ম্মসংহিতা"; জয়ন্তিয়ার কবিরাজের "রাঘবপাণ্ডবীয়"; ঢাকাদক্ষিণের কালীচরণ তর্কবাগীশের "দায়াদর্শ," "ভক্তিবাদ"; পঞ্চখণ্ডের বলভদ্রভট্টের "শ্যামলবর্ম্মাচরিতম"; ভটাটিকরের বিরজানাথ ন্যায়বাগীশের "সর্ব্বানন্দপ্রকাশ"; বানিয়াচঙ্গের ব্রহ্মানন্দপুরীর "মোহচপটম্"; লাউতার মথুরানাথ তর্কবাগীশের "আধ্যাত্মের টীকা", মহলালের মহেশ্বর ঘোষের "বঙ্কিমচরিত্রম"; বানিয়াচঙ্গের মহাদেব পঞ্চাননের "সাংখ্যভাষ্যম্"; ইটার রাজগোবিন্দ সার্ব্বভৌমের "ব্রহ্মপদার্থনিরূপণম্" "বেদবাদনিবারিকা", "ভট্টটীকা" প্রভৃতি ২০ খানা গ্রন্থ, লক্ষ্মীপুরের রামগোপাল ন্যায়পঞ্চাননের "কালনির্ণয়ঃ", "অশৌচনির্ণয়ঃ", "প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ঃ" "প্রেতাধিকারীনির্ণয়ঃ", "সম্বন্ধনির্ণয়ঃ"; কৃষ্ণধন তর্কবাগীশের "যুক্তিপরিভাষা"; জানাইয়ার ঈশানচন্দ্র বিত্তাবিনোদের "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী"; দীঘির পাড়ের সূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতীর "সম্বন্ধচিন্তামণিটীকা", "জাতিপুরাবৃত্তঃ"; অস্তেহরির দীনেশচরণ দাসের "সটীক শ্রীকৃষ্ণকথামৃতম্" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত টীকা, সংকলনগ্রন্থ প্রভৃতির খবর পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিলে আরও গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে।

একান্তে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আজো যে পড়িছে মনে। এমনি আঁধার
আরো কোন সন্ধ্যাবেলা রুধি' গৃহদ্বার
একান্তে বসিয়া তোমা' ভাবা, চুপে চুপে
সারা লয়ে খেলা, সাজাইয়া দীপে ধূপে
স্মৃতিতে দেউল করা, সহসা ব্যাকুল
চকিতে চমকি' ওঠা, মানসের ভুল
তাও ভাল লাগা ; তবু অকারণ দুখে
ভরে যায় মন। আজো ধীরে নত মুখে
কাঁদি' ফিরে গোধূলির আলো। সিক্ত বায়
মেঘের অলকে মেলি' কারে বুঝি চায়
মদির মহর ; অত মনে থাকি' থাকি'
উদাসিয়া দেয়া তাকে ; বসিয়া একাকী
অনুভব করি সবি। তবু সংগোপনে
তোমার প্রতিটি কথা রবে ছুঁড়ি মনে।

মারাঠী সন্ত-সাহিত্য

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষের সকল প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অনুধাবন করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মারাঠী সাহিত্যে সন্ত-প্রভাব এক সময় অত্যধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সে প্রভাব এক দিকে যেমন সুদৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণ তাকে পরম সমাদরে ও অসীম শ্রদ্ধার গ্রহণ করেছিল। এই সন্তবাণী-প্রভাবান্বিত সাহিত্যকে বলা হয় সন্ত-সাহিত্য। এই শ্রেণীতে যে সাহিত্য পড়ে না, তাকে বলা হয় অ-সন্তসাহিত্য। কিন্তু সন্ত-সাহিত্যের প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ও তার গতিবেগ এমন অপ্রতিহত হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে কালক্রমে অ-সন্ত-সাহিত্য সন্ত-সাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে যায় এবং তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

মারাঠী সন্ত-সাহিত্যে প্রধানতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিশ্লেষণ দ্বারা মানব-মনে সৎ-প্রবৃত্তি জাগ্রত রাখবার প্রয়াস করা হয়েছে। আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে এইসব সাধু-সন্ত স্ব স্ব যুক্তিবিচার ও গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসার ফলে নিজেদের আদর্শে, ভাবে ও ভাষায় প্রচার করেছেন, পুরাতনের পুনরাবৃত্তি তাঁরা করেন নি, কিংবা পরানুকরণের প্রয়াসও পান নি।

এই সন্ত-সাহিত্যের অভ্যুদয় হয় সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের তিরো-ধানের সময়। দেশের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া তখন মোটেই বিশুদ্ধ ছিল না এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের দার্শনিক মতবাদ দেশে নাস্তিকতা প্রচারে সহায়তা করেছিল। যদিও জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য নবম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্ম্মাদির প্রভাবকে খর্ব্ব করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার মূলোৎপাটন করতে পারেন নি।

পৃথ্বীরাজের পরলোক প্রয়াণের কিছু পরেই সারা ভারতে ইসলাম ধর্ম্মপ্রচারের প্রবল প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। ধর্ম্মান্ধ মুসলমান সম্প্রদায় তরবারির জোরে ইসলামধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হয়ে পড়ে। এই সময় ভারতের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছিল। একদিকে নাস্তিকতাবাদ, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, অপরদিকে মুসলমানের একেশ্বরবাদ দেশের সঙ্কটজনক অবস্থাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছিল।

দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে জনগণ সম্পূর্ণ অক্ষম হয়ে পড়েছিল। আধ্যাত্মিকতার কোন্ মার্গ ভক্তির অনুসরণ করা উচিত দেশবাসী সে বিষয়ে মোটেই অবহিত ছিল না।

এই সময় গোটা জাতটা একেবারে নির্বীর্য্য ও শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল। তাঁদের চৈতন্য সঞ্চারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। দেশের কবিগণ প্রধানতঃ বীররস-ব্যঞ্জক উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা রচনা করে জনগণের চিত্তকে নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও সফলকাম হন নি। দেশ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত হয়ে পড়েছিল।

এমনি অন্ধকার-যুগে রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, মুকুন্দরাজ, জ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ দক্ষিণ ভারতে আবির্ভূত হন এবং ভগবৎ-তত্ত্বকথা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে জনসাধারণকে শোচনীয় দুরবস্থার কবল থেকে উদ্ধার করেন, তাঁরা দেশের অজ্ঞানতা দূর করতে সক্ষম হন।

এই যুগকে ভক্তিধর্ম্মের যুগও বলা হয়ে থাকে। এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, এই ভক্তিধর্ম্মের যুগের পূর্ব্বেও এদেশবাসিগণের অন্তরে আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব ছিল না, কিন্তু সে ধর্ম্ম-ভাবনার ধারা এত ক্ষীণ ও জাতীয় জীবন থেকে তা এতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল যে তার অস্তিত্বের কথাই ছিল অধিকাংশের অগোচর। যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়ে প্রবহমাণ ছিল, কালক্রমে তা ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে। সেই সনাতন আধ্যাত্মিক ভাবধারাকেই নূতনরূপে ব্যাখ্যা করে এই সাধু-সন্তগণ জনচিত্ত আকর্ষণ করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সন্তকর্ত্তৃক ধর্ম্মবিষয়ক প্রচারকার্য্য সুরু হয়, ফলে সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট আধ্যাত্মিক আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করে। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে।

এই সাধু-সন্তগণের মধ্য থেকে কয়েকজন কবিরও আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরাই সন্ত-সাহিত্যে নব প্রাণ-চেতনার সঞ্চার করেন। তাঁদের বাণী জনগণের চিত্তে অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।

উত্তর-ভারতে রামানুজাচার্য্য আর তাঁর শিষ্যমণ্ডলী গুজরাতে মধ্বাচার্য্য ও তাঁর অনুচরবর্গ, বাংলায় জয়দেব ও পদাবলী সাহিত্যে তাঁর অনুগামীগণ এবং দাক্ষিণাত্যে মুকুন্দরাম, জ্ঞানেশ্বর, চক্রধর প্রভৃতি মহাত্মগণের সাধনায় এই সন্ত-সাহিত্যের অপ্রতিহত প্রবাহ সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠে।

এ সময় ভারতে এমন সব মহাপুরুষ জন্মেছিলেন যাঁরা ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ও হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলকেই একতাসূত্রে আবদ্ধ করবার জন্যে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে সফলকাম হয়েছিলেন। বাংলায় চৈতন্য মহাপ্রভু এই নব ভাবধারার প্রথম প্রবর্ত্তক।

এই সময় চক্রধর শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস আর মধ্বাচার্য্যের

ভক্তিমার্গের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি 'মহানুভাব পন্থ' নামক এক ধর্ম্মসঙ্ঘ বেরার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন।

যে সময় জ্ঞানেশ্বর, নামদেব ইত্যাদি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করতে থাকেন তখন 'মহানুভাব পন্থ' সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়। কিন্তু 'মহানুভাব পন্থ' প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই স্বামী মুকুন্দরাম, শঙ্করাচার্য্যের, অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে মারাঠী সন্ত-সাহিত্যের বনিয়াদ গড়ে তোলেন।

স্বামী মুকুন্দরামই হলেন মারাঠী সন্ত-সাহিত্যের জন্মদাতা। পরেজ্ঞানেশ্বর ও তাঁর অনুবর্ত্তিগণ একে আরও উন্নততর করেন। মহারাষ্ট্রের এই সঙ্ঘের নাম দেওয়া হয় 'ভাবপন্থ'।

এই পন্থের গোড়াপত্তন হয় আদিনাথের সময় থেকে। কিন্তু গোঢ়খনাথই (গোরক্ষনাথ) এই পন্থের শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে গণ্য। এঁর জন্ম হয় অযোধ্যা নগরীর নিকটবর্ত্তী জয়শ্রী গ্রামে। মৎস্যেন্দ্রনাথ নামক এক মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসী এঁর গুরু।

গোরখনাথ নূতন কোন 'পন্থ' প্রতিষ্ঠিত করেন নাই বা নূতন কোন 'মতে'রও প্রবর্ত্তন করেন নাই। শঙ্করাচার্য্যের 'অদ্বৈতবাদে' তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আজীবন প্রচার-কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। ভারতে এবং ভারতের বাইরে, বিশেষ করে লঙ্কায়—তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরসমূহ আজও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নেপাল গোরখনাথের প্রচার-কার্য্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। নেপালের প্রায় সকল অধিবাসী এঁর শিষ্য হওয়ায় তাদের 'গোরখা' (বাংলায় গুরখা) বলে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকে গোরখনাথ নেপাল থেকে প্রায় সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মারাঠী সন্ত-কবি জ্ঞানেশ্বর এঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের ধর্ম্মান্দোলনে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের সহজবোধ্য করে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরখ-নাথের বাণীসমূহ মহারাষ্ট্র-দেশে প্রচার করেন।

গৈনীনাথ ছিলেন গোরখনাথের আর একজন প্রধান শিষ্য। তিনিও সন্ত-কবি। ইনি এবং এঁর শিষ্য নিবৃত্তিনাথ মহারাষ্ট্রে সন্ত-সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। প্রসিদ্ধ সন্ত-কবি জ্ঞানেশ্বর গৈনীনাথের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ নিয়েই এঁরা ধর্ম্মপ্রচারে রত হন, পরিণামে তাঁদের সাধনা জয়যুক্ত হয়।

নামদেব প্রমুখ সন্তগণদ্বারা প্রচারিত 'অদ্বৈতবাদ' ক্রমে পণ্ঢরপুরে 'ভাগবত ধর্ম্ম' ও শেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে 'বারকরী পন্থ' নামে অভিহিত হয়। গোরখনাথের শিষ্যদের অঙ্গাবরণ ও আভরণস্বরূপ নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ধারণ করতে হ'ত—মেখলা, শৃঙ্গী, পুংগী, কন্থা, কর্ণমুদ্রা, কৌপীন ও ব্যাঘ্রছাল আর ঝোলা। সন্ত জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের সময় এই সমস্ত নিদর্শন-চিহ্নের অবলম্বন হয়, কারণ তখন এই সন্ত-সঙ্ঘের সহিত 'ভাগবতধর্ম্ম' ও 'বারকরী পন্থে'র মিলন সাধিত হয়। ফলে উক্ত 'আভরণ'-সমূহের সংখ্যা কমে যায় এবং মৃদঙ্গ, করতাল, বীণা ও পতাকা এই কয়টি মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

গোরখনাথ যেমন ছিলেন মহাপুরুষ তেমনি একজন মহা-কবিও ছিলেন। তিনি ৬০খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে গোরক্ষকীয় সংবাদ, গোরক্ষচিন্তামণি, জ্ঞানসিদ্ধান্তবোধ, বিবেকমার্ত্তণ্ড অতি বিখ্যাত ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। অধিকাংশ পুস্তকই হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কেবলমাত্র 'অমর-নাথ সংবাদ' মারাঠী ভাষায় রচিত।

গোরখনাথের প্রধান শিষ্য গৈনীনাথ কৃষ্ণভক্তি প্রচার-মূলক সাহিত্য-রচনায় বিশেষ সফলতা লাভ করেন। তৎপরে নিবৃত্তিনাথ, জ্ঞানদেব ও নামদেব এই তিন জনের সাধনায় কৃষ্ণ-ভক্তিপ্রচারমূলক সন্তসাহিত্যের ধারা দূরদূরান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। এরা সকলেই মারাঠী ভাষায় বহুমানাস্পদ অতুল প্রতিভা-শালী কবি। নিবৃত্তিনাথের 'ভাবার্থ দীপিকা' অতি প্রসিদ্ধ ভক্তিরসাত্মক কাব্য। স্বামী একনাথ ও শ্রীসমর্থ রামদাসও মারাঠী ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্ত-কবি ছিলেন। এঁদের যুগকে বাস্তবিকই মারাঠী সাহিত্যে আধ্যাত্মিক সাহিত্য-রচনার স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সন্ত সাহিত্যের বিপুল প্রভাব দেশের সীমা অতিক্রম করে প্রথমে উত্তর-ভারতে ও পরে প্রায় সারা দেশকে প্রভাবিত করেছিল। এমন কি ইংরেজী শিক্ষা এবং সভ্যতাও মহারাষ্ট্রে সন্ত-সাহিত্যপ্রচারে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে নি।*

* প্রবন্ধে উল্লিখিত মহাত্মগণের গ্রন্থসমূহ ও মারাঠী ভাষার বিশ্ব-কোষ অভিধান থেকে এই প্রবন্ধের বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

পুস্তক-পরিচয়

শাসনতন্ত্রে আদিম অধিবাসী ও উপজাতির স্থান—শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—সংহতি কার্যালয়, ২০।২ বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৪, মূল্য বার আনা।

আদিম অধিবাসিগণ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশেই, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য অঞ্চলে, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। শিক্ষায় অনগ্রসর ও আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়া আছে বলিয়া ইহারা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এই জন্যই ১৯৩৫ সনের ভারত-আইনে যখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আইন সভায় আসন বণ্টন করা হইল, তখন এই বিরাট জনসমষ্টি নিজেদের সংখ্যানুপাতে খুব সামান্য আসনই লাভ করিয়াছিল। ইহাদের রক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণর ও গবর্ণর-জেনারেলের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে। এই দায়িত্ব পালনের প্রকৃত স্বরূপ ভারতবাসীর বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের প্রতিবেশী আহোম, আও, কাছাড়ী, কোন্যাক, লালুং, আঙ্গামী, গারো, খাসিয়া, কুকি, লোটা নাগা, লুশাই, মিরি, রাভা, মিকির, রেঙ্গমা, সিনতেঙ্গ, চাক্মা, অসুর, মুণ্ডা, ওঁরাও, লোহরা, খাণার, পরহৈয়া, সাঁওতাল, সউরিয়া, পাহাড়িয়া, থারা, পরজা পরোজা, সাওরা, চেঙ্, ভীল, কোল, করকু প্রভৃতি অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। অথচ এদের সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। লেখক তাহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই পুস্তক লিখিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষে যাহাতে এই বিরাট জাতিসমষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় তাহাই কাম্য। উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য গণপরিষদের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কার্য্য করিতেছেন।

এরূপ তথ্যবহুল পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে, আশা করি। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্রে আদিবাসীদের অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ দেখাইলে পুস্তকখানি অধিকতর উপযোগী হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

কালো রাত—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়। বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় বহু গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে রচিত হইয়াছে। সবগুলিই যে রসোত্তীর্ণ বা মনে রাখিবার মত এ কথা বলা চলে না। আলোচ্য উপন্যাসখানি পরিসরে ক্ষুদ্র হইলেও কাহিনী-গ্রন্থনে লেখকের দরদ পরিস্ফুট এবং সেই কারণেই করুণ একটি ছবি মনের মাঝে দাগ কাটিয়া বসে। মহাযুদ্ধের আঘাত যাহাদের জীবনকে নানা দিক দিয়া পঙ্গু ও নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছে সেই নিম্ন-মধ্যবিত্তের স্তর হইতে লেখক কতকগুলি পাত্রপাত্রী বাছিয়া লইয়াছেন। গল্পের নায়ক জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রথম-পুরুষের পেশা ছিল সরকারী চাকুরী, দ্বিতীয়-পুরুষ ছাপাখানার কম্পোজিটর—বর্তমান পুরুষ অর্থাৎ নায়ক তাঁহার শ্রমিক পর্য্যায়ে অবনীত। উদয়াস্ত খাটিয়া কোন রকমে সে নাতিবৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করে। ডকের কাছাকাছি ভাঙা তক্তা ও পুরাতন টিনের ছাউনিতে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার ব্যবস্থাও আছে। মাঝে মাঝে এই আশ্রয় ছাড়িবার নোটিশও আসে। পাশেই

আছে রয়েল হোটেল—নানা জাতীয় শ্রমিকদের সস্তা পান-ভোজনের আগার। কোনটিই সুস্থভাবে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী নহে। এমনই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকে একটি দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের জীবনযাত্রার ধারাটুকু 'কালো রাত্রে'র আকাশে লেখক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।...বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ দেখাইতে উপন্যাসখানিকে দীর্ঘতর করা চলিত—লেখক সে চেষ্টা করেন নাই, অথচ সংক্ষেপে মূল রসকে অব্যাহত রাখিয়া কাহিনীটিকে গাঁথিয়াছেন। ললিতা চরিত্রটি এই কাহিনীর মধ্যমণি। দুঃখে আঘাতে অবিচলিত ধরিত্রীমাতার মত সর্ব্বংসহা এই চরিত্রটি সার্থক সৃষ্টি বলা যায়। ছাপা ও প্রচ্ছদপট প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

চতুরিকা—শ্রীরবি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রহস্যোপন্যাস। আলোচ্য উপন্যাসখানি এড্‌গার ওয়ালেসের "ফোর স্কোয়ার জেইন" অবলম্বনে লিখিত। যাঁহারা রহস্যোপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন "চতুরিকা" তাঁহাদের আনন্দের খোরাক জুটাইবে। কাহিনীটি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে মনকে টানিয়া লইয়া যায়। সাধারণ রহস্যোপন্যাসের ন্যায় কোথাও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ঘটনার এতটুকু রেখাপাত হয় নাই, অথচ ঘটনাপ্রবাহ মনকে সর্ব্বদা একটা উত্তেজনার মধ্যে সজাগ করিয়া রাখে।

মুক্তির ডাক—শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। শ্রীকালী প্রকাশালয়, ১৪-বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উপন্যাস। দেশকে ভালবাসার ফলে শিবনাথ রাজশক্তির কোপানলে পড়িয়া জীবনে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আদর্শচ্যুত হয় নাই। সংসারে প্রিয়তমা স্ত্রী এবং তদপেক্ষা প্রিয় একমাত্র শিশুপুত্রের আকর্ষণও তাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া শিবনাথের ক্ষুদ্র, নগণ্য পরিবারটিকে পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শেষ পরিণতি হইয়াছে দুর্ব্বলের ধ্বংসের মধ্যে। শিবনাথের মৃতদেহ যখন তার স্ত্রীর চিতাভস্মের পাশে পড়িয়া আছে তখন গাঁয়ের প্রেসিডেণ্ট কুখ্যাত সুজিতকুমার রায়চৌধুরীর "রায় সাহেব" খেতাব প্রাপ্তি উপলক্ষে ঢাক ঢোল আর শানাইয়ের বাদ্য, এই শ্রেণীর ধনীসম্প্রদায়ের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে মনকে সচেতন করিয়া তোলে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

প্রতিষ্ঠার পথে—খবির উদ্দীন আহমদ। নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গী লেন, কলিকাতা।

উত্তর-বঙ্গের পল্লীজীবন অবলম্বনে লিখিত মনোজ্ঞ উপন্যাস। ভাষা সহজ, স্বচ্ছন্দ এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উদার। আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান সমাজের ছবি ভালো করে আঁকা শক্তিশালী মুসলমান লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। তাঁরা যদি সে বিষয়ে অবহিত হন তবে বাংলা সাহিত্যের একটি দিক ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

সাইরেন—শ্রীসুধাংশুকুমার রায়। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

কলিকাতায় যখন বিমান আক্রমণ চলছিল, তখনকার সঙ্কট-পূর্ণ জীবনের কথা নিয়ে তিন-দৃশ্যের একখানি নাটিকা। নাট্য-রস ভালো জমে নি। প্রথম গানের "কম্পিত তব মধুর দেহলী, বঙ্কিম ছাঁদে নামিল বক্ষে"—এ অংশে 'দেহলী' অর্থ কি ?

হে সূর্য্য—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাঁতরা। শ্রীপাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা। দাম।৵০।

কবিতার বই। মলাটের ভিতর-পিঠে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তেরোশো পঞ্চাশের আর্ত্তনাদ। পড়ে মনে প্রশ্ন জাগল, 'আর্ত্তনাদ'—দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীর, না, বঙ্গভাষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ?

"কূটনীতি দাবা খেলে,
সাপে কেটেছে ? কার সাপ ?
মানুষ,—ফুঃ।"

দেশের মর্ম্মান্তিক বেদনা নিয়ে এ কি পরিহাস ?

বীর পূজা—শ্রীমতী শ্রীলা দেবী। পরাগ পাবলিশাস। ১৬৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পার্থসারথি, শ্রীরামচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কর্ম্ম-বীর ও চিন্তাবীরগণের উদ্দেশে কবিতায় শ্রদ্ধা নিবেদন। রচনা মন্দ নয়, কিন্তু স্থানে স্থানে ছন্দোভঙ্গের ফলে কবিতার সৌন্দর্য্য-হানি হয়েছে।

মর্ত্তের রবীন্দ্রনাথ—শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী। মূল্য ১৲।

কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের মর্ত্তপ্রীতি ও মানবপ্রীতির পরিচয় দিতে চেয়েছেন।

কথা-প্রসঙ্গ—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। দি বুক কোম্পানী, ৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

লেখকের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্র ব্যাপক। ভাষা ও সাহিত্যের মালমশলা, চিকিৎসাতত্ত্ব, আইনের প্রভাব ও গতি, পরিচিত গাছপালা—প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী—মেজর জেনারেল শাও নওয়াজ খান। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৫৩০, মূল্য সাত টাকা।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে, আজাদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয়-বাহিনীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। বর্ত্তমান পুস্তকের (মূল গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত) লেখক মেজর জেনারেল শাও নওয়াজ খান ভারত-ব্রহ্ম রণাঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দীর্ঘ চার বৎসরকাল মালয়ে, সিঙ্গাপুরে ব্রহ্মদেশ আর আরাকানের জঙ্গলে এবং মণিপুরের উপত্যকায় তিনি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বর্ত্তমান পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও সংযত প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তিনি ইতিহাসকে উপন্যাসে পরিণত করেন নাই। সেইজন্যই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সম্বন্ধে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ হইয়াছে 'মুখবন্ধে' পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পুস্তকখানি পড়িয়া বুঝা যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের এই ওস্তাদ যোদ্ধা লেখনী পরিচালনায়ও কম দক্ষ নহেন। হাকা কালমের যুদ্ধ, পালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণ, ইম্ফল অভিযান প্রভৃতির

উদ্দীপনাপূর্ণ বিবরণ পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং যে দেশাত্মবোধ আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদিগকে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা যেন পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইয়া দেশের মুক্তি-সাধনায় দুর্গম পথের অভিযাত্রী হইবার জন্য তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে। যিনি ছিলেন আজাদ হিন্দের প্রাণস্বরূপ সেই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে মানুষ রাজনীতিবিদ ও সেনাধিনায়ক এই ত্রিবিধরূপে দেখিবার এবং ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার দুর্লভ সৌভাগ্য লেখকের হইয়াছিল। একান্ত অনুরাগ ও দরদের সহিত নেতাজীর যে লিপিচিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা সার্থক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানিতে (৪৪২ হইতে ৪৯১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ায় রেডিও যোগে প্রদত্ত নেতাজীর যে সমস্ত বক্তৃতা উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি পড়িলে তাঁহার গভীর রাজনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের ১৯শে জুন তারিখে বেতার-বক্তৃতায় নেতাজী বলেন—"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট একবার যদি কৌশলে কংগ্রেসের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হয় তা হলে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠাকে ভারত বিভাগেও কংগ্রেসকে রাজী করাতে চেষ্টা করবে।…" দুই বৎসর পূর্ব্বে এক জুনে যা তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, বিগত ৩রা জুন তারিখে তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে। নেতাজীর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মর্ম্মকথা জানিতে হইলে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য্য। বাংলা অনুবাদ বেশ ঝরঝরে হইয়াছে। ৪৪ খানা ছবি এবং তিনখানা মানচিত্র ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

উনিশে আষাঢ়—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। বিদ্যাসাগর বুক ষ্টল। ৪১ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

এই উপন্যাসের 'নিবেদনে' লেখক বলিয়াছেন, যে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় যে সকল নরনারীর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটিকে এই পুস্তকে তিনি আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বইখানি পড়িয়া মনে হয়, যাহাদের তিনি আঁকিতে চাহিয়াছেন তাহাদের তিনি ভাল করিয়া চেনেন না—পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে পরিচয়টা তাঁহার ভাসাভাসা রকমের। উপন্যাসের উপসংহারটা কতকটা সিনেমাগন্ধী হইয়া গিয়াছে। বইয়ের স্থানে স্থানে প্রকৃতি-বর্ণনায় কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণের নিপুণ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় ডায়লগও বেশ উপভোগ্য, সংলাপের ভিতর দিয়া লেখক প্রচুর ভাবিবার খোরাক পরিবেশন করিয়াছেন।

পরমায়ু—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডি, টি, এম। ডি এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায় বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের দৈন্য অপরিসীম, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-বিষয়ক ভালো বই বাজারে বিরল বলিলেই চলে। পরিভাষাকে যথাসম্ভব পরিহার করিয়া সর্ব্বজনবোধ্য সহজ সরল ভাষায় কেমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে পারা যায়, পশুপতি বাবুর 'পরমায়ু' তাহার প্রমাণ। যে সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিলে মানুষ সুস্থ দেহ-মনের অধিকারী হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার পুরাপুরি হদিস এ পুস্তকে পাওয়া যাইবে। 'মনের রোগ' আর 'মনের সুস্থতা' নামক

দুইটি অধ্যায়ে আধুনিক মনোবিকলন তত্ত্বের (Psycho-Analysis) সার কথাগুলি লেখক এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে নিতান্ত আনাড়ীর পক্ষেও বিষয়টি মোটামুটি হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবে না। প্রসঙ্গক্রমে পৃথিবীর মধ্যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে সকলের সেরা হিমালয়ের অপর পিঠের হুনজাদের কাহিনী, প্রৌঢ় বয়সে লুইগি কর্ণারোর স্বাস্থ্যচর্চ্চার খুঁটিনাটি বিবরণ ইত্যাদি কতকগুলি বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া বইটিকে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। পশুপতি বাবু নিপুণ কথাশিল্পী, তাঁর লেখনীর যাদুস্পর্শে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের মত একটা তথ্যবহুল, নীরস বিষয়ও সাহিত্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূমিকায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যে সকল সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছেন, স্বাস্থ্যচর্চ্চায় উদাসীন সাধারণ বাঙালী নরনারীর পক্ষে তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

য়্যাং ব্যাং—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা

লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক। গদ্যে-পদ্যে অজস্র রচনা-সম্ভারে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিও তাঁহার খ্যাতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ইহার ছত্রে ছত্রে লেখকের পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যে কয়টি আজগুবি কাহিনী ও ছড়া আছে তাহা পড়িয়া শিশুরা বেশ মজা পাইবে। প্রচ্ছদপটের রঙীন ছবিটি এত সুন্দর হইয়াছে যে তাহা লইয়া শিশুমহলে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবে।

কে কোথায়—শ্রীলাবণ্যকুমার মৈত্রেয়। শ্রীভারতী পাবলিশার্স, ২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা যেন অদৃষ্টের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। নিয়তির নির্ম্মম বিধানে ইহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িল তাহার হদিসই পাওয়া গেল না। উপসংহারে আবার তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্ম্মিলিত হইল। লেখকের ভাষায় বেগ আছে, কিন্তু সংলাপ বক্তৃতাভারাক্রান্ত। গল্প জমাইবার ক্ষমতা লেখকের আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে মাত্রাজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি নজরে পড়িল।

প্রান্তরের গান—শ্রীনবেন্দু ঘোষ। মডার্ণ পাবলিশার্স। ৬, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। পৃঃ ৪২৪, মূল্য—৪৲ টাকা।

১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত—এই চার বৎসরের বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে পটভূমিকা করিয়া এই বৃহৎ উপন্যাসখানি রচিত। কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি, পূর্ব্ববঙ্গের ধলেশ্বরী নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র কলাতিয়া গ্রামের ধানের কারবারী হরিচরণ দাসের ছেলে নন্দ, কাঞ্চনলতার সঙ্গে পূর্ব্বরাগের পালা উদ্‌যাপনে ব্যাপৃত। ওদিকে কম্যুনিষ্ট প্রবীর গ্রামের হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক ও মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কাজে আত্মনিয়োজিত। নন্দর বোন মাধবী তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু দেশের মুক্তি-সাধনায় একাগ্রচিত্ত প্রবীর তাহার প্রতি উদাসীন। অকস্মাৎ পূর্ব্বদিগন্তে দেখা দিল ঝটিকার পূর্ব্বাভাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাবে ক্ষুদ্র কলাতিয়া গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা উলট-পালট হইয়া গেল, তারপর সেই বিপর্য্যস্ত পল্লীর বুকে সুরু হইল আগষ্ট-আন্দোলনের তাণ্ডবলীলা। কলাতিয়ার পল্লী-পথ পুলিসের গুলিতে নিহত গ্রামবাসীদের রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রবীর এ আন্দোলনের সমর্থক ছিল না, কিন্তু জমিদারের ষড়যন্ত্রে বন্দীকৃত হইয়া তাহাকে তাহার কল্পনার স্বর্গ জন্মপল্লী হইতে বিচ্যুত হইতে হইল।

উপন্যাসখানি বিয়োগান্ত। উপসংহারে বিচ্ছেদের দুঃখ, অ-কৃত-কার্য্যের মর্ম্মবেদনা, অকথিত বাণীর নীরব আকুলতা ইত্যাদি সব কিছুতে মিলিয়া বড় একটি ভাবব্যাকুলতাপূর্ণ স্নিগ্ধ-করুণ পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের মুক্তিসাধনায় গান্ধীপন্থী সুব্রত এবং কম্যুনিষ্ট প্রবীর উভয়েরই বিফলতা হৃদয়কে পীড়া দেয়। কিন্তু লেখক আশাবাদী এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। তাই তিনি আশ্বাস দিয়াছেন—"অগ্নিদগ্ধ দেশের ভস্মরাশি থেকেই নবজীবনের অঙ্কুরোদ্গম হবে। মিথ্যা আশ্বাস নয়, রূপকথা আর স্বপ্ন নয়, তাদের সাধনা সার্থক হবেই।"—সুগভীর দেশ-প্রীতিই যে লেখককে এই উপন্যাস-রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, ইহার ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ আছে। লেখকের ভাষার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, আসলে যে তিনি রোম্যান্টিক-ধর্ম্মী কবি তা তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনা পড়িলেই বুঝা যায়। উপমাগুলি স্থানে স্থানে বাস্তবিকই চমক লাগাইয়া দেয়।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ছুটির ঘণ্টা—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম্ এ, বি-টি। পাইওনীয়ার বুক কোং, ১৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০।

বইখানি টেক্সটবুক কমিটি কর্ত্তৃক সেকেণ্ডারি স্কুলসমূহে অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বইটি যে সুলিখিত ও কিশোরদের

প্রবাসীর পুস্তকাবলী

মহাভারত (সচিত্র) ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৯৲
সচিত্র বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়	৶০
সচিত্র বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ—ঐ	৶০
চাটার্জির পিক্‌চার এল্‌বাম (১, ৪, ৫, ৮ ও ৯ বাদে)	প্রত্যেক ৪৲
উষসী (মনোজ্ঞ গল্পসমষ্টি)— ঐ	২৲
সোনার খাঁচা— শ্রীসীতা দেবী	২৷০
আজব দেশ (ছেলেমেয়েদের সচিত্র) ঐ	১৲
বজ্রমণি (শ্রেষ্ঠ গল্পসমষ্টি) ঐ	২৲
উদ্যানলতা (উপন্যাস)—শ্রীশান্তা ও সীতা দেবী	২৷০
কালিদাসের গল্প (সচিত্র)—শ্রীরঘুনাথ মল্লিক	৪৲
গীত উপক্রমণিকা—(১ম ও ২য় ভাগ) প্রত্যেক	১৷০
জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ—ভারতচন্দ্র মজুমদার	১৷০
কিশোরদের মন—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৷০
চণ্ডীদাস চরিত—(৺কৃষ্ণপ্রসাদ সেন) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সংস্কৃত	২৷০
মেঘদূত (সচিত্র)—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	৩৷০
হিমালয় পারে কৈলাস ও মানস সরোবর (সচিত্র)— শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪৲
পাথুরে বাঁদর রামদাস (সচিত্র)— শ্রীঅসিতকুমার হালদার	১৷০
জলনা—শ্রীহেমলতা দেবী	১৷০
খেলাধূলা (সচিত্র)—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৷০
বিলাপিকা—শ্রীযামিনীভূষণ সাহিত্যাচার্য্য	১৶০
ল্যাপল্যাণ্ড (সচিত্র)—শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ	১৷০

ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

BOOKS AVAILABLE

	Rs.	As.
Chatterjee's Picture Albums—Nos. 1 to 17 (*No. 1, 4, 5, 8 & 9 out of Stock*) each No. at	4	0
History of Orissa Vols. I & II —R. D. Banerji each Vol.	25	0
Canons of Orissan Architecture—N. K. Basu	12	0
Dynasties of Mediæval Orissa— Pt. Binayak Misra	5	0
Eminent Americans: Whom Indians Should Know— Rev. Dr. J. T. Sunderland	4	8
Emerson & His Friends— ditto	4	0
Evolution & Religion— ditto	3	0
Origin and Character of the Bible ditto	3	0
Rajmohan's Wife—Bankim Ch. Chatterjee	2	0
Prayag or Allahabad—(*Illustrated*)	3	0
The Knight Errant (*Novel*)—Sita Devi	3	8
The Garden Creeper (*Illust. Novel*)— Santa Devi & Sita Devi	3	8
Tales of Bengal—Santa Devi & Sita Devi	3	0
Plantation Labour in India—Dr. R. K. Das	3	8
India And A New Civilization— ditto	4	0
Mussolini and the Cult of Italian Youth (*Illust.*)—P. N. Roy	4	8
Story of Satara (*Illust. History*) —Major B. D. Basu	10	0
My Sojourn in England— ditto	2	0
History of the British Occupation in India —[*An epitome of Major Basu's first book in the list.*]—N. Kasturi	3	0
History of the Reign of Shah Alum— W. Franklin	3	0
The History of Medieval Vaishnavism in Orissa—With introduction by Sir Jadunath Sarkar.—Prabhat Mukherjee	6	0
The First Point of Aswini—Jogesh Ch. Roy	0	8
Protection of Minorities— Radha Kumud Mukherji	0	4

Postage Extra.

The Modern Review Office

120-2, Upper Circular Road, CALCUTTA

উপযোগী হইয়াছে তৃতীয় সংস্করণই তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে কয়েকটি মহাপুরুষের জীবনী এবং কৌতূহলোদ্দীপক ও জ্ঞাতব্য তথ্যমূলক কয়েকটি ঘটনা অবলম্বনে রচিত সচিত্র গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

জয়ন্তী শিশুসাথী (১৩৫৩)—সম্পাদক শ্রীআশুতোষ ধর। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ২২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪৲।

অতীত বৎসরের বার্ষিক শিশুসাথীর ন্যায় এবারওইহা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও শিল্পিগণের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও ছবির উৎকর্ষতায় পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান বার্ষিকীর বিশেষত্ব এই যে, শিশুজনপ্রিয় মাসিক শিশুসাথী এই বৎসরে ২৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া জয়ন্তী সংখ্যার বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং প্রকাশকগণ ইহাকে চিত্র ও রচনাসম্ভারে সুসমৃদ্ধ ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। মুখবন্ধে শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমরাও বলি—তথাস্তু।

অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹

পৌনে দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগ ইউরোপীয়গণের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। যে সকল আবিষ্কারক আফ্রিকার দুর্গম ও সঙ্কটসঙ্কুল প্রদেশগুলির অজানা তথ্য সকল সভ্যসমাজে সুপরিচিত করিয়াছেন, মঙ্গোপার্ক তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান অভিযানকারী। নাইগার নদীর উৎসের সন্ধানে আফ্রিকার অভ্যন্তরে তাঁহার কয়েক হাজার মাইল অভিযানের কাহিনী রোমাঞ্চকর ঘটনায় পূর্ণ, তিনি তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে এই সকল ঘটনা মনোজ্ঞ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বহুবার অসভ্য আফ্রিকাবাসী সর্দ্দারগণের হস্তে বন্দী হইয়া তিনি কি ভীষণভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছিলেন ও কি অমানুষিক অত্যাচার ও শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তিনি কি অতুলনীয় সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নারায়ণবাবুর রচনার সতেজ ও বলিষ্ঠ ভঙ্গী পাঠকের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করিবে।

আবৃত্তি, গান, অভিনয়—শ্রীসুনির্ম্মল বসু। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

সুনির্ম্মল বাবুর পাকা হাতের রচিত আবৃত্তি ও গানের সুরসাল ছড়াগুলি সভার আসরে প্রচুর হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করিবে। কয়েকটি কবিতায় ছন্দের যাদুকর সুকুমার রায় চৌধুরী রচিত কবিতার বিষয়বস্তু, ছন্দ ও সুরের আভাস পাওয়া যায়। অভিনয়ের অংশগুলিও সুরচিত হইয়াছে। কয়েকটি বিষম রকমের প্রাদেশিকতাদুষ্ট শব্দের সংশোধন বাঞ্ছনীয়, যথা, খ্যাংরার স্থলে খ্যাংড়া, নোংরার স্থলে নোংড়া ইত্যাদি।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

মুদ্রাকর ও প্রকাশক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



প্রকৃতি ও আনন্দ
(চণ্ডালিকা)
শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



বিঠল মন্দির



কাদালাইকল গণেশ মন্দির

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড | শ্রাবণ, ১৩৫৪ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত ও বাংলার ভবিষ্যৎ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে, "The road to Hell is paved with good intentions." "নরকের পথ সদুদ্দেশ্যে বাঁধান।" বর্তমানে যাঁহারা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছেন তাঁহাদের ঐ প্রবাদবাক্যটি প্রতিদিন স্মরণ করা প্রয়োজন। এতদিন যাবৎ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যত বার কংগ্রেসের আদর্শ উপেক্ষা করিয়া দেশের অপকার করিয়াছেন, তত বারই তাঁহারা দেশকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের ভুল হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভাল। লীগ প্রবল হইল কংগ্রেসের সদিচ্ছার ফলে, হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাড়িল মুসলমানকে তাহার প্রাপ্যের অধিক দানে, দেশকে যুদ্ধের পাঁচ বৎসরের জন্য জাতীয়তাবাদ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াবাদীদিগের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাকৃত বনবাস-সংকল্পের ফলে। আজ সারা ভারতে যে অরাজকতা, অনাচার ও দুর্নীতির বন্যা বহিয়া যাইতেছে তাহার উৎপত্তি ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ হইতে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার বৃদ্ধি ও তাহার বীভৎসতাবৃদ্ধির জন্য কংগ্রেসের নেতৃবর্গের দায়িত্বহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কার্য্যকলাপ অনেকাংশে দায়ী সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহা বিগত হইয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা বৃথা ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু আজ আমাদের এই সকল অপ্রিয় কথা বলিতে হইতেছে তাহার কারণ আমরা দেখিতেছি যে এত দুর্দশা, এত বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিপদের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অধিকাংশের মধ্যে আজও কোন চেতনার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আজও শুনিতেছি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভাল, কিছু সময় পাইলে তাঁহারা ভুলভ্রান্তি শুধরাইয়া লইবেন। কিন্তু দেখিতেছি যে তাঁহাদের ভুলভ্রান্তির অন্ত নাই, সে সব [illegible]ই চলিতেছে, অথচ শুধরাইবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, তাঁহারা নিজেদের পথে চলিয়া দেশকে ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর জলে লইয়া যাইতেছেন।

আমরা কংগ্রেসের মূলনীতি ও আদর্শবাদ অনুযায়ী জাতীয়তাবাদে দৃঢ় আস্থা পোষণ করি, এবং ইহাও আমরা বিশ্বাস করি যে ঐ নীতিগত কঠোর পন্থা অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ গৌরবময় ভবিষ্যতের অধিকারী হইবে। কিন্তু ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে অসমর্থ যে কংগ্রেস কোনও ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসমষ্টির নিজস্ব সম্পত্তি। কংগ্রেসের আদর্শ অবলম্বনে দেশের বা দশের হিতসাধনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টিত হওয়া উচিত, সে আদর্শ সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেকেরই স্বার্থত্যাগ ও দুঃখ-বরণের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত একথা আমরা আজীবন শুনিয়া আসিয়াছি ও সমর্থনও করিয়াছি। কিন্তু ১৯২৪ সাল হইতে আমরা দেখিতেছি যে, "ত্যাগ" ও "কারাবরণ" মূল্যবান পণ্য-বিশেষ। ইহার বিনিময়ে অতি অযোগ্য লোকও উচ্চ পদ লাভে সমর্থ হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে নিকৃষ্টতর লোকের সহায়করূপে ঐরূপ অনুচরবর্গের অন্যায় লাভের পথ পরিষ্কার করিতে সমর্থ। এইরূপ অযোগ্য লোক এবং তাহাদের দুষ্ট অনুচরবর্গের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের ফলে দেশের দুর্দশা এবং কংগ্রেসের অধঃপতন কতটা হইতে পারে তাহা নেতৃবর্গ আজ বিশ বৎসর যাবৎ ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাইলেন না, যাহার ফলে ভারতের বর্তমান দুরবস্থা শোধনের আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতেছে। এতদিন ভারতের স্বাধীনতা ও গৌরবময় স্বাতন্ত্র্যের প্রধান অন্তরায় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সে অন্তরায় দূর হওয়ার দিন আসন্ন। শেষে কি কংগ্রেস-নেতৃবর্গের অদূরদর্শিতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আবার ভারতের ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে ?

দেশের প্রত্যেক লোকের এ বিষয়ে গভীর চিন্তার দিন আজ আসিয়াছে। কেবল পতাকা-উত্তোলনেই স্বাধীনতা আসিবে না। অনেক দুঃখে আমাদের এই সকল অপ্রিয় কথা বলিতে হইতেছে। বাংলাদেশে আমরা কংগ্রেস-নেতৃবর্গের কাণ্ডজ্ঞান-হীন ব্যবস্থা ও বিচারের যে বিষময় ফল ভোগ করিতেছি ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের এতটা দুর্ভাগ্য হয় নাই। এই বাংলাদেশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও সমস্ত ভারতের পথ নির্দেশ করিত, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাংলাদেশের কথা প্রসঙ্গেই এক-জন অবাঙালী বলিয়াছেন, "What Bengal thinks to-day, the rest of India will think to-morrow." আজ সেই বাংলার কংগ্রেসের "নেতৃবর্গ" বিভিন্ন প্রদেশের নেতাগণের চাটুকারে পরিণত, বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে

বুদ্ধির কর্ম্মী ভিন্ন অন্য সকলেই কতিপয় দলাদলি ও চক্রান্তে নিপুণ "পালের গোদা"র প্রসাদভিক্ষু অনুচর, না নিষ্ক্রিয় অন্ধভক্ত। ফলে বাংলার কংগ্রেসের যে অধঃপতন হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়। বাংলার কংগ্রেস-প্রতিনিধি আজ এই কারণেই সমস্ত ভারতে উপেক্ষা, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার পাত্র।

বাংলার ভবিষ্যৎ

বাংলার এক অংশে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ আলোক পড়িবে ইহা আনন্দের কথা। কিন্তু আর এক অংশে জাতীয়তা-বাদ আরও গভীরতর অন্ধকারে পড়িবার আশঙ্কা, এ কথা আমাদের প্রতিদিনই স্মরণ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের সৌভাগ্যের দিন যদি আসে তবে প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইবে পূর্ব্ববঙ্গের ভাইবোনদের সাহায্য ও দুঃখ-প্রতিকারে চেষ্টিত থাকা।

অনেকেই বলিবেন যে, পশ্চিমবঙ্গ যখন কংগ্রেসের দখলে আসিয়াছে তখন "সৌভাগ্যের দিন যদি আসে" একথা বলা ঠিক নহে। আমরা সেখানে বলিব যে পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এক দলের হাতে আসিয়াছে মাত্র, যদি সেই দল কংগ্রেসের মূলনীতি ও আদর্শবাদ সঠিকভাবে অনু-সরণ করিয়া চলে, তবেই দেশ কংগ্রেসের পথে চলিবে, অন্যথায় কংগ্রেস ভেকধারী সুবিধাবাদী চক্রান্তকারীর হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গও বৃহত্তর "কলিকাতা করপোরেশনেই" পরিণত হইবে। প্রফুল্লবাবুর মন্ত্রীসভা যে দিন এ কথা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিবেন যে দেশের লোক তাঁহা-দিগকে কংগ্রেসের প্রতীক রূপেই ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহারা নিজেদের গুণ বা যোগ্যতার বলে সেখানে বসেন নাই—কেননা সেই দুইয়ের প্রাচুর্য্যের কোনই প্রমাণ তাঁহারা দেশকে অদ্যাবধি দিতে পারেন নাই, বরঞ্চ দারুণ বুদ্ধির অভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন—সেই দিন ঐ ভয় যাইবে।

"কলিকাতা করপোরেশন" দেশবন্ধু দাশের কর্তৃত্বে কংগ্রেস-দলের অধিকারে আসে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে। যে সময় কংগ্রেস-দল ঐ নাগরিক প্রতিষ্ঠানটি আয়ত্তে আনিল তখন কলিকাতার প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভাবিয়াছিল এই বার কংগ্রেসের অধিকারে এই মহানগরী সকল দিকে উন্নত হইয়া কংগ্রেসের আদর্শের গৌরবে দেশকে পুলকিত করিবে। সেই দলগত অধিকার আজও আছে, প্রভেদের মধ্যে কলিকাতা করপোরেশন "কলিকাতা চোর-পোরেশনে" পরিণত হওয়ায় তাহার দুর্গন্ধ এতই তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে উহার চালনায় কংগ্রেসের হাত নাই।

যথাস্থানে যোগ্য গুণী ব্যক্তি নিয়োগ ইহাই দেশের রক্ষণা-বেক্ষণ ও উন্নতির একমাত্র পথ। যে দেশে ও যে জাতিতে—যে কোন কারণ বা অজুহাতে—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে সে স্থলে সে দেশের ও জাতির অবনতি সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ এমন কিছু যাদুমন্ত্র জানেন না যে এই সর্ব্বলোকবিদিত নিয়ম তাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতি-পদে লঙ্ঘন করিবেন অথচ দেশের অপকার হইবে না।

বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যাঁহারা কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়তেই চতুর্দ্দিকে বহুস্থলে অযোগ্য লোক নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ব্যবস্থাপক ও রাষ্ট্র-পরিষদ অযোগ্য—এমন কি অকর্ম্মণ্য—লোকেই পূর্ণ হইয়াছে, দুই-একটি উপযুক্ত প্রতিনিধি বাংলার ভাগ্যক্রমে তাহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বাংলার দুর্ভিক্ষের ছায়া গাঢ় হইতে চলিয়াছে, এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলে সাধারণের খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির (সিভিল সাপ্লাই) বিষয়ে ভার দেওয়া হইয়াছে অতি অযোগ্য লোকের হাতে, উপরন্তু তাঁহার সেক্রেটারী ও সিভিল সাপ্লাই কমিশনারের পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাতে চুরির পথ পরিষ্কার করা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা হইল মনে হয় না। কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি এবং তাঁহার সেক্রেটারী ও ডাইরেক্টর উভয়েই সমান অযোগ্য। বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার, কপালে কি আছে ভগবান জানেন।

পুলিস বিভাগে নিয়োগেও ঐরূপ গোলমাল হইয়াছে। প্রফুল্লবাবুর মন্ত্রীসভা দেশের শান্তিরক্ষা এভাবে করিতে পারি-বেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে সকল ধূর্ত্ত ফন্দিবাজ তাঁহাদের কাঁধে ধরিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করাইতেছে তাহারা দূর না হইলে দেশের অপকার ও প্রফুল্লবাবুর দুর্নাম অনিবার্য্য।

পশ্চিম-বাংলার শাসনযন্ত্র

১৫ই আগষ্ট হইতে পশ্চিম বাংলার শাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য যে সব কর্ম্মচারীকে ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহাদের নাম মোটামুটি এইরূপ :—

চীফ	সেক্রেটারী	শ্রীযুক্ত	সুকুমার সেন
রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য		,,	সত্যেন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি
গবর্ণরের	সেক্রেটারী	,,	বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রধান মন্ত্রীর	,,	,,	করুণাকুমার হাজরা
অর্থ	,,	,,	সুশীল মুখার্জ্জি
হোম	সেক্রেটারী	,,	রণজিৎ গুপ্ত
শিক্ষা	,,	,,	শৈবাল গুপ্ত
সিভিল সাপ্লাই		,,	সন্তোষ চ্যাটার্জ্জি
কৃষি	,,	,,	কৃপালনী
চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট			শ্রীরবীন্দ্র মিত্র
বীরভূমের		,,	শ্রীনিত্যগোপাল রায়
সার্জ্জন-জেনারেল ও স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর			ডাঃ অমিল চ্যাটার্জ্জি
কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর			শ্রীসুশীল দে
সিভিল সাপ্লাই কমিশনার			মিঃ এ ডি খাঁ
ইনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের চেয়ারম্যান			শ্রীপ্রত্যোৎ রায়

এই তালিকা অসম্পূর্ণ। সমস্ত নাম দেখিলেই বুঝা যাইবে যে অধিকাংশ পদেই বিচার বিভাগ হইতে লোক আনিয়া শাসন বিভাগে বসান হইয়াছে। ইহাতে অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তারতম্য হইবে, কিন্তু মন্ত্রী যোগ্য লোক হইলে ক্ষতি হইবে না। চীফ সেক্রেটারী, গবর্ণরের সেক্রেটারী, প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী এবং ফিনান্স সেক্রেটারী নিয়োগ ভালই হইয়াছে। ডাঃ এ সি চ্যাটার্জির নিয়োগেও দেশবাসী সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি নিয়োগই দুই কারণে উপযুক্ত হয় নাই। কয়েকজন যোগ্য লোককে অল্প দায়িত্বপূর্ণ পদে বসান হইয়াছে এবং কয়েকজন জাতীয়তাবিরোধী ও অনুপযুক্ত লোককে উচ্চপদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশৈবাল গুপ্তের কর্মজীবনের ইতিহাস নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার চরিত্রবল, কর্মদক্ষতা এবং স্বদেশপ্রীতি সুবিদিত। দেশবাসী ইঁহাকে হোম সেক্রেটারীরূপে দেখিতে চাহিয়াছিল। এই পদে তিনি যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং ইহাতে দেশের প্রকৃত উপকার হইত। কিন্তু যোগ্যস্থানে তাঁহাকে না দিয়া শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারীর পদে বসাইয়া এমন একটা ভাব দেখান হইয়াছে যে তাঁহাকে বুঝিবা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশৈবাল গুপ্তের কর্মজীবনে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেখা গিয়াছে যে তিনি অনুগ্রহ বা পুরস্কারের প্রত্যাশী নহেন। হোম সেক্রেটারী যাঁহাকে করা হইয়াছে তাঁহার উপর দেশবাসীর আস্থা নাই। নোয়াখালীর ঘটনার অনুসন্ধানে ইঁহার আচরণ ও রিপোর্ট লোকে সহজে ভুলিবে না।

সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনরের পদ হইতে শ্রীসত্যেন রায়কে সরাইয়া তাঁহাকে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় এবং পরবর্তীকালে চৌর্য্য ও লুণ্ঠন নিবারণে ইঁহার কৃতিত্ব সুবিদিত। যে সময়ে ঊর্দ্ধতন কর্মচারীদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রণোদিত বাধাযুক্ত হইয়া ইনি ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিতেন সেই সময়ে ইঁহাকে সরাইয়া দেওয়া হইল। তৎস্থলে যাঁহাকে বসানো হইয়াছে তাঁহার কর্মজীবনে দক্ষতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইঁহারই আমলে ২০ লক্ষ পেট্রোল-কুপন চুরি গিয়াছিল।

সিভিল সাপ্লাই বিভাগের সেক্রেটারী করা হইয়াছে শ্রীসন্তোষ চ্যাটার্জিকে। জাতীয়তাবিরোধী বলিয়া ইঁহার কুখ্যাতি যথেষ্ট, মেদিনীপুর জেলায় মহকুমা হাকিম রূপে ইঁহার আচরণ গৌরবজনক নহে। গোলার্ডের মামলায় এই ব্যক্তি উপরওয়ালাদের তুষ্ট করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে হাইকোর্ট তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইনি নিজের বিবেককে যে কোন রূপ দিতে পারেন (Plastic conscience) এবং বিচারবুদ্ধি টানিয়া লম্বা করিতেও পারেন। বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন সিভিলিয়ান জজ এত তীব্র ভাবে হাইকোর্ট কর্তৃক তিরস্কৃত হন নাই।

চব্বিশ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন শ্রীরথীন্দ্র মিত্র। লীগ শাসনকালে গত কয়েক বৎসর প্রেস অফিসার রূপে ইনি উৎসাহের সহিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির উন্নতি বিস্ময়জনক।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে শ্রীনিত্যগোপাল রায়কে বহাল রাখা হইয়াছে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে যুদ্ধের সময় ইনি ডাইস-কন্ট্রোলার হন। ইঁহার আমলে চিনির চোরাকারবার চরমে ওঠে এবং ইঁহারও যথেষ্ট বদনাম রটে। নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে এই ব্যক্তি যে শোচনীয় অদূরদর্শিতা, অক্ষমতা ও অপদার্থতা দেখাইয়া আসিয়াছেন তাহার পর ইঁহাকে বরখাস্ত করাই একমাত্র পন্থা ছিল। কংগ্রেস-শাসনে স্বাধীন ভারতে এইরূপ ব্যক্তিকে উচ্চপদে বহাল রাখা আমরা ঘোর কলঙ্কের বিষয় বলিয়া মনে করি।

কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী করা হইয়াছে শ্রীকৃপালনীকে। দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহার হাতে দিনাজপুরে চাউল থাকিতেও অনাহারে লোক মরার যে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং ইঁহার ব্যক্তিগত মতিগতি সম্বন্ধে যে সংবাদ জানা আছে তাহাতে কৃষি বিভাগের ন্যায় একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে ইঁহাকে বসানো অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। বাংলার কৃষির উন্নতি করিতে না পারিলে এক দিকে যেমন খাদ্যাভাব ঘুচিবে না, আর এক দিকে তেমনি গ্রামবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতিও হইবে না। অথচ জাতি গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই বিভাগটির মন্ত্রী, সেক্রেটারী এবং ডিরেক্টর নিয়োগ দেখিয়া মনে হয় যেন কংগ্রেসী মন্ত্রীরা উহা তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় বর্ত্তমানে যে মৎস্য-ব্যবসায়ী দলটি টাকার জোরে জোট পাকাইয়া মাছের দর সাড়ে তিন টাকায় চড়াইয়া রাখিয়াছে মন্ত্রীবর শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর তাহাদের এক জন। সরকারী ক্ষমতার জোরে এবার মাছের দর ছয় টাকায় তুলিবার চেষ্টা হয়ত তিনি করিতে পারিবেন, কিন্তু কৃষি বা মৎস্যজীবীদের উন্নতিবিধানের সামর্থ্য ইঁহার আছে আশা করি তাঁহার পরম শত্রুও এই অপবাদ দিবেন না। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর সাহেবেরও অকর্ম্মণ্যতার খ্যাতি আছে।

এই কয়েকটি পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইলে ডাঃ ঘোষের শাসনযন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তালিকা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইত। তবে এখনও সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এখনও এইটুকু সংশোধন তিনি করিতে পারেন।

পুলিসে রদবদল

পুলিস বিভাগের নূতন ব্যবস্থায় গলদ অত্যন্ত বেশী হইয়াছে এবং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে চক্রান্ত এড়াইতে গিয়া ডাঃ ঘোষ অতি দুষ্ট কন্দীবাজদের হাতে পড়িয়াছেন।

বেঙ্গল পুলিসের ইন্সপেক্টর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন শ্রীহরকুমার গুপ্ত। ইনি উপযুক্ত লোক, অভিজ্ঞ এবং কর্মদক্ষ। উপরওয়ালাকে তুষ্ট করিবার জন্য ইনি কখনও

নিজের বিবেক বিক্রয় করেন নাই। আমরা আশা করি ইঁহার পরিচালনাধীনে বেঙ্গল পুলিসের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। শ্রীহীরেন গুপ্ত, শ্রীমাধবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীহীরেন সরকারকে ডি-আই-জি করা হইয়াছে। শ্রীহীরালাল সাহাকে হুগলীর পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট করা হইয়াছে। কলিকাতার পুলিস কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে চব্বিশ পরগণার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। এই নিয়োগ লোকে ভাল চক্ষে দেখে নাই। ইঁহার পিতা বসন্ত চট্টোপাধ্যায় টেগার্ট সাহেবের দক্ষিণ হস্তরূপে স্বদেশী আন্দোলন দমনে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিপ্লবী যুবকদের গুলির আঘাতে নিহত হন। পিতার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ গবর্মেণ্ট ইঁহাদের তিন ভ্রাতাকেই পুলিসে চাকুরি দেন। কলিকাতার গত বৎসর আগষ্ট মাসের হাঙ্গামার আরম্ভের কয় দিন পরে বেলিয়াঘাটাতে ইঁহার এলাকায় উড়িয়ার দল নিহত হয়। স্থানীয় অবস্থা জানিয়াও ইনি ইহাদিগকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কৃতিত্ব অথবা সিনিয়রিটি কোন দিক দিয়াই ইঁহার পুলিস কমিশনার হওয়ার দাবি টিঁকে না। সিভিল লিষ্টে সিনিয়রিটি হিসাবে প্রথম কয়েকজন বাঙালীর নাম এইরূপ :

শ্রীসুকুমার গুপ্ত—	কার্য্যকাল প্রায়	২৪ বৎসর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়—	"	৩০ বৎসর
শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—	"	৩০ বৎসর
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—	"	২২ বৎসর
শ্রীহীরালাল সাহা—	"	২২ বৎসর
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—	"	২২ বৎসর
শ্রীসর্ব্বদাস ভট্টাচার্য্য—	"	২০ বৎসর
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার—	"	১৯ বৎসর

ডি-আই-জির পদ অপেক্ষা কলিকাতার পুলিস কমিশনারের পদ উচ্চ, উহা আই-জির সমকক্ষ। সে হিসাবে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার উপরের চার জনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। দক্ষতা হিসাবেও তাঁহার উপরের চার জনের ইতিহাস তাঁহা অপেক্ষা ভাল ছাড়া কোন দিক দিয়াই খারাপ নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি দেখা হয় নাই। কলিকাতার পুলিস কমিশনার কলিকাতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলে কাজ ভাল হইবে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান গোলযোগের মধ্যে কলিকাতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নূতন লোকের চেয়ে শহরের পুলিশ ও শান্তিরক্ষার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক আনা প্রয়োজন ইহা মতলবী লোক ভিন্ন সকলেই স্বীকার করিবেন। সেদিক দিয়া শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সমকক্ষ অফিসার দুই জনের দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য। শ্রীসর্ব্বদাস ভট্টাচার্য্য কলিকাতা পুলিসে নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট এবং পোর্ট এই তিন স্থানের ডেপুটি কমিশনার পদে দক্ষতা ও সুনামের সহিত দীর্ঘকাল কাজ করিয়াছেন, সুতরাং কলিকাতা পুলিস সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। শ্রীহীরেন সরকার প্রায় দশ বৎসর কলিকাতা পুলিসের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টে দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। কলিকাতার শান্তিরক্ষা যাঁহারা অন্তরের সহিত কামনা করেন তাঁহারা শ্রীসর্ব্বদাস ভট্টাচার্য্যকে কমিশনার এবং শ্রীহীরেন সরকারকে হেডকোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার রূপে দেখিতে চাহিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা পুলিসের নিয়োগগুলি দেখিয়া শহরের শান্তিরক্ষার আগ্রহ অপেক্ষা বেঙ্গল পুলিসের বিশেষ একটি দল কর্ত্তৃক কলিকাতা পুলিস-পদ দখলের অভিপ্রায়ই যেন বেশী করিয়া ব্যক্ত হইতেছে। নীচের নাম ও কর্ম্মজীবনের পরিচয় হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে :

শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী—হেড কোয়ার্টার্সের ডেপুটি কমিশনার। কার্য্যকাল প্রায় ১৮ বৎসর। কলিকাতার পোর্ট পুলিস এবং মোটর ভেহিকেলসের ডেপুটি কমিশনাররূপে কাজ করিয়াছেন, থানা পরিচালনায় বা গোয়েন্দা বিভাগের অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই।

শ্রীরণজিৎ গুপ্ত—হেড কোয়ার্টার্সের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার। মোট কার্য্যকালই ৫ বৎসর। অভিজ্ঞতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসু—স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার। কার্য্যকাল ৯ বৎসর।

শ্রীদুর্গাপতি চট্টোপাধ্যায়—সিকিউরিটি কণ্ট্রোলার, ডেপুটি কমিশনার। কার্য্যকাল ১১ বৎসর।

শ্রীপ্রণবকুমার সেন—ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কমিশনার। কার্য্যকাল ৯ বৎসর অমধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক এ-আর-পিতে কাটিয়াছে। লীগ মনোনীত কর্ম্মচারীরূপে ইঁহাকে এই পদে আনা হইয়াছিল। ইঁহার বর্ত্তমান কার্য্যকালে ডাঃ এডিথ ঘোষ, অধ্যাপক অজিত সাহা, গদাধর মল্লিক প্রভৃতি নিহত হন এবং ইঁহার পরিচালনাধীনে গোয়েন্দা বিভাগ তাহার কোন কিনারা করিতে পারে নাই।

লীগ শাসনকালে কলিকাতা পুলিসের দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের থানার ভার হইতে সরাইয়া পুলিস ট্রেনিং, এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রভৃতিতে রাখা হইয়াছিল। গত বৎসর আগষ্ট মাস হইতে কলিকাতা পুলিসে উন্নতি হইয়াছে এক দল মুসলমানের ও লীগের তাঁবেদার কতকগুলি হিন্দু কর্ম্মচারীর। লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে সহায়তা করিবার জন্য যাহারা পক্ষপাতিত্ব করিতে পারিয়াছে তাহাদিগকেই শুধু থানার ও অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখা হইয়াছে। থানা হইতে অপসারিত ভাল কর্ম্মচারীরা কাজ করিবার সুযোগ পান নাই অথচ সকলের সঙ্গে একযোগে বদনামের ভাগী হইয়াছেন। এবার ইঁহাদিগের সাহায্যে কর্ত্তৃপক্ষ শান্তি রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে সুফল পাইতেন বলিয়াই লোকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া কেবল

পুলিস হইতে উচ্চ ও নীচ সর্ব্ববিধ পদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারী আমদানী করিয়া শহরের শান্তিরক্ষাকার্য্য আরও জটিল করিয়া তুলিতেছেন। কলিকাতা পুলিসের সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ কর্ম্মচারীদের মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কোন থানার বা হেড কোয়ার্টার্সের ভার না দিয়া মোটর ভেহিকেলসের ভার দেওয়া হইয়াছে। ইঁহার কর্ম্মদক্ষতা এবং সততা সম্বন্ধে খ্যাতি সুবিদিত। ইঁহাকে চোরাকারবার দমন ও শান্তিরক্ষাকার্য্য হইতে কেরাণীগিরিতে সরাইয়া দেওয়ার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে ঘুষ ও চুরির রাস্তা এখনও খোলা রাখিবার ইচ্ছা কাহারও কাহারও আছে।

কলিকাতা পুলিসের নিয়োগ প্রভৃতি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, শ্রীপ্রণবকুমার সেন এবং শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জির দ্বারা হইতেছে এইরূপ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রটিয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তি এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল, কার্য্যকাল ১৬ বৎসর এবং কলিকাতায় আসিয়াছেন বৎসরখানেক আগে। কলিকাতা পুলিস সম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চা করিবার কোন কারণ ইঁহার নাই কিন্তু তিনি উহা করিতেছেন। এ বিষয়ে প্রথমেই আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। শ্রীসুরেন চ্যাটার্জ্জির সহিত কোন মন্ত্রীর এবং শ্রীউপানন্দ মুখার্জ্জির বিবাহ-ঘটিত সম্পর্ক আছে কিনা?

কলিকাতা পুলিসের দক্ষতা বৃদ্ধির নামে ইঁহারা যে সব নিয়োগ করিতেছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে ডেপুটি কমিশনারের পদে অত্যন্ত জুনিয়র এবং কলিকাতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আই পি বসানো হইতেছে। এখানে কলিকাতা পুলিসের দক্ষ কর্ম্মচারীদের নিযুক্ত করা উচিত ছিল। থানাগুলিতে দেখা যাইতেছে অত্যন্ত বেশী সংখ্যায় আই বি-র লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। কলিকাতায় এখন থানার কাজে এবং শহরের অবস্থা সম্বন্ধে দক্ষ লোকের প্রয়োজনই বেশী, গুপ্তচরের প্রয়োজন এখন নাই। নীচের নামগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে কি অশোভন ব্যস্ততার সহিত বেঙ্গল পুলিস হইতে গোয়েন্দা আনিয়া থানাগুলি ভর্ত্তি করা হইতেছে।

এসিষ্টাণ্ট কমিশনার—

শ্রীঅনিলকুমার মুখার্জ্জি—আই বি হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার।

শ্রীবঙ্কিম সরকার—আই বি হইতে আর্ম্মস এ্যাক্টের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার।

শ্রীতারাপদ কবিরাজ—বেঙ্গল সি আই ডি হইতে দক্ষিণ বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার। কলিকাতায় থানার কোন জ্ঞান নাই।

ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীজগদিন্দ্রনাথ মজুমদার—আই বি হইতে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট। থানার কাজ বা কলিকাতার ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীসন্তোষ চ্যাটার্জ্জি—আই বি হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

শ্রীযোগেশ মুখার্জ্জি—আই বি হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

থানা অফিসার—

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাগ—অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর, কার্য্যকাল ৭ বৎসর, মাণিকতলা থানা। বেঙ্গল পুলিসে ২য় পর্য্যায় ছিলেন।

শ্রীউপেন গুপ্ত—অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর। আই বি হইতে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানা। এই থানাটির এলাকায় লীগের বড় বড় আড্ডা আছে। থানার কাজ সম্বন্ধে এই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীশ্রীমন্ত বসু—অস্থায়ী ইন্‌স্‌পেক্টর। আই বি হইতে উত্তর বিভাগ কোর্ট পুলিস। থানার অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীসন্তোষ চক্রবর্ত্তী—আই বি হইতে বড়বাজার থানা। থানার অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু—সাব ইন্‌স্‌পেক্টর, ওয়াটগঞ্জ থানা। মেটিয়াবুরুজ হত্যাকাণ্ডের সময় তথাকার থানা অফিসার ছিলেন।

শ্রীশৈলেন সেন—সাব ইন্‌স্‌পেক্টর, পার্ক ষ্ট্রীট থানা। ১৭ বৎসর কাজ করিয়াছেন, কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কখনও হন নাই।

শ্রীকালীপদ দে—সাব ইন্‌স্‌পেক্টর, হেয়ার ষ্ট্রীট থানা। ইনি কখনও এ এস আই রূপেও থানার কাজ করেন নাই। হেয়ার ষ্ট্রীট এলাকায় লীগের বড় বড় ঘাঁটি আছে। ইনি লিটারেট কনেষ্টবল হিসাবে কাজে ঢুকিয়া অতিক্রতভাবে প্রমোশন পাইয়াছেন কিন্তু কোন দিন থানার কাজ করিতে হয় নাই।

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার—সাব ইন্‌সপেক্টর। আই বি হইতে সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট পোর্ট পুলিস। থানার অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীসুধাময় মুখার্জ্জি—সাব ইন্‌সপেক্টর। আই বি হইতে পোর্ট পুলিসের স্পেশাল ষ্টাফ। এই পদটির গুরুত্ব যথেষ্ট। ইনি অত্যন্ত জুনিয়র এবং থানার অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীনীহাররঞ্জন ভৌমিক—সাব ইন্‌সপেক্টর। আই বি হইতে কাশীপুর।

শ্রীশম্ভু চ্যাটার্জ্জি—সাব ইনসপেক্টর। আই বি হইতে মাণিকতলার দ্বিতীয় অফিসার। ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রবোধ নাগ ইঁহার জুনিয়র।

শ্রীসত্যেন বসু—সাব ইনসপেক্টর। আই বি হইতে গার্ডেন রীচ।

শ্রীহেমন্ত অধিকারী—সাব ইনসপেক্টর। আই বি হইতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ।

শ্রীতারানন্দ মুখার্জ্জি—সাব ইনসপেক্টর। ঝাঁটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদ হইতে বালিগঞ্জ। ইনি দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার সময় হাওড়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। সেখানে অযোগ্য প্রতিপন্ন হওয়ায় ঝাঁটিয়ায় বদলী হন। সেখানেও গোলযোগ থামাইতে অসমর্থ হন। তৎপরে এই প্রমোশন। ইহাতে ইঁহার বেতন

দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ইনি বর্তমান রমবলের অন্যতম কর্মকর্তা এ-আই-সি শ্রীউপানন্দ মুখার্জির ভ্রাতা।

এই তালিকায় উপর্যুক্ত কর্তাব্যক্তি চতুষ্টয়ের আত্মীয়, পোষ্য এবং প্রিয়পাত্র কতজন আছেন তার অনুসন্ধান অবিলম্বে হওয়া দরকার।

ময়মনসিংহ ও কলিকাতা সম্মেলন

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কর্তব্য নির্ধারণ সম্পর্কে দুইটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। একটি হইয়াছে ময়মনসিংহে কংগ্রেসের উদ্যোগে, দ্বিতীয়টি হইয়াছে কলিকাতায় হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে। এই সম্মেলনটি হওয়ার কথা ছিল নারায়ণগঞ্জে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার ফলে স্থান পরিবর্তন করিয়া সম্মেলন কলিকাতায় করিতে হয়।

ময়মনসিংহ সম্মেলনে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মূল প্রস্তাবটি এইরূপ :

"পাকিস্তান ডোমিনিয়নে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে মিঃ জিন্না যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং পাকিস্থান ও ভারত-সরকারের প্রতিনিধিগণ যুক্তভাবে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এই সম্মেলন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। সম্মেলন এই আশা পোষণ করে যে বাংলায় মুসলিম লীগের নেতারা ঐ সকল প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আন্তরিকতার সহিত অবহিত হইবেন এবং শাসন ব্যাপারের নীতি সম্পর্কে মিঃ জিন্না যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা তাঁহারা কথায় ও কাজে পূর্ণ করিবেন।"

"পূর্ব্ব ও উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলায় এবং শ্রীহট্টে এক শ্রেণীর মুসলমানের কার্য্যাবলীর সংবাদে সম্মেলন অত্যন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে এবং মিঃ জিন্নার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও যে সকল অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিতেছে তাহা বন্ধ করিবার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করা হইতেছে। সম্মেলন বিশ্বাস করে যে, যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত মুসলিম লীগ যদি নীতিগত ও কার্য্যকরীভাবে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা হইলে অমুসলমানেরাও বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া উত্তর-বঙ্গ, পূর্ব্ব-বঙ্গ ও শ্রীহট্ট লইয়া গঠিত নূতন রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যভার গ্রহণ করিবে।"

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় উহা উত্থাপন করিয়া বলেন যে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ভারত-বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বাংলার জনগণের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ খোলা ছিল—হয় সমগ্র বাংলা পাকিস্থানের নিকট সমর্পণ করা, অথবা উহা বিভক্ত করা। পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন, ইহার সমাধান মুখের কথায় হয় না। সকলকে সমবেতভাবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল হিন্দু পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উঠিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছেন তিনি তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের লোকদের পূর্ববঙ্গেই বাস করিতে হইবে, কারণ পশ্চিমবঙ্গে কোন উদ্বৃত্ত জমি নাই এবং সকলের কর্ম্ম-সংস্থানের উপায়ও নাই।

একটি প্রস্তাবে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ লোপ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়। আর একটিতে বলা হয় যে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের কয়েকটি স্থানের এবং শ্রীহট্টের হিন্দুরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সম্মেলন বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছেন; নিরাপত্তা-ব্যবস্থার অভাবেই যে ইহা হইতেছে তাহা সম্মেলন উপলব্ধি করিতেছে। তথাপি জনগণের নিকট অনুরোধ করা হইয়াছে যে শত আপদ-বিপদ সত্ত্বেও তাঁহারা যেন ঘরবাড়ী ত্যাগ না করেন। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারীগণকে পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "আজ জাতি এক ঘোর জটিলতার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সময় বাংলার জনগণ তাহাদের নেতৃবর্গের নিকট হইতে পথের নির্দ্দেশ চায়। কংগ্রেসের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই কংগ্রেসের আন্দোলন এখনও শেষ হয় নাই। এই আদর্শ যত দিন না সাফল্যলাভ করে তত দিন আন্দোলন চলিতেই থাকিবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সাময়িক সমাধান হিসাবে কংগ্রেস ৩রা জুনের পরিকল্পনা মানিয়া লইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়ন সাম্প্রদায়িক সমস্যা চিরতরে সমাধান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর।" পাকিস্থান ডোমিনিয়নও একই পথে চলিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

কলিকাতা সম্মেলনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবিলম্বে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করার ব্যবস্থা এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় পরিবেষ্টিত বিক্ষিপ্ত হিন্দুদের পশ্চিম বঙ্গে আনিবার জন্য দাবি করেন। বাংলার হিন্দু যুবক বিশেষ ভাবে ছাত্রদের নিকট আবেদন জানাইয়া তিনি বলেন যে তাহারা যেন অনতিবিলম্বে অন্ততঃ এক মাসের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন। এই সম্মেলনে নিম্নোদ্ধৃত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় :

"এই সম্মেলন সমগ্র হিন্দুস্থানকে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের প্রতি তাহার দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের সম্মানিত নাগরিক হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য দাবি করিতে এবং হিন্দুস্থানকে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এই সম্মেলন পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মসম্পর্কিত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা দাবি করিতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে, পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার অনুযায়ীই হিন্দুস্থানের সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার

করা উচিত এবং এইরূপ পারস্পরিক ব্যবহারের প্রথা অবলম্বন করিলে জবরদস্তি ও দুর্ব্ব্যবহারের সম্ভাবনা দূর হইবে।

যে সকল দুর্ব্বৃত্ত সংখ্যালঘুদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন ও জুলুম করিতেছে তাহাদের কঠোর শাস্তি দিয়া সংখ্যালঘুদের মনে বিশ্বাসের সঞ্চার করিবার জন্য এই সম্মেলন পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম লীগ সরকার ও পাকিস্থান ডোমিনিয়ন সরকারের নিকট দাবি করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ও ভারতীয় ইউনিয়নকে পাকিস্থান-সরকারের উপর পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের প্রতি সুব্যবহার করিবার জন্য চাপ দিতে অনুরোধ করিতেছে। পাকিস্থান-গণপরিষদের উপলব্ধি করা উচিত যে মুসলিম লীগ পতাকা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতীক। সুতরাং পাকিস্থানের জাতীয় পতাকা এমন হওয়া উচিত যাহা অ-মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণীয় হয়। মিঃ লিয়াকৎ আলির বিবৃতি অনুযায়ী মুসলিম লীগকে তাহার নিজ পতাকা ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, হিন্দুদেরও অনুরূপ ভাবে হিন্দু মহাসভার পতাকা উত্তোলন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত।

পাকিস্থান রাষ্ট্রে যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্মানিত নাগরিকরূপে বাস করা অসম্ভব বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের বাসস্থান ও আর্থিক উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ইউনিয়ন সরকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

বাস্তুত্যাগিগণকে, বিশেষ করিয়া যে সকল স্ত্রীলোক এবং শিশু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে বন্দোবস্ত করা উচিত।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের অসুবিধা বুঝিয়াও এই সম্মেলন তাহাদের বাস্তুত্যাগ করিয়া দেশের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতে নিষেধ করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি তাহাদের গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিত এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দাবি করা উচিত।

পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের জনসংখ্যার অনুপাতে উভয় সম্প্রদায়ের লোককে সরকারী চাকুরীতে গ্রহণ করা উচিত। যে সকল হিন্দু অফিসারের বাড়ী পাকিস্থান এলাকায় তাঁহাদের পূর্ব্ববঙ্গে থাকিয়া স্বদেশ ও সম্প্রদায়ের সেবা করা উচিত।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘুদের লইয়া এক একটি হিন্দু অঞ্চল গঠন করিবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার এবং অর্থ সংগ্রহ ও উপযুক্ত এলাকায় হিন্দুদের বসতি স্থাপন করিবার জন্য প্রতি জেলায় সংখ্যালঘু রক্ষা কমিটি গঠন করা দরকার। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গের জমির মালিকগণ পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদের নিকট হইতে অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের আইন করিয়া উহা বন্ধ করা উচিত।

পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা হইতে অর্থ উঠাইয়া লওয়া হইতেছে এবং উহা বন্ধ করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের অবিলম্বে ঘোষণা করা দরকার যে, কাহারও অর্থ বাজেয়াপ্ত করিবার উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই ও তাঁহারা সকলকে বাণিজ্যে সমান অধিকার দান করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গ-সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন পঞ্জাবী মুসলমানদের পুলিস বিভাগে নিয়োগ না করেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের স্থলে বাঙালী মুসলমানদের গ্রহণ করেন।

এই সম্মেলন পূর্ব্ববঙ্গের যুবক ও ছাত্রদের অন্ততঃ দুই মাসের জন্য তাহাদের স্ব-স্ব এলাকায় যাইয়া বাস করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি মিঃ জিন্নার প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ফিরিয়া আসিতে নিষেধ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি

পূর্ব্ববঙ্গ কংগ্রেস-পরিষদ দলের নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গবিভাগ হইয়া গিয়াছে এবং কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুদের গুরুতর সমস্যার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখা যাইতেছে; এখানকার সমস্যা-গুলিও দুরূহ। অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিলেও একথা আজ কেহই অস্বীকার করিবে না যে বিভিন্ন জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিতেছে, এমন কি বগুড়া জেলায় শবসংকারেও বাধা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আখাউড়ার ঘটনার কথাও সকলেই জানেন। আজ এক দিকে অসংযত কথাবার্ত্তা ও চাপা হুমকী, অন্য দিকে ব্যাপক আতঙ্ক পূর্ব্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুস্লিম লীগ নেতাদের উদ্দেশ্য যতই শান্তি-পূর্ণ হউক না কেন, লীগের কার্য্যসূচী যাহাই হউক না কেন, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছে যে ১৫ই আগষ্টের পর পাকিস্থানের হিন্দুদের বাড়ী-সম্পত্তি প্রভৃতি মুসলমানদের দখলে আসিবে এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদের দাস জাতিতে পরিণত হইবে। ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমানেরা তাহা-দের পাকিস্থানের এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে বলিয়া সর্ব্বত্র আশঙ্কার সঞ্চার হইয়াছে এবং মুস্লিম লীগ এখন হইতেই এই উন্মত্ততা হ্রাসের ব্যবস্থা না করিলে ভবিষ্যতে ইহাকে সংযত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। মিঃ জিন্নার বিবৃতি বেশ সন্তোষজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল বিবৃতিদ্বারা বিশেষ কোন কাজ হইবে না। লীগ-নেতারা যদি সত্য সত্যই মুস্লিম জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করিতে চান তবে তাঁহাদের পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলিতে অনুরোধ করা উচিত। এই কাজ এখনই আরম্ভ করা উচিত, কারণ ১৫ই আগষ্টের আর বেশী বিলম্ব নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের সভাপতি,

মিঃ এইচ এস সুরাবর্দি ও খাজা নাজিমুদ্দিনের এই সম্পর্কে আবেদন প্রচার করা উচিত এবং এই আবেদনগুলি মুদ্রিত করিয়া পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে।

হিন্দু কর্ম্মচারীদের পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে যোগদানের সমস্যা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, এই সমস্যার প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বাংলা-সরকারের সমস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী পশ্চিমবঙ্গে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা এবং সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভার অধীনে কাজ করিবার অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার ফলে পাকিস্থানী সরকার সম্পূর্ণরূপে মুসলমান কর্ম্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইবে এবং ফলে হিন্দুদের মনোভাব যে কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। সুতরাং দেশপ্রেমের নামে আমি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু কর্ম্মচারীদের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাহারা যেন পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের অধীনে কাজ করিতে রাজী হন, কারণ উহার ফলে হিন্দু জনসাধারণের মনে কতকটা আত্মবিশ্বাস থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে মুস্লিম লীগ-নেতাদের নিকট আমি আবেদন করিতেছি যে হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারীদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না বলিয়া তাঁহারা যেন আশ্বাস দেন।

পাকিস্থানের নীতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, মুসলমানেরা সহযোগিতার ভাব দেখাইলে হিন্দুরাও সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিবে। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অখণ্ড বাংলা বা অখণ্ড ভারতের আদর্শ সার্থক হইয়া উঠিতেছে না এবং এই কারণে আদর্শ ত্যাগ না করিয়াও আমরা বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত। আমরা যে রাষ্ট্রের নাগরিক হইব সেখানকার স্বার্থ আমাদের নিজেদের স্বার্থ বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এই রাষ্ট্রকে সুখী ও শক্তিশালী করিয়া তোলাই আমাদের কর্ত্তব্য এবং এই কারণে আমরা আমাদের যথাযোগ্য স্থান ও দায়িত্ব গ্রহণে রাজী আছি। কিন্তু পাকিস্থান শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের অধিকার, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পর্কে কোনভাবে হস্তক্ষেপ করা চলিবে না। লীগের নেতৃবৃন্দ এই সম্পর্কে যথেষ্ট রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিবে বলিয়া আমি আশা করি। কিন্তু আমাদের ঘরবাড়ী, আমাদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কোনরূপে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইলে উহার প্রতিরোধ করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। এই সম্পর্কে কাহারও যেন কোনরূপ ভুল ধারণা না থাকে। আমরা সংখ্যালঘু হইলেও সঙ্ঘবদ্ধ এক কোটি হিন্দুর প্রতিরোধ-আন্দোলন দমন করা সহজ নয়। তবে আমাদের গোলমালের আশঙ্কা করা উচিত নয়।

পশ্চিমবাংলার নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইবে না বলিয়া তিনি আশা করেন। এই সম্পর্কে তাহাদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না বলিয়া সরকারী ভাবে যেন ঘোষণা করা হয়। পরিশেষে তিনি বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গের লীগ-নেতাদের নীতির উপরই হিন্দুদের মনোভাব নির্ভর করিতেছে।

এই বিবৃতি প্রকাশের পর পূর্ব্ববঙ্গের লীগ-নেতাদের কেহ কেহ হিন্দুদের মৌখিক আশ্বাস দিয়াছেন কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা ঘটিতেছে তাহাদ্বারা তাঁহাদের আশঙ্কা দূর হইতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গে নূতন গবর্ণমেণ্ট ও সৈন্যদলের স্থান সঙ্কুলানের জন্য অভিনাক্স জারী করিয়া যে সব বাড়ীঘর দখল করা হইতেছে তার প্রায় সমস্তই হিন্দুদের। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সর্ব্বত্রই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে। যাহাদিগকে আইনের বলে গৃহচ্যুত করা হইতেছে তাঁহাদের বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় নাই। প্রথম দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহা ভাল নয়।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারীদের পরিত্যক্ত শূন্য পদ পূরণ। শ্রীযুক্ত রায় ইঁহাদের চলিয়া আসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লীগ-নেতাদের এবং লীগ-পত্রিকাসমূহের উক্তি ও লেখা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে এই সব পদে হিন্দু কর্ম্মচারী গ্রহণের কথা তাঁহারা চিন্তা করিতেছেন না। খাজা নাজিমুদ্দীনের দলের মুখপত্র লিখিতেছেন যে পূর্ব্ববঙ্গে ২৫০ গেজেটেড অফিসার এবং কয়েক সহস্র কেরাণী প্রভৃতি অবিলম্বে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহারা চাহেন যে এই সকল পদ পূরণের সময় পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদের দাবি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবে, এখান হইতে সব লোক না পাওয়া গেলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সুযোগ দেওয়া হইবে এবং তাহাতেও না কুলাইলে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের আনিতে হইবে। সংখ্যার অনুপাতেও হিন্দু নিয়োগের কোন কথা ইঁহারা উচ্চারণ পর্য্যন্ত করিতেছেন না। অথচ কংগ্রেস প্রদেশসমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও উহা অব্যাহত রাখিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের জন্য গান্ধীজীর উদ্বেগ

নয়াদিল্লীতে এক প্রার্থনান্তিক সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, পাকিস্থান এলাকার অধিবাসী আমার জনৈক অমুসলমান বন্ধু শঙ্কা প্রকাশ করিয়া আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ধর্ম্মান্তরিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই এরূপ কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু জিন্না সাহেব এই আশ্বাস দিয়াছেন যে পাকিস্থানে অমুসলমানদের প্রতি ঠিক মুসলমানদের মতই ব্যবহার করা হইবে। আমি সকলকেই জিন্না সাহেবের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে বলি। আজ যখন ভারতবর্ষে

দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন উভয় রাষ্ট্রেরই কর্তব্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। আমার বন্ধু আমাকে লিখিয়াছেন,

"১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালনের কথা আপনারা সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু আপনারা কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে পাকিস্থানের অমুসলমান অধিবাসীরা এই দিনটি কি ভাবে পালন করিবে? আমাদের মনে কি উৎসব করিবার মত এক বিন্দু আনন্দও আছে? আপনারা যখন আনন্দে মত্ত হইবেন, আমরা তখন নিজেদের নিরাপত্তার কথা লইয়া মাথা ঘামাইব। আমরা কি করিতে পারি সে বিষয়ে আপনি কোনও নির্দেশ দিবেন কি? একমাত্র শোক প্রকাশ ছাড়া এই দিনটিতে করিবার মত আমাদের আর কি আছে? আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা ত ইতিমধ্যেই আমাদের ভয় দেখাইতে সুরু করিয়াছে। ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের মুসলমানদের মনের অবস্থাই বা কিরূপ? তাহাদের মনেও কি আমাদের মতই শঙ্কা জাগে নাই? আমরা এত দূর সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, মনে হইতেছে আমাদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইবে। আপনি ত আমাদের সাহস অবলম্বনের পরামর্শ দিতেছেন ও বলিতেছেন যে, প্রত্যেকের ধর্ম্মই তাহার নিজের হাতে। একথা হয় ত সন্ন্যাসীদের পক্ষে সত্য হইতে পারে কিন্তু পুত্র-পরিবারসম্বলিত গৃহস্থের পক্ষে নহে।"

"আমি উক্ত পত্রের উত্তরে কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, পাকিস্থানের গবর্ণর-জেনারেল জিন্না সাহেব বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানে অমুসলমানদের প্রতি ঠিক মুসলমানদের মতই ব্যবহার করা হইবে। আমি সকলকে এই পরামর্শই দিব যে, আমরা যেন উক্ত কথায় বিশ্বাস করি। আমার এই আস্থা আছে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যেমন মুসলমানদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না, তেমনি পাকিস্থানেও অ-মুসলমানগণ অত্যাচারিত হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উভয় রাষ্ট্রকেই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

"আমি অবশ্যই মনে করি যে, সংখ্যালঘুরা যখন ত্রাসাক্রান্ত হৃদয়ে দিন যাপন করিবে, তখন ১৫ই আগষ্টে কিছুতেই আনন্দোৎসব হওয়া উচিত নয়। এই দিন প্রার্থনা ও গভীর আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হওয়া উচিত। তবে এই দিনটিকে সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক করিবার একটি-মাত্র উপায় আছে। উভয় রাষ্ট্রই যদি এখন হইতে প্রয়াস করিয়া ১৫ই আগষ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলেই উহা সম্ভব। ইহা অবশ্য নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মত।

"পূর্ব্বোক্ত বন্ধু আমাকে এ প্রশ্নও করিয়াছেন যে, যাঁহারা প্রাণভয়ে পাকিস্থান ছাড়িয়া চলিয়া আসিবেন তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় পাইবেন কি না। আমি অবশ্য ইহার উত্তরে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে, এইরূপ আশ্রয়-প্রার্থিগণ যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব্ববিধ সাহায্যই পাইবেন। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র কাহারও জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকার বন্দোবস্ত করিতে পারিবে না। এইরূপ কোথাও করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই, আমি অবশ্য ইহাও বলিতে চাই যে, আশ্রয়-প্রার্থীদের যে আহার দেওয়া হইবে তাহার জন্য তাঁহারা শ্রম করিবেন।

"বিনা পরিশ্রমে বেতন মেলা সম্ভব নয়। আমি এখনও এই বিশ্বাস পোষণ করি যে, মুসলমান অথবা অ-মুসলমান কাহাকেও পাকিস্থান অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া যাইতে হইবে না।

"উক্ত বন্ধু আমাকে আরও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, পাকি-স্থানে ফেলিয়া-আসা গৃহ-সম্পত্তিরই বা কি হইবে।

"আমি ত বরাবরই বলিয়াছি যে, গৃহ এবং জমির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বর্ত্তমান মূল্য দেওয়া উচিত। আমি যত দূর জানি প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এরূপ বিধান আছে। তবে ব্যাপার এত দূর গড়াইবে, এরূপ কল্পনা না করাই কর্ত্তব্য।

"সর্ব্বশেষে আমার উল্লিখিত বন্ধু বলিয়াছেন যে, আমি নাকি একজন খাঁটি আদর্শবাদী। বর্ত্তমানে চতুর্দ্দিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা অমানুষিক; সুতরাং কোন্ বাস্তবসম্মত উপায়ে দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে অহিংসা কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা তিনি জানিতে চাহিয়াছেন।

"আমাকে খাঁটি আদর্শবাদী বলায় আমার আপত্তি করার কিছু নাই; কারণ আমি যাহা প্রচার করি তাহাকে কার্য্যে প্রয়োগ করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকি, তবে উহাতে হয়ত অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যায়। আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই তিনি যাহাদের দুষ্কৃতকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়া-ছেন তাহারা কারা? তাহারা কি মনুবর্ণিত ব্যক্তি? কিন্তু দুষ্কৃতকারী হইলেই ত সব সময় তাহার মৃত্যুর বিধান দেওয়া হয় না। আজকাল বরং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তুলিয়া দিবার জন্যই আন্দোলন চলিতেছে! আজ যদি কোনও কার্য্যের মূল্য থাকিয়া থাকে, তাহা হইতেছে বন্দীশালাকে হাসপাতাল ও সংস্কার বিদ্যালয়ে পরিণত করা। এই সমস্ত স্থানে দুষ্কৃত-কারীদের রোগীর মত মনে করিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, বিধানমাত্রকেই কার্য্যকরী বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। তা ছাড়া বিধানকেও বিজ্ঞানসম্মত হইতে হইলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। মানুষের প্রয়োজনে লাগাইতে হইলে বিধানকেও সময়োপযোগী করিয়া লইতে হইবে। অপরিবর্ত্তনীয় বিধি-বিধান খুব কমই আছে। এই সকলের জন্য কোনও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। উক্ত বিধানগুলি মানব-সমাজের ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি

দিবার অধিকারও সকলের নাই। যে কোনও ভাল সমাজ-ব্যবস্থায় এই অধিকার রাষ্ট্রের হাতেই থাকে। রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী বিচারকগণ উহাদের বিচার করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমাদের মধ্যে অনেকেই দুষ্কৃতকারীতে পরিণত হইত।"

হিন্দুদের প্রতি পাকিস্থান কর্তৃপক্ষের আশ্বাস—কথায় ও কাজে

পাকিস্থান-কর্তৃপক্ষ হিন্দুদের উদ্দেশে অনেক মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কোন কোন স্থলে লীগনেতারা প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন ও বিবৃতিও দিয়াছেন কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের ব্যবহার ইহাতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এত দিন নিম্ন ও গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানদিগকে পাকিস্থানের লড়াইয়ে আকর্ষণ করিবার জন্য এই বলিয়া লোভ দেখানো হইয়াছে যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পর হিন্দুদের ঘর-বাড়ী, জমি-জমা, টাকা-পয়সা এবং সুন্দরী তরুণীরা তাহাদের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এই লোভ তাহাদের মনে এমন ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে আজ ইচ্ছা থাকিলেও পাকিস্থানের কর্তাদের পক্ষে এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, এই মনোভাব পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যে দৃঢ়চিত্ততার প্রয়োজন তাঁহারা তাহা দেখাইতে পারিতেছেন না এবং তাঁহাদের এই নিষ্ক্রিয়তা এবং অসহায়তাকে লোকে অসৎ কার্য্যের পরোক্ষ সমর্থন বলিয়া মনে করিতেছে। এই সঙ্গে তাঁহাদের কোন কোন কাজও লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। যে পঞ্জাবী পুলিস দল কলিকাতায় চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচার করিয়াছে ও পেশাদার দুর্বৃত্তের ন্যায় আচরণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহাদিগকে পূর্ব্ববঙ্গে লইয়া যাওয়ায় পাকিস্থান-কর্তৃপক্ষের উপর হিন্দুদের বিরূপ ধারণা জন্মিতে বাধ্য। বহুবার তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে মুসলমান যেখানে মাইনরিটি সেখানে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী মুসলমান করা উচিত এবং সশস্ত্র পুলিসও মুসলমান হওয়া দরকার। বিহারে তাঁহারা এই দাবি করিয়াছেন এবং কলিকাতায় মুসলমান সংখ্যালঘু অঞ্চলে এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় মুসলমান মাইনরিটির মনে সাহস সঞ্চারের জন্যই তাঁহারা পঞ্জাবী পুলিস আনিয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে পূর্ব্ববঙ্গের অধিকসংখ্যক সরকারী চাকুরীতে হিন্দু নিযুক্ত করা এবং হিন্দুদের রক্ষার জন্য গুর্খা বা হিন্দু সশস্ত্র পুলিস অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা উহার বিপরীত আচরণই করিতেছেন। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে ঘরবাড়ী দখলের সময়েও এই একতরফা পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইতেছে। ৫ই আগষ্ট ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আতঙ্কগ্রস্ত না হইবার জন্য আবেদন জানান এবং মিঃ জিন্নার প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দেন। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য উভয় সম্প্রদায়কে হাতে হাত মিলাইয়া অগ্রসর হইবার জন্য এবং হিন্দুদের মনে আঘাত না দিবার জন্য তিনি আবেদন জানান। অন্য দিকে ঐ দিনই নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি 'যুগান্তরে' প্রকাশিত হইয়াছে:

"পাকিস্থান কায়েম হওয়ার ফলে ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে যে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, শহরের বিভিন্ন অংশে বহু বাসভবন রিকুইজিশনের জন্য কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় উহা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ, সরকার যাহাতে অবিলম্বে বাড়ীগুলি দখল করিতে পারেন তাহার জন্য সেগুলি অতি শীঘ্র এবং কোন কোন স্থলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খালি করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মনোহর খাঁ বাজার ও ঠাঠারি বাজারের কতিপয় বাড়ীর মালিক ও বাসিন্দাগণকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শহরে খালি বাড়ীর অভাব হেতু উক্ত বাড়ীর মালিক ও বাসিন্দাগণ সরকারের আদেশ পালনে অসমর্থ হইয়াছেন। ফলে কতিপয় পুলিস সেখানে গিয়া বাড়ীর বাসিন্দাগণকে বাড়ী খালি করিয়া দিতে বাধ্য করে। প্রকাশ, তাহাদের জিনিসপত্র রাস্তায় স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশই শহরের স্থায়ী ব্যবসায়ী। এই সকল কারণে জনসাধারণের মনে এই আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহাদের বাড়ীও যে কোন মুহূর্ত্তে রিকুইজিশন করা হইতে পারে। উপরোক্ত বাড়ীগুলির বাসিন্দাগণ অন্যত্র স্থান না পাইয়া স্ত্রীপুত্র বালকবালিকাসহ বিভিন্ন ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আরও প্রকাশ, বক্সীবাজার, ঢাকেশ্বরী মন্দির অঞ্চল, গেণ্ডারিয়া, পুরনো পল্টন, সেগুনবাগান, শান্তিনগর ও আর্ম্মাণীটোলার কতিপয় ভাড়া বাড়ীও রিকুইজিশন করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে বাড়ীগুলি খালি করিয়া দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ দাবি জানাইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের এই কঠোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া পুরনো পল্টন, সেগুনবাগান ও শান্তিনগরের অধিবাসীবৃন্দ অদ্য সকালে এক সভায় এই সকল কার্য্যকে সরকারী আশ্বাস সত্ত্বেও জুলুম রূপে বর্ণনা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। কর্তৃপক্ষ যদি বাড়ী রিকুইজিশন চালাইতে থাকেন তবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে বলিয়া কয়েক দিন পূর্ব্বে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহার পুনরুল্লেখ করা হয়।"

কথায় ও কাজে লীগ-নেতাদের এই সব গরমিল দেখিলে হিন্দুদের মনে সন্দেহ হইবে ইহা স্বাভাবিক।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলায় শান্তিরক্ষার আবেদন

ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যবহিত পরে বা সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের রায় বাহির হইবার ফলে তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং মিঃ সুরাবর্দ্দী সমগ্র

বাংলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। পূর্ণ বিবৃতিটি নিয়ে প্রদত্ত হইল :

আজ হইতে প্রায় এক সপ্তাহকাল পর ভারতের শাসনক্ষমতা ব্রিটেনের হাত হইতে ভারতীয়দের হস্তে অর্পিত হইবে। ইহা যে একটা বিরাট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা হিসাবে পরিচিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বুঝাপড়ার ফলে স্থির হইয়াছে যে, এই ক্ষমতা আগামী ১৫ই আগষ্ট তারিখে দুইটি ডোমিনিয়নের নিকট হস্তান্তরিত হইবে। কিন্তু এই ডোমিনিয়ন দুইটির সীমা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। ইহা স্থির হইবে সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের রায়ের দ্বারা।

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, সীমানির্দ্ধারণ কমিশনের রায় তাঁহারা উভয়েই মানিয়া লইবেন। এজন্য আমরা বাংলার জনসাধারণের সকল শ্রেণীর লোকের নিকট এই বলিয়া আবেদন জানাইতেছি যে কমিশনের রায় কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের নিকট যতই অসন্তোষজনক বলিয়া মনে হউক না কেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বদাই তাহা মানিয়া চলেন। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, দেশের অধিকাংশ অধিবাসী, যাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের প্রতি অনুগত, তাঁহারা নিশ্চয় এই দুই প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের এই সময়ে নিজেদের স্বার্থের জন্য গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারে এমন অবাঞ্ছিত লোকও দেশে আছে। তবে তাহারা সত্যই যদি কোন গোলযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

গণ-পরিষদ ভারতের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা আশা করি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অধিবাসীই এই পতাকা উত্তোলন করিবেন এবং অনুরূপ ভাবে পাকিস্থান গণ-পরিষদ পাকিস্থানের জন্য যে পতাকাই নির্ব্বাচিত করুন না কেন পূর্ব্ববঙ্গের সকলেরই সেই পতাকা উত্তোলন করা উচিত।

পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের প্রতি অতিশয় বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া পরস্পরের সহযোগিতায় শাসনকার্য্য চালাইতে ইচ্ছুক। এই দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে কোনরূপ মতভেদের সৃষ্টি হউক না কেন তাহা সমাধানের জন্য আমরা সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ উপায়ে চেষ্টা করিব। এজন্য জনসাধারণের নিকটও আমাদের আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন কখনও নিজেদের ইচ্ছামত নিজ হস্তে অন্যায়ের প্রতিকার করিবার চেষ্টা না করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ উপায়ে অভিযোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন। আমরা বাংলার উভয় অংশেরই সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্পূর্ণ ন্যায় বিচার করিতে চাই, তবে ইহার জন্য সংখ্যালঘুদেরও কর্ত্তব্য হইবে তাহাদের রাষ্ট্রকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা।

আজ আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে চলিয়াছি। এ কার্য্য আমরা সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব কিনা সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিয়াছে। তবে আমাদের আশা, দেশের অগণিত দুঃখী ও নিরন্ন জনসাধারণের স্বার্থের জন্য দেশের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার মত সাহস ও সুবুদ্ধি ভগবান আমাদিগকে অবশ্যই দিবেন।

মৌলানা আক্রাম খাঁ একটি স্বতন্ত্র বিবৃতি দিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিতেছেন, "ভারতের রাজনৈতিক আজাদীর পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লীগ উভয় প্রতিষ্ঠান-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এতদনুসারে উভয় প্রতিষ্ঠানের হাই কমাণ্ড নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন এবং বাউণ্ডারী কমিশন ও অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত বিনা ওজরে মানিয়া লইতে স্বীকার করিয়াছেন। পাকিস্থান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমাল রক্ষার প্রতিশ্রুতি নেতাগণ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। মুসলমানগণ এই আবেদনে সর্ব্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে যে কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতা, হাওড়া ও পশ্চিমবঙ্গে এরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে না।" মৌলানা সাহেব যথারীতি লীগ-পদ্ধতি অনুসারে পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই গাহিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে মোসলেম লীগ-নেতাগণের তরফ হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী কলিকাতা ও হাওড়ায় দাঙ্গা-দমনে কোনই কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন নাই।"

মিঃ সুরাবর্দীর মুখপত্র "ইত্তেহাদ" এবং খাজা নাজিমুদ্দীন ও মৌলানা আক্রাম খাঁর মুখপত্র "আজাদ" অল্প কয়েক দিন আগেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতে ছাড়েন নাই এবং একজনও মুসলমান জীবিত থাকিতে তাঁহারা কলিকাতার উপর কর্ত্তৃত্বের দাবি ছাড়িবেন না এইরূপ মনোভাব প্রচার করিয়াছেন। বাউণ্ডারী কমিশনের বৈঠক আরম্ভ হওয়ার অনেক পর পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর প্রচারকার্য্য অবাধে তাঁহাদের কাগজে চলিয়াছে, তাঁহারা কেহই উহা বন্ধ করান নাই, প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়া উহার নিন্দাও করেন নাই।

প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। ইহা স্বভাবের বিধান। প্রতিক্রিয়া যত অবাঞ্ছনীয়ই হউক না কেন, উহা এরূপ অবস্থায় দেখা দিবেই। গত বৎসর ১৬ই আগষ্ট হইতে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংগ্রামের উদ্দেশ্য

ছিল রাজনৈতিক পাকিস্থান অর্জন। কিন্তু এই সংগ্রামের জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল, কোন সভ্য মানুষ তাহা সমর্থন করিতে পারে না। পাকিস্থান অর্জনের নামে সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানেরা যখন হিন্দু নিধন, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন, হিন্দুর গৃহদাহ এবং হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ আরম্ভ করিল, মিঃ জিন্না হইতে আরম্ভ করিয়া কোন মুসলমান নেতা তাহার প্রতিবাদ করিলেন না। সাধারণ মুসলমান বুঝিয়া লইল যে হিন্দু কেবল মাত্র হিন্দু বলিয়াই তাহার বধ্য, হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠনে তার কোন অপরাধ হয় না, হিন্দু নারীর মর্য্যাদানাশে কোন পাপও হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর শিক্ষার পরিণাম কখনও ভাল হইতে পারে না। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য, কোন কোন স্থানে দেখা দিয়াছিলও; কিন্তু কংগ্রেস-নেতাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে প্রতিক্রিয়া স্বভাবতঃ যে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিত তাহা করিতে পারিল না। লীগ-নেতারা কিন্তু সংযত হইলেন না, অনুচরবৃন্দকে সংযত করিবার কোন চেষ্টা করিলেনও না, বরং উহাদের মানবতাবিরোধী অপরাধ অনুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের শক্তির অধিকারী লীগ-নেতারা প্রকারান্তরে নানা ভাবে সাহায্যই করিলেন। হিন্দুর মনে তাঁহারাই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিলেন। ক্রিয়া বন্ধ না হইলে প্রতিক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে না, এই সত্য তাঁহারা আজও অনুভব করিতে পারেন নাই। সেদিন রাষ্ট্রপতি কৃপালনী এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পরেও লীগ-নেতাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছে এমন পরিচয় আজও পাওয়া যায় নাই।

খাজা নাজিমুদ্দীন, মিঃ সুরাবর্দ্দী এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ কলিকাতা এবং হাওড়ায় আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। ডাঃ ঘোষ উহা থামাইতে পারিতেছেন না বলিয়া তাঁহাকে দোষারোপও করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি? কলিকাতায় যে সব স্থলে আজও গোলযোগ চলিতেছে সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে ঐ সব স্থানের হিন্দু অধিবাসীরা দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ অহোরাত্র সশঙ্কিত চিত্তে বাস করিয়াছে। সকাল বেলায় পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তিরা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েরা একরূপ রুদ্ধশ্বাসে তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় সশঙ্কিত চিত্তে কাল কাটাইয়াছেন। ইহারই মধ্যে হয়ত পাকিস্থানী সৈনিকেরা পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগে পাড়া আক্রমণ করিয়াছে, ছেলেরা বাধা দিতে গিয়া কেহ বা প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ আহত হইয়াছে, অনেককে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়া লাঞ্ছনার চরম করিয়াছে। সন্ধ্যায় হয়ত কোন গৃহে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে আপিস-ফেরত তাঁহাদের প্রিয়জন ছুরিকাঘাতে অথবা পঞ্জাবী পুলিসের গুলিতে নিহত হইয়াছেন। এই ভয়াবহ অবস্থা দূর করিবার জন্য পুলিস কোন চেষ্টা করে নাই বরং গুণ্ডাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছে। দীর্ঘ এক বৎসর কাল যে সব পাড়ার লোক এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইয়াছেন, যে সব গুণ্ডাকে চক্ষের উপর আস্ফালন করিতে দেখিয়া, এমন কি নরহত্যা করিতে দেখিয়াও যাহারা তাহার কোন প্রতিকারের জন্য কোনরূপ সরকারী সাহায্য লীগ গবর্ণমেণ্টের নিকট পায় নাই, যাহারা সুবিচারের পরিবর্ত্তে লাঞ্ছনা ও অত্যাচারই পাইয়াছে, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এই পাল্টার ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে আজ প্রায় আট-দশ মাস সুতরাং ঐরূপ প্রতিক্রিয়ার দায়িত্ব বাংলার লীগ গবর্ণমেণ্টের। পাল্টা আক্রমণ বা নিষ্ঠুর নরহত্যা হিন্দুরা কখনও সমর্থন করেন না, উহা বন্ধ করিবার জন্য নেতারা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন।

ডাঃ ঘোষ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন না বলিয়া মৌলানা আক্রাম খাঁ তাঁহাকে দোষ দিয়াছেন। পুলিসের অত্যাচারের কথাও তাঁহারা আজ বলিতেছেন। কিন্তু গত এক বৎসরকাল মুসলমান পুলিস এবং পঞ্জাবী পুলিসের নামে সাক্ষ্য-প্রমাণ সমেত অভিযোগ করিয়া হিন্দুরা কি প্রতিকার পাইয়াছে তাহা কি তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন? নারীর সতীত্বনাশ, গৃহকর্ম্মরতা নারীকে গুলির আঘাতে হত্যা, বিনা কারণে বিনা উত্তেজনায় রাজপথে নিরীহ নাগরিকদের গুলি করিয়া হত্যার যে সব মারাত্মক অভিযোগ পঞ্জাবী পুলিসের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে তাহার প্রতিকার কি তাঁহারা করিয়াছিলেন, না ঐসব নরপশুকে আরও উৎসাহ দিয়াছিলেন। ইহাদিগকে পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইয়া কি তাঁহারা সেখানকার হিন্দুদের মনে আরও আতঙ্ক বাড়ান নাই? কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অত্যাচারের সংবাদ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' সংবাদ দিতেছেন যে ৬ই আগষ্ট পঞ্জাবী পুলিসেরা দিনাজপুর পৌঁছিয়াছে এবং দুই দিনের মধ্যে তাহারা সেখানে উপদ্রব সুরু করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন স্থানীয় কোতোয়ালীর দারোগার বাড়ীতে গভীর রাত্রে অনধিকার প্রবেশ করে এবং বাড়ীর মেয়েদের চীৎকারে থানার পুলিসেরা আসিয়া উহাকে গ্রেপ্তার করে। এই বর্ব্বরগুলি কলিকাতায় যাহা করিয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনায়াসে মনে করা যায় যে পূর্ব্ববঙ্গে আরও বেশী করিয়া ইহারা এইরূপ করিবে। এই অবস্থায় প্রতিকারের একমাত্র উপায় এই নরপশুগুলাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া। লীগ-নেতারা তাহা করিবেন কি?

লীগ-নেতৃবৃন্দ ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভাকে দোষ দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহারা মুসলমানদের রক্ষার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বেলিয়াঘাটায় গোর্খা সৈনিকদের আচরণে স্থানীয় অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদের অপসারণ দাবি করিয়াছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নারীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা করিতে গিয়া ধরাও পড়িয়া-

ছিল। ডাঃ ঘোষ স্থানীয় অধিবাসীদের দাবি মানিতে বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবী পুলিস কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার পর লীগ-নেতাদের অনুরোধে গোলযোগের স্থানগুলিতে আবার গোরা সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে। ডাঃ ঘোষ এত আন্তরিকতার সহিত গোলযোগ থামাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে তাঁহাকে নিজ সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট অপ্রিয় হইয়াও উঠিতে হইতেছে। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীন, মিঃ সুরাবর্দী এবং মৌলানা আক্রাম খাঁ তাঁহাদের অনুচরবৃন্দের আক্রমণ ও অত্যাচার বন্ধ না করিলে গোলযোগ থামানো ডাঃ ঘোষের কেন, মানুষমাত্রেরই সাধ্যের অতীত। তাঁহাদের অনুচরবৃন্দ এখনও ট্রেন হইতে যাত্রী টানিয়া নামাইয়া ছুরিকাঘাত করিতেছে, ব্রেণ গান চালাইয়া বাসের আরোহীদের হত্যা করিতেছে, বোমা ও এসিড ছুঁড়িয়া মানুষকে হতাহত করিতেছে। এখনও পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর, ক্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট ইত্যাদি বহু অঞ্চলে হিন্দুর কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লীগ-পোষিত গুণ্ডাদিগের দখলে আছে।

পূর্ব্ববঙ্গে রক্তারক্তির বদলে যাহা চলিতেছে তাহা আরও খারাপ, ইহাকে চোরা মার বলিয়া অভিহিত করাই ভাল। মিঃ সুরাবর্দী সে দিন পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থানে হিন্দুদের মনে আস্থা স্থাপনের জন্য তিনি মৌখিক প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত কার্য্যতঃ কিছু করিয়াছেন কি? বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে হিন্দুদের ভীতিপ্রদর্শন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। ক্ষেতের পাকা ধান জোর করিয়া কাটিয়া লওয়াও অবাধেই চলিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতিতে এমন কথা দেখিলাম না যে কোন এক স্থানেও স্থানীয় মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীরা আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন। লীগ-নেতারা এতদিন নোয়াখালী-ত্রিপুরার গুণ্ডা মুসলমানদের যেভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার মুলতুবি রাখিয়া উহাদের মিথ্যা নালিশে হিন্দু কর্ম্মচারীদের ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলার বিচারে যে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, যেভাবে হাজতে আবদ্ধ গুণ্ডাদের পরিবারবর্গকে অনুকম্পা দেখাইয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতেও যে এরূপ হইবে না হিন্দুরা তাহা বিশ্বাস করিবে কিরূপে? সেই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিজেদের এলাকার সরকারী কর্ম্মচারীদের তৎপর ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়া পথ প্রদর্শন করিলে তবেই লীগ-নেতারা ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনিতে পারিতেন। লীগ-নেতারা আজও যদি তাঁহাদের দলকে যে প্রকাশ্য ও চোরা আক্রমণ হিন্দুদের প্রতি চলিতেছে তাহা বন্ধ না করেন, তবে প্রতিক্রিয়া কিরূপে থামিবে আমরা তাহা বুঝিতে অসমর্থ। নিজেদের দোষ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া পরের দোষ দেখাইলে প্রতিকার হওয়া দুরূহ এই কথা লীগ-নেতৃবর্গের বুঝিবার সময় কি আজও হয় নাই?

শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি আসামের মনোভাব

আসামে বাঙালী এবং শ্রীহট্টবাসীর প্রতি বিরূপ মনোভাব কিছুদিন যাবৎ খুব ভাল ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীহট্টে গণভোটের ফলাফল প্রকাশিত হইবার পর আসাম সরকার শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদের অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রদেশের পক্ষে এইরূপ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিক মনোভাব অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। বিশেষতঃ পাকিস্থানের মধ্যে যে সব ভারতবাসী পড়িয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহায়তায় বঞ্চিত করা আমরা অতিশয় অন্যায় বলিয়া মনে করি। নিম্নের সংবাদটির প্রতি ঊর্দ্ধতন কংগ্রেস-নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং ইহার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া উচিত।

শ্রীহট্টে গণভোটের ফল প্রকাশিত হইবার পর হইতে নানারূপ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে; এই নূতন পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদের বিদায় করিবার জন্য আসাম-সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রচারিত এক সরকারী সার্কুলারে বলা হইয়াছে যে, শ্রীহট্ট জেলার কিংবা শ্রীহট্টবাসীদের মধ্য হইতে কোন নূতন কর্ম্মচারী নিয়োগ কিংবা একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথায়ও নূতন ব্যয় করা হইবে না। শ্রীহট্ট জেলার বাসিন্দা কাহাকেও কোন অস্থায়ী বা পাকা সরকারী চাকরীতে নিয়োগ করা হইবে না এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের চাকরী পাকা করার বিষয়ও স্থগিত রাখা হইবে। ইহা ছাড়া ভারত সরকার হয়ত আসামকে সাহায্য দান সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে পারেন; সুতরাং আসাম সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ ও শ্রীহট্ট সংক্রান্ত পরিকল্পনা আপাততঃ মুলতুবী রাখিতে পারেন।

উক্ত সার্কুলার হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে বিতাড়নের জন্য কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন। অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের বরখাস্তের নোটিশ দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমগ্র সরকারী দপ্তরখানা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। অন্য দিকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগকে পাকিস্থান ডোমিনিয়নের অধীনে কাজ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য লীগ-নেতাদের নিকটও এক সার্কুলার আসিয়াছে।

শ্রীহট্টবাসী কর্ম্মচারীদের মত অবস্থা ভারতের অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। অসমীয়াদের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছে যে শ্রীহট্ট পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইলে আসামে সরকারী চাকুরীর ছড়াছড়ি দেখা দিবে এবং ফলে আসামের বর্ণহিন্দুদের বরাত খুলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, তাহারা দিবাস্বপ্ন দেখিতেছে, কারণ শ্রীহট্ট চলিয়া গেলে আসামের দপ্তরখানার কাজ অর্দ্ধেক কমিয়া যাইবে ; ফলে বহু দপ্তরই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং কর্ম্মচারীদের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। সুতরাং চাকুরীর নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত আসামের হিন্দুদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে নূতন অবস্থায় নূতন কর্ম্মচারীদের লইয়া কাজ করা যে কিরূপ অসুবিধা হইবে তাহা বরদলৈ মন্ত্রিসভার শ্রীহট্ট-বিরোধী সদস্যেরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে বহু অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীকে আসামে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপাতঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অনুরোধ করা হইতেছে বলিয়া উহার কোন মূল্য নাই।

উড়িষ্যায় বাঙালী-বিদ্বেষ

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ হইতে বাঙালী-বিদ্বেষের সংবাদ আসিতেছে। তন্মধ্যে বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে উড়িষ্যা সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সাল হইতে উড়িষ্যায় বাঙালীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার চলিতেছে। বাঙালী অধিবাসীরা উড়িষ্যা গবর্মেণ্টের নিকট মেমোরাণ্ডাম দাখিল করিয়া এবং নানাভাবে ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কিছু দিন আগে দৈনিক বসুমতীতে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি প্রকাশিত হয় :

"মহাশয়,

পুরীতে বর্ত্তমানে বাঙালী-বিদ্বেষ কিরূপ তীব্র হইয়াছে, তাহাই কয়েকটি ঘটনার দ্বারা জানাইতেছি। ভারত যখন স্বাধীন হইতে চলিয়াছে, তখন একটি প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা সত্যই দুঃখের বিষয়। শুধু যে নিম্নস্তরের উড়িয়ারাই বিদ্বেষভাবাপন্ন তাহাই নহে, সেখানকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরাও ভীষণ বাঙালী-বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করে এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা সকলেই সম্ভ্রান্তবংশীয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঘটনাস্থলে যে সমস্ত পুলিস কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা ইহাতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করে না এবং দুষ্কৃতকারীদের পরোক্ষভাবেই সাহায্য করে। অত্যাচারিত ব্যক্তিরা সেই সব পুলিসের নিকট হইতে কোন রকম সাহায্য পায় না, তদুপরি তাহাদিগকে পুলিস বলে, "কেন তোমরা এদেশে আসিয়াছ ?" এই বিদ্বেষ-ভাবের ফলে পুরী বর্ত্তমানে বাঙালীদের, বিশেষতঃ বাঙালী মেয়েদের, পক্ষে বিপজ্জনক স্থান হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতি বৎসরই তীর্থের জন্য অথবা স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বহু বাঙালী তথায় যায়। ইহা ব্যতীত বাংলাদেশের দাঙ্গায় পরও বহু বাঙালী তথায় গিয়াছে। কিন্তু সেখানকার লোক মোটেই চায় না যে, বাঙালীরা সেখানে যায়। সম্ভ্রান্তবংশীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা যেভাবে বাঙালী মেয়েদের প্রতি ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত জঘন্য পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

'রেশনে'র কথাও উল্লেখযোগ্য। নূতন বাঙালী, যাহারা সেখানে যায় তাহারা ত ration পায়ই না, তাহা ছাড়া যে সমস্ত বাঙালী আট-দশ মাস সেখানে আছে, তাহাদেরও ration card সংগ্রহ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ration office-এ কাহাকে কাহাকেও দুই-তিন মাস ঘোরা-ঘুরির পর card দেওয়া হয়—ইহা ছাড়া বহু লোককে এক-বারেই দেওয়া হয় না। বর্ত্তমানে পুরীতে কোন বাঙালী জমি অথবা বাড়ী ক্রয় করিতে পারে না। যদি কোন বাঙালী জমি বা বাড়ী বিক্রয় করিতে চাহে তবে তাহা domiciled Bengali অথবা উড়িয়াদের ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে সেখানে বাঙালী দেখিলেই তাহারা বলে "মুসলমানের মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।" রাস্তায় অথবা বাজারে যদি কোন বাঙালীর সঙ্গে সেখানকার কাহারও একটু ঝগড়া হইল, তখনি সকলে এক হইয়া বাঙালী ভদ্রলোককে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। 'শড়া বঙালী' সম্বোধন ছাড়া তাহারা কথাই বলে না।"

এত দিন আমাদের জাতীয় গবর্মেণ্ট ছিল না, এজন্য ভারতের অনেক স্থানেই বাঙালীরা অত্যাচারিত হইয়াছে ; কারণ প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এখনও যদি বাঙালীদের প্রতি অত্যাচার ভারতের কোন প্রদেশে চলিতে থাকে এবং এ বিষয়ে যদি কোন প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করা না হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত দুঃখের কারণ হইবে।

এই পত্রখানি প্রকাশিত হওয়ার পর কলিকাতায় উহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ কোন কোন উড়িয়া প্রহৃত হয় কিন্তু তৎক্ষণাৎ বাঙালী নেতাদের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রতিক্রিয়া ব্যাপক হইতে পারে নাই। ইহার পর উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব আশ্বাস দেন যে উড়িষ্যায় বাঙালীদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার যাহাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিবেন এবং পুলিসকে তদনুসারে নির্দ্দেশ দিবেন। এই কাজ কেন তিনি এত দিন করেন নাই এখানে সে প্রশ্ন কেহ তোলেন নাই এই কারণে যে এই অপ্রীতিকর অবস্থার আশু অবসান সকলেই কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও যে সব চিঠিপত্র কটক, পুরী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেছে তাহাতে দেখা যায় উড়িয়াদের দুর্ব্ব্যবহার ত কমেই নাই বরং বাঙালী-দের বাড়ী চড়াও হইয়া উপদ্রব করাও এবার সুরু হইয়াছে।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া থাকিবেই। এতদিনে রাষ্ট্রপতি কৃপালনীকেও এই স্বভাব-সত্য স্বীকার

করিয়া বলিতে হইয়াছে যে এক স্থানে উপদ্রব চলিলে অপর স্থানে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই, ক্রিয়া বন্ধ না করিয়া প্রতিক্রিয়া সংযত করা একরূপ অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক হানাহানির সঙ্গে এবার যদি প্রাদেশিক মারামারিও সুরু হইয়া যায় তবে তার চেয়ে কলঙ্ক আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে অত্যাচার যেখানে প্রথমে আরম্ভ হইবে, প্রতিক্রিয়ার দায়িত্বও সেখানকার কর্তৃপক্ষকেই বহন করিতে হইবে।

বাংলায় উড়িয়াদের কোন কিছু হইলেই উড়িষ্যা গবর্ণেমেণ্টের প্রতিনিধি এখানে আসেন। কিন্তু বাঙালীদের উপর উড়িষ্যায় কি ঘটিতেছে তাহার তদন্তের জন্য বাংলা-সরকারের কোন প্রতিনিধি সেখানে যান নাই। আমাদের মনে হয় অবিলম্বে বাংলা-সরকারের একজন দক্ষ প্রতিনিধি উড়িষ্যায় পাঠাইয়া সেখানকার বাঙালীদের প্রতি উৎপীড়নের পূর্ণ পরিচয় অবগত হওয়া উচিত এবং তদনুসারে কাজ যাহাতে হয় তাহাও সরকার পক্ষ হইতেই দেখা অবশ্য কর্তব্য।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

ভারতীয় গণপরিষদে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ভারতের জাতীয় পতাকা গৈরিক, শ্বেত ও সবুজ এই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত হইবে। পতাকার মধ্যস্থলে অর্থাৎ শ্বেত অংশের মধ্যস্থলে থাকিবে নীলবর্ণ অশোকচক্র।

পণ্ডিত নেহরু পতাকাটি গণপরিষদে উপস্থিত করেন। পতাকাটি উপস্থিত করার সময় পরিষদের সদস্যগণ প্রবল উৎসাহভরে "মহাত্মা গান্ধী কি জয়" ধ্বনি করিতে থাকেন। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে গণপরিষদের সমস্ত সদস্য অর্দ্ধ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই পতাকাকে ভারতের জাতীয় পতাকারূপে গ্রহণ করার সম্মতি জানান।

পরিষদকক্ষে দুইটি পতাকা উত্তোলন করা হয়। তাহার একটি জাতীয় মিউজিয়মে রাখার জন্য পণ্ডিত নেহরু প্রস্তাব করিলে তাহা গৃহীত হয়। গণপরিষদ-গৃহে জাতীয় পতাকা উপস্থিত করিয়া পণ্ডিত নেহরু আবেগপূর্ণ স্বরে বলেন:

"আমি এই পতাকা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে গৌরববোধ করিতেছি। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে, এই পতাকা কোনও সাম্রাজ্যের পতাকা হইবে না, কোনও সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক হইবে না, একের উপর অপরের প্রভুত্বের নিশান হইবে না—এই পতাকা হইবে স্বাধীনতার প্রতীক, শুধু আমাদের স্বাধীনতা নহে, পরন্তু যাহারা এই পতাকা দেখিবে তাহাদের সকলের স্বাধীনতার প্রতীক। আমি আশা করি এই পতাকা দূর দূর দেশে যাইবে—যেখানে ভারতীয়রা থাকিবে, যেখানে ভারতের দূতরা থাকিবে সেখানেই এই পতাকা যাইবে; শুধু তাহাই নহে ভারতীয় জাহাজসমূহ এই পতাকা উড়াইয়া দূরদূরান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া যেখানেই যাইবে সেখানেই এই পতাকা সেই সমস্ত স্থানের লোকের জন্য স্বাধীনতার বাণী, সখ্যের বাণী, ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর সকল দেশের মিত্র হইতে চাহে এই বাণী, যাহারা স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ভারতবর্ষ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত এই আশার বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

মুসলিম লীগ দলের নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জমান বলেন, "ভারতের প্রত্যেক মুসলমানই এই পতাকার সম্মান করিবে এবং পতাকা উত্তোলন করিয়া গর্ব্ববোধ করিবে। ভারতের অনুগত নাগরিক হিসাবে সকলেরই এই পতাকার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।" মুসলিম লীগদলের সম্মতিক্রমে গৃহীত এই পতাকাকে জাতীয় পতাকা বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য মিঃ জিন্নাও মুসলমান সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিয়াছেন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা কি হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যত দূর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে তাহাদের পতাকা মুসলিম লীগ পতাকারই অনুরূপ হইবে এবং উহাতে ইসলামের প্রতীক দ্বিতীয়ার চাঁদ থাকিবে। ভারতীয় পতাকা গণপরিষদের মুসলমান প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে জাতীয় পতাকারূপেই গৃহীত হইয়াছে। পাকিস্থান গণপরিষদের হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিদের বিনা সম্মতিতে পাকিস্থান পতাকা গৃহীত হইলে তাহা অন্যায় হইবে এবং হিন্দু ও শিখদের উপর ইহা লইয়া জবরদস্তি চালাইতে গেলে মুসলিম লীগ বিশ্ববাসীর সহানুভূতি পাইবেন না।

সীমান্তে গণভোটের ফলাফল

সীমান্তে গণভোটের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। ভোটদাতাদের শতকরা ৫০·৪৯ জন পাকিস্থানে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছে। ভোটদাতাদের মধ্যে ২,৮৯,২৪৪ জন পাকিস্থানের পক্ষে এবং ২,৮৭৪ জন ভারতবর্ষের পক্ষে ভোট দিয়াছে। মোট ভোটদাতাদের মধ্যে ২,৬০,৬৮০ জন ভোটদানে বিরত ছিল।

সীমান্তের গণভোট সম্পর্কে বড়লাট ভবন হইতে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে:—

(১) পাকিস্থানের পক্ষে বৈধ ভোট···২,৮৯,২৪৪

(২) ভারতবর্ষের পক্ষে বৈধ ভোট···২,৮৭৪

(৩) ফলাফল:—পাকিস্থানের পক্ষে ভোটাধিক্য—২,৮৬,৩৭০

(৪) মোট ভোটদাতাদের মধ্যে বৈধ ভোট—শতকরা ৫০·৯৯

(৫) গত নির্ব্বাচনের সময়কার বৈধ ভোট—৩,৭৫,৯৮৯

(৬) গণভোটে মোট ভোটদাতার সংখ্যা—৫,৭২,৭৯৮

এই হিসাবে দেখা যায় যে ভোটদাতাদের শতকরা ৫০·৪৯ জন পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে। মোট ভোটদাতাদের মধ্যে ২,৬০,৫৫৪ জন ভোটদানে বিরত ছিল। অমুসলমান ভোটদাতাদের সংখ্যা হইতেছে ৮৪৭৮১।

৩রা জুনের ঘোষণা অনুযায়ী সীমান্ত প্রদেশ ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, না পাকিস্থানে যোগ দিবে, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য গণভোট লওয়া হয়। ৬ই জুলাই হইতে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এই ভোট লওয়া হয়। কংগ্রেস গণভোট বর্জ্জন করে। সীমান্ত কংগ্রেসের দাবী ছিল 'পাঠানীস্থান' বনাম 'পাকিস্থান' প্রশ্নের গণভোট লওয়া কিন্তু 'হিন্দুস্থান' বনাম 'পাকিস্থান' প্রশ্নে ভোটের সিদ্ধান্ত হওয়াতেই কংগ্রেস উহাতে যোগদান করে নাই। লীগের পক্ষ হইতেই এক তরফা ভোটের প্রচারকার্য্য চলিতে থাকে। ভোটের ফলাফল পাকিস্থানের পক্ষে হইলেও সীমান্তের কংগ্রেস-নেতারা এই গণভোটকে একটা প্রহসন বলিয়াই আখ্যা দিয়াছেন। এই ভোটের ব্যাপারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ খোলাখুলি ভাবেই মুসলিম লীগের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন বলিয়াও কংগ্রেস-নেতারা অভিযোগ আনিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে ভোটদান ব্যাপারে অনেক চালাকি চলিয়াছিল।

অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক সাধারণ সভায় উক্ত ব্যাঙ্কের গবর্ণর সার চিন্তামন দেশমুখ বলেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে সর্ব্বশেষ মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সম্ভবতঃ যত দিন পর্য্যন্ত উভয় ডোমিনিয়ন অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হইয়া উঠে তত দিন তাহারা পরস্পরের সহিত একটা সাময়িক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই চুক্তির ফলে বর্ত্তমানে উভয় সরকারের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ আছে, ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও নূতন সরকার দুইটির মধ্যে অনুরূপ সম্পর্ক বহাল থাকিবে। তবে একথা ভুলিলে চলিবে না যে, শুধু অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যাই নহে, দুইটি ডোমিনিয়নের মধ্যে আর্থিক পরস্পরাপেক্ষিতার জন্যও বহু নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সমগ্র দেশের উৎপাদন ও বিনিময়-ব্যবস্থা এমনভাবে করা হইয়াছিল যে, গত এক শত বৎসর যাবৎ উৎপাদনের তিনটি উপকরণ পুঁজি, শ্রম ও ভূমিকে একটি মাত্র অখণ্ড রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান দেশবিভাগের পর এসম্পর্কে বহুল পরিমাণে পুনর্গঠনের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু ইহার ফলে আমরা সম্প্রতি যে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাতে অত্যন্ত বিঘ্ন ঘটিবে।

সার চিন্তামন দেশমুখ অতঃপর বলেন, রাজনৈতিক দিক হইতে দেশ-বিভাগ হইলেও উভয় রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য হওয়া উচিত ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অখণ্ডত্ব বজায় রাখা এবং ইহা পারস্পরিক চুক্তির সাহায্যেই করা যাইতে পারে।

সার দেশমুখ বলেন যে, গত এক বৎসরে নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যগুলির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মূল্য-মানের তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যুদ্ধের বছরগুলিতে যে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি হইয়াছে গত একটি বৎসরে। জনসাধারণের মঙ্গলার্থে মূল্য-মান স্থির রাখার জন্য যথাসম্ভব উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমানের মূল্য এত অধিক যে, ইহা অপেক্ষা কোনও দ্রব্যের মূল্যই সামান্য পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতে না পারে তাহা দেখিতে হইবে। নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সার দেশমুখ বলেন যে, যদিও কতকগুলি দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বহাল থাকায় জনসাধারণ ও সরকার উভয়েই বিরক্ত হইতেছেন, তবুও নিয়ন্ত্রণ একেবারে তুলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। কয়েকটি অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ চালু রাখিতে হইবে যাহাতে এই নিয়ন্ত্রণকে কেহ ফাঁকি না দিতে পারে সেজন্য শাসনযন্ত্রকে অত্যন্ত কঠোরভাবে কাজ চালাইতে হইবে। দেশ-বিভাগের ফলেও ইহা অত্যন্ত জরুরী হইয়াছে।

যুদ্ধের পর খাদ্য, বস্ত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কোন অর্থনৈতিক কারণ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। যে সৈন্যদলের প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া দেশবাসীর জন্য বরাদ্দ খাদ্য ও বস্ত্রের টানাটানি হইত তাহাদের অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর মাছ মাংস ডিম তরকারি প্রভৃতির দাম বাড়িবার কোন কারণ নাই অথচ গত এক বৎসরে ইহাদের প্রত্যেকটির দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ডালের দাম প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কাপড় ফুটপাথে এবং ফেরিওয়ালাদের নিকট বেশী দামে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে অথচ রেশনের দোকানে সহজে পাওয়া যায় না। লবণ, সরিষার তেল, নারিকেল তেল প্রভৃতির কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়ার পর ঐগুলি সহজলভ্য হইয়াছে, রেশনের আমলে উহাদের যে দাম ছিল কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর তদপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, কণ্ট্রোল বিভাগ যেখানে দুর্নীতিতে জর্জ্জরিত সেখানে সহস্র কড়াকড়ি করিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কড়াকড়ি যত বাড়িবে চোরাকারবারীদের লাভ এবং দেশবাসীর লাঞ্ছনা ক্রমশঃ সেই অনুপাতেই বাড়িতে থাকিবে। দেশের বাহিরে রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া ক্রমশঃ কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া এবং চোরাকারবারীদের আদর্শ শাস্তিবিধান মূল্যহ্রাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কণ্ট্রোল বর্ত্তমান আকারে বজায় থাকিলে চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে না।

আইরিয়ানা ও আর্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

আবেস্তিক ও ইরাণীয় আর্য এবং বৈদিক আর্য সম্বন্ধে পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে যে সকল আলোচনা করা হইয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহার মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করা হইবে। আশা করা যায়, এই আলোচনার ফলে বৈদিক আর্য ও আবেস্তার আরিয়াও পদের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে তাহা আর্য বনাম অনার্য বিতর্কের একটা মীমাংসায় আসিবার সহায়তা করিবে।

এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় 'আর্যবাদের উৎপত্তির পটভূমি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কোন্ সময়ে ও কি ভাবে ভাষা-বিজ্ঞানীদিগের গবেষণার ফলে প্রাপ্ত কতকগুলি তথ্য লইয়া একটি আদর্শ, সম্ভাবিত আর্য জাতির সৃষ্টি হইল, এই সম্ভাবিত আর্য জাতি ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-এরিয়ান নামে দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞানীর সহায়তা করিবার জন্য নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী কখন আসরে নামিলেন তাহাও বলা হইয়াছে। পণ্ডিতসমাজের এই সকল গবেষণার দুইটি দিক আছে, একটি বৈজ্ঞানিক দিক ও অন্যটি ব্যবহারিক দিক। বৈজ্ঞানিক দিক সম্বন্ধে বলা যায় যে নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবে এবং লোকের ঔৎসুক্য নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এই জাতীয় গবেষণা চলিবে। সাধারণের আপত্তি এই গবেষণায় নহে, তাহাদের আপত্তি অসমাপ্ত গবেষণার অভিসন্ধিমূলক প্রয়োগ সম্বন্ধে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার এই প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগের নেশায় অন্যের কথা দূরে থাকুক সত্যানুসন্ধিৎসু প্রকৃত বৈজ্ঞানিকও অভিভূত হইয়াছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে। বিষয়টি একটু খুলিয়া বলা আবশ্যক।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ইউরোপে ভাষা-বিজ্ঞানের (Comparative philology) গবেষণার সূত্রপাত হইল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। প্রসিদ্ধ ইংরেজ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স আবিষ্কার করিলেন যে সংস্কৃতের সহিত গ্রীক ও লাটিন ভাষার যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান তাহা আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না। ("......bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar which could not have been produced by accident......") তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক ও লাটিন এক মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত। ("......no philologer could examine all the three without believing them to have sprung from some common source which, perhaps, no longer exists.") তাঁহার আরও ধারণা হইল, যে মূলভাষা হইতে সংস্কৃত উদ্ভূত হইয়াছে সেই মূলভাষা হইতে গথিক এবং কেল্টিকও উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার পরে common source বা মূলভাষা সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বপ (Bopp) এবং Historical Grammar-এর স্রষ্টা গ্রিম এ সম্বন্ধে গবেষণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনুমিত মূলভাষা পটের (Pott) হাতে ইন্দো-জারমেনিক নাম পাইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিল। পটের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পরে (১৮৩৩-৩৬) জার্মেনীতে বৈদিক ও আবেস্তিক ভাষাতত্ত্বের গবেষণার জোয়ার আসিল। জার্মেনী ও ফ্রান্সে এবং অন্যত্র বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত আপনাদিগের গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক গবেষণা সম্বন্ধে Rosen, Roth, Benfey, Kuhn, Aufrecht-এর নাম পণ্ডিতসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। তারপর প্রকাশিত হইল অগাষ্ট শ্লেইসারের (August Schleicher) বিখ্যাত গ্রন্থ (১৮৬১)। শ্লেইসার গবেষণা করিয়া মূল ভাষার একটা কাঠামো (reconstruction of prehistoric parent speech) খাড়া করিয়া দিলেন।

এই মূলভাষা এবং তাহা হইতে যে সকল ইউরোপীয় ও এশিয়াটিক ভাষার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয়ান বা ইন্দো-জার্মেনিক ভাষাগোষ্ঠী। Aryan নামটি ইংলণ্ডে বেশী প্রচলিত, দ্বিতীয় নামটি ফরাসী ও আমেরিকার পণ্ডিত মহলে ও তৃতীয় নামটি জার্মেনীতে প্রচলিত।

বপ্ এবং তাঁহার অনুগামীদিগের গবেষণার ফলে পণ্ডিতসমাজে এই মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে একটি আদি আর্য মূলভাষা ছিল, তাহা হইতে পরবর্তীকালে কতকগুলি ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার ঠিকুজি এই প্রকারের :—

মূল আর্যভাষা

এসিয়াটিক — ইউরোপীয়

ভারতীয় — ইরাণী — ৭টি ইউরোপীয় শাখাগোষ্ঠী

আর্মানী ভাষা কাহারও মতে ইউরোপীয় শাখাভুক্ত,

কাহারও মতে ইহার উৎপত্তি এশিয়াটিক ও ইউরোপীয় শাখার মিশ্রণে। মূলভাষা হইতে উদ্ভূত ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যা দশটি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কি ভাবে, কখন এই গোষ্ঠীগুলি মূলভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বাধা অলঙ্ঘ্য বলিয়া মনে হইলেও কেহ কেহ নিরুৎসাহ হন নাই।

মূলভাষা যখন একটি ছিল তখন এই ভাষাভাষী জাতিও একটি অবশ্য ছিল (the great original Aryan tribe)। মূল ভাষাকে যাঁহারা আর্য নাম দিয়াছেন তাঁহাদের মত এই যে উহা হইতে উদ্ভূত সবগুলি ভাষা যাহারা ব্যবহার করে তাহারা সকলে আর্যবংশধর। ইহার পর আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণের ("Our Aryan forefathers") আদি বাসভূমি কোথায় ছিল, কি ভাবে, কখন তাঁহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়েন সে সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হইল। Philology কেমন করিয়া Ethnologyর পথে পা বাড়াইল তাহা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই ভাবে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে জাতি সৃষ্টি হইল। যে সকল বাধাবিঘ্ন যথার্থ বৈজ্ঞানিকমনা ভাষা-বিজ্ঞানীকে নিরস্ত করিয়া রাখিত, উৎসাহী, একাধারে ফিলোলজিষ্ট ও এথনোলজিষ্টদিগকে তাহা ঠেকাইতে পারে নাই। আর্যভাষাগোষ্ঠী হইতে আর্য পূর্বপুরুষ, ক্রমে Aryan race, Aryan nationality ("Europe may boast of being the mother of Aryan nationality"—Schrader-এর মত দ্রষ্টব্য), Aryan brotherhood প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। আর্যপূর্বপুরুষগণের ধর্ম, সমাজব্যবস্থা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে।

পণ্ডিত Schrader-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর্যপূর্বপুরুষদিগের আদি বাসভূমি আর্যবাদী য়ুরোপীয় গবেষকগণ দুই হাতে টানিয়া উত্তর-পশ্চিম এশিয়া হইতে রুশিয়ার সীমানার মধ্যে ফেলিয়াছেন, কেহ কেহ বল্টিক অঞ্চলে লইয়া গিয়াছেন। এক দল পণ্ডিতের এই প্রকার উদ্যম হইতে রাজনৈতিক আর্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। উপরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিসন্ধিমূলক ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বলা হইয়াছে। পলিটিক্যাল আর্যবাদ ইহার দৃষ্টান্ত। ইহার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে জার্মেনীতে। এই ইতিহাস সুপরিচিত।

দেখা যাইতেছে যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে মূল ভাষাভাষী একটি জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। এই কল্পিত জাতির সহিত অত্যন্ত দূর সম্পর্কিত বলিয়া যাহাদিগকে মনে করা হয় (Indians and Iranians) তাহারা একটি বিশিষ্ট নামে আপনাদিগের পরিচয় দিত। এ সম্বন্ধে তাহাদের দলিল-দস্তাবেজ আছে, আর কাহারও তাহা নাই। এই নামটি হইতেছে আর্য। এই বিশিষ্ট নামের উৎপত্তির একটা ইতিহাস পাওয়া যায়. ইহার ভৌগোলিক একটা অর্থ আছে। এই ভৌগোলিক অর্থদ্যোতক নামটি তাহারাই বহন করিবার অধিকারী যাহারা এই নাম ব্যবহারের সময়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলটিতে বাস করিত, অথবা যাহারা তাহাদের বংশধর। কিন্তু এ সকল কথা বিবেচনা করিবার অবকাশ কোথায়? তাই দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে উপনিবিষ্ট জাতির ও সেই ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধবাচক আর্য নামটি ঐ কল্পিত জাতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইল। তার পরের ব্যাপার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইউরোপীয় আর্যবাদের উৎপত্তির পটভূমি সংক্ষেপে এইরূপ।

দেখা যাইতেছে যে ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে একটি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই জাতিকে আবার এমন একটি নাম দেওয়া হইয়াছে যাহা এই অনুমিত জাতির বাসভূমি ইত্যাদি সম্বন্ধে ইউরোপীয় গবেষণা অনুসারে কোন মতে তাহাকে দেওয়া চলে না। এই ব্যাপারটি যদি আপত্তিকর মনে করা যায় তাহা হইলে ইউরোপীয় আর্যবাদের যে ব্যবহারিক প্রয়োগ, অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক নূতন নূতন মতবাদের ভিত্তি হিসাবে আর্যবাদের যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহা আরও আপত্তিকর মনে হইবে।

ভাষা-বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে জাতি সৃষ্টির ইহাই একমাত্র নমুনা নহে। ভারতবর্ষের মধ্য হইতে আর একটি নমুনা দেওয়া যায়। ভাষা-বিজ্ঞানী এই ভাবে দ্রাবিড়িয়ান (Dravidian) জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছেন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী। তাঁহাদের উদ্যম এখানে নিরস্ত হয় নাই। এই ভাবে সৃষ্ট দ্রাবিড় জাতিকে ভারতবর্ষের আর্য আক্রমণকারীদিগের প্রতিপক্ষ রূপে দাঁড় করাইয়া তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত মতবাদের নীরস অস্থিখণ্ড লইয়া ভারতীয় আর্য জাতি ও দ্রাবিড় জাতির উৎসাহী সমর্থকদিগকে তাঁহারা আপনাদিগের বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ করিবার অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষে রপ্তানীর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত ইউরোপীয় আর্যবাদ যখন এদেশে প্রথম প্রচারিত হইল, কৃষ্ণকায় ভারতীয় হিন্দুগণ সবিস্ময় পুলকে আবিষ্কার করিল যে তাহারা তাহাদের বিজেতা জাতির সগোত্রীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বেচ্ছায় তাঁহারা লৌহশৃঙ্খল ধারণ করিয়াছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর Aryan brotherhood-এর মতবাদ এই শৃঙ্খলের ক্ষতের উপর স্নিগ্ধ প্রলেপ লেপন করিল। তার পর হইতে

ভারতীয় নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী, বৈদেশিক নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচার করিতেছেন ভারতীয় হিন্দুর নাক, মুখ, মাথা, সবই ইউরোপীয় আর্যের, শুধু ত্বকের কৃষ্ণত্বটুকু আসিয়াছে climatic conditions হইতে। ইহা ব্যঙ্গ বা অতিরঞ্জন নহে, প্রকৃত ঘটনা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার নাম প্রোটো-নর্ডিক থিওরী। বর্তমানে আর্যবাদের রাজনৈতিক দিক কাহারও কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা কদাচিৎ দেখা যায়। এখানে একটি পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কাহিনী হইতে বর্তমান বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যাইবে। দ্রাবিদিয়ান জাতির স্রষ্টা বিশপ ক্যাল্ডওয়েলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ (Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages) প্রকাশিত হইলে মিঃ গোভার নামক এক ব্যক্তি দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশপের মতের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার মর্ম বিশপের নিজের কথায় উদ্ধৃত করা হইতেছে:

"He (Mr. Gover) considers it of great moral and political importance to prove that the Dravidians were Aryan and not of a Scythian race. The Scythian theory, he says, 'shuts up the door of sympathy and fellow-feeling between the Dravidian peoples and their English conquerors." (Comparative Grammar 2nd Ed. 1875).

এই ইঙ্গিতে তীক্ষ্ণধী বিশপ ক্যাল্ডওয়েল কর্ণপাত করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার ধারণা এইরূপ ছিল যে দক্ষিণ-ভারতীয়গণ উত্তর-ভারতীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতি, এই মতবাদই ইংরেজ বিজেতাগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বেশী সুবিধাজনক হইবে।

সে যাহা হউক উপরে এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের আর্যপদের ব্যবহার অসঙ্গত ও অযৌক্তিক এবং ইউরোপীয় আর্যবাদের প্রকৃত কোন ভিত্তি নাই। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের গবেষণা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া উপরের এই ইঙ্গিত করিবার মত যে সকল প্রমাণের আলোচনা বিভিন্ন প্রবন্ধে করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইবে এবং প্রয়োজন মতে অতিরিক্ত দুই-একটি প্রমাণের উল্লেখ করা হইবে।

প্রথম কথা এই যে পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতে এই সূত্র পাওয়া গিয়াছে যে আর্যপদের একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই ভৌগোলিক অঞ্চল আইরিয়ানা বা আরিয়ানা। এই আইরিয়ানা বা আরিয়ানা হইতে ঋগ্বেদের আর্যপদ আসিয়াছে, এবং আবেস্তার আইরিয়াও বা আরিয় পদ আসিয়াছে। পরবর্তীকালে এই আইরিয়ানা হইতে আইরাণ বা ইরাণ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এখানে একটু সতর্ক হইতে হইবে। আধুনিক পারস্য বা ইরাণের যে ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ পশ্চিমে কুর্দীস্থান হইতে পূর্বে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত যে মালভূমির নাম ইরাণ দেওয়া হয়, তাহা প্রাচীন আইরিয়ানার সীমানা নহে। ইরাণীয় গোষ্ঠীর ভাষার ইতিহাস, প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মের ইতিহাস এবং আবেস্তার সাক্ষ্য ইহার প্রমাণ। পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যে আইরিয়ানা হইতে আর্য নামটি আসিয়াছে তাহা ভৌগোলিকগণের পূর্ব-ইরাণও নহে। এই আইরিয়ানার কেন্দ্রস্থল হিন্দুকুশ—ইহার একটি নাম Indian Caucasus,—পশ্চিমে খোরাশান, দক্ষিণে শতুদ্রি, উত্তর-পূর্বে পামীর উপত্যকা ও উত্তর-পশ্চিমে সুগধা ও মৌরু, ইহার এইরূপ সীমানা নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সীমানা সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে আবেস্তার আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির তালিকা হইতে মোটামুটিভাবে এই সীমানা নির্দেশ করা হইতেছে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে হিন্দুকুশের উত্তরে অক্সাস উপত্যকা, দক্ষিণে সিন্ধু উপত্যকা ও পশ্চিমে হরিরুদের অববাহিকা লইয়া এই প্রাচীন আইরিয়ানা সংগঠিত ছিল। আবেস্তায় কয়েকবার আরিয়াবো ডাঙ্হাবো (aryavo danhavo) পদের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ কেহ Aryan countries, কেহ Aryan races করিয়াছেন। যাহারা আর্য দেশ অর্থ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যাকট্রিয়া, পারস্য ও মিডিয়া লইয়া এই দেশ গঠিত ছিল বলেন। কিন্তু প্রাচীন পারস্য বা ফার্স ও মিডিয়া আইরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইহা যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে সেই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে বলা যায় না। পূর্বে উল্লিখিত প্রথম দারিয়ুসের উক্তিও স্মরণ করিতে হইবে। যাহারা ইহার অর্থ Aryan races বলেন তাঁহাদের কথা—

"The followers of the Zoroastrian religion in their earliest records never give themselves any other title but Airyavo danhavo, that is to say, Arian races."

কিন্তু জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের প্রাচীনতম দলিলে দেখা যায় যে এই ধর্ম তাহার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়াছিল এবং অহুরা মাজদার সৃষ্ট আইরিয়ানায় এমন কতকগুলি গোষ্ঠী বাস করিত যাহারা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম গ্রহণ করে নাই। আইরিয়াবোর সহজ অর্থ আইরিয়ানার অধিবাসী গোষ্ঠী। সে যাহা হউক, এইরূপ অনুমান করা যায় যে পশ্চিম-ইরাণের

অঞ্চলগুলিতে ইরাণীয় বা আর্য গোষ্ঠীর লোক অথবা আই-রিয়ানার অধিবাসীরা পরবর্তীকালে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। হেরোডোটাস যে সময়ে মীডগণ আরিওয়া বলিয়া পরিচিত ছিল বলিয়াছেন (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতক) তাহার বহু পূর্বে আর্য গোষ্ঠীর লোক ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল ইহা সহজে অনুমান করা যায়।

আবেস্তায় আইরিয়াও জাতির বাসভূমি আইরিয়ানা। আইরিয়ানা পহ্লবী অনুবাদে আইরান হইয়াছে। চ্যাল্ডিক-পহ্লবীতে লিখিত সাসানীয় লেখনে Aryan রূপ দেখা যায়।

হাজিবাদ গ্রামে (Istakhr) সাসানীয় সম্রাট্ প্রথম সাহ্‌পুরের একটি শিলালেখনের ব্রিটিশ মৃ্যজিয়ামে রক্ষিত অনুলিপির নকল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (New Series, Vol. iii) প্রকাশিত হইয়াছিল। ডাঃ হগ তাঁহার গ্রন্থে এই লেখন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

সাসানীয় পহ্লবী—

Tagalahi Zenman li mazdaysn bagi shahpupari, malkan malka Airan va Aniran minochitri min yaztan barman mazdayasn bagi Artakh-shatar malkan malka Airan······

চ্যাল্ডিক পহ্লবী—

Karzavani zenman li mazdayazn alaha Shahipuhari malkin malka Aryan va Anaryan minoshihar min Yaztam, bari mazdayazn alaha Arta khshatar, malkin malka Aryan······

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছে,

"This is an edict of me, the Mazda-worshipping divine being shahpuhar, king of the kings of Iran and non-Iran, of spiritual origin from God; son of the Mazda-worshipping divine being Ardashir, king of the kings of Iran······

এখানে চ্যাল্ডিক-পহ্লবীতে Aryan va Anaryanকে Airan va Aniran পড়া যাইতে পারে। Aryan ও Airan দুইটি রূপ Iran পদ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং Anaryan ও Aniran un-Iran বা non-Iran বুঝাইতেছে। ইরাণ কথাটি এখানে আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইরাণ দেশ বা ইরাণ গোষ্ঠীর ভাবাভাষী জাতি সম্বন্ধে। Aniran বা Anaryan কথাটির যে অর্থ করা হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রথম যে সাহ্‌পুরের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টীয় ২৪২—২৭২) ব্যাকট্রিয়া, সুগধা, আরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত পশ্চিম-ইরাণের রাজনৈতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, রোম সম্রাট্ ভ্যালেরিনকে যিনি পরাজিত ও বন্দী করিয়াছিলেন তিনি ব্যাকট্রিয়া অধিকার করেন নাই। ব্যাকট্রিয়া তখন তুখার রাজগণের অধিকারে। তাঁহাদিগের হাত হইতে উহা হেপথালাইট হূণদিগের দখলে চলিয়া যায়।

পহ্লবীর এই আইরান এরানে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আইরিয়ানা হইতে আইরান এবং ক্রমে এরান, ইরুণ এবং আধুনিক ইরাণ কি ভাবে আসিয়াছে তাহার ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন ইরাণ রূপটি গত পাঁচ শত বৎসরকাল প্রচলিত আছে। আবেস্তার আইরিয়ানা দেশ যে পহ্লবীর আইরান দেশ নহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। চ্যাল্ডিক-পহ্লবীর আরিয়ান দেশের সম্বন্ধে অর্থাৎ আইরানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। দারিয়ুসের লেখন হইতে অনুমান করা যায় যে আরিয় (ariya, cuneiform inscription) আইরিয়ানার প্রাচীন জাতি হইতে উদ্ভূত লোক বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। অর্থাৎ আবেস্তার আইরিয়াও old Persian-এ আরিয় হইয়াছে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে গ্রীক আমলে আরিয়া বলিতে হিরাট অঞ্চল বুঝাইত।

ঋগ্বেদের আর্য, আবেস্তার আরিয়াও, প্রাচীন পারসিক আরিয় এই পদগুলি অভিন্ন এবং এই পদগুলি আইরিয়ানা বা আরিয়ানা নামক নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসী অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং আর্যপদ যে একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক অর্থবাচক তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈদিক ও আবেস্তিক গবেষণায় কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আর্য জাতি ইরাণীয় মালভূমির পূর্বাঞ্চলে হিন্দুকুশের সন্নিকট হইতে পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছিল। ("They came from the eastern part of the Iranian plateau near the Hindukush mountains.") এখানে ও পূর্বের কয়েকটি প্রবন্ধে প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। বলা আবশ্যক যে ইউরোপীয় গবেষণার প্রথম আমলে, অর্থাৎ পোলিটিকাল আর্যবাদের জন্মের পূর্বে, এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছিল।

ইহার পরে ভৌগোলিক অর্থবাচক আর্যপদের কৃষ্টি-বাচক অর্থের কথা আসে। ঋগ্বেদে আর্যবাদের কৃষ্টি-বাচক অর্থ সম্বন্ধে পূর্বের এক প্রবন্ধে (প্রবাসী পৌষ, ১৩৫২) বিস্তারিত বলা হইয়াছে। আর্য বর্ণ, আর্য ব্রত, আর্য ভাব, আর্যকে পৃথিবী দান, আর্যের জন্য জ্যোতিরূপে অগ্নির উৎপত্তি, আর্যের জন্য যব বপন ইত্যাদি নানাভাবে ঋগ্বেদে আর্যপদের উল্লেখ আছে। অনেক বার আর্য শত্রুর উল্লেখও দেখা যায়। কিন্তু সমগ্র ঋগ্বেদে এক বার মাত্র পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে কুশযুক্ত যজ্ঞ যাহারা করে তাহারা আর্য। আর্যপদের ব্যবহার হইতে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে সূক্তকার ঋষিগণ

আর্যবর্ণ বলিতে আপনাদিগকে বুঝাইতেছেন। সুতরাং ঋগ্বেদের আর্যকৃষ্টি সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে হইলে আপনাদের সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে এই ধারণা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার স্থানাভাব। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে গাথা ও আবেস্তার অন্য অংশে "আর্যত্ব" সম্বন্ধে সচেতন মনোভাবের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মশাস্ত্রের সামান্য অংশ মাত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং গাথা অংশ বাদে অন্যান্য অংশ খৃঃ পূঃ ৪র্থ বা ৫ম শতকের রচনা পণ্ডিতগণ এইরূপ মনে করেন। গাথা অংশেও প্রতিমা পূজা, প্রতিমা পূজার পুরোহিত প্রভৃতির প্রতি আক্রমণ যে পরিমাণে দেখা যায় তাহাতে ঋগ্বেদের তুলনায় উহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। যে ফ্রাবারডিন ইয়াষ্টে বলা হইয়াছে যে গাথো মারাথনের দেহ হইতে অহুরা মাজদা আর্য দেশের মধ্যস্থল সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে গৌতমের ও ধর্মচক্রের উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহা হউক, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্ম আইরিয়ানার প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ধর্ম; ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া বিরুদ্ধ ভাবের যে সকল পরিচয় পাওয়া স্বাভাবিক তাহা বাদ দিলে দেখা যায় যে বৈদিক আর্যকৃষ্টি ও আবেস্তার আর্যকৃষ্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও ঐক্য বর্তমান।

প্রথম সাহ্‌পুরের শিলা লেখনের যে অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে আইরান এবং অনআইরান, আরিয়ান অনারিয়ান পদগুলি পাওয়া যাইতেছে। অনআইরান ও অনারিয়ানকে অনার্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু ইহার ইংরেজী অনুবাদ Non-Iran, ঠিক। সাসানীয় আমলে পারস্যের নাম ইরাণ হইয়া দাঁড়ায়। পারস্য নামটি একটি প্রদেশের নাম, সমগ্র দেশের সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ বৈদেশিকগণের হাতে হইয়াছে। আইরিয়ানা ও তাহার অধিবাসী আরিও বা আর্য জাতির স্মৃতি তখন লুপ্ত হইয়াছে। হাকামণি ও সাসানীয় দুই রাজবংশের জন্মভূমি ফার্স বা পারস্য। কিন্তু যে প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া প্রথম দারিয়ুস "আমি পারশীকের পুত্র পারশীক, আরিয়র পুত্র আরিয়" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করা ঋতক্ষত্রের (আদর্শীর) পুত্র সাহ্‌পুর আবশ্যক মনে করেন নাই। যাহা হউক, সাসানীয় লেখনের এই Non-Iran বলিতে কোন্ অঞ্চল বুঝায় তাহা পরিষ্কার নহে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা সুদূর পূর্বাঞ্চল হইতে পারে অথবা আর্মেনীয়া হইতে পারে। পূর্বাঞ্চল বলিতে খোরাশানের পূর্বে ব্যাকট্রিয়া, হিরাট প্রভৃতি বুঝায়। এই অঞ্চলকে অনাইরান বলা চলে সাসানীয় আমলে ইরাণের রাজনৈতিক সীমানা বিবেচনা করিলে। আর্মেনীয়ার অধিবাসী ইরাণের অধিবাসীর সগোষ্ঠীয় বলা হয়। সাহ্‌পুর মেসোপটেমিয়া অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং অনাইরান বলিতে এই অঞ্চলও বুঝাইতে পারে। সাহ্‌পুরের পিতা শুধু ইরাণের সম্রাট ছিলেন, পুত্রের সাম্রাজ্য ইরাণের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল।

সাসানীয় আমলের ইরাণ বা ইরাণীয় গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ যে অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত তাহার চতুঃসীমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় পশ্চিমে উহার সীমা ছিল সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অঞ্চল, উত্তর-পূর্বে উরল-আলটাইক (ural-altaic) ভাষাগোষ্ঠীর অঞ্চল ও পূর্বে ভারতবর্ষের আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অঞ্চল। পূর্বে ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠী ও ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সীমারেখা অনির্দিষ্ট এবং দুই গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনা করিলে এই অবস্থা স্বাভাবিক মনে করা যায়। যাহা হউক, ইরাণীয় গোষ্ঠীর ভাষার চার দিকের সীমানার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে পশ্চিমে ও উত্তরে দুইটি ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী বর্তমান, কেবল দক্ষিণ-পূর্বে ও পূর্বে ইহার সম্পর্কিত ভাষাগোষ্ঠী বর্তমান। ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠী তাহার উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমারেখা যে কোন দিন অতিক্রম করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। সুতরাং এই ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থান পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল হইতে পারে না, উহার অগ্রগতিও পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম বা উত্তর পূর্ব-দিক হইতে পূর্ব দিকে হইতে পারে না। জর্জিয়ার ওসেটিক ভাষাকে ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত বলা হয়, ইহা একটি ক্ষুদ্র উপজাতির ভাষা। প্রাচীন কাল হইতে পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত জর্জিয়ার রাজনৈতিক সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিলে এই সম্পর্কের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। আর্মেনীয়ার ভাষা সম্বন্ধে ভাষা-বিজ্ঞানীদিগের মত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইরাণী ভাষাগোষ্ঠী ও ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া যদি অনুমান করা যায় যে এই দুই গোষ্ঠী এক মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত তাহা হইলে দেখা যায় যে কাস্পিয়ান হইতে পূর্ব দিকে হিন্দুকুশ ও হিমালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথ পর্যন্ত—যদি তামিল, তেলেগু, ক্যানাড়ী ও মলয়ালীকে ভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা মনে করা হয়,—এক মূল ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। কিন্তু ইরাণী গোষ্ঠীর যে সকল শাখা বর্তমান তাহারা এই গোষ্ঠীর একটি শাখা, পশ্চিম শাখা (Western Iranian) হইতে উদ্ভূত। এই শাখাটি বরাবর সেমিটিক

মেশা। পূর্ব শাখা—যাহার সহিত ভারতীয় আর্যগোষ্ঠীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর,—তাহা সম্ভবতঃ গ্রীক আক্রমণের বহু পূর্বে লুপ্ত হইয়াছিল। জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মগ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই ভাষা হাকামণি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে লুপ্ত হইয়া যাওয়া একটা আশ্চর্য ব্যাপার এবং ইহার অবশ্য একটা তাৎপর্য আছে।

গাথার ভাষা ও বৈদিক ভাষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ইহারা two dialects of the same tongue. আরও বলা হইয়াছে যে গাথার ভাষা হইতে ঐ ভাষার অবনতির অবস্থা বুঝা যায়। ইহা যথার্থ হইলে বলিতে হয় যে অনুমিত মূলভাষা হইতে গাথার ভাষার তুলনায় যে ভাষা অপেক্ষাকৃত অবিকৃত সেই ভাষা অবশ্য বেশী প্রাচীন। ইহা নূতন কথা নহে। অধিকাংশ পণ্ডিত ঋগ্বেদকে গাথা হইতে প্রাচীন মনে করেন। জরাথুস্ট্রের প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতীয় আর্য ও ইরাণীয় বা ব্যাকট্রিয়ার আর্যদিগের মধ্যে মতান্তর আরম্ভ হইবার কয়েক শতাব্দী পরে জরাথুস্ট্র আবির্ভূত হইয়া প্রচলিত অহুরা ধর্মের নীতি ও অনুষ্ঠান আপনার ধর্মের মধ্যে গ্রহণ করিয়া অহুরা মাজদার উপাসনা প্রচলিত করেন, তাহাও এই মত সমর্থন করে। তার পর আবার দেখা যায় যে জরাথুস্ট্র যে সকল অনুষ্ঠান ও দেবদেবী বর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মধ্যে সেইগুলি আংশিক পরিবর্তিত রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। এই তথ্যগুলি মিলাইলে যে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, কি কারণে বলা যায় না, পণ্ডিতগণ সে সিদ্ধান্তে আসেন নাই বা আসিতে চাহেন নাই।

ককেশাস হইতে আসিয়া ইরাণে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির দুই দলের মধ্যে মতান্তর, এক দলের মধ্যে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা-পদ্ধতি ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের উৎপত্তি, ইরাণের বাসভূমি হইতে এই দলের বিতাড়ন এবং ভারতবর্ষ মুখে প্রস্থান, এই কাহিনী ইউরোপীয় আর্যবাদের সমর্থকদিগের দ্বারা প্রচারিত হইয়া বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। এ দেশে প্রথম প্রচারিত হইবার সময়ে ইহা ভারতীয় পণ্ডিতের মনকে কি ভাবে নাড়া দিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলে একটু কৌতুক বোধ হয়। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষিকার্যে অনুরক্ত ও নিরামিষাশী ইরাণীয় আর্যগোষ্ঠী (এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যজ্ঞে পশু বলি দিবার প্রথা জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মে প্রচলিত ছিল এবং এই মাংস ভোজন করিবার ব্যবস্থা ছিল। বেহরাম ইয়াষ্ট দ্রষ্টব্য) ও পশুপালক, আমিষাশী যাযাবর বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ ও ফলে এক দিকে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের অভ্যুদয় ও অন্য দিকে বৈদিক আর্যগোষ্ঠীর বিতাড়নের কাহিনী গলাধঃকরণ করিয়া একজন এদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিতেছেন, এই বিতাড়িত দল Brahmanic Aryansদিগের পূর্বপুরুষ।

"In India they found a peaceful congenial home.······It may offend the self love of the Brahmans to be told that the celestial wars resulted in the final overthrow of Indra, or., in other words, that their ancestors were expelled from their ancient home by the followers of the Asuras."

Asuras বলিতে অহুরা মাজদা ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ বুঝাইতেছে। যে ভারতীয় পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছেন তাঁহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল। উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করিয়া এইমাত্র বলা যায় যে লেখক ব্রাহ্মণ নহেন।

আবেস্তার আমলে ইরাণ বলিয়া কোন ভৌগোলিক অঞ্চল বা ইরাণীয় বলিয়া কোন জাতি ছিল না। আবেস্তার আইরিয়ানা সাসানীয় আমলের ইরাণ নহে। আইরিয়ানার অধিবাসীর জাতীয় নাম ছিল আইরিয়াও বা আরিয় বা আর্য। এই আইরিয়ানার ভাষার দুইটি শাখা দেখা যায়, বৈদিক ভাষা এবং গাথা ও আবেস্তার ভাষা। গাথা ও আবেস্তার ভাষাকে এক দিকে যেমন মূল ভাষা হইতে অধিকতর বিকৃত এবং বৈদিক ভাষার তুলনায় আধুনিক দেখা যায় অন্য দিকে সেইরূপ দেখা যায় যে গ্রীক আক্রমণের সময়ে অর্থাৎ হাকামণি যুগে উহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। জরাথুস্ট্রের আবির্ভাবের সময়, (কোন কোন মতে খৃঃ পূঃ ৭ম শতক) ও গাথা ও আবেস্তার ভাষা লুপ্ত হইবার সময় বিবেচনা করিলে অনুমান হয় জরাথুস্ট্রের পরে এই ভাষা তিন চার শত বৎসর প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতর বৈদিক ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে এই ইতিহাসের তুলনা করিতে হইবে। ভাষার এই ইতিহাসের সঙ্গে জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মের ইতিহাস,—জরাথুস্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বেকার ধর্ম, গাথা উষ্টাবৈতিতে দেশের লোকের ও দেশের দুই শাসকগণের বিরোধিতা, অনুগামীগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারককে পরিত্যাগ, এখন কোন্ দেশে গিয়া তিনি অহুরা মাজদার ধর্ম প্রচার করিবেন ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ, জোরোষ্ট্রিয়ান ধর্মে প্রাচীন ধর্মের কোন কোন অঙ্গের পুনঃ প্রচলন এবং মিডিয়ায় মাজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ইত্যাদি মিলাইতে হইবে।

ফলে যে সিদ্ধান্তে আসিতে হয় তাহা এইরূপ : আইরিয়ানার অনুমিত মূল ভাষা ও ধর্মের অবিকৃত রূপ যাহাই হউক প্রাচীন আর্য জাতির মধ্যে বৈদিক ভাষা ও ধর্ম প্রচলিত ছিল। ইতিমধ্যে আর্যগোষ্ঠীর লোক এক দিকে মালভূমির পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং অন্য দিকে পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও প্রতিমা পূজার অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং হিন্দুকুশের উত্তরাংশে এই নূতন ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার হইয়াছিল। অহুরা ধর্মের অভ্যুদয় সম্বন্ধে যাহা বলা হয় এখানে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। এইমাত্র বলা যায় যে হিন্দু-

কুশের উত্তরে বৈদিক ধর্মের অগ্নি উপাসনার উপর জোর দেওয়া হয়, দক্ষিণে সোমযাগের উপর জোর দেওয়া হয়। পশ্চিমে জরাথুষ্ট্র আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু আইরিয়ানায় এই বিদ্রোহ বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। বাল্‌খে বৈদিক ভাষা হইতে সেই সময়ে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল গাথার ভাষায় তাহা দানা বাঁধিয়াছে। আইরিয়ানায় বিরোধিতার ফলে জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মমত পশ্চিম মুখে গতি পাইল, বাল্‌খে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও পরে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হইল। জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম যখন পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছিল আর্য জাতির সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে ব্যাকটিয়া ও সিন্ধু উপত্যকা তখন হৃতগৌরব। মাজি সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্ম সুদূর পশ্চিমে নব জীবন লাভ করিল, গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এই রকম সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল শাক্য-বংশীয় রাজকুমারের দ্বারা।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পক্ষে বাধা প্রচলিত আর্যবাদ। কিন্তু আর্যবাদের সমর্থকগণ সম্ভবতঃ অসুবিধাজনক মনে করিয়া জরাথুষ্ট্রের নিজের রচিত বলিয়া প্রচারিত গাথা অহুনাবৈতি ও গাথা উষ্টানৈতির সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। প্রাচীন পারসীক কিম্বদন্তী মতে জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাব কাল যে প্রথম দারিয়ুসের পিতা হিষ্টাপেসের সমসাময়িক (খৃঃ পূঃ ৫৫০) বা গ্রীক আক্রমণের দুই শত বৎসর পূর্বে ইহা স্মরণ রাখা যাইতে পারে। আর্যবাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য জরাথুষ্ট্রের আবির্ভাবের কাল পাঁচ হইতে সাত শত বৎসর পিছাইয়া দিবার পক্ষে ভাষা-বিজ্ঞানীর অনুমান ছাড়া আর কি প্রমাণ আছে তাহা বলা হয় নাই। জরাথুষ্ট্রের কাল সম্বন্ধে নানা প্রকার অদ্ভুত মত প্রচলিত আছে। বাবিলোনীয় বেরোসসের (Berosos) মতে জরাথুষ্ট্র খৃঃ পূঃ ২২০০ শতাব্দীতে বাবিলোনের রাজা ছিলেন। আরিষ্টটল ও যুডোকসাসের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাইতেছে যে আইরিয়ানা হইতে পরবর্তী কালে ইরাণ পদের উৎপত্তি হইলেও ঐতিহাসিক আমলের পূর্ব-ইরাণের একাংশ মাত্র আইরিয়ানার সীমানার মধ্যে পড়ে। প্রাচীন ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে ইরাণের প্রাণকেন্দ্র বিস্তৃত মালভূমির পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল, পশ্চিম অংশ অনেকখানি সেমিটিক প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। হাকামণি, গ্রীস, আরসিকিডান ও সাসানীয় আমলে পূর্ব-ইরাণের রাজনৈতিক ইতিহাসের মর্ম পূর্বের দুইটি প্রবন্ধে (প্রবাসী, শ্রাবণ ও কার্তিক, ১৩৫৩) দেওয়া হইয়াছে। আরব জাতি পারস্য অধিকার করিয়া সমগ্র দেশকে ইসলামে দীক্ষিত করিল, ইরাণের প্রাচীন ধর্ম ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ইস্তাকার (Ishtakar) বারবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রক্ত মোক্ষণে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দুই শত বৎসর আরব শাসনের পরে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির আন্দোলন আরম্ভ হইল খোরাশানে। তাহিরিদ ও সামানিদ রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল খোরাশানে। সাফারিদ বংশের অভ্যুদয় জাবুলিস্থান বা সিস্তানে। নূতন জাতীয় ভাবধারা আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি হইল তাহার জন্মভূমি, বাল্‌খ, বোখারা (সুগধা), হিরাট, মার্ভ (মৌরু) ইত্যাদি।

উপরের আলোচনা হইতে আর্য জাতির দেশ আইরিয়ানার ভৌগোলিক অবস্থান এবং আইরিয়াও, আরিয় ও আর্যবাদের উৎপত্তির ইতিহাস ও অর্থ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হইবে, আইরিয়ানা হইতে আর্যগোষ্ঠীর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইবে। একটা প্রশ্ন উঠে, আইরিয়ানার এই আর্য জাতির প্রাচীন ইতিহাসে এমন কি ছিল যাহাতে ঋগ্বেদের ঋষিকুলের আর্য বলিয়া গৌরব বোধ করিবার, আবেস্তায় বার বার আইরিয়াও জাতির উল্লেখ করিবার, পার্সিপে বা ফার্সে যিনি জন্মিয়াছিলেন সেই প্রথম দারিয়ুসের আরিয় বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিবার, অধুনালুপ্ত মীড জাতির আরিওয়া বলিয়া খ্যাত হইবার, সংক্ষেপে আর্য নামের একটা বিশিষ্ট সম্মানজ্ঞাপক অর্থ আসিবার কি কারণ ঘটিয়াছিল? ঋগ্বেদ অপেক্ষা প্রাচীন কোন্ কীর্তির জন্য এই অহঙ্কার ও আত্মসচেতন ভাব আসিল? এই প্রাচীন কীর্তি আমাদের অজ্ঞাত হইতে পারে কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহ যে একটা জাতির মনে এই ভাব অকারণে আসে নাই।

এখন খ্রীষ্ট জন্মের পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাহারা নিজেদের আর্য বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের কথায় আসা যাউক। একজন লেখক মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "Europe may boast of being the mother of Aryan nationality." ভাষা-বিজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া কল্পনা-প্রবৃত্তির এই প্রকার উদ্দাম বিলাস সুধী ব্যক্তিগণের হাস্য উদ্রেক করে নাই। যে নাম একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সহিত সম্বন্ধবাচক, যে নাম একটা নির্দিষ্ট কৃষ্টিবাচক, যে নাম বহন করিবার অধিকারীরা ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হইতে পরিচিত সেই নামের দাবিদার দাঁড়াইয়াছে ইউরোপের জাতিসমূহ (Ugro-Finns গোষ্ঠীবাদে), বিশেষ করিয়া টিউটন জাতির বর্তমান বংশধরগণ! বৈজ্ঞানিক ঠাটবাট সমেত একটা প্রকাণ্ড মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে এই দাবি প্রমাণ ও প্রচার করিবার জন্য। রাজনৈতিক নেতাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য পণ্ডিতগণ অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন।

ব্রণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ রেশন চালু হওয়াতে বিপিন বিপন্ন বোধ করলে। বেশ চলছিল চালের কারবার—টাকায় টাকা লাভ—কি তার চেয়েও বেশী। কোম্পানীর আইনকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল সবে আয়ত্ত করে নিয়েছে—এমন সময় হবে-কি-হবে-না এই সন্দেহ-দোলায় দুলতে দুলতে—হবে খবর পৌঁছে গেল—শহরে রেশন চালু হয়েছে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে। অবশ্য শহর থেকে ষাট মাইল দূরের এই গ্রামখানিতে মাথা-পিছু বরাদ্দের ব্যাপারটা আপাতত চালু হবে না, কিন্তু আয়ের অঙ্ক যেটা ক্রমশই স্ফীত থেকে স্ফীততর হচ্ছিল সেটার এক প্রান্তে মাঝারি রকমের একটা ছিদ্র ত দেখা দিলে। বলতে গেলে শহর নিয়েই এই কারবার ফলাও হচ্ছিল—নইলে বিপিনের মত চুনোপুঁটিরা রুই-মৃগেলে পরিণত হবার আশা করবে কোন্ পুণ্যফলে! ছোটমত একটা দোকান—তার বাপের আমল থেকে বসতবাড়ির বাইরের ঘরে চলে আসছে। তাতে চাল ডাল মশলাপাতি থেকে হাঁড়ি কলসী পেরেক স্ক্রু বিড়ি সিগারেট পর্য্যন্ত সাজানো থাকত। পাঁচ রকমের জিনিসে লাভ খুব বেশী না হলেও সংসার চলত কায়ক্লেশে। কি শুভক্ষণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল—গেল যুদ্ধে যারা ধনী হয়েছিল—তাদের দৃষ্টান্ত ছোট বড় মাঝারি সকল ধনাভিলাষীদের চোখের সম্মুখে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল, কিন্তু এ পোড়া যুদ্ধে হঠাৎ কোন জিনিসের দর যেন উঠতেই চায় না। তারপর জাপান যুদ্ধে নামল—তারপর এল মহা মন্বন্তর। এক দিকে সাগু-দারুচিনি-এলাচ-সুপুরি-কুইনিন—অন্য দিকে চাল আটার বাজার হঠাৎ আগুন হয়ে উঠল। সুরু হল ধনসঞ্চয়ের প্রতিযোগিতা। তা বলতে নেই—মাত্র ছ'টি মাসের মধ্যে বিপিনের পোষ্ট আপিসের খাতাখানির পাতা প্রায় ভর্ত্তি হয়ে উঠল, বাইরের চালাখানি ঘুচে একটা পাকা বারান্দাসমেত ঘর মাথা তুললে—চারদিকে উঁচু করে পাঁচিল ঘিরে বাড়ীটাকে অন্তঃপুরের মর্য্যাদা দেওয়া হ'ল।

একতলা ঘরের অসুবিধা নিয়ে আজকাল স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই তর্ক হয়। উঁচুতে ওঠার কোন মানেই হয় না—সব দিক দিয়ে যদি সেটা প্রমাণিত না হয়। প্রতিবেশীদের ঈর্ষাদুষ্ট না করতে পারলে মানবজন্মের সার্থকতা কি করে যে প্রতিপন্ন করা যায় এ আন্নাকালী কিছুতেই বুঝতে পারে না। কয়েকটি উপায়ে মাত্র এটা হওয়া সম্ভব। তা শাড়ীতে ও গহনায় সম্ভ্রান্ত ঘরের মর্য্যাদা প্রায় আয়ত্ত হয়েছে—বাড়ীটির খুঁতই বা থাকবে কেন—এ আন্না কিছুতেই বুঝতে পারে না। ঝি-চাকর? এ কথাটা আন্না ভালমতেই জানে—নিজের গতর না খাটাতে হলেই যথেষ্ট। শুধু শুধু পয়সা উড়িয়ে জাঁকজমকের কোন মানেই হয় না। বিধবা বড় জা সংসার মাথায় করে রেখেছে—সংসারের ভারি ভারি কাজগুলো তার দ্বারাই সুসম্পাদিত হয়। আন্না যে গতর নাড়ে না তা নয়—কিন্তু এক গা গহনা পরে লোকসান বাঁচিয়ে অর্থাৎ সোনা না ক্ষয়ে যায়—এমন ভাবে তাকে চলাফেরা করতে হয়। আজকাল সোনার দামটাও কি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে না! একটা ভারী রকমের গহনা তৈরির কথা ক'দিন থেকে মনে তোলাপাড়া করছে, কিন্তু দোতলার হেস্তনেস্ত না করে আন্না সোনায় দেহ মুড়তে রাজী নয়। দোতলার বারান্দায় বা ছাদে চুল শুকোবার কালে বা কাপড় মেলে দিতে গিয়ে—কিংবা অকারণেই খানিকটা ঘুরে বেড়াবার সময়—অলঙ্কারসমৃদ্ধ দেহ-লাবণ্য যদি পাশের বাড়ীর বা পথের কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করল তো কি ফল এ ছার জীবনে! যে উঁচু পাঁচিল তোলা হয়েছে বাড়ির চারদিকে—অন্যের ছাদ থেকে উঁকি মেরেও কেউ গহনা কাপড় ত দূরের কথা—মানুষটাকেই ভাল করে ঠাহর করতে পারে না। পোড়া কপাল, একতলা ঘরের বাসিন্দা বড়লোকদের!

রোজ রোজ বিকার শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে বিপিনের। যে কটি ভাত খাবার সে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়, মাছ বা দুধের শেষাংশ কারও জন্য সে পাতে ফেলে রাখে না। খাওয়ার শেষে কচ কচ করে গোটাকতক পান চিবোয়—ভুড়ুক ভুড়ুক করে খানিকক্ষণ তামাক টানে—ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে খানিকটা ঘুমোয়—এ সবের সঙ্গে আন্নার অনুযোগগুলো একতান বাদ্যের মত আশ্চর্য্য রকম মিশে যায়—কোথাও একটু অখণ্ডি জাগায় না।

আজ যথারীতি বড় জা এসে ভাতের থালা দিলে। শীত-কাল—মাছি নেই—তবু আন্না পাখা হাতে করে বসলে সামনে। বসেই আরম্ভ করলে, মিত্তিরদের মেজ বউ আজ বেড়াতে এসেছিল। বললে, 'ওমা—এত টাকা হয়েছে শুনি, তোদের ঘরদোরের এমন তোকলা তোকলা ভাব কেন।' লজ্জায় ঘেন্নায় মাটির সঙ্গে মিশে রইলাম—একটি কথা বলতে পারি নি। বিশ্বেস না হয় দিদিকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।

রেশন চালু হবার খবরটা বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল—সে জ্বালা বার হবার পথ না পেয়ে মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠছিল এতক্ষণ। এই কথায় সে দপ করে জ্বলে উঠে বললে, আর দোতলায় উঠে সুখ ভোগ করতে হবে না—যা আছে গায়ে তা বজায় থাকলে ভাগ্যি বলে মেনো।

বিপিনের জ্বলে-ওঠা আকস্মিক বলেই—আন্না মিনিটখানেক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর পাখা আছড়ে সেও চীৎকার করে উঠল, উঃ পুরুষের মুরোদ কত! বলে ভাত দেবার কেউ নয়—নাক কাটবার গোঁসাই! লজ্জা করে না মুখ নাড়তে!

ছেলে মেয়ে বড় জা যে যেখানে ছিল ছুটে এল। পাশের

বাড়ীর জানালাগুলো খুলে গেল, উঁচু পাঁচিলের মাথায় কয়েকটা দুঃসাহসী ছেলেকেও দেখা গেল। এ রকম ব্যাপার এ বাড়ীতে অভূতপূর্ব্ব। এক তরফা যা চলে আসছে এতকাল ধরে তা পাঁচিলের ওপিঠে পৌঁছয় নি। ব্যবসাদারের প্রধান গুণ ধৈর্য্য—তা বিপিনের প্রচুরই ছিল।

যাই হোক—ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বড় জা ব্যাপারটাকে বেশীদূর গড়াতে দিলে না—তবে বিপিনের খাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেল।

আধ খাওয়া করে উঠলেও রাগের জেরটা সে টেনেই চলল। পান মুখে দিলে না, তামাক টানলে না কিংবা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে মাকও তাকালে না। আঁচিয়ে ভাল করে মুখের জল না মুছেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

শম্ভু সাহা বড় দোকানদার। তার দোকান-ঘরের পিছনে একটা খুপরিমত ঘরে বসে এই দুপুর বেলায় প্রায়ই সুখ-দুঃখের কথা হয়। সমব্যবসায়ীদের সলাপরামর্শের নিভৃত জায়গা এটি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বিপিন এখানে আসে না। শুধু গল্প হলে কথা ছিল না—কয়েক মাস থেকে দাবার ছকও একটা পড়ছে। চুপচাপ বসে আকাশ-পাতাল ভেবে এক একটা ঘুঁটি এগিয়ে দেওয়ার মধ্যে কি যে আনন্দ তা বিপিন ভেবে পায় না। দু-চারটে চাল দেখলেই তার মাথা ধরে ওঠে—আলস্য বোধ হয় এবং দেয়াল ঠেস দিয়ে বাড়ীর অভ্যস্ত দিবানিদ্রাটাকে প্রায় পুষিয়ে নেয়। এ ঘরে যে সুখদুঃখের আলোচনা হয় তা কোন্ গন্ধের চাল কি দরে বিকোচ্ছে—কোন্ মোকাম থেকে সরবে তিসি চালান আনিয়ে খরচখরচা বাদ কত টাকা গড়পড়তা লাভ দাঁড়াচ্ছে—কোন্ হাটে মুগ কলাই প্রচুর আমদানি হওয়াতে বাজার-দর থেকে মণপ্রতি আট আনা সুবিধা হয়েছে ইত্যাদি। তা এই সব মুখরোচক লাভজনক আলোচনা আজকাল উঠে গেছে বললেই হয়। সাদা বাজারের জন্ত কারই বা মাথাব্যথা। মণপ্রতি চার আনা আট আনা লাভ—এ কি লাভ নাকি! মারি ত গণ্ডার লোচের না হলে ব্যবসা করে সুখই বা কি!

দুপুরে কেনাবেচা চলছে ঢিলে তালে। দোকানকর্ম্মচারীরা অধিকাংশই স্নান আহারের জন্ত বাড়ী যাবে, দু-এক জনকে বেলা দশটায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তারা পান চিবোতে চিবোতে এসে বসবে পাল্লার সামনে। দুপুরবেলায় অল্প খদ্দের থাকে বলে বেশী লোকের দরকার হয় না। শম্ভু সাহা বেলা দশটায় আহারাদি সেরে তহবিল নিয়ে একটা উঁচুমত তক্তাপোষে বসে। পাশে বসে লাল খেরো বাঁধা মোটা মোটা খাতা নিয়ে দু'জন মুহুরি। পাইকারি ও খুচরা দু' রকম খদ্দেরের হিসাব আছে। যে সব মাল কলকাতা থেকে আসছে তার জমাখরচ আছে—যে সব মাল ছোট গাঁয়ের দোকানীরা নিচ্ছে তার চালান লেখা, টাকা বুঝে নেওয়া আছে। দোকানের কেনাবেচায় টাকা এসে জমছে তহবিলে। বাক্সের ডালাটি মুহূর্তে মুহূর্তে উঠছে আর নামছে—জিনিসের দাম বাদে খুচরো রেজকি খদ্দেরকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। প্রকাণ্ড বাক্সের এক একটা খোপে বিভিন্ন রকমের রেজকি, টাকা, নোট প্রভৃতি আলাদা করা আছে। কাজ হচ্ছে কলের মত। দুপুরে দোকানের লাগাও ঐ খুপ্‌রি ঘরটাতে গিয়ে শম্ভু ঘণ্টা দুই জিরিয়ে নেয়। বড় ক্যাশ-বাক্সের চাবিটা তার কোমরের ঘুন্‌সিতে বাঁধা থাকে—দুপুরে দু-এক জন খদ্দের এলে বড় বাক্স খোলবার দরকার হয় না। যারা ডাল বিক্রী করে তারাই পয়সা বুঝে নেয়। নিজেদের বসবার তক্তার গায়ে ছোটমত যে খোপ আছে তাতেই পয়সা ফেলে—ভাঙানি দেয়। এটুকু বিশ্বাস না করলে ব্যবসা চলে না।

বিপিন এসে দেখলে খুপ্‌রিতে আজ লোক বোঝাই—অথচ দাবার ছক তাকের ওপর তোলা রয়েছে। গল্পও বেশ জমে নি।

বিপিন আসতেই শম্ভু সাহা তাকিয়াটার ওপর একটু নড়ে বসে বললে, এস বিপিন।

বিপিন বললে, আর এস! খবর শুনে তো হাতপা ঠাণ্ডা মেরে আসছে মশায়।

শম্ভু সাহা ঈষৎ হেসে বললে, ভাবনা কিসের, বলে না:

শরীরের নাম মহাশয়—
যা সওয়াও তাই সয়।

যুদ্ধের আগের অবস্থা আর আজকের অবস্থা ভাব ত।

বিপিন বললে, কিন্তু একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেলে—ব্যবসার কম্মো কিলিয়ার হবে না কি?

রতন গড়াই বললে, তারপর আইনের নানান রকম ক্যাচাং—হাঙ্গাম হুজ্জুৎ—

শম্ভু তাকিয়াটা কোলের ওপর তুলে ধরে মিষ্টি করে হাসলে। বললে, আইন—হাঙ্গামা! আরে ভাই—পদ্যপাঠে পড় নি:

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

পয়সা তো গাছের ফল নয় যে কোঁচড় পাতলেই টুপটাপ করে পড়বে।

বিপিন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, কিন্তু কড়া আইন—

শম্ভু বললে, আইন আর কোনকালে নরম হয় রে ভাই। কড়া আইনে না বাঁধলে চড়া লাভটা কি সাগ্‌রা আসে! কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন—

বিপিন রাগ করে বললে, কড়া আইনকে বাগ মানাতে তোমার মত লাখপতিরা পারে—আমার মত চুনোপুঁটিরা—

শম্ভু বললে, প্রায় বৎসরাবধি কালো কারবার চালিয়ে কোন্ লোকটা চুনোপুঁটি আছে বলতে পার। হেঁ হেঁ বাবা—সবাই এখন যাকে বলে রাঘব বোয়াল।

শম্ভুর উচ্চ হাসিতে ছোট ঘরটা গম গম করে উঠল। কেউ সে হাসিতে যোগ দিলে—কেউ বা কারো পা টিপে ইসারা করলে। সবাই বুঝলে, আইনকে পাশ কাটাবার বিদ্যা অন্ন

শভুর আয়ত্তাধীন। নতুবা আসন্ন বিপদের মুখে এমন বে-পরোয়া ভাবে কেউ হাসতে পারে।

এবার ওধার চেয়ে পথটা নির্জন দেখে বিপিন দাঁতে দাঁত চেপে বিকৃত কণ্ঠে উচ্চারণ করলে, চামার—রক্ত-চোষ—

কে? রতন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

কে? ন্যাকা—জানেন না কিছু।

নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে রতন অপ্রতিভ সুরে বললে, বুঝেই বা করছি কি ভাই—যাদের টাকা আছে তাদের রীতই আলাদা। বিপিন বললে, টাকা থাকলে যা খুশী তাই করা যায়—ধর্মকে ঠকানো যায় না।

ধর্ম! আর একবার বিস্মিতভাবে কথাটা উচ্চারণ করেই রতন সামলে নিলে। কলিকালে আবার ধর্ম! চারপোয়া পাপ পূর্ণ না হয়ে যুদ্ধ বাধে দেশে? অরাজক হয়?

বিপিন খিঁচিয়ে উঠল, দেখ রতন—ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়—এক কাহন দিয়ে তিন কাহন নেয় তোর হ'ল গিয়ে সেই গোত্তর। যুদ্ধ বাধাটা পাপের ফল কিসে? মানুষের অভাব ঘুচবে না? আগুন জ্বেলে কলাগাছ হয় নি কেউ?

রতন সতেজে উত্তর দিলে, যে যার হয়েছে—তার হয়েছে—আমার কি!

বিপিন বললে, ঘটে বুদ্ধি না থাকলে কিছুই হয় না। ওই চামার শভুটা জোঁকের মত মানুষের রক্ত চুষে মোটা হচ্ছে দিনকের দিন—এটা বুঝি নজরে পড়ে না?

রতন বললে, ওর মত টাকার আণ্ডিল হলে আমিও দেখাতে পারতাম—

থাক—থাক আর ফুটুনি মারিস নে—তোদের হিম্মত জানা আছে।

রতন রাগ করে বললে, তোর হিম্মতও জানতে বাকি নেই কারো। চালে ছিল খড়—পাঁচিলে ছিল না ইঁট—যুদ্ধ না বাধলে—

নির্জন পথ প্রায় শেষ হয়ে এল—মোড় ফিরলেই বাজারের মধ্যে এসে যাবে তারা। এখন ঝগড়া করে লোক হাসিয়ে লাভটা কি। বিপিন ওর ডান হাতখানা চেপে ধরে বললে, আয়।

হাতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে রতন রাগ প্রকাশ করলে। ছাড়—লাগে মাইরি। আবার টানে।

তোর ভালর জন্যেই টানছি। ওই যে সুধীরবাবু—সেদিন হাটের মধ্যিখানে বক্তৃতা দিলে না, তাই সব—মুনাফাখোর শয়তানদের চিনে রাখ—ওরা জোঁকের মত তোমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে।

রতন বললে, সে তো আমাদেরই বললে।

আমাদের নয়—যারা সত্যিই সকলকার রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের বললে। ওই শভুর মত লোকেদের। যারা আইনকে টাকার জোরে কলা দেখাতে পারে—তাদের অসাধ্য দুনিয়াতে কি আছে!

তা আছে তো আছে—ইদিকে টানিস কেন?

ওই বাবুদের কাছে যাব। শভুর গুণের কথাটা খুলে বলব সকলকে।

তাতে আমাদের লাভ?

ও তো জব্দ হবে।

না ভাই, নিজের গলদ বেরিয়ে পড়বে তাতে। ওদের টাকা আছে। না পুলিস—না স্বদেশী মিঞাই কিছু করতে পারবে। লাভে হবে পুঁটিমাছের প্রাণ—ছাড় ছাড় লাগে না? কি যে ইয়ার্কি করিস—মাইরি।

সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে রতন বিপরীত দিকে পা চালালে।

বিপিনের ক্রোধের বেগটা সহসা মন্দীভূত হ'ল। ও বুঝলে—পরের সম্পদ বৃদ্ধিতে—অক্ষম হিংসা পুষে ক্ষতবিক্ষত হওয়া ছাড়া কোন প্রতিকারই তার দ্বারা সম্ভব নয়। ইচ্ছায় যে পথে সে পা বাড়িয়েছে—সে পথ থেকে পিছু হটা বিপজ্জনক। শভুকে জব্দ করবার উপায় ভেবে চিন্তে বার করতে হবে।

গ্রামের একটেরে বারোয়ারিতলায় ক'জন লোককে কারা যেন কি উপদেশ দিচ্ছে। দূর থেকে বুঝা যায় বক্তৃতার উত্তেজনা লোকদের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে। মাঝে মাঝে তারা হুঙ্কার দিয়ে উঠছে, জগতের বণিক নিপাত হোক।

আনন্দে বিপিনের বুকখানা নেচে উঠল। এ গাঁয়ের অনেক লোকই তাকে জানে। যুদ্ধের বাজারে অবস্থা ফেরায় সে যে অনেকের ঈর্ষার পাত্র তা সে বুঝতে পারে, কিন্তু এই মুহূর্তে শহরে রেশন চালু হবার পর থেকে সে কি বণিকশ্রেণীর তালিকা থেকে নেমে পড়ে নি! দুখানা গহনা গড়ালে কিংবা একখানা একতলা ঘর তুললেই অবস্থা সচ্ছল হয়েছে এই কথা মাত্র বলা চলে—বণিকশ্রেণীর সংজ্ঞা আলাদা। দশ বছর আমিরী চালে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেলেও যার টাকা ফুরোয় না সেই ব্যক্তিই তো—

মিটিঙের লোকগুলি বিপিনের পানে চেয়ে কেমন যেন মিইয়ে গেল। বিপিনের কাছে ওরা ঋণী না হলেও কৃতজ্ঞ বটে। টাকা দিয়েও যে-বাজারে চাল পাওয়ার আশা ছিল না—সে বাজারে বিপিন ত্রাতা এবং অন্নদাতা দুই-ই। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যই অর্থ। সে অর্থের বিনিময়ে, হোক তা প্রচুর, যে জীবনরক্ষার জিনিস সরবরাহ করেছে—মহামন্বন্তর-কবলিত বিপন্নেরা তাকে কেমনই বা কৃতজ্ঞতা না জানাবে। যুদ্ধের পরমায়ু যেমন করে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না—তেমনি মন্বন্তরও যে বৎসরান্তে ফিরে আসবে না তারই বা নিশ্চয়তা কি। বিপিনকে ওরা ভীতির পাত্র মনে করলে কেন।

রকের উপর দাঁড়িয়ে দু'জন বক্তা কানে কানে কি বললে 'বুর্জোয়া' এই শব্দটা কানে গেল—মানে বুঝলে না বিপিন। সে আর একটু এগিয়ে রকের ধারে এসে দাঁড়াল—একবার

ইতস্ততঃ করলে। ডান হাতে মাথাটা চুলকে বললে, আপনাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে বাবু।

বক্তাদের একজন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ। আমরা ত বাবু ব্ল্যাক মার্কেটের খবর রাখি না।

এই ব্যঙ্গোক্তিতে বিপিন রাগ করলে না, বললে ব্লেলাক মার্কেটের মুখে ঝাঁটা মারি বাবু—সে যা হয়েছে হয়েছে। এই নাকে খত দিচ্ছি, কান মলছি, ও পথ আমার নয়।

বক্তাদের একজন বললেন, পেট ভর্ত্তি থাকলে রক্তে শুনেছি বাঘেরও অরুচি হয়।

বিপিন বললে, যা খুশী বলুন বাবু রাগ করব না। অন্যায় করেছি সে কথা একবার নয়, একশো বার স্বীকার করছি। কিন্তু বাবু পাপ করলে প্রাচিত্তিরের বিধান নেই, এমন কোন শাস্তর আছে কি?

বক্তারা এবার সত্যই বিস্মিত হলেন। লোকটা বলে কি। যুদ্ধের বাজারে শোষণক্রিয়াদক্ষ ব্যক্তির হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন অভাবনীয় বলতে হবে। এ ক্ষণিক উচ্ছ্বাস, না সুপরিকল্পিত কোন কিছু রয়েছে ওর মধ্যে?

একজন বললে, তোমার যা আছে, সব ত্যাগ করতে পারবে?

দেখুন বাবু পরীক্ষে করে। একটু হেসে বললে, বাইরে থেকে মনে হয় অনেক কিছু জমিয়েছি হয়ত বা লাখপতিই হব, কিন্তু বাবু—

ওঁরা হেসে বললেন, আচ্ছা চুপ করে বসে আমাদের লেকচার শোন, তারপর উচিত মনে কর—

বক্তৃতাশেষে বিপিন বক্তাদের অনুসরণ করলে।

নিজেকে নূতন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে যে অনাচার চলছে সে অনাচার দমন করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। দুষ্কৃতদমনের উল্লাস আছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

পথ চলতে চলতে সমব্যবসায়ী যার সঙ্গে দেখা হ'ল—তাকেই সগৌরবে নিজ সঙ্কল্পের কথা সে ব্যক্ত করলে।

ভেবে দেখলাম—পাপ যা তা মানুষকে খাটো করে। পুঁজিদাররা হ'ল পৃথিবীর শত্রু, তাদের ধ্বংস করবার জন্যই এই যুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হলে এরা একজনও পৃথিবীতে থাকবে না।

অনাদি তাকে একান্তে ডেকে বললে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বিপিন, ইংরেজ রাজত্বে সূর্য্য অস্ত যায় না জানিস। ওরা পুঁজিপতি না হলে—

বিপিন বললে, পুঁজিদার কেউ থাকবে না পৃথিবীতে—বাবুরা বলেছে।

তোর বাবুরা তো পুঁজির মর্ম্ম বুঝলে না। বলে হেসে গলার স্বর খাটো করে আনলে, এক জায়গায় নুনের সন্ধান পেলাম—দু'শো মণ।

বিপিন অভ্যাসবশত বললে, মাইরি? না খাপ্পা লাগাচ্ছিস?

খাপ্পা লাগাই ত আমি—মধুর নবরের বাবা শপথ নিয়ে বিপিনকে সে আশ্বস্ত করলে।

বিপিন সন্দিগ্ধ স্বরে বললে, তা তুইও ত কিনতে পারতিস, আমাকে বলছি যে বড়?

তবে—শোন—টাকা নেই হাতে। আজ রবিবার পোষ্ট আপিসের পাস বই থেকে তোলাও যাবে না। অথচ শম্ভু খবর পেলে আজই কুটোটা পর্য্যন্ত কিনে নেবে। একটা ঢোক গিলে বললে, তবে তোকেও যে খবরটা দিচ্ছি বিনি স্বার্থে তা মনে করিস নে। বস্তাপ্রতি এক সিকি ছাড়তে পার—সন্ধান বলে দেব, না হলে বাবা কেটে পড়।

বিপিন তার হাত ধরে বললে, আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা খবর দেব—মানে আমারও তো টাকার অনটন যাচ্ছে। আর এই মাত্তর প্রিতিজ্ঞে করে এলাম—

ধুত্তো'র প্রিতিজ্ঞে! বড় বড় লোকেরা আজ দিব্বি-দিলেসা করছে—কাল তা ভাঙছে। ভশ্চাজ্জি মশাই কালই তো বলছিলেন—রুশের সঙ্গে জার্ম্মানী দশ বছর যুদ্ধ করবে না বলে খত লিখে ইষ্টাম্পর সই করে দিয়েছিল—আজ আদ্ধেক রুশ তার পেটের মধ্যে।

বিপিন তার হাতে চাপ দিয়ে বললে, আচ্ছা, মা-কালীর দিব্যি রইল, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবি।

আচ্ছা।

বিপিন ভাবলে, জাল তো সে গুটিয়েই নিচ্ছে, শেষবারের মত একটা টান দিতে ক্ষতি কি। রুই কাতলার আশা সে করে না—অন্তত চুনোপুঁটিও যদি এই টানে আসে আসুক না।

বাড়ী আসতেই আন্না বললে, নকুল মিস্তির এসে কত ডাকাডাকি করছিল—বললে, তুমি নাকি ইঁটের বায়না দেবে—

শক্ত শক্ত কথাগুলোকে ঠোঁটের প্রান্ত থেকে গলার মধ্যে চালান করে দিয়ে বিপিন একটু হাসলে। বললে, হাঁ ভেবে দেখলাম দোতলাটা তুলে ফেলাই ভাল—তোমারও সাধ যখন এত দিনের—

আন্না বললে, তবু ভাল যে ভগবান তোমায় সুমতি দিয়েছেন।

বিপিন বললে, একটা পরামর্শ আছে—ইদিকে এস। বলে শোবার ঘরে খিল লাগিয়ে বহুক্ষণ ধরে তার সঙ্গে ফিস-ফাস করলে।

সবটা শুনে আন্না বললে, আমায় ফাঁকি দেবার মতলব নয় তো?

এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি। বিপিন হাত বাড়ালে।

আন্না তার হাতখানা ঠেলে দিয়ে বললে, যদি লাভ না হয়—তা হলে আমার গহনাগুলো গেল তো!

লাভ না হয় তো আমার নাক কান কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিও।

এত বড় আশ্বাসেও আন্না আশ্বস্ত হ'ল না। পোষ্ট আপিসের পাস বইখানা আর লোহার সিন্দুকের চাবিটা নিজের

খায়ে তুলে তবে সে তোলা গহনার বাক্সটা বিপিনের হাতে এনে দিলে।—দেবার সময় করুণ স্বরে বললে, মা-কালীর দিব্যি রইল—আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিলাম। যদি বিশ্বাসভূকি হও এর প্রতিফল ভগবান তোমায় দেবেন।

বিপিন বললে, এই কাজটা হয়ে যাক আগে—নিজের নামে কিছুই রাখব না—সব তোমার নামে লেখাপড়া করে দেব।

চটি পায়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করছে বড় জা ডাকলে, ঠাকুরপো—একটা কথা আছে।

অপ্রসন্ন চিত্তে বিপিন বললে, যাচ্ছি এক জায়গায়—পিছু ডাকলে তো? যত সব—

বেচারী মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, আমি তো পিছু থেকে ডাকি নি—

আচ্ছা—আচ্ছা যা বলবার—বলে ফেল।

কত্তা বলছিল—কাল বই না নিয়ে ইস্কুল গেলে মাষ্টার মারবে।

ইস্—মারলেই হ'ল। আচ্ছা আমার কি কুবেরের সম্পত্তি দেখেছ তোমরা মায়ে ব্যাটায়? নতুন বই না হলে পড়া হয় না? কেন যারা ওপর কেলাসে উঠেছে—তাদের চেয়ে চেয়ে চিন্তে নিয়ে পড়া হয় না? আমরা তো এক বই উপরি উপরি তিন বছর ধরে পড়েছি। সে রাগের মাথায় বেরিয়ে গেল।

কথাটা বিপিনের মিথ্যা নয়। তিন বছর একই ক্লাসে স্থিতিশীলতার লক্ষণ দেখে—অভিধান-বহির্ভূত কতকগুলো বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করে বাবা ওকে দোকানঘরে এনে বসিয়েছিল। বিপিন এ কথা নিয়ে প্রায়ই আন্নার কাছে গর্ব্ব করে বলে, নিজের বাবা বলে বড়াই করছি নে—ওনার দিব্যদিষ্টি ছিল। লেখাপড়া শিখে সত্তর-আশী টাকা মাইনের চাকরি করে এই যুদ্ধের কলকাঠি কোথায় নড়ছে বুঝতে পারতাম? তোমার ছেলেরাও ছুটো তিনটে পাস দিয়ে খোড়ার ঘাস কাটবে এ আমি বলে রাখছি।

বড় জার বিষণ্ণ মুখ দেখে আন্না প্রবোধ দিলে, ভেব না দিদি—আজ রাত্তিরে টাকা যদি আদায় না করি তো ছিদাম হালদার মেয়ে নই আমি। শুনেছ তো? এত দিন ক্যা-ক্যা করে মরলাম কি বেরথাই। বলে গেল ইট পোড়ানো হচ্ছে—দোতলা হবে।

বড় জা শুধু বললে, ভগবান ঠাকুরপোর সুমতি দিন—মা রক্ষেকালী মুখ তুলে চান।

বিপিন আসতেই অনাদি বললে, মাপ কর ভাই—এই মাত্তর মাল গস্ত হয়ে গেল।

মানে! টাকা পেলে কোথায়?

তোমার বউদি জানই তো চাপা মেয়েলোক। বললে, ভগবান করুক ঠাকুরপোর বাড়-বাড়ন্ত হোক—এ সুযোগটা তুমি ছেড় না। আমার গহনাগুলো নিয়ে আদ্ধেক টাকা দিয়ে মাল বায়না করে রাখ—চাষার ব্যাটা থাক না—লেখাপড়াটা শুধু পাকা হোক। বুদ্ধিমাণী মেয়েছেলে—কি বল ভাই?

বিপিনের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সে হাসির একটা উজ্জ্বল ঠোঁটের উপর তুলে বললে, অবিশ্যি নিজ স্বার্থে সে গহনাগুলো ছেড়ে দেয় নি। বললে, লাভের থেকে পাঁচ ভরি সোনা আমায় দিও। কিনা—

বিপিন হন হন করে চলতে সুরু করেছে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে—সুযোগ পেয়ে বুদ্ধিহীন অনাদিও তাকে এক হাত নিলে।—আচ্ছা, সবুর কর্। বাবুরা বলেছে, এ যুদ্ধে সব বড়লোকরা শেষ হয়ে যাবে। জোর গলাতেই লেখাপড়া জানা মানুষেরা যে কথা বলছে তা কি ফলবে না? কেন ফলবে না? শাস্ত্রেও তো বলেছে—যেদিন কলির চার পোয়া পাপ পূর্ণ হবে—সেইদিন—

গহনার পুঁটুলিটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত গায়ের কাপড়ের মধ্যে জ্বলছে। আগুন—না আন্নাকালীকে বঞ্চনা করার—বাবুদের কাছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপগুলো এর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এ তারই পাপ—তারই পাপের ফল। এমনি করেই পৃথিবীর সঞ্চিত সোনায় আগুন ধরে যাবে এক দিন। সে দিন বেশী দূরে নয়—এই যুদ্ধটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত—

এত বুঝেও সোনার তালগুলো সে বাবুদের হাতে তুলে দিলে না। পৃথিবীতে যে সাম্যবাদের ঢেউ উঠেছে তা থেকে কারও পরিত্রাণ নেই; সোনার মূল্য তখন হয়ত সোনাই থাকবে না। কিন্তু সে তো যুদ্ধের পরের কথা। আপাততঃ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এটা এমন জায়গায় গচ্ছিত রাখতে হবে—যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না—কিংবা সাম্যবাদের ভিত্তিতে তা বংশগত দাবিকে ছাড়িয়ে গোষ্ঠীগত সম্পত্তিতে বর্ত্তাবে না। তার একমাত্র উপায়—

বাড়ী এসে বিপিন গহনার পুঁটুলিটা আন্নাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, ভেবে দেখলাম—তোমার গহনায় হাত না দেওয়াই উচিত। ব্যবসার কথা তো বলা যায় না—ধর যদি একটা ভালমন্দ হয় তখন আমাকেই দুষবে। তুমিও কথা বলতে ছাড়বে না—পাড়ার পাঁচ জনও ছি-ছাকার করবে।

আন্নাকালী প্রসন্নচিত্তে গহনার পুঁটুলি হাতে নিয়ে বললে, তা হলে দোতলা হবে না?

কেন হবে না। বাড়ি ঘর দুয়োর ব্যবসা ইষ্টেটপত্তর সব তোমার নামে লেখাপড়া করে দেব কাল।

আন্নাকালী স্বামীর অবিক্ষুব্ধ মুখের পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বহুক্ষণ; পরে বললে, তা না তোমার খুশী। কিন্তু তোমার ব্যবসা আমি চালাতে পারব কেন?

আচ্ছা—সে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেব—না হয় ম্যানেজার রেখো আমায়।

স্বামীর রসিকতায় আন্নাকালী পরম সন্তুষ্ট মনে গহনাগুলো বাক্সজাত করলে। তারপর কাছে এসে বললে, এস—জল-খাবার খাবে। খানকতক লুচি ভেজে রাখলাম, ভাবলাম সকালে তো খাবা গরম করে হাতে ভাতে করে উঠে গেলে—

লুচির থালাটা সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে, দিদি বলছিল —ক্লাসের বই ক'খানা কিনে না দিলে—

বিপিন বললে, লেখাপড়া শিখে কি হবে বলতে পার? একজন মজুর যা উপার্জ্জন করবে—পাঁচটা পাস দিয়ে তোমার ছেলে-ভাইপোরা—উকিল, দারোগা—অত বড় ব্যবসাদার শত্রু না সবাই তাই রোজগার করবে। টাকা আর কারো জমিয়ে রাখতে হবে না! মনে করছি—কালই সব ক'টাকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেব। বউদি রাজী না হয়—বেশ ত, কারো স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই নে—যা খুশী করুক গে।

কয়েকখানা লুচি উদরস্থ করে বললে, বাবুরা কি বলছিল জান? এই যুদ্ধ শেষ হলে—

আন্নাকালী হাঁ করে বিপিনের বক্তৃতা শুনতে লাগল।

নবীন আয়ার্লণ্ড

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পঁচিশ বৎসর হইল আইরিশ ফ্রি ষ্টেট—বর্ত্তমানে যাহা আয়ার বা আয়ার্লণ্ড নামে পরিচিত—প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আয়ার্লণ্ডবাসীদের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব কতটা কার্য্যকরী হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার সময় আজ আসিয়াছে। আইরিশ পত্রিকাগুলির সাম্প্রতিক মন্তব্যে দেখি দুইটি অঞ্চলের মধ্যে ঐক্যবোধ আজ নিঃশেষে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সুতরাং ভারতবাসীকে বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ডের ইতিহাস আজ গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের মধ্যে কি সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখা উচিত।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা অনেকটা ১৯২১-২২ সনের আয়ার্লণ্ডের অনুরূপ। ইংরেজের ভেদনীতি সেদিন আয়ার্লণ্ডকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজের সঙ্গে আয়ার্লণ্ডের জাতীয়তাবাদী নেতারা সেদিন যেভাবে আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন আজ ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ায় সেই একই কূট রাষ্ট্রনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ডের কর্ণধার ইমন ডি ভ্যালেরা ভারতবর্ষের পক্ষে এই বিভেদের শোচনীয় কুফল আশঙ্কা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তখন তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন—



আইরিশ মেলায় গ্রাম্য কুটীরশিল্পের প্রদর্শনী

"ইহা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার যে, আয়ার্লণ্ডে আমরা যাহা পরিহার করিতে চাহিয়াছিলাম ভারতবাসী তাহাই গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডের জাতীয়তাবাদী নেতারা কেমন করিয়া যে দেশবিভাগকে মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা আইরিশ জনগণের নিকট এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

আইরিশ নেতারা একদিন ভাবিয়াছিলেন যে বিভক্ত আয়ার্লণ্ড পুনর্মিলিত হইবে। কিন্তু আজ ২৫ বৎসর পরে তাঁহাদের সে আশা আকাশকুসুমের মতই অলীক রহিয়া গেল, বরং

বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ড যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিতর দিয়া চলিয়াছে তাহার সূত্রপাত ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যখন সেখানকার একটি রাজনৈতিক দল উক্ত বৎসরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চুক্তির সর্ত্তগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। আর একটি দল কিন্তু চরম নিষ্পত্তি বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে রাজী না হইয়া প্রত্যাখ্যান করে। ফলে দুই দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং আজও পর্য্যন্ত তাহার জের চলিতেছে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে প্রায় দশ বৎসর কাল প্রথমোক্ত



সমবায় সমিতির লোকেরা মাখন ইত্যাদি বাক্সজাত করিতেছে

দলই আইরিশ রাষ্ট্রে নায়কত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। সন্ধির ব্যাপারে তাঁহারাই জিতিয়াছিলেন, যে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণে আপত্তি জানাইয়াছিলেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে হটাইয়া দিয়াছিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে তাহারা সম্পূর্ণ রূপে নিষ্ক্রিয় এবং বহুধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের সংহতিকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এমনি ভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব লাভ করিয়া তাঁহারা প্রচণ্ড উৎসাহে নূতন আয়ার্লণ্ড প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

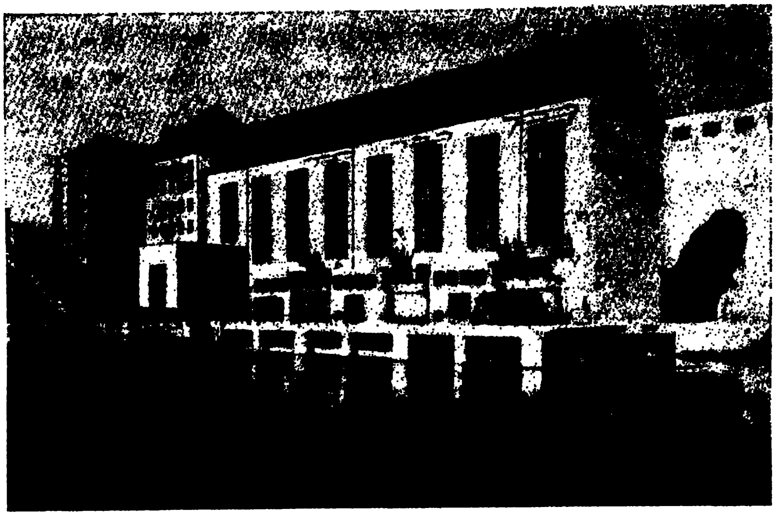
আর কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধন বা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনায় দিকে তাহাদের ঝোঁক ছিল না এবং এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় যে, ১৯২২ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরের আয়ার্লণ্ডে ভিতরের দিক দিয়া তেমন পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই—অবশ্য বাহিরের দিক দিয়া কিছু কিছু অদলবদল যে না হইয়াছিল তেমন নয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ১৯২২-এর পর হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত আয়ার্লণ্ডের রাজনৈতিক বিবর্ত্তন তাহার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। যথাসময়ে আয়ার্লণ্ড লীগ অব নেশন্স বা জাতিসঙ্ঘে তাহার যোগ্য আসন গ্রহণ করিল। সিভিল সার্ভিস, প্রধান বিচারকের পদ, সামাজিক জীবনের সাধারণ আইনকানুন ইত্যাদি আধুনিক শাসনতন্ত্র অনুযায়ীই গঠিত হইল।

এই অন্তর্বর্ত্তী কালে আয়ার্লণ্ডে এমন সব ঘটনা ঘটিতেছিল যাহার প্রভাব যথাসময়ে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারের লোকেরা জীবিকা অর্জ্জনের যাবতীয় ক্ষেত্র আসিয়া দখল করিতেছিল। চাষী, দোকানী, গেঁয়ো ডাক্তার প্রভৃতি সাধারণ লোকেদের ছেলেপিলেরা টাকা রোজগারের জন্য নানা পেশা অবলম্বন করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবনযাত্রার মানই বদলাইয়া গেল। তাহাদের অবস্থার অবনতি হইয়াছিল একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি তাহাদের খুব যে উন্নতি হইয়াছিল তাহাও বলা যাইতে পারে না। মোট কথা এই যে, তাহাদের গতানুগতিক জীবনে আসিয়াছিল বিরাট পরিবর্ত্তন, নূতন পারিপার্শ্বিক সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় তাহাদিগকে উপনীত করিয়াছিল। তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী ছিল সহজ সরল এবং গণতান্ত্রিকতার আদর্শ তাহাদের উপরেই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছিল।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ভোটযুদ্ধে মিঃ ডি ভ্যালেরার বিজয়লাভের পর গণতন্ত্রের পথে আয়র্লণ্ডের এই গতিবেগ যেন দশ গুণ বাড়িয়া গেল। এই বৎসর হইতে তাঁহার নেতৃত্বে 'ফিয়ানা ফেল' নামক রাজনৈতিক দলটিই আইরিশ রাষ্ট্রে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। আয়ার্লের বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থা 'ডি ভ্যালেরা কর্ত্তৃক প্রণীত ১৯৩৭ এর শাসনতন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিধান অনুযায়ী আয়ার স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত।

আইরিশ জীবনের বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে ডি ভ্যালেরা গোড়া থেকেই ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ, জনগণের নাড়ীনক্ষত্র তিনি চিনিতেন। তিনি এমন কতকগুলি রীতি ও আদর্শ প্রবর্ত্তন করিলেন যাহা এই ক্রমবর্দ্ধমান গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর সরাসরি ক্রিয়াশীল হইল। এদিকে গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তকগণ কিন্তু ধীরে ধীরে আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িতেছিলেন। 'ভাইস-রিগ্যাল লজ'কে পোষণ করিবার জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় হইত তাহা ডি ভ্যালেরা জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। স্বার্থান্বেষীদের নিকট হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয় তাহার ফলে আইরিশ জনগণ গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এমনি অবস্থায় ডি ভ্যালেরার সংস্কারমূলক রাজনৈতিক কার্য্যাবলী এবং তাঁহার আবেদন জনসাধারণের মনে অপূর্ব্ব সাড়া জাগাইতে সক্ষম হয়। একদিকে তিনি যেমন আয়ার্লণ্ডকে ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নবজাগ্রত আইরিশ গণতন্ত্রকে আত্মসচেতন করিয়াও তুলিয়াছিলেন।



শানন নদীতীরস্থ আর্ড্রনাক্রুশায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আয়ার্লণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য শুল্কপ্রাচীর খাড়া করিয়া তাহার আওতায় অনেকগুলি ছোটখাটো শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলো পুরনো—আর কতকগুলি একেবারে আনকোরা।

ক্ষুর ব্লেড হইতে আরম্ভ করিয়া ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব, বিটের চিনি, মটর টায়ার ও টিউব, ফেল্ট হ্যাট, তার, প্রাচীর মুড়িবার কাগজ (wall-paper)। সিল্কের মোজা, অন্তর্বাস (underwear) ঘরের ছাদ নির্ম্মাণের টালি, অঙ্গরাগ, রান্নার বাসন-কোসন, এলুমিনিয়াম এবং অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত পাত্র, ইলেকট্রিক ব্যাটারি, টিনজাত খাদ্য ইত্যাদি কত রকমারি জিনিষ যে এই সময় হইতে আয়ার্লণ্ডে প্রস্তুত হইতে লাগিল তাহার আর অন্ত নাই। পূর্ব্বে এই সকল জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইত।

আয়ার্লণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষিই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৯৩৬ সনের সরকারী হিসাব মতে আয়ার্লণ্ডের জনসংখ্যার মধ্যে হাজারকরা ৪৮০জন কৃষিজীবী। বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা হাজারকরা ১৪৬, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানাদিতে কর্ম্মীর সংখ্যা হাজারকরা ৭০, যানবাহনের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ৫১, বিভিন্ন পেশা অবলম্বনকারীদের (অধিকাংশেরই পেশা ‘ধর্ম্ম’) সংখ্যা সবচেয়ে কম—হাজারকরা ৪৬ মাত্র।

আইরিশ জীবনের যে-কোনো দিক সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে সকল সময়েই একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আয়র্লণ্ডে জনমনের ওপর সব চেয়ে বেশী প্রভাব ক্যাথলিক চার্চ্চের। সমাজের উপর আইরিশ চার্চ্চের প্রভাব ব্যাপক ও উহা প্রচুর রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। আয়ার্লণ্ডে ভ্রমণ করিতে গিয়া যিনি রবিবার ভিন্ন সপ্তাহের যে-কোন দিন সকালবেলা ডাবলিনের সিটি চার্চ্চগুলিতে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মব্যস্ত জনতার ভিড় অবলোকন করেন নাই, পথিপার্শ্বস্থ ছোট ছোট ক্রুশগুলি এবং ওকনেল ষ্ট্রীটের মাঝখানে দণ্ডায়মান গির্জ্জাটি যে ভ্রমণকারীর নজর এড়াইয়া গিয়াছে তিনি বলিতে গেলে আয়র্লণ্ডের কিছুই দেখেন নাই। অথবা প্রত্যেক লেণ্টের (রোমান ক্যাথলিকদের চল্লিশ দিন ব্যাপী উপবাস) সময় সংবাদপত্রগুলিতে পুরা দুই বা তিন পৃষ্ঠাব্যাপী লেণ্ট-সংক্রান্ত যে কবিতাদি প্রকাশিত হয় সেগুলিও যাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ডের আসল চেহারার সহিত তিনি অপরিচিতই রহিয়া গেলেন।

একথা মানিতেই হইবে যে, নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাম্প্রতিক আয়ার্লণ্ডের জনগণের জীবিকানির্ব্বাহের পথকে সুগম করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে মানুষের মত খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে সে ব্যবস্থা সেখানকার স্বাধীন রাষ্ট্র করিয়াছে এবং করিতেছে। ইহা নূতন নূতন চাকুরি ও পেশার সৃষ্টি করিয়াছে এবং স্বাধীন ব্যবসায়ের নূতন নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে। দীনদরিদ্রের পক্ষেও রুটির সংস্থান করা অনেকটা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিলাস-ব্যসন, সামাজিকতা ইত্যাদির পরিবর্ত্তে অন্নবস্ত্রের সংস্থান এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মিটানোই এখন আয়ার্লণ্ডের সমাজ-জীবনে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে, কাজেই আগেকার তুলনায় এখনকার লোকেরা অনেকটা অসামাজিক হইয়া উঠিতেছে। অর্থকে সমাজের সকল স্তরে যতই ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা যায়, ততই যে শ্রেণীর লোকেরা টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া আসে। ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফল কি দাঁড়ায় বর্ত্তমান রাশিয়ার দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা কিন্তু এমন একটি ব্যবস্থা যাহা পল্লী অঞ্চলের পুরনো খানদানী পরিবারের লোকদের খুশী করিতে পারে নাই। তাহারা এই প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিরপেক্ষভাবে দেখিতে গেলে আয়ার্লণ্ডের পল্লীবাসীদেরই অধিকতর সৌভাগ্যবান বলিতে হয়। তাহাদের জীবন বাস্তবিকই আনন্দময়। যাবতীয় খেলাধুলার প্রতি সেখানকার ছেলেবুড়া সকলেরই অনুরাগ আছে, যে-কোন অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা পল্লীবাসীদের আছে, আর সেখানকার কৃষিজীবীদের ভদ্রতার ত তুলনাই নাই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেমন খুশি অদলবদল হইতে পারে, কিন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে, আয়ার্লণ্ডের

সনাতন জীবনধারা আগামী বহুকাল সেই পুরণো খাতেই বহিয়া চলিবে। শিকারীদল চিরকালই শিকারের সন্ধানে পথেপ্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর তাহাদিগের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করিবার জন্য সকল সময়ই কোন না কোন সম্পত্তিপন্ন পরিবারের গৃহদ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, এরো ক্লাবে বার্ষিক বলনাচও যথারীতি নিয়মিতভাবেই চলিতে



ডাবলিনের একটি হাসপাতাল

থাকিবে। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ কুফলও কিন্তু দেখা যাইতেছে। ইহার ফলে পল্লীর বহু লোক নাগরিক জীবনের অনুরাগী হইয়া শহরে চলিয়া আসিতেছে। আশঙ্কা হয় যে, পরিণামে পল্লীগুলির অবনতি হইয়া শহরগুলিই ধনে-জনে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, ইতিমধ্যেই তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে। বিগত সেন্সাসে ইহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, আয়ার্লণ্ডে এমন একটিও শহর নাই যেখানকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। পল্লী অঞ্চলের লোকদের শহরে গিয়া বসতিস্থাপন ইহার জন্য অংশতঃ দায়ী।

বর্তমান আয়ার্লণ্ডের শহরগুলির এই সমৃদ্ধি পল্লীর পক্ষে বাস্তবিকই বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। কারখানা-সমূহকে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralization) পূর্ব্বক পল্লীর সম্পদবৃদ্ধির যে মূল জাতীয় পরিকল্পনা ছিল ইহাদ্বারা তাহা বানচাল হইতে চলিয়াছে। ইহার দরুন পল্লীজীবনের সংহতিও বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। এমনি ভাবে পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য যদি লোপ পাইয়া যায়, তাহা হইলে পরিণামে আইরিশ জাতীয়তার ভিত্তিমূলেই ভাঙন ধরিবে। এই বিষয় লইয়া আয়ার্লণ্ডের সমস্ত জাতীয়তবাদী নেতারা এক উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গিয়াছেন। 'কঃ পন্থা' ইহাই হইল তাঁহাদের সমস্যা। উন্নত ধরণের জীবন যাপন করিতে হইলে এবং পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য্য। কিন্তু দেখা যায় যে দেশ আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করে সেই দেশই বহির্জগতের নিকট নিজের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। দুনিয়ার চিন্তাধারা, রীতিনীতি, বিলাস-সামগ্রী ধীরে ধীরে তার জাতীয় জীবনে আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। সিনেমা, রেডিয়ো, সাম্প্রতিক সাহিত্য, সব কিছুরই আমদানী হয়। সাম্প্রতিক আয়ার্লণ্ডেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এবং এ ধরণের পরানুকরণ-প্রবৃত্তি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া চলার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াই-তেছে। ফলে জীবনযাত্রাপ্রণালীরই আমূল পরিবর্ত্তন হই-তেছে। অতি সামান্য কারণেই তাহারা দেশ ছাড়িয়া স্থানান্তরে বসবাস করিতে চলিয়া যাইতেছে। নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে ব্যাপারটি আরও সুপরিস্ফুট হইবে। বিগত সেন্সাসের প্রাথমিক রিপোর্ট হইতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইংলণ্ডের বার্ষিক বহিরাগতদের মধ্যে ১৮,০০০ জন হইতেছে আইরিশ যুবক। ইহারা সকলেই যে জীবিকার জন্য সেখানে যায় তাহা নহে; ইহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য একটু নূতনত্বের আস্বাদলাভ। আয়ার্লণ্ডে পরিচারিকা-সমস্যা দিন-দিন অধিকতর জটিল হইয়া উঠিতেছে। উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিচারিকার অভাবই নাকি অধিকাংশ যুবকের দেশ ছাড়িবার মূল কারণ।

আয়ার্লণ্ডবাসীদের জাতীয়তা-বিরোধী এই মনোভাবকে কি ভাবে দূর করা যায় সেজন্য চার্চ্চের কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয়তাবাদী নেতাগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। কিছু কিছু কাজ সুরু হইয়াও গিয়াছে। বৈদেশিক দ্রব্যাদি আমদানীর বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধের বিশেষ কড়াকড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী সেন্সরসিপ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা আয়ার্লণ্ডে এমন শত শত পুস্তক আমদানীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছেন যেগুলি একদম ওঁচা এবং যাহা পঠিত না হইলে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—চলচ্চিত্রসমূহও 'সেন্সরড' (সরকারীভাবে পরীক্ষিত) হইয়া তবে আয়ার্লণ্ডে আসিতেছে এবং ইহাতে সুফললাভই হইতেছে।

অন্যদিকে লোক-শিল্পের উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। দেশের যে সকল অংশে বিশেষ কর্ম্মঠ লোকেরা বাস করে, ছোট ছোট কারখানাগুলি যাহাতে সেই সকল অঞ্চলে স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে সে বিষয়েও জোর চেষ্টা চলিতেছে। গেলিক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার জন্য বিপুল অর্থব্যয় করা হইতেছে। স্কুল ছাড়িবার বয়স নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে ষোল। প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর আরও পড়াশুনা চালাইবার মত অবস্থা যাহাদের আছে, বৃত্তিশিক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের জন্যই। সম্প্রতি একটি জাতীয় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিদেশের বাজে মডেল-সমূহের ব্যর্থ অনুকরণের দ্বারা যাহাতে জাতীয় শিল্প বিকৃত না হয় সেইজন্য শীঘ্রই পরিকল্পনা-বিশারদ অধ্যাপকদের নিযুক্ত করা হইবে। সারা পৃথিবীতে দুটিরে যে কয়টি



স্লিগো অঞ্চলের শস্যক্ষেত্র



গলওয়ের 'ডায়মণ্ড মাউন্টেন'— এখানে আইরিশগণ ক্রমওয়েলের নিকট পরাজিত হয়



'কর্ক' নগরে মোটর-কারের একটি ফ্যাক্টরী—এখানে কারখানায় প্রস্তুত মোটর-কারসমূহ জড় করিয়া রাখা হয়



আয়ার্লণ্ডের একটি বীট-চিনির কারখানা

জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ষ্টেটের অর্থসাহায্যে পুষ্ট হইতেছে আয়ার্লণ্ডের 'এবে থিয়েটার' তাহাদের অন্যতম এবং একটি গেলিক থিয়েটারও এ ধরণের সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে। একটি বিশেষ সরকারী পুস্তক-প্রকাশ-বিভাগ গেলিক ভাষায় লিখিত অজস্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সকল এবং অন্যবিধ নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আইরিশ চিন্তানায়কগণ "ইংলীকরণে"র (Anglicization) স্রোতকে প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

কিন্তু উপরোক্ত সমস্যাসমূহ অপেক্ষাও যেটির ভাবী গুরুত্ব সমধিক তাহা হইতেছে উত্তরাঞ্চলের সমস্যা। ছয়টি বিভিন্ন অঞ্চল লইয়া আয়ার্লণ্ডের যে অংশটি উত্তর আয়ার্লণ্ড নামে পরিচিত তাহা দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডের 'আলসার'-স্বরূপ। সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে আয়ার্লণ্ড বিভাগের ফলে আলষ্টার সমস্যার উদ্ভব হয়। তখন দক্ষিণ অঞ্চলের ২৬টি কাউন্টি লইয়া আইরিশ ফ্রি ষ্টেট গঠিত হয় আর বাকী ছয়টি অঞ্চল লইয়া সৃষ্ট হয় ক্ষুদ্র আলষ্টার ষ্টেট। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে নানা জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুইটি অঞ্চলের ঐক্যবোধ আজ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। উত্তর আয়ার্লণ্ডে এখনও আগেকার মত প্রতিনিধিত্বমূলক ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তির ফলে আয়ার্লণ্ডের বাত্রিশটি কাউন্টি হইতে পরবশ্যতার যে সমস্ত নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে এখানে কিন্তু সেগুলিই বিশেষভাবে নজরে পড়ে। যেমন---রাজকীয় আইরিশ রক্ষীদল। ইহা সাধারণতঃ 'রয়েল আলষ্টার কনষ্টেবুলারী' বলিয়া অভিহিত হয়, যদিও আলষ্টারের নয়টি কাউন্টির মধ্যে মাত্র ছয়টির শাসন-ব্যবস্থা উত্তর অঞ্চলের পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক পতাকাও এখানে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণে ইহা যুদ্ধবিরতি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাত্র উড্ডীন হয়—তাহাও আবার কালেভদ্রে দু'একবার। আয়ার্লণ্ড আজ সেই ছয়টি কাউন্টিকে ফিরিয়া পাইতে চায় এবং একন্য যে-কোন মূল্য দিতে সে পরাঙ্মুখ নহে। আয়ার্লণ্ডে যে-সমস্ত ছোটখাটো রাজনৈতিক দল আছে তন্মধ্যে আই. আর. এ (দি আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি) একটি প্রধান। আসলে কিন্তু ইহা একটি বে-আইনী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইহা গুপ্ত ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। প্রয়োজন হইলে গৃহযুদ্ধ চালাইয়াও বিভক্ত অঞ্চল দুটিকে পুনর্ম্মিলিত করা ইহাদের লক্ষ্য। ষ্টরমণ্টস্থ নর্দার্ণ পার্লামেণ্টের কার্য্য যাহাতে ফেডারেল পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয় তাহাই স্বাধীন আয়ারের কাম্য। এই কল্পনা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তাহা হইলে বাহিরের সকল রকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে ইহার নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইবে। এবং যে সমস্ত সভ্য এখন ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টারে ছয়টি 'কাউন্টি ডিভিসনে'র প্রতিনিধিত্ব করেন ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ডাবলিনে যাইতে হইবে।

এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভবিষ্যতে বিভক্ত আয়ার্লণ্ড যদি পুনর্ম্মিলিত হয় তবে উহার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের উপর উত্তর অঞ্চল গভীর প্রভাব বিস্তার করিবে। কি ভাবে করিবে তাহা এখন খুঁটিনাটির সহিত বলা সম্ভবপর নহে, তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান শুল্ক-প্রাচীর উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায়ের দিক দিয়া যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে তখন তাহা অপসারিত হইবে। ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকগুলি নূতন ফ্যাক্টরী নিজেদের একচেটিয়া অধিকার হারাইবে এবং দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত, উত্তর অঞ্চলের ফ্যাক্টরীগুলির সহিত ইহাদিগের প্রতিযোগিতা সুরু হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণের মিলনের জন্য, দক্ষিণ আয়ার্লণ্ডকে তাহার উৎকট আদর্শবাদ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং কেবলমাত্র নিজস্ব সাংস্কৃতিক গণ্ডীর মধ্যে গুটাইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কতকটা বর্জ্জন করিতে হইবে। শিল্পপ্রধান উত্তর অঞ্চল বই ফিল্ম ইত্যাদি সেন্সর করা অথবা রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের রক্ষণশীলতা সমর্থন করে না।

অনেকেই বলেন যে, স্বাধীন আয়ার্লণ্ড বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের বিরুদ্ধে চলিয়া মান্ধাতার আমলের আদর্শগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বড়ই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। যাঁহাকে বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ডের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি বলা যাইতে পারে সেই আইরিশ কবি এ, ই (জর্জ রাসেল) এই উৎকট জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ডি ভেলেরা অবশ্য প্রগতিমূলক আদর্শ এবং চিরাগত সংস্কার এই দুইটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা, জাতীয় আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি বজায় রাখিবার জন্য তিনি আয়ার্লণ্ডের অধিবাসীদিগকে স্বদেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। ওদিকে আবার তাঁহার ফ্যাক্টরীগুলির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে, জনগণের নিকট শহরের আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে—আয়ার্লণ্ডের জাতীয় জীবনে লাগিতেছে আধুনিকতার ছোঁয়াচ। আয়ার্লণ্ডে সনাতন আদর্শ ও আধুনিকতার এই যে সংযোগ ও সংঘাত এর পরিণতি কি এ প্রশ্ন আজ সকলের মনেই জাগিতেছে।

স্বাধীন আয়ার্লণ্ডের জাতীয় জীবনকে নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন যিনি সেই রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা আজ অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। কতকগুলি প্রাচীন আদর্শ বাস্তবিকই আয়ার্লণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অন্যবিধ প্রগতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে চার্চ্চ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে তাহা একেবারে সেকেলে। চার্চ্চ-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কোন শিল্পবিদ্যা (crafts) শেখানো হয় না। এই সমস্ত স্কুলের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের অধিকার সরকারের নাই। উত্তর-

প্রাথমিক বৃত্তিশিক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলিতে (Post Primary Vocational Schools) আবার ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার বালাই নাই। এইগুলিই একমাত্র আইরিশ বিদ্যালয় যাহাতে পাদ্রীদের কর্তৃত্ব নাই। তা ছাড়া আর যাবতীয় বিদ্যালয়ই পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত।

উপরে বর্ত্তমান আয়ার্লণ্ডের জাতীয় জীবনের কতকগুলি ত্রুটি দেখানো হইল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একথা ভুলিলে চলিবে না যে, তাহার ভবিষ্যৎ গৌরবময়; কেন না ভুলত্রুটি সংশোধনের এখনও তাঁহার যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। আয়ার (১৯৩৭ হইতে এই নামে পরিচিত) স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পর সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে পরাধীন জাতিসমূহ নবীন প্রেরণা লাভ করিতেছে।

ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলাদেশের সঙ্গে আয়ার্লণ্ডের আত্মিক যোগ গভীর। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মূলে মুখ্যতঃ রহিয়াছে আইরিশ কবি ইয়েট্সের ঐকান্তিক চেষ্টা। ইংরেজী গীতাঞ্জলিতে তাঁহার ভূমিকা এই দুই জাতির সাংস্কৃতিক মিলনের নিদর্শনস্বরূপ কালজয়ী হইয়া থাকিবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও বর্ত্তমান আয়র্লণ্ডের কর্ণধার ডি-ভ্যালেরার সৌহৃদ্যের কথা এই উভয় দেশেরই অধিবাসীরা চিরকাল কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। ভারতবর্ষ ও আয়ার্লণ্ড, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজালে বিজড়িত এই দুইটি দেশের মধ্যে যাহাতে গভীর সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় তাহাই ছিল নেতাজীর একান্ত ইচ্ছা, আর ডি ভেলেরার ভারতপ্রীতির কথা তো সর্ব্বজনবিদিত।

বিদায়-আরতি

(বৃটিশের ভারত-ত্যাগ উপলক্ষে)

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

বহু দোষ আছে— আছে বহু পাপ—সরল তোমরা নও,
অহঙ্কারীও বট— বড় বড় দম্ভের কথা কও।
তবু তোমাদের জাতির নিকটে সকল জাতির হার,
শত ত্রুটি থাক, তবুও তোমরা ধরার অলঙ্কার।
ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যেতেছ—পথ গৌরবময়,
বিশ্বের ইতিহাসে রেখে গেলে সব সেরা পরিচয়।

২

ধুয়ে ক্লাইভের সব কলঙ্ক—হেষ্টিংসের পাপ,
সিংহ তোমার হ'ল এত দিনে মনুষ্যত্ব লাভ।
তোমার জাতিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দিলে দান,
বিজয় কিরীট যা আজ পরালে—কখন হবে না ম্লান।
দাস-ব্যবসায় উঠায়ে করিলে যে পুণ্য সঞ্চয়,
এর তুলনায় তাহাও তুচ্ছ—জয় জয় তব জয়।

৩

এই যে বিশাল প্রাচীন ভারত নর-দেবতার ভূমি—
স্বাধীন করিয়া মহা পুণ্যের ভাগী যে হইলে তুমি।
কালে মুছে যাবে হয় ত তোমার রাজ্য শৌর্য্য সব,
অটুট তবুও চিরদিন রবে—এ কীর্ত্তি গৌরব।
করী এ জীবনে অক্ষয় কিছু করিল তোমার জাতি,
আনিল যশের আলো-পরিবেশে অমরত্বের ভাতি।

৪

এই ধরণীর সব চঞ্চল, নহেক কিছুই স্থায়ী,
আজিকে উঠিলে অমৃতের সরে আনন্দে অবগাহি।
সকল হীনতা—যুগের যুগের সব গ্লানি হ'ল দূর,
স্থাপিলে তোমরা চির স্মরণের দাবি যে সুপ্রচুর।
বজ্র লইয়া এসেছিলে তাতে কেবলি ছিল যে জ্বালা,
বিদায় ভিক্ষু অতিথি আজিকে করে মন্দার মালা।

৫

ভাসের মতন ছিল এ ভারত করি প্রত্যার্পণ—
জানাইয়া দিলে তোমরা বট যে সত্যই মহাজন।
হয়ে বিতাড়িত লাঞ্ছিত হৃত অনেক জেতাই যায়,
কুলার বাতাসে তুষের ধোঁয়ায়—গৌরব নাহি তায়।
তোমরা যেতেছ জয়োল্লাসেই করিয়া সমর্পণ—
যোগ্য হস্তে বৃহৎ ভারত—ভাগ্য অসাধারণ।

৬

তোমরা যেতেছ ঘন গৌরবে, উজ্জ্বল মহিমায়,
মাঘ মাস যথা মধু বসন্তে আহ্বানি চ'লে যায়।
তোমরা যেতেছ বিনীত বেশেতে ভকতি ও অনুরাগে,
সমাপ্ত করি দেউল যেমন শিল্পী বিদায় মাগে।
শঙ্খ, ঘণ্টা, হুলু ধ্বনিতে পূর্ণ তোমার পথ—
গঙ্গারে পথ দেখাইয়া দিয়া চলে যায় ভগীরথ।

রবীন্দ্রসংলাপকণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

স্বর্গীয় রামানন্দবাবুর ইচ্ছায় এই নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছোট-ছোট কথা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করিয়াছিলাম, সে আজ অনেক দিন হইল। রামানন্দবাবুর তিরোধানের পর আর তাহা বাহির হয় নি। দেখিতেছি, ইহার মধ্যে অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা মনে আছে তাহাই তাড়াতাড়ি লিখিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিব।

"আমিই কেনে কলম কিনি!"

একবার ইউরোপের কোন এক শক্তি নিজের শত্রুর প্রতি অতি নির্মম ভাবে বোমা ফেলে। ইংরেজ প্রভুরা ইহার অত্যন্ত নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে দেখা গেল সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজেরা প্রচুর বোমা ফেলিয়া বিষম ক্ষতি সাধন করিয়া ফেলিয়াছেন। এক দিন বৈকালে গুরুদেবের সঙ্গে এই বিষয়েই কথা হইতেছিল। কাছে আর কে ছিলেন মনে নাই, তবে আমার বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেন ঠিক ছিলেন। কথা হইতেছিল, সকলেই এইরূপ অপকার্য করেন, নামটা রটে বিশেষ কোন ব্যক্তির। ক্ষিতিমোহন বলিয়া উঠিলেন

"সর্বপক্ষী মৎস্যভক্ষী মৎস্যরঙ্গা কলঙ্কিনী"

অর্থাৎ সব পাখীই মাছ খায়, মাছ খাওয়ার কলঙ্কটা হয় কেবল মাছরঙার। এর মূলে একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে। সেটি এই—

"সরট-কুরর-কঙ্কাঃ কাক-কাদম্ব-হংসা
অহি-নকুল-মনুষ্যাঃ কে ন খাদন্তি মৎস্যান্।
অহমতিতনুজীবী ক্ষীণমৎস্যোপভোজী
জগতি বিদিতমেতন্মৎস্যরঙ্কঃ কলঙ্কী।"

অর্থাৎ কৃকলাস, কুরর পক্ষী, কাঁক, কাক, বালিহাঁস, রাজহাঁস, সাপ, নেউল, মানুষ, কে না মাছ খায়? আমি অতি ক্ষুদ্রজীবী এবং অতি ক্ষীণ মৎস্য ভোজন করিয়া থাকি, কিন্তু মাছরঙা মাছ খায়, এই কলঙ্কটাই প্রসিদ্ধ।

ক্ষিতিমোহন বলিয়াছিলেন "মৎস্যরঙ্গা কলঙ্কিনী" গুরুদেব শেষের "কলঙ্কিনী" শব্দটা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন "রসুন, রসুন, একটা সমস্যা পূরণ করি। তিনি বলিলেন

"সবাই কলম ধার করে নেয়,
আমিই কেনে কলম কিনি!"

নেপালবাবুর দণ্ড

একটা ঘরে অধ্যাপকেরা অনেকেই আছেন। গুরুদেবের আসিবার সময় হইয়াছে, সকলেই তাঁহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই বেশ প্রফুল্ল। কিন্তু গুরুদেব ঘরে ঢুকিয়াই সহসা এমন এক গম্ভীর ভাব দেখাইলেন যাহাতে সকলেরই মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যে, আজ কি যেন একটা কিছু হইয়াছে। কেহ কিছু সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। গুরুদেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন—

'নেপাল বাবু, আপনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করিয়াছেন, অত্যন্ত গর্হিত। আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে!'

অধ্যাপকেরা আরো চিন্তিত, শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। একটি কথা বলিবার সাহস কাহারো নাই। কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। ওদিকে গুরুদেব নেপাল বাবুকে বারবার ভর্ৎসনা করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবার কথা বলিতে লাগিলেন। অধ্যাপকেরা যখন এইরূপ উদ্বেগ, আশঙ্কা ও ভয়ের চরম সীমায় গিয়া উঠিয়াছেন, তখন গুরুদেব পাশের ঘর হইতে একখানি লাঠি বাহির করিয়া নেপাল বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন, 'নেপাল বাবু, কাল আপনি সন্ধ্যার সময় ভুলিয়া এই লাঠিখানি এখানে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, এই নিন, আপনার লাঠি নিন।'

বলাই বাহুল্য, এই কথায় সকলেই আশ্বস্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এখনো হিংসা গেল না!

এক দিন আমরা কেহ-কেহ গুরুদেবের সঙ্গে সন্ধ্যার পরে পুরাতন কলাভবনে বসিয়া আছি। শান্তিনিকেতনের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এখন পুরাতন কলাভবন চিনেন না। ইহা হইতেছে এখনকার কলেজের ছাত্রদের হোস্টেল। ইহার নীচের তালায় কিছু দিন এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেব ছিলেন। এই কলাভবনে বসিয়া আছি এমন সময়ে গুরুদেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—

'শাস্ত্রী মহাশয়, আপনি এত দিন বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, কিন্তু এখনো আপনার হিংসা প্রবৃত্তি গেল না!'

আমি তো অবাক্। হঠাৎ তিনি এ কথা বলিতেছেন কেন? কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি আমার দাড়ি-গোঁফ দেখাইয়া বলিলেন 'এদের ছাড়িয়া দিন, বাড়িতে দিন। আর হিংসা করিবেন না!'

আমার দাড়ি-গোঁফ সব সময় কামানই থাকে। আমিও তাঁহার মত লম্বা-লম্বা দাড়ি-গোঁফ রাখি ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন।

সরস্বতীর শাপ

হর্ষচরিতে আছে, দুর্বাসা মুনি কোন সময়ে সরস্বতীকে শাপ দিয়াছিলেন। একবার শান্তিনিকেতনে আমাকেও এই কাজ করিতে হইয়াছিল।

তখন বিণ্টারনিটৎস সাহেব এক বৎসরের জন্য অভ্যাগত অধ্যাপক-রূপে নিমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার ফিরিয়া যাইবার সময় হইলে বিদায়সভায় সংস্কৃত অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষসের এক অঙ্ক ও শকুন্তলার এক অঙ্ক অভিনয় করা হইয়াছিল। বালকেরা মেয়েদের পাঠ করিবে, সেই সময়ে কেহ কেহ ইহা পছন্দ করেন নাই। গুরুদেবের এই মতই ছিল। তাই স্বভাবতই অনেকেই ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি অভিনয় বর্জন করা হয় নি। যথারীতি ইহা হইয়াছিল। চিত্রকলার দিক্ দিয়া যতটা যা সম্ভব নন্দলালবাবু তাহাতে সাহায্য করিয়াছিলেন। মোটের উপর অভিনয়টা এমন কিছু হয় নি যাহাতে তাহাকে "অখাদ্য" বলিতে পারা যায়। কিন্তু গুরুদেবের নিকটে অভিনয়ের বিরুদ্ধ বিবরণই পৌঁছিল। তিনি নিজে অভিনয় দেখিতেই আসেন নি। পরের মুখে যা শুনিলেন তাই বিশ্বাস করিলেন। আমি ইহাতে দুঃখিত হইয়াছিলাম। রাগও হইয়াছিল কম নয়। আমি উত্তরায়ণে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া খানিকটা গায়ের জ্বালা ঝাড়িয়া বলিলাম—'গুরুদেব আপনি আপনার নন্দী-ভৃঙ্গীদের মুখে যা শুনিলেন তাই বিশ্বাস করিলেন। ভাল, সংস্কৃতের উপর যদি আপনার এইরূপই শ্রদ্ধা থাকে, তবে এই আশ্রমে সংস্কৃতবিদ্যার উপরে আমার এই শাপ থাকিল যে কখনো ইহাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না!'

অচিরেই আমি শান্ত হইয়া গেলাম, কিন্তু আশ্রমে আমার পরবর্তী অনেক সংস্কৃত শিক্ষক বলেন, সেখানে এই শাপোদ্ধারটি হয় নি। দুর্বাসার শাপদানে সরস্বতীর অপরাধ ছিল, কিন্তু আমার শাপদানে সংস্কৃত সরস্বতীর কোন অপরাধ ছিল না। আমি নিরপরাধের দণ্ড বিধান করিয়া ভাল কাজ করি নি।

গুরুদেব এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। পর্বটি আপনা আপনিই শেষ হইয়া গেল।

বাক্‌সিদ্ধি

৩১শে আশ্বিন ৩৪৪। গুরুদেব বরাহনগরে কামারহাটির পথে বালি ব্রেলের পুলের নীচেই "গুপ্তনিবাস" নামে এক বাগানবাড়ীতে আছেন। তাঁহার শরীর খুব ক্লান্ত ও দুর্বল অল্প কিছুদিন হইল সাংঘাতিক ব্যারাম (বিসর্প) হইতে উঠিয়াছেন। লম্বা চুল কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। দাড়িও দুই পাশে উপরে কাটিতে হইয়াছে। ইহাতে ঐ সময়ে তাঁহাকে অনেকটা মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের মত দেখিতে লাগিত।

সেদিন অনেক কথা হইল। হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, শরীর যখন চলে না তখন অন্যের উপর ভর করিয়া থাকা আর ঠিক নহে। তিনি বলিলেন, ঐ গুরুতর ব্যারামের মধ্যে তিনি কোন কষ্ট অনুভব করেন নি। ঐ সময়ে তাঁহার এলোপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছিল। এই ডাক্তারদের অগ্রণী ছিলেন নীলরতন বাবু। এই সময়ে তিনি নিজেই বাইওকেমিক ওষুধ খাইতে চাহিয়াছিলেন, যদি নীলরতন বাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণের অমত না হয়। ডাক্তারেরা ইহাতে মত দিয়াছিলেন, কেননা তাঁহাদের মতে ওটা একটা ওষুধই নয়। গুরুদেব বলিলেন, ফলটা যে বাইওকেমিক ওষুধেরই হইয়াছিল ইহা বলা চলে না। ডাক্তাররা যথেষ্ট দেখিয়া-শুনিয়া চিকিৎসা করিয়াছিলেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় সে সময়ে তাঁহার ব্যারাম সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হইয়াছিল, গুরুদেব বলিয়াছিলেন, ইহার প্রতিবেদক (reporter) বন্ধুত্ব বা পরিচয়ের সুবিধা লইয়া ডাক্তারদের পরামর্শের স্থানে প্রবেশ করিয়া কাজটা ভাল করেন নি।

গুরুদেবের বাইওকেমিকে খুব শ্রদ্ধা ছিল। হোমিওপ্যাথির ন্যায় তিনি ইহাতেও নিজে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহার কাছে সর্বদাই বাইওকেমিক ওষুধ প্রচুর পরিমাণে থাকিত নিজেরই কথায় তিনি ছিলেন আমার "ফ্যামিলী ফিজিশিয়ান।" তিনি আমাকে প্রয়োজনের সময় এই ওষুধই দিতেন এবং আমার ধাতু প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া ক্যাল্‌ফস নামে ওষুধটিকে বরাবর ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, আর নিজেও এইরূপ করিতেন। আমি বহু দিন ইহা অনুসরণ করিয়াছিলাম, এবং ফলও পাইয়াছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে পারি। আমার শরীরটা কিছু দিন বড় দুর্বল হইয়াছিল। বেড়াইতে বাহির হইলে একটু গিয়াই বসিয়া পড়িতাম। গুরুদেব ইহা জানিয়া প্রতিদিন নিয়ম মত 'সেনাটোজেন' সেবন করিতে ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু আমার আলস্যে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। একদিন দেখি বিকালে আমার পড়ার ঘরে অর্থাৎ তখনকার প্রাচীন একতালা পুস্তকালয়ের পশ্চিম দিকের কুঠরীতে, আমার কাছে বসিয়া ঐ 'সেনাটোজেন' খাইবার কথা তুলিলেন। আমি যখন বলিলাম যে, তখনো আমি তাহা করি নি, তখন তিনি নিজেই একটি চাকরকে দিয়া দোকান হইতে এক শিশি 'সেনাটোজেন' আনাইয়া নিজেই শিশিটার আবরণ খুলিয়া কেমন করিয়া এবং কতটা খাইতে হইবে আমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি ইহাতে কিছুদিনের মধ্যে যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিলাম। গুরুদেব নিজেও ইহা প্রচুর সেবন করিতেন।

সেই "গুপ্তনিবাসে" আমাদের কথা হইতেছে। গুরুদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সকলে তাঁহাকে এখন হইতে কথাবার্তায় খুব সংযত হইতে বলেন, কেননা তিনি এখন যা বলেন তাই ফলিয়া যায়। প্রথম দৃষ্টান্ত

তাঁহার এই স্বাভাবিক বিসর্প। যেদিন রাত্রে শান্তিনিকেতনে ইহার প্রথম সূচনা হয় তাহারই একটু আগে সন্ধ্যার সময় সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে বলিতেছিলেন, তাঁহার তো তেমন রোগ-ব্যারাম হয়ই না। এমন রোগ-ব্যারাম হয় যে, সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য সকলে চারিদিকে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, লোক-জন ডাকাডাকি করিতেছে, ডাক্তার কবিরাজে বাড়ী-ঘর ভরিয়া গিয়াছে, তাঁহারা মাথার কাছে বসিয়া আছেন, অনেকেই রাত জাগিয়া কাটাইতেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে তো বুঝা যায়, হাঁ ব্যারাম, নতুবা কিছুই নয়। ইহা সঙ্গে সঙ্গেই ফলিয়া যায়।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। এই কিছুদিন আগে একটা খুবই বড় ঝড় হইয়া গিয়াছে। শান্তিনিকেতনের অনেক গাছ-পালা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার দিন দুই আগে গুরুদেব বলিতেছিলেন, এখন আর আগেকার মত ঝড় হয় না। সে সব ঝড় গেল কোথায়? মনে আছে, কলিকাতায় ভীষণ ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ছিলাম তেতালায়। ভয়ে দোতালায় নামিলাম। মায়ের ঘরের একখানা কপাট খুলিয়া পড়িল। চারিদিকে ভীষণ কাণ্ড। সেই সব ছিল ঝড়। এখন আর তেমন হয় না। এই কথার দুই দিন পরে তুমুল ঝড় হইয়া গেল।'

তৃতীয় দৃষ্টান্ত। গুরুদেব সেদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরাহনগরে বাগানবাড়ীর বাসায় ছিলেন। তিনি নিজের স্বাভাবিক কৌতুক ভাবে প্রশান্তবাবু প্রভৃতির সহিত গল্প করিতেছিলেন যে, আজকাল আর ডাকাতি হয় না, যদি হয় ত বেশ মজা করিয়া দেখা যায়। ঠিক ঐ দিনই রাত্রে ঐ বাসাতেই ডাকাতি হইয়াছিল। গুরুদেবের পাশেরই ঘরে প্রশান্ত বাবু ছিলেন। তাঁহাকে বেশ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। গুরুদেব ইহা বর্ণনা করিলেন ডাকাত প্রশান্ত বাবুর কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিয়া উদ্ধার পাইতে হইয়াছিল।

ভালবেসেছিনু

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

আদিগঙ্গার বুকে জোয়ারের কর্দমাক্ত জলধারা যেন প্রাণ পেয়েছে, মাঝিরা খড় বোঝাই নৌকাগুলো বেয়ে চলেছে নালার মাঝ দিয়ে—ভোর হতে আর দেরি নাই।

স্বাতীর চোখে ঘুম আসে না, যতীন নাইট-ডিউটিতে বেরিয়েছে। পুলিসের চাকরি—দিন নাই, রাত নাই। বড় খোকনের ঘরে আলো জলছে, বোধ হয় পড়তে উঠেছে। পরীক্ষার আর দেরি নাই। সবকিছু নিয়ে আজ তার সংসার, ফুলে ফলে ছেয়ে গেছে। কিন্তু ঋণী সে রয়ে গেল সর্ব্বত্যাগী নীলকণ্ঠের শিষ্যগোষ্ঠীর কাছে যারা যুগ যুগ ধরে কেবল দুঃখ-দুর্য্যোগই সয়ে এল, জীবনের জয়যাত্রার গান যারা শুনিয়ে এল—যার রেশ বিলীন হ'ল না ফাঁসির মঞ্চেও। তাদেরই একজন চাপিয়ে গেল তার উপর সারা জীবনে ঋণের বোঝা।

* * *

সে আজ অনেকদিন আগের কথা। স্বাতীর এ জীবন ছিল তখন স্বপ্ন। ক্লেদপঙ্কিল জীবনযাত্রার মাঝে এসেছিল সে। প্রথম যেদিন চোখ মেলল মানুষের জগতে, নিজের চারিদিকে—স্তম্ভিতই হয়ে উঠল। শিউরে উঠল মনে মনে। প্রথম জীবনেই তার পৃথিবী কালো হয়ে দেখা দিল তার কিশোর চোখের সামনে, সারা মনটা ছেয়ে উঠেছিল ঘৃণায়—লজ্জায়। চোখের সামনে দেখত দিদিরা কেমন করে ধাপে ধাপে জীবনের সর্ব্বনিম্নস্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ক্রমশঃ এইটুকুই তার মনে দৃঢ়মূল হয়ে উঠল, জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে ওপথে পা বাড়ানোর চেয়ে জীবনের যবনিকা টানাই সহজ এবং সরল পন্থা।

এমনি দিনে প্রাইভেট টিউটর রূপে দেখা দিল পার্থ। দীর্ঘ ঋজু দেহ, খদ্দরের পাঞ্জাবীর অন্তরালে পেশীবহুল দেহটা যেন বার হয়ে আসতে চায়। উস্কখুস্ক চেহারার মাঝে চোখ দুটো কি একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে দীপ্তিময়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্বাতী, নমস্কার করতে ভুলে যায়।

পার্থও চেয়ে থাকে নতুন ছাত্রীর দিকে। টাকার দরকার, না হলে কলকাতায় থাকা চলবে না, পড়া ত দূরের কথা। বাড়ী থেকে তার কোন সাহায্যই আসবে না। বৃদ্ধ পিতা ছিলেন—কোন রকমে চলত তাঁর পেন্সনের টাকায়, তিনিও আর নাই। একা পার্থ আজ অকূল পাথারে। ভালই হয়েছে, কাঁদবারও কেউ নাই, দেখবারও কেউ নাই।

ভদ্রতার মুখোসটা ঠিকমত লাগিয়ে রাখা সত্ত্বেও যেদিন আবিষ্কার করে বসে পার্থ এই পরিবারের প্রকৃত স্বরূপ—সারা মন বিষিয়ে ওঠে ঘৃণায়।

প্রকাশ পেয়ে যেতে আজ স্বাতী যেন প্রকৃত একজন দরদীকে খুঁজে পায়। এত দিনের সঞ্চিত ব্যর্থ অশ্রু আজ বাঁধনহারা হয়ে ঝরে পড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। এ পথে সে যাবে না—এ পথে যাবার আগে যেন জীবনের শেষ দিনই ঘনিয়ে আসে এই তার সবচেয়ে বড় কামনা।

পার্থের সারা মন যেন সাড়া দিয়ে ওঠে। চুপ করে শোনে স্বাতীর জীবনের ইতিহাস—এত দিন যাকে দেখেছে—চিনেছে আজ সন্ধ্যায় যেন তাকে আরও নিবিড় করে চেনে, আপন করে নেয়।

শুধু জীবনের একটুখানি আশ্রয়, কিন্তু তার বদলে চিরদিনের জন্য দিতে যাবে জীবনের সাধনার দীপ্তি, বৃহত্তর জীবনের প্রয়াস। কোথায় যাবে তার জীবনের ব্রত কিন্তু—না, না এ হয় না। তার কঠিন কঠোর জীবনের পথে অন্য কেউ সঙ্গী হতে পারবে না। তাকে চলতে হবে একা।…

সারাটা দিন মেসের জীর্ণ ঘরখানায় পার্থ কাটিয়েছে, শত চিন্তার মাঝে বার বার মনে পড়ে স্বাতীর করুণ চাহনি-পূর্ণ মুখখানা, জীবন সে উৎসর্গ করেছে দেশের অগণিত জনগণের কল্যাণে, আজ একজন একান্তভাবে তারই সাহায্য কামনা করে—কিন্তু…আর ভাবতে পারে না। মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় দুর্ব্বার আকর্ষণে মাণিকতলার দিকে রওনা হয়। সমিতির জরুরী বৈঠক আছে। নীচতলার অন্ধকার ঘরখানা প্রায় ভরে গেছে। সকলেই নীরবে শুনে যায় পার্থের কথা। টাকার তাদের দরকার। ঝুলে পড়া কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো কাঁচভাঙা লণ্ঠনের আলোয় ঘরখানি লালাভ হয়ে ওঠে। সমিতির বর্দ্ধা-শাখার কথাটা পার্থ শুনিয়ে যায়।

রাত্রি কত হয়েছে জানে না। একে একে সকলেই চলে যায়। ক্রমশঃ ঘরটা খালি হয়ে আসে। জরুরী বৈঠকেও কোন সমাধান হয় না। পার্থের সারা মন ভরে রয়েছে কোন দুশ্চিন্তার ছায়া, আজ যেন নিজেকেই সে খুঁজে পায় না।

কতক্ষণ বসেছিল জানে না, হঠাৎ ইলাদির ডাকে চমকে উঠে। সমিতির বৈঠক হবার একমাত্র স্থান ইলাদির এই এঁদো বাড়ীর নিচের তলার ঘরখানা। তার সন্ধানী চোখে পার্থের এ পরিবর্তন এড়ায় না। যে পার্থ বৈঠকে নিজেই সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে থাকত, আজ তাকে এভাবে নির্লিপ্ত দেখে ইলাদি বেশ একটু আশ্চর্য্যই হয়েছিলেন।

সে রাত্রে যখন পার্থ রাস্তায় পা বাড়াল—রাত্রি তখন প্রায় বারটা, রাস্তা নির্জ্জন হয়ে গেছে, জনমানব নাই। একটা কথা বার বার মনে আসে। ইলাদিকে আজ স্বাতীর কথা বলে খানিকটা যেন স্বস্তি পেয়েছে।

এমনি রাত্রির নিথর নীরবতা স্বাতীর সারা মনে ঝড় বইয়ে দেয়। বড়দির রুদ্রমূর্ত্তি—মায়ের নীরব সমর্থন তার সারা মনকে বিদ্রোহী করে তোলে। সন্ধ্যা থেকেই আজ সে যেন বিশেষ কিছুর আয়োজনই দেখে এসেছে।

দৃঢ় কণ্ঠে সে প্রতিবাদ জানায়। কঠিন সুরে জানিয়ে দেয় জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে ওপথে সে পা বাড়াবে না। হঠাৎ দরজার কড়াটা অনবরত নড়তে লাগল। নীচে গিয়ে দরজাটা খুলেই অবাক হয়ে যায়!—"মাষ্টার মশাই!"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ে। উপরের ঘরে তখন চলেছে উন্মত্ত কোলাহল, আজকের মত বিপদ স্বাতীর জীবনে আসেনি।

পার্থ অস্পষ্ট আলোতে স্বাতীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে; চোখ ছাপিয়ে তার জলধারা। প্রাণপণে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করেও পারে না স্বাতী। পার্থ অবাক হয়ে শোনে আজকের কাহিনী। মুহূর্ত্ত মধ্যেই কি যেন ভেবেই শক্ত হয়ে ওঠে। হাঁ সে পারবে। যেমন করে হোক তাকে পারতেই হবে। স্বাতী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে। একি সত্য! সামনে তার দুটো পথ খোলা। ভালভাবে বাঁচবে, পরিত্রাণ পাবে এই নরককুণ্ড হতে। মানুষের জগতে মানুষের পরিচয়ে বাঁচবে। দু'হাত দিয়ে ফিরে পাবে প্রকৃতির হারানো সম্পদ—বাইরের জগতের মুক্ত আলো-বাতাস। আজ পার্থের এ ডাকে সাড়া সে দেবেই।

রাত্রি হয়ে গেছে অনেক। ভাড়াটে ফিটনখানা মাণিকতলার এঁদো গলির বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই ইলাদি শশব্যস্তে নেমে আসেন। দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে যান। পার্থ এগিয়ে আসে, পিছু পিছু স্বাতী।

—'তোমার কাছেই নিয়ে এলাম ইলাদি, একটু ঠাই একে দিও!'

স্বাতী ইলাদির দিকে চেয়ে থাকে। হাত ধরে তাকে অভ্যর্থনা জানান ইলাদি—"এসো ভাই!"

কয়েকটা দিন কেটে গেল স্বাতীর মনের এলোমেলো অবস্থায়। ধাতস্থ হয়ে যে দিন এ বাড়ীর প্রতিটি অলিসন্ধিকে যতই দেখতে লাগল ততই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। চুণ-বালি-খসা এঁদো স্যাঁতসেঁতে ঘরখানায় অজানা অচেনা লোক সব আসে যায়। চাপা স্বরে কি আলোচনা করে, পার্থ সর্ব্বদাই যেন ব্যস্ত। ভালভাবে একদিন কথা বলবার সময়ও পায়নি স্বাতী। আজ আবার কয়েকদিন তার দেখাই নাই। ইলাদিকে জিজ্ঞাসা করতেও পারে না—কি রকম যেন মনে হয়।

সে দিন রাত্রে নীচেকার ঘরে উত্তেজিত কণ্ঠে কি সব আলোচনা শুনে থমকে দাঁড়ায় স্বাতী, এ বাড়ীর সকলেই যেন কি একটা জরুরি কাজের কথা নিয়েই আলোচনা করে। মাঝে মাঝে দু' একটা অস্ত্র-শস্ত্রও দেখেছে কারুর কারুর সঙ্গে—, কিছুই ভেবে উঠতে পারে না, ইলাদিকে জিজ্ঞাসা করলে হেসেই উড়িয়ে দেন।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বাতী, হঠাৎ কার গলা-খাঁকারির শব্দে নীচের দিকে চাইল, পাতলা সেই ছোকরা যতীন নাকি তার নাম। ইতিমধ্যে বারকয়েকই সে এমনি করে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু স্বাতী সরেই এসেছে তার কাছ থেকে।

সকলেই চলে গেছে, ঘরের বাতিটা তখনও জ্বলছে। দুর্ব্বার আকর্ষণে সে নীচেকার ঘরটার দিকে পা বাড়ায়। মনে

ভয়-সংশয়-সন্দেহের দোলা। থমকে দাঁড়ায়। কতকগুলো টুল ভাঙা চেয়ার ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলটার চারদিকে। বাতিটা উপর থেকে ঝোলানো, ওদিকে দেয়াল জুড়ে একটা ছবি, ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় সেই দিকে। ভারতমাতার হাস্যময়ী মূর্ত্তি—নীচে লাল অক্ষরে কি যেন লেখা রয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় স্বাতী, নিজের অজ্ঞাতেই যেন সারা দেহে-মনে কাঁটা দিয়ে উঠে। এক বিচিত্র অনুভূতি। আজ এদের সবাইকে সে নতুন করে দেখে। ইলাদি মাষ্টার মশায়—এঁরা দেশমাতৃকার ভক্ত সন্তান।

অজানা আনন্দে মনটা তার ভরে ওঠে। আজ হিসাব করে দেখে, পিছনের জীবন ফেলে এসে সে কি যেন অপূর্ব্ব সম্পদের সন্ধান পেয়েছে, মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে ওঠে। কতদিন মাষ্টার মশায়ের দেখা নাই।—কোথায় আছেন, কি ভাবে আছেন কে জানে। তার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানা কেন জানি না বার বার মনে পড়ে। দু'হাত তুলে সে প্রণাম জানায়—তুমিই আমায় পথ দেখিয়েছ, আলোর নিশানা দিয়েছ।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ দরজা ঠেলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উঠে বসে স্বাতী। দরজা খুলতেই এগিয়ে আসে পার্থ। একি। বাঁ হাতটা রক্তে ভিজে গেছে। জামার এখানে ওখানে রক্ত। বুলেটের আঘাতই হবে। তাড়াতাড়ি করে শাড়ীর খুঁটটা খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে স্বাতী। ঈষৎ হেসে পার্থ বলে, "ও কিছু নয়। এখন প্রচুর রক্তের প্রয়োজন—তবে যদি পথ পরিষ্কার হয় স্বাতী। থাক—ও বাঁধতে হবে না। রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।"

—"না এমনি খোলাই থাক্ কি বলেন।" স্বাতী ক্ষিপ্রহস্তে বাঁধতে থাকে। হঠাৎ পার্থের কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। তাকে চলে যেতে হচ্ছে আজই, এখুনিই। আপাততঃ যাবে বর্ম্মায়—পরে কোথায় জানে না।

'আজই।' স্বাতীর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। "এতদিন পর এলেন, চেহারাখানাও অর্দ্ধেক করে এনেছেন—"

এসব পার্থ হয়ত শুনেছে অনেক, কিংবা শুনল এই প্রথম। কিন্তু তাকে যেতে হবে। পথের দেবতা তাকে ডাক দিয়েছে অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে—পথের সীমানা তার ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। অশ্রুসজল নয়নে চেয়ে থাকে স্বাতী। ইলাদির চোখে আজ জল। রাত্রিশেষে জাহাজ ছাড়বে—সময় তো তার নাই।

"আসি ইলাদি—বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে।"

মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেল পার্থের শেষ চিহ্ন। স্বাতী আজ আবার একা—প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টা করে নিজেকে, পারে না। দু'দিনের পরিচয়—তবু ভোলা তাকে যায় না। সারা মন যেন উজাড় করে দিয়েছে ওই সর্ব্বত্যাগী পথচারীকে।

কত নৈশ উপাধান সিক্ত হবে, কত প্রিয়া—কত জননীর অশ্রুজল বিনিদ্র রজনীর অন্ধকারে গুমরে ফিরবে—তবু ওরা ফিরবে না। এগিয়ে যেতে হবে ওদের। সাধনার পথে স্বপ্ন নাই, আছে শুধু রূঢ় বাস্তব—ঘৃণা আর লাঞ্ছনা—অসহ দুঃখ আর কষ্ট। দেশকে ভালবাসার যদি কিছু পুরস্কার থাকে—তবে এইটুকুই শুধু আছে।

ভোর হতে না হতেই পাড়ার চারদিকে একটা কোলাহল পড়ে যায় বাড়ীটাকে কেন্দ্র করে। অগণিত পুলিশবাহিনী বাড়ীটাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। শিউরে উঠে স্বাতী। ইলাদি স্থির গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বাড়ীর প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে চলেছে। কি সব কাগজ-পত্র, আরও কত কি নিয়ে টানাটানি সুরু করে। সমিতির আসল কাগজপত্র কিন্তু পায় না। কয়েকজনকে দেখে স্বাতী—সমিতির সেই গলাখাঁকারি দেওয়া যুবকটিও রয়েছে পুলিশের সঙ্গে।

পুলিশ অফিসারের সামনে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়: পার্থ কোথায় আছে, কবে গেছে—এই সব নানা প্রশ্ন। স্বাতী নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথাই বার হয় না তার মুখ থেকে। বলবে না—কিছুতেই বলবে না সে।

সারা বাড়ীটায় একটা থমথমে নীরবতা, স্বাতীর সারা মনে আজ হাহাকারের সুর। কোথায় তারা সব কেউ জানে না। তাদের সমিতির কথা সমস্তই পুলিশের গোচরে এসে গেছে। তাদের গোপন কার্য্যকলাপ গতিবিধি প্রতিটি তথ্য পুলিশের নখদর্পণে। আজ বাংলার ছাত্র যুবক দলে দলে চলেছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সারা ভারতের মর্ম্মে আজ লেগেছে কিসের অজানা শিহরণ। দূরের, বহুদূরের যাত্রী পার্থের উদ্দেশ্যে যুক্তকরে নমস্কার জানায়, স্বাতী।

যতীনের আসা যাওয়া যেন বেড়ে গেছে; স্বাতী অবাক হয়ে যায় তার কথায়। পার্থের প্রায় সমস্ত খবরই সে জানে। সেদিন যতীন তার ব্যাগের মধ্যে পার্থের একখানা ফটোও দেখালে। পুলিশের হাতে পড়লে পার্থের আর অজ্ঞাতবাস চলবে না। যেখানে থাকুক, যেভাবে থাকুক তাকে আসতেই হবে বন্দী হয়ে, দিন গুনবে কারাপ্রাচীরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে—মহামূল্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তের হবে শোচনীয় অপচয়।

স্বাতীকে পাবার জন্যে যতীনের ব্যাকুলতার আর অন্ত নেই। সে তার কাছে বার বার বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করে। শেষ পর্য্যন্ত স্বাতী মত দেয়। পার্থকে বাঁচাবার জন্যে যে-কোনো ত্যাগস্বীকারেও সে কুণ্ঠিত নয়। যে তার জীবনে এনে দিল বৃহত্তর মহত্তর পথের সন্ধান তার জন্য এটুকু সে করবেই। যতীনও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে স্বাতীর দিকে, এত সহজে যে স্বাতী মত দেবে তা সে ভাবতেই পারে নি।

পার্থের দিন কাটে নব নব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে। বর্ম্মার

উত্তরে সুদূর লাশিও থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী নির্জন তুংলা ত্যালির গ্রামের বস্তিতে দূরপ্রসারিত পর্ব্বতসীমা। পারে পারে নেমে গেছে নোয়্যাসস্ ল্যাণ্ডের সীমারেখা, পথটা একেবেঁকে চলেছে দিগন্তসীমা পার হয়ে সুদূর মহাচীনের দিকে। গণজাগরণের সুপ্রভাতে পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি যারা সেদিন শুনিয়েছিল আজও তারা আছে। ওই পর্ব্বতসানুর কোল ঘেঁষে প্রতিটি নগরে জনপদে, পথে প্রান্তরে, এ যুদ্ধের শেষ নাই।

খচ্চরের পিঠে আসে পশম-রেশম নীল-গজদন্ত মৃগনাভি—আরও কত কি। তাদেরই সঙ্গে আসে অগণিত জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের রসদপত্র।…

সন্ধ্যা নেমে আসে তুংলা ত্যালির পর্ব্বতশীর্ষে। ভারতের সীমারেখা পারে মহাচীনের সীমান্তশীর্ষে ঝরে পড়ে অস্ত-সূর্য্যের শেষ লালিমা। হোয়াংহো বীরইন নদীর জলে পড়ে তার ছায়া।

পার্থ ভাবে ঠিক এমনি করেই হয়তো সন্ধ্যা নামে তার গ্রামের বুকে, ক্ষীণস্রোতা নদীর দু'পাশের শ্যামল ইক্ষুবনশীর্ষে, ধানের ক্ষেতে। মহাকালের প্রহরীর মত দণ্ডায়মান পর্ব্বতশীর্ষ থেকে পার্থ আজ অস্তারতি দেখে। শিহরণ জাগে প্রতিটি শিরা উপশিরায়, বহুদূরে মহাচীনের গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে আজ তার মনে জাগে এক বিচিত্র অনুভূতি। যে সুদূর বাংলার মাটির বুকে সে জন্মেছে, যার স্নেহক্রোড়ে সে লালিত পালিত হয়েছে সে দেশ তারই মাতৃভূমি। রক্তকণিকার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিজড়িত মৃত্তিকায় তার জন্মগত অধিকার।

আজ বার বার কলকাতার কথা ভাবতে ভাল লাগে, আর একজনের কথা—মনের মণিকোঠায় যার ছবি কোন দিনই মুছবে না। সেদিন কলকাতা থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিল ইলা দত্ত। স্বাতী নাকি যতীনকে বিয়ে করছে। যতীনের কথা মনে করতে ঘৃণা হয়। সমিতির সব খবর ওই দিয়েছিল পুলিশকে, রাজসাক্ষী হয়ে বেঁচে গেল—ভাল চাকরীও নাকি পেয়েছে। কে জানে, পুলিশের কর্তাদের নেকনজরে পড়েছে—হয়ত অফিসারই হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে যায় পার্থ, যতীন তার সব খবরই জানত—যার কটা অবধি হাত করেছিল, সেগুলো পুলিশের হাতে পড়লে এতদিনে অগ্নিমন্ত্রের উপাসক পার্থসারথিকে শান্ ষ্টেটের সীমান্তে বসে এয়্যানিসম যাপন করতে হত না। সুখে থাক তারা—সুখে থাক্ সবাই। পথের মৃত্তিকাতিলক পরিয়ে তাকে ডাক দিয়েছে যে পথের দেবতা তারই বাঁশীর সুর সব ভুলিয়ে দেয়। জানে না কতদিন—কতদিন পর সাধনা তার সফল হবে, মাথা উঁচু করে আবার দেশের মৃত্তিকায় পা দেবে বিজয়ী বীরের মত সগৌরবে।

নীচে বাঁশবনে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, শোনা যায় হায়নার অট্টহাসি—খস্ খস্ শব্দ। কে জানে হয়ত সদরই ছুটে পালাচ্ছে প্রাণভয়ে।

দরজার কাছে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসতেই সচকিত হয়ে ওঠে। আজ ত কোন মালপত্র আসবার কথা নয়, সবে সপ্তাহখানেক আগে একটা চালান পাঠিয়েছে বর্ম্মার দিকে।…সতর্ক হয়ে বেরিয়ে আসে—থমকে দাঁড়ায় সামনেই অনুচর 'সাং পো'কে দেখে।

খবরটা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না। রেঙ্গুনে রাজপথে হাহাকানি হয়ে গেছে। চারদিকে পুলিশের সন্ধানী সতর্ক দৃষ্টি। তারা অনুমান করেছে, চীন সীমান্ত হতে হয়ত কোনরকম সাহায্য আসছে। আজই শান্ ষ্টেটসের হেড কোয়ার্টার থেকে পুলিশ আসছে, বোধ হয় আসতে আর দেরি হয় নাই।

যাত্রা কর যাত্রীদল। হ্যাভারসেকটা তৈরিই থাকে সব সময়, রওনা হতে দুমিনিটও লাগে না। সদর রাস্তা ছেড়ে বনপথে মুয়ান গাঙের পাশ দিয়ে রেল লাইন পার হয়ে ভামোর পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। দেরী করা চলে না। সেই রাত্রেই শ্বাপদসঙ্কুল বনপথে বেরিয়ে পড়ল। এ জীবন জীবন নয়—মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি করে যে কটা দিন কাটানো যায়।

আকাশের তারা ওঠে শিউরে, মাটির বুকে জাগে শিহরণ, কানাকানি সারা আকাশ-বাতাসে। পথ চলেছে পার্থ। পথের আর শেষ নাই। বিনিদ্র রজনীর সঙ্কল্প পথের প্রান্তে হাতছানি দেয় সর্বহারাকে। কটা দিনই বাঁশকোড়ার কাঁচা শাস—আর ভুরিয়ানের কাঁচা কোয়া চিবিয়েই কেটেছে। পলাতক চোরের মত যেদিন বনপথের বাইরে এল চেনা যায় না তাকে, পা-টা ছিঁড়ে গেছে। কাপড়-খানাও ছিঁড়ে গেছে, সারা গায়ে ভুরিয়ানের আঁসটে গন্ধ। রাস্তার মাঝে হঠাৎ একখানা মোটর থামতে দেখেই চমকে ওঠে পার্থ—কারা যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে। শশব্যস্তে বনের দিকে ছুটে যাবে হঠাৎ একটা শব্দে বনভূমি সচকিত হয়ে ওঠে। পায়ে অসহ্য যন্ত্রণা। ক্লান্ত শরীর যেন ভারিয়ে আসে—চোখের সামনে একটা কালো যবনিকা, কেমন যেন ঘুমে ছেয়ে আসে চোখের পাতা।

ক'টা দিন কি ভাবে কেটে যায় জানে না পার্থ।…হাস-পাতালের ক্লোরোফরমের গন্ধ, নার্সের জুতোর শব্দ—ডাক্তারের সতর্কবাণী সব কিছু মিলে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল তা ভাঙতে দেরী হ'ল না পুলিশের জেরায়। এতদিন পর পার্থসারথির এরেষ্ট, শুধু বর্ম্মায় নয়, সুদূর বাঙলা মুলুকেও বেশ আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। ইরাবতী নেভিগেশন কোম্পানীর ছোট ষ্টিমারে আরাকানের দিকে পাড়ি জমাল পার্থ সম্মানিত রাজ-অতিথি রূপে।

রেঙ্গুন নদীর দু'পাশে উঁচু পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে থানকল—করাত-কলের চিমনীগুলো বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নেতা পার্থসারথির দিকে চেয়ে থাকে। ষ্টিমারসুদ্ধ লোকের দৃষ্টি নিবদ্ধ কেবলমাত্র একটি লোকের উপরই।

বাংলাদেশের মাটিতে আজ পা দিলে পার্থ, আগেকার মত সোনালী রোদ কি আজ আর ইডেন গার্ডেনের শ্যামল তরুশ্রেণীর মাথায় শরম বিছায় না। আউটরাম ঘাটের কাছে গঙ্গার বুকে গাং চিলের দলও কি ছোঁ মারতে ভুলে গেছে। যে চোখ দিয়ে আগে পার্থ দেখেছিল সেদিনের কলকাতাকে—সে চোখ আর নাই। আজ তার চলার পথে বাজে শিকলের ঝন্‌ঝনা, চারদিকে তার সশস্ত্র প্রহরী। কোথায় বা নর্দার্ন শান্‌ ষ্টেটসের দিগন্তবিস্তৃত মোয়্যানস্‌ ল্যাণ্ডের বুকে মিডল ট্রাকের অভিযান—কোথায় বা চিন্দুইন-ইরাবতীর বুকে পাহাড়ের খাড়ির নীচু দিয়ে জাপানে যাত্রা—কল্পনা-আশা-আলো সব মিশে গেছে। আইনের চক্ষে আজ সে বন্দী—অপরাধী।

'প্রিজন ভ্যান'টা হাজরা রোড বয়ে আলিপুর ব্রিজ পার হয়ে বিশাল জেল-গেটের সামনে এসে থামল, পার্থসারথির জয়-যাত্রার পথে ছেদ পড়ল।

... ...

দেখতে দেখতে কেটে গেল দীর্ঘ পনের বছর। পার্থের মনে দাগ কেটে বসেছে বন্দীজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। অতীত স্মৃতির রোমন্থন চলে। মনে পড়ে দেউলির মরু-প্রান্তরের বুকে বালুবড়, ওয়াধনের পাশ দিয়ে আরাবল্লী পর্ব্বতসীমা ছুঁয়ে চলে গেছে বি-বি এণ্ড সি-আই রেলের ক্ষীণতম যোগসূত্র। দ্বিতীয় বনভূমির মাঝে বন্দী-নিবাস। দৃষ্টি মেলে দাও দূর দিগন্তে—কালো আকাশ-ছোঁয়া জলরাশি যেন কেঁপে দুলে উঠেছে। কান পাত—বাতাসে শুনবে কার করুণ ক্রন্দন।...কে যেন দিনরাত্রি গুমরে কাঁদছে। বক্ত তরাইয়ের সীমান্তে ভারতের শেষ সীমারেখায় বনভূমি পার হয়ে বক্সারের নির্জ্জন বন্দীনিবাস। কত এল—কত গেল। এই বন্দীজীবনের মাঝে সে হারিয়ে ফেলেনি নিজেকে। তার অপরাধ সে মানুষকে ভালবেসেছিল। ভালবেসেছিল মাটির পৃথিবীকে—ধূলিধূসর ধরণীর শ্যামলিমা আর তার বুকে দিনরাত্রির আলোছায়ার মায়াজালকে—এই তার অপরাধ।

মুক্তিলাভ করতে মন চায় না: কি হবে বাইরে গিয়ে। স্তিমিত দীপশিখা মুক্ত বাতাসের মাঝে নির্ব্বাপিতই হবে। আজকের রাজনৈতিক আন্দোলনে বিক্ষুব্ধ ভারতে তাদের প্রয়োজন নাই। রক্ত দিয়ে পথ তৈরি করে দিয়েছে তারা, কিন্তু আজ আর তাদের প্রয়োজন নাই। দেশ অন্য পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের রক্তঢালা সাধনার বেদীমূলে আজ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। তারা আজ ঝরাপাতার দলে—বৃক্ষতল শুধু ভরিয়েই রাখে, নবকিশলয় আবার সাজিয়ে তোলে শাখারন্ধ্র।

রাত্রি যেমন দিয়ে জেলের বাইরে আসতেই সচকিত হয়ে যায় সামনে একজনকে দেখে। এ কি।—স্বাতী এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নেয়। সঙ্গে তাঁর ছেলে। সেও প্রণাম করে।

'আসুন'—গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলল তাকে। এতদিনের সঞ্চিত কথা যেন মুখর হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে যায় স্বাতীর চোখে জল দেখে। স্বাতীর সংসার দেখে তৃপ্তি অনুভব করে পার্থ। তবু তার চোখে জল কেন?

"জীবনে সাধনার পথে কি পেলাম জানি না—তবে তোমার সংসার দেখে আজ আনন্দ পেলাম স্বাতী।"

কথা কয় না স্বাতী। নীরবে বসে থাকে পার্থকে খেতে দিয়ে। গোগ্রাসে গিলে চলেছে সে। বহুদিন এমন খাদ্য জোটেনি।

যতীন। সেই যতীন আজ সত্যিই পার্থের সামনে আসতে পারে না। বাইরে বাইরেই কাটায়।

কোথায় যাবে জানে না পার্থ। সমস্ত দেশে চলছে নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন সম্পর্কিত নানা জল্পনাকল্পনা। এতদিনের পরিশ্রম—এতদিনের সাধনা আজ সফল হতে চলেছে। জাতীয় সরকারের কর্তৃত্ব লাভ। এরই জন্য ব্যয়িত হয়েছে কত ভারতীয়ের রক্তবিন্দু—রচিত হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালের করুণ ইতিহাস। হয়েছে কত গণ-আন্দোলন, রাজপথে কত রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। কত মায়ের কত প্রেয়সীর বিনিদ্র রজনীর অশ্রুধারা ঝরে পড়েছে। সবকিছুর বিনিময়ে এরা ধন্য হোক—! এরা সফল হোক। কেউ না চিনুক—কেউ না জানুক তাদের, দুশ্চর তপস্যার ঋত্বিকদের, শুধু জনগণ সুখী হোক, সাধনার বেদীমূল যোড়শোপচারে ভরে উঠুক।

স্বাতী অবাক হয়ে যায়—'যাবেন কোথায়?'

মলিন ভাবে হাসে পার্থ—'পথে।'

স্বাতী বোঝে তাকে ধরে রাখা যাবে না, সে যাবেই। তবু চোখের জল বাধা মানে না। হঠাৎ রাস্তায় কাদের কোলাহল শোনা যায়, নানা ধ্বনিতে ভরে ওঠে চতুর্দ্দিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে, রাস্তায় দেখা যায় লোকের চাঞ্চল্য। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল নিমেষের মধ্যে। গাড়ীগুলোও কমে আসে। দূর দিগন্তে দেখা যায় আগুনের শিখা; রাঙা হয়ে গেছে আকাশের কোল। কাদের আর্তনাদ ভেসে আসে আকাশে-বাতাসে।

ক্যালেণ্ডারের পাতায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে ১৬ই আগষ্ট—৪৬ সাল।

রক্তরাঙা আগষ্ট—এমনি এক আগষ্টে বর্ষার বুকে তাকে বন্দী করা হয়েছিল, এমনি এক আগষ্টের দিনে সারা ভারতের বুকে জেগেছিল বাঁধন-ছেঁড়ার প্রয়াস। রক্তে রাঙা হয়েছিল কলকাতার রাজপথ। এইত সেদিন। পার্থ তখনও জেলে। চিরস্মরণীয় সেই আগষ্ট। কিন্তু আজ। সেই স্মরণীয় আগষ্টেরই দিন আজ কলঙ্কের কালো ছায়ায়

খাঁধার হয়ে গেল। কেন এই রক্তপাত, কিসের জন্ত এই তাণ্ডবলীলা।

এত দিনের সাধনা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। রক্তের বিনিময়ে, এত দিনের কারাবাসের দুঃসহ কষ্ট দিয়ে অর্জ্জন করা মহার্ঘ মাণিক আজ তারা হারাতে বসেছে। ওরা কি শুনবে না আজ দেশমাতৃকার আহ্বান। আজ তাই আবার ডাক পড়েছে অহিংসার উপাসকদের—যারা জীবন দিয়ে শুনিয়ে এসেছে জাগরণের বাণী। সময় নাই, সারা দেশ ডাকে ডাকে। অনুভব করে পার্থ হারানো দিনের সেই উন্মাদনা—তেমনি এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য।

পার্থ ক্ষিপ্রপদে রাস্তায় নেমে পড়ে, স্বাতীও নেমে যায়। আজ সব লজ্জা-সম্ভ্রম ভুলে যায় সে। সামনে দাঁড়ায় পথ-রোধ করে।

আজ তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না—।

হাসে পার্থ সেই মলিন মধুর হাসি; 'ছিঃ। ছেলেমানুষি করো না স্বাতী।' হাতটা সরিয়ে দিয়ে পথে নেমে পড়ল। স্বাতীর দু'চোখে নামে অশ্রুর বন্যা।

পার্থ চলেছে পথে…সামনে কারা চলেছে বিজয়োল্লাসে; ওদিকের বস্তিতে আগুনের লেলিহান শিখা, কাদের আর্ত্তনাদে ওরা হাসছে, বিজয়োল্লাসে খল খল করে হাসছে। পার্থের বুকটা কেমন করে ওঠে। যেটুকু এগিয়ে এসেছিল দেশ এতদিনের সাধনায় সেই আগতপ্রায় নবযুগকে তারা যেন অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মারছে। এ যেন তার নিজেরই মৃত্যু।

না।—না। ওদের থামাতে হবে। বোঝাতে হবে কত বড় সর্ব্বনাশ ওরা করতে চলেছে।

এগিয়ে চলে পার্থ।…

সহসা পিছন দিক থেকে কাদের চীৎকার শুনে ফিরে চাইবার চেষ্টা করে—পারে না। মাথায় একটা আঘাত পেয়েই বসে পড়ে পার্থ। হাতটা রক্তে রাঙা হয়ে যায় দেখতে দেখতে। ওঠবার ক্ষমতা নাই। চোখের সামনে কেমন যেন জমাট অন্ধকার—ভেসে ওঠে কাদের পৈশাচিক হাসির ক্রমবিলীয়মান শব্দ।

রাস্তার কঠিন পাথরটা রাঙা হয়ে যায়। অদূরে শোনা যায় কাদের অট্টহাসির শব্দ, সামনে আগুনের লালাভ শিখা সারা আকাশ গ্রাস করে চলেছে।

দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে মাটি আঁকড়ে ধরে পার্থ। কঠিন মৃত্তিকা যেখানে সে জন্মেছে, পরিপুষ্ট হয়েছে যেখানে—মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করে সেই হিমশীতল ধরণীর আলিঙ্গন। এ ধ্বংসলীলার অবসান হোক্। সুখে থাকুক ওরা সবাই—যুগ যুগ ধরে ভোগ করুক তাদেরই শেষ রক্ত কণিকায় অর্জ্জিত জীবনের মহা সম্পদ। পার্থসারথির শেষ চিহ্ন শুধু পড়ে থাক এই পথেরই প্রান্তে। পায়ে পায়ে উঠুক চলার ছন্দ—এগিয়ে যাবার গান।

সভ্যতার আদর্শ ও শিক্ষার রূপ

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

আমাদের জীবদ্দশায় পর পর দুইটি মহাসমর সংঘটিত হইয়াছে। এই ধ্বংসলীলার দুঃখ ভূপৃষ্ঠের সকল দেশের অধিবাসীকেই কমবেশী ভোগ করিতে হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবান্বিত দেশসমূহ এই ধ্বংসলীলার কেন্দ্র। মানুষ মানুষকে হিংসা করিবে, ইহা কখনও মানব-সভ্যতার আদর্শ হইতে পারে না। প্রেম ও প্রীতির ভিত্তিতে পূর্ণতর মানবসমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে শিক্ষার রূপ দিতে হইবে। পূর্ণতর মানবসমাজগঠনের পরিপন্থী কারণসমূহ শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূর করিতে হইবে।

সভ্যতার ঊষাকালে প্রকৃতিই মানুষের খাদ্য যোগাইত। কর্ষণ করিয়া শস্য-উৎপাদন সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে মানুষ যেমন আবিষ্কার করিয়াছে, তেমনি কৃষিকার্য্য করিতে গিয়াই কৃষিযন্ত্রাদির উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। দেহাচ্ছাদনের প্রয়োজনে মানুষ চর্ম্ম, বল্কল ও অবশেষে কার্পাস-তন্তু দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। শস্য ও মাংসাদিকে খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য অগ্নি ও পাত্রের ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। আশ্রয়স্থল গড়িতে গিয়া গৃহাদিনির্ম্মাণ-কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য কৃষি ও গৃহপালিত পশুসম্বন্ধে জ্ঞান, দেহাবরণের জন্য বস্ত্রশিল্পবিদ্যা, আশ্রয়স্থল তৈরির জন্য স্থাপত্যবিজ্ঞান, দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা মানুষ সুদূর অতীতকাল হইতে করিয়া আসিতেছে। সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য উপরোক্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে অন্ততঃপক্ষে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা যেমন সকলেরই প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক জীবরূপে পরস্পরের সুখদুঃখে সহানুভূতিশীল হইতে গেলে অনুরূপ ভাবে সমাজবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞানও মূলনীতি শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া প্রয়োজন।

খাইয়া-পরিয়া স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় মানুষ বহুবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছে। এক একটি করিয়া বিভিন্ন বস্তুর পরিচয়লাভ ও বস্তুকে নিজের প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য যন্ত্রপাতির ক্রমোৎকর্ষ সাধন দ্বারাই মানুষ সভ্যতার ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে আগাইয়া চলিয়াছে।

আদিম মানুষ কঠিন পদার্থসমূহের মধ্যে একমাত্র পাথরকেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া জানিত; তখন পাথরদ্বারাই গৃহাদি ও যন্ত্রপাতি তৈরি হইত। সেই যুগকে আমরা প্রস্তর-যুগ বলি। এই ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়ায় মানুষ তাম্র, লৌহ প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া ইহাদের ব্যবহার-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমানে মানুষ যন্ত্র-যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই যন্ত্রযুগের সঙ্গে পূর্ব্ববর্তী যুগের তফাৎ, এই যে পূর্ব্বে মানুষ হস্তনির্ম্মিত যন্ত্রাদিদ্বারা হাতের সাহায্যেই নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করিত, সৌন্দর্য্য-স্পৃহাকেও চরিতার্থ করিত; আর যন্ত্রযুগে মানুষ কুটিরশিল্পের হাতিয়ারকে কলে পরিণত করিয়া তাহাদ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরি করিয়া লইতেছে। কলের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বর্তমান মানব-সমাজের উপর কতখানি চাপিয়া বসিয়াছে তাহা আজ শিক্ষানীতিবিদদের তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। কুটিরশিল্পের যন্ত্র-চালনা দ্বারা নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা এবং যন্ত্রকে কলে পরিণত করিয়া বহুজনের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থার অনুকূলে ও প্রতিকূলে যে সকল যুক্তি আছে তৎসমুদয়ই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যন্ত্র (tools) যেমন মানুষের সৃষ্টি, কলও (machine) তেমনি মানুষের সৃষ্টি, কিন্তু উভয়ের মূল উদ্দেশ্য কি এক? যন্ত্রসৃষ্টির মূলে আছে সহজতর উপায়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মিটানো ও শিল্পদ্রব্যাদির উৎকর্ষ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা আর কলসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বস্তু-বিশেষের উৎপাদনের হার বাড়ানো। এই বস্তু-বিশেষের উৎপাদন-হার বৃদ্ধির মূলে ছিল মানুষের প্রচণ্ড লোভ। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্যটি সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। খাদ্যের পরই মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু হইল বস্ত্র। এই বস্ত্র তৈরির কল উদ্ভাবন, ইহার স্থিতি ও প্রসারের ইতিহাস একান্ত ভাবে মানুষের দুর্দ্দমনীয় লোভেরই ইতিহাস।

অতি পুরাকালে ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু কল আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে বস্ত্রশিল্প এদেশবাসীর রুচি, কল্পনা ও সৃজনীশক্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র বৎসর এই শিল্প প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে এদেশবাসীর রুচিবোধেরও ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া চলিয়াছিল। এদেশবাসীর অপূর্ব্ব বস্ত্রশিল্প তিনটি মহাদেশের অধিবাসীদের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের এই ক্রমবিকাশমান নিজস্ব শিল্প বিনষ্ট হইল কেন? ইহার একমাত্র উত্তর—মানুষের লোভ এবং তাহারই ফলে উদ্ভাবিত কাপড়ের কল। কলের সহিত প্রতিযোগিতার এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া কলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। আজ প্রয়োজনীয় বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য এবং পরমুখাপেক্ষিতাই ইহার একমাত্র কুফল নহে, ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য দুর্গতিও আজ-চূড়ান্ত ভাবে দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী—যাহা তৈরির জন্য পূর্ব্বে সর্ব্ব-সাধারণ নানা কুটির-শিল্পের চর্চ্চা করিত, তাহা লোপ পাইতে বসিয়াছে; মানুষ আজ একান্ত ভাবে কলেরই মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। পরিণামে মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে বস্তুজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। উপরন্তু বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে বিমুখ হওয়ায় সর্ব্বসাধারণের কারুশিল্প-বিষয়ক স্বাভাবিক সৃজনীশক্তি-বিকাশের পথও রুদ্ধ হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে হইতেছে। ফলে শিল্প-দ্রব্য তৈরি করিতে গিয়া অঙ্গুলি ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কৃত্রিম ভাবে পরিচালনা করিতে বাধ্য হওয়ায় শিল্পশিক্ষার ধারা আজ স্বাভাবিক খাতে প্রবাহিত হইতে পারিতেছে না, এক কথায় স্বাভাবিক উপায়ে শিক্ষাশিল্পচর্চ্চার পথ সঙ্কুচিত হইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্যা আজ সকল দেশেরই সমস্যা। তদ্ভিন্ন কলে উৎপাদিত প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য এবং এগুলি বিক্রয়ের জন্য বাজার অনুসন্ধান—এক কথায় ইহাদের বিক্রয়ের জন্য যে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দেশবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র মানবসমাজের শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথকে—এক কথায় মানবতাবিকাশের ধারাকেই ব্যাহত করিয়া তুলিয়াছে। সেজন্য সর্ব্ব মানবের স্বার্থ আজ বিপন্ন। এইরূপ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, আবার মানব-সভ্যতাকে কল্যাণশ্রীমণ্ডিত দেখিতে হইলে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আসল লক্ষ্য স্থির করা এবং তাহাকে সর্ব্বমানবের পক্ষে মঙ্গল-প্রদ করিয়া তোলা প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ এ সম্বন্ধে অবহিত হইবার দিন সমাগত।

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি মূলগত প্রভেদ এই যে পাশ্চাত্যের ন্যায় পরদেশ জয় ও পরদেশ-বাসীর উপর শাসনকর্তৃত্ব স্থাপনের উৎকট প্রয়াস এদেশে কখনও দেখা দেয় নাই। উপরন্তু জড় বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস প্রাচীন যুগে এদেশে যেমন ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিরল। এক দিকে অঙ্ক, গণনাপদ্ধতি, জ্যামিতি প্রভৃতি গণিতবিজ্ঞান ও অন্যান্য জড়বিজ্ঞানের সৃষ্টি যেমন এদেশে হইয়াছিল অন্যদিকে তেমনি এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র যে ভাবে আলোচিত ও আচরিত হইয়াছে তেমনটি অন্য দেশীয় সভ্যতায় বড় দেখা যায় না। শিক্ষাক্ষেত্রে এ দেশের তরুণগণ কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিষয়-সম্ভোগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা এই যন্ত্রতান্ত্রিক যুগে পুনরায় শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। শিক্ষাগ্রহণকালে ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের পক্ষে যে কিরূপ কল্যাণকর আধুনিক কালের শিক্ষানীতিবিদ্‌দের সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইবে।

আধুনিক যুগের কোন কোন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ভারতের

প্রাচীন শিক্ষানীতির মূলমন্ত্রকে অনুসরণ করিয়াই নিদ্রিত, মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীকে জ্ঞানলোকের পথ প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রতিষ্ঠিত গুরুকুল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম,মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত সবরমতী (পরে সেবাগ্রাম) ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বস্তুতঃ বর্ত্তমান-যুগে এদেশের প্রাচীন আদর্শানুসারী অভিনব শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তনের পরীক্ষাক্ষেত্র হইতেছে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "শিক্ষাসত্র" স্থাপন করিয়া এদেশের পল্লীবাসী জন-সাধারণের শিক্ষাকে সার্থক রূপ দিবার প্রয়াসও তিনি পাইয়াছেন। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকল্পে একদিকে যেমন বিশ্বপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি এদেশের দীনদরিদ্র নিপীড়িত জনগণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ হয়, যাহাতে তাহারা প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত হইতে পারে সেজন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা তিনি করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার শোচনীয় কুফল সম্বন্ধে গুরুদেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে বলিয়াছেন—

"বর্ত্তমান যুগে কেবল যে যন্ত্রের উৎপাদন-ক্ষমতাই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়, ইহার ফলে মানুষের লাভের মাত্রা এবং সঞ্চয়ের লোভও বাড়িয়াছে। ইহার দরুন ব্যষ্টিস্বার্থ এবং সমষ্টিগত স্বার্থের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং দাবানলের মত যুদ্ধের আগুন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই লোভই গ্রাম এবং সহরের আভ্যন্তরিক সম্পর্কের মূলচ্ছেদ করিয়াছে এবং এই কারণেই গ্রামকে শোষণ করিয়া শহর পুষ্ট হইতেছে। গ্রাম হইতে শহর যা নেয়, তার প্রতিদানে কিছুই সে দেয় না।"

লোভসর্ব্বস্ব যান্ত্রিক সভ্যতার মোহ মানবসমাজের দুঃখ, ও গ্লানির হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পথ প্রশস্ত করিতেছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তৎপর্য্য এই—

"মানুষের ভিতরকার অজাত শত্রুর তার লোভও একটি সামাজিক স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তি। এই জন্যই ভারতবর্ষে ইহাকে রিপু বলা হইয়াছে। দস্যু যেমন বাহির হইতে অপহরণ করে লোভও তেমনি ভিতরের দিক হইতে সমাজকে সর্ব্বস্বান্ত করে। যে পর্য্যন্ত ইহাকে দমন করিয়া রাখা যায়, সেই পর্য্যন্ত মানুষের সুপ্ত শক্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিবার ক্ষমতা ইহার আছে। সেই শক্তি সামাজিক কল্যাণকে বিনষ্ট করে না। কিন্তু বিশেষ কারণে লোভ যদি সীমা অতিক্রম করে, ইহা চরিতার্থ করিবার উপায়সমূহও যদি অসাধারণরকম প্রবল হয় তাহা হইলে সমাজ-কল্যাণের সীমার মধ্যে আর ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না।"

এই ধরণের বহু সতর্কবাণী রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পল্লীগ্রামের শোচনীয় দুরবস্থা এবং নাগরিক সভ্যতার সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষার কবলে পড়িয়া দরুন পল্লীর ক্রম-বর্দ্ধমান দারিদ্র্য পূর্ব্বেই কবির মনে বেদনা জাগাইয়াছিল। তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' ও অন্যবিধ রচনা এবং বক্তৃতায় ইহার প্রমাণ আছে। পাশ্চাত্য দেশের লোভসর্ব্বস্ব যান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে তিনি বারবার বিশ্ববাসীকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ইহার অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়ার মত অর্থগৃধ্নু, লোভাতুর যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও পোষকদের লোভের বিষময় পরিণতি বা অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে সজাগ করিয়া তোলার প্রয়াসও পণ্ডশ্রমে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু ভারতবাসী আমরা নিজেদের জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসকারী যান্ত্রিক সভ্যতার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য এখনও কি যত্নবান হইব না? পাশ্চাত্য সভ্যতা—অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার যান্ত্রিক সভ্যতা, যাহার সমস্ত শক্তি দুর্দ্দমনীয় লোভপরবশে গঠিত; যে সভ্যতায় পরশোষণনীতির পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিজ্ঞান যেখানে ধ্বংসলীলায় সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে সেই দেশের ও সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও বিশালতার বাহ্যিক চাকচিক্য আকর্ষণীয় হইতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই বিনা বিচারে গ্রহণীয় নয়।

আজ বিশ্বজোড়া বিপ্লবের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি। লোভসঞ্জাত যে পরশোষণনীতি এই বিপ্লবের মূলে তাহা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত মানুষ সভ্যতার নামে এমনিভাবে বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করিয়া চলিবে বলিয়াই মনে হয়। মনুষ্য-সমাজে হিংসাবৃত্তি চরম দুর্নীতি। এই প্রবৃত্তির উৎস মানুষের লোভ। ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানব-সমাজ গৃধ্নুতামূলক শোষণনীতি ত্যাগ না করিলে উচ্চতর মানবতার আদর্শ কখনই জয়যুক্ত হইবে না। সত্যের সাধক মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও প্রেমের বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার আদর্শ ও গান্ধীজীর অহিংসাবাদের মূললক্ষ্য একই। যান্ত্রিক সভ্যতার বিকৃত আদর্শে বিভ্রান্ত মানবজাতিকে প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করাই ভারতের এই দুই মহামানবের সমগ্র জীবনের সাধনা। ইঁহাদের আদর্শকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করিতে হইলে বস্তুতান্ত্রিক ও যান্ত্রিক জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূলসংস্কার প্রয়োজন। ইঁহাদের মহান আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন, অভিনব শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন ও নিয়ন্ত্রণ একান্ত আবশ্যক এবং সেই শিক্ষানীতিদ্বারাই ভবিষ্যতে পূর্ণতর মানব-সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই নীতিরই আলোকে বনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর

(১৭৯৪—১৮৪৬)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

১

ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে পরাধীন ভারতবাসীরা যাঁহাদের প্রতিভাবলে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়া পান দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগে হিন্দুসমাজকে পরিশুদ্ধ করিতে তৎপর হন। ইহার উন্নতিকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা ছিল অপরিসীম। জাতিগঠনমূলক কার্য্যে অগ্রণীদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। দ্বারকানাথ প্রথম জীবনে কিছুকাল ব্যবহারজীবীর কার্য্য করেন। পরে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিমক মহলের দেওয়ান হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজ জমিদারি পরিচালনাও করিতেন। কিন্তু সরকারী ও বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও, যে-সব উপায়ে দেশের ধনসম্পদ বাড়িতে পারে সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। তিনি সরকারী কর্ম্ম করিতে করিতেই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। দ্বারকানাথ ১৮৩৪ সনে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং কয়েক জন ইংরেজ অংশীদার লইয়া কার-ঠাকুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, কোম্পানীর বৃহত্তম অংশ তাঁহারই ছিল। এ যাবৎ বহু বাঙালী ইংরেজদের যোগে টাকা খাটাইতেন এবং নিজেরা মুৎসুদ্দী নামে পরিচিত হইতেন। বিদেশের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-পরিচালনায় দ্বারকানাথই বাঙালীদের মধ্যে পথপ্রদর্শক হইলেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক একারণ তাঁহাকে পত্র দ্বারা অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন।



দ্বারকানাথ ঠাকুর

সরকারী কর্ম্ম করিতে করিতেই দ্বারকানাথ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন বলিয়াছি। তিনি সমাজের আর্থিক উন্নতির জন্য অন্যান্য দিকেও মনোযোগী হইলেন। জীবনবীমা কোম্পানী স্থাপন ও প্রসার ইহার মধ্যে একটি। তিনি নীলকুঠী, রেশম কুঠী স্থাপন করিলেন, রাণীগঞ্জের কয়লার খনিও ক্রয় করেন। দ্বারকানাথ ব্যবসা-কর্ম্ম দ্বারা প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। কলিকাতার দেশী বিদেশী উভয় সমাজেই তাঁহার প্রতিপত্তি আশাতীত রূপে বাড়িয়া গেল। প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেও তিনি দরিদ্র স্বদেশবাসীদের ভুলিয়া যান নাই। বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার দান ছিল প্রচুর। দ্বারকানাথ ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটির সভ্যরূপে ইহার পরিচালনায় সময়ক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দুঃস্থদের সাহায্যকল্পে তিনি ইহার হস্তে এক লক্ষ টাকা অর্পণ করেন। এই অর্থ হইতে দীন দুঃখী অন্ধ খঞ্জদের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হয়। তৎকালীন বিবিধ শিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গেও দ্বারকানাথ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে এই সম্পর্কেই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

২

কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮১৭, ২০শে জানুয়ারি) হইতেই ভারতবর্ষে নবযুগের সূচনা বলা চলে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহন রায় কি দ্বারকানাথ ঠাকুর কাহারও প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। রামমোহন রায় এংলো-হিন্দু স্কুল নামে কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই

বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। রামমোহন জীবনে কখনও হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন নাই। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে একথা মোটেই ঠিক নহে। কেহ কেহ বলেন, তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন, একথাও অনুরূপ ভ্রান্তিমূলক। হিন্দু কলেজের প্রথম দিকে তিনি ইহার সংস্রবে আসেন নাই। তিনি রামমোহন রায়ের স্কুলেই অর্থসাহায্য করিতেন। স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এই বিদ্যালয়েই ভর্তি করিয়া দেন। দেবেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের প্রথম ভাগ এইখানে কাটে। ১৮৩০ সনের নবেম্বর মাসে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। ইহার পরেও কিছুকাল তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন।

হিন্দু কলেজের শিক্ষার উপকারিতা দেখিয়া দ্বারকানাথ ইহার দিকে এই সময় বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৩৩ সনের মার্চ মাসে হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ ল্যাডলিমোহন ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার শূন্য পদে দ্বারকানাথ কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন।* তদবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে উহার পূর্ব্বেই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। এই তের-চৌদ্দ বৎসর (১৮৩৩-৪৬) দ্বারকানাথ হিন্দু কলেজের উন্নতিকল্পে সবিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। কলেজে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য ডাঃ ও'শাগনেসির প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন। কলেজের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহা আংশিক ভাবে গৃহীত হয়।

বাঙালী ছাত্রদের সুষ্ঠুভাবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য ১৮৩৯ সনে হিন্দু কলেজের অধীনে আর একটি শাখা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা পাঠশালা নামে ইহা পরিচিত হইতে থাকে। ইহার কার্য্য আরম্ভ হয় ১৮৪০ সনের ১৮ই জানুয়ারি। পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল—অল্পবয়স্ক ছাত্রদের বাংলার মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত, জ্যামিতি, সাধারণ বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তক বাংলা ভাষায় রচনার জন্য কলেজ-কর্তৃপক্ষ একটি সাব-কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন। এদিকে কতকটা কাজও হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় সরকার হিন্দু কলেজের ব্যয়ভার অত্যধিক বহন করিতে থাকায় পুনর্গঠিত শিক্ষা কমিটি (Council of Education) ইহার উপর কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করে। ইহারা উৎসাহ না দেওয়ায় উক্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এখানে বলা আবশ্যক, দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ বাংলা পাঠশালার আদর্শে ১৮৪০ সনের জুন মাসে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৩

হিন্দু কলেজের সঙ্গে দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠ যোগ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর যে ব্যবস্থা হয় এখানে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৮-৪৯ সনের শিক্ষা-কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর স্মৃতি-তহবিলের চাঁদাদাতৃগণ ১৮৪৯ সনের ১০ই জুলাই একটি সভায় সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, 'দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কলারশিপ' নামে হিন্দু কলেজে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-কমিটির হস্তে তহবিলটি ন্যস্ত থাকিবে এবং কমিটি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন। শিক্ষা-কমিটি এই সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন,—

"By a new distribution of the Government funds appropriated to the foundation of scholarships in the Hindu College, in connection with the change of system already alluded to, a first-class scholarship of 40 rupees was instituted and designated the Dwarkanath Tagore Scholarship ; the difference between the interest yielded by the amount of the subscriptions, 25 rupees monthly, and the full value of the scholarship, being made up from the funds assigned by Government for the endowment scholarships in that College."*

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, দ্বারকানাথ ঠাকুর-তহবিলের সুদ হইতে মাসিক আয় ছিল পঁচিশ টাকা। বক্রী পনর টাকা সরকার-প্রদত্ত বৃত্তিকণ্ড হইতে প্রতি মাসে দিয়া চল্লিশ টাকা পূরণ করা হয়। মাসিক চল্লিশ টাকা মূল্যের 'দ্বারকানাথ ঠাকুর স্কলারশিপ' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি এইরূপে স্থাপিত হইল। কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদিগকে এখনও এই বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৯ সনে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন-এর (যাহা পরে কাউন্সিল অব এডুকেশনে পরিণত হয়) সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

৪

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রায় প্রতিষ্ঠা অবধিই দ্বারকানাথ ইহার সংস্রবে আসেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি না। এখানে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৩৩ সনে গঠিত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক নেটিভ মেডিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশন এবং কলিকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক শ্রেণীগুলি তুলিয়া দিয়া ইউরোপীয় আদর্শে একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয় ১৮৩৫ সনের ২৮শে জানুয়ারির ঘোষণায় ব্যক্ত

* রাধাকান্ত দেব বিলাতে ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে ১৮৩৩ সনের ১০ই মে তারিখে এক পত্রে প্রসঙ্গতঃ লেখেন :—

"Prosunnocoomer Takore was elected in the room of his deceased brother and Dwarkanath Takore in that of the late Ladlymohun Takore."

* *General Report of Public Instruction, etc.* from 1st May, 1848 to 1st October, 1849, p. xi.

করেন। ডাঃ মাউণ্টফোর্ড যোসেফ ব্রামলির উপর কলেজ গঠনের ভার অর্পিত হইল। তিনি এই সনের ১লা জুন হইতে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। কলেজের কার্য্যের প্রকৃত প্রস্তাবে এই দিন হইতেই সূত্রপাত হয়। প্রথম বারে অস্থি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হইল। ছুটির পর ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়।* দ্বারকানাথ ঠাকুর কলেজের হিতকল্পে বিশেষ যত্নপর হইলেন। ছাত্রদের পাঠে উৎসাহ দানের জন্য তিনি বার্ষিক থোক টাকা পারিতোষিক দিবার প্রস্তাব করিয়া অধ্যক্ষ ব্রামলিকে ১৮৩৬ সনের ২৪শে মার্চ এই পত্রখানি লেখেন,—

"I am unwilling to offer you my congratulations upon the success which has attended your undertakings in the Medical College, without showing that my feelings towards the Institution are more substantial than those which words only can express.

"Should all your expectations be realised, and there is every reason to believe they will, the Medical College cannot fail to produce the happiest results amongst my countrymen. No man, I assure you, is more sensible than I am, of the benefits which such an Institution is calculated to dispense, but I know also that we have many very grave difficulties before you, and the greater part of these you will have to contend with at the outset. My own experience enables me to tell you that no inducement to Native exertion is so strong as that of pecuniary reward, and I am convinced you will find difficulties disappear in proportion to the encouragement offered to the students in this particular.

"As an individual member of the Native community, I feel it belongs to us to aid, as far as lies in our power, the promotion of your good cause. At present this can hardly be expected on any very great scale, but as example may be of service to you, I for one will not be backward to accept your invitation to my countrymen to support the College.

"I beg therefore as an inducement to the Native pupils now studying in the Institution, and to those who may hereafter, to offer the annual sum of 2,000 Rupees for the ensuing three years, to be distributed in the form of Prizes. In order that these may be of substantial value to the candidates, I propose that the prizes should not exceed 8 or 10 in number, and that they should be available to foundation students only and natives *bona fide* pupils of the College. All other arrangements in regard to their distribution I leave to your discretion."†

পত্রখানির সারমর্ম এই যে, নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইলেও অল্প দিনের ভিতরেই কলেজ ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। দ্বারকানাথ অধ্যক্ষ ব্রামলিকে শুধু মামুলি ধন্যবাদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেরূপ জানেন তাহাতে তাঁহার মতে আর্থিক সাহায্য লাভের আশা থাকিলে ছাত্রেরা কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে বেশী উৎসুক হইবে। এ কারণ তিনি প্রস্তাব করেন, বার্ষিক দুই হাজার টাকা হিসাবে পর পর তিন বৎসর তিনি যোগ্য ছাত্রগণকে পুরস্কার দিবেন। যাহাতে টাকার অঙ্ক কম না হয় সেজন্য তিনি এই টাকা দ্বারা আটটি কি দশটি পুরস্কারের অধিক দিবার পক্ষপাতী নন্। কলেজের ভারতীয় ছাত্রগণই এই পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইবে। পুরস্কার সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় স্থির করিবার ভার তিনি ব্রামলির উপর দেন।

ব্রামলি পত্রখানি যথারীতি শিক্ষা-কমিটিকে প্রেরণ করিলেন। কমিটির সেক্রেটারী জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড পরবর্তী ১২ই এপ্রিল এক পত্রে এই দানের জন্য দ্বারকানাথকে অভিনন্দিত করেন এবং ইহা গ্রহণে সম্মতি জানান। শিক্ষা-কমিটি পুরস্কার বিতরণের নিম্নরূপ সাময়িক ব্যবস্থা করিলেন,—

শব-ব্যবচ্ছেদ শ্রেণী (Anatomical Classes)		রসায়ন শ্রেণী (Chemical Classes)	
১ম পুরস্কার	৪০০ টাকা	১ম পুরস্কার	২১৫ টাকা
২য় ,,	৩৩০ ,,	২য় ,,	২০০ ,,
৩য় ,,	২৬০ ,,	৩য় ,,	১২৫ ,,
৪র্থ ,,	১৯০ ,,	৪র্থ ,,	৫০ ,,
৫ম ,,	১২০ ,,		
৬ষ্ঠ ,,	৫০ ,,		৬৫০ টাকা
	১৩৫০ টাকা	মোট	২০০০ টাকা*

এই পুরস্কারগুলি ১৮৩৭ সনের ২৯শে জুন তারিখে মেডিক্যাল কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের প্রথম দেওয়া হইল। ইঁহাদের নাম এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শব-ব্যবচ্ছেদ শ্রেণীতে 'দ্বারকানাথ-পুরস্কার' পান রাজকৃষ্ণ দে ২৭০ টাকা, ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৭০, শ্যামাচরণ দত্ত ১২০, রামনারায়ণ দাস ১২০, পঞ্চানন শ্রীমানী ১২০, যাদবচন্দ্র বাগ ৫০, নবীনচন্দ্র মিত্র ৫০, দ্বারকানাথ গুপ্ত ৫০, রামকুমার দত্ত ৫০, কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৫০, পরমানন্দ শেঠ ৫০। রসায়ন শ্রেণীতে পুরস্কার পাইলেন ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৫০ টাকা, নবীনচন্দ্র মিত্র ১৫০, রামনারায়ণ দাস ১০০, রামকুমার দত্ত ১০০, উমাচরণ শেঠ ১০০, গোবিন্দচন্দ্র পাল ১০০ টাকা মূল্যের 'কেমিক্যাল চেষ্ট', হরচন্দ্র দাস ৫০, সাতকড়ি দত্ত ৫০।† পুরস্কারের পরিমাণ মোট ২১২০ টাকা দেখিতেছি, সুদে এই টাকা বাড়িয়া থাকিবে। পারিতোষিকের সংখ্যা এবং অঙ্কেও অনেক তারতম্য দেখা যাইতেছে। দ্বারকানাথ এরূপ বণ্টনের পক্ষপাতী না হইলেও শিক্ষা-কমিটি বোধ হয় এইরূপই পরে সাব্যস্ত করেন।

* *Report of the General Commitee of Public Instruction of the Presidency of Fort William in Bengal, for the year 1836*, pp. 34, 49–51.

† *Report of the General Committee of Public Instruction, etc.*, for 1835, pp. 12, 13.

* *Ibid*, p. 14.

† *Ibid.*, for 1837, pp. 58-9.



সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, ভোলানাথ বসু

৫

তিন বৎসর পরেও দ্বারকানাথ পারিতোষিক দানে বিরত হন নাই। ১৮৪৫-৪৬ সন পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসরই 'দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রাইজ ফণ্ড' হইতে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় দ্বারকানাথ পরে একটি ফণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। শিক্ষা-কমিটির বিভিন্ন রিপোর্টে এরূপ পুরস্কার দানের উল্লেখ আছে। বিলাত গমনেচ্ছু প্রথম ছাত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম ভোলানাথ বসুও ১৮৪৪ সনে এই ফণ্ড হইতে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।* দ্বারকানাথের ভাগিনেয় (?) কাওয়াসজী, রামকমল সেন, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ সে-যুগের নেতৃবৃন্দও যোগ্য ছাত্রদের নানারূপ পারিতোষিক প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮৪৬-৪৭ সন হইতে কমিটি এইরূপ পুরস্কারদান-প্রথা রহিত করিয়া দিয়া অন্যবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। ঐ সনের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে "The Medical College of Bengal" অধ্যায়ে (পৃ. ৬৮) এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে,—

"Prizes. During the past year the Council brought to the notice of the Government the subject of prizes to the Medical College, which were previously chiefly obtained from private sources, and liable to an amount of fluctuation tending to defeat the object for which such rewards are bestowed, great encouragement being occasionally held out of proficiency in one department, while others equally important were entirely neglected."

সরকার শিক্ষা-কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক পুরস্কারদান-প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। অতঃপর উৎকৃষ্ট ছাত্রদের স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি এবং চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তকাদি পুরস্কার দেওয়াই সরকার কর্ত্তৃক স্থির হইল। কোনরূপ ভেদাভেদ না করিয়া, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্ব্বিশেষে উৎকৃষ্ট ছাত্র মাত্রেই পুরস্কার পাইবার অধিকারী হইল। ইহা ছাড়া পাঠোৎকর্ষের জন্য কাহাকেও কাহাকেও 'সার্টিফিকেট' বা প্রশংসাপত্র দিবারও ব্যবস্থা হয়।

দ্বারকানাথ ১৮৪৪ সনে শিক্ষা-কমিটির নিকট এক নূতন প্রস্তাব করিলেন। তিনি ১৮৪২ সনে প্রথম বার ইউরোপ যান। সেখানকার উন্নত শিক্ষা-প্রণালীও তিনি লক্ষ্য করেন। তখন পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যার খুবই উন্নতি সাধিত হইতেছিল। তিনি কমিটির নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, মেডিক্যাল কলেজের দুই জন ভারতীয় ছাত্রের লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। শিক্ষা-কমিটির তৎকালীন সেক্রেটারি ডাঃ এফ. জে. মোএট কলেজের ছাত্রগণের নিকট দ্বারকানাথের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এই প্রস্তাবে ভোলানাথ বসু, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এবং দ্বারকানাথ বসু নামক তিন জন ছাত্র উপস্থিতমতে বিলাত গমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ইহার পর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এইচ. এইচ. গুডিভ স্বয়ং একটি ছাত্রের ব্যয় বহন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আর একটি ছাত্রের ব্যয় বাবদেও গুডিভের চেষ্টা-যত্নে সাড়ে সাত হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। এই টাকার মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম চারি হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

লণ্ডনে চারি জন ছাত্রের অধ্যয়নের জন্য অর্থ যোগাড় হইল। ডাঃ গুডিভ কয়েকটি সর্ত্তে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানার্থ সঙ্গে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিনি কমিটিকে লেখেন যে, লণ্ডনে অবস্থান-সময়কে তাঁহার কর্ম্মকালের অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এই সময়ে তাঁহাকে অর্দ্ধ বেতন দিতে হইবে এবং পরে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে পূর্ব্বপদে বহাল করিতে হইবে। দ্বারকানাথ ও গুডিভের প্রস্তাব সম্পর্কে শিক্ষা-কমিটি সরকারকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এসব কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রয়োজনবোধে পত্রখানির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"The offer (of Dwarkanath Tagore) is an extremely liberal and munificent one, as it has been calculated that each pupil will cost at least Co's Rs. 7,000, including the passage to and from England.

*   *   *   *   *

* *Ibid.*, for 1843-44, p 65.

As it will be necessary to send them home in charge of some competent person, who will likewise have to take care of them in England, and superintend their studies, the Council of Education beg most strongly to recommend that Dr. Goodeve may be ordered upon this duty, upon the terms mentioned in his letter, *viz.*, the retention of half his staff allowance—his time of service to count while in Europe—and to be entitled to his appointment in the Medical College upon his return.

From Dr. Goodeve's long connection with the Medical College—his popularity among the students—his having been the first person in British India to introduce the important practice of human dissection, and also the first to found a Female Hospital—his munificent offer of taking one pupil at his own expense and his endowment of a midwifery scholarship, the Council are induced to hope, that his application will meet with favourable consideration from Government. His also having lost his health from a dissection would in the service of Government, will be an additional recommendation.

The best thanks of the Council have been returned to Dwarkanath Tagore for his munificence, in addition to the large sums bestowed by him for the purposes of education, and the benefit of his fellow countrymen."

এই পত্র হইতে জানা যাইতেছে, দ্বারকানাথ দুই জন ছাত্রের প্রত্যেকের মাথা পিছু লণ্ডন যাতায়াত ও অধ্যয়নের ব্যয় বাবদ অন্ততঃ সাত হাজার টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছিলেন। ডাঃ গুডিভের প্রস্তাবও শিক্ষা-কমিটির সুপারিশে সরকার গ্রহণ করেন।

৭

ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী—মেডিক্যাল কলেজের এই চারি জন ছাত্র লণ্ডনে অধ্যয়নার্থ মনোনীত হইলেন। তাঁহারা ডাঃ গুডিভের তত্ত্বাবধানে ১৮৪৫ সনের ৮ই মার্চ্চ 'বেণ্টিঙ্ক' জাহাজে কলিকাতা হইতে বিলাত যাত্রা করেন। স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য জাহাজে কিছু দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই জাহাজে দ্বারকানাথ ঠাকুরও দ্বিতীয় বার বিলাত গমন করিলেন। তিনি আর স্বদেশে ফেরেন নাই; ১৮৪৬ সনের ১লা আগষ্ট বিলাতেই ইহলীলা সম্বরণ করেন।

উক্ত চারি জন ছাত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় ১৮৪৪-৪৫ সনের শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্টে (পৃ. ১১৯) এইরূপ পাওয়া যাইতেছে,—

"The four pupils who accompanied the Professor and started in the steamer *Bentinck* on the 8th March, were *Bholanath Bose*, a pupil of Lord Aukland's School at Barracpore, who was supported at the Medical College by His Lordship for five years, and was considered by the late Mr. Griffith, the most promising botanical pupil in the school—*Gopal Chunder Seal*—*Dwarkanath Bose*, a Native Christian, educated in the General Assembly's Institution, and employed for some time as assistant in the Museum—together with Surjee Coomer Chuckerbutty, a Brahmin, native of Commillah, a junior pupil and a lad of much spirit and promise."

ভোলানাথ লর্ড অকল্যাণ্ডের ব্যারাকপুর স্কুলের ছাত্র এবং অকল্যাণ্ডেরই অর্থসাহায্যে পাঁচ বৎসর কাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। গোপালচন্দ্র শীলের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। দ্বারকানাথ বসু দেশীয় খ্রীষ্টান। তিনি জেনারেল এসেম্ব্লি ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র, এবং কিছুকাল যাদুঘরে চাকরি করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী ইঁহাদের সকলেরই বয়ঃকনিষ্ঠ, জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং কুমিল্লানিবাসী। তিনি কলেজের এক জন উদীয়মান ছাত্র। সূর্য্যকুমার পরে খ্রীষ্টান হইয়া সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী নামে পরিচিত হন।

বিদেশের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সকলই গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে উন্নত করা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঐকান্তিক বাসনা ছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই জন ছাত্রের ব্যয় সর্ব্বপ্রথম বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তিনি এই বাসনা নিজ জীবনেই কার্য্যে কতকটা পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর এক শতাব্দী অতীত হইয়া গেল। আজ ভারতবর্ষ আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের পথে। বর্ত্তমানে এক দল বিশিষ্ট বাঙালী ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের অনুকূলে কি কি সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রেরিত হইয়াছেন। এই সময় দ্বারকানাথের আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা আমাদের দৃষ্টি আরও বেশী করিয়া আকর্ষণ করে।

জাটিঙ্গা

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

অনেক শ্রাবণ এসে 'জাটিঙ্গা' নদীর জলে স্নান করে গেছে—
ঊর্মিপ্রিয় জলে তার রেখে গেছে যযনীল যৌবনের দাগ।
তারি তীরে এসে তুমি তাই আজো মধুময় স্মৃতি বেছে বেছে
নিয়ে যাও তুলে দিয়ে পৃথিবীর নিপীড়িত কঠিন আঘাত।
তোমারো বিলাসী মনে কত বার কত মেঘ দিয়ে গেছে দেখা
যে মেঘের বুকে বুকে বিজড়িত কত শত শ্রাবণের প্রাণ:
সে সকল শ্রাবণের আছে শুধু অরণ্যের ইতিহাস লেখা।
তারা এসে 'জাটিঙ্গা'র ঝিরিঝিরি করে যায় যৌবনের গান।
পাথর-ধোয়ানো কত রজনীর অফুরন্ত রূপ গ'লে গ'লে
মিশে গেছে জলে তার যেন কোনো তন্দ্রাহীন চাঁদের মতন:
সবুজ-সোনালী চাঁদ—যার তরে উন্মন হও কত ছলে,
'জাটিঙ্গা' তারেও চুপে লক্ষ্যহীন ঘুমে তার দেখে যে স্বপন।
তাই তুমি খুঁজে পাও তোমার খুশীর চাঁদ এই তীরে তার—
যে নদীতে স্নান করে তোমারো শ্রাবণ আজো কত শত বার।

নবীনচন্দ্রের 'শুভ-নির্ম্মাল্য'

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত

['নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী' ('প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৫৩) শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিবরের একটি নূতন নাটিকার সন্ধান দেন। উহার নাম—'শুভ-নির্ম্মাল্য'; পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬। ইহা আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। এই পুস্তিকাখানি সম্প্রতি দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। ভবিষ্যতে নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এই ভরসায় 'প্রবাসী'র বর্ত্তমান সংখ্যায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। আলোচ্য নাটিকাখানি নবীনচন্দ্র পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে রচনা করিয়াছিলেন। তিনি আত্মকথা—'আমার জীবনে'র ৫ম ভাগে (পৃ. ৩১৩-১৪) লিখিয়াছেন—"১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিবসে বিবাহ স্থির হইল। আমার স্নেহাস্পদ ভাই তারাচরণ ধরিয়া বসিল…কিছু একটা নূতন দেখাইতে হইবে। আমি তদনুসারে তিনটি মাত্র দৃশ্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র 'অপরেটা' (Operatta) লিখিলাম।" বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত পুস্তকতালিকা মতে ইহার প্রকাশকাল—২৭ জানুয়ারি ১৯০০।]

শুভ-নির্ম্মাল্য।

ভারতের সুবিখ্যাত

কবি

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

প্রথম অঙ্ক

(বর ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। বৎস! আমি কুলধ্বজের সন্তান। তোমার নয় পুরুষের আমরা পুরোহিত। তোমার আজ শুভ বিবাহ। তুমি নব যৌবনে উত্তীর্ণ হইয়া আজ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী হইবে। তোমাকে এ শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমাদের উদ্বাহ জীবন সুদীর্ঘ সুবাসিত সুখ-কুসুম-হারে পরিণত হউক, এবং উহা ধর্ম্মের বিমল আলোকে প্রোদ্ভাসিত হইয়া তোমার প্রাচীন বংশ সমুজ্জ্বল করুক।

বর। গুরুদেব! ধর্ম্ম কি?

পু। বৎস! জীব মাত্রই এ সংসারে সুখান্বেষণ করে। এক কথায়, ধর্ম্ম সেই সুখান্বেষণ। তুমি জান দেহ, মন ও আত্মা লইয়াই মানুষ। এই তিনেরই কতকগুলিন প্রবৃত্তি আছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থই সুখ। তাহাদের চরম চরিতার্থতা শ্রীভগবানে। বালক সুন্দর অক্ষর সম্মুখে রাখিয়া যেমন অক্ষর লেখা অভ্যাস করে শ্রীভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ এই চরিতার্থতার অনুশীলন করিবে। যে যতদূর অগ্রসর হইবে সে তত সুখী। সে তত ধার্ম্মিক। এই অনুশীলনের, এই সুখান্বেষণের, নাম ধর্ম্ম। যাহাতে এই অনুশীলনের শিক্ষা দেয় তাহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। যে কার্য্যের দ্বারা এই অনুশীলন সাধিত হয় তাহার নাম কর্ম্ম।

বর। গুরুদেব! উদ্বাহের দ্বারা কিরূপে এ ধর্ম্ম সাধিত হইবে?

পু। বৎস! সর্ব্বপ্রকার অনুশীলনের মূলে প্রেম-প্রবৃত্তি। জ্ঞানের প্রতি তোমার প্রেম না থাকিলে তুমি জ্ঞানের অনুশীলন করিবে কেন? তদ্রূপ দীন দুঃখীকে প্রেম না করিলে তাহাকে দয়া করিবে কেন? মানুষের জন্ম হইতেই হৃদয়ে এই প্রেমধারা বহিতে আরম্ভ করে। মানুষ প্রথমে মাতাকে, তাহার পর পিতাকে, তাহার পর খেলার সঙ্গী-সঙ্গিনীকে, প্রেম করে। কিন্তু বিবাহ না হইলে পত্নীপ্রেম, এবং সন্তান না হইলে বাৎসল্যপ্রেম, তাহার হৃদয়ে উন্মেষিত হয় না; তাহার প্রেম প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা হইতে পারে না। পিতৃ-মাতৃ-প্রেম ও সখ্য প্রেম হইতে পত্নী ও বাৎসল্য প্রেম গাঢ়তর। এরূপে মানুষে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তানকে প্রেম করিতে শিখে। তাহার পর সর্ব্বজীবভূত শ্রীভগবানকে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তান অপেক্ষায় অধিক প্রেম করিতে শিখে। এই মধুর ভাবেই প্রেমের চরিতার্থতা। অতএব বুঝিলে কি এই ধর্ম্ম-সাধনার পথে পত্নী প্রধান সহায়, এ জন্যে তিনি সহধর্ম্মিণী? এখানে ভারতীয় আর্য্য বিবাহের সঙ্গে অন্য বিবাহের পার্থক্য। অন্য বিবাহে পত্নী সহ-সংসারিণী মাত্র, আর্য্য বিবাহে পত্নী সহধর্ম্মিণী। এই বিবাহে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি।
মম চিত্তমনু চিত্তন্তে হস্তু।
মম বাচমেক মনা জুষস্ব
প্রজাপতি ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্।
ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থি ভিরস্থীনি
মাংসৈ মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

এই বিবাহে পতি পত্নী ধর্ম্ম সাধনের জন্যে এক রক্তে, এক মাংসে, এক আত্মায় পরিণত হয়। জীবনের সঙ্গে এ সম্মিলন বিচ্ছিন্ন হয় না। বৎস! তুমি এই শুভ বিবাহ দিনে প্রজাপতি শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। সহস্র সহস্র বার প্রণাম কর এবং তাঁহার চরণে তোমাদের যুগল হৃদয় অর্পণ কর।

বর। (জানু পাতিয়া)

"নমো নমস্তেস্তু সহস্র কৃত্বা
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তেস্তু সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

গীত

(১)

তুমি প্রজাপতি বিশ্বেশ্বর,
তুমি নাথ ! বিশ্ব জীবন।
তোমাতে গ্রথিত, বিশ্ব অগণিত,
সূত্রে মণি অগণন।

(২)

সেই প্রেম-সূত্রে দুটি ক্ষুদ্র ফুল
গাঁথি প্রেমে, নারায়ণ।
দুইটি শিশুর যুগল হৃদয়
চরণে কর গ্রহণ

(৩)

দিও দেহে শক্তি, দিও হৃদে ভক্তি,
জ্ঞানে আলোকিত মন।
তব প্রেম রথে, দিও তব পথে
সম্মিলিত এ জীবন।

পু। বৎস ! এখন শ্রীভগবানের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীখ্রীষ্ট, শ্রীমহম্মদ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তকে তুমি নমস্কার কর। ইঁহারা যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস ! পিতৃলোকস্থ তোমার পুণ্যবান পূর্ব্ব-পুরুষ ও রমণীগণকে নমস্কার কর। তাঁহাদের পুণ্যে ৩০০ বৎসর যাবত ধনে, গৌরবে, বিদ্যায়, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে তোমার এই বংশ চট্টগ্রামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন যে ইহার এরূপ অধঃপতন হইতেছে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্তে তাঁহাদের কাছে এই শুভ দিনে প্রার্থনা কর এবং নমস্কার কর।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস ! যিনি পরোপকার ব্রতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ত্রিদিবে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের গাথা এখনো চট্টগ্রামের সীমা হইতে সীমান্তরে উপকথার মত প্রচলিত, যিনি বজ্রের তুল্য তেজস্বী ও দৃঢ় এবং কুসুমের তুল্য সুকোমল হৃদয় ছিলেন, যাঁহার প্রেম ও করুণা জাহ্নবীর মত অজস্র ধারায় বহিত, সেই—

"সমাজের শিরোমণি সদ্গুণ আধার,
বিপদে প্রসন্ন মুখ মোহন আকার
সরল হৃদয় পরদুঃখে ম্রিয়মাণ
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান।"

মস্তকের উপর চাহিয়া দেখ, তোমার সেই পুণ্যশ্লোক পিতামহ ও তোমার খুল্লপিতামহ —রূপে প্রকৃত গোপীমোহন ও মদনমোহন—ও তোমার শিশুবৎ সরলা পিতামহী—মা আমার প্রকৃত রাজরাজেশ্বরী—কি প্রসন্ন সস্নেহ মুখে অন্তরীক্ষে বসে তোমার এই শুভ বিবাহ দেখ্‌ছেন ! তুমি তাঁহাদেরে প্রণাম কর !

বর। মরি মরি কিবা রূপ ! কি জ্যোতি বিমল
আকাশ করিয়া পূর্ণ শত চন্দ্রালোকে !
কি সৌরভ বহিতেছে, অম্লান যার
যেন নন্দনের ! কিবা কোমল মধুর
বহিছে সঙ্গীত স্রোত, সুখ স্রোত যেন
পুণ্যের নির্ঝরে বহে পবিত্র শীতল।
অনাথ শিশুর মত এ প্রৌঢ় বয়সে
কাঁদেন জনক মম যাঁহাদের তরে
গুরুদেব ! ইঁহারা কি কহ সেই মম
পিতামহ পিতামহী খুল্লপিতামহ ?
যিনি নিত্য গৃহে গোপীমোহন স্বরূপে,
শিব রূপে যিনি নিত্য বংশীয় শ্মশানে,
—সুপবিত্র কুল তীর্থে- সভক্তি পূজিত,
ইনি কি আমার কহ সেই পিতামহ ?
আমার জীবন আজি হইল সার্থক।
দেব দেবি ! তোমাদের অযোগ্য শিশুর
প্রাণ পূর্ণ, ভক্তি পূর্ণ, অযোগ্য প্রণাম
লও পাদ-পদ্মে প্রেমে, লও দয়া করি !
যেই পিতৃ মাতৃ প্রেমে চির আত্মহারা
পিতা মম ; দেব দেবি ! কর সঞ্চারিত
সেই পিতৃ মাতৃ প্রেম হৃদয়ে আমার !
আমি শিশু পিতা মাতা দেবতা আমার,
না জানি দেবতা অন্ত ; পিতৃ মাতৃ সেবা
মম ধর্ম্ম, নাহি জানি অন্ত ধর্ম্ম আমি। (নমস্কার)

পু। বৎস ! এবার পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণকে, তোমার পিতামাতাকে, তোমার পিতৃব্য, পিতৃব্যানীকে, তোমার বংশীয়-গণকে, তোমার বিপুল বংশের প্রজাগণকে এবং তোমার স্বদেশবাসিগণকে প্রণাম কর। (শ্রোতৃবর্গের প্রতি) আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, এই বিবাহ যেন এই বংশের ও এই দেশের একটি মঙ্গল গর্ভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং দম্পতি যুগল সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া স্ববংশের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করে।

বর। (নমস্কার)

(কোন পণ্ডিত এইখানে সভায় দাঁড়াইয়া একটি আশীর্ব্বাদ শ্লোক পাঠ করিবেন)

পু। নির্ম্মল ! এবার তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও পুণ্যধার মাতৃভূমিকে নমস্কার কর। মাতা জন্ম দিয়া থাকেন, মাতৃভূমি অন্ন, জল, সুখ, সমৃদ্ধি প্রদান করেন। মাতৃভূমি সর্ব্ব মঙ্গলা, সর্ব্বার্থ সাধিকা।

বর। (নমস্কার)

(১)

মা! মা! মা! তৃষিত অন্তরে
ডাকিতেছি মাগো! পরাণ ভ'রে।
শৈল-কিরীটিনী সাগর কুন্তলা
সরিৎ-মালিনী ডাকি মাগো! তোরে।

(২)

জীবন প্রথমে হৃদি রক্তে, শ্যামা!
পূজিব চরণ হৃদয় বাসনা।
শিশু হৃদয়ের কাতর কামনা
পূরাও পার্ব্বতি! পরম আদরে।

(৩)

হৃদয়ের রক্ত, নয়নের জল,
প্রেম বিগলিত পবিত্র শীতল,
বরষি চরণে মাগো! অবিরল
জুড়াইব প্রাণ চিরদিন তরে।

পু। বৎস! যিনি প্রজাপতি শ্রীভগবানের শক্তি-প্রতিমা, যিনি মাতৃরূপে, দশভুজে বিপদ-বিঘ্ন-নাশিনী দশভুজা রূপে, নয় পুরুষ যাবত তোমাদের গৃহে বিরাজ কচ্ছেন, এবার সেই জগত-জননী কুল-মাতাকে দর্শন ও নমস্কার কর। (পটোত্তোলন এবং দশভুজার সমুখে এক মিনিট আরতি ও হুলুধ্বনি)

বর। (নমস্কার) মা! মা!—

"নিরখি তোমারি পানে, তোমারি সন্তান দুজনে
প্রবেশে সংসারে আজি দেখ মা! কৃপানয়নে!
যথা নীরবিন্দু দয়
পদ্ম পত্র এক হয়,
তেমতি হে দয়াময়ি! মিলাইও দুই জনে!
সংসার মোহ মায়ায়
যদি পথ ভুলে যায়,
কৃপা করি কৃপাময়ি! ফিরাইও সেইক্ষণে
রেখ মাগো! মনে রেখ,
মাতা হয়ে কাছে থেক,
মরণে মরণে রেখ দিও স্থান শ্রীচরণে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পুষ্পমালা করে দ্বিভুজা ভগবতীর ও গৃহলক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মা জগত-জননী! মা সর্ব্বমঙ্গলে!

ভগবতী। তুমি বাছা! কেন আমাকে ডেকেছ। আমি যেখানে থাকি ভক্তের আহ্বানে আমার হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ আহ্লাদিত হয়। আমি আনন্দে অধীরা হই। তোমার আহ্বানে এবং তোমার পুত্র নির্ম্মলের স্তবে আকর্ষিত হয়ে কৈলাস থেকে এসেছি।

লক্ষ্মী। মা! তুমি যেমন আনন্দময়ী, তেমনই দয়াময়ী। মা! আজ তোমার দুই ভক্ত পরিবারের পুত্র-কন্যার শুভ বিবাহ। তুমি তাহাদের শিওশিরে তোমার পবিত্র নির্ম্মাল্য দিয়া শুভ পরিণয়-মালা তাহাদের কণ্ঠে প্রদান কর। মা! আমি এই দীন পরিবারের পর্ণগৃহের দীনা গৃহলক্ষ্মী। আমি তোমার কন্যাদের মধ্যে পর্ণগৃহবাসিনী হইলেও আমার হৃদয়ে শান্তি, সংসারে কীর্ত্তি আছে। আমার পুত্রগণ পুরুষানুক্রমিক সরল। ইহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে, দ্বেষ নাই। শান্তি আছে লোভ নাই। পরহিতৈষিতা আছে, পরশ্রীকাতরতা নাই, বরের প্রপিতামহ একজন বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাবজাত শিল্পী ছিলেন। তাঁহার পিতামহের তেজস্বিতা, দানশীলতা ও পরহিতৈষিতা এদেশে প্রবাদের মত প্রচলিত। কন্যাও এদেশের একটি প্রাচীন বিখ্যাত পবিত্র বংশের দুহিতা,— পবিত্রা পারিজাত মালা। তাহার পিতাও সুশিক্ষিত সদাশয় সহৃদয় ব্যক্তি। মা! দুইটি প্রধান মহৎ কুল, দুইটি মহৎ রক্ত, এই শুভ পরিণয়ে সম্মিলিত হচ্ছে। এই সম্মিলিত পুষ্প-চন্দন তোমার চরণে অর্পণ করলাম।

গীত

(১)

দেও মা! আনন্দময়ি! দেও মা চরণাশ্রয়
যুগল সন্তানে তোমার এ শুভ বিবাহ দিনে!
তুমি মা! সর্ব্বমঙ্গলা, শুভ পরিণয় মালা,
গাঁথিয়া মঙ্গল করে দেও গলে শুভক্ষণে!

(২)

সংসার বিঘ্ন সাগরে, রাখিও অভয় করে,
বরষি বরদ করে সুখ-শান্তি স্নেহ মনে।
যেন কর্ণফুলী মত বহে সুখ-স্রোত শত
দীনা জন্মভূমি বক্ষে এই শুভ সম্মিলনে।

(৩)

গঙ্গা যমুনার মত হয় যেন পরিণত
এ মিলন মহাতীর্থে এই ভিক্ষা ও চরণে।
রোগ, শোক, দুঃখতার হরি পার্ব্বতী মাতার,
বহে যেন মা! তোমার প্রেম সাগর-সঙ্গমে!

ভগবতী। বাছা! আমি জানি দুইটি পরিবার আমার পুরুষানুক্রমিক ভক্ত, দুই গৃহই আমার ভক্তি-তীর্থ। আমি এই গৃহে দশভুজারূপে নিত্য বিরাজিতা। এই শুভ বিবাহ আমারই অভিপ্রায়ে প্রজাপতি সংঘটিত করেছেন। আমি নিজ করে এই মঙ্গলমালা গেঁথে এনেছি। লও বাছা! ইহা গ্রহণ কর (মালা অর্পণ)। এই মালার সূত্র প্রেম, ইহার অনন্ত ফুল অনন্ত সুখ, ইহার সুশীতল সৌরভ কীর্ত্তি। এই মালা পুত্র-কন্যার গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাদের শিরে এই পারিজাত কুসুম-রাশি (পুষ্পপাত্র অর্পণ) বর্ষণ করিও। আশীর্ব্বাদ করি দুই মহৎ রক্তের সম্মিলন চট্টল ইতিহাসে মহাতীর্থ বলিয়া পূজিত হউক।

গীত

(১)

লও মা ! মঙ্গলডালা, লও মা ! মঙ্গলমালা,
গাঁথিয়াছি পারিজাতে সিক্ত মন্দাকিনী জলে।

(২)

প্রেম-সূত্র এ মালার, সুখ-শান্তি পুষ্প তার,
গেঁথেছি অনন্ত সূত্রে, গেঁথেছি অনন্ত ফুলে।
কীর্ত্তি তার সুসৌরভ, পুণ্য তার সুধা সব
চর্চ্চিত চন্দনে—মম চির কৃপা—হে সরলে।

(৩)

এই মালা পরাইয়া, পারিজাত বরষিয়া,
বাঁধি চির প্রেম-হারে বসাইও মম কোলে !
অভয় বরদ কর রাখি শিরে নিরন্তর
রাখিব মায়ের মত চোখে চোখে পলে পলে।

(ভগবতীর বিকট মূর্ত্তি অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হাঁরে বেটি ! তুই এত্‌না দেড়ি কর্ত্তে আছিস্, আর তোর বাপ হুঁয়া বটুকে বটুকে কাঁদতে আছে।

ভগবতী। দূর পোড়ারমুখো ! আমার বাপ কি রে, তোর বাপ বল ?

অনু। আচ্ছা ! আচ্ছা ! হামার বাপ ত আছেই। যে ছলকের বাপ, তবে তোর বাপ হইল না ? তুই ছলকের মা ! তুই তবে তার মা হইলি না ? হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে, কেমন নাই ঠিক ? হা ! হা ! হা ! (হাস্য)

ভগবতী। বুদ্ধি তোর মাথা আর তোর মুণ্ড ! যেমন রূপ-খানি তেমন বুদ্ধিখানি। পোড়ারমুখো আমাকে এখানে জ্বালাতে এলো (লক্ষ্মীর প্রতি) মা ! এটা বাঙ্গালা দেশের হিন্দুস্থানী দরওয়ানের ভূত।

অনু। আমি পোড়ারমুখো নহি, কেমন সুন্দর-মুখো। হা ! হা ! হা ! (হাস্য) হামি আছিবার ছমে ভোলা কহিল কি হামি ছিদি ছুট্‌তে বহলাম, তুই ভগবতীকে শীগ্‌গির নিয়ে আছবি। তুই ত নাই এত্‌না দেড়ি কর্‌লি, ভোলা ছিঙ্গ খোটার ডাণ্ডা দিয়া আমার ছির তুড়িয়া দিবে। হামার বুদ্‌ধি আছে, হা ! হা ! হা ! (হাস্য)

ভগবতী। নারে, আমি পুত্র-কন্যার বিবাহ উৎসব ছাড়িয়া যাইতে পারব না। তুই যা।

অনু। ঠিক কথা ! তুই এখানে পূজা খা, আর হামি হেথানে ডাণ্ডা খাই। সাদি বাড়ীতে আছিয়া হামি কুচ খাইতেভি পাইলাম না, ক্ষুধায় হামার পেটটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া যাইতে আছে। তোর ছিংহ বেটা ক্ষুধায় (মুখ ভঙ্গি করিয়া) হমহাম কর্ত্তে আছে। যেত হামার মুণ্ডটা খাইয়া ফেলিতে চাহে। হামারে মুণ্ড ছাড়া দেখলে তোর অপ্সরাগণ সাদি করেগা কি ? হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে। হা ! হা ! হা ! (হাস্য)

ভগবতী। অপ্সরাগণের ত আর মরবার স্থান নাই, তাই এমন গুণধরকে বিবাহ করবে। বটে তোর ক্ষুধা পেয়েছে ? (গৃহলক্ষ্মীর প্রতি) মা ! এটাকে কিছু খাবার দাও ত ! (গৃহ-লক্ষ্মীর একদোনা সন্দেশ প্রদান) তুই সব খাস না। সিংহকে নিয়ে আছেক দে।

অনু। আমি তোর বাপ হিমালয়, হামার উদরটা একটা গহ্বর। আমি আগে এটা পূরণ করি হামার বুদ্‌ধি আছে, হামার বুদ্‌ধি আছে ; হা ! হা ! হা ! (হাস্য ও দাঁত বাহির করিয়া মুখভঙ্গি করিয়া সন্দেশ খাওয়া) বহুত আচ্ছা ! এখন ছিংহমামার লিয়ে এই কেলাপাতটা লিয়া যাই। (উঠিতে উঠিতে উদরভারে ২৩ বার পড়িয়া যাওয়া) ছিংহমামার চৌদ্দপুরুষেও কখন কেলাপাত খায় নাই ! হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে। হা ! হা ! হা ! (হাস্য) বম্ ভোলানাথ ! বম্ বম্। বর কন্যাকি জয় ! হামার পেটের জয় ! বম্ বম্ ! হামি একটি গীত গাইব, মাই তোরা শুন,—(পাছাতে হাতে তাল দিয়া মাথা নাড়িয়া নৃত্য ও গীত)

এক ছচুয়া পিয়াথা ছচুর কি বাড়ী
এক ছচুয়া পিয়াথা ছচুর কি বাড়ী
এক ছচুয়া পিয়াথা ছচুর কি বাড়ী
এত্‌না বড়া পেট আউর এত্‌না লম্বা দাড়ী।

ভগবতী। পোড়ারমুখো ! এখনো গেলি নে। (লক্ষ্মীর প্রতি) মা ! ত্রিশূলটা নিয়ে আয় ত !

অনু। দোহাই মাই তোর ! তুই লাঠি মার, ডাণ্ডা মার, তোর ওই তিন শূলটা মারিস্ না। তার এক খোঁটায় তিন খোঁচা লাগে হামার পেটটা কাটিয়া যাবে। হামি চল্‌লাম।

গীত

এক ছচুয়া পিয়াথা ছচুর কি বাড়ী (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ গীত গাইতে গাইতে পেট দুলাইয়া প্রস্থান)

ভগবতী। দেখ'ল মা ! এ সব ভূত নিয়ে আমার সংসার।

লক্ষ্মী। তা ত ঠিক মা ! পঞ্চভূত নিয়েই তোমাদের সংসার।

তৃতীয় অঙ্ক

(বর আসীন। অপ্সরাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

"সুখের রাতি,   জ্বাল হে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়ে,   খোঁটা ফেলি দিয়ে,
গাঁথহে চিকণ মালা।
অগুরু চন্দন,   কুসুম আসন,
সুপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা,   কুসুম বিছানা,
রাখহে কদম্বের ডাল।

সুবাসিত বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহ শীতল করি।
পিক শুক সারি, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জ বসুক ঘেরি।"

১ম অ। আয়ুষ্মান! আমরা ত্রিদিবের অপ্সরা। আপনাদের সর্ব্বমঙ্গলা কুল-মাতা দশভুজা দেবী আপনার শিশু হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়া শুভ নির্ম্মাল্য স্বরূপ এই পারিজাত-হার আপনার ও মা চপলার শুভ পরিণয়ের জন্যে আপনার গৃহলক্ষ্মীমাতার করে অর্পণ করেছেন। জননী কৈলাসে বসে স্বীয় পবিত্র করে নন্দনজাত কুসুমে এই মালা গেঁথেছেন। জননী আশীর্ব্বাদ ক'রে শ্রীমুখে বলেছেন এ মালার অনন্ত-পুষ্প অনন্ত-সুখ-শান্তির নিদান হবে এবং এই পরিণয়ের দ্বারা এই কুল-গৌরব ও কুলশ্রী বর্দ্ধিত হবে। জননী ও আপনার গৃহলক্ষ্মী অন্তরীক্ষে থেকে আপনার শুভ-বিবাহ দর্শন করবেন। আপনি এই মালা গ্রহণ করুন। (মালা প্রদান)

বর। কুলমাতা ও গৃহলক্ষ্মী মাতার শ্রীচরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। (মালা গলায় ধারণ)

১ম অ। জননীর আজ আনন্দের সীমা নাই। জগত-জননীর আনন্দে আজ জগত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে।

গীত

আনন্দ উছলি যায় নিশামণি কিরণে,
আনন্দ উছলি যায় নীলিমায় গগনে।
নব বসন্তের বায়
আনন্দে বহিয়ে যায়,
তুমি মনোরম শোভা কুসুমিত কাননে,
আনন্দে দেবতাগণ করে পুষ্প বরিষণ,
নব দম্পতির শিরে প্রীতিফুল্ল বদনে।
১ম অ। চল্ সখি চল্, দেখকি নির্ম্মল
নব বসন্তের চাঁদিনী হাসি!
গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে
তুলি কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম রাশি।
প্রথম বসন্ত, প্রথম ফুটিত
ফুলের বহিয়া প্রথম ঘ্রাণ।
প্রথম মলয় কি মধুরে বয়
গাইছে কোকিল প্রথম গান।
বসন্ত পঞ্চমী বঙ্কিম চাঁদনি
নির্ম্মল চন্দ্রের নির্ম্মল হাসি।
বড় শুভ নিশি শুভ তিথি মিশি
কিবা পুণ্যক্ষণ উঠিছে ভাসি
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাশি।
চপলা সকাশি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি।
নবীন আকাশে প্রীতির আবাসে
কি শোভা হইবে এ মধুমাসে,
যখন অচলা নির্ম্মলা চপলা
শোভিবে নির্ম্মল চন্দ্রের পাশে!
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাশি।
চপলা সকাশি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি।

গীত

"কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনি
আয়লো সজনি!
দুকূল ভরিয়ে কুসুম তুলিয়ে সাজাব কামিনী—
—বালা বিনোদিনী—
চললো রঙ্গিনি! আয়লো সজনি!
প্রকৃতি হাসিয়ে চায়,
সুষমা ঝরিছে তায়।
ধীর মলয় বয়, আকুল করে হৃদয়,
ফুলের মাঝে, ফুলের সাজে, ফুলের কামিনী—
সাজাব রমণী,
চললো রঙ্গিনি! আয়লো সজনি!"
যবনিকা পতন।

তটিনী

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

নিঠুর পাষাণ-বক্ষ বিদারিয়া কবে
হে তটিনি উচ্চারিলে আগমনী-গান?
শৃঙ্গ হ'তে শৃঙ্গ চুমি তব অভিযান
ধরণীর বুকে নামে। যৌবন-উৎসবে
মেতে ওঠে ধরণীর বিশুষ্ক পরাণ;
দিকে দিকে সবুজের গৌরব-গরবে
ভরী তারা ধরণীর দেহখানি শোভে;
সাজাইয়া সাজি গাহি কুলু কুলু গান
চলেছ নটিনী বেশ। দিবস শর্ব্বরী
কল্লোলিত জলবক্ষে তরঙ্গ-লীলায়
রৌদ্রে মেঘে নিত্য নব পরি নীলাম্বরী
স্বর্গের সীমান্ত হ'তে ধরার সীমায়
খেলিতেছ অবিরত ক্ষুদ্র রূপ ধরি
অসীমের খেলাটুকু শীর্ণ রেখায়।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম. এ.

যে যুগে ভারতের প্রতি ধূলিকণায় স্বর্ণকণা লুক্কায়িত ছিল, যে ভারতের সোনার অন্ন সারা বিশ্বে বিতরিত হইত, ভারতের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগেরও বহুপূর্ব্বে উপনিষদের ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল "অন্নং বহু কুর্ব্বীত"। ইহা "Grow more food"এর ন্যায় নিরর্থক নির্দ্দেশ নহে। ইহা দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন ভারতীয় ঋষিগণের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির পরিচায়ক। এদেশে একদিন অন্নসমস্যা যে প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে তাহা যেন তাঁহারা দিব্যজ্ঞান সহায়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে "যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ" যে-কোন উপায় অবলম্বন করিয়া হোক প্রভূত অন্ন অর্জ্জন করিতে হইবে ইহাও আরণ্যক ঋষির অনুজ্ঞা।

অন্নের সংস্থান—ব্যক্তিগত ভাবেই হোক, কিংবা জাতিগত ভাবেই হোক কর্ম্মসম্ভূত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ইহারই ইঙ্গিত যেন গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকে রহিয়াছে।

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥" গীতা ৩।১৪

অর্থাৎ "প্রাণিদেহের উদ্ভব অন্ন হইতে, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি; বৃষ্টির সৃষ্টি যজ্ঞ হইতে আর সেই যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা সম্পাদিত হয়।" অন্ন অর্জ্জন করিতে হইলে কর্ম্মের প্রয়োজন, প্রয়াসের প্রয়োজন—উহারই আভাস প্রতিফলিত হইয়াছে "যয়া-কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।"—এই উক্তিতে।

যে অন্নকে প্রভূতরূপে অর্জ্জন করিতে হইবে, বহুধা অর্জ্জন করিতে হইবে সেই অন্নের উৎপত্তি, তথা অন্নপ্রশস্তি উপনিষদ-সমূহে যেভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক।

অন্নের উৎপত্তি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যাইতেছে:

ঐতরেয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"—অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে মাত্র আত্মারই অস্তিত্ব ছিল। জগৎস্রষ্টা ভাবনা করিলেন জগৎসৃষ্টি করিবেন কিনা। যথা—

"স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।"

অতঃপর পরমাত্মা জগৎ সৃজনের সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে অম্ভম্, মরীচী, মর ও আপ সৃষ্টি করিলেন। অম্ভস্ লোকাশ্রয়ী স্বর্গোপরি, অন্তরীক্ষ বা মধ্যদেশ মরীচী; পৃথিবী মর এবং সর্ব্বনিম্ন আপ্।(১)

ক্রমান্বয়ে তিনি জল হইতে পুরুষ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি করিবার উপাদান গ্রহণ করিয়া ইহার আকৃতি প্রদান করিলেন। অতঃপর সৃষ্ট পুরুষের অণ্ডবৎ বিদীর্ণ মুখের উৎপত্তি হইল ("মুখং নিরভিদ্যত যথাণ্ডম্")। এই মুখ হইতে বাক্, বাক্ হইতে অগ্নি—এইরূপে নিশ্বাস-বায়ু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সব কিছুই সৃষ্ট হইল। সর্ব্বপ্রথম পুরুষকে স্রষ্টা "ক্ষুধা ও তৃষ্ণার" অধীন করিয়া সৃষ্টি করিলেন। যথা :—

"তমশনায়া পিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ"

"ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা" এই দুইটি প্রবৃত্তি জগৎস্রষ্টার নিকট আশ্রয়স্থল যাচ্ঞা করিলে পরমাত্মা আত্মসৃষ্ট দেবগণের মধ্যে তাঁহাদের অংশভাক্ রূপে ইহাদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করিলেন। ফলে দেবগণকে হবিঃ প্রদান করিলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাও ইহার অংশভাগী হইলেন।(২)

অতঃপর জগৎস্রষ্টা চিন্তা করিলেন সকল লোকপালের নিমিত্ত অন্ন সৃষ্টি করিবেন। তিনি জলকে উদ্দেশ্য করিয়া ধ্যান করিলে পর যে মূর্ত্তির উৎপত্তি হইল ইহাই "অন্ন"। যথা

"সোঽপোঽভ্যতপৎ তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্ত্তি রজায়ত।
যা বৈ সা মূর্ত্তি রজায়তান্নং বৈ তৎ।"

ঐতরেয়োপনিষৎ ১।৩।২

সৃষ্ট হইবার পর অন্ন পশ্চাদভিমুখী হইয়া পলায়নপর হইলে প্রথম সৃষ্ট পুরুষ বাক্যের দ্বারা তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বাক্যের দ্বারা ইহাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। যদি বাক্যের দ্বারাই অন্নকে আবদ্ধ করিতে পারিতেন তবে লোকে অন্ন সম্বন্ধে কেবলমাত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারিত।

অতঃপর তিনি অন্নকে ঘ্রাণের দ্বারা আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ইহাতেও অপারগ হইলেন। ঘ্রাণের দ্বারা খাদ্যকে আবদ্ধ করিতে পারিলে লোকে কেবলমাত্র খাদ্যের ঘ্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত হইত। এই রূপে চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, মন প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্নকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা অকৃতকার্য্য করিয়া হইলেন। শুধু ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারাই যদি খাদ্যকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন তবে লোকে খাদ্যকে, চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করিয়া, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ করিয়া কিংবা মনদ্বারা চিন্তা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারিত।(৩)

---

(১) স ইমাং লোকান সৃজত।
অম্ভো মরীচী মর্ম্ম রমাপোঽদ্ যোঽম্ভঃ পরেন দিবং দ্যৌঃ
প্রতিষ্ঠাঽন্তরীক্ষং মরীচয়ঃ।
পৃথিবী মর যা অধস্তাৎ তা আপঃ।

ঐতরেয়োপনিষৎ ১।১।২

(২) * * * তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে
ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়া পিপাসে ভবতঃ।

ঐতরেয়োপনিষৎ ১,২।৫

(৩) "তৎপ্রাণেন," "তচ্চক্ষুষা",
"তচ্ছ্রোত্রেণ," "তত্ত্বচা" "তন্মনসা" ইত্যাদি

ঐতরেয়োপনিষৎ ১।৩।৪—৮

অতঃপর প্রথম জাত পুরুষ অপান অর্থাৎ মুখবিবরদ্বারা নিম্নগামী নিশ্বাস-বায়ুর সাহায্যে অন্নকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে সফলকাম হইলেন। এই নিঃশ্বাস-বায়ুই অন্নভুক ; এই বায়ুই অন্নদ্বারা জীবন ধারণ করে অর্থাৎ এই বায়ুই অন্নায়ু যথা :—

* * * স এষোঽন্নস্য গ্রহো

যদ্বায়ুরন্নায়ুর্বা এস যদ্বায়ুঃ।

ঐতরেয়োপনিষৎ ১।৩।১০

এইরূপে যে অন্নের উৎপত্তিক্রিয়া জগৎস্রষ্টা কর্তৃক সম্পন্ন হইল সেই অন্ন হইতে বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, জগৎ এবং জগতে সংজ্ঞার উদ্ভব হইল। এই সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

* * * অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকালোকেষু চ নাম চ। (প্রশ্নোপনিষৎ ৬।৪)

জগৎ তথা জীবদেহের উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ এবং মন্ত্র, কর্ম্ম, বীর্য্য ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের উদ্ভবের হেতু যে অন্ন, ঋষিকণ্ঠে উচ্চারিত সেই অন্ন-প্রশস্তি প্রণিধানযোগ্য। তৈত্তিরীয়োপনিষদুক্ত এইরূপ একটি অন্নস্তুতি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।

যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।

অথো অন্নেনৈব জীবন্তি।

অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।

অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্।

তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে।

সর্ব্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি।

যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।

অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্।

তস্মাৎ সর্ব্বৌষধমুচ্যতে।

অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে।

জাতান্যন্নেন বর্দ্ধন্তে।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি।

তস্মাদন্নং তদুচ্যত ইতি।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২য় বল্লী। ২)

তাৎপর্য্য :—পৃথিব্যাশ্রিত সর্ব্বপ্রাণী অন্নসম্ভূত ; অন্ন অর্থাৎ খাদ্য দ্বারাই জীবকুল জীবন ধারণ করে এবং পরিণামে অন্নেই অর্থাৎ খাদ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। সর্ব্ববস্তুর মধ্যে অন্নই সর্ব্বপ্রথম জাত। অতএব অন্নই বিশ্বের ঔষধ স্বরূপ। যাহারা অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করে তাহারাই অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ অন্নই প্রথম সৃষ্ট পদার্থ এবং যাবতীয় প্রাণীগণের ও বিশ্বের ওষধি-স্বরূপ। সকল প্রাণীই অন্ন অর্থাৎ খাদ্য হইতে উৎপন্ন এবং খাদ্যদ্বারাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জীবের দ্বারা ইহা ভক্ষিত হয় এবং ইহাদ্বারা তাহারা ভক্ষিত হয়। অতএব ইহা অন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এই স্থলে "যে অন্নং ব্রহ্মোপাসতে"—এই উক্তি দ্বারা অন্নকে ব্রহ্মজ্ঞান করিবার অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ন যে ব্রহ্মস্বরূপ উপনিষদে সে সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে এখন তাহা আলোচনা করা যাক্।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভৃগুবল্লী নামক তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, বরুণ-পুত্র ভৃগু ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর নিবেদন করিলেন —"ভগবন্! আমাকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দান করুন" ("অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি")। ঋষি বরুণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি।" অর্থাৎ অন্ন, জীবন, চক্ষু, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় এবং বাক্ ইহাই ব্রহ্ম।" পিতার উপদেশে ভৃগু ধ্যানে রত হইলেন এবং অবশেষে "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"—অর্থাৎ অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। অন্নের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছিল তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে সুপরিস্ফুট।—

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।

অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

অন্নেন জাতানি জীবন্তি।

অন্নং প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তীতি।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।১

তাৎপর্য্য :—তিনি অন্নকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন। অন্ন হইতেই সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি ; অন্নজাত জীব অন্নেই বাস করে ও অন্নেই প্রত্যাবর্ত্তন এবং প্রবেশ করে।

ভৃগু যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা হইতেছে—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ। যথা :—

—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"

"প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"

"মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"

"বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"—

ইহাই ঋষির ধ্যানলব্ধ জ্ঞান। সেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় অন্নকে তুচ্ছ জ্ঞান না করিবার অনুজ্ঞাও আমরা ঋষিবাক্য হইতে প্রাপ্ত হই, যথা :—

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ।

তদ্ ব্রতম্।

প্রাণো বা অন্নম্।

শরীরমন্নাদম্।

প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্।

শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।

স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।

অন্নবানন্নাদো ভবতি।
মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন।
মহান্ কীর্ত্ত্যা।
(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৭)

তাৎপর্য্যঃ—অন্নকে অনাদর বা নিন্দা করিবে না এবং ইহাকে জীবনের ব্রত-স্বরূপ জানিবে। জীবনই অন্ন; শরীর অন্নভুক্, জীবনে শরীর প্রতিষ্ঠিত; জীবন শরীরে প্রতিষ্ঠিত; অন্ন অন্নেই প্রতিষ্ঠিত। যিনি এই তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি অন্নবান্ ও অন্নাদ; সন্তান, সম্পদ ও ব্রহ্মদীপ্তির অধিকারী এবং কীর্ত্তিমান্।

অন্নকে পরিহার না করিবার, তাহাকে ব্রত বলিয়া বরণ করিবার বিধান এবং অন্ন-মাহাত্ম্যসূচক আরো বহু শ্লোক উপনিষদে আছে। যথা—

অন্নং ন পরিচক্ষীত।
তদ্ ব্রতম্।
আপো বা অন্নম্,
জ্যোতিরন্নাদম্,
অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।
অন্নবানন্নাদো ভবতি।
মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন।
মহান্ কীর্ত্ত্যা।
(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।৮)

এই শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্য 'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ' প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকাবলীরই অনুরূপ। নবম অনুবাকে অন্ন-সম্পর্কিত যে উপদেশ পাওয়া যায় তাহা মহা মূল্যবান।

অন্নং বহু কুর্ব্বীত।
তদ্ ব্রতম্।
পৃথিবী বা অন্নম্।
আকাশোঽন্নাদঃ।
পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা।
তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।
অন্নবানন্নাদো ভবতি।...
(ইত্যাদি) ৩।৯।

প্রভূতরূপে অন্ন অর্জ্জন করিবার অনুজ্ঞা এই অনুবাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্ন সম্বন্ধে "তদ্ ব্রতম্" শুধু একথা বলিয়াই ঋষি ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি আমাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছেন:

"অন্নং ন নিন্দ্যাৎ"
"অন্নং ন পরিচক্ষীত"

আরও বলিয়াছেন—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত"।
কি কি কারণে অন্নকে উপাসনা করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে, অর্জ্জন করিতে হইবে তাহাও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা, "প্রাণো বা অন্নম্"
"আপো বা অন্নম্"
"পৃথিবী বা অন্নম্"।

কেবল তাহাই নহে—অন্নই আনন্দ, অন্নই জ্ঞান, অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন জীবনের হেতু, জীবের উৎপত্তির হেতু—আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতি সব কিছুই অন্নময়। সুতরাং "যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।"

সারা পৃথিবীতেই আজ অন্নাভাব দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে আবার এই অন্নপ্রাচুর্য্যের দেশ ভারতবর্ষেরই অংশবিশেষে অন্নহীনতা আজ চূড়ান্তভাবে দেখা দিয়াছে। এই ভারতবর্ষের ঋষিদের অন্নপ্রশস্তি পর্য্যালোচনা করিয়া আজ দুঃখের সহিত এই কথাই মনে জাগিতেছে, যে দেশের ঋষিগণ অন্নকে আনন্দময়, প্রাণময় ও ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন সেই বিরাট্ দেশেরই অংশ-বিশেষ আজ মহামন্বন্তরের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অন্নরিক্ততার শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্নকে বহুধা অর্জ্জন করিবার অনুজ্ঞা প্রাচীনকালে অবহেলিত হয় নাই। রাজর্ষি জনক ও হলধর বলরামের হলকর্ষণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কি ভাবে "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এইনীতি অনুসৃত হয় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ হইয়া আছে।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
(গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক আচরিত কার্য্য ইতর জন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া থাকে; তিনি যাহা প্রমাণ করেন অপরে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

সোনার বাংলা অন্নাহারা হইয়া প্রকৃতই নিরানন্দ দেশে পরিণত হইয়াছে। অন্নহীন দেশের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। সেইজন্যই সমগ্র বাঙালী জাতির, তথা ভারতবাসীর কণ্ঠে আজ এই বাণীই সর্ব্বাগ্রে সমস্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠুক—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত"।

এ যুগের তীর্থঙ্কর

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অসাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ-লাভ আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিশেষ সৌভাগ্য। তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সুযোগলাভের ত আর কথাই নাই।

জীবনে কয়েকজন অসাধারণ মানুষের সহিত এই ভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। এইরূপ দুই-এক জনের কথা আজ বলিব। ইঁহাদের এক জন হইলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। ইঁহার সহিত এক দিন সকাল সাতটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত একাদিক্রমে বার ঘণ্টা একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাটাইবার পরম সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

সে আধ বছর পনর আগেকার কথা। আমি তখন আর্যসমাজের কর্মীরূপে বাংলাদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছি। খুলনায় জানিতে পারিলাম। ফরিদপুরে গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীন উলপুরে নমঃশূদ্র ও মুসলমান কৃষকদের এক বিরাট সম্মেলন হইবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবেন।

উলপুরে উপস্থিত হইলাম। আচার্যের সহিত সাক্ষাৎ-পরিচয় হইল। শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজে বাহির হইয়াছি জানিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্য থেকে কিছুদিন পূর্বে একটি ভাল কর্মী বের হয়েছে। সে হচ্ছে প্রভাত (প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও দেশকর্মী। অধুনা বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা-সংসদের সম্পাদক)। যাক্, তোমরা কেবল সাহিত্যচর্চাই কর না। সমাজসেবাও করছ, এ বড় ভাল কথা।"

বৈকালে সম্মেলনে বহু কৃষকের সমাগম হইল। আচার্য্যদেব বলিলেন, "তোমরা সমবেত চেষ্টায় বাঁধবন্দী করে এবং নানাস্থানে লম্বা নালা বা খাল (ক্যানেল) কেটে কয়েক হাজার বিঘা জমি জলগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছ কলকাতায় বসে এ কথা শুনলাম। গবর্মেন্টের সাহায্য বিনা আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের উৎসাহহীন জনগণ নিজের চেষ্টায় যে এমন অসাধ্য সাধন করতে পারে, তা আমার বিশ্বাস হয় নি। স্বচক্ষে দেখবার জন্য তাই আমি এখানে ছুটে এসেছি।"

যে অসাধারণ মানুষটির চেষ্টায় এই অসাধ্যসাধন সম্ভব হয়, এখানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিই। তাঁহার নাম শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। সে অঞ্চলে তিনি গোপালগঞ্জের গান্ধী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু দেশে তখনও তিনি অজ্ঞাত, অখ্যাত (এখনই বা দেশে তাঁহাকে কয়জন জানে)।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুপ্রেরণায় তিনি দেশসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। কটিবাসপরিহিত, শীর্ণদেহ, স্বল্পভাষী, সুগম্ভীর মূর্তি। যেন আপনাতে আপনি সমাহিত।

লোকমুখে শুনিলাম বহুকাল ধরিয়া হাজার হাজার বিঘা জমি জলে ডুবিয়া ছিল। তাহাদের উদ্ধারের কোনো আশাই ছিল না। গবর্মেণ্ট উদ্ধার করিবে না, কোনো জমিদার করিবে না, তাহা হইলে কাহার সাধ্যে ইহা সম্ভব হইবে?

এমন সময় ঐ কটিবাসপরিহিত ফকির আসিয়া বলিলেন, —"তোমাদের সাধ্যেই এ সম্ভব হবে। সকলে মিলে চেষ্টা কর।" সকলে অবাক! এ বলে কি! পাগল নাকি? পাগল তাহাতে সন্দেহ নাই। পাগল না হইলে অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করে কে?

তিনি আর কিছু বলিলেন না। নিজেই এক দিন কোদাল লইয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। কেহ হাসিল। কেহ বিদ্রূপ করিল। ভ্রূক্ষেপ নাই। কোদাল দিয়া মাটি কাটিতেছেন!

ক্রমে দেখা গেল একটি একটি করিয়া তাঁহার সঙ্গী বাড়িতেছে। অবশেষে অনেকেই এই কাজে যোগ দিল।

ইহার পর আর এক গণ্ডগোল বাধিল। জল নিকাশের জন্য নালা বা খাল (ক্যানেল) কাটিতে হইলে অনেকের জায়গা নষ্ট হয়। জায়গা তাহারা দিতে নারাজ। এক হাত জায়গার জন্য ভাই ভাইয়ের মাথা কাটায়। আর নিজের জমিতে পরের জন্য খাল কাটিতে দিবে কে?

নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীর জমি। উভয়েই দুর্দান্ত। কথায় কথায় খুন করিয়া বসে। জমির উপর কোদাল বসাইতেই লাঠিসোঁটা সড়কি লইয়া তাহারা উপস্থিত— "খবরদার! মাথা কাটাবো!"

—"কাটাও!" নির্ভীক অবিকৃত মুখে উত্তর দিলেন গোপালগঞ্জের গান্ধী।

সে মুখের দিকে চাহিয়া আর মাথা কাটানো সম্ভব হইল না। লাঠিসোঁটা ফেলিয়া যাহার জমি সেও খাল কাটিতে লাগিয়া গেল।

এইরূপে এক দিন নয়, দিনের পর দিন, প্রতি দিন, প্রতি-মুহূর্তে আঘাতকারী, হত্যাকামীর অস্ত্রের নীচে শির পাতিয়া দিয়া (নিজের) অক্রোধের দ্বারা (পরের) ক্রোধকে জয় করিয়া গোপালগঞ্জের গান্ধী তাঁহার কার্য করিয়া যান।

ক্রোশব্যাপী একাধিক দীর্ঘ প্রণালিকা (ক্যানেল) খনন করিয়া ও বিরাট বাঁধ বন্ধনের দ্বারা চন্দ্রনাথ বসু নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষীর সাহায্যে হাজার হাজার বিঘা জমি উদ্ধার করিলেন। সমবেত চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হইল।

সে অঞ্চলের কৃষকশ্রেণীর নিকট তিনি দেবতা। তাঁহার কথা সকলে দৈববাণীর ন্যায় গ্রহণ করে। শুনিলাম মামলা-মোকদ্দমা আদালতে যায় না। উভয় পক্ষ তাঁহার বিচারই শিরোধার্য করে। হত্যাকারী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া আত্ম-

পাপ প্রকাশ করে। পুত্রশোকাতুরা জননী তাঁহাকে দেখিয়া শান্তি পায়।

স্বল্পভাষী পুরুষ। তিন দিনের মধ্যে তাঁহার অতি অল্প কথাই শুনিয়াছিলাম। এক দিন তিনি বলিলেন, "এই কর্মের মধ্য দিয়ে কৃষকগণের অস্পৃশ্যতাদি বাছবিচার বিনা চেষ্টায় আপনি অন্তর্হিত হয়েছে। দিনের পর দিন যখন ঐ বাঁধ বন্ধন ও খাল কাটার কাজ চলতে থাকে তখন হিন্দু মুসলমান কৃষকগণ একত্রে এক পঙ্‌ক্তিতে সকলের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেছে। রাত্রে উন্মুক্ত স্থানে একত্রে পাশাপাশি শয়ন করেছে।"

উলপুরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রে সেখানকার অধিবাসিগণ 'প্রফুল্লজয়ন্তী'র আয়োজন করেন। পূর্ববঙ্গের নমঃশূদ্র সমাজের বিশিষ্ট নেতাগণ আচার্যের এই সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন প্রফুল্লচন্দ্র চন্দ্রনাথ বসুর ক্যানেলসমূহ পরিদর্শন করিতে বাহির হইলেন। একটি নৌকায় আচার্য, তাঁহার দুই ছাত্র ও আমি এবং অন্য আর একটি নৌকায় যশোহর জেলার নড়ালের জমিদার-ভ্রাতৃদ্বয় আশ্রয় লইলেন। চন্দ্রনাথ কখনো আমাদের নৌকায় কখনো বা নড়ালের নৌকায় কখনো বা গ্রামবাসিগণের সঙ্গে ক্যানেলের ধারে ধারে চলিতে থাকেন। কর্মী মানুষ এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারেন না।

গ্রামবাসিগণের সেদিন কি উৎসাহ! কি আনন্দ! দলে দলে হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, শিশু আচার্য-সন্দর্শনে আগমন করিতেছে। এক দিকে চন্দ্রনাথ অন্য দিকে প্রফুল্লচন্দ্র। আজ তাহারা ব্রহ্মাবিষ্ণুকে যেন একত্রে পাইয়াছে।

গরীব তাহারা। আচার্যের মত বড়লোককে তাহারা কি দিবে! আকুলভাবে সকলে এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। আচার্য্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, "কিছু না! কিছু না! মুড়ি আছে তো? মুড়ি দাও। আমি মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।"

তাহারা অবাক! প্রফুল্লচন্দ্র মুড়ি খাইবেন! ধামা ধামা মুড়ি আসিতে লাগিল! অত খাইবে কে? তবু প্রত্যেক ধামা হইতেই কিছু কিছু মুড়ি লইতে হইল। তাহা না হইলে তাহারা ক্ষুণ্ণ হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের পাল্লায় পড়িয়া নড়ালের রাজাকেও মুড়ি খাইতে হইল। আচার্য চাষীদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখ দেখ! তোমাদের রাজা মুড়ি খাচ্ছে!"

বাস্তবিক মুড়ি খাইয়া এত আনন্দ আর কোনো দিন পাই নাই। আচার্যের সেদিন কি অপূর্ব রূপই না দেখিয়াছি! এক এক মুঠা মুড়ি মুখে পুরিতেছেন, আর সমস্ত মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিতেছে। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "দেখ দেখি! এমন মিষ্টি জিনিষ! আর তোমরা কিনা এ সব ফেলে বিস্কুট খাও! মুড়ি দিয়ে নারকেল, এমন খাদ্য বিস্কুটে পাবে?"

বলা বাহুল্য সে স্থানে নারকেলের অভাব ছিল না। মুড়ির সহিত নারকেলও যথেষ্ট জুটিয়াছিল।

শুধু কি তাই! তাহার উপর আবার দই! তাহাও আবার যে-সে দই নয়—নড়ালের রাজবাড়ীর দই। দুধকে ক্ষীর করিয়া দই পাতা হইয়াছিল। যেমন তাহার রং তেমনি তাহার গন্ধ। স্বাদের তো কথাই নাই। সুতরাং আমাদের আহারের আয়োজন সেদিন ভালই হইয়াছিল। সমস্ত দিন আমাদের ঐরূপ আহার চলিল।

ইহা শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন আমরা কেবল আহারই করিতেছিলাম।

সারাদিন নানা প্রসঙ্গে নানারূপ আলাপ চলিতেছিল। প্রথম হইতেই বলি,—

নৌকায় আচার্যের জন্য একটি ছোট্ট কুঠরি ছিল। তাঁহার দুই ছাত্র ও আমি সকালে সেই কুঠরিতে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, "যাও এবারে তোমরা সব বাইরে যাও। এখন আমি কাজ করবো।"

আমরা বাহিরের বড় কুঠরিতে বসিলাম। ছাত্র দুইটি আমাকে ধরিয়া বসিলেন—"রবীন্দ্রনাথের কথা বলুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাঁর কোন্ কথা শুন্‌তে চান —একটা কিছু নির্দিষ্ট করে বলুন।"

তখন এক জন বলিলেন, "তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা বলুন।"

আর এক জন বলিলেন, "ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কিরূপ—সে সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চাই। আচ্ছা, তিনি কি ছাত্রদের সঙ্গে মেশেন?"

প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইলাম। ছাত্রদের লইয়াই তো তাঁহার জীবন কাটিল। নিজের ছাত্রাবস্থার কথা আরম্ভ করিলাম:—আমি তখন দশ বৎসরের বালকমাত্র। একেবারে অজপাড়াগাঁয়ের পাঠশালা হইতে আসিয়াছি। ছাপার অক্ষরে কাহারও নাম দেখিলেই তাঁহাকে দেবতা মনে করি। শান্তিনিকেতনে আসিবার পূর্বেই ছাপার অক্ষরে রবীন্দ্রনাথের নাম দেখিয়াছিলাম। তাঁহার কবিতাও পড়িয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম। ছাপার অক্ষরে নাম বাহির হয়—পদ্য রচনা করিতে পারেন, এমন লোকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি! হয় ত শীঘ্রই তাঁহাকে দেখিতেও পাইব।

তাঁহাকে দেখিতে পাইব—ইহাই তখন আমার নিকট আশাতিরিক্ত। তাঁহার সহিত আলাপ হইবে—এতদূর ভাবনাও কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার নূতন বন্ধুগণকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা তাঁকে দেখেছ?

তাহারা শুনিয়া বলিল—দেখি নাই! রোজ সব সময় দেখছি। তিনি আমাদের ক্লাস নেন। বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যান। রাত্রে নাটক করান, গল্প বলেন।

আমি ত অবাক! ইহারা বলে কি! বোকার মত আবার প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—রবিবাবু তোমাদের ক্লাস নেন?

তাহারা বলিয়া উঠিল—রবিবাবু বলে নাম ধর কেন? গুরুদেব বল।

এক জন বলিল, ক্লাস নেন কিনা কালই দেখতে পাবে। আমাদের কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না!

ধীরে ধীরে নিজেই সব প্রত্যক্ষ করিলাম। সকালে তাঁহার সারা সকাল ক্লাস। দুপুরে সেই ক্লাসের জন্ত তৈরি হওয়া। সন্ধ্যায় ছেলেদের ঘরে গিয়া নাটকের মহড়া। শুইবার আগে এক এক ঘরে পালাক্রমে গল্প!

ক্লাস লওয়া অপেক্ষা ক্লাসের পাঠ্যবিষয় প্রস্তুত করিতেই তাঁহার বেশী সময় যাইত। পাঠ যাহাতে ছাত্রদের নিকট সরল, সহজবোধ্য এবং চিত্তাকর্ষক হয়, তাহার জন্ত তাঁহার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। তাহার ফলও অদ্ভুত হইয়াছিল। যে সব ছাত্র অন্ত শিক্ষকদের ক্লাস ফাঁকি দিত, রবীন্দ্রনাথের ক্লাসে তাহাদের নিয়মিতভাবে দেখা যাইত। অন্ত শিক্ষকরা যাহাদের মূর্খ বলিতেন, যাহাদের কিছু হইবে না বলিয়া আশা ছাড়িয়া দিতেন; তাঁহার ক্লাসে গিয়া তাহাদের আশ্চর্য উন্নতি লক্ষিত হইত।

আমি এই পর্যন্ত বলিয়াছি, এমন সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আমাদের পাশে বসিয়া পড়িলেন। আমাকে থামিতে দেখিয়া বলিলেন, বল বল! আমিও শুনতে এলাম।

আমি পুনরায় বলিতে লাগিলাম—সন্ধ্যাবেলায় তিনি আমাদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন। তাঁহার রচিত 'হাস্য-কৌতুকাদি' পুস্তক হইতে আমরা আমাদের অভিনয়ের বিষয় নির্বাচন করিতাম। তিনি বলিতেন কেবল তাঁহার নাটক অভিনয় করিলে চলিবে না। আমাদিগকে নাটক রচনা করিতে হইবে। আমরা ত অবাক! তিনি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। আমাদের দিয়া নাটক রচনা করাইয়া ছাড়িলেন। শেষে বেশীর ভাগ আমাদের রচিত নাটকই আমরা অভিনয় করিতাম।

তাঁহার দ্বারা এইভাবে আমাদের রচনাশক্তিরও উদ্বোধন হইল। ঘষিয়া-মাজিয়া আমাদের অনেককেই তিনি লেখক, কবি, নাট্যকার করিয়া তুলিলেন।

রাত্রে শয়নের পূর্বে তিনি আসিয়া গল্প বলিতেন। যে দিন যে ঘরের ছেলেদের গল্প শুনিবার পালা, সে দিন ঠিক নিয়মিত সময়ে তিনি সেই ঘরে আসিতেন। এক জন তাঁহার বিছানা বিছাইয়া দিত। তিনি তাহার উপর বসিয়া, আমাদের লইয়া গল্প বলিতেন।

তাহার পর, সকলে ঠিকমত বিছানা পাতিয়া শুইয়াছে কিনা, মশারি খাটাইয়াছে কিনা, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা দেখিয়া বেড়াইতেন। শীতকালেও জানালা বন্ধ করিবার উপায় ছিল না। বন্ধ বাতায়নের কপাটে করাঘাত হইত। কপাট খুলিতেই হইত।

এখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি আশ্চর্য! এইভাবে তিনি তাঁর অমূল্য সময় ছাত্রদের জন্ত দিয়েছেন! বল কি হে! তুমি যে আমায় অবাক করলে।"

সত্যই অবাক হইবার কথা। তখন পর্যন্ত দেশের অনেকেই ইহা জানিতেন না। তাই আচার্যদেবের সেই ছাত্রটি আমাকে ঐরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

ইহার পর আচার্যদেব আমাদের কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

খালের মধ্য দিয়া মন্থরগতিতে নৌকা চলিতেছে। দুই পাশে জনতার অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা। গ্রামের পর গ্রাম আসিতেছে। কখনো বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছি। কখনো বা ভিতরে আচার্যের আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া আছি। সহজ, সরল সদানন্দ মূর্তি।

পোষাকে, পরিচ্ছদে, আহারে, বিহারে, সর্ববিষয়ে সহজ অনাড়ম্বর পুরুষ। মনে আছে, প্রথম দিন প্রাতে যখন উলপুরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—"আপনার আহারের কি ব্যবস্থা হবে?" তিনি বলিলেন, "কিছু না মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত।" ডাল না, অন্ত কোন তরকারি না, অতিথিসৎকারের কোন কষ্ট নাই, পূর্ববঙ্গে অতি সুলভ মাগুর মাছের ঝোল হইলেই তাঁহার চলিয়া যাইবে। বাসস্থানের জন্তও কোন হাঙ্গামা নাই। আসিয়া অবধি এই একখানা সামান্ত নৌকাতেই বাস করিতেছেন।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম—নিজের কাপড় জামা তিনি নিজেই কাচিয়া থাকেন। বলিলেন, "ধোপার বাড়ী হতে যত রোগ ছড়ায়। সামান্ত দুখানা কাপড় জামা তা আবার ধোপার বাড়ী দিয়ে রোগ সঞ্চয় করি কেন? নিজেই কেচে নিই।"

কথায় কথায় আমাদের সমাজের অস্পৃশ্যতাদি দুর্নীতির কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, "জাতিভেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্পৃশ্যতাদি বিষ আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করে আমাদের যে কি সর্বনাশ করেছে তা বলে শেষ যায় না। এর জন্ত আজ সাড়ে সাত শ' বছর স্বাধীনতা হারিয়ে আমরা বিদেশীর জুতার নীচে পড়ে আছি। কত মার, কত লাঞ্ছনা ভোগ করছি। এই পাপ দূর না হলে জাতিগঠন সম্ভব হবে না! আমি এই তথাকথিত 'বর্ণাশ্রম' বিশ্বাস করি না। হিন্দু-ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এই অভিশাপ নাই। ভারতের পাশেই রয়েছে চীনদেশ, যেখানে ৪৫ কোটি লোকের বাস, সেখানে গত তিন হাজার বছরের মধ্যে অস্পৃশ্যতার কোন চিহ্নই কেউ দেখতে পায় নি। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এখন প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করা দরকার।"

এই ভাবে সাধারণ বেশধারী সেই অসাধারণ পুরুষের মহিমাময় সংসর্গ ও বিচিত্র বাক্যালাপের মধ্য দিয়া আমাদের সময় অতি আনন্দে অতিবাহিত হইল।

আজ রাত্রেই আচার্যদেবকে কলিকাতা ফিরিতে হইবে। নৌকা ফিরাইয়া সন্ধ্যা সাতটার সময় সকলে ষ্টীমার-ঘাটে উপস্থিত হইলাম। বিদায়ের পূর্বের দৃশ্য আজিও ভুলিতে পারি নাই। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি চন্দ্রনাথের অপূর্ব ভক্তি এবং চন্দ্রনাথের প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অপরিসীম স্নেহ তাঁহাদের পরস্পরের সেই বিদায়-অভিনন্দনের সময় স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল।

পরম শ্রদ্ধাভরে প্রণত হইয়া আচার্যদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত সেই আমার প্রথম ও শেষ দেখা।

নব-সন্ন্যাস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সাঁকরেলের দিকে অগ্রসর হইল—কয়েক পদ মাত্র। তাহার পর একটা ঝোপের আড়াল পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপস্রিয়মান গাড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল—চোরের মত; গাড়িটা অদৃশ্য হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রহিল দাঁড়াইয়া, তাহার পর বাহির হইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাভিটির পানে অগ্রসর হইল।

গা ঘিনঘিন করিতেছে, সারা অঙ্গে কলঙ্কের মসীঘন প্রলেপটাকে যেন অনুভব করা যায়—যেন গড়াইয়া পড়িয়া চলার পথটুকু পর্যন্ত চিহ্নিত করিয়া দিতেছে।...ভাগ্যে দৈবযোগে ঠিক সেই গাড়োয়ানটার সহিত দেখা হইয়া গেল, ভাগ্যে ওর তিনটি ছেলে আছে—পড়ার কথাটা উঠিল, নয়তো এই কলঙ্কলিপ্ত শরীরেই তো সাঁকরেলে গিয়া উঠিত! সেই দুইটি ছেলের সামনে—সেই মেয়েটির—বাহিরের ভদ্রতা তাহাদের অন্তরের ঘৃণাকে যেন চাপা দিতে পারিতেছে না।...পা চালাইয়া দিল; সাঁকরেল যেন বড় কাছে, দূর—দূর—আরও দূর হইয়া যাওয়া—দরকার, যত দীর্ঘ হয়।...কিন্তু নিজের কাছ থেকে নিজেকে কি করিয়া লুকায়? নিজের থেকে নিজেকে কি করিয়া করে দূর? এই কলঙ্কিত দেহকে বহন করিয়াই তো জীবনের সমস্ত পথটা অতিক্রম করিতে হইবে?

অথচ তাহার অপরাধ? অপরাধ—ভাল হইতে চাহিয়াছে, কল্যাণকে আশ্রয় করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে। কিন্তু কোথায় ভাল? কোথায় কল্যাণ? কোথায়ই বা রহিল বিশ্বাস?...মনে হইয়াছিল পৃথিবীতে যেন নূতন আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আলো, না, আলোর প্রবঞ্চনা মাত্র? সে তো জানে সে এখনও ঠিক সেই সত্যেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিশ্বাসেই তো এই শেষ আশাটুকু অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল, তবে এই মিথ্যার ছাপ ললাটে বহন করিয়া ফিরিতেছে কেন?...ম্যানেজারেরই হইল জয়...কিন্তু মাষ্টারমশাই তাহাকে তাহার নিজের জীবন হইতে ছিনাইয়া লইতে গেলেন কেন? ..গোড়ায় তো ম্যানেজারই নয়...মনটা সবার উপর বিষাইয়া উঠিয়াছে—মাষ্টারমশাই, ম্যানেজার, চম্পা, ভিখারিণী বুড়ী, বিন্দু, জীবন, ভম্বা—স্কুলের যত ছেলেমেয়ে আজকের এই রাত্রিটি আসিয়া কেলিবার জন্য একটা চক্রান্ত করিয়াই ওরা সবাই যেন আসিয়া জুটিয়াছে টুনুর জীবনে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া—কেহ প্রকাশ্যে কেহ ছদ্মরূপে, কিন্তু ঐ একটি মাত্র উদ্দেশ্য লইয়া।...

একটা পরিবর্তন অনুভব করিতেছে টুনু—এ-একটা নূতন অনুভূতি—সামান্য হইলেও যেন এক ধরণের স্বস্তি অনুভব করিতেছে—নির্বিচারে আক্রোশটা একধার থেকে সবার উপর গিয়া পড়ায় মনটা যেন হালকা বোধ হইতেছে; দ্বন্দ্ব হইতে একটা যেন মুক্তি।...কেউ ভাল, কেউ মন্দ, কেউ আপন কেউ পর—তাহাতে মনটা যেন আরও বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। —ভালমন্দ জিনিসটা আলো-আঁধারি,—দৃষ্টিকে দেয় ধাঁধাইয়া, মনকে করে বিভ্রান্ত; তার চেয়ে একেবারে অন্ধকার, পরিপূর্ণ মন্দটা ভালো—মনকে একটা বিশ্রাম দেয়।...দুর্যোধনের মৃত্যু বিষাদে হয় নাই, হইয়াছিল হরিষে-বিষাদে।

মাষ্টার মশাইসুদ্ধ সমস্ত জগতটা মলিন হইয়া গিয়া টুনু যেন বাঁচিল একটু; গতি একটু দ্রুত হইল। সে একলা, কাহারও কাছে তাহার আশা নাই; কলঙ্কিত, কিন্তু নিঃসম্পর্কিত—এই বেশ হইয়াছে।...স্নিগ্ধ হাওয়া উঠিয়াছে, হয়তো বরাবরই ছিল, শুধু তাহার পক্ষে ছিল না। জ্যোৎস্নাটাও অনুভব করিল টুনু। এতক্ষণ এটাকে ভয় করিতেছিল, হইরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া বুঝি নটাই দাসের কাছে ধরাইয়া দিল টুনুকে!...এখন বেশ লাগিতেছে—হাওয়া, জ্যোৎস্না, স্তব্ধ রাত্রি, নির্জন পথ...এই রকমই যাওয়া যায় না—সমস্ত জীবন ধরিয়া?...

কিন্তু কোথায় যাইতেছে সে?...টুনু হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল, এ চিন্তাটা এখনও ওঠে নাই মাথায়, সত্যই তো কোথায় যাইতেছে?—গঙ্গাভিটিতে আর কে আছে?...কি আছে?—শুধুই তো কলঙ্ক, এক কোণে একটু নয়, সমস্ত গঙ্গাভিটি ব্যাপিয়া—তাহার যে গঙ্গাভিটি—বন্যার মত কেলিয়াছে ছাইয়া, ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া

তাড়াইয়াছে—কিন্তু শুধু গঙ্গাফড়িং কেন? পাকয়েলেও তো সেই ঢেউ···আবার সেই বিভীষিকা—মুক্তি নাই—মুক্তি নাই।

অমূপম চকিত হইয়া উঠিল—আলোর আভাস দেখা দিয়াছে আবার—অন্ধকারই, তবে আলোর মোহন রূপে—ঢেউ থেকে পরিত্রাণেরও তো আছে একটা উপায়—আছে—আছে—ঢেউয়ে গা ভাসাইয়া দেওয়া!—সমুদ্র-স্নানের একটা অভিজ্ঞতা—দিক না সেও গা ভাসাইয়া—!

বিরাট আবিষ্কার একটা—সমস্ত জীবনের গতি এক মুহূর্তে পরিবর্তিত করিয়া দিল।

সারা দেহমন পূর্ণ করিয়া একটা আনন্দের জোয়ারে—প্রমত্ত উল্লাসে—শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে যে দানবকে এতদিন রাখিয়াছিল বাঁধিয়া সে মুক্তির আনন্দে সব ছিন্নভিন্ন করিয়া মত্ত উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়াছে।—এই ঠিক—টুনু চম্পার কাছে কথা দিয়া আসিয়াছে—"কাউকে ফাঁকি পড়তে দোব না।" এক অর্থে দিয়াছিল কথাটা—চম্পাকে মুক্তি দিবে, এবার টুনু অন্য অর্থে কথাটাকে করিবে সার্থক—চম্পাকেও ফাঁকি দিবে না, নিজেকেও নয়। গঙ্গাফড়িঙের পানে চলিল—অদ্ভুত লঘু গতি···মাটির স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছে না।—খুব পরিচিত একটা জায়গা—সামনে একটা বাঁকা টিলা—এই পথ, এই জ্যোৎস্না, এই হাওয়া—মনে পড়িয়াছে—এর সঙ্গে সেদিন ছিল পুষ্পসারের ব্যাকুল গন্ধ—চম্পার সেই অভিসারের রাত্রিটি হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে—ক্রমে মনটা পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে চম্পা—

আশ্চর্য—এত জনের কাছে এত তত্ত্বকথা শুনিল জীবনে—কিন্তু চম্পার কথাই যেন সবার উপরে—"যেটা ধরেছিলেন সেইটেই কি সার্থক করবার পথ জীবনকে—ঠিক উল্টো নয় কি?" এত বড় তত্ত্বকথা তো শোনে নাই, জীবনের সঙ্গে এমন করিয়া কোন সত্য তো মিশিয়া যায় নাই—বেশ চমৎকার ব্যাপার—একটি যেন বৃত্ত পূর্ণ হইল—এক দিন এইখান থেকে চম্পাকে লইয়া গিয়াছিল ফিরাইয়া—সেই দিনও চম্পা ছিল একমাত্র সাথী, আজও তাই—সেই অভিসারিকা চম্পা—সে দিন ছিল বাহিরে, আজ অন্তরে—কোন্ দিনেরটা বেশী সত্য টুনুর জীবনে?—

স্কুলে যখন পৌঁছিল চাঁদ মলিন হইয়াছে, পূর্বাকাশে ঊষার আভা দেখা দিয়াছে। টুনু একেবারেই স্কুলে গিয়া চম্পার ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল; ডাকিবে, স্কুলের দিক থেকে প্রহ্লাদ হাঁকিল—"কে বটে?"

আগাইয়া আসিয়া বলিল—"ও, ছোটবাবু?"

টুনু বেশ সপ্রতিভ অকুণ্ঠ স্বরে বলিল—"চম্পাকে ডাকতে হবে একটু।"

বনমালীর বাসায় দুই দিদিমণিই শোয়—এরা তিন জনে শোয় স্কুলে। দরজায় ধাক্কা দিতে প্রহ্লাদের স্ত্রী আসিয়া খুলিয়া দিল। টুনুকে দেখিয়া হকচকিয়া যাইতে প্রহ্লাদ বলিল—"দুর দিদিমণিকে ডেকে দিতে হবেক।"

স্ত্রী চলিয়া গেল, একটু পরে আসিয়া বেশ খানিকটা বিস্মিত ভাবে বলিল—"দিদিমণি তো নাই, হীরাটিও নাই বটে।"

"সে কি!"—বলিয়া টুনু ভিতরে প্রবেশ করিল, পিছনে প্রহ্লাদ আর তাহার বউ।—

সত্যই চম্পা আর হীরক নাই। আরও বিশেষ ভাবে যাহা লক্ষণীয়, চম্পার টিনের বাক্সটা, তাহার শাড়ি নিত্য ব্যবহার্য্য দু-একটা টুকিটাকি আর হীরকের কাঁথা বালিশ আর পরিধেয় যা-কিছু ছিল সেগুলা পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

তিন জনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রথমে কথা কহিল প্রহ্লাদের বউ, একটু মুখঝামটা দিয়া স্বামীকে বলিল—"উয়ার বাপকে, ঠাকুরদাকে ডাকো গিয়া; হাঁ করে দাঁড়ায়ে রৈল।"

বনমালী আর চরণ আসিল, ঘুম হইতে উঠিয়াই এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেল। বনমালী যে রকম ঘন ঘন মাথা চুলকাইতেছে, মনে হইতেছে বাস্তবে স্বপ্ন-ভ্রান্তি হইবার মত অবস্থা বুঝি আসিয়া পড়িল ওর।

টুনু চরণদাসকে বলিল—"দুলি খাওড়ায় গিয়ে না হয় দেখবে একবার?"

এমন ভাবে বলিল যেন তাহার জানাই যে যাওয়াটা বৃথা হইবে। তাহার পর কিছু না বলিয়া মন্থরগতিতে বাসার দিকে ফিরিল।

বাসার দরজা ভিতর হইতে অর্গলিত, ডাকাডাকি করিতে বিন্দু আসিয়া খুলিয়া দিল। ঘরে তখনও অন্ধকার। রাস্তার দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল, খুলিতেই এক টুকরা কাগজ উড়িয়া পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। একটু খটকা লাগায় টুনু সেটা কুড়াইয়া লইয়া আলো জ্বালিল। যাহা সন্দেহ করিয়াছে তাহাই—চম্পার একটা চিঠি; লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু,

মাথায় লজ্জার বোঝা নিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন শেষ পরিচয় না দিয়ে গেলুম আপনাকে আমি তা নয়। ইচ্ছে ছিল থেকেই বরং সেটা দেখিয়ে দিই, কিন্তু নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারলুম না। কি থেকে কি হয়ে পড়ল বেশ ভাল করে বুঝতে পারছি না, তবে মাষ্টার মশাইয়ের চিঠি পেয়ে আপনি এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, ভয় হ'ল আপনাকে বুঝি হারালুম। সত্যি ভয় পেয়ে গেলুম, আমার সমস্ত জীবনটাই যে আপনার হাতে গড়া, আপনাকে হারালে কি করে চলবে? এখন বুঝছি এই জন্যই আমার বুদ্ধিনাশ করেছিল—আঁচল দিয়ে আগুনকে বেঁধে রাখব ভেবেছিলুম।

সত্যিই আগুন আপনি। শুনেছে পাহাড়ের আগুনের কথা নিয়ে আপনাকে যে উপদেশ দিতে গিয়েছিলুম তার লজ্জাও আমার জীবনে যাওয়ার নয়; সেই সময় থেকেই তো ভয়ের পাপও ঢুকল আমার মনে। আপনি আগুনই, কখন্

শান্ত হয়ে আলো দেবেন, কখন্ জ্বলে ওঠে ছাই করে ফেলবার দরকার হবে সে তো অন্তরই বুঝবে, তোমার জলের তা দিয়ে উপদেশ দেওয়া চলে কি? একজেই যাচ্ছি, বুঝছিলাম পায়ের শেকল হয়ে উঠছিলাম আপনার, অদৃষ্টের দোষেই, তারপর এ-দিকে নিজের দোষেও।

আমার কথা আপনি ভাববেন না, আপনার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে থাকবেই। হীরাও আপনার হীরা হয়েই তোয়ের হবে, এই কথা দিয়ে যাচ্ছি।

আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন।

ইতি স্নেহের চম্পা।

৩৭

কিছুক্ষণ পরে বনমালী ফিরিয়া আসিয়া জানাইল চম্পা বস্তিতে নাই। কোন সাড়া না পাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বার দুয়েক আড় চোখে চাহিয়া সংবাদটা আবার জানাইয়া দিল। টুনু অনাসক্তভাবে বলিল—"শুনলাম।"

বনমালী একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিল—"তা তো শুনলেন, শুনবেক নাই ক্যানে? আরও যা খবর সিটি শুনেছেন? বস্তির উরা আজ সকালে কাজে যাবেক নাই।"

টুনু দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"ক্যানে তা আমায় বুলবেক উরা? মাহুষটি ভাবে আমায়? আমার নিজের নাতনি আমায় মাহুষটি ভাবে বটে? উর বিয়ার যোগাড় তো করছিলাম, বুঝলেক সে কথা?…তা আমি জানলুম—উরা না বলুক, জানলুম আমি—রমণী ঘোষ ভাগে নাই, ম্যানেজার উকে খুনটি করালে—উরা সব টের পেইছেঁ—মানবেক নাই উরা—আপুনি দিখবেন, উরা মানবেক নাই…কে খুন করলে উরা খবর পেইছেঁ…"

একটা বড় বিরতির মুখে জীবনের গতিটা হঠাৎ উগ্র হইয়া ওঠে; ঘটনাগুলার মধ্যে যেন একটা তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়, একটার জের মিটিতে না মিটিতে আর একটা পড়ে আসিয়া।

সেই দিন গভীর রাত্রে সদর দরজায় মৃদু মৃদু করাঘাত হইল। টুনু জাগিয়া ছিল, খুলিয়া দিতে দেখে মাষ্টার মশাইয়ের সেই চর, এর আগে যে চিঠি দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল।

বলিল—"আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"কোথায়?"

"আমার সঙ্গে চলুন।…কাপড় জামা একটু বদলে নিতে হবে; ঐটুকুরই সময়।"

সঙ্গে একটা ছোট পুঁটুলি ছিল, হাতে তুলিয়া দিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে টুনু খদ্দর কুলির পিরান-কাপড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতে একটি ডাণ্ডা ছিল, সেটা দরজায় লাগাইয়া বলিল—"চলুন।"

এক একটা জায়গার সঙ্গে মাহুষের জীবনের কেমন একটু গূঢ় সংযোগ থাকে, ঠিক যুক্তিতর্কে বাঁধা যায় না, তবু অদ্ভুত মনে হয় বটে। সেই টিলার নীচেটি, যেখানে চম্পাকে তাহার অভিসার থেকে একদিন ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কাল যেখান থেকে তার নিজের অভিসার হইয়াছিল সুরু—ঠিক এই সময়।…মাষ্টার মশাই সাঁকোটার উপর বসিয়াছিলেন, পাশে হাত দিয়া স্বভাবসিদ্ধ অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"বোস টুনু, অনেক দিন পরে দেখলাম তোমায়।"

টুনু পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া হঠাৎ হাতটা টানিয়া লইল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাষ্টার মশাইয়ের মুখের দিকে চাহিতেই তাহার দুই গণ্ড দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু নামিল।

মাষ্টার মশাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পিঠে হাত দিয়া একটু নিজের দিকে টানিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি হ'ল।"

"আমি আর আপনাকে প্রণাম করবার যুগ্যি নেই স্যার।"

"বেশ তো, আমি যেমন ভক্তিপুষ্প দিয়ে প্রণামের অর্ঘ্য চাই না টুনু, ঠিক তেমনি চোখের জলের পাত্তও তো চাই না"—একটু হাসিয়া পিঠে স্নেহভরে আর একটু চাপ দিয়া বলিলেন—"না, এক দিন তোমায় মানা করেছিলাম প্রণাম করতে টুনু, আবার তোমায় আদেশ করছি—তোমার প্রণামে আজ আমার লোভ হচ্ছে।"

একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, টুনু প্রণাম করিলে তাহাকে পাশে লইয়া আবার সাঁকোর উপর উপবেশন করিলেন।

ডান দিকের রাস্তাটা সোজা চলিয়া গিয়াছে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়; বাঁদিকে কয়েক হাত পরেই টিলাটা, রাস্তাটা তাহার কোল দিয়া ঘুরিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, বাঁকটা প্রায় শ'খানেক হাত তফাতে। টিলাটা একটি ছোটখাট পাহাড়, একেবারে খাড়া পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঁচু পাথরের একটা চাঁই, গায়ে মাথায় কিছু ঝোপঝাপ। লোকটি টুনুকে পৌঁছাইয়া দিয়া রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দুই জনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মাষ্টার মশাই কথা কহিলেন, বলিলেন—"আমি তোমার আত্মগ্লানির ভেতরকার কথা বোধ হয় আন্দাজ করেছি টুনু। ব্রত-সিদ্ধিটা খুবই ভাল—যাকে বলা যায় চরম ভাল; কিন্তু যদি না-ই হয় পূর্ণ সিদ্ধি, তবু ব্রতটাকে, চেষ্টাটুকুকেও তো খানিকটা মর্যাদা দিতে হবে? অন্তত আমি তো দিই।"

একটু থামিয়া বলিলেন—ব্রতটা ছিল দুরূহ, এ ব্রতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছেন পুরাণ, ইতিহাস মিলিয়েও এমন লোক খুব বেশি পাই না। সে দিক দিয়ে আমার তেমন ক্ষোভ নেই; একটা অভিজ্ঞতা তো হ'ল, অন্য জায়গায় কাজ হবে। ক্ষোভ শুধু এই যে চম্পা মেয়েটা সম্বন্ধে আমার বড় একটা আশা ছিল,—ও যে স্তরের সেখানে ওর মতন একটা মেয়ে শুধরে উঠলে সেই উদাহরণেই মস্ত একটা কাজ হ'ত।"

টুনু মাথাটা একটু নীচু করিয়াই বলিল—"আশা তো আপনার সে নষ্ট করে দি স্যার।"

"বুঝলাম না।" মাষ্টার মশাই একটু বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিলেন।

"তাই ; আপনার আশা সে এত বেশী করে সফল করেছে যে ততটা বোধ হয় ভাবেননিও আপনি..."

মাষ্টার মশাই আবেগভরেই টুনুর হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"আমার সবটা বলো টুনু, সঙ্কোচ করবার দরকার নেই, আমার সময় অল্প, কেন তা বুঝতেই পারবে—তবু সবটা বল, আমি শুনব।"

বলার টুনুর আনন্দ আছে। বাদ দিল শুধু বস্তিতে চম্পাকে প্রথম দিন দেখার কথাটা—মাষ্টার মশাই সেটা জানেন—তাহার পর বাদিয়াড়ির পথের কাহিনী হইতে একটু একটু করিয়া সবটা বলিয়া গেল—ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তায় ওর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়, বস্তি ছাড়িয়া স্কুলে আসার ইতিহাস—ধীরে ধীরে ওর মর্যাদাজ্ঞানের উন্মেষ—খনির কাজ ছাড়া, পরেশের সাহচর্য ছাড়া, তাহার পর হীরার খোরপোষের টাকাটা পর্যন্ত ছাড়িয়া দেওয়া...এর পরে ওর হঠাৎ পরিবর্তনের কথাটাও বলিল—আগের রাত্রেই বটতলার রূঢ় অভিজ্ঞতাটা—টুনুর জীবনে যা সবচেয়ে বড় আশাভঙ্গের কথা ; তাহার পর সাকরেদের পথের সমস্ত কাহিনীটুকু—পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফেরা, সবশেষে চম্পার চিঠি।

শেষ হইলে মাষ্টার মশাই আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন সমস্ত কাহিনীটাকে সাজাইয়া-গুছাইয়া তাহার মধ্যে থেকে কি একটা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এক সময় টুনুর পিঠে সস্নেহ স্পর্শ দিয়া বলিলেন—"টুনু, আমাদের শাস্ত্রে ছ'টা রিপুর কথা বলেছে ; কিন্তু আমি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অন্তত আর দুটো তো আছেই, বেশির কথা বলতে পারি না—সে দুটো হচ্ছে ভয় আর নিরাশা, দেখেছি ষড়-রিপুর যে কোনটার মতনই এ দুটোতেও আমাদের জীবনের ধারা বদলে জীবনকে একেবারে বিষময় করে দিতে পারে।...তোমার শিষ্যাকে আমি তারিফ করি, সে নিজের মনের গতিটা ঠিক বুঝেছে, তাই ওর দুর্বলতাটুকু যে ভয়ের বিকার ভিন্ন আর কিছু নয় সেটা বুঝে নিয়ে ও সামলে উঠেছে ; কিন্তু আমার শিষ্যকে আমি সেই পরিমাণ তারিফ করতে পারলাম না ; তুমি বুঝতে পার কি যে তুমিও যে নামতে যাচ্ছিলে সেটা তীব্র নিরাশারই বিকার একটা ; ক'দিনের মধ্যে একটার পর একটা কতকগুলো ধাক্কা খেলে দেখ না ; জীবনের একটা গতি চাই তো ?—চারদিকেই নিরাশার দেয়াল দেখে তোমার মন এই খোলা পথটায় জীবনের ইঙ্গিত পেয়েছিল। সে পথটা যে কত কদর্য তা ভেবে দেখবার ধৈর্য তার হ'ল না। চিন্তার কিছু নেই টুনু ; আমার শুধু এইটুকু আপশোষ রয়ে গেল যে আমার শিষ্য তার শিষ্যার কাছে বুদ্ধির দৌড়ে হার মানলে।—আমারই হার তো ?—তা এমন আপশোষই বা কিসের ? শাস্ত্রকারেরা 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়'টা গৌরবের বলে গেছেন, তা হলে লজিক্যালি প্রশিষ্যা থেকে পরাজয়টা তো আরও কাম্যই হওয়া উচিত তো !...নিজের পদ্ধতি মত বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, যেন একেবারে হালকা করিয়া দিলেন ওদিককার সমস্ত ব্যাপারটা ; তাহার পর পিঠে হাতের একটা মৃদু টান দিয়া বলিলেন—এবার আমার এ দিকটা শোন, জীবনে আর বলবার সুযোগ হবে কিনা জানি না।

টুনু বিস্মিতভাবে মুখের দিকে চাহিতে বলিলেন—"হ্যাঁ তাই ; গঞ্জডিহিতে ফেরার কথা আর আসে না আমার টুনু, এটুকু খুব স্পষ্ট, বাকিটা একেবারেই অস্পষ্ট। ওরা আমার পিছু নিয়েছে, ওরা মানে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ... না, ঝরিয়া-কাতরাসগড় অঞ্চলে যে কাজ করছিলাম তার জন্যে নয়, তার মধ্যে তো তেমন কিছু লুকোচুরি ছিল না, অনেকটা খোলাখুলি কুলি ক্ষেপাচ্ছিলাম—ঝগড়াটা কুলি আর মালিকদের সঙ্গে ; গবর্ণমেন্ট কুলিদের দাবি অস্বীকার করতে পারে না, তাদের হয়ে কেউ স্পষ্টভাবে ওকালতি করতে গেলে গবর্ণমেন্ট অন্তত স্পষ্টভাবে বলতে পারে না কিছু।...এ যা পিছু নিয়েছে—ওদের এক পলাতক শত্রু ভেবে করেছে সন্দেহ। সন্দেহটা যে ঠিক সেটা নিশ্চয় ওদের কাছে স্বীকার করব না ; কিন্তু তোমার কাছে তো দোষ নেই। আমার দ্বিতীয় চিঠি তোমায় সে সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ দিয়েছে টুনু। উনিশ-শ' কুড়ি থেকে উনিশ-শ' বত্রিশ পর্যন্ত যে সমস্ত বড় বড় পলিটিক্যাল ডাকাতি আর ষড়যন্ত্র হয়ে গেছে তার গোটাচারেকের মধ্যে আমি ছিলাম। চোখে ধুলো দিয়ে দিয়ে আজ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি ; শুধু চোখে ধুলো নয়, বুকে গুলি বসানো পর্যন্ত আছে তার মধ্যে। শুধু যে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়েই বেড়িয়েছি তা নয়, যখন যেরকম সুযোগ হয়েছে একটু আধটু কাজ পর্যন্ত করে গেছি—যেমন ধরো গঞ্জডিহিতে তোমাকে দিয়ে করাবার প্ল্যান করেছিলাম, তারপর আর একটু সুযোগ পেয়ে ঝরিয়া-কাতরাসগড়ের দিকে তাড়াতাড়ি একটু ভালভাবেই করে ফেললাম। কিন্তু ঐ হয়, বেশি দিন কোন এক জায়গায় উপায় থাকে না টেঁকবার, নজর পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মপদ্ধতি বদলে না ফেললে চলে না। আজ পর্যন্ত পারলে না গায়ে হাত দিতে, তার কারণ আমাদের চোখও জাগ্রত আছে, ঠিক ওদের চোখের পাশেই—আপিসের একেবারে গুপ্ত কামরা থেকে, বড় সাহেবের একেবারে পাশ থেকে সে চোখের ইসারা পাই আমরা। অবশ্য পাইও না যে এমন নয়, না হলে ধরা পড়ছে কি করে ?—কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত জেলের বাইরেই আছি, কতকটা চাল্‌ও বলতে পার।

এই রকম একটা সঙ্কেত পেয়েছি সম্প্রতি, ভুল হয়েছিল, নিজেকে বড্ড বেশি প্রকাশ করে ফেলেছিলাম ; তবে মনে হচ্ছে সঙ্কেতটা পেয়েছি সময়েই, এবারেও সামলে যেতে পারি। তবে সবচেয়ে মুশকিল কি হয়েছে জান ?—আমাদের লোক-

বল দিন দিনই যাচ্ছে কমে, কেন, সে দুঃখের কথা আগের চিঠিতে লিখেছি তোমায় টুনু। এক দিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন করে স্বাধীনতা নিতে চায় বলে আমরা ঠাট্টা করতাম —তাই থেকেই আমাদের উদ্ভবও—আজ ক্লীব্ হয়েছে পড়ে মার খেয়ে ওদের দয়ার উদ্রেক করো, বলে তাইতেই পাবে; আমরা নতুন লোক তো পাচ্ছিই না এক রকম, পুরানোরাও ঐদিকেই চলছে,—জাতির ধমনীতে কি ধরণের রক্ত তা তো জানই, সে রক্ত দিন দিন বয়সেও তো নিস্তেজ হয়ে আসছে।

যাক্, দুঃখ করে আর হবে কি? যত দিন বেঁচে আছি, যে ক'জন বেঁচে আছি, চেষ্টা করব বেঁচে থেকে এবং বাইরে থেকে কাজ করবার। হ্যাঁ, বাইরে থেকে; জেল ভর্তি করা আমাদের ক্লীড্ নয় টুনু, দেখছি ওটা ক্রমে ক্রমে একটা বিলাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অ্যাস্ত আমাদের জেলে পুরবে, পারতপক্ষে আমরা তা ঘটতে দিই না। হয়তো তোমায়-আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ, লক্ষ্য রেখো যদি খবর কখনও পাও আমার, তো এমন খবর পাবে না যে আমি গলায় মালা দিয়ে শান্তশিষ্টটি হয়ে পুলিসের পেছনে পেছনে জেলে ঢুকলাম।"

মাষ্টার মশাই চুপ করিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া টুনুর পানে চাহিয়া বলিলেন—"কথাগুলোয় আক্রোশের ভাব বেরিয়ে পড়ছে, এতটা ঠিক নয়, না?—বুঝি, কিন্তু কি করব। ভুলতে পারছি না বাংলার কাজশক্তিকে কি ভাবে এরা নষ্ট করে দিলে।

"বাজে কথা যাচ্ছে বেড়ে। আমার ভবিষ্যতের কথা বলতে এসেছি তোমায় টুনু। সেই সঙ্গে তোমার ভবিষ্যতেরও। আমি ঠিক একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি—আমার পেছনে একটা ভীষণ দুর্যোগ, তাড়া করে নিয়ে চলেছে আমায়; আমার সামনে একটা বিরাট সুযোগ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে। কথাটা এই যে যত দূর বুঝতে পারা যাচ্ছে, পৃথিবীর আন্তর্জাতিক অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে শীগ্‌গির আবার একটা লড়াই বাধবে এবারে আরও ব্যাপকভাবে। এই সুযোগে আর একবার যদি দেশকে জাগিয়ে তুলতে পারি—অগ্নিমন্ত্রে, তো সিদ্ধি বোধ হয় আমাদের মুঠোর মধ্যে। যদি এদের চোখে ধুলো দিতে পারি, এক বার চেষ্টা করব—কোথায়, কি ভাবে, তোমায় বলতে পারলাম না, আর যদি আমারই চোখ বুজতে হয় তো সেইখানেই এ জীবন নাট্যের যবনিকা।"

টুনু খানিকটা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলিল—"আমায় সঙ্গে নিন।"

"সেই সম্পর্কেই বলতে এসেছি তোমায়। এক সময় হয় তো তোমায় নেব সঙ্গে, কিন্তু তার এখন দেরি আছে। এখন যা অবস্থা যাচ্ছে তাতে তোমায় সঙ্গে নেওয়া চলে না, নিলে ওদের সুবিধে করে দেওয়া হবে। এখন আমার সঙ্গে যে ক'জন আছে তারা এ ব্যাপারে ঝানু লোক, প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় পাকা, দরকার হলে হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্ম-গোপন করতে পারে। এদের এত দিন বাংলা বিহারের খনি-চক্রে রেখেছিলাম ছড়িয়ে, হাতে ছিল যোগসূত্র, এই স্কুলেও সেই ব্যবস্থা থেকে আমার অনেকখানি জোর ছিল, ম্যানেজার যে তোমায় খুব বেশি ঘাঁটাতে পারে নি তার কারণ সে সেক্রেটারি হলেও প্রেসিডেন্ট—জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান আমার লোক। এখন অন্য জায়গায় চলেছি, আস্তে আস্তে হয়তো দেব গুটিয়ে, তারপর পিছু হয়ে বসে তোমায় দেব ডেকে, অবশ্য পাকা কথা দিচ্ছি না, যদি দরকার মনে করি। আপাতত তোমায় রাজশাহীতেই চলে যেতে হবে।"

"রাজশাহী?"—প্রশ্নটা করিয়া টুনু বিস্মিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"রাজশাহীতে। বুঝতে পারছ না?—আমার সঙ্গে যোগ থাকায় তোমার ওপর পুলিসের নজর পড়বে, হয়তো পড়েছে; তোমায় এখন তোমার বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে থাকতে হবে। বিপদ সেখানেও ধাওয়া করবে, তবে তিনি বিচক্ষণ উকিল, কাটান্‌ছাড় জানেন অনেক। কাল পর্য্যন্ত তোমার সম্বন্ধে যা রিপোর্ট তা এই যে তুমি এক জন অনভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ যুবক, আমার প্রভাবে এসে ক্ষতিকর কিছু করবার আগেই স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছ—ইংরেজীটা হচ্ছে—A sentimental inexperienced youth who succumbed to a woman's charm before he was ripe for any mischief। ঠিক এই সময় সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে গিয়ে বসলে ওদের এই ধারণাটা পাকা হয়ে যাবে। এর সঙ্গে আর একটা চাল দিয়ে রাখব আমি, তার ব্যবস্থা করছি। চম্পার খোঁজ নেওয়াচ্ছি, তাকে রাজশাহীর কাছা-কাছি কোন জায়গায় বসিয়ে আসব ভাল ভাবে, স্বাধীন ভাবে যাতে সে কাজ করে যেতে পারে। তুমি খবর পাবে; তার সঙ্গে গোপনে যোগ রেখো, পুলিস নিশ্চিন্ত থাকবে, খুশী থাকবে। একটু সেন্টিমেন্টে লাগছে, না? তা কি করবে? যে পথের যে পাথেয়। তোমরা দু'জনে থাকবে ঠিক—এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস আর অন্তরের আশীর্বাদ।

পত্তুভিহিতে ফিরে গিয়ে স্কুলখোলা পর্য্যন্ত তোমায় থাকতে হবে। খুলতে আর তিন দিন আছে, না?...বুঝতে পারছ না?—আমি স্কুল খোলার পরও যখন এলাম না তখন কমিটি আমায় ডিসমিস করবে, আর তখনই, যেন নিরুপায় হয়ে বাসা ছেড়ে যাচ্ছ এই ভাবে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে। এর আগে ছাড়লেই আমার গোপন খবর জান মনে করে পুলিস তোমার সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠবে।...তারপর বুদ্ধির একটা ব্যবস্থা করে দিও—পার তো চরণদাস আর বনমালীরও—জমি আর বাড়ি করার মালপত্র না হয় ওদেরই দিয়ে যেয়ো—এর পর আমার জিনিসপত্রের খানিকটা ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে..."

"ম্যানেজারের কাছে?"—এবার একটু উগ্রভাবেই ফিরিয়া টুনু মাষ্টার মশাইয়ের পানে চাহিল।

মাষ্টার মশাই আবার পিঠে হাত দিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, এও বাধছে এক ধরণের সেন্টিমেন্টে না ?—বড় হেরেছ তার কাছে। কিন্তু ঐ পুলিসের সঙ্গে বাজি খেলায় এটুকু দরকার টুলু। ম্যানেজারের ওপর তোমার আক্রোশ আমি কি বুঝি না ? গঞ্জভিহিতে সে জিতে রইল, আক্রোশ মেটাবার অবসর পেলে না, উল্‌টে আমার জিনিস সব পৌছে দেওয়া। কি করবে ?—জীবনে এ রকম হয়, মুছে ফেলতে হয় দু'হাত দিয়ে। ভেবে দেখো, ম্যানেজার ত আসল শত্রু নয়—কর্ম্মের পথে এরকম ছোটবড় শত্রু অনেক এসে পড়ে, সাময়িক ভাবে, আক্রোশে প্রতিহিংসায় তাদের নিয়ে পড়ে থাকলে আসল শত্রু থেকে দৃষ্টি সরে যায় টুলু, এসব একটু ক্ষমা-ঘেন্না করে আসল জায়গায় নজর রাখতে হবে। আরও একটা কথা—যা থেকে তুমি সান্ত্বনা পেতে পার—আমি যে আগুন জেলে গেলাম, তা সহজে নিভবে না, সুতরাং ম্যানেজার আর তার স্বগোত্রীয়েরা তার মধ্যে পড়বেই এক সময়। আমি সে ধরণের ধ্বংস চাই না টুলু, সে কথা ত তোমায় এক সময় বলেছিই ; এখন লোভে স্বার্থপরতায় ওরা পশু, অভাবে অশিক্ষায় এরা পশু ; মূল কারণ ওরা,—এইটুকু ওরা বুঝলেই আমার মিশন সফল হবে, দুই পক্ষই মনুষ্যত্বের স্তরে এসে দাঁড়াবে। তখন, গঞ্জভিহিতে তুমি যে কাজের গোড়াপত্তন করে গেলে সেটাও হবে সফল। কাজই ত আসল, যেভাবেই তা হোক।...আরও একটা কথা আছে টুলু এ সবের ওপরে।"

"কি ?"

"চম্পার মতন একটা মেয়ে যদি তোমের হয়ে থাকে—তোমার সম্পর্কে এসে—আর ম্যানেজারের অত কূট-চক্রান্ত সত্ত্বেও ত সেই বিজয়ের কাছে ওর জয়টা কি ম্লান হয়ে যায় না ?"

টুলুর মুখটা একটু উজ্জল হইয়া উঠিল, অবশ্য কোন উত্তর দিল না।

মাষ্টার মশাই বলিলেন—"এবার যে কথা বলছিলাম। ধরো, তোমায় আমি আমাদের কাজে টানতে পারলাম না, কিম্বা অসময়েই যবনিকাটা নেমে পড়ল আমার জীবননাট্যে, তুমি যে কাজ আরম্ভ করেছিলে তাই করে যেও। আমার মনের কথাটা আরো খুলে বলি—আমার অন্তরের ইচ্ছে তুমি এই কাজই নিয়ে থাক ; আমি তোমায় যতটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস গঠনের দিক দিয়ে তোমার মনটা বিপ্লবী নয় ; তুমি আমার চিঠি পাওয়ার পর যে অশান্তিটা ভোগ করেছ মনে মনে, তা বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগ্রহ নয় ; বিপ্লবে মনটা তোমায় যে সাড়া দিতে চাইছিল না তারই একটা অভিব্যক্তি, তা না হলে তুমি চম্পার একটা সামান্য তর্কেই এমন করে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে না। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই, এই পথেই তোমার কাজ ; এরও তো দরকার আছে,—বোধ হয় বেশি দরকার। আর এও তো বিপ্লব—প্রতিদিনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াবে—তাতে যে তুমি নিজের প্রাণকে দু'হাতে আগলে থাকবে না এ বিশ্বাস আমার ষোল আনাই আছে টুলু।...এবার ওঠ, আর সময় নেই আমার।"

টুলু বলিল—"গঞ্জভিহিতে আমায় ফিরতে বলছেন, সেখানে ত সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসের ভয়...অবশ্য ভয়েই বলছি না আমি।"

মাষ্টারমশাই আবার সস্নেহে পিঠে হাত দিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"না, কেন বলছ আমি বুঝেছি টুলু—আমার সঙ্গ না ছাড়বার একটা লাগসই ছুতো বের করেছ—এই তো ?...না, যাও, ওরা এখন গঞ্জভিহির বাসায় আসবে না। আমি যে ওদের খবর টের পেয়েছি জান না তো ; আমি ঐখানেই ফিরব এই আশায় দূরে দূরেই ওৎ পেতে থাকবে, তোমাদের ডিস্টার্ব করবে না। এত বড় ভুল ওরা করলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোন্ দিন দেউলিয়া হয়ে যেত টুলু।"

উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর একটু গলা উচাইয়া বলিলেন—"এসো গো...আর তুমিও নেমে এসো।"

টুলুর সাথীটি রাস্তার বাঁকের দিক হইতে চলিয়া আসিল। টুলু বিস্মিত হইয়া দেখিল, টিলার বাঁ দিক দিয়াও একটি লোক উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে, দু'জনেই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

মাষ্টার মশাই টুলুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"একটু নাটুকে হয়ে গেল, না ?—যেন স্টেজের এক একটা সীন্।"

ওদের বলিলেন—"তোমরা তা হলে আর একটু আত্মপ্রকাশ করো।"

দুই জনের দক্ষিণ হস্ত পকেটেই ছিল, দুইটি পিস্তল বাহির করিল, মাষ্টার মশাই নিজের পকেট থেকেই বাহির করিলেন, বলিলেন—"এই কথাই তোমায় বলছিলাম টুলু, দাঁড়িয়ে মার খাওয়ায় আমাদের শ্রদ্ধা নেই, প্রত্যেকটিতে ছটি করে গুলি আছে।"...

বালাসোরের দিকে পুলিসের সঙ্গে জনকতক বিপ্লবীর সেই খণ্ড যুদ্ধটার কথা মনে আছে তো তোমার ?"

টুলু অভিভূত হইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ব্যাকুল মিনতির সহিত চাহিয়া রহিল—"সঙ্গে যদি না-ই নেবেন, যাবার আগে আমায় এই দিয়ে অভিষেক করে যান।"

মাষ্টার মশাই সত্যই শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সর্ব্বনাশ ! তা কি হয় ?"

"কেন হবে না ?"

"নানা কারণেই ; একটা কারণ বলি—তোমার ওপর এখন পুলিসের নজর থাকবে।"

টুলু স্থির ভাবে একটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,

তাহার পর দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"আর একটা কারণ আমি বলব স্যর ? ভাববেন ম্যানেজারের ওপর প্রতিশোধ নোব। তারপর নেমে পড়ব বিপ্লবে..."

সঙ্গে সঙ্গে বসিয়া পড়িয়া মাষ্টার মশাইয়ের পদ স্পর্শ করিয়া বলিল—"যদি সত্যিই নিজেকে মনে করি কখনও বিপ্লবের উপযুক্ত, তা হলেই নামব—আপনি বেঁচে থাকলে আপনার আদেশ নিয়ে—আত্মপ্রবঞ্চনা করব না ; আর যদি কখনও নামিই তা হলে করব এর ব্যবহার, ঐ কাজেই, এই কথা দিলাম আমি। পুলিসের কথা যে বললেন—তোয়ের সঙ্গে সঙ্গে এটাকে ফেলব সরিয়ে, নিশ্চিন্দি থাকুন আপনি।"

মাষ্টার মশাই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মুখটা একটু বিষণ্ণ ; তাহার পর টুলুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"ওঠ টুলু, ঠিক বুঝতে পারছি না—তোমায় দেওয়াটা বেশি অন্যায় হবে, কি তোমার এই শেষ প্রার্থনাটুকু অগ্রাহ্য করা। মনটা একটু কি রকম হয়ে রইলই আমার। তবু নাও, শুধু মনে রেখ তোমার প্রতিজ্ঞায় আমার অটল বিশ্বাস আছে বলেই দিলাম।"

টুলু যখন গঙ্গাভিহিতে ফিরিল তখনও খানিকটা রাত্রি আছে। বাসার সামনে আসিয়া রাস্তায় খানিকটা নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন একটা শূন্যতা যে নিজের অস্তিত্বকে যেন অনুভবই করা যায় না। পা উঠিতেছে না, এ শূন্যতা লইয়া গৃহে যাইয়া কি হইবে ? কি আর করিবার রহিল জীবনে ?

হঠাৎ একটা তুমুল শব্দ। দু'শ তিন'শ লোক একসঙ্গে কি একটা বলিয়া হাঁকিয়া উঠিল—শেষের "জয়"টা গেল শোনা। একটু ধাঁধা লাগিবার পরেই টুলুর মনে পড়িল বনমালীর কথা—বস্তির সবাই ক্ষেপিয়াছে—টের পাইয়াছে, রমণী ঘোষ পলায় নাই, খুন হইয়াছে। খুনীর সন্ধানও পাইয়াছে ইহারা—কলিকাতার সেই লোকটা—হয়ত পাইয়াছে হাতের মধ্যে। টুলুর পায়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল—এই সুযোগ প্রতিশোধের, মাথায় একমুহূর্তে যেন প্রলয়ের ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিল—এই আধঘণ্টা আগের প্রতিজ্ঞা—গুরুর পা ছুঁইয়া—সে ঘূর্ণিতে ধূলিকণার মতই গেল অবলুপ্ত হইয়া। টুলুর মুঠাটা পিস্তলের বাঁটে চাপিয়া বসিল, আপনাআপনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া গিয়া সমস্ত শরীর ছাপিয়া যেন একটা অব্যক্ত উল্লাসধ্বনি উঠিল—"রতিকান্ত ! এইবার !!..." আর একটা শব্দ, বস্তির আরও কাছে ; ওরা ফিরিতেছে, হয়ত প্রবল বাধা পাইয়া ; ওদের ফিরাইতে হইবে—"তোরা চল্, আমি যাচ্ছি, আর এই দেখ আমার হাতে এ কি—সাক্ষাৎ যম ম্যানেজারের !..." যেন সত্যই প্রত্যক্ষ হইয়া কথা বলিতেছে এই ভাবে পিস্তলটা পকেট থেকে বাহির করিয়া নিজের রক্তলুব্ধ দৃষ্টির নিচে ধরিল। চাদ্ দিয়া দুই পা নামিল...আর একটা শব্দ—বস্তির আরও কাছে, টুলু নামিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া গেল।

সমস্ত আক্রোশ জিঘাংসাকে ধুইয়া মুছিয়া নামিল ঘৃণার বন্যা। তরল অন্ধকারে মুখটা বিকৃত করিয়া বস্তির দিকে রহিল চাহিয়া—আবার এদের সংস্রব ! নর্দমার কীট... গঙ্গাভিহির শেষ অভিশাপ কি এরাই হইয়া রহিল না ?

উঠিয়া আসিল। প্রবল বিজাতীয় ঘৃণায় কয়েকবারই ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিল বস্তির দিকে, বিজয়ের ধ্বনিতে মুখ হইয়া উঠিল আরও কুঞ্চিত, তাহার পর পিস্তলটা বাঁ হাতে ধরিয়া তালায় চাবিটা দিয়া ঘুরাইয়াছে, পায়ের শব্দে ঘুরিয়া দেখিল পিছনে দুই পাশে দুই জন লোক, পুলিসেরই উর্দি গায়ে, শুধু পায়ে জুতা আর মাথায় পাগড়ি নাই। দুই জনে দুইটি হাত চাপিয়া ধরিল। ঘরের দেয়ালের পাশ থেকে আরও তিন জন আসিয়া দাঁড়াইল। একজন সাব-ইনস্পেক্টার গোছের। প্রশ্ন হইল—"এত রাত্রে ঘরে তালা দিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন ?"

প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজনও ছিল না। বাঁ হাতের পিস্তল জ্যোৎস্নার আলোয় চিক্‌চিক্ করিতেছে, সাক্ষী জবানবন্দিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে যেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হইল—নগরে দাঙ্গা হইয়াছে, এই রাত্রেই একটু আগে দাঙ্গাকারীরা এক জনকে খুন করিয়াছে, তাহার পর ম্যানেজারের বাড়ির ওপরও চড়াই করে। আসামীর সঙ্গে দাঙ্গাকারীদের সম্বন্ধও যে খুব ঘনিষ্ঠ—নেতা—জনতার—সেটা প্রমাণ করিতে সরকারী উকিলের একটুও বেগ পাইতে হইল না।

ম্যানেজার জিতিল কল্পনাতীত ভাবে। টুলুর কর্মজীবনে একটা বড় বিরতি নামিল।

উনিশ'শ পঁয়ত্রিশ সালের ঘটনা সবটুকু।

শেষ

বাংলা ভাষায় অ-বাংলা শব্দ

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে, স্বরবর্ণ আদিতে আছে এমন শতাধিক অ-বাংলা শব্দের একটা তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এবার ক, খ, গ আদিতে আছে, এমন প্রায় আড়াই শত শব্দ দেখান হইল। অধিকাংশ শব্দেই কোন-না-কোন রকমের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শব্দের শেষে আ, ফা, উ, হি যথাক্রমে আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু ও হিন্দী বুঝিতে হইবে।

অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ
কংগাল—হি	কাঙাল	করামত—আ	কেরামত
কংঘী—হি	কাঁকই (চিরুণী)	করোত—হি	করাত
কঁচ—হি	কাচ	করেলা—হি	করলা
কংগন—হি	কঙ্কণ	কর্জ, কর্জা—হি	কর্জ
কঈ—হি	কয় (টি)	কলঈ—আ	কলাই
কচহরী—হি	কাছারী	কলফ—আ	কলপ
কচ্চা—হি	কাঁচা	কলম—আ	কলম
কছু, কুছ—হি	কিছু	কলিয়া—আ	কালিয়া
কজিয়া—আ	কাজিয়া(বিবাদ)	কলেজা,	
কটৌতী—হি	কাটতি	কলেজী—হি	কলিজা, কলজে
কটারী—হি	কাটারী	কসনা, কসথা—হি	কষা
কট্‌ঠা—হি	কাঠা	কসরত—হি	কসরত
কড়কচ—হি	করকচ	কসাঈ—আ	কসাই
কচ্‌রা—হি	কড়া	কস্‌র, কুসূর—আ	কসুর
কতল—উ	কোতল	কহার—হি	কাহার
কতার—আ	কাতার	কহানী—হি	কাহিনী
কদর,কদ্র—আ	কদর	কাক্‌কা—হি	কাকা
কদাই,		কাছে—হি	কাছে
কদৈয়া—হি	কানাই	কাতা—হি	কাতা
কপড়া—হি	কাপড়	কানা—হি	কানা
কভী, কভু,		কানাফুসী—হি	কানাঘুষা
কবহুঁ—হি	কবে, কভু	কানুন—আ	কানুন
কবড্ডী—হি	কপাটি	কাফির—আ	কাফের
কবর, কব্র—উ	কবর	কাবু—তুর্কী	কাবু
কবাব—আ	কাবাব	কায়দা—আ	কায়দা
কবুতর—ফা	কবুতর	কায়ম—আ	কায়েম
কবুল—আ	কবুল	কারখানা—আ	কারখানা
কবুলিয়ৎ—আ	কবুলতি	কারবার,	
কম—ফা	কম	কারোবার—ফা	কারবার
কমরা—হি	কামরা	কারসাজী—ফা	কারসাজী
কমাঈ—হি	কামাই (আয়)	কারীগর—ফা	কারিগর
কমানা—হি	কামান (আয়)	কালাপানী—হি	কালাপানি
কমীজ—আ	কামীজ	কাহিল—আ	কাহিল

অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ
কাহু—হি	কেহ	কেওরড়া,	কেওড়া
কিংখাব—আ	কিংখাব	কেওরাড়া—হি	
কিতক, কিতনা,		কৈ (ক্যায়)—হি	কয় (টি)
কেত্তো, কেতা,		কৈত,	কয়েৎ (বেল)
কেতী—হি	কত	(ক্যায়েত)—হি	
কিতা—আ	কেতা	কৈদ (ক্যায়দ)—আ	কয়েদ
কিতাব—আ	কেতাব	কৈফিয়ৎ—আ	কৈফিয়ৎ
কিধৈ—হি	কোথায়	কোতবাল,	
কিন, কৌন,		(কোতয়াল)—হি	কোটাল
কো—হি	কে, কোন্	কোঠরী—হি	কুঠরী
কিন্‌না,		কোঠা—হি	কোঠা
কীন্‌না—হি	কেনা	কোঠী—হি	কুঠী
কিনার,	কিনারা,	কোড়া—হি	কোড়া
কিনারে—হি	কিনার	কোবী—হি	কপি
কির্চ,		কোয়া—হি	কোয়া
কিরচ—হি	কিরীচ	কোহ্‌নূর—ফা	কোহিনূর
কিরাণী,		কৌড়ী—হি	কড়ি
কেরাণী—হি,	কেরাণী	ক্যারী(কিয়ারী) হি	কেয়ারী
কিরায়া,		ক্যোঁ (ক্যোঁও)—হি	কেন
কেরায়া—হি,	কেরায়	খচড়া—হি	খচড়া
কিলা—আ	কেল্লা	খচ্চর—হি	খচ্চর
কিশমিশ—ফা	কিসমিস	খজাঞ্চী—ফা	খাজাঞ্চী
কিস্ত—আ	কিস্তি	খজানা—ফা	খাজনা
কিস্‌ম—আ	কসম (রকম)	খটকা—হি	খটকা
কীচড়—হি	কিচড় (কাদা)	খটাই—হি	খাটা (অম্ল)
কুকড়না—হি	কোঁকড়ান	খড়ী, খড়িয়া—হি	খড়ি
কুটনা—হি	কোটনা	খত—আ	খত
কুদার,কুদাল—হি	কোদাল	খতম, খত্ম—আ	খতম
কুপ্‌পা,		খফা—ফা	খাপ্‌পা
কুপ্‌পী—হি	কুপি	খবর—আ	খবর
কুরবানী—আ	কোরবানী	খবরদার—আ	খবরদার
কুরাণ—আ	কোরাণ	খয়াল—ফা	খেয়াল
কুলুফ, কুলুক—হি	কুলুপ	খরগোশ—ফা	খরগোস
কুলী—তুর্কী	কুলী	খর্চ—আ খরচ—হি	খরচ
কুশ্‌তী—ফা	কুস্তি	খরা—হি	খরা
কুহাসা—হি	কুয়াসা	খরাব—আ	খারাপ
কুঁচ—হি	কুঁচ	খরীদ—ফা	খরিদ
কূচা (গলি)—পা	কুচা	খলাস—আ	খালাস
(গলির সঙ্গে ব্যবহৃত)		খলাসী—হি	খালাসী
কুহা—হি	কুয়া(কুয়াসা)	খলিয়ান—হি	খলিয়ান
কেহু, কোঈ—হি	কেহ,কেউ	খলী—হি	খৈল

অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ	অ-বাংলা শব্দ	বাংলা রূপ
খলীফা—আ	খলিফা	খুদা—ফা	খোদা	গহনা—হি	গহান	গুনাহ্,	
খসী,		খুরপী—আ	খুরপী	গজ—ফা	গজ	গুনাহ্—হি	গুনাহ্
খস্সী—হি	খাসী	খুরাক—ফা	খোরাক	গঠরী—হি	গাঠরী	গুডী, গুড্ডী—হি	ঘুড়ি
খাঁচা—হি	খাঁচা	খুলাসা—ফা	খোলসা	গড্ড—হি	গাদা	গুম—ফা	গুম
খাঁড়—হি	খাঁড়	খুশী—ফা	খুশী	গড়—হি	গড়	গুমর—হি	গুমর
খাক (ছাই)—ফা	খাক	খুঁটা—হি	খুঁটা	গড়ানা—হি	গড়ান	গুমাশ্তা—ফা	গোমস্তা
খাকী—ফা	খাকী	খুন—ফা	খুন	গদী—হি	গদী	গুলজার—ফা	
খাট—হি	খাট	খুব—ফা	খুব	গফলতী—আ	গাফিলতি	গোলজার	গুলজার,
খাতির—আ	খাতির	খুবসুরত—ফা	খুপসুরত,	গমছা—হি	গামছা	গুলাব—ফা	গোলাপ
খাদী—হি	খাদি		খাপসুরত	গমলা—হি	গামলা	গুলাম—আ	গোলাম
খানগী—ফা	খানকী	খেদনা—হি	খেদান	গরমী—ফা	গরম	গুস্সা—আ,	
খানসামা—ফা	খানসামা	খেপ—হি	ক্ষেপ	গরীব—আ	গরীব	গুসা—হি	গোসা
খামখাহ্—হি	খামাখা	খেমটা—হি	খেমটা	গলত—আ	গলদ		
খালী—আ	খালি	খেল—হি	খেলা	গলৈয়া—হি	গলুই	গরুআ—হি	গেরুয়া
খাস—আ	খাস	খৈরখাহ—ফা	খয়ের খাঁ	গলী—হি	গলি	গেহুঁ,	
খাসা—আ	খাসা	খৈরাত—আ	খয়রাত	গলীচা—ফা	গালিচা	গোহুঁ—হি	গম
খিচড়ী—হি	খিচুড়ী	খোঁপা—হি	খোঁপা	গবৈয়া—হি	গাইয়ে	গৈর (গ্যায়র)—আ	
খিড়কী—হি	খিড়কি	খোআ—হি	খোয়া	গহনা—হি	গহনা, গয়না		গর (গরমিল)
খিতাব—আ	খেতাব	খোজ—হি	খোঁজ	গাড়ী—হি	গাড়ী, গাড়ি	গ্বাল—হি	গোয়ালা
খিদমত—ফা	খেদমত	খোনচা—হি	খুঞ্চী	গায়ব—আ	গায়েব	গোইন্দা—ফা	গোয়েন্দা
খিলবাড়—হি	খেলোয়াড়	খোরপোশ—হি	খোরপোষ	গারদ—হি	গারদ	গোড়—হি	গোড়
খিলাফ—আ	খেলাপ	খোল—হি	খোল	গালী—হি	গালি	গোবর—হি	গোবর
খিলোনা—হি	খেলনা	খ্যাল(খেয়াল)—আ	খেয়াল	গালী-গলৌজ—হি	গালিগালাজ	গোয়া—হি	গোয়া
খিসারা—ফা	খেসারত	খ্ওজা—ফা	খাজা	গিণতী—হি	গুণতি	গোলন্দাজ—ফা	গোলন্দাজ
খিসারী,		গঞ্জ—ফা	গঞ্জ	গিরফ্তার—ফা	গ্রেপ্তার	গোলী—হি	গুলী
খেসারী—হি	খেসারী	গঠকটা—হি	গাঁটকাটা	গিরহ্—ফা	গিরো, গেরো	গোশ্ত—ফা	গোস্ত
খীরা—হি	খিরাই	গঁবানা—হি	গোঁয়ান	গুংতা, গুতা—হি	গুঁতা		
খীলা—হি	খিল	গঁবার(গঁওয়ার) হি	গোঁয়ার	গুজরাণ, গুজরাণা—হি		—	
খুদ—ফা	খোদ	গগরী, গাগরী—হি	গাগরী	গুজারণা—ফা	গুজারণ		

সর্বহারা

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

বহিয়া চলেছি জীবনের যত গ্লানি,
পাইনি কখনো বরণের শুভ-মালা—
কহে নাই কেহ সোহাগের আধ-বাণী।
জমেছে বক্ষে শত অপমান-জ্বালা।

গোলাপ তুলিতে পেয়েছি কাঁটার ক্ষত।
আলো মিলায়েছে কখন আলেয়া হয়ে।
অভাবের সাথে সংগ্রামি অবিরত
সম্বলহীন, শক্তির অপচয়ে।

মোদের চক্ষে সংসার মরুভূমি,
নাহি ছায়া-ঘেরা শ্যামল কুঞ্জ-বীথি।
মরণ কেবল টেনে নেয় মুখ চুমি।
শাশ্বত ব্যথা মোদের রচির সাথী।

আমাদের তরে নাহি স্নেহ-প্রেম-ধারা,
সংসার মাঝে আমরা সর্বহারা।

তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি

সুবিখ্যাত তন্ত্রসার গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম শিক্ষিত বাঙালীর নিকট অপরিচিত নহে। কৃষ্ণানন্দ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। তন্ত্রসারের পরিচ্ছেদ সমাপ্তিসূচক পুষ্পিকায় গ্রন্থকার আপনাকে "মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ বাগীশ ভট্টাচার্য্য" নামে পরিচিত করিয়াছেন। এস্থলে তাঁহার উপাধি দেখা যায় "বাগীশ"; কিন্তু পরবর্ত্তীকালে অনেকেই তাঁহাকে "আগমবাগীশ" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ "বাগীশ" "আগমবাগীশ" উপাধির সংক্ষিপ্ত আকার।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের "বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বিবরণ" খণ্ডে তন্ত্রসার-রচয়িতা কৃষ্ণানন্দের বংশপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "এই বংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কাশ্যপগোত্রীয় মণ্ডলজানীয় মৈত্র নামে খ্যাত। ইঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমেশ্বরী তলাতে ছিল। পরে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের নানাস্থানে বসতি-স্থাপন করিয়াছেন। এক বংশ অদ্যাপি শ্রীধামে বাস করিয়া ৺আগমেশ্বরী দেবীকে যথারীতি অর্চ্চনাদি করিয়া আসিতেছেন।" (পৃ. ১৫৭) বসু মহাশয়ের গ্রন্থে কৃষ্ণানন্দের শক্তিসাধনা সম্পর্কিত কতকগুলি কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। আগমবাগীশের আবির্ভাবকাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সহিত শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহরাত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুই জনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়। কৃষ্ণানন্দ গৌরকে সখীভাবে ভজনা করিতে নিষেধ করিয়া অপমানিত হন এবং সেই সময় হইতে দুই জনে পৃথক্‌ভাবে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হন। কৃষ্ণানন্দ শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া কালীমূর্ত্তির স্বরূপ প্রকাশ করেন। তৎপূর্ব্বে ঘটে কালিকাদেবীর আরাধনা হইত। এখনও আগমেশ্বরী মন্দিরে (নবদ্বীপে) কৃষ্ণানন্দ স্থাপিত ঘট বর্ত্তমান আছে এবং বহু শাক্ত তথায় মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া ধন্য হইতেছেন।"

বসু মহাশয় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ দুইটি কথা না বলিলে চলে না। প্রথম কথা এই যে, তন্ত্রসার গ্রন্থের সূচনায় ভগবান্ কৃষ্ণের বন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ব্রহ্মাদিসুরপূজিতম্।
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা॥" ইত্যাদি।

ইহা হইতে মনে হয় যে, কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ছিলেন। তন্ত্রসারের তারা বা কালী প্রকরণে তিনি নানা তন্ত্র হইতে মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন; স্বকীয় কোন বিশিষ্ট মতবাদের প্রাধান্য প্রচার করেন নাই। (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. ৪৭২, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।)

দ্বিতীয় কথা এই যে, তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দকে চৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণির সহপাঠী জ্ঞান করা সম্ভব নহে। চৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী আবির্ভূত হন এবং ১৪৫৫ শকাব্দের অর্থাৎ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমীতে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে নরলীলা সংবরণ করেন।*

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির আবির্ভাবকাল ১৪৭৭ এবং ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।† কৃষ্ণানন্দের সহিত চৈতন্য এবং রঘুনাথের বাল্যবন্ধুতামূলক কিংবদন্তী সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আগমবাগীশ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার গ্রন্থখানি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দেরও কিছু পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছিল, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।

ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য পূর্ণানন্দ পরমহংস ১৪৯৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণি সংজ্ঞক বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, "শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীগুরু ব্রহ্মানন্দ মুখারবিন্দ নিস্যন্দমান পরম রহস্যাতিরহস্য নিগমমকরন্দ সন্দোহতুন্দিলানন্দঃ শ্রীপূর্ণানন্দ পরমহংসঃ শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণিং চতুর্দ্দশশতাধিক নবনবতিশকাব্দে বিতনোতি।" (কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ সংস্করণ, পৃঃ ১৪ দ্রষ্টব্য।) কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তদীয় তন্ত্রসারে (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ. ১৫৫) এই শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদি পূর্ণানন্দ এবং কৃষ্ণানন্দ পরস্পর সমসাময়িক প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলেও সে-যুগে (অর্থাৎ যখন চলাচলের আধুনিক সুবিধার অভাব ছিল) নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণানন্দের পক্ষে ময়মনসিংহবাসী পূর্ণানন্দের গ্রন্থের অতি শীঘ্র খোঁজ পাওয়া এবং উহার কোন প্রতিলিপি রচনা অনতিবিলম্বে সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তন্ত্রসারের রচনাকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের

---

* দীনেশচন্দ্র সেন কৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ, পৃ. ২৫৬ ও ২৬৬; R. G. Bhandarkar's *Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems, collected works*, vol. IV, pp. 118,19, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

† *History of Indian Logic*, pp. 463-64)।

অধিককাল পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যায় না। অবশ্য যদি এরূপ কল্পনা করা যায় যে, কৃষ্ণানন্দ শতাধিক বর্ষ বয়সে তন্ত্রসার রচনা করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে চৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণির বাল্যবন্ধু স্থির করা নিতান্ত অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও নিতান্ত অস্বাভাবিক তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজে প্রকাশিত কালীখণ্ড অর্থাৎ শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের প্রথমাংশ সম্পাদন-কালে ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ গ্রন্থের কালনির্ণয়প্রসঙ্গে তন্ত্রসারের রচনাকাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি রচয়িতা পূর্ণানন্দের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মতে গুরু অর্থাৎ পূর্ণানন্দ যদি তাঁহার শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থখানি ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করিয়া থাকেন, তবে শিষ্য অর্থাৎ কৃষ্ণানন্দ ঐ সময়ের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে আনুমানিক ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন। দুঃখের বিষয়, কৃষ্ণানন্দ পূর্ণানন্দের শিষ্য ছিলেন, এই কাহিনী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণানন্দকে কৃষ্ণানন্দের গুরু স্থির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অনেকেই জানেন যে, তান্ত্রিক সাধকগণ গুরুকে সর্ব্বদেবতার সমকক্ষ অথবা তদধিক জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণানন্দ স্বয়ং জ্ঞানার্ণব তন্ত্র হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি তন্ত্রসারে (পৃ. ২) উদ্ধৃত করিয়াছেন।—

"গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতিঃ
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥"

এই প্রসঙ্গে গুরুতন্ত্রের—

"ন গুরোরধিকং শাস্ত্রং ন গুরোরধিকং তপঃ।
ন গুরোরধিকং মন্ত্রো ন গুরোরধিকং ফলম্॥
ন গুরোরধিকা দেবী ন গুরোরধিকঃ শিবঃ
ন গুরোরধিকা মূর্ত্তির্ন গুরোরধিকো জপঃ॥"

এবং গুপ্ত সাধনতন্ত্রের—

"গুরু র্ব্রহ্মা গুরু র্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরু স্তীর্থং গুরু র্যজ্ঞো গুরুর্দ্দানং গুরুর্জ্জপঃ।
গুরুরগ্নি র্গুরুঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥"

ইত্যাদি শ্লোক (প্রাণতোষণীতন্ত্র, বসুমতী সংস্করণ, পৃ. ৯৪-৯৫) লক্ষণীয়। উপরে আমরা শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি হইতে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, উহাতে দেখা যায়, শিষ্য পূর্ণানন্দ কিরূপ সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বীয় গুরু ব্রহ্মানন্দের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গুরুর নামোল্লেখ সম্বন্ধে কুলার্ণব তন্ত্রে স্পষ্ট বলা হইয়াছে—

"শ্রীগুরুং কুলশাস্ত্রাণি পূজাস্থাপানি যানি চ।
ভক্ত্যা শ্রীপূর্ব্বকং দেবি প্রণম্য চ প্রকীর্ত্তয়েৎ॥
গুরুং নাম্না ন ভাষেত জপকালাদৃতে প্রিয়ে।
শ্রীনাথদেবস্বামীতি বিবাদে সাধনে বদেৎ।"
(প্রাণতোষণী তন্ত্র, পৃ. ১০৩ দ্রষ্টব্য।)

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারের একস্থলে (পৃ. ৪৮৯) পূর্ণানন্দের একটি মত খণ্ডন করা হইয়াছে। এখানে বলা হইয়াছে, "পূর্ণানন্দ মতেন লক্ষজপে পুরশ্চরণং, তৎ সন্দিগ্ধমতং; নানাতন্ত্রে লক্ষদ্বয়দর্শনাৎ লক্ষদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণং সিদ্ধমিতি।" যদি পূর্ণানন্দ তন্ত্রসার রচয়িতার গুরু হইতেন, তাহা হইলে এস্থলে তাঁহাকে কেবলমাত্র "পূর্ণানন্দ" বলিয়া উল্লেখ করা হইত না, অন্ততঃপক্ষে "শ্রীপূর্ণানন্দ" বলা হইত। তন্ত্রসারে পূর্ণানন্দের এইরূপ শ্রদ্ধাহীন উল্লেখ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্ণানন্দ কৃষ্ণানন্দের গুরু ছিলেন না।

বসুমতী সংস্করণ প্রাণতোষণীতন্ত্রের আখ্যাপত্রে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত। বইখানি পাঠ করিলে কিন্তু উক্তিটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া জানা যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী খড়দহের বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় রামতোষণের এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। গ্রন্থমধ্যে ইহাকে প্রাণতোষণী নাম্নী লতা বলা হইয়াছে। এই গ্রন্থনামে প্রাণকৃষ্ণ এবং রামতোষণ উভয়ের নামাংশ সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থের নানাস্থানে রামতোষণ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের গুণাবলী ও বংশপরিচয়াদি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে আত্মপরিচয়ও তিনি দিয়াছেন। এক স্থানে (পৃ. ১৪৭) গ্রন্থকার নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"শ্রীপ্রাণকৃষ্ণকৃতিরস্ত নিদেশবর্ত্তী
মৈত্রেয়বংশজকুলাশ্রিতচক্রবর্ত্তী।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, রামতোষণ বারেন্দ্রব্রাহ্মণ সমাজের অকুলীন মৈত্রেয় বংশীয় ছিলেন। অন্যত্র (পৃ. ৭৭) তিনি নিজের পরিচয় দিয়াছেন—

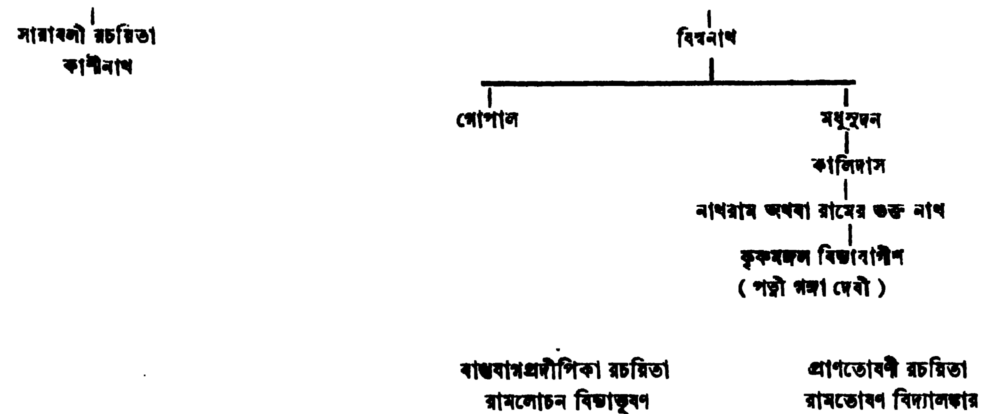
"কৃষ্ণমঙ্গলবিদ্যাবাগীশসূনুঃ সতাংমুদে।
গঙ্গাদেবীসুতোকার্ষীৎখর্ব্বকাণ্ডং দ্বিতীয়কম্॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণমঙ্গল বিদ্যাবাগীশ এবং গঙ্গাদেবী রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের জনক-জননী ছিলেন। অপর একস্থানে (পৃ. ১০৫) গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "মদগ্রজরামলোচন বিদ্যাভূষণকৃত বাস্তুযাগপ্রদীপিকা ধৃত হয় শীর্ষপঞ্চরাত্রে" ইত্যাদি। সুতরাং রামলোচন বিদ্যাভূষণ নামে রামতোষণের এক অগ্রজ ছিলেন এবং তিনি বাস্তুযাগপ্রদীপিকা-সংজ্ঞক টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থের কয়েক স্থলে দেখা যায়, "অস্মদ্ গোষ্ঠী গরিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দাগমবাগীশেন স্বকৃততন্ত্রসারে সর্ব্বং লিখিতম্" (পৃ. ১০৪), "অস্মদ্ গোষ্ঠী গরিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দাগমবাগীশেন স্বকৃততন্ত্রসারগ্রন্থে লিখিতা" (পৃ. ১৪৩), ইত্যাদি। ইহা

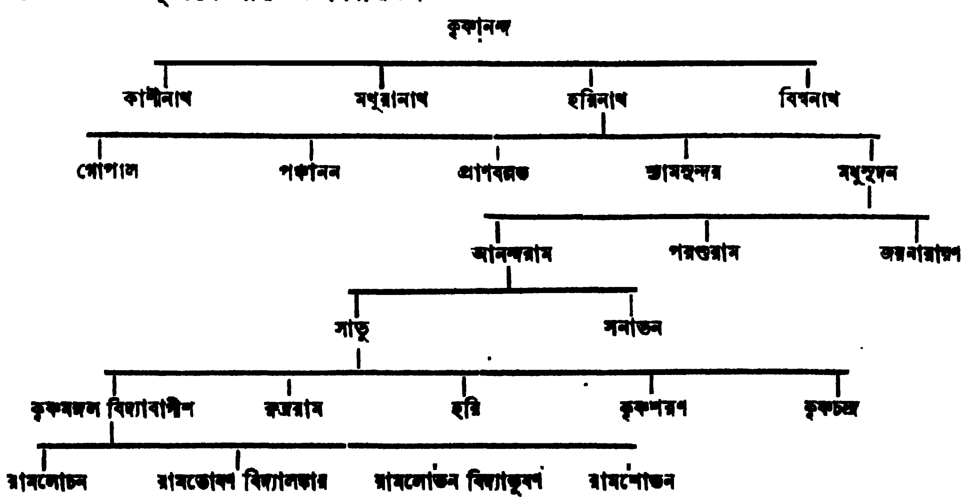
হইতে জানা যায় যে, তন্ত্রসার-রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ প্রাণতোষণীকার রামতোষণের অনেক পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের সম্পর্ক স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, "অস্মদত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কৃষ্ণানন্দাগমবাগীশের তন্ত্রসারে লিখিতে" (পৃ. ১১৬) "অস্মদত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সজ্জনগোষ্ঠী গরিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দাগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যৈঃ স্বকৃততন্ত্রসারে লিখিতম্" (পৃ. ৭৫), ইত্যাদি। সুতরাং কৃষ্ণানন্দ রামতোষণের "অতি-অতি-বৃদ্ধপ্রপিতামহ" ছিলেন, অর্থাৎ রামতোষণকে কৃষ্ণানন্দের "অতি-অতি-বৃদ্ধ-প্রপৌত্র" বলিতে হইবে, কেবলমাত্র "বৃদ্ধপ্রপৌত্র" নহে। স্বয়ং, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ—এই ক্রমানুসারে কৃষ্ণানন্দ রামতোষণের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ ছিলেন। প্রাণতোষণীর একস্থলে (পৃ. ১৪৬) একটি বিস্তৃত বংশলতিকায় উভয়ের সম্পর্ক আরও পরিষ্কাররূপে দেখান হইয়াছে।

"ধীমান্ শ্রীমান্ ভুবন বিদিত তন্ত্রসারস্ত কর্ত্তা।
কৃষ্ণানন্দোহজনি ভুবি নবদ্বীপদেশপ্রদীপঃ।
কাশীনাথো ভবদিহ সুতস্তস্ত সারাবলীকৃৎ।
বিদ্বান্ মান্যোহজনি তদনুজো বিশ্বনাথাহ্বয়োহতঃ।
গোপালো নির্ণয়কৃতি যশস্বী মধোঃ সূদনাচ্চা (সূদনস্চা)
ভূতাং পুত্রৌ মধুসুত ইতঃ কালিদাসঃ প্রসিদ্ধঃ।
তৎ পুত্রোহভূদ্রঘুবরপরো নাথ একান্তবুদ্ধি—
স্তৎসূনুশ্চাভবদিহ সুধীর্ম্মঙ্গলঃ কৃষ্ণ পূর্ব্বঃ।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলসুতো নববল্লিকায়াঃ
শ্রীরামতোষণ ইদং কৃতবান্ দ্বিতীয়ম্।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বংশলতা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বিবরণাদি হইতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিম্নোদ্ধৃত বংশ-লতিকা প্রস্তুত হইতে পারে।



নগেন্দ্রনাথ বসু তদীয় গ্রন্থে (পৃ. ১৬১) মঙ্গলকানীর মৈত্রবংশের যে লতিকা প্রকাশ করিয়াছেন, উহার সহিত প্রাণতোষণী হইতে উদ্ধৃত বংশলতার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এ বিষয়ে প্রাণতোষণীর প্রামাণ্য অধিক হইলেও তুলনার জন্য আমরা বসু মহাশয়ের প্রকাশিত বংশলতিকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন যে, নামগুলি অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং সম্পূর্ণরূপে শাক্ত প্রভাববর্জ্জিত।



যাহা হক, তন্ত্রসারচয়িতা কৃষ্ণানন্দ প্রাণতোষণীকার রামতোষণের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ পঁচিশ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষ্ণানন্দের আবির্ভাব কাল রামতোষণের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। রামতোষণের প্রাণতোষণী (পৃঃ ৩) "শাকে নেত্রযুগাদ্রিকাগুপিমিতে তীতে কয়ারাভিখৌ" অর্থাৎ ১৭৪২ শকাব্দের (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের) অক্ষয়া (সম্ভবতঃ অক্ষয় তৃতীয়া) তিথিতে সমাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থখানি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্বর অর্থাৎ বাংলা ১২৩১ সালের ২৯শে কার্ত্তিক তারিখের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ৬০ পৃষ্ঠায় ঐ তারিখের সমাচার দর্পণের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।) রামতোষণের প্রাণতোষণী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলে, তদীয় ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার ঐ সময়ের দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

বঙ্গবাসী সংস্করণ তন্ত্রসারের ভূমিকায় স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ঐ সংস্করণের পাঠ নিরূপণের জন্য মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত হরিপদ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে তন্ত্রসারের একখানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল; উহার অনুলিখনের তারিখ ১৫৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই উক্তি সত্য হইলে, মনে করা যায় যে, কৃষ্ণানন্দের যৌবনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তন্ত্রসার গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছিল এবং স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুথিখানি গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই অনুলিখিত হইয়াছিল। কিন্তু পুথিখানির অনুলিপির তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৫৮০ শকাব্দ কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। ঐ পুথির সহিত সংশ্লিষ্ট কেহ যদি আমাকে উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ দেন, তবে অত্যন্ত উপকৃত হইব। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আবির্ভাবকাল নির্ণয়সম্পর্কে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, তবে উহা আমাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় জানাইবেন, এই অনুরোধ করি। উল্লিখিত পুথিখানির তারিখের পাঠে বা ব্যাখ্যায় ত্রুটি থাকা অসম্ভব না হইতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার গ্রন্থখানি যে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।

মুক্তি-ঘোষণার দিনে অশ্রু ঝরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মেঘমুক্ত নহে আজ ভারতের ভাগ্যাকাশ
নব ঘোষণায়।
উদয়াচলের পথে স্বাধীন সূর্য্যের শিখা মৌন ম্লান হেরি
দ্বিখণ্ডিত স্বদেশের যাত্রীদল ভেবেছ কি?
চলেছ কোথায়!
স্বাধীনতা এলো বটে: তারি সাথে ইতিহাস
দীর্ঘশ্বাস লয়ে
অতীতের বিভীষিকা দস্যুতার নিষ্ঠুরতা-স্মৃতি আনে বয়ে।

অসত্যের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের পূতিগন্ধ
হয়েছে দুঃসহ।
বৈরতন্ত্রী সভ্যতার দলকেন্দ্রী-পশ্বাচার এ ঘোর প্রান্তরে!
জীবনের মহীরুহ অসার হয়েছে বন্ধু,
পুষ্পগন্ধবহ
নাহি আজ। ওঠে ঝড়, মুক্তি-ঘোষণার দিনে অশ্রু ঝরে।
আসমুদ্র হিমাচল ভাল করে দেখিবারে
দৃষ্টিদীপ জ্বালো,
শেষ আলিঙ্গন করি এস মেঘে মেঘে ঢেকে—
যায় মুক্তি আলো।

দুশো বছরের পরে ভেবেছিনু পাবো ফিরে
গত স্বর্ণ যুগ।
নিরাশার নদীকূলে চিতাবহ্নি—দগ্ধ দেখ সমাজ সংসারে;
এখনো সীতার অশ্রু অশোক কাননে ঝরে
ভেঙে যায় বুক।
এখনো পাঞ্জাবী কাঁদে, অন্তর কাঁপিয়া ওঠে অস্ত্রের ঝঙ্কারে।
যে ভ্রান্তিবিলাস নেতৃত্বের দেখে গেনু মোর গোধূলি লগনে,
তারি পরিণাম কহি যদি, মোরে কি করিবে ক্ষমা মুক্ত মনে?

দূর সীমান্তের পারে একবার চেয়ে দেখো
ঘন কৃষ্ণ মেঘ,
বিন্ধ্যাচল নড়ে ওঠে ধূর্জ্জটির তপোভঙ্গে
কে রোধিবে বেগ!
কে জানে কখন এই অর্দ্ধভগ্ন মাতৃভূমি রণক্ষেত্র হবে,
শান্তি নাই সাম্প্রতিক হে স্বাধীন বন্ধু মোর মুক্তির উৎসবে।

পাকিস্থানে হিন্দুদের মানুষের মত বাঁচিবার উপায়

শ্রীরঞ্জনকুমার দত্ত

নোয়াখালিতে গত ১৯৪৬-এর অক্টোবর-দাঙ্গার পর থেকে বিধ্বস্ত এলাকার হিন্দুদের মধ্যে কাজ করা হচ্ছে—প্রধানতঃ পুনর্বসতির কাজ। এই কাজ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, হিন্দুদের মনোবল এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে সরকার তাদের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র প্রভৃতির জন্যে অর্থসাহায্য করলেও গ্রামে বাস করার মত সাহস তাদের নেই। মুসলমানাতঙ্ক জলাতঙ্কের ন্যায় প্রত্যেক হিন্দুর মনে ব্যাধির রূপ নিয়েছে। পল্লীসেবকদের কাছে এই অবস্থা অতিশয় বেদনাদায়ক মনে হয়। তাঁরা চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুনর্বসতির সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। লোকে গৃহনির্মাণের জন্যে টাকা পায়, আসবাবপত্র বা ব্যবসায়ের জন্যেও পায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বাস্তুভিটা ছেড়ে শহর বা অন্যত্র চলে যায়। দেশের বাড়ীতে যে বসবাস করবে বা কখন বসবাস করতে পারবে এ তাদের মনে স্থান পায় না, পরবর্তীকালেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবহারে এমন আশ্বাস তারা পায়নি যাতে তাদের উপর তারা আস্থা স্থাপন করতে পারে। এই অবস্থায় গ্রামবাসীকে গ্রামেই ফিরিয়ে আনা ও বাড়ীঘর তৈরি করে বাস করতে বলা পরিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

তাই বহিরাগত ও স্থানীয় সেবকদল হিন্দুদের মধ্যে যাতে সাহসের সঞ্চার হয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে কর্মে প্রবৃত্ত হন। হিন্দুদের সাহস ও মনোবল ফিরিয়ে আনার দিকেই বেশী জোর দেওয়া হয়। বিশেষ করে গান্ধী-ক্যাম্পের অধীনে যতগুলি কেন্দ্র বিধ্বস্ত এলাকায় বিভিন্ন স্থানে আছে সেগুলোর মারফতে এই সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা সুরু হয়। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই কর্মীদের নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

এতকাল অখণ্ড বাংলায় অধিবাসী হিসাবে গণ্য ছিল পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা। সংখ্যায় লঘু হলেও হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলে তারা নিজেদের ততটা অসহায় বলে মনে করে নি। কিন্তু আজ ত পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক হিন্দুর মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে তারা কি এখানেই থাকবে, না আর কোথাও যাবে? তাদের মানুষের মত বাঁচবার উপায় কি? তাদের উপর ভবিষ্যতে যদি পাকিস্তান-সরকার পীড়ন ও দুর্ব্যবহার করে তবে প্রতিবিধানের উপায়ই বা কি?

এ সকল প্রশ্নের জবাবও সোজা। কিন্তু যে পথ কংগ্রেস এতকাল দেখিয়ে এসেছে সে পথে চলতে আজ অনেকের মনে দ্বিধা জাগছে। মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক মিঃ জিন্নার উক্তিতে এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয় যে পাকিস্তানের শাসন, সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতি ইসলামিক ধর্মের ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সে নিছক ভুয়া হয়ত নয়। তবে এর আসল উদ্দেশ্য হ'ল রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধার এবং মনে হয় মিঃ জিন্না সেই উদ্দেশ্যেই সম্প্রতি উচ্চরোলে একথা ঘোষণা করেছেন। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে অত্যুগ্রভাবে না দেখলে ভারত বিভাগের জন্যে এমন মরিয়া হয়ে উঠার আবশ্যকতা ছিল কি?

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থায় এবং অখণ্ড হিন্দুজাতিকে খণ্ডিত করে বর্ণহিন্দু এবং তপশীলী হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদ সৃষ্টি করার ফলে ভারতবর্ষে যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তারই পরিণতি পাকিস্তান। ভারতীয় ইউনিয়ন হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি এড়াতে ইচ্ছা করে তবে অনতিবিলম্বে উদার হিন্দুধর্মের ছায়াতলে সকল হিন্দুকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আজও যখন দেখি বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্যে আট বছরের পড়ুয়া ছেলে আবেদনপত্রে জাতির পরিচয় দিতে "হিন্দু" স্থলে তপশীলী হিন্দু বা "schedule caste" লিখে নিয়ে আসে, তখন ব্রিটিশের ভেদনীতি যে কতদূর কার্যকরী হয়েছে তা ভেবে মন বেদনায় ভরে ওঠে। এই বয়সের ছেলে—হিন্দু কি মুসলমান প্রশ্ন করলে বলতে পারে না যে সে হিন্দু। যদি বলি, তুমি মুসলমান ত নও! উত্তর হয়—না। তবে হিন্দু ত? না আমরা "সিডিউল কাষ্ট"। "সিডিউল কাষ্ট" বলে কোন ধর্ম আছে কি? "না"। তবে কি তোমার ধর্ম? নমাজ পড় না, গির্জায় উপাসনা কর না। দেবদেবীর পূজা কর ত? তোমাদের বাড়ীতে মনসাপূজা হয় না? হয়। হরিসভায় নামকীর্তন কর না? করি। তবে ত হিন্দু তোমরা—হিন্দু ত? "হাঁ"।

এই যে ভেদবুদ্ধির বীজ বালক-মনে উপ্ত হয়েছে আস্তে আস্তে তাই একদিন মহীরুহে পরিণত হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে। তখন "সিডিউল কাষ্ট"ই ধর্ম হয়ে দাঁড়াবে। তাই আজ সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে বর্ণহিন্দুদের বলব,—যদি মানুষের মত বাঁচতে হয় এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের যাবতীয় জন্মগত অধিকার বজায় রেখে টিকে থাকতে হয় তবে সঙ্কীর্ণতা পরিহার করে উদার ও প্রকৃত হিন্দু হও। এক সার্বজনীন হিন্দু ধর্মের পতাকাতলে সকল হিন্দুকে সমবেত কর। এক ধর্ম, এক মন, এক প্রাণ, এক জাতি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হও। অখণ্ড ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যেমন ভারতবাসীর মহা অনিষ্ট সাধন করেছে তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিভাগ বা জাতিভেদের সুযোগ নিয়ে হিন্দুজাতিকে শতধা বিভক্ত করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সহজসাধ্য হবে। হিন্দুজাতি যদি এমনিভাবে বহুধা বিভক্ত হয় তবে ধীরে ধীরে অনুন্নত সম্প্রদায়কে গ্রাস করে ফেলা ইসলাম ধর্মের পক্ষে অসম্ভব হবে না। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব ও হিন্দুত্ব

বিলুপ্ত হবে। এই রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে যদি না হিন্দু সমাজকে অচিরে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়।

মনে হয়েছিল নোয়াখালির হিন্দুরা আঘাতের ভেতর দিয়ে এমন একটা শক্তি লাভ করবে যে বাংলার অপরাপর জেলার হিন্দুদের কাছে তা আদর্শ-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সে আশা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। নোয়াখালির হিন্দু আজ সকল দিক দিয়েই রিক্ত হতে চলেছে। দাঙ্গায় যা হবার তা ত হয়েছে ; সে অপূরণীয় ক্ষতির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ওদিকে আবার ভারতীয় ইউনিয়ন হতেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে পূর্ব-বাংলার অবদান নেহাৎ কম নয়। কিন্তু তা সত্বেও অদৃষ্টচক্রে আজ তারা স্বাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসী হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল, কিন্তু শুধু এতেই ত শেষ নয়।

আজও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বর্ণহিন্দুরা তথাকথিত অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি যে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করে তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও আত্মাবমাননাকর। কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় ভারতের এবং সকল ভারতবাসীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে। আজও যদি এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে ছোট মনে ক'রে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে তবে সে মূঢ়তার তুলনা হয় না। স্বাধীনতা লাভের জন্যে এত যে আন্দোলন, এত যে দুঃখবরণ অনেক বেদনার মধ্য দিয়ে আজ তা সার্থক হতে চলেছে। সেই স্বাধীনতাকে যদি স্থায়ী-ভাবে রক্ষা করতে হয় তবে উচ্চ বর্ণদের অভিমান পরি-ত্যাগ করে এক-জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সাম্যের ভিত্তিতে ভেদবৈষম্যহীন সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। গণমন সেই দিকেই ঝুঁকছে। আজ যদি বর্ণকৌলিন্যের মোহে সমাজের যারা মেরুদণ্ড তাদেরই অবজ্ঞা করা হয়, মানুষের মর্যাদা থেকে তাদেরই বঞ্চিত করা হয় তবে এর পরিণাম এক দিন বিষময় হয়ে উঠবে। সমগ্র পৃথিবীতে আজ ধনতন্ত্রবাদের সমাধি-রচনার আয়োজন চলছে। এই বিবর্তনকালে বিত্তশালী ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের আজ যুগধর্মকে স্বীকার করে নিতে হবে। ভারতের দারিদ্র্য অপরিসীম। যারা সমাজ ও দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই তথাকথিত নীচশ্রেণীর অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত। কিন্তু ওরাই পেট ভরে খেতে পায় না, পরণে ওদেরই বস্ত্র জোটে না, ওরাই মাথা গোঁজবার আস্তানা পায় না। এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে। যে মালী-চুলী, যে কর্মকার, যে নাপিত, যে চর্মকার, যে ধোপা, যে তাঁতি না হলে সমাজ-জীবন একেবারে অচল, তাদের জল-অচল বা অস্পৃশ্য করে রাখার কোন মানে হয় না। তাদের সেবা নিতে কুণ্ঠা নেই অথচ মানুষের যোগ্য মর্যাদা তাদের দেব না, এ মনোবৃত্তি সর্বথা নিন্দনীয়।

ইতিমধ্যেই তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগরণের আভাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিত্তশালী এবং বর্ণাভিমানীদের অত্যাচার আর সহ্য করতে যে তারা রাজী নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাদের সুপ্ত আত্মসম্মানবোধ আজ জাগ্রত হয়ে উঠেছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত নোয়াখালীতে দেখলাম। এখানে অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা বর্ণহিন্দুদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে 'বয়কট নীতি' অবলম্বন করেছে। এর ফল খুব মারাত্মক। একে তো এখানে মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে সকল প্রকার সহযোগিতা বর্জন করেছে, তার উপর অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত—তথাকথিত নীচশ্রেণীর হিন্দুরাও যদি আঘাত পেয়ে বর্জন-নীতি গ্রহণ করে তখন বর্ণহিন্দুদের বর্ণাভিমান কোথায় থাকে ?

গান্ধীজী প্রেমের পথ দেখিয়েছেন। তিনি বিত্তশালী ও অভিজাত-সম্প্রদায়কে অনুন্নত অস্পৃশ্য দীন দরিদ্রের সেবায় অগ্রসর হতে বলেছেন, কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে ধনাঢ্য বা বর্ণহিন্দুরা ধন ও বর্ণাভিমান ত্যাগ করে দরিদ্র এবং অস্পৃশ্য-দের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এমন উদাহরণ আমাদের সামনে কম। এযুগ নিপীড়িত, শোষিত ও লাঞ্ছিতদের জাগরণের যুগ। আজ যদি অভিজাত-সম্প্রদায় গান্ধীজীর নির্দেশিত প্রেমের বাণী অনুসরণ না করেন তবে তাদের পরিণতি কি হবে তা কেউ বলতে পারে না।

বর্ণভেদ ও ধনবণ্টনবৈষম্য বশতই সমাজে উচ্চনীচের বিভেদ আজ শিকড় গেড়ে বসেছে। বিভেদ দূরীকরণের পথে প্রধান বাধা আসছে বিত্তশালীদের কাছ থেকেই। এক বর্ণেরই মধ্যে বিত্তপ্রাধান্য বশত একে অপরকে হেয় জ্ঞান করে আসছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কাজেই ধন-বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা যে বিভেদের এক প্রধান হেতু সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৈষম্য দূর করতে হবে। অন্যথা দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নেই। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনার আর বিলম্ব নেই। তাই সময় থাকতে মিথ্যা বিত্তাভিমান বিসর্জন দিয়ে শ্রেণীহীন হিন্দুসমাজ গঠন করতে, পাকিস্তানের হিন্দুদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাই। নোয়াখালীর হিন্দুরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে আস্তে আস্তে পাকিস্তান-বহির্ভূত এলাকায় চলে যাচ্ছে। ভয় তো অমূলক নয়। পাকিস্তান আয়ত্তে এসেছে তবুও সম্প্রদায়বিশেষের সন্তোষ নেই। হিন্দুর হিন্দুয়ানী তাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই চক্ষুশূল। চুরি, রাহাজানি, ভীতি-প্রদর্শন বোধ হয় কায়েম হয়ে গেল। এহেন পাকিস্তানে হিন্দু দাঁড়ায় কোথায় ? প্রত্যেকটি মুসলমানের মনোভাব এই যে, হিন্দুরা তাদের আশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থী, ভবিষ্যতে তাদের গোলামি করেই হিন্দুদের পাকিস্তানে থাকতে হবে এই অবস্থায় স্বাধীন মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাস করতে হলে সকল হিন্দুকেই সব রকমের ভেদবৈষম্য বিসর্জন দিয়ে এক হতে হবে। হিন্দুসমাজকে বর্ণবিহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হতে হবে। যে ধরণের বর্ণবৈষম্য এখন প্রচলিত তা কখনই

শাস্ত্রসম্মত নয় এবং তা জনকল্যাণমূলকও নয়। পাকিস্তানের হিন্দুরাও সম্মানে জীবনযাপন করতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। এ অবস্থায় হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সকল রকমের শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীবৈষম্য দূর করে হিন্দুশক্তিকে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

আলোচনা

"শ্রীহট্ট ও সংস্কৃত সাহিত্য"

"প্রত্নকন্ন"

উল্লিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৪, পৃ. ৩০১-২) বহু অমূলক ও ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ উক্তি স্থানলাভ করিয়াছে। এগুলির সংশোধন আবশ্যক।

(১) রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টনিবাসী কি না, এ বিষয়ে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধেও (সাহিত্য-পরিষদ্-পত্রিকা, ১৩৫০ পৃ. ৬-১০) প্রমাণিত করা হইয়াছে যে, শিরোমণি রাঢ়ীয় শ্রেণী, শূলপাণির দৌহিত্র ও রাঢ়ীয় ঘোষাল বংশীয় নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। শ্রীহট্টের কতিপয় ব্যক্তির চক্রান্তে ১৩১০ সন হইতে শিরোমণির উপর শ্রীহট্টের দাবি প্রচারিত হয়। বর্ত্তমানে এই অমূলক দাবি সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করা উচিত। অধ্যাপক দাস মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধোল্লিখিত প্রমাণাবলীর বিরুদ্ধে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ করুন। প্রবন্ধে শিরোমণির ১৯টি টীকার নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে অনুমানখণ্ডদীধিতি ও অনুমানচিন্তামণি দীধিতি অভিন্ন। বৌদ্ধমূল ব্যাখ্যা ও প্রামাণ্য (বাদ) দীধিতি ব্যতীত বাকী সব কয়টিই অনুমানদীধিতির অন্তর্ভূত পরিচ্ছেদ মাত্র, পৃথক টীকাগ্রন্থ নহে। বৌদ্ধমূল ব্যাখ্যা অর্থাৎ অতিদুর্লভ আত্মতত্ত্ববিবেক দীধিতির পুথি বস্তুতই শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে কি?

(২) কাব্যপ্রকাশ (ও সাহিত্যদর্পণের) সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার শ্রীহট্টনিবাসী নহেন। উক্ত টীকাই বাংলায় সর্ব্বত্র এবং বাংলার বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়াছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত "প্রদীপ" নামক কতিপয় স্মৃতি গ্রন্থের রচয়িতা মহেশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি। তাঁহার "প্রদীপ"-গ্রন্থের কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। "অষ্টাবিংশতি প্রদীপ" প্রভৃতি অমূলক উক্তি না করিয়া একটিমাত্র "প্রদীপে"র প্রকৃত বিবরণ পাইলে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয়।

(৩) দীধিতির টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কারের অধস্তন বংশধরগণ অদ্যাপি নবদ্বীপে সসম্মানে বাস করিতেছেন এবং তাঁহাদের কুলপরিচয়াদি সর্ব্বজনবিদিত। ইঁহারা "বৈদিক"—মহাপ্রভুর শ্বশুর সনাতন মিশ্র হইতেই ইঁহারা নবদ্বীপবাসী। জগদীশ সনাতনের প্রপৌত্র ছিলেন—তাঁহাকে শ্রীহট্টের লোক বলা আদৌ সঙ্গত নহে। জগদীশের রচিত গ্রন্থোল্লেখ-মধ্যেও অনেক ভুল আছে।

(৪) রঘুনন্দন শ্রীহট্টনিবাসী ছিলেন না এবং তাঁহার মতও ব্যাপক ভাবে শ্রীহট্টে প্রচলিত নাই। প্রবাদমাত্রেই বিনা বিচারে গ্রহণীয় নহে। 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্বং' তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ বলায় অগ্রে উল্লিখিত শুদ্ধিতত্ত্বাদি হইতে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়ে। তাহা একেবারেই ভুল।

(৫) ৪০০ বৎসর যাবৎ বাংলায় সকলে জানিয়া আসিয়াছে যে কাঞ্চনপল্লী নিবাসী চৈতন্যপার্ষদ কবিকর্ণপূরের বংশ লোপ পাইয়াছে। হঠাৎ অদ্য জানিতেছি যে, তাঁহার বংশ এখনও শ্রীহট্টে বিদ্যমান। অধ্যাপক দাস মহাশয় অবিলম্বে এই বংশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রচার করিলে ভাল হয়। "কবিকর্ণপূর" একটি উপাধিমাত্র, এই উপাধিসমন্বিত বহুতর ব্যক্তি বাংলার নানাস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই চৈতন্যপার্ষদ নহেন।

প্রবন্ধশেষে যে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি ক্রমানুসারে লিখিত আমরা বুঝিলাম না। দিব্যসিংহের বাল্যলীলাসূত্রের পরই পদ্মনাভ সরস্বতীর গীতাভাষ্য। এই তালিকামধ্যেও কয়েকটি অতি উৎকট দাবি করা হইয়াছে। জয়ন্তিয়ার কবিরাজের "রাঘবপাণ্ডবীয়" সুপ্রাচীন শ্লেষকাব্য, ইহা দাক্ষিণাত্যের কাদম্বরাজবংশীয় রাজা কামদেবের সভায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীহট্টের সংলগ্ন জয়ন্তিয়ার দাবি এস্থলে ঘুণাক্ষরন্যায়দ্বারাও সমর্থন করা যায় না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের স্বল্পকালপরবর্ত্তী গোপাল (কুত্রাপি রামগোপাল বলিয়া লেখা নাই) ন্যায়পঞ্চাননের "নির্ণয়" গ্রন্থসমূহ মিথিলাদিদেশেও প্রচারলাভ করিয়াছিল। তিনি শ্রীহট্টের এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই নিষ্প্রমাণ উক্তি। বানিয়াচঙ্গের মহাদেব পঞ্চাননের "সাংখ্য-ভাষ্য" নিতান্তই এক অভিনব আবিষ্কার, বিনা আলোচনায় ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। উক্ত পঞ্চাননের সময়ে সাংখ্যদর্শনের পঠনপাঠন বঙ্গদেশে লোপ পাইয়াছিল। শ্রীহট্টে বহু পণ্ডিতবংশ ছিল এবং এখনও আছে। তাঁহাদের রচিত সংস্কৃতগ্রন্থাদির বিবরণ কষ্টসাধ্য বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বারা সংগ্রহ করা আবশ্যক।

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্র

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান বলতে মনোবিজ্ঞানের যে বিশেষ মতবাদটি বোঝায় তার প্রবর্তক হলেন সুইস্ চিকিৎসক সি. জি. ইয়ুং (C. G. Jung)। ১৮৭৫ সালের ২৬এ জুলাই সুইজারল্যাণ্ডে এঁর জন্ম হয়। প্রথমে ইনি মনঃসমীক্ষার (Psycho-analysis) প্রবর্তক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-এর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকেন, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে ফ্রয়েডের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসেন ও ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষা থেকে নিজের মতবাদের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্ত তার নাম দেন 'বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান' (Analytical Psychology)। ফ্রয়েড তাঁর মতবাদে মানুষের যৌন প্রবৃত্তির উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এমন কি, বলা যেতে পারে যে, মানব-জীবনের মূলে তিনি এই এক যৌন-প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পান নি। মানুষের যা কিছু আচরণ-ব্যবহার, আশা-আকাঙ্ক্ষা—তা সবই এই প্রবৃত্তির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইয়ুং এ মতবাদকে মনে করেন নিতান্ত একাদেশদর্শী; তাই ফ্রয়েডের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারলেন না। ফলে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও পরীক্ষা করে তিনি তাঁর বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান গড়ে তুললেন।

বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রথম স্বীকৃতি হ'ল জড় নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এক মনের অস্তিত্ব। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীটাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের যুগ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের নব নব গবেষণায় ও আবিষ্কারে সেই যুগের মন বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মানুষের চিন্তা এত বেশী পরিমাণে এই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে প'ড়েছিল যে, যা কিছুই তার পরীক্ষাগার ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে তাকেই সে অস্বীকার করল। এই জাতীয় এক অস্বীকৃতি ছিল মন সম্বন্ধে। ফলে সে-যুগের মনোবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে দেখা দিয়েছিল 'মনোহীন মনোবিজ্ঞান' (Psychology without psyche)রূপে। অর্থাৎ বলা হয়েছিল যে মনের কোনো স্বাধীন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। মন বা চেতনা—জড় পদার্থের ক্রমবিকশিত রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইয়ুং একথা মানলেন না। তিনি বললেন যে, এ অত্যন্ত ভুল কথা। কেননা অন্ততঃ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না মেনে উপায় নেই। আর তাই যদি ঠিক হয়, অর্থাৎ মন যদি জড় নিরপেক্ষ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হয় তবে এটাও মানতে হবে যে জড়দেহের সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ তা অবিচ্ছেদ্য নয়। অর্থাৎ মন নৈর্ব্যক্তিক (impersonal), ও যে-কোনো জ্ঞাতা বিশেষের আয়ত্তের বাইরে (objective)। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এমন আকুতি দেখা দেয় যাকে কোনো প্রকারে দমন করাই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। মন খারাপ হলে ইচ্ছেমত তাকে আমরা ভাল করে ফেলতে পারি না; বা স্বপ্নের মধ্যে কি দেখতে চাই, আর কি চাই না, তার দ্বারা প্রকৃত স্বপ্নকে আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যেও সময়ে সময়ে এমন এক আবিষ্ট ভাব (obsessed thought) দেখা যায় যাকে যুক্তিতর্ক বিচার- কোনো কিছুর দ্বারাই দূর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সমস্ত থেকে বুঝা যাবে যে, মনের উপর প্রকৃতপক্ষে আমাদের কোনো হাত নেই। এ কথাটা আরও বিশেষ করে সত্য এইজন্ত যে, আমাদের জীবন অচেতনার দ্বারা এত বেশী পরিমাণে পরিচালিত হয়ে থাকে যা আমরা সাধারণতঃ ধারণা করতে পারি না। আদিম মানুষ এই সত্যটি জানত। আত্মা তার কাছে ছিল নিজের বাইরে বস্তুগত কোনো অস্তিত্ব, যার সঙ্গে সে কথা বলতে পারত। এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ইয়ুং বলছেন, নিজ অস্তিত্বের বাইরে আত্মার বাস্তব অস্তিত্বের যে ধারণা আদিম মানুষ করেছিল তার বিরুদ্ধে সমর্থনযোগ্য কোনো যুক্তি নেই। আত্মার যদি অন্যনিরপেক্ষ বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, এবং আমাদের সচেতন কাজকর্ম যদি তারই দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে আর একটা সিদ্ধান্ত সহজেই এসে পড়ে যে, সে-ই আমাদের জীবনের মূল উৎস। প্রকৃত পক্ষে ইয়ুং সেই কথাই বলেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, 'আমি' ভাব বা আত্ম-চেতনা জন্ম নেয় অচেতনার ভিতর দিয়ে। ছোট শিশুর জীবনে কোনো আত্মচেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না; এবং সেইজন্যই ছোট বেলার স্মৃতি থাকে না। তা হলে প্রশ্ন এই যে, আমাদের বুদ্ধি ইত্যাদি আসে কোথা থেকে? আমাদের উৎসাহ, প্রেরণা, উত্তেজনা ইত্যাদির মূলই বা কি? আদি মানবেরা আত্মার মধ্যেই জীবনের সমস্ত উৎস খুঁজে পেয়েছিল; এবং এইজন্তই তাদের কাছে আত্মা ও জীবন এক। এর থেকে যদি মনে করা হয় যে, আত্মা অমর ও শাশ্বত, তা হলে তথা-কথিত আধুনিক জগতে হয়তো ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু ইয়ুং-এর মতে এ কল্পনাতে খুব বেশী ভুল হবে না। কেননা আত্মা মোটের উপর এমন একটা কিছু যা সাধারণের বাইরে। অন্যান্য প্রায় সবই কিছু পরিমাণ স্থান অধিকার করে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু আত্মাকে কোনো স্থানেই পাওয়া যাবে না। সে দেশাতীত। মনের ক্রিয়াসমূহকে দেহের কোনো কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ বলে নির্দিষ্ট করায় (localisation

of psychic functions) চেষ্টা করা হয়েছে ; কিন্তু তা প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়েছে। তা বাদে মনের সম্বন্ধে কোন্ বিশেষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে ? সে কি ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ভারী, তরল, সরল, বৃত্তাকার অথবা অন্য কিছু ?

অবশ্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার করলেই সমস্ত সমস্যাটি সহজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু একটা যে আছে এ কথা অস্বীকার করা চলে না। মন যদি দেশাতীত হয় তা হলে তার অবয়ব থাকাও সম্ভব নয় এবং যার কোনো অবয়ব নেই, যে দেশাতীত ও নিরাকার তার মৃত্যু নেই। আর যা অনন্ত তা অনাদি। অনাদি না হলে অনন্ত নিজেই যুক্তির দিক থেকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তা হলে বলা অসঙ্গত হবে না যে, মানুষ তার নিজ 'আমি' সম্বন্ধে সচেতন হবার অনেক আগে থেকেই—সেই 'মন' বর্তমান থাকে। এবং যে সময় সাময়িক ভাবে আমাদের সচেতনতা লুপ্ত হয় তখনও সেই মন সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে। যেমন স্বপ্ন। এর থেকে আমরা আর একটা কথা বুঝতে পারি। আগের কালে 'মন'কে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই সময়কার সভ্যতায় 'স্বপ্ন' ও 'দৃষ্টি' (vision)-কে জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হ'ত। তার কারণ সেই সময়ে লোকে মনের এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিল। এই জাতীয় যুক্তি থেকে ইয়ুং মনোবিজ্ঞানে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেন ও বললেন যে, মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করব অথচ মনেরই কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব ও ক্রিয়াপদ্ধতি অস্বীকার করব, এ অতি হাস্যকর প্রস্তাব। ফলে মনের অনস্বীকার্য স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভিত্তিতে ইয়ুং তাঁর বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান গড়ে তুললেন ; ও তার আর এক নাম দিলেন 'মনোময় মনোবিজ্ঞান' (psychology with psyche)। ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞান তাই এই মনেরই আলোচনা।

'মন' কথাটি ইয়ুং এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রচলিত অর্থে, 'মন' বলতে আমরা 'চেতন'-মনকে বুঝে থাকি। কিন্তু ইয়ুং মন কথাটি ব্যবহার করলেন চেতন ও অচেতন এই দুয়ের সমষ্টিকে নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর মতে মনের দুটি অংশ —চেতন ও অচেতন্। অচেতন অংশের আবার দুটি বিভাগ বা স্তর আছে : (১) ব্যক্তিগত অচেতন, (২) সমষ্টিগত অচেতন। সমগ্র অচেতন মনকে যতদূর পর্যন্ত চেষ্টা দ্বারা—চেতনার স্তরে নিয়ে আসা যেতে পারে, ততদূর পর্যন্ত হ'ল প্রথম স্তরের সীমানা। দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ'ল ঠিক তার পর থেকেই। মনের এ অংশের যে-সমস্ত বিষয় তা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নয়। আদিকাল থেকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত হয়ে হয়ে এরা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই পুরুষানুক্রমিতা পৃথিবীর সর্বজীবের মধ্যেই দেখা যায়, ও সেই-ই প্রত্যেক ব্যক্তিগত মনোজীবনের ভিত্তি। অচেতনায় জন্ম হয়েছে চেতনার অনেক আগে এবং এই প্রাথমিক স্তর থেকে জন্ম নেয় নব নব চেতনা। মানুষের মানসিক জীবন যে প্রধানতঃই সচেতন, ইয়ুং-এর মতে এ ধারণা ভুল। বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝতে হলে ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞানে চেতনা ও অচেতনার গঠন ও প্রকৃতি, ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইয়ুং বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের চেতনার মধ্যে বিশেষ চারটি বৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তারা যথাক্রমে, চিন্তা, অনুভূতি, সংবেদন ও বোধি। পরিবর্তনশীল ও মুহূর্তগত বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির অন্তরালে এরা এদের মূল স্বরূপে সব সময়েই বর্তমান থাকে বলে এই বৃত্তিগুলি মৌলিক। যে মানসিক বৃত্তির দ্বারা জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মে ও সেই ধারণা বা জ্ঞানের সাহায্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিই, সেই হ'ল চিন্তা। বুদ্ধি ও তার যুক্তি হ'ল এর প্রধান মানদণ্ড। অনুভূতি হ'ল ঠিক এর বিপরীত। এর মানদণ্ড হ'ল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বোধ। চিন্তার মতো অনুভূতিও বিচার করে জগতের। কিন্তু কোন্ জিনিস কি পরিমাণে সুখকর অথবা দুঃখকর, এরই ভিত্তিতে সে জগতের মূল্য নির্ধারণ করে। তবু চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে একটি মিল আছে এই যে, এরা দু'জনেই জগৎকে বুঝতে চায় বিশেষ এক মূল্যের দিক থেকে। চিন্তার পক্ষে সেই মূল্য হ'ল 'সত্য', ও তার মানদণ্ড হ'ল বুদ্ধি ও তার যুক্তি ; আর অনুভূতির পক্ষে সে হ'ল সুখকর ও দুঃখকর। মানুষের আচরণে এরা পরস্পর বিপরীত ধর্মী। অন্য যে দুটি বৃত্তি—সংবেদন ও বোধি—ইয়ুং তাদের বলেন অযৌক্তিক (irrational) বৃত্তি। কেননা তাদের মধ্যে বিচারের অবসর নেই। তারা বিচার করে না, বিশ্লেষণ করে না, বা কোনো প্রকার মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করে না। তাদের ক্রিয়া শুধু মাত্র প্রত্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপস্থিত বস্তুকে ঠিক যথাযথভাবে প্রত্যয়ের গোচরে আনা হ'ল সংবেদনের কাজ। বিষয়ের বাস্তব সত্যের পরিচয় আমরা এর কাছ থেকে পাই। বোধিও বিষয়কে প্রত্যয়ের গোচরে আনে ; কিন্তু তার বাহ্যিক অবয়ব-রূপের দ্বারা নয়। এক প্রকার সহজ আভ্যন্তরীণ দৃষ্টির দ্বারা সে বিষয়বস্তুর অন্তরের স্বরূপটি প্রত্যক্ষ করে। এই দৃষ্টি সংবেদনের মতো সচেতন নয়—কিছু পরিমাণে অচেতন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যে-কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে নেওয়া যেতে পারে। সংবেদন দেখবে ঘটনাটির খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণ। কিন্তু বোধি ঐ খুঁটিনাটি বিশদ বিবরণকে সরিয়ে রেখে মূল ঘটনাটির বিশেষ একটি অর্থ ও তাৎপর্য অতি সহজেই বুঝে নেবে। এর থেকে বোঝা যাবে যে, এরাও চিন্তা ও অনুভূতির মতো পরস্পর বিপরীত ধর্মী।

মানুষের মধ্যে এই চারটি বৃত্তিই বর্তমান। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে এরা সকলেই একসঙ্গে কার্যকরী হয় না। ব্যক্তিভেদে এদের যে-কোনো একটি অন্য তিনটি অপেক্ষা

অধিক প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এবং মানুষ তার মধ্যের প্রধান বৃত্তিটিকে অবলম্বন করে বহির্জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এইটিই ক্রমে ক্রমে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও জীবনের গতিপথ নির্দেশ করে। ইয়ুং এর নাম দিলেন উন্নততর বৃত্তি (superior function) ও বললেন যে, মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি হ'ল এই উন্নততর বৃত্তি। যে সমস্ত মানুষের মধ্যে এই বৃত্তি এক ও অভিন্ন, তাদের আচরণ, ব্যবহার ও প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক সাদৃশ্য দেখা যায়। সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক স্তরভেদে অবশ্য তাদের প্রকৃতিতে কতকটা পার্থক্য দেখা যাবে সত্য, কিন্তু মূলগত স্বভাবে তারা এক। যে বৃত্তিটি উন্নততর রূপে দেখা দেয় তার জোড়ের অন্যটি দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত অবস্থায়। এর নাম হ'ল নিম্নতর বৃত্তি (inferior function)। উন্নততর বৃত্তি বাস করে মনের সচেতন অংশে ; আর নিম্নতর বৃত্তি বাস করে অচেতন অংশে। মনে করা যাক কোন লোকের মধ্যে উন্নততর বৃত্তি হ'ল চিন্তা ; অর্থাৎ লোকটি সম্পূর্ণ বুদ্ধিজীবী ; যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের সাহায্যে সে জগতের মূল্য নির্ণয় করে। তা হলে তার মধ্যে নিম্নতর বৃত্তি হবে অনুভূতি। অনুভূতি এখানে অচেতন মনের অধিবাসী। কাজেই লোকটির সম্পূর্ণ আয়ত্তের বাইরে। অন্য দুটি বৃত্তি—বোধি ও সংবেদন—এরা থাকবে এদের দু'জনের মাঝখানে। এরা অংশত সচেতন ও অংশত অচেতন। সচেতন উন্নত বৃত্তি বাদে এরাও কিছু পরিমাণে মানবজীবনে সাহায্য করে থাকে। তাই এদের নাম হ'ল সাহায্যকারী বৃত্তি (auxiliary functions)।

মোটের উপর এখানে আমরা মনের চারটি বৃত্তি দেখতে পাচ্ছি : (১) উন্নত বৃত্তি—এ সম্পূর্ণ সচেতন, (২) সাহায্যকারী বৃত্তির সচেতন অংশ ও (৩) অচেতন অংশ—একে চেতনার স্তরে সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু চেষ্টাদ্বারা সম্ভব হতে পারে। (৪) নিম্নতর বৃত্তি—এ সম্পূর্ণ অচেতন ও মানুষের আয়ত্তের বাইরে। যদি এই চারটি বৃত্তিকেই চেতনার স্তরে নিয়ে আসা যায় তবে মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণতা আসবে। এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এ সম্ভব। যদি কোন লোক একই সময়ে ঐ চারটি বৃত্তিকেই অন্তত কিছু পরিমাণেও নিজের আয়ত্তের মধ্যে আনতে সমর্থ হতে পারে, তা হলে সে অসাধারণ জ্ঞান লাভ করে। সংবেদনদ্বারা পাওয়া যায় বিষয়বস্তুর বাইরের অবয়ব সম্বন্ধে প্রত্যয় ; বোধিদ্বারা জন্মে তার আন্তরিক স্বরূপের জ্ঞান ; ও যুক্তি ও অনুভূতি দ্বারা পাওয়া যায় তার বিভিন্ন মূল্য। এই ভাবে সেই ব্যক্তি যে জ্ঞান লাভ করবে তা যেমন সম্পূর্ণাঙ্গ, তেমনই গভীর। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই জাতীয় জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের ক্রিয়াগত শ্রেণীবিভাগ সত্য শুধু মাত্র নীতি ও যুক্তির ক্ষেত্রে। প্রকৃত বাস্তব জীবনে জ্ঞান প্রায় কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে না, ও ব্যক্তিত্ব কখনই অবিমিশ্র এক বৃত্তিগত নয়। সে সাধারণতঃই মিশ্র। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট দুইটি গোষ্ঠী—চিন্তা ও অনুভূতি ; সংবেদন ও বোধি পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে দেখা যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন একটি বৃত্তি, যেমন বুদ্ধি, খুব বেশী প্রভাবান্বিত, সেখানে তার বিপরীত বৃত্তি, অনুভূতি, তার পরিপূরক হিসাবে, প্রবল ভাবে নিজের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করতে থাকে। ফলে এক দিন দেখা যায় যে, ঐ বুদ্ধি-প্রধান লোকটি অকস্মাৎ এক দুর্দমনীয় ভাবাবেগের দ্বারা ও আদিমানব-সুলভ-স্বপ্ন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং এদের কাছে সে সম্পূর্ণ অসহায়। বৃত্তির মধ্যে এই পরিপূরণ ধর্ম ইয়ুং এর মনোবিজ্ঞানে মনের প্রকৃতির এক অন্তর্নিহিত নীতি।

জগতের সমস্ত লোকের প্রকৃতি ঠিক এক রকমের নয়। ব্যক্তিগত রুচি, আদর্শ ও আচরণের দিক থেকে মানুষকে মোটামুটি কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। মনোবিজ্ঞানও মানুষের এক প্রকার শ্রেণী বিভাগ করেছে। তার ভিত্তি হ'ল মানসিক বৃত্তি। আমরা একটু আগেই দেখেছি, ইয়ুং-এর মতে মানুষের মধ্যে চারটি প্রাথমিক বৃত্তি আছে। এই দিক থেকে সকল মানুষের মূল প্রকৃতি এক। কিন্তু এই বৃত্তিগুলি সকলের মধ্যে এক অবস্থায় নেই। কারো মধ্যে চিন্তাবৃত্তিটি প্রধান ও বলশালী ; আবার অন্য কারো মধ্যে প্রধান ও বলশালী হ'ল অনুভূতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৃত্তির দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ নেহাৎ অসঙ্গত নয়। মনের প্রকৃতি নির্ণয়ে এই বৃত্তি দর্পণ-স্বরূপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র এই বৃত্তি-দর্পণ থেকে আমরা ঐ লোকটির সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে পারি না। তা হলে আমাদের আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। বাইরের জগৎ ও মনোজগতের প্রতি সে কি ভাবে সাড়া দেয়, তার প্রতিক্রিয়ার সেই বৈশিষ্ট্যকে ভাল করে বুঝতে হবে। ইয়ুং সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বহির্মুখীন (extravert) ও অন্তর্মুখীন (introvert)। বহির্মুখীন চরিত্র অতিমাত্রায় সমাজকেন্দ্রিক। তার কথাবার্তা, চলাফেরা সমস্তই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিগত মানদণ্ডে। ফলে সমাজজীবনের সঙ্গে তার আচরণ অসঙ্গত হয়ে পড়ে। বহির্মুখীনের চিন্তা, অনুভূতি ও কাজ সবকিছুই ঘটে বস্তুকে কেন্দ্র করে। তার প্রেরণা ও উৎসাহকে নিজের উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে সে বাইরের বস্তুর উপর আরোপ করে। কিন্তু অন্তর্মুখীন চরিত্রে দেখা যায় এর ঠিক বিপরীত। তার কাছে সমস্ত কিছুর মূল কথা হ'ল সে নিজে। তার বাইরে যে বিষয়বস্তু সে তার কাছে গৌণ। এ শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতির মধ্যে পড়লে প্রথমে সে নিজেকে যেন গুটিয়ে নিয়ে অপসারণ করে। তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তখন যেন এক অনুচ্চারিত অস্বীকৃতি জানাতে থাকে, এবং তার পরে আস্তে আস্তে দেখা দেয় তার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। হঠাৎ সে বাইরের জগতের উত্তেজনায় ধরা দেয় না। প্রথমে

সে নিজেকে সামলে নেয় ; তারপর সাড়া দেয়। বিভিন্ন লোকের সামনে একই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু সকলেই সেই জগৎকে ঠিক এক ভাবে দেখে না, বা গ্রহণ করে না। কে তাকে কোন্ ভাবে গ্রহণ করবে, অর্থাৎ জগৎ তার মনের কোন্ বিশেষ রূপ ও অর্থ নিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়—তাই জানা যায় তার মধ্যে কোন্ বৃত্তি প্রধান তার থেকে। অর্থাৎ, বৃত্তিমূলক শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা এ বিষয়ে অনুমান করতে পারি। আর আচরণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে শ্রেণীবিভাগ—বহির্মুখীন ও অন্তর্মুখীন—তার থেকে জানা যায় তার জগৎ অর্থাৎ জগৎ যে রূপ নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, সেই জগতের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রকৃতিটিকে।

প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন বৃত্তিগত শ্রেণী ও আচরণ বৈশিষ্ট্যমূলক শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সে নিজেই এ বিষয়ে মোটেই সচেতন নয়। অথবা যদিও সে সচেতন হয় তবু তার ধারণা ঠিক নয়—নিজের সম্বন্ধেই সে ভুল বুঝেছে। অবশ্য ব্যাপারটা বিশেষ সহজ নয়। বিশেষতঃ অচেতনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ যদি দৃঢ় হয়, তবে সমস্যাটি অধিকতর কঠিন হয়ে ওঠে। শিল্পীদিগের সম্বন্ধে এ অতি সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে শিল্পী, অথবা যে কোন সৃজন-প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সহসা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা অচেতনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ। শিল্পীর বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, শিল্পী-ব্যক্তিকে শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সমীকরণ করা একেবারেই চলে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, ব্যক্তিজীবনে শিল্পীমন হয় তো বহির্মুখীন, অথচ সৃষ্টি ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন এমন হয় বুঝতে হলে মনের পরিপূরকতা-নীতিকে স্মরণ করতে হবে। কেননা বহির্মুখীনতা ও অন্তর্মুখীনতা—এরা পরস্পর পরিপূরক। চেতনা যদি হয় বহির্মুখীন ; অচেতনা হবে অন্তর্মুখীন। এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন যাঁরা নিজের মধ্যে যে বিশেষ গুণ বা আদর্শের অভাব সেইগুলিকেই তাঁদের শিল্পের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। মনের পরিপূরণ-নীতির সবচেয়ে পরিষ্কার ও নিঃসন্দেহ প্রকাশ দেখা যায় এইখানে। অবশ্য আবার এমন অনেক শিল্পী আছেন যাদের শিল্প সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁদের শিল্পে তাঁদের নিজ চরিত্রের বিপরীত কোন গুণ বা আদর্শই মিলবে না। শিল্প সেখানে শিল্পীর প্রতিরূপ। এই শ্রেণীর শিল্প দেখা যাবে অন্তর্মুখীনের সৃষ্টিতে। যেমন সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানমূলক উপন্যাস। কোন কোন বহির্মুখীনের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। তাদের সৃষ্ট উপন্যাস ইত্যাদিতে খুব আবেগপ্রবণ কর্মবহুল বীরত্বপূর্ণ নায়কনায়িকারা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে অতি মেলামেশার ফলে বহির্মুখীন শিল্পীর যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ দর্শন তাই তার শিল্পে রূপ নেয়। আবার অন্তর্মুখীন শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটে এর বিপরীত। যে কোন ভাব বা আদর্শ যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা তার অন্তরের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র আদর্শের ভিতর দিয়ে এসে তারই আলোকে বাইরে রূপায়িত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়া, অচেতনার গর্ভে নিহিত মানবতার সীমাহীন অনাদি যে প্রতীক, উন্নততর ও মার্জিততরূপে তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি সমস্ত চারুশিল্পের গোড়ার কথা এই। আদিকাল থেকে যুগে যুগে অনন্ত প্রবাহের ভিতর দিয়ে যে চিরন্তন মানব রূপান্তরিত হতে হতে আজ আমাদের অচেতনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে লুকিয়ে রয়েছে, শিল্প হ'ল যুগোপযোগী রূপসজ্জা ও আধারে সেই আদি মানবের উন্নততর প্রকাশ। যে লোক তার মনোভাবকে প্রকাশ করতে এই আদিম চিত্রের (primordial image) সাহায্য নেয়, সে প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধি। সমগ্র মানবজাতির বাণী তার ভিতর দিয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সমগ্র মানবজাতির পটভূমিকায় সেই শিল্প তখন সার্বজনীন ও সার্বকালিক।

আমরা আগেই দেখেছি যে, অচেতনার মধ্যে দুটি স্তর আছে—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত। ব্যক্তিগত অচেতনা হ'ল ব্যক্তিগত মানুষের বিস্মৃত অবদমিত চিন্তা ভাবনা ইত্যাদির আবাস। কিন্তু সমষ্টিগত অচেতনার এক ঐতিহাসিক রূপ আছে। তা বাদে এর মধ্যেও আছে দুটি স্তর। ব্যক্তিগত অচেতনার ঠিক পরেই হ'ল এর প্রথম স্তর। এখানে আছে আবেগ আকৃতিজাতীয় আদিম প্রেরণা। যদি এরা কখনও কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, তবে ওদের আয়ত্তে আনা হয়ত আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। এর পরের স্তর প্রকৃতপক্ষে অচেতনার স্তর। কেননা এখানকার কোন কিছু কখনই আত্মপ্রকাশ করে না ও সব সময়েই আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তাদের গতিবিধি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং তাদের থেকেই জন্ম নেয় নানাপ্রকারের মানসিক বিকার। অবশ্য মনের যে স্তর বিভাগ এখানে করা হ'ল তা একান্ত নয়। কোথায় যে একটা শেষ হয়ে আর একটা সুরু হয়েছে তা বলা প্রায় অসম্ভব। তবে বিষয়টির মোটামুটি একটা ধারণা করার জন্য ইয়ুং এই রকম ভাগ করেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মনের সাধারণ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। মনের দুটি বিভাগ এবং সেই বিভাগের মধ্যেই বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে ইয়ুং-এর মত মোটামুটি আমরা জেনেছি। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, অচেতনা যদি এমনই কিছু হয় বা সম্পূর্ণরূপে চেতনার বাইরে, তবে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কি করে সম্ভব ? এবং অচেতনা যদি কখনও চেতনার স্তরে প্রকাশিত হয়, তবে তা কি ভাবে হয় ?—এর উত্তরে ইয়ুং বলেন যে, চেতনার স্তরে অচেতনার আবির্ভাবের প্রধান উপায় হ'ল স্বপ্ন ও গূঢ়ৈষণা (complex)। সমগ্র ব্যক্তিত্ব থেকে যখন কতকগুলি অচেতন ভাব, চিন্তা, অর্থাৎ মানসিক বিষয় বিচ্ছিন্ন

হয়ে অচেতনার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন সেই ঘটনাটিকে বলা হয় গূঢ়ৈষণা। এ অবস্থায় ঐ বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; ফলে মানুষের আয়ত্তের বাইরে। এ অবস্থায় মানুষ তার সক্রিয়তা হারিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভূতগ্রস্তের মত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকের মধ্যেই গূঢ়ৈষণা আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সাধারণ ভুলভ্রান্তিও এই গূঢ়ৈষণার ফল। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে, গূঢ়ৈষণা থাকলেই যে মানুষ হীন হবে এমন কোন কথা নেই। গূঢ়ৈষণা থেকে শুধু মাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অসংহত, বিসদৃশ ও পরস্পরবিরোধী। ফলে তারা মনের অগ্রগতির পক্ষে এক প্রকার বাধা-স্বরূপ। কিংবা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে নবতর সফলতার পক্ষে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন প্রেরণা। এই দিক থেকে দেখলে গূঢ়ৈষণার বিশেষ মূল্য আছে; এবং আমাদের পক্ষে তাকে বাদ দেওয়া তাই প্রায় অসম্ভব। ইয়ুং সেইজন্য বলেন যে, গূঢ়ৈষণাকে বাদ দিলে আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়া-প্রবাহ থেমে যাবে। যে-কোন মানুষের মধ্যে কোন গূঢ়ৈষণার প্রকৃত রূপ, গভীরতা ইত্যাদি জানার জন্য ইয়ুং এক বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তার নাম হ'ল ভাব-সাহচর্য-পদ্ধতি। বিশেষভাবে নির্বাচিত একশ'টি কথার একটি তালিকা তৈরি করা হয়। তারপর পরীক্ষক একে একে তালিকা থেকে কথাগুলি উচ্চারণ করে যান। যাকে নিয়ে এই পরীক্ষা করা হচ্ছে, অর্থাৎ যার গূঢ়ৈষণার বিচার করা হচ্ছে, তাকে আদেশ দেওয়া থাকে যে, পরীক্ষকের উচ্চারিত এক একটি কথা শুনেই সব আগে তার মনে যে কথাটি জেগে আসে সে যেন তাই বিনা দ্বিধায় বলে যায়। পরীক্ষকের উচ্চারিত শব্দকে বলা হয় 'উদ্দীপন শব্দ' (stimulus word) এবং তার উত্তরে ঐ লোকটি যে কথা বলে তার নাম 'প্রতিক্রিয়া শব্দ' (reaction word)। এই দুইয়ের মধ্যে কতটা সময় লেগেছে তার থেকেই গূঢ়ৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আশ্চর্য রকম ফল পাওয়া গেছে। দেখা গেছে যে, যে উদ্দীপন শব্দের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত গূঢ়ৈষণার কোনপ্রকার যোগ আছে, তার প্রতিক্রিয়া শব্দ আসতে অপেক্ষাকৃত দেরি হয়ে থাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। একজন রোগীর কাছ থেকে ইয়ুং এই উপায়ে যে ফল পেয়েছিলেন তা এই:—

	উদ্দীপন শব্দ	প্রতিক্রিয়া শব্দ	প্রতিক্রিয়া কাল	
১।	মাথা	চুল	১.৪	সেকেণ্ড
২।	সবুজ	তৃণভূমি	১.৬	"
৩।	জল	গভীর	৫.০	"
৪।	ছড়ি	ছুরি	১.৬	"
৫।	লম্বা	টেবিল	১.২	"
৬।	জাহাজ	ডুবে যায়	৩.৪	"
৭।	জিজ্ঞাসা	উত্তর	১.৬	"
৮।	পশম	বোনা	১.৬	"
৯।	বিদ্বেষকারী	বন্ধুভাব	১.৪	"
১০।	হ্রদ	জল	৪.০	"
১১।	পীড়িত	সুস্থ	১.৮	"
১২।	কালি	কালো	১.২	"
১৩।	সাঁতার	সাঁতার জানি	৬.৮	"

যে রোগীর কাছ থেকে তালিকাটি পাওয়া গিয়েছিল, জানা গিয়েছিল যে, সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে ব'লে স্থির করেছিল। এই গূঢ়ৈষণার চমৎকার প্রকাশ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ৩, ৬, ১০ ও ১৩ নম্বরের প্রতিক্রিয়া-কাল লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

স্বপ্ন-সাহায্যেও গূঢ়ৈষণা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। যে সমস্ত বিষয়কে অবলম্বন করে স্বপ্ন আত্মপ্রকাশ করে তা যেমনি বিচিত্র তেমনই অদ্ভুত। দৈনন্দিন জীবনের ছোট বড় নানা ঘটনা থেকে নিয়ে অচেতনার গভীরতম ভাব ইত্যাদিকে অবলম্বন করে সে দেখা দেয়। তাদের মধ্যে কোন কার্যকারণ সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে না; তারা দেশ-কাল-বহির্ভূত এবং তাদের ভাষা পৌরাণিক ও সাংকেতিক। সুতরাং তাদের অর্থ বুঝতে হলে বিশেষ উপায় আবশ্যক। স্বপ্ন থেকে যে আমরা শুধু অচেতন মনের প্রকাশ পাই, তা নয়; তার কর্মনীতিও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ স্বপ্ন প্রধানতঃই অচেতনার প্রকাশ। এই অচেতনা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—সমগ্র মানবজাতির আদিম প্রকৃতি এবং এর নাম হ'ল 'বিষয়গত মন' (objective psyche)। কি ভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা যেতে পারে সেই হ'ল চেতনার লক্ষ্য। কিন্তু অচেতনা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্যক্তিকে অতিক্রম করে তার মধ্যে ব্যক্তির অতীত যে প্রকৃতি তারই সঙ্গে তার যোগাযোগ। কেননা তার লক্ষ্য হ'ল মানসিক ক্রিয়া-প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখা। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে অচেতনা হচ্ছে মনের একদেশিতার বিরুদ্ধে সতর্কতা। এই সতর্কতা রূপ নেয় স্বপ্নে। কিন্তু অচেতনার আধেয় ও তার অর্থ এত ব্যাপক ও বিচিত্র যে, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হবার জন্যে তাদের নির্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। স্বপ্নদ্রষ্টার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিস্থিতি ইত্যাদি অনুসারে স্বপ্নের অর্থ এবং তাৎপর্যও বিভিন্ন। অনেক সময়ে এমন হয় যে, স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার ব্যক্তিগত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই স্বপ্ন ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে ব'লে সমগ্র মানবজাতির চিরন্তনী কোন সমস্যার পুনরাবৃত্তি মাত্র। অনেক সময়ে আবার স্বপ্ন থেকে ভবিষ্যতেরও আভাস পাওয়া যায়। মনঃসৃষ্টি (phantasy) ও দৃষ্টি (vision) থেকেও অচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে। মনঃসৃষ্টির আর এক নাম দিবাস্বপ্ন। কল্পিত চিত্রের সাহায্যে কতকগুলি

ঘটনাকে মনের সামনে উপস্থিত করে অচেতনা তার মধ্যে আপন সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। যে অচেতনা থেকে মনঃসৃষ্টির আবির্ভাব হয় তা ব্যক্তিগত অচেতনা।

স্বপ্ন, মনঃসৃষ্টি ও বৃষ্টির বিষয়বস্তুর বিচার করলে দেখা যাবে যে, শুধু মাত্র ব্যক্তিগত অচেতনা নয়, সমষ্টিগত অচেতনাও সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। যে সমস্ত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অচেতনা এদের ভিতর, বিশেষতঃ স্বপ্নের ভিতর, আত্মপ্রকাশ করে, তার মধ্যে পৌরাণিক চিত্র ও প্রতিরূপ সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। মনের অতি গভীর অন্তস্তল থেকে জন্ম বলে উহা 'আদিম প্রতীক' বা Archotype। আদিকাল থেকে মানুষের সমস্ত অভিজ্ঞতা-জ্ঞানের মূল এই আদিম প্রতীক। দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন যুগে এর রূপ বদলেছে; কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রকৃতিটি সেই একই রয়ে গেছে। অচেতন মনে এর আবাস এবং সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি ব'লে এ আমাদের আয়ত্তের বাইরে। একটা অতি সাধারণ উপমা দিয়ে এ বিষয়ে বোঝা যেতে পারে। যে-কোন ভাষার একই মূল বর্ণমালাকে ভিত্তি করে যেমন গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি, তেমনই একই প্রতীককে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, অনুভূতি। মূলে বর্ণমালা এক; বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের হাতে তারই সাহায্যে গড়ে উঠে বিভিন্ন সাহিত্য। তেমনই মূল প্রতীকও এক। এই জন্যেই ইয়ুং একে বলেছেন, "a priori determining constituent of all experience" আর এইজন্যই, অর্থাৎ আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি বলেই মোটামুটি কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় একে ভাগ করা যেতে পারে। কেননা যে সমস্ত প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গ সম্বন্ধ আছে তাদের সংখ্যা মোটামুটি নির্দিষ্ট। 'জননী' এই রকম এক জাতি-রূপ। যত প্রকারের 'মাতৃভাব' আছে তার সবই এই এক জাতি-রূপের বিভিন্ন বিকাশ। যুগ যুগ থেকে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত যে জননী ভাব, ব্যক্তিমাতার মধ্যে সেই সার্বজনীন মাতা, আদিম জাতি-রূপ জননী ("The collective image of the mother, not of the particular mother, but of mother in her universal aspect.")। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই আদিম জাতীয় রূপগুলিই মানুষের সমস্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতার উৎস। আর এ যদি মানতে হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্ত আপনা থেকেই এসে পড়ে। অর্থাৎ ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞান শুধুমাত্র মনোবিজ্ঞান নয়, জীবন-পদ্ধতি। অভিজ্ঞতার মূল উপাদানগুলি অচেতন মনের গভীরে নিহিত অবস্থায় থেকে আমাদের জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অচেতনার সীমা থেকে উত্তীর্ণ করে চেতনার মধ্যে তাদের নিয়ে আসা মানুষের অন্যতম কর্তব্য। অথবা, অন্য ভাবে বলতে গেলে আমাদের চেতনার বর্তমান সীমাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একে বলা যেতে পারে, জীব-চৈতন্য থেকে বিশ্ব-চৈতন্যে জন্মগ্রহণ। কি করে এই নবজন্ম সম্ভব হতে পারে ইয়ুং তারও উপায় নির্দেশ করেছেন। ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞানের এই হ'ল মোটামুটি গোড়ার কথা।

স্বাধীন ভারতে কৃষি-পরিকল্পনার একটি দিক

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

অতীতে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতি যতই সহজ সচ্ছল থাকুক না কেন, বর্তমানে কৃষিই এদেশে অধিকাংশ লোকের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শতকরা প্রায় ৮০ জনেরও অধিক লোক এদেশে কৃষির উপর নির্ভর করে। যৎসামান্য শিল্প যা এদেশে গড়ে উঠেছে, যেমন বস্ত্রবয়ন, পাটশিল্প, চিনির কারখানা প্রভৃতি, তাও প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, শিল্পের উপর নির্ভরশীল লোকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এ অবস্থায় কৃষির ভবিষ্যৎ নিয়েই আমাদের মাথা ঘামাতে হবে, এর সবগুলো সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে এবং তার সমাধানের উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে। আর্থিক উন্নতিবিধান বা জীবন যাত্রার মান উন্নততর করা অথবা জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি যে-কোন দিক থেকেই ধরা যাক না কেন কৃষি আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।

দেশীয় রাজ্য বাদে ভারতের মোট যা আয়তন তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ জমিই আবাদী এবং প্রতি বৎসর তাতে চাষ হয়। শতকরা ১২ বা ১৩ ভাগ জঙ্গল; শতকরা ২২'৮ ভাগ পতিত জমি হলেও চাষের উপযুক্ত এবং শতকরা ৭ ভাগ জমির উর্বরতা বাড়াবার জন্য প্রতি বৎসর পতিত রাখা হয়। অর্থাৎ এদেশে প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ জমিই কোন না কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাত্র ২২ কি ২৩ ভাগ জমি অকেজো। এদিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে আমাদের অবস্থা যে অনেক ভাল তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, জাপান প্রভৃতি দেশে শতকরা ১৫ ভাগের বেশী জমি কাজে লাগানো যায় না। আমাদের কৃষিজাত সামগ্রীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—খাদ্যশস্য এবং কাঁচা মাল। খাদ্যশস্যের মধ্যে চাল, গম, জোয়ার, বাজরা, বিভিন্ন প্রকারের ডাল উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বার্লি, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্যও কিছু পরি-

মাণে উৎপন্ন হয়। খাদ্যশস্য ছাড়া ভারতে আরও অনেক প্রকার কৃষিজাত সামগ্রী উৎপন্ন হয়। প্রথমেই ইক্ষুর কথা বলা যাক। ইক্ষুর চাষ এ দেশে নূতন নয়। কিন্তু ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত চিনির কারখানা এদেশে স্থাপিত না হওয়ায় ইক্ষুর আবাদ কম ছিল। গত পনর বছরের মধ্যে এদেশে এত চিনির কারখানা গড়ে উঠেছে যে, চিনির সরবরাহ বিষয়ে আজ আমরা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী ত নই-ই, বরং অন্য দেশকেও সরবরাহ করতে পারি। এই শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিগত পনর বছরে ইক্ষুর চাষ ত বৃদ্ধি পেয়েছেই সেই সঙ্গে নানা উপায়ে ইক্ষুকে উৎকৃষ্টতর করবার, এতে চিনির পরিমাণ বাড়াবার এবং বিঘাপ্রতি ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণবৃদ্ধির জন্যেও নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হচ্ছে। ইক্ষুর মত তূলার চাষও এদেশে বহু দিন থেকে হয়ে আসছে। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৈজ্ঞানিক যানবাহনের ব্যাপক প্রচলন হওয়ায় এবং এদেশে বস্ত্রবয়নশিল্প গড়ে ওঠায় তূলার চাষও গত দেড় শ বছরে বাড়তে সুরু করেছে। বর্ত্তমানে প্রায় ১৬০ লক্ষ একর জমিতে তূলার চাষ হয়ে থাকে। গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কারখানায় তৈরি সূতা চীন দেশে রপ্তানী হ'ত। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে এদেশে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হওয়ায় এবং নানা কারণে সূতোর রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এদেশে জাত তূলোর প্রায় সবটাই এদেশের কারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। গত পনর বছরে তূলোর উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় কিছু কিছু অবলম্বন করা হয়েছে এবং বড় আঁশের তূলোর আবাদ ও সরবরাহ বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। পাটের চাষও এদেশে নূতন নয়। তবে বর্ত্তমানে পাট যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপক ব্যবহার ও রপ্তানীর জন্য উৎপন্ন হয় আগে তা হ'ত না। আগে বাংলায় স্থানবিশেষেই পাটের চাষ হ'ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে পাট-কলের আবির্ভাব হয় এবং তার পর থেকে পাটের চাষ বাড়তে থাকে। বর্ত্তমানে পাট বাংলার এবং সমগ্র ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম। ভারতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এদেশে তৈল-শিল্পের বিশেষ প্রসার না হওয়ায় এই সব তৈলবীজ প্রতি বৎসরই রপ্তানী করতে হয়। এক-কালে এদেশে প্রচুর রেশম উৎপন্ন হ'ত। এখন কৃত্রিম রেশমে দুনিয়ার বাজার ছেয়ে ফেলেছে। তাই প্রকৃত রেশমের কদর দিন দিনই কমে আসছে। পানীয়ের মধ্যে চা, কফি ও কোকো প্রভূত পরিমাণে এদেশে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া এদেশে নানা প্রকার মশলা, আরণ্য পদার্থ ও অন্যান্য বহুবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হয়।

ভারতীয় কৃষিজাত সামগ্রীর বিশেষত্ব ছিল এই যে, এসবের অধিকাংশই রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উৎপন্ন করা হ'ত না। এমন কি গত শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কৃষিজাত প্রায় যাবতীয় সামগ্রীর ব্যবহারই দেশের বিশেষ বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ একথা সর্ব্বজনবিদিত যে ভারত প্রতি বৎসরই বহু পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে আসছে—সে প্রায় আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের ইতিহাসের প্রারম্ভ কাল থেকে। এ থেকে এ কথা বেশ বোঝা যায় যে, ভারতের জনসাধারণ কোন কালেই কৃষির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল না। এর অর্থ এই নয় যে, ভারত অন্নবস্ত্রের কাঙাল ছিল বা এদের সরবরাহ বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিল। আসল কথা হ'ল, ভারত এই সব বিষয়ে আপন চাহিদা মিটিয়ে এবং এদের ব্যবহার করে এমন সব শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করত যা ইউরোপের বাজারে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হিসাবে চড়া দামে বিক্রয় হ'ত। অর্থাৎ ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ-কাল পর্য্যন্ত সামঞ্জস্যশীল ছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পর থেকে এবং পাশ্চাত্যে শিল্পবিপ্লব হওয়ায় এদেশের শিল্প একেবারে ধ্বংস হ'ল। কৃষিই হ'ল একমাত্র উপজীবিকা। তাই গত দেড়শ বছরে এমন সব কৃষিদ্রব্য উৎপাদন করতে হচ্ছে, যেগুলোর চাহিদা এদেশে থাক বা না থাক বিদেশে রপ্তানীর কাজ চললেই হ'ল। কৃষিজাত সামগ্রী নিয়ে ব্যবসায় চালানো, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই পাট, তূলো প্রভৃতির চাষ বর্ত্তমানে করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমাদের কৃষি যে নিজস্ব সনাতন পদ্ধতি ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি তা সবারই জানা আছে। ক্রমশঃ আর্থিক অবনতির ফলে এবং লোকের অভাব ও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কম বা বেশী প্রায় প্রত্যেক কৃষককেই বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতে হচ্ছে। এ যে শুধু তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই হয়েছে তা নয়; সমস্ত দেশের স্বার্থেও, বিশেষ যখন কৃষিজাত সামগ্রীই আমাদের প্রায় একমাত্র রপ্তানীর বস্তু,—এ অবস্থা নিতান্ত অপরিহার্য্য হয়েছে।

সে যাই হোক, আমরা যে পরিমাণে খাদ্যশস্য ও শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রী পাই তার সবটাই যদি দেশে থাকে তাহলে এই সব সামগ্রীর সরবরাহে ন্যূনতা হবার কথা নয়। প্রথমত, শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর কথাই ধরা যাক। এ বিষয়ে আমি ইণ্ডিয়ান জার্নল্ অব ইকনমিক্সে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, কৃষিজাত সামগ্রীর সরবরাহের দিক থেকে আমাদের অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় এই সরবরাহ দিয়ে শুধু আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটালেই চলবে না; সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে শিল্প-জাত সামগ্রী বা উৎপাদন-উপকরণ আনতে হলেও আমাদের তার বিনিময়ে কিছু দিতে হবে। সেই দেওয়ার মধ্যেও আসবে খাদ্যশস্য এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রী। এ বিষয়েও ভারত সন্তোষজনকভাবে কাজ করে আসছে। প্রতি বছর এদেশ থেকে তূলা, পাট, তৈলবীজ এবং চা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয়ে আসছে। এদেশে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন-কার্য্যের প্রসার হওয়ায় এর মধ্যে কোন কোনটি

বহুলাংশে এদেশের শিল্পেই ব্যবহৃত হতে পারছে। ফলে, সেই সব দ্রব্যের সরবরাহ বিষয়ে একদালে আমরা পরমুখাপেক্ষী হলেও আজ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছি। কেবলমাত্র তৈল-নিষ্কাশন ও এর বহুল ব্যবহারকারী শিল্প এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার আমাদের তৈলবীজের অধিকাংশ পরিমাণই বিদেশে পাঠাতে হচ্ছে। তবে কালে তৈলনিষ্কাশন-শিল্প এদেশে ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে এ বিষয়েও আমাদের পরনির্ভরশীলতা ঘুচবে।

কৃষির ভবিষ্যৎ বিবেচনা করতে হলে দুটি বিষয়ের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। এদের প্রথমটি হ'ল, ভারতীয় কৃষি সম্প্রসারণশীল শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্ষম কিনা এবং দ্বিতীয়টি শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণাগুণের দিক থেকেও কৃষিজাত সামগ্রীর উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কিনা। প্রথমে প্রশ্নটি নিয়ে হঠাৎ বিচার করা সম্ভবপর নয়, কেননা এটি শিল্প বিস্তারের পরিমাণ বা মাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কোন্ শিল্পের কতখানি প্রসার আমরা চাই সেইটিই হবে শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণের নির্দ্ধারক। শিল্পের প্রসারও আবার নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের উপর—প্রথম, দেশের জনসাধারণের বর্ত্তমান ক্রয়শক্তি; দ্বিতীয়, তাদের ক্রয়শক্তি ভবিষ্যতে যা হতে পারে, অথবা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করা বিষয়ে সরকারী নীতি; এবং তৃতীয়, ভারতের বাহিরে ভারতীয় শিল্পজাত সামগ্রী এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত সামগ্রীর বর্ত্তমান বাজার ও তার ভবিষ্যৎ। তবে এদেশের শিল্পের এবং আন্তর্জ্জাতিক বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় সরবরাহের দিক থেকে আমাদের কৃষিজাত সামগ্রীর পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক। কিন্তু গুণাগুণের দিক থেকে এদের এখনও যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন দরকার। তুলার কথাই ধরা যাক। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে তুলা উৎপন্ন হয় তার আঁশের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চিরও কম। এতে উৎকৃষ্ট ধরণের কাপড় তৈরি করা চলতে পারে না। তাই উৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্ত আমাদের লম্বা আঁশওয়ালা তুলা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিছু দিন থেকে অবশ্য এদেশেও লম্বা আঁশওয়ালা তুলার চাষ হচ্ছে। তবে তার পরিমাণ এখনও এদেশের কারখানার চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পাটের বিষয়েও একথা বলা চলে। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, পাট একমাত্র বাংলা দেশেই উৎপন্ন হয়। তাই কিছুকাল থেকে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ ব্যবহার করা যায় কি না সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে এবং কিছু কিছু সফলতালাভও হইয়াছে। এ অবস্থায় পাটের যদি উৎকর্ষ না হয় অথবা পাট চাষে যা খরচ তা না কমে তা'হলে ভবিষ্যতে পাট আপন একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। ইক্ষুর বেলায়ও একই কথা বলা যায়। এখনও এদেশে যে জাতের ইক্ষু উৎপন্ন হচ্ছে তাতে খরচ পড়ছে বেশী অথচ বিঘা প্রতি অন্যান্য দেশের চাইতে ইক্ষু জন্মায়ও কম এবং তার রসে চিনির পরিমাণও কম। এই সব দিক থেকে কৃষির উন্নতি করবার একটা সাধারণ প্রয়োজনীয়তা যে সবাই স্বীকার করবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই।

খাদ্যশস্যের সরবরাহের দিক থেকেও আমাদের অবস্থা অচল নয়। এদেশে মোট প্রায় ২৭০ লক্ষ টন চালের প্রয়োজন; তার মধ্যে ২৬০ লক্ষ টন চাল এদেশেই উৎপন্ন হয়। মাত্র ১০ লক্ষ টন চালের জন্যে আমাদের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও ইন্দোচীনের উপর নির্ভর করতে হয়। এদেশে প্রায় ১০০ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিক সময়ে আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে উৎপন্ন গমের পরিমাণ কিছু বেশী। তাই উৎপাদনের প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগ বিদেশে রপ্তানী হয়। স্বাভাবিক সময়েও অষ্ট্রেলিয়া থেকে কিছু গম এদেশে আসত সত্য; কিন্তু এই আমদানীর পরিমাণও ছিল সামান্য এবং এর উদ্দেশ্য ছিল বাজার দরকে যথাসম্ভব স্থির রাখা। জোয়ার এবং বাজরাও এদেশে যা উৎপন্ন হয় তাতে এদেশের চাহিদা মিটাবার পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে এবং সেই পরিমাণ সিংহল এবং প্রতিবেশী দেশসমূহে রপ্তানী হয়। মোটের উপর একথা বলা যায় যে, জীবনযাত্রার বর্ত্তমান মানে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বিষয়ে ভারত কারও মুখাপেক্ষী নয়। এখানে একটি কথা উঠবে। ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান এত নীচু যে, এ বিষয়ে এদেশ এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে। এ সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে একমত না হলেও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, ভারতবাসীরা তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক কম খাবার পায়। এ বিষয়ের গবেষকগণ প্রত্যেকটি লোকের খাদ্যের প্রয়োজন তার শরীরে তাপের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্দ্ধারণ করেছেন। এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট অসুবিধাও আছে। কেননা, বিভিন্ন প্রদেশের বা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের জীবনযাত্রার মান যেমন পৃথক তাদের তাপের প্রয়োজনীয়তাও তেমনি বিভিন্ন। যদি ২৮০০ সংখ্যক তাপের সৃষ্টি করতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য প্রত্যেকটি লোকের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে ধরা হয় তা হলে ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪১·১ মহাপদ্ম (লক্ষ কোটি—এক বিলিয়ন) সংখ্যক তাপের সৃষ্টি করতে পারে এই পরিমাণ খাদ্যের কমতি, অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি লোকের খাদ্যের অভাব রয়েছে। স্বাধীন ভারতে এই ৫ কোটি লোকের খাদ্যের সংস্থান হওয়া চাই। জীবনযাত্রার মান উন্নততর করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই খাদ্যশস্য আসবে কোথা থেকে? এই খাদ্যশস্য হয় দেশে উৎপাদন করতে হবে, নয় বিদেশ থেকে আমদানী করতে হবে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করার পথে নানা অসুবিধা রয়েছে। অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বাদ দিলেও স্বাভাবিক অবস্থায় বিদেশ থেকে কিছু আমদানী করতে হলেই তার পরিবর্ত্তে

কিছু রপ্তানী করতে হবে। তা ছাড়া পৃথিবীতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার যে হিড়িক পড়েছে তাতে আমাদেরও পরনির্ভরশীল হয়ে থাকলে চলবে না। অতএব এই ৫ কোটি লোকের খাদ্য-শস্য জোটাতে হবে এদেশেই। এদেশের জমিতে বর্তমানে একর-প্রতি যেটুকু খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে অন্য দেশের অনুপাতে তা নগণ্য এ কথা নীচের তুলনামূলক সংখ্যা থেকেই বেশ বুঝা যায়:—

(প্রতি একরে উৎপাদন-পরিমাণ)

দেশ	গম	চাল	ইক্ষু	তুলা
মিশর	১৯১৮	২৯৯৮	৭০৩০২	৫৩৫
জাপান	১৭১৩	৩৪৪৪	৪৭৫৩৪	১৯৬
মার্কিন	৮১২	২১৮৫	৪০২৭০	২৬৮
চীন	৯৮৯	২৪৩৩	—	২০৪
ভারত	৬৬০	১২৪০	৩৪৯৪৪	৮৯

উপরের সংখ্যা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের জমিতে অপেক্ষাকৃত অনেক কম খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, মিশর, জাপান বা মার্কিন দেশের তুলনায় ভারতের জমির বাংলার অনেক প্রাচীন। তাই এদেশে জমির উর্বরতা বা উৎপাদিকা-শক্তি কমে গেছে। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি, চীন পুরনো দেশ হলেও তার জমি ভারতের জমির চেয়ে বেশী ফসল উৎপাদন করছে। জমির উর্বরতা দুটো শক্তির উপর নির্ভর করে—প্রকৃতিদত্ত শক্তি এবং মনুষ্যকৃত শক্তি। প্রকৃতি-দত্ত শক্তি যে দিন-দিনই কমে আসে একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের যা উন্নতি হয়েছে তাতে মানুষ জমির উর্বরতা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাড়িয়ে নিতে পারে, এমন কি মরুভূমিতেও মরূদ্যান রচনা করতে পারে। আমাদের দেশে যে তা হয়ে উঠছে না তার এক বিশেষ কারণ আছে এবং এখনও এই কারণের বিরুদ্ধে ঠিকমত অভিযানই করা হয় নি। এই বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝাবার চেষ্টা করব।

আমাদের দেশে কৃষির সমস্যা বহুমুখী। মান্ধাতার আমল থেকে যে প্রণালীতে চাষ-আবাদ হয়ে আসছে আজও তার পরিবর্তন সম্ভব হয় নি। বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে দেওয়ার যে প্রথা বিলেতে বহুদিন আগে আরম্ভ হয়েছিল তা এদেশে আজও প্রায় অজানা। জমি সব অরক্ষিত অবস্থায় এমনি পড়ে রয়েছে। কর্ষিত ক্ষেত্রে দাঁড়ালে শুধুই দেখা যায় ছোট ছোট টুকরো জমি চাষ করা হয়েছে, আর এদের আয়তন পুরুষানুক্রমে ছোটই হয়ে আসছে। তাই সেকেলে উপায়ে জমির উৎপাদিকা-শক্তি আর বাড়বে না। কিছু কিছু জঙ্গল পরিষ্কার ও জল-সেচনের ব্যবস্থা ছাড়া জমির স্থায়ী উৎকর্ষের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয় নি। তাই জমির উৎপাদিকা-শক্তি দিন দিনই কমছে। ইউরোপের যে-কোন দেশের কথাই ধরা যাক না কেন, প্রত্যেক দেশেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ানো হয়েছে। এরা যদি শুধু প্রকৃতিদত্ত শক্তির উপর নির্ভর করে থাকত তা হলে আজ এদের জমির অনেক কমে যেত। মোট কথা আমাদের দেশের জমির স্থায়ী উন্নতির কোন বিশেষ ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। সেই সঙ্গে কৃষিকর্ষণপদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিরও কোন পরি-বর্তন হয়নি। শুধু যে জমিরই এই অবস্থা তা নয়; সেই সঙ্গে কৃষকের কর্মশক্তিও অন্যদেশের কৃষকের তুলনায় অনেক কম। এই কর্মশক্তি কম হবার অনেকগুলি কারণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের কর্মক্ষমতা যে বাড়ানো যায় না তা নয়। কিটিং বলেন যে, আমেরিকায় কাজ করে একজন স্ত্রীশ্রমিক গড়ে ১০০ পাউণ্ড তুলা কুড়িয়ে আনে, মিশরে সেই স্থলে ৬০ পাউণ্ড এবং ভারতে মাত্র ৩০ থেকে ৪০ পাউণ্ড। কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হ'ল, ভারতে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তির চেয়ে ট্রিনিদাদ, জ্যামাইকা, ফিজি প্রভৃতি দেশে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তি অনেক বেশী। তা হলে ভারতীয় শ্রমিকের কর্মশক্তির ন্যূনতা যোল আনাই প্রকৃতিগত নয়। বোম্বাই প্রদেশের খারওয়ার অঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে, একজন স্ত্রীশ্রমিক দৈনিক পাঁচ আনা মজুরির হারে মাত্র ৩০ পাউণ্ড তুলা সংগ্রহ করত। সেই স্থলে কাজের হিসাবে পারি-শ্রমিকের হার নির্ধারণ করে দেওয়ায় সেই স্ত্রীলোকই প্রায় ১৫০ পাউণ্ড তুলা সংগ্রহ করেছিল। এছাড়া শ্রমিকদের আর একটি সমস্যা হ'ল এই যে, কৃষিতে এরা সারা বছর কাজও পায় না এবং এ থেকে তাদের আয়ও প্রয়োজনানুরূপ হয় না। তাই আবাদের সময় বাদে এদের কি করে অন্য কাজে লাগানো যায় সেও এক সমস্যা। এ নিয়েও এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টাই হয় নি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে, কুটির শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে। কথাটি আংশিক ভাবেই মাত্র সত্য। কেননা গ্রামাঞ্চলে যেসব শ্রমশিল্পী রয়েছে তাদের অনেকেই কৃষির সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখে না; আপন আপন পেশা নিয়েই তারা ব্যস্ত। তাই কৃষক যেসব শিল্পে লেগে থাকতে পারে তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং তাদের জন্যে বাজারও সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় কৃষকদের সাময়িক বেকারত্ব প্রায় প্রতি বৎসরই দেখা দেয়। জমির পরি-মাণ ও উর্বরতার তুলনায় জমির উপর ক্রমবর্দ্ধমান লোকসংখ্যার চাপ পড়াতেও কৃষিঋণ, কাজের অভাব, জমি বিভাগ ও খণ্ডন প্রভৃতি নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কতকগুলি সামাজিক বিধিনিষেধ যথা—জাতিভেদ, যৌথপরিবারপ্রথা, উত্তরাধিকার বিষয়ক আইন—একদিকে যেমন অনেকের কর্মস্পৃহা কমিয়ে দিয়েছে, অন্য দিকে আবার তেমনি উপরিউক্ত সমস্যাগুলোকে নানাদিক থেকে বাড়িয়ে তুলেছে। এতে এক দিকে জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার হতে পারছে না, অন্য দিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্মও সম্ভবপর হচ্ছে না। এদেশে অধিকাংশ কৃষকেরই পুঁজির অভাব। তাই তারা জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে

টাকা লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না। পর্য্যাপ্ত জলসেচন এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের কৃষিকে অনিশ্চিত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তাই প্রতি বৎসরই যে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হবে এমন কোন স্থিরতা থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলও নিরক্ষর কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না।

কৃষির যে সব সমস্যার কথা উপরে বলা হ'ল তা এদেশের পক্ষে যে একেবারেই নূতন তা নয়। কৃষিবিপ্লবের আগে এই সব সমস্যার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের প্রায় দেশে দেখা গিয়েছে। কৃষিবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সব দেশে এই সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল,—সে আপনা থেকেই হোক, অথবা যুদ্ধবিগ্রহের ফলেই হোক অথবা আভ্যন্তরীণ সংস্কারের জন্যেই হোক। তাই কৃষি-বিপ্লব যখন সুরু হ'ল, তখন ইউরোপে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা আইন কানুনের দিক থেকে আর কোন বাধাই ছিল না। কৃষিবিপ্লবের জয়-যাত্রা অবাধে চলল। যে সব কৃষক জমিদারদের অধীনে অর্দ্ধস্বাধীন অবস্থায় ছিল তারা পেল মুক্তি। জমি এবং খাজনা সংক্রান্ত আমূল পরিবর্ত্তন হ'ল। ছোট ছোট জমিতে চাষের পরিবর্ত্তে এখন বড় বড় ক্ষেত তৈরি হয়ে উঠল এবং জমি ঘিরে রাখবার ব্যবস্থাও হ'ল। চাষ-আবাদের প্রণালীতেও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। নূতন নূতন যন্ত্র-পাতির ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগে কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে কৃষি-জগতে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব হ'ল। প্রাচীন ব্যবস্থা থাকাকালেই যদি কৃষিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ের ব্যবহার করা হ'ত তাহলে পাশ্চাত্ত্যে কৃষিবিপ্লব কোনদিনই আসত কিনা সন্দেহ। মার্কিন দেশে অবশ্য প্রাচীন ব্যবস্থা নিয়ে কোন সমস্যাই দেখা দেয় নি। নূতন দেশে নূতন জাতি স্বাধীনতার আস্বাদ পেয়ে একেবারে অভিনব উপায়ে জীবনযাত্রা সুরু করতে পেরেছিল। আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম। আজও প্রাচীন ব্যবস্থা বোঝার মত আমাদের উপর চেপে বসে রয়েছে। সমাজ-বিজ্ঞানবিদ্‌দের একথা অবশ্য ঠিক যে, কোন সমাজ তার ঐতিহ্য বা তার সভ্যতার ধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রাচীন ব্যবস্থার সবটুকুই ভাল। যেমন ধরা যাক, আমাদের উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের কথা। এতে পুরুষানুক্রমে সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এইভাবে আজ এক-এক জন কৃষকের ভাগে যেটুকু জমি পড়েছে তাতে একখানা সাধারণ লাঙলও পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারে না, আধুনিক প্রণালীতে তৈরি লাঙল ত দূরের কথা। সাধারণ কৃষকের কথা না হয় বাদই দিলাম। কৃষিবিষয়ক যে দু-চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশে রয়েছে তাদের ক্ষেত-খামারেও ট্রাক্টরের ব্যবহার সম্ভবপর নয়। এই প্রসঙ্গে মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার কথা আমাদের মনে পড়ে। এই সব দেশে হাজার হাজার বিঘা জমি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ হয়; বিমান থেকে বীজ ছড়ানো ও পর্য্যবেক্ষণের কাজ করা হয়। মামুলি বিধিব্যবস্থার হাত থেকে যদি আমরা অব্যাহতি পেতে পারি তা হলেই মাত্র আমাদের দেশে কৃষিবিপ্লব বা আধুনিক কৃষি-পরিকল্পনা সম্ভবপর হবে। জমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে কৃষক ও কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত অন্যান্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রসারণ করতে হবে। তবেই আমাদের কৃষি প্রাচীন সংস্কার থেকে মুক্ত হবে। এ কেবল স্বাধীন ভারতের শাসনব্যবস্থার অধীনেই সম্ভবপর। গত দেড়শ' বছরের ব্রিটিশ শাসনে কৃষি বিষয়ে সরকারী নীতি বিফল হয়েছে। তার কারণই হ'ল, যে সমস্যার সমাধান আগে দরকার তার কথা বাদ দিয়ে হঠাৎ আংশিক ভাবে কৃষিবিপ্লব প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয়েছে, তার জন্যে আইন প্রণয়ন হয়েছে, বিদেশ থেকে অভিজ্ঞ লোক আমদানী করা হয়েছে, অর্থেরও অপব্যয় হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু গত দেড়শ' বছরের ইতিহাস যদি খতিয়ে দেখা যায় তাহলে এ কথা বলতেই হবে যে, কৃষির উৎকর্ষ মোটেই আশানুরূপ হয়নি। পাশ্চাত্ত্যের কৃষিবিপ্লব এবং তার অব্যবহিত পূর্ব্বেকার কৃষির অবস্থার এত বড় শিক্ষা এদেশে আমরা আজও কাজে লাগাতে পারি নি; তাই তার পরবর্ত্তী স্তরগুলো নিয়ে যতই গবেষণা করি না কেন, কাজ তাতে কিছুই এগুচ্ছে না।

দিন আগত ঐ

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

তোমার কঠিন পণ সত্য হয়ে মূর্ত হোক, গ্লানি মুছে যাক
প্রতীক্ষামুখর প্রান্তে ধ্বংস হোক রাত্রি ঘোর, উদ্ধত আহ্বানে;
পরমরাত্রির সেই ব্রীড়ানত ক্ষণগুলি শুধু লজ্জা পাক।
কুসুমপেলব বাহু তরবারি নিতে চাক অন্তরীক্ষ পানে।

তোমার সাগর হতে তরঙ্গের লীলাধ্বনি বৈশাখের ভেজে
বাঁশরিরে ভুলে গিয়ে জালাময়ী অগ্নিবীণা বাজাক অন্তরে।
মোহিনীপ্রলুব্ধ রূপ দূর করে দাঁড়াইও বিশ্বপিতা সেজে;
পুরনো পৃথিবী যেন শতবর্ষ পরে তোমা মঞ্জিরে স্মরে।

এমন চাঁদের মায়া সূর্য্য হয়ে বেঁচে থাক; পদতলে যেন
প্রেমের মূল্যেরে দিয়ে কালপুরুষের ভালে অদৃষ্ট মাগুক।
শতধার ছুলে যাক, প্রভাময় হয়ে সবে ভুলি ভেদাভেদ
তোমার পণেরে বেঁধে ললাটের বহ্নিসনে বিশ্বেরে জাগুক।

আমরা বাঁচিয়া আছি হৃদয়ের বুকে আলো; মাথার আকাশ—
দুরন্ত বজ্রের মাঝে ব্যথাহত বুকে তাই হাঁকে দীর্ঘশ্বাস।

বাংলা শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

শ্রীঊষা বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবনস্মৃতি"র এক জায়গায় বলেছেন—"এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলান বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না।" বাস্তবিকই বাংলা শিশু-সাহিত্যের অনেক লেখক-লেখিকাই এইরূপ একটা মস্ত বড় ভুল করেন। তাই বিশেষ করে শিশুদের জন্যেই লিখিত অনেক বই-ই নানা অসম্ভব আজগুবি গল্পে পূর্ণ। আমরা শিশুদের যে এমনই করে শুধু শিশু বলেই মনে করি, তারা কিন্তু মোটেই তা চায় না। শিশুর মনের একান্ত কামনা করে সে তার দাদার মত, বাবার মত বড় হবে—তাঁদের মত কত বড় বড় সব কাজ করে সকলকে অবাক করে দেবে।

"এখনও ত বড় হই নি আমি
ছোট আছি, ছেলেমানুষ বলে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড় হয়ে বাবার মত হলে।"

এইটেই যেন তার শৈশবের স্বপ্ন। আমাদের বাল্যকালে শিশুসাহিত্য বলে বিশেষ কিছু ছিল না বললেই হয়। তখনও "শিশুদের প্রতি মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবে"র তেমন কোনও লক্ষণ দেখা যায় নি। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসিখুসি" ইত্যাদি কয়েকখানি বই, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি", "ঠাকুরদাদার ঝুলি", "ঠানদিদির থলে" ইত্যাদি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর "টুনটুনির বই", "ছোট রামায়ণ", "ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত" ইত্যাদি, সুখলতা রাও-এর "গল্পের বই", "আরো গল্প" ইত্যাদি এই ধরণের অল্পসংখ্যক বই ছাড়া বিশেষ করে শিশুদের জন্যে লিখিত বই খুবই কম ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে, একটু বড় হয়েই আমি ইংরেজী বাংলা এমন অনেক বই পড়তে চেষ্টা করতাম যেগুলি অনেক প্রবীণ বিচক্ষণদের মতে মোটেই ছোটদের পড়বার উপযোগী নয়। সেই বইগুলো পড়ে সব যে বুঝতাম তা নয়—অনেক জিনিষই হয়ত তখন বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তাতে আমার পড়ায় কোনও বাধা হ'ত না। বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—"ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই।"—এটি খুব ঠিক কথা। শিশুসাহিত্যের এবং বয়স্কদের সাহিত্যের মাঝখানে কোথায় যে সীমারেখা টানা যায় তাও বলা কঠিন। আমার মনে হয় ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই এমন অনেক বই-ই পড়তে পারে যেগুলি ঠিক শিশুসাহিত্য পর্যায়ভুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর", "মুকুট", "শারদোৎসব", "গুরু", "বিসর্জন", "রাজর্ষি", "গল্পগুচ্ছ", "হাস্যকৌতুক", "ব্যঙ্গকৌতুক" ইত্যাদি অনেক নাটক, গল্প, প্রহসন; শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "মেজদিদি", নিষ্কৃতি", "বৈকুণ্ঠের উইল" ইত্যাদি; বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ", "কপালকুণ্ডলা" ইত্যাদি; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলি; রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা", "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" ইত্যাদি অনেক বই-ই ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলে অনায়াসে পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথের "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথে"র অনেক কবিতা, তাঁর "কথা ও কাহিনী" যেমন শিশুদের তেমনি বয়স্কদেরও উপভোগ্য। অবনীন্দ্রনাথের "রাজকাহিনী" ও "নালক" আমি ছোটবেলায় যখন পড়েছি তখন এই বই দুটি যেমন ভাল লাগত আজও তেমনই ভাল লাগে। আমার বেশ মনে আছে, "রাজকাহিনী"র গল্পগুলি পড়তে পড়তে চোখের সামনে ভেসে উঠত একটির পর একটি ছবি—কথাচিত্রের বিচিত্র মায়ার পরশে জীবন্ত হয়ে উঠত সেই সুদূর অতীতের বিস্মৃত ঘটনাগুলি—পুরনো দিনের হারানো গৌরবের সুখদুঃখের আনন্দ-বেদনাময় অপরূপ কাহিনীসমূহ। সেই ছবিগুলিতে যে একটি স্নিগ্ধ নবীনতা ছিল তা আজও তেমনই অম্লান সুন্দর হয়ে রয়েছে বলে মনে হয়।

আধুনিক কালে হেমেন্দ্রলাল রায়ের "গল্পের মায়াপুরী", "গল্পের ঝরণা" "গল্পের আলপনা"; সুনির্মল বসুর "ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন", "ছোটদের চয়নিকা", "ঝলমল" ইত্যাদি; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "কিং কং" ইত্যাদি ধরণের বইগুলি আমার এখনও পড়তে খুব ভাল লাগে। আমার তাই মনে হয় শিশু-সাহিত্যের গণ্ডীনির্দ্দেশ করে দিয়ে শিশুদের তার বাইরে মনের খোরাক খুঁজতে না দেওয়া সমীচীন নয়। তাতে তাদের বিকাশোন্মুখ মন সঙ্কুচিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। বড়দের বই পড়ে শিশুরা যদি সব না-ই বোঝে তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতি"তে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ সম্বন্ধে কয়েকটি খুব খাঁটি কথা লিখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে।...আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে। যাঁহারা শিক্ষার হিসাবে জমাখরচ খতাইয়া বিচার করেন তাঁহারা অত্যন্ত কষাকষি করিয়া দেখেন, যাহা দেওয়া গেল তাহা বুঝা গেল কি না। বালকেরা এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে তাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গলোকে বাস করে সেখানে মানুষ না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যখন পতন হয় তখন বুঝিয়া পাইবার দুঃখের দিন আসে। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। জগতে না বুঝিয়া পাইবার রাস্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাট-বাজার বন্ধ হয় না বটে, কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায়

আর থাকে না, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।" পাঠে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করা আমার মতে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের অচলায়তন গড়ে তাদের ইচ্ছামত বই পড়তে না দেওয়া খুবই ভুল। যে জিনিস তারা হয়ত সহজ সরল ভাবে বুঝবে তাদের কড়া শাসনের গণ্ডিতে বাঁধতে গেলে তারা সেগুলি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে চেষ্টা করবে এবং তাদের কদর্থ খুঁজবে; একথা প্রত্যেক শিক্ষক এবং অভিভাবকেরই মনে রাখা দরকার। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই এমন বইও তাদের পড়তে দিতে হবে যার সব কথা তারা হয়ত ঠিক বুঝতে পারবে না। শিশুর যখন প্রথম দন্তোদ্গম হয় তখন যেমন তাকে অল্প অল্প করে কঠিন জিনিসও কিছু কিছু চিবোতে দিতে হয় তেমনই তার পাঠোদ্যমের আরম্ভেও তাকে কিছু কিছু কঠিন বিষয়ের আস্বাদ নিতে দিলে ভাল হয়। নৈলে তার মন উপযুক্ত প্রসারতা লাভ করবে কি করে?

এখন বিবেচ্য, কি রকম বই দিয়ে আমরা শিশুদের প্রথম পড়তে শেখাব? এটাই আমাদের বিশেষ করে ভাববার কথা, কারণ শিশুদের প্রথম পড়তে শেখানোটাই হচ্ছে সব চেয়ে কঠিন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা শিশুসাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের এদিকে তেমন লক্ষ্য নেই। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান-প্রণালীসম্মত শিশুদের প্রথম পঠন শিক্ষা দেবার উপযোগী কতকগুলি চিত্রবহুল বই বাংলা গদ্যে এবং পদ্যে লেখা বিশেষ দরকার। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "হাসিখুসি" ইত্যাদি ধরণের বইগুলি আমার মতে শিশুদের প্রথম পড়তে শেখাবার পক্ষে মন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথের "সহজ পাঠ"ও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শিশুরা এই বইগুলি বাস্তবিকই খুব উপভোগ করে।

আমাদের অনেকেরই বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের "বর্ণপরিচয়"র মধ্যে দিয়ে। এই বইখানি আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত। আমরা সকলেই জানি বইটি কি রকম দুর্বোধ্য শব্দে ও কঠিন কঠিন বানানে পূর্ণ। এতে করে শিশুদের পাঠে অনুরাগ না জন্মিয়ে বিরাগ জন্মাবারই বেশী সম্ভাবনা। এই বই প্রথমেই তাদের হাতে দিলে তাদের মনে কেবল বানান-বিভীষিকাই জাগিয়ে দেবার আশঙ্কা আছে। শিশুদের প্রথম পড়া শেখাবার জন্যে পরবর্তী যে বইগুলি লেখা হয়েছে তার বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বর্ণপরিচয়"রই কতকটা অনুকরণ। বইগুলিতে যেন পঠন-শিক্ষা দেবার সুযোগে ফাঁকি দিয়ে বানান শিক্ষা দেবার প্রয়াসই লক্ষিত হয়। পুরাতনপন্থী আমার কোনও কোনও বন্ধু এই নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছেন। তাঁদের মতে বানানের দিকে প্রথম থেকেই সমুচিত দৃষ্টি না দিলে ছেলেমেয়েরা পরে বানানে কাঁচা থেকে যাবে। এই যুক্তিকে আমি মোটেই সমর্থন করি না। শিশুদের পড়তে শেখাবার সময়ে তাদের পড়তে শেখানোই দরকার। বানান পরে অথবা সঙ্গে সঙ্গেই অত নানা উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এই জন্যেই পঠন-শিক্ষা দেবার পক্ষে বাক্য-গঠন প্রণালীই (Sentence Method) সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত প্রণালী বলে মনে হয়। এতে শিশুদের প্রথমেই বানান শেখাতে চেষ্টা না ক'রে পড়তে শেখানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বাস্তবিকই আমরা যখন কোনও কিছু পড়ি তখন প্রত্যেকটি বর্ণ বিশ্লেষণ করে বানান করে করে শব্দগুলি পড়ি না। বার বার দেখতে দেখতে শব্দগুলির এক একটি ছবি আমাদের মনে মুদ্রিত হয়ে যায়, যাতে ক'রে আমরা কোনও একটি বিশেষ শব্দ দেখলেই বুঝতে পারি সেটা কি—বানান করবার আর দরকারই হয় না। এই রকম করে এবং "Look and say method"-এ পঠন-শিক্ষা দিলে—অর্থাৎ ছবি দেখিয়ে শিশুদের পড়তে শেখালে তারা পড়ার সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এই প্রণালী অবলম্বনে রচিত পঠন-শিক্ষা দেবার উপযোগী বই খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। এটি আমাদের বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি মস্ত বড় অভাব ব'লে মনে হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—well begun is half done—অর্থাৎ কোনও কিছুর আরম্ভটি ভাল হলেই সেটি প্রায় অর্দ্ধেক সম্পন্ন হয়ে যায়। তাই প্রথম পাঠ্য বইগুলি যথাসম্ভব শিশুদের পক্ষে চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ক হওয়া দরকার। ছেলেমেয়েরা যেন প্রথম থেকেই পড়তে ভালবাসে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর ও পিতামাতার তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যে বইগুলি দিয়ে শিশুদের পড়ার "হাতেখড়ি" হয়—যা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পাঠানুরাগের গোড়াপত্তন করতে হবে—সেগুলি যদি নিতান্তই নীরস দুর্বোধ্য শব্দে পূর্ণ ও কষ্টায়ত্ত বানানবহুল হয় তাহলে তাদের মনে স্বভাবতঃই পাঠের প্রতি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা জন্মে। বলা বাহুল্য এই প্রথম পাঠ্য বইগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে সুরঞ্জিত চিত্র থাকা দরকার, কারণ রঙীন ছবির সাহায্যে শিশুদের মন পাঠে আকৃষ্ট করা সহজ হয়। এই বিষয়টির প্রতি আমি লেখক-লেখিকাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করতে চাই। শিশু-দের বইয়ে বেশী ছবি থাকা সম্বন্ধেও কোনও কোনও প্রাচীন-পন্থী আপত্তি করেন। তাঁরা বলেন তাতে নাকি শিশুদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবার বিশেষ আশঙ্কা এবং সম্ভাবনা থাকে।

শিশুরা অনেক সময়ে পাঠ্য বিষয়ের প্রতি মনোযোগী না হয়ে ছবিগুলির প্রতিই নাকি বেশী আকৃষ্ট হয়। এ কথা অংশতঃ সত্য হতে পারে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি? বিদ্যালয়ে শিশুরা কি শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই শিক্ষালাভ করবে? চোখ দিয়ে দেখেও তো তাদের অনেক শেখবার আছে। তাদের একাধিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা করে শেখবার সুযোগ দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয়? শিশুরা কান দিয়ে যা শুনবে চোখ দিয়েও যদি তা দেখতে পায় তা হলে তাদের মনের

ধারণাগুলি ঢের বেশী স্পষ্টতর, দৃঢ়তর ও অধিকতর স্থায়ী হয় না কি? তা ছাড়া, আমরা জানি শিশুদের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এইজন্যে একই প্রকার কাজে বা জিনিসে তাদের মনোযোগ বেশীক্ষণ নিবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই আমরা পাঠ্যবিষয়ের প্রতিও তাদের অখণ্ড মনোযোগ কখনই আশা করতে পারি না। আমরা জানি কোনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়ে শিশুদের মন আদৌ আকৃষ্ট হয় না—যতক্ষণ না আমরা সেটির সঙ্গে তাদের পূর্ব্বপরিচিত কোনও বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি—বিষয়টি ছবি ইত্যাদির সাহায্যে তাদের কাছে কতকটা সরস, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য করে তুলতে পারি। সুতরাং পাঠ্য বিষয়ের প্রতি কৃত্রিম উপায়ে শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগানো দরকার—নইলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। পাঠে প্রথমেই শিশুদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত (voluntary) মনোযোগ সম্ভবপর নয়। তাদের মন স্বভাবতঃই সুন্দর রঙীন ছবির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই ছবির সাহায্যে তাদের মনে পাঠের প্রতি অনুরাগ জন্মাতে ও পাঠ্য বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতে হবে। এই বইগুলির মলাট এবং প্রচ্ছদপটও সুরঞ্জিত চিত্রের সাহায্যে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করতে চেষ্টা করা দরকার—যাতে শিশুদের মনে স্বতঃই পঠনস্পৃহা জাগে, তাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয়।

বাংলা ভাষায় শিশুদের উপযোগী ছড়া ও কবিতার বইয়েরও বিশেষ অভাব লক্ষিত হয়। ইংরেজীতে যাকে nursery rhymes বলে সে জাতীয় ছড়া ও কবিতা লিখবার প্রয়াস এখনও তেমন করে বাংলা শিশুসাহিত্যের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে দেখা যায় না। শিশুরা আধ-আধ স্বরে কবিতা ও ছড়া মুখস্থ বলতে ভারি আমোদ পায়। এই ছড়াগুলি শিখিয়ে শুধু যে তাদের স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির অনুশীলন হয় তা নয়, এইগুলির সাহায্যে তাদের স্বাভাবিক ছন্দোবোধকেও জাগিয়ে তোলা হয়। শিশুর সুকোমল পেলব মনটি দুলতে থাকে ছন্দের তালে তালে। "জল পড়ে, পাতা নড়ে"—এই সামান্য কথা ক'টির ছন্দ শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে কি রকম দোলা দিয়েছিল কবি তাঁর "জীবনস্মৃতিতে" অমর ভাষায় তা লিখে গিয়েছেন। এইটেই নাকি তাঁর জীবনে "আদি কবির প্রথম কবিতা।" এই কথা ক'টির ঝঙ্কার তাঁর কানে গিয়ে বাজতে তাঁর মনে যে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল তাই বর্ণনা করে তিনি বলেছেন—"সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এতো প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনও ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

কবিতার মিলের মধ্য দিয়েই শিশুর স্বাভাবিক ছন্দ-অনুরাগ চরিতার্থ হয়। কবিতার ছন্দের ঝঙ্কারটি অনেকক্ষণ ধরে তার কানে অনুরণিত হতে থাকে—কথা ফুরিয়ে গেলেও। শিশুরা তাই ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করতে এত আনন্দ পায়। কিন্তু আবৃত্তির উপযোগী ভাল ভাল ছড়া ও কবিতা আজও শিশুদের পাঠ্য পুস্তকগুলিতে তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় অবদান, "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথে"র কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এই কবিতাগুলির মধ্যে যে অপূর্ব্ব শিশুমনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে তার আর তুলনা হয় না। এইগুলি শিশুদের মুখস্থ করিয়ে তাদের সেগুলি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করতে শেখালে কত ভাল হয়। বাংলা ভাষায় শিশুদের উপযোগী ছড়া ও কবিতা লিখতে আর যে সব লেখক-লেখিকা প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও সুনির্ম্মল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের "খুকুমণির ছড়া", "ছড়া ও পড়া" ইত্যাদি, সুনির্ম্মল বসুর "ছন্দ ঝুমঝুমি," "ছন্দের টুংটাং" ইত্যাদি ধরণের বইগুলি শিশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী। বাংলায় এই ধরণের ছড়ার বই আরও লেখা দরকার। আমাদের দেশে ছেলে ভুলাবার জন্যে অনেক মেয়েলি ছড়া ও ঘুমপাড়ানী গান অনেক দিন ধরে লোকের মুখে মুখে চলে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ধরণের ছড়াগুলি ক্রমশঃই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় আধুনিককালে আলোকপ্রাপ্তা জননীরা এই রকম "ছড়া কাটা"কে সভ্য সমাজের নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন। যা হোক, শিশুশিক্ষায় এই ছড়াগুলিরও যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে সে কথা আজ আমাদের ভুললে চলবে না। সুতরাং এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করে বইয়ের আকারে প্রকাশ করলে এবং শিশুদের শিক্ষায় সেগুলি কাজে লাগালে খুবই ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ছড়াগুলিকে, "মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা" বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিকই অর্থশূন্য এই ছড়াগুলিতে কোনও ভাবের সঙ্গতি বা ঘটনার ধারাবাহিকতা নেই। পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন, অসংবদ্ধ, অসংলগ্ন কতকগুলি ছবি যেন সামান্য একটি প্রসঙ্গের যোগসূত্রে গাঁথা। কবে কে যে এগুলি রচনা করেছিল কেউ তা জানে না। কিন্তু এগুলির উপরে এমন একটি চিরনবীনতা ও সহজ সজীবতার ছাপ আছে যে হাজার বছর আগেও যদি এগুলি রচিত হয়ে থাকে তবুও এগুলি কিছুতেই পুরনো হবে না। শিশুমনকে ভুলাবার জন্যে এই ছড়াগুলির মধ্যে যেন একটি অপূর্ব্ব মোহনমন্ত্র নিহিত আছে।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হ'ল, তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে, বাপের বাড়ী যান।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই ছড়াটি তাঁর শৈশবের "মেঘদূতে"র মত ছিল। এই ছড়াটি শুনলেই আমাদের অনেকেরই নিজেদের শৈশবের স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। মনে পড়ে, ছোটবেলায় বৃষ্টি

পড়তে আরম্ভ করেছে দেখলেই ছড়াটি বলে কত আমোদ পেতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি—প্রায় প্রত্যেকটি ছড়ায় সাদাসিধা সাদাসিধা কথায় ফুটে উঠেছে গ্রামের এক একটি ছবি বা গান—আমাদের মনের এক একটি ভাব যা আমাদেরই একান্ত মর্মের কথা। এগুলি যেন একটি আস্ত জগতের ভাঙ্গা টুকরা কালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসেছে—এগুলির মধ্যে বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে জড়িয়ে রয়েছে বিচিত্র কত বিস্মৃত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, কত হারানো দিনের ভুলে যাওয়া হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখের কাহিনী। কবি এই ছড়াগুলিকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—"মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশুশস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতঃই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভার-হীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতঃই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশু মনো-বিজ্ঞানের কোনও সূত্র সম্মুখে রাখিয়া রচিত হয় নাই।" এই ছড়াগুলির অপরূপ বিশেষত্ব কবির ভাষায় যেমন সুন্দরভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে আমার সাধ্য নেই আমার বক্তব্যটি অমন চমৎকার করে প্রকাশ করা। তাই কবির কথাগুলিই উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বাংলা শিশু-সাহিত্য-স্রষ্টাদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন তাঁরা যেন এই ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলিকে নিতান্তই ছেলে-ভুলানো জিনিস বলে তুচ্ছ না করেন। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এইগুলির মূল্য যে কত বেশী তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গিয়েছেন।

আমরা জানি শিশুরা স্বভাবতঃই গল্প শুনতে ভালবাসে। কিন্তু সকল বয়সের শিশুদের এক রকম গল্প ভাল লাগে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ জীবজন্তুর কথা শুনতে খুব ভালবাসে। "বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী"র গল্প, "শিয়াল পণ্ডিতে"র গল্প, "সিন্দিবাদা"র গল্প তাদের কত প্রিয়। তারপর তাদের কল্পনাশক্তির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রূপকথা উপকথার বিচিত্র কাহিনী তাদের শিশু-মনকে অভিভূত করে। কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে শিশুর মন কখনও 'সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে', তেপান্তরের মাঠে, কখনও সাগরতলে রাক্ষসপুরীতে যে রাজ-কন্যা ঘুমিয়ে আছে সোনার কাঠির স্পর্শে যে জেগে উঠবে—তার কাছে চলে যায়। দুয়োরাণীর দুঃখে কখনও তার ক্ষুদ্র বুকটি ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠে—উদ্গত অশ্রুভারে চোখ দুটি তার ছল ছল করতে থাকে—দুই গণ্ড বেয়ে মুক্তোর মত অশ্রু-বিন্দু ঝরে পড়ে। পাতালপুরীতে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্যে বা সাতরাজার ধন মাণিক আহরণ করবার জন্যে রাজ-পুত্রের বিপৎসঙ্কুল দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী শুনতে শুনতে ভয়ে বিস্ময়ে তার ছোট্ট বুকটি দুরু দুরু কাঁপতে থাকে। গল্প শুনতে শুনতে সে কল্পনায় বল্গা ছেড়ে চলে যায় পরীদের অপরূপ রাজ্যে, বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর দেশে, দৈত্যপুরীতে বা রাক্ষসপুরীতে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শিশু গল্প শোনে—তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির মালা—সেগুলি বাস্তবে সম্ভব কি অসম্ভব তার মন সে বিচার করে না—সে এখনও এ জগতের "সম্ভাব্যতার শেষ সীমা"র প্রাচীরে মাথা ঠুকে ফিরে আসে নি। তার কাছে তাই অদ্ভুত কিছু নেই—অসম্ভবও কিছু নেই। শিশুর কল্পনাশক্তির পরিস্ফুরণের জন্যে শিশুসাহিত্যে রূপকথা এবং উপকথার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রূপকথা ও উপকথার মায়ায় বয়স্কদের মনও আবিষ্ট না হয়ে থাকতে পারে না। এই গল্পগুলির মধ্যে ভোর বেলাকার শিশিরধোয়া ফুলের মত এমন একটি অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও সরসতা আছে যার মাধুরী আমাদের বয়স্কদের মনের মধ্যেও যে একটি চিরন্তন শিশু ঘুমিয়ে আছে তাকে মুগ্ধ না করে পারে না। লেখক-লেখিকাদের মনে রাখতে হবে তাঁদের কথার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে হবে ছবিগুলি, গল্প শুনতে শুনতে বা পড়তে পড়তে শিশুর চোখের সামনে আঁকা হয়ে যাবে ছবির পর ছবি—তার মন চলে যাবে কোন্ সুদূরের এক স্বপনপুরীতে যেখানে অসম্ভব বা অদ্ভুত কিছু নেই। বাংলা রূপকথা বললেই মনে পড়ে রূপকথার যাদুকর দক্ষিণারঞ্জনের "ঠাকুরমার ঝুলি" ও "ঠাকুর-দাদার ঝুলি" আর শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্ষীরের পুতুলে"র কথা। অবনীন্দ্রনাথের মত গল্প বলিয়ে খুব কমই আছেন—কলমই যেন তাঁর তুলি। তাই তাঁর কলমে ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি। যেমনি অভিনব তাঁর কল্পনা তেমনি যাদু তাঁর ভাষায়। "ক্ষীরের পুতুল" শুধু রূপকথা নয়—একে চিত্র-রূপকথাও বলা চলে।

শিশুরা একটু বড় হলেই যুক্তি প্রয়োগ করে বিচার করতে চায় গল্পগুলি বাস্তবে সম্ভব কি না। তখন আর নেহাত শুধু জীবজন্তুর গল্পে, রূপকথায়, উপকথায় তাদের মনের খোরাক জোগানো যায় না। তাই শিশুদের মনোবৃত্তিগুলির ক্রম-বিকাশের ধারা অনুযায়ী তাদের বিকাশোন্মুখ মনের বিবিধ খোরাক জোগাতে চেষ্টা করতে হবে। তা ছাড়া, শিশুমন বৈচিত্র্যপ্রিয়। একই রকম গল্প তাদের ভাল লাগে না—একঘেয়ে লাগে। সাধারণতঃ নয় থেকে এগার-বার বছরের ছেলেমেয়েরা দুঃসাহসিকতার গল্প, শিকারকাহিনী ইত্যাদি ভালবাসে। এই বয়সে তাদের মন খুব কল্পনাপ্রবণ থাকে। তাই অসম্ভব দুঃসাহসিকতার কাহিনী, বিপৎসঙ্কুল দুরন্ত অভিযানের গল্প এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনকে আকৃষ্ট করে। একটু বড় ছেলেমেয়েদের জন্যে ভাল ঐতিহাসিক গল্প এবং উপন্যাসও রচিত হওয়া দরকার—তাদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায়। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্র-নাথের "রাজকাহিনী"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই

ধরণের বই বাংলায় আরও লেখা দরকার। আগেই বলেছি ছেলেমেয়েরা যখন সম্ভব-অসম্ভব বিচার করতে শেখে তখন আর তাদের মন শুধু রূপকথা, উপকথার গল্পেই তৃপ্ত হতে পারে না। তখন তারা গল্পের মধ্যে দেখতে চায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি, সংসারের প্রতিদিনকার ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত—তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনার স্পন্দন। সুখের বিষয় এই ধরণের কিছু কিছু গল্প বাংলায় লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। আশা করি বাংলা শিশুসাহিত্য ক্রমেই নূতন নূতন গল্পসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বাংলা শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব অবদান—তাঁর "গল্পসল্প" বইখানি। বইখানি কতকগুলি ছোট গল্প ও কবিতার সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্পই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং প্রত্যেকটি কবিতা গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা। গল্প ও কবিতাগুলি অপরূপ হাস্যরসে সমুজ্জ্বল। বাংলার শিশুরা এই বইখানির মধ্যে নূতনত্বের আস্বাদ পাবে।

শিশুদের পঠন যদি শুধু গল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাদের মন অতিরিক্ত পরিমাণে কল্পনাবিলাসী হয়ে উঠবার আশঙ্কা আছে। দশ-এগার বছর বয়স থেকেই তাদের অন্যান্য সাধারণ জ্ঞান-বিষয়ক বইও পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। তারা দেশবিদেশের বড় বড় লোকদের জীবনী পড়বে—নানা-রকম ভ্রমণ-কাহিনী পড়বে—আবিষ্কারকদের বিচিত্র অভি-যানের কথা পড়বে। এইগুলি গল্পের চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়। সুখের বিষয়, ছোটদের উপযোগী কতক-গুলি ভাল ভাল জীবনী সম্প্রতি বাংলা ভাষায় লিখিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিমল ঘোষ রচিত "শিশুরবি," "মনীষীদের ছোটবেলা" ইত্যাদি বইগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাটিকাকারে লিখিত বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলে-মেয়েরা পড়তে পারে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও আবিষ্কার কাহিনী-গুলিও ছেলেমেয়েরা গল্পের চেয়ে কম উপভোগ করে না। এর মধ্যে দিয়ে তারা জানতে পারে দেশ-বিদেশের কথা—জানতে পারে নানা ভৌগোলিক তথ্য। বাংলায় ছোটদের জন্যে লিখিত ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের "বুড়ো আংলা"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা শিশুসাহিত্যে এই ধরণের বই আর লেখা হয়েছে কি না জানি না। বাংলা শিশুসাহিত্যে "বুড়ো আংলা" যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ছোটদের জন্যে আরও কিছু কিছু ভ্রমণ-কাহিনী বাংলায় লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। তার মধ্যে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "চরণিক", অন্নদাশঙ্কর রায়ের" ইউরোপের চিঠি", গজেন্দ্রকুমার মিত্রের "দেশ-বিদেশে" ইত্যাদি কয়েকখানা বইয়ের নাম করা যেতে পারে। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "অভিযাত্রিক", প্রবোধকুমার সান্যালের "মহাপ্রস্থানের পথে" ইত্যাদি ভ্রমণ-কাহিনীগুলি বেশ পড়তে পারে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে এমন কতকগুলি বই লেখাও দরকার যাতে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ে। তারা বিংশ-শতাব্দীর ছেলেমেয়ে—জন্মেছে বৈজ্ঞানিক যুগে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখলে চলবে কি করে? আজকালকার শহরের শিশুরা তো মাতৃক্রোড়ে থেকেই দেখতে পায় রেডিও, টেলিফোন, ট্রাম, ট্রেন, মোটর, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা, সিনেমা ইত্যাদি। এগুলি কি রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলছে তা জানতে অনেক শিশুর মনেই হয়ত কৌতূহল জাগে। অনেক সময় তারা বড়দের নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্নও করে —কিন্তু অনেক সময়েই তারা তাদের প্রশ্নগুলির সদুত্তর পায় না। শিশুদের স্বাভাবিক জ্ঞানপিপাসা ও কৌতূহল নিবৃত্ত করা মোটেই সমীচীন নয়। শিশু-সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তাদের এই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহাকে নানা উপায়ে চরিতার্থ করতে চেষ্টা করতে হবে। কিছুদিন আগে বিজনকুমার ভট্টাচার্য্যের লেখা "পূজার ছুটি" বলে একখানা বই পড়েছিলাম। বইখানি আমার বেশ ভাল লেগেছিল। তাতে কতকগুলি সাধারণ বৈজ্ঞানিক তথ্য বেশ সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পচ্ছলে ছেলেমেয়েদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই রকম বই বাংলায় আরও লেখা দরকার। জগদানন্দ রায়ের বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক বইগুলি পড়েও ছেলে-মেয়েরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে। শিশু তার নবীন চোখ দিয়ে প্রকৃতির দিকে যখন তাকায় গভীর বিস্ময়ে তার কচি মনটি ভরে ওঠে—কত প্রশ্নই, কত সমস্যাই তখন তার মনে জেগে ওঠে। তার সেই নবোন্মেষিত কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসাকে সর্ব্বদাই সজাগ রাখতে চেষ্টা করতে হবে—তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে। কিন্তু মা বাবা প্রভৃতি গুরুজনদের পক্ষে তাদের প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয়ে ওঠে না—অনেক সময় তাঁরা বিরক্ত হয়ে তিরস্কার করে শিশুদের প্রশ্ন করতে নিরস্ত করেন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "শিশু-ভারতী" পড়েও ছেলেমেয়েরা অনেক বিষয় জানতে পারে। তবে এই বইগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদের উপযোগী। সহজ সরল বাংলায় লেখা চিত্র-বহুল ইতিহাস-ভূগোলবিষয়ক বইয়েরও বিশেষ অভাব। ইংরেজীতে শিশুদের উপযোগী এই ধরণের অনেক বই আছে, যেমন—*Then and now stories*, *Here and there stories*, *Little People in Far-off Lands*, *Children of Other days*, *Peeps at many Lands* ইত্যাদি। এই শ্রেণীর ভাল ভাল বইগুলি বেছে সহজ সরল বাংলায় তর্জ্জমা করলেও বেশ হয়। কিংবা এই ধরণের বই সম্পূর্ণ নূতন করে বাংলায়ও লেখা যেতে পারে। এমনি করে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের

সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে—তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা ও কৌতূহল উদ্দীপিত করতে হবে।

কেবল কতকগুলি গুরুগম্ভীর শিক্ষাপ্রদ বই লিখেই যেন বাংলা শিশু-সাহিত্যের লেখকলেখিকারা শিশুদের মনের খোরাক জোগাতে চেষ্টা না করেন। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তাদের কিছু কিছু লঘুতর বিষয়ও পড়তে দেওয়া সমীচীন। তাই তাদের জন্যে লিখতে হবে নির্দোষ কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসাত্মক কতকগুলি বই যা পড়ে শিশুরা খুব আমোদ অনুভব করবে আর খুব প্রাণভরে হাসবে। বাংলায় এই ধরণের বই লিখে অমর হয়েছেন সুকুমার রায় চৌধুরী। তাঁর "হ-য-ব-র-ল", "আবোল তাবোল" ও "বহুরূপী" ছোট বড় সকলেরই উপভোগ্য। তিনি বাংলার শিশুদের "রুলটানা জীবনের খাতায় নিয়ে এলেন লাইনভাঙার আনন্দ।" তাঁর সম্বন্ধে একজন বলেছেন—"তাঁর হাসিটা শুধু হাসি নয়—সাহিত্য।" বাস্তবিকই তাই। এই ধরণের বই বাংলা শিশু-সাহিত্যে খুব বেশী এখন পর্য্যন্ত লেখা হয়নি।

বাংলা ভাষায় ছেলেমেয়েদের উপযোগী কয়েকখানি বেশ ভাল মাসিক পত্রিকাও থাকা দরকার। আমাদের ছোটবেলায় ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত "সন্দেশ" মাসিক পত্রিকা বেরুত। মনে আছে কি রকম অধীর আগ্রহে মাসের প্রথম দিকে "সন্দেশে"র জন্যে অপেক্ষা করতাম। এখনও "মৌচাক", "রংমশাল", "শিশুসাথী" ইত্যাদি কয়েকখানি ছোটদের উপযোগী ভাল মাসিক পত্রিকা বেরয়। বিদ্যালয়-সমূহে এই মাসিক পত্রিকাগুলির বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক এবং ছাত্রছাত্রীরা যেন এইগুলি নিয়মিত পড়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। এই সব মাসিক পত্রিকায় শুধু যে ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি বেরুবে তা নয়, এগুলি পড়ে ছেলেমেয়েরা যেন নিজেদের দেশের ও জগতের অজ্ঞাত দেশের খবর জানতে পারে। এগুলির মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তিকেও জাগিয়ে তুলতে হবে। তারপর, অনেক ছেলেমেয়েরই হয়তো লিখবার বা আঁকবার শক্তি আছে। কিন্তু উপযুক্ত উৎসাহ ও আনুকূল্যের অভাবে অনেক সময়েই তাদের সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি ফুটে উঠবার সুযোগ পায় না। তাই ছেলেমেয়েদের এই সব পত্রিকায় লিখতে এবং আঁকতেও উৎসাহিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও শিল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

যুক্ত প্রদেশের প্রান্তিক লোক-সঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিবাহ

যুক্ত প্রদেশের লোক-সঙ্গীতের ভাষার এবং বিহারের গানগুলির ভাষায় যে পার্থক্য বিদ্যমান তা যুক্ত প্রদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তের কথিত ভাষায় পার্থক্যেরই প্রায় সমতুল্য। বিহারী ভাষা যাঁরা বুঝেন যুক্ত প্রদেশের কথিত ভাষা বুঝা তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন নয়। জৌনপুর থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত অবধী ভাষা এবং পূর্ব্ব অংশে ভোজপুরীর সংমিশ্রণ আছে। অবধী ও ব্রজ ভাষা চলে যে অংশগুলিতে সেখানেও দুইয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এর কারণ বুঝা কঠিন নয়। হয়ত কোথাও প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে বধূ পশ্চিম প্রান্তে এসেছেন, এসে শৈশবের শেখা গানগুলির সঙ্গে যৌবনের শ্বশুরালয়ে শেখা গানগুলির এক সমন্বয় সাধন করেছেন—মাঝখানে দুই-চার কলি জুড়ে অথবা বিশেষ বিশেষ শব্দের সন্নিবেশ করে। মাঝে মাঝে দেখা যায় সেই একই কারণে পূর্ব্বাংশে পশ্চিমের গান প্রচলিত হয়ে গেছে এবং পশ্চিম অংশে পূর্ব্বাঞ্চলের গান গীত হচ্ছে।

প্রথমে যুক্ত প্রদেশের বিবাহ-সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। বিবাহের শুভদিন অবধারিত হওয়ার পর থেকেই প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা সমবেত হয়ে মাঙ্গলিক গান করেন। গানগুলি পূজার রসাত্মক এবং বহুক্ষেত্রেই রামচন্দ্র বা শিবের বিবাহ হচ্ছে এগুলোর বিষয়বস্তু। বিবাহ যাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য প্রার্থনা করা হয়—

"আওহু ম ভবানী মাইয়া বৈঠ মোরে অঙ্গনে,
দেবোঁ সতরঞ্জিয়া বিছায়
তোহরে সরণ মাইয়া মৈ জগ রোপোঁ
জগিয়া পূরণ মোর হোয়।"

"হে ভবানী আমার অঙ্গনে এস—শতরঞ্জি বিছিয়ে দেবো। আমার শুভকার্য্য যেন সফল হয়—আমি তোমার শরণাগত।"

মণ্ডপের জন্য বাঁশ কাটার সময় গাওয়া হয়—

আরে সে বাঁশ কাটায়েন রাজা দশরথ
পড়ি গয়ে অঙ্গুরিয়া মে কাঁস।
অঙ্গুরীকে বেদন মরৈ রাজা দশরথ
কেকই কে পরল হুঁকার,
অইসী কেকই পলঙ চঢ়ি বৈঠী
ঘরুঁলী অঙ্গুরিয়া কে পীর
অঙ্গুরীকে বরত বেদন হরি লেইলী
রাজা দশরথ সোয়ে সুখ নীঁদ"।

এ গানের আসল কথাটা হচ্ছে, (এত লোক থাকতে) রাজা

দশরথ বহতে বাঁশ কাটতে গেলেন কেন? মূল রামায়ণে এই গুরুত্বপূর্ণ (?) ব্যাপারটি উল্লেখ করতে মহাকবি হয়তো ভুলেই গিয়েছিলেন।

তার পরে মণ্ডপে তৈল-হরিদ্রা চড়ানো হয়, এয়োস্ত্রীরা হস্ত হরিদ্রারঞ্জিত করে কন্যার গায়ে হলুদ মাখিয়ে দেন। তেল চড়াবার পর প্রতিদিন বরবধুকে তৈল-হরিদ্রা মাখানো হয়। সেই সময় স্বামী-সৌভাগ্যবতীরা প্রত্যহ কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

সাঠি ক চাউর হালরি দুব
চুমৈ চ'লী কওন লাল ধীয়রে
মথওয়া চুমির চুম দিহ'লী আসীস্
জিয়হিঁ কওন লাল লাখ বরিষ।
জস রে বড় হিঁ জস্ ধরতী কে ধান রে
জস্ রে বেলসি জস রৈইনি ক চাঁদ রে।"

"চাল-দূর্ব্বা নিয়ে সুন্দরী কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে চল। মস্তক চুম্বন করে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে হবে—তার পুত্র লক্ষ বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হোক। পৃথিবীর ধানসম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক এবং রাত্রির চাঁদ চির শোভাময় হোক।

প্রতি সন্ধ্যায় কলসীর উপর প্রদীপ জ্বালাবার সময় গাওয়া হয়—

"কুরখেতে লছমী পুকারৈঁ ত কেহি ঘর মৈঁ জাঁউ
জিন মোঁহি সাঁঝ লেসৈঁ
পুতবা কহৈঁ মৈঁ ত জেকরহিঁ জাঁউ জেন মোঁহি পুত গোহরাবৈঁ
দুধবা কহৈঁ মৈ ত জেকরহিঁ জাঁউ জে মোঁহি ওঁট জমাবৈ
বহুআ কহৈ মৈঁ ত জেকরহিঁ জাঁউ জে মোহিঁ
দুলারী গোহরাবৈ।"

"কুরুক্ষেত্রে লক্ষ্মী বলছেন আমি কার গৃহে বাস করব—না যে নিত্য আমায় সন্ধ্যায় প্রদীপ দেবে। পুত্র বলছে আমি তার ঘরে যাব যে আমায় পুত্র বলে সমাদর করবে—দুধও চায় যোগ্য আধারে যেতে। তেমনি বধূ বলছেন, আমি তার ঘরে যাব যে আমায় আদরিণী করে রাখবে।

এই ধরণের গানকে বলে 'মৌর'। এই মৌর গান ভোর-বেলাতেও গাওয়া হয়। বিবাহের কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কন্যাকে সোহাগ (হরিদ্রা) দেওয়া হয়, রীতি আছে প্রথমে সেই সোহাগ দেবে কোনও ধোবানী। এর মূলে আছে এক কাহিনী। কথিত আছে সোনা নাম্নী এক ধোবানী নিজের তেজ ও সতীত্বের বলে স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করেছিল। এটি আমাদের সাবিত্রী-উপাখ্যানেরই অনুরূপ সন্দেহ নেই।

ঠাকুরমা নাতনীকে সোহাগ-আশীর্ব্বাদ দিচ্ছেন—

"মচিয়হিঁ বৈঠল হৈ মায় বহিন লট আয়
লেহু দুলরৈতী বেটী অকরা পসায়।
অকরাকে ভোগবা হে মায় ঝরি বুরি যায়
মাজিয়াকে ভোগিয়া হে মায় সদা অহিবাত।"

ঠাকুরমা প্রথমে অকলে সোহাগ দান করছেন—কন্যা বলছেন, অকলের সোহাগ, হরিদ্রা সিন্দুর অক্ষয় হয় না—ঝরে পড়ে যায়। সিঁথিতে সোহাগ দান করলেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে। কন্যার প্রধান সৌভাগ্যসূচক চিহ্ন সিঁথির সিঁদুর। কন্যার বিবাহে আছে 'ভুকতাকে'র গান, কেমন করে কন্যা বরকে বশ করবেন তার হদিস্।

"বাবাকে অদনা বৈগনকের গাছিয়া
ফুল ফুলৈলে তিন কোণা রে মেরো টৌনা (তুক)
সেই ফুলকে তবীজ বনায়া
বাঁধবৈ দুলারী পুত বাজুয়ে মেরো টৌনা।
বাঁধি ছান্দি জব বৈঁড়বা বানায়া
লাড়ো কে আগে বন্না ঘুমরই রে মেরো টৌনা"

"পিতার অঙ্গনে বেগুনের গাছ লাগিয়ে ফুল ফুটলো ত্রিকোণ। সেই ফুলের মাদুলী করে বরের বাহুতে বেঁধে দেব।" তারপর আর কি? বশ মেনে বর কন্যার পিছে পিছে ঘুর ঘুর করবেন।

কন্যা যাতে স্বামী-সৌভাগ্য লাভ করতে পারে স্নেহাতুরা জননীর সে জন্যে চেষ্টার আর অন্ত নেই। জামাইয়ের বস্ত্রাদির উপরেও ভুকতাক চালানো হচ্ছে। কন্যা চলে যায় পরের ঘরে, মায়ের সান্ত্বনা কোথায়। তাঁর কন্যাটির সেখানে আপন আর কে আছে! কন্যা যদি বরকে বশ করতে পারে তবেই মা সে সুখী হবে।

বলা বাহুল্য, ভুকতাকের গানগুলি কেবল কন্যাপক্ষই গেয়ে থাকেন।

বরপক্ষ বরযাত্রীদের নিয়ে যখন বিবাহ করতে যাত্রা করে তখন এমন সব গান গাওয়া হয় যেগুলোতে বরের ওপর অপর পক্ষের তন্ত্রমন্ত্রাদি যাতে কার্য্যকরী না হয় তার ইঙ্গিত থাকে।

"বনে পর টৌনবা না কোই ডারে
সিয় মাতু কহৈঁ রাণী সুনৈনা
বনে পর রাঈ নোন উতারো।"

রাই এবং নুন নামাবার প্রথা আছে বিবাহের যাত্রার পূর্ব্বে। "ছেলের ওপর যেন কেউ যাদু না প্রয়োগ করে। রাণী সুনয়না বলছেন—যাতে কোন ভুকতাক সফল না হয় সেইজন্য রাই আর নুন দিয়ে বাড়া হবে ছেলেকে।"

বর যখন বিবাহ করতে চলে তখন তাকে 'পরিছন' করা হয়—পরিছন শব্দের অর্থ বরণ করা।

পরিছন কৈর জব চললী কামিনি
চুমেলি তিলক লিলার
অইসনে দুলুরুয়া ক রোগ বল জাবৈ
সগরী অজোধিয়া উঁজোর।

"বরণ করা হচ্ছে বরকে। তার কপালের তিলক চুম্বন করে আশীর্ব্বাদ করা হচ্ছে—এমন পরম স্নেহের দুলাল যে সমস্ত অযোধ্যার আলোক, তার সকল রোগবালাই দূর হয়ে যাক।" পুত্র যখন বিবাহ করতে রওনা হয় তখন তাঁর স্নেহের ভাগীদার আর একজন হতে চলেছে এই ভেবে মায়ের

মনে জাগে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব, তারই ইঙ্গিত আছে নিম্নোক্ত গানটিতে—

তু তো চললে পুতা গৌরী বিআহন
দুধবা ক রিণ দৈ দেউ,
গইয়া ক দুধবা রে হটিয়া বিকালা
মাইয়া ক দুধ অনমোল।
দুধবা ক রিণ মাইয়া কাউ মৈঁ দৈউ
দৈউ বনি হোইহৈঁ দাসী তোহার।

বিবাহ-যাত্রী পুত্রকে জননী বলছেন, "এবার তো চললে গৌরীকে বিবাহ করতে, এতদিন তোমায় বুকের দুধ দিয়ে পোষণ করেছি তার মূল্য দিয়ে যাও।" ছেলে বলছেন, "গাইয়ের দুধ বাজারে পাওয়া যায়, মায়ের দুধ অমূল্য। তোমার দুধের দাম কেমন করে পরিশোধ করবো—আমি তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি।"

প্রথা আছে, পুত্রের বিবাহ-যাত্রাকালে জননী কূপের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন যতক্ষণ না পুত্র এসে তাঁকে দাসী আনার আশ্বাস দেয়।

বাজন বাজত হম সুনল বাবা
কৈ লাখ আবৈ বাবা হাথী সে ঘোড়া
কৈ লাখ তাবুআঁ কানাত।
কৈ লাখ আবৈ বাবা কুষ্ট মুরারী
দুই লাখ আবৈ বাবা হাথী সে ঘোড়া
তিনি লাখ আবৈ কুক মুরারী
এতনা বচন সুনি বেটী কে বাবা
হমি গিরৈঁ বজরা কিবার
কিন ঘোরী বেটীয়ে সজন সমহরি দৈঁ
কিন রে রিধৈঁ ভগ-ভাত।

বরযাত্রীদল আসছে, বাজনা শোনা যাচ্ছে। আসছে দু-লক্ষ হাতী ঘোড়া তিন লক্ষ কুক মুরারী (বরযাত্রী)। শুনে কন্যার পিতার চক্ষু চড়কগাছ—তিনি উদ্‌ভ্রান্তপ্রায় হয়ে দ্বার বন্ধ করতে বলছেন। হে কর্তা, কেই বা এত কুটুম্বকে সামলাবে এবং কেই বা এত জনের ভাত রাঁধবে?

কন্যাদানের সময় গাওয়া হয়—

"চন্দ গরহণবাঁ বেটী সাঁঝে লাগৈ,
সুরজ গরহনবা তিনুসার।
ধেরিয়া গরহনবা বেটী ওঁথট লাগৈ
কবহোঁ উগরহ হোয়।
কাঁপই হাথীয়ে কাঁপই ঘোড়া
কাঁপৈ নগরা কে লোগ
হাথ মেঁ কুস লিহে কাঁপৈ বাবা,
কবহোঁ উগরহ হোয়।"

হে কর্তা! চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যায়, সূর্য্যগ্রহণ ভোরে হয়, তার শেষও আছে। কিন্তু পিতার কন্যা-সম্প্রদানের চিন্তা যেন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য 'গ্রহণ' লাগার মত। গ্রহণ লাগলে সমস্ত অন্ধকার, যাবতীয় প্রাণী হয় ভীত সন্ত্রস্ত ও সারা শরীর ভয়ে কাঁপে। আবার যখন কন্যা সম্প্রদান করা হয় তখন কুশ হাতে পিতা কাঁপছেন দুঃখে। চিরদিনের জন্য কন্যাকে বিদায় দিতে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। বিবাহ-বেদী সাত বার প্রদক্ষিণ করছেন কন্যা, নারীরা গাইতে লাগলেন বিদায়ের গান। কেননা এই প্রদক্ষিণের পর কন্যা পর হয়ে যায়।

অঙ্গর ডাঁড়িয়া কনাও মোরে বাবা
বিহবা করাও হমার
সাত পরগ সঙ্গ চলিকে হো বাবা
অব মৈঁ ভইউ পরাই।
সাতই ভবরিয়া কে কিরত বাবা
অব নহি বাটি তোহার।

"সপ্তপদী হয়ে গেল, হে পিতা এবার আমার বিদায়ের ব্যবস্থা কর। স্বামীর সঙ্গে সাত পা চলে আমি তোমার পর হয়ে গেছি, আর আমি তোমার নই।"

সপ্তপদীর পর হয় সিন্দূর দান।

হটিয়ে সেন্দুরা মহঙ্গ ভয়ে বাবা
চুন্দরী ভঈ অনমোল
যেহি সেন্দুরাকে কারেন হো বাবা
ছোড়েউ মেঁ দেশ তোহার।
বাবা কহৈঁ বেটী দশ কোস বিআহব
ভইয়া কহৈঁ কোস পাঁচ
মায় কহে বেটী নগর অজোধ্যা
নিত উঠ প্রাত নহাউ।
বাবা যে দীহেন অনধন সোনবাঁ
মায় যে লহরা পটোর
ভইয়া যে দীহেন চঢ়নেকো ঘোড়বা,
ভৌজি যে অপনা সোহাগ।
বাবা ক সোনবাঁ নবৈ দিন খাবৈ
কটি জইহৈঁ লহরা পটোর
ভইয়া ক ঘোড়বায়ে নগ্র কুদহবৈ
ভৌজি ক বাঢ়ে অহিবাত।
বাবা কহৈঁ বেটী নিত উঠি আয়েউ,
মায় কহে ছঠমাস
ভৈয়া কহৈঁ বহিনী কাজ বিতাহে
ভৌজি কহৈঁ কস বাত।

'বাবা বাজারে সিন্দূরের মূল্য বেড়েছে, চুনরী দুর্ম্মূল্য হয়েছে, সেই সিন্দূরের জন্য তোমার দেশ ছেড়ে চলছি।' বাবা বলছেন, 'কন্যা তোমার বিবাহ দেব দশ ক্রোশের মধ্যে, ভাই বলছেন পাঁচ ক্রোশের মধ্যে, মা বলছেন অযোধ্যা নগরে তোমার বিবাহ দেব—নিত্য প্রাতে স্নান করবে। বাবা দিলেন ধন, ধান, সোনা; মা দিলেন লোহিত পট্টবস্ত্র; ভাই দিলেন চড়বার জন্য ঘোড়া এবং ভ্রাতৃবধূ দিলেন নিজের কৌটা থেকে সিন্দূর। অবশেষে যখন বিবাহের পর কিছুকাল কাটল, যখন পিতৃদত্ত ধনধান্য খরচ হ'ল, মায়ের দেওয়া পট্টবস্ত্র ছিঁড়ে গেল—অর্থাৎ কন্যা যখন আয়ুষ্মতী হলেন তখন পিতা বললেন, 'নিত্য আমার গৃহে এস', মা বলেন, 'কন্যা, ছয় মাস অন্তর এস', ভাই বলেন, 'বোন নিজের কাজকর্ম শেষ করে এস', ভ্রাতৃবধূ কিন্তু উচ্চারণ করলেন কঠোর বাক্য।

পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর মনোভাবের বড় নিপুণ বর্ণনা আছে এই গানটিতে। প্রথম যখন কন্যা শ্বশুরগৃহে

যাত্রা করেন তখন সভ বিরহে যে ব্যাকুলতা থাকে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতিতে তার গভীরতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু পিতা মাতা ভ্রাতার স্নেহ নিঃশেষ হয় না। ভ্রাতৃবধূর আচরণের উপর কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে।

কোন কোন গানে বিবাহ বিষয়ে কন্যাকে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায়।

বাবা জো চলেন মোর বর হেরনে
পাট পিতাম্বর ডারি
ছোট দেখি বাবা করবৈন কন্নিহৈঁ
বড় নহি নজর সমাই।
অরে অরে বাবা সুন্দর বর হেরেউ
হম বেটী তোহারি দুলারী
তীন লোক মাঁ হম বড়ি সুন্দর
হঁসী ন করায়উ মোরি।

কন্যার জন্য বর খুঁজতে পিতা পট্টবস্ত্রাদি ধারণ করে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কন্যা জানিয়ে দিচ্ছেন বর যেন বেশী ছোট ঘরের বা বেশী বড় ঘরের না হয়, অর্থাৎ সমান ঘরের হয়। পিতা! সুন্দর বরের খোঁজ করো, আমি তোমার আদরিণী কন্যা। তিন কুলে আমি তোমার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যা, আমার যেন বিদ্রূপভাজন হতে না হয় কুরূপ বরের জন্য!

বেশ স্পষ্টোক্তি! পিতা কিন্তু নিরুত্তর। সুন্দর চিত্রখানি! কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা গলায় চাদর দিয়ে চিন্তিতমুখে যাত্রা করছেন এবং আদরিণী কন্যা ফরমাস দিচ্ছেন বরটি কেমন হওয়া চাই। নিজে তিনি পরমাসুন্দরী এই কারণেই সুন্দর এবং উপযুক্ত বর চাই তার। পছন্দমত বর না হলে লোকে যে হাসবে এইটাই যেন সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার।

বাল্য-বিবাহের প্রচলন ক্রমশঃ কমে আসছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। বালিকা-বধূর বিবাহে যে সব গান গাওয়া হ'ত তারই কিছু কিছু এখনও গীত হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে অসমবয়সী বরকন্যার বিবাহ।

"পাঁচ বরিসবা ক মোরী মদরেলী,
অসিয়া বরস ক দমাদ
নিকরি ন আবউ তুঁ মোরী মদরেলী
অজগর ঠাঢ়ি দুআরি।"

"পাঁচ বছরের কন্যা আর আশী বছরের বর! আহা আমার আদরিণী কন্যা ঘরের বাইরে এস না। বাইরে অজগর সাপ তোমায় শিকার করবার জন্য অপেক্ষা করছে।" কন্যা জিজ্ঞাসা করছেন—

কে করে দুয়ারে মাইয়া বাজন বাজৈ
কেকর রচা হৈ বিআহ।

জননী উত্তর দিচ্ছেন—

তুঁহি বেটী আউরি তুঁহি বেটী বাউরি
তুঁহি বেটী চতুর সয়ানি
তোহরে দুয়ারে বেটী বাজন বাজৈ
তুমহর রচা হৈ বিআহ।

গানটি বিভিন্ন দেশের সামাজিক তথ্যানুসন্ধিৎসুদের নিকট বিশেষ চিত্তাকর্ষক। গানটির অর্থ এইরূপ—কন্যা বলছেন,—"মা কার দ্বারে বাজনা বাজছে—কার বিবাহ?" জননী শিশুকন্যাকে আদর করে উত্তর দিচ্ছেন—"তুমি আমার আদরিণী কন্যা, তুমি যেমন রুচি তেমনি বুদ্ধিমতী। তোমার গৃহদ্বারে বাজনা বাজছে এবং তোমারই বিবাহ হচ্ছে।"

বিদায়ের সময় কন্যা জননীকে অনুরোধ করছেন—

"বাম মলোইয়া মৈ গুড়িয়ারে
ভুলী ধরৈ পেটরিয়া কে বীচ্।"

হায়রে, আমার পুতুল নিতে ভুলে গেছি—সেটি আমার বাক্সে দিয়ে দাও।

এক সংসারের পুতুল খেলা শেষ না হতেই অন্য সংসারে এসে খেলাঘর সাজিয়ে বসতে হয় এখনও বহু বালিকাকে। কন্যার বিবাহে খরচের মোটা অঙ্ক স্মরণ করে গাওয়া হয়—

গঙ্গা বৈঠি বাবা সুরজ সে বিনবৈঁ
মোরে বুতে ধেরিয়া জিনি হোয়।
ধেরিয়া জনম তব হোঈ বিধাতা
জব ঘর সম্পতি হোয়।

গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে পিতা প্রার্থনা করছেন সূর্য্যের নিকট, যেন কন্যা-সন্তানের জন্ম না হয়। হে বিধাতা, ঘরে ধনসম্পদ থাকলে তবেই যেন কন্যা জাত হয়।

হোইগা বিআহ পড়া সির সেন্দুর
সব লাখ দায়জ থোড়।
ভিতরাঁ ক ভাঁড় বহর ধই মারী
সতরু কে বিয়া জিনি* হোয়।

"কন্যার বিবাহে সিঁদুর দান হ'ল তারই সঙ্গে যতই দান-'দাহেজ' হ'ল কিছুই যথেষ্ট নয়। ঘরের মধ্যে যা ছিল সব গেল—হে ভগবান, শত্রুরও যেন কন্যা না হয়।"

কন্যার দরুন অর্থনাশ তো আছেই, তার ওপর—

"গিরি নবৈ পর্ব্বত নবৈ হম তো না নইয়ো
বেটী তোহরে কারণ হম জগ মে মাথ নবায়ে

গিরি-পর্ব্বত নত হয় কিন্তু আমি কারো কাছে মস্তক অবনত করি নি। হে কন্যা, তোমার জন্যই সংসারে আমার মাথা নোয়াতে হ'ল।"

বিদায়কালে কন্যা বলছেন—

"বিরনা কলেউবা এ অম্মা হঁসীখুসী রে দেব
হমরা কলেউবা এ অম্মা দিহিউ রিসি আই।"

কন্যার কঠিন অভিযোগে জননী বলছেন—

বজরা ক ছাতিয়া বেটী বিহরিউ ন জায়
চলতী কী দইয়াঁ রে বেটী দিই সমুঝায়।

বিদায়কালে কন্যা অভিমানভরে জননীকে শোনাচ্ছেন—ছেলেকে যখন খাওয়াও তখন তো বেশ হাসিখুসী, কিন্তু আমায় যখন খাবার দিতে তখন বিরক্তি প্রকাশ করতে।

জননী সখেদে উত্তর দিচ্ছেন—বজ্রের অন্তরে কি আছে বোঝা যায় না। বিদায়কালে হে কন্যা, বুঝিয়ে দিলে কি ছিল তোমার মনে!

---

* জিনি শব্দটির অর্থ 'যেন না'—। ব্রজবুলির পদাবলীতে জিনি শব্দের অর্থ ভিন্ন,—দুটি অর্থে তার ব্যবহার দেখা যায় পদাবলীতে—জিনি = অপেক্ষা, এবং জিনি = যেন।

আফগানিস্থানের বর্ত্তমান শাসননীতি

শ্রীসুবাস রায় চৌধুরী

আফগানিস্থানের নূতন শাসনপদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। এই শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয় দুই বার—১৯২৮ এবং ১৯৩০ সনে। প্রত্যেক সংশোধনের সঙ্গে এই পদ্ধতি দেশের মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, দেশকে উন্নত ও জাগ্রত করিয়া তোলে। ১৯২৯ সনে গৃহ-বিবাদ ঘটে। তার ফলে দেশের মধ্যে বিপ্লব দেখা দেয়। এই বিপ্লবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং শাসনবিভাগে ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায়ে ১৯৩০ সনে কতকগুলি আইন, কানুন, নীতি ও পদ্ধতির খসড়া তৈয়ারী করা হয়। বর্ত্তমান শাসনপরিচালনা এই ভিত্তির উপর স্থাপিত। মহম্মদ নাদির শা ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি তখন দেশের রাজা ছিলেন। তিনি নেশন্যাল এসেমব্লিতে নূতন নীতি ও পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমস্ত সদস্য ইহা সমর্থন করেন।

নবপ্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত। ইহাতে জাতীয়তাবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতির ও প্রসারের ব্যাপক পরিকল্পনা করা হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। ১৯৩০ সনে আফগানিস্থানে নবযুগের সূচনা দেখা দেয়।

বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইতেছেন রাজা। দেশের সুনির্দ্দিষ্ট রাজকীয় প্রথায় দেশকে শাসন করিতে হইবে। রাজার ক্ষমতা কতক অংশে সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত প্রথানুযায়ী নাদিরশার বংশধর হইতে রাজা নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত থাকিবে। উপাধি বা সম্মান তিনিই প্রদান করিবেন। মন্ত্রীদের নিয়োগ বা অপসারণের অধিকার তাঁহার হাতে থাকিবে। দেশের সৈন্যাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনে তাঁহার অনুমতি লইতে হইবে। যুদ্ধ ঘোষণা করা, সন্ধি স্থাপন করা এবং বিদ্রোহীকে শাস্তি দেওয়া রাজার অন্যতম কর্ত্তব্য। রাজা সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে রাজ্যের নায়কদের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে যে, তিনি ইসলাম ধর্ম্মানুযায়ী দেশকে শাসন ও পরিচালনা করিবেন।

দেশীয় পার্লিয়ামেণ্ট:—নিম্নোক্ত সদস্যগণ লইয়া পার্লিয়া-মেণ্ট গঠিত হয়,—

১। রাজা

২। মজলিসী সুরা অথবা দেশের প্রতিনিধি সদস্য।

৩। মজলিসী আযান অথবা সিনেট (প্রবীণ দেশ-নায়কগণ)

নূতন আইন প্রবর্ত্তন ও প্রচলিত আইন সংশোধন করিবার ক্ষমতা একমাত্র পার্লিয়ামেণ্টের আছে। ইহার বিরুদ্ধাচরণ অন্য কোন দল করিতে পারিবে না। সিনেট এবং প্রতিনিধি-দলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে উভয় দল হইতে ২০ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হইবে। তাহারা যদি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসিতে পারে, তবে রাজার নিকট বিষয়টি পেশ করিতে হইবে। রাজার সিদ্ধান্ত সকলেই মানিয়া লইতে বাধ্য। মন্ত্রিসভার সদস্যেরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে পার্লিয়ামেণ্টের কাছে দায়ী।

নির্ব্বাচন-প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক কেন্দ্র হইতে ৩ বৎসরের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সদস্যদের মধ্য হইতেই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করা হয়। পরিষদের কার্য্য পরিচালনার ভার তাঁহার হাতে ন্যস্ত। বাজেট পর্য্যালোচনা, আইন-প্রণয়ন বিষয়ে মতামত লওয়া, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা প্রভৃতি ইঁহার করণীয়। প্রেসিডেণ্টের অনুমতি লইয়া মন্ত্রীরা এই পরিষদে উপস্থিত থাকিতে পারেন এবং নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। কোন বিষয়ের আলোচনার সময় জনসাধারণ ও প্রেস-কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিতে পারে।

সিনেট :—সিনেটের সদস্য রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। অভিজ্ঞ ও প্রবীণ দেশনায়কগণের মধ্য হইতে সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়। আইন ও নূতন বিধি প্রণয়নে এবং দেশের জটিল বিষয় সম্পর্কে সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করা হয় এবং তাহাদের মতামত লওয়া হয়।

কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা :—৬ জন মন্ত্রী লইয়া কেবিনেট বা মন্ত্রীসভা গঠিত। রাজা প্রধান-মন্ত্রী নির্ব্বাচন করেন। অন্যান্য মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। যদি কোন বিষয় কোন মন্ত্রীর অধিকারের বাহিরে পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজার পরামর্শ লইতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার বিচারের জন্য অস্থায়ী কোর্ট স্থাপনের বিধি আছে। কোর্টের রায়ই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

আফগানিস্থানে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই সমান অধিকার ভোগ করে। ধনী বা গরীব বলিয়া কোন শ্রেণীভেদ নাই। প্রত্যেকের মর্য্যাদানুযায়ী কর ধার্য্য করা হয় এবং প্রত্যেকেরই ন্যায়-বিচার পাইবার দাবি আছে। অবিচার করা ধর্ম্মবিরোধী।

পুস্তক-পরিচয়

বাল্মীকি রামায়ণ—সারানুবাদ—শ্রীরাজশেখর বসু। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ৫৷০ টাকা।

আদি কবি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়া যুগে যুগে কবি-কুল রামচরিতকীর্ত্তনে দেশবাসীকে আনন্দ বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন। সংস্কৃতে কালিদাস, হিন্দীতে তুলসীদাস, বাংলায় কৃত্তিবাস মহাকবির দ্বারা অনুপ্রাণিত। বিগত সত্তর পঁচাত্তর বৎসরের মধ্যে মূল সংস্কৃত হইতে বাংলা গদ্যে বাল্মীকি রামায়ণের কয়েকখানি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুবাদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বরাট প্রেস হইতে যে রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার প্রথম কিয়দংশ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত; পরবর্ত্তী সকল অংশের অনুবাদই পণ্ডিত আশুতোষ কাব্যবিশারদ কৃত। "বঙ্গবাসী" যে সব শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন মূল-সহ রামায়ণের অনুবাদ তন্মধ্যে অন্যতম। কোন অনুবাদই বর্ত্তমানে সুপ্রাপ্য নয়। রামায়ণের শ্লোকগুলি সরল হইলেও ভিন্ন ভাষার দুরূহতা অতিক্রম করিয়া মূলের রস গ্রহণ করা সংস্কৃতভাষাজ্ঞান-সাপেক্ষ। সে জ্ঞান অর্জ্জন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু সকল আগ্রহশীল পাঠকের পক্ষেই আদি কবির কবিত্বের পরিচয়লাভের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। সে কৌতূহল মিটাইতে হইলে অনুবাদের প্রয়োজন। অথচ সম্পূর্ণ রামায়ণ অথবা তাহার অনুবাদ পড়িবার ধৈর্য্য ও অবসর অল্প লোকেরই আছে। এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বাল্মীকি-রামায়ণের বাংলা সার-সঙ্কলন করিয়া সাধারণ পাঠককে একান্তভাবে উপকৃত করিয়াছেন। সারানুবাদ বলিয়া কথিত হইলেও এই গ্রন্থে মূলের যেটুকু বাদ পড়িয়াছে তাহা নিতান্তই গৌণ। সাধারণের উপযোগী করিবার অনুরোধে রাজশেখরবাবু যেটুকু সংক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পরিশ্রমের বিশেষ লাঘব হয় নাই। কয়েকটি কারণে এই সারানুবাদ অত্যন্ত মূল্যবান। প্রথমতঃ, এ-যাবৎ এইরূপ অনুবাদে যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও তাঁহারা সাহিত্য হিসাবে বাংলা আলোচনা করেন নাই। গ্রন্থকার কিন্তু একাধারে সুপণ্ডিত, সুরসিক এবং সুসাহিত্যিক। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ মহাকাব্যের অনুবাদে কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার অত্যন্ত সাহসের কথা। এই পরীক্ষায় তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চলিত ভাষার ক্রিয়াপদ যে ব্যবহৃত হইতেছে গ্রন্থপাঠকালে তাহা মনেই হয় না এবং এই রীতি রচনার গাম্ভীর্য্যকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করে নাই। তৃতীয়তঃ, সমস্ত সুষ্ঠু এবং সার্থক অনুবাদের ন্যায় ইহা মূলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পাঠকের মনকে উদ্রিক্ত করে; সেই আগ্রহ এবং কৌতূহলকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে বঙ্গানুবাদসহ মূল শ্লোক-গুলিও সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে। প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা অল্পপরিসরের মধ্যে কি করিয়া বলা যায় এই ভূমিকাটি তাহার নিদর্শন। রামচন্দ্র মোটেই নিরামিষাশী ছিলেন না। অযোধ্যাকাণ্ডে আছে, রামলক্ষ্মণ চারিপ্রকার পশু বধ করিয়া তাহাদের পবিত্র মাংস লইয়া ক্ষুধিত হইয়া সায়ংকালে বাসের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিলেন। এই কাণ্ডেই দেখিতে পাই, মহর্ষি জাবালি অবস্থা বুঝিয়া নাস্তিক বা আস্তিক হইতেন। কৃত্তিবাস যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা যে সীতার পরিচয় লাভ করিয়াছেন তিনি অত্যন্ত সুকোমলা, তেজস্বিনী সীতার সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে বাল্মীকিপাঠের প্রয়োজন। রামচন্দ্রের অবতারত্বে বিশ্বাসী হইয়াও বাল্মীকি তাঁহার মানবত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বাল্মীকি লঙ্কাকাণ্ডেই মহাকাব্য শেষ করিয়াছেন। যুদ্ধকাণ্ডের শেষে যে রামায়ণ-মাহাত্ম্য আছে তাহাই মহা-কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে। যে কবি উত্তরাকাণ্ড রচনা করিয়াছেন তিনিও আদি কবি অপেক্ষা অল্পকবিত্বসম্পন্ন নহেন। উত্তর-কবি সীতাকে নির্ব্বাসিত এবং শেষে চিরবিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। "উত্তর কবির উদ্দেশ্য মহৎ, তিনি আপাত নিষ্ঠুর উপায়ে রাম ও সীতার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।" প্রকৃতি ও ঋতুর যে বর্ণনা বাল্মীকিতে আছে তাহা অপূর্ব্ব। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ঋতুর বর্ণনায় পাই, "দেখ বর্ষাকাল সমাগত হয়েছে, পর্ব্বততুল্য মেঘে নভোমণ্ডল আবৃত। এই মেঘের সোপানপঙ্‌ক্তি দিয়ে আকাশে উঠে কুটজ ও অর্জ্জুন পুষ্পের মালায় সূর্য্যকে অলঙ্কৃত করা যেতে পারে। আকাশ মেঘে আবৃত, তারা সূর্য্য দেখা যায় না, নবজলধারায় ধরণী পরিতৃপ্ত, সর্ব্বদিক অন্ধকারে অবগুণ্ঠিত হয়েছে।" শরৎ ঋতুর বর্ণনায় পাই, "সপ্তচ্ছদের শাখায়, সূর্য্য-চন্দ্র-তারার প্রভায় এবং গজেন্দ্রের লীলায় নিজ শোভা বিভক্ত ক'রে শরৎ আজ উপস্থিত হয়েছে। সুগন্ধ সুন্দর সুবর্ণগৌর প্রচুর পুষ্পভারে প্রিয়ক তরুর শাখাগ্র অবনত; তাতে বন যেন আলোকিত হয়েছে। কহ্লার-সুরভিত শীতল বায়ু বইছে, সর্ব্বদিক তমোমুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।" গ্রন্থকারের বহুমুখী প্রতিভা অনুবাদেও সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মূলসূত্রম্—(অথবা জিন গীতা) শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত। ডি এম্, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

মূলের যে সংস্কৃত অন্বয়, বাংলা অনুবাদ, টীকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থকার দিয়াছেন তাহা বেশ ভালই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থের ভূমিকায়। লেখক যে নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সে কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তবে, শব্দ-ব্যবহারে তাঁহাকে কখনও কখনও অসতর্ক দেখা যায়। প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রচলিত শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ করিলে লেখকের উচিত পাঠককে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সব সময় তাহা করেন নাই। যেমন, 'উদান' শব্দ পঞ্চ প্রাণবায়ুর একটিকে বুঝায়। লেখক ইহাকে অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ পাঠককে কোথাও

তাহা বলিয়া দেন নাই। পাঠক যদি সবই জানিবে, তবে নূতন বই পড়িবে কেন?

মুখবন্ধের শেষ অংশে বাংলা ভাষায় একাধিক বই প্রথম প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে একটু 'আত্মম্ভরিতা' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হয়ত অমার্জ্জনীয় নয়। কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, মানুষের সমাজকে টানিয়া প্রাচীন অতীতের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা না করিয়া অনাগত, উন্নত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দিলে তাহার উপকার করা হয় বেশী। প্রাচীনকে ভুলিয়া যাইতে বলি না, কিন্তু অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ারও কোন সার্থকতা আছে কি?

গীতা ও হিন্দুধর্ম—শ্রীবজ্রেশ্বর ঘোষ। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ। ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা। ২৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য চারি টাকা।

ইহা এখনও অপ্রকাশিত একখানি বৃহত্তর গ্রন্থের ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকায় বেদ ও উপনিষদ্‌ এবং সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শনের তুলনায় গীতার স্থান কোথায় এবং গীতার প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহাই বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই আলোচনায় শাস্ত্রীয় উপদেশই লেখকের প্রধান অবলম্বন হইলেও আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দিকে তিনি অনবহিত নহেন। এই দীর্ঘ বিচারে লেখকের গভীর চিন্তা, ভূয়িষ্ঠ অধ্যয়ন এবং অনবদ্য প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় আমরা পাই। আশা করি, গ্রন্থের বাকী অংশটুকুও শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া সুধীসমাজে সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পিএইচ-ডি। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৫, মূল্য ৩। টাকা।

লেখক সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এই পুস্তকে তাহা একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। প্রগতি-সাহিত্যের সংজ্ঞা, সাহিত্য ও সমাজ, সাহিত্যে সমাজচিত্র, হিন্দী সাহিত্যে প্রগতি, উর্দু সাহিত্যে প্রগতি, বাংলা সাহিত্যে প্রগতি এবং প্রলেটরীয় সাহিত্যের স্বরূপ মোট সাতটি প্রবন্ধে পুস্তক সম্পূর্ণ হইয়াছে। 'রূপ ও রস' লইয়া যাঁহারা সাহিত্যের বিচার করেন তাঁহাদের সহিত গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল নাই; তাঁহার মতে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভিতর দিয়া জাগতিক পরিবর্ত্তন চলিয়াছে ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া যে সাহিত্য যুগে যুগে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাই প্রগতিশীল সাহিত্য। এ সাহিত্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গোচর বাস্তবকেই ভাষায় প্রতিফলিত করে। ইহার দৃষ্টি সম্মুখের দিকে। ইহা চলমান। গ্রন্থকারের বিচারে বাংলা, হিন্দী এবং উর্দু সাহিত্যে বাস্তবতা ও প্রগতির দিক দিয়া আজ পর্য্যন্ত অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। এই সাহিত্য গণ-সাহিত্যে পরিণত হইতে অনেক বাকী। আজ পর্য্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের হাতে সামন্ত-যুগীয় সাহিত্যই বেশী সৃষ্টি হইয়াছে। খাঁটি বুর্জ্জোয়া সাহিত্য বেশী দেখা যায় না, প্রলেটরীয় সাহিত্য ত দূরের কথা। শেষোক্ত সাহিত্য রুশদেশে বহুল প্রচারিত হইতেছে। এই

সাহিত্যে কেবল 'জন'-গণের কথা আছে, 'রাজা, জমিদার, ধনী'র কথা ইহাতে স্থান পায় না। 'যে সাহিত্য সমাজের অচলায়তন ভাঙিয়া উন্নত অবস্থার দিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয় সেই চেষ্টাকেই প্রগতি-সাহিত্য বলা হয়। সুতরাং প্রগতি আপেক্ষিক। বিভিন্ন কালে ইহার বিভিন্ন রূপ। দেশ ও কাল অনুযায়ী ইহার 'পথ নির্দ্দেশ' বদলাইয়া চলিয়েছে।' লেখকের মতে বঙ্কিম-সাহিত্য মোটেই প্রগতিশীল নহে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও প্রগতি খুব সামান্য, শরৎচন্দ্রে কতকটা থাকিলেও 'বিপ্রদাস'-চরিত্র সৃষ্টিদ্বারা শরৎ-সাহিত্য প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থকার মার্ক্সপন্থী। মানব জাতির এবং সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস তাঁহার নিকট বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অবস্থার এবং শ্রেণীসংঘর্ষের পরিণতি মাত্র। বর্ত্তমান সভ্য জগতে এই বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার জীবন-মরণ সংগ্রাম চলিয়াছে। সাহিত্যে তাহাই আজ প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস চলিতেছে লেখকের সহিতমতের মিল না থাকিলেও পাঠক এই গ্রন্থে মার্ক্স-পন্থীর দৃষ্টিতে সাহিত্যের স্বরূপ কি প্রকার প্রতিভাত হয় তাহা বিশদভাবে জানিতে পারিবেন।

বিদ্ধি—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, এম, এ। মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৩১। মূল্য ৩৲।

প্রবন্ধের বই। বিরাট বিশ্ব, পৃথিবীর জন্ম ও বয়স, ভূমণ্ডল, জীবজগতের অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তিবাদ, আদি মানবের সন্ধানে, মানবের জাতি বিভাগ, সভ্যতা, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম প্রভৃতি তেরটি প্রবন্ধে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন—এই বইয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞানপিপাসা জন্মানো কিংবা বাড়ানো—জ্ঞান-পিপাসা মিটানো এর উদ্দেশ্য নয়। গ্রন্থকার যে সকল জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ, এমন কি সাধারণ পাঠকেরও জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সরল আলোচনা এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। উপন্যাস-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যে এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বই যতই প্রচারিত হইবে ততই দেশের মঙ্গল।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জীবনের ভুল—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ। প্রাপ্তিস্থান—পোঃ আঃ গোপালগঞ্জ, কায়স্থগ্রাম (শ্রীহট্ট)। মূল্য—২৲।

গ্রন্থকার নূতন, আলোচ্য উপন্যাসটিও ত্রুটিবিচ্যুতিশূন্য নহে। গল্প বলিবার কৌশল তিনি খানিকটা আয়ত্ত করিয়াছেন। যে সকল অনিবার্য্য ঘটনা চরিত্র-বিকাশের সহায়ক এবং গল্পকে সুষ্ঠু পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দেয়—তাহার অভাবই কাহিনীকে দুর্ব্বল করিয়াছে। মুদ্রাকর-প্রমাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত পদগুলির চন্দ্রবিন্দু বিচ্যুত হওয়াতে পাঠকালে বিরক্তি জন্মায়।

গল্পদাদার কথা—শ্রীকমলকুমার বসু সঙ্কলিত। পরি-বেশক: ছোটদের আসর—১৩।এ ডক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৸৹ আনা।

ছেলেদের কাছে গল্প বলার একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, পুরাতন জিনিষগুলিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া মিষ্ট করিয়া বলিবার ক্ষমতা সকলের থাকে না—একটি যেন দৈবলব্ধ জিনিস। গল্পদাদুর গল্পগুলি পড়িলে বস্তুতঃই মনে হয় এই দৈবলব্ধ প্রতিভার অধিকারী বলিয়াই তিনি

অনায়াসে শিশু-চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রত্যেকটি গল্পে ছোটদের জন্য তাঁর অকপট দরদ পরিলক্ষিত হয়। শিশু-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি মূল্যবান সম্পদ্। দক্ষদাদু আজ স্বর্গত, তাঁর নূতন নূতন মনোহর গল্প শিশুসাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিবে না—এই বেদনাই বার-বার মনকে পীড়া দিতেছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

মধুরাতি জাগর—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। কমলা পাবলিশিং হাউস। ৮।১ এ হরিপাল লেন, কলিকাতা। মূল্য ২৷০।

ফাল্গুনীবাবু ইতিপূর্ব্বে বহু উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানি মধ্যবিত্ত সংসারের সুখ-দুঃখের পটভূমিকায় লিখিত। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ। ছোট ছোট পার্শ্ব-চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। কিন্তু বালক-নায়ক গৌতমের মুখ দিয়া যে ধরণের কথা বলানো হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। ফাল্গুনী বাবু এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে উপন্যাসখানি আরও অধিক আকর্ষণীয় হইতে পারিত। কতকগুলি শব্দপ্রয়োগ লেখার স্বচ্ছন্দ গতিপথে মাঝে মাঝে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। যথা, ডরুক (ভীতু), কিন্তুক, লেগে (তার লেগে), রোমাঞ্চক জীবন, মাসের কত রা গৌতম ইত্যাদি। সংলাপের মধ্যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইলে বলিবার তেমন কিছু ছিল না।

বিজিতা—শ্রীউৎপলেন্দু সেন। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

অত্যন্ত দুর্ব্বল মামুলি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি লিখিত। অসিত ব্যারিষ্টার। বন্ধুমহলে নারীবিদ্বেষী বলিয়া খ্যাত—বিবাহ করে নাই। রমেন অসিতের বন্ধু। বড়লোকের ছেলে। বাপের অগাধ টাকা এবং ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে খুব খাতির। অসিত একটি মেয়েকে এক সময় ভালবাসিত, কিন্তু যে কারণেই হোক তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। ঘটনাচক্রে রমেন না জানিয়া সেই মেয়েটিকেই ভালবাসিয়া বিবাহের জন্য পাগল হইয়া উঠিল। রমেনের মা এই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী এবং শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অসিতের শরণাপন্ন হইতে হইল। অসিত অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই এই বিবাহ পণ্ড করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিল। এইখান হইতেই উপন্যাসের আরম্ভ এবং শেষ হইয়াছে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অসিতের সহিত উক্ত মেয়েটির পুনর্মিলনে। লেখকের ভাষা সহজ এবং বেগবান, কিন্তু আগাগোড়া ইংরেজী-বাংলার সংমিশ্রণে তিনি এক জগাখিচুড়ি পরিবেশন করিয়াছেন। এদিকে তাঁহার সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আজো ওঠে চাঁদ—৺অজয় ভট্টাচার্য্য। সারদা সাহিত্য-সংসদ, ৪১-ডি, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

গানের বই। সংগৃহীত সঙ্গীতগুলিকে গীতি-কবিতাও বলা চলে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে গান-রচয়িতা হিসাবে যাঁহাদের নাম করা যাইতে পারে, অজয় ভট্টাচার্য্যের নাম তাঁহাদের পুরোভাগে লিখিত হইবে। ফিল্মজগতের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই 'রাজার কুমার পক্ষীরাজে' 'রূপকথারি রাজা এসে তুলে নিল পারুল ফুল' প্রভৃতি রোমান্টিক গানগুলির সঙ্গে নবজীবনের জাতীয় উদ্বোধন মূলক 'সৈনিক তুমি দুর্জ্জয় বীর' 'বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সবে' 'নূতন ঊষার সৈনিক তুমি' প্রভৃতি সঙ্গীতগুলির সহিত পরিচিত আছেন। নূতন নূতন অতি-আধুনিক সুরে রচিত তাঁহার গানগুলি বাংলার রসিক সমাজে

সুবিদিত অথচ সাহিত্যিকগণের অনেকেই তাঁহার নাম ভাল করিয়া জানেন না, তাঁহারা শুধু কবিকে "সৈনিক" (২য় সং) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া জানেন। কারণ তাঁহার একমাত্র সঙ্কলন-গ্রন্থ 'শুক-সারী' ও বর্ত্তমান গ্রন্থ তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সম্যক্ পরিচায়ক নহে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসকলের অধিকাংশই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। বহু জনপ্রিয় নাম-করা ছবির জন্য তিনি নূতন সুরে অভিনব অপরূপ গীতিকথা রচনা করেন। তিনি প্রায় দু'হাজার গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। মাত্র সাইত্রিশ বৎসরে তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ ও রসিকসমাজ চিরকাল তাঁহার আদর করিবে। যদি কোন সাহিত্যিক-বন্ধু তাঁহার সমগ্র গীতি-কবিতা হইতে শ্রেষ্ঠ গানগুলি বাছিয়া একটি সঙ্কলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন, বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কবি কামিনীকুমারের সঙ্গীত—শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত। প্রাচ্যবাণী সর্ব্বজনীন গ্রন্থমালার ৭ম গ্রন্থ। প্রকাশক—ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশী-গানের স্বনামধন্য রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতির সহিত ত্রিপুরার গীতি-কবি কামিনীকুমারের নাম নিঃসন্দেহে উল্লেখ করা যায়। তাঁহার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'সুখদা'। সমালোচকের অনুরোধে সংগৃহীত বর্ত্তমান গীতিসংগ্রহের পুস্তকটি ক্ষুদ্রকলেবর হইলেও যে কয়েকটি গান ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতে পাঠক সঙ্গীতরচনায় নিঃসন্দেহে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। স্থানাভাবে তাঁহার রচনার কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, সঙ্গীত ও কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেই তাঁহার স্বদেশী ও অন্যান্য সঙ্গীতগুলির শব্দঝঙ্কার ও ছন্দোমাধুর্য্যে মোহিত হইবেন। সম্পাদকের সংগ্রহ আশানুরূপ হয় নাই, অবিলম্বে তাঁহার অবলুপ্তপ্রায় সঙ্গীতের আরও কতকগুলির পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক চীন—থান য়ুন শান। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়। আমাদের অদৃশ্য শত্রু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বের ইতিকথা—শ্রীসুশোভন দত্ত। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা—শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ। অন্তোরশ্মি—শ্রীসুকুমারচন্দ্র সরকার। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। গ্রীক দর্শন—শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী। নব্য বিজ্ঞানে অনির্দ্দেশ্যবাদ—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। ন্যায়দর্শন—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য্য। শিল্পকথা (সচিত্র)—শ্রীনন্দলাল বসু। হিন্দু সংগীত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। প্রাচীন ভারতের সংগীতচিন্তা—শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। বেতার (সচিত্র)—শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর।

প্রকাশক—বিশ্বভারতী, ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রত্যেকটির মূল্য—আট আনা।

এই গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটির পৃথক্‌সমালোচনা সম্ভবপর নহে, প্রতিটি পুস্তকই দেশের মনীষী ও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের উপর মন্তব্য বা টিপ্পনী প্রকাশ করা ধৃষ্টতামাত্র। আমরা শুধু সাধারণ পাঠকগণের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানপ্রচার ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থগুলি বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার গণ্ডী পার হওয়া যাহাদের পক্ষে নানা কারণে সম্ভবপর হয় নাই অথবা সর্বোচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াও যাহাদের জ্ঞানপিপাসা অতৃপ্ত রহিয়া গিয়াছে, যাহারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের নানা বিচিত্র ও বিস্ময়কর তথ্য সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করিয়া কৌতুহল পরিতৃপ্তি ও চিত্তের উৎকর্ষ সাধনে সমুৎসুক, এই গ্রন্থগুলি তাঁহাদের নিকট অমূল্য রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থ-সিরিজ সর্বসাধারণের মধ্যে অল্প মূল্যে প্রচার করিয়া বিশ্বভারতী দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

চৈতী ফসল—শ্রীগীতা বসু ও শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়। পূরবী পাবলিশার্স। ১৩, শিবনারায়ণ দাস লেন। মূল্য দুই টাকা।

'চৈতী ফসলে' সবশুদ্ধ চৌদ্দটি ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে সাতটি শ্রীগীতা বসুর এবং সাতটি শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। প্রায় সবগুলি গল্পকেই সার্থক ছোট গল্প বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে আমাদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। গল্পগুলি ঘটনা-প্রধান নয়, মনস্তত্ত্বমূলক। সেগুলি জীবনের এক একটি নিগূঢ় জটিল রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। মানুষের মনের গহনে পরস্পরবিরোধী কত প্রবৃত্তি যে পাশাপাশি বাসা বাঁধিয়া আছে এবং সময় সময় কত বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতেছে, লেখকগণ প্রত্যেকটি গল্পের পরিণতির মুখে আকস্মিকতার অবতারণা করিয়া পাঠককে সে সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন। ছোট গল্পের আর্ট বিশেষরূপে আয়ত্ত না থাকলে এ ধরণের গল্পকে রসোত্তীর্ণ করা সুকঠিন। চৈতী ফসলের প্রত্যেকটি গল্প শেষ করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে হয়—মনে হয় গল্প শেষ হইল বটে, কিন্তু অনেক কথাই যেন অনুক্ত রহিয়া গেল। "Greatest art consists in concealing art"—এ কথার সার্থকতা এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পেই সপ্রমাণ হইয়াছে। 'বিন্দুমাত্র' (গীতা বসু), আর অগ্নিমীলে (সুধাকর) এই দুইটি গল্পে প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় মানুষের মনোজগতে যে কি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প উপস্থিত হইতে পারে, সূক্ষ্ম এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বলে লেখকগণ গল্প দুটিতে তাহাই সুপরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

গান্ধীজীর গল্প—শ্রীপ্রভাত বসু। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গান্ধীজীর জীবনের কয়েকটি গল্প ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গল্পগুলি পড়িয়া তাহারা যেমন মুগ্ধ হইবে তেমনি চরিত্রগঠনোপযোগী শিক্ষালাভও করিবে। লেখকের বলিবার ভঙ্গীটি চমৎকার। গান্ধীজীর সান্নিধ্যে যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। সেই বর্ণনাটি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

মিলনতীর্থ—শ্রীপ্রবোধ সরকার। কারবারী হিন্দ্ লিমিটেড, ১১ গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১.০।

শিশু-সাহিত্য রচনায় শ্রীপ্রবোধ সরকারের হাত আছে। কাশীরাজ ও কোশল-রাজের বিরোধ, পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরিণামে উভয়ের মিলন এই বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত বর্তমান নাটকখানি শিশুদের চিত্তরঞ্জন করিবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে কাশীরাজসভায় অকস্মাৎ কোশলরাজের প্রবেশ, এবং বীরেন্দ্রসিংহের প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া, তাঁর উদ্দীপনাপূর্ণ উক্তি ইত্যাদি সব কিছুতে মিলিয়া একটি চমৎকার নাটকীয় সিচুয়েশন সৃষ্টি করিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রবর্জ্জিত বলিয়া নাটকখানি বিদ্যালয়ের ছেলেদের অভিনয়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মোপাসাঁ থেকে—শ্রীশীতাংশু মৈত্র, এম-এ। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও ঊর্দ্ধকাল হইল ফরাসী সাহিত্যিক মোপাসাঁ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যে গল্পলেখক হিসাবে আজও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ননীমাধব চৌধুরী মূল ফরাসী হইতে মোপাসাঁর কতকগুলি গল্প অনুবাদ করিয়া বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শীতাংশু মৈত্র সম্ভবতঃ ইংরেজী হইতে গল্পগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়াছেন।

মোপাসাঁর গল্পের মত শ্রেষ্ঠ রসসাহিত্যকে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত-করণ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু শীতাংশুবাবু এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মোপাসাঁর গল্পের "বিশাল ভাণ্ডার হইতে তিনি নেকলেস, তার ছেলে, জ্যোৎস্না, বসন্তে, বেচারা মেয়েটা, কুঞ্চিত, যমদূত, নিবিড় বন, মিস হ্যারিয়েট, মরণের পরে এই দশটি গল্প অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি গল্পই অনবদ্য এবং বিশ্বসাহিত্যের আসরে ইহাদের আসন চিরকালের জন্য কায়েম হইয়া রহিয়াছে। এর কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির কথা বলি। তবু মনে হয়, বাস্তবতার দিক দিয়া যমদূত গল্পটির তুলনা নাই। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিড়ম্বিত বঞ্চিত মানুষের প্রতি মোপাসাঁর দরদ যে কত বেশী ছিল মিস হেনরিয়েটা গল্পে তাহারই বেদনাকরুণ অভিব্যক্তি। বাঙালী পাঠককে মোপাসাঁর কথা-সাহিত্যের রস পরিবেশন করিতে গিয়া শীতাংশুবাবু যে শিল্পীজনোচিত নির্ব্বাচন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য মনে মনে তাঁহাকে অজস্র সাধুবাদ দিতেছি।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আশুতোষ লাইব্রেরী কিশোরদের জন্য বর্ত্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সংস্করণের সম্পাদক আদিরসাত্মক এবং কিশোরদের অনুপযোগী অন্যান্য অংশসমূহ সযত্নে পরিহার করিয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বয়স্ক পাঠক ইহাতে নক্সার আসল রসের আস্বাদ পাইবেন না। 'আশমান' হইতে 'হুতোম প্যাঁচা' এই পুস্তকে যে রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা নিরবচ্ছিন্ন, এবং তাহার পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করিতে হইলে মূল রসভাণ্ডটি চাখিয়া দেখিতে হইবে। যাই হোক, বিগত যুগের বাংলা-সাহিত্যের এই সমস্ত রত্নরাজির সহিত কিশোর বয়স হইতেই বাংলার ছেলেমেয়েদের পরিচয় হওয়া উচিত এবং সেদিক দিয়া এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ' 'কলিকাতার বারোয়ারি পূজা' ইত্যাদির বর্ণনা পড়িয়া বিগত শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক জীবনের চেহারা কিশোর পাঠক-পাঠিকাগণ সুস্পষ্টরূপে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইবে। অনেকগুলি রেখাচিত্রদ্বারা পুস্তকের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কুলটুর কামপফ—ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল। এম, সি সরকার এ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ৩১৫, দাম তিন টাকা।

"মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে"র রচয়িতা ডক্টর শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি পোলাণ্ডের ভারশো (Warsaw) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঘটনাচক্রে, জার্ম্মাণ আক্রমণে বিপর্য্যস্ত পোলাণ্ডের পথে-প্রান্তরে বাগ্‌দত্তা বধূসহ যাযাবর জীবন যাপনকালে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে ডক্টর ঘোষাল যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন "মহত্তর যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে" তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ভারশৌতে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তনান্তে বোমাবিধ্বস্ত নগরীর যে ভয়াবহ দৃশ্য তাহার চোখে পড়ে "কুলটুর কামপফে" তাহারই ছবি তিনি আঁকিয়াছেন। ইহাকে বলা যাইতে পারে মহত্তর যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক কাহিনীর দ্বিতীয় অধ্যায়।

Kultur Kampf—বিসমার্ক-উদ্ভাবিত এই যৌগিক জার্ম্মান কথাটির মানে হইতেছে সংস্কৃতি-সংগ্রাম। হিটলার সমগ্র য়ুরোপের উপর ধ্বংস-লীলা চালাইবার আয়োজন করিয়া এই 'কুলটুর কাম্‌পফে'র পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই সংস্কৃতি-সংগ্রামের আসল রূপটি কি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে ডাক্তার ঘোষালের বই দুখানি অবশ্যপাঠ্য। জার্ম্মানদের নির্ব্বিচার বোমাবর্ষণে ভারশৌর ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচ্য বিদ্যা-নিকেতন, অগ্নিদগ্ধ পোলীয় চিত্রগৃহ, নাট্যশালা প্রভৃতির যে বর্ণনা লেখক দিয়াছেন তাহা সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই বিচলিত করিয়া তুলিবে। যে অধ্যাপক নিজ লাইব্রেরির পাঁচ হাজার বই বাঁচাইতে গিয়া আগুনে প্রাণ দিয়াছিলেন, দারোয়ান মারিয়ানের জবানীতে, (পৃ. ২৮-৩১) গেঁয়ো ভাষায় তাঁহার বিয়োগান্ত কাহিনী শুনিতে শুনিতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে এবং সংস্কৃতি-সংগ্রামের এই সমস্ত জ্বলন্ত (?) দৃষ্টান্তের কথা পাঠ করিয়া তথাকথিত 'সভ্যতার পরাকাষ্ঠা সংস্কৃতি' না চূড়ান্ত বর্ব্বরতা সেই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়।

বইখানি পড়িবার সময় ভাষার উপর লেখকের অসামান্য অধিকার এবং ভাব প্রকাশোপযোগী নূতন শব্দসৃষ্টিনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ডক্টর ঘোষাল আসলে একজন কুশলী শিল্পী, সেইজন্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক সত্য ঘটনার বর্ণনা কথা-সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। লেখক তাঁহার বাগ্‌দত্তা বধূর বড় বোনের কথা এমন দরদের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই স্নেহময়ী বিদেশিনী মহিলা যেন একেবারে আমাদের হৃদয়ের মাঝখানটিতে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং বইখানি শেষ করিলে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার দৃশ্যের মধ্যেও তাঁহার বেদনাকরুণ মুখচ্ছবি যেন আমাদের মনশ্চক্ষের সামনে বার-বার উঁকি মারিয়া যায়।

বেদিয়া ছন্দ—শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৬, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এক এক জন লেখক আছেন যাঁহারা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যেটুকু যশ তাঁহাদের প্রাপ্য জীবিতাবস্থায় তাঁহারা তাহা পান না। পরলোকগত রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। ছোট গল্প রচনার ক্ষেত্রেই তাঁহার ক্রমবিকশমান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে—কেয়াবনের পথ, অন্ত শেষ রজনী, প্রায় জানা ছিল, মা নিষাদ, বেদিয়া ছন্দ, ধূমল বহ্নি, এই সেই ব্যথাতীর্থ, ছোয়া, পরাজিত যোদ্ধা এই আটটি ছোট গল্প স্থান পাইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্পের মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রতি অপরিসীম দরদ আর সকল মানবের দুঃখে ঐকান্তিক বেদনাবোধ। 'মা নিষাদ'—এই গল্প-সংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার দাবি রাখে। লেখকের সাহিত্য-রচনায় মূল সূত্রটির সন্ধান মিলিবে, 'এই সেই ব্যথাতীর্থ' নামক গল্পটিতে। ইহার প্রতিপাদ্য এই :—সমগ্র বিশ্ব যেন এক বিরাট ব্যথা-তীর্থ, আর জগতের নরনারী এই তীর্থের অভিযাত্রী—তাহাদেরই অশ্রুজলে অনন্তকাল ধরিয়া এই তীর্থের অধিদেবতার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। 'বেদিয়া ছন্দে'র সবগুলি গল্পের মধ্যেই এই মূল সুরটি অনুস্যূত।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

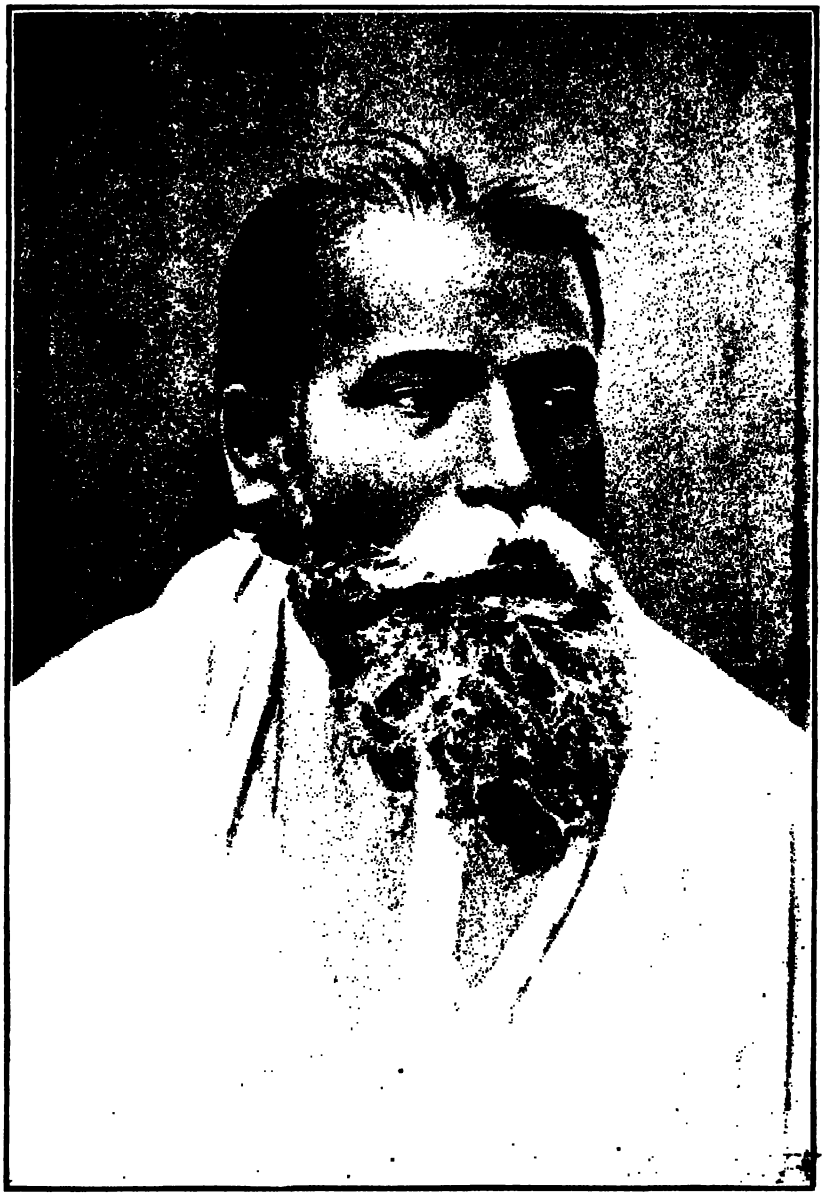
মুদ্রাকর ও প্রকাশক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



মিলন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীবৈদ্যনাথ দাস



শিবনাথ শাস্ত্রী

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫৪

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় দাঙ্গা ও মহাত্মাজীর অনশন

সোমবার ১৫ই ভাদ্র কলিকাতায় পুনর্ব্বার যে দাঙ্গা আরম্ভ হয় তাহার বিস্ফোরণ ও নির্ব্বাপণ দুই-ই অতি অদ্ভুত। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলিবার পূর্ব্বে প্রায় আঠার দিন কলিকাতার চতুর্দ্দিকে শান্তি ও মৈত্রীর বাতাস বহিয়াছিল। মহাত্মার আগমনে বৎসরকাল স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিদ্বেষের উপশম হইয়াছে বলিয়াই জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মায়। হিন্দুর পাড়ায় মুসলমানের এবং মুসলমানের পাড়ায় হিন্দুর গতায়াত প্রায় বাধাশূন্য হইয়া যায়। লোকের মনে সন্দেহের বিষ প্রায় যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আবার এই দাঙ্গার সৃষ্টি হইল। সোমবার ও মঙ্গলবারে পথে ঘাটে বহু নিরীহ পথিক, বহু দরিদ্র কর্ম্মী আক্রান্ত, হৃতসর্ব্বস্ব ও হতাহত হইল। সেই সঙ্গে কয়েক স্থলে শান্তিকামী যুবক ও বালকের দলকেও উন্মত্ত নরপশুরা আক্রমণ করে যাহার ফলে কয়েকটি অমূল্য জীবনও অকালে, অকারণে নষ্ট হইল; যাহার মধ্যে শচীন্দ্রের ও স্মৃতীশের মৃত্যু জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে নিদারুণ আক্ষেপের কারণ। দুই জনই উৎসাহী ও বিশ্বাসী অক্লান্তকর্ম্মী ছিলেন। শচীন্দ্রের প্রতিভা ও উজ্জ্বল কর্ম্মস্পৃহা আমাদের সকলেরই আশার বস্তু ছিল, স্মৃতীশের সাহস ও কার্য্যতৎপরতা তাঁহার শত শত সহকর্ম্মী বন্ধুবান্ধবকে উদ্বুদ্ধ করিত। কয়েকজন স্বার্থান্ধ অর্থপিশাচ ও কয়েকজন শক্তি ও প্রতিহিংসাকামী নির্ব্বোধ গণ্ডমূর্খের প্ররোচনায় যে আগুন জ্বলিল তাহাতে দেশকে অযথা অকারণে এইরূপ আহুতি দিতে হইল, বাংলার দুর্দ্দশা এতই সাংঘাতিক।

রবিবার, ১৪ই ভাদ্রের রাত্রে একদল নরপশু বেলেঘাটায় মহাত্মার বাসস্থলে উপস্থিত হইয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করে। তাহারা একজন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা লোককে লইয়া যায় ও বলে যে সে মুসলমান আততায়ীর হস্তে আহত হইয়াছে, সুতরাং মহাত্মাজীর শান্তি চেষ্টা মিথ্যা, ইত্যাদি। মহাত্মার শিবির হইতে এ বিষয়ে একটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতিটি এই :

"অতি দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, গতকল্য রাত্রিতে কয়েকজন যুবক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে লইয়া বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। সে কয়েকজন মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানান হয়। প্রধান মন্ত্রী তাহাকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু কথিত কোন ছুরিকাঘাতের চিহ্ন তাহার শরীরে পাওয়া যায় নাই। আঘাতের গুরুত্বই প্রধান বিষয় ছিল না। আমি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, এই যুবকগণ নিজেরাই বিচারক ও শাস্তিদাতা হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন রাত্রি প্রায় ১০টা। তাহারা তাহাদের সাধ্যমত চীৎকার করিতেছিল। আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইলেও কি ঘটিয়াছে, তাহা না জানিয়া শান্তভাবে শুইয়া থাকিবার চেষ্টা করি। আমি জানালার সার্শি ভাঙিবার শব্দ শুনিতে পাই। আমার উভয় পার্শ্বে দুইটি অত্যন্ত সাহসী বালিকা শুইয়াছিল। তাহারা নিদ্রিত ছিল না। আমার চক্ষু মুদ্রিত থাকায় তাহারা আমার অজ্ঞাতে সেই ক্ষুদ্র জনতার মধ্যে গিয়া তাহাদের শান্ত করিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে জনতা তাহাদের কোন ক্ষতি করে নাই। আমার মনে হয় যে, বাড়ীর বৃদ্ধা মুসলমান মহিলা ও একজন মুসলিম যুবক আমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমার বিছানার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল। চীৎকার তখনও চলিতেছিল। কয়েকজন মধ্যের হলঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা খুলিতে আরম্ভ করে। আমার মনে হইল যে, উঠিয়া উক্ত রাগান্বিত দলটির সম্মুখীন হওয়া উচিত। আমি একটি দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়াই। বন্ধুরা আমাকে ঘিরিয়া ধরে এবং অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। এই সব ক্ষেত্রে মৌনব্রত ভঙ্গ করা যায় বলিয়াই আমি উহা ভঙ্গ করি এবং উত্তেজিত যুবকদের শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করি। আমি আমার বাঙালী পৌত্রবধূকে আমার কথাগুলির বাংলা তর্জ্জমা করিয়া দিতে বলি। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কোনরূপ যুক্তি শুনিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল না। আমি হিন্দুদের কায়দায় হাতজোড় করি, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল

হয় না। জানালার আরও সার্শি ভাঙিতে থাকে। জনতার মধ্যস্থ বন্ধুরা জনতাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। দুই জন পুলিস অফিসারও সেখানে ছিলেন। তাঁহারা কোনরূপ শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া হাতজোড় করিয়া অনুরোধ করেন। অল্পের জন্য আমার ও আমার পার্শ্বস্থ সকলের দেহে একটিও লাঠির আঘাত লাগে নাই। আমার প্রতি একখণ্ড ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তাহা আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন মুসলমান বন্ধুর দেহে লাগে। বালিকা দুইটি আমার পার্শ্ব ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত আমার পার্শ্বে থাকে। এই সময়ে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হন। তাঁহারাও কোন রূপ বলপ্রয়োগ না করিয়া আমাকে গৃহে যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর যুবকদের শান্ত করিবার সুযোগ দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে জনতা চলিয়া যায়। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিসের টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা ছাড়া প্রাঙ্গণের বাহিরে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমি জানি না। ইতিমধ্যে ডাঃ পি. সি. ঘোষ, অন্নদা বাবু ও ডাঃ নৃপেন আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুক্ষণ আলোচনার পর চলিয়া যান। সুখের বিষয় যে প্রস্তাবিত নোয়াখালি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত শহীদ সাহেব বাড়ী গিয়াছিলেন। উপরোক্ত বিশ্রী ঘটনার জন্য আমি নোয়াখালি যাত্রার কথা চিন্তাও করিতে পারি না, কারণ উহার পরিণতি যে কি তাহা কেহই বলিতে পারে না।

এই ঘটনা হইতে কি শিক্ষা লাভ করা যায়? আমি সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে, ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে সেই সাধের স্বাধীনতা যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে প্রত্যেক নরনারীর সম্পূর্ণভাবে "লিঞ্চ আইন" বিস্মৃত হইতে হইবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যাহা করার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা মোটামুটি "লিঞ্চ আইনে"র অনুকরণ। যদি মুসলমানেরা অন্যায় করিয়া থাকে, তবে অভিযোক্তারা মন্ত্রীদের নিকট যাইতে না চাহিলে আমার নিকট বা আমার বন্ধু শহীদ সাহেবের নিকট যাইতে পারিত। মুসলমান অভিযোক্তাদের সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। যদি সভ্য সমাজের প্রাথমিক নীতিসমূহ অনুসৃত না হয়, তবে কলিকাতা বা অন্যত্র কুত্রাপি শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব। তাহারা যেন পঞ্জাবের বা বহির্ভারতের বর্ব্বরতার কথা না বলে। নিজ হস্তে প্রতিকারোপায় না করার যে প্রকৃষ্ট নীতি, উহার কোনও ব্যতিক্রম থাকিতে পারে না।

পাটনাস্থিত আমার সেক্রেটারী দেবপ্রকাশ তার করিয়াছেন—'পঞ্জাবের ঘটনাবলীতে জনসাধারণ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে জনসাধারণ ও সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করি।' শ্রীদেবপ্রকাশ কদাপি অযথা বিচলিত হন না। সংবাদপত্র নিশ্চয়ই কোনও অসতর্ক উক্তি করিয়া থাকিবে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান সময়ে—যে সময়ে আমরা বারুদের স্তূপের উপর বসিয়া আছি, সেই সময় সংবাদপত্রের বিশেষভাবে বিবেচনা করা ও সংযত হওয়া আবশ্যক। অসাধুতার ফল হইবে বারুদের স্তূপে জলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি সংযোগ করার মত। আমি আশা করি, প্রত্যেক সম্পাদক ও রিপোর্টার তাঁহার কর্ত্তব্য সম্যক উপলব্ধি করিবেন।

একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। পঞ্জাব যাওয়ার জন্য আমার নিকট জরুরী তাগিদ আসিয়াছে। কলিকাতার হাঙ্গামা পুনরারম্ভ সম্পর্কে আমি নানারূপ জনরব শুনিতে পাইতেছি। আমি আশা করি, এই সকল জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন না হইলেও অতিরঞ্জিত। আমাকে কলিকাতাবাসীদের আশ্বস্ত করিতে হইবে যে, কলিকাতায় কোনও গোলযোগ ঘটিবে না এবং শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে আর উহা ভঙ্গ করা হইবে না।

যেদিন শান্তি স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতেই অর্থাৎ ১৪ই আগষ্ট হইতেই আমি বলিয়া আসিতেছি যে, এই শান্তি হয়ত সাময়িক নিস্তব্ধতা মাত্র। অলৌকিক কিছুই ঘটে নাই। এই আশঙ্কা কি সত্যে পরিণত হইবে এবং কলিকাতায় কি আবার জঙ্গলের আইন প্রবর্ত্তিত হইবে? তাহা যেন না হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান যেন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেন এবং বাতুলতার পুনরাবির্ভাবে যেন তিনি বাধা দেন।

উপরোক্ত বিবৃতি রচনার পর অর্থাৎ বেলা ৪টার সময় আমি কলিকাতার বিভিন্ন অংশে সংঘটিত ঘটনাসমূহের মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিয়াছি। যে সকল স্থান কাল পর্য্যন্ত নিরাপদ ছিল, উহার কতকগুলি আজ অকস্মাৎ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি দুই জন অতিশয় দরিদ্র মুসলমানের মৃতদেহ দেখিয়াছি। আমি দেখিয়াছি, কয়েকজন বিষণ্ণবদন মুসলমানকে গরুর গাড়ীতে করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে। আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, এই আকস্মিক হাঙ্গামার তুলনায় কালকার ঘটনাটি ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমি এই জলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে গিয়া ইহা নির্ব্বাপণের চেষ্টা করিলেও কোনও ফল হইবে না। যে সকল হিন্দু সন্ধ্যাবেলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। এই হাঙ্গামা দমনে আমার কর্ত্তব্য কি? এই কয়দিন পূর্ব্ব-পঞ্জাব কি করিয়াছে তাহা তাঁহাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। পশ্চিম-পঞ্জাবের মুসলমানেরা উহাদের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাবের ঘটনায় হিন্দু ও শিখেরা উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, পঞ্জাবে যাওয়ার জন্য আমার নিকট জরুরী তাগিদ আসিয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় যুযুৎ যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন আমি কোন্ মুখে পঞ্জাব যাইব? ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট যে অস্ত্র অমোঘ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতেছে উপবাস। চীৎকাররত জনতার সম্মুখে উপস্থিত

হইলেই সর্ব্বদা কার্য্যসিদ্ধি হয় না। গত রাত্রিতে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় নাই। আমার মুখের কথায় যাহা না হয়, আমার উপবাসে তাহা হইতে পারে। যদি আমার উপবাসে কলিকাতার বিবদমান পক্ষগণের হৃদয় দ্রব হয়, তবে উহাতে পঞ্জাবের বিবদমান পক্ষ সকলের হৃদয়ও দ্রব হইতে পারে।

সুতরাং আমি অদ্য রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় অনশন আরম্ভ করিতেছি। যদি কলিকাতার শুভবুদ্ধি ফিরিয়া আসে এবং যখন ফিরিয়া আসিবে তবে এবং তখনই আমি এই অনশন ভঙ্গ করিব। অনশনের সময় যদি আমি জল গ্রহণ করি, তবে উহার সহিত লবণ ও সোডা-বাইকার্ব মিশ্রিত করিয়া লইবার অধিকার আমি রাখিলাম।

যদি কলিকাতাবাসীরা চাহে যে, আমি পঞ্জাব গিয়া তত্রত্য অধিবাসীদের সেবা করিব, তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাহাদের আমাকে আমার অনশন ভঙ্গ করিতে সাহায্য করা উচিত।"

রবিবার রাত্রের ঘটনা যখন কলিকাতার অধিকাংশ লোকের কাছে অজ্ঞাত এবং ঐ ঘটনার পিছনে যাহাদের প্ররোচনা কাজ করিতেছে সে কথা প্রায় সকলের অজ্ঞাত এরূপ অবস্থায় কলিকাতার বড়বাজার অঞ্চলে খুন-জখম ইত্যাদি আরম্ভ হয়। সেখানে বাঙালী ছাত্রদের একটি শান্তিবাহিনীও এক দল নরপশু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই উত্তর ও মধ্য কলিকাতা এবং পূর্ব্ব কলিকাতার নানা স্থলে লুঠতরাজ ও খুন-জখম সমানে চলিতে থাকে। অধিকাংশ স্থলেই উহা অতি নৃশংস ও অতি ঘৃণ্য ভাবে চলে। ইহা বলা বাহুল্য। তবে আশার কথা এইমাত্র ছিল যে এই ব্যাপারে ছাত্রশ্রেণী শুধু যোগদানই নহে, বরঞ্চ উহা দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে। কলিকাতার বাঙালী ভদ্রলোকশ্রেণীর যুবকবৃন্দের ছোট বড় সশস্ত্র রক্ষীবাহিনীর দলগুলি, যাহা বিগত এক বৎসরের দাঙ্গার ফলে গঠিত হয়, সেগুলিও এই দাঙ্গা হইতে প্রায় সর্ব্বস্থলেই নির্লিপ্ত থাকে। পুলিস দুই একটি ক্ষেত্র ভিন্ন অধিকাংশ স্থলেই নিশ্চেষ্ট থাকে এবং মিলিটারি অত্যন্ত দেরীতে আগমন করে।

মঙ্গলবারের অবিশ্রাম বৃষ্টিপাতে পথঘাট প্লাবিত হওয়ায় কলিকাতার নাগরিকগণ গৃহবদ্ধ হইয়া মহাত্মার অনশনের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিল এবং এই দাঙ্গার পিছনে কাহারা আছে তাহাও লুটতরাজ এবং নরহত্যার বিবরণে বুঝিতে পারিল। ছাত্রবাহিনীর উপর ঘৃণ্য আক্রমণ, হিন্দুগুণ্ডা কর্ত্তৃক হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত ভাবে ছড়াইয়া যাওয়ায় জনসাধারণের মনে বিপরীত ভাবের প্রবাহ বহিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সশস্ত্র রক্ষীর দল দাঙ্গা ও লুণ্ঠনকারীদের উপর পাল্টা আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহাদের তাড়াইতে আরম্ভ করিল। অনেক অঞ্চলে সেখানকার নাগরিকগণ দলবদ্ধ ভাবে দাঙ্গা ও লুণ্ঠন রোধ করিতে লাগিলেন।

বুধবার প্রাতে অনশনক্লিষ্ট মহাত্মার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কথা শুনিয়া কলিকাতাবাসী জনসাধারণের বিচলিত মন সক্রিয় হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিক হইতে দাঙ্গাকারীদিগের দমনের জন্য আহ্বান আসিল। সাংবাদিকদিগের সম্মেলনে দাঙ্গাকারীদিগের উপর গুলি চালাইবার জন্য সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এবং শান্তিবাহিনীদের সশস্ত্র সমর্থনের ইঙ্গিত আসিল। সশস্ত্র যুবকরক্ষীদলের মধ্যে মহাত্মার অনশনে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেওয়ায় একটি দলের এক জন প্রতিনিধি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে অনশনভঙ্গের জন্য অনুরোধ করিল। মহাত্মার সহিত অনেক আলাপ আলোচনার পর উহাদের কয়েকটি দল সেই দিনই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এবং সেই কয়েকটি দল ও অন্য দুই-তিনটি দল দাঙ্গা ও লুণ্ঠনে সবলে বাধা দিতে আরম্ভ করে। এদিকে জনমতের সহায়তায় শান্তিসেনা পূর্ণোদ্যমে কার্য্যারম্ভ করে এবং পুলিস ও সৈন্যদলও দাঙ্গাকারিদের উপর সবলে আঘাত করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ চতুর্দ্দিকের চাপের ফলে দাঙ্গাকারিগণ দ্রুত নিস্তেজ হইতে থাকে, যাহার ফলে বৃহস্পতিবারে কলিকাতা নগরী অন্য রূপ ধারণ করে। বৃহস্পতিবারের দ্বিপ্রহরে সশস্ত্র-রক্ষীদলের প্রতিনিধিগণ মহাত্মাজীর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করে ও সেই দিন সন্ধ্যার পর উহাদের মধ্যে কয়েকটি যুবক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মহাত্মার নিকট আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণ করে। মহাত্মাজী এই যুবকদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হওয়ায় এবং কলিকাতার বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দলের কলিকাতায় শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে তাঁহার অনশনব্রত শেষ হইয়া যাওয়ায় কলিকাতার উপর দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপের যে ভয় ছিল তাহা দূর হয়।

যে সাম্প্রদায়িক আগুনে এক বৎসর যাবৎ কলিকাতা জ্বলিতেছে, যাহা হাজার হাজার ব্রিটিশ ও দেশী সৈন্য, ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া গাড়ির বহরের সাহায্যেও নিবাইতে পারে নাই, যে সশস্ত্র যুবকের দলকে পঞ্জাবী পুলিসের অতি কঠোর দমন-চেষ্টাও হটাইতে পারে নাই, এক মহাপুরুষের প্রভাবে মাত্র ৭৩ ঘণ্টায় সে সবই ঘটিয়া গেল। আমরা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহা প্রায় সেই পর্য্যায়েই পড়ে। এই ঘটনায় ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে সবল ও সাহসীর অহিংসাই প্রকৃত অহিংসা, দুর্ব্বল ও কাপুরুষের অহিংসার মূল্য কাণা-কড়িও নহে।

বাংলায় মন্ত্রিবদল

বাংলায় ঘোড়-বড়ি-খাড়ার বদলে খাড়া-বড়ি-ঘোড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে বাংলাদেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। পশ্চিম বাংলার পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত সঙ্গীন, এখন এখানে প্রয়োজন এইরূপ মন্ত্রিদলের,

যাঁহাদের মধ্যে সক্রিয় ও স্থিরবুদ্ধিক বিচক্ষণ লোকই অধিক থাকে, যাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য দেশকে উদ্ধার করা। বিগত বার বৎসরের অরাজকতা ও চৌরতন্ত্রের পূজারী শাসকবর্গের ঘৃণ্য অর্থলোলুপতার ফলে সমস্ত দেশ দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে ও শাসনযন্ত্র কলুষিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার আজ্ঞাবাহী অনুচররূপে মন্ত্রিসভাকে যে ভাবেই গঠন করুন না কেন, তাহাতে দেশের উপকার বিন্দুমাত্রও হওয়া সম্ভব নহে। মন্ত্রিসভা যত দিন দলগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে দেশের কল্যাণের উপরে রাখিবে তত দিন এদেশ ডুবিতেই থাকিবে। প্রফুল্লবাবুর মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপে আমরা দলগত স্বার্থের চিন্তার পরিচয়ই অধিক পাইয়াছি এবং কদাচিৎ ব্যক্তিগত স্বার্থেরও পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং এই অবস্থায় দেশের কল্যাণের আশা করা বৃথা।

আসল কথা এই যে, যে গণ্ডীর ভিতর হইতে প্রফুল্ল বাবু তাঁহার সহকারী আনিতেছেন তাহার মধ্যে যোগ্য লোক পাওয়া অসম্ভব। বাংলাদেশে এখন প্রয়োজন যোগ্য, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকের। প্রফুল্ল বাবু যদি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভার অনুকরণে সেরূপ যোগ্য লোকের সন্ধান করেন তবে বাংলায় মোটেই অভাব হইবে না। বিচারক চারুচন্দ্র বিশ্বাসের মত বিচক্ষণ ও সাহসী লোকের উপর যদি আইন ও শাসনযন্ত্রের ভার অর্পিত হয়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় জ্ঞানী ও নিষ্কাম লোকের হাতে শিক্ষার দপ্তর দেওয়া হয় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বা তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্রের ন্যায় সেবাধর্ম্মের প্রকৃত ও অক্লান্ত পূজারীর উপর যদি দেশগঠনের ভার দেওয়া হয়, এবং এইরূপ দলাদলির কলুষমুক্ত লোকের বুদ্ধিবিবেচনার সহায়তা যদি মন্ত্রিসভা পায় তবেই এদেশের পরিত্রাণ সম্ভব, নতুবা নহে। প্রফুল্ল বাবুর দল দেশের কথা ও দেশের কাজের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া কেবলমাত্র ভোটের মাথা গুন্তির চিন্তা করিয়া সময় কাটাইতেছেন, কেননা উহাই তাঁহাদের স্বভাব। যদি দেশের কথা ভাবিয়া উপযুক্ত লোকের খোঁজ করিতেন তবে ভোটের কথা তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। দেশের জনসাধারণের মনের অবস্থা এখন এইরূপ যে ব্যবস্থাপক সভায় যদি তাঁহার মনোনীত ঐরূপ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট হইত তবে বিরূপ ভোটদাতাদিগকে ধাড়ে মাথা লইয়া ঘরে ফিরিতে হইত না। যথাসময়ে ইঁহাদিগকে প্রতিনিধি হিসাবে দেশের লোকে ব্যবস্থাপক সভায়ও নিশ্চয়ই পাঠাইত। আমরা এ কথা বলিতেছি এইজন্য যে, দেশের লোকের আজ আর জানিতে বাকী নাই যে, অযোগ্য ও চক্রান্তকারী নেতৃবর্গের কৃপায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কি অধঃপতন হইয়াছে এবং ঐ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের আদর্শবাদকে কিরূপে ধূলায় মিশাইয়া দিয়াছে।

বস্তুতপক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রকৃত চালকবর্গ বিগত বিশ বৎসর যাবৎ দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কথা কখনও ভাবেন নাই। ঐ স্বার্থের জন্য তাঁহারা প্রতি পদে দেশের লোকের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিকে ধোঁকা চালাইয়াছেন। তাঁহারা নেতৃত্বে বরণ করিয়াছেন হয় অকর্ম্মণ্য জড়ভরতকে নয় ঘোর কলি-কাল বিবেকবুদ্ধিহীন লোককে। জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে মনোনীত করিয়াছেন আজ্ঞাবাহী বুদ্ধিহীন লোক বা নানা রূপ দোষকলুষিত ধূর্ত্ত লোককে যাহাদের অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত টাকার রাশি দেশের শ্রাদ্ধ করিতে চালকবর্গের কাজে আসিতে পারে। দুই-চারিটি সৎ লোক ইঁহাদের বিচারের ভুলে প্রাদেশিক কমিটিতে বা ব্যবস্থাপক সভায় যদিই বা প্রবেশ করেন তবে শীঘ্রই তাঁহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হয়। দেশের লোক এত দিন এ সকল কথা বুঝিয়াও বুঝে নাই, কেননা তাহাদের চতুর্দ্দিকেই শত্রু ছিল। আজ বাহিরের শত্রু দূর হইয়াছে, সুতরাং অচিরে ঘর পরিষ্কার করা আরম্ভ হইবে, একথা যদি প্রফুল্ল বাবু না বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহার নিতান্তই বুদ্ধির অভাব। আজ যদি প্রফুল্ল বাবু নিজে অগ্রসর হইয়া এই গৃহসংস্কারে হাত দিতেন তবেই তাঁহার মন্ত্রিত্ব সার্থক হইত। এইরূপে ভোট গণিয়া ও ধোঁকা চালাইয়া তিনি কোন্ পথে চলিয়াছেন সেকথা কি তাঁহাকে এখনও বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

শাসনযন্ত্র

শাসনযন্ত্রের যে সব দেশী কর্ম্মচারী স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ইংরেজকে উৎসাহের সহিত সাহায্য করিয়াছেন সেই সব লোককে স্বাধীন বাংলার গবর্মেণ্টে স্থান দেওয়া সম্বন্ধে গত মাসে আমরা সমালোচনা করিয়াছিলাম। কাইন রাখার দক্ষতার চেয়ে এখন আদর্শনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম এবং চরিত্রের দৃঢ়তা সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক বেশী প্রয়োজন। প্রভু তোষণ ও তাহার জন্য বিবেক বর্জ্জন এবং স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ এতদিন যে সব কর্ম্মচারীর মূল লক্ষ্য ছিল, দেশ স্বাধীন হইবার পর তাহাদিগকে উচ্চপদে বহাল রাখিলে দুই দিক দিয়া অতিশয় ক্ষতি হইবে। প্রথমতঃ, দেশসেবকেরা যে সকল কর্ম্মচারীর হাতে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াছেন স্বাধীনতা লাভের পর তাঁহাদিগকে ঐ সব কর্ম্মচারীর হুকুম মানিয়া চলিতে বাধ্য করার অর্থ স্বাধীনতার সৈনিকদের চূড়ান্ত অপমান করা। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বাধীনতালাভের পর মন্ত্রিত্ব বা চাকুরির জন্য অগ্রসর হন নাই, দেশপ্রেমকে ও দুঃখবরণকে ভবিষ্যতে আখের গুছাইয়া লইবার মূলধন রূপে যাঁহারা ব্যবহার করেন নাই এরূপ লোকের অভাব বাংলাদেশে নাই। ইঁহাদিগের এবং স্বদেশপ্রেমের "অপরাধে" নির্যাতিত অসংখ্য জনগণের উপর যে সব কর্ম্মচারী বেটন ও গুলি চালাইয়া পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে আজ তাহাদেরই হুকুম মানিতে সেই সব স্বদেশসেবককে বাধ্য করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এই সব অত্যাচারী ও দেশদ্রোহী কর্ম্ম-চারীকে ন্যায়বিচার করিয়া শাস্তিদানের সাহস ডাঃ ঘোষের না থাকিতে পারে কিন্তু ইঁহাদিগকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া স্বাধীনতার পূজারীদের অপমান করিবার অধিকার তাঁহার

নাই। সেক্রেটারিয়েটের জেলা শাসনের ও লালবাজারের উচ্চতম কর্ম্মচারী নিয়োগের বেলায় এই মূলনীতি কর্ম্মচারীদের প্রথম তালিকা প্রণয়নের সময় রক্ষিত হয় নাই ইহা আমরা গত সংখ্যায় দেখাইয়াছি।

পুলিস সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। আপাততঃ এখানেও আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙালী হিন্দু নামধারী জনৈক আই পি অফিসারকে কলিকাতায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই ব্যক্তির কার্য্যকলাপ জানাইয়া এবং ইঁহার নিয়োগে আপত্তি করিয়া রাজসাহীর ৩২টি মহিলা গত ১১ই আগষ্ট তারিখে ডক্টর ঘোষকে একটি পত্র পাঠাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী যদি না পাইয়া থাকেন তবে আমাদের নিকট সন্ধান পাইবেন। এই ব্যক্তির অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে সন্ধান লওয়া হয় নাই ইহা ত বুঝাই যাইতেছে। প্রধান মন্ত্রীর অবগতির জন্য আমরা পত্রখানি প্রকাশ করিতেছি:

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন,

সংবাদপত্র মারফৎ আমরা দেখিলাম যে ***** ** পশ্চিমবঙ্গের Special Branch-এর Deputy Commissioner পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে এই পদে আসীন করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানাইতে চাই। এই ***** ** ১৯৪২ সালে রাজসাহী জেলার D. S. P. পদে নিযুক্ত ছিলেন। '৪২ সালের গণ-আন্দোলনে তিনি রাজসাহীর মহিলা এবং জনতার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াছেন। ১১ই আগষ্ট বৈকাল চার ঘটিকার সময় রাজসাহীর স্কুল ও কলেজের ছাত্রী এবং মহিলাবৃন্দ কর্ত্তৃক একটি বিরাট শোভাযাত্রা রাস্তা অতিক্রম করিয়া জেলের অভিমুখে যাইতেছিল এবং শোভাযাত্রাটি যখন রাজসাহী কলেজের নিকট পৌঁছায় ঠিক সেই সময় তিনি পুলিসের লাঠিদ্বারা শোভাযাত্রাটিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন, ইহাতে বহু মহিলা গুরুতর ভাবে আহত হন। ইহা ছাড়া তিনি কতিপয় ছাত্রীর হাত হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইবার সময় তাঁহাদের প্রতি অশ্লীল ইঙ্গিত ও ব্যবহার করেন। রাজসাহীর বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত কালিদাস চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে আগষ্ট আন্দোলনের সময় যখন শোভাযাত্রা করিয়া রাজসাহী শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করিতেছিল সেই সময় রাজসাহী বোয়ালিয়া পোষ্টাপিসের সম্মুখে *** **র উপস্থিতিতে এবং হুকুমে কালিদাস-বাবুকে গুরুতরভাবে প্রহার করা হয় এবং তিনি ড্রেনে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া যান। পরক্ষণে ঐ অবস্থায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রহার করিতে করিতে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুত কালিদাস চক্রবর্ত্তীকে দীর্ঘদিন কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন দমাইবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে নীতি গ্রহণ করে *** ** সেই নীতি অনুযায়ী তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া রাজসাহীর বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীকে প্রহার ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের চেয়ে অনেক বেশী নির্যাতন রাজসাহীর কংগ্রেসসেবী জনসাধারণকে করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাঁহার মত একজন দুর্নীতিপরায়ণ ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতামদে মত্ত কর্ম্মচারীকে কি করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী ঐরূপ একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন করিলেন, আমরা ভাবিয়া পাই না।

আজ আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি আর এই সব ব্যক্তিই যদি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন তবে জনসাধারণ কংগ্রেসের উপর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দিনে দিনে হারাইবে। এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইতে যদি চাহেন তবে রাজসাহীবাসী এবং রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির নিকট খোঁজ করুন। ইতি—১১ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল।

নিবেদিকা—৩২ জন মহিলার স্বাক্ষর।

দ্বিতীয়তঃ, এই শ্রেণীর নিয়োগের কুপ্রভাব শাসনযন্ত্রের উপরও পড়িবে। উপরওয়ালাকে তুষ্ট করিয়া পদোন্নতির লোভে উৎসাহের সহিত দেশদ্রোহিতা করিয়াছে এরূপ লোক যেমন আছে তেমনিই চাকুরি বিপন্ন ও ভবিষ্যৎ উন্নতি তুচ্ছ করিয়া উপরওয়ালার অন্যায় আদেশ পালনে অসম্মত হইয়াছেন এবং নিজের ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে দেশের কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এরূপ কর্ম্মচারীও আছেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর ইঁহারা যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া দেশের সেবায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন ঠিক সেই সময়ে ঐ সব বিবেকবর্জ্জিত চাটুকারিত্বসম্বল দেশদ্রোহী কর্ম্মচারীগুলিকে আমদানী করিয়া ইঁহাদের উপরওয়ালারূপে বসাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং ইহার ফলে শাসনযন্ত্রের *morale* এবার একেবারেই ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। প্রভুতোষণের দ্বারা "লয়্যালটি"র পরিচয় দানই সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রধান লক্ষ্য, দেশসেবা নয়, এই যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের মনোভাব দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয় তবে স্বাধীনতার ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত ধ্বসিয়া পড়িবে। যাঁহারা দলগত রাজনীতি অর্থাৎ power politics-এ লিপ্ত তাঁহাদের নিকট এই অবস্থা সর্ব্বথা কাম্য কিন্তু ইহাতে দেশের সর্ব্বনাশের পথ একেবারে পাকা করা হইবে।

একদিকে এই অবস্থা আর একদিকে উপযুক্ত এবং সৎ কর্ম্মচারীদের কোণঠাসা করা হইতেছে। স্বাধীন দেশের

শাসনযন্ত্র শোভাবর্দ্ধনের বা দেশবাসীকে পীড়নের অস্ত্র নয়। উহা সমগ্র সমাজের প্রতিচ্ছবি। শাসনযন্ত্র উপযুক্ত এবং দুর্নীতিমুক্ত হইলে দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়; অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ হইলে দেশবাসীর কষ্ট বাড়ে, এমন কি স্বাধীনতা রক্ষা করাও দুরূহ হইয়া পড়ে। কলিকাতায় গত কয়েক দিনের ঘটনায় এই সামাজিক সত্যের কতকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ ঘোষ যাঁহাদের উপর পুলিসবাহিনী পরিচালনার ভার দিয়াছেন তাঁহারা ১৫ই আগষ্ট হইতে ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ণ ১৭ দিন হাতে পাইয়াছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে শহরের শান্তি যাহাতে অব্যাহত থাকিতে পারে তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সময় পাইয়াছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বরের সপ্তাহখানেক আগে শহরে চুরি ডাকাতি রাহাজানি বিশেষতঃ রিভলবার দেখাইয়া টাকা আদায়ের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছিল। পুলিস উপযুক্ত হইলে ইহাকে ভাবী বিপদের ইঙ্গিত মনে করিয়া সতর্ক হইত; সে সময়ও যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান পুলিস কমিশনার, ডিটেকটিভ ডেপুটি কমিশনার, সিকিউরিটি কন্ট্রোলের ডেপুটি কমিশনার এবং গুপ্তচরবাহিনী অধিনায়ক, স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই। ইঁহারা প্রত্যেকেই কলিকাতা শহরে নবাগত, ইঁহাদের যোগ্যতার একমাত্র পরিচয় ইঁহারা আই পি। অথচ লোকের অভাব ছিল না। শ্রীহীরেন সরকার দীর্ঘকাল ডিটেকটিভ ডেপুটি কমিশনাররূপে দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছেন। কলিকাতার বোধ হয় সমস্ত গুণ্ডা সর্দারদের ও তাহাদের মুরুব্বী ও বুদ্ধিদাতাদের তিনি চেনেন। লীগ আমলে ইহাদিগকে গ্রেপ্তার বা বহিষ্কার করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা হয়ত তাঁহার ছিল না কিন্তু এখন উহাতে বাধা হইবে না। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-অবাঙালী তথাকথিত ভদ্র-অভদ্র নির্বিশেষে গুণ্ডামির প্রশ্রয়দাতাদের সন্ধান রাখা আজ পুলিসের সবচেয়ে বড় কাজ; তার পরের কাজ ক্রিমিনাল খুঁজিয়া বাহির করিবার যোগ্যতা। শ্রীহীরেন সরকার সম্প্রতি এ বিষয়ে বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতেও শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন; বর্ত্তমান অবস্থায় ইঁহাকে পুলিস কমিশনার নিযুক্ত করিয়া গুণ্ডা দমনে প্রবৃত্ত হইলে শহরের শান্তি চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় দক্ষ ও সৎ কর্ম্মচারী যে কোন দেশের পুলিস বিভাগের গৌরব। ইঁহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ করিলে সমগ্র পুলিস বাহিনীকে দুর্নীতি ও জড়তা মুক্ত করিবার উপায় হইতে পারে। অথচ শ্রীহীরেন সরকারের ন্যায় ইঁহাকেও কোণঠাসা করিয়া রাখা হইয়াছে। শাসনযন্ত্রের শীর্ষদেশে অযোগ্য লোক নিয়োগ করা এবং উপযুক্ত ও সৎ লোককে পরিহার করিয়া চলা কখনও দেশের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। বহু জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়া বহুজনের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া যাঁহারা মন্ত্রিপদে আসীন হইয়াছেন, তাঁহারা আত্মস্বার্থ, দলগতস্বার্থ ও চাটুকারস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হইয়া গণস্বার্থ উপেক্ষা করিবেন না এটুকুও কি "স্বার্থত্যাগী" খাদিপন্থী কংগ্রেসসেবীদের নিকট আশা করা যাইবে না?

মন্ত্রিত্বের দেড়মাস

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা দেড়মাসকাল বহাল রহিয়াছেন। ছায়ামন্ত্রীরূপে একমাস কাল তিনি শাসনযন্ত্রের সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া লওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং পূর্ণ দুই সপ্তাহকাল নিজের কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত ও ঘোষণা করিবার সময় পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসের একটি সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক প্রোগ্রাম আছে। পৃথিবীতে ভারতীয় কংগ্রেসই বোধ হয় একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যাহার বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে গঠনমূলক প্রোগ্রামও কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। নূতন প্রোগ্রাম তৈরি করিবার প্রয়োজন বা অসুবিধা প্রফুল্লবাবুর ছিল না কিন্তু তিনি বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া এত দিন বলিতে পারেন নাই। যে শাসনযন্ত্র তিনি তৈরি করিয়াছেন তাহাকে কংগ্রেসের বেনামীতে একটি সিভিলিয়ান ও আই পি রাজ বলা চলে।

ডাঃ ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গের লোক কিন্তু তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গ। তিনি ভাল কাজ করিলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হইবে, ভুল করিলে পশ্চিমবঙ্গেরই ক্ষতি হইবে। মন্ত্রীরা পূর্ব্ববঙ্গ অথবা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এটা মোটেই বড় কথা নয়, আসল কথা মন্ত্রীদের যোগ্যতা, আদর্শনিষ্ঠা এবং সততা। ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পূর্ব্ববঙ্গের লোক। তিনি সবচেয়ে কম কথা বলিয়াছেন এবং সবচেয়ে বেশী কাজ করিয়াছেন। ইলেকট্রিক সরবরাহ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জুট ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করিয়া তিনি এমন একটি কাজ করিয়াছেন যাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। এই দুইটি কার্য্যের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হইবে। জুট ট্রাইবিউনালের সাফল্যের উপর বাংলার সমৃদ্ধি ও ইংরেজ বণিকদের শোষণের শক্তি-হ্রাস নির্ভর করে এবং এই কঠিন কার্য্যের ভার পড়িবে ট্রাইবিউনালের চেয়ারম্যানের উপর। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহাকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক।

শ্রীরাধানাথ দাস পশ্চিমবঙ্গের লোক। তাঁহার অল্প কয়েকদিনের মন্ত্রীগিরিতে চালের দর কমিয়াছে এবং কয়লার দাম বাড়িয়াছে। কাপড় ও কয়লা রেশনের দোকানে পাওয়া যায় না কিন্তু দ্বিগুণ দাম দিলে প্রকাশ্য রাজপথে এবং কয়লাওয়ালাদের নিকটেই পাওয়া যায়। এই ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিতে সময় লাগিবে সত্য কিন্তু উহা বন্ধ করিবার আন্তরিক চেষ্টা সুরু হইয়াছে এটুকুও কি রাধানাথবাবু দেখাইতে পারিতেন না? তিনি তাহা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা পশ্চিমবঙ্গের লোক। তাঁহার

উপর খাদ্যবিভাগের ভার ছিল। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল হাসপাতাল, লেক মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতিতে উচ্চতম পদগুলিতে যে সব নিয়োগ হইয়াছে তার সবগুলিতে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছে ইহা কি তিনি বলিতে পারেন?

শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সী ডিভিসনের লোক। মৎস্য-ব্যবসায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যের ফলে মৎস্য-ব্যবসায়ী ভিন্ন ধীবর অথবা মৎস্য-ক্রেতা কাহারও কি কোন লাভ হইয়াছে? মাছের দাম ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় শ্রীরামপুর এবং কলিকাতায় একটি বাজারে ক্রেতারা ধর্ম্মঘট করিয়া মৎস্য ক্রয় বন্ধ করেন, ইহাতে বরং মাছের দরের ক্রমবৃদ্ধি একটু থামিয়াছে। সমস্ত বাজারে কয়েক দিন এরূপ হইলে মাছের দর আপনিই কমিয়া আসিবে, মন্ত্রী শ্রীহেম নস্করের চেষ্টার প্রয়োজন হইবে না।

শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় পশ্চিমবঙ্গের লোক। যে বিভাগের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন স্বীকার করিতেই হইবে যে উহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বাগমারীতে একটি বস্তিতে স্বয়ং বাস করিয়া বাস্তুত্যাগীদের ফিরাইয়া আনিবার যে প্রয়াস তিনি করিতেছেন তাহা প্রশংসনীয়।

মন্ত্রিসভায় আর যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়াই কঠিন।

পশ্চিমবঙ্গের লোকদের বেশী পরিমাণে সরকারী চাকুরি, রেশনের দোকান, কণ্ট্রাক্টরী অথবা মেডিক্যাল কলেজের সিট প্রাপ্তি মোটেই বড় কথা নয়, আমাদের সম্মুখে আসল প্রশ্ন জাতি হিসাবে বাঙালীর বাঁচিবার সমস্যা। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালীর লাঞ্ছনা সর্ব্বজনবিদিত। দিল্লীতেও বাঙালী অবজ্ঞা ও করুণার পাত্র। ঘরেও যদি আমরা আজ দলাদলিতে প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষা করাই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। দামোদর-পরিকল্পনা, কুটির শিল্পের উন্নয়ন, সুপরিকল্পিত গ্রামপ্রতিষ্ঠা, ছাত্র ও যুবকদের সামরিক বিদ্যা ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দান, সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি—এই সব কাজের দিকেই পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, বর্ণহিন্দু, তপশীলী হিন্দু নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালীকে মনোযোগ দিতে হইবে। অতি অল্পদিনের মধ্যে বাঙালী যদি এমন শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারে যাহাতে কি ভিন্ন প্রদেশের কি বিদেশের কোন লোক বাঙালীকে অপমান বা অবজ্ঞা করিতে ভীত হয় তাহা হইলে বাঙালীর ধ্বংস অনিবার্য্য। মন্ত্রিসভায় এবং শাসনযন্ত্রে সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা জাতীয় সমস্যার সমাধান না হইয়া বরং বিপরীত ফলই যে হয় তাহার দীর্ঘকালের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গ্রামের কৃষিঋণ ও কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়-সমস্যার সমাধানের শ্রেষ্ঠতম উপায় যে সমবায় সমিতি যাহার সহিত প্রত্যেক চাষীর মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে গত দশ বৎসর তাহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন তপশীলী এবং রেজিষ্ট্রার ছিলেন মুসলমান। চাষীদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী এই দুই সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু ফল কি হইয়াছে? সমবায় সমিতি ধ্বংস হইয়াছে। বাংলার সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসে একটিবার মাত্র সমিতিগুলি সজীব করিয়া কৃষককে বাঁচাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহা করিয়াছিলেন যামিনী মিত্র নামক একজন রেজিষ্ট্রার। তিনি মুসলমানও নহেন তপশীলীও নহেন।

র‍্যাডক্লিফ রিপোর্ট

র‍্যাডক্লিফ রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গুরুতর অবিচার করা হইয়াছে। বাংলাদেশের পরস্পর সংলগ্ন হিন্দু এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল দুইটিকে পৃথক করিয়া বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হইবে; তবে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য কারণে ইহার কিছু অদলবদল করা যাইবে ইহাই ছিল সীমানা কমিশনের প্রতি নির্দ্দেশ। র‍্যাডক্লিফ সাহেব এই নির্দ্দেশ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে বসিয়া উহা তিন টুকরা করিয়াছেন, পরস্পর সংলগ্নতার নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং নিজের অভিসন্ধি অনুসারে অঙ্কিত সীমারেখাই যে ঠিক তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। বাঙালী জাতির উপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের আক্রোশ দীর্ঘকালের। র‍্যাডক্লিফ রিপোর্ট পাঠ করিলেই মনে হয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই চিরন্তন শত্রুটিকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের পাওয়া উচিত ছিল ২ কোটি ১৩ লক্ষ লোক অধ্যুষিত শতকরা ৪৫·৩ ভাগ জমি। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ লোকসহ শতকরা ৫৪·৭ ভাগ জমি পড়িত এবং ভবিষ্যতে লোক-বিনিময় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিলে উভয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব লোক বসাইয়া উপযুক্ত জমি উভয়ের হাতে থাকিত। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রায়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাপ্য ৪৫·৩ ভাগ জমির পরিবর্ত্তে পাইল মাত্র ৩৬·২ ভাগ, ন্যায্য প্রাপ্যের ১০০০ বর্গমাইল কম।

সীমানা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য দার্জ্জিলিং-জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরের মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান। পরস্পর সংলগ্ন হিন্দু এলাকা ধরিলে দেখা যায় যে এই দুইটি অংশের মধ্যে পরিষ্কার একটি যোগসূত্র রহিয়াছে। জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী হিন্দু থানাগুলির যোগসূত্র রক্ষা করিতে গেলে পশ্চিম দিকের মুসলমান প্রধান থানাগুলি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে বলিয়াই বোধ হয় হিন্দু থানাগুলিকে পাকিস্থানে ঢুকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ র‍্যাডক্লিফ সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন যাহাতে মুসলমান প্রধান থানা সহজে পশ্চিমবঙ্গে না পড়ে তার জন্য তদন্ত হিসাবে হিন্দু থানা পাকি-

হাতে পড়িলেও ক্ষতি নাই। এই এক চালে পশ্চিম বাংলাকে দুই টুকরা করা হইয়াছে, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়িকে আসামে জুড়িবার ব্যবস্থা করিয়া বাংলাকে আরও দুর্ব্বল করিবার পথ পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং পাকিস্থানের সীমানা বিহারের মুসলমান প্রধান পূর্ণিয়া জেলার সংলগ্ন করিয়া দিয়া বিহারে উপদ্রব সৃষ্টির পথও নিষ্কণ্টক করা হইয়াছে।

সমগ্র খুলনা জেলাটিকে পাকিস্থানে ঠেলিয়া দেওয়ায় লোকে স্তম্ভিত হইয়াছে। এই ঘোর অন্যায় কার্য্যের যুক্তিও চমৎকার। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের মতে যশোহর যাহার হাতে থাকিবে, খুলনাও তাহার থাকা উচিত। এই যুক্তি পঞ্চাশ বৎসর আগে চলিত বটে, কিন্তু এখন একেবারেই অচল। যশোহর এবং খুলনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একটি জেলা সমতল এবং আর একটি নদীমালা ও জঙ্গলপরিপূর্ণ। উভয়ের সমস্যা এত বিভিন্ন যে তাহার জন্য দুটিকে আলাদা জেলায় পরিণত করিতে হইয়াছে। ঐক্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে চব্বিশ-পরগণার সহিত খুলনার যোগ অনেক বেশী। উভয় জেলারই দক্ষিণ দিক জুড়িয়া সুন্দরবন এবং দুইটিরই দক্ষিণের পাশাপাশি থানাগুলি হিন্দু প্রধান। খুলনার পূর্ব্বদিকের শরণখোলা ও মোরেলগঞ্জ থানা দুটি বাদ দিলেই খুলনা জেলায় হিন্দুপ্রাধান্য খুব বেশী হইয়া পড়ে। সুতরাং অনায়াসে ঐ দুটি থানা বাদ দিয়া খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গে রাখা যাইত। ইহাতে যশোহরের হিন্দু প্রধান কালিয়া, নড়াইল, শালিখা ও অভয়নগর থানা চতুষ্টয় গোপালগঞ্জ এবং বরিশালের উত্তরাংশ পশ্চিমবঙ্গে থাকিতে পারিত। র‍্যাডক্লিফ সাহেব এক অদ্ভুত যুক্তি বলে খুলনাকে পাকিস্থানে জুড়িয়া দিয়া এই সমগ্র হিন্দুপ্রধান অঞ্চলটিকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে ফেলিয়া দিলেন, অথচ উহার পরিবর্ত্তে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কোন এলাকা বাংলায় দিলেন না।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম পাকিস্থানে দেওয়ার সিদ্ধান্তটিও সমান বিচিত্র। পার্ব্বত্যজাতি অধ্যুষিত এই বিরাট এলাকাটিতে মুসলমান সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন জন হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহাকে পাকিস্থানে ঠেলিয়া দিলেন। পূর্ব্বের মোটামুটি ভাগে খুলনা ও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামকে পাকিস্থানে দেওয়া আরও অন্যায় হইয়াছে এই কারণে যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাহাদের কোন প্রতিনিধি ছিল না এবং শাসন হিসাবে এই জেলাটি বাংলা-সরকারের এলাকার বহির্ভূত।

রেলওয়ে লাইন বণ্টন সম্বন্ধেও র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রায় আশ্চর্য্যজনক ভাবে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ। দার্জ্জিলিং লাইনের পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি যাহাতে বাধে কোথাও না ভাঙে তার জন্য তিনি হিন্দুপ্রধান বালুরঘাট থানা ভাঙিয়াছেন। শ্রীহট্টে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান পরস্পর সংলগ্ন থানা ভাগ করিতে গিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে তার বিচার করিতে গেলে কুলাউড়া জংসন পাকিস্থানের বাহিরে পড়িয়া যায় তখন তিনি মৌলবীবাজার ও কুলাউড়া দুইটি হিন্দুপ্রধান থানা পাকিস্থানে দিয়া শ্রীহট্ট যাতায়াতের পথ ঠিক রাখিলেন কিন্তু তার পরিবর্ত্তে মুসলমানপ্রধান করিমগঞ্জ ও বদরপুর থানা আসামে দিলেন। পশ্চিম বাংলার সহিত কাটিহার হইয়া জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিঙের সহিত সংযোগ রাখার জন্য গোদাগাড়ী ঘাট জংশনটি বাংলায় থাকা একান্ত প্রয়োজন ছিল। তিনটি মুসলমানপ্রধান এবং দুইটি হিন্দুপ্রধান থানা পশ্চিমবঙ্গে দিলেই ইহা হইতে পারিত। কিন্তু এখানে র‍্যাডক্লিফ সাহেবেরই সৃষ্ট, অপরিহার্য্য রেলপথ অক্ষত রাখা এবং তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নীতি রক্ষিত হইল না। দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাই-গুড়ির দশটি হিন্দুপ্রধান থানা তিনি অনায়াসে বিনা যুক্তিতে পাকিস্থানে ঠেলিয়া দিলেন কিন্তু গোদাগাড়ী-আমনুরা রেল-লাইনটি অক্ষত রাখিবার জন্য তিনটি মুসলমান থানা পশ্চিম-বঙ্গে দিতে পারিলেন না।

মিঃ র‍্যাডক্লিফ যে রায় দিয়াছেন তাহা লইয়া সীমানা কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান সদস্যসংখ্যা সমান ছিলেন এবং তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি একটি সর্ব্বনাশা সিদ্ধান্ত বাঙালীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিচার-পতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস সীমানা সম্বন্ধে যে সুপারিশ করিয়াছিলেন তাহা পরে প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তি-যুক্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম ভিন্ন নিম্নোক্ত এলাকাগুলিকে তাঁহারা পশ্চিবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিমত প্রকাশ করেন—

সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, সমগ্র ২৪-পরগণা জেলা, মোরেলগঞ্জ এবং শরণখোলা থানা ব্যতীত সমগ্র খুলনা জেলা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা এবং রাজৈর থানা, বাখরগঞ্জের সাতটি থানা, (গৌরনদী, স্বরূপকাটি, ঝাল-কাটি, নাজিরপুর, উজিরপুর বানরিপাড়া, বরিশাল শহর সহ বরিশাল থানার কিয়দংশ)। যশোহর জেলায় ১২টি থানা—অভয়নগর, শালিখা, নড়াইল, কালিয়া, বাঘারপাড়া, যশোহর, ঝিকরগাছা, মণিরামপুর, কেশবপুর, সার্সা, গৈঘাটা ও বনগ্রাম। নদীয়া জেলায় রাণাঘাট এবং কৃষ্ণনগর মহকুমা। মাথাভাঙ্গা নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ নদীয়া জেলার সকল থানা, সমগ্র মুর্শিদা-বাদ জেলা। উত্তর বঙ্গের সমগ্র জলপাইগুড়ি এবং দার্জ্জিলিং জেলা, রংপুর জেলার দুইটি থানা, মালদহ ও দিনাজপুরের কিছু অংশ, রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া থানা। ইহা ব্যতীত সকল এলাকা পূর্ব্ববঙ্গে যাইবে।

বিচারপতি মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি বিশ্বাস যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের আয়তন ৩৪,৩৩৬ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ৩৩,২৫৬,৮২৫ জন হইত।

বাংলা ও শ্রীহট্টের সীমানা সম্বন্ধে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের রায়

বঙ্গীয় সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের রায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ পূর্ব্ববঙ্গে এবং সমগ্র বর্দ্ধমান বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়িয়াছে। রাজসাহী বিভাগের রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জেলা পূর্ব্ব-বঙ্গে এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাতা, ২৪ পরগণা মুর্শিদাবাদ জেলা এবং রাজসাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং জেলা পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ জেলাকে দুইটি নূতন প্রদেশের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যান সর র‍্যাডক্লিফ বড়লাটের নিকট তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য এতই প্রবল যে সীমানা সম্পর্কে কোন আপোষমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় তাঁহারা সর র‍্যাডক্লিফের স্বকীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সম্মতি দেন।

বাংলার সীমানা কমিশনে ছিলেন বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, বিচারপতি আক্রম ও বিচারপতি রহমান। বিচারপতি দীন মহম্মদ, বিচারপতি মুনীর, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজসিংকে লইয়া পঞ্জাব সীমানা কমিশন গঠিত হয়।

দিনাজপুরের নিম্নোক্ত থানাসমূহ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়িবে :—

রাইগঞ্জ, ইতাহার, বাঁশীহারি, কোশমণ্ডী, তপন, গঙ্গারামপুর, কুমারগঞ্জ, হেমতাবাদ, কালীগঞ্জ এবং প্রধান রেলপথের (বি, এ রেলপথ) পশ্চিম দিকের যতখানি বালুরঘাট মহকুমার মধ্যে পড়ে। দিনাজপুরের অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে পড়িবে।

জলপাইগুড়ীর তেঁতুলিয়া, পচাগড়, বোদা, দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম থানা এবং কুচবিহারের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বাকী অংশ ছাড়া জলপাইগুড়ী জেলার বাকী সমুদয় অংশ পশ্চিম-বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

নদীয়া জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত থানাগুলি পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে :—

খোকসা, কুমারখালী, মীরপুর, আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, গাঙ্গনী, দামুরহুদা, চুয়াডাঙ্গা, জীবননগর, মেহেরপুর এবং দৌলতপুর থানার মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্ব তীরের অংশ।

যশোহর জেলার বনগাঁ ও গাইঘাটা থানা দুইটি ছাড়া আর সমস্ত অংশ পূর্ব্ববঙ্গে পড়িয়াছে।

মালদহ জেলার গোমস্তাপুর, নাচোল, নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাট থানা পূর্ব্ববঙ্গে পড়িবে, আর বাকী সমুদয় অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার পাথরকান্দি, রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর এই চারিটি থানা ছাড়া বাকী সমুদয় অংশ পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে পড়িবে।

সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের রায়ে বলা হইয়াছে :— পাশাপাশি অবস্থিত মুসলমান ও অমুসলমান অঞ্চলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের দুই অংশের সীমানা নির্দ্ধারণের ভার সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশনের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কমিশনকে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও বিবেচনা করিতে বলা হয় এবং ১৫ই আগষ্টের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাইতে অনুরোধ করা হয়। প্রাথমিক বৈঠকাদির পর কমিশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলের তরফ হইতে স্মারকলিপি ও দরখাস্ত চাহিয়া পাঠান। উহার উত্তরে অসংখ্য স্মারকলিপি ও দরখাস্ত আসে।

কলিকাতায় কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন বসে এবং ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুলাই বুধবার হইতে ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত এই অধিবেশন চলে। তন্মধ্যে ২০শে জুলাই রবিবার কোন অধিবেশন হয় নাই। উভয় পক্ষের তরফ হইতে অসংখ্য দল যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন তন্মধ্যে একদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবং নিউ বেঙ্গল এসোসিয়েশন এবং অন্য দিকে মুসলিম লীগই প্রধান। কমিশনের চেয়ারম্যানকে পঞ্জাব সীমানা কমিশন ও বাংলার সীমানা কমিশনের কাজ চালাইতে হওয়ায় তাঁহার পক্ষে বাংলার সীমানা কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত থাকা সম্ভবপর হয় নাই। তবে তিনি বিভিন্ন দল কর্ত্তৃক উত্থাপিত সমস্ত যুক্তিতর্ক ও তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনের পর বাকি যে কয় দিন ছিল, সেই কয়দিন ধরিয়া বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আলোচনা ও ব্যাখ্যা চলে। কলিকাতায় এই আলোচনা চলে। বিভিন্ন দলের দাবির মধ্যে বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া প্রদেশের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় এরূপ কোন সন্তোষজনক প্রাকৃতিক সীমানাও বিশেষ নাই।

তাই কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের উপরেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সীমানা নির্ভর করে বলিয়া মনে হয়। প্রশ্নগুলি এইরূপ—

১। কলিকাতাকে কোন্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে কিম্বা এমন কোন পন্থায় শহর ভাগ করা যায় কি যাহাতে উহা উভয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। কলিকাতা শহর যদি সমগ্রভাবে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে কোন এলাকার উপর এই শহরের অকাট্য দাবী রহিয়াছে, যেমন সমগ্র নদীয়া বা উহার অংশবিশেষের নদীসমূহ বা হুগলী নদী—যাহার উপর কলিকাতা শহর ও বন্দরের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

৩। গঙ্গা-পদ্মা-মধুমতী নদী বরাবর লাইন টানিলে

যশোহর ও নদীয়ার মুসলমানদের বিরাট সংখ্যাধিক্যের প্রতি ঔদাসীন্য ও মূলনীতির ব্যতিক্রম করা হয় কিনা।

৪। যশোহর যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া খুলনার কোন লাভ আছে কিনা।

৫। মালদহ ও দিনাজপুরের যথেষ্ট সংখ্যক অমুসলমান জনগণকে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হইবে কি?

৬। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার মুসলমান জনসংখ্যা যথাক্রমে ২·৪২ ভাগ ও ২৩·০৮ ভাগ। এক্ষেত্রে কোন্ রাষ্ট্র এই দুইটি জেলা দাবী করিবে? কিন্তু জলপাইগুড়ির এমন একটি এলাকা রহিয়াছে যাহা অমুসলমান এলাকার সংলগ্ন নহে।

(৭) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম কোন্ এলাকায় যুক্ত হইবে। চট্টগ্রাম যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তাহা ভিন্ন অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়া লাভ আছে কি?

(৮), (৯) বহু আলোচনার পর আমার সহযোগিগণ বড় বড় সমস্যায় কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম হন নাই, ফলে আমাকেই রায় দিতে হইয়াছে।

প্রদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রেল চলাচল ব্যবস্থা বা নদীপথের বিঘ্ন যথাসম্ভব এড়াইয়া আমি লাইন টানিয়াছি। এই ধরণের কোন ব্যতিক্রম না করিয়া আমাদের পূর্ব্বঘোষিত নীতি অনুযায়ী লাইন টানা অসম্ভব বিধায় আমি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাতে আমি শুধু এই আশাই করিতে পারি যে, এই ব্যবস্থার কুফল যাহাতে কোন বড় ব্যাপারে না দাঁড়ায় তজ্জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(১) বিহার প্রদেশের সহিত যে স্থানে সীমারেখা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে দার্জ্জিলিং জেলার ফানসীদেওয়া থানা ও জলপাইগুড়ি জেলার তেঁতুলিয়া থানার মধ্যবর্ত্তী সীমানা ধরিয়া একটি লাইন টানা হইবে; অতঃপর তেঁতুলিয়া ও রাজগঞ্জ থানা, পচাগর ও রাজগঞ্জ থানা এবং পচাগর ও জলপাইগুড়ি থানার মধ্যবর্ত্তী সীমানা ধরিয়া এই লাইন চলিবে। পরে দেবীগঞ্জ থানার উত্তর কোণ ধরিয়া কুচবিহার রাজ্যের সীমানা পর্য্যন্ত উহা চলিবে। দার্জ্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ি জেলার যে অংশ এই লাইনের উত্তরে পড়িবে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। কিন্তু পাটগ্রাম থানা এবং জলপাইগুড়ি জেলার অন্য যে অংশ এই লাইনের পূর্ব্বে বা দক্ষিণে পড়িবে তাহা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(২) অতঃপর দিনাজপুর জেলার হরিপুর ও রায়গঞ্জ থানার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা যেখানে বিহার প্রদেশের সীমানার সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থান হইতে ২৪-পরগণা ও খুলনা জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমরেখা যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত একটি লাইন টানা হইবে। বাংলার যে অংশ এই লাইনের পশ্চিমে পড়িবে তাহা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পর্কে ১ম অনুচ্ছেদে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাংলার অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) এই লাইন নিম্নোক্ত থানাসমূহের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা ধরিয়া অগ্রসর হইবে, হরিপুর ও রায়গঞ্জ, হরিপুর ও হেমতাবাদ, রাণী সাকাইল ও হেমতাবাদ, পীরগঞ্জ ও হেমতাবাদ, ও কালীগঞ্জ পীরগঞ্জ, রাচাগঞ্জ ও কালীগঞ্জ, চিরল ও কালীগঞ্জ, চিরল ও কুশমুণ্ডি, চিরল ও গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর ও গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর ও কুমারগঞ্জ, চিরির বন্দর ও কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ী ও কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ী ও বালুরঘাট। বালুরঘাট থানার পূর্ব্ব কোণে যেখানে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের উত্তর-দক্ষিণ লাইনের সহিত ফুলবাড়ী ও বালুরঘাট থানার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা মিলিত হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত এই লাইন বিস্তৃত হইবে। এই লাইন উক্ত রেলওয়ে জমির পশ্চিম পার্শ্ব ধরিয়া বালুরঘাট ও পাঁচবিবি থানার মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

(৪) ঐ স্থান হইতে নিম্নোক্ত থানাসমূহের মধ্যবর্ত্তী সীমানা ধরিয়া লাইনটি অগ্রসর হইবে :—বালুরঘাট ও পাঁচবিবি, বালুরঘাট ও জয়পুরহাট, বালুরঘাট ও ধামইরহাট, তপন ও ধামইরহাট, তপন ও পত্নীতলা, তপন ও পোরসা, বামনগোলা ও পোরসা, হবিবপুর ও পোরসা, হবিবপুর ও গোমস্তাপুর, হবিবপুর ও ভোলাহাট, মালদহ ও ভোলাহাট, ইংলিশ বাজার ও ভোলাহাট, ইংলিশ বাজার ও শিবগঞ্জ, কালিয়াচক ও শিবগঞ্জ, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমানা গঙ্গানদীর সহিত যে স্থানে শেষোক্ত দুইটি থানার সীমারেখা মিলিত হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত এই লাইন বিস্তৃত হইবে।

(৫) অতঃপর মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা, রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলা এবং রাজসাহী ও নদীয়া জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমানা হিসাবে গঙ্গানদী ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এই লাইনটি ঘুরিয়া নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে, যেখানে গঙ্গানদী হইতে মাথাভাঙ্গা নদী বাহির হইয়াছে। সেই স্থান পর্য্যন্ত চলিবে। জেলার সীমারেখা দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্দ্ধারিত হইবে; গঙ্গার গতিপথের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকিবে না।

(৬) গঙ্গানদীর যে স্থান হইতে মাথাভাঙ্গা নদী বাহির হইয়াছে, সেই স্থান হইতে মাথাভাঙ্গা নদী ধরিয়া দৌলতপুর ও করিমপুর থানার মধ্যবর্ত্তী সীমানার যে স্থানে উহা মিলিত হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত এই লাইন চলিবে। নদীর মধ্যবর্ত্তী লাইন দ্বারাই প্রকৃত সীমানা নির্দ্ধারিত হইবে।

(৭) এইস্থান হইতে দৌলতপুর ও করিমপুর থানা, গাংনি ও করিমপুর থানা, মেহেরপুর ও তেহাট্টা থানা, মেহেরপুর ও চাপড়া থানা, দামুড়হুদা ও চাপড়া থানা, দামুড়হুদা ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা, চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা, জীবননগর ও কৃষ্ণগঞ্জ থানা, জীবননগর ও হাঁসখালি থানা, মহেশপুর ও হাঁসখালি থানা,

মহেশপুর ও রাণাঘাট থানা, মহেশপুর ও বনগাঁও থানা, ঝিকরগাছা ও বনগাঁও থানা, সরসা ও গাইঘাটা থানা এবং গাইঘাটা ও কলারোয়া থানার মধ্যবর্তী সীমানা ধরিয়া খুলনা ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যবর্তী সীমানার যেখানে ঐ সকল থানার সীমারেখা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমারেখা বিস্তৃত হইবে।

(৮) অতঃপর খুলনা ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যবর্তী সীমানা ধরিয়া এই লাইন দক্ষিণ দিকে চলিবে এবং যে স্থানে এই দুইটি জেলার সীমারেখা বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত উহা বিস্তৃত হইবে।

শ্রীহট্ট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

শ্রীহট্ট জেলা এবং আসামে উহার পার্শ্ববর্তী জেলা সম্বন্ধে আমি বঙ্গীয় সীমা নির্দ্ধারণ কমিশনের রিপোর্ট পেশ করিতেছি। সীমারেখা কি ভাবে টানা হইবে সে সম্পর্কে কমিশনের সদস্যগণ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ হন। তাঁহারা আমাকে এই ব্যাপারে অভিমত দিতে বলেন, আমার মতে এই ব্যাপার শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। শ্রীহট্টের ৩৫টি থানার মধ্যে ৮টি থানায় অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। উক্ত আটটি থানার মধ্যে শাল্লা ও আজমীরিগঞ্জ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম এলাকা-পরিবেষ্টিত। সেজন্য ঐ দুইটি পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অপর থানা ছয়টির লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৩০ হাজার। উহা শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ অংশ বরাবর অবস্থিত। ঐ থানাগুলি দুইটি মহকুমায় মধ্যে বিভক্ত। উহার মধ্যে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১৫ হাজারেরও অধিক। তথায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ অপর দিকে করিমগঞ্জ থানার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৮ হাজারের অধিক। এখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি থানা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং উহা শ্রীহট্টের বদরপুর করিমগঞ্জের সহিত সংলগ্ন। সমগ্রভাবে হাইলাকান্দি মহকুমার মুসলমানরা মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। তথায় তাহারা শতকরা ৫১ ভাগ। হাইলাকান্দি মহকুমাকে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্তির জন্য মুসলমানরা দাবী করিয়াছে। কিন্তু আমার মতে মানচিত্র দেখিয়া বুঝা যায় যে, এইভাবে ভাগ করিলে শাসন পরিচালনা সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় অ-মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলকে পূর্ব্ববঙ্গে দিতে এবং কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে আসামে দিতে হইবে। তদনুযায়ী আমি নিম্নলিখিত অভিমত দিতেছি—এমন একটি স্থান হইতে রেখা টানা হইবে যেখানে পাথারকান্দি ও কুলাউরা থানার মধ্যস্থিত সীমানা ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উক্ত-রেখাটি পাথারকান্দি ও বড়লেখা থানার মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিবে। তাহার পর উক্ত রেখাটি করিমগঞ্জ ও বড়লেখা থানার মধ্যস্থিত সীমানা ধরিয়া চলিবে এবং তাহার পর করিমগঞ্জ ও বিয়ানী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া এমন একটি স্থানে উপনীত হইবে যেখানে ঐ সীমারেখা কুশিয়ারা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর নদীকে উক্ত সীমারেখা করিয়া পূর্ব্ব দিকে ঘুরিয়া যাইবে এবং এমন একটি স্থানে আসিয়া পড়িতে হইবে, যেখানে ঐ নদীটি শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার মধ্যস্থিত সীমানার সহিত মিলিত হইয়াছে।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের পর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আকার

র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলে ৩৪টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পশ্চিমবঙ্গে এবং ৫৪টি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ব্ববঙ্গের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। এই ৩৪টি মুসলমান থানার আয়তন ৩৮৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৯,০০,২৭৬ (মুসলমান ১৮,১৩,৫৭৪, অমুসলমান ১০,৮৭,১০৬)। ৫৪টি অমুসলমান থানার মোট আয়তন ৯৭৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৩,৮৫,৭৮৪ (মুসলমান ১৮,০১,৫২২ এবং অমুসলমান ২৫,৮৪,২৬২)। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মাত্র ৩টি শহর পশ্চিম বঙ্গে পড়িয়াছে কিন্তু অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪৭টি শহর পড়িয়াছে পূর্ব্ববঙ্গে।

৩রা জুনের মোটামুটি ভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এই রকম ছিল :—

	আয়তন বর্গমাইল
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪১৩৫
২৪-পরগণা	৩৬৯৬
কলিকাতা	. ৩৪
খুলনা	৪৮০৫
জলপাইগুড়ি	৩০৫০
দার্জ্জিলিং	১১৯২
চট্টগ্রাম (পার্ব্বত্য)	৫০০৭
	মোট ৩০৯১৯ বর্গমাইল

অনেকের মনে ভুল ধারণা আছে যে, সাময়িকভাবে পশ্চিমবঙ্গের যে মোটামুটি সীমানা ধরা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ধরা হয় নাই। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা বিলে বলা হইয়াছে যে, নূতন পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশের মধ্যে যেসব স্থানের উল্লেখ করা হয় নাই, সেই সব স্থান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়িবে। এই সম্পর্কে যেসব স্থানের নামোল্লেখ করা হয়, তাহার মধ্যে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ছিল না। সুতরাং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পড়িয়াছিল। মোটামুটি অস্থায়ী প্রদেশ গঠনকালে পূর্ব্ববঙ্গের সীমানা ছিল ৪৩৫২৩ বর্গমাইল।

র‍্যাডক্লিফের ঘোষণা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান সীমানা দাঁড়াইয়াছে নিম্নোক্ত রূপ :—

	আয়তন বর্গমাইল
বর্দ্ধমান বিভাগ	১৪১৩৫
২৪-পরগণা	৩৬৯৬
কলিকাতা	৩৪
মুর্শিদাবাদ	২০৬৩
নদীয়া (অংশ)	১৫০৭
যশোহর "	৩২০
মালদহ "	১৩৯১
দিনাজপুর "	১৩৮৯
জলপাইগুড়ি "	২৫২৮
দার্জ্জিলিং	১১৯২
মোট	২৮,২৫৫ বর্গমাইল

বর্ত্তমানের আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা ৫৬৬৪ বর্গমাইল কম হইয়াছে। ১৯৪১ সনের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের কোন্ অঞ্চলে কোন্ সম্প্রদায়ের কত লোক বাস করে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে বুঝা যাইবে :—

	মোট জনসংখ্যা হাজারের হিসাব	মুসলমান হাজারের হিসাবে	মুসলমান শতকরা
বর্দ্ধমান বিভাগ	১০২৮৭	১৪২৯	১৩.৯
২৪-পরগণা	৩৫৩৬	১১৪৮	৩২.৫
কলিকাতা	২১০৯	৪৯৭	২৩.৩
মুর্শিদাবাদ	১৬৪১	৯২৮	৫৬.৫
নদীয়া (অংশ)	৮৪০	৪৩১	৫১.৩
যশোহর "	১০৩	৭৭	৫৭.৯
মালদহ "	৮৪৪	৪১৪	৪৯.০
দিনাজপুর "	৫৮৩	২১৫	৩৬.৯
জলপাইগুড়ি "	৮৫৬	১৪৩	১৬.৯
দার্জ্জিলিং	৩৭৬	৯	২.৪
মোট	২১১৯৬৪৫৩	৫২৯১৬৯৬	২৪.৯

বাংলায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ৫৩ লক্ষ পড়িয়াছে পশ্চিম বাংলায় আর ২ কোটি ৭৩ লক্ষ অ-মুসলমানের মধ্যে ১ কোটি ১৪ লক্ষই পড়িয়াছে পূর্ব্ব বাংলায়। বাংলার মোট আয়তন ৭৭৪৪২ বর্গমাইলের মধ্যে পশ্চিম-বাংলা পাইয়াছে শতকরা ৩৬.৩ ভাগ। মোট ৬ কোটি ৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পশ্চিম-বাংলায় পড়িয়াছে শতকরা ৩৫.১ জন অর্থাৎ ২ কোটি ১২ লক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গের অ-মুসলমান সংখ্যা-লঘু বাসিন্দা শতকরা ২৯.১৭ জন আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান বাসিন্দার সংখ্যা শতকরা ২৫.১১ জন। উভয় প্রদেশের মোট মুসলমান ও অ-মুসলমান জনসংখ্যা নিম্নোক্ত রূপে উভয় বঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে :

	পশ্চিম বাংলা শতকরা	পূর্ব্ব বাংলা শতকরা
মুসলমান	১৬.২ জন	৮৩.৮ জন
অ-মুসলমান	৫৮.৩ জন	৪১.৭ জন

দুই-পঞ্চমাংশেরও বেশী হিন্দু পূর্ব্ব বাংলায় পড়িয়াছে।

শাসন-কার্য্য ও আইন রচনার জন্য মৌলিক রাষ্ট্রনীতি

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত উপদেষ্টা কমিটির সভাপতিরূপে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কয়েকটি মূল নীতি সম্বলিত একটি অতিরিক্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। রিপোর্টে সর্দ্দার প্যাটেল বলেন যে, এই মূল নীতিগুলি আদালতের বিচার্য্য বিষয় না হইলেও এইগুলি অনুসরণ করিয়া দেশ শাসন ও আইন রচনা করা কর্ত্তব্য। 'ক' পরিশিষ্টে এই নীতিগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে—আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ন্যায়সঙ্গত মৌলিক অধিকারসমূহ ছাড়াও শাসনতন্ত্রে এমন কয়েকটি মৌলিক রাষ্ট্রনীতির নির্দ্দেশ থাকা আবশ্যক যেগুলি আদালতের বিচার্য্য বিষয় না হইলেও দেশের শাসন ব্যাপারে অপরিহার্য্যরূপে গণ্য হইবে। আমাদের সুপারিশগুলি 'ক' পরিশিষ্টে বর্ণিত হইল।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে রিপোর্ট দাখিল করি, তাহার ৮নং অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার সাব-কমিটির সুপারিশের উল্লেখ করিয়া আমরা বলিয়াছিলাম যে, কোন নাগরিকের আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনার অধিকার অথবা বাধা-নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে। কিন্তু বিশেষ বিচার-বিবেচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এ সম্পর্কে ২২নং ধারাতে ইতিপূর্ব্বেই যে অধিকারের সুপারিশ করা হইয়াছে ও যাহা গণ-পরিষদের এপ্রিল-মে মাসের অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, শাসনতন্ত্রে তার অতিরিক্ত আর কোন অধিকারের ব্যবস্থা রাখিবার প্রয়োজন নাই।

গণ-পরিষদ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রিপোর্টের ১৬, ১৭ ও ১৮(২) নং ধারা পুনর্বিবেচনা করিতে বলিয়াছিলেন। আমরা ধারাগুলি পুনর্বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত সুপারিশ করিতেছি।

১৬নং ধারা—"যে সকল বিদ্যালয় সরকারী অর্থে পরিচালিত হয় অথবা সরকারী সাহায্য লাভ করে, সেই সকল বিদ্যালয়ে যদি ধর্ম্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকে তবে তাহাতে কাহাকেও অংশ গ্রহণ করিতে অথবা বিদ্যালয়ে কিম্বা বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে কাহাকেও যোগদান করিতে বাধ্য করা যাইবে না।" আমরা পরিষদকে এই ধারাটিকে বর্ত্তমান আকারে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

১৭নং ধারা—"বলপ্রয়োগে অথবা অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়া কাহাকেও ধর্ম্মান্তরিত করা হইলে তাহা আইনতঃ স্বীকৃত হইবে না।"

এই ধারাটি আরও বিবেচনার পর আমাদের নিকট ইহা অনাবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা এই ধারাটি সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিবার সুপারিশ করিতেছি।

১৮(২)নং ধারা—"ধর্ম্ম, সম্প্রদায় অথবা ভাষার ভিত্তিতেই হউক, রাষ্ট্রপরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভের পক্ষে

কোন সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে কোন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা যাইবে না অথবা ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাইবে না।"

উপরোক্ত ১৬নং ধারা দৃষ্টে আলোচ্য ধারার শেষাংশ বাহুল্য বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইল। ধারার অবশিষ্টাংশ অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রেও এই ধারা সম্প্রসারিত করা আমরা বর্ত্তমানে যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সাব-কমিটি আমাদের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাহাতে দেবনাগরী অথবা ফারসী অক্ষরে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষাকে ভারতীয় ইউনিয়নের ভাষারূপে গ্রহণের সুপারিশ করেন। গত এপ্রিল মাসে এই বিষয়টির আলোচনা আমরা স্থগিত রাখিয়াছিলাম। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করায় আমরা বিষয়টিকে মৌলিক অধিকারের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা অনাবশ্যক মনে করি।

পরিষদের এপ্রিল-মে মাসের অধিবেশনে বহুসংখ্যক সংশোধন প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহার একটিও গ্রহণ করিতে সক্ষম হই নাই।

মূল রাষ্ট্রনীতি

১। রিপোর্টের এই অংশে রাষ্ট্র পরিচালনার পক্ষে আবশ্যক মূল নীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই নীতিগুলি আইনের আমলে না আসিলেও দেশ-শাসনের পক্ষে এগুলি অত্যাবশ্যক এবং এই নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া আইন রচনা করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য হইবে।

২। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচারের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া রাষ্ট্রকে সমগ্র জাতির কল্যাণসাধনে যথাসাধ্য যত্নবান হইতে হইবে।

৩। রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—(ক) পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের যথোপযুক্ত জীবিকার অধিকার; (খ) সমাজের ধনোৎপাদন-ব্যবস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এরূপভাবে বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে যতদূরসম্ভব সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ হইতে পারে; (গ) সাধারণের ক্ষতি করিয়া আবশ্যক পণ্যদ্রব্যের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যাহাতে কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে তজ্জন্য অবাধ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা; (ঘ) পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক প্রদান; (ঙ) পুরুষ ও নারী নির্ব্বিশেষে কর্ম্মীদের শক্তি ও স্বাস্থ্য এবং বালক-বালিকাদের সৌকুমার্য্যের যাহাতে অপচয় না হয় এবং নাগরিকরা যাহাতে অভাবের তাড়নায় বয়স ও শক্তির অনুপযুক্ত কার্য্য করিতে বাধ্য না হয় তাহার ব্যবস্থা; (চ) শিশু ও যুবকদের শক্তির অন্যায় সুযোগ যাহাতে কেহ গ্রহণ না করিতে পারে এবং তাহাদের নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৪। আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবিকার জন্য কাজের অধিকার এবং বেকার, বৃদ্ধ, পীড়িত, অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্যপ্রাপ্তির অধিকারের ব্যবস্থা করিবে।

৫। কর্ম্মীরা যাহাতে মনুষ্যোচিত পরিবেশের মধ্যে কাজ করিতে পারে ও নারীকর্ম্মীরা সন্তান প্রসবের সময় ছুটি পায় তাহার ব্যবস্থা করা।

৬। রাষ্ট্র আইন, অর্থনৈতিক সংগঠন ও অন্যান্য উপায় দ্বারা শ্রমজীবী বা অন্যান্য সমস্ত প্রকার কর্ম্মীর জন্য কাজ, জীবন ধারণোপযোগী বেতন, সুষ্ঠু জীবনযাত্রা, অবকাশ এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক মেলামেশার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবে।

৭। রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য সমান সামাজিক রীতির প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিবে।

৮। প্রত্যেক নাগরিকের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার আছে। রাষ্ট্রকে এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত শিশুর জন্য ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। জাতির দুর্ব্বলতর অংশ, বিশেষতঃ তপশিলী ও আদিবাসীদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি রাষ্ট্রকে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সামাজিক অবিচার ও শোষণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

১০। জাতির পুষ্টি, জীবন-যাত্রার মান ও স্বাস্থ্য উন্নত করাকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্বরূপে গণ্য করিতে হইবে।

১১। রাষ্ট্রকে সমস্ত স্মৃতিস্তম্ভ, ঐতিহাসিক স্থান ও শিল্প নিদর্শনকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে রক্ষা করিতে হইবে।

১২। রাষ্ট্রকে বিভিন্ন জাতির সহিত সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অনুকূল করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে যে পরামর্শ কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি অদ্য গণ-পরিষদে তিনটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ঐ রিপোর্টে পৃথক নির্ব্বাচনের বিলোপসাধন, যৌথ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য নির্ব্বাচন, যে সকল সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকৃত, জনসংখ্যার অনুপাতে প্রথমে দশ বৎসরের জন্য বিভিন্ন আইনসভায় তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষণ, দশ বৎসরের জন্য এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নিমিত্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা এবং যাহার উপর বিচার বিভাগের কোন হাত থাকিবে না সেইরূপ কতকগুলি নীতি প্রজাদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ঐ কমিটির সভাপতি।

প্রথম রিপোর্টে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনীতিক রক্ষাকবচ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, দ্বিতীয় রিপোর্টে কোন কোন চাকুরীতে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা এবং তাহাদের শিক্ষায় সুবিধা দানের বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। তৃতীয় রিপোর্টকে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে অতিরিক্ত রিপোর্ট বলা যাইতে পারে।

সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিটির চেয়ারম্যান পরিষদে রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বলেন, গত ২৩শে এপ্রিল প্রেসিডেন্টের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছিল, উহার পরিপূরক হিসাবেই এই রিপোর্টটি গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যায়সঙ্গত মৌলিক অধিকার সম্পর্কেই রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সকল অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হউক বা বিশেষভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকেই দেওয়া হউক, সেগুলি সমাজজীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক রক্ষাকবচ সম্পর্কেই রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রহিয়াছে :—

(১) আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব ; যৌথ বনাম স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ; বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।

(২) মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(৩) সরকারী চাকুরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণ।

(৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য সরকারী ব্যবস্থা।

সর্দার প্যাটেল বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাব-কমিটি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পরামর্শদাতা-কমিটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াই আমরা প্রস্তাবগুলি রচনা করিয়াছি। বিষয়টি এরূপ যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই সকলের সম্মতিলাভের আশা করা যায় না। যে ক্ষেত্রে সর্ব্বসম্মত অভিমত পাওয়া যায় নাই, সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ সদস্য যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথমেই আমরা পৃথক নির্ব্বাচন সমস্যা আলোচনা করিয়াছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং সমগ্র দেশের রাজনৈতিক জীবনের পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিকাংশের মতানুসারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, নূতন শাসনতন্ত্রে এই পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা অবশ্যই রহিত করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে অতীতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সুষ্ঠু জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে যে নূতন রাজনৈতিক অগ্রগতির সূচনা হইয়াছে তাহার উন্নতিকল্পে এই সকল বিপদ এড়াইয়া চলাই বিশেষ প্রয়োজন। এই দিক হইতে পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ অকাট্য বলিয়াই মনে হয়।

এই হেতু আমরা সুপারিশ করি যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সর্ব্বপ্রকার নির্ব্বাচন যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায়ই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। অবাধ যৌথ নির্ব্বাচনে সংখ্যালঘুরা যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সেজন্য সাধারণ নিয়ম হিসাবে বিভিন্ন আইন-পরিষদে স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের সংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষিত থাকিবে। প্রথমে দশ বৎসরের জন্য এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। দশ বৎসর পর অবস্থা পুনর্ব্বিবেচিত হইবে। আমরা ইহাও সুপারিশ করি যে, যে সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সাধারণ আসনেও প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। সাধারণভাবে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষাকবচ ব্যবস্থার আমরা বিরোধী।

সর্দার প্যাটেল বলেন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ব্বোক্ত নীতি প্রয়োগ করা সঙ্গত কিনা, দুই কারণে কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, আমরা জানিতে পারিলাম যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থের খাতিরে আইন সভায় আসন সংরক্ষণের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা প্রয়োজন বলিয়া সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মত সংখ্যায় নগণ্য একটি সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ব্বোক্ত নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে তাহা সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। দেশীয় রাজ্য বাদ দিয়া ভারতীয় ডোমিনিয়নে যাহাদের জনসংখ্যা শতকরা '৫-এর কম—'ক' শ্রেণী ; শতকরা '৫-এর বেশী অথচ $১\frac{১}{২}$-এর বেশী নহে—'খ' শ্রেণী ; শতকরা $১\frac{১}{২}$-এর বেশী—'গ' শ্রেণী। তিনটি শ্রেণীকে এভাবে ভাগ করা হইয়াছে :—

'ক' শ্রেণী

১। এংলো-ইণ্ডিয়ান

২। পার্শী

৩। আসাম সমতল ভূমির উপজাতি

'খ' শ্রেণী

৪। ভারতীয় খ্রীষ্টান

৫। শিখ

'গ' শ্রেণী

৬। মুসলমান

৭। তপশিলী সম্প্রদায়

দেশীয় রাজ্যগুলিকে বাদ দিলে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা এক লক্ষের সামান্য কিছু বেশী (শতকরা '৪ জন)। এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ হইতে মিঃ এ্যান্থনী বলিয়াছেন যে, আদমসুমারীর সংখ্যা বিশুদ্ধ নহে। কিন্তু সঠিক সংখ্যা আরও বেশী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহারা সংখ্যায় নগণ্যই থাকিবে। এ অবস্থায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহাদিগকে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত

করিতে হয়। কমিটিতে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে সকল প্রতিনিধি রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে নিম্নরূপ দাবি জানাইয়াছিলেন :—

লোক-সভায়—তিন জন সদস্ত ; পশ্চিমবঙ্গ ৩, বোম্বাই ২, মাদ্রাজ ২, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১, বিহার ১, যুক্তপ্রদেশ ১।

কিন্তু পরে তাঁহারা মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং লোক-সভায় দুইটি আসন এবং যে সকল প্রদেশের আইন সভায় বর্তমানে তাঁহাদের প্রতিনিধি রহিয়াছেন সে সকল প্রদেশের ভবিষ্যৎ আইন সভায় একটি হিসাবে আসনের দাবি জানান। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাঁহারা মোট ৮টি আসনের দাবি করিতেছেন।

কমিটি এংলো-ইণ্ডিয়ানদের মতামত বিশেষ যত্নের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন :—

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্ত আসন সংরক্ষিত থাকিবে না—কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনে যদি তাঁহারা আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না পারেন,তবে ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি ও প্রদেশসমূহের গবর্ণরগণ যথাক্রমে কেন্দ্র ও প্রদেশের আইন সভায় নিম্ন পরিষদে এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

পার্শীদের সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল বলেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাব-কমিটিতে স্যর হোমি মোদি বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় পার্শী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন—কেননা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে তাঁহারা অনেক প্রকার সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। এই দাবি মানিয়া লওয়া প্রয়োজন বলিয়া কমিটি স্বীকার করেন। কিন্তু স্যর হোমি বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত সময় চাহেন।

এডভাইসরী কমিটিতে এ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে স্যর হোমি বলেন যে, যদিও কমিটি পার্শী সম্প্রদায়কে 'ক' শ্রেণীভুক্ত অন্তান্ত সম্প্রদায়ের মতই বিশেষ সুযোগের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেছেন, তথাপি পূর্ব্বেকার রীতিই তিনি অনুসরণ করিবেন এবং বিধিবদ্ধভাবে আসন-সংরক্ষণ রাখার দাবি প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্ত স্বতন্ত্র প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা থাকে, তবে তাঁহাদের দাবি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

আসামের সমতল ভূমির উপজাতিগণ

শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত ও আংশিক শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল সাব-কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে এ সকল উপজাতির সমস্তা বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে।

ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়

ভারতীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জাতিগঠনের কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিবেন না। কেন্দ্রীয় আইন সভায় এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁহারা জনসংখ্যার হারে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক ছিলেন। অন্তান্ত প্রদেশে তাঁহারা সাধারণ আসনের জন্ত নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে প্রস্তুত ছিলেন। কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার বেশী কিছু দেওয়া হউক, ইহা তাঁহারা চাহেন না ; কিন্তু 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যদি অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তবে ভারতীয় খ্রীষ্টানরাও সে দাবি জানাইবেন।

শিখ সম্প্রদায়

সীমানা কমিশনের রায় বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত শিখদের অবস্থা অনিশ্চিত রহিয়াছে। শিখ সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচ সম্পর্কে আলোচনা বর্তমানে স্থগিত রাখা হইতেছে।

মুসলমান ও তপশিলী সম্প্রদায়

কমিটির অভিমত এই যে, মুসলমান বা তপশিলীদের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের প্রয়োজন নাই। সুপারিশ করা যাইতেছে যে, এ দুইটি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হারে আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে এবং যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় এ সকল আসন লাভ করিতে হইবে।

মন্ত্রিসভায় আসন-সংরক্ষণের প্রস্তাব

কমিটির কোন কোন সদস্ত এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভায় আসন সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কমিটি এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্রে এরূপ কোন ব্যবস্থা রাখিলে ভবিষ্যতে গুরুতর অসুবিধা দেখা দিবে। অবশ্য, যথাসম্ভব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকেও যে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় সেদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রদেশসমূহের গবর্ণরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, শাসনতন্ত্রে তপশিলী এই কথাটি উল্লেখ করা হউক।

সংখ্যালঘুদের জন্ত সংরক্ষণ-ব্যবস্থা রহিত : মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সংরক্ষিত আসনের জন্ত কোন আইনগত ব্যবস্থা থাকিবে না, কিন্তু শাসনতন্ত্রের তপশীলে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে গবর্ণরদের প্রতি প্রদত্ত নির্দ্দেশাবলীর ৭ম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রথা প্রবর্তনের বিধান থাকিবে।

চাকুরীতে আসন-সংরক্ষণের প্রস্তাব

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হারে সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্তও প্রস্তাব করা হইয়াছে। অন্ত কোন দেশের শাসনতন্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া আমরা জানি নাই। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিলে মারাত্মক ফল দেখা দিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ কথাও স্বীকার করি যে, শাসন-ব্যবস্থার যোগ্যতা বিনষ্ট না করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবির দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, মন্ত্রী নিয়োগের স্থায় সরকারী

চাকুরীতেও লোক নিয়োগের কালে যাহাতে শাসন-ব্যবস্থার যোগ্যতা বজায় রাখিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তজ্জন্য শাসনতন্ত্র বা উহার কোন তপশিলী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্টসমূহের প্রতি নির্দেশ থাকিবে।

কমিটির এংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য বলিয়াছেন যে, কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর চাকুরীর উপর তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। যাহা হউক, এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি: সর্ব্ব-ভারতীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীগুলিতে নিয়োগের সময় যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় সম্পর্কিত কমিটি

বর্ত্তমানে এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা কতকগুলি বিশেষ চাকুরীর উপর নির্ভরশীল এবং তাহারা শিক্ষা ব্যাপারে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে:—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীযুত কে এম মুন্সী, শ্রীযুক্তা হংস মেটা, মিঃ এস এইচ প্রেটার ও মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এন্টনী।

সর্দ্দার প্যাটেল বলেন, যে সকল রক্ষাকবচ রহিয়াছে সেগুলি কার্য্যক্ষেত্রে মানিয়া চলা হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ হইবে এক জন মাইনরিটি অফিসার নিয়োগ করা। রক্ষাকবচ ও অধিকার উপেক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইলে এই অফিসার তদন্ত করিবেন এবং আইন সভায় তাঁহার রিপোর্ট পেশ করিবেন।

ষ্ট্যাটুটরী কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব

আমরা সমাজ ও শিক্ষার দিক হইতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি ষ্ট্যাটুটরী কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছি। অনুন্নত শ্রেণীগুলি কি কি অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাঁহারা সে সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং অসুবিধা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে নিউনিয়ন বা সংশ্লিষ্ট ইউনিট গবর্মেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন।

আমাদের সুপারিশগুলির সংক্ষিপ্তসার পরিশিষ্টের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল:—যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় নির্ব্বাচন হইবে। তপশীলে বর্ণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত থাকিবে। বর্ত্তমানে দশ বৎসরের জন্য এই সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। পরে এই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে হইবে। এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে না। কিন্তু সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে যদি তাঁহারা আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না পারেন, তবে রাষ্ট্র-পতি ও প্রদেশসমূহের গবর্ণররা যথাক্রমে কেন্দ্রে ও প্রদেশে তাঁহাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারিবেন। পার্শীদের জন্য বিধিবদ্ধ কোন সংরক্ষণ-ব্যবস্থা থাকিবে না, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জনসংখ্যার হারে কেন্দ্রীয় আইন সভায় ও বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক আইন সভায় আসন সংরক্ষিত থাকিবে। অন্যান্য প্রদেশে তাঁহারা সাধারণ আসনের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন। সংখ্যালঘু শিখ সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। মুসলমান ও তপশীলীদের জন্য তাঁহাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

অতিরিক্ত অধিকার

সংরক্ষিত আসনের অধিকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আরও আসনের জন্যও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত থাকিবে—এতদতিরিক্ত কোন সুযোগ-সুবিধা কোন সম্প্রদায়কেই দেওয়া হইবে না। সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তিকে তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম সংখ্যা ভোট পাইতে হইবে, এমন কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।

এংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, (১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র চালু হইবার পরও তিন বৎসর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; (২) প্রথম তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর পূর্ব্বোক্ত সাহায্য শতকরা দশ ভাগ, ৬ষ্ঠ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর আরও দশ ভাগ, ৯ম বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর আরও দশ ভাগ হ্রাস করা হইবে। দশ বৎসর পরে এংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলি কোনরূপ অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাইবে না; (৩) এই দশ বৎসরের মধ্যে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত এংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলিতে যে সকল কর্ম্মখালি হইবে, উহার শতকরা ৪০ ভাগ অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পাইবেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে যে অর্থে এংলো-ইণ্ডিয়ান শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, ঠিক সেই অর্থেই এ রিপোর্টে "এংলো-ইণ্ডিয়ান" শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

চাকুরী সম্পর্কে ব্যবস্থা

রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগ ও শুল্ক বিভাগে বর্ত্তমানে যে ভিত্তিতে এংলো-ইণ্ডিয়ান নিয়োগ করা হয়, তাহা যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। উহার পর প্রতি দুই বৎসর শতকরা দশটি হারে সংরক্ষিত চাকুরীর সংখ্যা হ্রাস করা হইবে। অবশ্য, ব্যক্তিগত যোগ্যতার দ্বারা যদি কেহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট "কোটা"র বাহিরেও তাহাকে নিয়োগ করা চলিতে পারিবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের দশ বৎসর পর পূর্ব্বোক্ত চাকুরীগুলির ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষণ-ব্যবস্থারও অবসান ঘটিবে।

হরিবংশ-পুরাণে ভারতীয় সঙ্গীত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

হরিবংশকে ঠিক ঠিক পুরাণই বলা যায়। পণ্ডিত উইণ্টারনিজের অভিমতও তাই। তিনি বলেছেন:

"* * the *Harivamsa*, a work which in reality a *Purana* and is also occasionally called '*Harivamsa-Purana*' as part of the *Mahabharata*."

হরিবংশ মহাভারতেরই যে পরিশিষ্ট ('a supplement or appendix') একথা 'খিল হরিবংশ' নাম থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরই অভিমত যে, সমগ্র হরিবংশ-পুরাণ একজন মাত্র গ্রন্থকারই রচনা করেন নি, ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারই বরং রচনা করেছিলেন।১ হরিবংশের ভিতর রামায়ণের কিছু কিছু ঘটনারও পুনরুল্লেখ আছে। তা ছাড়া বায়ুপুরাণের বেশীর ভাগ অংশের উল্লেখই আবার হরিবংশে পাওয়া যায়। মহাভারতেও বায়ুপুরাণের উল্লেখ অনেক জায়গায় আছে। পণ্ডিত উইণ্টারনিজ, হপ্‌কিন্স, হোল্টজম্যান, ভাণ্ডারকর এঁদের সকলের অভিমত যে, বায়ুপুরাণের অধিকাংশ ঘটনার কথাই হরিবংশে উল্লেখ করা হয়েছে। রামচন্দ্র দীক্ষিতর, ভাণ্ডারকর, সি. ভি. বৈদ্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকেরা বায়ুপুরাণের রচনাকাল গুপ্ত রাজাদের শাসনের সময়ে বলে মন্তব্য করেছেন। রামচন্দ্র দীক্ষিতর বলেছেন:

"The version of the *Visnu-Purana* with regard to the Mauryan dynasty, and of the *Vayu-Purana* to the early Guptas has found general acceptance among scholars. The *Vayu* version of the Gupta rule is believed to be a description of the reign of the Chandragupta 1, who ruled Magadha from 320-330 A.D."২

পণ্ডিত উইণ্টারনিজের অভিমতও তাই।৩ পার্জিটার সাহেব বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দুটিকে আবার একটি মাত্র পুরাণই বলতে চেয়েছেন। মোটকথা বায়ুপুরাণের রচনাকাল যদি গুপ্তযুগের সময়ে হয় তবে বায়ুপুরাণের অনেক প্রসঙ্গ ও বর্ণনাই মহাভারত ও হরিবংশে উল্লেখ থাকার জন্যে মহাভারত ও হরিবংশকে অবশ্যই বায়ুপুরাণ তথা গুপ্তযুগের পরবর্তী বলে গণ্য করতে হবে। অথচ পণ্ডিত উইণ্টারনিজ বলেছেন, সবার চেয়ে গোড়াকার দিকের পুরাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে মোটেই রচনা করা হয় নি।—

"All that we can safely conclude is that the earlier Puranas must have come into being *before the 7th Century*, * * ."৪

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হরিবংশ-পুরাণের রচনাকাল ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে নয়, প্রবন্ধ ভারতীয় সঙ্গীতের পরিচয় কতটুকু ও কিভাবে পাওয়া যায় সেটাই দেখার বিষয়। আদিম ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ যেমনই হোক না কেন—বেদ, প্রতিশাখ্য, শিক্ষা, রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারতে সঙ্গীতের বিকাশ-বৈচিত্র্য যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সামগানের যুগ থেকে হরিবংশের যুগ অথবা সময়ের ব্যবধানে সঙ্গীতের বিকাশে যথেষ্ট রকম উন্নতি সাধিত হয়েছিল। হরিবংশের সমাজে গান্ধারগ্রামের রূপ ও রাগেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল তা "আগান্ধারগ্রামরাগং" (৯৪।২২-২৬) শব্দগুলি থেকে বেশ বুঝা যায়। সপ্তস্বরে লালায়িত ছটি গ্রামরাগ ("ষড়্‌গ্রামরাগাদি" [৮৯।৬৮]), ভিন্ন ভিন্ন রাগিনী, তিন স্থান, মূর্ছনা, নৃত্য, নাট্য ও বাদ্য এসবের কোন কিছুরই অভাব হরিবংশের যুগে ছিল না। গাথা ও সামগান থেকে আরম্ভ করে গ্রামরাগের পরিচয়ও পরিষ্কারভাবেই হরিবংশের যুগের সমাজে আমরা পেয়ে থাকি।

হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বেই বিশেষ করে গাথা, গান, উদ্গান ও সামগানের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিবংশের যুগেও যাগযজ্ঞ ও সত্রের বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠান করা হ'ত। যেমন হরিবংশপর্বে আছে: "অধ্বর্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ" (৪১।৬)। ভবিষ্যপর্বে দেখা যায়: "ঋচশ্চ সকৃচঃ পূর্বং সামগানাং চ ভারত" (২৪।১১) অথবা "উদ্গীয়মানং বিপ্রেশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম্" (১১।৫)। তা ছাড়া 'গান' বলতে 'সামগান'-ই বিপ্র অর্থাৎ উদ্গাতারা যজ্ঞশালায় গান করতেন। যেমন,

> 'গানপ্রভাবং সকলে গন্ধর্বাপ্সরসেশ্বরঃ।
>
> অন্যেষাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্ম প্রভাবিতম্॥'(২১।৮)

এখানে টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেছেন,

১। Vide Winternitz: *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 443.

২। Vide *Indian Historical Quaterly*, Vol. VIII, December (1932), No. 4, p. 762.

৩। Vide *A History of Indian Literature*, Vol. I, p. 524.

৪। অনেকে সেজন্যে হরিবংশের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দী বলে নির্দেশ করেন।

'গানং প্রভাসতে যুংগেষ্যতেহসেমেতি গানপ্রভাবং গান্ধর্ব-শাস্ত্রং তথা ব্রহ্মর্ষি বেদে প্রভাবিতং গানং সাধ্যাযম্।'

এ ছাড়া উদ্গানের কথা হরিবংশপর্বেও পাওয়া যায়; যেমন "উদ্গায়নমপ্যগ্রবৃত্ত্যভাবহংপ.গ্র বা পুনঃ।" টীকাকার নীলকণ্ঠ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :"উদ্গায়নমপ্যত্র কর্ত্তব্যং স্বধামন্ত্রেন হোমে * *।" অশ্বগায়নের কথা তুলেও তিনি আবার বলেছেন : "সোমায় * * স্বধা নমঃ ইতি স্বাহাকারেণাগ্নিং পূর্বমিতি উদ্গায়নপদাদেবাত্র * *।" মোটকথা স্বাহা অথবা স্বধা মন্ত্রের সাহায্যে হোমে যে স্বর ও তালযোগে গান করা হ'ত তাকেই 'উদ্গান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। গাথাগানের পরিচয় সম্বন্ধে হরিবংশ আবার হরিবংশপর্বে বলেছে : (১) "তস্য যজ্ঞে পুরা গীতা গাথাঃ প্রীতৈর্দ্বিজৈঃ" (১৯.৬২); (২) "গাথাশ্চাপ্যুশনো-গীতা ইমাঃ শৃণু মহেরিতা" (২১:১১৯); (৩) "ইত্যেতা হ্যুশনোগীতা গাথা ধার্যা বিপশ্চিতা" (২১।১৩৭); (৪) "যস্য যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্বো নারদস্তথা" (৩৩.১৯; (৫) "গীয়মানাস্থ গাথাস্থ দেবসংস্তবাদিষু" (৪৭।৪৬); (৬) "তত্রাসীৎ প্রথিতা গাথা যাদবানাং প্রিয়ঙ্করা" (৩৫।৩১)।

এখানে 'গাথা' বলতে যাগ-যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গান করা বুঝতে হবে; কারণ তা না হলে শিক্ষা ও সঙ্গীতশাস্ত্রে দুই স্বরে গান করাকেও 'গাথা' অথবা গাথিক গান ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' এই শব্দগুলি গান করতে গেলে কেবল ষড়জ-মধ্যম, ষড়জ-পঞ্চম অথবা যে কোন দুটি স্বরের সাহায্যেই গান করার রীতি ছিল। গাথা-গানে দুটি স্বরের অধিক মোটেই ব্যবহার করা হ'ত না। এ ধরণের গাথা অথবা গাথিক গান বৈদিক যুগের গোড়াকার দিকে গাওয়া হ'ত। তখন সঙ্গীতের শৈশব-কালই বলতে হবে; সঙ্গীত আর্চিকের স্তর কাটিয়ে গাথিক যুগে তখন পদার্পণ করেছে মাত্র। গাথিক অথবা এই ধরণের গাথা-গানের পরে আবার সামিক গানের যুগ প্রবর্তিত হয়। সামিক গানে তিনটি স্বরই (সমপা বা নৃসরা) সাধারণতঃ ব্যবহার করা হ'ত। এই সামিক যুগকেই সামগানের যুগ বলা যায়। শিক্ষাগুলিতে ও সামপ্রতি-শাখ্য পুষ্পসূত্রে দেখা যায়, সামগানে তিনটির বেশী স্বরেরও ব্যবহার করার পদ্ধতি ছিল। বেদের এক একটি শাখায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরের ব্যবহার করার কথা আছে এবং সেদিক দিয়ে সামগানে চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরেরও ব্যবহার করার রীতি দেখা যায়। সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ সেজন্যে "সাম্নাং তু ত্রিস্বরত্বং সপ্তস্বরত্বেহপি মন্দ্রাদিস্থানত্রয়-বিবক্ষয়া" কথাগুলির উল্লেখ ক'রে ঐ কথারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামপ্রাতিশাখ্যেও বলা হয়েছে :

"এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি হৃদ্রিষ্ঠানি স্বরেষু তু।
সামানি ষট্সু চান্যানি সপ্তসু যে তু কৌথুমাঃ।"

নারদীশিক্ষাকার নারদও ঋগ্বেদ ও তৈত্তিরীয় সম্প্রদায় এবং সামবেদের সামগানে প্রচলিত স্বরসংখ্যার উল্লেখ করেছেন।[৫] কাজেই একথা ঠিক যে হরিবংশে যে, 'গাথা'-গানের উল্লেখ আছে তাতে নির্দিষ্ট স্বরসংখ্যার কোন উল্লেখ না থাকলেও সেই গাথা-গান ভিন্ন ভিন্ন স্বরে যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় গান করা হ'ত বুঝা যায়।

হরিবংশ-পর্বে আবার ছ'টি গ্রামরাগের কথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন,

"ছালিক্য গেয়ং বহুসন্নিধানং
যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি।
জগ্রাহ বীণামথ নারদস্তু
ষড়্গ্রামরাগাদি সমাধিযুক্তাম্।" (৮৯.৬৭-৬৮)

টীকাকার নীলকণ্ঠও ষড়্গ্রামরাগের বিবরণ দিতে গিয়ে তাই বলেছেন : "ষট্ গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগাণাং তৈর্যঃ সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্রং তদ্বস্তাঃ তাম্। তে চ মধ্যশুদ্ধভিন্ন-গৌড়মিশ্রগীতরূপাঃ।" এই গ্রামরাগের কথা নারদীশিক্ষার ভেতরেও পাওয়া যায়; যেমন "স্বররাগবিশেষেণ গ্রামরাগঃ ইতি স্মৃতাঃ।"[৬] কিন্তু সেখানে গ্রামরাগদের সংখ্যা বা কোন নামেরও মোটেই উল্লেখ নেই। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত দুটি মাত্র গ্রামের নাম করেছেন ও দু' জায়গায় 'রাগ' শব্দেরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গ্রামরাগের কথা কিছুই বলেন নি। ভরতের সমসাময়িক দত্তিলের কথাও তাই। ভরত ও দত্তিল দু'জনেই দুটিমাত্র গ্রামের উল্লেখ ক'রে তাদের জাতি তথা জাতিরাগের (?) কথাই বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীর রাগলক্ষণে ভরতমুনির কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "তথা চাহ ভরতমুনিঃ—'জাতি-সম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানামি' তি।"[৭] মতঙ্গ কাশ্যপের উক্তিও তুলে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই ভরতমুনি বাস্তবিক পক্ষে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতই কি-না এ সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট মতদ্বৈত আছে। কারণ যে নাট্যশাস্ত্র বর্তমানে ছাপা অক্ষরে পাওয়া যায় তার কোথাও 'গ্রামরাগ' শব্দের অথবা মতঙ্গ যে উক্তিটি ভরতের নামে করেছেন তার কোনটিরই উল্লেখ নেই। তবে একথা ঠিক যে, ভরতের নাট্যশাস্ত্র যে আকারে আমরা এখন দেখছি তার অনেক অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই হয় মতঙ্গ ভরতীয় নাট্যশাস্ত্রের সেই লুপ্ত অংশ থেকে এই উক্তি তুলে দেখিয়েছেন, নয় বলা যায় যে, পঞ্চভরতের ভিতর নাট্যশাস্ত্রকার ভরত ছাড়া নন্দী,

৫। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ° ৩১৭-৩১৮ দ্রষ্টব্য।
৬। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ° ৩০৯ দ্রষ্টব্য
৭। বৃহদ্দেশী, পৃ° ৮৭ দ্র°

বৃহ অথবা কোহল প্রভৃতি অন্য কোন ভরতের উক্তিকেই উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন। মতঙ্গ নিজেও গ্রামরাগের কথা স্বীকার ক'রে ও যাষ্টিক ও দুর্গাশক্তি প্রভৃতির মতে গ্রামরাগের কথারও উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ "গ্রামরাগা ময়া সর্বে কথিতা লক্ষণান্বিতাঃ"৮ ব'লে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন ভাষা, বিভাষা প্রভৃতি রাগের কথারও উল্লেখ করেছেন।

সঙ্গীতরত্নাকর প্রণেতা শার্ঙ্গদেবও গ্রামরাগের কথা স্বীকার করেছেন, তবে তাঁর মতে গ্রামরাগের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি: "পঞ্চধা গ্রামরাগাঃ স্যুঃ পঞ্চগীতিসমাশ্রয়াৎ।" এই পাঁচটি গ্রামরাগের নাম শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী—"গীতয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধা চ ভিন্না গৌড়ী চ বেসরা। সাধারণীতি * *।"৯ হরিবংশ-পুরাণে কিন্তু "ষড়্গ্রামরাগাদি" ব'লে ছটি গ্রামরাগের কথাই মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে এবং নীলকণ্ঠও তাদের নাম সম্বন্ধে বলেছেন মধ্য, শুদ্ধ, ভিন্ন, গৌড়, মিশ্র ও গীত। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গের অভিমতে গ্রামরাগ আবার সাতটি ও তাদের নাম শুদ্ধগীতি, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষাগীতি ও বিভাষা, অর্থাৎ "প্রথমা শুদ্ধগীতিঃ স্যাদ্ দ্বিতীয়া ভিন্নকা ভবেৎ। তৃতীয়া গৌড়িকা চৈব রাগগীতিশ্চতুর্থিকা॥ সাধারণী তু বিজ্ঞেয়া গীতজ্ঞৈঃ পঞ্চমী তথা। ভাষাগীতিস্তু ষষ্ঠী স্যাদ্বিভাষা চৈব সপ্তমী॥"১০ মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে কিন্তু যাষ্টিক, শার্দূল ও দুর্গাশক্তির অভিমত এবং সঙ্গে সঙ্গে ভরতের মতে মাগধী, অর্ধমাগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলা এই চারটি গীতির নামোল্লেখও করেছেন। গ্রামরাগ অথবা গীতি-সংখ্যা শার্ঙ্গদেবের মতে পাঁচটি, যষ্টিকের মতে তিনটি ও দুর্গশক্তির মতে মাত্র দুট। কাজেই হরিবংশে উল্লিখিত ছটি গ্রামরাগের উল্লেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সম্প্রদায়-ভেদে গানের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন ছিল একথা পরিষ্কারই জানা যায়। সুতরাং মতঙ্গ ও টীকাকার সিংহভূপাল যে গ্রামরাগের পর্যায়ে ভরতের চারটি গীতির নামোল্লেখ করেছেন তাতে বোঝা যায় যে, যদিও নাট্যশাস্ত্রকার ভরত 'গ্রামরাগ' নামের কোন কথা বলেন নি, তবুও মাগধী প্রভৃতি চারটি গীতির উল্লেখ ক'রে প্রকারান্তরে গ্রামরাগের কথাই স্বীকার করেছেন একথা অন্ততঃ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বিশ্বাস করতেন। গ্রামরাগ দশ রকম রাগের অন্যতম এবং জাতি অথবা জাতিগান থেকেই গ্রামরাগের উৎপত্তি বলতে হবে।

এর পর উল্লেখযোগ্য গ্রামের কথা। হরিবংশে 'গ্রাম' কথার উল্লেখ১১ অতি সামান্যভাবে থাকলেও কোন গ্রামের সংজ্ঞা অথবা সংখ্যার কথা স্পষ্ট ক'রে মোটেই বলা নেই। টীকাকার নীলকণ্ঠই বরং "নিষাদর্ষভগান্ধারষড়্জমধ্যম-ধৈবতাখ্যান্ সপ্তস্বরান্ ব্যাপ্য গ্রামঃ কতিপয়স্বরসঙ্ঘঃ। তে চ ত্রয়ঃ। রাগো বসন্তাদি" কথাগুলি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সে সব কথা ছেড়ে দিলেও হরিবংশকার যখন "আগান্ধারগ্রামরাগং গঙ্গাবতরণং তথা" কথাগুলির উল্লেখ করেছেন তখন নারদীশিক্ষাকার নারদের মত তিনিও যে ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটি গ্রামই স্বীকার করতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ মনীষীদের অভিমতও তাই। মহাভারতেও গান্ধারগ্রামের প্রশংসা আছে। ষ্ট্র্যাঙ্গ্‌ওয়েজও তাই তাঁর *The Music of Hindoostan* বইয়ের পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন:

"The *Harivamsa* (fourth Century A.D.) speaks with enthusiasm of music composed in the *agandharagramaraga*, 'the scale which comes down to *gandhara*', *i.e.* which, if taken upwards, begins on *Ga.*"১২

মহাভারতে গান্ধারগ্রামের কথা ষ্ট্র্যাঙ্গ্‌ওয়েজ ও পপ্‌লেও উল্লেখ করেছেন।১৩ কাজেই একথা ঠিক যে, মহাভারত ও হরিবংশের যুগে গান্ধারগ্রামের প্রচলন লোকসমাজে ছিল। তবে এরকম হতে পারে যে, ব্যবহারে সম্প্রদায়ভেদ ছিল অথবা সমাজ বিশেষে গ্রামগুলিকে ব্যবহার করা হ'ত। কেননা নারদী-শিক্ষায় নারদ গ্রাম তিনটির ব্যবহারে সমাজভেদ দেখিয়ে বলেছেন,

> "ষড়্জমধ্যমগান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
> ভূর্লোকাজ্জায়তে ষড়্জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যম॥
> স্বর্গান্নান্যত্র গান্ধারো নারদস্য মতং যথা।"১৪

অবশ্য এই বিভেদ নারদের নিজের, কেননা 'নারদস্য মতং যথা' ব'লে একথা তিনি স্বীকারই করেছেন। আমাদের মনে হয়, হরিবংশের যুগে পৃথিবীলোক তথা লোকসমাজেও গান্ধারগ্রামের প্রচলন ছিল। স্বর্গলোকে প্রচলনের কথা নারদীকার নারদ যা উল্লেখ করেছেন সেই স্বর্গলোক যে ঠিক কোন্ জায়গায় ছিল তার নির্ধারণও কিন্তু এখনো কিছু হয়

৮। বৃহদ্দেশী, পৃ° ১০৪ দ্র°। তবে একথা ঠিক যে, গ্রামরাগের উল্লেখ থাকলেও রাগলক্ষণ এবং নিয়মিত বিভাগের কোন উল্লেখ নেই।

৯। সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) ২য় ভাগ, পৃ° ৩ দ্র°।

১০। বৃহদ্দেশী, পৃ° ৮২ এবং সঙ্গীতরত্নাকরের সিংহভূপালের টীকা দ্রষ্টব্য (সঙ্গীতরত্নাকর, [Adyar ed.] ২য় ভাগ, পৃ° ৪-৫)।

১১। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৯৬.২৪ দ্র°।

১২। Vide *The Music of Hindoostan*, p. 111.

১৩। Vide *The Music of Hindoostan*, p. 11; এবং *The Music of India*, p. 10.

১৪। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃ° ৩২৯ দ্র°।

নি। পুরাণের যুগেই দেখা যায়, খ্রীষ্টানদের মতে স্বর্গ ও নরকের পার্থক্য সাহিত্য, ইতিহাস ও নাটকের ভিতর বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নরকে দুষ্কর্ম তথা পাপের শাস্তি ও স্বর্গে শান্তি ও আনন্দের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বর্গে গন্ধর্ব-অপ্সরাদের আবার অবাধ গতির কথাও বর্ণনা করা আছে। এই স্বর্গলোক অনেকের মতে বর্তমান কান্দাহার যাকে দক্ষিণ আফগানিস্তান বলা যায়। এই কান্দাহারকেই গন্ধর্ব-লোক ব'লে অনেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই স্বর্গলোক বলতে কান্দাহার অথবা গান্ধার যে কোন একটা জায়গাই হোক না কেন, গন্ধর্বদের প্রিয় গান্ধারগ্রামের প্রচলন যে হরিবংশ ও মহাভারতের যুগেও সঙ্গীতসমাজে প্রচলিত ছিল তা "আগান্ধারগ্রামরাগং" কথাগুলি থেকে অনুমান করতে মোটেই বই পেতে হয় না।

হরিবংশে সঙ্গীতের অন্যান্য অংশ যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের নৃত্য, বাদ্য ও নাট্যের কথারও উল্লেখ আছে। ঘন, সুষির, বেণু, মুরজ, মার্দল, দুন্দুভি এবং বিভিন্ন তন্ত্রীযুক্ত বীণা, রুদ্রবীণা, নান্দি, পটাহ, মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। নাট্য অথবা অভিনয় বিষয়েও দেখা যায়, হরিবংশের সময়ে ভরতীয় নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনই যথাযথ অনুসরণ করা হ'ত। টীকাকার নীলকণ্ঠও সেকথা স্বীকার করেছেন। যেমন বিষ্ণুপর্বের ৮৯ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে,

"মুরজবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্
বরাপ্সরাস্তা জগৃহুঃ প্রতীতাঃ।
আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা
রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতত্ত্বজ্ঞা।
* * *
স্বগীতনৃত্যাভিনয়ৈরুদারৈঃ।"

এখানে নৃত্যকারীদের ভিতর দেখা যায় উর্বশী, হেমা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারাই আছে। তারা নর্তকীপ্রবেশ, বিভিন্ন বাদ্যের সঙ্গে অভিনয়, নৃত্য ও গীত নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ীই সম্পন্ন করত। টীকাকার নীলকণ্ঠও তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: "আসারিতান্ত ইতি। ভরতো মুনিশ্চতুর্বিধমাসারিতং নৃত্যাবিধাবুপদিদেশেতি। প্রথমং নর্তকীপ্রবেশঃ, ততশ্চা-সারিতার্থাভিনয়ঃ নাট্যং, ততস্তালানুগত্যাজাহরণং, ততো দেবতাচিহ্নরূপেণ নৃত্যম্। এবং চতুর্থ প্যাভিসারেবুক্তম্। এবমেব নর্তকীপ্রবেশো ভরতশাস্ত্রমতঃ।" তাই হরিবংশেও উল্লেখ দেখা যায় যে, বীণা ও মুরজযোগে ছটি গ্রামরাগ গাওয়া হচ্ছে, এমন সময় "রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতত্ত্বজ্ঞা"— অভিনয়-সুচতুরা অপ্সরা রম্ভা প্রথমে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে অভিনয় করতে লাগল। তারপর ('তয়াভিনীতে') বিশাল-নেত্রা উর্বশী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে অভিনয় করল ('অথোর্বশী-চারুবিশালনেত্রা')। এইভাবে ক্রমে ক্রমে মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা সকলেই অভিনয় সম্পন্ন করলে। মূর্ছনাযুক্ত গ্রামরাগ নাট্যে সর্বত্রই তখন গাওয়া হ'ত। তবে মূর্ছনা যে সঙ্গীতে তখন কতগুলি ছিল তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই ('স্থানে বিধানান্যথ মূর্ছনাস্থ। ষড়্ গ্রামরাগেষু চ তত্র কার্যং * *)। এই অভিনয়ের প্রসঙ্গে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ে উল্লেখ করে বলেছেন,

"নৃত্যাদপ্রাহিবাদ্যৈস্তৈর্যোজ্যং বাদ্যং তু তাণ্ডবে।
* * *
অনেনৈব বিধানেন প্রবিশন্ত্যপরাঃ পুনঃ।
* * *
ততশ্চাসারিতং ভূয়ো গায়নং তু প্রযোজয়েৎ।
পূর্বেণৈব বিধানেন প্রবিশেচ্চাপি নর্তকী।
গীতকার্যপ্রয়োগশ্চ দ্বিতীয়াসারিতস্য তু।"১৫

রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গিয়ে অনেক জায়গায় হরিবংশেও উল্লেখ আছে (১) 'স দৃষ্ট্বা সর্বনির্মুক্তং প্রেক্ষাগারং নৃপোত্তমঃ' (২৮।৬), (২) "মঞ্চারোহণমুত্তমম্" (২৮।৮), (৩) "প্রেক্ষাগারঃ সকংসসন্ত" (২৯।১৫)।

মোটকথা সঙ্গীত তথা নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং অভিনয়ের কথা হরিবংশ-পুরাণে উল্লেখ থাকলেও পূর্ণাবয়ব সঙ্গীতের কোন পরিচয়ই আমরা সেখানে পাই না। তবে রামায়ণের যুগের চেয়ে মহাভারত ও হরিবংশে সঙ্গীতের রূপ ও সাধন যে অধিকতর উন্নত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই একথাই পরিশেষে স্বীকার করতে হয় যে, রামায়ণকার বাল্মীকির মত হরিবংশ-প্রণেতা অথবা সংগ্রহকার তদানীন্তন সঙ্গীতকলার পরিপূর্ণ মূর্তি রচনা করতে নানা দিক থেকে অনিচ্ছুক ছিলেন, অথবা রাজবংশের পরিচয়, তাঁদের গুণমাধুর্য, কীর্তিকলাপ, যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিচয়কেই আসল মনে ক'রে সামাজিক রূপের পরিচয়দানের সঙ্গে সঙ্গীতকলারও তিনি কথঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন একথাই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

১৫। বিস্তৃত আলোচনা 'নাট্যশাস্ত্র' (কাশী সংস্করণ), পৃঃ ৪৮-৪৯ দ্রঃ।

শিবনাথ জন্মশতবার্ষিকী

(জন্ম ৩১ জানুয়ারী ১৮৪৭—মৃত্যু ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৯)

শ্রীজীবনময় রায়

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মের পর এক শত বৎসর পূর্ণ হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গমাতা হইয়াছিলেন রত্নগর্ভা। এক শতাব্দীর মধ্যে একদেশে এত অধিকসংখ্যক মনীষীর অভ্যুদয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। পরাধীন দেশ না হইলে বোধ হয় এই একটি মাত্র কারণেই বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা ভারতীয় ধর্ম ও সমাজকে পুনর্জ্জীবন দান ও প্রগতিশীল করিতে প্রয়াসী হইয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন শিবনাথ সেই মনীষীদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ। এই শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধারা চোখে পড়িতেছে, যাঁহাদের চিন্তার দুঃসাহস এবং জীবন ও সমাজে তাহাকে প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম—মানসিক শক্তিতে যাঁহারা ছিলেন দুর্দ্দমনীয়। এই ধারায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পরে বিদ্যাসাগরের প্রিয় শিষ্য শিবনাথ। শিবনাথের চরিত্রে ও জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব যেন অজ্ঞাতসারেই আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেইজন্য ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র ও জীবনের সহিত শিবনাথের চরিত্র ও জীবনের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এ কথা সত্য যে শিবনাথ চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে মহৎ জীবনমাত্রেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত এবং নিজ জীবনকে সেই জীবনের আদর্শে গঠিত করিয়া তুলিতে অনুপ্রাণনা দান করিত। এই জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, জননী গোলকমণি, প্রপিতামহ রামজয় তর্কালঙ্কার, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সকলেই তাঁহার চরিত্র ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কিন্তু মহৎ জীবনকে আত্মজীবনে প্রতিভাত করাই শিবনাথের প্রধান সাধনার বিষয় ছিল না। তাঁহার প্রতিভা ছিল বিচিত্রমুখী ও বেগবান; তাঁহার প্রতিভা ছিল সৃজনশীল ও প্রাণবন্ত। তাঁহার এই স্বাভাবিক উচ্চস্তরের প্রতিভা অনায়াসে সংসারে তাঁহাকে প্রভূত সম্পদ ও শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারিত। কিন্তু সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের মোহ ও কাঞ্চনের লালসাকে, ধর্ম্মসাধনা, ধর্ম্মপ্রচার ও মানবের সেবায় তিনি লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সাংসারিক সম্পদ এই দুই কূল সযত্নে ও সুকৌশলে রক্ষা করিতে চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাঁহার অন্তরের আদর্শকে জগতে বাস্তবে পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার সাধনায় তিনি ভোগ, সুখ, প্রতিষ্ঠা ও জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছিলেন।

"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক, থাকে থাক ধন প্রাণ মান রে
পিতারে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান রে।"

অতএব "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

শিবনাথের নিকট এই উক্তি ফাঁকা কবিত্বের বিলাস মাত্র ছিল না। জীবনের প্রতিরক্তবিন্দু ক্ষয় করিয়া শিবনাথ এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি কর্ম্মে প্রবল ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কঠিন শাসনে "মনের কান মলিয়া" দিয়া পদে পদে তাঁহাকে সংযমের পথে, ত্যাগের পথে, দুরূহ সাধনার দুশ্চর পথে পরিচালিত করিয়াছেন। নিজের প্রতি মমার্দ্র করুণায়, অজুহাত অন্বেষণ করিয়া নিজেকে কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইতে দেন নাই; সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, ও সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, অশেষ দুঃখ ও চরম দারিদ্র্যকে তিনি অনায়াসে হাসিমুখে পদে পদে বরণ করিয়া চলিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে এই জন্যই তাঁহার জীবন, সাধারণের—মানুষের পক্ষে অনুকরণীয়। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হইয়াই নিজের সকল বাসনা কামনা উচ্চাশা এবং ভোগলিপ্সা সমস্তই ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কঠিন সংগ্রামে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এইজন্য আদর্শ হিসাবে, অনুকরণীয় জীবন হিসাবে, শিবনাথের চরিত্র আমাদের নিকট অনুশীলনযোগ্য এবং জীবনসংগ্রামের পথে সহায় হইবার পক্ষে অনুকূল। এইখানেই তাঁহার জীবনের প্রকৃত বিশেষত্ব।

বংশপরিচয়

দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর বাৎস্য গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ-বংশে শিবনাথের জন্ম হয়। পিতা পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম ইংরাজের অধীনে পণ্ডিতী কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে নিন্দাভাজন হন। মাতামহ, সুবিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতা, হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় কবি ঈশ্বরগুপ্তের বন্ধু ছিলেন এবং "প্রভাকর" পত্রিকা পরিচালনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং পরে সেই কলেজেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা সুপরিচিত ছিল। শিবনাথের মাতা গোলকমণি দেবী, যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, ধর্ম্মনিষ্ঠাও তেমনি তাঁহার প্রবল ছিল। এই সকল পরিচয় সংক্ষেপে হইলেও

এইজন্য দিলাম যে শিবনাথ উত্তরকালে যে সকল মহৎগুণের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার উৎস কোথায় তাহার সন্ধান মিলিবে। পিতা হরানন্দ ও মাতামহ হরচন্দ্র বড় সুরসিক মানুষ ছিলেন। শিবনাথ ঐ গুণটি পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন গুরুগম্ভীর আবহাওয়ায় বাস করিয়াও সে হাস্য-কৌতুকরস তাঁহার কখনও শুষ্ক হয় নাই। পিতার নিকট আর একটি গুণের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন—সেটি হইল প্রচণ্ড সংকল্পের দৃঢ়তা। শিশুকাল হইতেই এই গুণটি তাঁহার চরিত্রে দেখা দিয়াছিল। এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শৈশবের সহিত শিবনাথের একটা সাদৃশ্য আছে। একটি ঘটনা বলিলেই ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। শিবনাথ লিখিয়াছেন,"আমাদের বাড়ীতে শালগ্রাম, শিব, পঞ্চানন প্রভৃতি পৈতৃক ঠাকুর ছিলেন। প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন তাঁহাদের অগ্রে নিবেদন না করিয়া কাহারও আহার করিবার অধিকার ছিল না। আমার তখন ৪।৫ বৎসর বয়স। কে যে আমার মাথায় এ সংকল্প ঢুকাইয়াছিল, বলিতে পারি না; আমার দৃঢ়সঙ্কল্প পণ ছিল, ঠাকুরদের নিবেদিত অন্ন আহার করিব না। এজন্য বাবার ও মার হাতে গুরুতর প্রহার সহ্য করিতাম, তবুও নিজের জেদ ছাড়িতাম না।"

পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রপিতামহ রামজয় তর্কালঙ্কার ও তাঁহার মাতা গোলকমণি হইতে। রামজয় নিত্য পূজা-আহ্নিক শেষ করিয়া জপে বসিতেন এবং জপ ও ধ্যান শেষ হইলে শিবনাথের ডাক পড়িত। শিবনাথ বলিয়াছেন, "আমি তখন দিগম্বর মূর্ত্তি বালক। মা আমাকে খেলার ভিতর হইতে ধরিয়া আনিতেন। অমনি দুই জনে হাতে হাত দিয়া নৃত্য আরম্ভ হইত। রোজ একই গান করিতেন মনে আছে—

দুর্গা দুর্গা বল ভাই
দুর্গা বই আর গতি নাই।

এই সাধু সিদ্ধপুরুষের স্মৃতি আমাদের পরিবারে জীবন্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইতেছে।" আরও লিখিয়াছেন, "প্রপিতামহদেব আমার মাতার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন। তিনি (জননী) সমগ্র জীবনে ঐ সকল উপদেশ হইতে একপদও বিচলিত হন নাই। ধর্মসাধন তাঁহার প্রতিদিনের কার্য্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া নিত্য পূজা করিতেন। খাবার অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না।"

জন্ম ও শৈশব

বাংলা ১২৫৩ সাল, ১৯শে মাঘ, মাতুলালয় হরিনাভি গ্রামে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাতামহীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র দুই মাস তখন তাঁহাকে লইয়া তাঁহার জননী তাঁহাদের নিজ বাসগ্রাম মজিলপুরে আসেন। মজিলপুরে আসিয়া রক্তভেদবমি রোগে শিবনাথের জীবনান্ত হইবার উপক্রম হয়। অতি কষ্টে প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু দেহ জলের মত রুগ্ন হইয়া "হাত পা ছিন্ন পড়িয়া গেল।" দেহের এই বৈকল্য ও দুর্ব্বলতা তাঁহার জীবনে শত বিঘ্ন উপস্থিত করিলেও প্রচণ্ড মানসিক বল ও সঙ্কল্পের অপরাজেয় দৃঢ়তায় তিনি জীবনের সকল বাধা জয় করিয়া সার্থক হইয়াছিলেন।

শিশুকালের দুই জনের কথা আমরণ তাঁহার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া ছিল। প্রথম জন তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী উন্মাদিনী। শিবনাথ লিখিয়াছেন, "আমার ছয় বৎসর বয়সে আমার ভগ্নী উন্মাদিনীর জন্ম হয়। উন্মাদিনীকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। সর্ব্বদাই কাঁধে করিয়া বেড়াইতাম; কোথাও কিছু ভাল ফল বা ফুল পাইলে তাহার জন্য আনিতাম। মা সন্ধ্যার সময় আমাদের দুই ভাইবোনকে খাওয়াইয়া দিতেন; আমরা দুই জনে গিয়া শয়ন করিতাম। আমার কল্পনাশক্তি শৈশব হইতেই প্রবল ছিল; কত যে গল্প বানাইয়া উন্মাদিনীকে শুনাইতাম, এখন মনে হইলে হাসি পায়।"

এই উন্মাদিনী এক গ্রীষ্মের ছুটিতে মারা যায়, শিবনাথের বয়স তখন বার বৎসর। মৃত্যুকালে উন্মাদিনীর চক্ষে যে জলধারা বহিয়াছিল তাহা আমৃত্যু তিনি ভুলিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় জন তাঁহাদের বাড়ীর এক দাসী। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই দেখিলাম চিন্তাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা। আমরা তাহাকে দাসী বলিয়া মনে করিতাম না, চিন্তাদিদি বলিয়া ডাকিতাম। চিন্তা সকল কর্ম্মেই পটু ছিল। বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত; জাল, পোলো প্রভৃতি লইয়া গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী খাল হইতে মাছ ধরিয়া আনিত; গো-দোহন করিত, বাজার হাট করিত, ধান ভানিত; সর্ব্বোপরি আমাদের প্রতি কেহ কোন অত্যাচার করিলে বাঘিনীর ন্যায় তাহার ঘাড়ে গিয়া পড়িত।"

এই চিন্তাদিদির মাতৃস্নেহ জীবনে কোন দিন তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

পিতা ও মাতা

শিবনাথের পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তৎকালীন প্রগতিশীল সমাজসেবকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতামত একটু উদারভাবাপন্ন ছিল। তিনি শিবনাথের মাতাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এখন আমাদের পক্ষে ধারণা করা কঠিন যে এই বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানো ব্যাপারে কতখানি দৃঢ়চিত্ততা ও বীর্য্যের আবশ্যক ছিল। শাস্ত্রীমহাশয় পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় ভর্ত্তি হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে পড়াইয়া দিতেন বলিয়া পাঠশালার অন্যান্য বালকেরা পড়ায় তাঁহাকে

কাটিয়া উঠিতে পারিত না। শিবনাথের উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া গুরুমহাশয় এক দিন অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোকে কে পড়া বলে দেয় রে?" শিবনাথের মা তাঁহাকে পড়া বলিয়া দেন শুনিয়া গুরুমহাশয় একেবারে হতবাক্ হইয়া গেলেন। এই সময় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দেশে অনেকগুলি আদর্শ বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়। এইরূপ একটি স্কুলে শিবনাথকে পাঠশালা ছাড়াইয়া আনিয়া ভর্ত্তি করা হইল। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষার অনেক পাঠ মিত্রাক্ষর ও কবিতার মত ছিল, সেগুলি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। ঐ শিশুবয়সেই শিবনাথ বর্ণ মিলাইয়া মুখে মুখে কবিতা করিতে পারিতেন।

এই সময়েই বাংলাদেশের গ্রামে নূতন সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। হরিদাস দত্ত নামে একজন যুবকের উৎসাহে ও চেষ্টায় এবং গ্রামের জমিদারের অর্থানুকুল্যে মজিলপুর গ্রামে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইল। ইঁহাদেরই উৎসাহে "মজিলপুর পত্রিকা" নামে একখানি কাগজও বাহির হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্রজনাথ দত্ত নামে গ্রামের মধ্যবিত্ত এক ভদ্রলোক গ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষদের লইয়া জ্ঞানানুশীলন করিতেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি গ্রাহক ছিলেন এবং তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবকৃষ্ণ দত্ত গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে সচেষ্ট হন ও গ্রামের নানাবিধ উন্নতি বিষয়ে মহা উৎসাহে কাজ করিতে থাকেন। ১৮৫৯ সালে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া মাত্রই শিবনাথের মাতা শিবনাথের ভগিনীদিগকে তাহাতে প্রেরণ করিলেন। জমিদার বাবুরা বাড়ীতে বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে 'যে মেয়ে পাঠাইবে তাকে একঘরে করব' বলিয়া শাসাইয়া দিলেন। সকলেই মেয়ে পাঠানো বন্ধ করিলেন, কেবল শিবনাথের মাতাপিতার দৃঢ়চিত্ততার গুণে তাঁহার দুই ভগ্নীকে লইয়াই পণ্ডিত মহাশয় স্কুল চালাইতে লাগিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক দোষ গুণ আমার পিতাতে ছিল।" তিনি ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গেলেন; বলিলেন, "কি এত বড় স্পর্দ্ধার কথা? আমার ছেলেমেয়ে পড়াব কিনা, তার হুকুম ওরা দিবে?" ব্রাহ্মদের প্রতি অত্যাচারের জন্য ব্রাহ্মণের ন্যায়ধর্ম্মী চিত্ত তাঁহাদের পক্ষপাতী হইল ও তিনি প্রকাশ্যেই তাঁহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শিবনাথের আকৃষ্ট হওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ হইয়াছিল। অথচ কৌতুকের কথা এই যে, কলিকাতায় শিবনাথ যখন সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে ব্রতী হইলেন এবং বহু চেষ্টায়ও পিতা তাঁহাকে ফিরাইতে না পারিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন; মাতা তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওগো, তোমার মুখ এত ম্লান কেন, ছেলে কেমন আছে?" পিতা সংক্ষেপে গভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "সে মরেছে।"

জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা

যাহা হউক, স্কুলে শিবনাথ পাঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল পড়াশুনা লইয়া বা কেবল সাধারণ খেলা খেলিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। ছোটবেলা হইতে জীবজন্তু ও পাখী পোষা এবং তাহাদের হাবভাব আহার-বিহার পর্য্যবেক্ষণ করা, তাঁহার প্রায় একটা নেশার মত ছিল। এমন কি পিপীলিকার গতিবিধি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিবার চেষ্টায় তাহাদের সহিত হামাগুড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। নানা রকমের পাখী, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পুষিয়া তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার যেন আশ আর মিটিত না। পথে একদিন একটি নূতন পাখী দেখিয়া তিনি তাহার গতিবিধি দেখিতে দেখিতে রাস্তায় দাঁড়াইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। ওদিকে গোলবন্দী সাহেবের হাতী আসিতেছে। পাড়ার লোকে চেঁচাইতেছে—"মলি মলি, পালা পালা।" তাঁহার সেদিকে খেয়াল নাই। কানে একটা চীৎকার প্রবেশ করিতেছে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ চেতনা হইতেছে না। এমন সময় হঠাৎ দেখেন হাতী শুঁড় দিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। হাতীর শুঁড় দেখিয়া তখন ভয়ে চীৎকার করিয়া তিনি সরিয়া গেলেন। এমনি তন্ময়তা ছিল তাঁহার সকল বিষয়েই। তিনি লিখিয়াছেন, "একমনে কাজ করিতে থাকিলে, পশ্চাৎ হইতে ডাকিলে আমি শুনিতে পাইতাম না। বাবার বিশ্বাস জন্মিল যে আমি কালা হইয়া যাইতেছি। এই ভাবিয়া বাবা আমাকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের আউট-ডোরে লইয়া গেলেন। তখন ডাঃ গুডীভ চক্রবর্ত্তী আউট-ডোরে বসিতেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এ ছেলে ত কালা নয়।'"

শেয়ালের মুখ হইতে বাচ্চা বেলায় রক্ষা করিয়া পালন করিয়াছিলেন বলিয়া কুকুরের নাম দিয়াছিলেন "শেয়ালখাকী"। এই শেয়ালখাকী ছিল ছেলেদের খেলায় একজন বিশিষ্ট সঙ্গী। সকল খেলাতেই সে তাঁহাদের সঙ্গী হইত। চড়ুইভাতি করিতে যাইবেন শেয়ালখাকী সঙ্গে সঙ্গে আছে। আহারান্তে যখন লুকোচুরি খেলা হইত সেও তাঁহাদের সহিত সমানে বনের মধ্যে লুকাইয়া বসিয়া থাকিত এবং শিবনাথের দলের সকলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিত। প্রতিবেশীদের পুরাতন দালানে ঢুকিয়া পায়রা ধরিতে হইবে, দলবল গিয়া সেখানে জুটিয়াছে। কিন্তু একটা বড় মুশকিল হইয়াছে। ঘর পুরাতন। দরজা জানলা ভাঙিয়া এত গর্ত্ত হইয়াছে যে সেগুলি বন্ধ করিবার জন্য অনেকগুলি ছেলেকে ঘরে ঢুকিয়া গর্ত্তে পিঠ দিয়া দাঁড়াইতে হইতেছে। চৌকাঠের কাছে একটা গর্ত্তের জন্য আর লোক পাওয়া যাইতেছে না। এমন সময় দেখা গেল, শেয়ালখাকী আসিয়া উপস্থিত। বাস্ সকলে নিশ্চিন্ত। শেয়ালখাকীকে বলা হইল "এই গর্ত্তের মধ্যে লেজ দিয়ে বসে থাক, দেখিস যেন এ যায়গা থেকে নড়িস্ না।" শেয়ালখাকী প্রস্তুত হইয়া বসিল। ভাবিতে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে শেয়ালখাকী

বালকদের কথা বুঝিত কি করিয়া। খেলার সমস্ত কৌতুক ও রসটুকু বালকদের সঙ্গে সে যেন সমানে উপভোগ করিত।

আর একদিনের কথা শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"শেয়ালখাকী রাখালের সঙ্গে আমাদের বুধীগরুকে লইয়া মাঠে যাইত। কি কারণে যেন রাখালকে বিদায় করা হইয়াছিল। বুধী ঘরে বাঁধা পড়িল, তাহাকে চরায় কে? বাবাকে বলিলাম, 'বাবা, শেয়ালখাকীকে দিলে সে গরু চ'রিয়ে আনতে পারে।' বাবা শুনিয়া হাসিলেন, 'ছাঃ, কুকুরে আবার গরু চরাবে।' কিন্তু সত্যই শেয়ালখাকী গরু লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল গরু আর আসে না। বাবা ও মা চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল যে একা শেয়ালখাকী মহা চীৎকার করিতে করিতে আসিতেছে। সঙ্গে গরু নাই। আসিয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া চীৎকার করে, একটু দৌড়িয়া যায় আবার দাঁড়ায়, আবার নিকটে ছুটিয়া আসে, মুখের দিকে চায়, ডাকে, আবার দৌড়িয়া যায়, আবার দাঁড়ায়। তখন আমরা গিয়া দেখি, একজনেরা আমাদের গরু বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা শেয়ালখাকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—'ওরে, কুকুরটা আবার এসেছে; নিজে মার খেয়ে গিয়ে বাড়ীর লোক ডেকে এনেছে'।"

জীবজন্তুর প্রতি এই ভালবাসা ও আগ্রহ তাঁহার রচিত প্রত্যেক উপন্যাসে একটি বিশেষ কৌতুকমণ্ডিত আনন্দ রসের সৃষ্টি করিয়াছে। কুকুর, বিড়াল, পক্ষী ও শিশুদিগের স্থান তাঁহার উপন্যাসে তুচ্ছ নয়।

কলিকাতা-শিক্ষা

নয় বৎসর বয়সে শিবনাথের উপনয়ন হইল। প্রপিতামহ পিতা নিজের নিকটে লইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যা করাইতে লাগিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই, ১৮৫৬ সালে, পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। নিজের অবস্থা দেখিয়া হরানন্দ বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে যাহার পাণ্ডিত্য থাকিলেও ইংরেজী শিক্ষা না হইলে রাজকার্য্যে সুবিধা হইবে না। তাঁহার নিজের আর কোন কালেই ৩৫ টাকার অধিক হয় নাই। কিন্তু আশানুরূপ ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং তাহা তাঁহার সাধ্যের অতীত হইল। তাহা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সেখানে অধ্যাপক। বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারকানাথের বাসায় প্রায়ই আসিতেন, এবং দুই আঙুল চিম্‌টার মত করিয়া শিবনাথের পেট টিপিতেন। শিবনাথের বুদ্ধিটি কিঞ্চিৎ তাগর ছিল, তাই উক্তরূপ সম্ভাষণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ও আনুকূল্যে শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

মাতুলের বাসায় থাকিয়া শিবনাথের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের অনেকগুলি যুবককে মাতুল প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের কেহ পড়ে, কেহ বা কিছু কাজ করে, কেহ বা নিষ্কর্ম্মা বসিয়া খায়। আর সে কি খাওয়া! কেহ অর্দ্ধসের, কেহ বা তিন পোয়া চালের ভাত খাইতেন। আত্মীয়-সম্পর্কশূন্য এক পাল জোয়ানমর্দ্দের মধ্যে পড়িয়া নয় বৎসরের বালকের যে কি অবস্থা হইল, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। থালা চুরি যাইত বলিয়া মেটে পাথরের থালা এক একখানি করিয়া সকলকে দেওয়া হইত এবং প্রত্যেককে নিজের নিজের থালা মাজিতে হইত। তাঁহার ভাগ্যে অতিরিক্তও জুটিত।

এই বয়স্ক গ্রাম্য মণ্ডলীটির প্রভাব স্বাস্থ্যকর ছিল না। তাহাদের অজস্র আলোচনার মুখে পড়িয়া বালক শিবনাথের অনিষ্ট হইতেছিল। এই বালককালে একপাল বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের দলে বাস করিয়া, তাসনমাজা, বাজার করা প্রভৃতিতে ফরমাস খাটিয়া খাটিয়া, সকলের মন রক্ষা করিয়া চলিতে শিবনাথের পাঠের ব্যাঘাত ত করিতই উপরন্তু নানা কু-অভ্যাসও তাহারা শিখাইত। কেবল তাঁহার অনন্যসাধারণ নিবিষ্ট-চিত্ততা ও পাঠে তন্ময়তার জন্যই তাঁহার পাঠচর্চ্চা কতকটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। এই সময় তাঁহার তের বৎসর মাত্র বয়স। এই অল্প বয়সে উক্তরূপ সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহার স্বাভাবিক ও নির্ভীক সত্যপরায়ণতা কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এ সম্বন্ধে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর কাউয়েল সাহেব তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজে একটি দাঙ্গা হয়। সকলেই সে দাঙ্গায় যুক্ত ছিল। শিবনাথও ছিলেন। কাউয়েল সাহেব সকলকে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে দাঙ্গায় ছিলে, উঠিয়া দাঁড়াও।" শিবনাথ চারিদিকে চাহিয়া দেখেন কেহই দাঁড়াইতেছে না। ইতিমধ্যে সাহেব আবার বলিলেন, "তবে কি আমি বুঝিব, তোমরা কেহই দাঙ্গায় যাও নাই?" শিবনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব বলিলেন, "তুমি সত্য বলিয়াছ বলিয়া আমি তোমায় মার্জ্জনা করিলাম।" দ্বিতীয় ঘটনাটি এই। বাসার বড় বড় ছেলেরা তামাক খাইত এবং শিবনাথকে টানিতে শিখাইত। এক দিন দ্বারকানাথ (তিনি নিজে তামাক খাইতেন না) শিবনাথের গায়ে তামাকের গন্ধ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই তামাক খাস?" শিবনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ।" এবং যতবার যেভাবে তামাক খাইয়া থাকেন তাহাও বলিলেন। দ্বারকানাথের মত গুরুগম্ভীর রাশভারি সংযত অভিভাবকের নিকট এ কথা স্বীকার করা যে বালকের পক্ষে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই বার তের বছর বয়সেই শিবনাথের প্রথম বিবাহ হয়। পত্নী প্রসন্নময়ীর যখন এক মাস বয়স ও শিবনাথের বয়স দুই বৎসর, তখন এই বিবাহ স্থির হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই পিতা বদলী হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন ও শিবনাথ মাতুলের বাসায় গিয়া থাকিতে আরম্ভ

করেন। রোজ দেখিতেন বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিয়া তাঁহার মাতুলের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। পরামর্শের ফলে ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ কাগজ বাহির হইল। ছাপাখানার জন্য অনেক লোক বাসায় থাকিতে লাগিল। বাসা হরিঘোষের গোয়াল হইল। হৈ-হাই গোলমাল সমস্ত দিন ও রাত্রি ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত। তাহার ভিতরে তিনি বয়সে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, তাঁহার খাওয়া-দাওয়াই বা কে দেখে, পড়াশুনার প্রতিই বা কে দৃষ্টি রাখে! সেই পুরুষের দলে পড়িয়া রাঁধেন, বাসন মাজেন এবং কোনপ্রকারে নিজের পড়াশুনা করেন। এইভাবে কিছুকাল গেল।

তাহার পরে এ বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। শিবনাথ দু'দিন ইহার বাড়ী দু'দিন উহার বাড়ী করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এক দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিলেন। তিনি কম্পোজিটারের কাজ করিতেন এবং একখানি গোল পাতার ঘরে বাদুড়বাগানে বাস করিতেন। এইখানে শিবনাথকে দুই বেলা রান্না, বাসন মাজা, ঝাড়ু দেওয়া, বাজার করা, জল তোলা—সমুদয় কাজ করিতে হইত। বাম হস্তে পাঠ্যপুস্তক ও দক্ষিণ হস্তে ভাতের কাটি লইয়া কি কষ্টে যে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল, এখনকার ছাত্রগণ তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য মিল দেখিতে পাই।

অবশেষে এই সশ্রম কারাদণ্ড হইতে শিবনাথ মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া ভবানীপুরে মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাটী রাখিয়া আসিলেন। মহেশ চৌধুরী মহাশয় সাধু ও সদাশয় প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। তাঁহারা সপরিবারে সকলেই এরূপ সজ্জন ও মুক্তপ্রাণ মানুষ ছিলেন যে শিবনাথকে তাঁহারা একেবারে একজন ঘরের লোক করিয়া লইলেন। এখানে শিবনাথের পড়াশুনার বিশেষ সুবিধা হওয়ায় তাঁহার মনে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল।

১৮৬২ সালে তিনি ভবানীপুরে যান। বাসার নিকটেই ছিল ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য অঘোরনাথ পাকড়াশি প্রভৃতির উপদেশ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের Destiny of Human Life বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

বালকের তেজস্বিতা

এই চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে থাকিতে থাকিতে শিবনাথের জীবনে এক ঘটনা ঘটে, যে ঘটনায় বালক শিবনাথের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

একবার শিবনাথের পিতা শিবনাথকে একখানি সরকারী কাগজ দিয়া স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেবের আপিসে পাঠান। তখনকার দিনে সাহেবের আপিসে যাইতে এমনিই লোকে ভয়ে মরিত। ছিন্ন চটি জুতা ও মলিন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র বালক শিবনাথ, কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপিসে যাইয়া প্রবেশ করিতেই উড্রো সাহেব উগ্র স্বরে বলিলেন, "তুমি আপিসের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?"

শি—এ ঘরে ঢুকিতে যে জুতা খুলিতে হয় জানিতাম না। তাহা হইলে এ ঘরে ঢুকিতাম না।

উড্—তুমি জুতা পরিয়া এ ঘরে ঢুকিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। জুতা খুলিয়া এস।

শি—না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অসম্মান করিলাম বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি; আপনারা যদি খোলেন, তবে আমি খুলিতে পারি।

উড্—তুমি জুতা খুলিবে কিনা বল।

শি—না সাহেব, খুলিব না।

ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সোমপ্রকাশে' এই ঘটনা কলমা সাহেব ও চটিজুতা নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল। বালক শিবনাথের জীবনের এই ঘটনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রৌঢ় বয়সের ঘটনার সহিত আশ্চর্য্য মেলে।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ

ঐ অল্প বয়সেই শিবনাথ মধ্যে মধ্যে 'সোমপ্রকাশে' ও 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা লিখিতেন। এইসূত্রে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক সুবিখ্যাত প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি এই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও সুরাপান নিবারণী সভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া সুরাপানের উপর শিবনাথের দারুণ বিদ্বেষ জন্মিল।

মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই ১৮৬৬ সালে উনিশ বৎসর বয়সে শিবনাথের প্রথম কাব্য "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" প্রকাশিত হয়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ 'সোমপ্রকাশে' কবিতা বাহির হয় আর লোকে পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বলিতে থাকে "এ 'শ্রীশিঃ' লোকটা কে হে?" শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমার লাঙ্গুল স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। নিজের মনে মনে মস্ত একটা কবি হইয়া দাঁড়াইলাম।" বাস্তবিক তাঁহার কবিতার মধ্যে একটু নূতনত্ব ছিল। ইহাতে ঈশ্বর গুপ্তের বাঁধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোলা অমিত্রাক্ষর ছিল না। দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহা তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্ত্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের বশবর্ত্তী করা হইয়াছিল। ইহা বড় সামান্য কথা নহে। প্রধানত এইজন্য ইহা তখন সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, ইহার মধ্যে আরও একটু সারবত্ব ছিল। নিছক ছন্দের চাতুর্য্য

মানুষের হৃদয়কে তেমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে না, যেমন করে, যে-কবিতা হৃদয়ের দুয়ারে ঘাইয়া ঘা দিয়া বলে—"ওগো আমি তোমার মনের কথা।" মন কাড়িয়া লইবার মত সেই সুমিষ্ট আবেদন শিবনাথের কবিতায় ছিল; তাই আসরে নামিয়া হৃদয় জয় করিয়া লইতে তাঁহার মুহূর্তও বিলম্ব হয় নাই। তবে ইহাও সত্য যে, ছন্দ ও ভাষাই ভাবের সংবাহন। তাহা বচ্ছন্দ ও সুভাষিত না হইলে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করে না। তাঁহার এই সকল নব আবিষ্কৃত ছন্দ গিরিনির্ঝরিণীর মত সাবলীল, বচ্ছন্দ ও বেগবান; তাঁহার কবিতার ভাষা অকৃত্রিম, আয়াসহীন, সরল ও সতেজ—তাহা সোজা প্রাণে যাইয়া আঘাত করে। কাব্যখানি কিশোর বয়সের কাঁচা লেখা হইলেও, ইহার বিশিষ্টতা এই যে ইহার মধ্যে তখনকার কবিদের নকলনবীশী ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ মৌলিক। ইহাই নির্ব্বাসিতের বিলাপের শ্রেষ্ঠ গৌরব।

ঐ অল্প বয়সেই তাঁহার কবিখ্যাতি বাংলা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। কবি নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম কবিতা শাস্ত্রী মহাশয় কাটিয়া ছুটিয়া তাহাতে নিজে কিছু যোগ করিয়া প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের এডুকেশন গেজেটে ছাপিতে দিয়া আসেন। সেই পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই তাহা নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়বার বিবাহ ও মানসিক প্রতিক্রিয়া

এই ১৮৬৬ সালেই, শিবনাথের পাঠ্য অবস্থায়, শিবনাথের পত্নী ও শ্বশুরগৃহের লোকের প্রতি রাগ করিয়া, শাস্ত্রী মহাশয়ের আপত্তির প্রতি দৃকপাত মাত্র না করিয়া, তাঁহার পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় জোর করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ দেন।

শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই বিবাহের পর মনে দারুণ অনুতাপ হইল। একটি নিরপরাধা স্ত্রীলোককে গুরুতর সাজা দেওয়া হইল; সেই অন্যায় কার্য্যের প্রধান পুরুষ হইলাম আমি। আমার হাস্যপরিহাস কোথায় উবিয়া গেল। আমি ঘন বিষাদে নিমগ্ন হইলাম। রাত্রি আসিলে মনে হইত, আর প্রভাত না হইলে ভাল হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম। ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনার অভ্যাস ছিল না। এই মানসিক গ্লানির অবস্থায় তাহা করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রার্থনা করিতে করিতে দুর্ব্বলতার বল আসিল। মনে সংকল্প করিলাম 'কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক, থাকে থাক ধন প্রাণ মান রে।' ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ও উপাসনাতে যাইতে আরম্ভ করিলাম।"

"বল ও আশা পাইয়া আমি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চলিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলাম। বাড়ীতে গেলাম। সেবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গেলাম যে আর ঠাকুরপূজা করিব না।" ইহাতে তাঁহার পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া লাঠি হস্তে তাঁহাকে মারিতে চলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় পিতাকে ধীর ভাবে বলিলেন—"কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন। আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।"

হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হওয়ায় অর্থ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ভাববিলাসিতা বা বস্তুহীন ভাবুকতা ছিল না। তাঁহার চিত্ত সমস্ত প্রকার প্রেয়কে ও প্রলোভনকে কঠিন বলে সংযত করিয়া শ্রেয়ের মধ্যে চিত্তকে আবদ্ধ করিল। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার সুফল ফলিতে লাগিল। এমন কি কলেজে প্রথম হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেকেণ্ড গ্রেড বৃত্তি পাইয়া পাস করিলেন। এই সময়, ১৮৬৮ সালেই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম সন্তান হেমলতা দেবীর জন্ম হয়।

সমাজ-সংস্কারের আরম্ভ

ক্রমেই তাঁহার মত ও বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে জীবনে কঠিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সে সংগ্রাম যেমন কল্পনাতীত দুরূহ তেমনি বীরত্বের ও দৃঢ় সংকল্পের ইতিহাসে পূর্ণ। শিশু বয়স হইতেই শিবনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেলা এবং মাত্র বিশ বৎসর বয়সে ১৮৬৮ সালে তরুণ শিবনাথ, পাঠ্যাবস্থাতেই সমাজ-সংস্কারের গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন। বিপত্নীক বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বন্ধু ঈশান রায়ের ভগ্নী রাজলক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। শিবনাথের নিকট সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন এবং বিবাহের সমুদয় ব্যয়ভার তিনিই বহন করিলেন।

বিবাহের পর যোগেন্দ্রনাথ স্বজনগণকর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতিত হইতে লাগিলেন এবং আত্মীয়গণ স্বভাবতই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। তখন ঘটক শিবনাথ নিজের স্কলারশিপের টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। নবদম্পতিকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি তাঁহাদের সহিত গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। শিবনাথের পিতা ইহাতে স্বভাবতই যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। এই বিপদে একমাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিয়াছিলেন।

এদিকে যোগেন্দ্রের মাতা কলিকাতায় আসিয়া পুত্রকে আটক করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় শিবনাথকে সমগ্র সংসারটি চালানোর জন্য অর্থোপার্জ্জন, জল তোলা, বাজার করা সবই একাকী করিতে হইত। নিজের পড়াশুনা শিকায় উঠিল এবং ঐ বয়সে এতবড় একটা গুরু দায়িত্বের চিন্তাভারে তাঁহার দেহমনের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল।

ইহার উপর তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর প্রতি যে অন্যায় করা

হইয়াছে তাহাও তাঁহাকে পীড়িত করিতে ছিল কম নয়। রিফরমার হইবার নেশাও তিন বন্ধুকে এমনি পাইয়া বসিয়াছিল যে এক সময় এমন পরামর্শও হইয়াছিল যে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর আবার বিবাহ দিবেন।

যাহাই হউক, ইহারই মধ্যে আবার বন্ধু উপেন্দ্রনাথ দাসকে বিধবা বিবাহ করাইলেন। এই বিবাহে কন্যার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সাহায্যে কন্যাকে চুরি করিয়া আনিয়া বিবাহ দিতে হইল। এক প্রকার খিচুড়ী বিবাহ হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জীবনে এই প্রথম জনের সামনে উপাসনা করিলেন। গিয়া শোনেন বিবাহ সভায় গান হইতেছে—"মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর, অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।" যিনি গান করিতেছিলেন ব্রহ্মসঙ্গীত বলিতে ঐ একটি বই আর গান জানিতেন না; তাহাই গাহিতেছিলেন। গানটি রামমোহন রায়ের। এই সকল কর্মে পড়াশুনার দফা একেবারে মাথায় উঠিয়াছিল। কলেজে অনুপস্থিত থাকিয়া দেশোদ্ধার ও সমাজ-সংস্কার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইংরেজের কবল হইতে মুক্ত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উপায়-স্বরূপ কত অদ্ভুত কল্পনাই যে তাঁহার মাথায় আসিত তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সকল বিষয়ে গুরুতর পরিশ্রম করিতে করিতে ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস আসিয়া পড়িল। তখন ডিসেম্বরের গোড়ায় পরীক্ষা হইত। পড়াশুনা একেবারেই হয় নাই দেখিয়া কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় শিবনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আগামী বারের পরীক্ষাতে কলেজের মুখ রাখবে বলে আশা করেছিলাম, কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে পাস হও কিনা।" নেশার ঘোরে চলিতে চলিতে একটা ধাক্কা খাইয়া শিবনাথ যেন চমকিয়া দেখিলেন সম্মুখে গভীর খাদ। পাস হইবেন না? স্কলারশিপ না পাইলে যে তাঁহার চলিবেই না। যোগেন ও রাজলক্ষ্মী যে না খাইয়া মরিবে। তখন "ঈশ্বর রাখ; এই বিপদে রাখ" বলিয়া একান্ত মনে ডাকিতে ডাকিতে মনে অসীম বল পাইতে লাগিলেন এবং এক মুহূর্তের মধ্যে কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। শিবনাথ লিখিয়াছেন, "তখন দিনের মধ্যে বহুবার প্রার্থনা করিতাম। লোকে যেমন শ্রমের মধ্যে বার বার চা খাইয়া সবল হয়, আমি তেমনি বার বার প্রার্থনা করিয়া সবল হইতাম।" যোগেন ও মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া মহেশ চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আড়াই মাসের জন্য একটা ঘর চাহিয়া লইলেন। দৃঢ় সংকল্প করিয়া, সেই ঘরের মধ্যে পাঠে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেন। দিনে ১৮ ঘণ্টা খাটিয়া এবং মাত্র ৬ ঘণ্টা কাল আহার স্নান নিদ্রা ও অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে ব্যয় করিয়া ফার্ষ্ট গ্রেড স্কলারশিপ ৩২৲, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য ১০৲ এবং নিজের কলেজে প্রথম হওয়ার দরুণ ১২৲, সর্ব্বসমেত ৫৯৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। কিন্তু যাহার জন্য এই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ করিলেন, সেই মহালক্ষ্মী ১৮৬৯ সালের প্রথম দিকে মারা গেলেন। শিবনাথ বড়ই আঘাত পাইলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান

১৮৬৭ সাল পর্য্যন্ত শিবনাথের আকর্ষণ আদিব্রাহ্ম-সমাজের দিকেই ছিল। তাঁহার জ্যাঠামহাশয় হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন আদিসমাজের আচার্য্য ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক। মাতুল দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর মহাশয়প্রভৃতি, যাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আদিসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র-পরিচালিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণকে শিবনাথ তাঁহাদের মতই একটু বিরাগের চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ১৮৬৮ সালে, ১২৭৫-এর ১১ই মাঘ তিনি আদিব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবে যোগদান করিয়া যখন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন তখন কেশবচন্দ্রের দলের নগর-কীর্ত্তনের একখানি কাগজ তাঁহার হাতে পড়িল। তাহাতে ছিল—

"তোরা আয়রে ভাই,
এতদিনে দুখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি, নাহি জাত-বিচার।" ইত্যাদি।

এই আহ্বানধ্বনি তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শ তাঁহার নিকট ধরিল তাহাতে তাঁহার মনে এতদিন যে সমস্যা গুরুভার হইয়া চাপিয়াছিল তাহার একটা চমৎকার সমাধান পাইলেন। প্রাণ তাঁহার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে উৎসবের পর যে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন; কলুটোলায় কেশবচন্দ্রের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহপাঠী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দেখিলেন। গোঁসাইজী "কি ভাই!" বলিয়া আসিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ধরিলেন এবং ঐ দলে তাঁহাকে যেন একেবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যায় কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা হইল। বিষয়, Regenerating Faith; শুনিয়া শিবনাথ মুগ্ধ হইয়া গেলেন। "ধর্ম্মবিশ্বাস যদি নবজীবন না আনিয়া দিল, তবে তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসই নয়, এই সত্য তাঁহার প্রাণে আধ্যাত্মিক জীবনের একটা নূতন দ্বার খুলিয়া দিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদলের প্রতি তাঁহার চিত্ত আরও আকৃষ্ট হইল।

১২৭৬ সনের ৬ই ভাদ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন শাস্ত্রী মহাশয়, কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, রজনী নাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রভৃতি একুশ জন যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তখন উপবীত ত্যাগ লইয়া তাঁহার এক বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বৈদিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের এক মাত্র পুত্র; দরিদ্র পিতামাতার আশা ও অবলম্বন, দেশাচার

লোকাচারের বিরুদ্ধে এইরূপ বিদ্রোহ তখনকার দিনে এ দেশে এক অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বনাশের ব্যাপার—এমন দুরন্ত কদাচারের কল্পনাও কেহ কখনও করে নাই। চতুর্দ্দিকে সকলেই বজ্রাহত হইয়া উঠিল। মা কাঁদিতে কাঁদিতে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার গলায় উপবীত পরাইয়া দিলেন, পিতা ক্রোধান্ধ হইয়া "এমন পুত্রের মৃত্যুই কাম্য" এই বলিয়া দরিদ্র পরিবারকে উপবাসী রাখিয়া ২০।২৫৲ টাকা খরচ করিয়া শুভ্‌ স্বস্ত্যয়ন করিলেন। কি করি, কি করি এমনি একটা অস্থিরতায় শিবনাথের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এই যন্ত্রণার মধ্যে (শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন) "অবশেষে অনন্যগতি হইয়া ঈশ্বরচরণে পড়িলাম; আপনার বিচার ও কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলাম, প্রার্থনাতে বার বার বলিতে লাগিলাম—"তুমি আমাকে লইয়া যাহা হয় কর। কি আশ্চর্য্য! এত যে ভয় বিভীষিকা, কোথায় যেন পলাইয়া গেল। আমার মনে অভূতপূর্ব্ব বল ও উৎসাহ আসিল।"

বিষাদবাদী ও আনন্দবাদী দল

১৮৬৬ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা "Jesus Christ—Asia and Europe" কলিকাতায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিক্রিয়া, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। ব্রাহ্ম অগ্রসর দলের একটি অংশে ইহার প্রতিক্রিয়ায় এক বিষাদবাদী মণ্ডলী গঠিত হইল। খ্রীষ্টীয় অনুতাপশীলতা ও পাপবোধে তাঁহারা অনুতাপ, ক্রন্দন, হাস্য-পরিহাস ত্যাগ, এবং নিজেকে পাপী বোধে হা হুতাশ ইত্যাদি করিয়া সমাজে তা'র একটা আলোড়ন উপস্থিত করিলেন। আর একদল ব্রাহ্ম বলিতে লাগিলেন, "এত অনুতাপ ও ক্রন্দন কেন? প্রেমময় ও আনন্দময়ের গৃহে এত ক্রন্দনের রোল কেন?" এই দুই দলকে "বিষাদবাদী" ও "আনন্দবাদী" দল বলিয়া লোকে উল্লেখ করিত। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন এই আনন্দবাদী দলের নেতা। শিশিরকুমার নিজে চমৎকার কীর্ত্তন করিতেন। বিষাদবাদীগণের বিপরীত ভাবের যে সকল কীর্ত্তন তাঁহাদের দলে হইত, তাহার ভাব অতি সুন্দর ছিল।

"তোমার রাগে রাঙা নয়ন জলে বহে দেখি অশ্রুধার।"

"যার মা আনন্দময়ী তার কেন নিরানন্দ?"—ইত্যাদি।

১২৭৮ সালের ১৪ই আষাঢ় তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রিয়নাথ জন্মগ্রহণ করেন।

স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলন

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গ মঞ্চভূমিতে নারীহিতৈষী পত্র "অবলা-বান্ধব" অবতীর্ণ হইল। ইহার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তাজা তাজা নির্ভীক বাণী শিবনাথের প্রাণে গিয়া ঘা দিল। কিছুদিন পরে "অবলা-বান্ধব" লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় বরিশাল হইতে দুর্গামোহন দাস মহাশয়ও কলিকাতায় আসিলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল।

শিবনাথ, দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রভৃতি কয়েকজন প্রগতিশীল ব্রাহ্মদিগের সহিত স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয় লইয়া কেশবচন্দ্র প্রমুখ পুরাতনপন্থী ব্রাহ্মদের সংঘর্ষ হইতে লাগিল। বিখ্যাত বাগ্মী ও রামমোহন জীবনীর লেখক যুক্তিবাদী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও এই অগ্রসর দলে ছিলেন। সংঘর্ষ ক্রমেই মতান্তর হইতে মনান্তরে গিয়া পৌঁছিতেছিল। কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহার সহিত এক পরিবারের মত হইয়া যাঁহারা ভারত-আশ্রমে থাকিতেন, এক এক করিয়া তাঁহারা বিদায় লইতে লাগিলেন।

কর্ম্মজীবন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১৮৭২ সালে শিবনাথ এম-এ পাস করেন। মাতুল দ্বারকানাথের আশা ছিল যে, তিনি শিবনাথকে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভার দিয়া যাইবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। এদিকে নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের কাজে অর্পণ করিবেন বলিয়া কেশবচন্দ্রের বয়-মহিলা বিদ্যালয়ের ভার শিবনাথ লইয়াছিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই কাজ সুচারুরূপে চালিত করাতে ব্রহ্মানন্দ ঐ বিদ্যালয় বিষয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এখন শিবনাথ সমস্যায় পড়িলেন। একদিকে মাতুল দ্বারকানাথ, যিনি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিত্তে ধর্ম্মনীতি ও চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য, আর একদিকে কেশবচন্দ্র (যাঁহার প্রতি শিবনাথের প্রীতি, ভক্তি ও নির্ভর প্রগাঢ়) ও জীবনের নূতন নির্ব্বাচিত পথ। কোন্‌ দিকে যান। শেষে তখনকার মত মাতুলের সাহায্যে যাওয়াই স্থির করিলেন। অবশ্য ব্রহ্মানন্দ ক্ষুণ্ণ হইলেন; শিবনাথ হরিনাভি মাতুলের স্কুলে হেডমাষ্টার হইয়া গেলেন।

হরিনাভি যাইয়া মহাকার্য্যের আবর্ত্তনের মধ্যে পড়িলেন। ম্যালেরিয়ায় স্কুলটি প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছিল। সুতরাং হেডমাষ্টারের মাহিনা ১০০৲ টাকা হইতে স্কুলে ৪০৲।৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে হইত। স্কুলে 'জুতা সেলাই হইতে চণ্ডী পাঠ' পর্য্যন্ত সবই করিতে হইত। আবার 'সোম প্রকাশে'র ভারও অধিকাংশই তাঁহার উপর পড়িল। দেশে আসাতে মাতুলের বিষয় সংক্রান্ত বহু কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত। তাহার উপর তাঁহার চির দুর্ব্বল দেহে ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, লিভারে প্লাষ্টার লাগাইয়া ঐ সকল কার্য্য সমুদয় চালাইয়া যাইতেন। তাহার উপর মিউনিসিপ্যালিটি, লাইব্রেরী, গ্রাম সংস্কার প্রভৃতি শত রকমের কাজ ছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনী আলোচনা করিলে মনে

হয় যে ঐ শরীরে এত নিরন্তর খাটুনী সহ্য হইত কি করিয়া। একেবারে কেন ভাঙিয়া পড়িত না। তিনি যেন একটা রবারের কীট্ ব্যাগ—যত কাজ ঠাসা যাক না কেন কিছুতেই যেন তাহা ফাটিয়া যায় না। বস্তুত, ইহার পর হইতে তাঁহার জীবন বিশ্রামবিহীন কর্মের ঘূর্ণাচক্র ও অকুণ্ঠিত অজস্র আত্মদানের ইতিহাস মাত্র। তাহার প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি মহত্ত্বের ও ঈশ্বরানুরাগের রসে অভিষিক্ত। কোন্‌টি বলিব এবং কোনটি বাদ দিব তাহার দিশা পাওয়াই যায় না। পরার্থে উৎসর্গীকৃত এই জীবনের মূল ধারাটি ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার আত্মচরিত পাঠ করিলে জীবনে অভিনব চমৎকার একটা বস্তুর আস্বাদন পাইলাম বলিয়া পাঠকের মনে হওয়া অনিবার্য্য। কি সাহিত্যের দিক দিয়া, কি সরসতার দিক দিয়া এরূপ বই বাংলা-সাহিত্যে একান্ত বিরল। শাস্ত্রী মহাশয় আর অন্য কোনো জিনিষ না লিখিয়া কেবল যদি এই একখানি মাত্র গ্রন্থ রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেই সাহিত্যজগতে তাঁহার নাম অক্ষয় হইয়া থাকিত।

শিবনাথ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মানন্দের সহিত মতান্তর হওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, গুরুচরণ মহলানবীশ প্রভৃতি মিলিয়া যে-কেশবকে তাঁহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া (১২৮৫, ২রা জ্যৈষ্ঠ) নূতন সমাজ গঠন করিলেন। ১৮৭৯ (বাংলা ১২৮৬) সালের মাঘোৎসবের সময় ভূমি ক্রয় করিয়া নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। নাম রাখা হইয়াছিল "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" এবং নিয়মাবলী সাধারণ নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে ভিত্তি করিয়া প্রস্তুত হইল। এবং এই কথাটি নিয়মাবলী প্রণয়নের সময় সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা রহিল যে এখানে সভ্যগণের ও সমাজসমূহের মত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা হইবে। এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মসমাজের একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এই প্রথম সাধারণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইল। ইহার পর, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা "ভারত সভা," যাহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বীজ-স্বরূপ বলা যায়, প্রায় এই সময়েই শিবনাথ, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহারও নিয়মাবলী ঐ একই সাধারণতন্ত্র অনুসারে প্রস্তুত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বলিতে কি, ভারত সভা ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন যমজ সহোদরের মত জন্মগ্রহণ করিল। একই লোক দুই দিকে, একই ভাবে উভয়ের কার্য্য চলিয়াছিল।" এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সিটি স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোনো প্রতিকৃতি রক্ষিত হয় নাই এবং তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষেও সেই প্রতিষ্ঠাতাকে স্মরণ করা হয় নাই। আশা করি এ বিচ্যুতি তাঁহারা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সাংবাদিক শিবনাথ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যেন কাজের ঝড়ের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এতগুলি বিরাট কর্মের মধ্যে যুক্ত হইয়া এবং সেগুলিকে কৃতকার্য্য করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজস্র লেখা লিখিয়াছেন। একই কালে তিনি বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের কোনো কোনোটিতে অধিকাংশ লেখাই তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছে। সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয় লিখিয়াছেন, "আজকালকার সম্পাদক ও লেখকগণের নিকট ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লেখক বিনা পারিশ্রমিকে এতগুলি সংবাদপত্রে বিভিন্ন বিষয়ে এত প্রবন্ধ দিতে পারিয়াছেন।" এইখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বেই শিবনাথ গভর্ণমেণ্টের চাকুরী ছাড়িয়া ঘোর দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়া কায়মনে তাঁহার কর্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন।

যত সংবাদপত্রে তিনি লিখিয়াছেন এবং যত সংবাদপত্র তিনি পরিচালনা করিয়াছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইতে হয়। ১৮৭০ সালে "সুলভ সমাচারে" তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। মদ না গরল (ঐ সময়) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৪ সাল হইতে "সোমপ্রকাশে" ও "এডুকেশন গেজেটে" তিনি লেখা শুরু করেন এবং ১৮৭৩ সালে কিছুকাল সোমপ্রকাশের সম্পাদকতা করেন। "সমদর্শী"র সম্পাদক হন ১৮৭৪ সালে; তিনি "সমালোচক" নামক বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার (১৮৮৩) ও তত্ত্বকৌমুদী কাগজের সম্পাদকতা বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন, বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন, "মুকুল" (বালকবালিকাদিগের মাসিকপত্র ১২৯৫ হইতে সম্পাদক) "সখা" প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক ও লেখক রূপে এ সকল কাগজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। "বঙ্গবাসী" পত্রের উদ্যোক্তাগণের মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন এবং বহু লেখা তাহাতে লিখিয়াছেন। তাহা ছাড়া সমসাময়িক নানা পত্রে লিখিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ ইত্যাদিতেও তিনি লিখিতেন।

সাহিত্য

শিশুকাল হইতেই মুখে মুখে অক্ষর মিলাইতে শিবনাথের ভারি ভাল লাগিত। তাহার উপর মাতামহের মধ্য দিয়া ঈশ্বর গুপ্তের কিছু প্রভাব বালক কবির উপর পড়িয়াছিল।

ব্যঙ্গ-কবিতা দিয়া তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ক্লাসে ঐ অল্প বয়সে তাঁহার কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্লাসের একটি স্থূলকায় অহংকারী ধনী-পুত্রের নামে

চাদর চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গদাধর হাতী,
বড় তার অহংকার ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।

ইত্যাদি এক দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া তাহাকে বড়ই নাকাল করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের বেগে তাঁহার খাতা ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

এই কবিতাটি পাঠ করিলে রবীন্দ্রনাথের বালক বয়সের

"আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে,
হাপুসহুপুস শব্দ চারি দিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।"

মনে পড়ে। আশ্চর্য্য এই যে, দুই জনেই দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রভাবেই ঘটিয়াছিল।

১৮৬৪ সাল হইতেই কিশোর শিবনাথের লেখা "এডুকেশন গেজেটে" এবং "সোমপ্রকাশে" প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন তাঁহার অধিকাংশ লেখাই ব্যঙ্গাত্মক ছিল। কিন্তু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় উভয়েই এই কিশোর কবির মধ্যে ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আভাস দেখিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সালে এফ-এ ক্লাসের ছাত্র শিবনাথের প্রথম কাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ' বাহির হইয়াই বাংলাদেশের হৃদয় জয় করিল। ইহা কৈশোরের রচনা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে তৎকালীন প্রতিষ্ঠাপন্ন কবিদের নকলনবীশী ছিল না। নবীন ছন্দে, ও নিজস্ব মৌলিক রস পরিবেশনের জন্য ইহা বিশিষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। বইখানি পরে কয়েক বৎসর এফ-এ ক্লাসের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে তাঁহার পুষ্পমালা প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কবিখ্যাতির মধ্যগগনে প্রকাশিত এবং ভাস্বর করিল। তাহার পর তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ' প্রকাশিত হইল ১৮৭৯ সালে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। "প্রথম কাব্য 'নির্ব্বাসিতের বিলাপে'র মত শিবনাথের প্রথম উপন্যাস 'মেজ বৌ' খুবই সমাদর লাভ করিয়াছিল। পর বৎসরই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। তখনকার দিনের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার চরম test ছিল উপসংহার রচনা।...শিবনাথের মেজ বৌ-এরও 'উপসংহার' হইল—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'শান্তি মঠ'।" ইহার পর পরে পরে তিন খণ্ড কবিতার বই বাহির হইল। 'হিমাদ্রিকুসুম' ১৮৮৭, 'পুষ্পাঞ্জলি' (কবিতাসংগ্রহ) ১৮৮৭ এবং 'ছায়াময়ীর পরিণয়' ১৮৮৯ সালে। ইহার মধ্যে ছায়াময়ীর পরিণয়খানি বাংলায় যে দুইখানি রূপক কাব্য নাম করিবার মত আছে তাহার একখানি। ছায়াময়ীর পরিণয়ের একটি বিশেষত্ব আছে। এই রূপক কাব্যখানি আগাগোড়া লোকসাহিত্যের চলিত ছন্দে, চলিত ভাষায়, জনসাধারণের পক্ষে সম্ভোগযোগ্য করিয়া রচিত। বিষয়ের অনুরূপ এই ছন্দ নির্ব্বাচনে শিবনাথের কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতা প্রমাণিত হইতেছে। ইহার সুমিষ্টতা ও directness বাংলা ছড়ার একান্ত নিজস্ব বস্তু এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের বিশেষত্ব। শিবনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'যুগান্তর' (১৮৯৫) সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি তুলিয়া দিলেই বুঝা যাইবে যে উপন্যাসখানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচককে কি ভাবে বিচলিত করিয়াছিল। সমালোচনাটি বাহির হয় ১৩০১ চৈত্রের 'সাধনা'য়। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"যাহারা বালি ধুইয়া হীরা বাহির করে, তাহারা অনেককাল বিস্তর বালি ঘাঁটিয়া এক-টুকরা হীরার সন্ধান পায়। গ্রন্থ-সমালোচকের ভাগ্যেও হীরা সহজে মেলে না, সেইজন্য বহুকাল বিস্তর নীরস এবং নিস্ফল পরিশ্রমের পর যেদিন একখানা যথার্থ গ্রন্থ হাতে আসে সেদিন আনন্দবেগে গ্রন্থকারকে মনুমেন্টের উপর তুলিয়া দিয়া জয়জয়কার করিতে ইচ্ছা করে। ...এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।" ইত্যাদি অতি সুদীর্ঘ সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া উপন্যাসটির দোষগুণ নির্ণয় করিয়াছেন এবং সর্ব্বশুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া লেখক যে তাঁহার "সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী-কল্পনাশক্তিদ্বারা আমাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন" প্রাণ ভরিয়া এই কথা স্বীকার করিয়া যেন তাঁহার আনন্দ-সম্ভোগের ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

১৮৯৯ সালে তাঁহার উপন্যাস 'নয়নতারা' প্রকাশিত হয়। এখানিও খুব সমাদর লাভ করে। শিবনাথের সাহিত্য-প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া যে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, "হায় কি পরিতাপ! এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ ঘানিতে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল" তাহা কিছু মাত্র অত্যুক্তি নহে। শিবনাথ যে কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন তাহা তাঁহার এই সকল উচ্চশ্রেণীর লেখা কি অবস্থায় বাহির হইয়াছে তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভীষ্ম যেমন অর্জ্জুনের নিরন্তর বাণবৃষ্টির মধ্যে সামান্যতম অবকাশ খুঁজিয়া আপনার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতেন শাস্ত্রী মহাশয় তেমনি অজস্র কর্ম্মের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও সামান্যতম অবসর পাইয়াই এই সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

সর্ব্বশেষভিক্রমে তাঁহার রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" বাংলা ভাষায় জীবনী রচনার এক আশ্চর্য্য গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির সহিত অনেকেই পরিচিত

আছেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক বৎসর ইহাকে বি-এর পাঠ্য রাখিয়াছিলেন—আবার কেনই যে তাহা বন্ধ করিয়াছেন তাহাও জানি না। এই পুস্তকখানি যে ভাবার সত্তের পরিচ্ছন্নতায় বঙ্গসাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ শুধু তাহা নয়; ইহার রচনাকৌশলই সম্পূর্ণ অভিনব। জীবনী-গ্রন্থ রচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণালীর সমন্বয়ের এই কলাকৌশল ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ভাষায় কেহ অবলম্বন করেন নাই। ১৯১৩ সালে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিতে যাইয়া সার রোপার লেথব্রিজ উক্তরূপ মত প্রকাশ করেন। সেই কারণে জীবনী-সাহিত্যে ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বটে; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে ইহা চিরকাল পাঠ্য থাকা উচিত এমন কথা বলি না। পাঠ্য এইজন্য থাকা উচিত যে, আমাদের পরবর্তী যুগের যুবকবৃন্দ, আধুনিক বঙ্গদেশ গঠনের জন্য যে সকল মনীষী আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাঁহাদের ইতিহাস এবং মহত্ত্ব এই গ্রন্থ হইতে সুসম্বদ্ধ আকারে লাভ করিবে। এই গ্রন্থে অতি চমৎকার ভাবে উপন্যাসের মত চিত্তহারী এবং ইতিহাসের মত সুবিশুদ্ধ করিয়া সেকালের মনীষীদের জাজ্বল্যমান চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠ্যরূপে যুবকদিগের মধ্যে প্রভূত কল্যাণসাধন করিতে পারে এইজন্যই ইহা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত থাকা উচিত। এই লেখাটির মধ্যে, ইতিহাস ও তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ, মানবের প্রতি শিবনাথের গভীর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিপূর্ণ গুণগ্রাহী চিত্তটি সহজ আনন্দে আপনার চিত্তকমলের সহস্রদল মেলিয়া ধরিয়াছে।

১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা।...শিবনাথের সহৃদয়তা এবং কল্পনাদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি দুই-ই ছিল—এইজন্য মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের কষ্টিপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিতেন না।"

কি আশ্চর্য্য তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থখানি। কেবলমাত্র ইহার ভাষা ও বর্ণনভঙ্গীর জন্যই ইহা যে কোনও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের মত উপভোগ্য। এক রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" ব্যতীত এমন চমৎকার মনোমুগ্ধকর জীবনীসাহিত্যও বাংলায় আর নাই। কিন্তু ইহাই এই মহৎজীবনীর একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁহার আত্মচরিতের মত এমন নির্ভীক আত্মবিশ্লেষণ, এমন সুস্পষ্ট দ্বিধাবিহীন স্বীকৃতি বাংলা ভাষায় লেখা আত্মজীবনীতে আর কোথাও আছে বলিয়া জানি না। এই আত্মচরিতখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের ভিতরকার সরল হাস্যোজ্জ্বল, সত্যসন্ধ, নিরভিমানী, স্বচ্ছ মানবাত্মাটিকে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। হরানন্দ, দ্বারকানাথ ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যে স্বাভাবিক সত্যপরায়ণতা তাঁহার স্বভাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট ছিল এই আত্মচরিতে প্রতি ছত্রে ছত্রে তাহা বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার উপদেশাবলী "ধর্ম্মজীবন", "মাঘোৎসবের উপদেশ ও বক্তৃতা" প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের ভাষার ওজস্বিতা ও বর্ণনার আকর্ষণী ক্ষমতা মানুষকে স্বতঃই মুগ্ধ করে এবং একটি বিশ্বাসে দীপ্ত সরস সুন্দর উজ্জ্বল আত্মা পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে ভাস্বর হইয়া উঠে।

বাংলা ভাষায় তাঁহার সমতুল্য বক্তা আমাদের কালে আমরা দেখি নাই। যাঁহারা তাঁহার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা ডিপোর্টেশনের জন্য গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিয়াছেন তাঁহারাই আমার সহিত একমত হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের উৎসব প্রভৃতির উপাসনায় ব্রাহ্ম এবং অব্রাহ্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন সে কথা চিন্তা করিলে এখন আশ্চর্য্য বোধ হয়।

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা

অতি বালক বয়স হইতেই শিবনাথ ভারতের পরাধীনতার বেদনা অনুভব করিতেন—তীব্রভাবে ইহার অপমান তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইত। তরুণ বয়স হইতেই দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়া তিনি পাঠ ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার কবিচিত্ত স্বভাবতই দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ করিয়াছে। এক-এক সময় তাঁহার কবিতা, তাঁহার অন্যান্য লেখা পড়িয়া এই কথাই আমার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার সকল ধর্ম্মপ্রচার ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্তরে অন্তরে একটা স্বাদেশিকতার ফল্গুস্রোত বহিত; তাহাই যেন তাঁহার সকল কর্ম্মের, সকল চেষ্টার মধ্যে প্রেরণা যোগাইত। স্বদেশী যুগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ "ধর্ম্ম ও দেশ" পড়িলেই এ বিষয়ে তাঁহার চিত্তের গভীরতা সহজেই অনুধাবন করা যাইবে। দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যে কথার কথা নয়, নিজেকে কোনপ্রকার আরাম, প্রলোভন, স্বার্থের মধ্যে নিবিষ্ট রাখিলে যে তাহা সুদূরপরাহত হইবে, তাঁহার সমস্ত লেখায় এবং সমস্ত জীবন দিয়া তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন।

১। "ইন্দ্রিয়ের দাস সেবা যার মাস
স্বদেশ উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।"

২। "ওরে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে
আর সে প্রকারে থাকি শুদ্ধাচারে
মৃত স্বাধীনতা ধনে উদ্দেশিয়ে।"

৩। "শিবরাত্রি মত থাক অবিরত
জ্বালিয়ে সলিতা বসে মতজনা;"
"হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।"

শিবনাথ দেশের মুক্তির জন্ত, মানুষের সেবার এমনি করিয়া নিরন্তর "কঠোর সাধনা" করিয়া গিয়াছেন, তিলে তিলে—অকস্মাৎ একটা উচ্ছ্বাসের আবেগে নয়—আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। শিবনাথ-চরিত্রের এইখানেই বিশেষত্ব। তাঁহার সকল কর্মে ও সকল চেষ্টায় অন্তরে অন্তরে একটা দেশপ্রীতির রসস্রোত বহিত এবং তাঁহাকে তাঁহার অজস্র কর্মের মধ্যে অনুপ্রেরণা দান করিত।

হিন্দু মেলায় (১৮৬৮) তরুণ বয়সেই দেশপ্রেমদ্যোতক কবিতা রচনায় জন্য তিনি আহূত হন; এবং এক শত শ্লোক-ব্যাপী এক সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন।

১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী, (ডাক্তার) সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তি গভীর রাত্রে হেয়ার স্কুলের এক নিভৃত কক্ষে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া একটি বটপত্রের উপর প্রতিজ্ঞার সর্ত লিখিয়া আহুতি দান করিতে করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন :—

(১) বিদেশী শাসন বিধাতার অভিপ্রেত নয়…ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

(২) এই শাসনতন্ত্রের অধীনে চাকুরী বা দাসত্ব (স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিকূল বলিয়া) দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইলেও বর্জন করিব।

(৩) সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-বিরোধী জাতিভেদ-প্রথা রহিত করিতে চেষ্টা করিব।

(৪) অর্থ সঞ্চয় করিব না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময় শিবনাথ হেয়ার স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল ছিল দু-একটি দুঃস্থ সংসার; বৃদ্ধ পিতা মাতার তিনিই একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। বন্ধু ও আত্মীয়জন সকলেই তাঁহাকে গবর্মেণ্টের চাকুরী ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন ও মনে বল পাইলেন। তখনই তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন।

ভারত-সভার তিন জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে শিবনাথ এক জন। এবং ইহার জন্ত চাঁদা আদায় প্রভৃতি খাটুনীর কাজ তিনিই করিয়া ইহাকে রূপদান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নয় জনকে ডিপোর্ট করার বিরুদ্ধে যে সভা হয় তাহাতে রাজ-ভয়ে সভাপতিত্ব করিতে শীর্ষস্থানীয় দেশনায়কগণ রাজী হন নাই—পাছে গবর্মেণ্টের কু-দৃষ্টিতে পড়েন। শাস্ত্রী মহাশয় সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নির্ভীক তেজস্বিতার সহিত গবর্মেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করেন।

ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী শিবনাথের বিদ্যুৎ-বর্ষী আবেগময়ী কবিতাগুলি প্রত্যেক বাঙালীর কণ্ঠস্থ ও জীবনে প্রতিভাত করিবার যোগ্য।

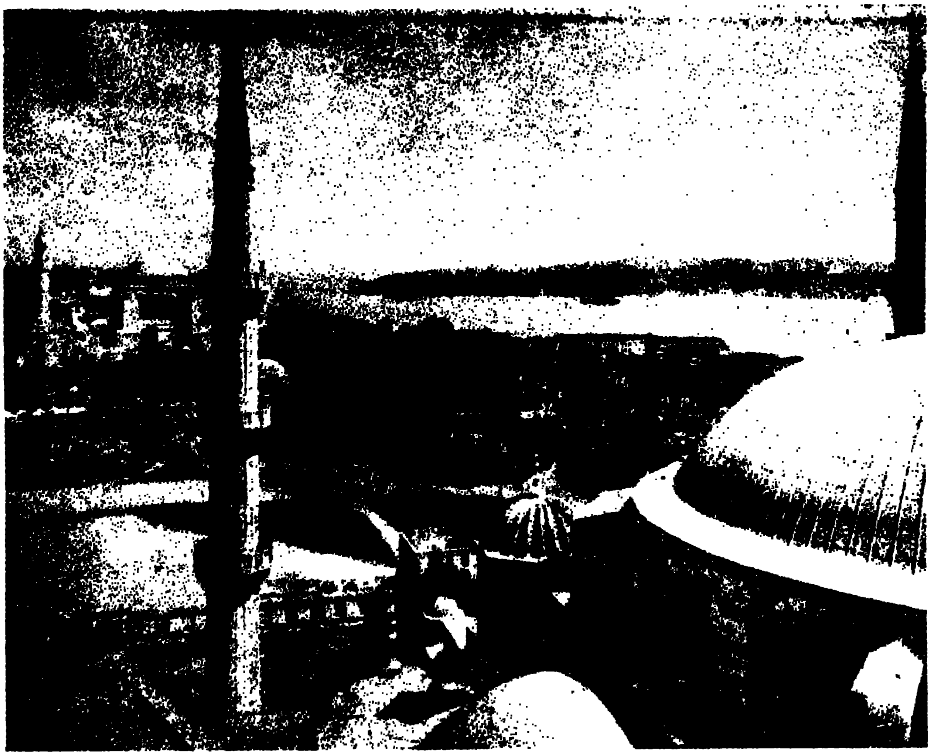
ইংলণ্ড বাসকালে শাস্ত্রী মহাশয় ভারতের অবস্থা ও দাবি জানাইয়া কয়েকটি বক্তৃতা করেন এবং ব্রিষ্টল হইতে রাজা রামমোহন রায়ের মুখের মূর্ত্তি পাগড়ী প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্নগুলি আনিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে দান করেন।

এই সূত্রে মনে হইতেছে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত প্রাণবান সাহিত্যিকের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ও তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিশেষ আয়োজন করা উচিত।

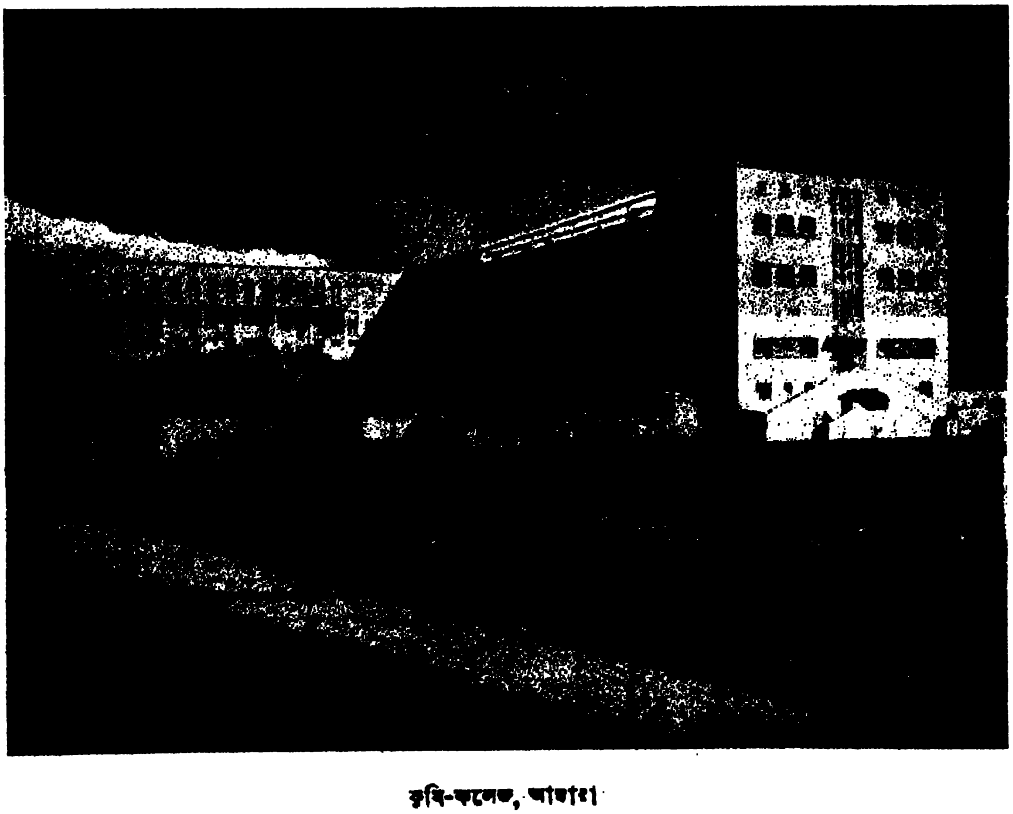
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত বহুমুখী ও বিচিত্র প্রতিভাসম্পন্ন এবং সংখ্যাতীত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সহিত ক্রিয়াশীল ভাবে ঘনিষ্ঠ কর্ম্মীর জীবনের ঐতিহাসিক চিত্র সংক্ষিপ্ত অবকাশের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা দুঃসাধ্য। আমরা এখানে শিবনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

"…তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তমসো মা জ্যোতির্গময়, এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধি-বিচার হইতে পান নাই, ইহা তাঁহার জীবনী শক্তিরই কেন্দ্রনিহিত ছিল, এইজন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা।

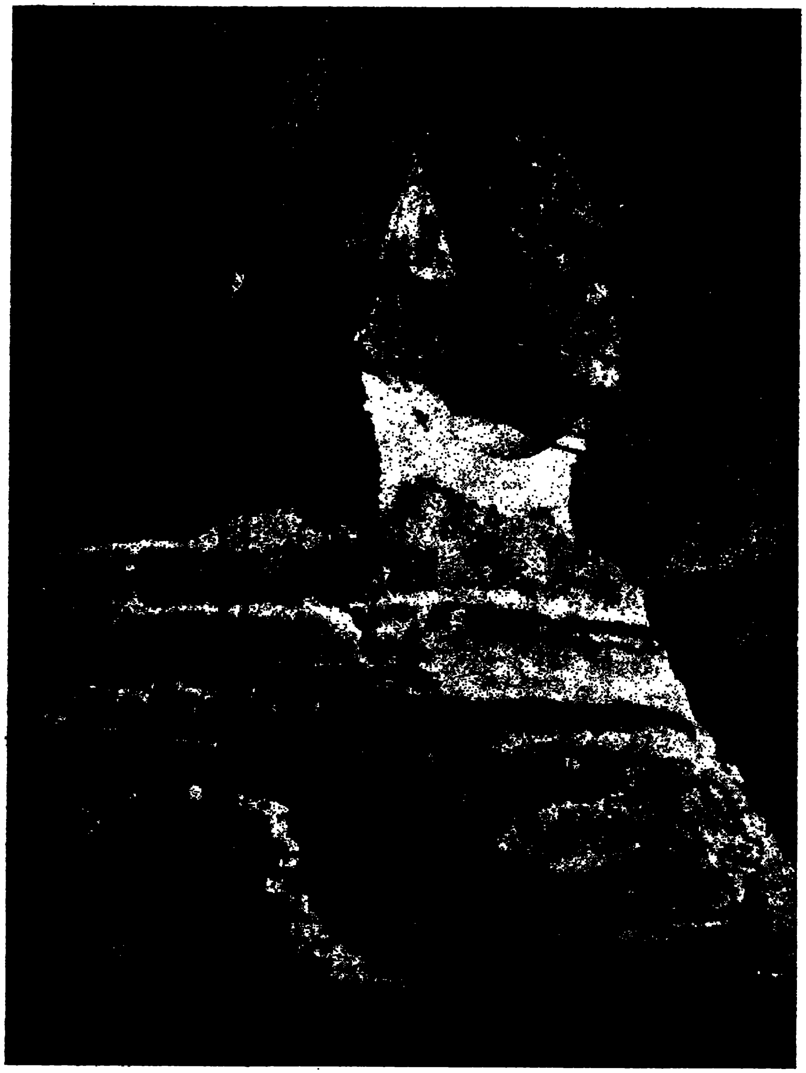
"জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্ম্মসমাজের প্রধান শিক্ষার বিষয়।…যাঁরা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খুঁজিয়া বাহির করে।…প্রাণশক্তি সহজ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিয়াছেন, শিবনাথ তাঁহাদের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাঁহার প্রবল মানববৎসলতা।…অথচ এই তাঁর মানববাৎসল্য প্রবল থাকা সত্ত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে।…মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীরিত।"



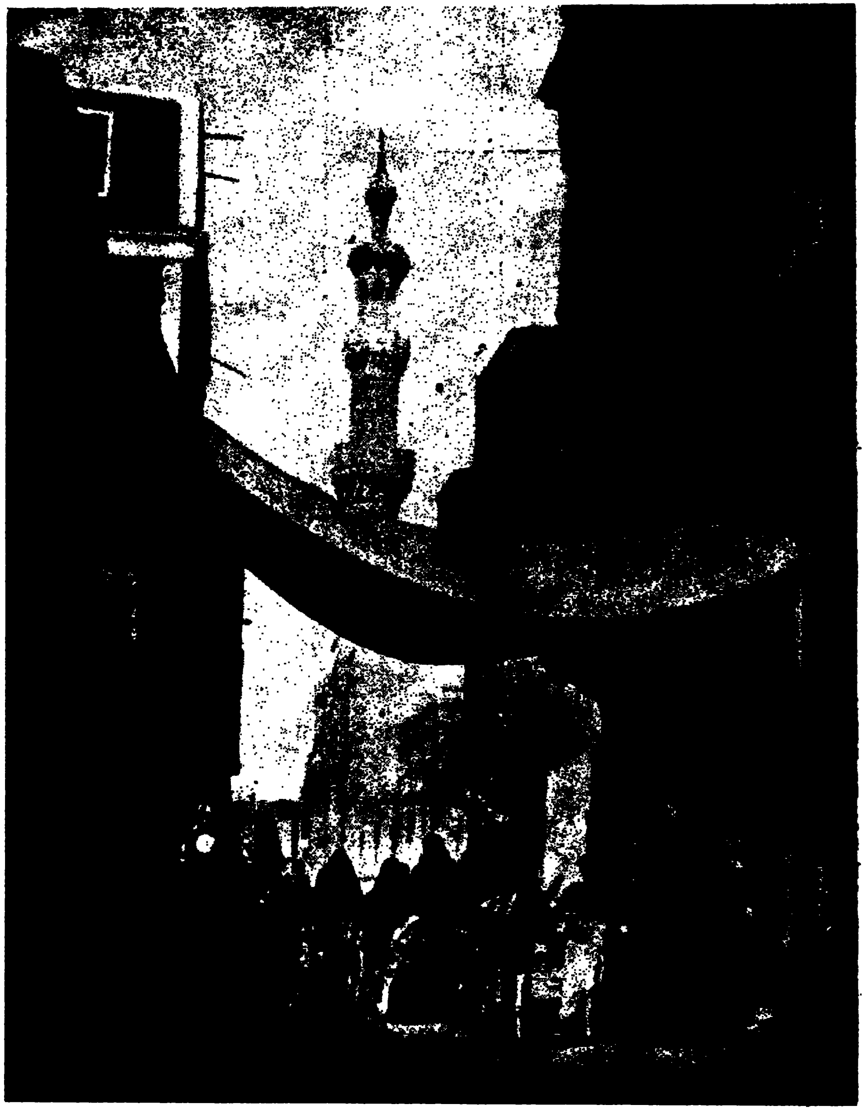
ইস্তাম্বুল, বাঁদিকে সেন্ট সোফিয়া, সম্মুখে সুলতান আহমেদ মসজিদ



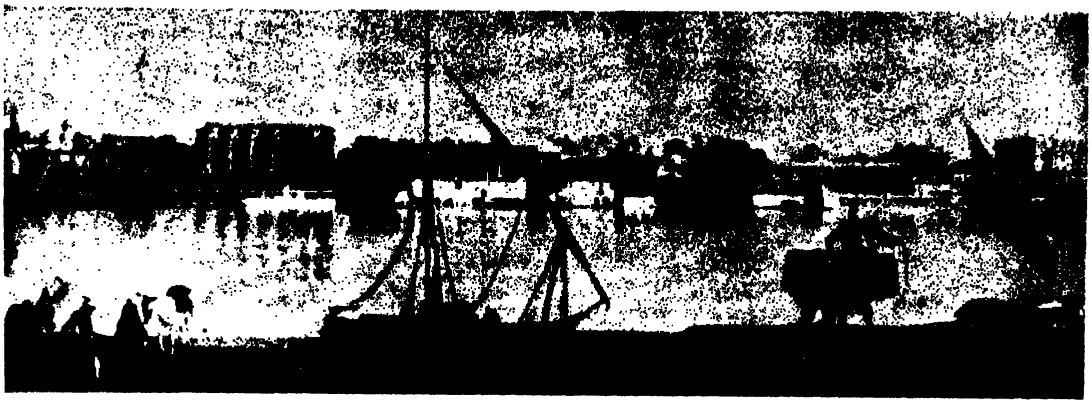
কৃষি-কলেজ, আঙ্কারা



স্ফিংস, কায়রো



কায়রোর একটি দৃশ্য



নীলনদের একটি দৃশ্য

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতা হইতে লণ্ডন

সন ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাস। বঙ্গমাতা দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা-বিধ্বস্তা। তথাপি তাঁহার উদার শারদাকাশে সর্ব্বগ্লানিহারী প্রসন্নতা; শেফালিকাঞ্চলা পদ্ম-পত্র-নয়নার বদনকমলে কাশ-কুসুমের হাসি; আনন্দময়ীর আগমনী গানে বাঙালীর মন সমুৎফুল্ল। দ্রুত-সমাপ্য রাজ-কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি দেশ-দেশান্তরে চলিয়াছি।

১৪ই আশ্বিন, (১লা অক্টোবর ১৯৪৬) মঙ্গলবার। সকাল সোয়া আটটায় (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) দমদম বিমান-ঘাঁটি হইতে বিমান উড়িল, উঠ্তি বিমানের সামনে ও পিছনে দমদম শহরটি সুন্দর দেখাইতেছিল। গৃহরাজি যেন শ্যামল-বৃক্ষ-মধ্যবর্ত্তী। নারিকেল-বৃক্ষ-শ্রেণী সবার উপর মাথা তুলিয়া সমীরণ-ভরে হেলিয়া-দুলিয়া আমাকে হাতছানি দিতেছিল। উইলিংডন সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় বামে উত্তর-কলিকাতার সৌধশ্রেণী, উত্তর হাওড়ার পোল এবং অসংখ্য নৌকা-নিষেবিত গঙ্গাস্রোত সমবায়ে এক অপূর্ব দৃশ্য চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল।

আট হাজার ফুট উঁচু দিয়া ঘণ্টায় প্রায় আড়াই শত মাইল বেগে বিমান গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। বর্ষা-বিধৌত পরিষ্কার আকাশ। দু-এক টুকরা সাদা মেঘ এখানে ওখানে উপরে ও নীচে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। নীচের দৃশ্যাবলী পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

শস্য-শ্যামলা সরিৎ-মেখলা বঙ্গমাতার রূপ উপর হইতে অপরূপ দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে সবুজ গাছে ঘেরা গ্রাম ও শহর। দামোদর নদ ও তাহার উপনদী, শাখানদীগুলি মিলিয়া বঙ্গমাতার তরুলতাশোভিত গাত্রে অপূর্ব্ব আভরণ রচনা করিয়াছে। মাঠের মধ্যে জমির আলগুলি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ক্রমশঃ লালমাটির দেশে উপনীত হইলাম। অ-প্রসন্ন-সলিলা কূলকষা শোণ নদীকে দ্রুত অতিক্রম করিয়া



ব্যবস্থা পরিষদ ভবন, নূতন দিল্লী

সলীলগতি গৈরিক-বসনা গঙ্গানদী দর্শনে পবিত্র বোধ করিলাম। কিছুক্ষণ গঙ্গানদীকে সানন্দে অনুসরণ করিলাম। গঙ্গার মনোরম ছবি অন্তর্হিত হইল। চারি দিকে বিশাল প্রান্তর। গ্রাম ও শহরগুলি এখন আর ঘন নয়। সুরম্য লক্ষ্ণৌ নগরী দর্শনে মন আহ্লাদিত হইল। সহসা নূতন দিল্লীর নূতন সৌধ-শ্রেণী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বেলা পৌনে বারোটায় বিমান দিল্লীর পালাম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিল।

STREET SCENE, OLD DELHI



পুরাতন দিল্লীর একটি রাস্তার দৃশ্য

কিয়দ্দিবিক এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা আবার উড়িলাম। এবার আর সবুজ চোখে পড়ে না। বিস্তীর্ণ মরুভূমি। করাচীর কিছু পূর্বে জলসেঁচের খালগুলি দেখা যাইতে লাগিল। আবার কিছু কিছু সবুজ দেখা দিতে লাগিল। ন' হাজার ফুট উঁচু দিয়া উড়িয়া বৈকাল প্রায় চারিটায় করাচী বিমানঘাঁটিতে নামিলাম। বিমান ঘাঁটি হইতে কোম্পানীর বাস আমাদিগকে শহরের প্যালেস্ হোটেলে লইয়া গেল। রাস্তায় উষ্ট্র-পৃষ্ঠারোহী যাত্রীদল দেখিলাম। দিবালোকটুকুর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার মানসে একটি ট্যাক্সি লইয়া শহর দেখিতে ছুটিলাম। ক্লিফ্‌টন সমুদ্র-সৈকতে নামিয়া সমুদ্র ও পোতাশ্রয়ের দিবাবসানকালের শোভা প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লইলাম। বিস্তীর্ণ বেলাভূমি। সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র। তন্মধ্যে একটি পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া অকম্পিত দেহে সমুদ্রের ঢেউ উপভোগ করিতেছে। দক্ষিণে চক্রাকার পোতাশ্রয় ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জাহাজসমূহ। সূর্য্যাস্ত হইয়া গেল। চারি দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গদেশে আমার গৃহে তখন হয়তো বিল্ববৃক্ষ-মূলে দুর্গামাতার অকাল বোধন হইতেছে। হোটেলে ফিরিলাম।

হোটেলে রাত্রি যাপন করিয়া ভোরে অন্ধকার থাকিতে বিমানঘাঁটির দিকে রওনা হইলাম। সেখানে পুলিস, শুল্ক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাঁটি অতিক্রম করিয়া সূর্য্যোদয়কালে সাতটায় পুনরায় উড়া সুরু করিলাম। কিয়দ্দিবিক দশ হাজার ফুট ঊর্দ্ধে ঘণ্টায় প্রায় আড়াই শত মাইল বেগে উড়িতেছি। তথাপি মনে হয় বিমান সম্পূর্ণ স্থির, যেন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছি। কেবল প্লেনের দারুণ গর্জন অনবরত কানে আসিতেছে। আমাদের দক্ষিণে ইরাণের পর্বত-বন্ধুর অনুর্বর উপকূল। বামে সমুদ্র। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। নীচে নীলাম্বুরাশির উপর ভাসমান মেঘমালা বালসূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত। কোথাও মেঘগুলি সাদা ভেলার মত ভাসিতেছে। কোথাও মনে হইতেছে যেন তুলার পর্বতমালা দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ তাহাদের উপর পড়িয়া সুন্দর দেখাইতেছে। নীচে দু'একখানা ষ্টীমার দেখা গেল। একটি নদী আসিয়া সমুদ্রে মিলিয়াছে। সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর উপর দিয়া উড়িতেছি। ছোট বড় নৌকা ও ষ্টীমার নদীতে চলিতেছে। সহসা অনুর্বর ভূমির মাঝখানে নদীতীরে একখণ্ড তৃণাচ্ছাদিত জমি দৃষ্টিগোচর হইল। অপর তীরে ঘর-বাড়ী। প্লেন নামিতে সুরু করিল। নীচে আসিতে দেখিলাম যে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড আসলে বিস্তীর্ণ খর্জ্জুর-বন। ছয় ঘণ্টা উড়িয়া ভারতীয় সময় একটায় আমরা টাইগ্রিস তীরবর্ত্তী বসরা শহরে নামিলাম। তখন স্থানীয় সময় সকাল দশটা। ছয় ঘণ্টায় আমাদের তিন ঘণ্টা সময় লাভ হইয়াছে।

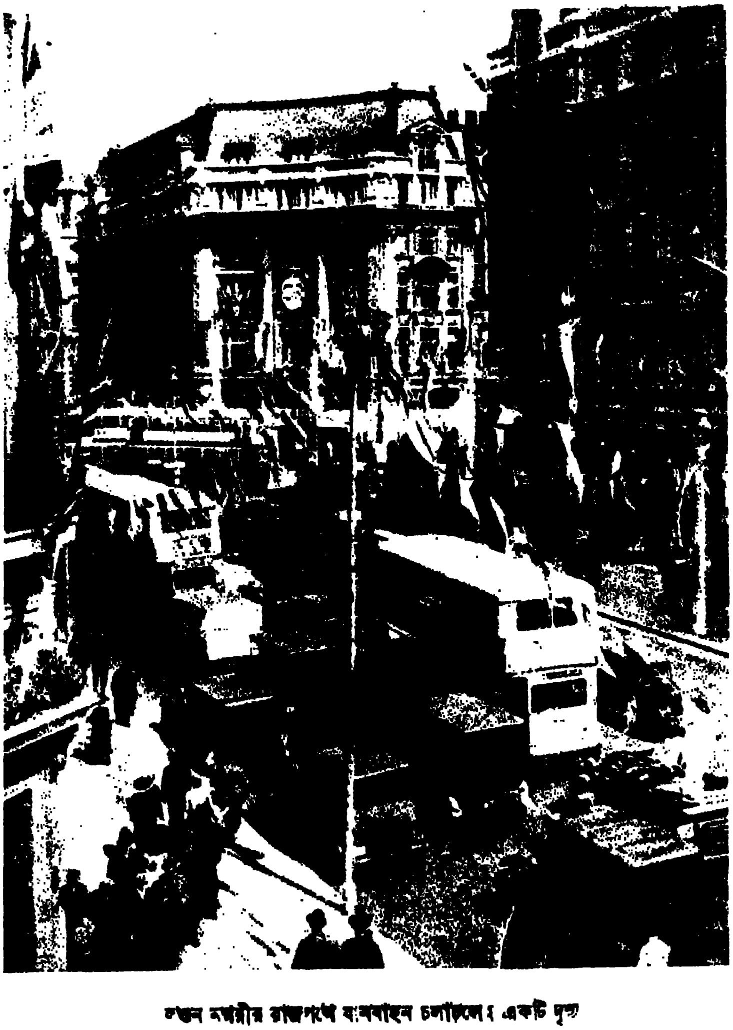
এক ঘণ্টা বসরার খ-পোতাশ্রয়ে বিশ্রাম করিয়া স্থানীয় কর্ম-চারিগণের আতিথেয়তা উপভোগ করিয়া আবার উড়িলাম। তারপর ইরাক ও ট্রান্স জর্ডনের বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি সুরু হইল। এক স্থানে ডাইনে দূর হইতে ভূমধ্যসাগর দেখা গেল। সুয়েজ-খালকে অতিক্রমকালে মুক্তামালার মত মনে হইল। খালটি

পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হইল। সহসা দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে এক নয়নাভিরাম সবুজ দেশ দেখা গেল। ইহা মিশর দেশ। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা উড়িয়া নীলনদ-তীরবর্ত্তী কায়রো শহরে নামিলাম।

কোম্পানী কায়রোতে আমাদিগকে হোটেল মেট্রোপলিটনে লইয়া গেল। তখন ঘণ্টাখানেক দিবালোক আছে। একটি গাইড জোগাড় করিয়া ট্যাক্সি লইয়া তৎক্ষণাৎ শহর দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরে ফরাসী ইঞ্জিনীয়রগণের পরিকল্পিত সুন্দর রাস্তা ও বাড়ী লি বেশ লাগিল। শহর হইতে দূরে বিশ্ববিখ্যাত



বাণিজ্য-মুখর বসরা



লণ্ডন নগরীর রাজপথে যানবাহন চলাচলের একটি দৃশ্য

পিরামিড্ পর্য্যন্ত সোজা চলিলাম। পিরামিড্গুলি প্রস্তর-নির্মিত, বিরাটকায়; ক্রমশীর্ণায়মান হইয়া ভূতল হইতে আকাশে উঠিয়াছে। কত রাজা ও রাজ্য একে একে মহাকালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বজ্রদেহ পিরামিড্শ্রেণী মহাকালের প্রহরীস্বরূপ স্বস্থানে অটল। ইহাদের নির্মাণ-রহস্য আজিও অজ্ঞাত। যুগ যুগ ধরিয়া মরুভূমির মধ্যে উন্নতশীর্ষে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইহারা মনুষ্যজাতির বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। নয়টি পিরামিড দেখিলাম। তিনটি বড়, ছয়টি ছোট। গাইড় বলিল, বড়টির উচ্চতা পূর্ব্বে ৫৮১ ফুট ছিল, এখন ৫৫১ফুট আছে। উপরের ত্রিশ ফুট আলাবাষ্টার নির্মিত ছিল। কালক্রমে ভাঙিয়া গিয়াছে। গাইড়টির মতে পিরামিডগুলি ৩৭৩৩ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্মিত। বড় পিরামিডের পার্শ্বে রাজা ফারুকের গ্রীষ্মনিবাস। এখন রাজা আলেকজান্দ্রিয়ায় আছেন। সান্ত্রী শূন্য প্রাসাদ পাহারা দিতেছে। অদূরে বিরাটকায় স্ফিংস্ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া হাসিতেছে। তখন দিবালোক প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। সেই আলো-আঁধারের মিলনে স্ফিংসের মিষ্টহাসি মিষ্টিক্ হইয়া উঠিয়াছে। ইতস্ততঃ অনেকগুলি প্রাচীন মিশরের রাজা-উজিরের সমাধি-মন্দির। মাটি খুঁড়িয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর গর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। মন্দিরমধ্যস্থ পাথরের মূর্ত্তিগুলিতে শিল্পীর



ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার রাজপ্রাসাদের ক্লকটাওয়ার : অগ্রভাগে রাণী বোডেসিয়ার রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি

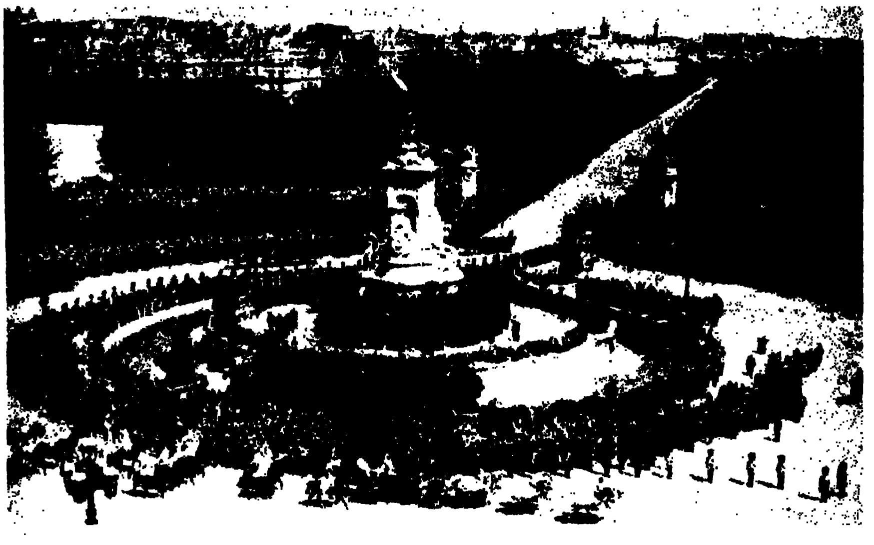
নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। শুক্লা সপ্তমীর চাঁদের আলোকে যথাসম্ভব উহাদিগকে দেখিয়া, আমাদের ভাগ্যগণনা-লিপ্সুদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ট্যাক্সিতে আসিয়া উঠিলাম। নীলনদের উভয় তীরবর্ত্তী, আলোকাবলী-খচিত শহরের রাত্রিকালীন দৃশ্য পরম রমণীয় মনে হইল। বাজার, রাজপ্রাসাদ ও বড় বড় রাস্তাগুলি দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটে আমরা হোটেল ত্যাগ করিলাম। বিমানঘাঁটিতে আসিয়া পুলিশ ও শুল্ক-বিভাগের ঘাঁটিগুলি অতিক্রম করিয়া প্লেনে উঠিলাম। রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটে পুনরায় উড়িতে সুরু করিলাম। অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমান সগর্জ্জনে চলিয়াছে। যাত্রিগণ স্ব-স্ব আসনের পিঠ যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। ক্রমশঃ সূর্য্যোদয় হইল। আমরা আফ্রিকার উত্তর-উপকূল ধরিয়া উড়িতেছি। শুধুই মরুভূমি দেখা যাইতেছে। ক্যাপ্টেন বলিয়া পাঠাইলেন যে, ভূমধ্যসাগরে ঝড় উঠায় তিনি সেদিকে যান নাই।

স্থানীয় সময় আটটায় ত্রিপোলীর ক্যাসেল্ বেনিটো বিমানঘাঁটিতে নামিলাম। এই বিমানঘাঁটিটি যুদ্ধকালে কয়েকবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। মেসিনগানের সহস্র ক্ষত এই ঘাঁটিটিতে বিদ্যমান। ঢেউ-টিনের ঘরগুলি ছিদ্রময়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এই ঘাঁটি। দূরে পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যায়। লোকালয় কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে আমাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইল।

দেড় ঘণ্টা বিশ্রামের পর স্থানীয় সময় সাড়ে নয়টায় পুনরায় উড়িতে সুরু করিলাম। প্রথমেই ভূমধ্যসাগর পাড়ি সুরু হইল। উপরে দিগন্তপ্রসারী নীলাকাশ, নীচে সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বুরাশি। মাঝে মাঝে মেঘগুলি সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে। উপর হইতে সূর্য তাহাদের উপর আলোকপাত করিতেছেন। আকাশ, সমুদ্র ও মেঘের খেলা দেখিতে দেখিতে সহসা ফ্রান্সের উপকূলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল।

উপর হইতে ফরাসী দেশের দৃশ্য পরম রমণীয়। সর্ব্বত্রই শস্যমণ্ডিত ক্ষেত্র। দক্ষিণাংশ পর্ব্বতময়; কিন্তু তথাপি শস্যশ্যামল। বন্ধুরগাত্র ফরাসীভূমিকে কুটিলগতি স্রোতস্বিনীগণ কোথাও মুক্তাহারের ন্যায়, কোথাও বা রৌপ্য-মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে সুন্দর শহর। বাড়ীগুলির ছাদ প্রায়ই লাল। নগর হইতে নগরান্তর পর্য্যন্ত রাস্তা বা রেল-লাইন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নদীর উপর পুলগুলিপর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতেছে। চলন্ত মোটর গাড়ী বা রেলগাড়ীগুলিকে উপর হইতে চলনশীল বিন্দু বা রেখার ন্যায় দেখাইতেছে। একটি সুরম্য উদ্যানের মত সমস্ত ফ্রান্সকে পশ্চাতে ফেলিয়া লা-হাভ্‌র্ বন্দরের নিকট দিয়া সমুদ্রে পড়িলাম। বামে আটলান্টিক। দক্ষিণে ইংলিশ চ্যানেল। পিছনে সমুদ্র-বিধৌত গৃহমালা-শোভিত সুশ্যামল ফ্রান্সের উপকূল। সহসা সমুদ্রমধ্য হইতে যেন এক সুন্দর দেশ উত্থিত হইল। ইংলণ্ড দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র যাত্রিমহলে আনন্দের চঞ্চলতা লক্ষিত হইল। ইংলণ্ডের উপকূলে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গৃহরাজি পরিশোভিত। ডাইনে দূরে সাদা খড়ির পাহাড়শ্রেণী দেখা যাইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ তাহার উপর পড়িয়া পরম রমণীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। দেখিয়া আমার অ-কবি মনেও



১৯৩৫ সনে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পরিক্রমা

বোধ হইতেছে এ যেন জার্মানী, তথা ইউরোপ তথা—সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া জয়-দৃপ্ত ইংলণ্ডের পুঞ্জীভূত অট্টহাসি। ঘন-সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, সুকর্ষিত ক্ষেত্রমালা এবং ঘন-বিন্যস্ত প্রাসাদাবলী অতিক্রম করিয়া বিমান লণ্ডনের হিথ্‌রো বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিল। তখন স্থানীয়সময় বৈকাল প্রায় চারিটা।

পুলিস, শুল্ক ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাঁটি অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা সময় গেল। কোম্পানী বাসে আমাদিগকে তাহাদের শহরের আপিস পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। আপিসটি বাকিংহাম প্যালেস রোডে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের কাছে। সেইখানেই খবর পাইলাম যে কেন্‌সিংটন হাইষ্ট্রীটের এক হোটেলে আমার জন্য স্থান করা হইয়াছে। ট্যাক্সি-যোগে সেখানে পৌঁছিলাম। সেদিন মহাষ্টমী। বঙ্গদেশে আমার গৃহে তখন হয়তো দুর্গামাতার সন্ধ্যারতি সমাপনান্তে ভোগের আয়োজন হইতেছে।

এই যাত্রায় ছয় লক্ষে মোট ৬৪০২ মাইল রাস্তা বিমান-যোগে অতিক্রম করিয়াছি। দূরত্বের তালিকা এইরূপ :—

কলিকাতা—দিল্লী	৮২১
দিল্লী—করাচী	৬৭৪
করাচী—বসরা	১২৯৩
বসরা—কায়রো	১০২০
কায়রো—ত্রিপোলী	১০৯৪
ত্রিপোলী—লণ্ডন	১৫০০
	৬৪০২

প্রত্যেক লক্ষের পর ঘড়ির কাঁটা পিছাইয়া দিতে হইয়াছে। এই রাস্তা অতিক্রম করিতে মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাভ হইয়াছে। লণ্ডন কলিকাতার পশ্চিমে। অতএব সূর্য্য এখানে কলিকাতার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে দেখা যায়। সেইজন্য লণ্ডন সময় কলিকাতা সময়ের (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পিছনে।

বৈকাল চারিটায় লণ্ডনে পৌঁছিলাম। তখন কলিকাতায় রাত্রি সাড়ে নয়টা। যদি কোন বিমান ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে সোজা পশ্চিমে চলে তবে উহা সর্বত্র একই স্থানীয় সময় পাইবে। যদি কোন প্লেন সূর্য্যোদয়ে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ঘণ্টায় ৬০০ মাইল বেগে নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত যায় তবে ঐ বিমানারোহিগণ সর্বত্রই সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইবেন। এ অবস্থায় যদিও আহারাদির ব্যবস্থা ঘড়ি দেখিয়াই করিতে হয় তথাপি প্রায়ই সময়-বিভ্রাট ঘটে। করাচী হইতে বসরার পথে খুব দ্রুত রাত্রিদিবা-পরিবর্ত্তন হয়। কারণ বসরা সিধা পশ্চিমে। এই লক্ষে আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা সময় লাভ করিয়াছিলাম। ফলে যখন ভারতীয় সময় একটায় আমরা বসরায় পৌঁছাই তখন স্থানীয় সময় দশটা। প্লেনের মধ্যে যখন আমাদিগকে মধ্যাহ্ন-ভোজন দেওয়া হইল তখন স্থানীয় সময় বারটা—ভারতীয় সময় যখন তিনটারও বেশী। অতএব আমাদের দুই বার আহারের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। এইরূপ অনেক সময় এই ব্যবধান কমিয়া যায়। কখন কখন দিনে দুই বারই বা মধ্যাহ্ন-ভোজন জুটিয়া যায়। ঐদিন আমরা প্রায় ১৮ ঘণ্টা দিবালোক পাইয়াছিলাম।

এই যাত্রায় আমাদের আহারাদি কখনও নীচে কখনও বা প্লেনে হইয়াছিল। প্লেনে খাবার কোন অসুবিধা হয় না।

যে প্লেনে আমরা গিয়াছিলাম, উহা ইয়র্ক-শ্রেণীর প্লেন। চারিটি ইঞ্জিন, খুব দ্রুতগামী—গর্জন একটু বেশী। বারটি আসনে আমরা বার জন যাত্রী ছিলাম; তন্মধ্যে নয় জন শ্বেতাঙ্গ, তিন জন ভারতীয়। বাঙালী আমি একা। দ্বিতীয়—পূর্ণিয়া জেলাবাসী এক জমিদারপুত্র। যুবকটি বিদ্যাশিক্ষার্থ কেম্‌ব্রিজ যাইতেছেন। খুব অমায়িক এবং সদালাপী। করাচী এবং কায়রোতে নগরদর্শন সময়ে এই যুবকটি আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তৃতীয়—এক জন ভারতীয় মিলিটারী অফিসার।

প্লেন-ভ্রমণ খুব আরামদায়ক বলিয়াই মনে হইল। প্লেন খুব স্থিরভাবে চলে। নড়িতেছে এরূপ মনেই হয় না। প্লেনের মধ্যে চলাফেরা করায় কোনই অসুবিধা হয় নাই। রেল বা জাহাজে যাহা অসুবিধা হয়, প্লেনে তাহাও নাই। বরং নীচের সতত-পরিবর্ত্তনশীল রমণীয় দৃশ্যাবলী সর্বদাই চিত্তের আনন্দ উৎপাদন করে। আর দ্রুতগামিত্বের তো কথাই নাই।

"স্বপন যদি সত্য হয়—"

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

রায়বাহাদুর মহীতোষ বোস্ একবার বাড়ী আবার রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত সারা বিকেলটা ছুটাছুটি করছিলেন। দুর্ভাবনায় তাঁর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল—কণ্ঠ ঘন ঘন শুকিয়ে উঠছিল। শীতের দিনেও দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি কুঁজো-খানেক জল শেষ করে ফেলেছেন। তাঁর স্ত্রী অনীতা দেবী স্বামীর মনের কথা বুঝতে পেরেও মুখে কিছুই বললেন না। কতকগুলো কাটা কাপড় নিয়ে সেলাইয়ের কলের কাছে বসেছিলেন দুপুরবেলায়—সেলাই শেষ করে তিনি যখন উঠলেন তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। মনে মনে তিনিও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—কিন্তু তার বাহ্য-প্রকাশ ছিল না। তিনি জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকালেন। দেখলেন, রাস্তার জায়গায় জায়গায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনতা উত্তেজিত-ভাবে আলোচনা করছে।

মহীতোষ বাবু আর সহ্য করতে পারলেন না। রাস্তার মোড় থেকে ঘুরে এসে স্ত্রীকে বললেন—পাঁচটা বেজে গেল—অথচ আনন্দ ফিরলো না এখনও। শুনেছ তো ধর্ম্মতলায় গুলি চলেছে ছেলেদের মিছিলের ওপর। যে হুজুগে ছেলে তোমার—আবার কোনও হাঙ্গামা না বাধায়। মাসের মধ্যে বিশ দিন তো ইস্কুল কলেজ ষ্ট্রাইকই চলছে—তবু ওর কেনই বা কলেজে যাওয়া। কি বিপদ বল দেখি! ঐ গোলাগুলি, লাঠি-মারামারির মধ্যে—যদিও গিয়ে থাকে—নাঃ! ভারি জ্বালাতনে পড়তে হ'ল দেখছি!

অনীতা দেবী স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর মনের ভাবটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। তাঁর রায় বাহাদুর স্বামী নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার প্রত্যাশকেই যে জীবনের সর্ব্বোপরি স্থান দিয়ে থাকেন, ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল তাঁর সান্নিধ্যে থেকে তিনি তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন। তাঁর ছেলেকে তিনি স্নেহ করেন অন্য পিতার মতই এতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু পুত্র-স্নেহই বড় না, নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিই তাঁর কাছে কাম্য একথা ঠিক করে বুঝে উঠতে পারেন নি এখনও।

অনীতা দেবী বললেন—ব্যস্ত হয়ে কি হবে। এসে পড়বে শীগ্গিরই। পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিশে যদি একটু হুজুগ করেই—কি আর করা যাবে বল।

মুখে তিনি একথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁর চিন্তাও কম হয় নি। ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ্জ, গুলি চলছে—একথা শুনে কোন্ মা-ই বা স্থির থাকতে পারেন।

রায় বাহাদুর স্ত্রীর কথায় মোটেই সান্ত্বনা পেলেন না বরং তিনি জ্বলে উঠলেন, কটুকণ্ঠে বললেন—সকলের ছেলে আর তোমার ছেলে এক নয়, একথা তুমি ভোলো কেন?

একটু চাপা হাসি অনীতা দেবীর মুখের প্রান্তে খেলে গেল, তিনি শান্ত স্বরেই বললেন—সত্যিই তুমি অত উতলা হয়ো না। আনন্দ এখনই এসে পড়বে। তা ছাড়া ছেলে এখন বড় হয়েছে—আর কি আঁচল চাপা দিয়ে রাখবা'র বয়স আছে!

—না-না-না, আমি বেঁচে থাকতে চলবে না ওসব। ছেলেকে তোমার সযত্নে দিও—বুঝেছ? উঃ! ছয়টা বেজে গেল। না জ্বালালে দেখছি।...তিনি আবার ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অনীতা দেবী জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। রাস্তায় জনতা তেমনি জটলা করছে। তীব্র বেগে সৈন্যবোঝাই কয়েকখানি মিলিটারি লরি বেরিয়ে গেল। সেইদিকে ইঙ্গিত করে জনতার কোলাহল বেড়ে উঠল।

সন্ধ্যা হয় হয় দেখে অনীতা দেবীও বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিছু বিপদ ঘটল না তো? পাশের বাড়ীর একটি ছেলে আনন্দদের কলেজেই পড়ে। তার কাছে গিয়ে খোঁজ নেবার কথা তাঁর মনে হ'ল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মহীতোষ বাবু ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়ে শয্যা নিয়েছেন। অনীতা পাশের বাড়ী গিয়ে দেখলেন—সে বাড়ীর ছেলেটি অনেক আগেই ফিরেছে। তার মুখে শুনলেন, আনন্দ কলেজের ছেলেদের মিছিলে যোগ দিয়ে ধর্ম্মতলার দিকে গিয়েছে। সেখানে গুলি চলার খবরও সে শুনেছে। একটা ছেলে গুলির আঘাতে মারা গিয়েছে তাও সে জানে—তারপর আর কি হয়েছে জানে না, কারণ অনেক আগেই সে ফিরেছে।

অনীতার মনের উদ্বেগ বেড়ে গেল। ঐ ছেলেটি যদি আনন্দ হয়? আনন্দ—তাঁর একমাত্র পুত্র আনন্দ! তিনি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, যে ছেলেটিকে ওরা গুলি করে হত্যা করেছে সে তো কোনও না কোনও মায়েরই ছেলে! তাঁর ছেলে না হলেও বা কি? কত মায়ের ছেলেই তো এমনি করে প্রাণ দিয়ে এসেছে পরাধীনতার অভিশাপে—আরও কত ছেলেকে এমনিভাবে জীবন বলি দিতে হবে!

বাড়ী ফিরে এসে তিনি বারান্দার এক কোণে বসে পড়লেন। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন তিনি। জেগে স্বপ্ন দেখার অভ্যাস আছে তাঁর। সে স্বপ্নের মধ্যে দুঃখের বেদনা আছে—আনন্দের স্মৃতি আছে। এমনি মানসিক অবস্থার সময় তিনি ফিরে চলে যান সেই অতীতের যুগে যখন তাঁর বিয়ে হয় নি। আর সেই সময়কার কথা মনে হলেই প্রথমেই মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দেখা দেয় যৌবনদীপ্ত এক অপূর্ব্ব তেজস্বান্

মূর্ত্তি—দীর্ঘ ছয় ফুট গৌরবর্ণ ঋজুদেহ—চোখে যাঁর অদ্ভুত জ্যোতি—কখনও ভাবাবেগে কোমল, কখনও মনের উত্তেজনায় প্রখর, উগ্র।—তাঁর সেই ছোড়দা!

ছোড়দার কথাগুলো এখনও যেন কানে বাজছে তাঁর।—অনি ভাই, তোকে আমি দীক্ষা দেব—ভারতের নবযুগের দীক্ষা—যে দীক্ষা নিলে গৃহসংসার, আত্মীয়পরিজন সকলের কথা ভুলে যেতে হয়—কেবল পরাধীনতার অভিশাপের কথা মনের মধ্যে সর্বসময়ে জ্বলতে থাকে। বাবা মা দাদারা যাই বলুক, বিয়ে করিস নে তুই। তোর মধ্যে শক্তি আছে আমি লক্ষ্য করেছি—যা দেশের কাজে লাগাতে চাই আমি। আমি তোকে দীক্ষা দেব অনি!

কিন্তু বিয়ে তাঁকে করতে হয়েছে। আর তা ছাড়া এমন লোকের গৃহিণী হয়েছেন তিনি যাঁর জীবনের আদর্শের সঙ্গে ছোড়দার আদর্শের একতিল মিল নাই। সন্তানও তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন। আনন্দ—তাঁর একমাত্র পুত্র আনন্দ—কেমন হবে সে? কোন্ আদর্শ সে গ্রহণ করবে?

চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। কক্ষের ভিতর থেকে ঘড়ি বেজে উঠল। শুনতে লাগলেন—এক, দুই, তিন—। আটটা বেজে গেল, তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠলেন। শয়নকক্ষের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন, স্বামী খাটের উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছেন। তাঁর মানসিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছিলেন তিনি· কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁর ক্ষমতার বাইরে।

তিনি আবার বারান্দায় এসে বসলেন। স্বপ্ন দেখা আবার সুরু হ'ল। সেই রাত্রির কথাই মনে হ'ল তাঁর। ছোড়দা সাত আট দিন পর বাড়ী ফিরেছেন সন্ধ্যাবেলায়—মুখখানি তাঁর চিন্তাকুল। কোথায় তিনি গিয়েছিলেন এ প্রশ্ন বাড়ীর কেউ করলেন না। অনীতা ছোড়দার মুখের ভাব দেখে মনে মনে বিচলিত হলেন, কিন্তু সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না। ছোড়দা এমনি করে কিছু দিনের মত অদৃশ্য হয়ে যান, আবার ফিরে আসেন—এ ব্যাপারটা বাড়ীর সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু মুখে তাঁর এমন চিন্তার রেখা কই আগে তো কখনও দেখেন নি অনীতা দেবী। ছোড়দার পাশের ঘরটিতে তাঁর ছিল শোবার ঘর। শেষরাত্রের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, শুনলেন দরজায় মৃদু করাঘাত। অনীতা কান খাড়া করে উঠলেন। আবার শব্দ শুনতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার কাছে গিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললেন—কে? কে?

চাপা গলায় ছোড়দা বললেন—আস্তে। চেঁচাস নি। দরজা খোল্।

দরজা খুলে দিলে ছোড়দা ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে বললেন—অনি, পুলিসে বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। পালাবার উপায় নাই। আমি আগেই ঢুকতে পেরেছিলাম—আমাদের দলকে 'কলো' করেছে ওরা। ভেবেছিলাম—আজকের রাতটা রেহাই দিলে সামলে নিতে পারব—কিন্তু সে ফুরসত ওরা দিলে না।...এই বলে তিনি একটু হাসলেন।

অনীতা বিচলিত হয়ে বললেন—কেন—কি করেছ তোমরা ছোড়দা—পুলিস কেন?

ছোড়দা তেমনি একটু হেসে বললেন—আস্তে অনি। দেওয়ালের ওপাশেই ওরা কান খাড়া করে রয়েছে, শুনতে পাবে। করি নি বিশেষ কিছু—যারা টাকার গদিতে বসে বসে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে তাদের মানুষ হবার সুবিধে করে দেওয়ার জন্ত মাঝে মাঝে আমরা তাদের নিয়ে একটু খেলা করে আসি—এই আমাদের অপরাধ। যাক্ গে, হরিবিলাস সা দিয়েছে মন্দ নয়—হাজার পনরো হবে। কিন্তু তাকে সাবধান করে দিয়ে এসেছিলাম যে আমরা চলে আসবার অন্ততঃ চার ঘণ্টা পরে যেন পুলিসে খবর দেয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার আর তর সয় নি। মালগুলো ভাগাভাগি করে সরিয়ে দিয়েছিলাম রাস্তাতেই। অনেক পথ ঘুরে ফিরে এসেও দেখছি ওদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় নি এবার—কি জানি বিশ্বাসঘাতকতা কেউ করলে কি না।

অনীতার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, চাপা গলায় বললেন—ছোড়দা, তোমার কাছে কি আছে বলতো?

ছোড়দা একটু মিষ্টি হাসি হেসে বললেন—বিশেষ কিছু নয়, একটা রিভলভার, গোটা বিশেক টোটা আর হরিবিলাস সা'র শ'খানেক বোধ হয় 'গিনি' হবে। মুশকিল হচ্ছে কি জানিস্—এই কটা সামান্ত জিনিস আবিষ্কার করে ওরা যে মর্য্যাদা পাবে, সেটা দেওয়ার আমার ইচ্ছে ছিল না। আর এই সামান্ত ব্যাপারে দীর্ঘকাল জেলে পচতে হবে এ ভাবতেও আমার ভারি খারাপ লাগছে। সব কাজই যে বাকি আছে অনি! এই রিভলভার দিয়ে অন্ততঃ গোটা দশ-পনরো যেয়ো কুকুর মেরে নিজেও মরা যায়—কিন্তু তাতেও মন উঠছে না আমার। সেটা যেন একটা কোল্ড ব্লাডেড মার্ডারের মত হবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া—এ বাড়ীতে তোদের সামনে—বাবা মা দাদারা তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়বেন—না, এ আর ইচ্ছে করছে না।

অনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে তেমনি চাপা গলায় বললেন—জিনিসগুলো আন দেখি দাদা। বালিশ আর তোষক ছিঁড়ে ওগুলো পুরে এখনই সেলাই করে দিচ্ছি—ওরা টেরও পাবে না—।

ছোড়দা হেসে বললেন—পাগল হয়েছিস! একটু পরেই দেখতে পাবি ওদের কাণ্ড। সার্চ্চ করবার নামে ওদের তাণ্ডব লীলা চলবে সারাদিন। ওরা চাবি থাকলেও বাক্স ভাঙবে, চাল ডাল হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়ে দেবে, তোষক লেপ ছিঁড়ে তুলো উড়োবে, পাকা মেঝেও খুঁড়ে ফেলতে পারে।

অনীতা বিস্মিত হয়ে বললেন—বলো কি দাদা!

—ঠিকই বলছি ভাই।

অনীতা দেবী একটু ভাবলেন, তার পর বললেন—তা হলে ? আচ্ছা, তুমি আন তো দেখি, কি করতে পারি দেখছি আমি।

…সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে সচকিত হয়ে উঠলেন অনীতা দেবী। স্বপ্নের ঘোর তাঁর নিমিষে টুটে গেল। ধীরে ধীরে কে যেন উঠছে উপরে। যত ধীরেই হোক, এ পায়ের শব্দ ভুল করতে পারেন না তিনি। তিনি চাপা গলায় বললেন—আনন্দ, এসেছিস্ বাবা !

আনন্দ মায়ের কাছে বসে মুখ গম্ভীর করে বললে—হাঁ্যা মা ফিরে এসেছি, কুকুরের মত ফিরেছি।

অনীতা দেবী আগ্রহভরে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন, বললেন—সব শুন্‌বো। এইবার হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে আনন্দ, মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

মহীতোষ বাবুর গলার আওয়াজ শোনা গেল এবার—কে কথা বলছে ওখানে ? আনন্দ ফিরেছে নাকি ? আনন্দ—আনন্দ—! তিনি ঘরের বাইরে এসে বললেন—এই যে ফিরেছেন দেখছি। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—এত দেরি হ'ল কেন তোমার ? এদিকে তোমার মা আর আমি ভেবে ভেবে মরছি। ছেলের দল আর পুলিসে গোলমাল হচ্ছে একথা শুনে কোন্ বাপ মা ঠিক থাকতে পারে বল। তোমারও একটা আক্কেল থাকা চাই। তোমার উচিত্‌ ছিল আনন্দ—কলেজ থেকে সোজা একেবারে বাড়ী চলে আসা।…কথায় গাম্ভীর্য্য আর তিনি বেশীক্ষণ রাখতে পারলেন না। পুত্রকে দেখেই তাঁর মন হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। বুকের বোঝা নেমে যেতেই তাঁর কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন—আর কখনো এমন দেরি করিস্‌নে রে বাবা। আমার কথা না হয় ছেড়েই দে—তোর মায়ের দিকটাও একবার ভাবিস্।

অনীতা দেবী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন—আচ্ছা, এখন থাম তুমি। যে ব্যাপার তুমি করছিলে। চল্ আনন্দ, খাবি চল্।

হো হো করে হেসে উঠে রায়বাহাদুর বললেন—হ্যাঁ ভয় আমি পেয়েছিলাম বটে, আর না পেয়েই বা কি করি বল। কলকাতার রাস্তা তো হয়েছে সুন্দরবনের চেয়ে ভয়ের জায়গা। এ্যাক্‌সিডেন্ট তো লেগেই আছে। মিলিটারি লরীর উৎপাত—কত লোক যে রোজ চাপা পড়ছে ! গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য, কথা নাই বার্ত্তা নাই ছুরি বসিয়ে দিলেই হ'ল ! তারপর আছে পুলিস আর মিলিটারির গুলি—সে যে ছিটকে এসে কার গায়ে লাগবে তাও তো জানার উপায় নেই। এ সব দেখে শুনে কার না মন অস্থির হয় বল দেখি। আমি জানি ও আমার তেমন ছেলে নয়, বজ্জাত ছেলের দলে ও মিশবে না—আর মেশবার দরকারই বা কি ওর। আমার একমাত্র ছেলে ওর অভাব কি বল দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি আমি এখন। ওকে কিছু খেতে দাও—পরে কথা হবে।…তিনি ছেলে ও মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের ভাব বুঝবার চেষ্টা করে সেখান থেকে সরে গেলেন।

ছেলের মুখে অনীতা দেবী শুনছিলেন সব। মিছিল চলেছে—ছেলের দলের মিছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের প্রতিবাদে আয়ুধহীন অভিমন্যুদের শান্ত কিন্তু উচ্ছ্বসিত মিছিল। চলার ধ্বনি—কণ্ঠের ধ্বনি ছাড়া—প্রতিবাদ জ্ঞাপনের তাদের আর কোনও অস্ত্র নেই। 'চলো চলো দিল্লী চলো'—সমবেত কণ্ঠের এই শব্দগুলি তাদেরই কানে প্রবেশ করে উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলছে। অধীর হয়ে উঠেছে তারা। স্বপ্ন দেখছে, দিল্লীতে তাদের যেতেই হবে, সেখানে উড়াবে তারা স্বাধীনতার জয়পতাকা !

ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছে আনন্দ। তার বলার মধ্যে আবেগ ফুটে বেরুচ্ছে। শুনতে শুনতে অনীতা দেবী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—তিনি আবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন।…

ভোর হতেই প্রথমে দরজা খুললেন বড়দা। সামনেই সশস্ত্র পুলিস দেখে তিনি অস্ফুট চীৎকার করে উঠলেন এ কি, এরা কে ! বাড়ীর সকলেই উঠে পড়লেন, তারপর ব্যাপার জানতেও বাকি রইল না কারও।

প্রথমেই খোঁজ হ'ল ছোড়দার। তিনি বেরিয়ে আসতেই ইনস্পেক্টর সাহেব একটু হেসে বললেন আপনিই প্রমথেশ বাবু ? ক্ষমা করবেন, আপনার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে।—আপনাকে এ্যারেষ্ট করলাম।

খানাতল্লাসী সুরু হবে এবার—মামুলি বিধানমত বাইরে থেকে কয়েক জন লোক আনা হ'ল সাক্ষী হবার জন্ত। তার পর হুকুম হ'ল মেয়েদের সব একটি ঘরে যেতে হবে পুলিসের কর্ত্তাটির সামনে দিয়ে।

মেয়েরা যাচ্ছে কম্পিত পদে—মুখে তাদের আতঙ্ক, আকস্মিক এই বিপদে তারা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। অনীতা ছিলেন সর্ব্বশেষে, তাঁরও বুক কাঁপছে। পুলিসের কর্ত্তাটি তাঁর মুখের দিকে, তারপর তাঁর সর্ব্বদেহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন। ষোড়শী কুমারী, সুন্দরী অনীতা দেবী—মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। হঁ্যা, দেখবার মত রূপ তাঁর বটে ! বাবা ডাকেন—জগদ্ধাত্রী মা আমার, মা বলেন—মেয়ে আমার দুর্গা গো ঠাক্‌রুন। ছোড়দা বলতেন—উঁহু, আগে হতে হবে তোকে ছিন্নমস্তা—তারপর অন্নপূর্ণা। বুঝলি রে অনি !

—আপনি একটু দাঁড়ান দেখি। পুলিসের কর্ত্তার এই কথায় দুর দুর করে উঠল অনীতা দেবীর বুক। আর একবার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করে ইনস্পেক্টর সাহেব একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বললেন—আচ্ছা যেতে পারেন এখন।—ছোড়দাও এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—ব্যাপার বুঝে তাঁর মুখও বিবর্ণ হয়ে গেল। ছোড়দাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে পুলিসের কর্ত্তাটি চাপা গলায় বললেন—আপনার বোন বুঝি ? বিয়ে হয় নাই তাও

বুঝতে পারলাম। আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে—যাক, ওর শরীর তল্লাসী করার দরকার হতে পারে। মনে হ'ল ওর পেটের কাছে কাপড়ের তলায় কিছু লুকোনো রয়েছে। বিয়ে হলে না হয় সন্দেহ হ'ত না—ভাবতুম—। তিনি অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন। ছোড়দার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। ইন্‌স্‌পেক্টর মোলায়েম হাসি হেসে বললেন—আপনি কিছু মনে করবেন না প্রমথেশ বাবু, পুলিসের লোক হলেও আমি আপনাদের স্বজাতি। ভারি সুন্দর কিন্তু আপনার বোনটিকে দেখতে। যাই হোক, আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে—তাই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

ছোড়দা গম্ভীর স্বরে বললেন—আপনি অন্যায় সন্দেহ করছেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বললেন—হতে পারে। পুলিস অনেক সময় ভুল দেখলেও মাঝে মাঝে সত্যটাও তার চোখে পড়ে প্রমথেশ বাবু। আপনার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন আপনি। একথা মোটেই ভাববেন না যে মেয়েদের কোনও রকম অসম্মান হবে আমি উপস্থিত থাকতে। পুলিসের লোক হলেও আমাকে বন্ধু বলেই ভাববেন এখন থেকে :···

স্বপ্নের ঘোরেই অনীতা দেবী একটু হাসলেন। না—ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব কথা রেখেছিলেন বৈকি। তা না হ'লে অনীতা দেবীর কি দশা হ'ত তখন? আর তাঁর ছোড়দার? তাঁর দয়াতেই তো তিনি হতে পেরেছিলেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইন্‌স্‌পেক্টর-পত্নী, তারপর আস্তে আস্তে এসিষ্ট্যান্ট পুলিস কমিশনারের 'বেটারহাফ', রায়বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী।

সার্চ্চের ঘটা একেবারে যজ্ঞের ব্যাপারটির আধুনিক সংস্করণ। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলেছিল সে কাণ্ড। তারপর ছোড়দাকে নিয়ে পুলিসের কর্ত্তারা চলে গেলেন—জনকয়েককে বাড়ীর ছাদে ছাদে পাহারায় রেখে। দেখা গেল, বাড়ীর ভিতরের ঘেরা ইঁদারাটি, যেখানে মেয়েদের স্নান করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিলে—সেখানকার পাহারার ব্যবস্থাটিই বিশেষ কঠোর।

সেদিনকার ব্যাপারের পর বাবা শয্যা নিলেন। দাদাদের মুখের ভাব হয়ে উঠল থমথমে গম্ভীর। বৌদিদিদের ভাবখানা এই যে—গৃহের শান্তি যাকে দিয়ে নষ্ট হতে বসেছে তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখা কেন। কিন্তু মাকে দেখে তাঁর মনের চাঞ্চল্য ধরার উপায় ছিল না কারও। তিনি নিঃশব্দে ভাঙা সংসার গুছানোর কাজে লেগে গেলেন।

এর পর থেকে দিন কয়েক ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবের ঘন ঘন যাতায়াত চলতে লাগল তাঁদের বাড়ীতে। তাঁর আশ্বাসে বাবা শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন, দাদাদের গম্ভীর মুখেও হাসির রেখা দেখা গেল। অনীতা দেবী অবশ্য পরে বুঝতে পেরেছিলেন সবই। তাঁর বাবা আর দাদারা একটা মতও দিয়েছিলেন তাঁর—তিনিও মত দিয়েছিলেন।

কিন্তু মত না দিয়েই বা তাঁর উপায় ছিল কি! পুলিসের লোক হয়ে কর্ত্তব্যে অবহেলা ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব করতে পারেন না। হয় বিপ্লবী মেয়েকে গ্রেফ্‌তার করে বিচারের জন্য পাঠাতে হয়, না হয় তার এই মনোবৃত্তির সংশোধনের ভার নিতে হয় তাঁরই—একেবারে অঙ্কলক্ষ্মী করে। কাপড়ের তলায় রিভলভার আর টোটা লুকিয়ে রাখা সোজা অপরাধ নয়—তা ছাড়া সিঁদির বলেটাও ডাকাতি ব্যাপারটার সঙ্গে যোগাযোগের অকাট্য সাক্ষ্য। বাস্থাকে রক্ষা করতে গিয়ে সেগুলো তলপেটে রেখে সুযোগ বুঝে ইঁদারায় ফেলে দেওয়াটা বোনের পক্ষে বাহাদুরি হতে পারে বটে, কিন্তু তাঁর মত পুলিসের লোকের চোখকে ফাঁকি দেওয়া তো আর সহজ নয়। রাত্রের অন্ধকারে কৌশলে তিনি উদ্ধার করেছেন জলের তল থেকে—সেগুলো আছে তাঁরই হেফাজতে। এ বাড়ীর একটা মতামত পেলেই তিনি এ সম্বন্ধে যা হোক একটা ব্যবস্থা করবেন। যে রিভলভারটি পাওয়া গিয়েছে সেইটে দিয়েই নাকি কোন এক বড় পুলিস কর্ম্মচারীকে কলকাতার রাস্তায় হত্যা করা হয়েছিল এবং সেটি যে কোন্ এক বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীর ঘর থেকে তার কিছুদিন আগেই উধাও হয়েছিল এ সব প্রমাণও তাঁর কাছে আছে। এ ব্যাপারগুলো তিনি চেপেই যাবেন, কারণ এ পরিবারের লোকদের তিনি পরমাত্মীয় বলে মনে করতে সুরু করেছেন। জিনিসগুলোকে কিছুদিন পর হরিবিলাস সা'র বাড়ীর অদূরে কোনও ঝোপের মধ্যে থেকে আবিষ্কার করাটাও তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না। কিন্তু যদি সত্য কথা এখন প্রকাশ হয় তা হলে ব্যাপার কি হবে ভাবুন দেখি! প্রমথেশ বাবুর ফাঁসি পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়, আর অনীতা দেবীর কম পক্ষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কেউ রোধ করতে পারবে না। তাঁর কথা শুনে বাবা প্রায় অজ্ঞান হবার মত হয়েছিলেন, আর দাদারা ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেবের মুখের দিকে অনুনয়মাখা দৃষ্টিতে চেয়ে অনবরত হাত কচ্‌লাচ্ছিলেন।

বিয়ের দিন তিনেক আগে অনীতা দেবী ছোট্ট একখানি চিঠি পান ছোড়দার কাছে থেকে—হাজত থেকে লেখা সেই চিঠির কথা এখনও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। লিখেছিলেন—'অনি, মহীতোষ বাবুর কাছ থেকে সবই শুনেছি। আশীর্ব্বাদ করবো না অভিশাপ দেব তোকে ঠিক করতে সময় লেগেছে আমার। নিজেকে কি তুই বলি দিলি? জানি না তোর ভবিষ্যৎ কি! ভবিষ্যতের কথা বলতে কিন্তু হাসি পায় আমার। পরাধীন জাতির ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বলতে আছে কি কিছু? যাই হোক, শেষটায় মনস্থির করে ফেলেছি—সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি আজ তোকে। নাঃ—মহীতোষ বাবুর বাহাদুরি আছে। একজন বিপ্লবীর বোনকে বিয়ে করার মধ্যে তাঁর সাহস আছে বলতে পারিস। তিনি চতুর লোক—তাঁর বড় কর্ত্তাদের অনুমতি নেওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। একটি বিপ্লবী

পরিবারকে ভুলপথ থেকে ফেরানোর জন্ত তাঁর এই স্বার্থত্যাগ নিশ্চয়ই তাঁর বড়কর্তারা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমোদন করেছেন। আমার মনে হচ্ছে—তাঁর এই সাহস ও আত্মত্যাগের কথা তোদের বিয়ের পর সংবাদপত্রেও ঘোষিত হবে।

একটা কথা ভাবছি। 'ইউজেনিকস্' সম্বন্ধে আমার ষ্টাডি করার খেয়াল আছে। 'হেরিডিটি' সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অপরিসীম। এমন দিন যদি আসে—অর্থাৎ যদি তোর কোনও দিন সন্তান হয়—তাহলে সে কি প্রকৃতি নিয়ে জন্মাবে আমি ভাবতে চেষ্টা করছি। হয়ত সেদিন আর আমি থাকব না এ পৃথিবীতে—যাক সে কথা। আবার তোকে আশীর্ব্বাদ করছি ভাই। সুখী হতে চেষ্টা করিস। ও জিনিসটা কারও আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা রাখে না—নিজের উপরই নির্ভর করে। আর দেশের দীনদুঃখী, লাঞ্ছিতদের কথা মনে রাখিস্ মাঝে মাঝে। আর বলার কিই বা আছে আমার।'

ছোড়দার টুকরো টুকরো অর্থপূর্ণ কথাগুলো তাঁর বুকে দাগ কেটে বসে আছে। কি করে যে তাঁদের পরিবারে এমন এক মানুষের জন্ম হ'ল—তা ভাবতেও অবাক লাগে। ছোড়দা বলতেন—মা আর মাতৃভূমি—এদের কি ভোলা যায় কখনও। বাইরে যখন ঘুরি এ দেশের মাটি, গাছপালা, পশুপক্ষী,—মানুষের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার সময় কাটে—আর বাড়ীতে ফিরে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে চেয়েও আমার সাধ মেটে না। জানি, অমন মা পেয়েছিলাম—তাই এ বাড়ীতে এখনও টিকে আছি—নইলে যে কি করতুম জানি নে।

অনীতা দেবীর বিয়ে হ'ল বটে, কিন্তু ছোড়দার মুক্তি হ'ল না। তবে সাজা তাঁর খুবই কম হয়েছিল—মাত্র দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড। স্বামী হেসে বলেছিলেন—এ শুধু তাঁরই চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

জেল থেকে বেরোবার পর ছোড়দাকে তিনি একবার দেখেছেন। মা তখন ইহলোকে নাই। তাঁর গম্ভীর মুখ, শীর্ণ চেহারার দিকে চেয়ে জল এসেছিল চোখে। ছোড়দার চোখের জ্যোতি যেন তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছিল আরও। কিছুদিন পরই তিনি নিরুদ্দেশ হন। তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী শোনা যেতে লাগল তার পর থেকে। পুলিস তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে গোটা দেশময়। জীবিত কি মৃত যে কোনও অবস্থায় তাঁকে ধরে আনতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কারের ঘোষণাও করা হয়েছে নাকি। কিন্তু জীবন্ত তাঁকে ধরতে পারলে না কেউ। মৃত্যু হ'ল তাঁর অভিমন্যুর মত বাংলার সীমান্তে এক অরণ্যের মধ্যে তিনি আর তাঁর দুই জন শিষ্য অগণিত পুলিস বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে। শেষ গুলিটি নিজের বুকে বিদ্ধ করেন তিনি।...

মায়ের কাছে শুয়ে আনন্দ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে বলছিল—মা, একবার দেখতে যদি সেই বীরের মৃত্যু-দৃশ্য। কতই বা বয়স হবে তার—হয়ত তের-চৌদ্দ। ধর্ম্মতলা দিয়ে এগোতে দেখে না আর ছেলেদের মিছিল। অজস্র পুলিস লাঠি নিয়ে বন্দুক নিয়ে সামনের পথ আটকে রয়েছে। উগ্রমূর্ত্তি সার্জেন্টরা রিভলভার হাতে নিয়ে ঘুরছে। ঘোড়-সওয়ার পুলিস ভিড়ের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আশ্চর্য্য ছেলেটির তেজ। দৃঢ়হস্তে পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে সবার সামনে। মাঝে মাঝে বলছে—বন্দে মাতরম্। এর প্রতিধ্বনি সকলের মুখে।... 'জয় হিন্দ'। 'চলো চলো দিল্লী চলো'।

ক্রুদ্ধকুটিল নেত্রে এগিয়ে এল রিভলভার বাগিয়ে ধরে এক সার্জ্জেণ্ট।...শাট আপ, বয়।

—'বন্দে মা-ত র-ম্'। 'চল চলো—দিল্লী চলো'।...উত্তর দিলে ছেলেটি।

রিভলভার উঁচিয়ে সার্জ্জেণ্ট বললে—আই সে, শাট আপ।

ছেলেটির মুখে অদ্ভুত হাসি খেলে গেল—সে উচ্চস্বরে বললে—বন্দে—। হাতের কব্জি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে সার্জ্জেণ্ট।

—মা—ত—রম্—ডান হাতের কব্জি ঝুলে পড়ল। বাঁ হাতে শক্ত করে পতাকা ধরে ছেলেটি অবিচলিত স্বরে বললে আবার—চলো চলো—দিল্লী চলো। ব-ন্দে মা-ত-রম্!

কিন্তু সার্জ্জেণ্ট আবার ছুঁড়লে গুলি কপাল লক্ষ্য করে। ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পাশেই ছিল আর একটি ছেলে; পতাকাটিকে সে প্রাণহীন ছেলেটির হাত থেকে নিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে।...

অনীতা দেবী শিউরে উঠলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে এল —তিনি আর্ত্তনাদের সুরে বলে উঠলেন—উঃ! বলিস কিরে আনন্দ!

আনন্দ বলতে লাগল—কিন্তু তার পর কি যে হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। দেখলাম ভিড়ের চাপে আমরা দুই তিন জন আধখোলা দরজার মধ্যে দিয়ে একটা দোকানঘরে ঢুকে পড়েছি। দোকানের লোক তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বিবর্ণ মুখে বললে—পালাও ছোকরারা পেছনের দরজা দিয়ে গলির মধ্যে। এখনই হয় তো আসবে পুলিস।...বলতে বলতে দরজায় ধাক্কার শব্দ। আমাদের তাড়াতাড়ি পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিলে তারা। যেতে যেতে শুনতে পেলাম ক্রুদ্ধ স্বরে এক সার্জ্জেণ্ট বলছে—ষ্টুডেণ্ট লোক কাঁহা? দোকানী বলছে—কোথায়, এখানে আবার ষ্টুডেণ্ট কোথায়। স্বপন দেখতা হ্যায় নাকি সাহেব। দেখ সাহেব ভাল করে দেখ—কেউ নেই এ ঘরে।

—মা, কুকুরের মত পালিয়ে এসেছি। সঙ্গে আরও অনেকে ছিল, কি অবস্থা হ'ল খোঁজ নিতেও পারি নি। তারা মলো না বাঁচলো কিছু জানি নে। কাল কিন্তু আটকে রাখতে পারবে

না—একবার খোঁজ নিতেই হবে আমাকে। বাবা বারণ করলেও শুনবো না কিন্তু আমি।

—কালকের কথা কাল হবে—এখন ঘুমো দেখি···তিনি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আনন্দ ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু সে রাত্রে তিনি আর দুই চোখের পাতা এক করতে পারলেন না—জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি।

সকাল বেলায় ছেলেকে না দেখে আবার মহীতোষ বাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অনীতা দেবীকে বললেন—আবার ও গেল কোথায়? নাঃ, জ্বালাতন করে মারলে দেখছি।

অনীতা দেবী একটু হেসে বললেন—থাম, থাম সকাল থেকেই ব্যস্ত হতে হবে না।

মহীতোষ বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—তোমার মত পাগল হই নি তো আমি। ব্যস্ত হবে না বললেই হ'ল। যেমন হয়েছে ছেলে—তেমনি তার মা। ওকে একটু সাবধান করে দিও তুমি—আমার কথা তো কানেই তোলে না। আমার দশটা নয়—পাঁচটা নয়—ঐ এক মাত্র ছেলে। ব্যস্ত হব না!

আনন্দ ফিরে এল হাসিমুখ নিয়ে। জয় হয়েছে ছাত্রদের। তাদের মিছিল গিয়েছে আজ ডালহৌসি স্কোয়ারে। পুলিসের বাধা গ্রাহ্য না করায় পুলিসই সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

আনন্দের আনন্দ আজ আর ধরছে না। বাপের সামনে সে বড় একটা কথা বলত না, আজ সবিস্তারে তাঁরই সামনে বলতে লাগল ছাত্রদের বিজয়কাহিনী। এককালের পুলিসের বড়কর্তা মহীতোষ বাবু স্তম্ভিত হলেন। পুলিসের পরাজয়? নাঃ, আজকালকার ব্যাপার সত্যিই বদলে গেছে দেখছি!

কয়েক দিন পরের কথা। আনন্দ মুখ গম্ভীর করে মাকে বললে—সবাই বাড়ী সাজাচ্ছে—আমাদেরই বুঝি বাদ যাবে না?

অনীতা দেবী হেসে বললেন—সবাই সাজাচ্ছে বুঝি?

—সাজাবে না? মেজর-জেনারেল শাহ নওয়াজ আসছেন যে। যে-সে লোক নয়—নেতাজীর রাইট্ হ্যাণ্ড। তা ছাড়া স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬শে জানুয়ারী। কংগ্রেসের আদেশ প্রত্যেকটি বাড়ী সাজাতে হবে স্বরাজ-পতাকা দিয়ে। রাত্তিরে জ্বালাতে হবে আলো। শান্তিনিকেতন থেকে পরিকল্পনা বেরিয়েছে—নন্দলাল বসুর পরিকল্পনা। কি ভাবে সাজাতে হবে—মঙ্গলঘট, নিশান—। কি লজ্জা বল দেখি যদি আমাদের বাড়ী বাদ যায়। একেই তো রায়বাহাদুরের ছেলে বলে সবাই টিটকারি দেয়—বাবার আর কি!

অনীতা দেবী হেসেই বললেন—কেন বাদ যাবে কেন? তুইও সাজা না বাড়ী?

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বললে—তুমি তো বলছ এই কথা। কিন্তু বাবার মনের কথা তো তুমি জানো।

—কেন তুই মত নিবি তাঁর।

—মত দেওয়ার মতই লোক তিনি। একটু বাইরে গেলেই তাঁর যে ভয়! কিন্তু এমনি করে তোমরা আমাকে আটকে রাখতে পারবে না বলে দিচ্ছি। আমি ঠিক করেছি কংগ্রেসে জয়েন করব—এ বাড়ীতে আমার আর থাকা হবে না।

অনীতা দেবী ছেলের অভিমান দেখে হাসলেন—আবার বললেন—কেন এ বাড়ীতে থেকে কাজ করা যায় না বুঝি?

উত্তেজিত স্বরে আনন্দ বলল—না—না—না। যায় না। তুমি সব জান তবু তোমার ঐ কথা। তোমাদের বাড়ী একটা জেলখানা—এখানে আমার দম আটকে আসে।

মহীতোষ বাবু নিকটেই কোথায় ছিলেন, ছেলের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে কাছে এসে বললেন—দম আটকে আবার কার আসে? কেন, হয়েছে কি?

আনন্দ মুখ গম্ভীর করে রইল। অনীতা দেবী বললেন—ও বাড়ী সাজাতে চায়।

মহীতোষ বাবু হেসে বললেন—বাড়ী সাজাতে চায়? সাজাক না। কত টাকা লাগবে ওর? হ্যাঁ, এ বয়সে একটু আর্টিষ্টিক টেণ্ডেন্সী থাকা ভাল। আচ্ছা তোর প্ল্যানটা শুনি দেখি। সত্যি এ বাড়ীটা বাজে, ডেকস্, ফার্ণিচারে জঞ্জাল বনে গিয়েছে। দম বন্ধ হয়ে আসা বিশেষ আশ্চর্য্য নয়। আমারও ছিল ছোটবেলায় এ সব দিকে টেষ্ট—পুলিসের কাজে ঢুকে সবই গিয়েছে রসাতলে।

অনীতা দেবী পুত্রের থমথমে মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর বললেন—না, বেশী কিছু লাগবে না ওর, গোটা পঁচিশেক টাকা হলেই হবে, কি বলিস আনন্দ? একটা বড়গোছের স্বরাজ-পতাকা—আর কতকগুলো ছোট ছোট—তা ছাড়া, আচ্ছা দেখানা রে ওঁকে কি পরিকল্পনা বেরিয়েছে শান্তিনিকেতন থেকে। ওঁরও তো আর্টিষ্টিক টেষ্ট ছিল বললেন না—!

ভ্রূ কুঁচকে মহীতোষ বাবু বললেন—তার মানে? স্বরাজ-পতাকা? আমার এখানে? পাগল হয়েছ!

কিন্তু দেখা গেল তিনিই পাগল হয়েছেন। বিকেলবেলায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন তিনি। গৃহে তাঁর শান্তি নাই। বহু অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী তাঁর বন্ধু। তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইবেন। তাঁর স্ত্রী আর ছেলে যে একটা ষড়যন্ত্র করেছে তা বুঝতে আর তাঁর বাকি নাই। মান-ইজ্জত গেল তাঁর সরকারের কাছে এবার। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন অদ্ভুত চঞ্চলতা। ছোট ছেলেমেয়েদেরই উৎসাহ বেশী। এক দল বলছে চলো চলো—। আর এক দল বলছে—দিল্লী চলো। ছাদে ছাদে অত্যন্ত কর্ম্মতৎপরতা। এরই মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছে বাড়ীর ছাদে। প্রথমে গেলেন অনুকূলবাবুর বাড়ী। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে ডিষ্ট্রিক্টের চার্জ্জও পেয়েছিলেন। রায়বাহাদুর খেতাবটিও তাঁর

আছে। সুতরাং তাঁকে অনেকটা নিজের সমকক্ষ মনে করেন তিনি। মহীতোষ বাবু দেখে বিস্মিত হলেন অনুকূলবাবু ছাদের উপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছেন—ঠিক কোন্ জায়গাটায় স্বরাজ পতাকাটি তুললে মানাবে ভাল।

মহীতোষবাবুকে দেখে অনুকূলবাবু সহাস্যে অভ্যর্থনা করে বললেন—এস ভাই এস। ছেলেমেয়েরা নাছোড়বান্দা, বলছে স্বরাজ-পতাকাটা আমাকেই 'হয়েষ্ট' করতে হবে। গোলামি করেও মনুষ্যত্বের কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা ওরা তাই যাচাই করতে চায়। ডেঁপো ছেলেমেয়েদের কথা শুনেছ! কি আর করি বল—স্বীকার করেছি।

মহীতোষবাবু সেখান থেকে আরও কয়েক জায়গা ঘুরে একই ব্যাপার দেখলেন, তারপর বাড়ী ফিরেই ডাকলেন—আনন্দ, আনন্দ!

আনন্দ এল না—এলেন অমীতা দেবী। মহীতোষবাবু বললেন—কই তোমার ছেলেকে ডাক দেখি।

অমীতা দেবী মুখ ভার করে বললেন—কেন, আবার ছেলের খোঁজ কেন? শুয়ে আছে ও ঘরে।

শুয়ে? এ অসময়ে আবার শোয়া কেন? অসুখ-বিসুখ করে নি তো? না জানালে দেখছি। দেখ, একটা ছেলে হয়েই না আমার যত মুশকিল হয়েছে। ভাবতে ভাবতেই গেলাম আর কি! ডাক, ডাক একবার তাকে।

তাঁর ভাব দেখে অমীতা দেবী বিস্মিত হলেন। আনন্দ আসতেই হাসিমুখে মহীতোষবাবু বললেন, কত টাকা তুই চাস বল দেখি। বিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ? যা নিয়ে যা এই টাকা! বাড়ী আমাদের সাজাতেই হবে। ছাদের উপর স্বরাজ-পতাকা 'হয়েষ্ট' করব আমি নিজে। আর ঐ যে কি সব পরিকল্পনার কথা বলছিলি—ঠিক সেই ভাবে সাজাতে হবে কিন্তু। অনুকূল ভাবছে বড় বাহাদুরি করে যাবে ও। সেটি হচ্ছে না। জানে না তো কত বড় বিপ্লবীর জন্মদাতা আমি।—নিজের রসিকতায় নিজেই তিনি হেসে ফেটে পড়লেন।

ছেলের দল ভেঙে পড়েছে ছাদে। স্বরাজ-পতাকা উড়ছে রায়বাহাদুরের বাড়ী। রায়বাহাদুর স্বহস্তে পতাকা উড়িয়েছেন। আনন্দ তার মা আর বাবাকে প্রণাম করলে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল তাঁদের পদধূলি নিতে লাগল।

পত্ পত্ করে উড়ছে স্বরাজ পতাকা। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন অমীতা দেবী। মনে পড়ল ছোড়দার মুখ, তাঁর দরদভরা অথচ তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি। চোখ তাঁর জলে ভরে এল। ভাবলেন—ছোড়দার অভিলাষ, তাঁর স্বপ্ন কি সত্য হবে এবার!

প্রণতি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

হে মোর দেবতা, হে চির-সাধনা, খুলিল দুয়ার তব?
পূর্ব্ব-তোরণে দেখা দিল আজি, রক্তিম ছটা নব?
আঁধার তবে কি বিদূরিত হ'ল রজনীর অবসান?
গুঞ্জন সাথে কুঞ্জ-কানন গাহে আগমনী গান?
হে দেবী শুনাও—এ নহে মিথ্যা, এ নহে ভ্রান্তিজাল;
এ নহে ক্ষণিক স্বপ্ন-বিলাসী কল্পনা-জঞ্জাল;
এ নহে ব্যথা ও বেদনায় ভরা চিত্তের মোহভার,
চির-আরাধ্য খুলিলে আজি কি রুদ্ধ তোমার দ্বার?

অর্ঘ্য তাদের হৃদয়-কমল উপাড়িল অবহেলে,
রুদ্ধ তোমার দুয়ার বাহিরে অনায়াসে গেল ফেলে।
তোমার চরণ-পদ্ম-পরশ পাবে কি পাবে না তাহা,
সে নহে ভাবনা—যজ্ঞ-অনলে জ্বলিল স্বধা ও স্বাহা।
আপন অস্থি ত্যজিয়া দধীচি রচিল বজ্র-জ্বালা,
উপাড়ি হৃদয় রচিল হেথায় রক্তজবার মালা।
অন্তর-তর বাসনার রাগে রঞ্জিছে বার বার,
হে মোর দেবতা, হে চির-সাধনা রুদ্ধ তোমার দ্বার।

আঁধারে হেরেছি, ঝঞ্ঝা হেরেছি, হেরেছি কুজ্ঝটিকা;
হেরেছি কালের করাল দংষ্ট্রা, মৃত্যুর বিভীষিকা;
হেরেছি হেথায় ঝরে' ঝরে' যায় কচি কচি কিশলয়;
মুকুলের বুকে নাচিতে হেরেছি তাণ্ডব নির্দ্দয়;
বেদনার গলা অশ্রু হেরিয়া হেসেছে অট্টহাস;
মানুষের বেশে চারিদিকে ঘোরে পশুদের ক্রীতদাস!
তবুও হে দেবী, ব্যর্থ-হৃদয় মানুষের সাধনায়
অশ্রু-আনত অন্তর আনে অর্ঘ্যের উপচার।

সন্দেহ জাগে, সংশয় জাগে, সঙ্কট-ভরা পথ,
আলোয়ে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় দুর্গম পর্ব্বত।
অন্ধকারের নাগিনীরা ফোঁসে বিষাক্ত নিশ্বাস,
দানবেরা রোধি মানবের পথ জাগায় অবিশ্বাস।
হয় ত তোমার খুলিবে না দ্বার রুদ্ধ রহিবে আজো,
হৃদয়-তন্ত্রে চির সাধনার বীণাখানি যদি বাজো,
বন্দীরা আসি দেখে যাবে দ্বারে সার্থক সাধনায়
নয়ন-গলিত অশ্রু-সজল প্রণতি বন্দনায়।

নিখিলনাথ রায়

১৮৬৫-১৯৩২

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্য ও শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে বহু সাধকের উদ্ভব হইয়াছিল। দেশ ও জাতির ইতিহাস রচনায় অনেকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিলেন ; সাহিত্যিক ঐতিহাসিক হিসাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও নিখিলনাথ রায়কে আমরা স্মরণ করিব। নিখিলনাথ শুধু নিজে ইতিহাস-সাহিত্যের সেবা করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, কোন কোন নবীন লেখককেও আন্তরিক উৎসাহ দানে এই পথের পথিক করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখক তাঁহাদের অন্যতম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (পৌষ ১২৭২)* ২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রামে নিখিলনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা জানকীনাথ রায়, মাতা—বসন্তকুমারী। তিনি তাঁহার শৈশব-জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন :—

"আমার কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই বর্ষ বয়সের সময় পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন।...আমি স্নেহময়ী জননীর চেষ্টায় লালিত পালিত হইয়া, পুঁড়ার আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাহার পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে আমার মাতৃস্বসার নিকট আগমন করি। আমার মাতৃস্বসা বহরমপুরের জমিদার সুপ্রসিদ্ধ সেন মহাশয়ের বাটীতে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী বিশ্বম্ভর সেন মহাশয় আমার পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃপুত্র এবং ডাক্তার রামদাস সেনের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। আমি যখন বহরমপুরে আসিয়াছিলাম, তখন বিশ্বম্ভর সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের যত্নে আমি ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করি। আমি প্রথমতঃ খাগড়া মিসনরি স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতে আমি একটু একটু কবিতা লিখিতে পারিতাম। বহরমপুরে আসিয়া আমার কবিতা লেখার বেগ বর্দ্ধিত হয়। অনেকে তজ্জন্য আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমি 'রাজপুতকুসুম' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করি। তাহাতে দ্বাদশটি রাজপুত বীরের কীর্ত্তি কবিতায় রচিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালে 'রাজপুতকুসুম' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। যদিও আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভালবাসিতাম বটে, কিন্ত বাল্যকাল হইতেই ইতিহাসই আমার আদরের পাঠ্য ছিল। 'রাজপুতকুসুম' ইতিহাস ও কবিতা উভয়ের প্রতি অনুরাগেরই ফল। এই পঠদ্দশা-



নিখিলনাথ রায়

কালে আমি রাজস্থান, সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ আদরের সহিত পাঠ করিতাম এবং বহরমপুরের ভাগীরথীতীরে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতাম। এই সময় হইতে আমি

* শ্রীযুত ত্রিদিবনাথ রায় পিতার এই জন্মতারিখ আমাকে জানাইয়াছেন।

বহরমপুর, কাশীমবাজার ও কোন কোন সময়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া, তৎসম্বন্ধে গল্প-গুজবাদি শুনিতে ভালবাসিতাম। এই সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা দেশের মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে, আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। আমরাও সেই স্রোতে বিচলিত হইয়াছিলাম। তজ্জন্য 'রাজপুত-কুসুম' সুরেন্দ্রবাবুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা-স্রোতে বিচলিত হইলেও, আমি সে বক্তৃতায় স্বদেশের প্রতি একটা অনুরাগের আভাস পাইয়াছিলাম। তাহার ফলে আমার ইতিহাস আলোচনা আরও বাড়িয়া যায়। যখন এক দিকে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলন বঙ্গদেশে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। বহরমপুরও সেই স্রোতে ভাসমান হয়। বহরমপুর তাঁহাদের একটি প্রিয় স্থান ছিল; তাঁহাদের যত্নে বহরমপুরে একটি 'সুনীতি সঞ্চারিণী' সভা স্থাপিত হয়। আমি তাহার এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলাম। এই সভা হইতে আমার কবিতা-রচনা দিন দিন বর্দ্ধিত ও প্রবন্ধ-রচনা আরব্ধ হয় এবং বক্তৃতা করিতেও শিক্ষা করি। ফলতঃ এই সুনীতি সঞ্চারিণী সভা আমাকে বাঙ্গলা লেখাইতে শেখায়। সুনীতি সভা কেবল লেখা শিখাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা দ্বারা আমরা যথাসাধ্য চরিত্রগঠনেরও সাহায্য পাইয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও পরমারাধ্য চূড়ামণি দেবের সংস্রবে থাকিয়া আমরা নানা বিষয়ে উপকার লাভ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ চূড়ামণি দেবের অনুগ্রহ চির দিন সমভাবে বিরাজমান থাকায়, পরিণামে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। এই সুনীতি সভা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের একটা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর আন্দোলনে বিচলিতচিত্ত সংযত হইয়া, কোন উচ্চতর কর্ত্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার ফলেও স্বদেশের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত আলোচনায় আরও আদর বাড়িয়া যায়। এই সময়ে আমি ডাক্তার রামদাস সেনের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হই; আমি তাঁহার তৃতীয়া কন্যার [সুরসুন্দরীর] পাণিগ্রহণ করি। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ আলোচনা, তাঁহার নিকট হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য শ্রবণ ও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ দেখিয়া, আমার ইতিহাসপাঠের প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। কয়েক বর্ষ খাগড়া মিশনারি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, আমি বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হই। এই সময়ে আমি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য কিছু কিছু অধ্যয়নও করিয়াছিলাম। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর নিকট আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করিতাম। তিনি ইতিহাসের প্রতি আমাদের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য যত্ন লইতেন; তজ্জন্য ইতিহাস-পাঠের প্রতি আরও অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে কবিতা-রচনাও একেবারে পরিত্যাগ করি নাই। কিন্তু প্রবন্ধ-রচনার প্রতি দিন দিন মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া আমি বড় ভাল থাকিতাম; কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশির যুদ্ধ,' হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও 'কবিতাবলী' আমার প্রিয় পাঠ্য হইল। এইরূপ সময়ে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তাহার পর উক্ত কলেজ হইতে ক্রমে এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।* কলেজ বিভাগে অধ্যয়নকালে বহরমপুর কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শিক্ষাগুণে স্বাধীন অনুসন্ধানের প্রতি একটি অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই সময়ে ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ের ও বহরমপুর কলেজের পুস্তকালয়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ আমি দেখিতে আরম্ভ করি। আমার কলেজ বিভাগে পাঠারম্ভের প্রথমেই ডাক্তার সেন মহাশয় পরলোকগত হন [১১ আগষ্ট ১৮৮৭]। তিনি জীবিত থাকিলে আমার ইতিহাস-চর্চ্চা আরও বর্দ্ধিত হইত। ঐ সময়ে আমি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতাম। ক্রমে আমার মুর্শিদাবাদের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা হয়। তৎকালে আমার কবিতা-লেখা দেশে অনেক পরিমাণে প্রশংসিত হইয়াছিল। 'অশ্রুহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক আমি বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত করিয়াছিলাম। 'জন্মভূমি' পত্রিকায়ও দুই একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম।... সুনীতি সভা হইতে প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিয়া আমি মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, প্রতিকার ও অনুসন্ধান পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার পর বি-এ পাসের পর আমি মুর্শিদাবাদের ই,তহাস লিখিতে আরম্ভ করি। এই সময়ে আমি সংস্কৃত এম-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। কিন্তু ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকায় তাহাতে ফললাভ করিতে পারি নাই। এই সময়ে বহরমপুর হইতে 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। আমি তাহাতে অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত

* বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে জানা যায়, নিখিলনাথ ১৮৮৭ সনে (বয়স ১৫ বৎসর) বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৮৮৯ সনে বহরমপুর কলেজ হইতে তৃতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৯২ সনে বহরমপুর কলেজ হইতে বি-এ, এবং ১৮৯৭ সনে বহরমপুর কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিগণের বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ঐরূপ প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'নব্য-ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রকাশ করিয়াছিলাম।··· পরিশেষে ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আমি ১৩০৪ সালে 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' প্রকাশ করি। ইংরেজী ১৮৯৭ সালে আমি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৮ সালের মে মাস হইতে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হই। বহরমপুর জজ আদালতে ৪ বৎসর ওকালতীর পর আমি কলিকাতায় আসি ও ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি। ১৩০৯ সালে··· কাশীমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রাজসম্পত্তি প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই আমার ইতিহাস আলোচনায় উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক' ১৩১১)

নিখিলনাথ হাইকোর্টে ও ছোট আদালতে কিছু দিন ওকালতী করিবার পর পুনরায় বহরমপুরে ফিরিয়া যান। তিনি ১৩১৪ সালে (ইং ১৯০৭) কাশীমবাজার-মহারাজের চাটি-বালিয়াপুরের জমিদারীর নায়েবী-পদ লাভ করেন। ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) তিনি চাকুরী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসেন।

১৯৩২ সনের ৪ঠা নবেম্বর (১৮ কার্ত্তিক ১৩৩৯), ৬৭ বৎসর বয়সে, নিখিলনাথ পরলোকগমন করিয়াছেন। বেলা ৮-৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার ১৫ মিনিট পরেই তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন।

মাসিকপত্র সম্পাদন

নিখিলনাথ যে-সকল সাময়িক-পত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

'ঐতিহাসিক চিত্র'।—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (পৌষ-ফাল্গুন ১৩০৫) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রাজশাহী হইতে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে—১৩১১ সালের ভাদ্র মাস (ইং ১৯০৪) হইতে নিখিলনাথের যত্নে মাসিকপত্র-রূপে 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র ২য় পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন :—

"আজকাল বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে ইতিহাস-আলোচনায় স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কি সাহিত্যজগৎ, কি নাট্য-জগৎ সর্ব্বত্রই ইতিহাসের সমাদর দেখা যাইতেছে। বঙ্গবাসিগণ যে ক্রমে ক্রমে ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, ইহা দেশের শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস যে, ইতিহাস-আলোচনায় দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অধঃপতিত জাতির পক্ষে ইতিহাসালোচনাই একমাত্র সান্ত্বনা বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর যে যে জাতি অবনতির রসাতলে শায়িত হইয়াও আবার উন্নতির উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেই সেই জাতির পক্ষে ইতিহাস-আলোচনা অনেক পরিমাণে বলসঞ্চারের সহায়তা করিয়াছে। বিশেষতঃ যে জাতির অতীত ইতিহাস গৌরব-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, উন্নতিলাভ তাহাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়া উঠে। সুখের বিষয় ভারতের অতীত ইতিহাসের অভাব নাই। পাশ্চাত্ত্য ভাবে লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও অসংখ্য গ্রন্থের পত্রে পত্রে, শিলাপত্রে ও তাম্রখণ্ডে ভারতের অতীত কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। যে বাঙ্গালী জগতের সমক্ষে হেয় বলিয়া পরিচিত, তাহারও অতীত কাহিনীর অভাব নাই। বর্ত্তমান সময়ে নানা দিক হইতে তাহার অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। তাই এই ঐতিহাসিক যুগে জনসাধারণের—বিশেষতঃ ভবিষ্যতের আশা-স্থল ছাত্রবৃন্দের নিকট ঐতিহাসিক কথাপ্রচারের জন্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র অবতারণা। ঐতিহাসিক চিত্র কেবল নানা স্থান হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ঐতিহাসিক চিত্র যোগ্যতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, অর্থাৎ সে ঐতিহাসিক চিত্র প্রধানতঃ স্বাধীন অনুসন্ধান ও আলোচনার ফলপ্রদর্শনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ইতিহাস সাধারণের পক্ষে আদরের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ সেরূপ অনুসন্ধান ও আলোচনার ফল-পাঠকের সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় অচিরেই তাহার অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক চিত্র নানা স্থানের ও নানা প্রকারের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। পূর্ব্বতন চিত্রের সহিত বর্ত্তমান চিত্রের পার্থক্য থাকিলেও চিত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে বর্ত্তমান পত্র 'ঐতিহাসিক চিত্র' নাম ধারণ করিয়াই আবির্ভূত হইল।···জাতীয় ইতিহাস-আলোচনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও, জগতের উন্নতিশীল জাতিগণের ইতিহাসও প্রকটিত করিতে ঐতিহাসিক চিত্র চেষ্টা করিবে। কারণ কেবল স্বদেশীয় নহে, বিদেশীয় ইতিহাস-আলোচনাও উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। সেইজন্য ঐতিহাসিক চিত্র জাতীয় ও বিজাতীয় উভয়বিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ইতিহাস-আলোচনার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ঐতিহাসিক সংবাদও প্রকাশিত হইবে।···"

প্রথম পর্য্যায়ের ন্যায় ২য় পর্য্যায়ের 'ঐতিহাসিক চিত্র'ও এক বৎসর পরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহার ৩য় পর্য্যায় আরম্ভ হয়—১৩১৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে। নিখিলনাথের সম্পাদনায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' ৭ বৎসর চলিয়াছিল।

'শাশ্বতী'।—'ঐতিহাসিক চিত্রে'র প্রচার রহিত করিয়া নিখিলনাথ ১৩২০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'শাশ্বতী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা চারি বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংখ্যায় "সূচনা"য় লেখেন :—

"শাশ্বতী যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যে দেশীয় ভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারে, তাহারই জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। শাশ্বতী আমাদের ধর্ম্মের কথা, সমাজের কথা, দর্শনের কথা, সাহিত্যের কথা বলিবে, আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথাও মধ্যে মধ্যে শুনাইবে।...যাহাতে দেশের লোকে দেশেই ফিরিয়া আসে, শাশ্বতী তাহারই চেষ্টা করিবে। যাহাতে আমাদের সমাজ শান্ত ও সংযত হয়, তাহাই তাহার উদ্দেশ্য থাকিবে, এবং লোককে ধর্ম্মালোচনারও পথ দেখাইয়া দিবে। ইহাই শাশ্বতীর মূলমন্ত্র থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-বিজ্ঞানালোচনাও ইহার কলেবরকে অলঙ্কৃত করিবে। রাজনীতির সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না।...

আমরা ঐতিহাসিক চিত্রকে শাশ্বতীর অঙ্গীভূত করিলাম। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসালোচনা সম্ভবপর নহে। সেইজন্য ঐতিহাসিক চিত্রকে প্রতিসংহার করিতে হইল। আমাদের ইতিহাসালোচনার জন্য অতঃপর শাশ্বতীতেই প্রকাশিত হইবে।"

'পল্লী-বাণী'।—নিখিলনাথ আরও একখানি মাসিক পত্রিকা দুই বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন; উহা 'পল্লী-বাণী'। ইহার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩২৭) "আমাদের কথা"য় তিনি লিখিয়াছেন :—

"বসিরহাটে বাণীসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম বৎসরের বাণী-পূজায় সকলে আমাদিগকে পুরোহিতের কাজ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আহ্বান আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই। বসিরহাট মহকুমাতেই আমাদের জন্মভূমি। জন্মভূমির লোকদিগের আহ্বান কে উপেক্ষা করিতে পারে? বাণী-সম্মিলনীর সঙ্গে সঙ্গে 'পল্লী-বাণীর'ও আবির্ভাব হয়। কাজেই আমরা সেই সময় হইতেই 'পল্লী-বাণী'র সহিত জড়িত হইয়া পড়ি। এখন ইহার প্রাণদাতা [ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী] যখন ইহাকে লালন পালন করিতে পারিয়া উঠিতেছেন না, তখন আমাদের ইহার সহিত যে সম্বন্ধটুকু রহিয়াছে, সে সম্বন্ধটুকু ছিন্ন করা উচিত নহে মনে করিয়া, আমরা ইহার সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিলাম।"

নিখিলনাথের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। অশ্রুহার (কাব্য)। ? । পৃ. ৯৯।

বিবাহের বৎসরখানেক পূর্ব্বে রচিত ও বিতরণার্থ মুদ্রিত প্রেম-নিবেদন।

২। রাজপুতকুসুম (গীতিকাব্য)। বৈশাখ ১২৯১ (ইং ১৮৮৪)। পৃ. ১০০।

"দ্বাদশটি সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত-বীরের বীর-কার্য্য-বর্ণন গীতিকাব্য।" এই দ্বাদশটি বীর :—বাপ্পা রাও, সমর সিংহ, পৃথ্বীমল্ল, বাদল, হামির, চণ্ড, কুম্ভ, পৃথ্বীরাজ, সংগ্রাম সিংহ, জয়মল্ল ও পুত্ত, প্রতাপ সিংহ, রাজসিংহ।

পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কবি ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন।

৩। ডাক্তার রামদাস সেন (জীবনী)। পৃ. ১৬

আমরা এই পুস্তিকাখানি দেখি নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহার ২য় সংস্করণের প্রকাশকাল—৭ আগষ্ট ১৮৯৯।

৪। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী (ঐতিহাসিক চিত্র)। শ্রাবণ ১৩০৪ (১ জুলাই ১৮৯৭)। পৃ. ৫৫০+৩৬।

সূচী :—কিরীটেশ্বরী, কাশীমবাজার, রাজা উদয়নারায়ণ, কাটরার মসজীদ (জাহানকোষা তোপ), রোশনীবাগ (কর্ত্তাবাগ), জগৎ শেঠ, বঙ্গাধিকারী, গিরিয়া, একটি ক্ষুদ্র কাহিনী, আলিবর্দ্দীর বেগম, ভগবানগোলা, মতিঝিল, হীরাঝিল, লুৎফ উন্নেসা, পলাশী, খোসবাগ, জাফরাগঞ্জ, উধুয়ানালা, বড়নগর, মহারাজা নন্দকুমার, কান্ত বাবু, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দেবী সিংহ, ব্যারা, একদিনের স্মৃতি, পরিশিষ্ট।

"এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত, সংসঙ্গ, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।" 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র ৪র্থ সংস্করণটি (শ্রাবণ ১৩২৪) পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত।

৫। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড। আশ্বিন ১৩০৯ (১৫ অক্টোবর ১৯০২)। পৃ. ৬৫০+১৯+২।

"এই গ্রন্থে মুসলমান রাজত্বের রাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে এদেশের বংশাবাজ ব্যক্তিগণের বংসামাজ কার্য্য ও কীর্ত্তি যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল, যথাসাধ্য তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার তৎসমুদয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ২য় খণ্ড ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল; নানা কারণে উহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

৬। সোনার বাঙ্গলা। ইং ১৯০৬ (২২ জুলাই)। পৃ. ১৫৭।

"স্বদেশী আন্দোলনে সকলের হৃদয়েই অন্নচিন্তার তুফান

উঠিয়াছে। সেই বিরাট আন্দোলন গ্রন্থকারেরও মর্ম্মস্পর্শ করায় সোনার বাঙ্গলার অবতারণা। আমাদের সোনার বাঙ্গলা পূর্ব্বেই বা কেমন ছিল, আর কিরূপেই বা ইহাতে ধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হয়, এবং সেই স্রোতরোধের জন্ত উপায়চিন্তা, ইহা লইয়া চারিটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। তাহাদের প্রথমটি 'বঙ্গদর্শনে' ও অপর তিনটি 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।"

৭। প্রতাপাদিত্য। ভাদ্র ১৩১৩ (২০ সেপ্টেম্বর ১৯০৬) পৃ. ৫১৩+১৪।

সূচী :—উপক্রমণিকা। রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (রামরাম বসু), টিপ্পনী, অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দের অর্থ, সমালোচনা। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র (হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার), মন্তব্য। অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র)। সারতত্ত্ব-তরঙ্গিণী (রামগোপাল রায়)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং, অনুবাদ। ঘটক-কারিকা, অনুবাদ, মন্তব্য। উদ্ভট-কবিতা (সানুবাদ)। Statistical and Geographical Report of the 24 Pergunnahs Dist. (Major Ralph Smyth,) অনুবাদ। Proceedings of the Asiatic Socy. for December 1868. Report of the Dist. of Jessore (J. Westland), অনুবাদ। Histoire Des Indes Orientales (Peirre Du Jarric), অনুবাদ। Relatio Historica De Rebus In India Orientali (Nicalao Pimenta), অনুবাদ। পরিশিষ্ট।

৮। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুক্রমণিকা ও পর্ব্ব-সংগ্রহ অধ্যায়। আষাঢ় ১৩১৪ (১৮ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ১১৩।

ইহা নিখিলনাথ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ভূমিকায় প্রকাশ :— "কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত অনুক্রমণিকা অধ্যায় ও পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক Intermediate in Arts পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত দুই অধ্যায় ছাত্রগণের দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমরা স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। ছাত্রগণের সুবিধার জন্ত ইহাতে শব্দার্থ ও টীকাটিপ্পনীও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ অর্থ নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুনমিশ্রের টীকা হইতে গৃহীত। কোন কোনটি পরমারাধ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিত হইয়াছে।"

৯। ইতিকথা। ভাদ্র ১৩১৫ (৪ অক্টোবর ১৯০৮) পৃ. ৩০২।

"কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রবাদ অবলম্বন করিয়া যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কথা উপাসনা ও ঐতিহাসিক চিত্রে লিখিত হইয়াছিল, একণে তাহাদিগের ইতিকথা নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইল।"

সূচী :—কল্যাণেশ্বরী, আহেরিয়া, প্রতিশোধ, রাখীবন্ধন, বৌঠাকুরাণীর হাট, অভিশাপ, প্রেমের জয়, আত্মদান।

১০। মরণ-রহস্য। আশ্বিন ১৩১৭ (১৬ অক্টোবর ১৯১০)। পৃ. ৬৪।

জীবন, মরণ, পরকাল, জন্ম-জন্মান্তর সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা।

১১। বারই ডিসেম্বর। ১৩১৮ সাল (জানুয়ারি ১৯১২)। পৃ. ১০।

১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দরবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'ঐতিহাসিক চিত্র' (পৌষ) হইতে পুনর্মুদ্রিত।

১২। জগৎ শেঠ। ১৩১৯ সাল (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৩১৭।

"জগৎ শেঠ প্রথমে 'উৎসাহ' পত্রে পরে 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, উক্ত পত্রদ্বয়ে জগৎ শেঠের কতকাংশ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। একণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।"

১৩। কবিকথা :

১ম খণ্ড, কালিদাস ও ভবভূতি। ১৩২২ সাল। পৃ.৫৬৬।

২য় খণ্ড, ভাস। ১৩২৬ সাল। পৃ. ৫১৬।

ইহাতে নাটকগুলি "কথা বা আখ্যায়িকার আকারেই লিখিত হইয়াছে।...সাধারণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন ইহাকে নাটকাবলীর অনুবাদ মনে না করেন।"

১৪। চুণার (ইতিহাস)। অগ্রহায়ণ ১৩২৫ (২০ জুন ১৯১৯)। পৃ. ৬৬।

১৫। সমাধান (উপন্যাস)। ১৩২৮ সাল। পৃ. ২১২।

"'মুরারেস্তৃতীয়: পন্থা:' চিরপ্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে তাহাই দেখান হইয়াছে।" পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারে নাম হিসাবে "শ্রীমুরারিপ্রণীত" মুদ্রিত আছে।

১৬। কায়স্থ-প্রসঙ্গ। ১১ চৈত্র ১৩২৯ (ইং ১৯২৩)। পৃ. ২৭।

পুস্তিকার উপসংহারে গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—"এইরূপে আমরা যেদিক দিয়া দেখি না কেন, কায়স্থকে স্বতন্ত্র জাতি ভিন্ন অন্ত কিছু বলিবার উপায় নাই। কোনরূপে কায়স্থকে মূল ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করা যায় না। কায়স্থগণ স্বতন্ত্র জাতি, তাঁহাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সমস্তই স্বতন্ত্র। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে মিশ্র আচারই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ, ঐতিহাসিক প্রমাণ, যুক্তি, পূর্ব্বপুরুষগণের গৃহীত কুলাচার এবং নিজ নিজ সমাজে প্রচলিত আচারব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, নূতন সংস্কারের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া, সরিয়া দাঁড়ান ভিন্ন আমাদের আর অন্ত পন্থা নাই। পিতৃপিতামহের আচরিত স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা আমরা গৌরব মনে করি।"

১৭। পৃথ্বীরাজ। আশ্বিন ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮) পৃ. ৬৯৯।

"পৃথ্বীরাজরাসো অবলম্বন করিয়াই পৃথ্বীরাজ লিখিত হইয়াছে। পৃথ্বীরাজরাসো দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সভাকবি চাঁদবরদাইপ্রণীত বলিয়া কথিত। এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকে বঙ্গভাষায় পরিচিত করিবার জন্যই পৃথ্বীরাজের অবতারণা, সহজবোধ্য করিবার জন্য ইহা উপন্যাসাকারে লিখিত হইয়াছে।"

* * *

নিখিলনাথ 'বাঙলার কথা' নামে একখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।— নিখিলনাথের বহু রচনা 'সাহিত্য', 'নব্যভারত', 'উপাসনা', 'প্রবাসী', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'বাণী', 'পঞ্চপুষ্প', 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার অনেকগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। এগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষার নবযুগ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার স্বর্গদ্বারে উপস্থিত ; দেশে এক বিরাট যুগপরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। এই নূতন যুগ জ্ঞানে-গৌরবে, শক্তিতে-সমৃদ্ধিতে মহান্ হইয়া উঠুক—ইহাই দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজ আমলের প্রথম হইতে বর্তমানকাল পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, ভারতবাসী যে গুরু দায়িত্ব বহন করিতে যাইতেছে এদেশের আধুনিক কালের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এতদিন বিদেশী শাসকের মমতাহীন শাসনতন্ত্রের অধীনে দেশবাসী আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পায় নাই ; নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদিগকে চলিতে হইয়াছে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, বিশ্বের সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সমষ্টিগত ভাবে আত্মরক্ষা স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নয়। ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করিতে যাইতেছে তখন এই সকল দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধেও তাহাকে সচেতন হইতে হইবে।

কোন মানুষের ব্যক্তিগত উন্নতি অথবা কোন জাতির বা মানবগোষ্ঠীর সমষ্টিগত উন্নতিসাধন, উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। শিক্ষা ব্যতীত কোন ব্যক্তির সুপ্ত শক্তির বিকাশ যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি জাতীয় শিক্ষা ছাড়া কোন দেশের জনগণের উন্নতিবিধান ও শক্তির বিকাশসাধন অসম্ভব। স্বাধীন এবং পরাধীন দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে গভীর পার্থক্য থাকিবেই, কেননা বর্তমানের গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশে প্রতিটি নাগরিককে বিভায় ও ঐশ্বর্য্যে শক্তিমান করিয়া সমগ্র দেশের উন্নতি সাধনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। পক্ষান্তরে স্বৈরাচারী শাসক জনগণকে নিবীর্য্য করিয়া রাখিবার জন্য ইহার বিপরীত অবস্থাই কামনা করে। ঋষি টলষ্টয় জারের আমলে রাশিয়ার শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "জনসাধারণের অজ্ঞতার মধ্যেই স্বেচ্ছাচারী গবর্ণমেন্টের শক্তি নিহিত ; গবর্ণমেন্ট ইহা জানে, তাজেই সর্ব্বদাই ইহা প্রকৃত জ্ঞানের বিকিরণ রোধ করিবে।" সোভিয়েট রাশিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা দেশের শক্তিকেন্দ্র স্বরূপ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া অতুলনীয় শক্তির স্ফূরণ ঘটাইয়াছে।

স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল দায়িত্ব ও দুরূহ কর্তব্য-ভার আমাদের দেশবাসীর বিশেষ করিয়া নেতৃবর্গের উপর পড়িয়াছে। এই দায়িত্ব গৌরবের সঙ্গে বহন করিয়া, দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে বিশ্বের কাছে প্রমাণ করিতে হইবে যে, আমরা স্বাধীনতার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে জানি। আত্মোন্নতির সাধনায় পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশ অপেক্ষা আমরা কোন অংশেই হীন নহি।

এতদিন গিয়াছে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের যুগ ; এখন আসিয়াছে গড়িয়া তুলিবার দিন। এবার দায়িত্ব নিজেদের ; দোষ ত্রুটি বিদেশী শাসকের অথবা আমলাতন্ত্রের স্কন্ধে চাপাইয়া আর নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। স্বাধীন দেশের প্রয়োজনে, নূতন যুগের আলোকে দেশকে সকল দিক হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সকল স্বাধীন সভ্য দেশেই দেখা গিয়াছে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জাতিগঠনের সর্ব্বপ্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম করা চলিবে না। এতদিন শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রাণহীন নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যমহীনতা ও ব্যর্থতার ভাব বিরাজ করিতেছে তাহার অবসান ঘটাইয়া সমগ্র শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে সবল প্রাণের উচ্ছল প্রবাহ সঞ্চার করিতে হইবে। দেশের সম্পদ যে জনসাধারণ তাহাদিগকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিযুক্ত হইবার জন্য যোগ্য ও সমর্থ করিয়া তুলিবার উপযুক্ত শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে।

আমরা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সামাজিক অর্থনৈতিক সকল বিষয়ে বিপর্য্যস্ত দেশের ভাগ্য নূতন করিয়া

গড়িয়া তুলিতে যাইতেছি, তখন রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিকল্পনায় শিক্ষার উপরই সর্ব্বাধিক মনোযোগ দিতে হইবে। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ভাবে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ভাবে ঢালিয়া সাজিতে হইবে সংক্ষেপে তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

সর্ব্বনিম্ন স্তর হইতে সর্ব্বোচ্চ স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা হিসাবে গ্রহণ করিয়া ইহার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার সহিত মাধ্যমিক শিক্ষার, মাধ্যমিকের সহিত উচ্চশিক্ষার সুসমঞ্জস যোগসূত্র নাই। প্রাণহীন কলের পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। একই সজীব দেহের শিরা-উপশিরা স্নায়ুতন্ত্ত-বদ্ধ বিভিন্ন অঙ্গের মত স্বাভাবিকভাবে পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে নাই। শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রথম প্রয়াস হইবে জরাসন্ধের বিভক্ত অঙ্গের সংযোগসাধনের মত শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যায়ের সামঞ্জস্য বিধান ও সমগ্র দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠন করিলে কোনই উপকার হইবে না।

স্বাধীন দেশের জন্য শিক্ষার পুনর্গঠনে সার্জেণ্ট শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ কাজে লাগিবে। ইহাতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে। বাংলাদেশে স্বতন্ত্রভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহা যে সুফলপ্রদ হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। পশ্চিম বঙ্গে পৃথক মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইবার পর নূতন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের যে সকল বিবৃতি ও আশ্বাস সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় অবিলম্বে সে অঞ্চলে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা। বুনিয়াদি শিক্ষা নিম্নস্তরের শিক্ষা; বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষদেশে উঠিবার উচ্চাভিলাষ ইহার মধ্যে নাই। সাধারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান ও বাস্তবজীবনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের যোগ্য করিয়া নাগরিক গড়িয়া তোলা ইহার উদ্দেশ্য। সকল দেশে উঁচু-নীচু-মাঝারি নানা স্তরের মেধাবিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী আছে; প্রত্যেকের সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী আত্মবিকাশের সুযোগ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা সভ্যতা সংস্কৃতি গঠনের কাজে বহু প্রকারের প্রতিভার প্রয়োজন। কাজেই বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারও অপরিহার্য্য।

বর্ত্তমানের মাধ্যমিক শিক্ষা অত্যধিক পাঠ্যপুস্তকের চাপে বহুলাংশে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। জাতিগঠনের ভিত্তিস্বরূপ না হইয়া, ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবজীবনের জন্য প্রস্তুত না করিয়া ইহা সকলকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিবার তরণীস্বরূপ হইয়াছে। ইহার আমূল সংস্কারসাধন না করিলে শিক্ষাক্ষেত্রে সজীবতা আসিবে না। কাজেই ইহার ভিত্তি দৃঢ় এবং আদর্শ উন্নত ও বলিষ্ঠ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

মাধ্যমিক শিক্ষার স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবেই বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও পুনর্গঠন প্রয়োজন হইবে। দেশের প্রতিভাবান তরুণগণ যখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি লইয়া উচ্চতম শিক্ষাসত্রে উপনীত হইবে তখন তাহাঁদের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দান করাই হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্তব্য। দেশকে নানাদিক হইতে সমৃদ্ধ করিতে যে উচ্চশিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন এখানে হইবে তাহার প্রধান কেন্দ্র।

উচ্চতম শিক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন স্বাধীন দেশে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান চলিতে থাকিলে তাহা কাহারও পক্ষেই গৌরবের নয়—না সে দেশের ভাষার পক্ষে, না সে দেশবাসীর পক্ষে। সমগ্র জাতির পক্ষে ইহা অবমাননাকর।

শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সমন্বয় সাধনের জন্য শরীরচর্চ্চা শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সামরিক কায়দায় ড্রিল অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত। ইহাতে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও একতা বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সুপারিশমত বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্যমান এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এক বৎসর বাধ্যতা-মূলক সমাজ-সেবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা আবশ্যক।

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-ব্যবস্থা রচনা করিয়া ইহার আশু প্রয়োগের জন্য কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন উৎসাহ দেখা দিবে। শিক্ষার প্রতি বাঙালীর স্বাভাবিক অনুরাগ গবর্ণমেণ্টের দীর্ঘদিনব্যাপী উদাসীনতার মধ্যেও লোপ পায় নাই। জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক রচিত অনুকূল পরিবেশে যে ইহা নূতন উদ্যমে স্ফূর্ত্তিধর্ম্মী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে, নূতন জীবনের প্রবেশ-পথে জাতির যাঁহারা সত্যকার কর্ণধার অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল রূপ তাঁহাদের মানসচক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া ওঠে। সেই দূরদৃষ্টির আলোকেই তাঁহারা জাতীয় জীবনের অন্ধকারে কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমাদের বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে নেতাদের উপর এই বিরাট কর্ত্তব্যভার অর্পিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের রাজা

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চৌধুরী

ঋগ্বেদের আর্য্য-ভারত বিভিন্ন রাজ্যনিচয়ে সমাকীর্ণ ছিল। তন্মধ্যে অনু, দ্রুহ্য, পুরু, যদু-তুর্ব্বসু ও ভরত (-তৃৎসু)* এই পঞ্চ আর্য্যরাজ্য সমধিক প্রসিদ্ধ। গন্ধার, চেদি, বৃষ্ণি প্রভৃতি অপর আর্য্যরাজ্যের নামও উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বৃষ্ণি রাজ্য বিষয়ে এক ঋকে (রাজাশূন্য বৃষ্ণিগণ†) এরূপ উক্তি আছে। রাজতন্ত্র ঋগ্বেদের সাধারণ রাষ্ট্রতন্ত্র। ঋগ্বেদের রাজা 'বিসপতি' বা জনসাধারণের পতি। ঋগ্বেদের রাজা সর্ব্বক্ষমতার অধিপতি ও সর্ব্বাধিপতি। কিন্তু প্রজার কল্যাণকামনা ও প্রজার মঙ্গলসাধন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। ঋগ্বেদে রাজা 'রাজ্যবহনকারী নরপতি'। রাজা—রক্ষক পালক হিতকর প্রজাবৎসল সুশাসক দুষ্টদমনকারী ফলদাতা কর্ম্মদক্ষ অভীষ্টপূরক শান্তিপ্রদ। ঋকে আছে—'প্রজাবৎসল রাজা প্রজার হিতকর কার্য্য করেন। অগ্নি জয়শীল রাজার ন্যায় মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। হে দেব! তুমি রাজার ন্যায় জনগণের অভীষ্টপূরক। আমি সম্রাট্ ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি। তোমরা এই স্তোত্রসকলকে নৃপতির ন্যায় ফলযুক্ত কর। প্রজাবর্গ ভয় পাইয়া রাজাকে আশ্রয় করে। হে ইন্দ্র! তুমি দুষ্টদমনকারী রাজার বন্ধু। হে সোম! তুমি কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর রাজার ন্যায় আমাদের পাপ ধ্বংস কর। হিতৈষীগণ সুশাসক নগরপতির পূজা করে। জয়শীল লোকপতি আমাদের শান্তিপ্রদ হউন।' ইত্যাদি। ঋগ্বেদে রাজার পুরী নগর দুর্গ রাজপথ‡ অট্টালিকা পরিচ্ছদ সজ্জা গো ধন রত্ন দ্রব্য-সামগ্রী ঐশ্বর্য্য লোকলস্কর সভা-পরিষদ অমাত্য দূত চর-অনুচর অস্ত্রশস্ত্র যুদ্ধসম্ভার রথ অশ্ব§ সেনা প্রভৃতি রাজ্যোপকরণ ও ঐশ্বর্য্যোপকরণের কথা উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে রাজগণের বেতনভোগী সেনা ছিল দৃষ্ট হয়। ঋকে আছে, 'অগ্নি- (যজ্ঞ) দ্বারা যজমান ধনলাভ করেন। সেই ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয় ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।' ঋগ্বেদে প্রবল রাজগণের বৃহৎ বৃহৎ সেনা ছিল দৃষ্ট হয়।** ঋকে 'মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণের' উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে রাজতন্ত্র পুত্রপৌত্রানুক্রমিক ছিল। ভরত-রাজবংশে দিবোদাস ও তৎপুত্র সুদাস এবং পুরুরাজবংশে পুরুকুৎস ও তৎপুত্র ত্রসদস্যু ও তৎপুত্র কুরুশ্রবণ, তৎপুত্র উপমশ্রবণ পর পর রাজা ছিলেন। ভরত ও পুরু ঋগ্বেদের দুই অন্যতম প্রধান আর্য্য রাজবংশ। ভরতরাজ দিবোদাস ও সুদাস এবং পুরুরাজ পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু অনার্য্যনিহন্তা প্রসিদ্ধ বীর ও পরাক্রান্ত নরপতি। যেরূপ অনার্য্য 'দাস' 'দস্যু' ও 'অসুর'-দিগের মধ্যে তদ্রূপ পরস্পর নিজেদের মধ্যেও, ঋগ্বেদের আর্য্যরাজগণ তুমুল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। আর্য্য ও অনার্য্য এবং আর্য্য ও আর্য্যে এই দ্বিবিধ সংঘর্ষে ঋগ্বেদের ভারত প্রকম্পিত হয়।

ঋগ্বেদে রাজা সুশ্রী উজ্জ্বল দীপ্তিমান্ চিত্রবিচিত্রমূর্ত্তি উগ্র সতর্ক ক্ষিপ্রকারী শত্রুনাশক দণ্ডদাতা ভজনীয় পূজনীয় ইত্যাদি। ঋগ্বেদের রাজার বিষয়ে কতিপয় ঋক্ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—'রাজগণ শত্রুদিগের দুর্গ বিনাশ করেন। মরুৎগণ নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ। যজমান অগ্নিকে বরণ করিতেছেন এবং রাজার ন্যায় তাঁহার প্রসাধন করিতেছেন। তুমি জায়াগণের সঙ্গে রাজার ন্যায় দীপ্তির সহিত বাস কর। আদিত্য যেমন ভুবনগণকে তাপ দেন, মহাসেনাবিশিষ্ট রাজগণ সেইরূপ শত্রুগণকে তাপ দেন। দরিদ্র স্তোতা এবং ধনশালী রাজা উভয়েই ধন যাচ্ঞা করে। মরুৎগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্তোতা সাম্রাজ্যযুক্ত হয়। বরুণ সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের একজন সম্রাট্ ও আর একজন স্বরাট্। রাজা শত্রুগণের প্রকম্পক। যে রাজার নিকট ব্রাহ্মণস্পতি প্রথমে গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হইয়া স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁহার জন্য সর্ব্বকালে ফল প্রসব করে, প্রজাগণ নিজেরাই তাঁহার নিকট প্রণত থাকে। নৃপতি পূজনীয়। রাজা পারিষদ ও অমাত্যবর্গ সহ হস্তিপৃষ্ঠে বহির্গত হন। রাজার ন্যায় যজ্ঞবিঘ্নকারী মনুষ্যগণের অভিমুখে সোম গমন করেন। স্তুতি দ্বারা রাজা যেরূপ তুষ্ট হন এবং সপ্ত হোতা যজ্ঞদ্বারা যেরূপ সংস্কৃত হয়, সেইরূপ গব্যের দ্বারা সোম সংস্কৃত হয়। হে সোম! তুমি রাজার ন্যায় আমাদের স্তুতি স্বীকার কর। বন্দীগণের বন্দনাগীতিতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয়। হে ব্রাহ্মণস্পতি! তুমি প্রশংসনীয়দিগের মধ্যে রাজা। শক্তা পূত রাজা মিত্রাবরুণ সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট এই স্থানে উপবেশন করুন। সোম রাজার ন্যায় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। হে সোম! তুমি রাজ্যবহনকারী নরপতি, রাজার ন্যায় আগমন কর। আমাদিগকে ধনপরিপূর্ণ রাজযোগ্য গৃহ দান কর। মরুৎগণ রাজাদিগের ন্যায় সুশ্রী ও চিত্রবিচিত্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। প্রবল রাজার সেনা কেহ নিবারণ করিতে পারে না। অনুকূল মিত্রবিশিষ্ট রাজার ন্যায়

---

* ঋগ্বেদে ভরত ও তৃৎসু এক বংশ বলিয়া দৃষ্ট হয়। অন্য মতে, তৃৎসু ভরতগণের রাজবংশের নাম।

† এই উক্তির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। বৃষ্ণি রাজ্য অ-রাজতান্ত্রিক রাজ্য ছিল, এরূপ অর্থও করা যায়। জানা যায়, পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধযুগে বৃষ্ণি নামক রাজ্য প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য ছিল।

‡ ঋগ্বেদে রথ শকট প্রভৃতি গমনোপযোগী প্রশস্ত রাজপথ ছিল। এক ঋকে 'নির্ভয় রাজপথ' এরূপ উক্তি আছে। অন্য ঋকে 'রক্ষাশূন্য দুর্গম স্থানে' চৌরতস্করের উপদ্রবের কথা আছে।

§ ঋগ্বেদে যুদ্ধাশ্বের নাম 'দধিক্রা'।

** ভরতরাজ সুদাসের সহিত যুদ্ধে অনু ও দ্রুহ্য রাজের নিহতই হয় ছেষট্টি হাজার ষাট জন অনু ও দ্রুহ্য সৈনিক। ঋগ্বেদের প্রবল রাজগণের বৃহৎ বৃহৎ সেনা ছিল, ইহা সুস্পষ্ট।

অগ্নি পৃথিবীতে বাস করেন। সুহৃৎ রাজা প্রবল রাজার নিকট স্বীয় লোককে দৌত্যকর্ম্মে নিয়োজিত করেন। স্তোতৃগণ তোমাদিগের অনুগ্রহে রাজপদ লাভ করে। তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। রাজা চোরের শাস্তি বিধান করেন ও শত্রু জয় করেন। প্রকৃত রাজা যুদ্ধে যায়। পৃথিবী বৃদ্ধ ও জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয়। ইনি উজ্জ্বল সতর্ক রাজার ন্যায়। (রাজার) চরগণ নদীর কূল হইতে দর্শন করে। মিত্র ও বরুণ রাজার রাজা। তোমরা রাজার ন্যায় ক্ষিপ্রকারী হও। আমরা রাজসামগ্রী সহকারে যজ্ঞ করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে পদ দাও।" ইত্যাদি।

ঋগ্বেদে রাজগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। দিগ্বিজয়ী রাজা ঋগ্বেদে অতীব প্রশংসাভাজন। ভরতরাজ সুদাস সহস্রমু (অথবা সহস্রম্ন)* যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া তুমুল সমরানল প্রজ্জ্বলিত করেন ও বলশালী রাজগণকে পরাভূত করিয়া রাজ্যসমূহ জয় করেন। সুদাস ঋগ্বেদের 'দশ রাজার যুদ্ধ' নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে দশ জন রাজাকে পরাজিত করেন। ঋগ্বেদের প্রবল রাজগণ 'সর্ব্বোপরিবর্ত্তী রাজা' ও 'অধিরাজ' হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেন। ঋকে আছে, 'আমি যেন সর্ব্বোপরিবর্ত্তী রাজা ও অধিরাজ হইতে পারি।' প্রবীণ ঋষিগণ রাজগণের পুরোহিত ও উপদেষ্টা বা মন্ত্রীস্বরূপ হইতেন। রাজ্যে রাজার অভাবে বিচক্ষণ ঋষিবৃন্দ রাজ্য পরিচালনার ভারও গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে যে, পুরুবংশের প্রসিদ্ধ নৃপতি পুরুকুৎস বন্দী (বোধ হয় যুদ্ধে) হইলে পর, সপ্ত ঋষি 'রাজ্যের অধীশ্বর' হইয়াছিলেন। 'পুরুকুৎসে'র রাজ্ঞী যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যুকে পুত্র প্রাপ্ত হইলে ত্রসদস্যু তৎপর রাজা হন। ঋগ্বেদের রাজগণ প্রজাবর্গ হইতে 'বলি' বা কর গ্রহণ করিতেন। ঋকে আছে, 'হে রাজন্! ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একান্ত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন।'......'হে অশ্বিদ্বয়!† তোমরা নহুষকে পুনঃ ভ্রষ্টরাজ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলে। সেই মহান্ অগ্নি প্রজাগণকে বলদ্বারা নিরুদ্ধ করতঃ নহুষ রাজাকে করপ্রদ করিয়াছিলেন।' আর্য্য রাজগণের রাজ্যে স্থানীয় জন-অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া বোধ হয়। আর্য্য গ্রাম ও নগরে জনানুমোদিত সভাসমিতিও হয়ত ছিল। সভার সভ্যপদ বিশেষ সম্মানজনক। সভায় ওজস্বিনী ভাষায় বাগ্মিতা প্রকাশ বিশেষ শ্লাঘ্য ছিল। আর্য্যগ্রামের 'গ্রামণি' বা গ্রামপতি গ্রামবাসিগণের মনোনীত বা নির্ব্বাচিত ছিল মনে হয়। নগরের নগরপতি বিশেষ ক্ষমতাশীল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি। ঋকে 'দুর্গাসক নগরপতি'র বিশেষ প্রশংসা আছে। সংগ্রাম ঋগ্বেদে অবাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য। ভয়াবহ সংগ্রাম-দুঃখ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঋষিগণের প্রার্থনা-মন্ত্র আছে। এক ঋক্-মন্ত্রে আছে, 'ঘোর সংগ্রামে আমাদিগের অপত্যদিগকে বলিদান দিতে হয়।...'হে অশ্বিদ্বয়! সংগ্রাম-দুঃখ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর।' কিন্তু সমাগত সংগ্রামে বীরের ন্যায় যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋগ্বেদের রাজগণ রণবিমুখ ছিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধে গমনকরতঃ পরম শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন। ঋকে আছে, 'প্রকৃত রাজা যুদ্ধে যায়।' ঋগ্বেদে বীরত্ব বিশেষ শ্লাঘ্য ও বীর পরম শ্রদ্ধাভাজন। বীরপুত্র বিশেষ কাম্য। 'বীরপ্রসবিনী মাতা' সমাজে সেবিতা। যুদ্ধ ঋগ্বেদে 'যশোলাভের ক্ষেত্রস্বরূপ' এবং 'স্বর্গলাভের দ্বারস্বরূপ'।

ঋগ্বেদের রাজগণ নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। ঋগ্বেদের রাজগণের দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, অতিথিসেবা প্রভৃতি আদর্শস্থল। ভরতরাজ দিবোদাস অতিথিসেবা দ্বারা 'অতিথিগ্ব' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে অতিথি 'দেবগণের ন্যায় পূজনীয়'। ঋগ্বেদ রাজগণের অগণিত গো অশ্ব ধনরত্নাদি দানের উল্লেখে পূর্ণ। বশিষ্ঠ ঋষি রাজদানে 'শতদানবিশিষ্ট, সহস্রদানবিশিষ্ট ও সর্ব্বদানবিশিষ্ট' হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের রাজকুলে বিশেষ বিদ্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। রাজন্যবর্গ কবি, জ্ঞানী ও ঋষিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজাদের মধ্যে অনেকে ঋক্-রচক ঋষিও ছিলেন। রাজন্যবৃন্দের পরিবারবর্গেও শিক্ষার প্রভাব ও প্রসার ছিল। রাজকন্যা ঘোষা, অসঙ্গরাজপত্নী শশ্বতী, ভাবয়ব্যরাজপত্নী লোমশা প্রভৃতি রাজকুলনারীগণ ঋগ্বেদের ঋষি ছিলেন ও তাঁহাদিগের রচিত ঋকসমূহ ঋগ্বেদে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে রাজা পূজনীয় ও ভজনীয়। ঋগ্বেদের সূক্তে 'রাজস্তুতি', দেবতা।‡ রাজস্তুতি-সূক্তে রাজার রাজ্যাভিষেক যজ্ঞের সুন্দর ঋক্মন্ত্রে আছে,—'হে রাজন্! তোমাকে রাজপদে অধিরোপিত করিলাম। তুমি এই জনপদের মধ্যে প্রভু হও। অটল, অবিচলিত ও স্থির হইয়া থাক। তাবৎ প্রজাগণ তোমাকে বাঞ্ছা করুক। তোমার রাজত্ব যেন নষ্ট না হয়। তুমি এই স্থানেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত হইয়া থাক। রাজ্যচ্যুত হইও না। ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল হইয়া এই স্থানে থাক। এই স্থানে রাজ্যকে ধারণ কর। অক্ষয় হোমদ্রব্য পাইয়া ইন্দ্র এই নবাভিষিক্ত রাজাকে আশ্রয় দিয়াছেন। সোম তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতি আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল, এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল। ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন। হে রাজা! বরুণ রাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন। ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন। দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন। যাহারা বিপক্ষ, যাহারা আমা-

* পরবর্ত্তী অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায়।

† অশ্বিন্ যুগল দেবগণের ভিষক ও আর্য্যগণের ব্যাধিমোচনকারী ভিষক দেবতা।

‡ বেদে যাঁহার বাক্য তিনি 'ঋষি' এবং ঋষি যদ্বিষয়ে বলেন তাহা 'দেবতা'। সূক্তের প্রতিপাদ্য যে বিষয়বস্তু তাহাই সূক্তের 'দেবতা'।

দিগের হিংসাকারী শত্রু, যে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসে, যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, হে রাজন্‌! এতাদৃশ তাবৎ ব্যক্তির সম্মুখীন হও। সবিতা দেব তোমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, সোম অনুকূল হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রাণী তোমার প্রতি অনুকূল। এই দেখ অক্ষয় হোমদ্রব্য সহকারে অক্ষয়। সোমরসকে সংশোধিত করিতেছি। অতএব ইন্দ্র তোমার প্রজাদিগকে একাগ্রত ও করপ্রদানোন্মুখ করিয়াছেন।......(রাজার উক্তি—) আমার শত্রু নাই। আমি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছি। আমি রাজ্যের প্রভু ও বিপক্ষ নিবারণে সমর্থ হইয়াছি। এইরূপে আমি তাবৎ প্রাণীবর্গের উপর এবং এই সকল লোকদিগের উপর অধীশ্বর হইয়াছি, ইত্যাদি।

শৌর্য্যশীল ও কল্যাণকর রাজতন্ত্র ঋগ্বেদের আদর্শ রাষ্ট্রতন্ত্র।

লেবুগাছ

[দি লাইম ট্রি : জন্‌ গল্‌সওয়র্দি]

অনুবাদক : শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

জুলাই মাসের এক সায়াহ্নে একটি লেবুগাছের ধারে আমি শুয়েছিলাম। সুদীর্ঘ, পুষ্পভারনত, মধুবর্ণ তার কুসুমস্তবকে মৌমাছির দল ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছিল। হাওয়া এসে পাতায় পাতায় মরমর শব্দ তুলছিল, ডালপালায় লেগেছিল দোলা, আমার দিকে ভেসে আসছিল তার সুগন্ধ। আমি তাই দেখতে দেখতে ভাবছিলাম হিন্দু-শিল্পশাস্ত্রের ধারণা—সে মতে এই গাছটির বহিরাকৃতির কোন মূল্য শিল্পীর কাছে নেই, তার কাছে সত্য কেবল এর 'তত্ত্ব', বহুক্ষণ একাগ্র-ধ্যানে নাকি তাকে উপলব্ধি করতে হয়। কয়েক দণ্ড আমি নিজে ঐ রকম সমাধিস্থ হবার চেষ্টা করলাম তার শ্যামল শাখার অন্তরালে চেয়ে, দেখলাম সত্যিই ওর অন্তরখানির আভাস আমি পাই কিনা; কিন্তু পাশ্চাত্ত্যসুলভ মনোভাবের বশে আমার ভাবনা উড়ে গেল অন্য দিকে—আমার সামনে তৃণগুল্ম ও লবঙ্গশাখার মধ্যে এক ঝাঁক নীল প্রজাপতির মত পরস্পরের অনুসরণ করতে করতে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দূরের মাঠটিতে কয়েকটি লাল রঙের গরু, আর করল দূরে একটা জলাভূমির ওপর স্তূপীকৃত একরাশ পাথর, দেখতে ঠিক পাহাড়ের ধারে একটি মানুষের মত। কিন্তু অল্পক্ষণেই আমার মন আবার ফিরে এল লেবু-গাছটির দিকে। আলুথালু বেশ এখন তার, হাওয়ার দোলা লেগেছে তার অন্তরে, তার আবেগকম্পিত উচ্ছলতা দেখে তার দিকে না তাকিয়ে কেউ পারবে না। এক ঝাঁক মৌমাছির মধ্যে যে আবেগ লক্ষিত হয়, এ সেই উচ্ছ্বাস—উদ্দাম গুঞ্জরিত এক ঘূর্ণিবেগ, যেন প্রাণ ও প্রেম তাকে পাগল ক'রে তুলেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল এই চপলতা; আবার এক সুরভিত, সুঠাম, মনোহারিণীর রূপ নিল সে।

আমি ভাবলাম, "ওগো, কখন তোমার হৃদয় তুমি প্রকাশ করবে আমার কাছে? তোমার এই স্নিগ্ধ মাধুর্য্য, এই বায়ু-উদ্বেজিত জীবনচাঞ্চল্যের মধ্যে কি আছে সেই কলাশাস্ত্রবর্ণিত 'তত্ত্ব'? কখন আমি তোমার হৃদয়খানি দেখতে পাব?"

আবার ভাবনা উড়ে চলল। এবারে আর প্রজাপতির মত নয়, ঐ রক্তগোলাপকুঞ্জে সঞ্চরমাণ কাল ভ্রমরগুলির মত সুধীর চরণক্ষেপে। ক্রমে ঐ লেবুগাছের মধুরিমা ধ্যানের পাখা থেকে সমস্ত শক্তি শুষে নিয়ে আমার চেতনাকে অবশ ক'রে আনল, মাথা আমার আপনা থেকে নুয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। আধোঘুমের এই অতীন্দ্রিয় কুহেলিলীন অবস্থা, জীবনের এই মধুরতম মুহূর্ত্ত, যখন জগৎ কাছে থেকেও আসন্ন স্বপ্নের জ্যোৎস্নারঙে রঙিন হয়ে উঠেছে, তারই বেদনাবিহ্বল গুণ্ঠনে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ল।

সহসা দেখলাম, আমার খুব কাছে, অথচ অসীম দূরের ব্যবধানে এক নারী—দীপ্ত অঙ্গারবর্ণ তার কেশভার বুকে 'এস্‌কোল্‌জে' ফুলের মত চারদিকে সংবদ্ধ পুষ্পরাজির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। আঙুল দিয়ে সে তার গলায় একটা বড় কাল মৌমাছি ধরেছিল। ঐ ছোট ছোট বৃন্তসংলগ্ন ফুলে প্রায় আবৃত থাকলেও তার তনুলতা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল, আর তার মুখখানি কি আশ্চর্য্য রকম মধুর, পূর্ণ ডিম্বাকার, তার কোমলতা মানুষের হৃদয়ে স্পন্দন আনে। অধর দুটি হাস্যময়, আর বঙ্কিম, সুচারু ভ্রূযুগলের নীচে তার চোখ দুটি চেয়েছিল আমারই দিকে—উজ্জ্বল, ঘনকাল, শিশিরসিক্ত সে চোখ। তার চারদিকে গোলাপী ও মধুরঙের সব পাপড়ি ঝরছিল অবিরত; তবু তার দৃষ্টি সে পাপড়ির মধ্য দিয়ে আমায় বিদ্ধ করেছিল। শিশুকে তিরস্কার করলে তার গালে যেমন টোল পড়ে, এর কপোলের এক কোণে তেমনি ছোট্ট একটি টোল। একটি কানে তার একটা বড় হলুদ রঙের ফুলগাছের স্পর্শে সেই ফুলেরই রং ধরেছিল, দেখাচ্ছিল একটি সোনালি শঙ্খের মত। ঝরা পাপড়িগুলিতে তার নিঃশ্বাস লাগছিল—আমি যেন সে নিঃশ্বাস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—রূপোলি রং আর অপূর্ব্ব এক কোমল সুরে ভরা।

ভালবাসায় প্রদীপ্ত তার চোখে চেয়ে আমি উঠে তার দিকে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না; যত বারই পার-

ছিলাম না, তত বারই সে চোখ দুটিতে এমন করুণভাব ফুটে উঠছিল যে তা দেখে কান্নায় আমার বুক ভরে এল। কিন্তু এই করুণ চাহনি সত্ত্বেও তার ঠোঁট দুটি তেমনই হাস্যময় রইল, ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠতে লাগল 'এস্‌কোতেল্‌' ফুলে-ছাওয়া তার দীর্ঘ দেহ। কাল মৌমাছিটিকে ধ'রে অবিরত আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে—আঙুলগুলি জ্যোৎস্নারশ্মির মতই দীর্ঘ, পাণ্ডুর, কোমল।

আমার মনে হ'ল একেই আমি জীবন ভরে খুঁজেছি। অথচ, উঠে তার কাছে যাবার সকল চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হ'ল।

আমি যখন এমনিতর কামনাবিভোর, কোকিলের মত ধূসর রঙের একটি পাখী, সরু তার পুচ্ছ, উড়ে এসে তার অনাবৃত হাতের ওপর বসে তাকিয়ে রইল তার দীপ্ত, সুগোল দুটি চোখের পানে। মুক্তারঙের অনাবৃত বাহুতে তার এক শিহরণ বয়ে গিয়ে পাখীটাকে যেন আদর করল, ঠিক যেমন ক'রে আদর করেছিল সে শ্রীবালার মৌমাছিটিকে তার জ্যোৎস্নাধবল আঙুল দিয়ে। আমি বেশ বুঝছিলাম, তার হৃদয়ের এত কাছে এসে এ দুটি প্রাণীর খুব সুখ হচ্ছিল। ঈর্ষ্যা জাগল আমার মনে, শেষে সকল শক্তি দিয়ে আমি নিজেকে তার দিকে ঠেলে দিলাম; কিন্তু সেই শূন্যতাই আমার ব্যাহত করল, অবসন্নভাবে আমি আবার বসে পড়লাম।

তখন যে আঙুল দিয়ে মৌমাছিটিকে আদর করেছিল, সেই আঙুল তুলে ধরল সে। অধরে বিকশিত হ'ল এক মধুর, অপূর্ব্ব হাসি, বুক দুলে উঠল তার, চোখ দুটি হ'ল আরও গভীর, আরও কাল। সেই বর্ণহীন, অভেদ্য বাধার বিরুদ্ধে এক অস্বাভাবিক শক্তি নিয়ে আমি তিলে তিলে এগিয়ে গেলাম; যতই এগোতে লাগলাম, তার চোখ দুটিতে প্রবলতর প্রাণের আভাস দেখা গেল। মধুর মত, মদের মত উষ্ণ, মিষ্ট এক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সে চোখ। শিউরে উঠল তার অঙ্গ, একগোছা চুল ভেসে এল আমার দিকে, মুখে দেখা গেল নশ্বর মানুষের অজ্ঞাত এক প্রেম। ভ্রমর তার গ্রীবা ছেড়ে গেল, কিছু দূরে ডানার ওপর ভর ক'রে রইল, শোনা গেল মৃদু গুঞ্জন। তার বাহুর ওপর পাখীটি একটুও ভয় না পেয়ে কেবলই মাথা দোলাতে লাগল, আর কাল চোখ দুটির স্থির দৃষ্টি রইল আমার দিকে, যেন সে বুঝেছে, আমিই জয়ী। আমি দু'হাত বাড়িয়ে দিলাম সুন্দরীর দিকে, তার স্পর্শে সে হেসে উঠল, সে হাসির চেয়ে কোমলতর ধ্বনি কখনও শুনি নি। তার কেশভার আমার ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে গেল। কিসের সুগন্ধ আমায় মাতোয়ারা করে তুলল। আকুল-করা এক অন্ধকারে সকল চেতনা লুপ্ত হ'ল আমার মগ্ন লোকের মত।...

লেবুফুলের একটি কুঁড়ি মৌমাছিতে খসিয়ে দিয়েছিল, তাই হাওয়ায় উড়ে এসে লেগেছিল আমার ওষ্ঠে, তারই সুবাস ভাসছিল আমার নাকে। আমার সামনে শুধু উদার প্রান্তর আর জলাভূমি আর কাছেই লেবুগাছটি—আর কিছুই কোথাও নেই।

লেবুগাছটির পানে চাইলাম। সে যেন বহু দূরে, উদাস এক সৌন্দর্য্যে ভূষিত, শ্যামল, কুসুমিত আচ্ছাদনে বড়ই শান্ত। কিন্তু তবু তো জানি যে, স্বপ্নে তার হৃদয়টি আমি দেখেছি, স্পর্শ করেছি।

যুগান্তরে এল স্বাধীনতা

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দুর্য্যোগ-তামসী রাত্রি হ'ল বুঝি ভোর,
হ'ল অবসান,
দৈবিক জীবনযাত্রা শৃঙ্খলিত হবে নাকি আর?
অচল পাষাণ
জীবনের উৎসমুখে অবিরুদ্ধ প্রাণের সঞ্চার
ব্যর্থ করি দিবে না কি আর?
শত কোটি ক্রীতদাস জীবনের প্রতিটি প্রহরে
লাঞ্ছনার ক্ষত বহি' অদৃষ্টেরে দিবে না ধিক্কার।
শুধু দুটি অন্ন মাগি কত রিক্ত প্রাণ
বিধাতার অসন্তোষে দিবে না কি আত্মবলিদান?

দেশের হারানো ছেলে, মাটির হারানো মেয়ে তাই,
আর কি দিবে না প্রাণ নিরর্থক রাজশক্তি রোষে?
কুহুমকংকাল আর রমণীর সব সেরা ধন
নিষ্ফল আক্রোশে,
আর কি পথের পরে লুটাবে না নির্ম্মম হেলায়?
শতাব্দীর মূক মাটি ভাষা পেয়ে যেন কথা কয়
তিমির দিগন্ত শেষে ও কাদের পদধ্বনি শুনি;
অনাগত আগন্তুক, তোমার আমার মত নয়।
সুদীর্ঘ-প্রতীক্ষা ক্লান্ত শতাব্দীর জমা-করা ব্যথা
হ'ল শেষ, এল শান্তি, যুগান্তরে এল স্বাধীনতা।

চীনের সঙ্কট

অধ্যাপক শ্রী সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

দীর্ঘ আট বৎসর রক্তস্নানের জের মিটিতে না মিটিতেই মহাচীনের ভাগ্যাকাশে দুর্য্যোগের ঘনীকৃষ্ণ মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বনাশা গৃহযুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা মহাচীনের জাতীয় সত্তাকে আবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। চীনের ভাগ্যাকাশে কবে যে আবার নবারুণরেখার সন্ধান মিলিবে কে জানে!

মহাচীনের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাঙ (Kuomintong)। আধুনিক চীনের স্রষ্টা ডাঃ সুন ইয়াট সেন ক্যুওমিণ্টাঙ দলের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমানে এই দলই চীনের ভাগ্যবিধাতা। ১৯২০ সালে চীনে সর্ব্বপ্রথম সাম্যবাদী দল গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হইতেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এই দলের শক্তি এবং প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১৯২৩ সালে সুন ইয়াট সেন যখন রুশিয়ার সহিত মৈত্রীস্থাপন করেন, তখন মহাচীনের রাজনীতিক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট দল একটি অনুপেক্ষণীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। তখন পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাঙ দলের মধ্যে কোন গুরুতর মতবিরোধ বা মৌলিক পার্থক্য ছিল না। আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে গণতন্ত্র স্থাপন করিতে উভয়েই তখন সমান আগ্রহশীল। ১৯২৪ সালে বোরোডিনের পরামর্শে ক্যুওমিণ্টাঙ দল রুশীয় আদর্শে নূতন করিয়া গঠিত হয়। তখন হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্টগণ এই দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। ১৯২৫-২৭ সালের যে বিপ্লব পিকিঙের অত্যাচারী স্বেচ্ছাতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিল, তাহার সংগঠন এবং পরিচালনায় কম্যুনিষ্টগণ একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ সুন ইয়াট সেন এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন ক্যুওমিণ্টাঙ দল কর্তৃক কম্যুনিষ্ট দলের দুইটি প্রধান নীতি—আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভূস্বামী এবং ঋণ-দায়ক সম্প্রদায়ের ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে চীনের রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন—গৃহীত হওয়ার ফলেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল।

কম্যুনিষ্টগণ মনে করেন যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব (Bourgeois democratic revolution) অপরিহার্য্য। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রথম এবং দ্বিতীয় পাদে মহাচীনে জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁহারা আদর্শ ভ্রষ্ট হন নাই।

মহাচীনের দুর্ভাগ্যক্রমে সুন ইয়াট সেন-পরিকল্পিত বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ১৯২৫ সালে তাঁহার দেহাবসান হয়। দুই বৎসর পরে ১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। চিয়াংকাইশেকের নেতৃত্বে ক্যুওমিণ্টাঙের এক অংশ নান্‌কিঙে একটি স্বতন্ত্র সরকারের প্রতিষ্ঠা করিল। কম্যুনিষ্টগণ এবং ক্যুওমিণ্টাঙের অধিকাংশ সদস্যই মনে করিলেন যে এই প্রচেষ্টা বিপ্লব-বিরোধী এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী।

অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ক্যুওমিণ্টাঙ দলের যে অংশ পূর্ব্বে নান্‌কিঙ সরকারের বিরোধিতা করিয়াছিল, তাহা ইহার সহিত সহযোগিতা করিতে আরম্ভ করিল। কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধ কিন্তু রহিয়াই গেল। নান্‌কিঙ সরকার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া চীন হইতে সাম্যবাদ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে কৃতযত্ন হইলেন। সরকারী আদেশে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রচার এবং সাম্যবাদীদলভুক্ত হইয়া চরম দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লবের আদর্শ প্রকৃত প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। অভিনব ঋণ-দায়ক সম্প্রদায় পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ঋণ-দায়কগণের স্থান গ্রহণ করিলেন। গৃহ-যুদ্ধ এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক আন্দোলন দমন করিতে নান্‌কিঙ সরকার বদ্ধপরিকর হইলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের নেতা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনেকে আবার পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একনায়কত্ব (Totalitarian Dictatorship) স্থাপনের আয়োজন করা হইতে লাগিল।

সাম্যবাদিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে চীনের মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে কৃষক বিপ্লবও অপরিহার্য্য।

নান্‌কিঙ সরকার ক্রমশঃই এই বৈপ্লবিক আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতি ঘটিতে লাগিল। এক দিকে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণ দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল। অপর দিকে আবার স্বল্পসংখ্যক ভূস্বামী এবং কুসীদজীবী ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিলেন। ভূ-সম্পত্তি ক্রমশঃই ইঁহাদিগের হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ফলে বর্ত্তমান চীন সমাজে বিত্তবান্ এবং বিত্তহীন ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত। সমাজ হইতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ সাল এই ১০।১১ বৎসর কাল নানকিঙ সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়ার ফলেই মহাচীনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিমিত স্থান জাপানের কুক্ষিগত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, চীনের মোট রেলপথের শতকরা ৪০ ভাগ, অনাবাদী জমির শতকরা ৮৫ ভাগ, কয়লা-সম্পদের একটা বিরাট অংশ, লৌহখনি সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ, উৎকৃষ্ট আরণ্য অঞ্চলের শতকরা ৮৭ ভাগ এবং রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৪০ ভাগ নানকিঙ সরকারের অনুসৃত নীতির ফলেই জাপানের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে চীনের কার্পাস শিল্পের শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক জাপ কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। মাঞ্চুরিয়া জাপ কবলিত হওয়ার পর চীন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের যোগানদার এবং পণ্য বিক্রয় ক্ষেত্রের সুবিধা হইতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে মাঞ্চুরিয়া চীনের অন্যান্য প্রদেশে উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ২৭ ভাগ ক্রয় করিত। কিন্তু জাপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৩৯ সালে মাঞ্চুক্যুও (মাঞ্চুরিয়ার জাপানী নাম) চীনে মোট উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ক্রয় করিয়াছিল। যুদ্ধকালে মাঞ্চুক্যুও হইতে চীনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার পক্ষে জাপানের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

কিন্তু জাপানের সহিত যুদ্ধ করিলেও কিছু লাভ হইত কিনা বলা শক্ত। নানকিঙ ক্যুওমিণ্টাঙ সরকারের সর্ব্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-শেক একাধিকবার প্রকাশ্যেই বলিয়াছেন যে দুর্ব্বল চীনকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া না তোলা পর্য্যন্ত তাহাকে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত করা সমীচীন হইবে না। তুলনীয়:—"We are still a weak people, and we dare not provoke a war. But if we are forced to fight, we shall not stop until the last man has fallen, or until we are victorious." অর্থাৎ আমরা এখনও দুর্ব্বল। কাহারও সঙ্গে ইচ্ছা করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার সাহস আমাদের নাই। কিন্তু যুদ্ধ যদি করিতেই হয় তাহা হইলে শেষ সৈনিকটির দেহে প্রাণ থাকা বা জয়লাভ করা পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

ক্যুওমিণ্টাঙ দলের দক্ষিণ পন্থীদিগের বরাবরই কম্যুনিষ্ট-গণের সহিত সহযোগিতা করিতে আপত্তি ছিল। সুন্ ইয়াট সেনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্বের গুণেই সাময়িকভাবে হইলেও ইঁহাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধ আত্মপ্রকাশ করিল। ক্যুওমিণ্টাঙের দক্ষিণপন্থী দল বলিতে লাগিলেন যে কনফ্যুসিয়াসের জন্মভূমি এবং কর্ম্মক্ষেত্র মহাচীনকে কোনক্রমেই বলশেভিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হইতে দেওয়া চলিবে না।

নানকিঙ সরকার প্রথম হইতেই কম্যুনিষ্ট বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। অভিযানের পর অভিযান পাঠাইয়া কম্যুনিষ্ট দল এবং তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চীনের সৌভাগ্য-ক্রমে আজ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা সফল হয় নাই।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক উত্তর চীনের সিয়ানে যান। চ্যাংসোলিনের পুত্র চ্যাং সুয়ে-লিয়াঙের আদেশে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুও-মিণ্টাঙ এই দুই দলের মধ্যে একটা আপোষরফা হয়। কম্যুনিষ্টগণ তাঁহাদের চরম মতবাদ পরিত্যাগ করেন। ভূ-স্বামী এবং বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের ভূমি এবং বিত্ত বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিত্যক্ত হইল। নানকিঙ সরকারও চীনকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

যুদ্ধকালে কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাঙ এই দুই রাজনৈতিক দলের বিরোধ সাময়িকভাবে প্রশমিত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে এই বিরোধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া অবশেষে সর্ব্বনাশা গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছে।

জাপ আক্রমণের ফলে যেদিন জাতির সত্তা এবং স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল সেদিন এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল সমস্ত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। মাতৃভূমির রক্ষার জন্য উভয়েই সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিয়াছে।*

কিন্তু এই যুদ্ধকালেই বিভিন্ন সূত্রে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধের ধারা বহিয়াই চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষের কথাও মধ্যে মধ্যে শোনা গিয়াছে।

অন্তর্বিরোধে দুর্ব্বল, রণ-বিধ্বস্ত মহাচীন বহুদিন হইতেই আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতাই প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধ মিটিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য কারণও যে না আছে এমন নহে।

অবিলম্বে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধ মিটিয়া না গেলে অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত আমাদিগকে মিঃ জিন্না এবং তাঁহার স্বপ্ন-সৌধ পাকিস্থানের চৈনিক সংস্করণের কথা শুনিতে হইবে। যে যে কারণে প্রগতিশীল, ত্যাগব্রতী এবং স্বদেশের মুক্তিকামী একটি রাজনৈতিক দলের সহিত প্রতিক্রিয়াপন্থী ও ক্ষমতালিপ্সু অপর একটি দলের অনৈক্য, সংঘর্ষ এবং স্বীয় স্বার্থের খাতিরে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক এই শেষোক্ত দলকে প্রত্যক্ষ

*১৩৫৩ সালের মাঘ মাসে প্রবাসীতে প্রকাশিত লেখকের 'যুদ্ধোত্তর মহাচীন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ও অপ্রত্যক্ষ প্রশ্রয় দান—ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ দ্বারে উপস্থিত হইয়াও অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে পারিল না, জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘ ষাট বৎসরের সাধনা মাত্র আংশিক ফলপ্রদ হইল, পূর্ণাহুতির মুখে ভারতবর্ষ—দ্বিধা—বহুধা কিনা কে জানে!—বিভক্ত হইয়া গেল, চীনেও ঠিক সেই সমস্ত কারণ বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপ-যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বোঝা গিয়াছিল যে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিন্টাঙ বিরোধের আগুন নিভে নাই। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স্', 'লণ্ডন টাইমস্' 'ওয়ার-য়্যাণ্ড দি ওয়ার্কিং ক্লাস' প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন সংবাদদাতা এবং লেখক মানকিঙ (পরে চুংকিঙ) জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। এই সমস্ত অভিযোগের মধ্যে জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলসমূহের অবরোধ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক চীনে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা এবং সমগ্র চীনের জন্য একটি সম্মিলিত সরকার গঠনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলনীয়:

"The Chinese Communists have good armies which are now fighting guerilla warfare against the Japanese…the Generalissimo regards these armies (*i. e.* not the Japanese) as the chief threat to his supremacy…For several years he has immobilised 300,000 to 500,000 Central Government troops to blockade the Communists…The Generalissimo is determined to maintain his group of ageing reactionaries in power until the war is over, when it is commonly believed, he will resume his war against the Chinese Communists without distraction." (Brooks Atkinson in the *New York Times*, October 31, 1944)

এটকিন্‌সনের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

ক্যুওমিন্টাঙ্ সরকার কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ আইনের বলে কম্যুনিষ্ট দলের সদস্য হওয়া জাপ-যুদ্ধ কালেও চরম দণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল। আজও এই দলের বৈধতা স্বীকৃত হয় নাই। যুদ্ধের ফলে যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ওলটপালট হইয়াছে, সরকার তাহা কিছুতেই স্বীকার করিতেছেন না। কম্যুনিষ্টদলের শক্তি এবং ইহার সমর্থকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই দলের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। জাপ-যুদ্ধকালে যখন সর্ব্ববিষয়ে সরকারী বাহিনীর সুস্পষ্ট অধঃপতন পরিলক্ষিত হইতেছিল, সেই দুর্দ্দিনেও কম্যুনিষ্টগণ লক্ষ লক্ষ লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের গণশক্তিকে বহুলাংশে সুসংহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে যে শর্তে কম্যুনিষ্টগণ ক্যুওমিন্টাঙ্ দলের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে মিশিয়া যাইতে সম্মত ছিলেন, তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ দ্বিমত নাই। ইঁহাদের উত্থাপিত প্রধান দাবিগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ক্যুওমিন্টাঙ্ বাহিনী কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলের অবরোধ প্রত্যাহার;

২। 'লেণ্ড-লিজ-চুক্তি' (Lend-Lease Agreement) অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণসমূহ ক্যুওমিন্টাঙ্ বাহিনীর সহিত সমান ভাবে পাইবার অধিকার;

৩। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের বিলোপসাধন এবং

৪। সর্ব্বদলীয় সরকার গঠন।

ভূমি-বন্দোবস্ত প্রথার সংস্কার কম্যুনিষ্টদলের প্রধান উদ্দেশ্য ("Stand upon a moderate agrarian platform with a Marxist colouration")। ভূম্যধিকারের সমতা-সাধন, গুরুভার পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যতীত যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সামাজিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন, সর্ব্বশ্রেণীর সমান ভোটাধিকার প্রবর্তন এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা এই দলের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই দিক হইতে বিচার করিলে চীনের সাম্যবাদী প্রচেষ্টাকে উনবিংশ শতাব্দীর টাইপিং (Taiping) আন্দোলনের একটি পরিণত সংস্করণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশের মধ্যেও ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে কোন ক্রমেই এই কর্ম্মসূচীকে রূপায়িত করা সম্ভব নহে।

ডাঃ সুন ইয়াট সেনের 'সান মিন চু-ই' বা 'থ্রি-প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অব দি পিপ্‌ল'কে বাস্তবে পরিণত করা ক্যুওমিন্টাঙ দলের লক্ষ্য। মহাচীনের জাতীয় সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার সৌকর্য্য সাধন 'থ্রি-প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্' এর উদ্দেশ্য। কাজেই কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিন্টাঙ্ দলের আপাততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাজ করিতে না পারিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

কিন্তু গোড়ার গলদ এই যে উভয় দলই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কর্ত্তৃত্ব প্রয়াসী। বহুদিন পূর্ব্বে চীনের অন্যতম সাম্যবাদী নেতা পো-কু (Po-ku) আমেরিকান গ্রন্থকার এবং সাংবাদিক এড্‌গার স্নো (Edgar Snow) নিকট বলিয়াছিলেন—সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব সময়েই যে আমাদিগকে নেতৃত্বের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। যে রাজনৈতিক দলের হাতে নেতৃত্ব নাই, তাহার থাকা এবং না থাকা উভয়ই সমান।

ক্যুওমিন্টাঙ দলের কম্যুনিষ্ট-আতঙ্ক এই উভয়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আর একটি প্রধান অন্তরায়। প্রথমোক্ত দলের ধারণা যে শেষোক্ত দল সুযোগ পাইলেই স্বীয় অধিকৃত অঞ্চলসমূহে এমন একটি সরকারের প্রতিষ্ঠা করিবেন যে জাতীয় সরকারের পক্ষে তাহাকে কোনক্রমেই বশে রাখা সম্ভব হইবে না।

ক্যুওমিণ্টাঙ দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে কম্যুনিষ্ট দলের বৈধতা একবার স্বীকৃত হইলে ইহাকে দমন করিবার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ পাইবে।

নীতি এবং মূল আদর্শের দিক হইতেও কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাঙ এই দল দুইটির মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। চিয়াং কাই-শেক পরিচালিত ক্যুওমিণ্টাঙ দল কৃষক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় ক্ষমতা রক্ষায় যত্নবান। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট দল সমাজের মেরুদণ্ড কৃষক সম্প্রদায়কে একটি সক্রিয় রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিয়া তাহার সহায়তায় স্বীয় শক্তি বর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর।

বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র নিম্নলিখিত ভাবেই কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে। হয় কম্যুনিষ্টগণকে নিজেদের সৈন্যবাহিনী বিনা সর্ত্তে ক্যুওমিণ্টাঙ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে সঁপিয়া দিয়া চিরদিনের মত রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাদিগকে রাজনৈতিক আত্মহত্যা করিতে হইবে। আর না হয় ত ক্যুওমিণ্টাঙ দলকে একনায়কত্বের মোহ পরিত্যাগ করিয়া এবং জনসাধারণের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

দুইরত কম্যুনিষ্ট এবং ক্যুওমিণ্টাঙ নেতৃবৃন্দ কি ভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান করিবেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাঁহাদের বিচারে দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা প্রাধান্য দেওয়া হয় কিনা দেখিয়াই ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান নির্দ্ধারিত হইবে।

গাছগাছড়া হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এস্‌সি

আধুনিক সভ্যতা যে প্রকৃতপ্রস্তাবে রাসায়নিক শিল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। লিখিবার কালি কলম কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড়-চোপড়, জুতা-মোজা, প্রসাধন-দ্রব্য, ঔষধপথ্যাদি সমুদয় সামগ্রীই যে রাসায়নিক শিল্পপ্রসূত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামালকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ। খনিজ কাঁচামালের মধ্যে পড়ে বিবিধ ধাতুপ্রস্তর, পাথুরিয়া কয়লা, গন্ধক, সাধারণ লবণ, পেট্রোল প্রভৃতি। এই শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ না হইলে অপর দুই শ্রেণীর রাসায়নিক শিল্প উৎপন্ন হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ, ধাতুপ্রস্তর হইতে উৎপন্ন লৌহ, তাম্র, পারদ, রৌপ্য, টিন, সীসা, প্লাটিনাম, এলুমিনিয়ম, সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম প্রভৃতি ধাতু এবং ঐ সব ধাতুর অসংখ্য লবণ-পদার্থ—যায় কাচ, সোডা, কষ্টিক সোডা, সালফিউরিক, নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড। ইহাদের মধ্যে সালফিউরিক প্রভৃতি এসিড, সোডা, কষ্টিক-সোডা প্রভৃতিকে বলে হেভী কেমিক্যাল। মূলতঃ এগুলি অত অধিকাংশ রাসায়নিক শিল্পের কলকাঠিস্বরূপ। পক্ষান্তরে পাথুরিয়া কয়লা হইতে সঞ্জাত বেনজিন, টলুয়িন, জাইলিন, ন্যাপথেলিন, অ্যানথ্রাসিন, কার্ব্বলিক এসিড, পিরিডিন, কুইনোলিন প্রভৃতি দ্রব্য এবং শ্বেতসার-প্রধান খাদ্যশস্য কিংবা খোসা গুড় হইতে উৎপন্ন এলকহল বা সুরাসার এবং তাহা হইতে প্রস্তুত ইথর, ক্লোরোফরম, এসিটন, এসেটিক এসিড, এসেটিক এনহাইড্রাইড ও ইথাইল সিটেট প্রভৃতি পদার্থ অত বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পেরই প্রাণস্বরূপ। এই কারণেই কোনও দেশে প্রাকৃতিক কাঁচামালের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও সেই সম্পদের সদ্ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না যদি সে দেশে আনুষঙ্গিক রাসায়নিক শিল্পগুলি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া না উঠে। জার্ম্মানি রঞ্জন-পদার্থ বা dyestuff শিল্পে যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহার গোড়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ দেশে রাসায়নিক শিল্পের আবশ্যক সকল বিভাগই একই সঙ্গে বিকশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্রিম নীল, এলিজারিন প্রভৃতি রঞ্জন পদার্থকে যিনি লাভজনক শিল্পরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, জার্ম্মানীর সেই স্বনামধন্য রাসায়নিক হাইনরিখ কারোর "উবের দি এনটভিক-লুঙডের টেরফারবেন ইনডুষ্ট্রি" (Uberdie Entwicklung-der Teerfarben industrie—আলকাতরাজাত রঞ্জন-শিল্পের ক্রমবিকাশ) নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মানবশিশু যেমন শুধু মাথা লইয়াই জন্মায় না, পরন্তু সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সমান ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, রাসায়নিক শিল্পের বেলায়ও সেইরূপ। প্রারম্ভেই প্রয়োজনীয় সকল বিভাগেরই গোড়াপত্তন দরকার; তাহা যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক না কেন। আমাদের দেশে যাঁহাদের ধারণা যে, বিশিষ্ট কোনও লাভজনক রাসায়নিক শিল্পকে তাঁহারা রাতারাতি আধুনিক আকারে দাঁড় করাইবেন তাঁহারা একথা যেন কখনও বিস্মৃত না হন যে, রাসায়নিক শিল্প এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে অত্যাবশ্যক সকল বিভাগ একযোগে গড়িয়া না তুলিলে তাঁহাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করা সুদূরপরাহত। রাসায়নিক শিল্পসম্বন্ধে আর একটি

প্রধান জ্ঞাতব্য এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞান থাকিলেই চলে না, পরন্তু রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী লোক না জুটিলে সাফল্যের সঙ্গে রাসায়নিক শিল্প দাঁড় করানো অসম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত এসিডও কারে নষ্ট হয় না এমন ধাতুপাত্রাদি, নিষ্কাশন-যন্ত্র, অটোক্লেভ, এনামেলের বিবিধ পাত্র, চুল্লি, নল প্রভৃতির প্রচুর সংস্থান না থাকিলেও রাসায়নিক শিল্প দাঁড়াইতে পারে না। একটি উদাহরণ দিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কাঠ হইতে ঘনীভূত ও উত্তপ্ত এসিড যোগে গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। আমরা লেবরেটরিতে চেষ্টা করিয়া বড়জোর দুই-এক পাউণ্ড হয়ত তৈরি করিতেও পারি, কিন্তু সুন্দরবনের হাজার হাজার টন কাঠ হইতে শত শত মণ গ্লুকোজ তৈরি করিবার জন্য যে ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল ও যেরূপ ধাতুপাত্রাদির আবশ্যক তাহা আমাদের আয়ত্তে নাই বলিয়াই আমরা আজ বহু বৎসর হইতে শুধু "ভুত ক্রম উড" কথাটিই কপচাইতেছি। একটু অবান্তর হইলেও রাসায়নিক শিল্পসম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই এই কথাগুলি বলিতে হইল। এখন গাছগাছড়া হইতে কোন্ কোন্ রাসায়নিক শিল্প বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা হইতেছে।

গাছগাছড়া হইতে লাভজনক রাসায়নিক শিল্প-সম্ভাবনায় প্রথমেই চায়ের পরিত্যক্ত গুঁড়া হইতে ক্যাফিন প্রস্তুতের কথা মনে পড়ে। মাথাধরার ঔষধ ক্যাম্পিন, ক্যাফিয়াস্পিরিন প্রভৃতির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। ভারতবর্ষে বার্ষিক ৪০ হইতে ৫০ কোটি পাউণ্ড চা জন্মে এবং তাহার সঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড চায়ের গুঁড়া পাওয়া যায়। বাংলাদেশ এবং আসামেই বেশীর ভাগ চা উৎপন্ন হয়। চায়ের গুঁড়াতে শতকরা ২ হইতে ৪ ভাগ ক্যাফিন থাকে। গত কয়েক বৎসর হইল বাংলাদেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ক্যাফিন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তবে এখনও উহার বার্ষিক উৎপাদন ২০-২৫ হাজার পাউণ্ডের বেশী নহে। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অধিকাংশ চায়ের গুঁড়াই নামমাত্র মূল্যে বিদেশে চালান যাইতেছে। যাহাতে অতঃপর এক ছটাক চায়ের গুঁড়াও আর বিদেশে চালান না যায় এবং সমস্তটাই এদেশে ক্যাফিন প্রস্তুতকল্পে নিয়োজিত হয় তদ্রূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমাদের দেশের চায়ের গুঁড়াগুলি পুরাপুরি কাজে লাগাইতে পারিলে বার্ষিক প্রায় ১০০ টন বিশুদ্ধ ক্যাফিন পাওয়া যাইতে পারে এবং পাউণ্ডপ্রতি পনর টাকা মূল্য ধরিলেও এই দফায় প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টাকা আসিতে পারে। বর্ত্তমানে চায়ের গুঁড়া হইতে ক্যাফিন প্রস্তুতের প্রধান অন্তরায় উপযুক্ত পরিমাণ দ্রাবক বেনজিনের অভাব। অনেকে হয়ত জানেন, বেনজিন-সাহায্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিষ্কাশক-যন্ত্রে অবিরাম ঊর্দ্ধপাতন উপায়ে গুঁড়া হইতে ক্যাফিন পৃথক করা হইয়া থাকে। চিনি যেমন জলে গলিয়া যায় চায়ের গুঁড়ার ক্যাফিন তেমনি সবটাই ঐ উপায়ে বেনজিনে দ্রবীভূত হয়, পরে বেনজিন উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পীকৃত করিয়া সেই বাষ্প পাত্রবিশেষে শৈত্যপ্রভাবে তরল আকারে ধরা হয় ও পুনরায় ঐ কাজে ব্যবহার করা হয় এবং অবিশুদ্ধ ক্যাফিন পাওয়া যায়; অতঃপর রাসায়নিক উপায়ে এই ক্যাফিনকে বিশুদ্ধ করা হয়। পাথুরিয়া কয়লা ও আলকাতরা বেনজিনের উৎস। সুতরাং দেশে কয়লাসংশ্লিষ্ট রাসায়নিক শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে অপরাপর রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া তোলা যে প্রায় অসম্ভব, ইহা তাহারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাংলার অন্যতম মূল্যবান্ উদ্ভিজ্জ পদার্থ কুইনিন। যদিও সম্প্রতি আমেরিকার রসায়নাগারে কৃত্রিম কুইনিন প্রস্তুত হইয়াছে তথাপি বিশেষজ্ঞগণের অভিমত এই যে, উহা কৃত্রিম নীলের মত সুলভে বহুল পরিমাণে প্রস্তুতের সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে এটেব্রিন, প্লাজমোকিন, ক্লোরোকিন, মেটাক্লোরিডিন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও কুইনিনের মর্য্যাদা হ্রাস পায় নাই। সিন্‌কোনা-বৃক্ষের বল্কলে অন্যূন ৩০টি বিভিন্ন উপক্ষারের (alkaloid) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ক্রমনিম্ন হারে ক্রিয়াসম্পন্ন হিসাবে কুইনিন, কুইনিডিন, সিন্‌কোনিন এবং সিনকোনিডিন উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিনই সর্ব্বাপেক্ষা ক্রিয়াশীল এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম অপকারী। গত ১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে ৪ লক্ষের উপর লোক ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ—ভুগিয়াছে যে কত লোক তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। বাংলায় প্রতি বৎসর অন্ততঃ পক্ষে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড কুইনিনের প্রয়োজন, কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সালেও বাংলাতে মাত্র ১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড কুইনিন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায়। দার্জ্জিলিঙের নিকট মংপু কুইনিন কারখানায় বার্ষিক মাত্র ৫০ হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি কুইনিন তৈরি হইয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে সিনকোনা গাছের চাষের উপযোগী যথেষ্ট জমি থাকা সত্ত্বেও এ যাবৎ গবর্ণমেণ্ট ঐ চাষ বৃদ্ধির বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। অনেকেই জানেন যবদ্বীপে ওলন্দাজ পুঁজিপতিদের অধীনে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন কুইনিনের প্রায় ৯৩ ভাগ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতে কুইনিনের চাষ বেশী হইলে পাছে কুইনিনের দাম কমিয়া যায় এবং ওলন্দাজ ধনিকগণের স্বার্থহানি ঘটে, এই কারণে যবদ্বীপের ওলন্দাজ বণিক প্রতিষ্ঠান 'কিনাবুরো' সর্ব্বদাই ভারত-গবর্ণমেণ্টকে প্রভাবান্বিত করায় ওলন্দাজ স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ভারতে সিন্‌কোনা চাষের প্রসার ব্যাহত হয়; ফলে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়। আমরা হিরোশিমায় এটম বোমে আতঙ্কিত হই; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কূটনীতির অদৃশ্য আণবিক বোমা যে প্রতি বৎসরই হতভাগ্য বাংলাদেশের উপর পড়িয়া থাকে তাহার খবর আমরা কয়জনেই বা রাখি? বাংলার জনসাধারণের মরণ-বাঁচনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত

কুইনিনের উৎপাদন যাহাতে দেশের চাহিদা মিটাইতে পারে সেইজন্য অবিলম্বে সিনকোনা-চাষের উপযোগী অধিকাংশ জমিতে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে চাষের প্রসার সাধন করা এবং আবশ্যক বোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সিনকোনা-চাষের সুযোগ দেওয়া ও যেরূপ গাছে কুইনিন বেশী হয় সেইরূপ গাছের প্রবর্ত্তন করাও সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বাংলায় বর্ত্তমানে যে সিনকোনার চাষ হয় তাহার বাকলে ৪ হইতে ৭ অংশ মাত্র ক্রিয়াশীল উপাদান থাকে, পক্ষান্তরে যবদ্বীপের সিনকোনা বৃক্ষে উহার পরিমাণ ১২ হইতে ১৫। সুতরাং কৃষি-বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত গবেষণা করিয়া অগৌণে সিনকোনা বৃক্ষের কুইনিনের পরিমাণ বৃদ্ধির জরুরি নির্দ্দেশ দেওয়া ও এই শিল্পের সম্প্রসারণকল্পে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনে আত্মনিয়োগ করা জাতীয় গবর্ণমেন্টের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

কুঁচিলা বা নাক্সভমিকা বীজের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন—এই বীজের মধ্যে ষ্ট্রিকনিন ও ব্রুসিন নামে তীব্র বিষ থাকে। ঔষধরূপে ও ইঁদুর মারিবার জন্য ষ্ট্রিকনিন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ও সিংহলের ইহা একচেটিয়া সম্পদ। একমাত্র গ্রেট ব্রিটেনেই বার্ষিক আড়াই হাজার টন কুঁচিলা চালান হইয়া থাকে। যদিও উড়িষ্যাতেই কুঁচিলা বেশী জন্মে তথাপি মেদিনীপুর জেলার কোনও কোনও অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায় এবং একটু যত্ন করিলে ঐ অঞ্চলে আরও বেশী কুঁচিলা উৎপাদন করা সম্ভবপর। কুঁচিলা রপ্তানী না করিয়া যদি তাহা হইতে ষ্ট্রিকনিন প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া যায় তবে বহু লক্ষ টাকা আসিতে পারে এবং দেশের বহু লোক এতৎ ব্যপদেশে অন্নসংস্থান করিতে পারে। বর্ত্তমানে বার্ষিক মাত্র কয়েক হাজার পাউণ্ড ষ্ট্রিকনিন প্রধানতঃ বাংলার রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ক্যাফিন প্রস্তুতের মত এক্ষেত্রেও প্রচুর বেনজিনের প্রয়োজন। সুতরাং ষ্ট্রিকনিন শিল্পের প্রসারও আপাততঃ সীমাবদ্ধ।

রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর তামাক জন্মে। তামাক পাতা তুলিবার সময় ও উহা বিদেশে চালান দিবার সময় উহার অনেক অংশ বাদ যায়। ঐ পরিত্যক্ত অংশ হইতে নিকোটিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলে দেশে আর একটি লাভজনক রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। আমেরিকায় তামাকের পরিত্যক্ত অংশ হইতে প্রচুর পরিমাণে নিকোটিন প্রস্তুত ও শস্যক্ষেত্রের কীট বিনাশে ব্যবহৃত হয়। নিকোটিন একটি তীব্র বিষ; কিন্তু উহা হইতে প্রস্তুত নিকোটিনিক এসিড ও নিকোটিনিক এসিড হইতে প্রস্তুত কোরামিন সুপরিচিত ঔষধ। নিকোটিনিক এসিড ভিটামিন বি-শ্রেণীর অন্তর্গত—পেলাগ্রা-নাশক। ইহা আমাদের চাউলের মধ্যে এবং চিনাবাদাম প্রভৃতি অনেক খাদ্যের মধ্যেই থাকে। নিকোটিন হইতে নিকোটিনিক এসিড জন্মে শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তামাক, সিগারেট খাইলেই ঐ ভিটামিনের কাজ হইবে। ফলতঃ, রাসায়নিকের যাদুকাঠি স্পর্শে তীব্র বিষ নিকোটিন উপকারী ঔষধে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশে কয়েক স্থানে নিকোটিনিক এসিড ও কোরামিন কিছু কিছু তৈরি হইতেছে। এখন দেশের অকেজো তামাকের ডাঁটাগুলি সংগ্রহ করিয়া সুলভে নিকোটিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলে দেশীয় নিকোটিনিক এসিড ও কোরামিন বিদেশী ঔষধের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে।

বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় ও সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর হরিতকী পাওয়া যায়। এযাবৎ জলের দরে ইহা বিদেশে রপ্তানী হইয়াই আসিতেছে। লিখিবার কালির উপাদান রূপে, পোড়া ঘা প্রভৃতি রোগে এবং চামড়া পাকা করিবার কাজে যথেষ্ট ট্যানিক এসিড ব্যবহৃত হয়। হরিতকী হইতে ট্যানিক এসিড তৈরি করিয়া দেশের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত ট্যানিক এসিড বিদেশে চালান দিতে পারিলে জাতীয় অর্থাগমের সুরাহা হইতে পারে।

মধ্য এবং উত্তর-বাংলায় আখের চাষ হয়—ঐ সব অঞ্চলে ইক্ষুর চাষ প্রসারেরও সম্ভাবনা আছে। আখের রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে ঝোলা গুড় পাওয়া যায়। ঝোলা গুড় এলকহল বা সুরাসার প্রস্তুতের একটি সুলভ উৎস। এলকহল রাসায়নিক শিল্পের জীবন-স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুরচি, বাসক, চিরতা, গুলঞ্চ, কালমেঘ, অশ্বগন্ধা, পুনর্ণবা প্রভৃতি দেশীয় ভেষজ নিষ্কাশন করা ও তাহাদের ক্রিয়াশীল উপাদান পচন হইতে রক্ষা করা এলকহলের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আজকাল প্লাস্টিকসের জিনিষপত্রে বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। কয়েক প্রকার প্লাসটিকসেরও প্রধান উপাদান এলকহল। তদ্ভিন্ন কৃত্রিম রঞ্জন পদার্থ, বিস্ফোরক, সালফোন এমাইড, ভালভারসান, এট্রেব্রিন প্রভৃতি যাবতীয় আধুনিক ঔষধ, বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রভৃতিতে অপর্য্যাপ্ত এলকহল লাগিবে। পক্ষান্তরে ভাটিতে এলকহল প্রস্তুতকালে ফিউজেল অয়েল নামক যে অংশ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে থাকে প্রধানতঃ এমিল এলকহল। ইহা হইতে প্রস্তুত এমাইল এসিটেট পাকা কলার আঘ্রাণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বার্ণিশ শিল্পের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে, রাসায়নিক শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণে এলকহল প্রস্তুতের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করণীয়।

গন্ধযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে তুলসী এবং গাঁদাল পাতার সহিত আমরা আশৈশব পরিচিত। অবশ্য গাঁদালের সুগন্ধ নিষ্কাশনে বা উহা মাথার তেলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে কেহ রাজী হইবেন বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিম বাংলার স্থানবিশেষে ইউক্যালিপটাস্ বৃক্ষের চাষের এবং তাহার মূল্যবান্ তৈল নিষ্কাশনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলার

লেবুঘাসের (Lemon grass) চাষ হইতে পারে। জার্মানির জগদ্বিখ্যাত গন্ধদ্রব্য প্রতিষ্ঠান শিমেল কোম্পানীর ১৯১০ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ জলপাইগুড়ি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে উৎপন্ন লেবুঘাসের তৈলে উহার প্রধান উপাদান সিট্রালের পরিমাণ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে উৎপন্ন লেবুঘাসের সিট্রালের মতই দেখা গিয়াছে। ঐ তেলে শতকরা ৭০।৮০ ভাগ সিট্রাল থাকে। সিট্রাল সাবান ও অন্যান্য শিল্পে সুগন্ধিকারক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন সিট্রাল হইতে রাসায়নিক উপায়ে আয়োনন নামে মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সম্প্রতি দুই-এক স্থানে লেবুঘাস হইতে সিট্রাল পৃথক করা ও তাহা হইতে আয়োনন অল্প পরিমাণে তৈরি করা আরম্ভ হইয়াছে। দেশের এই সব কাঁচামাল বিদেশীরা সুলভে কিনিয়া মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যে পরিণত করিয়া তাহার অধিকাংশই আবার এদেশেই বিক্রয় করে। দেশেই উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা এই প্রথার বিলোপসাধন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় লেবুঘাস, সিট্রোনেলা ও পামারোজা প্রভৃতি ঘাসের চাষের প্রবর্তন করিয়া একটি লাভজনক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামালের সংস্থান করা যাইতে পারে।

পরিশেষে কৃত্রিম রেশম-শিল্পের ভাবী সম্ভাবনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বনবিভাগের কাঠ হইতে গ্লুকোজের মত কৃত্রিম রেশমও প্রস্তুত হইতে পারে। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার কৃত্রিম রেশম এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। তবে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পেও প্রচুর কষ্টিক সোডা, এসিটোন, এসেটিক এসিড ও এসেটিক এনহাইড্রাইড প্রভৃতি পদার্থের প্রয়োজন। সাধারণ পরিমাণ কষ্টিক সোডা ব্যতীত অপর রাসায়নিক দ্রব্যগুলি এদেশে প্রস্তুত হয় না বলিলেই চলে।

প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও গোড়াকার রাসায়নিক শিল্পগুলির অভাবে আমাদিগকে কিরূপ পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে তাহার পরিচয় পাইলাম। দেশের রাসায়নিক শিল্পের সহিত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা ও জাতীয় ধনাগম তথা জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিবিধান গভীরভাবে জড়িত। এদিকে নেতৃবর্গের এবং দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত কর্তব্য।

বেদনার বিনিময়ে

শ্রীগোপাললাল দে

হে আমার দেশ! মুক্তির লাগি বেদনা সয়েছ যত,
কে জানিত মনে কণ্টক বনে কুসুম ফুটেছে তত!
একদা দাস্যক্লান্ত নিশীথে জাতি ঘুমে অচেতন,
তরুণ বালক কি ছবি হেরিয়া কাঁদি দিল চুম্বন!
মৃত্যু আদেশ ললাটে আঁকিয়া দেশ ছেড়ে গেল ছেলে,
বর্মা জাপানে চীন ইন্দোচীনে চলে বুভুক্ষা ঠেলে।
রাজসম্পদ, গৌরবপদ ফেলে ছোটে কারাগারে,
নূতন বুদ্ধ, নবীন অশোক দেখা গেল বারে বারে।

ঈর্ষ্যার রাগে কেহ অপবাদে, কেহ বিস্ময়ে পূজে,
কেহ শ্রদ্ধায় ঘর ছেড়ে যায়, কেহ শুধু ছল খুঁজে;
বনের পশুর শিকারে যেমন একদল পিছু ধরে,
স্বভাব-প্রবীণ, ভ্রান্ত পথের মূঢ়তা নিন্দা করে।
পথে কৈশোর যৌবন গেল, মহাপ্রাণ কত যায়,
মাঝে মাঝে নামে গভীর নিরাশা, ক্লান্তি অঙ্গে ছায়।
'ফেরো ফেরো আজও।' 'কে রে কাপুরুষ? জীবন—
দিয়েছি দান।'
অভিমানাহত দৃপ্ত সিংহ পুনঃ হ'ল আগুয়ান।

হেনকালে ছবি ভাসিয়া উঠিল কবি ঋষিদের চোখে,
'আসিছে আসিছে, হও প্রস্তুত'; শুনে হাসে মূঢ় লোকে;
ওরা ত দমে না, 'রবি' ঘুচাইল ভাবের দীনতা যত,
'মোহন' সে 'চাঁদ' অহিংসা-পথে সাধিল 'সত্যব্রত';
দেশের 'চিত্ত', ভারতের 'মতি' ভরে নব ইতিহাসে,
লক্ষ যোয়ান অসি দেয় শান্ 'সুভাষের' আশ্বাসে;
রত্নাকরেতে 'জওহর' জাগে, রাঙিল কোটির প্রাণ,
উদীরিল নভে আশ্বাসবাণী, 'দুখরাতি অবসান।'

'সত্য'? 'সত্য, বিশ্বাস কর; প্রাপ্য এ বর লহ,
আপনার হাতে শেষ কর বীর অন্তিম দুর্গ্রহ';
হেনকালে ডাকে রক্তের-বান, অগ্নি আবাস ছায়,
দস্যু মনের দানব জাগায়ে জয়াভূমি ওরা চায়।
বহুপ্রাণ দিলে, অমর যোয়ান! তবু ত জেগেছে বীর,
'জয় হিন্দ, জয় স্বাধীনভারত!' বল উন্নত শির।
নিশার তিমির ঘুচাইতে নারে ঊষার অভ্যুদয়,
স্বাধীন ভারত! অসীম বিশ্বে লহ নিজ পরিচয়।

বিশাখা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

১

কোশল রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের প্রধান অমাত্যের নাম ছিল মৃগার। তিনি নিজের অনুরূপ বংশে বিবাহ করেন। কালক্রমে তাঁহার সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সর্ব-কনিষ্ঠের নাম ছিল বিশাখ। কিছুকাল পরে মৃগারের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃগার প্রথম ছয়টি পুত্রের বিবাহ দিয়া-দিয়াছিলেন। পুত্রেরা নিজ-নিজ পত্নীর সহিত বেশভূষা লইয়াই থাকিতেন, গৃহকার্যের কোন চিন্তাই করিতেন না। অমাত্য ইহা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এক দিন তিনি যখন এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন তখন তাঁহার এক প্রিয় ব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ঐরূপ চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৃহপতি, আপনি এরূপ চিন্তিত হইয়া আছেন কেন?'

'আমার পুত্রেরা নিজ-নিজ স্ত্রীর সহিত বেশভূষাই লইয়া রহিয়াছে, গৃহকার্য কিছুই দেখে না। গৃহ এখন নষ্ট হইতে যাইতেছে।'

'বিশাখের বিবাহ দিতেছেন না কেন?'

'সে যে তাহাদের অপেক্ষা আরো নিকৃষ্ট হইবে না কে বলিবে?'

'তাহাদের অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট হইবে না ইহাও তো কেহ জানে না। তা, আপনার যদি মত হয় তো একটি কন্যাকে অন্বেষণ করিতে পারি।'

'তাই করুন।'

ব্রাহ্মণ কন্যা অন্বেষণ করিতে করিতে চম্পায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

২

চম্পায় বলমিত্র নামে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার কন্যার নাম বিশাখা। তাহার যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন বুদ্ধি, তেমন শীল-স্বভাব ও চাল-চরিত্র। বিশাখা এক দিন নিজের মনের মত কয়েকটি কন্যার সহিত এক উদ্যানে চলিয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণও ঘুরিতে ঘুরিতে সেই সময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হন। তিনি ঐ কন্যাটিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। তাই তিনি সাবধানে ঐ কন্যা কয়টির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। কন্যারা স্বভাবতই চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া থাকে। দেখা গেল তাহাদের মধ্যে কেউ দৌড়াই-তেছে, কেউ লাফাইতেছে, কেউ বা পড়িতেছে, কেউ বা হাসিতেছে, কেউ বা গা-মুড়ি দিতেছে, কেউ বা গান করিতেছে; এইরূপ অনেকে অনেকরূপ খেলা করিতেছে। কিন্তু বিশাখা সেরূপ কিছু না করিয়া ধীর ও বিনীতভাবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

আর সব মেয়ে ঐ উদ্যানের পুষ্করিণীর তীরে নিজ-নিজ কাপড় খুলিয়া নগ্ন হইয়া স্নান ও খেলা করিতে লাগিল। কিন্তু বিশাখা ওরূপ নগ্ন হইল না।

দেখা গেল, আর সমস্ত কন্যা প্রথমে নিজে ভোজন করিয়া পরে পরিজনবর্গকে পরিবেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু বিশাখা পূর্বে পরিজনবর্গকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করিল।

এইরূপে উদ্যানসুখ অনুভব করিয়া কন্যারা আবার একসঙ্গে ফিরিল। পথে কিছু জল ছিল উহা পার হইতে হইবে। মেয়েদের পায়ে জুতা ছিল, তাহারা তাহা ছাড়িয়া খালি পায়ে ঐ জল পার হইল, কিন্তু বিশাখা জুতা পায়ে দিয়াই ঐ জলেরও মধ্যে চলিল।

মেয়েদের ছাতা ছিল, তাহারা তাহা বন্ধ করিয়া আমবাগানের ভিতর দিয়া চলিয়াছে; কিন্তু বিশাখা ছায়াতেও তাহা মাথায় দিয়াই চলিয়াছে।

এমন সময়ে বাতাস উঠিল ও বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আর সমস্ত মেয়েরা এক দেবমন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু বিশাখা বাহিরেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

৩

বিশাখার এই সমস্ত আচরণ দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে বড় কৌতূহল উৎপন্ন হইল। তিনি বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, তুমি কাহার কন্যা?'

'আমার পিতার নাম বলমিত্র।'

'বৎসে, তোমাকে প্রশ্ন করিব? রাগ তো করিবে না?'

বিশাখা একটু হাসিয়া উত্তর করিল, 'পিতা, প্রশ্ন করুন। দোষ কি?'

'বৎসে, সব কন্যাই তো দৌড়াইতেছে, লাফাইতেছে, পড়িতেছে, হাসিতেছে, গা-মুড়ি দিতেছে, আরো কত কি করিতেছে, তুমিই কেবল এদের সঙ্গে বিনীত ও ধীর-ভাবে চলিয়াছ।'

'সব কন্যাই তো মাতা-পিতার বিক্রেয় বস্তু। লাফাইতে বা পড়িতে গিয়া যদি আমার হাত বা পা ভাঙিয়া যায়, তবে আমাকে কে চাইবে? যত দিন বাঁচিব বাবা ও মা আমাকে তো পোষণ করিবেন না।'

'বৎসে, ভাল। ইহা হইল। অন্য একটা প্রশ্ন করি। আর সব মেয়েরা নিজ নিজ কাপড় খুলিয়া তীরে রাখিয়া জলে নামিয়া পড়িল, কিন্তু তুমি তো সেরূপ করিলে না, কেন?'

'স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই লজ্জাসম্পন্ন হয়। যদি কেহ আমাকে ঐ অবস্থায় দেখিত তবে সেটা ভাল হইত না।'

'বৎসে, কে তোমাকে সেখানে দেখিতে আসিতেছে?'

'পিতা, এই তো আপনিই আমাকে দেখিতেন।'

'বৎসে, ভাল; ইহাও হইল। অন্য কথা জিজ্ঞাসা করি।'

'এই সমস্ত মেয়েরা পূর্বে নিজে ভোজন করিয়া পরিজনবর্গকে পরে ভোজন করায়। কিন্তু তুমি পূর্বে পরিজনবর্গকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করিলে। কেন?'

'পিতা, আমরা পুণ্যের ফল ভোগ উপভোগ করিতেছি, সব সময়েই আমাদের পর্ব। কিন্তু ইহারা কুকর্মের ফল উপভোগ করিয়া কচিৎ কখনো উৎকৃষ্ট খাদ্য পাইয়া থাকে।'

'ভাল, পুত্রি; ইহাও গেল। আর একটি প্রশ্ন করি। পথ যখন শুষ্ক তখনই সকলে জুতা পায়ে দেয়। কিন্তু তুমি জলের মধ্যে পায়ে জুতা দিলে। কেন?'

'পিতা, লোক মূর্খ। জলেই পায়ে জুতা দেওয়া উচিত। কারণ ডাঙায় কাঁটা, কাঁকর, ঝিনুকের টুকরা বা ঐরূপ আরও কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জলের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। অতএব জলেই পায়ে জুতা দেওয়া উচিত।'

'ভাল পুত্রি, ইহাও হইল। অন্য প্রশ্ন করি। এই মেয়েরা রৌদ্রে ছাতা ধরিয়া চলে, কিন্তু তুমি তো আমের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ইহা করিলে?'

'পিতা, লোকেরা মূর্খ। বাগানেরই মধ্যে ছত্র ধারণ করা উচিত। কেননা বাগান সব সময়েই পাখী ও বানরে ভরা থাকে, তাহারা মল-মূত্র ত্যাগ করে, হাড়ের টুকরা ফেলে, অর্ধভুক্ত ফলসমূহ ফেলে, তাহারা চঞ্চল স্বভাব বলিয়া এক শাখা হইতে অন্য শাখায় যায়, কাঠের টুকরা ফেলে। কিন্তু ফাঁকা জায়গায় তাহা হয় না। অথবা কখনো হইলেও তাহা হালকা হয়। তাই বাগানেরই মধ্যে ছত্র ধারণ করা উচিত।'

'ভাল, পুত্রি। ইহাও হইল। অন্য প্রশ্ন করি।

'বাতাস বা বৃষ্টি হইলে এই সব মেয়েরা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিল, কিন্তু তুমি বাহিরেই থাকিলে। কেন?'

'পিতা, বাহিরেই থাকা উচিত। দেবমন্দিরে যাওয়া উচিত নয়।'

'বৎসে, যুক্তি কী?'

'এই সমস্ত দেবমন্দিরে সব সময়ে যে ধূর্ত, লম্পট প্রভৃতি থাকে না তাহা নহে। আমি উহাতে প্রবেশ করিলে যদি কেহ সেই অবসরে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে তবে তাহাতে আমার পিতা-মাতার কি কলঙ্ক হইবে না? তাই বাহিরে থাকিয়া যদি প্রাণ যায় তাহাও ভাল, কিন্তু শূন্য দেবালয়ে প্রবেশ করা ভাল নয়।'

৪

তাহার পর, ব্রাহ্মণ বিশাখার কথাবার্তা ও ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলমিত্রের গৃহে 'স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা বলিলেন,

'ব্রাহ্মণ, এ তো ভিক্ষার সময় নয়, আপনি কী প্রার্থনা করেন?'

'কন্যা ভিক্ষা চাই।'

'কাহার জন্য?'

'শ্রাবস্তীর প্রধান অমাত্য হইতেছেন মৃগার। তাঁহার পুত্রের নাম বিশাখ, তাঁহার জন্য।'

তাঁহারা বলিলেন, 'ও বংশ তো আমাদের অনুরূপ। তবে কী?'

'অত্যন্ত দূর।'

'দূরেই তো কন্যা দিতে হয়।'

'কেন?'

'যদি সুখে থাকে তো শুনিয়া বেশ আনন্দ হয়। কিন্তু যদি দুঃখে থাকে তো দান, মান, সৎকার করিতে দুঃখ হয়, অর্থক্ষয় হয়।'

কন্যাপক্ষ বলিলেন 'যদি ইহাই হয় তবে কন্যা দান করাই হউক।'

ব্রাহ্মণ 'স্বস্তি' বলিয়া শ্রাবস্তীতে অনুক্রমে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পথের শ্রম অপনয়ন করিয়া অমাত্য মৃগারের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তিনি কন্যার রূপ, গুণ ও বিচক্ষণতার কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'আমি নানা কষ্টে নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিয়া এই কন্যার সন্ধান পাইয়াছি। এখন বিবাহ দিতে পারেন।' অমাত্য মৃগার শুভদিন নির্ধারণ করিয়া চম্পায় আগমন করিয়া খুব ধুমধামে বিশাখের বিবাহ দিলেন।

৫

বিশাখার পতিগৃহে যাইবার সময়ে তাহার মা তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন, 'মা, তুমি প্রতিদিন সূর্য ও চন্দ্রকে নমস্কার করিবে। অগ্নির পরিচর্যা করিবে। দর্পণ নির্মল করিয়া রাখিবে। শুক্ল বসন পরিধান করিবে। গ্রহণ করিবে, দান করিবে না। কথা রক্ষা করিবে।

উঠিয়া কাহাকেও আসন দিবে না। মিষ্ট ভোজন করিবে। সিঁড়ি বাঁধিবে।'

মৃগার ইহা শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন ইহাকে মিথ্যা মত গ্রহণ করান হইতেছে, আমি ইহাকে যথার্থ মত গ্রহণ করাইব। এই ভাবিয়া মৃগার পুত্রবধূকে লইয়া যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন।

বিশাখার মায়ের হৃদয় স্নেহে ব্যাকুল। তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন 'মা আমার, এই শেষ দেখা।'

কন্যা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'মা, জিজ্ঞাসা করি তোমার জন্ম কি এখানেই হইয়াছিল, না জ্ঞাতিগৃহে (নায়রে) ?

'মা, জ্ঞাতিগৃহে।'

'তাহাই তোমার বাড়ী, না ইহাই ?'

'ইহাই।'

আমারও জন্ম এখানে, কিন্তু বাস করিতে হইবে সেখানে (পতিগৃহে)। সংযোগের শেষে হইতেছে বিয়োগ। চুপ কর। কেন কাঁদিতেছ ?'

৬

মৃগার উপরে স্থলপথে, আর বিশাখা স্বামীর ও স্বগৃহ-লব্ধ পরিজন প্রভৃতির সঙ্গে নীচে জলপথে শ্রাবস্তীতে যাত্রা করিলেন।

বিশাখার সঙ্গে ঘোড়ার একটি খুবই ছোট বাচ্চা ছিল। স্থলপথে যাইতে হইলে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইবে ভাবিয়া ইহাকেও ইহার মায়ের সহিত নৌকায় করিয়া যাওয়া স্থির হয়। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও ঐ ঘোড়াটি নৌকায় উঠিতে চায় না। ইহা লইয়া একটা কোলাহল হয়। বিশাখা তাহা শুনিতে পাইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। তিনি বলিলেন 'আগে বাচ্চাটিকে নৌকায় উঠাও, তার পর ঘোড়াটি নিজেই উঠিবে।' তাহাই হইল, ঘোড়াটি নৌকায় উঠিল। অমাত্য মৃগার তাঁহাদের পৌছিতে বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কিরূপে বিশাখার বুদ্ধিতে ঘোড়াটি নৌকায় উঠিয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধিমতী ("পণ্ডিতা") চম্পাকুমারী !'

৭

পথিমধ্যে রাত্রিতে সকলেই এক স্থানে বাসা লইলেন। তাহাতে ছাদের একটা অংশ খুব খারাপ ছিল। মৃগারের জন্ম তাহারই নীচে বিছানা করা হইয়াছিল। বিশাখা যখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঐ বিছানাখানি মৃগারের জন্ম করা হইয়াছে তখন বলিলেন,

'ইহা সরাও।'

'কেন ?'

'যদি তাঁহার সুপ্তাবস্থায় ইহা নীচে পড়ে তিনি মরিয়া যাইবেন। আর যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব তত দিন এই কলঙ্ক থাকিবে যে, এমন কন্যার সঙ্গে বিবাহ হইল যে, পথেরই মধ্যে শ্বশুরের মৃত্যু হইল, তিনি বাড়ীতেও পৌছিলেন না।'

যেমনি বিছানাখানি ওখান হইতে সরান হইল, অমনি ছাদের ঐ অংশটা পড়িয়া গেল। চারি দিক হইতে লোক-জন ছুটিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল 'গৃহপতি (মৃগার) চাপা গিয়াছেন।'

তিনি কাছে ছিলেন, বলিলেন, 'আপনারা ভয় পাইবেন না, এই আমি এখানে আছি।'

লোকজনেরা দেখিলেন বিছানা ওখান হইতে সরান হইয়াছে।

'কে সরাইয়াছে ?'

'বিশাখা!'

সকলে বলিল, 'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী !'

একদিন রাত্রে সকলে এক পুরাতন বাগানে বাসা লইয়াছিলেন। মৃগারের বিছানা হইয়াছিল এক শূন্য দেবালয়ে। বিশাখা ইহা দেখিয়া বলিলেন, 'ইহা কাহার জন্য ?'

'গৃহপতির জন্য।'

বিশাখা বলিলেন, 'সরাও।'

'কেন ?'

'যদি দেবালয় পড়িয়া যায়, তিনি চাপা পড়িয়া মরিবেন। আর আমার কলঙ্ক হইবে।'

বিছানাও সরান হইল, দেবালয়ও ভাঙিয়া পড়িল। চারি দিক হইতে অনেক লোকজন ছুটিয়া আসিল। পূর্বের ন্যায় সকলেই বলিল, 'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী !'

৮

ক্রমশ তাঁহারা শ্রাবস্তীতে পৌছিলেন। পথের শ্রম অপনীত হইলে ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে নিজ-নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলে বিশাখাকে নিজ বংশের অনুরূপ কাজকর্ম করাইতে আরম্ভ করা হইল। মৃগারের আর ছয়টি পুত্রবধূ যেমন নিজ-নিজ বারে পাক করিতেন, বিশাখাও সেইরূপ কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে বলা হইল 'তোমার বার সপ্তম দিবসে।'

শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর ব্যবহারের পর যে চন্দন বাঁচিয়া যাইত তিনি তাহা প্রতিদিন শুকাইয়া ছোট-ছোট গুলি করিয়া রাখিতেন। সংসারে প্রতিদিন যে ছাতু দেওয়া হইত তিনি তাহা হইতে কিছু-কিছু স্থানান্তরে রাখিতেন, পরে উহাতে ঘি মিশাইয়া মোয়া করিতেন।

স্বামী বা নিজের উপভুক্ত যে গন্ধ মাল্যাদি থাকিত তাহা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া দিতেন। রাত্রি প্রভাত হইলে কর্মকরদিগকে গন্ধ, পুষ্প, ভোজন ও মন্ত দান করিতেন। তাহারা অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া বলিত আজ আমাদিগকে আমাদের পুরাতন গৃহিণী (অর্থাৎ বিশাখার শাশুড়ী) আমাদিগকে দেখাশুনা করিতেছেন। তাহারা সেদিন দ্বিগুণ কাজ করিল। অমাত্য মৃগার তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা কি আজ আরো কতক মজুর আনিয়াছিলে?' তাহারা বলিল 'না।'

'তবে দ্বিগুণ কাজ কিরূপে হইল?'

'যেমন ভাত, তেমন কাম।'

'ইহার অর্থ কী?'

তাহারা সমস্ত খুলিয়া বলিল। মৃগারের অন্যান্য পুত্রেরা নিজের নিজের স্ত্রীর নিকট এই কথা বলিলে তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, তাঁহারাও বাড়ী হইতে কিছু কিছু অপহরণ করিয়া মজুরদের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, যেমন বিশাখা করিয়াছেন।

এক দিন মৃগার বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা', তুমি খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতির কেমন তত্ত্বাবধান কর?' বিশাখা সমস্ত খুলিয়া বলিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই গৃহকার্যের ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া বাড়ীর লোকজনকে বলিলেন 'তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশাখার দানে সন্তুষ্ট তাহারা থাকিবে, তাঁহারই অনুকূলভাবে তোমাদিগকে চলিতে হইবে, কেননা তিনিই এখন গৃহস্বামিনী হইয়াছেন।' তাঁহার আচার-ব্যবহারে বাড়ীর সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

৯

এক দিন বিশাখার গৃহের উপর দিয়া কতকগুলি হাঁস উত্তর কুরুদ্বীপ হইতে মুখে করিয়া এমন এক শালিধান্যের মঞ্জরী লইয়া উড়িয়া যাইতেছিল যাহা বিনা চাষে বিনা বোয়াতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজবাড়ীতেও একটি হাঁস ছিল। ইহা ঐ সমস্ত হাঁসকে দেখিয়া ডাকিয়া উঠিল। তাহারাও স্বজাতির কণ্ঠস্বরে আনন্দে ডাকিয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাদের মুখ হইতে কয়েকটি শালিমঞ্জরী রাজার পায়ের কাছে পড়িল। রাজা তাহা অমাত্যগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। প্রধান অমাত্য মৃগার নিজের ভাগটি বিশাখাকে প্রদান করেন। বিশাখা তাহা কৌটার মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং অন্য সময়ে চাষীদের ডাকাইয়া উহা লাগাইবার জন্য আদেশ করিলেন। তাহারাও খুব সন্তুষ্ট হইয়া ছোট্ট এক টুকরা জমি ভালরূপে চষিয়া ঐ ধান লাগাইল। যথাসময়ে বৃষ্টি হইয়াছিল। বীজের অনুরূপ বেশ ভাল ফসল ফলিল। পর বৎসর আরো বেশী ফসল হইল, তাহার পর বৎসর তাহা হইতেও বেশী হইল। এই-রূপে হংসসমূহের দ্বারা আহৃত ধান্যে কোশলরাজ প্রসেনজিতের গোলাঘর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

১০

কালক্রমে রাজা প্রসেনজিতের এক ব্যারাম হইল। বৈদ্যগণকে ডাকা হইল। তাঁহারা বলিলেন, 'মহারাজ, যদি হংসাহৃত শালি পাওয়া যায়, তবে তাহার তণ্ডুলের মণ্ড করাইয়া তাহা পান করিয়া আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন।' রাজা অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'আমি আপনাদিগকে কিছু কিছু করিয়া হংসাহৃত শালিমঞ্জরী দিয়াছিলাম। আপনারা তাহা কি করিলেন?' কেহ বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তাহা দেবালয়ে দিয়াছিলাম।' কেহ বলিলেন, 'আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।' অন্য একজন বলিলেন, 'আমি গৃহের দ্বারে তাহা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম।' মৃগার বলিলেন, 'মহারাজ, আমি তাহা বিশাখাকে দিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানি তিনি ইহা কি করিয়াছেন।' তিনি বিশাখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'পিতা, হংসাহৃত শালির কী প্রয়োজন?' মৃগার তাহা বলিলে বিশাখা একটি সুবর্ণপাত্র ঐ শালির তণ্ডুলের মণ্ডে পূর্ণ করিয়া রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন, রাজা তাহা পান করিয়া সুস্থ হইলেন।

১১

অন্য সময়ে জনপদবাসীরা রাজাকে দুইটি মাদী ঘোড়া দিয়াছিল; একটি মা অন্যটি তাহার কন্যা। কিন্তু কোন্‌টি মা আর কোন্‌টি কন্যা কেহই জানিত না। রাজা অমাত্য-গণকে বলিলেন, 'আপনারা ভালরূপে বিচার করিয়া আমাকে জানান।' অমাত্যেরা সমস্ত দিন বিচার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। মৃগার এত বেলায় বাড়ী গেলেন। বিশাখা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'পিতা, আজ এত বিলম্বে আসিলেন কেন?' তিনি সব কথা বলিলেন। বিশাখা বলিলেন, 'পিতা ইহাতে জানিবার কী আছে? দুইটি ঘোড়াকেই সমান আহার দিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যেটি কন্যা, সে নিজের অংশ খাইয়া মায়েরও অংশ লইবে। যে মা সে তাহাতে কোন বিরোধ করিবে না, মুখ নীচু করিয়া থাকিবে। ইহাই হইতেছে জানিবার উপায়।'

মৃগার আসিয়া অমাত্যগণকে এই কথা বলিলে সেইরূপ পরীক্ষা করা হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজাকে বলা হইল, 'মহারাজ এইটি মাতা আর এইটি কন্যা।'

'কীরূপে ইহা আপনারা জানিলেন?'

'মহারাজ, আমাদের জানিবার সামর্থ্য কী? বিশাখা এইরূপ বলিয়াছেন।'

'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী!'

১২

একদিন একটি মানুষ ঘাটে একখানি কম্বল রাখিয়া স্নান করিতেছিল। ঐ সময়ে সেখানে আর একটি মানুষ আসিল। এ ঐ কম্বলখানি মাথায় জড়াইয়া সেইখানেই স্নান করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম মানুষটি স্নানান্তে উঠিয়া নিজের কম্বলখানি দেখিতে পায় না। দ্বিতীয় মানুষটি বলিল ওহে, 'তুমি কী খুঁজিতেছ?'

'কম্বল।'

'কোথায় তোমার কম্বল?'

'হইতে পারে আমি যেমন মাথায় কম্বল জড়াইয়া জলে নামিয়াছি তুমিও সেইরূপ করিয়া থাকিবে।'

'এ তো আমার কম্বল!'

'তোমার? আমার।'

এই বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। উহারা রাজার নিকটে গেল। রাজা অমাত্যগণকে বলিলেন, 'আপনারা পরীক্ষা করিয়া এখানি যাহার তাহাকে দিন।' তাঁহারা পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে এক জন বলে আমার, অন্য জনে বলে আমার। 'তোমার? আমার।' এইরূপ করিতে করিতে দিন শেষ হইয়া গেল। অমাত্যেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া বাড়ী গেলেন। বিশাখা পূর্বের ন্যায় প্রধান অমাত্য মৃগারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা ঘটিয়াছে তিনি তাহা বলিলেন। বিশাখা বলিলেন, 'বাবা, এখানে জানিবার কী আছে? তাহাদের উভয়কেই বলা হউক, এই কম্বলকে ছিঁড়িয়া তোমাদের এক জন এক অর্ধ গ্রহণ করুক, অপর জন অপর অর্ধ গ্রহণ করুক। যাহার কম্বল সে বলিবে আমার কম্বল কেন ছেঁড়া হইতেছে। আর যাহার কম্বল নয় সে মনে করিবে, আচ্ছা, অর্ধেকই আমার হউক, আমার ক্ষতি কী? ইহাই এখানে পরীক্ষা।' মৃগার গিয়া আমাত্যগণকে এই কথা বলিলেন, এবং রাজাও ইহা শুনিয়া পূর্ববৎ বলিলেন, 'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী!'

১৩

কোন গ্রামে এক গৃহস্থ বাস করিতেন। তিনি নিজের সমান বংশ হইতে স্ত্রী আনয়ন করেন। তাঁহার পুত্রও হয় নি, কন্যাও হয় নি। তাই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর যাহাতে সন্তান না হয় প্রথম স্ত্রী তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হয় নি। তিনি একটি পুত্র প্রসব করেন। তিনি ভাবিলেন, সপত্নীদের পরস্পর শত্রুতা প্রসিদ্ধ। নিশ্চয়ই ইহার বিমাতা যে-কোন উপায়ে ইহাকে মারিবে। আমার স্বামী কী করিবেন? কত কালই বা আমি ইহাকে রক্ষা করিতে পারিব? অতএব সপত্নীরই হাতে ইহাকে দান করি। স্বামীর সহিত ইহা ঠিক করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীকে বলিলেন, 'ভগিনী, এই পুত্র তোমারই, তোমাকেই আমি দিলাম, তুমিই ইহাকে মানুষ কর।' প্রথম স্ত্রী ভাবিলেন 'যাহার পুত্র, তাহারই গৃহ। আমি ইহাকে বর্ধন করি। আমিই গৃহের কর্ত্রী হইব।'

কালক্রমে গৃহস্থের মৃত্যু হইল। আর বাড়ী লইয়া ঐ দুই স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। এক জন বলেন 'এ আমার পুত্র', অপর জন বলেন,'এ আমার পুত্র।' তাঁহারা রাজার নিকট গেলেন। রাজা অমাত্যগণকে মীমাংসা করিবার জন্য আদেশ দিলেন, 'যান, আপনারা বিচার করুন।' সমস্ত দিন কাটিয়া গেল কোন নির্ণয় হইল না। অমাত্যেরা বহু বিলম্বে বাড়ী গেলেন। বিশাখা পূর্বের ন্যায় মৃগারকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও আসল ঘটনা জানিয়া বলিলেন, 'এখানে জানিবার কী আছে? তাহাদের উভয়কে বলিতে হইবে, "কাহার পুত্র আমরা জানি না। তোমাদের মধ্যে যে বলবতী সে তাহাকে লইয়া যাউক।" ইহা শুনিয়া তাহারা উভয়েই বালকের বাহু ধরিয়া যথাশক্তি টানিতে আরম্ভ করিবে। বালক তাহাতে চীৎকার করিতে থাকিবে। ইহা দেখিয়া বালকের যে সত্য মা সে দয়া বশত তাহাকে ছাড়িয়া দিবে—সে ভাবিবে, 'বাঁচিয়া থাকিলে অন্তত পুত্রকে দেখিতে তো পাইব।' কিন্তু অপর স্ত্রীলোকটি নির্দয়ভাবে টানিতেই থাকিবে, ছাড়িবে না। তারপর যখন তাহাকে কশাঘাত করা হইবে তখন ঠিক হইবে। ইহাই এখানে পরীক্ষা।' মৃগার গিয়া এই কথা জানাইলে তাহাই করা হইল। রাজা বলিলেন, 'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী!'

১৪

কোন সময়ে মৃগারের ব্যারাম হয়। বৈদ্য আসিয়া তাঁহাকে এক দিন ঔষধ দেন, আবার জ্বর হয়। বিশাখা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কী জন্য তিনি এক দিন ভাল থাকেন, আর পরের দিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। বিশাখা বৈদ্যগণকে দরজা হইতেই ফিরাইয়া দিয়া নিজেই চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। মৃগার সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন কিসে তিনি এক দিন ভাল থাকেন, আর পর দিন অসুস্থ হন। যে দিন বৈদ্য বাড়ীতে প্রবেশ করেন না, নিয়তই তিনি সে দিন ভাল থাকেন। তিনি বিশাখাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া বলিলেন 'বুদ্ধিমতী চম্পাকুমারী!'

১৫

এক দিন মৃগার বিশাখাকে বলিলেন, 'বৎসে, তোমার

মা তোমাকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন তুমি সে সমস্ত অনুসরণ কর তো?' বিশাখা বলিলেন—'হাঁ পিতা, আমি অনুসরণ করিয়া চলি। ঐ যে মা বলিয়াছিলেন সূর্য ও চন্দ্রকে নমস্কার করিবে, উহার তাৎপর্য এই যে, কন্যার পক্ষে শ্বশুর ও শাশুড়ী হইতেছেন সূর্য চন্দ্রের স্থানীয়। তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করিয়া থাকি। তিনি অগ্নি-পরিচর্যার কথা বলিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য এই যে স্ত্রীর নিকটে স্বামী অগ্নিস্থানীয়। স্ত্রী স্বামীর নিকটে থাকিবেন দূরে নহে, আমি অগ্নির ন্যায় স্বামীর পরিচর্যা করিয়া থাকি। মা যে দর্পণকে নির্ম্মল করিয়া রাখিতে বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, গৃহখানিই হইতেছে দর্পণস্থানীয় ইহাকে নিত্য মার্জন করিয়া লেপন করিয়া রাখিতে হইবে। তাই আমি প্রতিদিন গৃহসংস্কার করিয়া থাকি। আর যে তিনি সাদা কাপড় পরিতে বলিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে অন্য কাপড় পরিয়া গৃহ পরিষ্কার করিতে হইবে আর শুক্লবসন পরিধান করিয়া দেবসেবা করিবে। ইহাও আমি করি। তিনি যে বলিয়াছেন গ্রহণ করিবে, দান করিবে না, ইহার তাৎপর্য এই যে, লোকে যদি কোন কিছু খারাপ বলে তাহা শুনিবে, কিন্তু খারাপ কথা বলিবে না। ইহাও আমি অনুসরণ করিয়া চলি। তিনি যে বলিয়াছিলেন কথা রাখিবে, ইহার তাৎপর্য এই যে, গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবে না। এ বাক্‌সংযম আমার আছে। ঐ যে তিনি বলিয়াছিলেন উঠিয়া কাহাকেও আসন দিবে না, তাহার তাৎপর্য এই যে, তুমি কুলবধূ, তুমি গুপ্তস্থানে উপবেশন করিবে। আমি তাহাই করিয়া থাকি। তিনি বলিয়াছিলেন মিষ্ট ভোজন করিবে। ইহার তাৎপর্য এই, ভাল ক্ষুধা হইলে খাইবে। আমি প্রতিদিন বাড়ীর সকলকে খাওয়াইয়া ক্ষুধিত হইয়া ভোজন করিয়া থাকি। আর যে তিনি বলিয়াছিলেন সুখে শুইবে, তাহার তাৎপর্য হইতেছে যে, সমস্ত গৃহকার্য করিয়া রাত্রিতে ভাণ্ড-পাত্র সব গুছাইয়া রাখিয়া বিছানা করিয়া শুইবে যাহাতে এটা ঠিক রাখা হইয়াছে, এটা ঠিক রাখা হয় নি, এই চিন্তায় আবার উঠিতে না হয়। আমি তাহাই করি। আর যে তিনি সিঁড়ি বাঁধিতে বলিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, 'তুমি নিজের শুভ কর্মফলে দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া আবার মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াছ। ইহা কর্মভূমি, এখানেও তুমি দান দিবে, পুণ্য করিবে, পাপ করিবে না. ইহা পুণ্যের সিঁড়ি, স্বর্গের সিঁড়ি।' ইহাও আমি যথাশক্তি করি।'

'ভাল ভাল, বিশাখা। তোমার মা বুদ্ধিমতী, তুমি তাঁহা হইতেও বেশী বুদ্ধিমতী!'*

* চীবরবস্তু (Gilgit Manuscripts, vol. III, Part 2, pp. 52) হইতে সঙ্কলিত।

স্বাধীন ভারত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

যে সূর্য্য কাল উঠেছিল নভে সে সূর্য্য এ তো নয়,
নব প্রভাতের নবীন সূর্য্য, নূতন অভ্যুদয়।
নূতন যুগের আরম্ভ আজ, নূতন পথের সুরু,
নবজীবনের নব অধিকার, নব দায়িত্ব গুরু।

যে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল বুকে দ্বি-শতাব্দী ধরি'
সহসা জাগিয়া চাহিয়া দেখি যে সে মায়া গিয়াছে সরি।
ঊর্দ্ধে এ কি এ অপূর্ব্ব নীল যে নীলের সীমা নাই,
আকাশে মুক্তি, বাতাসে মুক্তি, মুক্তি সকল ঠাঁই।
মুক্ত বন্ধ, যেন মুহূর্ত্তে খ'সে গেল নাগপাশ,
ভারহীন দেহ, প্রাণ ভ'রে আজ নিতে পারি নিঃশ্বাস।
আজি অকুণ্ঠ-কণ্ঠে কবি যে গাহিতে পারিবে গান,
নূতন প্রভাত, দুর্য্যোগময়ী রাত্রির অবসান।

এত দিন ধরি পেয়েছি আমরা তোমারি যে আগমনী,
বাতাসে এখনো মিলায়ে যায় নি সুরের প্রতিধ্বনি।
সেই প্রতীক্ষা সফল তাদের? পূজার লগ্ন লাগি'
বিনিদ্র-আঁখি যুগ যুগ ধরি যাহারা রয়েছে জাগি।

স্বাধীনতা মোর বক্ষের ধন, আমার মাথার মণি,
অমূল্য নিধি, সব রত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন গণি।

কোথায় থাকিব? কোথায় ঢাকিব? কোথায় রাখিব তোমা?
তুমি অপূর্ব্ব হে মহিমময়ী, তুমি সর্ব্বোত্তমা।
এত সুন্দর স্বাধীনতা তুমি, তুমি এত সুমধুর।
কোথা ছিলে তুমি, কোথা ছিলে তুমি, কেন ছিলে এত দূর?

অশোকচক্রলাঞ্ছিত ওই ত্রিবর্ণ পতাকায়
নব জীবনের শুভ সূচনায় নবীন দীপ্তি ভায়।
কত ভক্তের হৃদয়-রক্তে রঞ্জিত হ'ল এ যে,
জয়ধ্বনিতে তাদের কীর্ত্তি শোন নি কি ওঠে বেজে?
স্বাধীন দেশের নিশানের পাশে এই কেতনের স্থান,
দেশের প্রতীক এই পতাকায় দেখে যাব সম্মান।
এর পানে চেয়ে অতীতের সব দুঃখ যাব যে ভুলি,
সাগরে সাগরে ভাসিবে তরণী ত্রিবর্ণ কেতু তুলি।

এত দিনে দেবী, মিটালে কি আশা, মিটালে কি সব সাধ?
এই জীবনেই লভিলাম বুঝি নবজন্মের স্বাদ।
তোমারি চরণে নিবেদিত প্রাণ, তোমারি তরে মা মরি,
হে দেশজননী, এ শুভ লগ্নে আজি বন্দনা করি।
ভুলেছি সকল অতীতের ব্যথা, ভুলেছি সকল ক্লেশ,
স্বাধীন, স্বাধীন, স্বাধীন জীবন, স্বাধীন আমার দেশ।

আবিষ্কার

শ্রীবাণী রায়

সে নিঃশব্দে শুয়ে আছে। তার নাম সুমিত্রা। তার বয়স ত্রিশ। সে একটি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির ওপর বিভাগের অফিসার। তার বিবাহ হয় নি। সে সুন্দরী।

গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ সন্ধ্যার ছায়ায় এতক্ষণ কালো হয়েছে। সেই কালো আকাশ আলো করে গাছে ফুটে উঠার মত সারি সারি তারা ফুটেছে। বাতাসে এখনও উত্তাপ। ক্লান্ত শরীরে তবু আরাম আসে।

সুমিত্রার বাড়ী তিনখানি ঘরের সমষ্টি মাত্র। পাচক, দাস-দাসী নিয়ে সুমিত্রা থাকে। এই আরাম ও বিলাসের নিবিড়তা সুমিত্রার নিজের গড়া। প্রসাধন-টেবিলের ওপর রজনীগন্ধার ঝাড়, উপহার নয়, নিজের অর্থে ক্রীত। খাটের নীচে কার-বসান চটিজুতো; প্রসাধন টেবিলের টুলে এক প্রস্ত প্রবাল বর্ণের পা-জামা; তেপায়ার উপর এক বাক্স চকোলেট ও এক গুচ্ছ সচিত্র ইংরেজী মাসিক; কোণে রেডিও ধীরে বেজে যাচ্ছে; ছোট সেক্রেটারিয়েটের ওপরে কলম-পেন্সিল সাজান, পার্কারের প্রেসেণ্টেসন সেট্; মনোগ্রাম-করা কাগজ, রূপোর কাগজ চাপা। এর একটিও সুন্দরীর পদপল্লবে উপহার আসে নাই। সুন্দরীকেই নিজের কষ্টার্জ্জিত উপার্জ্জন থেকে কিনে নিতে হয়েছে। সেইখানেই গৌরব সুমিত্রার।

খাটের নীল আচ্ছাদনীর ওপর এলায়িত চুল সরিয়ে হাত-ঘড়ি দেখল সুমিত্রা—সাতটা কুড়ি। আপিসের পোষাক ছাড়বার পূর্ব্বেই ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চেয়েছিল।

পাশের ঘরে পোষাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে সুমিত্রা রেফ্রিজেরেটর থেকে কমলার ঠাণ্ডা রস কাঁচের টাম্বলারে চুমুক দিতে দিতে ফিরে এল। দাসী মেমসাহেবের খাতাদি ঠিকমত রেখে গেছে। তিন কুলে এক পল্লীগ্রামবাসী কাকা ভিন্ন কেউ নেই সুমিত্রার। ক্ষতি নেই, টাকা থাকলে যত্ন-আদরও কেনা যায়।

এখন কি করা যেতে পারে, সুমিত্রা ভেবে দেখল। কাল শনিবার, তা ছাড়া আপিসে কাজের কোন চাপ নেই আজ। কপি-রাইটিং যা জমেছিল সুমিত্রা বহুদিন বাড়ীতে পর্য্যন্ত কাজ করে শেষ করে ফেলেছে। মেমন এণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের ছবি কি ভাবে আঁকতে হবে তা-ও আর্টিষ্টকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার বিকালবেলা ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্টি দেবেন, কিন্তু সে ভার তাঁর সেক্রেটারী মিস্ র‍্যাগডেনের ওপরে। শুধু চমৎকার সাজ করে চা খেয়ে সুমিত্রা রয় নিষ্কৃতি পাবে। ভাবতে বেশ লাগে। প্রকাণ্ড আপিসে প্রকাণ্ড টেবিল, রূপোর সার্ভিস্ সেট, চমৎকার চায়না, আঁটুট ইস্ত্রি পোষাক, কেতাদুরস্ত আচরণ। পাশে যিনি বসবেন তাঁর নাম সংবাদ-পত্র প্রায়ই অলঙ্কৃত করে। মিস্ রয়কে এটা-ওটা এগিয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন যিনি, তাঁর মাসিক আয়ের অঙ্ক শুনলে কাকা বিহ্বল হয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে বার বার ভাইঝির দিকে তাকাবেন। কিন্তু এই সব পার্টির পিছনে কি আছে? হতাশা, হতাশা। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি, ওপরওয়ালার মন যোগাবার গ্লানি, ভবিষ্যতের বিফলতা। পাশের লোক চল্লিশের ঊর্দ্ধে, বিবাহিত, পরিবার-পরিবৃত। ব্যস্ত ভদ্রতায় যিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন, সুমিত্রার মত মেয়ে প্রত্যহ বহু সংখ্যায় দেখা তাঁর অভ্যাস আছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বুলডগ-মন মিস্ র‍্যাগডেনের মোহিনীমায়ার শিকলে বাঁধা। অত চারটি পুরুষ অফিসারের মধ্যে দুই জনের সঙ্গে সুমিত্রার প্রচণ্ড ঝগড়া। কারণ, মেয়ে হয়েও সুমিত্রার কর্ম্মনৈপুণ্য তাদের অপেক্ষা বেশী, পূর্ব্বেই প্রোমোশন পেয়েছে সে। তাই আধবয়সী, সংসারচাপক্লিষ্ট অফিসার দুটির বিদ্বেষের অন্ত নেই। আর একজন অ-বাঙালী, অত্যন্ত গম্ভীর। কারুর সঙ্গে প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলেন না। চতুর্থ ব্যক্তি সহাস্য সুপুরুষ, অবিবাহিত তরুণ। কিন্তু সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত তাঁর মন সম্পূর্ণ হরণ করেছে। শীঘ্রই নাকি বিবাহও হবে।

সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্ত এই টেবিলে নিমন্ত্রণ পায় নাই, সুমিত্রা পেয়েছে। কিন্তু সুমিত্রার সযত্নে সাহেবী ভঙ্গিতে বিন্যস্ত অলকাবলী, সুদীর্ঘ নখর, ক্ষীণ-শুভ্র দেহবল্লরী, রক্তনীরক্ত ওষ্ঠাধর, আপাদমস্তক সূক্ষ্ম পালিশ কিছুই প্রদ্যোত বসুর চোখে পড়বে না, জানে সুমিত্রা। তাঁর মনে জেগে থাকবে অনুপস্থিতা মীনা দত্তের গোল মুখ, এলোমেলো চুল, ভাঙা ভাঙা কথা, আর কথায় কথায় হাসাকাঁদা। অদ্ভুত!

এখন কি করা যায়? কাজেই 'কিস্‌মেট' হচ্ছে। দেখা যেতে পারে। কিন্তু একা সিনেমা ভাল লাগে না। মঞ্জুকে সঙ্গে ডাকা যেতে পারে। কাকীমার ভাইঝি মঞ্জু হোষ্টেলে থাকে, অনুমতি চাই তার পক্ষে। থাকগে গিয়েই কাজ নেই ছবিতে।

বরং কিছু পড়া যাক। বহুদিন ও বালাই নেই। কপি লিখে আর বিজ্ঞাপনের মালমশলা ঘেঁটে ঘেঁটে জ্ঞানের পথ বন্ধ করেছে সুমিত্রা। জওহরলালের 'The Discovery of India' ('দি ডিস্‌কভারি অফ ইণ্ডিয়া') সামান্য একটু পড়া হয়েছে মাত্র। সেক্‌শনাল বুককেস থেকে বইটি নিয়ে খাটের পাশে আরাম-চেয়ারে বসল সুমিত্রা টেবল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে।

বইখানা জন্মদিনে এক বন্ধুর উপহার। সেই বন্ধুই মীনা দত্তের জন্মদিনে উপহার দিয়েছে নীল ফুলতোলা ক্রেপ ডি-শিনের ব্লাউস্‌পিস্। এত পার্থক্য কেন? সত্যই কি সুমিত্রার

জীবনের প্রতীক The Discovery of India ; আর মীনা দত্তের প্রতীক ফুলতোলা জামা ?

মীনার কথা ভেবে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। মীনা অতি সাধারণ, একশো বাট টাকা মাত্র পায়। সুমিত্রার আদেশে মীনা মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করতে পারে। এক ক্ষুদ্র ফ্ল্যাটে দরিদ্র পরিবারে নগণ্য জীবনযাত্রা মীনার। অতি ভাকা সুলভ ধরণের মেয়ে। কি করে প্রদ্যোত বসুর মত ধীমান্ তাকে পছন্দ করে ফেললেন, বিশেষতঃ যখন সেখানে অফিসের সুমিত্রা রয় উপস্থিত ছিল।

তাতে ক্ষোভ নেই সুমিত্রার। নিজে উপযুক্ত পুরুষ সে পায় নাই খুঁজে। নিঃসঙ্গ জীবনের গাম্ভীর্য্য নিয়ে সে গৌরবে সমাসীন। প্রদ্যোত বসু প্রত্যেকটি মতামতে তার শ্রদ্ধা দেখান। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্য্যন্ত স্বীকার করেন—"Miss Roy at times surpasses even herself." সে যা চেয়েছিল—প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, সম্মান, সবই পেয়েছে। অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা করে সুমিত্রা নিজেকে আর হীন করবে না।

মনোযোগ সহকারে সুমিত্রা পড়ে যেতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই তন্ময়তা এসে গেল। একটি বিরাট মানবের বিরাট হৃদয়ের অন্বেষণ সুমিত্রার দিনযাত্রার ক্ষুদ্রতাকে কিছুক্ষণের জন্যও ভুলিয়ে দিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি গিরিগুহায়, প্রতিটি পত্রপল্লবে যে অমর জীবনস্রোত শতাব্দীর আঘাত প্রতিহত করে আজও অফুরন্ত উৎসাহে প্রবহমান, তারই আনন্দ নেহেরুর চক্ষে ভারতের অন্তর্নিহিত সত্তাকে প্রতীয়মান করেছে। সুমিত্রা কি এই ভারতবর্ষ চেনে না ? এই ভারতের অধিকার তার জন্মগত। বেদান্ত ও উপনিষদের দেশে আজ সুমিত্রার মত মেয়ের স্থান কোথায় সে কথা 'দি ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া'র কোথাও লেখা আছে কিনা সুমিত্রা খুঁজতে লাগল। খোঁজাই বোধ হয় ভারতীয় মনের বিশেষত্ব।

"The Upanishads are instinct with a spirit of enquiry, of mental adventure, of a passion for finding out the truth about things.···The emphasis is essentially on self-realization,' on knowledge of the individual self."

সুতরাং মনের মধ্যে এই অন্বেষণের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সহসা প্রদীপের কথা মনে পড়ে গেল। সহপাঠিনী নিবেদিতার বড়ভাই সে। বহুদিনের আলাপ আজও জমে ওঠে নাই। কারণ প্রদীপ কিঞ্চিৎ লজ্জাশীল ; পিতার আপিসে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে বাকী সময় ক্যামেরা নিয়ে কাটায়। সেই স্বল্প পরিচয়কে গভীরতা দিতে হলে উদ্যোগী হতে হবে সুমিত্রার নিজেকে। হাত নিস্‌পিস্ করে উঠল সুমিত্রার ; সম্মুখেই টেলিফোন। এখন প্রদীপ বাড়ীতেই আছে। টেলিফোনে এই নির্জ্জন সন্ধ্যার আলাপে নিশ্চয় অন্তরঙ্গতার সুর লাগবে। তার পর সুমিত্রা তাকে ডাকবে—'আসুন না, এখনও তো রাত হয় নি। কাছাকাছিই তো বাড়ী। আসুন না—'

তবে নিস্পৃহ পুরুষকে যার ইচ্ছা সাধুক, সুমিত্রা সাধবে না। সাধারণ প্রদীপ। প্রদীপের চেয়ে 'ডিস্কভারি অফ ইণ্ডিয়া'র আকর্ষণ বেশী।—

"But that very individualism led them to attach little importance to the social aspect of man, of man's duty to society. For each person life was divided and fixed up, a bundle of duties and responsibilities within his narrow sphere. This idea is perhaps a modern development."

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। সহসা শোবার ঘরের পরদা ঠেলে কতকগুলো প্যাকেট হাতে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল সুমিত্রার বান্ধবী সুধীরা।—"উঃ, আজ সারাদিন ঘুরছি ভাই। শাড়ীটা পেয়েছি কিনা। মনে হ'ল পথে তোর সঙ্গে দেখাটাও করে যাই। কি করছিস সুমি একা বসে বসে ? মার্কেট থেকে এই কেক-প্যাটি কিনলাম। চা আনতে বল্, ধ্বংস করা যাক।"

বই রেখে মৃদু হেসে সুমিত্রা চেয়ে রইল। সুধীরা তার থেকে বছর দুয়েক ছোট। তবু লেসের বাণ্ডিল আর ব্রোকেটের ফুলশোভিত এত উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরবার বয়স সুধীরারও নেই। আহ্লাদে খুকী ধরণে ঘাড় নেড়ে সুধীরা বলল—"বেশ আছিস সুমি। অতগুলো টাকা পাচ্ছিস। স্বাধীন ভাবে রয়েছিস। নিজের কর্ত্তা নিজে।"

চায়ের কথা ভৃত্যকে বলে এসে সুমিত্রা সুধীরার পাশে বিছানায় বসল। হাল্কা সাটিনের ঢাকনা—"দিন দিন সৌখিন হচ্ছিস, সুমি। হবে না কেন ? তোর জগৎ তো তুই নিজে।"

চা ঢেলে কাপ এগিয়ে দিয়ে সুমিত্রা নীরবে হাসল। ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুধীরা মন্তব্য পাস করল—"তোর সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারলে বেঁচে যেতাম সুমি।"

এবারে সুমিত্রার নীরব হাস্যে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ মিলল। সত্যই বেশ আছে সে, বেশ আছে। নিজের ইচ্ছা মত নিজের আদর্শে জীবন যাপন করবার ক্ষমতা সে অর্জ্জন করেছে। এই ক্ষমতা হস্তচ্যুত করবে কেন সুমিত্রা ? প্রদীপের রোজগার তার চেয়ে কম। তবে ধনী যৌথ পরিবারে সাচ্ছল্যের অবকাশ হবে। হয় তো নিবেদিতার ঘটকালি এবং সুমিত্রার নিজের উদ্যমে লজ্জাশীল প্রদীপ লজ্জা ত্যাগ করে বিবাহ-প্রস্তাব করতে পারে। নিবেদিতা বিবাহিতা। তবু অনেক ননদ, অনেক জা নিয়ে ঘর করতে হবে সুমিত্রার। আঙুলের কিউটেক্স-রং পান সাজার চুন-খয়েরে ম্লান হয়ে যাবে। কেতা-করা চুল রাখা চলবে না। প্রত্যহ শাশুড়ী পিসিশ্বশুরী মাখামাখি-মশলা দেওয়া লাল গন্ধ তেল এবং ফিতে কাঁটা হাতে ডাকবেন—"ও ছোটবৌমা চুল বাঁধতে এস।" প্রাত্যহিক বরাদ্দের নাপতিনী এসে দেড় ইঞ্চি লম্বা সযত্ন বর্দ্ধিত পায়ের নখ কচ কচ করে কেটে ফেলে ঘষ ঘষ করে টকটকে আলতা পায়ে চওড়া করে

লেপে দিয়ে যাবে। ছোটবউ সে হবে, সুতরাং মাথা থেকে ছুয়ে শাড়ীর আঁচল নামানো চলবে না। সারা দ্বিপ্রহর শীতল পাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর নভেল পড়ে পড়ে চমৎকার সাফল্য মণ্ডিত কর্ম্ম-জীবনের সমাধি হবে সুমিত্রার।

কিন্তু মনের মত বিবাহিত জীবন হতে পারত সুমিত্রার; প্রেমের সঙ্গে কর্ম্মজীবনকেও মেলান চলত, যদি প্রদ্যোত বসুর মত কোন ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হ'ত। যে জীবনে সে অভ্যস্ত, সেই জীবন যাপন করা যেত। সুমিত্রা ও প্রদ্যোত বসু এক পর্য্যায়ের। সুমিত্রা নিজের পর্য্যায়ে থাকতে চান, কিন্তু ভিন্ন পর্য্যায়ের ব্যক্তিকে কেন প্রদ্যোত বসু মনোনয়ন করলেন, যখন সহধর্ম্মী সুমিত্রা সম্মুখে উপস্থিত ছিল? এই বিস্ময়কর প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পায় নাই সুমিত্রা।

যাক, আমার জীবনই ভাল। কায়-বসান চটির দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সুখের নিশ্বাস ফেলে এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। সুধীরা এসে তাকে রক্ষা করেছে। এখনই সে প্রদীপকে টেলিফোন করেছিল আর কি? হয় তো, কে জানে এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাতেই তার জীবনে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলবন্ধন পড়ে যেত। সুধীরা ঠিক সময়ে এসেছে।

আনন্দিত মনে সুমিত্রা প্রশ্ন করল—"কি সুধীরা, লাল চিঠি আসছে কবে?"

হাত মুখ ঘুরিয়ে কেকে কামড় দিয়ে সুধীরা ভরা গলায় উত্তর দিল—"আর ভাই, ভাল লাগে না। এবারে সম্বন্ধ হচ্ছে জমিদার-তনয়ের সঙ্গে। খুব বনেদী সেকেলে বাড়ী। শ্রীমানের বয়স আটাশ। ভেবে দেখ সুমি, তোর বয়সী। তোর বয়সী লোক আমার স্বামী হবে, কি ভীষণ মজার কথা!"

সুমিত্রার মনের প্রান্ত চমকে উঠে সংযত হয়ে গেল আবার। তার বয়সী ব্যক্তি তার বান্ধবীর স্বামী হবার যোগ্যতা রাখে? তা হলে সুমিত্রার বয়স এতই বেশী হয়েছে?

কেকের গুঁড়ো কাপড় থেকে ঝাড়তে ঝাড়তে সুধীরা আধ-আধ খুকীর স্বরে বলল—"এখানে বিয়ে হলে ভাই, স্বাধীনতাটি যা সামান্যও নেই নেই করে আছে, তা-ও যাবে। অতি গোঁড়া পরিবার। ছাব্বিশ বয়েসই হোক, আর বি-এ পাসই করি চলতে হবে ছা'ব্বিশ বছর আগের কনে' বউয়ের চালে। বাবা ওদের অত টাকা দেখে সব ভুলে গেছেন।"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল—"লেখাপড়া জানা বয়স্থা মেয়ে ঘরে নিয়েও কি তারা তার কাছে পর্দ্দা আদায় করবেন?"

"ওই তো মজা সুমি। পুত্র চায় শিক্ষিতা। তাই বি-এ পাস, এম-এ পাসের খোঁজ পড়ে আজকাল। কিন্তু অন্দর তার অধিকার ছাড়তে রাজী নয়। সুতরাং আলোকপ্রাপ্তা বধূকে ঘরে এনে আবার তাকে অন্ধকারে পোরবার চেষ্টা করা হয়। এই তো মজা সুমি।"

এই ট্রাজেডিতে মজার কি উপাদান থাকতে পারে সুমিত্রা খুঁজে পেল না। তবে সুধীরার কথাটার সত্য উপলব্ধি করল সে। প্রদীপকে বিবাহ করলে সুমিত্রার ভাগ্যেও এই হবে। ভালই হয়েছে, টেলিফোন করা হয় নি। সুধীরাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শূন্য চায়ের ট্রে অপসারিত করলে সুমিত্রা বলল—"তা হলে এই বিয়েতে তুমি অমত জানাও না কেন?"

হাত-ব্যাগ খুলে সিল্কের রুমালে মুখ মুছে সুধীরা উত্তর দিল, "মত অমতের কি-ই বা আছে? বিয়ে যখন করতেই হবে, এক ভাবে হলেই হ'ল। বাবা-মায়ের জন্যে সব কিছু সহ্য করতেই হবে।"

কিন্তু উপদেশে ঢেঁকি গেলবার মত মুখভাব নয় সুধীরার। কথার স্বরে কিছু নির্লিপ্ত আত্মসমর্পণ বেজে উঠলেও তার বাহ্য আকৃতি অন্য কথা বলে। পুলক-প্রবাহ সুধীরার দেহের প্রতিটি রেখায়।

তবে? যদি সুধীরা যেন তেন প্রকারেণ বিবাহে সুখী হতে পারে, সুমিত্রাই বা পারবে না কেন? পর মুহূর্ত্তেই মনকে শাসন করল সুমিত্রা। অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করবার দীনতা আজ তার ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে। মীনা দত্ত, সুধীরা, এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ। গড্ডালিকা-প্রবাহের অন্তর্গত এরা। সুমিত্রার স্বাতন্ত্র্য আছে।

মন শক্ত করে সুমিত্রা সুধীরাকে একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশাত্মক বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত হ'ল। কথা আরম্ভ করবার পূর্ব্বেই টেলিফোন বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্ করে।

"হ্যালো!" গলার স্বর সুমিত্রার আগ্রহে ঈষৎ কম্পিত, "হ্যালো কে?" 'Hoping against hope' বলে একটি কথা ছিল শোনা, আজ অন্তর দিয়ে তার মানে বুঝলে সুমিত্রা। হয়ত লজ্জার বাঁধ ভেঙেছে। প্রদীপ কি?

পুরুষালী গম্ভীর গলার পরিবর্ত্তে মিহি ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, "আমি মাসীমা। সুমি, ধীরা কি ওখানে আছে?"

"ডেকে দিচ্ছি,"—সুমিত্রা সরে এসে জানাল, "সুধীরা, তোমাকে তোমার মা খুঁজছেন।"

"কি মুশকিল, এক মিনিট শান্তিতে থাকবার উপায় নেই"—গজগজ করতে করতে সুধীরা লবিতে বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। ছি, ছি, এত অধঃপতন হয়েছে তার? প্রদীপের টেলিফোন দিয়ে তার কি প্রয়োজন? একটা মেয়ের থেকে কম আর যায়, তাকে সুমিত্রা বর চায় না।

দরজায় ধাক্কা খেতে খেতে এলায়িত অঞ্চল সামলে সুধীরা ফিরে এল, "চললাম ভাই। বাড়ীর লোকেরা নাকি আধঘণ্টা ধরে আমাকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত বন্ধুদের বাড়া বাড়ী টেলিফোন করছে। রাত হয়েছে কি না একটু। অমনি ওঁদের ভয় হয়েছে আমি বোধ হয় পথেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি। আর বলিস না সুমি, তুই আমার অবস্থা বুঝবি নে। সুখের জীবন তোর। যা খুশী তাই করতে পারিস, বাধা দেবার কেউ নেই।" জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুধীরা চলে গেল।

এখন সুমিত্রা একা। সম্পূর্ণ হৃদয়, বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে একা। বাধা দেবার কেউ নেই, আবার ব্যাকুল হবারও কেউ নেই। সারারাত্রি যদি বাড়ী না ফেরে সে, কোন স্নেহার্দ্র হৃদয় চিন্তিত হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াবে না। বাসর করছে সুধীরা, সে বাসর ভালবাসার কাছে। হায়, সুধীরা তার সঙ্গে নিজেকে বদলাতে চায়!

আরাম-চেয়ারে বসে পড়ল সুমিত্রা, পায়ের কাছে খসে ধুলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে অনাবৃত 'ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া', পাতা উল্টে যাচ্ছে পাখার বাতাসে—"a passion for finding out the truth,…"…"a bundle of duties within his narrow sphere…"

বইয়ের দিকে মন নেই সুমিত্রার। চারি পাশে তার রচিত হয়েছে একটি নিঃসঙ্গতার দুর্গ, দিনান্তে দিনান্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে জগতের সমস্ত নিঃসঙ্গ নারীহৃদয়ের বিলাপ। সুমিত্রার উদ্‌ভ্রান্ত আহ্বান ছাদ ভেদ করে উঠছে না, ভাবতে পারছে না অন্য কোন হৃদয়কে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুমিত্রা। ঠিক! এই নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাকে এড়াবার জন্য নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দেয়। তার সমস্ত বন্ধুরা তাই বিবাহ করছে, তাই সুধীরা বিবাহে উৎসুক। সুমিত্রা কেবল নিঃসঙ্গতাকে বরণ করে নিতে যাচ্ছে। সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতা ভীতিজনক। ঠিক! তাই তো নিঃসঙ্গ প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার এই নিঃসঙ্গতাকে ভয় করে সিনিয়র ক্লার্ক মীনা দত্তের কাছে আশ্রয় খুঁজেছে। মীনা দত্ত সুমিত্রার মত নিঃসঙ্গ নয়, তার গৃহ পরিজনপরিপূর্ণ, শিশুকণ্ঠের উল্লাসধ্বনিতে মুখর। মীনা দত্ত গৃহ রচনা করতে জানে।

আর সুমিত্রা? কাকা-কাকীর ইচ্ছা ছিল সুমিত্রার কাছে থাকেন। তা হলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পথ সুগম হবে, ভাইঝিরও রক্ষণাবেক্ষণ চলবে। কিন্তু সুমিত্রার বাইরের নিঃসঙ্গতা যে তার অন্তরের প্রতিফলন। সে রাজী হয় নি।

হলে হয়ত ভাল হ'ত। নারীর চরম একাকিত্ব পুরুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, পুরুষ চায় নীড়। আজ সুমিত্রার জীবনের ছাঁচ পৃথক হয়ে গেছে, নীড় বাঁধবার কৌশল অধিগত সুমিত্রা আর জানে না। তাই প্রদ্যোত বসু সুমিত্রার জন্য নয়।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে ভাবতে লাগল সুমিত্রা। আত্মজিজ্ঞাসা বেদ ও উপনিষদের দেশের জন্মগত অধিকার। 'আত্মানং বিদ্ধি' সুমিত্রার মত আধুনিকারও নিজেকে জানা প্রয়োজন। সুমিত্রা, তুমি কি চাও?

চাই পরম নিঃসঙ্গতাকে এড়িয়ে যেতে। আমার গৃহ রচিত হয়েছে আমার নিজেকে কেন্দ্র করে, আমার প্রাত্যহিক সুখের উপকরণ সযত্নে আহৃত করে। অন্য কোন ব্যক্তির জন্য চিন্তা-দুশ্চিন্তার মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যাকুলতার স্বাদ আমার জগৎ জানে না। চাই এই আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতাকে এড়িয়ে যেতে। নিজের তুচ্ছ কর্ম্মপদ্ধতি দিয়ে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিজেকে বেঁধে রাখতে চাই না।

প্রদ্যোত বসুকে আমার প্রয়োজন নাই। আমার অবচেতন মন চায় প্রদীপকে, তার সুখপূর্ণ গৃহের বেষ্টনীতে। আমি গৃহ বাঁধতে পারি নি, যে পেরেছে তারি গৃহে আমি আশ্রয় চাই।

প্রদ্যোত বসু আমার স্বপ্ন নয়। দশটায় সে যার কর্ম্মস্থলে চলে যাব, ছয়টায় কর্ম্মক্লান্ত দেহে ফিরে এসে দেখব অপর জন অনুপস্থিত। অথবা, সাজান ফ্ল্যাটের সাহেবী আবহাওয়ায় আবার একাকিত্ব অনুভব করব বাড়ীতে বসে বসে স্বামীর বহির্গমনে। আমি চাই অসংখ্য পরিজনকে অসংখ্য স্নেহের বন্ধনে বাঁধতে; তার জন্য প্রাত্যহিক ত্যাগস্বীকার ও অসুবিধা-অনটনের মধ্যে আমার অতৃপ্ত অন্তরের অপরিসীম ভালবাসার প্রবৃত্তিকে ধন্য করতে। নিজেকে আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার পূর্ব্বে সহস্র নারী যা করেছে, আমার পরে সহস্র নারী যা করবে, আমিও তাই করতে চাই। একটি সাধারণ ছকের অঙ্গীভূত হয়ে জীবনের জটিলতাকে অতিক্রম করতে চাই।

লবিতে চলে এল সুমিত্রা। টেলিফোনে আর সুমিত্রার কণ্ঠ কম্পিত নয়—"হ্যালো, কে?…প্রদীপবাবু বাড়ী আছেন? …একটু ওঁকে ডেকে দিন না…"

অমরতা

(আইরিশ কবিতা হইতে)

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ধোঁয়ায় আমরা মিশিব কিংবা বাঁচিব প্রাণের আগুন জেলে,
ধোঁয়াটে আকাশই মোদের আগুন, আগুনে আত্মা পুড়াবে সব;
মোদের চিন্তা-স্বপ্ন হইতে স্বপ্নেই যাবে, কিংবা আশা—
রাংতার মত জলিয়া উঠিবে, কাগুনেরি মত রঙিন রব।

মোদের প্রভাত ধূসর তারায় ক্ষুদ্র আলোর কণিকা নয়,—
এখানে সত্য—সত্য শুধু সে চলিয়া যাওয়ার ছন্দখানি;
আমরা বেঁচেছি প্রেমের আলোয়, হৃদয়ের শত দুয়ার মেলে,
স্বপ্ন পথের লক্ষ পথিক মৃত্যু-জয়ের উঠাব বাণী!

আধুনিক তুরস্ক ও তাহার পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে এশিয়া মাইনর। ইহার কতকটা পশ্চিমে দার্দেনেলিস ও বসফরাস প্রণালী। ওপারে ইউরোপের পূর্ব্ব সীমা। এই দুই মহাদেশের সংযোগস্থলে একটি রাজ্য বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে



তুরস্কের রেঁস্তোরায় পিয়ানোবাদন-রত তুর্কী মহিলা

তুর্ক জাতি রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র কনষ্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। ঐতিহাসিকগণ এই অব্দটিকে ইউরোপের নবজাগরণের সূচনাকাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কারণ ঐ স্থান তুর্কিজাতির অধিকারভুক্ত হইলে পণ্ডিতেরা সেখানে ক্ষণমাত্র অবস্থান না করিয়া ইউরোপ মহাদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়েন। তদবধি তুরস্ক প্রবলপ্রতাপে পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা এবং পূর্ব্বপ্রান্তিক ইউরোপে আপন শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে ক্রমশঃ শক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতেছিল তখন তুরস্ক গতানুগতিকতার অনুবর্ত্তী হইয়া ইহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। ইহার অধিকার ক্রমে সংকুচিত হইল, শক্তি-সামর্থ্যও ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। ইউরোপের অত্যগ্রসর দেশগুলি তখন ইহার নাম দিল "Sick man of Europe" অর্থাৎ ইউরোপের রুগ্ন মনুষ্য। কিন্তু তুরস্ককে ইউরোপের রুগ্ন মানুষ হইয়া আর অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাসমর অন্তে ইহা আবার একটি প্রগতিশীল শক্তিমান্ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

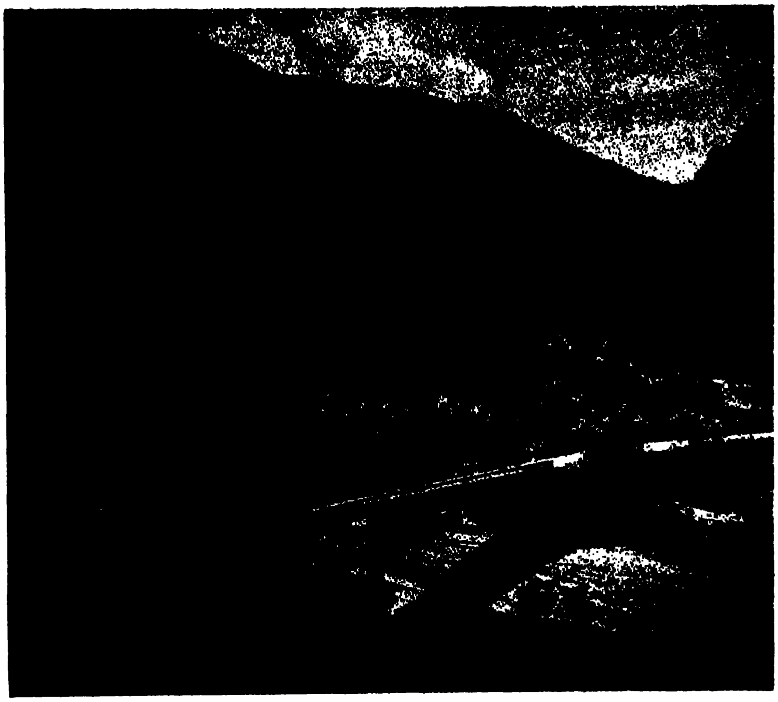
প্রথম মহাসমরে তুরস্ক জার্ম্মানীর পক্ষে যোগ দেওয়ায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রমুখ বিজয়ী মিত্রশক্তিপুঞ্জ ইহাকে ইউরোপের মানচিত্র হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় ছিল। সুলতান এবং তাঁহার মন্ত্রীসভা এই অপচেষ্টা প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইলেন। জাতির এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) নামে একজন সাধারণ সৈনিক দলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি ১৯২০ সনের এপ্রিল মাসে আঙ্গোরা (বর্ত্তমান নাম আঙ্কারা) শহরকে রাজধানী করিয়া সমগ্র এশিয়া মাইনরের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সরকারের নাম হইল 'গবর্ণমেন্ট অফ দি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্ব্লি অফ টার্কি' অর্থাৎ এক কথায় তুরস্কের জাতীয় সরকার। ইহার আড়াই বৎসর পরে ১৯২২ সনের একটি প্রস্তাবদ্বারা সুলতান পদের উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্বে তুরস্কের সুলতানই আবার মুসলমান-জগতের খলিফা বলিয়া অভিহিত হইতেন। জাতীয় সরকার খলিফা পদটি তখনই রহিত না করিয়া সুলতান-বংশের অন্ত একজনকে খলিফা পদে বসাইলেন। জাতীয় সরকারের প্রতাপ সুলতান অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯২২ সনের ১৭ই নবেম্বর তিনি দেশত্যাগী হইলেন। জাতীয় সরকারও তৎক্ষণাৎ সমগ্র তুরস্কের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ১৯২৪ সনের ২রা মার্চ্চ খলিফা পদ উচ্ছেদ করায় সুলতান-বংশের শেষ কর্তৃত্বটুকু পর্য্যন্ত অবলুপ্ত হইল। ইহার পর এই পরিবারের সমুদয় লোককে তুরস্কের নাগরিক অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হয়।



আঙ্কারার একটি কমার্শিয়্যাল কলেজ। এখানে ছাত্রছাত্রীদের সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে

কামাল তুরস্কের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ইহার পুনর্গঠনে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ইহার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন স্বদেশকে বিশ্বসভায় স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করানো। স্বদেশে শক্তি সংহত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতেও যাহাতে ইহার অনুকূলে

নানা সুযোগসুবিধা আদায় করা যায় তদ্বিষয়ে তিনি সমান অবহিত হইলেন। এ কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন বিশ্বস্ত সহকর্মী ইশ্‌মেত পাশা (পরে, ইশ্‌মেত ইনোহু)। ১৯২৩ সন নাগাদ তিনি অন্যান্য শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তুরস্কের জাতীয় সরকার ও তাহার দাবি যথাসম্ভব মান্য করাইয়া লইতে সমর্থ হন। স্বদেশে শাসন-যন্ত্র সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া এবং বিদেশে নূতন জাতীয় রাষ্ট্র স্বীকৃত করাইয়া ইশ্‌মেত পাশা প্রমুখ যোগ্য সহকর্মীদের সঙ্গে এক-যোগে কামাল পাশা তুরস্কের উন্নয়ন-কার্য্যে তৎপর হইলেন। আরবীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির চাপ এড়াইয়া নিজেদের সবল সুস্থ করিবার জন্য কামাল প্রথমেই আরবি হরফের পরিবর্ত্তে রোমান অক্ষরের প্রবর্ত্তন করিলেন। তুরস্কে পুস্তক-পুস্তিকা, সরকারী দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি সকলই রোমান



আধুনিকতম আদানভাক-বার্টিন রাজপথ

অক্ষরে লিখিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন ফেজ ও মুসলমানী পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে আইন দ্বারা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারেরও ব্যবস্থা হইল। শিক্ষাবিভাগের পূর্ণ সংস্কার সাধিত হইল। মৌলবী মৌলানাদের হাতে শিক্ষার ভার না রাখিয়া সরকার নিজেই শিক্ষার উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নারীর অবরোধপ্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হইল, নারীসমাজ মুক্ত আকাশে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলিবার অধিকার লাভ করিলেন। সরকারী উচ্চ উচ্চ পদেও শিক্ষিতা মহিলাগণ নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

কামালের নেতৃত্বেই বরাবর সকল কার্য্য পরিচালিত হইতে থাকে। তুরস্কের জাতীয় সরকার ১৯২৩ সনের ২৯শে অক্টোবর তুরস্ককে একটি রিপাবলিক বা সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। তখন কামাল পাশা ইহার প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি পদে বৃত হন। চারি বৎসর পরে ১৯২৭ সালে ১লা নবেম্বর তিনি পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (৯ই নবেম্বর ১৯৩৮) কামাল এই পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ১৯৩৪ সনের ডিসেম্বর মাসে তুরস্কে সরকারীভাবে আর একটি পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। কামাল পাশা পারিবারিক নাম 'আতাতুর্ক' গ্রহণ করিয়া ইহার পর হইতে কামাল আতাতুর্ক বলিয়া পরিচিত হইলেন। এই নিয়ম অনুসারে ইশ্‌মেত পাশা ইশ্‌মেত ইনোহু নাম গ্রহণ করেন। তুরস্কের আপামর সকলেই পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য। 'পাশা', 'বে', 'এফেন্ডি', 'হজরেতলেরি' (যাহার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Excellency') প্রভৃতি পদবীও বর্জ্জিত হইল।

দেশের শক্তি নির্ভর করে ইহার ধনসম্পদ বৃদ্ধির উপর। কামাল আতাতুর্ক কৃষি শিল্প বাণিজ্য তিন দিক হইতেই তুরস্ককে একটি আধুনিক উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। তিনি ১৯৩৩ সনে একটি পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। এ কথা পরে বলা হইবে। এ বিষয়ে সোভিয়েট রুশিয়াই বর্ত্তমান যুগে সকলের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। কামাল দেখিলেন, স্বদেশের কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে প্রচুর মূলধনের আবশ্যক। কিন্তু এই মূলধন সংগৃহীত হইবে কি প্রকারে? বিদেশী অর্থ গ্রহণ করার ফলে পূর্ব্বে বহু রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়াছে, এখনও মাঝে কোন কোন স্বাধীন দেশ প্রকৃত পক্ষে বিদেশীর অর্থদাস হইয়া পড়িয়াছে। কামাল চতুর রাজনীতিক; তিনি অর্থের জন্য স্বদেশের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে কখনও রাজী হন নাই। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া অর্থ আমদানী করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশের ধনসম্পদ শ্রীসৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মানও বাড়িয়া গিয়াছে।

তুরস্কের গঠনতন্ত্র ১৯২৪ সনে বিধিবদ্ধ হয়। ইহার মূল রহিয়াছে গণতন্ত্র নীতির মধ্যে। তবে আপাতদৃষ্টিতে ইহার বিপরীতই ধারণা হইবে। কারণ সত্য কথা বলিতে কি, ১৯২৩ সন হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত কামাল আতাতুর্কই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তুরস্কে এই দীর্ঘকালের মধ্যে 'রিপাবলিকান পিপলস পার্টি' নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছিল। ১৯৩০ সনে কামাল মাত্র অল্প কিছুদিনের জন্য একটি বিরোধী দল গঠনের অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ইহা স্থায়ী হয় নাই।



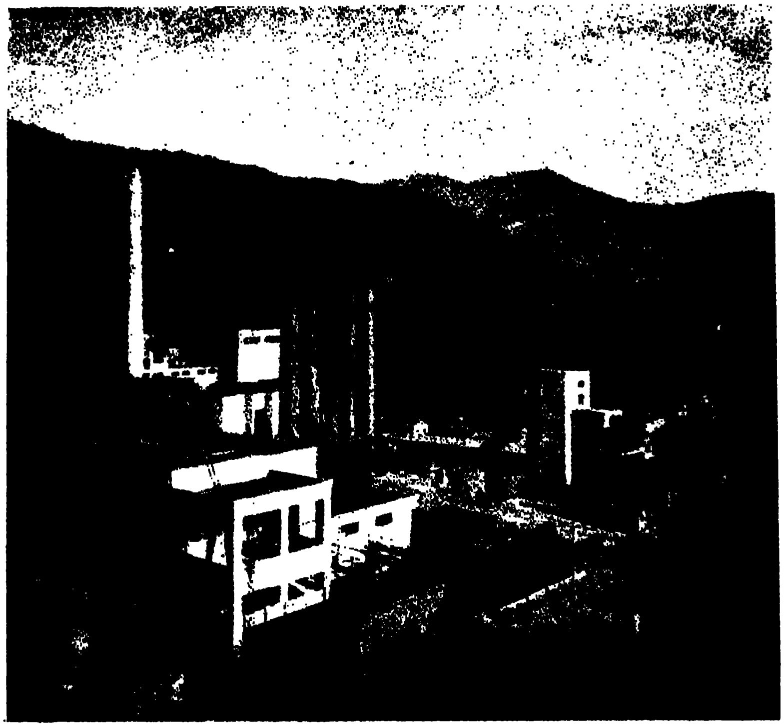
কার্স এবং আর্টভিনের মধ্যবর্ত্তী পুরনো আমলের রাজপথ ও ঘরবাড়ী

১৯৩৪ সনের ৬ই ডিসেম্বর গঠনতন্ত্রের দশম ও একাদশ ধারার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইহার ফলে তুরস্কে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তেইশ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক নর-নারী সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে সক্ষম। সদস্যদের পক্ষে নিম্নতম বয়স ধরা হইয়াছে একত্রিশ। এখানে আরও স্থির হয় যে, নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতেই প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইবেন। নেশন্যাল এসেম্ব্লির পরবর্ত্তী নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থাকিবেন।

তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় শাসন-কেন্দ্র অবস্থিত। নেশন্যাল এসেম্ব্লি বা তুর্কী ভাষায় 'কামুতায়'-এর হস্তে রাষ্ট্রের ভার ন্যস্ত। প্রতি চারি বৎসর অন্তর এক বার করিয়া সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। জনগণ 'সেকেণ্ডারী ইলেক্টর' বা মাধ্যমিক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী নির্ব্বাচন করেন। এই নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারাই এসেম্ব্লির সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন। 'পিপলস পার্টি'র মনোনীত সদস্য ব্যতীত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন কোন সদস্যও নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই ভাবে নির্ব্বাচিত এসেম্ব্লির সদস্যগণ জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে সফরে বাহির হন এবং তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে তাহা অবগত করান। এই রূপে সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হইয়া থাকে।

'রিপাবলিকান পিপলস পার্টির' কর্ম্মধারা সম্বন্ধেও এখানে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তুরস্কে এই একটিমাত্র রাজনৈতিক দল রহিয়াছে। কামালতুর ১৯৩৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি সরকারী ভাবে ইহার কর্ম্মধারাকে শাসন-নীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। পিপলস পার্টির কর্ম্মধারার পাঁচটি অঙ্গ—(১) জাতীয়তা, (২) গণতন্ত্র, (৩) ক্রমিক উন্নতি, (৪) ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং (৫) যানবাহন, শিল্প, খনি ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরে সরকারী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, তুরস্ক-সরকার বর্ত্তমানে এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

তুরস্ক একটি মাত্র দল কর্ত্তৃক শাসিত হইলেও ইহা জনসাধারণের সদিচ্ছার উপরই প্রতিষ্ঠিত বলা চলে। কামাল এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মূলগত অভিপ্রায় ছিল দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল জনগণের মতামত এসেম্ব্লির মাধ্যমে পরিব্যক্ত করা। ইহা অনেকাংশে সার্থক হইয়াছে। কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী ইশমেত ইনোনু প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন। তিনি পূর্ব্বে বার বৎসর যাবৎ (১৯২৪-৩৬) কামাল আতাতুর্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনোনু বর্ত্তমানেও সভাপতি রহিয়াছেন। আধুনিক তুরস্কে হক এভলেরি (Halk Evleri) এবং হক ওডালারি (Halk Odalari) নামে দুইটি সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠান দুইটি পিপলস পার্টির নির্দ্দেশে পরিচালিত। উভয়েরই শাখা সমগ্র তুরস্ক জুড়িয়া আছে। ইহাদের কাজ হইল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং শিল্পাদি কর্ম্মে প্রেরণা যোগান।



চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জঙ্গালডাক কয়লার খনি অঞ্চলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে

আধুনিক তুরস্ক বা তুর্কি রিপাবলিক বলিতে প্রধানতঃ এশিয়া মাইনর বা আনাটোলিয়াকেই বুঝায়। তবে ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে পূর্ব্ব-থ্রেসের একটি ক্ষুদ্র অংশও ইহার সঙ্গে সংযোজিত রহিয়াছে। পরে, ইহার পরিধি আরও কিছু বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনের ২৩শে জুন আলেকজাণ্ড্রেটার সঞ্জাক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। লজান সন্ধি ও অন্যান্য চুক্তি অনুসারে দার্দ্দেনেলিস ও বসফরাস প্রণালী অঞ্চল নামেমাত্র তুরস্কের অধীন ছিল, এবং তখন ইহাকে নিরস্ত্র করিয়াই রাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সনের ২০শে জুলাইর নূতন চুক্তিবলে এই অঞ্চল তুরস্কের পূর্ণ অধিকারে আসে, ইহাকে সংরক্ষিত করার যথেচ্ছ অধিকারও সে লাভ করে। তুরস্কের আকার গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় তিন গুণ, কিন্তু লোকসংখ্যা ১৯৩৫ সনের সেন্সাস অনুযায়ী মাত্র এক কোটি বাট লক্ষ। ১৯২৭ সনের সেন্সাসের উপরে শতকরা আঠার জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৫ সনের পরে গত বার বৎসরে লোকসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুরস্কে জন্মহার অত্যধিক।

এশিয়া মাইনর বা আনাটোলিয়ার অভ্যন্তরভাগ পাহাড়-পর্ব্বত সমাকীর্ণ। অথচ সেখানে কৃষিদ্রব্যও বিস্তর উৎপন্ন করা হইতেছে। এখানকার কৃষকগণ একারণ বিশেষ কর্ম্মঠ ও অভিজ্ঞ। দীর্ঘকাল ধরিয়া বনজঙ্গল কাটা হইলেও পাহাড়-পর্ব্বতে পূর্ণ থাকায় ইহা কখনও নিঃশেষিত হয় নাই। ১৯৩৭ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারি একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সমস্ত বনজঙ্গল সরকার খাস করিয়া লন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এবং সিরিয়া ও ইরাকের দিকে ভূমি ক্রমশঃ সমতল হইয়া গিয়াছে। কোথাও পাহাড়-পর্ব্বত, কোথাও বন-জঙ্গল, কোথাও সমতল ভূমি—এ হেতু দেশের জলবায়ু স্থানে স্থানে বিভিন্ন রকমের। মধ্য-অধিত্যকা ভূমিতে প্রধানতঃ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, পশ্বাদিও এখানে প্রচুর। তামাক (তুরস্কের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য), ডুমুর, কিসমিস, অন্য রকমারি ফল এবং অহিফেন উত্তর ও পশ্চিম উপকূলে জন্মে। সাইলেসিয়ায় তুলা প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সরকারও ইহার চাষে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। এই অঞ্চলে পূর্ত্তকার্য্যের জন্য সরকার মনোযোগী হইয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলেও চাষবাস হইয়া থাকে, তবে এখানে তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহার দ্রুত উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক। তুরস্ক সরকার ১৯৪৫, ৭ই জুন ভূমিসংক্রান্ত একটি আইন পাস করাইয়া লইয়াছেন। এই আইন বলে ভূমিহীন বা স্বল্প-আয়ী চাষীর মধ্যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এ তো গেল চাষবাসের কথা। তুরস্কের খনিজ দ্রব্য-সমূহের মধ্যে কয়লা, ক্রোমিয়ম, তাম্র, লৌহ, লিগনাইট, সীসা ও দস্তা প্রধান। রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এ সমস্ত আহরণের বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। জঙ্গালডাক কয়লার খনি হইতে ১৯২৩ সনে যে কয়লা পাওয়া গিয়াছে, ১৯৩৮ সনে তাহার অন্ততঃ চারি গুণ অধিক উত্তোলিত হইয়াছে। ১৯২৩ সনে তুরস্ক হইতে ক্রোমিয়াম রপ্তানি হইয়াছে মাত্র চৌত্রিশ শত টন, ১৯৩৭ সনে এই রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার টন। সুতরাং ইহা হইতে স্বতঃই বুঝা যাইতেছে, রিপাবলিক স্থাপিত হইবার পর তুরস্কের বৈদেশিক বাণিজ্য অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ গ্রেটব্রিটেন, ইটালী, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং এমন কি এই যুদ্ধের মধ্যেও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে।



আঙ্কারার নিকটবর্তী কিউবাক বাঁধ

তুরস্ক কৃষিপ্রধান দেশ, ইহার চারি-পঞ্চমাংশ অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভরশীল; তথাপি বৈদেশিক বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা দেখিয়াই আতাতুর্ক দেশের শিল্প-সম্পদ বৃদ্ধির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেন। ১৯৩৩ সনে তুরস্ক-সরকার একটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাধারা দেশের এই শিল্প-সম্পদ আহরণ ও বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির দিক হইতে স্বদেশকে স্বয়ম্পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প করেন। ১৯৩৮ সনেও ঐ একই উদ্দেশ্যে একটি চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়। দ্বিতীয় বারের এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী জঙ্গালডাক কয়লার খনি অঞ্চলের উন্নতি-সাধন এবং ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ঐ স্থান হইতে প্রায় এক শত মাইল ভিতরের দিকে কারাবাকে একটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন। জঙ্গালডাক ও কারাবাক রেল দ্বারা যুক্ত হইয়াছে। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বৃহৎ শিল্পনির্ম্মাণে এই কারখানা তুরস্কে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তুরস্ক-সরকার ১৯৩৭ সনে খনিজ দ্রব্য আহরণ ও উন্নতি সম্পর্কে একটি ত্রি-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে 'এটি ব্যাঙ্ক' নামে একটি সরকারী ব্যাঙ্কের উপর দায়িত্বভার দেওয়া হয়।

ইতিপূর্ব্বে তুরস্কে স্থানান্তরে যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা ছিল। রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে গবর্ণমেন্ট এদিকে সবিশেষ তৎপর হন। ১৯২৩ সনের পূর্ব্বে তুরস্কে বড় রেললাইনের মধ্যে বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের অংশবিশেষ মাত্র ছিল। এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তর ভাগেও ইহার কিছু কিছু শাখা ছিল বটে, কিন্তু ১৯২৩ সনের পরেই তুরস্কে রেলপথ যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ মোসাল পর্য্যন্ত পৌঁছায় ১৯৪০ সনের মার্চ্চ মাসে। তিন মাস পরে জুন মাসে (১৯৪০) ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়। এই মাসেই সর্ব্বপ্রথম বাগদাদ হইতে ইস্তাম্বুল পর্য্যন্ত রেলগাড়ী যাতায়াত সুরু হয়। রেলপথ বিস্তারের ফলে পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বর্ত্তমানে গমনাগমন সহজতর। তুরস্কে রেলপথ বিস্তৃতিলাভ করিলেও সাধারণগম্য রাস্তা কিন্তু তেমন প্রসারিত হয় নাই। কৃষ্ণসাগর তীর হইতে ইরাণের সীমা পর্য্যন্ত একটি মোটর চলাচলের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে এই রাস্তাটির গুরুত্ব সমধিক। তুরস্কের অভ্যন্তর ভাগ রাস্তাঘাট-বহুল করিবার উদ্দেশ্যে একটি দশ বৎসরের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

কিছুকাল যাবৎ আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক বিবেচিত হইলেও, সমর-শক্তি বাড়াইতেও তুরস্ক বিরত হয় নাই। এখানে ১৯৪২, ২২শে জানুয়ারীর আইন বলে প্রত্যেককে তিন বৎসর স্থল ও নৌ-বাহিনীতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে বাধ্য করান চলে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় অন্যূন বিশ লক্ষ লোক যুদ্ধ-কার্য্যের জন্য জড় করা চলিত। ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার, গানবোট, মাইন সুইপার প্রভৃতি লইয়া নৌ-বহর গঠিত। এখানকার বিমান-বাহিনীও ক্রমশঃ বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তুর্কি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র পঁচিশ বৎসর। একটি জাতির জীবনে এই সময়টুকু অতি অল্প। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তুরস্ক সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনানুযায়ী একটি সমৃদ্ধিশালী গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বদেশের সমৃদ্ধি বিদেশীকেও নানা ভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু সুচতুর তুরস্ক-সরকার সকল অবস্থাতেই স্বকীয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সফলকাম হইয়াছেন। প্রথম মহাসমরে তুরস্ককে কিরূপ নাজেহাল হইতে হইয়াছিল আরম্ভেই বলিয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে তাহার কূটনীতি সকলকেই চমৎকৃত

করিয়া দিয়াছে। জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়া এবং ব্রিটেন তথা মিত্রশক্তিপুঞ্জ ও সোভিয়েট রুশিয়ার মিতালী—এবারে কত কি হইয়া গেল। কিন্তু তুরস্ক ব্রিটেন, জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে সম্প্রীতি প্রায় অটুট রাখিয়াই চলিয়াছিল। যায় শেষের দিকে জার্ম্মানী ও জাপানের সঙ্গে মিত্রতা পরিহার পূর্ব্বক উভয়ের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু ইহাতে তাহার বরং লাভই হইয়াছে। মিত্রশক্তিপুঞ্জের নিকট তুরস্কের মান-মর্য্যাদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারত আজ স্বাধিকার লাভ করিয়াছে। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক সকল দিকই তাহার পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। আজ তুর্কী রিপাবলিকের প্রথম যুগের মত ভারতবর্ষের পুনর্গঠন-কার্য্যে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণ উভয়কেই যথেষ্ট মনোযোগী হইতে হইবে।

শৈবাচার্য্য আপ্পার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

ভারতে যুগে যুগে এক একজন ধর্ম্মাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু-সংস্কৃতিধারা সংরক্ষণ করিয়াছেন। হিন্দুর জাতীয় জাগরণের মূলে রহিয়াছে ধর্ম্মজাগরণ। বৈদিক এবং পৌরাণিক কাল হইতে ভারতে যুগপ্রয়োজনে এক একজন অবতার পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ ও দুর্বৃত্তের বিনাশসাধন করিতে এবং ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতে যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই যে ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শাশ্বত বাণী ইহা সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশ এবং সর্ব্বলোকের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আদর্শের পরিবর্ত্তনে জগতের ভাবধারাতেও নানা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। কিন্তু অতীতের সাধনার ভাবধারাকে অবতার-পুরুষগণ নিজ নিজ জীবনালোকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন এবং অভিনব কৌশলে বর্ত্তমানের উপযোগী রূপ প্রদান করেন। অনাগত এবং অতীত যুগের সেতুবন্ধ নির্ম্মাণ করিয়া ইঁহারা জগতের কল্যাণময় পথ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্যে শৈব এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম দ্রাবিড়ী সংস্কৃতি নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের আধ্যাত্মিক ভূমি আজও এই দুইটি ধর্ম্ম-দর্শন দ্বারা সঞ্জীবিত রহিয়াছে। মাণিক্য-বাচগর, সম্বন্ধর, বাগীশ, আপ্পার সুন্দরার প্রমুখ শৈব সন্ন্যাসীদের প্রভাব মহাবল্লীপুরম্ ও কাঞ্চীর অপরূপ স্থাপত্যশিল্পকলাপূর্ণ মঠ-মন্দিরে রূপায়িত হইয়া আজও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সাধারণতঃ পল্লব রাজত্বের কাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক হইতে ৯০৭ অব্দ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আদি শৈব কবি সম্বন্ধর এবং আপ্পার খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগে বিরাজ করেন। অধ্যাপক সুন্দরম্ পিল্লাই বলেন—"The opening of the seventh century is the latest period that can be assigned to Sambhandar." সুন্দরার সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতকে বাস করেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের প্রথম ভাগে মাণিক্কবাসগর আবির্ভূত হন। তাঁহার লিখিত কুবাই ধর্ম্মগ্রন্থে পাণ্ড্যরাজ বরগুণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলের রাজবংশাবলী পুস্তকে তৎকর্ত্তৃক সিংহলীদের শৈব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের শেষভাগে সিংহলে এই ধর্ম্ম-প্রচারের অভিযান সংঘটিত হয়। পাণ্ড্যরাজ তিরুমল নায়েক মাদুরার মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই বিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে উক্ত শৈবাচার্য্যগণের ঐকান্তিক সাধনা। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া শৈব দর্শন সমস্ত ভারতে বিস্তার লাভ করে।

শৈব সন্ন্যাসী আপ্পার কুড্ডালোর জেলার থিরু আমুর গ্রামে বেল্লাল-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পুগলানার এবং মাতার নাম মাথিনিয়ার। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর নাম থিলথ বথিয়ার। শৈশবে আপ্পার মারুলনীকিয়ার নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথিতযশা শৈব সন্ন্যাসী সম্বন্ধর তাঁহাকে আপ্পার বলিয়া অভিহিত করেন। সাধারণ্যে এই নামেই তিনি পরিচিত। পল্লবরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ কালিপ্পহাইয়ারের সহিত থিলথ বথিয়ারের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিণয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই কালিপ্পহাইয়ার কোন একটি যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাকালে প্রাণত্যাগ করেন। এই সময় তাঁহাদের মাতাপিতাও পরলোকগমন করেন। থিলথ বথিয়ার পতির সহিত সহমরণে প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি এ সঙ্কল্প হইতে বিরত হন।

ভগ্নীর তত্ত্বাবধানে আপ্পার ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। শৈশব হইতেই ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় পল্লবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় জৈনধর্ম্ম দক্ষিণ-ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। আপ্পার জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শীঘ্রই জৈনধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি জৈন এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র পাটলীপুত্রে গমন করেন। তথাকার জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা তদীয় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আচার্য্য-পদে বরণ করেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদেশ গমন এবং পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার

সংবাদে বেল্লাল-কুমারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। যে ভ্রাতার অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি সহমরণে বিরত হইতে বাধ্য হন আজ সেই ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়ের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। সংসারে তাঁহার আর কিছুমাত্র আকর্ষণ রহিল না, তিনি সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিয়া কেটিলম্ নদীর তীরবর্ত্তী শৈব মন্দির তিরু আদিকাইতে গমন করেন। তিনি মন্দিরে দেবতার সেবাপূজায় আত্মনিয়োগ করেন। পূজা-অর্চ্চনায় ব্যাপৃত থাকিলে কি হইবে, তিনি সর্ব্বদা স্বধর্ম্মত্যাগী ভ্রাতার সুমতির জন্য ভগবানের চরণে প্রাণের আকুতি জানাইতেন। তাঁহার আকুল প্রার্থনায় দেবাদিদেবের আসন নড়িল। এক আকস্মিক ঘটনায় আপ্পার চৈতন্যের উদ্রেক হইল। হঠাৎ তিনি পিত্তশূলে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার মনে হইল মৃত্যু অনিবার্য্য। জৈন চিকিৎসকগণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। যে স্নেহময়ী ভগ্নীকে তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁহারই কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভগ্নীকে তথায় আনয়ন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তিলক্‌বতিয়ার তাঁহাকে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিলেন— 'আমি কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বীর মুখদর্শন বা জৈন-অধ্যুষিত প্রদেশে পদার্পণ করি না।' আপ্পার ভগ্নীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে জৈন সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, পানপাত্র ও ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন। একে রোগজীর্ণদেহ তার উপর দীর্ঘপথ! আপ্পার কোন প্রকারে শ্রান্ত শরীরে ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি জ্যেষ্ঠার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'প্রিয় ভগ্নী আমার, আর আমি রোগযন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে এবং আমাদের নিজস্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করে আজ আমি বিধর্ম্মী হয়েছি। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করে আমায় বাঁচাও।' ভ্রাতার শোচনীয় পরিণতিতে তিলক্‌বতিয়ার অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মন্দির হইতে পবিত্র রজঃকণা লইয়া ভ্রাতার ললাটে মাখাইয়া দিলেন। ভগ্নীর আদেশে মন্দিরে গিয়া দেবাদিদেবের মূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তিভরে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনাশেষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বেদনা যেন সম্পূর্ণ রূপে দূর হইয়া গেল। এই উপলক্ষে তিনি যে সমস্ত স্তোত্রগাথা রচনা করেন তাহা তামিল সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব অবদান।

পল্লবরাজ ক্রমে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আপ্পারার জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগে তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাকে তৎসমীপে আনয়ন করিতে সসৈন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন। রাজাকে সমক্ষে আনয়ন করার উদ্দেশ্যে আপ্পার মন্ত্রীর সহিত গমন করিলেন। সেখানে তিনি অশেষ লাঞ্ছিত হইলেন। ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় তাঁহাকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। রাজাদেশে তাঁহাকে জ্বলন্ত চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। আর একবার উত্তাল সমুদ্রে তাঁহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহাকে এই লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করেন। পরিশেষে পল্লবরাজ স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আপ্পারার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি সমস্ত জৈন মঠ-মন্দির ধ্বংস করিয়া ঐ সমস্ত উপকরণ দ্বারা এক অপরূপ শৈব মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

প্রাগুক্ত ঘটনার পর আপ্পার ভগ্নীর সহিত কিছুদিন বাস করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। তিনি একে একে চিদাম্বরম্, শিয়ালী, তিরু অরোর, পান্দুকালোর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈব তীর্থ দর্শন করেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি পান্দু-কালোরে অতিবাহিত করেন। এইখানে সম্বন্ধর ও সমসাময়িক অন্যান্য শৈবাচার্যগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্বন্ধর এবং আপ্পার পুনরায় শৈব তীর্থ দর্শনে বহির্গত হন। ক্রমে উভয়ে বেদারণ্যমে উপনীত হন। ইহা তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। ইহা সর্ব্বদা অর্গলবদ্ধ থাকিত। কথিত আছে, পূর্ব্বে বেদগণ এখানে আসিয়া শিবের পূজা দিতেন। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তাঁহারা আর পূজা করিতে আসেন নাই। সম্বন্ধর এবং আপ্পার উভয়ে শিবের স্তব-গান করেন। ফলে মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। জৈনধর্ম্মের প্রসার এবং বেদ উপনিষদের প্রতি লোকের অনুরাগহীনতার নিদর্শন এই উপাখ্যানে সূচিত হইয়াছে।

সম্বন্ধর ও আপ্পারার মধ্যে অশেষ শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে মাদুরার পাণ্ড্যরাজ নিন্দ্রেশ্বর নেদুমারন সম্বন্ধরের প্রভাবে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই বিজয়বার্ত্তা আপ্পারার নিকট জ্ঞাপন করিতে তিনি শিবিকারোহণে তৎসকাশে গমন করেন। কতিপয় ভক্ত এই শিবিকা বহন করিয়া লইয়া যান। আপ্পার তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতে অগ্রসর হন এবং সম্বন্ধরের অজ্ঞাতসারে শিবিকা বহনকার্যে যোগ দেন। সম্বন্ধর আপ্পারার বাসভবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া আপ্পার কোথায় জানিতে চাহেন। উত্তরে আপ্পার বলেন, 'এই যে আমি এখানে, আপনার শিবিকা বহন করিতেছি।' সম্বন্ধর ভক্তিবেগে শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। তাঁহার দুই নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। বেল্লাল ভক্তকবির জীবনে নরনারায়ণ সেবার আদর্শ ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি শুধু আধ্যাত্মিক সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত নহেন, কায়িক সেবাও তাঁহার একান্ত কাম্য।

কৈলাস পর্ব্বত শিবের আবাসভূমি। এখানে শিব ও পার্ব্বতী নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি অনুচরবর্গ সহ বাস করেন। সুতরাং এই স্থান শৈবদের অতি পবিত্র তীর্থ। আপ্পার এই তীর্থদর্শনমানসে যাত্রা করেন। পথশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় তিনি

একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় আপ্পার কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত তিরুবদি মন্দিরে ফিরিয়া যাইবার প্রত্যাদেশ পাইলেন। এখানে তাঁহার অভীষ্ট ইষ্টদেবতা হর-পার্ব্বতী দর্শনের আশা পূর্ণ হয়। এ সম্বন্ধে তিনি বহু স্তোত্র রচনা করেন। মরমী ভক্ত হৃদয়ের আলেখ্য ইহাতে জলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আপ্পার রচিত স্তোত্র-গাথা তিন শতেরও অধিক। থিরোমুরোই নামক পুস্তকে এই সমস্ত স্তোত্র স্থান পাইয়াছে। তাঁহার রচনার অনেক ছন্দঃপতন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সাবলীল গতি এবং গাম্ভীর্য্য ইহাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের পূজারী তিনি। তাঁহার মতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভগবান বিরাজিত। তিনি অসীম—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সবকিছুতেই তিনি বিরাজিত। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। তিনি অসীম হইয়াও সসীমের মধ্যে লীলা করিতেছেন। কবি আপ্পার আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক যাবতীয় ঘটনার মধ্যে নটরাজের নৃত্যলীলার রস উপলব্ধি করিতেন। মহতী প্রজ্ঞা অধ্যাত্ম-চেতনা এবং আলোর মূর্ত্ত প্রতীক হইলেন ভগবান শিব। নটরাজের নৃত্যে পৃথিবীর গতিচ্ছন্দ লীলায়িত হইয়া উঠে। অজ্ঞানরূপ তিমির এবং পাপ নৃত্যের গতিবেগে দূরীভূত হইয়া থাকে। শিবনৃত্য সম্বন্ধে ডাঃ আনন্দকুমার কুমারস্বামী বলেন—

"In the Night of Brahma, Nature is inert and cannot dance till Siva wills it: He rises from His stillness, and dancing sends through matter pulsing waves of awakening sound proceeding from the drum; then Nature also dances, appearing about Him as Glory:...The orderly dance of the spheres, the perpetual movement of the atoms, evolution and involution, are conceptions that have at all times occurred to men's mind's: but to represent them in the visible form of Nataraja's Dance is a unique and magnificent achievement of the Indians."

—*Art and Crafts of India and Ceylon*

নটরাজ নৃত্যের এই নিগূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আপ্পার ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সচেতন।

শৈবাচার্য্য আপ্পার সর্ব্বদা লাঙ্গলের ন্যায় একটি যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। তীর্থভ্রমণকালে তিনি এই যন্ত্র-সাহায্যে মন্দির-গাত্রে উৎপন্ন ঘাস, লতা আগাছা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতেন। তাঁহার রচিত বহু স্তোত্র-গাথায় কৃষিকর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তামিল শ্রমিক-সন্ন্যাসীদের জীবনে ভাবরাজ্যের জ্ঞানের সহিত শ্রমশিল্পের কর্ম্মপরায়ণতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে এবং সিংহলে আপ্পারের যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লাঙ্গলযন্ত্র দেখা যায়।

আপ্পার পাম্পুকালোর গ্রামে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি দুইটি পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এক দিন মন্দিরে সেবাকার্য্য করিবার সময় কয়েক খণ্ড হীরক এবং স্বর্ণ হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত অমূল্য রত্নরাজিতে তাঁহার কিছুমাত্র লোভ হইল না। মন্দিরের নিয়মিত সেবাকার্য্য সমাপন করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করেন। আর এক দিন স্বর্গের অপ্সরীরা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চিত্তবিকার ঘটাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ রমণীর মোহজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হন।

এখানেই ধর্ম্মাচার্য্য আপ্পার পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন।

দু'জনে বাঁধিব ঘর

শ্রীকল্যাণী সেনগুপ্ত

পদ্মার সাথে মেঘনা মিশেছে
ত্রিমোহানা বালুচর—
তার মাঝখানে তোমাতে আমাতে
দু'জনে বাঁধিব ঘর।
দিনের সঙ্গী না ফুরাতে বেলা
ফিরে যায় তীরে ভেঙে যায় মেলা;
তুমি আমি শুধু রহিব একেলা
হেরিতে চাঁদের কর।

প্রভাতের রোদে ভরে ওঠে দিক,
বালুকণাগুলো করে চিক্ চিক্,
ত্রিমোহানী ঢেউ হেসে ফিক্ ফিক্
সোহাগে গলিয়া পড়ে।
পাত্ চিল ডাকে ওড়ে বেলেহাঁস
সদাগরী পালে লেগেছে বাতাস
চখা ঘোরে ফেরে নয়ন উদাস
চখী আছে মান ভরে।
জীবন্ত বালুচর
দু'জনে বাঁধিব ঘর।

সন্ধ্যাবেলায় লয়ে দীপখানি
দেখাবে কুটিরে কুটিরের রাণী;
নমিবে আঁচল গলে দিয়ে টানি'
তুলসীমঞ্চ-তলে।
আমি চুপি চুপি কাছে আসি ধীরে
দেখাবো যতনে অরুন্ধতীরে,—
বাহুর বাঁধনে তনুখানি ঘিরে
কত কথা যাব ব'লে।
একান্ত বালুচর
দু'জনে বাঁধিব ঘর।

ভারতীয় শর্করাশিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতির প্রধান কারণ ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত অনুকূল সংরক্ষণনীতি। তাহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। ১৯৩২ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়, ইহার ফলে ভারতীয় শর্করাশিল্প সহজেই কলকারখানার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাহা ছাড়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সুদের হার নামিয়া যাওয়ায় শর্করা-ব্যবসায়ীরা নামমাত্র সুদে ঋণগ্রহণ করিয়া কলকারখানার উন্নতিসাধন করে। এই অর্থ-সঙ্কটের দিনেও সুলভে চাষ, খাল ও টিউবওয়েলের সাহায্যে জলসেচন ও সস্তায় হাইড্রোইলেকট্রিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়। সুলভ শ্রমশক্তি, উত্তম সরবরাহ-ব্যবস্থা ও চাষের সুযোগ-সুবিধার ফলে ভারতীয় শর্করাশিল্প সহজেই প্রসার লাভ করে। ইম্পিরিয়্যাল সুগার ইনষ্টিটিউটও এই শিল্পের সম্প্রসারণে অনেকটা সহায়তা করে। এই সকল কারণে ভারত আজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদন-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রায় ২৫ হইতে ৩০ কোটি টাকার মূলধন এই শিল্পে খাটানো হইতেছে।

ভারতীয় শর্করাশিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রের আয়তন নির্দেশ করা, ফ্যাক্টরীতে ইক্ষু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা, ফ্যাক্টরীর মালিক ও কণ্ট্রাক্টরদের লাইসেন্স দেওয়া, ইক্ষু ও চিনির ওজন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, ইক্ষু ও চিনির সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ভারত-সরকারকে করিতে হইতেছে। শর্করা-শিল্পের উপরই সরকারী নিয়ন্ত্রণের চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক। কেন্দ্রীয় সরকার ইক্ষু ক্রয়-বিক্রয় এবং ইক্ষুর দর ও ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আইনকানুন তৈয়ারী করিবার নির্দেশ দিয়া ১৯৩৪ সালে সুগারকেন এক্ট পাস করেন। যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে ১৯৩৮ সালে মেহতা কমিটির অনুমোদনক্রমে ইক্ষু ও চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়; এই কমিটিতে চিনি ব্যবসায়ী ও চিনির কলের মালিক ও শ্রমিক সকল দলের প্রতিনিধিই ছিল। অতঃপর ইক্ষু ও চিনির ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনকানুন তৈয়ারী হয় এবং তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বহু কর্মচারী নিযুক্ত হয়। সরকারী প্রচেষ্টার আর একটি উদাহরণ সুগার ফ্যাক্টরিজ কণ্ট্রোল এক্ট; উহাতে আছে—

(ক) চিনির কলগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া;

(খ) চিনির কলে ইক্ষু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) সুগার কণ্ট্রোল বোর্ড এক্ট এবং এডভাইসারী কমিটিসমূহ নিয়োগ করা;

(ঘ) ইক্ষুর সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া;

(ঙ) ইক্ষুর বিক্রয়কর আদায় করা।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ফলে সহজেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং ১৯৩৮ সালের পর হইতে ভারতীয় শর্করাশিল্প বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে।

১৯৩৭ এবং ১৯৪০ সালে ভারতীয় শর্করাশিল্প দুই বার গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯৩৭ সালে আশা করা গিয়াছিল যে ইক্ষুর দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে; ফলে ইক্ষুর চাষ নির্দিষ্ট চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। চিনির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৩০,০০০ টনে, কিন্তু চিনির চাহিদা ছিল ১১,৫০,০০০ টন। এই অতি-উৎপাদনের ফলে চিনির মূল্য কমিয়া যায়। অতি-উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, লাভের অঙ্কের মন্দা পড়া প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য সুগার সিণ্ডিকেট গঠন করা হয় এবং সুগার কণ্ট্রোল এক্ট পাস হয়।

১৯৩৭ সালে ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী যে আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তি নিষ্পন্ন হয় তাহার ফলে একমাত্র ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর সকল দেশে চিনি রপ্তানীর অধিকার হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়। ইহার জন্য অতি-উৎপাদনের সময়েও ভারতবর্ষ মধ্যপ্রাচ্যে বা অন্য কোন দেশে চিনি রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতে পারে নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ প্রায় কয়েক লক্ষ টন চিনি বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিত, কিন্তু আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার দরুন ১৯৪০ সালে ভারতীয় শর্করাশিল্পে এক গুরুতর সঙ্কটের উদ্ভব হয়।

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয় শর্করাশিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং আজ তাহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হইয়াছে। উচ্চ বিক্রয়কর বসানোর ফলে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাবে এই শিল্পকে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অতি-উৎপাদন বা স্বল্প-উৎপাদন—কোন ক্ষেত্রেই ভারত-সরকার ইক্ষু ও চিনির দরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেন নাই। সরকারী সাহায্য পাইলে ১৯৪০ সালে বাহিরে চিনি রপ্তানী করিয়া ভারতীয় শর্করাশিল্প সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত। তদুপরি ভারত-সরকার মোলাসেস হইতে এলকহল প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় প্রতি বৎসরে প্রায় ৩৪ লক্ষ টন মোলাসেস অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন এলকহল নষ্ট হইতেছে। এই এলকহল রাসায়নিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও কেমিক্যাল শিল্প-ব্যবসায়ীদের বিশেষ কাজে লাগিত।

ভারতীয় শর্করাশিল্পের স্থান বস্ত্রশিল্পের পরেই; চিনি আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় সম্পদ। খাদ্যগুণের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, এই শিল্পের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ লোকের (তন্মধ্যে ৩০০০ আর্টস, সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট) জীবিকার সংস্থান হইতেছে। এই শিল্প শুধু যে দেশের অর্থ দেশেই রাখিতেছে তাহা নহে, বরং বহু চাষী, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের বিশেষ লাভবান করিতেছে। ভারতীয় শর্করাশিল্পের সম্মুখে আছে বিরাট সম্ভাবনা। স্বাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় শর্করা-শিল্প দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচনা

"আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের কালনির্ণয়"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এ বিষয়ে ডঃ সরকারের প্রবন্ধটি (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৪, পৃ. ৩৮২-৫) পড়িলাম। যে বিষয়ে জ্ঞানের পরিসর সংকীর্ণ সে বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হইলে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রবন্ধোক্ত দুইটি মাত্র মূল সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

১। তন্ত্রসারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দেখিয়া ডঃ সরকার মনে করেন "কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ছিলেন" (পৃ. ৩৮২) এবং তিনি পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিতে বলেন যে, কৃষ্ণানন্দের বংশধরদের "নামগুলি অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং সম্পূর্ণরূপে শাক্তপ্রভাববর্জ্জিত" (পৃ. ৩৮৪)। নবদ্বীপ অঞ্চলে ও উত্তরবঙ্গে আগমবাগীশের বংশ প্রায় ৩০০ বৎসর যাবৎ বহুতর সম্ভ্রান্ত পরিবারে গুরুরূপে সম্মান পাইতেছেন। তিনি ও তদীয় বংশধরগণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। তদীয় জ্ঞাতি গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত মাধবানন্দের সহিত তাঁহার বিরোধকাহিনী নবদ্বীপে চিরকাল প্রচলিত আছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩৪-৫)। এই সকল তথ্য উপেক্ষা করা অতি সাহসের কাজ। তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের দীক্ষা-মন্ত্র সম্বন্ধে গোপন করিয়া থাকেন ইহা অতি-প্রসিদ্ধ কথা এবং "গোপয়েম্মাতৃজারবৎ" প্রভৃতি বচন ইহার পরিপোষক। তন্ত্রসার সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্য লিখিত একটি "সংগ্রহ"-গ্রন্থ, সম্প্রদায় বিশেষের জন্য লিখিত গোপনীয় গ্রন্থ নহে। গ্রন্থশেষে পুষ্পিকার পূর্ব্বে একাধিক পুথিতে আমরা এই শ্লোকটি পাইয়াছি :— শ্রীকৃষ্ণানন্দবাগীশ-ভট্টাচার্য্যাখ্যসংগ্রহং। দৃষ্ট্বা নবীতশাস্ত্রাণি বীরাধ্যাপয় সাম্প্রতম্। সম্ভবতঃ তিনি একটি গোপনীয় গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "শ্রীতত্ত্ব-বোধিনী"—একটি মাত্র খণ্ডিত পুথি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থশালায় ছিল (L. 281, প্রারম্ভে "কৃষ্ণানন্দ-বিদিংহনা বিরচিতা শ্রীতত্ত্ববোধিনী" সংদিগ্ধার্থ বচন—তাহা হইতে গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিন্তু নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না)। সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা রীতিসিদ্ধ আচার। কারণ, তান্ত্রিকদের আচরণ সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ বচন আছে, "অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।"

দ্বিতীয়তঃ, পুত্রাদির নামকরণ অভীষ্টদেবতার নামানুযায়ী হইবে এইরূপ কোন সর্ব্বমতসিদ্ধ নিয়ম নাই। বরং নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবনামধারী নহেন। পক্ষান্তরে শ্যামারহস্যকার পূর্ণানন্দের একটি বংশধারায় (কৌলজ্ঞানরহস্য পৃ. ৶০) একটিও শাক্ত নাম নাই। পূর্ণানন্দ ও তাঁহার বংশ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত নহে।

২। আগমবাগীশের কালনির্ণয় অন্তর্লীন ও বাহ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ। তন্ত্রসারগ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ-পঞ্জী ঔফ্রেক্ট সাহেব প্রকাশ করেন (Oxf. Cat., p. 95)—তন্মধ্যে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও পূর্ণানন্দের নাম নাই। অদ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণে কিম্বা পুথিতে আমরা এ যাবৎ তন্ত্রসারে পূর্ণানন্দের উদ্ধৃতি পাই নাই। সুতরাং একমাত্র বঙ্গবাসী সংস্করণ দেখিয়া এই তথাকথিত 'অকাট্য' প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রাণতোষিণীতে রামতোষণের পিতামহের সম্বন্ধে যে শ্লোকপাদ আছে—"তৎপুত্রোঽভূদ্রঘুবরপরো নাথ একান্তবুদ্ধিঃ"—তদ্দ্বারা সহজেই "রঘুনাথ" নাম পাওয়া যায়। ডঃ সরকার কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া "নাথরাম অথবা রামের ভক্তনাথ" (পৃ. ৩৮৪) নাম লিখিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রামতোষণের নামমালায় একটি নিশ্চিত ভ্রম আছে, গোপাল ও মধুসূদন বিশ্বনাথের পুত্র নহে, পরন্তু হরিনাথের পুত্র। কারণ, এই গোপাল পঞ্চানন কৃত ("পঞ্চানন" উপাধি, পৃথক্ নাম নহে) সুবৃহৎ "তন্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :—আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনাথস্য সূনুনা।

শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা। (L 2202)

রামতোষণ কাশীনাথকে "সারাবলীকৃৎ" এবং গোপালকে "নির্ণয়"কার বলিয়াও ভ্রম করিয়াছেন। মুদ্রিত তন্ত্রসারে সারাবলীর বচনের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় এবং "নির্ণয়"কার গোপাল ন্যায়পঞ্চানন (কেবল পঞ্চানন নহে) নিশ্চিতই ভিন্ন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী। উভয় গোপালের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ নির্ণয়কারকে "বৃদ্ধ" পদে ভূষিত করা হইত (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ৪০-৪৪ দ্রষ্টব্য)। কুলপঞ্জীর প্রতি অশ্রদ্ধা এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মজ্জাগত; অথচ এস্থলে মূল কুল-পঞ্জীতে কোনই ভুল নাই। যাদব চক্রবর্ত্তীর "কুলশাস্ত্রদীপিকা" (২য় সং, ১৩১৩, পৃ. ৭০) হইতে নগেন বসু নকল করেন—তন্মধ্যে আনন্দরাম ও সাধু নাম আছে। উভয়ই ডাকনাম কিম্বা রাশিনাম ধরিয়া নামভুক্ত করা যায়। আমরা কিন্তু যে সকল বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর পুথি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে একটি পত্রে এইরূপ নামমালা পাইয়াছি :—(অবিকল উদ্ধৃত হইল) "আগমবাগিষ ভট্টা° পু° হরিনাথ ভট্টা° পু° মধুসুদন বাচস্পতি পু° কালীদাষ ভট্টা° পু° রঘুনাথ ভট্টা° পু° রুদ্ররাম ভট্টা° কৃষ্ণমঙ্গল ভট্টা° হরিপ্রসাদ ভট্টা° কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টা°। * * * (রুদ্ররামের ধারা)। কৃষ্ণমঙ্গল ভট্টা° পু° রামলোচন ভট্টা° রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার রামশোভন ভট্টা° রামলোচন ভট্টা°।" এই নাম-মালাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, রামতোষণকৃত ভুলটি এখানে নাই এবং মধুসূদনের উপাধিটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রামতোষণের গ্রন্থরচনাকাল হইতে ঊর্দ্ধগামী গণনাদ্বারা তন্ত্রসারের রচনাকাল "১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী" বলিয়া ডঃ

সরকার নির্ণয় করিয়াছেন এবং প্রবন্ধশেষে দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানি যে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।" কারণ, "এইরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ পঁচিশ বৎসরে একপুরুষ গণনা করিয়া থাকেন।" (পৃ. ৩৮৫) ডঃ সরকার প্রভৃতি কোন কোন ঐতিহাসিক রাজারাজড়াদের বংশাবলী হইতেই "একপুরুষে ২৫ বৎসর" গড়পড়তা ধরিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত নহে। আমরা বরং জানি কৃষ্ণানন্দের ন্যায় বাংলার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে কস্মিন্‌কালেও ২৫ বৎসরে একপুরুষ পাওয়া যায় নাই, আমাদের গবেষিত শতাধিক বংশমধ্যে আমরা একটিও পাই নাই। ডঃ সরকারের মত যে এ স্থলে একান্ত ভাবে ভ্রান্ত (যদিও তাঁহার মনে 'কোন সন্দেহ' নাই) তাহা শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখিত "কত বৎসরে 'একপুরুষ' ধরা উচিত" প্রবন্ধ পাঠে (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৮-৪৩) বুঝা যাইবে। বঙ্গবাসী সংস্করণ তন্ত্রসারে ১৫৮০ শকের একটি পুঁথির পাঠ পদে পদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৫৮০ শক (১৬৫৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে) ডঃ সরকার-নির্ণীত রচনাকালের পূর্ব্বে পড়ে। সুতরাং, "পুঁথিখানির তারিখের পাঠে ও ব্যাখ্যায় ত্রুটি থাকা অসম্ভব না হইতে পারে" (পৃ. ৩৮৫)। বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। অতি তুচ্ছ কারণে তাঁহার পাঠে ও ব্যাখ্যায় ত্রুটির আশঙ্কা করা সমীচীন নহে।

তন্ত্রসারের রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের বহুকাল সঞ্চিত উপকরণরাজি হইতে সারাংশ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাংলার প্রায় প্রতি ব্রাহ্মণ-গৃহে তন্ত্রসারের পুঁথি ছিল এবং এখনও অনেক পাওয়া যায়। এই সকল পুঁথি পরীক্ষা করিলে তন্ত্রসারের পাঠে, প্রকরণে, পরিচ্ছেদ বিভাগে ও আয়তনে অতি বিস্ময়কর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমরা চট্টগ্রাম হইতে একটি পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, লিপিকাল এই :— "রূপাম্বরষড়িন্দৌ চ শুচৌ মাসে চ ভার্গবে। লিখিতা পুস্তিকা চৈব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-ধীমতা।" এতদ্দ্বারা ১৬০১ শক হয় (১৬৭৯ খ্রীঃ, রূপ অর্থে ১)—ব্যাখ্যায় কোন ত্রুটি আছে কিনা ডঃ সরকার দেখিবেন। ১১২।১ পত্রে পুষ্পিকা আছে, "ইতি তন্ত্রসারে দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ," ১৮২।১ পত্রে "ইতি…আগমতত্ত্বে ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।" ১৩২।৩৩ পত্রে স্তবচন্দ্রীমন্ত্রাঃ ও "অথ মগধেশ্বরীমন্ত্রাঃ" পাওয়া যায়। মগধেশ্বরী পূজা চট্টগ্রামের বাহিরে কুত্রাপি প্রচলিত নাই। লেখক স্থানীয় পূজাপদ্ধতি ও স্তবকবচাদি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বেই তন্ত্রসারগ্রন্থ বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সুপ্রাচীন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া কৃষ্ণানন্দের রচনা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা দুইটি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলাম। একটির লিপিকাল "শ্রীরাঘব শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরম্ শ্রীনরসিংহ বাচস্পতেঃ পুস্তকমিদং। শক ১৫৫৮।" ডঃ সরকার নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন যে এখানে তারিখের পাঠে কোন ত্রুটি নাই। কারণ, নরসিংহ বাচস্পতি প্রবন্ধ লেখকের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ এবং তাঁহার পুত্র হইতে ৮ পুরুষের প্রায় প্রত্যেকের স্বহস্তাক্ষর পুঁথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এই মূল্যবান সম্পূর্ণ পুঁথিটি উদ্ধার করা যায় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তন্ত্রসারের প্রাচীনতম পুঁথি রক্ষিত আছে (১৭৫১ সংখ্যক সংস্কৃত পুঁথি)। ইহাতে "শ্রীবিদ্যা" প্রকরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—অতিজীর্ণ, ত্রুটিত এবং কতিপয় পত্রহীন। পুষ্পিকা এই :—(১৩৪।২ পত্র) "—মহাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিততন্ত্রসারঃ সমাপ্তঃ। শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৪ শ্রীরাজীবলোচন শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং স্বপুস্তকঞ্চ। শ্রীসরস্বত্যৈ নমো নমঃ।" (জীর্ণ পুঁথির পাঠে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে ; আমরা সাদরে ডঃ সরকারকে এই পুঁথি পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করি।) এই পুঁথির প্রমাণ-বলে তন্ত্রসার রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬২৫ খ্রীঃ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত মোটামুটি মিল থাকিলেও এই পুঁথির পাঠে অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। "মন্ত্রসংস্কার" পদ্ধতি মুদ্রিত গ্রন্থে "তৃতীয়" পরিচ্ছেদের শেষে আছে, কিন্তু এই পুঁথিতে "দ্বিতীয়" পরিচ্ছেদের শেষে (৬২।২ পত্র) দৃষ্ট হয় এবং বগলামুখীপ্রকরণের শেষে (৫১।২ পত্র) পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই। অর্থাৎ এই পুঁথির মতে ৩ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত। মুদ্রিত গ্রন্থের বহুস্থলই পুঁথিটিতে বাদ পড়িয়াছে।

তন্ত্রসারের প্রমাণপঞ্জী মধ্যে রাঘব ভট্টের রচনাকাল ১৪১৫ শক (১৪৯৩-৪ খ্রীঃ) সুনিশ্চিত। "আগমকল্পদ্রুম" গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। পূর্ব্বস্থলীর ৺তারণকাননগৃহে রক্ষিত পুঁথি হইতে পরিচয়-শ্লোক উদ্ধৃত হইল : (১১১।২ পত্র)।

"প্রাগাসীদ্‌গৌড়ভূমৌ শ্রুতিকুলনিপুণঃ শ্রীজগন্নাথনামা,
গোপীনাথাব্দি পয়োদরমধুমধুপঃ প্রাপ্তহর্ষপ্রকর্ষঃ।
বীরভস্তারক্মাখিলগুণনিপুণঃ শ্রীলগোবিন্দনামা

শাকে বেদা (ধি) শক্রে মকরগতরবাবুদ্ভুতং যেন তন্ত্রং॥

সুতরাং ইহা ১৪২৪ শকে (১৫০৩ খ্রীঃ) রচিত। তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা প্রকরণে একটি ব্যাখ্যাবচন আছে, "অভার্থঃ, পুনঃশব্দস্বরাসাৎ দ্বিতীয়-লোপামুদ্রামিত্যর্থঃ। প্রক্রমাদিতি তন্ত্রকৌমুদীকারঃ।" সকল পুঁথিতে পাওয়া না গেলেও ইহা অধিকাংশ পুঁথিতে (Oxf. Cat., p. 95) এবং ১৫৮০ শকের পুঁথিতেও আছে (বঙ্গবাসী সং, পৃ, ৩৭৪)। "তন্ত্রকৌমুদী" মৈথিল মহাপণ্ডিত "দেবনাথ তর্কপঞ্চানন" কর্ত্তৃক কোচবিহারাধিপতি মল্লদেব নরনারায়ণের (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ) সভায় রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বস্থলীর ৺তারণকানন গৃহে দুইটি পুঁথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। একটি খণ্ডিত (১৫১ পত্র), সুন্দরীপটলে (২৫।১ পত্রে) তন্ত্রসারোদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি যথাযথ পাওয়া যায়— "লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ামেব প্রক্রমাৎ।" অপর পুঁথিটি সম্পূর্ণ

(২৩১ পত্র, ৩৬।১ পত্রে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা আছে)। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথিও দ্রষ্টব্য (I.E. 3?, ২১।২ পত্র)। গ্রন্থের বহু স্থানে মল্লদেবের উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ আছে এবং নানা পরিচ্ছেদের শেষে পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়। শেষ পুষ্পিকা এই— "ইতি সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমান -- মহারাজাধিরাজশ্রীশ্রী মল্লদেবকমলেশ্বর শ্রীশ্রীমল্লনারায়ণকারিতায়াং মহামহোপাধ্যায়-তর্কপঞ্চাননশ্রীশ্রীদেবনাথকৃতায়াং তন্ত্রকৌমুদ্যাং পদ্ধতিপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।" দেবনাথ স্বরচিত "মন্ত্রকৌমুদী"র উল্লেখ করিয়াছেন (২২৬।১ — মন্ত্রকৌমুদ্যাং বিস্তরঃ) — মন্ত্রকৌমুদীর রচনাকাল ৪১০ লক্ষ্মণাব্দ (Mithila Mss., II, introd., p. 4.) অর্থাৎ ১৫২৯ খ্রীঃ। বুঝা যায় বার্দ্ধক্যে দেবনাথ মল্লদেবের সভায় আসেন। গ্রন্থারম্ভের ৪র্থ শ্লোকে পরিচয় আছে "গোবিন্দ-পঞ্চমসুতো।" ৫ম শ্লোকে আছে "গজপতি রাজা গোবিন্দদেব" তাঁহাকে স্বর্ণাদি প্রচুর দান করিয়াছিলেন। এই রাজার পরিচয়াদি গবেষণীয়। তন্ত্রকৌমুদী ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল ধরিলে তন্ত্রসারের রচনা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই হয় না—১৬০০ সনে ধরাই যুক্তিযুক্ত। আমরা বাহুল্য বোধে কুলপঞ্জী হইতে ইহার সমর্থক উৎকৃষ্ট প্রমাণ পরিত্যাগ করিলাম। এই কাল নির্ণয়দ্বারা চৈতন্যের সহাধ্যায়নাদি অমূলক প্রবাদ এক কথায়ই নিরস্ত হয়।

উপসংহারে আমরা একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। ডঃ সরকার রঘুনাথ শিরোমণির অভ্যুদয়-কাল (১৪৭৭-১৫৪৭ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়া ডঃ বিদ্যাভূষণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন, অথচ তিনি শিরোমণির কালনির্ণয়ে প্রমাণাদি বিচার কিছুই করেন নাই এবং তাঁহার উক্তির কোনই মূল্য নাই। ডঃ বিদ্যাভূষণ অচ্যুত চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১, পৃ. ১-১২) নির্ব্বিচারে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বিচারপূর্ব্বক শিরোমণির কালনির্ণয়ে সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবে তাহা বাংলা ভাষায় (ঐ, ১৩৫০, পৃ. ১৩-১৬ ; ১৩৫৩, পৃ ১-৩) প্রকাশিত হইয়াছিল, ইংরেজীতে নহে।

চরকা

(Leconte de Lisle কৃত La Chanson Du Rouet কবিতার বঙ্গানুবাদ)

শ্রীফণিভূষণ রায়

(১)

চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
ভুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা।
তোমার দেওয়া সব কিছু মোর—
অন্ন, গৃহ, আচ্ছাদন
তোমার তরে জীবন ভরে
সুখের স্রোতে সন্তরণ।
চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা!

(২)

চরকা প্রিয় বন্ধু আমার
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
ভোরের পাখীর সঙ্গে তুমি
গানটি তোমার সুধা-মাখা!
সাঁঝ, সকালে, গ্রীষ্মে, শীতে—
কাপাস, শণের সুরজাল,
চরকা-পাকে চলেই বেড়ে
চরকা ঘোরে ঘূর্ণিতাল।
চরকা আমার—বন্ধু আমার
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
ভোরের পাখীর কণ্ঠে তুমি
গানটি তোমার সুধা-মাখা!

(৩)

চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা!
শেষের দিনে বন্ধু আমার—
শুভ্র বাসে আচ্ছাদিয়ো
সেই বাসের হয় যেন মোর
মৃত্যুপুরের উত্তরীয়।
চরকা প্রিয় বন্ধু আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা!

ধর্ম্মের উপর আধুনিক যুগের আক্রমণ

শ্রীউমা সেন

ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমরা সমুপস্থিত। অসন্তোষ ও বিদ্রোহ, অতৃপ্তি ও বেদনা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। বিদ্রোহের আঘাতে পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আজ বিপর্য্যস্ত। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ আর তৃপ্তির সন্ধান পায় না। পুরাতন আদর্শে তাহার বিশ্বাস ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাহার অন্তরে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে ও বিজ্ঞানের প্রসারে অপরিসীম সন্দেহ ও অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। উত্তরের আশায় পুরাতনের দিকে বার বার তাকাইয়া সে হইতেছে নিরাশ ও ব্যর্থ। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা তাহার মনে যোগাইতেছে প্রবল অসন্তোষ ও বিদ্রোহের উপাদান। এই মনোভাবের দরুন সে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতনকে সৃষ্টি করিতে ব্যাকুল। এই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। নিদারুণ আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক দুর্য্যোগের যুগে গতানুগতিক ধর্ম্মের ভিতর হইতে প্রেরণা সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ ব্যর্থ হইয়াছে। তাই গতানুগতিক ধর্ম্মের বিধানেও সে আজ আস্থাহীন। ক্রমশই ধর্ম্মহীন হইয়া সে নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করিতেছে। কারণ, পুরাতন ধর্ম্ম তাহার সুগভীর বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণ করিতে অক্ষম। সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাকে আনন্দ দেয় না, তৃপ্তি দেয় না, জীবনের আনন্দ উপভোগের পথও উন্মুক্ত রাখে না। ইহা শুধু মানুষকে পারলৌকিক মিথ্যা স্বপ্নে ভুলাইয়া ইহলৌকিক ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করিয়াই চলে। তাই তথাকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানুষের আজ বিদ্রোহ।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের উপর আক্রমণ আসিতেছে প্রধানতঃ দুইটি দিক হইতে; প্রথম আক্রমণ বিজ্ঞানীদের পক্ষ হইতে এবং দ্বিতীয় আক্রমণ সমাজ-সংস্কারকগণের তরফ হইতে। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নব নব আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই জগৎ কার্য্য-কারণের অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। বিশ্वবিধানে খামখেয়াল বলিয়া কিছু নাই। আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে খামখেয়ালী ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও কার্য্য-কারণ নিয়মাধীন। জড় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র আবিষ্কার দ্বারা এই সত্যটিই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীতে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম কখনও বিচ্যুত হয় না। ইহাই যদি সত্যি হয়, তবে ঈশ্বর-উপাসনার লাভ কি? সকল জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আকররূপে আমরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধর্ম্ম-জীবনে স্বীকার করি ও শাস্ত্রে যাঁহার উপাসনার অনুমোদন ও বিধান আছে, তাহার সার্থকতা বিজ্ঞানীরা ঘৃণামিশ্রিত করুণায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি উত্থাপন করেন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার *An Idealist View of life* পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ঈশ্বর মানুষের কল্পনার সৃষ্টি (anthropomorphic conception) মাত্র। মানুষ তাহার দুর্ব্বল মুহূর্তে প্রয়োজন মিটাইবার ও অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে মানস-লোকে গড়িয়া তোলে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতিরূপ। কল্পলোক ব্যতীত অন্য কোথাও সেই মূর্তির স্থান নাই। ইহার কোন বাস্তব সত্তাও নাই। কাজেই তাঁহার নিকট জাগতিক অভাব পূরণের জন্য ব্যর্থ উপাসনায় সময় ব্যয় নির্বুদ্ধিতামাত্র। "There is no God and we are the instruments of a cold, passionless fate to whom virtue is nothing and vice nothing and from whose grasp we escape to utter darkness," অর্থাৎ ভগবান বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। আমরা উদাসীন ও নিষ্ঠুর নিয়তির হস্তে যন্ত্রমাত্র। ইহার নিকট পাপ-পুণ্যের কোনও বালাই নাই, গভীর অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও নাই। কাজেই জাগতিক দুঃখ-বেদনা মোচনের উপায়-স্বরূপ ঈশ্বরোপাসনা বৃথা। কারণ সেই ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই তো নাই। আর, যদি একান্তই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকেও, তাহা হইলেও একথা সত্য যে তিনি কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং বিশ্ব-জগতের নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ নহেন। কাজেই অক্ষম দেবতার পূজায় সময় ও শক্তিব্যয় নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান ধর্ম্মের অন্যান্য ভিত্তিগুলিকেও ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মার অমরতা ও পুনর্জন্ম, পরলোকের অস্তিত্ব ইত্যাদি অধ্যাত্ম চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানীরা ধর্ম্মের ভিত্তিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্ম্মের উপর আধুনিক যুগে দ্বিতীয় আক্রমণ আসিতেছে সমাজ-বিপ্লবীদের নিকট হইতে। তাহারা বলেন, ঈশ্বর বা পরলোকের অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক তাহা বড় কথা নয়, প্রধান কথা হইল ধর্ম্মের কোন সামাজিক মূল্য আছে কিনা। ধর্ম্ম যদি সমাজে মঙ্গল আনে, যদি মানুষের জাগতিক অভাব-অভিযোগ পূরণের পথে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য। সমাজে প্রচলিত ধর্ম্ম মানুষের দুঃখময় জীবনে কোনও শান্তিই আনে না—তাহাকে শুধু মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর করিয়া তাহার কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করে। যে ধর্ম্ম মানুষকে ইহলোকে কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিল না, সে দিবে

পরলোকে মুক্তি—ইহা কি বিধাত ? আর পরলোকে মুক্তি যদি আসেও তাহাতে ইহলোকে, এই মাটির পৃথিবীতে তাহার কি মূল্য ? ধর্ম্ম যদি ধর্ম্মের মতন সমাজের অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিতেই না পারিল, তবে তাহা কিসের ধর্ম্ম, জীবনে তাহার প্রয়োজনই বা কোন্‌খানে ?

সমাজ-বিপ্লবীদের ভিতর যাহারা আধুনিক কালে সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট বলিয়া পরিচিত, ধর্ম্মের উপর তাহাদের আক্রমণ আরও প্রচণ্ড। তাহারা বলে, ধর্ম্ম শুধু যে মানুষের মঙ্গল বিধান করিতেই অক্ষম তাহা নহে, উপরন্তু তাহা সাংসারিক ক্ষেত্রে অনেক দুঃখ ও বিড়ম্বনার প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া আছে। তাহাদের বিচারে ধর্ম্ম হইল বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার একটি উপায়-স্বরূপ। অধিকারহীন ও ক্ষমতাহীনের বিরুদ্ধে অধিকার-প্রাপ্তের স্বার্থরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা-সংরক্ষণের ব্যাপারে ধর্ম্মের ক্রিয়াশীলতা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষুধিত-বঞ্চিত-শোষিত মানুষের নিকট ইহা পরলোকের স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, যাহাতে উৎপীড়িত মানুষের দল সমাজিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে না পারে সেজন্য ইহলোকে সংযম ও আত্ম-নিগ্রহের আদর্শ প্রচার করে। ধর্ম্মের পোষক ও প্রচারকবর্গ সমাজের শোষক ও শাসক শ্রেণীর তাবকমাত্র। বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার দিকে স্বভাবতঃই তাহাদের সজাগ দৃষ্টি। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য এবং তাহাদের সমগোত্রীয় শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের বিধি-বিধানের সৃষ্টি। ইতিহাস পাঠে ইহা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, এদেশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর প্রথম উদ্ভব হয় ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের একাংশ হিসাবে।* এই পুরোহিতবর্গ সমাজে ক্ষত্রিয়কুলের তাবক ও সমর্থক হিসাবে কাজ করিত, এবং যুদ্ধের সময় সর্ব্বপ্রকারে রাজন্যকুলের সহায়তা করিত। তাহারা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামনার ওজুহাতে স্বার্থবুদ্ধিকলুষিত শাস্ত্র-রচনা দ্বারা জনসাধারণের মনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিত। ইহার ফলে জনগণের উপর শাসক-ও সঙ্গে সঙ্গে যাজক-শ্রেণীর শোষণমূলক শৃঙ্খল দৃঢ়রূপে কায়েম হইত। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস পাঠেও দেখা যায় যে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ক্যাথলিক যাজক-শ্রেণীর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। বর্ত্তমানে ধনতন্ত্রবাদের যুগেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশে দেশে যাজকশ্রেণীর সজ্ঞানে-অজ্ঞানে সহযোগিতা চলিয়াছে। বনিয়াদী স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া যাজকশ্রেণী নূতন সমাজ-গঠনের পথে সর্ব্বত্রই নানা ভাবে কণ্টক সৃষ্টি করিতেছে। অতীত গৌরবের মিথ্যা স্বপ্নে ভুলাইয়া রাখিতেই তাহারা বদ্ধপরিকর। সেই দিক দিয়া তাহারা প্রগতিবাদের শত্রু। কাজেই সমাজের উন্নতির জন্য ধর্ম্মজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তাই আজ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত নর-নারীর প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছে। সাম্যবাদী রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের বিলোপের সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মেরও অবসান হইয়াছে, শাসক ও শোষক শ্রেণীর তাবক-স্বরূপ যাজকশ্রেণীও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক জীবনে মঙ্গল আনয়ন করে, তাহাই সেখানে ধর্ম্ম, তাহাই মন্ত্র, তাহাই জীবনের আদর্শ।

এইবার সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখা যাক, বর্ত্তমান জগতে ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য কিনা ? ইহা কি শুধু মানুষকে শৃঙ্খলিত করিয়াই রাখে ? এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার আগে প্রথমেই ধর্ম্মের আদর্শ ও তাহার সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আদর্শের সঙ্গে সামাজিক পরিণতির যে সকল সময় নিবিড় যোগ থাকিবেই, তাহার কোনও অর্থ নাই। আদর্শ মহান হইয়াও তাহার সামাজিক প্রকাশ অত্যন্ত উৎকট হইতে পারে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের যে আক্রমণ তাহা কি ধর্ম্মের মূলগত আদর্শের বিরুদ্ধে, না ধর্ম্মের নামে সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান তাহার বিরুদ্ধে ? অর্থাৎ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে না ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহাই হইল বর্ত্তমানে আসল প্রশ্ন। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতন্ত্র এই দুইটি কথার ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে: "ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমান-কারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো, তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আপনাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হউক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য, অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।" অর্থাৎ মূল ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু—তাহা ব্যক্তিগত সাধনাসাপেক্ষ, কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বহির্জ্জগতের সামগ্রী—ইহাতে যাজকশ্রেণীর প্রাধান্য। অর্থনৈতিক কারণে এই ধর্ম্মতন্ত্র অধিকার-বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তদনুরূপ অধিকারভেদমূলক শাস্ত্রও রচিত হইয়াছে। কিন্তু আজ সাম্যের যুগ আসিয়াছে। কোটি কোটি নরনারী সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল ভেদ-বৈষম্য বিলুপ্ত করিতে আজ কৃতসংকল্প।

---

*ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য।

তাই রক্ষণশীল ধর্মের পোষক ও প্রচারকবর্গের সহিত প্রগতিবাদী ও বিপ্লবীদের বিরোধ অতি স্বাভাবিক ও সাংঘাতিক। সমাজ-বিপ্লবীরা মনে করে যে, ধর্ম হইল শোষণমূলক পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। কাজেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন সমাজ সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে যাজকশ্রেণীর এবং ধর্মতন্ত্রের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন।

"Spiritually an external and ceremonial religion is good for nothing ; materially it has failed to stop the stronger from exploiting his weaker brother ; psychologically it has developed traits which are anti-social and anti-scientific."*

কাজেই ধর্মের নামে যে-সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমাজের ক্ষতি করিতেছে সেগুলি সমূলে ধ্বংস করা দরকার। দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবীদের আসল আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মের নামে প্রচলিত ধর্মতন্ত্র এবং এই দিক দিয়া বিষয়টি অবলোকন করিলে মনে হয়, তাহাদের আক্রমণ সার্থক ও কল্যাণপ্রদ।

কিন্তু এই আক্রমণ যদি প্রকৃত ধর্মের উপরেই আসিয়া পড়ে তবে তাহা হইবে মানুষের পক্ষে সর্ব্বনাশা। কারণ, যাজক-শ্রেণী-শাসিত ধর্মতন্ত্রে যত অনাচার ও হীনতা, এবং কলুষ-কালিমা থাকুক না কেন, প্রকৃত ধর্ম মানব-জীবনের গভীরতম আকুতি পূরণ করিবার পথ নির্দেশ করে। মানুষের জাগতিক দাবিগুলি চরমভাবে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, ইহাই তাহার জীবনের সবটুকু নয়। তাহার অন্তরের গভীরে আছে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, অসীমকে জানিবার ব্যাকুলতা ও সুদূরের পিপাসা। ইহাদিগকে অস্বীকার করিলে জীবনের একটা বড় অংশকেই অস্বীকার করা হইবে। উপস্থিত প্রয়োজনের মুহূর্তে হয়ত ইহাদের সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় না, তবুও জীবনের সামগ্রিক বিকাশে যাহারা আস্থাবান, তাহারা ঐ সব আধ্যাত্মিক আদর্শকে অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুনিচয়ের সঙ্গর যারা আর যাহাই হোক, ভূমার জন্য অন্তরের যে আকুলতা তাহার অবসান হয় না। মানুষের এই গভীরতম প্রয়োজনেই ধর্মের মূল্য। হৃদয়ের এই মৌন আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন—ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়াও ইহা অপরিবর্ত্তিত। কাজেই ধর্মের প্রয়োজনও চিরন্তন। রাধাকৃষ্ণন্ ঠিকই বলিয়াছেন,

"There is an insistent need in the human soul to come to terms with the unseen reality so long as man is man, hoping and aspiring and reflecting on the meaning of existence and the responsibilities it entails, there is no fear of the loss of religion. It is only a question of reformulation."—*Kalki*, p. 55.

প্রকৃত ধর্ম দ্বারা মানুষ কেমন করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবে? বস্তুনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান ও জগতের প্রত্যেকের সঙ্গে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই আত্মবিকাশ সম্ভব। এইজন্য অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ দেয় ধর্ম। এই ধর্মের মহিমাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধর্মই যথার্থ মানবধর্ম।—যুগে যুগে ইহার ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিনেও এই মানব-ধর্মের প্রয়োজন হইবে। ইহাকে বিসর্জন দিয়া, সাময়িক প্রয়োজনের দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্য-সমাজ গঠন করিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে অভিশাপ হইয়াই থাকিবে। সমাজের পুনর্গঠন তো একটা বৃহত্তর আদর্শের জন্যই—জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই ইহার লক্ষ্য—সমাজের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক জীবনের ভিতর শৃঙ্খলা ও ঐক্যস্থাপন উপলক্ষ্য মাত্র। এই উপলক্ষ্য যদি লক্ষ্যকে ছাপাইয়া বড় হইয়া দেখা দেয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষে আর এক দুর্দিনের লক্ষণ বলিয়া নিঃসংশয়ে বিবেচিত হইবে। সেখানে সম্পদের হয়তো প্রাচুর্য্য থাকিবে, কিন্তু মন থাকিবে উপবাসী ও আত্মার দীনতার পরিসীমা থাকিবে না। জীবন সেখানেও ছন্দহীন, অর্থহীন বলিয়াই মনে হইবে। ঐশ্বর্য্য থাকিবে, জ্ঞান থাকিবে, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বও থাকিবে, কিন্তু জীবনে থাকিবে না সৃষ্টিমূলক আনন্দের স্পর্শ। ভবিষ্যতের এই দুর্দিন সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন যে খুব বেশী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* S. Radhakrishnan : *An Idealist View of Life*, pp. 46-47.

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতবর্ষ যে সুপ্রাচীন) দেশ ও ইহার পটভূমিকায় যে বিরাট ইতিহাস পড়িয়া আছে তাহা প্রত্নতত্ত্বের সমুদায় আবিষ্ক্রিয়া হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত যে সভ্য ছিল ও এইস্থানে এক মহাজাতির উন্নত ধরণের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিদ্যমান ছিল তাহা ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্র জানেন। পৃথিবীর নিকটে আমাদের জাতীয় ইতিহাস কত মহান্ তাহা প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হইতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বর্ষপঞ্জীতে সিন্ধুদেশের মোহেন-জো-দারো এবং ঝুকুর, পঞ্জাবের হরপ্পা তক্ষশীলা, যুক্তপ্রদেশের সারনাথ, বিহারের বুদ্ধগয়া ও নালন্দা, বাংলার পাহাড়পুর এবং মাদ্রাজের নাগার্জ্জুন কোণ্ডা প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য। এই স্থানগুলি আবিষ্কারের ফলে বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা, বিভিন্ন শিল্পকলা, এবং স্থাপত্যের নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ছিল কেবল তাহাই প্রমাণিত হয় নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি ধরণের জীবন যাপন করিতেন তাহাও জানিতে পারা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক প্রামাণ্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। উহাতে কেবল ইতিহাসের একটি ছক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত কেবল ধর্ম্ম-গ্রন্থ মাত্র নয়—এগুলি হইতে তাহারা গবেষণারও প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে মেজর মকলার ও হারগ্রিভস মধ্যভারত ও বেলুচিস্থানের বহু স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে অতীতে একদা ভারতের নবযুগের সূচনা হইয়াছিল তাহাদের আবিষ্কার হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালের নবেম্বর এবং ১৯২৮ সনের এপ্রিলের মধ্যে স্যার অরেল ষ্টেন কলাট ষ্টেটের সারওয়ান, ঝালাওয়ান, খারান এবং মকরান এই প্রদেশগুলিতে বিবিধ আবিষ্কার করেন।

স্যার জন মার্শালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, গিরি ও তক্ষশীলা এই দুইটি স্থানে পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন। তাঁহারা যখন ধর্ম্মরাজিকায় বাস করিতেন তখন শ্বেত হুনদের আক্রমণে তাহাদিগকে সেই প্রদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল। গিরিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানে বুদ্ধের একটি বৃহৎ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপ ও বৌদ্ধ মঠ দেখিলে কুশান যুগেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। এই সকল বৌদ্ধমঠে রান্নাঘর ছিল না। তক্ষশীলায় যে সকল ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরী প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা গান্ধার যুগের বলিয়া মনে হয়।

সিন্ধুদেশে এখনও যদি খননকার্য্য করা হয় তাহা হইলে স্তূপ কিংবা সাতভলাবিশিষ্ট প্রাচীন অট্টালিকা পাওয়া যাইতে পারে। হাদিয়াল, ভির, মণ্ড এবং কোসাম এই সকল স্থানে বহু বিচিত্র পাথরের বাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বহু অনাবিষ্কৃত মূর্ত্তি, তৈজসপত্র এবং বহু অট্টালিকা সেই সব স্থানে আছে। ১৯২৭-২৮ সনে মিঃ ম্যাকে মোহেন-জো-দারো খনন করিয়াছিলেন। এই খননকার্য্যের ফলে বহু বাড়ী আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। বাড়ীগুলিতে সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিলে সারি সারি ঘর, ঘরগুলির পরে সারি সারি স্নানের ঘর ও পায়খানা। প্রত্যেক ঘরে ছোট ছোট দরজা এবং দরজাগুলিতে খুব মোটা মোটা বাজু। বাহির হইতে ঘরের অভ্যন্তরভাগ দেখা খুব কঠিন। মোহেন-জো-দারোর ইটের পাঁজা দেখিতে খুব সুন্দর। এই পাঁজায় ইট পুড়াইবার জন্য কাঠের আগুন ব্যবহার হইত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে মোহেন-জো-দারো আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর নিকট ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় মোহেন-জো-দারো হইতে ষোল মাইল দূরে ঝুকর আবিষ্কৃত হয়। এই সকল আবিষ্কার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি যুগের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ আবিষ্কার গুপ্তযুগের বলিয়া মনে হয়।

মিঃ মাধো স্বরূপ ভাটও হরপ্পা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্থানের দশ ও এগার ফুট নীচে হইতে নরকঙ্কাল ও সুন্দর সুন্দর জিনিষপত্র বাহির হইয়াছে। এই সভ্যতাকে মানুষের প্রথম স্তরের (Chalcolithic) সভ্যতা বলা যায়। তাহারা মূর্ত্তি পূজা করিত। তাহাদের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিবিধ পূজার দ্রব্যসম্ভার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৯২৮ সনে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনী মহাশয় সারনাথ আবিষ্কার করেন। সেইস্থান হইতে যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রথম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে একটি হুবিষ্কের ও অন্যান্য চৌকা মুদ্রাগুলিকে সুঙ্গ যুগের বলিয়া ধারণা হয়। অন্যান্য পুরানো জিনিষের মধ্যে পোড়ামাটির তৈরি স্ত্রীলোকের মাথা ও মৌর্য্যযুগের ধরণের চিত্রকলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ পেজ নালন্দা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ঐ স্থানে দেবপাল

ভারতীয় শর্করাশিল্পের এই অভাবনীয় উন্নতির প্রধান কারণ ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত অনুকূল সংরক্ষণনীতি। তাহা ব্যতীত আরও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। ১৯৩২ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়; ইহার ফলে ভারতীয় শর্করাশিল্প সহজেই কলকারখানার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাহা ছাড়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে সুদের হার নামিয়া যাওয়ায় শর্করা-ব্যবসায়ীরা নামমাত্র সুদে ঋণগ্রহণ করিয়া কলকারখানার উন্নতিসাধন করে। এই অর্থ-সঙ্কটের দিনেও সুলভে চাষ, খাল ও টিউবওয়েলের সাহায্যে জলসেচন ও সস্তায় হাইড্রোইলেকট্রিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হয়। সুলভ শ্রমশক্তি, উত্তম সরবরাহ-ব্যবস্থা ও চাষের সুযোগ-সুবিধার ফলে ভারতীয় শর্করাশিল্প সহজেই প্রসার লাভ করে। ইম্পিরিয়াল সুগার ইনষ্টিটিউটও এই শিল্পের সম্প্রসারণে অনেকটা সহায়তা করে। এই সকল কারণে ভারত আজ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ চিনি উৎপাদন-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রায় ২৫ হইতে ৩০ কোটি টাকার মূলধন এই শিল্পে খাটানো হইতেছে।

ভারতীয় শর্করাশিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রের আয়তন নির্দেশ করা, ফ্যাক্টরীতে ইক্ষু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা, ফ্যাক্টরীর মালিক ও কণ্ট্রাক্টরদের লাইসেন্স দেওয়া, ইক্ষু ও চিনির ওজন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, ইক্ষু ও চিনির সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, শ্রম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ভারত-সরকারকে করিতে হইতেছে। শর্করা-শিল্পের উপরই সরকারী নিয়ন্ত্রণের চাপ সর্বাপেক্ষা অধিক। কেন্দ্রীয় সরকার ইক্ষু ক্রয়-বিক্রয় এবং ইক্ষুর দর ও ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আইনকানুন তৈয়ারী করিবার নির্দেশ দিয়া ১৯৩৪ সালে সুগারকেন এক্ট পাস করেন। যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে ১৯৩৮ সালে মেহতা কমিটির অনুমোদনক্রমে ইক্ষু ও চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়; এই কমিটিতে চিনি ব্যবসায়ী ও চিনির কলের মালিক ও শ্রমিক সকল দলের প্রতিনিধিই ছিল। অতঃপর ইক্ষু ও চিনির ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনকানুন তৈয়ারী হয় এবং তাহার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বহু কর্মচারী নিযুক্ত হয়। সরকারী প্রচেষ্টার আর একটি উদাহরণ সুগার ফ্যাক্টরিজ কণ্ট্রোল এক্ট; উহাতে আছে—

(ক) চিনির কলগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া;

(খ) চিনির কলে ইক্ষু সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা;

(গ) সুগার কণ্ট্রোল বোর্ড এবং এডভাইসারী কমিটি-সমূহ নিয়োগ করা;

(ঘ) ইক্ষুর সর্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া;

(ঙ) ইক্ষুর বিক্রয়কর আদায় করা।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ফলে সহজেই বহু সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং ১৯৩৮ সালের পর হইতে ভারতীয় শর্করাশিল্প কর্ষ লাভ করিতেছে।

১৯৩৭ এবং ১৯৪০ সালে ভারতীয় শর্করাশিল্প দুই বার গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ১৯৩৭ সালে আশা করা গিয়াছিল যে ইক্ষুর দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে; ফলে ইক্ষুর চাষ নির্দিষ্ট চাহিদা অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। চিনির উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১২,৩০,০০০ টনে, কিন্তু চিনির চাহিদা ছিল ১১,৫০,০০০ টন। এই অতি-উৎপাদনের ফলে চিনির মূল্য কমিয়া যায়। অতি-উৎপাদন, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, লাভের অঙ্কের মন্দা পড়া প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য সুগার সিণ্ডিকেট গঠন করা হয় এবং সুগার কণ্ট্রোল এক্ট পাস হয়।

১৯৩৭ সালে ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী যে আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তি নিষ্পন্ন হয় তাহার ফলে একমাত্র ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর সকল দেশে চিনি রপ্তানীর অধিকার হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়। ইহার জন্য অতি-উৎপাদনের সময়েও ভারতবর্ষ মধ্যপ্রাচ্যে বা অন্য কোন দেশে চিনি রপ্তানী করিয়া লাভবান হইতে পারে নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষ প্রায় কয়েক লক্ষ টন চিনি বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিত, কিন্তু আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার দরুন ১৯৪০ সালে ভারতীয় শর্করাশিল্পে এক গুরুতর সঙ্কটের উদ্ভব হয়।

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয় শর্করাশিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং আজ তাহা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হইয়াছে। উচ্চ বিক্রয়কর বসানোর ফলে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বুঝাপড়ার অভাবে এই শিল্পকে নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অতি-উৎপাদন বা স্বল্প-উৎপাদন—কোন ক্ষেত্রেই ভারত-সরকার ইক্ষু ও চিনির দরের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেন নাই। সরকারী সাহায্য পাইলে ১৯৪০ সালে বাহিরে চিনি রপ্তানী করিয়া ভারতীয় শর্করাশিল্প সঙ্কটের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইত। তদুপরি ভারত-সরকার মোলাসেস হইতে এলকহল প্রস্তুত নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় প্রতি বৎসরে প্রায় ৩৪ লক্ষ টন মোলাসেস অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ গ্যালন এলকহল নষ্ট হইতেছে। এই এলকহল রাসায়নিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক ও কেমিক্যাল শিল্প-ব্যবসায়ীদের বিশেষ কাজে লাগিত।

ভারতীয় শর্করাশিল্পের স্থান বস্ত্রশিল্পের পরেই; চিনি আমাদের অন্যতম প্রধান জাতীয় সম্পদ। খাদ্যগুণের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, এই শিল্পের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ লোকের (তন্মধ্যে ৩০০০ আর্টস, সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েট) জীবিকার সংস্থান হইতেছে। এই শিল্প শুধু যে দেশের অর্থ দেশেই রাখিতেছে তাহা নহে, বরং বহু চাষী, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের বিশেষ লাভবান করিতেছে। ভারতীয় শর্করাশিল্পের সম্মুখে আছে বিরাট সম্ভাবনা। স্বাধীন ভারতবর্ষে রতীয় শর্করা-শিল্প দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন ব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

আলোচনা

"আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের কালনির্ণয়"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এ বিষয়ে ডঃ সরকারের প্রবন্ধটি (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৪, পৃ. ৩৮২-৫) পড়িলাম। যে বিষয়ে জ্ঞানের পরিসর সংকীর্ণ সে বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হইলে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রবন্ধোক্ত দুইটি মাত্র স্থূল সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

১। তন্ত্রসারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা দেখিয়া ডঃ সরকার মনে করেন "কৃষ্ণানন্দ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ছিলেন" (পৃ. ৩৮২) এবং তিনি পাঠকদিগকে লক্ষ্য করিতে বলেন যে, কৃষ্ণানন্দের বংশধরদের "নামগুলি অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং সম্পূর্ণরূপে শাক্তপ্রভাববর্জ্জিত" (পৃ. ৩৮৪)। নবদ্বীপ অঞ্চলে ও উত্তরবঙ্গে আগমবাগীশের বংশ প্রায় ৩০০ বৎসর যাবৎ বহুতর সম্ভ্রান্ত পরিবারে গুরুরূপে সম্মান পাইতেছেন। তিনি ও তদীয় বংশধরগণ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। তদীয় জ্ঞাতি গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত মাধবানন্দের সহিত তাঁহার বিরোধকাহিনী নবদ্বীপে চিরকাল প্রচলিত আছে (নবদ্বীপ-মহিমা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩৪-৫)। এই সকল তথ্য উপেক্ষা করা অতি সাহসের কাজ। তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের দীক্ষা-মন্ত্র সম্বন্ধে গোপন করিয়া থাকেন ইহা অতি-প্রসিদ্ধ কথা এবং "গোপয়েন্মাতৃজারবৎ" প্রভৃতি বচন ইহার পরিপোষক। তন্ত্রসার সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্য লিখিত একটি "সংগ্রহ"-গ্রন্থ, সম্প্রদায় বিশেষের জন্য লিখিত গোপনীয় গ্রন্থ নহে। গ্রন্থশেষে পুষ্পিকার পূর্ব্বে একাধিক পুথিতে আমরা এই শ্লোকটি পাইয়াছি :— শ্রীকৃষ্ণানন্দবাগীশ-ভট্টাচার্য্যৈঃসংগ্রহং। দৃষ্ট্বা নবীতশাস্ত্রাণি ধীরাধ্যাপয় সাম্প্রতম্। সম্ভবতঃ তিনি একটি গোপনীয় গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "শ্রীতত্ত্ব-বোধিনী"—একটি মাত্র খণ্ডিত পুথি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গ্রন্থশালায় ছিল (L. 281, গ্রন্থারম্ভে "কৃষ্ণানন্দ-বিদিংসুনা বিরচিতা শ্রীতত্ত্ববোধিনী" সংদিগ্ধার্থ বচন—তাহা হইতে গ্রন্থকার সম্বন্ধে কিছু নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না)। সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবন্দনা রীতিসিদ্ধ আচার। কারণ, তান্ত্রিকদের আচরণ সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ বচন আছে, "অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।"

দ্বিতীয়তঃ, পুত্রাদির নামকরণ অভীষ্টদেবতার নামানুযায়ী হইবে এইরূপ কোন সর্ব্বমতসিদ্ধ নিয়ম নাই। স্বয়ং নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বৈষ্ণবনামধারী নহেন। পক্ষান্তরে শ্যামারহস্যকার পূর্ণানন্দের একটি বংশধারায় (কৌলজ্ঞাননির্ণয়, পৃ. ৵০) একটিও শাক্ত নাম নাই। পূর্ণানন্দ ও তাঁহার বংশ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত নহে।

২। আগমবাগীশের কালনির্ণয় অর্বাচীন ও বাহ্য প্রমাণ-সাপেক্ষ। তন্ত্রসারগ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ-পঞ্জী ঔফ্রেক্ট সাহেব প্রকাশ করেন (Oxf Cat., p. 95)—তন্মধ্যে শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও পূর্ণানন্দের নাম নাই। অন্য কোন মুদ্রিত সংস্করণে কিম্বা পুথিতে আমরা এ যাবৎ তন্ত্রসারে পূর্ণানন্দের উদ্ধৃতি পাই নাই। সুতরাং একমাত্র বঙ্গবাসী সংস্করণ দেখিয়া এই তথাকথিত 'অকাট্য' প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। প্রাণতোষিণীতে রামতোষণের পিতামহের সম্বন্ধে যে শ্লোকপাদ আছে—"তৎপুত্রোঽভূদ্রঘুবরপরো নাথ একান্তবুদ্ধিঃ"—তদ্দ্বারা সহজেই "রঘুনাথ" নাম পাওয়া যায়। ডঃ সরকার কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া "নাথরাম অথবা রামের ভক্তনাথ" (পৃ. ৩৮৪) নাম লিখিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। রামতোষণের নামমালায় একটি নিশ্চিত ভ্রম আছে, গোপাল ও মধুসূদন বিশ্বনাথের পুত্র নহে, পরন্তু হরিনাথের পুত্র। কারণ, এই গোপাল পঞ্চানন কৃত ("পঞ্চানন" উপাধি, পৃথক্ নাম নহে) সুবৃহৎ "তন্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :—আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনাথস্য সূনুনা।

শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা। (L 2.03)

রামতোষণ কাশীনাথকে "সারাবলীকৃৎ" এবং গোপালকে "নির্ণয়"কার বলিয়াও ভ্রম করিয়াছেন। মুদ্রিত তন্ত্রসারে সারাবলীর বচনের উদ্ধৃতি পাওয়া যায় এবং "নির্ণয়"কার গোপাল ন্যায়পঞ্চানন (কেবল পঞ্চানন নহে) নিশ্চিতই ভিন্ন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী। উভয় গোপালের পার্থক্য দেখাইবার জন্যই সম্ভবতঃ নির্ণয়কারকে "বৃদ্ধ" পদে ভূষিত করা হইত (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃ. ৪৩-৪৪ দ্রষ্টব্য)। কুলপঞ্জীর প্রতি অশ্রদ্ধা এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকের মজ্জাগত; অথচ এস্থলে মূল কুলপঞ্জীতে কোনই ভুল নাই। যাদব চক্রবর্ত্তীর "কুলশাস্ত্রদীপিকা" (২য় সং, ১৩১৩, পৃ. ৭০) হইতে নগেন বসু নকল করেন—তন্মধ্যে আনন্দরাম ও সাধু নাম আছে। উভয়ই ডাকনাম কিম্বা রাশিনাম ধরিয়া সাব্যস্ত করা যায়। আমরা কিন্তু যে সকল বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর পুথি সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে একটি পত্রে এইরূপ নামমালা পাইয়াছি :—(অবিকল উদ্ধৃত হইল) "আগমবাগিষ ভট্টা° পু° হরিনাথ ভট্টা° পু° মধুসুদন বাচস্পতি পু° কালীদাষ ভট্টা° পু° রঘুনাথ ভট্টা° পু° রুদ্ররাম ভট্টা° কৃষ্ণমঙ্গল ভট্টা° হরিপ্রসাদ ভট্টা° কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টা°। * * * (রুদ্ররামের ধারা)। কৃষ্ণমঙ্গল ভট্টা° পু° রামলোচন ভট্টা° রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার রামশোভন ভট্টা° রামলোচন ভট্টা°।" এই নামমালাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, রামতোষণকৃত ভুলটি এখানে নাই এবং মধুসূদনের উপাধিটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রামতোষণের গ্রন্থরচনাকাল হইতে ঊর্দ্ধগামী গণনাদ্বারা তন্ত্রসারের রচনাকাল "১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী" বলিয়া ডঃ

সরকার নির্ণয় করিয়াছেন এবং প্রবন্ধশেষে দৃঢ়তার সহিত লিখিয়াছেন, "গ্রন্থখানি যে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।" কারণ, "এইরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকগণ পঁচিশ বৎসরে একপুরুষ গণনা করিয়া থাকেন।" (পৃ. ৩৮৫) ডঃ সরকার প্রভৃতি কোন কোন ঐতিহাসিক রাজারাজড়াদের বংশাবলী হইতেই "একপুরুষে ২৫ বৎসর" গড়পড়তা ধরিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা অভ্রান্ত নহে। আমরা বরং জানি কৃষ্ণানন্দের ন্যায় বাংলার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজে কস্মিন্‌কালেও ২৫ বৎসরে একপুরুষ পাওয়া যায় নাই, আমাদের গবেষিত শতাধিক বংশমধ্যে আমরা একটিও পাই নাই। ডঃ সরকারের মত যে এ স্থলে একান্ত ভাবে ভ্রান্ত (যদিও তাঁহার মনে 'কোন সন্দেহ' নাই) তাহা শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখিত "কত বৎসরে 'একপুরুষ' ধরা উচিত" প্রবন্ধ পাঠে (প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৯, পৃ. ২৩৬-৪৩) বুঝা যাইবে। বঙ্গবাসী সংস্করণ তন্ত্রসারে ১৫৮০ শকের একটি পুথির পাঠ পদে পদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৫৮০ শক (১৬৫৮-৯ খ্রীষ্টাব্দ) ডঃ সরকার-নির্ণীত রচনাকালের পূর্ব্বে পড়ে। সুতরাং, "পুথিখানির তারিখের পাঠে ও ব্যাখ্যার ত্রুটি থাকা অসম্ভব না হইতে পারে" (পৃ. ৩৮৫)। বঙ্গবাসী সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়। অতি তুচ্ছ কারণে তাঁহার পাঠে ও ব্যাখ্যায় ত্রুটির আশঙ্কা করা সমীচীন নহে।

তন্ত্রসারের রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের বহুকাল সঞ্চিত উপকরণরাজি হইতে সারাংশ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাংলার প্রায় প্রতি ব্রাহ্মণ-গৃহে তন্ত্রসারের পুথি ছিল এবং এখনও অনেক পাওয়া যায়। এই সকল পুথি পরীক্ষা করিলে তন্ত্রসারের পাঠে, প্রকরণে, পরিচ্ছেদ বিভাগে ও আরম্ভে অতি বিস্ময়কর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। আমরা চাটিগ্রাম হইতে একটি পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, লিপিকাল এই :— "রূপাব্ধরসক্ষিতৌ চ শুচৌ মাসে চ ভার্গবে। লিখিতা পুস্তিকা চৈব শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-ধীমতা।" এতদ্দ্বারা ১৬০১ শক হয় (১৬৭৯ খ্রীঃ, রূপ অর্থে ১)—ব্যাখ্যায় কোন ত্রুটি আছে কিনা ডঃ সরকার দেখিবেন। ১৭২।১ পত্রে পুষ্পিকা আছে, "ইতি তন্ত্রসারে দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ," ১৮২।১ পত্রে "ইতি…আগমতত্ত্বে ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।" ১৩২।৩৩ পত্রে ত্রবচণ্ডীমন্ত্রাঃ ও "অথ মগধেশ্বরীমন্ত্রাঃ" পাওয়া যায়। মগধেশ্বরী পূজা চাটিগ্রামের বাহিরে কুত্রাপি প্রচলিত নাই। লেখক স্থানীয় পূজাপদ্ধতি ও স্তবকবচাদি অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বেই তন্ত্রসারগ্রন্থ বাংলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সুপ্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া কৃষ্ণানন্দের রচনা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমরা দুইটি পুথির সন্ধান পাইয়াছিলাম। একটির লিপিকাল "শ্রীমাধব শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরম্ শ্রীনরসিংহ বাচস্পতেঃ পুস্তকমিদং। শক ১৫৬৮।" ডঃ সরকার নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন যে এখানে তারিখের পাঠে কোন ত্রুটি নাই। কারণ, নরসিংহ বাচস্পতি প্রবন্ধ লেখকের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ এবং তাঁহার পুত্র হইতে ৮ পুরুষের প্রায় প্রত্যেকের স্বহস্তলিখিত পুথি হইতে আমরা উদ্ধার করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এই মূল্যবান সম্পূর্ণ পুথিটি উদ্ধার করা যায় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তন্ত্রসারের প্রাচীনতম পুথি রক্ষিত আছে (১৭৫১ সংখ্যক সংস্কৃত পুথি)। ইহাতে "শ্রীবিদ্যা" প্রকরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়—অতিজীর্ণ, ত্রুটিত এবং কতিপয় পত্রহীন। পুষ্পিকা এই :— (১৩৪।২ পত্র) "— মহাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিততন্ত্রসারঃ সমাপ্তঃ। শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৪ শ্রীরাজীবলোচন শর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং স্বপুস্তকঞ্চ। শ্রীসরস্বত্যৈ নমো নমঃ।" (জীর্ণ পুথির পাঠে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নহে ; আমরা সাদরে ডঃ সরকারকে এই পুথি পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করি।) এই পুথির প্রমাণ-বলে তন্ত্রসার রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬২৫ খ্রীঃ নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত মোটামুটি মিল থাকিলেও এই পুথির পাঠে অনেক বৈষম্য দৃষ্ট হয়। "মন্ত্রসংস্কার" পদ্ধতি মুদ্রিত গ্রন্থে "তৃতীয়" পরিচ্ছেদের শেষে আছে, কিন্তু এই পুথিতে "দ্বিতীয়" পরিচ্ছেদের শেষে (৬২।২ পত্র) দৃষ্ট হয় এবং বগলামুখীপ্রকরণের শেষে (৫১।২ পত্র) পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই। অর্থাৎ এই পুথির মতে ৩ পরিচ্ছেদে গ্রন্থ সমাপ্ত। মুদ্রিত গ্রন্থের বহুস্থলই পুথিটিতে বাদ পড়িয়াছে।

তন্ত্রসারের প্রমাণপঞ্জী মধ্যে রাঘব ভট্টের রচনাকাল ১৪১৫ শক (১৪৯৩-৪ খ্রীঃ) সুনিশ্চিত। "আগমকল্পদ্রুম" গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। পূর্ব্বস্থলীর ৺তারণকাননগৃহে রক্ষিত পুথি হইতে পরিচয়-শ্লোক উদ্ধৃত হইল : (১১১।২ পত্র)।

"প্রাগাসীদ্‌গৌড়ভূমৌ শ্রুতিকুলনিপুণঃ শ্রীজগন্নাথনামা,
গোপীনাথাঙ্ঘ্রিপয়োদয়মধুমধুপঃ প্রাপ্তহর্ষপ্রকর্ষঃ।
ধীরস্তস্যাত্মজন্মাখিলগুণনিপুণঃ শ্রীলগোবিন্দনামা

শাকে বেদা (খি) শক্রে মকরগতরবাবদ্ভুতং যেন তন্ত্রং।

সুতরাং ইহা ১৪২৪ শকে (১৫০৩ খ্রীঃ) রচিত। তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা প্রকরণে একটি ব্যাখ্যাবচন আছে, "অত্রার্থঃ, পুনঃশব্দসমাসাৎ দ্বিতীয়-লোপামুদ্রাবিদ্যার্থঃ। প্রক্রমাদিতি তন্ত্রকৌমুদীকারঃ।" সকল পুথিতে পাওয়া না গেলেও ইহা অধিকাংশ পুথিতে (Oxf. Cat., p. 95) এবং ১৫৮০ শকের পুথিতেও আছে (বঙ্গবাসী সং, পৃ, ৩৭৪)। "তন্ত্রকৌমুদী" মৈথিল মহাপণ্ডিত "দেবনাথ তর্কপঞ্চানন" কর্ত্তৃক কোচবিহারাধিপতি মল্লদেব নরনারায়ণের (১৫৫৫-৮৭ খ্রীঃ) সভায় রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বস্থলীর ৺তারণকানন গৃহে দুইটি পুথি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। একটি খণ্ডিত (১৫১ পত্র), সুন্দরীপটলে (২৫।১ পত্রে) তন্ত্রসারোদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি যথাযথ পাওয়া যায়— "লোপামুদ্রাং দ্বিতীয়ামেব প্রক্রমাৎ।" অপর পুথিটি সম্পূর্ণ

(২৩১ পত্র, ৩৬।১ পত্রে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা আছে)। কলিকাতা রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিও দ্রষ্টব্য (I.E. 3৭, ২১।২ পত্র)। গ্রন্থের বহু স্থানে মল্লদেবের উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ আছে এবং নানা পরিচ্ছেদের শেষে পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়। শেষ পুষ্পিকা এই— "ইতি সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমান — মহারাজাধিরাজশ্রীশ্রীমল্লদেবকমণ্ডেশ্বরশ্রী শ্রীমন্নরনারায়ণকারিতায়াং মহামহোপাধ্যায়-তর্কপঞ্চাননশ্রীশ্রীদেবনাথকৃতায়ান্তন্ত্রকৌমুদ্যাং পঞ্চত্রিংশপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ।" দেবনাথ বিরচিত "মন্ত্রকৌমুদী"র উল্লেখ করিয়াছেন (২২৬।১ — মন্ত্রকৌমুদ্যাং বিস্তরঃ) — মন্ত্রকৌমুদীর রচনাকাল ৪১০ লক্ষণাব্দ (Mithila Mss., II, introd., p. 4.) অর্থাৎ ১৫২৯ খ্রীঃ। বুঝা যায় বার্দ্ধক্যে দেবনাথ মল্লদেবের সভায় আসেন। গ্রন্থারম্ভের ৪র্থ শ্লোকে পরিচয় আছে "গোবিন্দ-পঞ্চমসুতো।" ৫ম শ্লোকে আছে "গজপতি রাজা গোবিন্দদেব" তাঁহাকে স্বর্ণাদি প্রচুর দান করিয়াছিলেন। এই রাজার পরিচয়াদি গবেষণীয়। তন্ত্রকৌমুদী ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল ধরিলে তন্ত্রসারের রচনা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কিছুতেই হয় না—১৬০০ সনে ধরাই যুক্তিযুক্ত। আমরা বাহুল্য বোধে কুলপঞ্জী হইতে ইহার সমর্থক উৎকৃষ্ট প্রমাণ পরিত্যাগ করিলাম। এই কাল নির্ণয়দ্বারা চৈতন্যের সহাধ্যয়নাদি অমূলক প্রবাদ এক কথায়ই নিরস্ত হয়।

উপসংহারে আমরা একটি ক্ষুদ্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। ডঃ সরকার রঘুনাথ শিরোমণির অভ্যুদয়-কাল (১৪৭৭-১৫৪৭ খ্রীঃ) উল্লেখ করিয়া ডঃ বিদ্যাভূষণের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের দোহাই দিয়াছেন, অথচ তিনি শিরোমণির কালনির্ণয়ে প্রমাণাদি বিচার কিছুই করেন নাই এবং তাঁহার উক্তির কোনই মূল্য নাই। ডঃ বিদ্যাভূষণ অচ্যুত চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১১, পৃ, ১-১২) নির্বিচারে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা বিচারপূর্ব্বক শিরোমণির কালনির্ণয়ে সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবে তাহা বাংলা ভাষায় (ঐ, ১৩৫০, পৃ, ১৩-১৬ ; ১৩৫৩, পৃ ১-৩) প্রকাশিত হইয়াছিল, ইংরেজীতে নহে।

চরকা

(Leconte de Lisle কৃত La Chanson Du Rouet
কবিতার বঙ্গানুবাদ)

শ্রীফণিভূষণ রায়

(১)

চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা।
তোমার দেওয়া সব কিছু মোর—
অন্ন, গৃহ, আচ্ছাদন
তোমার তরে জীবন ভরে
সুখের স্রোতে সন্তরণ।
চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা।

(২)

চরকা প্রিয় বন্ধু আমার
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
ভোরের পাখীর সঙ্গে তুমি
গানটি তোমার সুধা-মাখা।
সাঁঝ, সকালে, গ্রীষ্মে, শীতে—
কাপাস, শণের সূত্রজাল,
চরকা-পাকে চলেই বেড়ে
চরকা ঘোরে ঘূর্ণিতাল।
চরকা আমার—বন্ধু আমার
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
ভোরের পাখীর কণ্ঠে তুমি
গানটি তোমার সুধা-মাখা।

(৩)

চরকা প্রিয় মিত্র আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা।
শেষের দিনে বন্ধু আমার—
শুভ্র বাসে আচ্ছাদিতো
সেই পাথেয় হয় যেন মোর
মৃত্যুপুরের উত্তরীয়।
চরকা প্রিয় বন্ধু আমার—
তুলোর পাঁজা বকের পাখা,
কোথায় লাগে তোমার কাছে
সোনার মোহর, রূপোর টাকা।

ধর্মের উপর আধুনিক যুগের আক্রমণ

শ্রীউমা সেন

ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমরা সমুপস্থিত। অসন্তোষ ও বিদ্রোহ, অতৃপ্তি ও বেদনা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। বিদ্রোহের আঘাতে পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আজ বিপর্য্যস্ত। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ আর তৃপ্তির সন্ধান পায় না। পুরাতন আদর্শে তাহার বিশ্বাস ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাহার অন্তরে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে ও বিজ্ঞানের প্রসারে অপরিসীম সন্দেহ ও অনন্ত জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। উত্তরের আশায় পুরাতনের দিকে বার বার তাকাইয়া সে হইতেছে নিরাশ ও ব্যর্থ। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা তাহার মনে যোগাইতেছে প্রবল অসন্তোষ ও বিদ্রোহের উপাদান। এই মনোভাবের দরুন সে পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতনকে সৃষ্টি করিতে ব্যাকুল। এই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। নিদারুণ আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক দুর্য্যোগের যুগে গতানুগতিক ধর্ম্মের ভিতর হইতে প্রেরণা সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ ব্যর্থ হইয়াছে। তাই গতানুগতিক ধর্ম্মের বিধানেও সে আজ আস্থাহীন। ক্রমশই ধর্ম্মহীন হইয়া সে নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করিতেছে। কারণ, পুরাতন ধর্ম্ম তাহার সুগভীর বাস্তব প্রয়োজনগুলি পূরণ করিতে অক্ষম। সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম তাহাকে আনন্দ দেয় না, তৃপ্তি দেয় না, জীবনের আনন্দ উপভোগের পথও উন্মুক্ত রাখে না। ইহা শুধু মানুষকে পারলৌকিক মিথ্যা স্বপ্নে ভুলাইয়া ইহলৌকিক ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা করিয়াই চলে। তাই তথাকথিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মানুষের আজ বিদ্রোহ।

বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের উপর আক্রমণ আসিতেছে প্রধানতঃ দুইটি দিক হইতে; প্রথম আক্রমণ বিজ্ঞানীদের পক্ষ হইতে এবং দ্বিতীয় আক্রমণ সমাজ-সংস্কারকগণের তরফ হইতে। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নব নব আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই জগৎ কার্য্য-কারণের অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। বিশ্ববিধানে খামখেয়াল বলিয়া কিছু নাই। আপাত-দৃষ্টিতে যাহাকে খামখেয়ালী ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও কার্য্য-কারণ নিয়মাধীন। জড় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র আবিষ্কার দ্বারা এই সত্যটিই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীতে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম কখনও বিচ্যুত হয় না। ইহাই যদি সত্যি হয়, তবে ঈশ্বর-উপাসনায় লাভ কি? সকল জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আকররূপে আমরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধর্ম্ম-জীবনে স্বীকার করি ও শাস্ত্রে যাঁহার উপাসনার অনুমোদন ও বিধান আছে, তাহার সার্থকতা বিজ্ঞানীরা ঘৃণামিশ্রিত করুণায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি উত্থাপন করেন। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ তাঁহার *An Idealist View of life* পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ঈশ্বর মানুষের কল্পনার সৃষ্টি (anthropomorphic conception) মাত্র। মানুষ তাহার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রয়োজন মিটাইবার ও অভাব পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে মানস-লোকে গড়িয়া তোলে এক অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রতিরূপ। কল্পলোক ব্যতীত অন্য কোথাও সেই মূর্ত্তির স্থান নাই। ইহার কোন বাস্তব সত্তাও নাই। কাজেই তাঁহার নিকট জাগতিক অভাব পূরণের জন্য ব্যর্থ উপাসনায় সময় ব্যয় নির্বুদ্ধিতামাত্র। "There is no God and we are the instruments of a cold, passionless fate to whom virtue is nothing and vice nothing and from whose grasp we escape to utter darkness," অর্থাৎ ভগবান বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। আমরা উদাসীন ও নিষ্ঠুর নিয়তির হস্তে যন্ত্রমাত্র। ইহার নিকট পাপ-পুণ্যের কোনও বালাই নাই, গভীর অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও নাই। কাজেই জাগতিক দুঃখ-বেদনা মোচনের উপায়-স্বরূপ ঈশ্বরোপাসনা বৃথা। কারণ সেই ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই তো নাই। আর, যদি একান্তই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকেও, তাহা হইলেও একথা সত্য যে তিনি কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং বিশ্ব-জগতের নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ নহেন। কাজেই অক্ষম দেবতার পূজায় সময় ও শক্তিব্যয় নিরর্থক। ইহা ছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান ধর্ম্মের অন্যান্য ভিত্তিগুলিকেও ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মার অমরতা ও পুনর্জন্ম, পরলোকের অস্তিত্ব ইত্যাদি অধ্যাত্ম চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানীরা ধর্ম্মের ভিত্তিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্ম্মের উপর আধুনিক যুগে দ্বিতীয় আক্রমণ আসিতেছে সমাজ-বিপ্লবীদের নিকট হইতে। তাহারা বলেন, ঈশ্বর বা পরলোকের অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক তাহা বড় কথা নয়, প্রধান কথা হইল ধর্ম্মের কোন সামাজিক মূল্য আছে কিনা। ধর্ম্ম যদি সমাজে মঙ্গল আনে, যদি মানুষের জাগতিক অভাব-অভিযোগ পূরণের পথে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য। সমাজে প্রচলিত ধর্ম্ম মানুষের দুঃখময় জীবনে কোনও শান্তিই আনে না—তাহাকে শুধু মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর করিয়া তাহার কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করে। যে ধর্ম্ম মানুষকে ইহ-লোকে কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারিল না, সে দিবে

পরলোকে মুক্তি—ইহা কি নিশ্চিত? আর পরলোকে মুক্তি যদি আসেও তাহাতে ইহলোকে, এই মাটির পৃথিবীতে তাহার কি মূল্য? ধর্ম যদি ধর্মের মতন সমাজের অত্যাচার হইতে মানুষকে রক্ষা করিতেই না পারিল, তবে তাহা কিসের ধর্ম, জীবনে তাহার প্রয়োজনই বা কোন্‌খানে?

সমাজ-বিপ্লবীদের ভিতর যাহারা আধুনিক কালে সাম্যবাদী বা কম্যুনিষ্ট বলিয়া পরিচিত, ধর্মের উপর তাহাদের আক্রমণ আরও প্রচণ্ড। তাহারা বলে, ধর্ম শুধু যে মানুষের মঙ্গল বিধান করিতেই অক্ষম তাহা নহে, উপরন্তু তাহা সাংসারিক ক্ষেত্রে অনেক দুঃখ ও বিড়ম্বনার প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া আছে। তাহাদের বিচারে ধর্ম হইল বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার একটি উপায়-স্বরূপ। অধিকারহীন ও ক্ষমতাহীনের বিরুদ্ধে অধিকার-প্রাপ্তের স্বার্থরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা-সংরক্ষণের ব্যাপারে ধর্মের ক্রিয়াশীলতা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ক্ষুধিত-বঞ্চিত-শোষিত মানুষের নিকট ইহা পরলোকের স্বর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, যাহাতে উৎপীড়িত মানুষেরা সব সমাজিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে না পারে সেজন্য ইহলোকে সংযম ও আত্ম-নিগ্রহের আদর্শ প্রচার করে। ধর্মের পোষক ও প্রচারকবর্গ সমাজের শোষক ও শাসক শ্রেণীর তাঁবেদারমাত্র। বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার দিকে স্বভাবতঃই তাহাদের সজাগ দৃষ্টি। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের জন্য এবং তাহাদের সমগোত্রীয় শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের বিধি-বিধানের সৃষ্টি। ইতিহাস পাঠে ইহা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায়, এদেশে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর প্রথম উদ্ভব হয় ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের একাংশ হিসাবে।* এই পুরোহিতবর্গ সমাজে ক্ষত্রিয়কুলের তাঁবেদার ও সমর্থক হিসাবে কাজ করিত, এবং যুদ্ধের সময় সর্ব্বপ্রকারে রাজন্যকুলের সহায়তা করিত। তাহারা যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলকামনার ওজুহাতে স্বার্থবুদ্ধিকলুষিত শাস্ত্র-রচনা দ্বারা জনসাধারণের মনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিত। ইহার ফলে জনগণের উপর শাসক-ও সঙ্গে সঙ্গে যাজক-শ্রেণীর শোষণমূলক শৃঙ্খল দৃঢ়রূপে কায়েম হইত। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস পাঠেও দেখা যায় যে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ক্যাথলিক যাজক-শ্রেণীর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। বর্ত্তমানে ধনতন্ত্রবাদের যুগেও পুঁজিপতিদের সঙ্গে দেশে দেশে যাজকশ্রেণীর সজ্ঞানে-অজ্ঞানে সহযোগিতা চলিয়াছে। বনিয়াদী স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া যাজকশ্রেণী নূতন সমাজ-গঠনের পথে সর্ব্বত্রই নানা ভাবে কণ্টক সৃষ্টি করিতেছে। অতীত গৌরবের মিথ্যা স্বপ্নে ভুলাইয়া রাখিতেই তাহারা বদ্ধপরিকর। সেই দিক দিয়া তাহারা প্রগতিবাদের শত্রু। কাজেই সমাজের উন্নতির জন্য ধর্মজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তাই আজ ধর্মের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত নর-নারীর প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছে। সাম্যবাদী রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের বিলোপের সঙ্গে পুরাতন ধর্মেরও অবসান হইয়াছে, শাসক ও শোষক শ্রেণীর তাঁবেদার-স্বরূপ যাজকশ্রেণীও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক জীবনে মঙ্গল আনয়ন করে, তাহাই সেখানে ধর্ম, তাহাই মন্ত্র, তাহাই জীবনের আদর্শ।

এইবার সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখা যাক, বর্ত্তমান জগতে ধর্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য কিনা? ইহা কি শুধু মানুষকে শৃঙ্খলিত করিয়াই রাখে? এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার আগে প্রথমেই ধর্মের আদর্শ ও তাহার সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আদর্শের সঙ্গে সামাজিক পরিণতির যে সকল সময় নিবিড় যোগ থাকিবেই, তাহার কোনও অর্থ নাই। আদর্শ মহান হইয়াও তাহার সামাজিক প্রকাশ অত্যন্ত উৎকট হইতে পারে। ধর্মের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের যে আক্রমণ তাহা কি ধর্মের মূলগত আদর্শের বিরুদ্ধে, না ধর্মের নামে সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান তাহার বিরুদ্ধে? অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে না ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইহাই হইল বর্ত্তমানে আসল প্রশ্ন। ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র এই দুইটি কথার ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা চলে: "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমান-কারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো, তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হউক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য, অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।" অর্থাৎ মূল ধর্ম অন্তরের বস্তু—তাহা ব্যক্তিগত সাধনাসাপেক্ষ, কিন্তু ধর্মতন্ত্র বহির্জ্জগতের সামগ্রী—ইহাতে যাজকশ্রেণীর প্রাধান্য। অর্থনৈতিক কারণে এই ধর্মতন্ত্র অধিকার-বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তদনুরূপ অধিকারভেদমূলক শাস্ত্রও রচিত হইয়াছে। কিন্তু আজ সাম্যের যুগ আসিয়াছে। কোটি কোটি নরনারী সাম্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল ভেদ-বৈষম্য বিলুপ্ত করিতে আজ কৃতসংকল্প।

---

*ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি" দ্রষ্টব্য।

তাই রক্ষণশীল ধর্ম্মের পোষক ও প্রচারকবর্গের সহিত প্রগতিবাদী ও বিপ্লবীদের বিরোধ অতি স্বাভাবিক ও সাংঘাতিক। সমাজ-বিপ্লবীরা মনে করে যে, ধর্ম্ম হইল শোষণমূলক পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। কাজেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া নূতন সমাজ সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে যাজকশ্রেণীর এবং ধর্ম্মতন্ত্রের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন।

"Spiritually an external and ceremonial religion is good for nothing ; materially it has failed to stop the stronger from exploiting his weaker brother ; psychologically it has developed traits which are anti-social and anti-scientific."*

কাজেই ধর্ম্মের নামে যে-সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমাজের ক্ষতি করিতেছে সেগুলি সমূলে ধ্বংস করা দরকার। দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবীদের আসল আক্রমণের লক্ষ্য ধর্ম্মের নামে প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্র এবং এই দিক দিয়া বিষয়টি অবলোকন করিলে মনে হয়, তাহাদের আক্রমণ সার্থক ও কল্যাণপ্রদ।

কিন্তু এই আক্রমণ যদি প্রকৃত ধর্ম্মের উপরেই আসিয়া পড়ে তবে তাহা হইবে মানুষের পক্ষে সর্ব্বনাশা। কারণ, যাজক-শ্রেণী-শাসিত ধর্ম্মতন্ত্রে যত অনাচার ও হীনতা, এবং কলুষ-কালিমা থাকুক না কেন, প্রকৃত ধর্ম্ম মানব-জীবনের গভীরতম আকুতি পূরণ করিবার পথ নির্দেশ করে। মানুষের জাগতিক দাবিগুলি চরমভাবে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, ইহাই তাহার জীবনের সবটুকু নয়। তাহার অন্তরের গভীরে আছে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, অসীমকে জানিবার ব্যাকুলতা ও সুদূরের পিপাসা। ইহাদিগকে অস্বীকার করিলে জীবনের একটা বড় অংশকেই অস্বীকার করা হইবে। উপস্থিত প্রয়োজনের মুহূর্তে হয়ত ইহাদের সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় না, তবুও জীবনের সামগ্রিক বিকাশে যাহারা আস্থাবান, তাহারা ঐ সব আধ্যাত্মিক আদর্শকে অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুনিচয়ের সঞ্চয় দ্বারা আর যাহাই হোক, ক্ষুধার্ত অন্তরের যে আকুলতা তাহার অবসান হয় না। মানুষের এই গভীরতম প্রয়োজনেই ধর্ম্মের মূল্য। হৃদয়ের এই মৌন আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন—তাহা-গলার নব্য দিয়াও ইহা অপরিবর্ত্তিত। কাজেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও চিরন্তন। রাধাকৃষ্ণন্ ঠিকই বলিয়াছেন,

"There is an insistent need in the human soul to come to terms with the unseen reality so long as man is man, hoping and aspiring and reflecting on the meaning of existence and the responsibilities it entails, there is no fear of the loss of religion. It is only a question of reformulation."—*Kalki*, p. 55.

প্রকৃত ধর্ম্ম ছাড়া মানুষ কেমন করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিবে? বস্তুনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান ও জগতের প্রত্যেকের সঙ্গে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই আত্মবিকাশ সম্ভব। এইজন্য অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ দেয় ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মহিমাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "মানুষের ধর্ম্ম" গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধর্ম্মই যথার্থ মানবধর্ম্ম।—যুগে যুগে ইহার ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিনেও এই মানব-ধর্ম্মের প্রয়োজন হইবে। ইহাকে বিসর্জ্জন দিয়া, সাময়িক প্রয়োজনের দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্য-সমাজ গঠন করিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে অভিশাপ হইয়াই থাকিবে। সমাজের পুনর্গঠন তো একটা বৃহত্তর আদর্শের জন্যই—জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই ইহার লক্ষ্য—সমাজের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক জীবনের ভিতর শৃঙ্খলা ও ঐক্যস্থাপন উপলক্ষ্য মাত্র। এই উপলক্ষ্য যদি লক্ষ্যকে ছাপাইয়া বড় হইয়া দেখা দেয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষে আর এক দুর্দ্দিনের লক্ষণ বলিয়া নিঃসংশয়ে বিবেচিত হইবে। সেখানে সম্পদের হয়তো প্রাচুর্য্য থাকিবে, কিন্তু মন থাকিবে উপবাসী ও আত্মার দীনতার পরিসীমা থাকিবে না। জীবন সেখানেও ছন্দহীন, অর্থহীন বলিয়াই মনে হইবে। ঐশ্বর্য্য থাকিবে, জ্ঞান থাকিবে, প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্বও থাকিবে, কিন্তু জীবনে থাকিবে না সৃষ্টিমূলক আনন্দের স্পর্শ। ভবিষ্যতের এই দুর্দ্দিন সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন যে খুব বেশী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

* S. Radhakrishnan : *An Idealist View of Life*, pp. 46-47.

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার

শ্রীগোপীনাথ সেন

ভারতবর্ষ যে সুপ্রাচীন দেশ ও ইহার পটভূমিকায় যে বিরাট ইতিহাস পড়িয়া আছে তাহা প্রত্নতত্ত্বের সমুদায় আবিষ্ক্রিয়া হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত যে সভ্য ছিল ও এইস্থানে এক মহাজাতির উন্নত ধরণের সভ্যতা ও কৃষ্টি বিদ্যমান ছিল তাহা ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্র জানেন। পৃথিবীর নিকটে আমাদের জাতীয় ইতিহাস কত মহান্ তাহা প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া হইতে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৭-২৮ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বর্ষপঞ্জীতে সিন্ধুদেশের মোহেন-জো-দারো এবং ঝুকুর, পঞ্জাবের হরপ্পা তক্ষশীলা, যুক্তপ্রদেশের সারনাথ, বিহারের বুদ্ধগয়া ও নালন্দা, বাংলার পাহাড়পুর এবং মাদ্রাজের নাগার্জ্জুন কোণ্ডা প্রভৃতি নামগুলি উল্লেখযোগ্য। এই স্থানগুলি আবিষ্কারের ফলে বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রকলা, বিভিন্ন শিল্পকলা, এবং স্থাপত্যের নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ইহা হইতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ছিল কেবল তাহাই প্রমাণিত হয় নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি ধরণের জীবন যাপন করিতেন তাহাও জানিতে পারা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কিছু কিছু জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে ঠিক প্রামাণ্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। উহাতে কেবল ইতিহাসের একটি ছক ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদের নিকট রামায়ণ ও মহাভারত কেবল ধর্ম্ম-গ্রন্থ মাত্র নয়—এগুলি হইতে তাহারা গবেষণারও প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে মেজর মকলার ও হারগ্রিভস মধ্যভারত ও বেলুচিস্থানের বহু স্থান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে অতীতে একদা ভারতের নবযুগের সূচনা হইয়াছিল তাহাদের আবিষ্কার হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯২৭ সালের নবেম্বর এবং ১৯২৮ সনের এপ্রিলের মধ্যে স্যার অরেল ষ্টেন কলাট ষ্টেটের সারওয়ান, ঝালাওয়ান, খারান এবং মকরান এই প্রদেশগুলিতে বিবিধ আবিষ্কার করেন।

স্যার জন মার্শালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সিরি ও তক্ষশীলা এই দুইটি স্থানে পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন। তাঁহারা যখন ধর্ম্মরাজিকায় বাস করিতেন তখন শ্বেত হুনদের আক্রমণে তাহাদিগকে সেই প্রদেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল। সিরিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানে বুদ্ধের একটি বৃহৎ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপ ও বৌদ্ধ মঠ দেখিলে কুশান যুগেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। এই সকল বৌদ্ধমঠে রান্নাঘর ছিল না। তক্ষশীলায় যে সকল ধূসর বর্ণের পাথরে তৈরী প্রাচীন মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা গান্ধার যুগের বলিয়া মনে হয়।

সিক্‌রিপে এখনও যদি খননকার্য্য করা হয় তাহা হইলে ছয় কিংবা সাততলাবিশিষ্ট প্রাচীন অট্টালিকা পাওয়া যাইতে পারে। হাবিয়াল, ভির, মণ্ড এবং কোসাম এই সকল স্থানে বহু বিচিত্র পাথরের বাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও বহু অনাবিষ্কৃত মূর্ত্তি, তৈজসপত্র এবং বহু অট্টালিকা সেই সব স্থানে আছে। ১৯২৭-২৮ সনে মিঃ ম্যাকে মোহেন-জো দারো খনন করিয়াছিলেন। এই খননকার্য্যের ফলে বহু বাড়ী আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। বাড়ীগুলিতে সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়া উঠিলে সারি সারি ঘর, ঘরগুলির পরে সারি সারি স্নানের ঘর ও পায়খানা। প্রত্যেক ঘরে ছোট ছোট দরজা এবং দরজাগুলিতে খুব মোটা মোটা বাজু। বাহির হইতে ঘরের অভ্যন্তরভাগ দেখা খুব কঠিন। মোহেন-জো-দারোর ইটের গাঁজা দেখিতে খুব সুন্দর। এই গাঁজায় ইট পুড়াইবার জন্য কাঠের আগুন ব্যবহার হইত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে মোহেন-জো-দারো আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীর নিকট ভারতের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তৎপরে ননীগোপাল মজুমদার প্রমুখ অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় মোহেন-জো-দারো হইতে ষোল মাইল দূরে ঝুকর আবিষ্কৃত হয়। এই সকল আবিষ্কার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি যুগের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ আবিষ্কার গুপ্তযুগের বলিয়া মনে হয়।

মিঃ মাধো স্বরূপ ভাটও হরপ্পা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্থানের দশ ও এগার ফুট নীচে হইতে নরকঙ্কাল ও সুন্দর সুন্দর জিনিষপত্র বাহির হইয়াছে। এই সভ্যতাকে মানুষের প্রথম স্তরের (Chalcolithic) সভ্যতা বলা যায়। তাহারা মূর্ত্তি পূজা করিত। তাহাদের বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিবিধ পূজার দ্রব্যসম্ভার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১৯২৮ সনে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় সারনাথ আবিষ্কার করেন। সেইস্থান হইতে যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রথম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। তন্মধ্যে একটি হুভিস্কের ও অন্যান্য চৌকা মুদ্রাগুলিকে সুঙ্গ যুগের বলিয়া ধারণা হয়। অন্যান্য পুরানো জিনিষের মধ্যে পোড়ামাটির তৈরি স্ত্রীলোকের মাথা ও মৌর্য্যযুগের ধরণের চিত্রকলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ পেজ নালন্দা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ঐ স্থানে দেবপাল

যুগের একই স্তরের প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্র প্রভৃতি বাহির হইয়াছে। ভারতের দুইটি শিল্প-কেন্দ্র অজন্তা এবং ইলোরা সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে গর্ব্বের বস্তু হইয়া আছে। পর্ব্বতগাত্রে এত উচ্চাদের শিল্পকলার নিদর্শন আর কোন জাতি রাখিয়া যায় নাই। মিঃ দীক্ষিতের পাহাড়পুর আবিষ্কারে বাংলার ভাস্কর্য্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলার ভাস্কর্য্য-শিল্পীদের সাধনা, তাঁহাদের সুনিপুণ হস্তের পরিচয় আমরা এই সকল মূর্ত্তিতে পাই। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত চুণকাম-করা মনুষ্য মূর্ত্তি, পোড়া মাটির উপরে বিচিত্রিত মনুষ্যের মূর্ত্তি এবং জীবজন্তুর প্রতিমূর্ত্তি, ইহা ছাড়া থালা বাটি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনের দেশে শত দেবতার মন্দির ছিল। মাদ্রাজে নাগার্জ্জুন কুণ্ডের বড় বড় বৌদ্ধ মন্দির প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় এই স্থানে বৌদ্ধ সাধুদের বাস ছিল। বহু খোদিত লিপি হইতে এই সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। নাগার্জ্জুনকুণ্ডায় বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা বৌদ্ধ জগতের যথা ব্রহ্মদেশ, জাপান, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের নিকট তীর্থস্থান হইয়া আছে। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীতে নাগার্জ্জুনকুণ্ডা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

ভারতের প্রতিটি প্রদেশ গৌরবোজ্জ্বল অতীতের নানা স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। আরও কত মনোরম হর্ম্য-মালার ধ্বংসাবশেষ, চিত্রকলা প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মাটির নীচে চাপা পড়িয়া আছে তাহা বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথাও প্রত্যেক ইতিহাসের ছাত্রকে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। সাধারণ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন ইতিহাস, মুদ্রা, শিলালিপি, মূর্ত্তি ইত্যাদি হইতে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যাদি অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যে সকল নিদর্শনচিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই বা যাহা এখনও কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না তাহা কিরূপে অনুসন্ধান করা যাইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, প্রচলিত কাহিনী ও লোক-প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত। কৃষককূল মাঠে আবাদ করিতে করিতে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু নিদর্শন পায় কিন্তু সেগুলিকে তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক এ. ঈ. মাহন এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"The experiences of Archœological Missions prove nevertheless that the information obtained from people living on the sites themselves is the most valuable. Primitive people and peasants are generally excellent observers. While hunting, ploughing, digging pits, they notice many details, they have made accidental discoveries or secret

excavations. The secrets of the discoveries are handed down from father to son in certain families.

The questioning of mayors and peasants is a very delicate matter, requiring tact and experience. It is essential to go slowly and to use all one's ingenuity in order to obtain their confidence. When met by an evasive answer, do not be persistent, talk of something else, and then return to the question. Specialists in Folklore have for a long time used the best methods of making local enquiries; in fact it is their principal source of information. The questions when one puts to peasants, says one of them, ought to be of a kind not only not to induce psychical opposition, but also not to suggest an answer which would be false or indirect. Peasants often feel a kind of shyness with regard to people who belong to another social state and who they feel are better educated. They believe that when they are questioned on their manners and customs one wishes to ridicule them. Sometimes they show very little interest."

গবর্ণমেণ্ট যে সকল খননকার্য্য করেন তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক স্থানের সঙ্গে যে সকল কাহিনী জড়ানো আছে তাহা সেই স্থানের লোকদের মুখে শুনিলে অনেক কথা জানা যায়। অনুসন্ধিৎসুরা যদি উদ্যোগী হইয়া স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে বহু তথ্য জানিতে পারিবেন। গ্রাম্য ব্যক্তিরা নিজেদের বংশের এবং গ্রামের কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং যদি একবার মুখ খুলিয়া যায় তাহা হইলে অনর্গল বহু খবর বলিতে থাকেন।

পুস্তক-পরিচয়

রুশো—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, এ। পূর্ব্বাশা লিমিটেড কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭৯। মূল্য ১৶৹।

ফরাসী দার্শনিক জীন্ জ্যাকস্ রুশো ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার জীবন-কথা "কনফেশনস্" নামক গ্রন্থ হইতে কতক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। নৈতিক আদর্শ প্রচারই তাঁহার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়ন দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার শাণিত বুদ্ধি ও সাহিত্যিক এবং দার্শনিক প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'এ্যামিলিভেল এডুকেশন' প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত পুস্তক "লা কনট্রাক্ট সোস্যাল।" ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম জন্মদাতা হিসাবে রুশো স্মরণীয় হইয়া আছেন। এই বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁহার সাহিত্য, বিশেষভাবে তাঁহার 'লা কনট্রাক্ট সোস্যাল' নামক গ্রন্থ মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। লেখক পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর ও সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিক ও ইংরেজ এবং অন্যান্য চিন্তা-নায়কগণের সহিত রুশোর তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটলের চিন্তাধারা রুশোর মতবাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাও সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ দর্শন ও রাজনীতির অনুরাগী পাঠকমহলে আদর পাইবে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র—এঙ্গেল্‌স্। অনুবাদক—ডাঃ বিনয়কুমার সরকার। এন, এম, রায় চৌধুরী কোং লিঃ, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৫। মূল্য ৪৲।

কার্ল মার্কসের সহকর্মী ও শিষ্য ফ্রিড্‌রিশ এঙ্গেলস্ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে "পরিবার, নিজস্ব এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ উহারই অনুবাদ। এঙ্গেল্‌সের মতবাদকে মার্কস হইতে পৃথক করা যায় না। এঙ্গেল্‌স নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই পুস্তকের অনেক কথাই তাঁহার গুরু মার্কসের। মর্গ্যান চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান সমাজে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার নৃতত্ত্ব সম্পর্কীয় মূল্যবান আবিষ্কারগুলি এঙ্গেল্‌স্ 'ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা' দ্বারা এই গ্রন্থে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিবার বা বিবাহপদ্ধতি ও যৌন সম্বন্ধের ইতিহাস, গোষ্ঠীপ্রথায় সমাজ-শাসন, গোষ্ঠীর ভাঙ্গন ও রাষ্ট্রের জন্ম প্রভৃতি বিষয় আদিম ও তথাকথিত বর্ব্বর-মানবের বিভিন্ন সমাজের আলোচনা দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। অবশ্য এই আলোচনা-পদ্ধতি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাসম্মত।

কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বর্ত্তমান গ্রন্থ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ। এই কালের মধ্যে মার্কসীয় সাহিত্য বাংলাদেশে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আশা করি এই গ্রন্থ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইয়া পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করিবে।

মন্ত্রী-মিশন ও পরবর্ত্তী অধ্যায়—শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। চৌধুরী ব্রাদার্স, ৬০।১'এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৫৩। মূল্য দুই টাকা।

১৯৪৬ সনের ২৩শে মার্চ্চ মন্ত্রী-মিশন ভারতবর্ষে পৌঁছেন। মিশন সকল রাজনৈতিকদলের সহিত, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সহিত ভারত-শাসনসমস্যা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন মীমাংসা না হওয়ায় ১৯৪৬ সনের ১৬ই মে মন্ত্রী-মিশন ও বড়লাট এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া সকল দলের, বিশেষতঃ কংগ্রেস ও লীগের আবার আলোচনা সুরু হয়। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত গুরুতর যে মিলিবার সম্ভাবনা আদৌ তখন দেখা যায় নাই। তবুও বড়লাটের চেষ্টায় কেন্দ্রে অন্তর্বর্ত্তী-কালীন গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ও অন্তর্বর্ত্তী সরকারে প্রবেশ আরও পরে হয়। গণপরিষদের সভ্য নির্ব্বাচন, লীগের গণপরিষদ বর্জ্জন আরও পরেকার ঘটনা। এই পুস্তকে গণপরিষদ গঠন পর্য্যন্ত বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আশা করি এই তথ্যবহুল পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং তাহাতে গণপরিষদ গঠনের পরবর্ত্তী, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাগুলি স্থান পাইবে।

এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

জঁ। ভালজঁ।—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩৲।

ভিক্টর হুগোর অমর উপন্যাস 'লে মিজারেবল্‌স'-এর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। অনুবাদের ভাষাটি বেশ ঝরঝরে—কিশোরদের উপযোগী। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদকালে অনেকে ঘটনার স্থান ও পাত্রপাত্রীর নামগুলিকে দেশী পোশাক পরাইয়া ঘরোয়া বলিয়া চালাইবার প্রয়াস পান। তাঁহারা ভুলিয়া যান—গল্পের ধারা অনুসরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বহুদূরের অপরিচিত দেশ, সমাজ, ব্যক্তি ও তাহাদের রীতিনীতি জানিবার কৌতূহল কিশোর-মনে প্রবল হইয়া উঠে। প্রশংসার বিষয় লেখক এরূপ চেষ্টা করেন নাই। উপরন্তু এই বিরাট উপন্যাসের প্রায় সমস্ত চরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সমসাময়িক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত-সার আখ্যায়িকার সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছেন। অনুবাদটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবনচিত্র—শ্রীঅপরাজিতা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

এটিকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া দিনানুদিন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড ঘটনার সমাবেশ করা হইয়াছে। চিত্রগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইলেও কতকগুলিকে সুচিত্রিত বলা যায়। পুস্তকের কলেবর অযথা দীর্ঘ করা হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থকার, পোঃ—গড়িয়া, ২৪পরগণা। মূল্য দু' টাকা চার আনা।

জাপান, চীন, ব্রহ্মদেশ, বহির্ভারতীয় হিন্দু মুসলমান ও ইউরোপের নারী ও সমাজ সম্বন্ধে বহু তথ্য গ্রন্থখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। বর্ত্তমান (দ্বিতীয়) সংস্করণে পুস্তকখানি অধিকতর সমাদৃত হইবে বলিয়া মনে হয়।

বন্দেমাতরম—শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেন ব্রাদার্স ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম ৩।০।

কবি নবেন্দু স্বার্থত্যাগী আদর্শবাদী পুরুষ। নিজের যথাসর্ব্বস্ব সে পরম সুহৃদ নির্ম্মলের হাতে তুলিয়া দিল, যার ফলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পিত আনন্দমঠের বাস্তব রূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তুটি ছাপাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কবি নবেন্দুর প্রতি তরুলতার প্রেমই বড় হইয়' উঠিয়াছে। উপন্যাসখানি বড় বেশী বক্তৃতাভারাক্রান্ত এবং ভাবোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। চরণ গোঁসাই এবং বলাই এ দুটি চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে; কিন্তু কবিজননী হরিলক্ষ্মীর চরিত্র মাঝে ম'ঝে অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। উপসংহারে নবেন্দুর স্ত্রী কমলের আকস্মিক মৃত্যু নবেন্দুর অনশনে মৃত্যুবরণ, সেই মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীজির বক্তৃতা, হরিলক্ষ্মীর ভুলভাঙ্গা ইত্যাদি সব কিছুতে মিলিয়া একটি অতি-নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে। লেখকের এইদিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল। ছাপায় বহু ভুল আছে। প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পাথেয়—সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীবিমল বসু। কথা সাহিত্য মন্দির। ১৬-এ ডক স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থখানি হাতে লইয়াই ইহার প্রচ্ছদ-সজ্জা এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থারম্ভে কথাসাহিত্য-মন্দিরের পরিচালিকা শ্রীঅঞ্জলি সরকারের 'নিবেদন'টি বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সজনীকান্ত দাস, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, দিলীপকুমার রায়, বাণী রায় প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের রচনা-সম্ভারে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। আধুনিকতম সাহিত্যসেবীরাও বাদ পড়েন নাই। রচনা নির্ব্বাচনে 'পাথেয়'র সম্পাদকদ্বয় উন্নত রুচি এবং সুপরিণত রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। শুধু একটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে। পুস্তকের গোড়ার দিকে 'সম্পাদনা করেছেন অমুক', 'প্রকাশ করেছেন অমুক' ইত্যাদি সিনেমাগন্ধী পরিচয়পত্র না দিলেই ভাল হইত। সম্পাদকগণের মনে রাখা উচিত, চলচ্চিত্রে যে ধরণের চটকদার বিজ্ঞাপন জনচিত্তকে মুগ্ধ করে সাহিত্যে তাহা অচল; ইহাতে সাহিত্যের আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়।

সগরল—শ্রীসত্যভূষণ চৌধুরী। মডার্ণ বুক ডিপো। জিন্দাবাজার—শ্রীহট্ট। দাম আড়াই টাকা।

গল্পের বই। সবশুদ্ধ বারটি গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানিতে বানান ভুলের এত ছড়াছড়ি যে বিদ্যালয়ের

গ্রন্থকর্তাগণ ইহা হইতে বাংলা প্রশ্নপত্রের অশুদ্ধি সংশোধনের অংশ প্রস্তুতিতে বেশ সাহায্য পাইবেন। বানান ভুলের পালা সুরু হইয়াছে ভূমিকা হইতেই। তাহাতে 'সত্বাধিকারী' এই অদ্ভুত বানানযুক্ত শব্দটি ছুইবার আছে। নীচে বর্ণাশুদ্ধির একটি ফিরিস্তি দিতেছি: সাতভুত, মুখস্ত, আধুনিকি, ত্র্যস্ত্য, উপরানো, সাক্ষাত, হলজীবি, জীবনব্যাপি, নিরব্দ্ধ, কাটাতেছে, মুক, মুহুর্ত্ত, উর্দ্ধমুখী। লেখক যে বর্ণশুদ্ধজ্ঞানবর্জ্জিত তাহার কতকগুলি উদাহরণ—বারুণী, আগুণ, দক্ষিন, কর্ষন, প্রান প্রনাম। সব চেয়ে বেশী কেরামতি দেখাইয়াছেন তিনি শব্দপ্রয়োগে, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ও বাক্য রচনায়। যেমন: দুধের ফেনা 'ছুটিয়া' ছিটকাইয়া পড়ে, মিঠাইয়া উঠে (সম্ভবত—মিঠা হইয়া: ইহা পঞ্চানন্দের 'বটাইয়া দিব যত পাষণ্ড বর্ব্বরে' এই বিখ্যাত ছত্রটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়)। মাণিকের মার-এ (কাশী শব্দ নয়—মারে)। কাজের ধার মাড়ায় না, অতি সুন্দর দু ফাঁক কোমল সেকেলে চিবুকটি (টিং টিং ছট) রাজহাঁসের ডাক উধাও হইয়া চলে, বিশৃঙ্খল (সম্ভবতঃ উচ্ছৃংখল) স্বামী, মেয়েটির দিকে আমার পক্ষপাত হয়ে পড়ল··· ইত্যাদি। ত্রুটিগুলি একটু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে দু'একটি গল্প (তন্মধ্যে 'সগরল' গল্পটিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য) পড়িয়া লেখকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রীতিমত বর্ণ-পরিচয় লাভ না করিয়া এবং বাংলা ভাষার রচনারীতি ও শব্দপ্রয়োগ-কৌশলাদি আয়ত্ত না করিয়াই গ্রন্থকার-পরিচিতি লাভ করিবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া দুঃখ হয়। লেখককে আরও দুইটি কথা মনে রাখিতে বলি। প্রথমতঃ, অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা করিলেই রোমাণ্টিক গল্প রসোত্তীর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ ইতর প্রাণীদের লইয়া গল্প লেখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' আর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাসিমের মুরগী' ছাড়া ইতর প্রাণীদের লইয়া লেখা সার্থক গল্প বাংলাসাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ।

ত্রিবেণী—শ্রীসুশীল রায়। এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১ সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

চারিটি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত এই উপন্যাসখানির আঙ্গিকে নূতনত্ব আছে। প্রথম অধ্যায়ে আমরা করতোয়া আর কাবেরী এই দুই বোনের দেখা পাই। রাত্রির অন্ধকারে বড় বোন করতোয়া ঘর ছাড়িয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, আর ঘটনাচক্রে ছোট বোন কাবেরীকে পরিণীতা হইতে হইল দিদির পূর্ব্বপ্রণয়ী দুর্জ্জয়ের সহিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি, বৈমানিক দিলীপের সহিত সাহিত্যিক শকুন্তলার প্রণয়লীলার বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যরসিক অপূর্ব্বর সঙ্গে তাহার অপ্রত্যাশিত পরিচয়, উভয়ের পরিণয়ের মধ্যে যাহার পরিণতি। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক আসরে আনিয়াছেন দুর্জ্জয়ের বোন, রোগশয্যাশায়িনী দাঃজ্জলিঙের লতাকে। চিকিৎসক উৎপলের সংস্রবে আসিয়া লতা হইতে চাহিল শাখাপ্রশাখী, শেষে যে উৎপল একদা ছিল শকুন্তলার প্রতি আসক্ত সে লতার সহিত আবদ্ধ হইল পরিণয়সূত্রে। চতুর্থ অধ্যায়ে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি করিয়া লেখক উপন্যাসের সবগুলি পাত্রপাত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য সিনেমার প্রেক্ষাগৃহে আনিয়া একত্রে মিলাইয়াছেন। সেখানে নিরুদ্দিষ্টা কাবেরীর

নূতন পরিচয় আমরা লাভ করি ছায়ানটী কৃষ্ণারূপে। উপন্যাসের চারিটি অধ্যায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অথচ ইহাদিগকে একটি অদৃশ্য অথচ অতি সূক্ষ্ম যোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া লেখক বিশেষ শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। একান্ত বাঞ্ছিতকে না পাওয়ার বেদনাই হইল এই উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের মর্ম্ম-কথা। জীবনের সহিত আপোষ করিয়া ইহারা ঘর-সংসার করিতেছে বটে, কিন্তু—

'We pine for what is naught.
Our sincerest laughter with some pain is fraught.'

এই কথাই ইহাদের অসতর্ক মুহূর্ত্তের আচরণ ও উক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অল্প কথায় এবং ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় পাত্রপাত্রীদের অন্তর্গূঢ় মৌন বেদনার প্রকাশে লেখক বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান এবং ভাষার ইঙ্গিতময়তার পরিচয় পাই, যেখানে তিনি বলিতেছেন, "ঠিক সেই সময় এখান থেকে বহুদূরে হোটেলে ত্রিতলে বসে শকুন্তলা অপূর্ব্বর চিঠিটি হাতে চেপে ধরে মনে মনে দিলীপের (তার প্রথম প্রণয়ী) কাছে ক্ষমা চাইছে।"

লেখকের মাত্রাজ্ঞান বহুস্থানে, বিশেষতঃ উপসংহারে উপন্যাসটিকে অপঘাতের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

শ্রীশ্রীশনি পূজা ও কথা—ভক্তিতীর্থ শ্রীউমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। ১৬ পৃঃ। মূল্য দশ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তিকায় মৎস্যপুরাণীয় নবগ্রহ বর্ণনা, শ্রীশ্রীশনির ধ্যান, পূজামন্ত্র, প্রণাম, নবগ্রহ স্তব, শনিদেবের স্বতন্ত্র স্তবসহ সুললিত পয়ার ছন্দে পাঁচালী কথা স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর পক্ষে এ পুস্তিকা খুবই প্রয়োজনীয়।

চ.

যজ্ঞোপবীত—শ্রীগৌরমোহন দেববর্ম্মণ বিদ্যাভূষণ প্রাপ্তিস্থান—১১৩ নং মনোহর দাস চক, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা মাত্র।

বেদ তথা শ্রুতিস্মৃতিশাসিত আর্য বা হিন্দু জাতির পবিত্র জাতীয় চিহ্ন শিখাসূত্র। নবগুণ বা তন্তুযুক্ত সূত্রের ত্রিবেষ্টনীকে পরিমিত আকারে গ্রথিত করিয়া মন্ত্রোক্তিতে পরিশোধন করিয়া লইলেই আর্যগৌরবের মহাপবিত্র চিহ্ন যজ্ঞোপবীত হয়। সর্বব্যাপী পরমাত্মার বা সর্বজীবের মিলনক্ষেত্রের নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের সমীপে পৌঁছার জন্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ সাধনের যোগ্যতা লাভ হয় যে সূত্রচিহ্ন ধারণে—তাহাই যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র, পবিত্রসূত্র বা পৈতা। আলোচ্য গ্রন্থে, গ্রন্থকার, যজ্ঞ ও যজমান পৈতা ও পুরোহিত, পৈতার কালাকাল নিরূপণ, মনুষ্যত্বলাভের প্রথম সোপান উপবীতকে স্মরণ রাখিতে হইবে, পৈতার সহিত ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই কয়টি অধ্যায়ে বিস্তারিত গবেষণা করিয়াছেন। জাতির সঙ্কটময় ভেদবহুল অবস্থায় ঐক্যসাধনের সহায়করূপে বেদানুগ নরনারী মাত্রকেই

অধিকারী নির্বিশেষে সকলের ধারণে উৎসাহদান শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে করা হইয়াছে। কি রাজনীতি কি ধর্মনীতি কোন বিষয়েই মানব কখনও একমতাবলম্বী নহে। বর্তমানে আমাদের কল্যাণের পথ খুঁজিবার সময় উপস্থিত। এ সময়ে প্রাচীন বেদোজ্জ্বলা আর্য-সংস্কৃতির বিস্তৃত সম্যক্‌ আলোচনা হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ক আলোচনায় এ গ্রন্থ অনেকখানি সাহায্য করিবে নিঃসন্দেহ।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলন

নয়া দিল্লীতে সম্প্রতি নিখিল-ভারত সাহিত্য-সম্মেলন নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। ভারতের যাবতীয় সাহিত্য ও ভাষার প্রতিনিধিরা যাহাতে পরস্পরের সহিত ভাব-বিনিময় ও সাহিত্যধারার আদান-প্রদান করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ই সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীর 'কনষ্টিটিউশন হলে' (বিধান পরিষদ গৃহে) হইবে। এজন্য সম্মেলন সকল প্রদেশেই আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছেন। সম্মেলনের কার্য্যকরী সমিতিতে বাংলাসাহিত্যের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ঠিকানা না জানায় কোন কোন বাঙালী সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো সম্ভব হয় নাই। শ্রীযুক্ত দাশ তাঁহাদিগকে এবং সম্মেলনে যোগদানেচ্ছু অন্যান্য সাহিত্যানুরাগীদের ১ নং ওল্ড মিল রোড, নয়া দিল্লী—এই ঠিকানায় তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন।

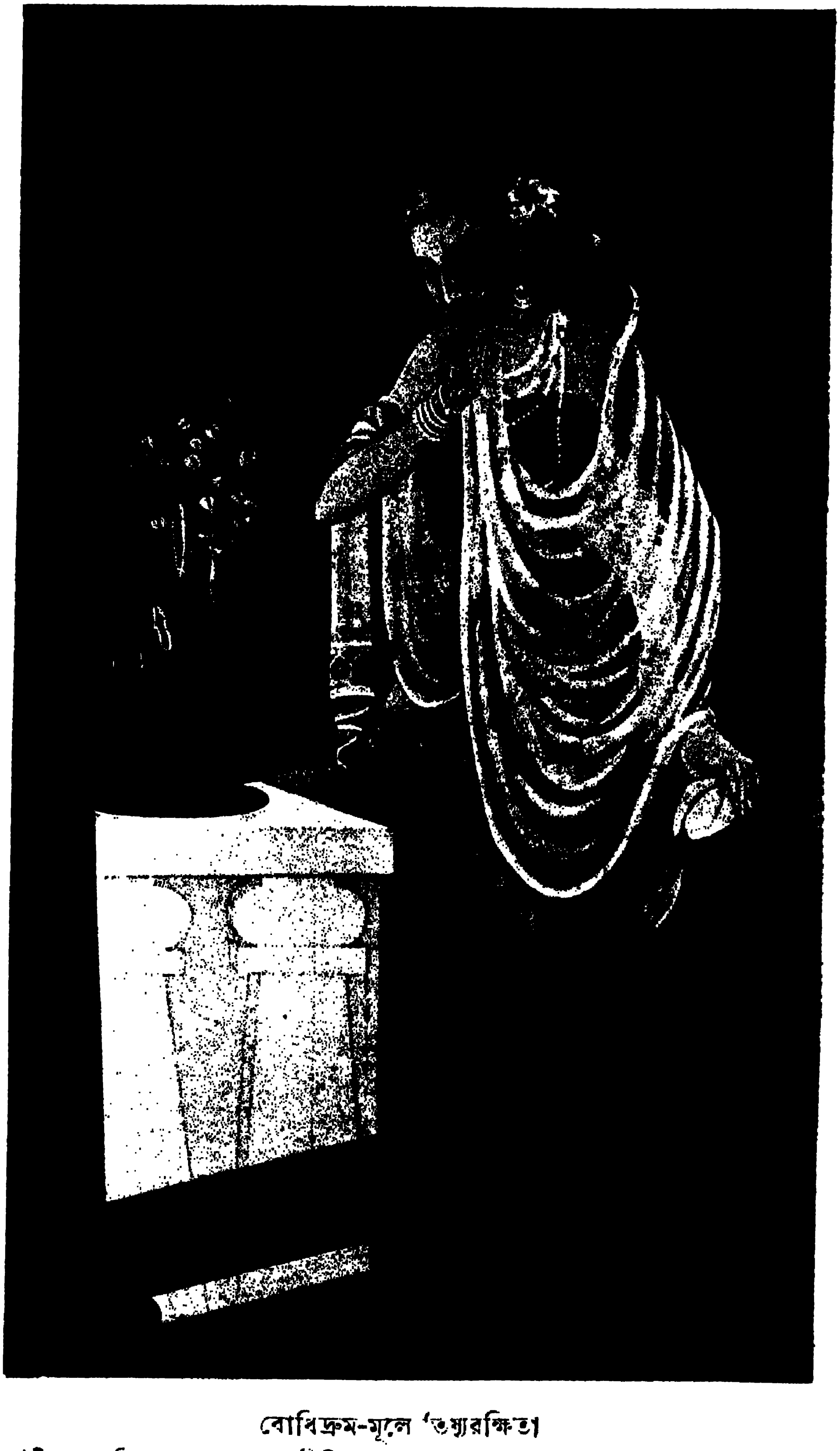
আশা করা যায়, সাহিত্যের জন্য বাঙালী যে সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহার যোগ্য মর্য্যাদা এই সম্মেলনে নিশ্চয়ই সে পাইবে।

সুশীলাবালা বসু

বিগত ৫ই আষাঢ় সুশীলাবালা বসু পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১২৮৮ সালে বৈশাখ মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মিত্র ইন্‌স্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিশ্বেশ্বর মিত্র ইঁহার পিতা ছিলেন। ১২৯৮ সালে উক্ত জেলার অন্তর্গত বাগ আঁচড়া গ্রামনিবাসী বিখ্যাত বসু-বংশে স্বর্গীয় কেদারনাথ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি পল্লীগ্রামেই বাস করিতে থাকেন এবং ক্রমে পল্লী-উন্নয়নকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পল্লীবাসীরা তাঁহাদ্বারা নানাভাবে উপকৃত হইত। সুশীলাবালা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান তীর্থস্থান পরিক্রমা করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ সালে ইঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। তদবধি তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ই ভগবদারাধনায় ও ধর্ম্মালোচনায় রত থাকিতেন। উপর্য্যুপরি কতকগুলি দুর্ঘটনায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়ে।

এই অবস্থায়ও তাঁহার পরোপকারপ্রবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বকাল পর্য্যন্তও তিনি গ্রামবাসীদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



বোধিদ্রুম-মূলে 'তিষ্যরক্ষিতা

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।



মিশরের 'দেয়ার এল বাহারী'—হাতাশুর মন্দির



মিশরের চিওপস অঞ্চলের বিরাট পিরামিড

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৫৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার সমস্যা

পশ্চিম বাংলার সম্মুখে যে সকল জটিল সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে সে সকলের সংখ্যা অনেক এবং গুরুত্বও ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা অন্ন-বস্ত্রের, তাহার পর ক্রমে শিক্ষা, আত্মরক্ষা ও জাতি সংগঠনের। তাহার পর ছোট বড় অশেষ প্রকারের দৈব-ব্যাধির প্রশ্ন সমাধানের কথা তো আছেই, উপরন্ত আছে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যা-লঘিষ্ঠদিগের জীবনসমস্যা। বর্ত্তমান ভারতের যে পরিস্থিতি তাহার মধ্য দিয়া দেশকে সবল ও জাগ্রত করিয়া তোলা যে কি নিরতিশয় কঠিন ব্যাপার তাহা বোধ হয় জনসাধারণের ধারণার অতীত। উপরন্ত ঐরূপ জটিল মরণ-বাঁচনের সমস্যার জালে যদি দেশের লোক ক্রমেই জড়াইয়া পড়ে তবে পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হইবে সে কথা ভাবে কয় জনে? দিন-গত পাপক্ষয় ও ফাঁকি দিয়া কার্য্যোদ্ধার ইহাই হইয়া উঠিয়াছে অভাগা বাংলাদেশের চলতি প্রথা। দেশজোড়া চোরাকারবার, ফাঁকি-জুয়াচুরি, তাহার উপর আছে শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ও চাষী বিক্ষোভ এবং আছে নানা প্রকার প্রতি-ক্রিয়াশীল মতবাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য প্রচার। দেশের যখন এই-রূপ অবস্থা, যাহার সংশোধন প্রায় শিবের অসাধ্য, সেই সময় যদি দেশ শাসন ও পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তাঁহারা দলাদলি, ভোট জুগতি এবং ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত থাকেন তবে বাংলার ও বাঙালীর দুর্দশার সীমা থাকিবে কি? ভিন্ন প্রদেশে বাঙালীর স্থান এখন অতি নিম্নে, বাঙালী বিদ্রূপের পাত্র, অবজ্ঞার বস্তু। বাংলাদেশের ভিতরে কাজ-কারবার প্রায় সবই বিদেশীর হাতে, মসীজীবী ও বুদ্ধিজীবী বাঙালী কোন প্রকারে, পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া, বাঁচিয়া আছে মাত্র। আর কিছুদিন পরে যখন সম্বিৎ-হীন অবস্থায় সন্তান-সন্ততির হাত ধরিয়া সে পথে দাঁড়াইবে তখন তাহাকে সাহায্য করিবে কে? দেশের কর্ণধারের আসন যাঁহারা দখল করিয়াছেন তাঁহারা বিপদ ঘনীভূত হই-তেছে দেখিবামাত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা তাঁহারা আজ বিশ বৎসরকাল এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবল তর্কের মুখে, জাতি-বিপ্লবের মুখে, দাঙ্গাহাঙ্গামায়, বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় প্রায় সকল লোকেই স্থান ত্যাগ করিয়া চাণক্যনীতির অনুসরণই করিয়া আসিয়াছেন, দুই-এক জন যাঁহারা সে পথ গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের কেহই আজ বাংলার শাসনযন্ত্রের অধিকারী নহেন। অথচ কংগ্রেসের নীতি কখনও এ পথ লইতে বলে নাই এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতৃবর্গ দুর্গম পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করিয়া চলাই শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছেন, যাহার ফলে সে সকল প্রদেশ নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রগতির পথে চলি-য়াছে। আমাদের দেশেই প্রকৃত নেতার অভাবে দেশের লোক বিভ্রান্ত ও প্রাদেশিক কংগ্রেস আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে।

দেশবন্ধু দাশ বিদেশী পার্টি সিষ্টেমের প্রথা এদেশের কংগ্রেসে প্রবর্ত্তন করেন। উহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করে যে সময়ে সেই সময়েই তাঁহার নানা উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে অকালমৃত্যু ঘটে, সুতরাং তিনি তাহা সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পর একে একে অনেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের গদীতে সমাসীন হইয়াছেন বটে, কিন্তু কাহারও ক্ষমতা হয় নাই—অথবা ভরসা বা ইচ্ছা হয় নাই—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে দুর্নীতিমুক্ত করিতে। ইহার ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিকারগ্রস্ত হয়। এই বিকারের ফলে পশ্চিমবঙ্গই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা ঐ ফাঁকে ফন্দি-বাজ "নেতা"র দল পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগের কংগ্রেসের প্রতি ঔদাসীন্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি এক লক্ষ মুসলমানের "মনোনীত প্রতিনিধি" স্বরূপে নিজেদের এক একজন অনুচর আনিয়া সমগ্র কংগ্রেস কমিটিতে ভোটাধিক্য লাভ করেন। এই ভোটাধিক্যের জোরে তাঁহারা সারা বাংলাদেশে, বিশেষত পশ্চিম বঙ্গে, কোন যোগ্য বা শক্তিশালী লোককে কোন প্রকার মনোনয়ন দান করেন নাই পাছে তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বসেন। এইরূপ ব্যবহার পরিণামস্বরূপ আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে যোগ্য লোকের একান্ত অভাব। সেইজন্যই আমরা গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম যে ঐ গণ্ডীর মধ্যে যোগ্য মন্ত্রীর খোঁজ করা পণ্ডশ্রম।

যাহা হউক, আক্ষেপ করিবার সময় আর নাই, আমাদের এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমাদের উদ্ধারের পথ কোন্ দিকে। দেশের চালকতার যাঁহারা নিজেদের হাতে লইয়াছেন তাঁহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের বুঝিতে হইবে দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে, প্রগতির না অধোগতির। একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের হাতে সময় অতি

অল্প, যে কোন মুহূর্তে দেশের উপর প্রচণ্ড বিপদের প্লাবন আসিতে পারে। সেরূপ অবস্থায় নেতৃত্বের অভাবে দেশের অবস্থা ও তাহার ব্যবস্থা কি হইতে পারে তাহার চিন্তা আমাদের এখনই করিতে হইবে। ইহা আমাদের বুঝা দরকার যে আমরা একান্তই বন্ধুহীন ও সহায়হীন হইয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি।

প্রতিকার কোন্ পথে

বাংলা ও বাঙালী যে আজ কেবলমাত্র "গতগৌরব হৃত-আসন নতমস্তক লাজে" তাহাই নহে, হৃতসর্ব্বস্ব ও সম্বিৎহীন হওয়ার পথেও বেশ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গ ব্রিটিশ কুশাসন ও দমননীতির ত্রিশ বৎসরের পর লীগ দলের লুণ্ঠন, অনাচার ও সাংস্কৃতায়ের বিষে আরও দশ বৎসর কাল জর্জ্জরিত হইয়াছে, যাহার ফলে এই স্বর্ণপ্রসূ অঞ্চল এখন দারিদ্র্য ও দৈন্যজনিত ব্যাধিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে। এই কষিষ্ণু ও মুমূর্ষুপ্রায় খণ্ডিত প্রদেশের সর্ব্বরোগের আশু উপশম অত্যাবশ্যক, এ কথা যে কাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই তাহা তো হইতে পারে না, কিন্তু প্রতিকারের চিন্তা কে করিতেছে, কি উপায়ে তাহা সম্ভব, সে কথা কোথাও তো শুনিতেছি না। দেশে কর্ম্মঠ ও বুদ্ধি বিবেচনাশালী অভিজ্ঞ লোকের অভাব এখনও হয় নাই ইহা সত্য, কিন্তু সে সকল লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পিত না হইলে তাঁহাদের বুদ্ধি-শক্তি ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিবে কি করিয়া? ঝড়ের আশঙ্কায় যাঁহারা পূর্ব্বাকাশের দিকে, কম্পিত বক্ষে ও ম্লানমুখে, তাকাইয়া দিন কাটাইতেছেন তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়াছেন যে যদি ঝড় সত্যই আসে তবে বন্যাপ্রপীড়িত দুঃস্থদের আশ্রয়, উদ্ধার ও সাহায্যের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায়ে কতটুকু হইতে পারে? এ কথা তো ধ্রুব সত্য যে ঝড় আসিয়া পড়িলে তখন লম্ফপ্রদান করিয়া দিল্লীর হুজুরদিগের সম্মুখে গিয়া গরুড়ের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে বসিয়া অভাব-অভিযোগ আবেদন-নিবেদন করিবার সময়ও থাকিবে না, এবং সময় যদিই বা কিছু থাকে তাহাতে কিছুমাত্রও ফল হইবে না, কেননা, হুজুরেরাও এতদিন সময় কাটাইয়াছেন অকাজে ও দীর্ঘসূত্রিতায়, সুতরাং এখন তাঁহাদের সকল শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে পঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক বহ্নি নির্ব্বাপণে।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এখন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত। সীমান্তের উপর খরদৃষ্টি রাখা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দিল্লীর কর্ত্তাদের সে বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে চিন্তা করিবার অবসর হইয়াছিল কি না জানি না, বর্ত্তমানে যে সে অবকাশ নাই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। সুতরাং সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীবর্গের সে বিষয়ে চিন্তা করা শুধু কর্ত্তব্য নহে উহা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলে এত দিনে দৃঢ়চেতা লোক আসিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা পশ্চিম সীমান্তের দিকে তাকাইয়া, সময় থাকিতে ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের কূপমণ্ডুক মণ্ডলী কি ভাবিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন, কাজে কর্ম্মে এ বিষয়ে যে কিছুই অদ্যাবধি করেন নাই সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পশ্চিম বঙ্গ ডুবিলে আসাম অতলে তলাইয়া যাইবে ইহা নিশ্চিত, আসামের মস্তিষ্কে সে কথা প্রবেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই, সুতরাং সে "বঙ্গাল খেদা" করিয়া ও পশ্চিম বাংলার চাউল আটকাইয়া আনন্দলাভ করিতেছে ও আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা চুপ করিয়া দেখিতেছেন। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার মনোভাব দেখিয়াও কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না যে বিপদের সময় কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে না? বিপদ শেষ পর্য্যন্ত আসামের ঘাড়েও পড়িবে, সুতরাং সেখান হইতে সাহায্য আশা করা বৃথা, উড়িষ্যার ক্ষমতা অল্প, ইচ্ছা যাহাই থাকুক, এবং বিহারে এখন সকল বিষয়েই বিপরীত বুদ্ধি চলিতেছে, সুতরাং সেখান হইতে সাহায্য প্রত্যাশা করাও বাতুলতা, এবং সর্ব্বশেষে দিল্লী এখন সত্য সত্যই "দূর অস্ত্"—বহুদূর। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সশস্ত্র, সবল ও সর্ব্বোপরি বিশ্বস্ত, প্রহরীদল সংগঠন ও দ্রুত সংযোজনের সময় কি এখনও আসে নাই? এক দল লোক আছেন যাঁহারা রক্ষী-প্রহরী, অস্ত্রশস্ত্রের কথা উঠিলেই চীৎকার করিতে থাকেন "যুদ্ধের প্ররোচনা করা হইতেছে, অহিংসনীতির ব্যতিক্রম করা হইতেছে।" নিরীহ দেশবাসী নরনারী নরপশুর দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ইঁহারা অন্তর্দ্ধান করেন, একমাত্র যে প্রায় অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের নাম ভাঙাইয়া ইঁহারা দেশে মাতব্বরী করেন সেই বৃদ্ধ এবং তাঁহার কয়েকজন প্রকৃত সহকর্ম্মীর উপরই সকল বোঝার ভার পড়ে। দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য, রাষ্ট্রের প্রগতি ও মঙ্গলের জন্য এখন ক্ষাত্র ধর্ম্মের প্রয়োজন এবং দেশরক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ব্যর্থ না হয় তাহার জন্য প্রখর দৃষ্টিতে রক্ষীদলের বিশ্বস্ততার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, এ কথা যিনি স্বীকার না করিবেন তিনি এখন দেশের ঘোর শত্রু। কংগ্রেসের অহিংসবাদ আমরা সমর্থন করি, কিন্তু অহিংসবাদের নামে ক্লীবত্বকে আমরা বরণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা হিংসাও চাহি না, প্রতিহিংসাও চাহি না, কিন্তু হিংস্র আততায়ী দমনের যে উপায় ইতিহাস-পুরাণ প্রসিদ্ধ, যাহা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ের সাফল্য আমরা জানি না, সেই উপায় অবলম্বন করা এখন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কথিত আছে, গোস্বামী তুলসীদাস বৃন্দাবনে গোপালজীর মন্দিরে নিবেদন করিয়াছিলেন "ধনুর্ব্বাণ লেও হাথ তো তুলসী করে প্রণিপাত" এবং দেবতা প্রসন্ন হইয়া সেই বেশেই তাঁহাকে দর্শন দেন। বাংলার প্রকৃত অহিংসবাদীদিগের আজ সে কথা স্মরণ করা প্রয়োজন।

দেশরক্ষার পর খাদ্যের ও বস্ত্রের কথা। আমাদের লজ্জার কথা এই যে, ঐ দুই বিষয়েই আমরা শুধু বর্ত্তমানে পরমুখাপেক্ষী নহি, অদূর ভবিষ্যতে ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন ব্যবস্থাও আমাদের সামনে এতদিনেও আসে নাই। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার ফলে বাংলার মঙ্গল হইতে পারে এই জন্য বিহারে ঐ ব্যবস্থা বানচাল করার চেষ্টা চলিতেছে, এদেশে তাহার প্রতিক্রিয়া কিছুই দেখা যায় নাই। এ প্রদেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান তিন-চার বৎসরের মধ্যেই অনেকটা হইতে পারে যদি সে সমাধান চেষ্টার কর্ম্মঠ ও বুদ্ধিমান্

লোকের সমবেত চেষ্টা এখন হইতেই আরম্ভ হয়। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা যাহাতে দ্রুত কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য অবিলম্বে শক্তিশালী আন্দোলন আরম্ভ হওয়া উচিত। বিহার যদি প্রতিকূল আচরণ না ছাড়ে তবে আমাদেরও ঐ পথ অবলম্বন করিতে হইবে। ভূয়া স্তোকবাক্যে দেশের লোকের পেট ভরিবে না এবং বুভুক্ষু দেশে শান্তি শৃঙ্খলা আসিতে পারে না—ইহা দেশের কর্ণধারগণের বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের ফসল উঠিবার পূর্ব্বে আমাদের অনেককেই হয়ত দেড় দুই মাস অর্দ্ধাশনে ও কদন্ন ভোজনে কাটাইতে হইবে। আসাম চাল দেয় নাই, বিদেশের শস্যের জাহাজ এক মাস দেরিতে আসিবে, সুতরাং দিন গণিয়া আধপেটা খাইয়া থাকা ছাড়া উপায় কি? হয়ত এই বাধ্যতামূলক কৃচ্ছ্রসাধনে, পেটের আগুনের জ্বালায় মগজ তরল ও চঞ্চল হইলে, দেশের লোক বুঝিতে পারে যে যোগ্য লোকের হাতে খাদ্য সমস্যা পূরণের ভার না দিয়া স্তোকবাক্য বিশারদদিগের হাতে দিলে আগামী বৎসরে অর্দ্ধাশনের বদলে অনশন, এবং কৃচ্ছ্রসাধনের স্থলে মৃত্যুবরণ, অনিবার্য্য হইবেই।

খাদ্য অর্জ্জনের অন্য উপায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও পণ্যশালায় বাণিজ্য বস্তু উৎপাদন। এ বিষয়েও বাংলায় অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। মালিকানা স্বত্বের এবং কর্ম্মী ও শ্রমিকের প্রাপ্য দাবির বিবাদ ত রহিয়াছেই, উপরন্ত চোরাকারবার, বস্ত্রাভাব ও খাদ্যাভাবে বিব্রত কর্ম্মী ও শ্রমিকের দল অতি সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনকারীদিগের ফাঁদে পড়িতেছে। যে ভাবে বাংলার প্রত্যেক কারবারে, প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে, উৎপাদনের অনুপাত কমিতেছে ও সেই কারণে পড়তা চড়িতেছে, তাহাতে এ প্রদেশের কলকারখানা আর কিছুদিনের মধ্যেই ভিন্ন প্রদেশ ও বিদেশের আমদানীর মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না। চাষী যদি বলে যে "আমি ক্ষেতে লাঙল দিব অর্দ্ধেক ও রোপণ-বপন-নিড়ান করিব কম, কিন্তু আমার ফসল চাই দ্বিগুণ" তবে লোকে তাহাকে পাগলাগারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, কিন্তু শ্রমিক যদি সেই মত বলে যে আমি কাজ করিব অর্দ্ধেক সময়, বাকীটা ছুটিতে ও ফাঁকিতে কাটাইব, কিন্তু আমার পারিশ্রমিক চাই দ্বিগুণ এবং আমি কাজ ভালই করি বা মন্দই করি সেই পারিশ্রমিকের হার ক্রমেই বাড়াইতে হইবে, তবে তাহার নাম হয় "গণ-আন্দোলন", "মুক্তি-সংগ্রাম" ইত্যাদি। দেশের নেতৃবর্গের এখন স্পষ্ট ভাষায় কর্ম্মী ও শ্রমিকদিগকে বলা উচিত যে তাহাদের দুর্দ্দশার প্রতিকার ঐ পথে সম্ভব নয়, কেননা ঐ পথে কারবার বন্ধ হইলে "পুঁজিপতি" তাহার পুঁজির অর্দ্ধেক খোয়াইয়াও বাঁচিয়া থাকিবে, শ্রমিক নিরন্ন হইয়া পথে পথে ঘুরিবে। শ্রমিকের উন্নতির পথ কোন্ দিকে তাহা ইউরোপ বুঝিয়াছে। তাহারা উৎপাদন দেড় গুণ বাড়াইয়া পারিশ্রমিক দ্বিগুণ লইতেছে, যাহাতে কারবারের পড়তা মোটামুটি ঠিক থাকে অথচ তাহাদের অবস্থারও উন্নতি হয়। সোভিয়েট রাশিয়া তো অন্য পথ লইয়াছে, সেখানে কাজে ফাঁকির নামে মৃত্যুদণ্ড, এ প্রদেশের "শ্রমিক নেতার" সেখানে আয়ু দুই দিনও হইত না। সে কথা এদেশের শ্রমিককে বলার সময় আসিয়াছে। শ্রমিক বিক্ষোভ এবং দেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ চোরাকারবার। বাংলাদেশে যে ডালের দর মণ করা ৪০ হইতে ৫০-৫২, টাকা, সেই ডাল মধ্য প্রদেশে ও উড়িষ্যায় ১০-১২ টাকা মণ দরে পাওয়া যায়, রাজপুতনারও ঐ দর, যুক্তপ্রদেশে সামান্য বেশী। এদেশে আনিবার খরচ, ন্যায্য লাভ, বখ্‌তি-পড়তি, সব কিছু ধরিলেও ২০৲ মণ দরে অনায়াসে ঐ বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য বিক্রীত হইতে পারে। চোরাকারবারী মণ-করা ২০ হইতে ৩০ টাকা লুঠ করিয়া গরীবের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ফ্রান্সে খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদিতে চোরাকারবারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও উহা হওয়া উচিত, অন্ততঃ পক্ষে খুন-জখমের শাস্তির অনুরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত। চোরাকারবারীর বছরপাঁচেক শ্রীঘর বাস ও তাহার সম্পত্তির মোটা অংশ বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং চোরাকারবার দমন করার জন্য পৃথক মন্ত্রী ও পৃথক বিভাগ সামরিক ভাবে করা প্রয়োজন। কাপড়, ডাল ইত্যাদির কণ্ট্রোল-দোকানগুলির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অবিলম্বে রাখা দরকার।

পূর্ব্ববঙ্গের মাইনরিটি

পাকিস্থানী রাজত্বে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। ইহা সত্য যে খাজা নাজিমুদ্দীন শান্তিরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার আন্তরিকতায় আমাদের লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যে ভূতকে জাগ্রত করিয়া তোলা হইয়াছে পাকিস্থান লাভ হইলে যে অসম্ভব সুবিধা প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি বৎসরাধিককাল যাবৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনামাত্র না করিয়া নিরক্ষর ও অবিবেচক লোকদের দিয়া আসা হইয়াছে, এখন তাহাকে দূর করা কতটা বা কত দিনে সম্ভব হইবে তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। শুধু হত্যা বা আঘাত হইতে বাঁচিতে পারিলেই মানুষের মত বাঁচা হয় না, স্বচ্ছন্দচিত্তে আপন অধিকার লইয়া বাস করিবার স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। পদে পদে অধিকারহারা হইয়া যেখানে অপমানিত জীবনযাপন করিতে হয়, মানুষ সেখানে বাস করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যখন খুশী বাড়ী-ঘর-সম্পত্তি দখল করিয়া লইবে, উপদ্রুত হইয়া নালিশ করিলে প্রতিকার মিলিবে না, ধর্ম্মকর্ম্মের স্বাধীনতা থাকিবে না, কর্ম্মোপলক্ষে দূরে যাইতে হইলে ন্যাশনাল গার্ড আসিয়া ষ্টেশনে মালপত্র খানাতল্লাসী করিবে এবং তাহাদের হুকুম তামিল না করিয়া উপায় থাকিবে না, এই ভাবে পদে পদে লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া মানুষ কখনো বাঁচিতে পারে না।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল উপলক্ষ্যে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও খাজা নাজিমুদ্দীন হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। মিছিলের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, সঙ্গে পুলিস ছিল, লীগনেতারা ছিলেন তথাপি একটি মসজিদের সামনে একদল লোকের অসঙ্গত জিদের ফলে মিছিল বন্ধ করিতে হইয়াছে।

খাজা নাজিমুদ্দীন কালেক্টরী আপিসের আঙিনাতে এক মুসলমান জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শত শত বৎসর যাবৎ যে শোভাযাত্রা বিনা বাধায় বাহির হইয়াছে আজ তাহারা সেই শোভাযাত্রায় বাধাদান করিয়াছে। তিনি হিন্দুদিগকে শোভাযাত্রা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং তাঁহারা তাহাতে রাজীও হইয়াছেন। তিনি শ্রোতাদিগকে একথা স্মরণ করাইয়া দেন যে গত ঈদ ও পাকিস্থান দিবসের শোভাযাত্রায় হিন্দুরা স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে শান্তিপূর্ণভাবে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি জনতাকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, এখানে কোন হাঙ্গামা বাধিলে তাহা সমগ্র পূর্ব্ব বাংলায় ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং ইহার ফলে কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

কলিকাতার কোন কোন লীগ পত্রিকা এই বাধাদানকারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও ফল হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এবং মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান্ লোকদের যদি এইরূপে অদূরদর্শী লোকদের নিকট পরাজয় মানিতে হয় তাহা পূর্ব্ব পাকিস্থানের ভবিষ্যতের পক্ষে উজ্জ্বল মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির বনিয়াদ রূপে গ্রহণ করিলে এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব নয় ইহা বুঝিবার মত যথেষ্ট সুযোগ সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সহজে ও বিনা স্বার্থত্যাগে রাজ্যলাভের জন্য তাঁহারা উহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দীন নারায়ণগঞ্জে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব পাকিস্থানে শান্তিরক্ষা আমাদের করিতে হইবেই। এখানে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আরম্ভ হইলে আমাদের উন্নতির সকল আশা চূর্ণ হইবে, অর্থাভাব, খাদ্যাভাব ও বেকার সমস্যা লইয়া আমরা ভীষণভাবে বিব্রত হইয়া পড়িব। আমি আল্লার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি পূর্ব্ব পাকিস্থানের শান্তি যেন অটুট থাকে এবং আমি আশা করি আপনারাও শান্তিরক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্নবান হইবেন।" পূর্ব্ব পাকিস্থানের সমৃদ্ধি যেমন মুসলমানদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে, ঠিক তেমনি হিন্দুদের সহযোগিতা ভিন্ন পূর্ব্ব পাকিস্থান গড়িয়া উঠিতে পারিবে না।

সামরিক শিক্ষা

যুক্তপ্রদেশের অর্থ ও প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদত্ত পালিওয়াল সেখানে রক্ষীদল গঠনের যে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার সংবাদ দিয়াছেন প্রত্যেক প্রদেশে তাহা অনুসরণ করা শুধু যে কর্ত্তব্য তাহা নয়, এ বিষয়ে আর একটি দিনও বিলম্ব করা অনুচিত। শ্রীযুক্ত পালিওয়াল বলিয়াছেন যে এই রক্ষী বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উন্মুখ করিয়া তোলা হইবে না, সামরিক শিক্ষা দিয়া এই বাহিনীকে দেশরক্ষায় উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান ইহা নয়, ইহা দেশরক্ষার প্রস্তুতি মাত্র। যুক্তপ্রদেশের ১,১০,০০০ গ্রামের প্রত্যেকটিতে এক জন অধিনায়ক ও দশ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি করিয়া রক্ষীদল গঠিত হইবে। ইহারা সামরিক শিক্ষালাভ করিবে এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রও ইহাদের হাতে থাকিবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার সমস্যা এখনই গুরুতর হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রিটেন ও পাকিস্থান এক জোট হইয়া একদিকে ভারতে অশান্তি ও হানাহানির আগুন প্রজ্বলিত রাখিতেছে, অপর দিকে পৃথিবীর দেশে দেশে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে ও সিনেমায় প্রবল প্রচার কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও দিল্লীর ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাই বুঝা যায় যে পাকিস্থানের সদভিপ্রায়ে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। বাংলা এখন ভারতবর্ষের একটি সীমান্ত প্রদেশ। খাজা নাজিমুদ্দিনের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব বাংলা হইতে আক্রমণ তো দূরের কথা সেখানে কোন বড় রকমের গোলযোগের আশঙ্কাও আপাততঃ নাই। কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং সে হিসাবে যদি পূর্ব্ববঙ্গে কোন নির্দ্দেশ আসে তখন কি ঘটিবে তাহা বলা যায় না। রাষ্ট্রনীতির প্রথম কথা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বিরোধ ক্রমেই যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং ইংরেজ আমেরিকাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পশ্চিম পাকিস্থান এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। পশ্চিম পাকিস্থানের দুই কোটি লোকের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ভিন্নভাবাপন্ন পঞ্জাবী হিন্দু ও শিখকে মিঃ জিন্না কেন থাকিতে দিতে চাহেন না এই দিক দিয়া বিচার করিলে তাহার অর্থ উপলব্ধি করা কঠিন হইবে না।

বাংলাকে এখনই সতর্ক হইতে হইবে ও তরুণ দলকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষাদান করিয়া এখনই রক্ষীদল গঠনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোর পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের অস্ত্র চালনা শিক্ষাদান এবং নীচের শ্রেণীগুলিতে মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা ও যুযুৎসু শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক ক্লাব এই সব চর্চ্চা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এখনই উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। দেশের প্রত্যেকটি তরুণ যদি সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয় তাহা হইলে এক দিকে সেই জাতি যেমন বহিঃশত্রুর নিকট দুর্দ্ধর্ষ প্রতীয়মান হইবে তেমনি সামরিক শৃঙ্খলা শিক্ষার ফলে দেশের লোকের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অভ্যাসও বাড়িবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, সবলের অহিংসাই প্রকৃত অহিংসা, দুর্ব্বলের অহিংসা কাপুরুষের দুর্ব্বলতা ঢাকিবার ভেক ভিন্ন আর কিছু নয়। যুদ্ধে নিরপেক্ষতা ভাল, কিন্তু তাহা সশস্ত্র নিরপেক্ষতা (armed neutrality) না হইলে নিরর্থক হইয়া পড়ে।

ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ-সম্ভাবনা ও গান্ধীজী

নয়া দিল্লীতে গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় বলিয়াছিলেন যে তিনি বরাবরই সকল প্রকার যুদ্ধের বিরোধিতা করিয়া

আসিয়াছেন কিন্তু পাকিস্থানের নিকট হইতে ন্যায় বিচার লাভের আর কোন পন্থা যদি না থাকে, যদি পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট ক্রমাগত তাহাদের প্রমাণিত ভুলগুলি উপেক্ষা করেন ও সেগুলিকে ছোট করিয়া দেখাইতে থাকেন তাহা হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। অবিচার সহ্য করিবার পরামর্শ তিনি কখনও কাহাকেও দিতে পারেন না।

গান্ধীজীর এই উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে গান্ধীজী বুঝি বা যুদ্ধের পরামর্শ দিতেছেন। গান্ধীজীর বক্তৃতাগুলির অনুমোদিত রিপোর্ট পর্য্যন্ত ছাঁটিয়া কাটিয়া বরাবরই এত ছোট করিয়া দেওয়া হয় যে তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করা অনেক সময় কঠিন হইয়া উঠে ইহা আমরা পূর্ব্বেও লক্ষ্য করিয়াছি। রিপোর্ট খুব বেশী ছোট করা উচিত নয় ইহা গান্ধীজী নিজেও এখন বলিতেছেন। কিন্তু উপরোক্ত রিপোর্টটি ক্ষুদ্র হইলেও উহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসুবিধা হয় না। গান্ধীজী যুদ্ধের অনুকূলে প্রচারকার্য্য সুরু করেন নাই, পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট যে অন্যায় করিয়া চলিয়াছেন তাহা বন্ধ না করিলে শেষ পর্য্যন্ত ভারত ও পাকিস্থানে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে ইহাই তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতি পরদিন তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। পাকিস্থান অন্যায় কার্য্যে বিরত না হইলে যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহা তিনি আবারও স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থান সমস্যা সমাধানের দুইটি মাত্র উপায় আছে: প্রথম, নিজেদের মধ্যে আপোষে মিটমাট করা; দ্বিতীয়, সালিশ নিয়োগ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া। এই দুই পথে মীমাংসা না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "এক পক্ষ যদি অন্যায় করিতেই থাকে এবং উল্লিখিত বিষয় দুইটির একটিও অবলম্বন না করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট থাকে আর একটি মাত্র উপায়—যুদ্ধ।"

যুদ্ধ সম্বন্ধে গান্ধীজীর যে উক্তি লইয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে তার সপ্তাহ দুয়েক আগেও তিনি অনুরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। দিল্লী যাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি বলিয়াছিলেন, "পাকিস্থান যদি ক্রমাগত অন্যায় করিতেই থাকে তবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবেই।" (If Pakistan persisted in wrong-doing there was bound to be a war between India and Pakistan.) গান্ধীজীর মুখে যুদ্ধের কথা শুনিলেই এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় বিরোধী যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি একমাত্র গান্ধীজী। শান্তির এত বড় দূত আধুনিক বিশ্বে আর কেহ নাই। ঊন-অশীতিতম বৎসর বয়সেও তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য—মানুষের মন হইতে হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য যে কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছেন তাহাতে বিশ্বের প্রত্যেক দেশ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে মাথা নত করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করিলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত তাঁহার আদর্শ মানুষ বা রাষ্ট্র কেহই গ্রহণ করিতে পারে নাই। কাজেই যুদ্ধের সম্ভাবনা বাস্তব জগতে রহিয়া গিয়াছে, গান্ধীজীর নিকট উহা নিতান্ত অপ্রিয় হইলেও যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয় এবং প্রয়োজন বোধে তাঁহাকে সতর্কবাণী রূপে উহা উচ্চারণ করিতেও হয়। যে অন্যায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে তাহা স্বীকারে অনিচ্ছা, অপরের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া নিজের দোষ ক্ষালনের আগ্রহ এবং অন্যায় কার্য্যে বিরত না হইবার যে সকল পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে প্রতিপন্ন হইতেছে—তাহার শেষ পরিণাম যুদ্ধ, গান্ধীজী এই কথা বলিয়াই দেশকে সময় থাকিতে সাবধান করিতে চাহিতেছেন। অন্যায় সহ্য করিবার পরামর্শ তিনি কখনও কাহাকেও দেন নাই, দিতে চাহেনও নাই, ইহাই তিনি আমাদের বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছেন। অহিংসা দুর্ব্বলের ও কাপুরুষের জন্য নহে, শক্তিমানের জন্য—গান্ধীজী ইহা বহুবার বলিয়াছেন।

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি

গত ২৪ আগষ্টের 'হরিজন' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অলৌকিকও নয়, আকস্মিকও নয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাই বুঝা যায় যে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের অজ্ঞাতে এই মিলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। গান্ধীজীর এবং মিঃ সুরাবর্দীর প্রয়াস তাহাতে পূর্ণতা দান করিয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমানে দিল্লীতে যাহা ঘটিতেছে তাহার সহিত তুলনার জন্য আমরা ইহা উদ্ধৃত করিলাম। কেননা দেশের অবস্থা কোন্ দিকে চলিতেছে সে বিষয়ে পাঠকদিগের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গান্ধীজী বলেন, "শহীদ সাহেব ও আমি বেলিয়াঘাটার এক মুসলিম অঞ্চলে একত্র বাস করিতেছি। মুসলমানরা এই স্থানে দুর্গত বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৩ই বুধবার আমরা এই বাড়িতে আসিয়াছি, আর ১৪ই মনে হইয়াছে যেন হিন্দু-মুসলমানে কোন শত্রুতা কখনও ছিল না। তাহারা হাজারে হাজারে আসিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং এক বা অপর দল যে সব স্থানকে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিত, সকলে অবাধে এখন সে সকল স্থান দিয়া যাতায়াত সুরু করিয়া দিল। মুসলমান ভাইরা প্রকৃতই মসজিদে হিন্দুদের লইয়া গেল, আর হিন্দুরা মন্দিরে মুসলমানদের লইয়া

গেল। উত্তরে মিলিত কণ্ঠে "জয় হিন্দ" "হিন্দু-মুসলমান এক হো" ধ্বনি তুলিতে লাগিল। আমি আগে বলিয়াছি যে, আমরা এক মুসলমানের ঘরে বাস করিতেছি, আর মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকগণ অতিশয় মনোযোগ সহকারে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে। রান্নার কাজ তাহারা করে। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকের এখানে আসিবার আগ্রহ—তাহারা আমাদের এই সব কাজকর্ম করিয়া দিতে চায়; কিন্তু আমি নিষেধ করিয়াছি। আমার সংকল্প ছিল যে, মুসলমান ভাইবোনেরা আমাদের শারীরিক সুখবিধানের জন্য যাহা কিছু করিতে পারিবেন আমরা তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইব। আর একথা এখন আমি বলিবই যে, আমার সঙ্কল্পের অবিমিশ্র শুভ ফল ফলিয়াছে। এই স্থানে এই শীমাসার মধ্যে অগণিত হিন্দু-মুসলমান শুভ ধ্বনি তুলিয়া জলস্রোতের মত প্রবেশ করিতেছে। একথা বলা যায় যে, ভ্রাতৃভাব উদ্বোধনের এই আনন্দ যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিতেছে।

"ইহাকে কি অলৌকিক কাণ্ড বলিব, না আকস্মিক? যে নামেই ইহার বর্ণনা হউক, একথা খুব স্পষ্ট যে, ইহার জন্য চতুর্দিক হইতে আমাকে যে কৃতিত্ব দেওয়া হইতেছে আমি একবারেই তাহার যোগ্য নহি, আর শহীদ সাহেবও যে তাহার যোগ্য একথাও বলা যায় না। জনমনের এই আকস্মিক আবেগচঞ্চল বিপুল ঊর্দ্ধগতি কোন এক বা দুই জনের কাজের ফলে সম্ভব হয় নাই। আমরা ত ভগবানের হাতে খেলার পুতুল। তিনিই আমাদের আপন সুরে নাচান। অতএব এই নৃত্যে বাধা সৃষ্টি করিতে আমরা যেন বিরত থাকি, আর সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কাছে যেন পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে আমাদের দ্বারা সর্ব্বাধিক যাহা সম্ভব তাহা করা হইবে। এইরূপে বুঝিয়া দেখিলে বলা যায় যে এই অলৌকিক ব্যাপার সংঘটনে তিনি আমাদের দুই জনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আর আমি নিজেকে প্রশ্ন করিতেছি, আমার যৌবনের স্বপ্ন কি আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় সফল হইবে।

"ভগবানে যাঁহাদের পূর্ণবিশ্বাস আছে তাঁহাদের কাছে ইহা অলৌকিকও নয়, আকস্মিকও নয়। ঘটনাপরম্পরায় স্পষ্ট প্রকাশ হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের অজ্ঞাতে এই ভ্রাতৃত্বের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তারপর রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব দেখিয়া এই শুভ ঘটনা যখন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, দ্রষ্টারা তখন আমাদেরই কৃতিত্ব দান করিল।

সে যাহা হউক, আনন্দের এই উন্মত্ত প্রকাশে আমার খিলাফৎ আন্দোলনের প্রথম অবস্থার কথা মনে পড়িতেছে। তখন ভ্রাতৃত্ববোধের এই আবেগ লোকের উপর একটা নূতন অভিজ্ঞতার আন্দোলন আনিয়া দিল। তাহা ছাড়া তখন খিলাফৎ ও স্বরাজ আমাদের দুইটি লক্ষ্য ছিল। আজ ঐরূপ কিছুই আমাদের সম্মুখে নাই। আমরা আজ পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ পান করিয়াছি, তাই ভ্রাতৃত্ব-উদ্বোধনের এই অমৃত এত বেশী মধুর লাগিতেছে। এ মাধুর্য্যের যেন কখনও ক্ষয় না হয়।

"বর্ত্তমানের এই উচ্ছ্বাসের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ', 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শুনা যাইতেছে। আমাদের মনে হয়, এই ধ্বনি সম্পূর্ণ সঙ্গত, দেশবিভাগে সম্মত হওয়ার কারণ যাহাই হউক, তিন পক্ষই পাকিস্থান স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং এই দুই পক্ষ যদি অপরের শত্রু না হয় আর শত্রু যে তাহারা নয় তাহাও এখন স্পষ্ট, তবে ঐ ধ্বনিতে অন্যায় কোথাও কিছু নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহারা যদি পরস্পরের বন্ধু হইয়া থাকে, তবে উভয় রাষ্ট্রকে 'জিন্দাবাদ' না জানাইলে বোধ দ্রোহিতা করা হইবে।"

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী

বাংলার বাহিরে বাঙালীর উপর একটা সুপরিকল্পিত আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কিছুদিন যাবৎ মনে হইতেছে। আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঙালী বিদ্বেষ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীদের উপর সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে উৎপীড়ন সুরু হইয়াছে। এই সমস্যা ক্রমশঃ এত গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে যে উহা আর উপেক্ষা করা নিরাপদ নহে।

উড়িষ্যার পুরীতে বাঙালী বিদ্বেষ চরমে উঠিয়াছিল, মহিলারা পর্য্যন্ত আক্রমণের হাত হইতে রেহাই পান নাই। ইহা লইয়া আন্দোলন হইলে উড়িষ্যা কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন যে ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর দুর্ব্বৃত্তদের সংযত করিবার ব্যবস্থা হইবে। অবস্থা এখন আপাতদৃষ্টিতে আয়ত্তাধীন বলিয়া মনে হইলেও বাঙালী বিদ্বেষের মূল দূর হয় নাই ইহা নিশ্চিত। আসামে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে। সম্প্রতি রেলের হেড আপিস গৌহাটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে অনেক বাঙালী কর্ম্মচারী সেখানে গিয়াছেন। আসামীরা ইহাকে 'বাঙাল খেদা' আন্দোলনের উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া লইয়া সভা সমিতি সুরু করিয়া দিয়াছেন এবং এক সভা অন্তে বাঙালী বাড়ী ও দোকান প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ইট-পাটকেল ছোঁড়াও হইয়া গিয়াছে। ইঁহাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, আসামের রেলপথে বাঙালী কেন চাকুরি করিবে? আসামীদের ঐ সব কাজ দিয়া দিতে হইবে। এই সব স্থায়ী কর্ম্মচারী তখন কোথায় যাইবেন এই প্রশ্ন অশিক্ষিত এবং প্রাদেশিক বিদ্বেষদুষ্ট লোকদের মনে না উঠিতে পারে, কিন্তু আসাম জাতীয় মহাসভার সভাপতি প্রভৃতি শিক্ষিত লোকেরাও এই কথা বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। বিহারেও বাঙালীর বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে ইংরেজ বাঙালীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া-

ছিল। কিন্তু বঙ্গ-বিভাগ রহিতের সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে ইংরেজ এমন কয়েকটি কাজ করিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে বাঙালীর অসম্ভব ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমতঃ, বাংলার সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী লোহা, তামা, অভ্র, কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর জেলাগুলি কাটিয়া অকারণে ও বাজে অজুহাতে সরাসরি বিহারে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত প্রদেশে এই আন্দোলনের পর হইতে সরকারী চাকুরিতে বাঙালী নিয়োগ বন্ধ হয়। সরকারী চাকুরির বিজ্ঞাপনে আগেই বলিয়া দেওয়া হইত—Bengalees need not apply। তৃতীয়তঃ, ব্যবসায়-বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালীকে বঞ্চিত করিয়া মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতিকে ইংরেজ বণিকেরা প্রকাশ্যে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে। ইংরেজের হাতে কলকারখানা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য থাকায় ইহা সহজসাধ্য হয়। স্বদেশী আন্দোলন পর্য্যন্ত পাটের কারবার বাঙালীর হাতে ছিল। ইহার পর উহা অবাঙালীর হাতে যায়, কারণ ইংরেজ বাঙালীর নিকট হইতে পাট কেনা বন্ধ করে। বিপ্লব আন্দোলনে বাঙালী সকলের পুরোভাগে ছিল এই অপরাধে তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরেজ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯৪৭ সালের র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড পর্য্যন্ত ঘটনাবলী একটু ভাল করিয়া বিচার করিলে ইংরেজের মূল অভিসন্ধি বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

এই যুদ্ধের মধ্যেও ইংরেজ অনেক প্রকারে ভারতবাসীর সাহায্য লইয়াছে কিন্তু সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে বাঙালীকে। কলিকাতার বড় বড় ইংরেজ কোম্পানীর অনেক অংশীদার অবাঙালী হইয়া গিয়াছে। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মাথা তুলিবার সুযোগ পাওয়ার আগেই তাহাকে আবারও আঘাত হানিবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং ইহাতে এবার সেই তিনটি প্রদেশ বেশী করিয়া যোগ দিয়াছে যাহারা ইংরেজের বদলে অথবা ইংরেজের সঙ্গে এক জোট হইয়া বাংলাদেশকে নিজেদের শোষণ ক্ষেত্র করিয়া রাখিতে চায়।

বাংলার যে চারিটি জেলা ১৯১২ সালে বিহারে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল সেইগুলি ফিরাইয়া পাওয়ার দাবি অনেক-দিন যাবৎ উঠিয়াছে। এত দিন বিহারী নেতারা বলিয়া আসিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হইলে ঐ জেলাগুলির সঙ্গে শ্রীহট্ট এবং গোয়ালপাড়াও বাংলায় আসিবে। তাহাতে বিহারের জেলাগুলি পাইলেও বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা বদলাইবে না। সুতরাং বাংলা যদি কখনও হিন্দুপ্রধান এবং মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে বিভক্ত হয় তখন এই দাবি বিবেচনা করা যাইবে। বঙ্গ-বিভাগের পর জামসেদপুরে বাংলার অঙ্গ জেলাগুলি প্রত্যর্পণ দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব আনা হয়। বিহারীরা ইহা শুনিয়াই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, সভাক্ষেত্রে মারপিট করেন এবং কয়েকজন বাঙালী আহত হন। ইহার পর পাটনার দৈনিক পত্র 'সার্চ লাইট' অসংযত ও অভদ্র ভাষায় বাঙালীদের আক্রমণ করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখে। শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লাল এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলা বিভাগের পর ঐ জেলাগুলি ফিরাইয়া পাওয়ার দাবী তুলিবার আর কোন কারণ নাই। কয়েক দিন মাত্র আগে শ্রীযুক্ত মহামায়াপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, বিহারীরা ঐ সব জেলা ফিরাইয়া দিবে না, জেলাগুলির প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষা করিবার জন্য তাহারা সংগ্রাম করিবে।

এই হইল আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার জনসাধারণ এবং নেতাদের মনোবৃত্তি। এ সম্বন্ধে আমরা আন্দোলন আরম্ভ করি নাই এইজন্য যে উক্ত প্রদেশত্রয়ের গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র-দের মনোভাব আমরা লক্ষ্য করিতেছিলাম। তিন প্রদেশেরই প্রধান মন্ত্রীরা মৌখিক বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলনের নিন্দা করিয়াছেন কিন্তু এ কথা সুবিদিত যে উহা কোন প্রদেশেই ফলপ্রদ হয় নাই। ইঁহাদের উক্তির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এই অবস্থায় এখন আর বাঙালীর পক্ষে নীরব থাকিবার উপায় নাই। আসামে এবং উড়িষ্যায় যে সব লোক প্রকাশ্যে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে উক্ত দুই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরা তাহাদের কাজের বিরুদ্ধে দুই-একটা কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রচার কার্য্য বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। বিহারের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং অনেক মিষ্ট কথাও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জামসেদপুরে যাহারা বাঙালী সভায় মারপিট করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি-দানের চেষ্টা তিনি করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। সার্চলাইটে পুনরায় বাঙালীবিদ্বেষ উদ্গার আরম্ভ হইবে না এমন কথা মনে করিবার মত কোন কার্য্য তিনি করিয়াছেন বলিয়াও আমরা শুনি নাই। এই তিন প্রদেশে বাঙালীবিদ্বেষ এত দৃঢ়মূল হইয়াছে যে শুধু মিষ্টবাক্যে উহা মুছিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশই বাঙালীর নিকট অসংখ্য প্রকারে উপকৃত। কোন কোন বাঙালী সেই সব স্থানে গিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিতে পারেন, বাংলায় ঐ তিন প্রদেশের লোকেরও অনেক গর্হিত কার্য্যের নিদর্শন বাহির করা কঠিন নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে ঐ তিন প্রদেশের নানা বিষয়ের, বিশেষতঃ শিক্ষার উন্নতির জন্য বাঙালী যে স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রম করিয়াছেন বাংলায় ভিন্ন প্রদেশীয় লোকেরা তার একাংশও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবে একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার বাহিরে প্রাদেশিকতার আবর্ত্তে বাঙালীর স্থান সর্ব্বত্র সঙ্কুচিত হইয়াছে কিন্তু বাঙালী কখনও বাংলাদেশের দ্বার ভিন্ন প্রদেশীয়ের নিকট রুদ্ধ করিবার কথা চিন্তা করে নাই। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলার বর্ত্তমান দুর্দশা দিবাচক্ষে দেখিতে

পাইয়াছিলেন এবং তার জন্য বাঙালীকে বার বার সাবধানও করিয়াছেন কিন্তু বাঙালী তাঁহার উপদেশ শোনে নাই। উড়িষ্যার পুরীতে বাঙালী মহিলাদের পর্য্যন্ত অপমান করিতে দ্বিধা করে না কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবিয়া দেখে না যে যদি বাংলা দেশ হইতে উড়িয়া রাঁধুনি বামুনের দল এবং কলিকাতার উড়িয়া শ্রমিকের দল বিতাড়িত হয় তবে দরিদ্র উড়িষ্যার কি অবস্থা ঘটিবে। বিহার একথা ভাবে না যে, বাংলা হইতে কারখানার বিহারী শ্রমিক, রেলের কুলি, রিক্সাওয়ালা, ঠেলা-ওয়ালা প্রভৃতির কলিকাতার ও বাংলার উপার্জ্জনলব্ধ দুই কোটি টাকা প্রতি মাসে বিহারে না গেলে তার কি দুর্দশা হইবে। কলিকাতার তিন লক্ষ চটকল শ্রমিকের মধ্যে বোধ হয় আড়াই লক্ষই বিহারী। তার পর কেরীওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, রিক্সা-ওয়ালা প্রভৃতির সংখ্যাও লাখ দুয়েকের মত হইতে পারে। বাঙালীর বিরুদ্ধে ইহারা প্রথম হইতেই কি মনোভাব লইয়া আসে আসানসোল ষ্টেশনে ইহাদের বাক্যালাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়। কলিকাতায় আসিয়া ইহাদের অধিকাংশই ফুটপাথে শোয়, ফুটপাথে উনান পাতিয়া রাঁধে, রাস্তা নোংরা করে, এবং পাড়ার লোক আপত্তি করিলে মারিতে আসে। যে সব স্থানে ইহাদের আড্ডা, সেখানে রাত্রে ফুটপাথে চলাফেরা কি দুষ্কর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে। ঠেলাগাড়ী, রিক্সাওয়ালা ও রেলের কুলির ঔদ্ধত্যের পরিচয় না পাইয়াছেন এমন লোক বাংলাদেশে নাই। ঠেলা-গাড়ী ও রিক্সার জন্য রাজপথে মোটর গাড়ী ও বাসের গতি বৃদ্ধির উপায় নাই, ইহারা তাহার সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। ইহার সহিত আছে বিহারী গোয়ালাদের নোংরামি এবং অত্যাচার। বিহারী ধোপায় বাংলাদেশ ছাইয়া যাইতেছে। ফুটপাথ ইহাদের কাপড় শুকাইবার স্থান। ইহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় যে কলিকাতা শহরটা ইহাদেরই, বাঙালীকে পথে ঘাটে দয়া করিয়া একটু চলাফেরা করিতে দিয়া ইহারা যেন আমাদের কৃতার্থ করিতেছে। ট্যাক্স দিবে বাঙালী কিন্তু শহর ভোগদখল করিবে অবাঙালী ইহাই যেন নিয়ম। যে সব বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস এবং অর্থোপার্জ্জন করিতেছে তাহারা কে কত পয়সা ট্যাক্স দেয় তাহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে কলিকাতায় ৫০ হাজার ফেরীওয়ালা আছে, তন্মধ্যে ৪০ হাজার যে বিহারী প্রভৃতি অবাঙালী তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে মাত্র ৫ হাজার কর্পোরেশনকে লাইসেন্স ট্যাক্স দেয় অবশিষ্ট সকলে বাংলাদেশকে ফাঁকি দেয়।

বাঙালীকে এবার সত্যই কঠোর প্রাদেশিকতা অবলম্বন করিতে হইবে। আইন করিয়া এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে কোন প্রদেশ নিজ এলাকায় বাঙালীর উপর উপদ্রব করিলে তৎক্ষণাৎ বাংলাদেশে সেই প্রদেশের লোকদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইবে। বাংলাদেশ সর্ব্বাগ্রে বাঙালীর এই কথা মনে রাখিয়া অবিলম্বে পশ্চিম বাংলাকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে কোন প্রদেশ বাঙালীর উপর অবিচার করিতে সাহসী না হয়। ভারতবর্ষ ভারতবাসীর, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক প্রদেশবাসীর সমান অধিকার আছে কিন্তু কোন প্রদেশকে দুর্ব্বল মনে করিয়া তাহার অধিবাসীদের উপর অন্যায় করিবার অধিকার কাহারও নাই। পশ্চিম বাংলা একটু সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করিলেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং অতিশয় শক্তিশালী প্রদেশে পরিণত হইতে পারে। খাদ্য, কয়লা, লোহা, শিল্পদ্রব্যের কলকারখানা, বন্দর প্রভৃতি একটি আধুনিক রাষ্ট্রের শক্তিশালী হইবার উপযুক্ত সমস্ত কিছুই পশ্চিম বাংলায় রহিয়াছে। পশ্চিম বাংলায় বাঙালী যদি বাঙালীজাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে ভিন্ন প্রদেশে বাঙালীর উপর অবিচার অনায়াসে বন্ধ হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব ভাবধারা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া বাঙালী সকলের আগে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল এবং সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। বাঙালী আজ নানা কারণে, বিশেষতঃ আত্মকলহে এবং কতকগুলি ভুয়া আদর্শে বিভ্রান্ত বলিয়া আজ সে দুর্ব্বল এবং ভিন্ন প্রদেশীয়ের অবজ্ঞা লাঞ্ছনার পাত্র। আবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বাঙালীকে এখন হইতেই সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে ঘর গুছানো প্রয়োজন, ইহাকে প্রাদেশিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যে সব প্রদেশ বাংলার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে, বাংলা তাহাদের অধিবাসীদের সাদরে গ্রহণ করিবে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পঞ্জাবী ছাত্র লওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহা আমরা উচিত কার্য্য বলিয়া মনে করি। পঞ্জাব স্বদেশী যুগ হইতে বাংলার সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আবার খাদ্যসমস্যা

পঞ্চাশের মন্বন্তরের জের মিটিতে না মিটিতে আবার বাংলাদেশে অনটন সুরু হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার অবস্থাই সমান সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাউলের দাম আগের বারের ন্যায় এবারও এখনই সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার সীমার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। আগামী দুই মাসে কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বাংলায় নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ার পর অতি সঙ্গীন অবস্থা দেখা দিয়াছে। ঢাকা ও ফরিদপুরের অবস্থাও খারাপ। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার বরাদ্দ কমাইতে কমাইতে এমন একটা অসম্ভব মাত্রায় আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে যাহা লোকে সহ্য করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। সপ্তাহে আটাশ ছটাক খাদ্য, তন্মধ্যে এক সের মাত্র চাউল, এই বরাদ্দে লোকে কি করিয়া বাঁচিবে বুঝা দুষ্কর। ইহার মধ্যে আবার অখাদ্য চাউল ও আটা আছে।

আটা না চালিয়া খাওয়া যায় না, চালিতে গেলে বেশ খানিকটা ভুষি প্রভৃতি বাহির হইয়া যায়। মিঃ সুরাবর্দীর সুরে সুর মিলাইয়া ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ শুকনা আলুর গুণকীর্তন সুরু করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কি লোকের পেট ভরিবে? এক সের শুকনা আলু সিদ্ধ করিয়া তাহাকে খাওয়ার যোগ্য করিতে অতিরিক্ত পরিমাণ কয়লা প্রয়োজন, সেই কয়লা দিবে কে?

কলিকাতায় রেশন বজায় না রাখিলে সমগ্র বাংলায় অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিবে, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর এই উক্তি অতিশয় সত্য। কলিকাতা যদি বেপরোয়া খাদ্য ক্রয় সুরু করে তবে বাংলার অর্দ্ধেক লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিকাতার লোককে এক পোয়া চাউল ও তিন পোয়া বক্তৃতা দিয়া কি রেশন বজায় রাখা যাইবে? শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সরবরাহসচিবের পদ গ্রহণের পর চাউল সংগ্রহের জন্য জোর চেষ্টা সুরু হইয়াছে, ফল যে কিছু না হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দেশের লোকে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং প্রাক্তন সরবরাহ সচিব শ্রীরাধানাথ দাসের সমালোচনা না করিয়া পারিবে না। দুর্ভিক্ষের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে ইহা বুঝিবার মত যথেষ্ট সুযোগ ডাঃ ঘোষ পাইয়াছেন এবং সাবধান হইবার জন্য প্রায় তিন মাস সময়ও তিনি পাইয়াছেন। মানুষের প্রাণের মূল্য সকলের আগে, রাষ্ট্রনায়কদের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব দেশে একটি লোকও যাহাতে অনাহারে না মরে তাহা দেখা। গত বৎসর ভাল ফসল হয় নাই; বাহিরের আমদানী একেবারে নাই। জানিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রধান মন্ত্রী ইহা অনায়াসেই জানিতে পারিতেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হইতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা বাস্তব রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে, তার আগে আড়াই মাস সময় হাতে ছিল। প্রধান মন্ত্রীর দল এবং শ্রীরাধানাথ দাস কাইল ঠিক রাখিতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে দুর্ভিক্ষ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতেছে ইহা তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই, তার জন্য সতর্ক হওয়া তো বহু দূরের কথা। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় পর্য্যন্ত নানা স্থানে অজস্র চাউল বাজারে বিক্রয় হইয়াছে, দামও এমন কিছু চড়া ছিল না। সরকারী সংগ্রহ কার্য্য এখন যেরূপ জোরের সহিত আরম্ভ হইয়াছে দুই বা আড়াই মাস আগে হইতে সেই ভাবে সুরু হইলে অনেক চাউল সরকারের হাতে আসিয়া যাইত। শ্রীরাধানাথ দাস যদি ডাঃ ঘোষের মুখ চাহিয়া কাইল হাতে বসিয়া না থাকিয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দিন হইতে চাউল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে গদী হইতে সরাইবার সাহস ডাঃ ঘোষের হইত না ইহা নিশ্চিত। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে প্রধান বা অপ্রধান কোন মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব একেবারেই নাই। নিজ নিজ বিভাগ সুপরিচালনার দ্বারা দেশের লোকের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য যতটা চেষ্টা করা যায় তাহাও যেন তাঁহারা করিতে সাহস পান না।

বর্ত্তমান মন্ত্রীরা প্রত্যেক শুভ কার্য্যে দেশের প্রত্যেকটি লোকের সহানুভূতি ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিতেছেন। তৎসত্ত্বেও যদি তাঁহাদের হাত দিয়া আবার এক ভাবেই দুর্ভিক্ষ ঘাড়ে আসিয়া পড়ে তাহা অতি বড় একটি দুর্ভাগ্য বলিয়াই মনে করিতে হইবে। খাদ্যের সহিত রাজনীতির সম্পর্ক থাকা উচিত নয়—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না। মন্ত্রীদের এখন সমস্ত রাজনীতি ফেলিয়া একমাত্র দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। কংগ্রেসের নাম লেখা না-লেখা, নাম জানা না-জানা যে সহস্র সহস্র সেবক ও শুভানুধ্যায়ী রহিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আহ্বান করিয়া একযোগে দুর্ভিক্ষ নিবারণে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী হ্রাস

পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীন গবর্মেণ্ট গঠিত হইয়াছে। কিন্তু আগামী কয়েক বৎসরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবার মত অর্থ এই গবর্মেণ্টের নাই। প্রদেশে উন্নতি বিধানের জন্য যে পরিকল্পনা আছে অর্থাভাবে তাহা অনেক ব্যাহত হইতে পারে। রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার নূতন কোন উপায় আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা অল্প, কারণ রাজস্ব আদায় করিবার সকল প্রকার সম্ভবপর উপায়ই কার্য্যকরী করা হইয়াছে। জনসাধারণের অপ্রিয় বিক্রয়-শুল্ক টাকায় তিন পয়সা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। সুতরাং নূতন গবর্মেণ্টকে তাহার বর্ত্তমানে যে সংস্থান আছে তাহার মধ্যেই চলিতে হইবে; ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে এবং শাসনকার্য্যের বিভিন্ন শাখার লোকসংখ্যা কমাইতে হইবে। ব্যয় সঙ্কোচের ও কর্মচারী সংখ্যা কমাইবার যে যথেষ্ট উপায় আছে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। এই প্রশ্নটি বিশদভাবে আলোচনা করিবার নিমিত্ত এবং ব্যয় সঙ্কোচের অন্যান্য উপায় উদ্ভাবনের জন্য ও পরিমিত ব্যয় করিবার জন্য অবিলম্বে একটি শক্তিশালী ব্যয়সঙ্কোচ কমিটি বা Retrenchment Committee স্থাপন করা আবশ্যক।

নিম্নে ব্যয়-সঙ্কোচের এমন কতকগুলি সম্ভবপর উপায় লিপিবদ্ধ হইল যাহা এখনই কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। বোর্ড অব রেভিনিউ এবং ডিভিসনাল কমিশনার এই দুইটি পদ এখন চালু রাখার আর কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ইহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ক্রমাগত আন্দোলন হইয়াছে এবং রোলাণ্ড কমিটিও বলিয়াছেন যে ডিভিসনাল কমিশনারের পদগুলি তুলিয়া দিয়া বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সদস্য এক জন বাড়াইলেই চলে। লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সদস্যপদ বাড়াইয়াছেন কিন্তু কমিশনারের পদ তোলেন নাই।

নবগঠিত গবর্মেণ্ট ইতিমধ্যেই সার্জ্জন-জেনারেল ও ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ এই দুইটি পদ আলাদা না রাখিয়া

একটিতে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও এইরূপ একত্রীকরণ সম্ভব। এক জন ব্যক্তিই রেজিষ্ট্রেশনের ইনস্পেক্টর-জেনারেল এবং আবগারী কমিশনারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, যদি এই দুই বিভাগের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয় এবং তাঁহার এই অভিজ্ঞতাকে কার্য্যকরী করিবার সুবিধা দেওয়া হয়। বাংলার কৃষি ও সমবায় ঋণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু এই দুই বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা অত্যল্প। বাংলার সমবায় ঋণের সাহায্য ব্যতিরেকে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-বিধান অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে কৃষিবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ এখন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে সমবায় ঋণের উপায়গুলি প্রবর্ত্তন করিতেছেন না। জেলার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের বিক্ষিপ্ত চেষ্টার অভাব নাই বটে, কিন্তু ইহা ধারাবাহিক নহে এবং যাঁহারা যেটুকু কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের পরবর্ত্তী অফিসারগণের উদাসীনতায় বিফল হইয়া যায়। কৃষিকার্য্যে সমবায় ঋণের উপায়গুলি পরিচিত করিবার জন্য এই দুই বিভাগ এক জন কর্ম্মচারীর শাসনাধীনে রাখা উচিত। আগেকার দিনে কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর সমবায় সমিতিগুলির রেজিষ্ট্রারের কার্য্যও পরিচালনা করিতেন; কিন্তু কালক্রমে পৃথক রেজিষ্ট্রারের প্রয়োজন হইল। সুতরাং একটি পৃথক সমবায় বিভাগ গঠিত হইল এবং বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু ইঁহারা এই বিভাগের উন্নতিবিধানে কোন কাজ করিবার পরিবর্ত্তে ইহাকে ধ্বংসের মুখেই টানিয়া আনিলেন। মিষ্টার ডর্নে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী অন্যান্য লোকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল বাবিনী মিত্রের পরবর্ত্তী কর্ম্মচারীদের অক্ষমতায় তাহা আজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে যদি সমবায় বিভাগ পুনর্গঠনের উপায় উদ্ভাবিত না হয় তবে অদূর ভবিষ্যতেই ইহার সকল প্রকার কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহাকে কার্য্যকরীভাবে পরিচালনা করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের পদ ও কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরের পদ একই কর্ম্মচারীর অধীনে সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা যাইতে পারে এবং এই দুই জনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি যুবক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে পারে। যে যে সহকারী রেজিষ্ট্রার বর্ত্তমানে কার্য্যক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিফলতাই অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং ইনস্পেক্টরগণের অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে অবিলম্বে ছাঁটাই ও বরখাস্ত করা উচিত এবং তাঁহাদের কার্য্যকে কালেক্টর, মহকুমা হাকিম ও সার্কেল অফিসারদিগের হস্তে দেওয়া উচিত। যিনি কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর এবং সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার হইবেন, তাঁহার অত্যন্ত কর্ম্মকুশল হওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত উভয়বিধ কর্ম্মেই তাঁহাকে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে।

সেক্রেটারিয়েটে সেক্রেটারী ও ডেপুটি সেক্রেটারীর সংখ্যা প্রয়োজনের অধিক আছে। ইঁহাদের সংখ্যা কমে কমান উচিত। বর্ত্তমানে প্রত্যেক ছোট ছোট বিভাগ এক জন করিয়া সহকারী সেক্রেটারী কর্তৃক পরিচালিত হইতে পারে এবং এক জন সেক্রেটারীর অধীনে তাঁহারা সকলে থাকিতে পারেন।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে আই-সি-এসগণের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত। বাংলার আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত অতিরিক্ত অফিসারগণকে অন্যান্য প্রদেশে বদলি করা কিম্বা দেশ গঠন বিভাগে দেওয়া।

প্রতি বৎসর পি-ডব্লু-ডিতে অত্যধিক অর্থব্যয় হইতেছে। এই বিভাগের অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। ইহা কঠিন কার্য্য বটে, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কার্য্যটি অসম্ভব হইবে না। এই বিভাগের দুর্নীতি সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহা রহিত করিবার জন্য কার্য্যকরী কিছুই করা হয় নাই। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট সকল লোকের আশা-ভরসার স্থল, সুতরাং এই অসদুপায়সমূহ এখনই বন্ধ হওয়া দরকার। ইহার জন্য যদি এমন কোন অফিসারকে এই পদে নিযুক্ত করিতে হয়, যিনি ইঞ্জিনিয়ার নন, কিন্তু সততার জন্য খ্যাত, তাহা হইলেও গবর্ণমেণ্টের ইহা করিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

বাংলা-আসাম রেলপথের ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান এই দুই ভাগে পাকাপাকি বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে আন্দাজী ভাগের সময় বাংলা-আসাম রেলপথ নিম্নলিখিতরূপে বিস্তৃত ছিল।

	পাকিস্থান	ভারত
ব্রডগেজ লাইন—	৬৮৯	১৯৯
স্মলগেজ লাইন—	১৭	২০
মিটারগেজ লাইন—	১২২২	১৪১০
মোট—	১৯২৮	১৬২৯

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ফলে নিম্নলিখিতরূপে উহা পরিবর্ত্তিত হইবে—

	পাকিস্থান	ভারত
ব্রডগেজ লাইন—	৫১১	৩৭৭
স্মলগেজ লাইন—	১৯	১৮
মিটারগেজ লাইন—	১০৯৬	১৫৩৬
	১৬২৬	১৯৩১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই রেলপথ, আসাম রেল, ই. আই. রেল এবং ও. টি. রেলের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, না বি. এ. রেল হিসাবে একসঙ্গেই রাখা হইবে। যদি আসামের রেলপথকে বিহারের রেলপথের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আসাম ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য পাকিস্থানের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে না। এবং এই প্রয়োজনটি যে অচিরেই দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আসামের সমস্ত প্রদেশের সঙ্গে জলপাইগুড়ির যাতায়াতব্যবস্থা,

হাসিমারার সঙ্গে মাদারিহাট এবং যোগরাকটের সঙ্গে শিলি-গুড়ি যোগ করিলে এবং শিলিগুড়ি ও কিষণগঞ্জের মধ্যে যে ন্যারোগেজ রেল লাইন আছে তাহাকে যদি মিটার গেজে পরিবর্তিত করা যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের মাটির উপর দিয়া আসামের সহিত যোগ রক্ষা সহজসাধ্য হইবে। এই কার্য্যটি যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করা উচিত।

কলিকাতা বন্দরের সমৃদ্ধি এবং ভারতের স্বার্থরক্ষাকল্পে এই বন্দরের সহিত পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ আসাম ও বিহারে মিটার গেজের রেলপথ নির্মাণ আবশ্যক। এখনকার ন্যায় রেলপথ ব্রড, ন্যারো ও মিটার গেজে বিভক্ত থাকিলে যাতায়াত ও মাল চলাচলে বিস্তর অসুবিধা হইবে। রেলপথ একই মাপের হইলে এই অসুবিধা দূর হইবে। কলিকাতা ও লালগোলা ঘাটের মধ্যে যে রেল লাইন আছে তাহার সঙ্গে একটি মিটার গেজ লাইন বসাইলে ইহা সহজেই সম্পন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে কিছুদিনের জন্য অবশ্য পাকিস্থানের রোহনপুর ও গোদাগাড়ী ঘাটের ভিতর দিয়া উত্তর-বঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ মুর্শিদাবাদের লালগোলাঘাট ও মালদহ জেলার মধ্যে গঙ্গার উপরে কোন ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি ত্রিশ মাইল মিটার গেজ রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই একটি লাইন নির্ম্মাণ করিয়া লইলে কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং যাতায়াতের সময় পাকিস্থান দিয়া না গেলেও চলিবে।

বাংলা, আসাম, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, মালদহ, ভুটান, সিকিম, পূর্ব্ব নেপাল, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানের রেলপথে যে প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্পদ্রব্য ও খাদ্য সরবরাহ করে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই কেন্দ্র হইতেছে কলিকাতা। সুতরাং কলিকাতা এত দিন যেমন রেলওয়ের হেড অফিস ছিল এখনও তাহাই থাকা উচিত। রেলের হেড অফিস একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রে অবস্থিত হইলে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সুবিধা হয়। কিন্তু রেলকর্ত্তৃপক্ষ ইহা বিবেচনা না করিয়া পাণ্ডু এবং গৌহাটিতে আসাম রেলের হেড অফিস বসাইতেছেন। ইহাতে কর্ম্মচারীদের বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় হইবে। অথচ কিষাণগঞ্জ হইতে সপ্ত গ্রাম পর্য্যন্ত ৭০ মাইল ন্যারো গেজকে মিটার গেজে পরিবর্তন এবং ৮০ মাইল নূতন রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে পাণ্ডু ও গৌহাটিতে হেড অফিস পাঠাইবার কোন প্রয়োজনই থাকে না। বর্ত্তমানে এক মাইল মিটার গেজ লাইন নির্ম্মাণের ব্যয় মোট ৫০,০০০৲ টাকা; এই হিসাবে উক্ত রেলপথ নির্ম্মাণে ৭৫ লক্ষ টাকা মাত্র লাগে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মিটার গেজের গাড়ীগুলিকে মাঝে মাঝে সারাইবার জন্য সৈয়দপুরের কারখানায় পাঠাইতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যতে কাঁচড়াপাড়ায় এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কারণ সেখানে বড় এবং ছোট উভয়বিধ রেলগাড়ীই মেরামত করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় ব্যয়ও কম হইবে নিশ্চয়।

এতদিন পর্য্যন্ত আসাম রেলওয়েকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য সৈয়দপুরের ডিপো ও কলিকাতার বাজারের উপর নির্ভর করিতে হইত। আসাম রেল আলাদা করিলে তাহার প্রতি দিনের আবশ্যক জিনিষগুলির জন্য গুদাম তৈয়ারী করিতে হইবে। ইহাতে কয়েক বৎসর সময়ও লাগিবে কিন্তু বি. এ. রেল পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবানুসারে অক্ষুণ্ণ রাখিলে আসাম রেলপথ, হালিসহর ও কাঁচড়াপাড়া কারখানাগুলি হইতে সকল প্রকার সাহায্যই পাইবে এবং কলিকাতার বাজারের সহিত তাহার সম্পূর্ণ যোগাযোগও বজায় থাকিবে।

গঙ্গার উত্তরদিকের ও কলিকাতার উত্তর-পশ্চিমের রেল-পথ-গুলিকে অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে গোরক্ষপুর হইতে ইহাদের পরিচালনা করিতে হইবে এবং তাহাতে যথেষ্ট অসুবিধা হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে এখনও কলিকাতা হইতেই ইহা পূর্ব্ববৎ সহজে পরিচালিত হইতে পারিবে।

বিশেষ কোন জরুরি অবস্থা ঘটিলে গৌহাটিতে এক জন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের অধীনে আসাম রেল সম্পূর্ণ স্বাধীন অংশরূপে কাজ করিতে পারিবে। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল এবং যথেষ্ট সফলও হইয়াছিল।

বি-এ রেলওয়েকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলে যত কর্ম্মচারী লাগিবে উহা অক্ষত রাখিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম কর্ম্ম-চারী দ্বারাই কার্য্য চলিবে। আসাম রেলপথকে একটি পৃথক রেলপথে পরিণত করা হইয়াছে, এবং বেঙ্গল-আসাম রেল পথের অন্যান্য অংশগুলির এক ভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও অপর ভাগ অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলওয়ের সহিত যুক্ত করা হইতেছে। বেঙ্গল-আসাম রেলকে পূর্ব্ববৎ একটি সম্পূর্ণ রেলপথ হিসাবে বজায় রাখিলে ব্যয়সংক্ষেপও যথেষ্ট হইবে। ইহাতে যাতায়াতের অসুবিধা হইবে না এবং রেলের হেড অফিস কলিকাতা হইতে সরিয়া যাওয়ার প্রয়োজন না থাকায় লোকের অসুবিধাও হইবে না।

নবগঠিত বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের পরিচালনার সুবিধার জন্য কলিকাতা কাঁচড়াপাড়া এবং কাটিহার লইয়া একটি জেলা এবং আসাম একটি জেলা হিসাবে গঠিত হইতে পারে। এক জন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারের অধীন আসাম রেলকে কতকটা স্বাতন্ত্র্য দিলে আসামের কোন অসুবিধাই হইবে না।

গুদামের মাল বণ্টন, এঞ্জিন, রেলগাড়ী, মালগাড়ী এবং অন্যান্য জিনিষগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া হিসাব লওয়া দরকার। আপাততঃ বিভাগ-অনুসারে যে সকল বণ্টন হইয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করা হইয়াছে এবং কর্ম্মচারি-গণ, জনসাধারণ ও সংবাদপত্র সকল ইহার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও ইহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। এখন এ অবস্থার

আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বণ্টনকার্য্যকে সুপরিচালিত করিবার জন্য এবং অযথা সময় ও অর্থ ব্যয় না করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ড হইতে এখনই আদেশ দেওয়া উচিত এবং যত শীঘ্র সম্ভব নূতন ভিত্তিতে এই বণ্টনকার্য্য সম্পন্ন করা উচিত। তবে নূতন রেল নির্ম্মাণ ও সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব করা হইল তাহাতে এখনই হাত দেওয়া দরকার। ইহাদ্বারা ভারতবর্ষের সহিত আসামের রেল দ্বারা সংযোগ সাধন এবং কলিকাতায় রেলের হেড অফিস বজায় রাখা এই দুইটি কাজই একসঙ্গে হইতে পারিবে। পাণ্ডু ও গৌহাটিতে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বহু বাঙালী কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাতে আসামীদের 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলন আরও প্রবল হইয়াছে। ইহারা কলিকাতায় চলিয়া আসিলে আসামের এই বিসদৃশ অবস্থারও কতকটা প্রতিকার হইতে পারে।

হিন্দুসমাজ সংগঠন সমিতি

নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়া, বাকলা, বিক্রমপুর এবং কলিকাতার পণ্ডিত মহোদয়গণ হিন্দুসমাজ রক্ষাকল্পে কিছুদিন আগে যে সকল ব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহাকে ভিত্তি করিয়া হিন্দুসমাজ সংগঠন সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত সমাজের নির্দ্দেশ কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ঘোষণার নির্দ্দেশগুলি এইরূপ :—

"চতুর্ব্বর্ণ ও তদন্তর্গত শ্রেণীর অস্তিত্ব সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ এক ও অবিভাজ্য। হিন্দুজাতির বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকার-বৈষম্য থাকিবে না। হিন্দুর মন্দিরে বা পূজামণ্ডপে হিন্দু মাত্রেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে, কেবল ব্যক্তিগত মন্দিরে বা মণ্ডপে অপরের প্রবেশ মালিকের অনুমতি সাপেক্ষ হইবে। হিন্দুসমাজের ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি হিন্দু মাত্রেরই কার্য্য করিবে। ব্রাহ্মণ হিন্দুমাত্রেরই পূজাদি ধর্ম্মকার্য্যে পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন, তজ্জন্য কোন সামাজিক অবনতি ঘটিবে না। অত্যাচারনিপীড়িত ও বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত জনসমূহের ও ধর্ষিতা নারীগণের হিন্দুত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। বলপূর্ব্বক বিবাহ হইলেও শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহা বিবাহই নহে। তাঁহাদের সকলেই স্বসমাজে পূর্ব্ববৎ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিবেন।"

সমিতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন : (১) হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা এবং জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে হিন্দুসমাজের উন্নয়ন ; (২) জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুকে জীবনযাপন ও উন্নয়নের পূর্ণ ও সমান সুযোগ দান করিয়া এবং সামাজিক অধিকার বৈষম্য সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিয়া পরস্পরের সহিত প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ দ্বারা হিন্দুসমাজের সংহতি বৃদ্ধি এবং (৩) কোন হিন্দু পুরুষ বা নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার স্বকীয় ধর্ম্ম জীবনযাপন ব্যাহত হইলে তাঁহার সামাজিক অধিকার যাহাতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া হিন্দুসমাজের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা।

সমিতির কার্য্যসূচীতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল হিন্দুর একত্র পানাহারের ব্যবস্থা ও প্রচলন করা এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ হইতে হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা সামাজিক সংহতি বৃদ্ধির অন্যতম পন্থারূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সমিতির কর্ম্মধারা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতিবর্জ্জিত। হিন্দুসমাজের স্বাস্থ্যকর সংগঠন ও পুনর্গঠন ইহার লক্ষ্য হইলেও কোন অহিন্দু সমাজের সহিত ইহার বিরোধ নাই এবং সকল অহিন্দু সমাজের প্রতি এই সমিতির শুভেচ্ছা আছে। সমিতির উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রতি জেলায়, মহকুমায়, থানায় এবং গ্রামে শাখা সমিতি স্থাপন করা হইতেছে। একটি পরিচালকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে সমিতির কাজ চলিতেছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথম বৎসরের পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন : সভাপতি—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীতারকচন্দ্র রায় এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, হিন্দু মহাসভার সম্পাদক এবং হিন্দু মিশন, বৈশ্যসাহা মহাসভা, পাটনী সভা, নাপিত মহাসভা, রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি প্রভৃতির প্রতিনিধিরাও পরিচালকমণ্ডলীর সভ্য আছেন।

আন্তরিকতার সহিত কাজ করিলে সমিতি বাংলার জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান সঙ্কটক্ষণে একটি বড় অভাব পূরণ করিতে পারিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

উপেক্ষিত চিকিৎসক

ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বিবৃতি দিয়াছেন :

> গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে অনেক ডাক্তার ইংলণ্ডে আসেন অথবা যুদ্ধের প্রারম্ভে অনেক ডাক্তার ইংলণ্ডে বসবাস করেন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের মেডিক্যাল কাউন্সিল ইঁহাদের শিক্ষাকে স্বীকার করেন না এবং আইনতঃ ইঁহারা রেজিষ্টার্ড ডাক্তার বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কিন্তু যুদ্ধের সময় ডাক্তারের অভাব ঘটিলে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সাময়িক ভাবে রেজিষ্টার্ড ডাক্তার বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই সব বিদেশী ডাক্তারকে যাহাতে স্থায়ী রেজিষ্টার্ড ডাক্তার হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় ইতিমধ্যে সেই মর্ম্মে পার্লামেণ্টে একটি বিল আনা হইয়াছে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ১৯২১ সালে বহু ছাত্র তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসেন। ইঁহাদের অধিকাংশকে পল্লীর কাজের জন্য পাঠান হয় এবং কাহাকে কাহাকেও পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসা-কার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। বাংলাদেশে মহাত্মাজী ও দেশবন্ধুর

অনুপ্রেরণায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হয়। মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত পড়িবার পর তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষা বেশ শক্তই হইয়া থাকে এবং বিশেষজ্ঞগণই তাঁহাদের পরীক্ষা লইয়া থাকেন। তথাপি তদানীন্তন বাংলা গবর্ণমেণ্ট ইঁহা-দিগকে অনুমোদিত ডাক্তার হিসাবে গণ্য করেন নাই। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটকে পরে এল এম এফ কোর্সের জন্য অনুমোদন করা হয় এবং ইহার কোর্স হয় চারি বৎসরের। কিন্তু এই অনুমোদনের পূর্ব্বে যে সব ছাত্র ৫ বৎসর পড়িয়াছে তাঁহাদিগকে আর অনুমোদিত বলিয়া গণ্য করা হইল না। ইঁহাদের অনেকেই নীরবে বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া দেশের অপরিসীম সেবা করিয়া আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে রেজিষ্টার্ড ডাক্তার বলিয়া গণ্য করিবার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এই সব ডাক্তারের জন্য কিছু করিবেন ইহা আশা করা কি অন্যায় হইবে?

এই চিকিৎসকগণকে রেজিষ্টার্ড ডাক্তাররূপে গণ্য করিবার দাবি জানাইয়া ইতিপূর্ব্বে আন্দোলনও হইয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কিন্তু এখন আর ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবার কোনই কারণ নাই। মন্ত্রীদের উদ্যোগী হইয়া এই চিকিৎসক-দের যথারীতি রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়ার জন্য অগ্রণী হওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলে এই চিকিৎসক-দের অনেকে দীর্ঘকাল যাবৎ খুব ভাল কাজ করিতেছেন। গ্রামবাসীদের সুচিকিৎসার যে সরকারী পরিকল্পনা এখন প্রস্তুত হইতেছে ইঁহারা প্রায় ২০ বৎসর কাল তদনুসারেই কাজ করিয়া আসিতেছেন, ইঁহাদের এই দান আজ কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সব ছাত্র গ্রাজুয়েট হইয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিবেচনা করা উচিত। বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ অধ্যাপনা করিয়াছেন। যে সব ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জার্ম্মাণী গিয়া ভাষা-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন এবং নিজ নিজ বিষয়ে মৌলিক কার্য্য দ্বারা জাতির জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গীয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে জার্ম্মাণীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বি-এ ডিগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহারা সে স্বীকৃতি পান নাই। কোন কোন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ইহাদের ডিগ্রী অনুমোদিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন। আশা করি বাংলার বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল চিকিৎসকদের সরকারী অনুমোদন দানের সময় দীর্ঘকালের উপেক্ষিত এই ছাত্রদের প্রাপ্য সম্মান দানে কুণ্ঠিত হইবেন না।

গবর্ণরের দায়িত্ব

ভারতীয় গবর্ণরদের যে সব গুণ থাকা উচিত বলিয়া গান্ধীজী মনে করেন গত ২৪শে আগষ্ট তারিখের হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি তাহা আলোচনা করিয়াছেন। গান্ধীজী লিখিতেছেন:

১। ভারতীয় গবর্ণর নিজ দেহে এবং পরিবেশে সম্পূর্ণ-ভাবে মাদকস্পর্শ-মুক্ত থাকিবেন। ইহা ব্যতিরেকে মাদক-বিষ বর্জ্জনের সার্থক প্রয়াসের কল্পনা করা যায় না।

২। তাঁহার পরিবেশ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ পাইবে চরকায় সূতাকাটা—ভারতের কোটি মূক জনগণের সহিত একাত্মবোধের সুস্পষ্ট প্রতীকরূপে, কায়িক শ্রমই যে মানুষের অন্নে অধিকারের মূলে এই নীতির ধারকরূপে, আর বর্ত্তমান শোষণ-নীতির দ্বারা সুসংবদ্ধ হিংসায় প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার স্থলে সুব্যবস্থিত অহিংসার সূচকরূপে।

৩। সামান্য কুটিরে তিনি বাস করিবেন। তাঁহার গৃহের দ্বার সকলের জন্যই সদা অবারিত থাকিবে; অবশ্য সেখানে লোকচক্ষের অন্তরালে ভাল করিয়া কাজ করিবার সহজ ব্যবস্থাও থাকা চাই। ব্রিটিশ গবর্ণর ত স্বভাবতঃই ব্রিটিশ শক্তির প্রতিনিধি ছিলেন; কাজেই তাঁহার ও তাঁহার সাঙ্গো-পাঙ্গের জন্য সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যরক্ষী অনুচরবর্গসহ তাঁহার বসকে এই প্রাসাদ ঘিরিয়া থাকিত। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত দেশীয় লাটকে রাজন্যবর্গ ও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের দূতগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কতকটা জমকালো সাজীঘর রাখিতে হইতে পারে। এইরূপে দেশীয় লাটের আতিথ্য গ্রহণ যেন অতিথিদের মনে নূতন চেতনা সঞ্চারের পথ হইয়া উঠে এদেশীয় লাটের আচরণ ও পরিবেশ দেখিয়া তাঁহারা যেন সাম্যের প্রকৃত স্বরূপ—দীনতমের সহিত একাত্ম-বোধের বাস্তব অভিব্যক্তি শিখিয়া যাইতে পারেন। দেশী ও বিদেশী মূল্যবান আসবাবপত্র দেশীয় গবর্ণরের জন্য নহে, তাঁহার মন্ত্র হইবে উচ্চ চিন্তা ও সরল জীবন; এই মন্ত্র তাঁহার গৃহদ্বারে উৎকীর্ণ হইয়া শোভা বৃদ্ধি করিবে না, পরন্তু তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মে নিত্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে।

৪। তিনি কোনক্রমেই কুত্রাপি অস্পৃশ্যতা স্বীকার করিবেন না; জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণগত কোন ভেদই তিনি মানিবেন না। সকল ধর্ম্মের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু তাহা তাঁহার মধ্যে প্রতিফলিত হইবে। ভারতের নাগরিক থাকিয়াই তিনি জগতেরও এক জন নাগরিক হইবেন। আমরা পুঁথিতে পড়িয়াছি খলিফ; ওমর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিরাজ হইয়াও এইরূপ সরল জীবন যাপন করিতেন। প্রাচীন কালের জনক রাজাও এই পথে চলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লর্ড ও নবাব-নন্দনদের দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও ইটন বিদ্যা-মন্দিরের শিক্ষা-গুরুকে স্বগৃহে এইরূপ সরল জীবন যাপন করিতে দেখিয়াছি।

ভারতের বুভুক্ষু কোটি জনগণের গবর্ণরও কি ইহার অপেক্ষা কম কিছু করিবেন?

৫। যে প্রদেশের যিনি গবর্ণর হইবেন সেই প্রদেশের মাতৃভাষায় তিনি কথা বলিবেন। ভারতের রাষ্ট্রভাষায় হিন্দুস্থানীও তিনি নাগরী ও উর্দ্দু লিপিতে পড়িতে ও বলিতে পারিবেন। সংস্কৃতবহুল হিন্দী অথবা পার্শীবহুল উর্দ্দু কোনটিই এই রাষ্ট্রভাষা নহে। বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার উত্তরে কোটি কোটি লোকের কথ্য ভাষাই হইল এই হিন্দুস্থানী।

ভারতীয় গবর্ণরের মধ্যে কি কি গুণ প্রতিফলিত হওয়া উচিত তাহার সমগ্র ফর্দ দিবার চেষ্টা ইহা নহে। উদাহরণস্বরূপ কতকগুলির উল্লেখ করা হইল মাত্র।

এদেশীয় গবর্ণরগণ যে ভাবে জীবন যাপন করিবেন আশা করা যাইতেছে, ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক ঐ পদে নির্ব্বাচিত ইংরেজগণও সেইভাবে জীবন যাপন করিবার চেষ্টা করিবেন এইরূপ আশাও করা যায়। তাঁহারাও ত ভারতের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইয়াছেন। ব্রিটেনের পক্ষ হইতে ভারতকে তথা জগৎকে যাহা দিবার আছে তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহাদের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইবে।

প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজ গবর্ণরদের মধ্যে দুই জন ব্যতীত অপর সকলেই ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইয়াছেন। তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন। দেশের লোকে মনে করে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা যাহাতে সুচারুরূপে দেশের সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বর্ত্তমান গবর্ণরদের প্রধান দায়িত্ব। গবর্ণরেরা কনষ্টিটিউশনের দাস না হইয়া কনষ্টিটিউশনকে তাঁহারা মানবকল্যাণে নিযুক্ত করিবেন ইহাই তাঁহাদের নিকট দেশবাসী আশা করে। অন্য স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মন্ত্রীরা রাজনৈতিক চালবাজির দ্বারা অধিকসংখ্যক ভোট হাতে রাখিতে পারিয়াছেন এই কারণে বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও দেশপ্রেমিক গবর্ণর যদি তাঁহাদের পরামর্শ অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিয়া দেশকে সর্ব্বনাশের পথে চলিতে দেন তাহা হইলে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতাদের গবর্ণরের পদে নিয়োগ নিরর্থক হইয়া পড়ে। মন্ত্রীদের কাজে দেশের ক্ষতি হইতেছে, কংগ্রেসের আদর্শের অমর্য্যাদা হইতেছে বলিয়া যদি গবর্ণর মনে করেন তাহা হইলে কংগ্রেসের উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের মারফৎ যেমন এক দিকে তিনি মন্ত্রীদের উপর চাপ আনিয়া তাঁহাদিগকে সংযত করিতে পারিবেন, অপর দিকে প্রয়োজনবোধে জনসাধারণকে সমস্ত অবস্থা অসঙ্কোচে জানাইয়া জনমতের চাপে ফেলিয়াও মন্ত্রীদের সায়েস্তা করিতে পারিবেন। ইংরেজ গবর্ণরেরা এদেশে যে সকল নিয়মতান্ত্রিক ধারা মানিয়া চলিয়াছেন, স্বাধীন ভারতের প্রাদেশিক গবর্ণরদের তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। মন্ত্রীরা যেমন জননায়ক, গবর্ণরেরাও তেমনি জননায়ক। গণস্বার্থ জনগণকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া এবং গণদাবি মানিয়া লইয়া জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করা গবর্ণর এবং মন্ত্রী উভয়েরই কর্ত্তব্য। শাসন কার্য্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জনসাধারণকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ দিলে ডিক্টেটরী শাসন মাথা তুলিতে পারিবে না। কংগ্রেসী গবর্ণরেরা প্রাদেশিক ভাষা আয়ত্ত করিয়া এবং প্রদেশের কৃষি শিল্প শিক্ষা সমাজ ও রাজনীতি বুঝিয়া লইয়া মন্ত্রিমণ্ডল এবং ব্যবস্থা-পরিষদের বাহিরে যে সকল সমাজসেবক নীরবে ও নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা করিয়া যাইতেছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। কংগ্রেসী গবর্ণরেরা পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক সাক্ষীগোপাল নহেন, তাঁহারা জননায়কও, এই ধারণা সাধারণের মনে জন্মিতে দেওয়া দরকার যাহাতে দেশের আপামর জনসাধারণ পরাধীন ভারত ও স্বাধীন ভারতের গবর্ণরের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে।

মাদ্রাজে অর্থসচিবের বক্তৃতা

কিছুদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদিগের একটি যুক্ত বৈঠকে অর্থসচিব মিঃ আর কে সন্মুখম চেট্টি ব্যবসায়ীদিগকে, বিশেষ করিয়া শ্রমিকদিগকে, আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, জাতীয় সরকার তাঁহাদের ধ্বংস করিবেন বলিয়া আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। মনে হয়, ক্যাবিনেটের কয়েকজন সদস্যের ও কংগ্রেসসেবীর বিবৃতি দানের ফলে শ্রমিকদের মনে যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্যই অর্থসচিবের এই প্রয়াস। এই অনুমান সত্য হইলে তাঁহার প্রচেষ্টা যে যথোপযুক্ত ও সময়োচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সকলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে, ধনীদের সম্পত্তি লুঠ হইবে ইত্যাদি যে আশঙ্কা কতকগুলি মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার ফলে কতক লোকের মনে জন্মিয়াছে, অর্থ-সচিব তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং সকলকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। অর্থনৈতিক মতবাদ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ সি, এইচ, ভাবা যে আহ্বান জানাইয়াছিলেন অর্থসচিব তাঁহার বিবৃতিতে তাহা সমর্থন করিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দেশ যে অর্থনৈতিক মতবাদের সম্মুখীন হইয়াছে, নূতন অর্থসচিবের বিবৃতিতে তাহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানের জাতীয় সরকার একান্ত ভাবে জনসাধারণের, কোন শ্রেণীবিশেষের নহে। বাজারে পণ্যদ্রব্যের যে অনটন দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য মিঃ সন্মুখম চেট্টি কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন যে কেবলমাত্র সরবরাহের ত্রুটির জন্যই অভাব দেখা দেয় নাই। অনটনের মূলে রহিয়াছে সরবরাহের ত্রুটি ও বণ্টনে দোষ। এই বণ্টন-ব্যবস্থা যদি সুপরিচালিত হয় তবে দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

অর্থসচিব সকলকে ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতে বলেন এবং তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, দেশের শাসন পরিচালনাতেও তাঁহাদের বৃহৎ কর্তব্য রহিয়াছে। বর্তমান জগতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব যত বেশী, রাজনৈতিক অস্তিত্ব তত বেশী নয় বলিলেই সঠিক বলা হইবে। সুতরাং সাধারণের প্রাত্যহিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সহিত ইহাকে সমান ভাবে চলিতে হইতেছে। এই সুবৃহৎ পরিবর্তনের জন্যই ব্যবসায়ী ও বণিকদের প্রতিনিধিগণ নিজেদের দেশের পরিচালনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এই সম্পর্কে মিঃ সমুখম বলিয়াছেন,

"অতএব, স্বাধীন ভারতে আপনাদের মহান্ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয় আপনারা যদি আপনাদের অধিকার ও কর্তব্য বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে আপনারা নিজেদের সুখ-সুবিধাগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না, কিন্তু জনসাধারণের সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে, বিচক্ষণতার সহিত আপনাদের সেগুলিকেও অনুধাবন করিতে হইবে। আমরা চাই যে বণিক সম্প্রদায় তাঁহাদের দেশের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হউক।"

বক্তা বলেন, "আধুনিক সমাজ অর্থনৈতিক দিক দিয়া কন্ট্রোল ও পরস্পর সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগ চলিয়া গিয়াছে। যন্ত্রযুগ ও শ্রমশিল্পের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সর্বত্র মিতব্যয়িতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে এবং সকল শক্তির রেষারেষি বন্ধ হইয়াছে। আমরা সকলের প্রতিনিধি, কোন শ্রেণীকে বিনষ্ট করিতে আমরা আসি নাই। দারিদ্র্যকে ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই মহৎ কার্য্যে এবং স্ব স্ব স্বার্থরক্ষার জন্যও স্বাধীন সরকারের সহিত সমগ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহযোগিতা করা কর্তব্য। এই দারিদ্র্যকে ধ্বংস করিতে হইলে সকল সম্প্রদায়েরই প্রত্যেক লোককে স্বীয় ক্ষমতা নিয়োজিত করিতে হইবে। সমাজে ধনী-দরিদ্রভেদে এই প্রচেষ্টার মধ্যেও ভেদ থাকিবে। সুতরাং যদি দেখা যায় যে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীকে বেশী ত্যাগ করিতে হইতেছে তবে বুঝিতে হইবে যে প্রত্যেক লোকের ক্ষমতা অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর লওয়া হইতেছে। আধুনিক জগতে এই কঠোর সত্য সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে।" মিঃ সমুখম তাঁহার ভাষণে এই সকল কথা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সর্বশেষে, মিঃ সমুখম চেট্টি সকলকে সাবধান করিয়া বলেন যে, বর্তমানে কোন ব্যক্তি রককেলার বা ফোর্ডের ন্যায় অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না কিন্তু তিনি ইহাও জোর দিয়া বলেন যে, দ্রব্য উৎপাদনের কোন প্রচেষ্টা বা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের পথে অথবা শুল্ক আরোপ করিয়া তাহা নষ্ট করা হইবে না। যে সরকার ইহার বিপরীত করে, সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া থাকে। অর্থসচিব স্যার সমুখম চেট্টি মোটামুটি ভাবে যাহা বলিয়াছেন তাঁহার সহিত অনেকেরই মতভেদ হইবে না। কিন্তু কাজে এখনও বিশেষ কোন তৎপরতা দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের ট্যাক্স ব্যবস্থা ইংরেজ এমন ভাবে করিয়া লইয়াছিল যাহাতে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য মাথা তুলিতে না পারে। অবিলম্বে সমগ্র ট্যাক্স ব্যবস্থার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় ভারতের অর্থসচিব এখনও এরূপ কোন কমিটি নিযুক্ত করিবার কথা বলেন নাই। ট্যাক্সের সহিত পণ্যোৎপাদন এবং পণ্যোৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত শ্রমিকের ও ক্রেতার যোগ ওতপ্রোত; সেদিক দিয়াও ট্যাক্সের গলদগুলি ধরা দরকার।

পঞ্জাব সম্বন্ধে সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের রায়

পঞ্জাব সীমানা কমিশনের চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুলতান ও রাওয়ালপিণ্ডি বিভাগ সম্পূর্ণ এবং লাহোর বিভাগের গুজরানওয়ালা, সেখপুরা ও শিয়ালকোট জেলা পশ্চিম-পঞ্জাবের মধ্যে পড়িবে আর পূর্ব্ব-পঞ্জাবে পড়িবে জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগের সমুদয় অংশ এবং লাহোর বিভাগের অমৃতসর জেলা। লাহোর বিভাগের গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা উভয় অংশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুরুদাসপুর জেলায় ইরাবতী নদীর পশ্চিম দিকস্থ শকরগড় তহশীলটি পশ্চিম-পঞ্জাবে এবং ইরাবতী নদীর পূর্ব্বদিকস্থ পাঠানকোট ও গুরুদাসপুর ও বাটালা তহশীল পূর্ব্ব-পঞ্জাবে পড়িয়াছে আর লাহোর জেলায় চুনিয়ান ও লাহোর তহশীলের সমুদয় অংশ পশ্চিম পাঞ্জাবে পড়িয়াছে। কাসুর তহশীলটি উভয় অংশের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রায়দান প্রসঙ্গে স্যর সিরিল র‍্যাডক্লিফ বলেন যে, সীমানা কমিশনের সদস্যদের মতৈক্য না হওয়ায় আমাকেই এই রায় দিতে হইতেছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমারেখার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল—

পঞ্জাবকে দুই ভাগে ভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। উভয় পক্ষই বিরাট অঞ্চল দাবি করিয়াছেন। তবে মোটামুটি বিপাশা-শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিরোধ দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলের খালগুলির জন্য সীমারেখা নির্ধারণ করা আরও শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, কারণ খাল বা রাস্তা একটি প্রদেশের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাই এই সব সমস্যা ও অন্যান্য প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া আমি এই রায় দিতেছি।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সীমারেখা

১। কাশ্মীর হইতে উজ নদী যে স্থলে পঞ্জাব প্রদেশের

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে উত্তরে সেই স্থান হইতেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সীমারেখা আরম্ভ হইয়াছে। পাঠানকোট তহশীলে যে স্থলে পাঠানকোট, শকরগড় ও গুরুদাসপুর তহশীল মিলিত হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত উক্ত নদীর দ্বারাই দুই পঞ্জাবের সীমা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সীমা তহশীলের সীমানার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে, উক্ত নদীর গতিপথের দ্বারা নহে।

২। উপরে যে তিনটি তহশীলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই তিনটি তহশীল যে স্থানে মিলিয়াছে সেই পর্য্যন্ত প্রবহমাণ উক্ত নদী ইরাবতীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত সীমানা নির্দ্দেশ করিবে। অতঃপর গুরুদাসপুর ও শকরগড় তহশীলের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ ইরাবতী, বাতালা ও শকরগড় তহশীলের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ ইরাবতী, বাতালা ও নরোওয়ালের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ ইরাবতী আজনালা ও নারোওয়ালের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ ইরাবতী এবং আজনালা ও সহারী তহশীলের মধ্য দিয়া প্রবহমাণ ইরাবতী নদী ধরিয়া যেস্থলে অমৃতসর জেলা লাহোর জেলায় মিলিয়াছে সেই পর্য্যন্ত সীমারেখা নির্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত নদী ইরাবতী নদীর গতিপথের সহিত সীমানার কোন সম্পর্ক নাই।

ইরাবতী নদীর যে স্থলে অমৃতসর জেলা ও লাহোর জেলা মিশিয়াছে সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সীমানা দক্ষিণ মুখে আজনালা ও লাহোর তহশীলের সীমানা ধরিয়া অগ্রসর হইবে। অতঃপর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সীমানা তারণ ও লাহোর তহশীল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া কাস্তর, লাহোর ও তারণ তহশীলের সংযোগ স্থল পর্য্যন্ত যাইবে। অতঃপর সীমারেখা লাহোর ও কাস্তর তহশীলের সীমানা ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হইবে এবং বারোলিয়াম গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে গিয়া মিলিবে। অতঃপর সীমারেখা এই গ্রামের পূর্ব্ব কিনারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া হাতিয়ানওয়ালা গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত যাইবে। অতঃপর সীমারেখা হাতিয়ান-ওয়ালা গ্রামের পূর্ব্ব কিনারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া ওয়াইগল গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত যাইবে। অতঃপর উহা ওয়াইগল গ্রামের পূর্ব্ব কিনারা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া কালিয়া গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত যাইবে এবং তাহার পর ওয়াইগল গ্রামের দক্ষিণ সীমানা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পানহয়াওয়াল গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে। অতঃপর সীমারেখা পানহয়া-ওয়াল গ্রামের পূর্ব্ব সীমানা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া গান্ধোকে গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত যাইবে। অতঃপর সীমারেখা গান্ধোকে গ্রামের পূর্ব্ব সীমানা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া কাস্তভূমি কালান গ্রামের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত যাইবে। কাস্তভূমি কালানের পূর্ব্ব সীমানা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া সীমারেখা কালান ও মাস্তগড় গ্রামের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত যাইবে।

পশ্চিম-পঞ্জাবের অবস্থা

পশ্চিম-পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু ও শিখদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া জেলার লোমহর্ষণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া লালা ভীমসেন সাচার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট একটি বিবরণী দাখিল করিয়াছিলেন। মিঃ সাচার কিছুদিন পূর্ব্বে সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর প্রহরাধীনে থাকিয়া অপর ছয় জন সদীর সহিত সরকারের অনুমতি লইয়া দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চল-গুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

উক্ত বিবরণীতে মিঃ সাচার বলিয়াছেন যে, পশ্চিম পঞ্জাবের শহর ও মফঃস্বলে হিন্দু ও শিখদের বাসস্থান বলিতে কিছুই নাই; তাহাদের সমস্ত আবাসগৃহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। অন্য দিকে, মুসলমান অধ্যুষিত পাশের গ্রামগুলিতে দাঙ্গার চিহ্নমাত্র নাই, সেখানে স্বাভাবিক জীবন অব্যাহত রহিয়াছে।

হাজার হাজার নরনারী ও শিশু তাদের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া এখনও কয়েকটি অঞ্চলে বাঁচিয়া আছে। ট্রেনে বা বাসে চলা দুষ্কর। এই হতভাগ্যদিগকে স্থানান্তরিত করাই আজ সরকার ও নেতৃবর্গের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাথমিক কর্ত্তব্য।

ডাঃ আনন্দ কুমারস্বামী

ভারতবর্ষের যে অল্প কয়েকজন সুসন্তান ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকবর্ত্তিকা হস্তে বিদেশে গিয়াছিলেন, ডাঃ আনন্দ কুমার-স্বামী তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন। ভারতীয় কলা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশকে বুঝাইবার এত বড় ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের পর আর কাহারও ছিল না। আমেরিকায় ইনি দেহত্যাগ করিয়া-ছেন এবং এই মৃত্যুতে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপূরণীয়। ডাঃ কুমারস্বামী ছিলেন সিংহলের অধিবাসী, তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ইংলণ্ডে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারকেই তিনি জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। বিজাতীয় ভাব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রথমে তিনি ভারত ও সিংহলের সংস্কৃতি-গত ঐক্য বুঝাইবার জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে লঙ্কাদ্বীপের সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের সভ্যতারই একটি রূপ মাত্র। ভারতীয় কলাবিদ্যার চর্চ্চা তখন দেশ হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছিল, ডাঃ কুমারস্বামী উহার পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ সফলকাম হন। ক্রমে ক্রমে সমগ্র এশিয়ার কলাবিদ্যার মাধুর্য্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনীষীদের চমৎকৃত করেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ কোমল স্বভাব এই মনীষীকে দেখিলে প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কথাই মনে পড়িত।

স্বাধীনতার উষায় চিন্তা

(১৫ আগষ্ট ১৯৪৭)

ডক্টর শ্রীযদুনাথ সরকার

আজ ভারতের সম্মুখে স্বাধীনতার দরজা খোলা হইয়াছে। মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার আগে আমাদের সেই সব চিন্তার নেতাকে স্মরণ করি, যাঁহারা প্রথমে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং জীবনে তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বাণী আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে; সে বাণী যুগে যুগে অমর হইয়া থাকিবে, কারণ আমাদের ভাবধারা এবং কার্য্যপ্রণালী সব তাঁহাদের অঙ্কিত পথে চলিয়া এতদিনে সফলতায় পৌছিয়াছে। প্রাচীন আর্য্য-দ্রাবিড়-মহারাষ্ট্রব্যাপী হিন্দুধর্মের স্বাধীনতা হইতে, অথবা রাজপুত ক্ষত্রিয়দের বর্ণগত, শ্রেণীগত স্বাধীনতা হইতে আমাদের আজকার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে স্বাধীনতার জন্য আজ আমরা উন্মুখ হইয়া চাহিয়া আছি, তাহা ধর্মগত গোষ্ঠীগত, স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ স্বাধীনতা নহে। আজকার স্বাধীন ভারত পাশ্চাত্য সভ্যতার সব ধন, নব বিজ্ঞানের সব ফলগুলি আদরে মানিয়া লইবে, সেই সব নবীন জগৎ-ব্যাপী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র চালাইবে—অথচ প্রাচীন আর্য্যভূমির এবং মধ্যযুগীয় হিন্দু-দেশের আধ্যাত্ম সম্পদ ও নৈতিক আদর্শ হৃদয়ে পোষণ করিবে। আমরা জগতের কোন লোককে, কোন জ্ঞানকে, অছুৎ বলিয়া ত্যাগ করিব না।

বর্তমান যুগের উপযোগী এই স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেন—রামমোহন রায়। ইহা প্রচার করেন—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। বিদেশে আমাদের দূত হইয়া ভারতের এই স্বাধীনতার দাবি জগৎসভার মধ্যে খাড়া করেন—বিবেকানন্দ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। চিন্তার মৃত্যু নাই, চিন্তা অক্ষয়বটের মত দেশ ছাইয়া শাখা ও শিকড় বিস্তৃত করিতে থাকে। তাই আজকার দিনে প্রথমেই এই সব ভারতীয় চিন্তা-নায়কদের নাম স্মরণ করি, তাঁহাদের পদে মস্তক নত করি।

আমরা যে স্বাধীনতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইতেছি, এই শুভকার্য্যে কি অনুষ্ঠান করা উচিত? ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে এরূপ দিনে উৎসব হয়; তাহারা "উচ্ছ সিত সুরাপাত্রে তুষার গলায়ে করে পান"—ভোজ, নৃত্য, কুচকাওয়াজ ও আমোদের দ্বারা তাহারা স্বাধীনতাকে অভ্যর্থনা করে। কিন্তু এদেশের চারিদিকে তাকাইয়া রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার বলিতে ইচ্ছা করে—

"হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো ঝিঝির ঝিঝিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সে দিন দারুণ দুঃখদিন। • • •
খুলে ফেলো অলঙ্কার, সব রক্তাম্বর,
থামাও উৎসব বাদ্য, রাজ আড়ম্বর,
অগ্নিগৃহে যাও পুজি, ডাকো পুরোহিতে,
কালের প্রতীক্ষা করো, শুদ্ধ সব চিতে।"

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই আমার কথার অর্থ বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ আজ ইংরেজ একটি সম্পূর্ণ দেউলিয়া জমিদারী আমাদের ঘাড়ে সঁপিয়া দিয়া নিজে সরিয়া পড়িতেছে। বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে দুই শত কোটি টাকার নোট চলিত এবং তাহা লইয়া রূপার টাকা দিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য ছিল। এখন বারো শত ষাট কোটি টাকার নোট বাজারে বাহির হইয়াছে, অর্থাৎ আগেকার নোটের ছয় গুণেরও বেশী হ্যাণ্ডনোট সহী করিয়া গবর্ণমেণ্ট কাজ চালাইতেছে। তা ছাড়া, এখন যে টাকা-মুদ্রা চলিতেছে তাহাতে এক গ্রেণও রূপা নাই, সব পিতল বা নিকেল। অথচ সাধু অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে প্রতি টাকায় ১৭৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপা থাকা উচিত। এক টাকার যে নোট আছে তাহা ভারতীয় যুদ্ধ-আইন অনুসারে মুদ্রা বলিয়া গণ্য হয়, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট ইহার বদলে নিকেলের টাকা পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য নহে। এই রৌপ্য-হীন রূপীয়া এবং বাধ্যতামূলক এক টাকার নোট মিলিয়া ১৮২ কোটি টাকা এখন বাজারে চলিতেছে; এটা গবর্ণমেণ্টের কর্জ বা হ্যাণ্ডনোট ভিন্ন আর কিছু নয়।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ১২৬০+১৮২ বা ১৪৪২ কোটি টাকার হ্যাণ্ডনোট কি করিয়া শোধ দিবে?

ভারতীয় কোষাগারে সোনারূপা কিছুমাত্র নাই। এত দিন আমাদের স্তোকবাক্য শুনান হইত যে, ইংলণ্ড গত যুদ্ধে ভারতের নিকট ১১৭৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার স্বীকার করিয়াছে অর্থাৎ ১৫৬৬ কোটি টাকা। যে দেনার নাম Sterling balances, ইংরেজী ভাষায় তাহার মানে হয় যে, বিলাতি গিনির আকারে ঐ টাকাটা সে দেশের রাজকোষে ভারতের নামে জমা আছে। সুতরাং ঐ

ষ্টার্লিং ব্যালেন্সেস্ পাইলেই তাহা দিয়া আমাদের দেশে চলতি ১৪৪২ কোটি টাকার সরকারী হ্যাণ্ডনোট শোধ দেওয়া যাইবে। অতএব এই ষ্টার্লিং ব্যালেন্সেসের সবটা পাওয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ঋণমুক্ত হইবার একমাত্র উপায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট অনেক হাজার মিলিয়ন ডলার ধার করে। সেই যুদ্ধ শেষ হইবার পর ইংলণ্ড কয়েক বৎসর মাত্র কিস্তীর টাকা দিয়া, অবশিষ্ট সব স্থদ-আসল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এখন সেই দেনা-শোধের নাম পর্য্যন্ত উঠে না। স্থতরাং ভারতের কালা আদমিরা যে ইংলণ্ডের নিকট হইতে ঐ ১৫৬৬ কোটি টাকা সব ফেরত পাইবে ইহা যে আশা করে সে বাতুল। দিল্লীর লালকেল্লার কেন্দ্রীয় ভারতের রাজকোষে লালবাতি জ্বলিতেছে, একথা লুকান যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, inflation বা কারেন্সির পোদ ব্যাধি। যুদ্ধের সময় লোকের হাতে আগের চেয়ে ছয় গুণেরও অধিক নোট জমিয়াছে। তাহারা বাজারে এই নোট খরচ করিতে ব্যগ্র। হাতে সোনারূপার আসল টাকা মোহর আসিলে লোকে তাহা যথাসম্ভব ভবিষ্যতের জন্ত বাঁচাইয়া রাখে। কিন্তু ইনফ্লেশনের ফলে ভারতে সর্বত্র জিনিষের দাম অন্ততঃ চারি গুণ বাড়িয়াছে, কারণ কেহ এই অপদার্থ কাগজ বেশী দিন ঘরে রাখিতে চায় না। জিনিষের দাম এই চৌগুণা হইবার ফলে চাকুরে, মুটে, মজুর, সকলেরই বেতন বাড়াইতে হইতেছে নচেৎ তাহারা খাইবে কি ?

ফ্রান্সে যেমন, এদেশেও তেমনি, গবর্ণমেণ্ট সবচেয়ে বেশী চাকুরে-পোষক অর্থাৎ employer! ধর্মঘটের চাপে রেল, খাল, পোষ্ট অফিস, কাছারী, কেরাণীখানা, কারখানা, সর্বত্র আমাদের গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-পূর্বের বেতন গড়ে তিন গুণ বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই বর্দ্ধিত বেতনের টাকা কোথা হইতে আসিবে ? যদি এই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আয়ও তিন গুণ না বাড়ে গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইবে। কিন্তু জমির খাজনা. কেনালরেট, রেলভাড়া, পোষ্টকার্ড ও টিকেটের দাম, কাষ্টম্ ডিউটি ইত্যাদি সরকারী আয় কি বর্ত্তমান হারের তিন গুণ করা সম্ভব ? যখন সম্ভব নয়, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের গবর্ণমেণ্ট শুধু হ্যাণ্ডনোট কাটিতেছে যাহা শোধ দিবার শক্তি তাহার নাই।

ঠিক এই কারণে ফ্রান্স দেশে গবর্ণমেণ্ট-চাকুরেদের বেতনবৃদ্ধি এবং জিনিষের দাম সেই পরিমাণে চড়িয়া উঠা, ঘোড়দৌড়ের ছুটি তেজী ঘোড়ার মত পাল্লা দিয়া ছুটিতেছে, আর ইন্‌ফ্লেশন অর্থাৎ বদাস্ত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ছাপাখানা হইতে নূতন নোট বাহির করা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে। এই দুর্ভাগ্য হইতে ভারত কি উপায়ে উদ্ধার পাইবে ?

এটা একটা ঐতিহাসিক চির-সত্য যে সব দেশেই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট দেউলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যাহাকে আমি বলি সরকারী হ্যাণ্ডনোট এবং আমেরিকায় বলা হয় fiat money বা জবরদস্তির কারেন্সী, সেইরূপ নোট টাকার বদলে চালাইতে থাকে ; এবং যুদ্ধ শেষ হইলে আসল মুদ্রা true currency দিয়া ঐ নোট শোধ দিতে প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করে, যাহার নাম repudiation of public debt। ফরাসী দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে এরূপ কাগজের টাকা বাহির হয়, নাম *assignat* এবং নেপোলিয়নের সময়ে আর এক রকম তাহার নাম *mandat*, অবশেষে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে একশ' খানা এই কাগজ দিলে দেড়টা নগদ টাকা পাওয়া যাইত ; তাহার পর সেগুলি সব বাতিল করিয়া দেওয়া হইল !!! আমেরিকায় পাঁচবর্ষব্যাপী দাসপ্রথা-বিরোধী যুদ্ধের মধ্যে (১৮৬১-৬৫) এইরূপ বাধ্যতামূলক কাগজের টাকা বাহির হইল, নাম গ্রীন্ ব্যাক্‌স। ইহা অতি শীঘ্রই শতকরা ৬৫ বাটা দিয়া ভাঙান হইতে লাগিল, অর্থাৎ একশ' ডলারের কাগজ দিয়া ৩৫ ডলার সোনার মুদ্রা পাওয়া যাইত। সতের বৎসর পরে কাগজ ও সোনার মুদ্রা সমান সমান হইল। (Morison, ii. 272)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর সমস্ত কাগজের নোট German merks একেবারে বাতিল হইয়া গেল, নোটধারীরা কিছু পাইল না। ভারতের ভাগ্য যে এর চেয়ে ভাল হইবে এরূপ আশা করিবার ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ আছে কি ?

তৃতীয়তঃ, জগদ্ব্যাপী অন্নাভাব এবং খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি। যে যে দেশে গম বা চাউল বেশী জন্মে, সেই সেই দেশ হইতে জাহাজের অভাবে এবং শ্রমিকদের নিত্য হরতালের ফলে ঐ শস্য ভারতে পৌঁছিতে পারিতেছে না। মনে রাখিবেন, সাধারণ বৎসরেও ভারতকে আবশ্যক খাদ্য-শস্যের সিকি অংশ বাহির দেশ হইতে আনিতে হয়। কিন্তু এবার নিজ ভারতেই বন্যা, অনাবৃষ্টি, কাটাকাটি, এবং শ্রমিকদের বিদ্রোহের ফলে ঐ বারো আনা শস্য উৎপন্ন হইতে বাধা পড়িয়াছে ; আমরা হয়ত এ বৎসরে দেশের আবশ্যক শস্যের ছয় আনা মাত্র জন্মাইতে পারিব, তাহাতেই পেটের ষোল আনা স্থান পুরাইতে হইবে, অথবা দেশবাসীদের মধ্যে দশ আনা লোক ক্ষুধায় মরিবে।

এই ত হইল দেশের দশা। বাহিরের রাষ্ট্রগুলির মতলব কি তাহা ভাবা উচিত। এতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জগদ্ব্যাপী শক্তিদ্বারা ভারতরক্ষা করার যে বন্দোবস্ত ছিল তাহা আজ এক দিনে ভাঙিয়া ফেলা হইল এবং ভারতকে এক দিনে নিজ পায়ে দাঁড়াইবার আজ্ঞা দেওয়া হইল। ভারতের পক্ষে এই আত্মরক্ষার শক্তি অর্জন করিতে দুই-

তিন বৎসর সময় ও পূর্ণ শান্তি আবশ্যক; আমরা তাহা কি পাইব? বাহিরের শত্রুরা লোলুপ হইয়া ভারতের উপর থাবা মারিবার জন্য বসিয়া আছে।

আর আমাদের ভিতরের শত্রু হইতেছে বহিঃশত্রু অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক। এই শুভ দিনের আগে হইতেই নানা দল নিজ নিজ ভাগ-বাটোয়ারার দাবী লইয়া শত শত ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ জেলা বা ধর্মসম্প্রদায়, এমন কি জাতিতে বিভক্ত হইবার এবং প্রত্যেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার জন্য চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। আমরা কেহ কাহাকেও মানিব না, অন্য কাহারও সঙ্গে একজোটে মিলেমিশে দেশের কাজ করিব না, এই হুঙ্কার শোনা যাইতেছে। বহু বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেন যে পুরাতনপন্থী হিন্দুসমাজ যেন শত ছিদ্রযুক্ত একখানি নৌকা, এই নৌকায় চড়িয়া জাতি কিরূপে সমুদ্র পার হইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌছিতে পারে? এই সব ভিতরকার গলদ দূর করিয়া ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে সবল করিতে হইলে অনেক সময়, অনেক আত্মসংযম, অনেক কঠোর পরিশ্রম, এবং নিয়মপালনে স্বেচ্ছাকৃত আগ্রহ অর্থাৎ discipline চাই। তাহা কি আমরা পাইব?

পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবার প্রথম দিনে সব চেয়ে বেশী ভাবনার কারণ আমাদের ছাত্রদের মধ্যে অতি ব্যাপক নিয়ম ও শৃঙ্খলাবিরোধিতা। ইহার ফল একটু ধীরভাবে চিন্তা করা যাউক। রবিবার, পূজাপার্বণ ও গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি বাদ দিয়া বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে বড় বেশী ১৮০ দিন স্কুলে কলেজে পড়িবার সময় নির্দিষ্ট আছে; এই কয়দিন মাত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদের পড়া বুঝাইতে পারেন এবং ছাত্রেরা বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি লইয়া লেবরেটরীতে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিতে পারে। কিন্তু যদি নিত্য হরতালের দ্বারা ঐ ১৮০ কাজের দিনের মধ্যে ৯০ দিন স্কুল-কলেজ জোর করিয়া বন্ধ রাখা যায়, তবে অতি মেধাবী বা অসাধারণ সুশীল ছাত্র ক'টি মাত্র ঘরে পড়িয়া প্রায় অন্য বৎসরের মত জ্ঞান অর্জন করিতে পারিবে (বিজ্ঞানের প্র্যাক্‌টিকালে নহে), আর শতকরা ৯৫ জন ছাত্রই আবশ্যক পড়ার অর্দ্ধেকমাত্র প্রস্তুত করিবার সময় পাইবে, অর্থাৎ তাহারা যে যে পরীক্ষা দিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট মানের অর্দ্ধেক মাত্র প্রস্তুত হইবে। কোন ছাত্র চিরদিন কলেজে থাকিতে পারে না; কয়েক বৎসর পরে তাহাকে কাজের ক্ষেত্রে যাইতে হইবে। ঐ অর্দ্ধশিক্ষিত ছাত্রগুলি যখন সংসারে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা ভারতীয় সমাজের নানা ক্ষেত্রে নানা বিশেষ কাজের জন্য অতি কাঁচা কারিগররূপে উপস্থিত হইবে। এই অদক্ষতার ফল স্বাধীন ভারত ভোগ করিবে।

দুটি দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথা বুঝাইতেছি। ডাক্তারী পড়া পাঁচ বৎসর এবং তাহার পূর্বে আই এস্‌সি ক্লাসে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীবতত্ত্ব এই তিনটি বিষয় শিখিতে হয়, অর্থাৎ সাত বৎসরের কাজ করিয়া তবে পূর্ণ দক্ষ ডাক্তার হওয়া যায়। কিন্তু যদি নিত্য হরতালের অনুগ্রহে বৎসরে অর্দ্ধেক কাজের দিনই কলেজ বন্ধ থাকে তবে আমাদের ছেলেরা মাত্র সাড়ে তিন বৎসর পড়িয়া ডাক্তার হইবে একথা স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ যেন মেডিকাল কলেজের ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারের শেষে পরীক্ষা লইবার পরিবর্তে থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি ফাইনাল এম্‌-বি পরীক্ষা লইয়া কতকগুলি ছাত্রকে "ডাক্তার" ছাপ দিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। স্বাধীন ভারত যখন আত্মরক্ষার জন্য নিজ পুত্রগণকে বিদেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইবে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের আহত পুত্র-সৈন্যদের এইরূপ কাঁচা ডাক্তারের হাতে পড়িয়া কি দশা হইবে?

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কামান চালাইতে নিশানা-কারী কর্মচারীর পক্ষে অতি উচ্চশ্রেণীর গণিতের জ্ঞান আবশ্যক, প্রায় কেম্ব্রিজের অনার ম্যাথামেটিক্‌স্‌-এর সমান। কারণ এসব কামান চোখে দেখিয়া দাগা হয় না, বিজ্ঞানের সাহায্যে গোলা ফেলিতে হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে তাহার ফল লক্ষ্য করিতে হয়। কিন্তু যদি ঐ সব আর্টিলারী-অফিসর অনার ম্যাথামেটিক্‌স পর্য্যন্ত না শিখিয়া নিত্য হরতালের অনুগ্রহে ম্যাট্রিক ষ্টাণ্ডার্ডের বেশী শিখিবার সুযোগ ও সময় না পাইয়া থাকে, তবে তাহাদের দাগা কামান কিরূপে ভারত রক্ষা করিবে তাহা কল্পনা করা সহজ। সেইরূপ অন্য সব কার্য্যক্ষেত্রে, কাঁচা কর্মী যদি আমাদের একমাত্র সম্বল হয় তবে জগৎ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাধীন ভারত কোথায় দাঁড়াইবে? আমাদের প্রস্তাবিত শিল্পবাণিজ্য, নৌযান বিস্তার কিরূপে সম্ভব হইবে? দেশে টাকা আছে বটে, কিন্তু ঠিক দক্ষ কর্মী যথেষ্ট সংখ্যায় কোথা হইতে পাইব?

সাইমন কমিশনের সময় হইতে এই বিশ বৎসর ধরিয়া ছাত্রগণকে—স্কুলের অপোগণ্ড শিশুদের পর্য্যন্ত—রাজনৈতিক আন্দোলনে, নামতঃ "স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সেনানী", কিন্তু কার্য্যতঃ নেতাদের বেগারখাটার কুলী, Camp followers রূপে ব্যবহার করিবার ফলে আমাদের ছাত্রমহলে (বিশেষতঃ বাংলায়) নিয়মপালনের রীতি ও প্রবৃত্তি discipline একেবারে লোপ পাইয়াছে। অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে, কথায় কথায় ছেলেরা ষ্ট্রাইক্‌ ঘোষণা করে, তাহাদের দল, বয়স্ক রাজনৈতিক দলের গঠন, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংবাদপত্র চালনা এমন কি দুই দলের মধ্যে

মারামারি ও সভা পণ্ড করা পর্যন্ত অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। স্কুল-কলেজের দরজা আগলাইয়া গরীব ও সুবোধ ছাত্রদের পড়াশুনা করিতে যাইবার বাধা দেয়। পরীক্ষামন্দিরের প্রহরীকে অথবা শিক্ষককে প্রহার করা কেহ কেহ বীরত্বের চিহ্ন বা স্বদেশসেবার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করে, তাহাদের কাজ দেখিয়া এরূপ বোধ হয়। ইহার কুফল প্রথমতঃ তাহারাই নিজ ভবিষ্যৎ জীবনে ভোগ করিবে, এবং দেশ যে এজন্য কিরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা আগে বলিয়াছি। অথচ, যত দূর লক্ষ্য করিয়াছি, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনেরও কম ছাত্র এইরূপ হরতাল করায় এবং নিয়ম ভঙ্গ করিয়া শিক্ষার কাজে বাধা দেওয়ায় উদ্যোগী হয়, কিন্তু বারো আনা ছাত্রই প্রকৃত শিক্ষার্থীর ন্যায় কাজ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সংসারে ঢুকিয়া পিতামাতার বোঝা লাঘব করিবার জন্য উৎসুক। কিন্তু এই শেষের দল "ভালমানুষ, সুবোধ সুশীল", তাহারা নিয়মভঙ্গকারীদের বাধা দিতে পারে না, বা চায় না, কারণ ঐ নিয়মভঙ্গকারী তরুণদের পৃষ্ঠপোষক এক শ্রেণীর বয়স্ক রাজনৈতিক নেতারা এবং তাঁহারা উহাদের "শহীদ" করিয়া তোলেন। (লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরের U.P. শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা পত্র দ্রষ্টব্য।)

রাজনৈতিক আন্দোলনে, অথবা দুই নেতা (বা দলের) মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া দ্বন্দ্বে, ছাত্রদের অবৈতনিক মজুর রূপে লাগাইয়া দেওয়ার ফল হইবে, ঠিক যেন কোন চাষী তাহার বীজধান খাইয়া বসিয়া আছে, আগামী বৎসরে সে চাষ আরম্ভ করিতে একেবারে অসমর্থ হইবে। কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের আশা কোথায়? কোন্ শিক্ষামন্ত্রীর, কোন্ ভাইস্-চ্যান্সেলরের এমন সাহস যে ছাত্রসমাজকে নিজ উচিত কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিবেন, নিয়মভঙ্গকারীদের সরাইয়া দিয়া স্কুল-কলেজে অবশিষ্ট ছাত্রদের পড়াশুনা করার সুযোগ দিবেন, বাণীর মন্দিরে শান্তি ও পবিত্রতা ফিরাইয়া আনিবেন, এবং ক্রমে শিক্ষার মাত্রা উচ্চতর করিবেন?

বিনয় অর্থাৎ discipline তরুণ ভিক্ষুরা মানে না, এজন্য বৌদ্ধ মঠগুলি ভাঙিয়া গেল, বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে লোপ পাইল, এ দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে যেন সর্বদা থাকে।

অতএব আমাদের সমস্ত জাতির সামনে আজ এক কঠোর পরিশ্রমের, এক কঠিন পরীক্ষার দিবস উপস্থিত, আজ আনন্দের দিন নহে, আজ ছুটির দিন নহে, আজ কাজে ঢিল দিবার দিন নহে।

আজ আমাদের সব শিক্ষানবীশদের, সমাজের সর্ববিধ কর্মীদের, সব রাজপুরুষদের—অর্থাৎ উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর Public Servants বা দেশসেবকদের পক্ষে নিজ নিজ জীবনধারা এক নূতন পথে প্রবাহিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবার দিন আসিয়াছে। যদি এই কঠিন ব্রত মাথা পাতিয়া না লই, যদি এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অর্ধপথে থামিয়া যাই, তবে এ জাতি মরিবে, স্বাধীনতার স্বপ্ন লুপ্ত হইবে।

কিন্তু হতাশ হইবার কারণ নাই, যদি আমাদের হৃদয়বল থাকে, যদি আমাদের সুবুদ্ধি হয় এবং আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে স্বাধীনতা কাহারও দান হইতে পারে না, স্বাধীনতা নিজের অক্লান্ত শ্রমে অর্জন করিতে হয়, বহু বর্ষব্যাপী সজাগ চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়, Eternal vigilance is the price of liberty. এই যে আমরা মুখে আওড়াই— "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"; আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে স্বর্গে পৌঁছাইবার উপায় তিনটি "দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ"—আত্মসংযম, নিঃস্বার্থ জনসেবা এবং স্থির সৎবুদ্ধি।

আমার বিশ্বাস যে, বঙ্গদেশে এই আত্মশুদ্ধির অভাব হইবে না, যদি আমাদের নেতারা দেশসেবার সত্যপথ অনুসরণ করা অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চে নৃত্য ও হুংকার করাই গরীয়সী মনে না করেন, যদি আমাদের কর্মীগণ নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে স্বেচ্ছায় মানিয়া লয়, যদি নবার্জিত স্বাধীনতার সঙ্গে "বিনয়"কে (বৌদ্ধ অর্থ discipline) দৃঢ়বন্ধনে জোড়া যায়।

এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়াছেন—

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে, সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণমন পথপরিচায়ক ভারতভাগ্যবিধাতা।"

অতএব আজ এই জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতে, স্বাধীনতার মুক্ত-দুয়ার মন্দিরে প্রবেশ করিবার আগে আমরা দেহমনচিত্তকে স্নাত, পবিত্র করিয়া, পূজার ফুলপাতা হাতে লইয়া, করযোড়ে কবির সঙ্গেই সমস্বরে প্রার্থনা করি—

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে।
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হল দীপ্তি সাগরে
স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হতে জাগ,
সব জড়তা হতে জাগ, জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে।"

গুপ্ত মুদ্রায় সম্রাটগণের ব্যক্তি-জীবনের প্রতিফলন

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত হয়ে থাকে এবং গুপ্ত রাজগণের মুদ্রা সে দাবির যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। উত্তর-ভারতের বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর এই মুদ্রাগুলির পরিব্যাপ্তি, তাদের অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, শিল্পময় কারুকার্য্য—এ সবই গুপ্তযুগের উচ্চ সংস্কৃতির ও অর্থনৈতিক সাচ্ছল্যের পরিচায়ক। কিন্তু গুপ্তরাজগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত বিচিত্র প্রকারের মুদ্রা, বিশেষতঃ স্বর্ণমুদ্রাগুলি থেকে শুধুই যে আমরা গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রচণ্ড ক্ষমতা এবং অতুল বৈভব ও গরিমার পরিচয় পাই তাই-ই নয়—এই মুদ্রাগুলি গুপ্তসম্রাটগণের গুণাবলী, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও রাজত্বকালীন প্রধান প্রধান ঘটনানিচয়েরও পরিচয় প্রদান করে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তই হচ্ছেন প্রথম গুপ্ত-নৃপতি যিনি মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি কি কোনও মুদ্রার প্রচলন করেন? এক প্রকারের মুদ্রা আছে যেগুলির একদিকে চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমারদেবীর চিত্র ও নাম অঙ্কিত এবং অন্য দিক "লিচ্ছবয়ঃ" এই কথাটি সহ সিংহপৃষ্ঠে আসীনা দেবীমূর্ত্তি আঁকা আছে (১ম সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)। এল্যান সাহেবের মতে



১নং। চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবী মুদ্রা

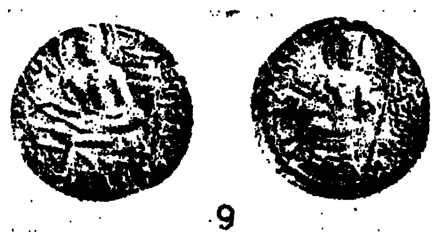
এই মুদ্রাগুলি চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক তাঁর পিতামাতার বিবাহের স্মরণার্থে প্রচলিত হয়েছিল। আবার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ এ এস্ আলটেকার স্মিট, স্মিথ প্রভৃতি পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণের মতে মত দিয়ে বলেন যে এই মুদ্রাগুলি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজেই প্রচলিত করেন। যাই হোক, এই মুদ্রাগুলি থেকে জানতে পারা যায় যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাবী গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলাফল শুধুই যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জীবনে অনুভূত হয়েছিল তাই নয়, শিলালিপিতে প্রাপ্ত সমুদ্রগুপ্তের 'লিচ্ছবিদৌহিত্র' উপাধি থেকে মনে হয়, এই বিবাহের ফলেই গুপ্তরাজ্য ও লিচ্ছবি রাজ্যের সহযোগিতায় বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। মুদ্রায় লিখিত 'লিচ্ছবয়ঃ' কথাটি সম্ভবতঃ গুপ্তগণ কর্ত্তৃক লিচ্ছবি সাহায্যের ঋণ-স্বীকার জ্ঞাপক।

চন্দ্রগুপ্ত-কুমারদেবীর নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যতিরেকেও সমুদ্রগুপ্ত সপ্তরীতির স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। সবগুলিই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও রাজত্বকালের বিশিষ্ট ঘটনাসমূহের পরিচায়ক। সমুদ্রগুপ্তের প্রথম রীতির স্বর্ণমুদ্রায় আমরা তাঁর রাজকীয় মূর্ত্তির দেখা পাই। মুদ্রার এক পিঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় সম্রাট্ দক্ষিণ হস্তদ্বারা অগ্নিকুণ্ডে ধূপ নিক্ষেপ করছেন, তাঁর বামহস্তে ধ্বজ ও দক্ষিণ দিকে গরুড়ধ্বজ আছে। রাজমূর্ত্তির চার দিকে উপগীতি ছন্দে লিখিত শ্লোক হচ্ছে—"সমরশত বিততবিজয়োজিতারিপুরাজিতো দিবম্ জয়তি।" মুদ্রার অন্য দিকে দেখি কুষাণ আরডক্সোর অনুকরণে সিংহাসনে আসীন লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি এবং 'পরাক্রম'—এই অর্থবাচক কথাটি। এই মুদ্রার ধ্বজ-হস্তে রাজমূর্ত্তি সমুদ্রগুপ্তের রাজক্ষমতার নিদর্শন, উপগীতি ছন্দের শ্লোকটি বহু-সংগ্রামের সাফল্য জ্ঞাপক, এবং গরুড় ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি সম্রাটের ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, বৈষ্ণবত্বের পরিচায়ক। দ্বিতীয় রীতির মুদ্রায় বাম হস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে তীরযুক্ত রাজমূর্ত্তির দেখা পাই। এই মুদ্রায় লিখিত শ্লোক হচ্ছে "অপ্রতিরথ বিজিত্য ক্ষিতিম্ সুচরিতৈর্দিবম্ জয়তি।" তৃতীয় রীতির মুদ্রায় "কৃতান্ত পরশুর্জয়ত্য জিতরাজ জেতাজিতঃ" শ্লোক সহ সম্রাটের মূর্ত্তি পরশুহস্তে দণ্ডায়মান। উপরোক্ত দুই রীতির মুদ্রাই সমুদ্রগুপ্তের যোদ্ধা মূর্ত্তিটি ফুটিয়ে তুলেছে! আর এক রীতির মুদ্রায় কটিবস্ত্র ও পাজামাপরিহিত সম্রাট্ ধনুকহস্তে একটি ব্যাঘ্রকে আক্রমণ ও পদদলিত করছেন। মুদ্রার সংস্কৃত শ্লোকে রাজাকে বলা হয়েছে "ব্যাঘ্রপরাক্রম।" এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে আমরা জানি যে, সমুদ্রগুপ্ত মহাকান্তারের জনৈক ব্যাঘ্ররাজকে পরাজিত করেন। মুদ্রাটি কি সেই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন? ডক্টর রাধাকুমুদ মুখো-



২নং। সমুদ্রগুপ্তের 'কাচ' মুদ্রা

পাধ্যায় মনে করেন, এই মুদ্রাটি সম্ভবতঃ ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত বাংলাদেশে সমুদ্রগুপ্তের অভিযান নির্দেশক। অন্য এক রীতির মুদ্রায় বামহস্তে চক্রযুক্ত দণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে যজ্ঞাগ্নিতে ধূপ নিক্ষেপরত রাজ-প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। মুদ্রার এক দিকে সংস্কৃত শ্লোক হচ্ছে—"কাচোগাম মভিত্য দিবম্ কর্ম্মভিরুত্তমৈর্জয়তি" এবং অন্যদিকে "সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা" কথাটি মুদ্রিত হয়েছে (২য় সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদিও এই মুদ্রাটিতে সমুদ্রগুপ্তের নাম নেই তবুও 'সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা' কথাটি থেকে জন এল্যান ও ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মুদ্রাটিকে সমুদ্রগুপ্তের বলে মনে করেন। সমুদ্রগুপ্ত যে 'সর্ব্বরাজোচ্ছেত্তা' অর্থাৎ সকল রাজার উচ্ছেদকারী ছিলেন—তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর এলাহাবাদ প্রশস্তি-লিপি থেকে। সমুদ্রগুপ্তের উপরি-উদ্ধৃত সব কয়টি মুদ্রার প্রতিকৃতিই তাঁর দৈনন্দিন জীবন থেকে গৃহীত। ষষ্ঠ রীতির মুদ্রা সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা চলে। এই মুদ্রাটিতে কটিবস্ত্র-পরিহিত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত একটি পালঙ্কে বসে বীণা বাজাচ্ছেন (৩য় সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)। বীণাবাদক



৩নং। সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদক রীতির মুদ্রা

রীতির মুদ্রাটি সম্ভবত সঙ্গীতকলার প্রতি সমুদ্রগুপ্তের অনুরাগ প্রকাশক। সঙ্গীতানুরাগের জন্যই বোধ হয় এলাহাবাদ প্রশস্তির প্রথমাংশে সমুদ্রগুপ্তের স্তুতিকাব্যে নারদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সপ্তম রীতির মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক। এর এক দিকে যজ্ঞযূপের সম্মুখে দণ্ডায়মান অশ্বমূর্ত্তি এবং অন্যদিকে চামরহস্তে প্রধান রাজমহিষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়েছে। মুদ্রায় লিখিত শ্লোক হচ্ছে—"রাজাধিরাজঃ পৃথিবী-



৪নং। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ রীতির মুদ্রা

মবিত্বাদিবম্জয়ত্য প্রতিবার্য্য বীর্য্যঃ" (৪র্থ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)। সমুদ্রগুপ্ত যে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উত্তরাধিকারীদের শিলালিপি থেকে—যেখানে সমুদ্রগুপ্তকে বলা হয়েছে "চিরোৎসন্ন অশ্বমেধাহর্ত্তু"। উপরোক্ত সকল রীতির মুদ্রাই সমুদ্রগুপ্তের সমরকালীন ও শান্তি-সময়ের নানা বিচিত্র ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভ্যাসের সাক্ষ্য দেয় এবং এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্ণিত সমুদ্রগুপ্তের বহুবিধ গুণাবলীর সমর্থনসূচক পরিচয় দান করে। মুদ্রার শ্লোকগুলিও সেই বিশেষ মুদ্রাঙ্কিত রাজমূর্ত্তির বিশিষ্ট পরিচয়জ্ঞাপক এবং সম্রাটের শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রকাশক। আর মুদ্রার রাজমূর্ত্তি থেকে সম্রাটের অবয়ব যা দেখি তাকে বলা চলে—শাল-প্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক।

সমুদ্রগুপ্তের পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র—তিন রকমের মুদ্রারই প্রচলন সুরু করেন। পিতার ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রাও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি ব্যতীত সম্রাটের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেকগুলি মুদ্রাই সমুদ্রগুপ্তের প্রচলিত মুদ্রারীতির অনুকৃতি হলেও নূতন রীতির মুদ্রাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের এক রীতির মুদ্রায় আমরা তাঁকে সিংহঘাতীরূপে দেখতে পাই। মুদ্রাটিতে চন্দ্রগুপ্তকে বলা হয়েছে—"নরেন্দ্রচন্দ্র প্রথিত (গুণ) দিবং জয়ত্যজেয়ো ভুবিসিংহবিক্রমঃ" (৫ম সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)। মুদ্রায় সিংহের



৫নং। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহঘাতী রীতির মুদ্রা

বিদ্যমানতা সম্ভবতঃ সিংহসঙ্কুল গুজরাট অঞ্চলে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রসার নির্দেশ করে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে পশ্চিম ভারতের "শকক্ষত্রপ"দের পরাজিত করে কাথিয়াবাড় অঞ্চল স্বীয় অধিকারে আনেন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় চন্দ্রগুপ্তের উদয়গিরি গুহালিপি এবং রৌপ্য মুদ্রাগুলি থেকে। পালঙ্কে উপবিষ্ট অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাগুলি প্রধানতঃ সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদক মুদ্রাগুলির মতই, কিন্তু বীণার পরিবর্ত্তে এখানে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ঊর্দ্ধোত্থিত দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্মপুষ্প ধারণ করে আছেন। এই মুদ্রায় লিখিত 'রূপাকৃতি' কথাটি সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের রমণশীলতা ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক অথবা কলাশিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগের নিদর্শন। অপর একটি নূতন রীতির মুদ্রায় বাম হস্ত তরবারির উপর ন্যস্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মূর্ত্তি দেখা যায়। একটি বামন অনুচর সম্রাটের মস্তকের

উপর ছত্র ধারণ করে আছে। এখানে ছত্র নিঃসন্দেহে চন্দ্রগুপ্তের একচ্ছত্র আধিপত্যের প্রতীক। অন্য একটি মুদ্রায় তীর ও তলোয়ার হস্তে সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত জীনবল্গা-পরিহিত একটি ধাবমান অশ্বের উপর বসে আছেন। অশ্বারূঢ় ও সিংহঘাতী রীতির মুদ্রাগুলি সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত অভ্যাস ও বীরত্বের পরিচায়ক—আর পালঙ্কে উপবিষ্ট রূপাকৃতি মুদ্রাটি প্রমাণ করে যে, সমুদ্রগুপ্তের মত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যেও ছিল সামরিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীর একত্র সমাবেশ। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কুষাণ 'আরডোকসো' থেকে গৃহীত সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেবীমূর্তি চন্দ্রগুপ্তের সময় সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবীতে পর্য্যবসিত হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজকীয় উপাধি বিক্রমাদিত্যের উল্লেখও তাঁর মুদ্রায় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুমারগুপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন। তাঁর অধিকাংশ স্বর্ণমুদ্রাই পূর্ব্বপুরুষদের প্রচলিত মুদ্রারীতির অনুকৃতি মাত্র। কুমারগুপ্ত প্রবর্তিত, চারিত্রিক অভ্যাস ও জীবনের বিশিষ্ট ঘটনার পরিচায়ক নূতন রীতির মুদ্রার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ময়ূরপৃষ্ঠে কার্ত্তিকেয় ও হস্তিপৃষ্ঠে সম্রাট্—এই দুই প্রকারের মুদ্রা। প্রথম রীতির মুদ্রার এক দিকে দেখি কার্ত্তিকেয় তাঁর বাহন পরবাণি ময়ূরের উপর আসীন এবং অন্য দিকে সম্রাট্ নিজ হস্তে একটি ময়ূরকে খাওয়াচ্ছেন (৬ষ্ঠ সংখ্যক চিত্র



৬নং। কুমারগুপ্তের 'ময়ূর মুদ্রা'

দ্রষ্টব্য)। এ থেকে মনে হয় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় খুব সম্ভবতঃ কুমারগুপ্তের উপাস্য দেবতা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কার্ত্তিকেয়েরই অন্য একটি নাম কুমার। দ্বিতীয় মুদ্রাটিতে দেখি সম্রাট্ কুমারগুপ্ত একটি হস্তিপৃষ্ঠে আসীন এবং জনৈক অনুচর সম্রাটের মস্তকের উপর একটি ছত্র ধারণ করে আছেন। ধৃত ছত্রটি মনে হয়, কুমারগুপ্তের একচ্ছত্র আধিপত্যের দ্যোতক। সমুদ্রগুপ্তের মত কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের স্মারক মুদ্রা প্রবর্তিত করেন।

কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রাগুলিকে ধনুকহস্তে রাজমূর্তি ও তথাকথিত রাজা ও রাজলক্ষ্মী—এই দুই রীতিতে ভাগ করা যায়। রাজা ও রাজলক্ষ্মী—এই রীতির মুদ্রাটি অভিনব। মুদ্রাটিতে এক হস্তে ধনুক ও অন্য হস্তে তীর নিয়ে দণ্ডায়মান সম্রাট্, সম্রাটের সম্মুখে গরুড়ধ্বজ। গরুড়ধ্বজের পরে মুদ্রার দক্ষিণে সম্রাটের দিকে মুখ করে দক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও বাম হস্তে অজ্ঞাত কোনও একটি বস্তু ধৃত এক নারীমূর্তি। পূর্ব্বে নারীমূর্তিটিকে স্কন্দগুপ্তের সাম্রাজ্ঞীরূপে কল্পনা করা হ'ত, কিন্তু এল্যানের মতে মূর্তিটি গুপ্তরাজলক্ষ্মীর। স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় সকল রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করে স্কন্দগুপ্তকে স্বীয় পতিত্বে বরণ করেন (ব্যপেত্য সর্ব্বান্ মনুজেন্দ্র পুত্রান্ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যম্ বরয়াঞ্চকার)। এল্যানের মতে মুদ্রার চিত্রটি জুনাগড় প্রস্তরলিপির উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যান-স্বরূপ। স্কন্দগুপ্ত যে অন্যান্য রাজপুত্রগণকে, এমন কি স্বীয় ভ্রাতৃগণকেও পরাজিত করে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, মুদ্রাটি হয়তো সেই কথাই জ্ঞাপন করেছে।

স্কন্দগুপ্তের পরবর্তীকালের গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস। যখন কোনও রাজশক্তির পতন হয়, তখন তৎপ্রচলিত মুদ্রার রীতি-বৈচিত্র্য ও মুদ্রায় লিখিত শ্লোকবৈচিত্র্য কমে আসে এবং মুদ্রায় একই রীতির ও একই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের বেলায়ও তাই দেখা যায়। স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীরা কেবলমাত্র ধনুক হস্তে রাজমূর্তি—এই রীতির মুদ্রারই প্রচলন করেন। এর ব্যতিক্রম দেখি একমাত্র 'প্রকাশাদিত্যের' মুদ্রায়। এই মুদ্রাটি সিংহঘাতী ও অশ্বারূঢ়—এই দুই রীতির মুদ্রার একটি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। কিন্তু প্রকাশাদিত্যকে আমরা আমাদের জ্ঞাত অন্য কোনও গুপ্তসম্রাটের সঙ্গে নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করতে পারি না এবং স্কন্দগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনা বা চারিত্রিক বিশেষত্ব সম্বন্ধে এই মুদ্রাগুলি কোনও আলোকপাত করে না।

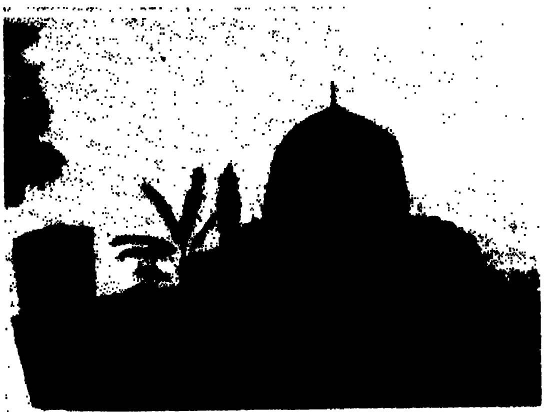
যাই হোক, আমরা যখন গুপ্তবংশের প্রথম যুগের খ্যাতনামা নৃপতিদের মুদ্রা দর্শন করি তখনই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুগঠিত অবয়ববিশিষ্ট গুপ্তসম্রাটগণের প্রতিভাদীপ্ত মূর্তিগুলি, যাঁরা ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, উৎপীড়িত দেশবাসীকে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন, আর সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে ভারত-ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় স্বর্ণযুগের অবতারণা করেছিলেন।

কালীসাধক মির্জা হুসেন আলি

(১১৫০ ?—চৈত্র ১২৩০)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাংলার তান্ত্রিক সাধনার ইতিহাসে শক্তিসাধক মির্জা হুসেন আলির নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার বিচিত্র জীবনকথা এ পর্য্যন্ত গবেষিত ও প্রচারিত হয় নাই। কারণ, কলিকাতা মহানগরীর সুসজ্জিত



মির্জা হুসেন আলির মসজিদ

গ্রন্থালয়ে বসিয়া গবেষকগণ সুদূর সীমান্তনিবাসী এই মহাপুরুষকে ধরিতে পারেন নাই। বিগত শতাব্দীতে কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮-১৩২১) মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক লেখক ছিলেন। তিনিই ১২৯২ সনে "সাধকসঙ্গীত" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় ভাগে "যবন শাক্তের গান" নামক প্রকরণে "ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখ্যাতের জমিদার মুজা হুসেন আলীর গীত" দুইটি মাত্র প্রথম মুদ্রিত করিয়াছিলেন (পৃ. ১১৭-১৮)। পাদটীকায় তাঁহার কাল সূচনা করিয়া লিখিত হয়, "আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরশালা বন্দোবস্তের কাগজে মুজা হুসেন আলীর নাম পাইয়াছি। সুতরাং বলিতে হইবে যে হুসেন আলী প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।" "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে প্রথম গানটি পুনর্মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিগত ৬০ বৎসরের মধ্যে হুসেন আলি সম্বন্ধে তদতিরিক্ত কোন কথাই প্রায় লিখিত হয় নাই। ১৩০৩ সনে উক্ত সিংহ মহাশয় "রাজমালা" গ্রন্থে মুজা হুসেন আলীর বংশ-পরিচয় দিয়াছেন (পৃ ৪৪৩-৪) এবং "তাঁহার স্থাপিত" কালী মূর্ত্তির কথাও লিখিয়াছেন (পৃ. ৪২৭)—উভয়ই সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। ১৩৪৩ সনে "চুণ্টাপ্রকাশ" নামক স্থানীয় পত্রিকার পূজাসংখ্যায় আমরা মির্জা হুসেন আলির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম এবং ১৩৪৪ সনের পূজা-সংখ্যায়ও "ব্রহ্মচারী মিখিল" লিখিত একটি প্রবন্ধ ঐ বিষয়ে মুদ্রিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হইল।

বরদাখাতের জমীদারবংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। ত্রিপুরা জেলার এই প্রধান পরগণাটির প্রাচীন নাম "সিরচাইল" (হিউ-এন্-সেঙের সি-লি চ-ট-ল হইতে অভিন্ন: I. H. Q., Vol. XX, pp. 7-8), পার্সি নাম "বলদাখাল" (আইন্-ই-আকবরি প্রভৃতি। এবং পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "বরদেশ্বরী"র নামানুসারে প্রচলিত হিন্দুনাম "বরদাখাত"। ইহার আদি জমীদার "প্রতাপ রায়" ত্রিপুরাধিপতি ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২৫ খ্রীঃ) আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বরদেশ্বরীর ইতিবৃত্তমূলক দ্বিজমদনকিশোর রচিত "বরদামঙ্গল" নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে (চুণ্টাপ্রকাশ, ১৩৪৯ সন পূজাসংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং রাজমালায় (২য় লহর, পৃ ১৩) তাঁহার উল্লেখ আছে। তাঁহার শোচনীয় পতনের পর বরদাখাত "১২ জিলা"য় বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীর হস্তগত হয়। তৎপর সুপ্রসিদ্ধ ইশা খাঁ অপরাপর ভূখণ্ডের সহিত বরদাখাতও অধিকার করেন। ইশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁর সময়ে মোগলবাহিনী সাময়িক ভাবে সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চল জয় করিয়াছিলেন। বরদামঙ্গলে বরদাখাত বিজয়কারী মোগল সেনাপতিদ্বয় "খাজ্ঞা খাঁ ও কোতর খাঁ"র বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁহারাই (বোধ হয় ১০২৩ সনে) বরদেশ্বরীর প্রভাব অনুভব করিয়া প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি "বিশারায় সপ্তগ্রাম" দান করিয়াছিলেন। বরদেশ্বরীর বর্ত্তমান দেবোত্তর ইশা খাঁর প্রপৌত্র "মনুহর খাঁ"র দান। ইশা খাঁর বৃদ্ধপ্রপৌত্র "হয়বত খাঁ"র নামীয় সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের সনদেও বলদাখাল পরগণায় এই বংশের অধিকার প্রমাণিত হয় (J. A. S. B., 1874, p. 214)। কিন্তু তৎকালে ইঁহাদের অধিকার নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, স্থানীয় জমীদারবংশই প্রকৃতপক্ষে শাসনকর্ত্তা ছিল। প্রবাদ অনুসারে ত্রিপুরার রাজবংশীয় "নয়ন ঠাকুর" বরদাখাত প্রভৃতি ৫টি পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার দৌহিত্রীর স্বামী "মির্জা মাহাম্মদ বাখর"ই অধুনালুপ্ত জমীদারবংশের আদিপুরুষ। তিনি সরাইল পরগণার জমীদার ত্রিপুররাজবংশীয় "দেওয়ান সাহেব-"গণের ও ইশা খাঁর বংশের সম্পর্কিত ছিলেন। অর্থাৎ ২।৩টি মূলতঃ হিন্দুবংশের ধারা তাঁহাতে মিশিয়াছিল। মির্জা মাহাম্মদ বাখরই মির্জা হুসেন আলির পিতামহ। ত্রিপুরার সদর মহ-

মুধার অন্তর্গত "খোল্লা" গ্রামে তাঁহার ও তদীয় বংশধরগণের বাসস্থান এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

মির্জা মাহাম্মদ বাখরের প্রদত্ত বহু ভূমিদানের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি, তদ্দ্বারা তাঁহার শাসনকাল ১০৯২-১১৩১ সন মধ্যে নির্ণয় করা যায়। প্রবন্ধ লেখকের পূর্বপুরুষ "নরসিংহ বাচস্পতি" ১০৯৫ সনে তাঁহার নিকট ৵১৫ গণ্ডা নিষ্কর ভূমি দান পাইয়াছিলেন (ত্রিপুরা কালেক্টরীর ১৫৫৯ সংখ্যক হকীকত লাখেরাজ দ্রষ্টব্য)। ১১৩৫ সনে তিনি জীবিত ছিলেন না (ঐ, ১১৮৫ সংখ্যক হকীকত), তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের শ্বশুর সৈয়দবংশীয় "আকা মাহাম্মদ নবি" বিস্তৃত জমীদারীর "ওয়াদাদার" ছিলেন। ক্রমে জামাতাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি ১১৪৫ সন পর্যন্ত স্বয়ং জমীদারী দখল করিয়াছিলেন। এই পরাক্রমশালী দুর্দান্ত আকা নবি-ই মির্জা হুসেন আলির মাতামহ। বাখরের জ্যেষ্ঠপুত্র মির্জা মাহাম্মদ ইব্রাহিম (ডাক নাম মির্জা জেলা) বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্যে মুরশিদাবাদ যাইয়া নবাব প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে আকা নবিকে তাড়াইতে সমর্থ হন। ইহা ১১৪৫ সনের শেষে ঘটিয়াছিল। মির্জা জেলার অংশে সমগ্র বরদাখাত পরগণা পড়িয়াছিল- -তাঁহার নাম যথাযথ নবাবী দপ্তরে পাওয়া যায় (Grant's Fifth Report, 1883 ed, p. 424)। তাঁহার তিন পুত্র, সর্বকনিষ্ঠ মির্জা হুসেন আলি অনুমান ১১৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

জমীদারী: মির্জা জেলার জীবদ্দশায় অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্রকে বাদ দিয়া সমগ্র ভূসম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা আলি (মৃত্যু ১১৮৯ সন) ও মধ্যম পুত্র মির্জা বাখর আলির (মৃত্যু ১১৮৩ সন) নামে দুই অংশে বিভক্ত হয়। মির্জা জেলার মৃত্যুর পর মির্জা হুসেন আলি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া তদানীন্তন ঢাকার নাজিম নবাব জসারত খাঁর নিকট দাবী উত্থাপন করিলে সমগ্র পরগণার তৃতীয়াংশ তিনি প্রাপ্ত হন। ইহা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজের দেওয়ানী প্রাপ্তির অল্প পূর্বে ১১৭৮ হিজরি সনে (১৭৬৪-৫ খ্রী:, শাহ আলমের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে) সংঘটিত হয় (ত্রিপুরার জজ জন বুলার সাহেবের ৫।১।১৭৯১ সনের চিঠি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। মির্জা হুসেন আলি প্রথম হইতেই জমীদারী কার্যে উদাসীন ছিলেন। ফলে ঋণগ্রস্ত হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট অর্ধাংশ বিক্রয় করেন (Press List, Revenue, Series 1, Vol. VIII, p. 205)। অর্থাৎ তখন হইতে তিনি ষষ্ঠাংশের মাত্র অধিকারী রহিলেন। ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর তাঁহাকে সময়ে সময়ে সমগ্র সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি দেওয়ান দুর্লভরাম, শ্রীমন্ত নাগ প্রভৃতির হস্তে কার্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ১৩।১১।১৭৮৭ সনের কালেক্টরের চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"Mirza Hossun Ali···is a man without either abilities or inclination to look into his own affairs and has been entirely the tool of Serimunt Naag his chief agent and Dolubram his Naib." পরগণা বরদাখাতের রাজস্ব এই সময়ে অনূ্যন দেড় লক্ষ টাকা ছিল। ১২০১-৬ সনে মির্জা হুসেন আলির অংশের রাজস্ব ক্রমশ: বাড়িয়া ২৬৭০০৲ হইতে ৩২০০০৲ এর উপরে উঠিয়াছিল। কালক্রমে মির্জা আলির পত্নী ও জামাতার সহিত তাঁহার অত্যন্ত বিরোধ হয়। ১৭।১।১৭৯৪ সনে মির্জা আলির পত্নী "ওজিউন্নিসা খানম্" তাঁহাকে সম্পত্তিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে সদর দেওয়ানি আদালতে নালিশ করেন। ৩০।১২।১৮০৮ সনে ইহার নিষ্পত্তি-পত্র অতীব কৌতূহলজনক (S. D. A. Reports, 1827 Ed., Vol. 1, pp. 266-8)। উক্ত খানমের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শিত হয় যে মির্জা হুসেন আলি তাঁহার ভ্রাতাদের মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন ("deserted the Mahomedan faith") এবং বিধর্মী হওয়ায় সম্পত্তির স্বত্বাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছেন ("apostacy from the Mahomedan faith, which was the case with the respondent, as shown by his paying worship to Hindoo idols, precluded all right of inheritance.)। অপর ভ্রাতা মির্জা বাখর আলির দৌহিত্র (মির্জা মাহাম্মদ বাখরের পুত্র) মির্জা মাহাম্মদ কাজিমও মির্জা হুসেন আলির নির্বুদ্ধিতার (idiotism) উল্লেখ করিয়া তাঁহার অংশের শাসনভার প্রার্থনা করেন (৩১।৩।১৮১৯ তারিখের কালেক্টরের পত্র দ্রষ্টব্য)। উভয় দাবী-ই অগ্রাহ্য হইয়াছিল। বিরোধের সূচনা হইতেই তিনি খোল্লায় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সাধনাস্থল নারায়ণপুরে চলিয়া আসেন এবং প্রবাদ অনুসারে সেখানেই তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

কালীবাড়ী ও মসজিদ: ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমায় "নারায়ণপুর" এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পরগণা (আইন্-ই-আকবরি দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে একটি খারিজা তালুক মির্জা জেলার ভ্রাতা (অর্থাৎ মির্জা হুসেন আলির খুড়া) পাটকারা পরগণার জমিদার "মির্জা আবুল হুসেনে"র নামে ছিল (রাজস্ব ৭৫০৲)। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রথমত: এই তালুক মির্জা আলি প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পুত্রত্রয়ের তত্ত্বাবধানে আবুল হুসেনের পত্নী "খোদাকী খানমে"র ভরণার্থ নিযুক্ত ছিল (W. Wroughton সাহেবের ১২।২।১৭৮৮ তারিখের বিবরণী দ্রষ্টব্য)। পরে তাহা মির্জা আলি প্রভৃতির জ্ঞাতী উক্ত আবুল হুসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা বাখরের বিধবা পত্নী "শাহজাদা খানমে"র অধিকারে যায় (১৬।৪।১৭৯৩ তারিখের কালেক্টরের পত্র)। মির্জা হুসেন আলি আজীবন তদীয় এই তালুকের সর্বময় কর্তা ছিলেন এবং তদীয় মৃত্যুর পর (১২২৬ সনের পূর্বেই) স্বয়ং তাহার "দখলকার মালিক" ছিলেন। তালুকের মোট "মৌজা ও কিসমত" ২৪, তন্মধ্যে "নিজ নারায়ণপুর" নামক অতিক্ষুদ্র গ্রামই মির্জা হুসেন আলির সাধনার স্থল। আমরা ১৩৩৯

সহে এই দুর্গমস্থান পরিদর্শন করি। একটি নাতিক্ষুদ্র পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে ৺কালীবাড়ী—কোন মন্দির-বিগ্রহ নহে, পরন্তু একটি প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ। মূলদেশে শাখার অপূর্ব বিন্যাসে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তন্মধ্যে মূলাংশ ঠিক যেন নাভিদেশ হইতে পাদাগ্র পর্যন্ত প্রত্যালীঢ়পদা দেবীমূর্তি। ইহাই সিন্দুরচর্চিত হইয়া পূজিত হয়। নদীয়ার গঙ্গাতীরস্থ "পাকাল্য" (? পকার নয় ত) গ্রাম হইতে লক্ষণ চক্রবর্তী ও সুভদ্রা দেবীর পুত্র "কাশীনাথ চক্রবর্তী" স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। প্রবাদ অনুসারে তিনি দেবীর দর্শন লাভ ও বাণী শ্রবণ করিতেন। দেহত্যাগকালে তিনি মির্জা হুসেন আলিকে পূজার ভার দিয়া যান। মির্জা সাহেবের প্রশ্নানুসারে দেবী নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন "মুসলমান হইলেও আমি তাহার ডাক শুনিব ও তাহার সঙ্গে কথা বলিব, কিন্তু তাহাকে একদিন মাত্র দেখা দিব।" এই সকল প্রবাদের সমর্থক অতি আশ্চর্যজনক ১।১টি প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

পুষ্করিণীর পূবপাড়ে কাছারি, দক্ষিণপাড়ে মসজিদ ও পশ্চিমপাড়ে "হাট কালীগঞ্জ" ছিল (পরে "সাহেবের হাট" নামে পরিচিত হয়)। মসজিদটি এখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। দ্বারদেশে শিলালিপির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে "বিসমিল্লা", দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে "কলমা"। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি এই :

হাস্ত্‌ ঈন্‌ মসজিদে হুসেন আলি, কে শোদ্‌ আরাস্তা কে
লুত্‌ফে সমদ্‌।
সাল তারিখ হিজ্‌রতে নবথি, শশ্‌ কমুন্‌ বুদ্‌ আজ্‌
হাজার ও দো শদ্‌।

[এই মসজিদ হুসেন আলির, প্রভুর প্রসাদে ভূষিত হয়।
নির্মাণকাল হিজ্‌রি নবির, হাজার দু'শতে বাড়িল ছয়।]

১২০৬ হিজ্‌রি সনে (অর্থাৎ ১৭৯১-২ খ্রীষ্টাব্দে) মসজিদ নির্মিত হয় এবং অন্যূন ৩০ বৎসর মির্জা হুসেন আলি এই মসজিদে বসিয়া সাধনা করেন। কালীবাড়ীর চারি দিকে উচ্চ প্রাচীর ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান, পূর্বদিকে সিংহদ্বার ও তাহার উত্তরপার্শ্বে দুইটি কোঠা ছিল। পূজক-ব্রাহ্মণ তাহাতে বাস করিত। সিংহদ্বারেও একটি শিলালিপি ছিল, দুঃখের বিষয় তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। মির্জা হুসেন আলি স্বয়ং প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। মসজিদে বসিয়া ডাকিতেন। একদিন ডাকিলেন "তুমি যদি সত্য হও, তবে এখনই মসজিদে একটি জানালা সৃষ্টি কর, আমি যেন দেখিতে পারি।" তৎক্ষণাৎ মসজিদের উত্তর দেওয়ালের ইট খসিয়া পড়িল এবং বৃক্ষমূল দৃষ্টিগোচর হইল।

কালীসাধনায় মির্জা হুসেন আলি কিরূপ মাতিয়াছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কাশীনাথের অভীষ্ট-দেবীর নাম "জয়কালী", মির্জা হুসেন আলির সমস্ত জমীদারি কাগজে "শ্রীজয়কালীচরণ সহায়" লিখিত আছে। বরদাখাত পরগণার তদীয় অংশে ১৭টি গ্রাম লইয়া একটি পৃথক তালুক ছিল—১২০৯ সনের কাগজে "শ্রীশ্রীজয়কালী প্রভুলকর্ত্তা" এবং "তালুকদার ৺জয়কালী দেবি" লিখিত আছে। (ত্রিপুরার ১৯০৩ তৌজি দ্রষ্টব্য)। নারায়ণপুরের উক্ত তালুকের বিবরণেও "দেবত্রাবিত্তী ৺জয়কালী দেবি কিং মিজ নারায়ণপুর ও বাজার কালিগঞ্জ" লিখিত পাওয়া যায় (২৫৫ তৌজি)। ১২৩৩ সনের এই "দেবোত্রবিত্তী জয়কালী দেবিঠাকুরাণির" বিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"কিসমত মজকুর দেহাইত ছোট কিসমত অতয়েব ৺ঠাকুরাণির সেবাপূজায় পাণ্ডা শ্রীরামরত্ন চক্রবর্তী গএরহ এই বিত্তীর উপসত্য ওসুল করে ৺সেবাপূজায় আন্দরে খরচ হবে ইতি।"

নারায়ণপুর পরগণার সংলগ্ন এতকাদপুর প্রভৃতি পরগণার ৫।০ হিস্যা দেবীর নামে ক্রীত হয়। ১২২২ সনে একটি অতি মূল্যবান দলীলের প্রথমাংশ এই : (৫৮ তৌজি দ্রষ্টব্য)

শ্রীজয়কালীচরণ সহায়

পার্শি মোহর "হুসেন আলি ১১৭৮.৬"

অষ্টদলপদ্মমধ্যে "জয়কালি | তারিণী ভব | ভয়হারিণী"

মহামহিম শ্রীযুত জিলে ত্রিপুরার কেলেক্টর সাহেব বরাবরেষু

লিখীতং শ্রীজয়কালীদেবিঠাকুরাণী সেবাইত্য শ্রীহুসেন আলি কস্য টরনিনামাপত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে পরগণে এতকাদপুর ও পরগণে কাশীমপুর-মাহমাবাদ দপ্তর চৌদ্দগ্রাই জমীদারি বনামে মরহুম কৃষ্ণরাম রায় তাহতজমা মবলগ ৪০০১ চাইর হাজার একটাকা সিক্কা লিখা জায়। এই পরগণা হায়ের ১০ আদ আনা হিস্যা জমীদারি মুদাকত শ্রীকির্তী নারায়ণ নাগ আমারদিগের খরিদা। এই ১০ আধ আনা হিস্যা হুজুর ইস্তকালি বহিতে আমারদিগের নাম দখলকারিতে লিখা গিয়াছে।...

(এইপত্রদ্বারা ত্রিপুরার স্থানগ্রাম রায়বংশীয় রাজকিশোর রায় বাটোয়ারায় টরনী নিযুক্ত হন)। এই অংশ (১৭ মৌজা, রাজস্ব ১২৫ ৫।০) অন্ততঃ ১২৩৩ সন পর্যন্ত দেবীর নামে পৃথক্ বিভক্ত ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত বাঙ্‌লা ও ইংরাজি দলীলপত্রে জমীদারের নাম "জয়কালী দেবী সেবাইত মির্জা হুসেন আলি" লিখিত আছে।

১২২৯ সনে মির্জা হুসেন আলি বরদাখাত জমীদারির প্রায় পোনর আনা অংশ (।৴১০৸/০) ঢাকানিবাসী (মৌলবী আহামোল্লার পুত্র) খাজা সলিমুল্লার নিকট বিক্রয় করেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে মহাসমারোহে ১০৮টি বলিদান সহ মহামায়ার পূজা সাধিত হয়। তন্মধ্যে দুইটি নরবলি হইয়াছিল—দুইটি নারিকেল গাছ নরবলির স্থান চিহ্নিত করিয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিল। ১২৩০ সনের শ্রাবণ মাসে হেবানামা করিয়া তালুক সাহজাদা খানম নিজপত্নী "শ্রীমতি হালেহা খানমে"র নামে লিখিয়া দেন এবং ১২৩০ সনের চৈত্রমাসে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে কালীবাড়ীতেই লীলাসম্বরণ করেন। প্রবাদ, মৃত্যুর দিন তিনি মহামায়ার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়াছিলেন। তাঁহার

পত্নী শবদেহ ঢাকায় নিয়া সমাহিত করেন। বলা বাহুল্য তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীও ১২৩৪ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। উল্লিখিত তারিখগুলি কপোলকল্পিত নহে, কালেক্টরীর বহুতর দলীলপত্র ঘাটিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। কৈলাস সিংহের "রাজমালা"র কিরূপ মারাত্মক ভ্রম লিপিবদ্ধ হইয়াছে তুলনা করিয়া দেখা যায়।

মির্জা হুসেন আলি সমসাময়িক সাধকদের মধ্যে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সমবয়স্ক ও অনেকটা সমধর্মী ছিলেন। উভয়েই জমীদার এবং স্ব স্ব জমীদারীর ধ্বংসকারক। "আর্য্য-দর্পণ" পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩২০, বৈশাখ, পৃ, ২১-২) একটি প্রসঙ্গ কথায় দ্বিজরামপ্রসাদের সহচররূপে রামকৃষ্ণ ও মির্জা হোসেনালীর নাম পাওয়া যায়। গল্পটি বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও সাধকত্রয়ের পরস্পর সংযোগ অসম্ভাবিত নহে। তাঁহার অপর এক সাধন সহচরের নাম "অক্রূরাম," তাঁহার কথা দ্বিজরামপ্রসাদের বিবরণ মধ্যে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৫২ সন, পৃ. ১৪) দ্রষ্টব্য। আমরা বৃদ্ধমুখে মির্জা হুসেন আলির প্রসঙ্গে এই দুইটি গল্প শুনিয়াছি। ঢাকানিবাসী সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ মির্জার মতিগতি ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে কতিপয় বিখ্যাত কৃতবিদ্য মৌলানাকে আনাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত মির্জা হুসেন আলির আলোচনার ব্যবস্থা হইলে তিনিও অঙ্গীকার করেন। নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা সভায় উপবিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া দ্বারের দিকে তাকাইয়া আছেন, সময় উত্তীর্ণ-প্রায়, হঠাৎ দেখা গেল সভার মধ্যেই তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে তিনি বসিয়া আছেন, অথচ কেহই তাঁহাকে বাহির হইতে সভাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখেন নাই। "কোন্ পথে আসিলেন," প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন "গন্তব্য-স্থানে যখন আসাই গেল, তখন আর পথের চিন্তা করিয়া লাভ কি ?" সকলেই তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া বিচার-আলোচনার ব্যর্থতা পরিগ্রহ করিয়া সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মির্জা হুসেন আলির ভ্রাতা একবার তাঁহাদের খানা খাইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করেন। তিনি বলিলেন, অদ্য তোমরা আমার খানা প্রস্তুত করিয়া এই দালানে রাখ। তৎপর সাধক ঐ খানা মাকে নিবেদন করায় সমস্ত খানাই সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি নানাপ্রকার মিষ্টদ্রব্য হইল।

উপসংহারে তাঁহার দুইটি সাধন-সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল। প্রথমটি বাঙ্গলার শাক্ত সঙ্গীতমধ্যে চিরস্থায়ী হইবে সন্দেহ নাই—প্রবাদ অনুসারে তিনি দুই বার এইরূপ সঙ্গীতদ্বারা যমকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং তৃতীয় বার আত্মসমর্পণ করেন।

যা রে শমন এবার ফিরি।
এসো না মোর আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে ত্রিপুরারি।
যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজ কাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি।
আমি তোমায় কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।
বলে মুজা হুসেন আলি, যা করে মা "জয়কালী"—
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে, পাপ দিয়ে যাও নিলাম করি ॥১

সকলই করিতে পার কালী (গো মা)।
কালী কং করালী মুণ্ডমালী ॥
কখন রত্নসিংহাসন, কখন পাঠাও বন,
কখন বনে বনে বনমালী ॥
শমন সঙ্কট ভয়, (নিবারিতে)
তোমা বই আর কেহ নয়।
তার সাক্ষী মুজা হুসেন আলী ॥২

অবকাশ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বহুদিন এ জীবনে পাই নাই কোন অবকাশ ;
আঁখি তুলে দেখি নাই সারাহ্নের ধূসর আকাশ—
নক্ষত্রের বর্ণলিপি ! এ মধুর ঝিল্লীকলগান,
ধরণীর তালে তালে উদাস এ পূরবীর তান,
এ মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, কমনীর কঙ্কণ-ঝঙ্কার
শুনি নাই কান পেতে বহুদিন ভুলে একবারে !
সন্ধ্যামালতীর শাখে আলোহিত নয়নাভিরাম
মদির সুবাসসিক্ত এ বিচিত্র ফুটপুষ্পদাম
দেখি নাই বহুদিন ! এ সংসার-প্রবাহের মাঝ
মুহূর্তের অবকাশ বুদ্বুদ্‌মুখে জলবিম্বপ্রায়
কোথা যায় মিলাইয়া ! এত ক্ষুদ্র, নশ্বর জীবন—
তবু তারি লাগি' কত খাটা হোটা আর উচাটন !
আঁখি মেলি' দেখিবার যদি হায়, নাহি অবসর—
এত বর্ণ-গন্ধ-গীতি কেন তবে ধরণীর 'পর ?

অগ্রবর্ত্তিনী

শ্রীসুরুচি সেনগুপ্তা

অবশেষে এসে পৌঁছেছি।

টি. বি. হস্‌পিটাল।

প্রকাণ্ড অট্টালিকা, সুসজ্জিত, সুপরিচ্ছন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত।

তেতলায় এক ফালি একখানা ঘর, চওড়া একটা জানালার কাছে ছোট একখানা খাট, পাশেই একটা মিট্‌সেফ, একখানা চেয়ার। এই আমার বর্ত্তমান বাসস্থান।

আসবার সময় দেখে এলাম, এই মাপেরই সারি সারি ঘর, একই প্যাটার্ণের খাট, তাতে যারা শুয়েছিল, তাদের সাগ্রহ-দৃষ্টি আমাকেই অনুসরণ করছিল। সকলেই দল ভারি করতে চায়; মাঝখানে একটা ঘর খালি পড়ে থাকলে দেখতেই কি ভাল লাগে? সঙ্গে এসেছিলেন অনেকে; সহস্র সান্ত্বনা, অজস্র শুভেচ্ছা, অফুরন্ত আশীর্ব্বচন, মুহুর্মুহু সতর্কবাণী। নির্ব্বাক ঘরখানা মুখরিত হয়ে উঠল।

সময় হলে একে একে সবাই চলে গেলেন, কোলাহল গেল থেমে, রাত্রের পথ্য খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

নির্জ্জন ঘরে শুয়ে কি ভাবছিলাম, ঠিক বলতে পারব না, অনেক অতীত, অনেক বর্ত্তমান, সীমাহীন ভবিষ্যৎ। কতক্ষণ কেটে গেছে জানি নে, কোথাকার একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বেজে গেল।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কে যেন হেসে উঠল।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে।

দিব্যি মেয়েটি। কিন্তু মুখখানা যেন রক্তশূন্য ফ্যাকাসে। একরাশ চুল পিঠে লুটিয়ে পড়েছে, সিঁথিতে, কপালে সিন্দুরের সমারোহ। পরনে লাল চওড়া পাড় গরদের শাড়ী, গলায় ফুলের মালা, বেশ মেয়েটি।

আমি কিছু বলবার আগেই সে হেসে বললে, 'তুমি এসেছ? বেশ হয়েছে। ক'দিন ঘর ঘুরে ঘুরে কারো সঙ্গে একটা কথা কইতে পারি নে, তা-রি খারাপ লাগত। চুপ করে আছ কেন ভাই? কথা বলবে না আমার সঙ্গে? তুমি একা শুয়ে আছ বলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।'

মৃদু হাসির সঙ্গে তার দু-ঠোঁটের মাঝে মুক্তার মত দাঁতের সারি দেখা গেল।

ও হরি। তোমার নামই জিজ্ঞেস করা হয় নি এখনও? কি ভুল আমার দেখেছ? তোমার নাম কি ভাই? আমার নাম 'মেখলা'। আমার স্বামী আদর করে আমাকে মেলা বলে ডাকতেন।

বলতে বলতেই তার হাসিমুখ ম্লান হয়ে আসে। চোখ দুটোও শুকনো ছিল কিনা ঠিক বুঝতে পারি নে।

কিন্তু একটু পরেই সে আবার হেসে বলে, 'খালি ঘরখানা আছ শুয়েছে; মিট্‌সেফটাও খাবার জিনিষে ভরে গেছে। আমাকেও অমনি কত খাবার জিনিষ দিয়ে যেত। আমি যে খেতে পারতাম না, খেতে ইচ্ছে হ'ত না, তা কেউ বুঝতে চাইতনা। না খেলেই বকুনি খেতে হত।

দেখ, তোমাকেও সকলে বকবে।

'বাঃ রে। তুমি যেন আমার সঙ্গে আড়ি করে বসে আছ, আমি এলাম ভাব করতে, তা তোমার খেয়ালেই আসছে না। চুপ করে শুয়ে বুঝি তোমার খুকুর কথা ভাবছ? আর ভাবছ কতদিনে আবার তাকে কাছে ফিরে পাবে।'

বউটি আবার হেসে ওঠে—'আমিও তাই ভাবতাম ভাই, দীপুকে ছেড়ে এসে বুকটার মধ্যে যা করত—' তার চোখ-দুটো ছল্ ছল্ করে ওঠে, দীপুকে কবে বুকের মধ্যে ফিরে পাব সেই-ই ছিল আমার সব চেয়ে সুখের কল্পনা।'— অন্যমনস্ক হয়ে বউটি কি যেন ভাবে।

একটু পরেই তার ম্লান মুখে আবার হাসি দেখা দেয়, 'সব্বাই বুঝি তোমাকে খুব সান্ত্বনা দিচ্ছে যে, তুমি ভাল হয়ে শীগ্‌গিরই বাড়ী ফিরে যাবে। আমাকেও সকলে তাই বলত, সেদিন তোমার ওই খাটেই আমি শুয়েছিলাম, সামনের চেয়ারখানিতে বসেছিলেন আমার স্বামী। জান, সেদিন আমার এক ভাবর রক্তবমি হয়েছিল। মাথার ভিতর ঝিম্ ঝিম্ করছিল, চোখ খুলে চাইতেও ভাল লাগছিল না। কিন্তু উনি বললেন, 'মরা রক্তগুলো পড়ে গিয়ে ভালই হয়েছে ডাক্তার বললেন। এখন তুমি সেরে উঠবে, আর একটু সেরে উঠলেই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।'

'ওঁর সান্ত্বনায়, আদরে আমার নির্জীব দেহটাও যেন সজীব হয়ে উঠেছিল। কেন ভাই ওঁরা এমন করে ছলনা করেন? আমাদের বুক ভরে এত আশার, এত কল্পনার সৃষ্টি করেন কেন? তুমি তোমার স্বামীকে ও রকম বলতে নিষেধ করে দিয়ো ভাই। আশার বাণী শুনতে শুনতে এই ঘরে, ওই খাটে শুয়ে আমি শেষ হয়ে গেছি, তুমিও যাবে, তখনও এই খাটে শুয়ে আমাদেরই মত আর এক জন দুই কান ভরে আশার বাণী শুনবে। সকল আশাই যায় ফুরিয়ে যায়, কাজ কি ভাই, তাকে অত আশার স্বপ্ন দেখিয়ে?'

'দেখ দেখি ভাই, কি আবোল-তাবোল বকছি আমি, তোমার কোন কথা শোনা হয় নি, আমার কোন কথাও তোমাকে বলা হয় নি। তুমি হয়তো সব কথা শুনবার জন্য ছটফট করছ।

'কি আমার ছিল না ভাই। সোনার সংসার, চাঁপার কলির মত ছেলে, এখনো সে ঘুমের ঘোরে 'মা' বলে কেঁদে ওঠে, স্নেহময় শ্বশুর-শাশুড়ী, লক্ষণের মত দেবর, আমার স্মৃতি অক্ষয় করবার জন্য সে 'মেখলা লাইব্রেরি করেছে, আমার

ছবি দেখে মা বাবা এখনও দু'বেলা চোখের জল ফেলেন। আর স্বামী! তাঁর স্নেহেরও অন্ত ছিল না, সেবা-যত্নেরও সীমা ছিল না! কত টাকাই যে তিনি অকাতরে আমার জন্য ব্যয় করেছেন! বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কত চেষ্টাই যে করেছেন! এখনও চোখের জলে অনুতাপ করেন যে আমার এ অবস্থার জন্য তিনিই দায়ী! আচ্ছা, বলত ভাই, নিয়তি কি কেউ রোধ করতে পারে? ওঁর সব তাতে পাগলামি '

দাঁত দিয়ে সে ঠোঁট চেপে ধরে।

'দীপুর জন্মের পরেই আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে; ডাক্তার ভয় দেখান যে আবার সন্তান হলে আমাকে বাঁচানো কঠিন হবে। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চলে গেলাম গিরিডি। কি সুন্দর জায়গা সেটা! সঙ্গে ছিলেন উনি, দীপু, বিধবা ননদ আর ঠাকুর, চাকর। সকলেরই লক্ষ্য ছিল আমার স্বাচ্ছন্দ্য, আমার স্বাস্থ্য!

'বিকেল বেলা উশ্রী নদীর তীরে দু'জনে বসতাম নির্বাক হয়ে। শালবনে মর্ম্মরধ্বনি উঠত, কখনও নদীর স্বচ্ছ জলে নিজেদের ছায়া দেখে পরস্পরকে চুম্বন করতাম।

'কি আনন্দেই দিনগুলি কেটেছিল! সে সব এখন স্বপ্ন! জীবনটা এমন স্বপ্ন হয়ে যায় কেন, বলতে পার ভাই?' অশ্রু তার চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ল। একটু পরেই গয়নের আঁচলে সে চোখ মুছে ফেলে বললে—'বেশ সেরে উঠলাম, গায়ে বেশ রক্ত হ'ল, শালবনের শুকনো পাতার উপর দিয়ে উশ্রী নদীর বালি ভেঙে প্রায় এক মাইল করে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ওঁর কি আনন্দ! সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা তাঁর এখনো ভুলতে পারি নে।

কিন্তু সে তো স্থায়ী হ'ল না আমার ভাগ্য মন্দ, তাই একটি মৃত-শিশু প্রসব করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম। আমাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য ওঁর যে কি ব্যাকুলতা! আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম যে আমার জন্য নয়, ওর জন্যই তুমি আমাকে বাঁচিয়ে তোলো। স্বামীর ঐকান্তিক যত্নে আর ভগবানের অনুগ্রহে বেশ সেরে উঠলাম, এবার বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন, কারণ ডাক্তার বিশেষ করে ভয় দেখালেন যে আবার সন্তান হলে কিছুতেই জীবন রক্ষা হবে না।

মা বাবার কাছে কত যত্নে ছিলাম, তবু ওঁকে ছেড়ে থাকতে আমার একটুও ভাল লাগত না। বিয়ের পর আমরা প্রায় একসঙ্গেই ছিলাম, সব সময় ওঁকে কাছে পাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল। দুষ্টু মেয়ে তুমি বুঝি হাসছ যে এখন কি করে ছেড়ে আছি, কি করে যে আছি'---হাসি মুখখানা তার আবার মেঘের মত আঁধার হয়ে এল। -'যাক সে কথা, উনিও সুখে ছিলেন না আমাকে ছেড়ে। ছুটি পেলেই চলে আসতেন আমার কাছে। ক্রমে আমি বেশ সেরে উঠলাম, ডাক্তার নির্ভয় হলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় তিন মাসের একটি সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। এবার আর সারতে পারলাম না, আসতে হ'ল এখানে। সব যত্ন, সব ব্যাকুলতা ব্যর্থ হয়ে গেল। শেষ শয্যা পাততে হ'ল আমাকে তোমার ওই খাটের উপর।'

তুমিও তো সেই খাটেই শয্যা পেতেছ! আমার কথা শুনে শিউরে ওঠোনা ভাই, এক দিন এসব কথা শুনলে আমিও শিউরে উঠতাম। আমার স্বামী পুত্র ছেড়ে, সাজানো সংসার ফেলে আমি যে চিরদিনের জন্য চলে যাব, এ আমি ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু যেতে হ'ল তো- -তোমারও তাই- থাক্ আর বলব না, তুমি বড্ড ভয় পেয়েছ, কিন্তু তাই বলে কোন সান্ত্বনাও তুমি আমার কাছে পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তোমার বুকভরা আশা—আমারও কি কম ছিল? এই বুকখানা চিরে দেখাতে পারি কত সাধ আশা সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। আগুনেও তো সে সব পোড়ে নি ভাই।'

সহসা তার মুখে সহানুভূতি ঘনিয়ে আসে, 'আমার কথায় ভয় পেয়েছ? কিন্তু ভয় কি ভাই? ভয় ভাবনা সবই শেষ হয়ে যাবে। দেখছ না আমার আর কোন ভয় নেই। সেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ ইন্‌জেক্‌সনের ভয় নেই, ক্ষয়-পূরণের জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় অনিচ্ছায় খাবার ভয় নেই। নিতান্ত প্রিয়জনকে ছুঁতেও ভয় নেই, আমি এখন নির্ভয়।'—একটু থেমে:

'আচ্ছা ভাই—তোমার তো একটি মাত্র খুকু, তোমার স্বাস্থ্য কি করে নষ্ট হ'ল? আমি সব জানি, তুমি লুকোতে চাইলে কি হবে! স্বামীর রোজগার নেই বলে সমস্ত শক্তি কি এমনি করে সংসারে বিলিয়ে দিতে হয়? অল্প অল্প জ্বর হ'ত, শাশুড়ী না হয় সেটা গ্রাহ্য করতেন না, বলতেন ও সব তোমার ঢং, যার স্বামীর এক পয়সা রোজগার নেই, তার রোগটাকে তিনি মুখের দাপটেই চাপা দিয়ে রাখতে চাইতেন, কিন্তু গলা দিয়ে দু' দুবার রক্ত পড়লেও তুমি কেন তাই সে কথা লুকিয়ে রাখলে? অভিমান করছিলে কার ওপর? তুমি কি জান না যন্ত্রীর যন্ত্র হয়েই নারী সংসারে আসে। এখন তো তোমার শ্বশুর টাকা খরচ করছেন, স্বচনায় কেন করেন নি? আমাদের জীবনের কি কোন মূল্য নেই ভাই? তাঁদের বলে দিয়ো, তোমাকে এখানে ফেলে রেখেই যেন তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ না করেন। তাঁরা যেন টাকা পাঠাতে অবহেলা না করেন, আর অতিরিক্ত যেন কিছু পাঠান। এখানে দাই নার্সের মধ্যে অজস্র দান না করলে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হবে। ওদের কর্ত্তব্যবোধ বা মমতা কিছুই নেই, অর্থেই ওরা বশ। যে ওদের অর্থে বশ করবে সে-ই পাবে সেবা, সান্ত্বনা, মমতা। যে তাতে কার্পণ্য করবে তার রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে একটি প্রাণীও গিয়ে দাঁড়াবে না, তেষ্টায় এক বিন্দু জলও তার গলায় কেউ দেবে না। জগৎটাই এমনি ভাই। তুমি নতুন এসেছ, তাই তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

'তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে? বকে বকে তোমাকে ঘুমোতেই দিচ্ছি নে। আমি ভাবি, আমারই মত সবারই বুঝি খিদে, তেষ্টা, ঘুম, ভয় সব চলে গেছে। রাত শেষ হয়ে এল আমি যাই, তুমি ঘুমোও একটু।

জেগে দেখি ঘামে সারা গা ভিজে গেছে। ভোরের আলো এসে পড়েছে বিছানায়। নার্স, দাই, জমাদার—চার দিকে জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে—"

ধড়মড় করে উঠে বসে চারদিকে তাকাই কোথাও কেউ নেই, শুধু কার যেন মিষ্টি হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৪৯—১৯২৫

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

১৮৪৯ সনের ৪ঠা মে (১২৫৬, ২২ বৈশাখ, রাত্রি ১।৫৩ মিনিট) তারিখে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়।* তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র।

"ইঁহাদের বাড়ীতে সে সময়ে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাঁহার নিকটেই ইঁহার হাতেখড়ি হয়।...ইহার পর, বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়া আরম্ভ হইল। তখন জ্যোতিবাবুর অভিভাবক হইলেন, তাঁহার সেজদাদা (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। হেমেন্দ্রবাবুর শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর ঘাড় গুঁজিয়া টেবিলে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি খেলিতেও ছুটি দিতেন না।...হেমেন্দ্রবাবু অবশ্য তাঁহার ভালর জন্যই করিতেন, কিন্তু ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। লেখাপড়ার উপর জ্যোতিবাবুর একটা বিষম বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল। হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ডন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন।...বাঙলা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।...প্রথমে St. Paul's School, তার পর Montague's Academy, তার পর হিন্দু স্কুল। এইরূপ ঘন ঘন স্কুল পরিবর্ত্তনে যে ভাল ফল হইয়াছিল তাহা বলা যায় না।...পূর্ব্ব-কথিত, বাড়ীর কঠোর শিক্ষাশাসনের ফলে শিক্ষার প্রতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কেমন একটা বিতৃষ্ণাই জন্মিয়া গিয়াছিল; কাজেই স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মনোযোগ দিতে পারিতেন না।...জ্যোতিবাবু তখন হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতেন। বয়স প্রায় বার কি তেরো,...ক্লাসে বসিয়া তিনি একবার তাঁহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়াছিলেন।...শেষে হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু কেশববাবুর স্থাপিত "কলিকাতা কলেজ" [পরে, আলবার্ট কলেজ] ভর্ত্তি হয়েন।" ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি')

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সনে কলিকাতা কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাঠ্য পুস্তকে তেমন মনোযোগী না থাকা সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই বৎসর রমেশচন্দ্র দত্তও প্রবেশিকা-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন; এখানে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

আমোদ-প্রমোদ ও নাট্যকৌতুক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশব প্রধানতঃ আমোদ-প্রমোদ ও নাট্যকৌতুকেই অতিবাহিত হইয়াছিল। খুল্লতাত-পুত্র গুণেন্দ্র-নাথ (অবনীন্দ্রনাথের পিতা) তাঁহার শৈশব-সঙ্গী ছিলেন। স্মৃতিকথায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—

"গুণুদাদা ও আমি প্রায়ই একবয়সী। আমরা ছেলেবেলায় বরাবর একত্রে থাকিতাম, একসঙ্গে খেলাধূলা এবং একসঙ্গে পাঠাভ্যাসও করিতাম।...আমরা দুই জনে যেন হরিহর-আত্মা ছিলাম। এক হাতার মধ্যে আমাদের দুই বাড়ী। "এ-বাড়ী" আর "ও-বাড়ী"। তিনি রোজ সকালে আমাদের বাড়ী আসিতেন। আরও দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া লইয়া, আমাদের বাড়ীর বারাণ্ডায় আমরা সারাদিনই প্রায় আড্ডা বসাইতাম। গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় বড় আমোদ পাইতেন। কত রকম কল্পনা যে আমাদের মাথায় আসিত, তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কিন্তু অধিকাংশ গল্পেই উবিয়া যাইত, কাজে কিছুই পরিণত হইত না। তবুও ওরই মধ্যে আমি একটু কেজো ছিলাম, কল্পনাকে জুড়াইতে না দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতাম। তা সে ছেলে-মানুষিই হউক আর যাই হউক।...এক দিন কথা হইল, আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কতকগুলি মজার মজার কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা "অদ্ভুতনাট্য" খাড়া করিয়া, তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে একটা গান ছিল,—

> ও কথা আর ব'লো না, আর ব'লো না,
> বল্‌ছো বঁধু কিসের ঝোঁকে—
> ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
> হাস্‌বে লোকে, হাস্‌বে লোকে—
> হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে।"*

হাঃ হাঃ হাঃ—এই জায়গাটাতে সুর হাসির অনুকরণে রচনা

---

* শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পারিবারিক খাতায় বলেন্দ্র-নাথের হস্তাক্ষরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রাশিচক্র ও জন্মকাল পাওয়া যায়। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্মকাল ভুলক্রমে ২২ বৈশাখ ১২৫৫ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

* শেষ পংক্তি ছাড়া সমগ্র গানটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা। ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত 'বোধেন্দু বিকাস' দ্রষ্টব্য।

করিয়া দিয়াছিলাম। বৈঠকখানার ঐরূপ "হাঃ হাঃ হাঃ" সুরে অধিকাংশ সময়ে অট্টহাস্য হইত আর ধুপ্ ধাপ্ শব্দে প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য চলিত।"

নাটকাভিনয়ের দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল প্রবল। এ বিষয়ে গুণেন্দ্রনাথেরও অনুরাগ বড় কম ছিল না। গোপাল উড়ের যাত্রা শুনিয়া বাড়ীতে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প তাঁহাদের মনে প্রথম উদিত হয়। তাঁহারা একটি নাটকীয় দল গঠন করিলেন। এই দলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন। কৃষ্ণবিহারী পূর্ব্বে 'বিধবাবিবাহ' নাটকে পদ্মার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে ওস্তাদ-জ্ঞানে সকলেই তাঁহাকে অভিনয়-শিক্ষকের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের চেষ্টায় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হইল। দুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই অভিনয়ে যথাক্রমে কৃষ্ণকুমারীর মাতা ও সার্জ্জেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নাট্যশালার পরিচালকগণ অভিনয়োপযোগী অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করিয়া ঠাকুর-বাড়ীর গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে, ১৮৬৫ সনের জুন (?) মাসে 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস' পত্রে বহুবিবাহ বিষয়ে একখানি উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কিন্তু পুরস্কার প্রদানের উপযুক্ত কোন নাটক হস্তগত না হওয়ায় তাঁহারা বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিয়া 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক-রচয়িতা, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই সামাজিক নাটক-রচনার ভার অর্পণ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই রামনারায়ণ নাটক-রচনা শেষ করিয়া দুই শত টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। নাটকখানির নাম—'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক'; প্রকাশকাল—মে ১৮৬৬।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজী জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের বাংলার সর্ব্বপ্রথম (National Dramatist) জাতীয় নাট্যকার বলা যাইতে পারে।...এই 'নব-নাটকে' বিদেশী আদর্শের একটু গন্ধ যে একেবারে না ছিল তাহাও নহে। আমাদের সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কোন বিয়োগান্ত নাটক নাই। তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় দিয়াই, খাঁটি বাঙলায় এই সর্ব্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিলেন।"

গণেন্দ্রনাথ (গুণেন্দ্রের অগ্রজ) প্রভৃতি অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে, তখন যাহাতে ছেলেমানুষি বা খাটামো প্রকাশ না পায়, এই ভয়ে নিজেরাই অভিনয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। ইহাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অধিকতর উৎসাহিত হইয়া



জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী

উঠিলেন। সাত আট মাস ধরিয়া দিনে রিহার্স্যাল ও রাতে কনসার্টের মহলা চলিবার পর ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারি মহাসমারোহে 'নব-নাটক' প্রথম অভিনীত হইল। বহু দর্শকের অনুরোধে নাটকখানি ঠাকুর-বাড়ীতে উপর্য্যুপরি নয় বার অভিনীত হইয়াছিল।

'নব-নাটকে'র অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনসার্টে হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়াছিলেন এবং নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নটী-বেশে তিনি সংস্কৃতে রচিত একটি বসন্ত-বর্ণনার গান গাহিতেন। গানটি এইরূপ :—

মলয় নিলয় পরিহরিপুরঃসর
ধুর সমাগম ধীরে,
বিকচ কমলকুল-কলিকা পরিমল
বাহিনী বহতি সমীরে।
বহু পরিণায়ক নাথ বধূ রব—
সীদতি সপদি শরীরে,
জলদতিবিরহ কৃশাঙ্গকৃশা কিল
মজ্জতি লোচন নীরে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অভিনয় সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

The play opened with the usual appearance of Nat and Nattee with the customary prologue.

Both were clad beautifully and Nattee particularly presented a very graceful figure. Her attitude, gestures, and motions were as delicate as they were becoming, though her singing, we must confess, was not up to the mark.

"নব-নাটকের অভিনয়কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মেজদাদা,—ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছুটিতে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"নাট্য অভিনয় বিষয়েও মেজদাদার [গণেন্দ্রনাথের] বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসবার দুই বৎসর পরে ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের বাড়ীতে 'নব-নাটক' অভিনয়ের প্রভূত আয়োজন হয়েছে—আমি সেই সমারোহের মধ্যে এসে পড়ি। রঙ্গমঞ্চে যবনিকার শিরোবেষ্টনী বিজ্ঞাপনতায় নবরত্নের নামে অঙ্কিত।" ('আমার বাল্যকথা', পৃ. ৩৬)

পরবর্তী এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদাদার সহিত বোম্বাই প্রস্থান করায় জোড়াসাঁকো নাট্যশালাও বিগতজীবন হইয়াছিল। আমেদাবাদ হইতে ১৮৬৭ সনের ১৪ই জুলাই গুণেন্দ্রনাথকে লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার উৎপত্তির কথা জানা যাইবে :—

14th July [1867]
Ahmedabad.

My dear Goonoodada,

It is but a few days ago that I received a letter from yourself and one from Jadoo [Nath Mookerj]; and I have already replied to them. You can't expect any letters to reach you, at least in less than 10 days. The origin of the Jorasanko Theatre, is now hidden in the deep folds of rusty antiquity !! It is well that some worthy historian, should bring it out into light, and expel the gloom which still hangs about it. Who knew at that time—in those jolly days of our Eating Club, that acorn would grow into an oak ?—that, small beginnings would give birth to mighty things ?—that smoke would blaze into a tremendous conflagration ?—who, I say, then looked into the seeds of time or would peep into the womb of futurity ? who knew in fact that a mouse would give birth to a mountain ? Had all this been known to us, we certainly would have taken good care to note down every particular of its birth, would have marked, with a vigilant eye, every symptom which it presented in its embryo state. If we but carry ourselves a couple of years back, we would perhaps find ourselves seated in the snug little room of old, where we passed the brightest moment of our existence, which was the usual haunt of a few merry souls, would perhaps find ourselves seated in the snug little room of old where we passed the dozen voices, where we used to enjoy the delicious songs of *Bama*, and pleasant buffooneries of *Jadoo*, where about all "hot, hot" কচুরি and চোকাস used to be heaped up in pyramids ; and it was there—in the self-same place that this Jorasanko Theatre got its being ! Now let me leave aside all metaphors and rather be homely. It was *Gopal Oorria's Jatra*, that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Saradaprasad], you and I that proposed it ; and I don't think that Jadoo can claim the credit of being one of its projectors. I *do* think that he had no hand in the matter.

Yours affly
J. N. Tagore.

বোম্বাই প্রবাস

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'নব-নাটক' অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৬৬ সনের নবেম্বর মাসে সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আগমন করেন। অসুস্থতার জন্য তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ মাসের (২৮-১০-৬৬ হইতে ৭-৪-৬৭) ছুটি লইয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি কাশীপুরের উদ্যান-বাটিকায় সদ্য-বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সহিত সস্ত্রীক কিছু দিন কাটাইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়া মেজদাদার সহিত মিলিত হন। তাঁহার এফ-এ পরীক্ষা তখন নিকটবর্ত্তী; তিনি পরীক্ষার পড়া ছাড়িয়া দিয়া মনোমোহনের নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কাশীপুরে অবস্থানকালে তিনি মেজ-বৌঠাকুরাণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নিকট বোম্বাইয়ের গল্প—সেখানকার সমুদ্র, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী প্রভৃতির কথা শুনিয়া বোম্বাই দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপচাপ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই পলায়ন করিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে প্রায় সাত মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে ফরাসী ভাষা, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যা ও একজন গুজরাটি মুসলমানের নিকট সেতার-বাদন শিক্ষায় তাঁহার দিন কাটিতেছিল। গণেন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত ইংরেজী পত্রাংশের অনুবাদে প্রকাশ :—

১১-৫-৬৭ :—জ্যোতি আমার নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার জন্য একজন ড্রয়িং-মাষ্টারও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু জ্যোতি পারিবে কি না জানি না।

২-৬-৬৭ :—জ্যোতি সেতার শিক্ষা করিতেছে।

৪-৮-৬৭ :—জ্যোতি সেতার শিখিতেছে। ইহাই তাহার একমাত্র আমোদ। আমি তাহাকে ফরাসী শিখাইতেছি। সে খুব খাটিতেছে। বড় লাজুক—সমাজে মিশিতে পারে না। বোধ হয় বাড়ী যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ২০-২১)

চৈত্র বা হিন্দু মেলা

সত্যেন্দ্রনাথ অসুস্থতার জন্য আট মাসের ছুটি (১৬-১০-৬৭ হইতে ১৫-৬-৬৮) লইয়া আমেদাবাদ ত্যাগ করেন। তাঁহার সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। ইহার অল্প দিন পরেই চৈত্র-সংক্রান্তির দিন (১১ এপ্রিল ১৮৬৮) কলিকাতার উপকণ্ঠে—বেলগাছিয়া ভিলায় চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ঠাকুর বাড়ীর সাহায্যে এই মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল।* গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার সম্পাদক এবং মহর্ষির আনুকূল্যে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।† বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যাহাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—পরানুচিকীর্ষার পরিবর্তে যাহাতে আত্মনির্ভরতা বা স্বাবলম্বনবৃত্তির উন্মেষ হয়, শুদ্ধেশ্যেই চৈত্র বা হিন্দু মেলার সৃষ্টি। ইহা প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।

"নবগোপালবাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনা-পূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না, বা ইহার পূর্ব্বেও কখন লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি রচিত হইবামাত্র, নবগোপালবাবু গণেন্দ্রবাবুকে দেখাইতে লইয়া গেলেন। জ্যোতিবাবু সেখানে গিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলে, গণেন্দ্রবাবু 'বেশ হয়েছে, এটা এবার মেলায় পড়তে হবে' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেবারকার মেলায় শিবনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে শাস্ত্রী), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী‡ ও জ্যোতিবাবু—এই তিন জনের তিনটি কবিতা পঠিত হয়। জ্যোতিবাবুর কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ, অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক শোনা যাইবে না বলিয়া, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করিয়াছিলেন" ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি')। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কবিতাটির নাম "উদ্বোধন"; ইহা তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সের রচনা; কবিতাটির কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসন্তান।
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্ব্বকীর্ত্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন?
দেখ দেখি জননীর দশা একবার,
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্ম্মসার;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জ্জয়,
শুষিছে শোণিত তাঁর বিদরি হৃদয়;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড।
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে?
যে জননী পয়ঃ-সুধা শতনদী ধারে,
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি,
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান,
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।...

চৈত্রমেলার এই দ্বিতীয় অধিবেশন আর একটি কারণে স্মরণীয়। এই অধিবেশনেই সত্যেন্দ্রনাথের রচিত "মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান" জাতীয় সঙ্গীতটি সগৌরবে গীত হয়।

বিবাহ

৫ জুলাই ১৮৬৮ (২৩ আষাঢ় ১৭৯০ শক) তারিখে কাদম্বরী দেবীর সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। ১৭৯০ শকের শ্রাবণ-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই সংবাদটি মুদ্রিত হয় :—

"ব্রাহ্ম-বিবাহ।—গত ২৩ আষাঢ় ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার যথাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শুভ বিবাহ সমারোহ-পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় বহুসংখ্য ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণ সকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদিগকে প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।"

পুত্রের বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি একখানি পত্রে ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন :

---

* বেলগাছিয়া ডন্‌কিন সাহেবের বাগানে মেলার প্রথম অধিবেশন হয়।—"সেকালের কথা" : অমৃতলাল বসু—'ভারতী', চৈত্র ১৩৩২।

† "আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে 'Prospectus of a Society for the promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' আখ্যা দিয়া ইংরাজীতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব' নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।...এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।"—রাজনারায়ণ বসু : 'বিবিধ প্রবন্ধ,' ভূমিকা।

‡ "ভারত" নামে কবিতা; ১৩১৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতী'তে পুনর্মুদ্রিত।

Willow Banks. Muree Hills
ওঁ 20th July 1868

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ

জ্যোতির বিবাহে যাহা কিছু আমার হৃদ্য ও কল্যাণকর কার্য্য হইয়াছে তাহা তোমার প্রযত্নেই হইয়াছে। ইহা হইতে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন হইয়া তোমার হৃদয়কে আনন্দে সিক্ত রাখুক এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ৬ শ্রাবণ, ১৭৯০ শক।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

আদি ব্রাহ্মসমাজ

অতঃপর আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহিত দীর্ঘকাল সম্পর্কিত দেখিতে পাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।—আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-রূপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রায় ষোল বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন; পুরাতন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সাহায্যে তাঁহার কার্য্যকালের হিসাব দিতেছি:—

বৈশাখ ১৭৯১ শক (এপ্রিল ১৮৬৯) হইতে পৌষ ১৭৯২ শক (ডিসেম্বর ১৮৭০): দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যুগ্ম-সম্পাদক।

মাঘ ১৭৯২ শক (জানুয়ারি ১৮৭১) হইতে ভাদ্র ১৮০৬ শক (আগষ্ট ১৮৮৪): সম্পাদক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা। ১৮৭২ সনের ১০ই মার্চ (২৮ ফাল্গুন ১৭৯৩ শক) তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগের দ্বারা এই সভার সূচনা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। সভার উদ্দেশ্য ছিল—"ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ প্রদান"। এই সভার অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে যথাক্রমে রাজনারায়ণ বসু, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ধর্ম্মবিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি এবং বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যান করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা প্রায় দুই বৎসর বিদ্যমান ছিল। ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১৭৯৩-৯৫ শক দ্রষ্টব্য।)

ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা।—১৮৬৮ সনের জুন মাসে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই চলিয়া যাইবার পর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তাঁহার বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ—এই তিন জনে মিলিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে মহর্ষি তাঁহাদের বিলক্ষণ উৎসাহ দিতেন। ঠাকুর-বাড়ীতে মাঝে মাঝে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের জমিদার রাজচন্দ্র রায়, মৌলা বক্স* যদু ভট্ট প্রমুখ ওস্তাদেরা গান-বাজনার মজলিস বসাইতেন। তাঁহাদের হিন্দী-বাংলা গান ভাঙিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন:—"কি সৌখীন কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলেই, অমনি সেটি টুকিয়া লইয়া, আমরা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে বসিতাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশলাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিয়াই হইয়াছে।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত তিনটি ব্রহ্মসঙ্গীত নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি:—

(খাম্বাজ, কাওয়ালি)

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারি। নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।
সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ;
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি। (ফাল্গুন ১৭৯৪ শক, ইং ১৮৭৩)

(আলাইয়া, কাওয়ালি)

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুল' না রে তাঁয়;
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয় ধন তাঁর সমান কে?
সেই সখা বিনে সুখ-শান্তি দিবে কে তোমায়?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;
এত যাঁর করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে?
তাঁরে ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়?

(পাহা, কাওয়ালি)

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা।
তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।
গায় তরুণ অরুণ, শশী নদী গিরি ফুলবন,
যথায় তথায় তব জয় জয় রব গায় নরনারী অগণন;
কেহ নহে নীরব।
এই ঘোর সংসার, কর হে পার, কর্ণধার ভব-জলধি-মাঝে;
হৃদয়ের ধন তুমি, নিরত মম হৃদে বিরাজ', কি আর কব।

---

* "আজি কালি ভারতবর্ষে যে সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ আছেন তন্মধ্যে প্রফেসার মওলা বক্স অতি প্রধান ব্যক্তি। কর্ণাটদেশ ইঁহার জন্মভূমি এবং বরদার রাজার ইনি প্রধান গায়ক। কয়েক মাসের অবকাশ লইয়া ইনি আপাততঃ বিখ্যাতনামা রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রমোদ-ভবনে বাস করিতেছেন।...ইনি অনেকগুলি যন্ত্র বাজাইতে এবং গাইতে পারেন। কিন্তু বীণা-বাদক এবং গায়ক বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবল গাইতে বাজাইতে জানেন এমন নহে, সংগীতে ইঁহার বেশ অধিকার আছে এবং সংগীত-বিষয়ক অনেক তর্কের সুন্দর মীমাংসা করিতে পারেন।...ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, সংস্কৃত ভজন ও কীর্ত্তন, ইনি সকল প্রকার গীত গাইতে পারেন। চিন্তা মাত্র না করিয়া অবলীলাক্রমে যে কোন প্রাণের যে কোন স্বর ব্যক্ত করিতে সক্ষম এবং সকল প্রকার স্বর অনুকরণে পটু" ('সাধারণী,' ১৫ নবেম্বর ১৮৭৪)। হিন্দুমেলার ৯ম বার্ষিক অধিবেশনের ৪র্থ দিবসে (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) মৌলা বক্স সঙ্গীতে শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়।—৪ জুন ১৮৭৫ তারিখে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে, "আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য" সমাজ-মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে এই সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। এখানে রবি ও বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহ্ন ৭৷৷ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা-বেতনে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তা যদুনাথ ভট্ট অধ্যাপনা-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ('তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', আষাঢ় ১৭৯৭ শক)

কেশবচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ।—১৮৫৯ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী কর্ম্মিরূপে প্রথমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ১৮৬৪ সনের ডিসেম্বর মাসে সমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মতবিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া 'অগ্রসর' ব্রাহ্মদের লইয়া, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন (নবেম্বর ১৮৬৬)। ১৮৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার 'ভারত-আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি তখন পূর্ণমাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা দানের জন্য বদ্ধপরিকর। ইহার কয়েক মাস পরে—সেপ্টেম্বর মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রকাশিত হয়। ইহা একখানি প্রহসন; ইহাতে তিনি নব্যপন্থী কেশবচন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক; এই কারণেই বোধ হয় অশোভন-জ্ঞানে পুস্তকে নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন:—

"এ সময়ে আমি কিন্তু পুরাতনপন্থী ছিলাম। তাই মেয়েদের স্বাধীনতা ব্যাপার লইয়া এই গ্রন্থে একটু হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রহসনখানি প্রকাশিত হওয়ার পর, প্রায় প্রত্যহই দেখিতাম 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' আমার উপর কিছু না কিছু আক্রমণ থাকিতই। আক্রমণকারীদিগের মতে বইখানি অশ্লীল বিবেচিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে এ পুস্তকে আমার নাম ছিল না, তবুও কি করিয়া যেন আমার নাম প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সমস্ত আক্রমণ আমার নামেই হইত।"

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ২৬ এপ্রিল ১৮৭৩ তারিখে সাফল্যের সহিত প্রথম অভিনীত হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে 'ন্যাশনাল পেপার' লেখেন: —"It elicited great cheers from the visitors."

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (চৈত্র ১২৭৯) প্রহসনখানির অনুকূল সমালোচনা করিয়াছিলেন, তিনি লেখেন:—

"একেই কি বলে সভ্যতার অব্যবহিত প্রহসনের কিছু ছড়া-ছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুই-খানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জ্জিত, 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'সধবার একাদশী'। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' ঐ দুই প্রহসনের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বর্জ্জিত করিতে পারি। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। এ প্রহসনের একটি গুণ এই যে তৎপ্রণেতা প্রহসন লিখিতে নাটক লিখিয়া ফেলেন নাই। অনেকেরই প্রণীত প্রহসন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র; এ প্রহসন প্রহসন মাত্র, কিন্তু অপকৃষ্ট নহে। ইহাতে হাস্যের প্রাচুর্য্য না থাকুক, নিতান্ত অভাব নাই, এবং ব্যঙ্গ যথেষ্ট। সেই ব্যঙ্গ যদি কোন শ্রেণী-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য হইয়া থাকে তথাপি নিন্দনীয় নহে, কেননা ব্যঙ্গের অনুপযুক্ত বিষয় লইয়া কোথাও ব্যঙ্গ দেখিলাম না। যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুক্ত; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে।…এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে, কেন না অন্যান্য বাঙ্গালা প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।"

স্ত্রী-স্বাধীনতা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিবার পর যখন ক্রমে ক্রমে অন্তঃপুরের অবরোধ-প্রথার আমূল পরিবর্ত্তন করিলেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথও স্ত্রী-স্বাধীনতার উগ্র পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন:

"মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া, আমাদের পরিবারে যখন আমূল পরিবর্ত্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধ-প্রথার বিরোধী নহি, বরং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহারই কিছু দিন পূর্ব্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্য 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।

"স্ত্রী-স্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমার স্ত্রীকে আমি নিজেই অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই জনে পাশাপাশি চড়িয়া, বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুই জনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানেরা আমাদের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত।

সে সব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্য ভাবের নেশায় উন্মত্ত। এইরূপে অন্তঃপুরের পর্দা ত উঠাইলামই, সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পর্দাটিও একেবারে উঠিয়া গেল।"

জমিদারী পরিদর্শন

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রকাশিত হইবার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর জমিদারী পরিদর্শনের ভার পড়ে। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—

"ইহার পরেই আমার উপর আমাদের জমিদারী পরিদর্শন ও সংসারের ভার পড়িল। পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কাজকর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারী পরিদর্শন উপলক্ষে একবার শুদাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল।...কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি [ইং ১৮৭৪] রচনা করিয়া ফেলিলাম।"

প্রজারঞ্জক জমিদার বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি ছিল।

'বিদ্বজ্জন-সমাগম'

কটক হইতে ফিরিবার পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর একটি অনুষ্ঠানে মাতিয়া উঠিলেন ; উহা 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন। জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে এই বার্ষিক সম্মিলনের সূচনা হয়—১৮৭৪ সনের ১৮ই এপ্রিল (১২৮১, ৬ই বৈশাখ)। বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভায় কবিতাদি পাঠ, গীতবাদ্য ও প্রীতিভোজনের আয়োজন ছিল। এই উপলক্ষে পরবর্তী ১২ই বৈশাখ (শুক্রবার) সাপ্তাহিক 'ভারত-সংস্কারক' লেখেন :—

"যোড়াসাঁকো বিদ্বজ্জনগণ সমাগম সভা।...আমরা গত সপ্তাহে প্রস্তাবিত বিষয়ের যে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, গত শনিবার রাত্রে [৬ বৈশাখ] তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে বাংলা গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগের অনেকে তাঁহাদিগের যোড়াসাঁকোর ভবনে সমবেত হন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মধ্যে আমরা এই কয় ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম—রেবরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো। সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ১০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিমন্ত্রয়িতা মহাশয়েরা ভদ্রোচিত অভ্যর্থনার ত্রুটি করেন নাই। সভাস্থলে একটি যুবা প্রথমে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দীপনী কবিতামালা উচ্চ গম্ভীর স্বরে ও উপযুক্ত ভাবভঙ্গীর সহিত অনর্গল আবৃত্তি করিলেন, তাহাতে আসর বেশ গরম হইয়া উঠিল। আমরা বহুদিন-বিস্মৃত একটি জাতীয় ভাব অনুভব করিলাম, এবং ইংরেজাধীনে বা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিতেছি বোধগম্য করিতে পারিলাম না। পরে কবিবর (প্যারীমোহন) কৃত অমরেন্দ্র দ্বারকানাথ মিত্রের গুণব্যাখ্যাপূর্ব্বক একটি সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিলেন। তিনি তৎপরে স্বকৃত আর একটি শ্রুতিমধুর গান করিলেন, তাহাতে বিলাতী দ্রব্যের সহিত এদেশীয় দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট ক্রন্দন করা হইতেছে। অতঃপর ঠাকুর-পরিবারের ছোট ছোট কয়েকটি বালক-বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তানলয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিয়া সভাস্থবর্গকে চমৎকৃত করিল। তৎপরে আমন্ত্রকগণ উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু কিছু বলিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহ কিছু বলিলেন না। ইহাতে কবিবর পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে গেলেন, কিন্তু তিনি এবার এরূপ একটি ইতর গান ধরিলেন, যে সভা এককালে মাটি হইয়া গেল এবং তাঁহাকে বসাইয়া দিতে হইল। পরে জ্যোতিরিন্দ্র বাবু এক অঙ্ক নাটক পাঠ করিলেন, তাহাতে পুরুরাজা যবন শত্রু নিপাত করিবার জন্য সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিতেছেন এবং সৈন্যদল তাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বীরমদে মাতিতেছে। ['পুরুবিক্রম নাটক,' ৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]। তদনন্তর দ্বিজেন্দ্র বাবু স্বরচিত 'স্বপ্ন' বিষয়ক একটি সুন্দর কবিতা ['স্বপ্ন-প্রয়াণ,' ১ম সর্গ] পাঠ করিলে শিশুরা সঙ্গীত করিতে লাগিল এবং পান, গোলাপের তোড়া, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা নিমন্ত্রিতগণের প্রতি সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সভাকার্য্য শেষ হইল।"

'বিদ্বজ্জন-সমাগম' উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ঠাকুর-বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার এই কয়টি অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :—

(১) গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে ১৮৭৫ সনের ৯ই (?) মে (বৈশাখ ১২৮২) রবিবার এই সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।"*

(২) ১৮৭৭ সনের অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'এমন কর্ম্ম আর কর্‌'ব না' প্রহসনখানি অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ

---

* 'সাপ্তাহিক' হইতে ১৬ মে ১৮৭৫ তারিখের 'সাধারণী'তে উদ্ধৃত। —'দেশ' (১৬ চৈত্র ১৩৫২) দ্রষ্টব্য। ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'প্রতিবিম্ব' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ভাদ্র ১৭৯৭ শক) লিখিয়াছিলেন :—"'প্রকৃতির খেদে'র ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না।" কবিতাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে'ও (আষাঢ় ১৭৯৭ শক) মুদ্রিত হইয়াছিল।

অলীকবাবুর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

"নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে জ্যোতিদাদার 'এমন কর্ম্ম আর কর্'ব না' প্রহসনে আমি অলীক বাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না ;—তখন বাড়ীতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সংগীতের অবিরলবিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে ; তখন নবযৌবনে নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে ; তখন সকল জিনিষই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, কিছু যে পারিব না এমন মনেই হয় না, তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় করিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই-যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দ্দাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।"

(৩) ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ (১৬ ফাল্গুন ১২৮৭) তারিখে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন-সমাগমে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনীত হইয়াছিল। "হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রতিভা' নাম্নী কন্যা প্রথমে বালিকা, পরে সরস্বতী-মূর্ত্তিতে অপূর্ব্ব অভিনয় করিয়াছিলেন।"* রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয়ে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই ; তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কনসার্টের ভার ছিল। "দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—তিনি এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।"†

(৪) ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ (৯ পৌষ ১২৮৯) তারিখে অনুষ্ঠিত বিদ্বজ্জন-সমাগমে রবীন্দ্রনাথের 'কাল-মৃগয়া' অভিনীত হয়।‡ রবীন্দ্রনাথ অন্ধ মুনি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খুব সম্ভব, এই বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষেই ঠাকুর-বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতি-নাটিকা ১৮৮০ সনে ও 'হঠাৎ-নবাব' প্রহসন ১৮৮৪ সনে অভিনীত হইয়াছিল।

সাধারণ-রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মেলার নবম বৎসরের (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪—ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) জন্য তিনি উহার "সংশ্লিষ্ট সম্পাদক" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু মেলার সংস্রবে আসিয়া তাঁহার মনে নাটকের সাহায্যে জনচিত্তে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তিনি জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—"হিন্দু-মেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত প্রথম নাটক—'পুরুবিক্রম' ১৮৭৪ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (ভাদ্র ১২৮১) ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

"লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি নীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের ভাণ বলিয়া বোধ হয়।...... যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্ত্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্য্যতা থাকিবে না।"

'পুরুবিক্রম' নাটকের অন্তর্গত সৈন্যগণের প্রতি পুরুরাজের বীরবাণীর কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

ওঠ ! জাগ ! বীরগণ ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।
হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।
... ...
এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের,
অনায়াসে করিবে হরণ।
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন ?

'বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম।
... ...
স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে শত ধিক্ তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে।

যায় যাক্ প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্,
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

* রাজকৃষ্ণ রায় : "বালিকা-প্রতিভা"।—'আর্য্যদর্শন,' বৈশাখ ১২৮৮, পৃ. ১ পাদটীকা।

† রবীন্দ্রনাথ : "জীবনস্মৃতির খসড়া"।—'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৫০।

‡ 'ষ্টেট্‌সম্যান,' ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮২ ; 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি,' পৃ. ১৬১।

'পুরুবিক্রম' ২২ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখে সর্ব্বপ্রথম বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরবর্ত্তী ৩রা অক্টোবর ইহা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও অভিনীত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় নাটক—'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক' ১৮৭৫ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার অন্তর্গত রাজপুত-ললনাদের চিতারোহণকালের এই গীতটি এক সময় সর্ব্বত্র গীত হইত :—

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥

১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬ তারিখে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সমারোহে 'সরোজিনী'র প্রথম অভিনয় হয়। জনপ্রিয়তাগুণে ইহা যাত্রার দলেও বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চতুর্থ ও পঞ্চম নাটক—'অশ্রুমতী' (নবেম্বর ১৮৭৯) ও 'স্বপ্নময়ী' (মার্চ ১৮৮২)।

প্রহসন রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ—ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসন—'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' (পরে, 'অলীক বাবু') ১৮৭৭ সনের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়। সুধী প্রিয়নাথ সেনের মতে :—"এই অপূর্ব্ব কল্পনা হাস্য-রসিকের সৃষ্টি। সাহিত্যে ইহা বিরল। বঙ্গসাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক মোলিয়ের (Moliere) তাঁহার রচিত কোন কোন নাটকে এইরূপ হাস্যময়ী কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন।" ('প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি', পৃ. ১৩৬)

এই প্রহসনের দুইটি গান উদ্ধৃত করিতেছি; ইহাতে যে ব্যঙ্গানুকৃতি আছে তাহা উপভোগ্য :—

১

গা তোলো রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁইশাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।
ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
ক্যাভেণ্ডারের গাড়ি দিয়ে যায় গাড়োয়ান।

২

গা চালো রে, নিশি আওসান, প্রাণ।
"বেলফুল" "বেলফুল" ঘন হাঁকে মালি-কুল,
"বরাফ্" "বরাফ্" হেঁকে বরফ-ওলা যান।
জাওড়া-বনে পালে পাল, ক্যাকা-হুয়া ডাকে শাল,
খাঁজাকুড়ে কিচির্ মিচির্ ছুঁচোয় করে গান।
হলো বেতাল নিরাও কোয়ে, নেংটে ইঁদুর থাকে যোরে,
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অতে কেন খান।
পড়্‌ল গুড়ুম মটার তোপ, এখনও কি যায় নি কোপ,
একটু-খানি দিয়ে হোপ্ রাখ্‌লো আমার প্রাণ।
ভোঁদোড়গুল মারছে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন হে জানকী, ভাংবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাংবার নয়,
চরণ ধর হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ।

'এমন কর্ম্ম আর ক'রব না' প্রথমে ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্বজ্জন-সমাগম উপলক্ষে ও পরে সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল।

সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনয়ের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর কোন নাটক রচনা করেন নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

"ইহার কিছু দিন পরেই [ইং ১৮৮১] গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতে লাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল। আমিও নাটক-রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, সাহিত্য-সেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।"

পরিবারে প্রভাব

সুরুচিসঙ্গত নাট্যগ্রন্থ রচনা ও সাধারণ রঙ্গালয়ে সেগুলির অভিনয় দ্বারা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পাঠক ও দর্শক মহলের উপর অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিবারেও তাঁহার প্রভাব বড় কম ছিল না। তাঁহারই উৎসাহ-বাণিতে ভগিনী স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যসেবাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—

"আমি সন্ধ্যাবেলা [মেয়েদের] সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জ্জমা করিয়া শুনাইতাম—তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্প দিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম। তখনও তিনি অবিবাহিতা। বিবাহের [১৭ নবেম্বর ১৮৬৭] পর তিনি 'দীপনির্ব্বাণ' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। 'দীপনির্ব্বাণ' প্রকাশিত হইলে, সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল।" (পৃ. ১১৯)

"সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই [নবেম্বর ১৮৭৫], আমরা রবিকে প্রমোশন্ দিয়া আমাদের সম-শ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিন জন—অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। পরে জানকী বিলাত যাইবার সময়, আমার কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী

আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায়, সাহিত্য-চর্চায়, আমরা তাঁহাকেও আমাদের আর একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।" (পৃ. ১৫১)

কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব কিরূপ কল্যাণকর হইয়াছিল, 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—

"সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অন্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

"তিনি আমাকে খুব-একটা বড়ো রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সেজন্য হয়তো কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবলপক্ষেরা সর্ব্বদাই স্বাধীনতার অপব্যবহার লইয়া খোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের দ্বারাই সদ্‌ব্যয়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত, আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দ্বারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে তাহাতে আমাকে উৎপাত-নিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর-কিছুই আমি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি যে-শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি তত ভয় করি না ভালো করিয়া তুলিবার উপদ্রবকে যত ভরাই—ধর্ম্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্যূনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে-দাসত্বের সৃষ্টি করে তাহার মত বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

"এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।" (পৃ. ৮০-৮১)

'ভারতী' প্রকাশ

'ভারতী' পত্রিকার নাম সাহিত্য-সংসারে সুবিদিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ইহার সঙ্কল্পয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা, একথা হয়ত অনেকের জানা না-থাকিতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র ন্যায় একখানি সাহিত্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা মাথায় উদয় হইবা মাত্র তিনি রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রজের শরণাপন্ন হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ-পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন; তিনিই পত্রিকার নামকরণ করেন—'ভারতী'। তাঁহার স্মৃতি-কথায় প্রকাশ :—

"জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল; আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্য্যায়, পৃ. ২০৫)

'ভারতী'র ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১২৮৪ সালের শ্রাবণ (১৮৭৭, জুলাই) মাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

"ভারতী-প্রকাশ হইতেই আমাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড়দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন 'ভারতী'র জন্য লেখা আদায় করিবার জন্ত আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম এবং এই সূত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন।...আমাদের বাড়ী যখনই আসিতেন, তখনই তিনি আমাকে বেহালা বাজাইতে বলিতেন। আমি বাজাইতাম, আর তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।

"ভারতীর প্রথম বর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' 'পত্রিকা' নামে একটা বিভাগ ছিল। তাহাতে কেবল ব্যঙ্গকৌতুকের কথাই থাকিত। এই ভাগে বড়দাদাই প্রায় সব লিখিতেন। আমি "ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ বা রামিরাড্" নামে কেবল একটা নক্সা লিখিয়াছিলাম মাত্র। আমি তখন অনেক বিষয়েই লিখিতাম। প্রথম বর্ষের 'ভারতী'তে রবি ও অক্ষয়ের লেখাই বেশী প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে রবির 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমালোচনা ও কবিতা প্রথম বাহির হয়। অক্ষয় তখন বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনা ও হৃদয়-ভাবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া এক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, যেমন 'মান ও অভিমানে কি প্রভেদ?' ইত্যাদি। লোকের এসব তখন খুবই ভাল লাগিত। ভারতীর দ্বিতীয় বর্ষ হইতে, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনায় পত্রিকার পৃষ্ঠা পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহু সুলিখিত রচনা 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

রবীন্দ্র-সংলাপকণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

১

সরস্বতীর তুলি

গুরুদেবের সহিত আলাপ-সালাপ হইতেছে। আর কেহ সেখানে ছিলেন কি না মনে হইতেছে না। প্রশ্ন করিলাম, 'গুরুদেব, আপনি ছবি আঁকাটা কীরূপে শিখিলেন, আর এত বয়সে?'

তিনি উত্তর করিলেন, 'শুনুন। সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল যাইবার পর ভাবিলেন, না, কাজটা সম্পূর্ণ হয় নি, সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নিজের তুলিকাটিকেও আমাকে প্রদান করিলেন!'

প্রশ্নকর্তা উত্তর পাইয়া চমৎকৃত হইলেন, বলাই বাহুল্য।

২

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহার শব্দটি আমার বড় প্রিয়। আমার কলিকাতার বাড়ীখানির এই নামই দিয়াছি। নামকরণের সময় এই শব্দটাই বার বার আমার মনে আসে, কিন্তু ইহা গ্রহণ করিতে বিশেষ বাধা অনুভব করিতেছিলাম। আমার ছেলের নাম ব্রহ্মব্রত। তাহার নামের সঙ্গে যোগ রাখিয়া বাড়ীর নাম করিতে একটুও মন অগ্রসর হইতেছিল না। পরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুহৃদ্বর সুনীতি-বাবুর পরামর্শে ঐ নামটাই গ্রহণ করি। লোকের মধ্যে কেহ ভাবিলেন আমাকে ব্রাহ্ম, কেহ ভাবিলেন বৌদ্ধ, কেহ বা আর কিছু। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহযোগীদের মধ্যে কেহ-কেহ ঠাট্টা করিয়া আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেন,

"By dress he is a Brahmin, by religion a Brahmo, by education a European, and by culture a Buddhist."

শেষের কথাটির মূলে বাড়ীর ঐ নামটারও যোগ থাকিতে পারে। যাই হোক, আমার হৃদয়ের কথাটি একখানি প্রস্তরফলকে একটি চতুর্দল পদ্মের মধ্যে পাঁচটি শব্দ লিখিয়া আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবু তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমার অনুরোধে পদ্মের কর্ণিকায় ব্রহ্মবিহার আর তাহার চারিদিকে চারিটি দলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিটি শব্দ লিখিয়া দিয়াছেন। এই কয়টি শব্দের অতি গভীর, অতি পবিত্র, ও অতি উচ্চ ভাব আমাদের ভক্তিশাস্ত্র, জৈনশাস্ত্র ও বিশেষত বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপ্রসিদ্ধ। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই কয়টির ভাবনাই হইল ব্রহ্মবিহার, কেননা ইহাই হইল মনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। বৌদ্ধশাস্ত্রে এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা আর্য।[১]

গুরুদেব নিজের সাধনা-নামক ইংরেজী পুস্তকে[২] ব্রহ্ম-বিহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"Buddha, who developed the practical side of the teaching of Upanishads, preached the same message when he said, *With every thing, whether it is above or below, remote or near, visible or invisible thou shalt preserve a relation of unlimited love without any animosity or without a desire to kill. To live in such a consciousness while standing or walking, sitting or lying down till you are asleep, is Brahma vihara, or in other words, is living and moving and having your joy in the spirit of Brahma.*

গুরুদেবের এই বিবরণ বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুগত নহে। বৌদ্ধ-শাস্ত্রে বিদুষী শ্রীমতী রীস ডেভিড্স্ (Mrs. Rhys Davids) ইহা এক স্থানে উল্লেখ করেন। আমি ইহা দেখিতে পাইয়া গুরুদেবকে জানাই। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'নিজের নিজের যুক্তি, তর্ক ও আলোক অনুসারে অনেকেই অনেক ব্যাখ্যা করিতে পারেন। একটিমাত্র বিশেষ কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা নহে।'

উপনিষদেরও অর্থ সম্বন্ধে স্থানে-স্থানে গুরুদেবের অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের অনৈক্য দেখা যাইত, এবং সেখানেও তাঁহার ঐ কথা ছিল।

১। রাদের (J. Rahder) সাহেব বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিবার অনুকূলে নূনপক্ষে অন্তত সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয় ও ফরাসী ভাষা জানেন। কিন্তু ব্রহ্মবিহার শব্দের তিনি অর্থ করিয়াছেন 'hall of Brahma'।

২। Macmillan & Co. Ltd. 1913, pp. 17-18.

গুরুদেব একখানি এই বই নিজে আমাকে দিয়াছিলেন, উহাতে লিখিয়াছিলেন,

"শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী
প্রিয়করকমলেষু
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

গুরুদেব তখনো শ্রী বর্জন করেন নি। তাঁহার নামের পূর্বে যথাযথ-ভাবে শ্রীর লোপ দেখিয়া আমি গুরুদেবকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি নিজে নিজের নামের পূর্বে শ্রী না লিখিতে পারেন, কিন্তু অন্যে লিখিলে তাঁহার তো আপত্তির কোন কারণ নাই। গুরুদেব আমার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রামানন্দবাবুও ইহা স্বীকার করিয়া পরে তাঁহার নামের পূর্বে শ্রী যোগ করিতেন। তাঁহার যে রচনাবলী প্রকাশ করা হইতেছে তাহাতে তাঁহার নামের পূর্বে তাঁহার জীবদ্দশাতেও শ্রী বর্জন কি ঠিক হইয়াছে?

৩

"আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ"

গুরুদেবের ইংরেজী বিদ্যার কথা তোলা আমার পক্ষে কেবল পাগলামি নয়, মহাপাগলামি। তথাপি বাহিরের দিক হইতে একটু তুলিতেছি।

আমি যখন কাশী হইতে প্রথমে শান্তিনিকেতনে আসি, সে গত ১৩১১ সালে মাঘ মাসের কথা, তখন তাঁহার গ্রন্থশালাটি বর্তমান গ্রন্থশালার নীচের তালায় মধ্যেকার কুঠরিতে আবদ্ধ। চারি দিকে আলমারীর মধ্যে মাঝখানে একখানি সতরঞ্চি বিছান থাকিত। ইহার আরম্ভ হয় একদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সংস্কৃত বই দিয়া আর অপর দিকে গুরুদেবের নিজের ইংরেজী বই দিয়া। সংস্কৃত বইগুলির মধ্যে ছাপান পুস্তক ও পুঁথি দুইই ছিল। পুঁথিগুলির মধ্যে বৈদিক পুস্তক অনেক ছিল, এবং এগুলিকে বেশ যত্নেরই সহিত রক্ষা করা হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি সংস্কৃত পুঁথির উপরে সেই সময়ে আমার টান ছিল না। ঐ সময়ে সাহিত্য পরিষদ হইতে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিতেছিলেন। শতপথব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদের সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তিনি গুরুদেবকে বলিয়া আমার নিকটে সংস্কৃত পুঁথিগুলি চাহিয়া বসিলেন। বলিয়াছি তখন উহাতে আমার টান ছিল না, উহার গুরুত্বও আমি তখন বুঝি নি, তাই আমি কোন আপত্তি না করায়, পরিষৎকে পুঁথিগুলি দেওয়াই গুরুদেব স্থির করিলেন। শ্রীযুক্ত রামকমল বাবু আসিয়া পরিষদে তাহা লইয়া গেলেন। আমার বাড়ী হইতেও কতক পুঁথি আমি পরিষদে দিয়াছিলাম। পরে যখন আমি পুঁথির গৌরব বুঝিলাম, তখন এই কার্যের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। আবার পুঁথি সংগ্রহের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিলাম।

ঐ সময়ে আমি দক্ষিণ-ভারতের ত্রিবেন্দ্রামের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের সন্ধান পাই। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী হইতে ভিন্ন। পুঁথি সংগ্রহে তাঁহার ন্যায় দক্ষ অন্য কোন ব্যক্তির নাম এখনো আমি জানি না। তিনি বড়োদা, আদিয়ার, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বহু সংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, পুঁথিগুলি হইতেছে জাতীয় সম্পত্তি, ইহাতে কাহারো ব্যক্তিগত স্বত্ব নাই। যে রকমে হউক, এ সব সংগ্রহ করিয়া সুরক্ষিত করিতে হইবে। তাই যদি কখন ইহাদের সংগ্রহে তেমন কোন অসাধু উপায়ও অবলম্বন করিতে হইত ইনি তাহাও করিতেন। কীরূপে পুঁথি সংগ্রহ করিলেন প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, 'ও কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি দিতেছি, গ্রহণ করুন।' তিনি ছিলেন বানপ্রস্থ। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক ছিলেন। তিনি বেতন গ্রহণ করিতেন না, কেবল পাথেয় ও সাধারণ আহারের ব্যয় লইতেন এবং পাই-পয়সা করিয়া তাহার হিসাব দিতেন। পুঁথি সংগ্রহের জন্য তিনি গ্রামে-গ্রামে সস্ত্রীক যাইতেন। কোন বাড়ীর ভিতরে নিজে যাইতে না পারিলে, স্ত্রীকে সেখানে পাঠাইতেন, এবং ইনিই পুঁথি বাহির করিতেন। শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত অনেক গ্রাম হইতে তিনি এইরূপে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমরা যেখানে কিছুই করিতে পারি নি। সংগৃহীত পুঁথিগুলিকে ঠিক-ঠাক করিয়া রক্ষারও ব্যবস্থায় ইনি খাটিতেন। কোন কোন পুঁথির পাতাগুলিকে সুতা দিয়া গাঁথিয়া রাখা হয়। অনেক সময়ে এই সব সুতা ছিঁড়িয়া থাকিত। গ্রন্থশালায় তিনি নিজের স্ত্রীর সহিত বসিয়া আবার ঐ সব পুঁথির পাতায় সুতা লাগাইতেন। কী করিতেছেন প্রশ্ন করিলে বলিতেন 'এদের thread ceremony (অর্থাৎ পৈতা) হইতেছে'! ইনি ইংরেজীতে কথা বলিতেন। ইনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ শৈব, কিন্তু উদার মতের। পরে ইনি ইউরোপে নরওয়ে পর্যন্ত যতদূর সম্ভব নিয়মনিষ্ঠা রক্ষা করিয়াই ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। আমাকে ঐ সময়ে লিখিয়াছিলেন, তীর্থ পর্যটনে মেরুযাত্রা করিতেছেন। নরওয়ে হইতে ফিরিবার সময় তিনি তুরুস্ক হইয়া বিমানপথে আসিয়াছিলেন।

কথায় কথায় দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পূর্ব স্থানেই যাই। পুঁথির প্রয়োজনের কথায় গুরুদেবকে শ্রীযুক্ত অনন্ত শাস্ত্রীর কথা বলাতেই তিনি রাজি হইলেন। দক্ষিণ-ভারতে "হিন্দু" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পত্রে গুরুদেবের নামে পুঁথির জন্য আবেদন প্রকাশিত হইল। আর অনন্ত শাস্ত্রী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় আড়াই হাজার সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিল গ্রন্থ-অক্ষরে। এই অক্ষর দক্ষিণ-ভারতে চলে, উদীচ্যদের নিকটে ইহা সহজে আয়ত্ত হয় না। এ জন্য এক জন দক্ষিণী পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি হইতেছেন পণ্ডিত শ্রীনটেশ আয়া স্বামী। ইনি শান্তিনিকেতনে আসিয়া ও চীনা-তিব্বতী শিখিয়া নিজেকে নানারূপে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। ইনি এখন সেখানকার চীনাভবনের অন্যতম অধ্যাপক।

পুঁথিগুলি হইতেছে জাতীয় সম্পত্তি। অনন্ত শাস্ত্রীর এই কথাটি মনে রাখিয়া বিশ্বভারতী যেন এই সংগৃহীত পুঁথিগুলি সুরক্ষিত রাখেন।

৪

শান্তিনিকেতনের প্রথমাবস্থায় গ্রন্থশালার কথা বলিতেছিলাম, ইহার তখনকার সংস্কৃত বিভাগটি যেরূপে হয় বলিয়াছি, এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, গ্রন্থশালার সংস্কৃত ভিন্ন অপর অংশ গুরুদেবের নিজেরই পুস্তকসমূহ দিয়া আরম্ভ করা হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচুর ইংরেজী পুস্তক ছিল। বলা বাহুল্য, এই পুস্তকগুলি কেবল আলমারী সাজাইবার জন্য কেনা হয় নি। শান্তিনিকেতনের তখন সে সমস্ত কেনা হয় প্রয়োজন অনুসারে। সমস্ত পুস্তকই গুরুদেব কিনিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অতি যৎসামান্য সংখ্যক গুরুদেবের পরিবারের মধ্যে কাহারো কাহারো হইতে পারে। আমি যখন শান্তিনিকেতনে যাই, দেখিতে পাই, আমার স্পষ্ট মনে আছে, পুস্তকবিক্রেতা থ্যাকার, স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানি, নিয়মমত প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া ইংরেজী পুস্তক ডাকে গুরুদেবের নামে পাঠাইতেন। এইরূপ করিবার এই উদ্দেশ্য ছিল, যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আগত বইখানি তাঁহার পড়া হইয়া যাইতই। এইরূপে বহু পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল।

আর কিছু নয়, যদি এইমাত্র জানা যায় যে, কেহ সেই বিপুল ইংরেজী গ্রন্থরাশি অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তবে তাহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ ব্যক্তির ইংরেজী জ্ঞান আছে কি না, এবং তাহা কীরূপ।

ইংরেজী গীতাঞ্জলি বাহির হইয়াছে। গুরুদেব নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহার বহু দিন পরে এক দিন তাঁহার কাছে বসিয়া আছি। আর কেহ সেখানে ছিলেন, মনে হইতেছে না। তাঁহার ইংরেজী লেখা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি যে, তাঁহার নিজের লেখা, আমাদের দেশে অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, গুরুদেব এণ্ড্রু সাহেবকে দিয়া উহা লেখাইয়া লইয়াছেন। ইহা উল্লেখ করিয়া গুরুদেব বলিলেন 'যদি তাহাই হয় তবে এণ্ড্রুজ নিজের নামে উহা প্রকাশ করিলেন না কেন? তিনিও তো, নোবেল পুরস্কার পাইতে পারেন, লইতেছেন না কেন?'

কীরূপে নোবেল পুরস্কার পাওয়া যায়, ইহার জন্য কোথায়, কেমন উদ্যোগ-আয়োজন, চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয়, এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কত লোকে তাঁহাকে কত রকম চিঠিপত্র লিখিয়া বিরক্ত করে, গুরুদেব তাহার কিছু বিবরণ দিয়াছিলেন।

আমি প্রশ্ন করিলাম 'আচ্ছা, গুরুদেব, আপনি তো এখন ইংরেজী লিখিতেছেন, আগে লিখিতেন না কেন?'

তিনি বলিলেন, 'আমি কি জানিতাম যে, আমি ইংরেজী লিখিতে পারি? প্রয়োজন হইলে, অজিত[১] প্রভৃতিকে ধরিয়া ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখাইয়া লইতাম। তার পর, এক দিন পূজার ছুটির পর শিলাইদহে আমার নৌকার মধ্যে আছি। পাশেই দোয়াত, কলম, কাগজ ছিল। তুলিয়া লইয়া কাগজখানায় অনির্দিষ্ট ভাবে একটু একথা-সেকথা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। দুই-একটা করিয়া ইংরেজী কথাও লিখিয়া ফেলিলাম। তার পর দেখিলাম, ধীরে ধীরে একটু করিয়া ইংরেজী কথাও কলমে আসিতেছে। ক্রমশঃ দেখিলাম আমি এক-আধটু ইংরেজী লিখিতে পারি। আমি সেই দিকে মন দিলাম। তাহার ফলে গীতাঞ্জলির ইংরেজী হইল। প্রথমত ইহা কাহাকেও দেখাইতে অত্যন্ত সঙ্কোচ হইত। পরে তাহা কাটিয়া গেল।

৫

বাঙলা ও সংস্কৃত

যখনকার কথা বলিতেছি তখন শান্তিনিকেতনে কলেজ খোলা হয় নি। সংস্কৃত ও বাঙলা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়ান হইত। কয়েকজন শিক্ষক বাঙলা পড়াইতেন।[২] কিন্তু ইহারা কেহই সংস্কৃত জানিতেন না। ইহাদের পড়ান দেখিয়া গুরুদেবের দৃঢ় ধারণা হয় যে, কিছু সংস্কৃত না জানিলে বাঙলা ভাল করিয়া জানা হয় না, বানান ঠিক হয় না, আবশ্যকমত নূতন নূতন শব্দও উদ্ভাবন করিতে পারা যায় না। তিনি নিয়ম করিলেন, যাঁহারা এখানে (শান্তিনিকেতনে) বাঙলা পড়াইবেন, তাঁহাদিগকে সংস্কৃত পড়িতেই হইবে। অন্যথা এখানে তাঁহাদের স্থান হইবে না। গুরুদেব আমাকে ডাকিয়া ইহাদের সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। আমি অবিলম্বেই মুজফ্ফরপুর হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর মিশ্র মহাশয়কে আনাইয়া এই কার্যে নিযুক্ত করিলাম। বিদ্যাভবনেও ইহার কাজ ছিল। ইনি পাণিনি-ব্যাকরণে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। বাঙলার শিক্ষকদের হাতে লঘুকৌমুদী দেখা গেল। ইহা ইচ্ছায় তো কখনো নহে, বরং তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ইহা না পড়িয়া তাঁহাদের উপায় ছিল না। গুরুদেব এ বিষয়ে এতই কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। এক দিন এক জন শিক্ষক (নগেনবাবু) এ বিষয়ে অবজ্ঞা করায় গুরুদেব তাঁহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।

---

১ ইংরেজী অধ্যাপক স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তী।

২ ইহাদের মধ্যে দুই জনের নাম স্পষ্ট মনে আছে, ৺কালীমোহনবাবু (ঘোষ) আর নগেনবাবু (আইচ)। ইঁহাকে যখন আমি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিই যে, ইঁহার উপাধি আ ই চ শব্দটি সংস্কৃত আ দি ত্য (> প্রাকৃত আ ই চ্চ) হইতে। যেমন যশোরে ছিলেন প্র তা পা দি ত্য, তখন তিনি আমার প্রতি বড় খুশী হইয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্রজির একটা কথা বলা যাইতে পারে। গুরুদেবের বিশেষ ইচ্ছা ও লক্ষ্য ছিল যে, আশ্রমের প্রত্যেকটি শিক্ষক যেন কিছু-না-কিছু শিক্ষা বা আলোচনা করিয়া নিজেকে যোগ্যতর করিয়া তোলেন। মিশ্রজি বিদ্যাভবনে দুই-একটি ছাত্রকে পাণিনি পড়াইতেন, তা ছাড়া আমি তাঁহাকে একটা বিশেষ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। ব্যাসের বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্র সুপ্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন বহু ভাষ্য আছে। এই সকল ভাষ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল ভাষ্যেই একরূপ পাঠ গৃহীত হয় নাই। তা ছাড়া, কোথাও পূর্ব সূত্রের শেষ শব্দটি পরবর্তী সূত্রের প্রথমে, কোথাও দুইটি সূত্রকে একটি করিয়া, বা কোথায় একটি সূত্রকে দুইটি করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। এইরূপ বহু অনৈক্য এই ভাষ্যগুলিতে দেখা যায়। মিশ্রজি আমার পরামর্শে এই সমস্ত অনৈক্য প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের একটি নূতন সংস্করণ করেন। ইহা বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, বিদ্যাভবনের প্রকাশনগুলির প্রচারের দিকে বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য প্রথম হইতেই কম।

অখণ্ড ভারত অথবা খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্রভাষা

শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ

বাংলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি হচ্ছে ওয়ার্ধাস্থিত রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক শাখা। মূল এবং প্রাদেশিক, দুইটি সমিতির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের সমাধানে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হচ্ছি। মহাত্মা গান্ধী, অধ্যক্ষ শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রওয়াল এবং আচার্য্য কালেলকার—এঁরা প্রত্যেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মূল সমিতির পদাধিকারী হয়ে আসছিলেন। দুই বৎসর হ'ল মহাত্মাজী এবং অন্যান্যেরা এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা সমীচীন মনে না করে হিন্দুস্থানী প্রচার সমিতি কায়েম করেন। মহাত্মাজী রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তাঁর মত বদলে ফেলেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, হিন্দী-উর্দ্দু দুইটিই রাষ্ট্রভাষা আর দেবনাগরী-ফার্সী দুইটি লিপিই রাষ্ট্রলিপি। এই ভাষা থেকে সংস্কৃত, আরবী এবং ফার্সী শব্দ বাদ দিতে হবে। অতএব প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে উপরোক্ত দুইটি ভাষা ও দুইটি লিপিই শিখতে বা আয়ত্ত করতে হবে; কেননা ভারতে এই দুইটি ভাষা ও লিপিই সর্ব্বাধিক প্রচলিত, কাজেই দুইটির সংমিশ্রণে প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা সৃষ্টি করা হবে। তিনি দুইটিকে গঙ্গা-যমুনার উপমা দিয়ে রূপকচ্ছলে ভাষা-সরস্বতীর উল্লেখ করেছিলেন ও ভাষায় ত্রিবেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে সরস্বতী আজ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে ভাষা-সরস্বতী হয়তো অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন।

পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ায় আজ যদি হিন্দুস্থান এই ভিত্তির উপর হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে চা'ইতে আরম্ভ করে—যে পাকিস্থান উর্দ্দু কায়েম করতে চেষ্টা করবে—তবে তাদের সেই চাওয়াকে অন্যায় বলা যায় না। কারণ উর্দ্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা করবার প্রয়াস ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে। উক্ত নীতির অনুসরণ ইতিমধ্যেই সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে, বাংলা ভাষায়ও তার প্রভাব বিস্তারলাভ করতে সুরু হয়েছে। অবশ্য বাংলা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি এই সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নিতে রাজী নয়। যে যে কারণে গোড়া থেকেই কেউ কেউ হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করবার জন্যে প্রচারকার্য্য চালাচ্ছেন সেগুলো একে একে উল্লেখ করা হচ্ছে। অধ্যক্ষ অগ্রওয়াল তো স্বকীয় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা এইটিই বেশী করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, উর্দ্দু মুসলমানদের আর হিন্দী হিন্দুদের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। এর দ্বারা দুই সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদকেই স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, যদিও মুখে ভারতের অখণ্ডত্বের দোহাই দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্থানে উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিক্রিয়ায় ফলে ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হওয়া অনিবার্য্য মনে করা ভুল হবে। বরং এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে এই মতবাদের প্রচারকগণ গোড়ায় যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন আজ আবার তার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। এর পিছনে রয়েছে অদূরদর্শিতা অথবা অন্ধানুসরণ যার ফলে সমস্ত ভারত রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠেছে, ফলে বিভিন্ন মতবাদের শিকড় গজাতে সুযোগ পেয়েছে। আমাদের মতে বরং যখন থেকে দুইটির প্রচলনের প্রয়াস সুরু হয়েছে তখন থেকে এই ভাষাগত সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এর মূলে প্রথম থেকেই প্রচ্ছন্নভাবে সাম্প্রদায়িকতার ছাপ রয়ে গেছে এবং আপোষ-রফা করবার প্রয়াসও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। আজকাল যোগ্যতার যুগ। যে যোগ্য সে উপযুক্ত স্থান অধিকার করবেই। অবশ্য

পৃষ্ঠপোষক পেলে কম সময়ে সকলকাম হওয়া যায়, নতুবা দেরি হয়।

আর একটি কথা, ভাষা কেউ কোন দিন গড়ে নি, ভাষা হচ্ছে স্বতঃপ্রবাহিত স্রোতের মত। বরং যখনই ভাষাকে বিশেষ ছাঁচে গড়বার চেষ্টা ব্যক্তিবিশেষ সুরু করেছে তখনই তার স্বাভাবিক গতি হয়েছে ব্যাহত। ভাষা সম্পত্তিবিশেষ নয়, জড় পদার্থ নয় যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে মিটমাট করা যায়। এমনি ভাবে সত্যিকারের ঐক্য হবে কিসে? অক্লান্ত পরিশ্রমে আর দীর্ঘ দিনের অপেক্ষায় ফলে যদি দুইটি ভাষা মিলে বর্ণসঙ্কর 'হিন্দুস্থানী'র সৃষ্টি হয়ে থাকে তথাপি তার দুইটি লিপি কি প্রমাণ করবে? এখানে যে আবার গরমিল—গোড়ায় গলদ। এমনিভাবে গোঁজামিল দিয়ে তৈরি যে রাষ্ট্র-ভাষা তার দেশের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের কোন সাদৃশ্য নেই, তারা পরস্পর সম্পর্কহীন।

অতএব আমাদের মত এই যে, মুখ্য মুখ্য ভারতীয় ভাষা-গুলিকে স্বাধীনভাবে নিজেদের দাবি প্রচার করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল এবং সেগুলির দাবিত্বতার জনমতের উপর ছেড়ে দিলেই ভাল হ'ত। বাংলার জন্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, হিন্দীর জন্যে হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন, উর্দুর জন্য আঞ্জুমানে তরক্কী উর্দু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করত তা হলে দেখা যেত যে স্বল্পকাল মধ্যেই স্বাভাবিক কারণে হিন্দী ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষাগুলি রাষ্ট্রভাষার দাবি ছেড়ে দিয়েছে। এই ধরণের কিছু না করে হঠাৎ উপর হতে হিন্দী-উর্দুর প্রচারের ধুয়া তোলায় অন্যান্য ভাষাগুলি তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করবার সুযোগ পায় নি। এই ভাবে বাস্তবিকই উপরোক্ত ভাষাসমূহের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, আর সত্যেরও অমর্য্যাদা করা হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করলে হিন্দী ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষীরা স্বতঃই বুঝতে পারতেন যে, বৃহত্তর লাভের জন্যে স্বার্থত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কাজেই হিন্দী প্রচারের বিরোধিতাও তাঁরা করতেন না। বাংলা ভাষার তরফ থেকে বলা যেতে পারে যে, ভারতে উর্দু অপেক্ষা বাংলা ভাষা বেশী প্রচলিত, তার লিপিও উর্দুর চেয়ে কম প্রচলিত নয়। তার উপর সাহিত্যসম্পদে তো ভারতের কোন ভাষাই তার কাছে দাঁড়াতে পারে না; তবুও উদারমনা বাঙালী বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ভাষার দিক দিয়ে সর্ব্ব ভারতীয় অখণ্ডত্ব রক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ দাবি ত্যাগ করে হিন্দীর সপক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু উর্দুকে টেনে আনায়, রাষ্ট্রভাষা বাংলা লিপিতে কেন লেখা যাবে না এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করার সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা যাঁরা হিন্দী বা দেবনাগরীর পাশে উর্দু বা ফার্সীকে এনে বসাবার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগে গেছেন। তাঁরা রাষ্ট্রভাষা-সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে তাকে ঘোরালো করে তুলেছেন আর ঐক্যের জায়গায় বিভিন্নতা আর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন।

হিন্দী উর্দুর মধ্যে ব্যাকরণসাদৃশ্য আছে, কিছুমাত্রায় শব্দ-সাম্যও আছে। সেগুলিকে অনায়াসে হিন্দী বলেই চালানো যেতে পারে। কিন্তু উর্দুর শব্দ-ভাণ্ডার প্রায় পুরোপুরি আরবী ফার্সী শব্দে পরিপূর্ণ, কাজেই তা বিদেশী। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান, আবার লিপি-সাম্যও রয়েছে। সে ক্ষেত্রে উত্তর ভারতের সর্ব্ব-সাধারণ দেবনাগরী লিপি সহজেই আয়ত্ত করতে পারে। বাংলাদেশের লেখাপড়া জানা অনেকেই দেবনাগরী অক্ষর চেনেন। যাদের দেবনাগরী অক্ষর পরিচয় নেই তাদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা খুব কষ্টসাধ্য হবে বলেও মনে হয় না। আর হিন্দী ভাষাকে বিদেশী বলে মনে করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু সংস্কৃতবর্জ্জিত, ফার্সীলিপিসম্বলিত, হিন্দুস্থানীকে সেই সব ভাষাভাষীরা কি ভাবে আপন করে নিতে পারেন? যাদের ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দ অজস্র, আরবী-ফার্সী বাদ দিলে অথবা ফার্সী লিপি বাদ দিলে সেই বাঙালীদের অসুবিধা হবে না; উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদেরও খুব মুশকিলে পড়তে হবে না। অসুবিধা যদি হয় তো একমাত্র তাঁদেরই হবে যাঁরা গোঁড়া উর্দু-ভাষাভাষী। আজ বাংলার মুসলমান ভায়েরা সাম্প্রদায়িকতার মোহে উর্দুর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলেও একথা সত্য যে বাংলাই তাদের মাতৃভাষা, বাংলা ভাষার সঙ্গেই তাদের অন্তরের যোগ গভীর; আর বাংলা ভাষা বা লিপি জানা মানে সংস্কৃত বা দেবনাগরীর সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হওয়া। তা ছাড়া বাংলা ভাষার মাসতুত বোন, শৌরসেনী-প্রাকৃত-অপভ্রংশ হিন্দী দেবনাগরী-বসনে সজ্জিত হলেই অপরিচিত কি করে হতে পারে? অথচ উর্দু বা ফার্সী লিপি আয়ত্ত করা গোটা বাংলার অধিবাসীদের পক্ষেই নয়, সমস্ত ভারতবাসীর পক্ষে দুঃসাধ্য। যদিই বা সুদূর ভবিষ্যতে তার লেশমাত্র সম্ভাবনাও থাকে, তা হলেও তাতে যথেষ্ট সময়, কঠোর শ্রম, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

উত্তর-ভারতের হিমালয়ের নিম্নবর্ত্তী অঞ্চলসমূহের নেপালী ভাষা এবং দক্ষিণ-ভারতের মারাঠি ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও দুইটিই দেবনাগরীতে লিখিত হয়। গুজরাতীও বাংলার ন্যায় দেবনাগরীরই রূপান্তরিত লিপিতে লেখা হয়। মারাঠি ভাষী অঞ্চল ছাড়া দাক্ষিণাত্যের অন্যত্র যদিও উত্তর-ভারতের কোন ভাষা বা লিপিরই প্রভাব নাই তবুও তামিলে ঢের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় আর সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিও অনেক আছেন। কাজেই হিন্দী এবং দেবনাগরী আয়ত্ত করা যে তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন নয়, তা বলাই বাহুল্য। অথচ তাঁদের জোর করে দুটি 'বিদেশী' ভাষা বা লিপি শেখানো—অর্থ, পরিশ্রম এবং সময় এই তিনটিরই অপব্যবহার মাত্র। ব্যক্তিগত প্রভাবের অপ-প্রয়োগ করে জাতীয় কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে কি ভাবে ব্যাহত

করা হচ্ছে তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। গত ২১ বৎসরের দক্ষিণ-ভারত হিন্দী প্রচার-সভাকে—যার মূলমন্ত্র ছিল ‘এক রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হো’, ‘এক হৃদয় হো ভারত জননী’—পারিপার্শ্বিক চাপে ফেলে ‘হিন্দুস্থানী প্রচারসভা’ নাম নিতে বাধ্য করা হয়েছে। আর এই সব অনুষ্ঠান মহাড়ম্বরে দেশের বরেণ্য নেতাদের দ্বারা করান হয়েছে যাতে দেশবাসীদের মনে সন্দেহ অঙ্কুরিত না হতে পায়। গণতন্ত্রের যুগে ভারতে জনমতকে যে কি ভাবে পদদলিত করা হচ্ছে এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ফার্সী লিপির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এই লেখা ভাষা-বিশারদ না হলে পাঠ করা সম্ভব হয় না। কারণ আকার ছাড়া আর কোন স্বর উচ্চারণ লেখার কালে থাকে না। উপরন্ত বহু উচ্চারণ ইংরেজীর মত অক্ষর যোগ করে লিখতে হয়। ওদিকে যে আবার কত রকমের ‘শ’, ‘স’ আর ‘জ’ তার ঠিক নাই। একেবারে অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজান—কোন উচ্চারণের জন্যে বহু বর্ণ প্রয়োজন আবার কোন উচ্চারণের জন্যে বর্ণের আবশ্যকতাই নাই। তার পর যদি বা হাতের-লেখার ধাঁচের লিথো-জাতীয় ছাপা উর্দ্দু পড়া যায়, লোহার টাইপের উর্দ্দু কোনমতেই বোধগম্য হয় না। এ অভিযোগ প্রত্যেক উর্দ্দুভাষীর মুখে শোনা যাবে।

এখানে রোমান অক্ষরের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রোমান লিপির সপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, রাষ্ট্রভাষা এই লিপিতে লেখা হলে ভাষাটি শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারতের বাইরেও তার প্রসার ও প্রচার হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা আছে। আর তাতে করে দেবনাগরী-ফার্সীর দ্বন্দ্ব থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঘরের প্রদীপ না জ্বালিয়ে কেউ বাহির দরজায় আলো দেয় না। বৈদেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য এত দিনের সাধনা আজ জয়যুক্ত হতে চলেছে অথচ স্বাধীন ভারতের নিজস্ব লিপি থাকবে না এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে। উপরন্ত, পূর্ব্ব-প্রভুদের নিদর্শনস্বরূপ ব্রিটিশজাতি শেষ আঁচড় রেখে যাবে আমাদের রাষ্ট্রভাষার বুকে, এটা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাহার উপর গোলামির এ দুরপনেয় কলঙ্ক-চিহ্ন কখনও মুছে যাবে না। তা ছাড়া দুইটি ভাষার দ্বন্দ্বের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে ডেকে এনে বসানোই বা কোন্ নীতি? বিশেষতঃ, দেবনাগরীর মত এরূপ বৈজ্ঞানিক ও স্বাভাবিক লিপি জগতে আর যখন নেই, তখন তাকে বর্জ্জন করার কি সার্থকতা? তা ছাড়া শুধু রোমান বর্ণমালা চালু করার কথা বললেই তো হ'ল না, তা কতদূর কার্য্যকরী হবে সেটাও তো ভেবে দেখা উচিত। আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় উচ্চারণ-পদ্ধতি প্রকাশে রোমান বর্ণমালা যে খুব উপযোগী তা প্রমাণিত হয় নি। এক n অক্ষরকেই ṇ ñ ṅ ইত্যাদি কত বিভিন্ন রূপ দিয়েই না ভারতীয় বর্ণমালার প্রতিবর্ণমালা নির্দ্দিষ্ট করতে হবে। এমতাবস্থায় ভারতস্থ ইংরেজী ভাষাভাষীরাও যে রাষ্ট্রভাষায় রোমান বর্ণমালা প্রচলন সমর্থন করতে পারেন না, তা ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এক main-কে মাইন, মেন, মেইন, ম্যান, ম্যাঁ, মৈঁ ইত্যাদি কত কি-ই না পড়া যায়। ‘ট’ বর্গীয় এবং ‘ত’ বর্গীয় বর্ণমালার উচ্চারণগুলির রোমানে রূপ দিতে বহু আয়াসের দরকার। আর যদি বা রোমান বর্ণমালাকে এমনি ভাবে নূতন ছাঁচে গড়া কোনো দূর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হয় তা হলেও তার অর্থ, উচ্চারণ, পাঠপদ্ধতি ইত্যাদি ভারতের চল্লিশ কোটি লোককেই নূতন করে শেখাতে হবে। সেটা প্রায় অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই আপাততঃ এই ধুয়ো উঠিয়ে লিপির প্রশ্নকে আরও জটিল করে না তোলাই শ্রেয়ঃ এবং অভিপ্রেত।

একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আজ ভারতে যতগুলি লিপি প্রচলিত, তাদের মধ্যে দেবনাগরীরই প্রচলন সবচেয়ে বেশী। ভারতে দেবনাগরী জানা লোকের অভাব নাই। তাঁদের বাদ দিয়ে, বাদবাকীদের দেবনাগরী শেখাতে, ফার্সী ও রোমান প্রচার ও শিক্ষাদানের চেয়ে ঢের কম শক্তি পরিশ্রম সময় ও অর্থের দরকার হবে। তাই আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে, সবাই যদি আন্তরিক ভাবে দেবনাগরীর প্রচারে বদ্ধপরিকর হন তো খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তা সারা ভারতের একমাত্র লিপিতে পরিণত হতে পারে। দেবনাগরী আর হিন্দীকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখা বা কেবলমাত্র একটি বিশেষ জাতির লিপি বা ভাষা আখ্যা দেওয়া সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক হবে। তার উপর গণতন্ত্রের যুগে, গণদেবতার চোখে ধুলো দিয়ে দেবনাগরীর পাশে, ভারতের অন্যান্য লিপির প্রতি অবিচার ক'রে ফার্সীকে সমান মর্য্যাদা দেওয়া জন-কল্যাণের নামে জনগণকে প্রতারিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতের জনমত নেওয়া হলে দেখা যাবে যে, বাস্তবিক একমাত্র দেবনাগরীই সর্ব্বভারতের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা-জনক ও সর্ব্বজনগ্রাহ্য লিপি এবং তা আয়ত্ত করাও সকলের পক্ষে সহজসাধ্য।

এখন ভাষার দিক থেকেও একটু আলোচনা করা যাক। আমরা হিন্দী বলতে কি বুঝি? এককালে মুসলমানেরাই উক্ত ভাষার নাম ‘হিন্দী’ রেখেছিলেন। ডক্টর ইকবালও তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় ‘ভারতীয়’ এই অর্থেই—‘হিন্দী’ কথাটি ব্যবহার করেছেন—“হিন্দী হৈঁ হম বতন হৈঁ হিন্দোস্তাঁ হমারা।” তা হলে আজ ‘হিন্দী’ শব্দে মুসলমানগণ ভীত হচ্ছেন কেন? তাঁদের দেওয়া নামে কেনই বা আজ সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আসছে? তার কারণ, আমাদের মতে, “ঐক্যের সওদা” করতে যাওয়ার কুফল আর গোড়ায় সত্য ও ন্যায়ের জোরে পাওয়া অধিকারকে, মিথ্যা উদারতা ও ন্যায়বিচারের ভাঁওতা দিয়ে হারানো। স্বাধীন ভারতে যেমন অন্যান্য ভাষার সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাদের সাহিত্য ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি

করবার পূর্ণ সুযোগ তারা পাবে, তেমনি সেই অধিকার উর্দ্দুরও থাকবে।- কিন্তু শুধু প্রতিক্রিয়ার ভয়ে তাকেও রাষ্ট্রভাষার পর্য্যায়ভুক্ত করা জেনেশুনে জনগণের মনস্তাপ সৃষ্টি করা— তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তাই অখণ্ড ভারতের বেলায়ও যা খাটত আজ খণ্ডিত ভারতের বেলায়ও তাই খাটবে। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত সেই হিন্দী ভাষাই যেটি, সম্পূর্ণ ভারতীয় ; যা আর্য্য সংস্কৃতি আদর্শ ও ঐতিহ্যের বাহক, সংস্কৃতবহুল, ইসলামীয় কৃষ্টি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যবহারিক শব্দমিশ্রিত এবং ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে প্রচলিত শব্দসম্পদে সমৃদ্ধ—যাকে ইংরেজীর একটি কথায় ব্যক্ত করা যায় BASIC—আর তার অর্থ এই ভাবে করা হবে যেমন : B—Bhartiya, A—Aryan, S—Sanskritic, I—Islamic, C—Chalu

কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা সে সম্বন্ধে আজ বিশেষ ভাবে ভেবে দেখা উচিত। বিষয়টি হচ্ছে এই যে, আজ অখণ্ড হিন্দী-উর্দ্দু দুইটিকে সমান সমান স্থান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করে চললে ভবিষ্যতে শুধু উর্দ্দুরই নির্ব্বিরোধে 'ডি-ফ্যাক্টো' রাষ্ট্র-ভাষা হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাব্যতা আছে। তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবি ত্যাগ করতে হবে, সে তার ন্যায্য আসন থেকে বঞ্চিত হবে। আজ থেকে দুই বৎসর আগে হিন্দী ভাষা এবং দেবনাগরী লিপির কথা যাঁদের মুখে শুনেছিলাম আজ তাঁদেরই মুখে হিন্দী-উর্দ্দু এবং দেবনাগরী-ফার্সীর কথা শুনছি, ভবিষ্যতে যে শুধু উর্দ্দু এবং ফার্সী শুনব না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে ? আর পাকিস্থান যদি শুধু উর্দ্দুকে তাদের রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করে তা হলে সেখানকার অধিবাসীরা সবাই উর্দ্দু শিখবেন। এদিকে মাতৃভাষা যাদের উর্দ্দু তেমন লোকের সংখ্যা কম নয়, উপরন্তু 'হিন্দুস্থানী'কে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচার ও প্রসারের নীতি অবলম্বন করলে ভারতীয় ইউনিয়নেরও সবাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং তোষণ-নীতির ফলে হিন্দী এবং উর্দ্দু দু'টিই শিখে রাখবেন। কাজেই সমগ্র ভারতে উর্দ্দু ভাষা প্রচারের অনুকূল অবস্থা এখন থেকেই তৈরি হয়ে রইল। আবার যখন এক দিন আজকের এই খণ্ডিত ভারত অখণ্ড হবে ; তখন দেখা যাবে যে সমগ্র ভারতের চল্লিশ কোটি লোকই উর্দ্দু জানে। আজ রাষ্ট্রভাষা হবার জন্য উর্দ্দুর দাবি কিঞ্চিন্মাত্র না থাকা সত্ত্বেও যদি উর্দ্দু সমর্থকেরা ভারতের রাষ্ট্র-ভাষার ক্ষেত্রে উর্দ্দুকে হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্য্যাদার আসনে বসাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠ্‌তে পারেন আর দেশের শ্রেষ্ঠ নেতৃবর্গ, এমন কি স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত এই অসঙ্গত দাবিকে মেনে নিতে পারেন, তো ভবিষ্যতে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। ভারতের যাবতীয় অধিবাসীরাই তখন উর্দ্দু ভাষা শিখতে বাধ্য হবে। সেই পরিস্থিতিতে হিন্দীর আসন কোথায় নির্দ্দিষ্ট হবে, রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সে কি অপাংক্তেয় বলে গণ্য হবে না ? গণভোটে, জনমতের দ্বারা তখন উর্দ্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং ফার্সীই একমাত্র রাষ্ট্রলিপি বলে পরিগণিত হবে। আজ যে-সকল 'হিন্দুস্থানী' সমর্থকেরা হিন্দী-দেবনাগরীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত তাঁরা কি এই ইচ্ছাই পোষণ করেন যে, খণ্ডিত ভারত যদি পুনরায় অখণ্ড হয় তবে তার রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দ্দু আর ফার্সী-লিপি হবে রাষ্ট্র-লিপি। আর রাষ্ট্র-ভাষার আসনে বসবার সত্যিকারের অধিকার যার রয়েছে, প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে নিতান্তই গায়ের জোরে সেই ভাষাকে স্রেফ প্রাদেশিক ভাষা বলে গণ্য করাটাকেই কি তাঁরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

তবে দেশের নাম 'হিন্দুস্থান' হলে তার রাষ্ট্রভাষাকে এবং সেই দেশবাসীকে 'হিন্দুস্থানী' নাম দিলে আমরা আপত্তি করব না। কিন্তু আজ যদি শুধু খণ্ডিত ভারতের নাম 'হিন্দুস্থান' হয়, তার রাষ্ট্রভাষা যদি 'হিন্দুস্থানী' হয় এবং আজ ভাষাগত যে অর্থে 'হিন্দুস্তানী' ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থ কায়েম হয় তবে আমরা কখনই তা সমর্থন করতে পারি না। 'হিন্দুস্থানী'র নামে রেডিও যে ভাষায় সংবাদ পরিবেশন করে এসেছে এবং দেশের বরেণ্য নেতারা আজ 'হিন্দুস্থানী'র নামে যে ভাষায় বক্তৃতা দেন, আমরা প্রশ্ন করতে পারি কি, এ খণ্ডিত ভাষার ব্যাপকতা কতটুকু এবং তা এই বিরাট দেশের কয়জন অধিবাসীর বোধগম্য।

তবে কি এটাই আমাদের মেনে নিতে হবে যে আজ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীরা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করেন না। হিন্দী যে ভারতীয় সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে এ কথা এক গায়ের জোর ছাড়া আর কিসে অস্বীকার করা যায় ? হিন্দীকে যে আজ প্রচার করে শেখান হচ্ছে তা নয় ; হিন্দী দেশময় আপনা হতেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এর একটা প্রাচীন ঐতিহ্য আছে। সর্ব্বভারতীয় ভাষাগত কোন প্রসঙ্গ উঠলেই, সে ক্ষেত্রে হিন্দীরও কথা উঠবেই। প্রাচীন ভারতীয় সামন্ত যুগের ইতিহাস, হিন্দী ভাষায় 'রাসো' গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। প্রেমভক্তির উৎসস্বরূপ সন্ত-কাব্যসমূহে বিশ্বপ্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি আছে, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"মধ্য যুগের সাধক কবিরা হিন্দী ভাষায় যে ভাবরসের ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়াছেন তাহার মধ্যে অসামান্য বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব এই যে তাঁহাদের রচনায় উচ্চ অঙ্গের সাধক এবং উচ্চ অঙ্গের কবি একত্র মিলিত হইয়াছেন—এমন মিলন সর্ব্বত্রই দুর্লভ।" এই কারণেই কবীর, দাদূ, মীরা, তুলসী দাস, সুরদাস এবং অন্যান্য সন্ত-কবিরা শুধু উত্তর-ভারতেই খ্যাতি অর্জ্জন করেন নি, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে তাঁদের সাধনার ধারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। মুসলমানগণও সুফী-মত প্রচারার্থে গ্রন্থাদি এই হিন্দীতেই রচনা করেন। পদ্মাবত রচয়িতা জায়সী, কুতবন, উসমান এই পর্য্যায়ের কবি। রহীম এবং রসখানও লোকপ্রিয় কবি হতে পেরেছেন হিন্দীতে রচনা করেই। বাংলাদেশেও কেশবচন্দ্র সেন এবং মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই ভাষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আগে থেকেই ইঙ্গিত ... গয়েছেন।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় ·

১

দুর্গামোহনের বৈঠকখানায় প্রাত্যহিক পাশার আড্ডা বসেছে। দান-কেলা ও আড়ি-মারার চীৎকারে থমথমে দুপুর বেলাটা খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—এ পাড়ার বহুদূর পর্য্যন্ত। বসু-ঘরণী সংসারের কাজ সেরে এই সময় একটু বিশ্রাম করেন। আর এই সময়েই পাশার আড্ডার কোলাহলটা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। অপ্রসন্ন মুখে ভুরু কুঁচকে বসু-ঘরণী বলেন, বেলা তিনটের আরম্ভ হ'ল দুপুরে মাতন! মানুষের খেয়ে শুয়ে একটু সোয়াস্তি নেই গা? নিত্যি নিত্যি কানের কাছে ডাকাত পড়াপড়ি—কারই বা ভাল লাগে?

কানের কাছেই বটে—এক পাঁচিলের এপিঠ ওপিঠ দুখানা বাড়ি। সাধারণ ভাবে সংসারের কথাবার্ত্তা কইলে—এক বাড়ির ঘরের হাক জানালা দিয়ে আর এক বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে অনায়াসে কর্ণগোচর হয়। পাড়াগাঁয়ে এত ঘেঁষা-ঘেঁষি বাড়ি তৈরি করার অর্থ—সেকালের প্রীতিবন্ধনবশত ঘটে থাকলেও—এ কালের সৌহার্দ্য-শিথিল আবহাওয়ায় ঠিকমত পরিস্ফুট হয় না। জমির হিস্যে নিয়ে বিবাদ এদের মধ্যে পাকাপাকি ভাবে কিংবা আকস্মিকও না ঘটে থাকলেও একের গোপন সাংসারিক বার্ত্তা অন্যের গোচরে আসে—এটা এবাড়ি ওবাড়ির কেউই চান না। কেননা, কালের প্রবাহ দু'বাড়ির সমৃদ্ধিকেই কিছু-না-কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জোত জমি—যা নিয়ে এককালে মানুষের সম্পদের নিরিখ নির্ণীত হ'ত—তার ধারাও গেছে বদলে। এখন কোন্ বাড়ির ছেলে—কোন্ ভাল আপিসে বড় চাকরি করে তাই নিয়ে মান-সম্মানের পাল্লা দেওয়ার রেওয়াজ। যেমন সেকেলে গহনা নারকেল ফুল আজ ইলেকট্রিক প্যাটার্ণের চুড়ির ফ্যাসানে পৌঁছেছে। তাতেও কি নিস্তার আছে! জমি যেমন সেকালের সম্মান—আর একালের উপহাসের বস্তু—তেমনি গহনাও ভরিতে বা নিত্য নূতন ফ্যাসানের অভিনবত্বে মানুষের মনকে শ্রদ্ধা বা গৌরবান্বিত করতে পারছে না। দু' দুটো যুদ্ধের ঢেউ—সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে গেল। মনে হ'ল, যে কালের স্রোত বনিয়াদে স্বাভাবিক গতিকে বহু পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়ে মানুষের সভ্যতাকে—সমাজকে তার মনকে আর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্ববশে আনতে পারত—তা অত্যন্ত অকস্মাৎ আর দুর্ব্বার গতিতে এসে পড়েছে পৃথিবীর উপর। এক শতাব্দী—আর এক শতাব্দীকে জোর করে হটিয়ে দিচ্ছে। তার আয়ুষ্কাল থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে সময়—তার বিধি-বিধানকে দিচ্ছে উল্টে—তার লেখাকে মুছে ফেলে নূতন বর্ণ-মালার সমাবেশ করতে চাইছে—এবং বিস্তৃত পৃথিবীকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে—ঘরের সামনে গুটিয়ে আনছে। আজ পাড়া-গাঁয়ে বসে—মনে হবে না—এখানকার সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে বাস করছি। ইচ্ছে করলেও—শহরের ঢেউকে—গাঁয়ের মাঠ দিয়ে—বনের পাঁচীল দিয়ে বা নদীর রেখা টেনে আটকে রাখা যায় না। আবার এখানকার সাদাসিধা সুখ সুবিধাগুলিকে ঘরের মধ্যে বন্দী করাও কঠিন। এদের যাওয়া-আসার মধ্যেই নতুন কালের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটছে। কালের স্রোত প্রবল হয়েছে বলেই বয়োবৃদ্ধেরা অহরহ অনুযোগ তুলছেন, কলিকাল!

যাই হোক—বসু-গৃহিণীর উক্ত মন্তব্য দুর্গামোহনের বৈঠক-খানায় প্রবেশ করলেও সেখানকার জমজমাট ভাবটি নষ্ট করতে পারে না। বৈঠকখানার ঠিক সামনে শাখা-সমৃদ্ধ আমগাছের ডালে বসে দুটো দাঁড়কাক প্রত্যহ দুপুরে যেমন কর্কশ স্বরে প্রণয়-আলাপের দ্বারা গ্রামবাসীদের অমঙ্গল আশঙ্কাকে বর্দ্ধিত করলেও—দুর্গামোহনের বৈঠকখানাকে বিদ্ধ করতে পারে না—তেমনি পাশের বাড়ির অনুযোগও শূন্যমণ্ডলে ভেসে চলে যায়। দান ও আড়ি মারার চীৎকারে বড় ঘরটা গম গম করতে থাকে।

কচে বারোর দান মেরে দুর্গামোহন শেষ ঘুঁটিকে ঘরে তুলতেই একটা সহর্ষ চীৎকার উঠল। কিন্তু সে চীৎকারের রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না। প্রার্থিত দানটির সঙ্গে একখানি খামের চিঠি···বৈঠকখানা ঘরের দোরগোড়ায় টুপ করে ফেলে দিয়েছে পিওন। পিওনের মৃদু 'চিঠি' শব্দটি সহর্ষ চীৎকার ধ্বনির মধ্যে ডুবে গেলেও—প্রতিপক্ষ বিপিন রায়ের দৃষ্টি খামখানির উপর পড়ল—চিঠিখানা তুলে এনে তিনি তক্তাপোষের উপর রেখে বললেন, 'দুর্গা—তোমার চিঠি। চিঠিখানা ঘুরিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন, ছাপ দেখছি—জি-পি-ওর— ; প্রশান্ত দিয়েছে বোধ হয়।

দুর্গামোহন পত্রখানি খোলবার উদ্যোগ করছেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বললেন, প্রশান্ত জি-পি-ওতে সেদিন একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এল না?

হাঁ—বোধ করি—চাকরি পেয়ে গেছে। খামখানার এক পাশ ছিঁড়ে চিঠিখানা দুর্গামোহন মেলে ধরলেন।

বিপিন রায় ফরাসের উপর চাপড় মেরে বললেন, তবে আর কি তোমার তো পাথরে পাঁচ কিল। ভাল রকম খ্যাটের ব্যবস্থা করবে কিন্তু—হুঁ।

সবাই চীৎকার করে বিপিনের মন্তব্য সমর্থন করবার উদ্যোগ করতেই দুর্গামোহন হাত তুলে তাঁদের নিষেধ করলেন গোলযোগ করতে। চিঠির দুটি ছত্রও অতিক্রম করেন নি—

ইতিমধ্যেই দুর্গামোহনের মুখ গাম্ভীর্য্যে থমথমে হয়ে উঠল। হেতুটা সাধারণের বোধগম্য না হবারই কথা। পাশার খাজি আর সংসারের খাজি সাফল্যের সড়ক ধরে পাশাপাশি চলেছে। লক্ষ্যটা অনিশ্চিত নয়—ধ্রুব। অথচ—

দুর্গামোহন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পাঠ করে চলেছেন নিঃশব্দে। তাঁর গাম্ভীর্য্যে অমঙ্গল আশঙ্কা করে আর সকলে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। নিস্তব্ধ দুপুরের প্রকৃত রূপটি এই গম্ভীর মৌনতার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠল। স্তব্ধতার দুঃসহ অস্বস্তি সকলকে পীড়ন করছে—কৌতূহল তো প্রবল হবারই কথা। বিপিন রায় সুসংবাদ অনুমান করে ভুরিভোজের দাবি জানিয়ে এই মুহূর্তে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে করছেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার দায়টা যেন তাঁর ঘাড়েই বোঝার মত চেপে বসেছে। এপাশ ওপাশে হেলে—একটা কিছু বলে নিজেকে হাল্কা করে নেবার মানসে তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, প্রশান্ত ভাল আছে তো ?

চিঠি পড়তে পড়তে দুর্গামোহন সংক্ষিপ্ত গম্ভীর উত্তর দিলেন, ভাল।

সাহস পেয়ে বিপিন রায় বললেন, চাকরিটি হয়েছে তো ?

দুর্গামোহন বললেন, বলছি।

দু'পৃষ্ঠার চিঠি শেষ হতে আরও কয়েকটি নিস্তব্ধ মিনিট কেটে গেল। দুর্গামোহন মুখ তুলে বললেন—যতটুকু বিদ্যা-শিক্ষা তার হয়েছে—তাতে ইণ্টারভিউতে উৎরে যাবারই কথা। হাঁ—চাকরি সে পেয়েছে—একশো টাকা মাইনের একটা ভাল চাকরিই। কিন্তু বিপিন, কথায় আছে না—কপালে নেইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি ! এও হয়েছে তাই।

ঠিক বুঝতে পারলাম না দুর্গা—

আমিও বুঝতে পারছি না ভাই। যুদ্ধের শেষ হয়েছে, জিনিষের দাম তবুও বাড়ছে। কেউ বলেন—এমন ধ্বংস হয়েছে যে ফলপত্তর কিছু নেই। অথচ মানুষও তো কমল ! কেউ বলছেন—টাকার দাম আজ আর ঠিক চৌষট্টি পয়সা নয়, তের পয়সা। তাই যে অনুপাতে ব্যয় বেড়েছে সে অনুপাতে আয় হচ্ছে না। আয়ব্যয়ের তফাৎ যদি আকাশ-পাতাল থাকে—তো শান্তি আসবে কোথা থেকে !

কেউ কোন কথা কইলেন না। দুর্গামোহন হিসাব করে কথা বলেন—যেমন পাশার চাল দিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। গুছিয়ে কথা বলতেও উনি পটু। সদাগরি আপিসে চল্লিশ বছর চাকরি করে অবসর নিয়েছেন। ত্রিশ টাকায় সুরু—সাড়ে চার শোয় শেষ। কমসে-কম পঁচিশ ত্রিশটা সাহেব তাঁর হাত দিয়ে পার হয়ে গেছে—সার্ভিস-শীটে সবারই কলমের জোর সুপারিশ জ্বল জ্বল করছে। ফলে—অবসর নেবার পরও ঠিক পেনসন না হলেও কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ মাস মাস মাইনের আদ্দেক পেয়ে আসছেন। এখনও জটিল কোন কাজের সমাধান করতে মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় ছুটতে হয়। তিনি বলেন, সায়েবেরা কাজ বোঝে—মানুষের দাম ঠিক করে কাজের কষ্টিপাথরে কষে। এহেন লোক—কোন কাজই যার আল্‌গা বা এলোমেলো নয়—একখানা চিঠি পেয়ে এ রকম অর্থহীন প্রলাপ বকবেন এ তো ধারণায় আসে না। গোড়া বেঁধে কাজ না করলে যুদ্ধোত্তর হাজার হাজার যুবক যখন পাকা পাতাটির মত চাকরির বিশাল তরু থেকে টুপটাপ খসে পড়ছে—তখন তাঁর ছেলে যোগাড় করে নিলে একশো টাকায় এক চাকরি। ভাগ্য আর কাকে বলে। আর এইমাত্র পাশার প্রথম বাজিটাও—

দুর্গামোহন একটি নিশ্বাস ফেলে—চিঠিটা ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে ফেললেন। মুখে শুধু উচ্চারণ করলেন, তারা —তারা।

সবাই বুঝলেন—আপাতত উনি এ প্রসঙ্গ তুলতে চান না। কালীকৃষ্ণ অগত্যা বললেন—এই দানটা শেষ করবে, না নতুন করে ঘুঁটি সাজাব ?

দুর্গামোহন বললেন—লোকের পুত্র হলে—আনন্দ করে—দানধ্যান করে—কেন জান ? পুন্নাম নরক থেকে সে ছেলে যত ত্রাণ করুক আর না করুক—ইহকালের দুঃখকষ্ট থেকে ত্রাণ করবে এ আশাটা কোন্‌ বাপে না করে থাকে ? অথচ—

একটু থেমে বললেন—আশার অন্ত নেই বলে এত কষ্ট ভোগ করি আমরা। পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে বিপিন রায়ের হাতে দিয়ে বললেন—তুমিই পড়ে বল তো বিপিন—এই কথাগুলো লেখা তার ভাষ্য হয়েছে কিনা ? আমি যা পেনসন্‌ পাই—তাতে জীবিত কাল পর্য্যন্ত নিজের ভাবনা ভাবি না। চাকরি করে তোরই সংসার সচ্ছল হবে—তিনটে পাস দিয়ে একটু বুদ্ধি যদি তোর ঘটে না থাকে তো···এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্ত আপসোস হয় না ভাই !

বিপিন সাগ্রহে চিঠিখানা নিয়ে ঈষৎ উচ্চস্বরেই পাঠ করতে লাগলেন :

বাবা, ক্ষমা করবেন। এক সপ্তাহ চাকরি করতে-না-করতে বুঝতে পারছি—এ জিনিস আমার সইবে না। দু-এক দিনের মধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দেব ঠিক করেছি। সারা জীবন ধরে—এই দাসবৃত্তি ! দশটায় নাকে মুখে যা তা গুঁজে—ছুটতে ছুটতে আপিসে এসে হাজিরা দেওয়া—পাঁচটা পর্য্যন্ত একই চেয়ারে—কতকগুলো খাতাপত্র নিয়ে হিসাব ঠিক করা—এর চেয়ে বেঁধে মারলেও সহ্য করা যায়। তার ওপর যাঁরা উঁচু চেয়ারে বসে আছেন—তাঁদের খোসামোদ—সে খোসামোদের ধারা আপনি নিশ্চয় জানেন—এ রকম তোষা-মোদ করে একশটি টাকা পকেটে তুলতে এক মাসেই আমি শেষ হয়ে যাব। এত দিন লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন কি আমাকে এই জন্তে ? নিজেকে চেনবার যেটুকু সুযোগ দিয়েছেন—দোহাই আপনার, চাকরির চাকায় পিষে তা নষ্ট হতে দেবেন না। আপনাকে মিনতি করছি—

এই পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে—দুর্গামোহন বিপিনের হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিয়ে বললেন—ব্যস—ব্যস—এইটুকু পড়লেই হবে। এর পর ইনিয়ে বিনিয়ে পিতৃভক্তির নমুনা ছড়িয়েছেন। তাতে ওঁর সান্ত্বনা মিলতে পারে—আমার শান্ত হবার কথা নয়। বল তো তোমরা—ওঁকে একশো টাকার একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে কি এমন মহা অন্যায় কাজ করেছি আমি—

ওঁর উচ্চ কণ্ঠস্বরে ঘরটা গম গম করে উঠল। প্রচণ্ড একটি আঘাত ওঁকে অপ্রকৃতিস্থ এবং ক্রোধান্বিত করেছে এ সবাই বুঝলেন। বুঝে সবাই যেন সেই দুঃখকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

সান্ত্বনার সুরে বিপিন বললেন—দুঃখু করে লাভ নেই দুর্গা, একালের ছেলেগুলোর ধারাই এই।

দুর্গামোহন তাঁর পানে ফিরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তুমি এ কথা বলতে পার না বিপিন—তোমার তিন ছেলেই চাকরি করছে—তারা তোমার অবাধ্য নয়।

বিপিন বললেন—সে ভগবানের দয়া, দুর্গা। কথাটা যখন তুললেই তো বলি—লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে ছেলেদের আমি বরাবর শাসনে রেখেছি। চাকরি করার মত বিদ্যে হবামাত্রই ওদের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি—বিয়ে দিয়েছি।

কালীকৃষ্ণ হেসে বললেন—তোমার হিসাবে ভুল থাকবার কথা নয় বিপিন—কেননা তোমার ঠাকুরদাদাও চাকরি করে গেছেন। ছেলেকে নিয়ে হ'ল গিয়ে চার পুরুষ।

বিপিন এই শ্লেষ বুঝতে পেরে ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে বললেন—হাঁ—শুধু জমি থাকলে মানুষের পেট ভরে না, এটুকু ঠাকুরদা বুঝতে পেরেছিলেন বৈকি! ধারে গলা ডুবিয়ে জমিদার সেজে বসবার যোগ্যতা তো সকলের থাকে না।

বাকা-কটাক্ষে কালীকৃষ্ণও বিচলিত হয়ে হাত উঠিয়ে কি একটা চড়া উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন—দুর্গামোহন বললেন—তোমার কথা পুরোপুরি না মানলেও—কিছুটা মানি বিপিন। কিন্তু এইটেই বুঝতে পারছি নে—আজকের দিনে চাকরি না করে—আমাদের মত গৃহস্থের ছেলেদের গতি কি! স্কুলে-পড়া ছেলেরা হুজুগে মাতে—বড় বড় কথা বলে—কল্পনা করে—আদর্শের স্বপ্ন দেখে—এ সবের অর্থও বুঝি—কিন্তু উপার্জ্জনের টাকা হাতে পড়লে—তারা কি বদলে যায় না! যে যাই বলুক—টাকা হাতে পড়লেই না মানুষ সত্যিকারের স্বাবলম্বী হতে পারে। দয়া—দান ধ্যান পুণ্য ব্রত—স্বদেশ-সেবা সবই কি টাকার খেলা নয়!

সবাই মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন।

তুমি একবার কলকাতায় যাও দুর্গা। প্রথমে ভাল কথায় বুঝিয়ে, না হয় ধমক দিয়ে—না হয় কিছুদিন ওখানে থেকে যাতে চাকরিতে তার মনটি বসে তাই করে এস। ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে বসলে চিরটা কাল কষ্ট পাবে ছেলেটা।

হাঁ—এ আমার কর্ত্তব্য। নাবালক ছেলে নাবালক কন্যা—সাবালক ছেলেকে টাকা উপার্জ্জনের তত্ত্ব বুঝিয়ে দেওয়া—এ সবই বাপেদের কর্ত্তব্য! হো হো করে উচ্চ হাসি হাসলেন দুর্গামোহন।

২

দুপুর বেলায় মেঝেতে আঁচল বা মাদুর পেতে শুলেই কিছু ঘুম আসে না। বসু-গৃহিণী হেমলতা বলেন, সারাদিন খাটুনির পর একটু গড়িয়ে নেওয়া—ঘুম নয় তাই, আলিস্যি ভাঙা—তাও কি সুস্থির হবে…দু'দণ্ড…বড় পালাখেলা।

ছোট বউ সুচিত্রা তিবেশ করে দুটি পান—জার্ম্মান সিল-ভারের ছোট কৌটায় করে দোক্তা আর কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস জল শিয়রের কাছে রেখে বলে, মা—পাকা চুল তুলব?

হেমলতা বলেন—না। তুমি শোও গে।

পাকাচুল তোলার বিলাস হেমলতার নাই। নরম হাতের ছোঁয়ায় মাথায় সুড়সুড়ি লেগে বেশ আরাম হয়—ঘুমটাও দু'চোখের পাতায় জড়িয়ে আসে—যদিও তিনি স্বীকার করেন না চোখ বুজলেই ঘুম আসে। কিন্তু এক দণ্ডের আরাম নিতে গিয়ে নিজেকে হতশ্রী করার কোন মানে হয় না। একেই ওঁর মাথার চুল পাতলা—ছোট। মরা খুস্কি কিনা ভগবানই জানেন…চিরুণী ঠেকালেই গোছা গোছা উঠে আসে। কত গন্ধ তেল কত ওষুধ—কিছুতেই কি কিছু হ'ল! কাস্তনে পাতা ঝরার মত—বার মাস চুল উঠছে তো উঠছেই। এর ওপর মানুষের হাত লাগলে কি আর রক্ষা আছে!

স্বামী বলতেন—সংসারের খাটুনি বেশি বলে ভগবান তোমায় দয়া করেছেন—চুল বাঁধার পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়েছেন।

হেমলতা কৃত্রিম ক্রোধে বলতেন, কেন,—আমার কি চুল বেঁধে দেবার লোকের অভাব—না কারো চুল বেঁধে দিই না? তোমার সংসারে এসে কোনদিন গতর কোলে করে বসে আছি—বলুক দিকি কেউ এ কথা!

…কথান্তর বা মনান্তর যাই হোক—প্রভাতের মেঘ-গর্জ্জনের মত আজও তা স্মৃতিতে শ্রুতি স্পর্শ করে উন্মনা করে দেয়। সে সব দিন আর আসবে না।

আজও শোবার আগে যথারীতি মন্তব্য করে চোখ বুজলেন—কিন্তু সত্যিই ঘুম তাঁর এল না। দান জেতার পর থেকেই ওদের বৈঠকখানা নিস্তব্ধ হয়ে গেল কেন! যে চীৎকারের তালে ঘুমের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়—তা যেন ব্যাহত হ'ল। ওরা ঘর ছেড়ে চলে গেল কি? না অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে? বিপিন একবার প্রশান্তর নাম করলেন না? প্রশান্ত চাকরি করছে? একটি নিশ্বাস কোনমতে বুকের মাঝে আটকানো গেল না। তা হবে বৈকি। বাপ পাচ্ছে মোটা পেনসন—ছেলের হ'ল একশো টাকা মাইনের চাকরি। ভগবান যখন

যেন…কিন্তু আনন্দ-সংবাদ…এমন চুপি চুপি চুরি করার মত ফিস্‌ফিসিয়ে বলছে কেন ওরা ? তবে কি…

পাশমোড়া ভেঙে উঠে বসলেন। শিয়রে রাখা গ্লাস থেকে খানিকটা জল খেলেন—একটি পান ও দু' আঙুলে তুলে খানিকটা দোক্তা গালে ফেললেন, তারপর বসে বসেই দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের বৈঠকখানার হাক্‌ জানালাটা এ ঘরের রোয়াকের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বলতে হবে।

চিঠির যেটুকু পড়া হ'ল—সবই কানে গেল—ওদের মন্তব্যও। দু'চোখ থেকে তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল—প্রৌঢ়ত্বের বলিরেখা'ঙ্কিত মুখমণ্ডল প্রসন্ন দীপ্তিতে হ'ল উদ্ভাসিত। বারান্দা থেকে রোয়াকের শেষপ্রান্তে এসে দেওয়ালের গায়ে মিশে বসে রইলেন—আরও কিছু শোনবার আশায়।

কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না। অকালে পাশার আড্ডা ভেঙে গেল—বৈঠকখানার দরজা বন্ধ করে দুর্গামোহন অন্দর মহলে চলে গেলেন।

হেমলতা ডাকলেন, ছোট বউমা—অ ছোট বউমা—একবার শোন তো মা।

দোতলার ঘরে বুকে বালিশ দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় সুচিত্রা একখানা চিঠি লিখছিল। পাশে খোলা পড়ে ছিল আর একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র—তারই প্রত্যুত্তর। স্বামী মলয় নাতিদূর প্রবাস শহর কলকাতায় থাকে। চাকরি করে কিনা সে সম্বন্ধে সুচিত্রা সুনিশ্চিত নয়—তবে উপার্জন করে সে। কোন একটা আপিসে দশটা পাঁচটার বাঁধা খাটুনিতে মাসকাবারের বাঁধা মাইনে নয়; তার উপার্জনের টাকা কখনও সংসারে আসে—কখনও আসে না। মেল ডাকের মত তা নিয়মিত নয়—আর মেল ডাকের মত শনিবার রোববারের আসা যাওয়ার ফাঁকে রবিবারের ছুটিটা সে বাড়ির আবহাওয়ায় প্রিয়পরিজনদের মধ্যে কাটাবার সুযোগও পায় না। তার বেলা আসা অনিয়মিত বলেই চিঠিটা নিয়মিত চলে। সেকালের মেয়েরা দেখলে বলতেন, এ আবার কি চিঠি লেখার শ্রী! হিন্দু গৃহস্থ ঘরের বউ—স্বামীকে পত্র লেখার পূর্বে একটি ভক্তিবাচক কিংবা প্রণয়বাচক সম্বোধনের দ্বারা অলঙ্কৃত করে না—পত্রশেষেও ভক্তি-ভালবাসার কোন চিহ্ন নেই। কালের ধারা কতই দেখব!

সত্যিই ওদের চিঠি অনাড়ম্বর—পরস্পরের নাম ধরেই পত্রালাপ আরম্ভ করে—আর যে সব বিষয় তাতে আলোচিত হয় তাতে প্রণয়ের বাষ্পবিন্দুও থাকে না। ভাষায় আবেগ-পুঞ্জিত অশ্রু গদগদ নয়—না আছে কাছে আসবার জন্য আকুল আবেদন—না প্রকাশ পায়—দূর ও দীর্ঘ বিরহের জন্য অন্তরের বেদনা।

মলয় লিখেছে: এবার একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম সুচিত্রা। আই, এন, এর আব্দুল রসিদ-দিবসটা কি ভাবে শহরে ছড়িয়ে পড়ল—তা বোধ হয় কাগজে পড়েছ। কাগজ ঠিক সময়ে মফঃস্বলে গেছে কিনা সন্দেহ—কারণ যান-বাহন চলাচল, আপিস, ইস্কুল, সবই বন্ধ হয়ে গেছে। এই আন্দোলনের জোয়ারে যারা ভিন্ন ধর্মী বলে দূরে সরে ছিল—তারা এক জায়গায় এসে মিশল—যারা খণ্ড ভারতবর্ষের দাবিতে রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল আর 'কুইট ইণ্ডিয়া' নীতিকে বিলম্বিত করে তুলছে—তারাও এসে মিশল—জনগণের সঙ্গে। অখণ্ড ভারতবর্ষের অখণ্ড একটি জাতি বন্দুক বেয়নেটের সামনে নির্ভীকভাবে বুক পেতে দাঁড়াল। যদি কোনদিন কোন ভিন্নমুখী স্রোতে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ও—তবু এ দিনের কথা আমরা ভুলতে পারব না।… প্রায় দু'শো বছরের—কাহিনী লিখতে যে কল্পনা উঠল—তার ধ্বনি—মনের গভীর থেকে যে অগ্নিবাণী উচ্চারিত হ'ল তার প্রাণশক্তি আমরা ভুল করে নিছক ভাবের উচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। এই সত্য স্পষ্ট নির্ভীক জাগরণের মন্ত্র কোন নির্জিত দেশ—কোন-না-কোন অসতর্ক মুহূর্তে উচ্চারণ করে ফেলে। রাজনীতির গোলকধাঁধা পার হয়ে পৃথক আন্দোলনের গণ্ডী ভেদ করে—আব্দুল রসিদ-দিবসে আমরা এক সুবিস্তীর্ণ মিলন-তোরণের সামনে এসে পৌঁছেছি মনে হচ্ছে। একটা প্রলয় বন্যা—অগ্নির তরল স্রোত—বারুদের ধোঁয়া আর শহীদের রক্ত—এই উন্মাদনায় কলকাতা আজ ভাসছে। সাইরেনের বেতারেতে ধ্বনিত হচ্ছে—ভারতবাসী হিন্দুমুসলমান এক হও। Give me your blood—I will give you freedom

দুটি পৃষ্ঠা মলয় তার আত্মহারা ভক্তি দিয়ে ভরিয়েছে; সে তীব্র অনুভূতিতে সুচিত্রা আচ্ছন্ন—অভিভূত হয়েছে বলেই কাগজ নিয়ে বসেছে প্রত্যুত্তর দিতে। এই অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী নয়। সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজ ও কর্তব্য—বাইরের জগৎ আড়াল করে রাখে। কোন মুহূর্তে সে জগৎ প্রকাশিত হলেও মনের বিচিত্র অনুভূতিতে তা রসসিক্ত ও পল্লবিত হবার সুযোগ পায় না। বৃহৎ কোলাহলের মধ্যে পরাধীনতার মর্মব্যথা প্রকাশের সুবিধা হয়তো ঘটে—তুচ্ছ কতকগুলি বিরামবিহীন সাংসারিক কাজ বা সংসারের ছন্দ বজায় রাখে এবং বৃহৎ অনুভূতির মূলে আঘাত করে তার মধ্যে সুখদুঃখ-ভরা মনের আকাংক্ষায় ঘটা দুর্লভ বই কি। দিনরাত্রির কোন কোন ক্ষণে সেই দুর্লভ-দর্শন মুহূর্তগুলি আসে, তাতে মন আচ্ছন্ন হয়—চঞ্চল হয়—আর প্রকাশ-ব্যথায় টন্‌ টন্‌ করতে থাকে।—প্রিয়বিচ্ছেদবেদনার সঙ্গে মিশে এই অনুভূতির মিতালী গাঢ় ও গূঢ় কিনা সুচিত্রা জানে না—তবে নির্জন দুপুরের এই অনাঘাত মুহূর্তে উদ্বেল মনের ভক্তি-বেদনা-প্রণয়-সম্পৃক্ত ভাষাকে পত্রে রূপ না দিলে এর সুকুমার আয়ু বাইরের তপ্ত পৃথিবী নিঃশেষ করে দেবে। অভিনিবেশ সহকারে সুচিত্রা চিঠি লিখছিল।

হেমলতার ডাকে তার অনুভূতিতে রূঢ় আঘাত লাগল। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে সে ভাবলে উত্তর দেবে না—ঘুমিয়ে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে চুপচাপ থাকবে। কিন্তু স্নায়ুর ভার ওই ডাকের প্রথম আঘাতেই আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। একদিক দিয়ে বিরক্তি আর একদিক দিয়ে শাশুড়ীকে ফাঁকি দেবার যন্ত্রণা—মস্তিষ্ককোষে উত্তেজনা সঞ্চার করেছে। বিদ্যুতের মত ইহাদের গতি এরা—কখন পালায় আর কখন জুড়ে বসে—মানুষ ভেবে উঠতে পারে না। কর্তব্য এই ফাঁকে সজাগ হয়ে উঠল—এই সামান্য কৌশলে তোমার কতটুকুই বা ক্ষতি। দু' দণ্ডের দরকার মিটিয়ে আবার তুমি লেখায় মনোযোগ দিতে পারবে।

সুচিত্রা দুয়ার খুলে বাইরে এল।

ঠিক দু' দণ্ড নয়—হেমলতার সাতিদীর্ঘ অভিযোগগুলি অমনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করলেও মনেতে তার প্রতিক্রিয়া লঘু হ'ল না। দুপুর তখনও নিস্তব্ধ, কয়েকটি লাইন কাঁচড় কাটা কাগজখানা অভাবিত মুহূর্তের সাক্ষ্যস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রের পাতায় অল্প অল্প নড়ছে—কিন্তু কলম নিয়ে অত্যন্ত একাগ্রচিত্তেও সে হারানো মুহূর্তকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না। দুর্লভ মুহূর্তগুলি স্পর্শভীরু।

ছোট্ট বুক-সেলফে খানকতক বই রয়েছে, অবসর বিনোদনের উপায়স্বরূপ নয়—চিন্তার জটিল মুহূর্তের সহায়ক। একঘেয়ে সংসার—ভোঁতা ও ভারি কাজগুলির প্রহারে চিন্তাকে জর্জরিত করে দেয়—বুদ্ধিতে আসে জড়তা। এক একটি দিন আসে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মত নিশ্বাস রোধকর—মৃত্যুর ইঙ্গিত বয়ে আনে তার মুহূর্তগুলি। সুচিত্রার তখন প্রয়োজন হয় ওই বইগুলিকে; ওরা পরিত্রাণ করে—ভোঁতামি থেকে—অন্ধকার থেকে—মৃত্যুর হিমশীতল গহ্বর থেকে। যে জগতে তার দিন রাত্রির অনুবর্তন চলে—সে জগৎ অন্তহীন নয়—অতলস্পর্শী অন্ধকারের মত বিভীষিকা দেখায় না। সুচিত্রা জানে এক দিন এই বাঁধন কাটবে—আলোয় ভরা জগৎ তার কর্মবন্ধনে ধরা দেবে। বই না থাকলে সে কবে ফুরিয়ে যেত।

দুয়োরের বাইরে মৃদু করাঘাতের শব্দ। কে? মৃদুকণ্ঠে সুচিত্রা প্রশ্ন করলে।

আমি। মেজ জা মন্দাকিনী। চিঠির কাগজ গুছিয়ে সুচিত্রা দুয়োর খুলে দিলে।

হৃষ্টপুষ্ট দেহ—এক গাল পান—মাথায় জলজলে সিঁদুর মেজ জা মন্দাকিনী ঘরের মধ্যে এসে বসলে। এক গাল হেসে বললে—শুনেছিস? মা বলছিলেন—ওদের প্রশান্ত নাকি চাকরি করবে না।

সুচিত্রা এ সব খবর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ভালবাসে না। মাছি যেমন এক কৌটা খাবার জিনিষের চারধারে ভনভন করে বেড়ায়—তেমনি কতকগুলি লোকের স্বভাব ছোটখাটো বিষয়কে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রসিয়ে পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই ক্ষুদ্র বৃত্ত থেকে দূরে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে বললে, তা সবাই যে চাকরিই করবে—মেজদি—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মন্দাকিনী বিস্ময়ের সুরে বললে—ওমা, চাকরি করবে না তো পুরুষমানুষ করবে কি শুনি!

সুচিত্রা হাসিমুখে বললে, তা বটে—।

মন্দাকিনী তার হাসিটাকে উপেক্ষা করে করে ভারি গলায় বললে—ওঃ মনে ছিল না—তোমরা আবার চাকরিটাকে দাসবৃত্তি বল কিনা!

সে রাগ করে পিছন ফিরতেই সুচিত্রা খপ করে তার একখানি হাত ধরে বললে—রাগের কথা নয়—সত্যিই বল দিকি মেজদি—যে কাজে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা খাটানো চলে না তা দাসবৃত্তি ছাড়া কি!

হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মন্দাকিনী বললে—জানি না—জগৎ জুড়ে সবাই যা করছে, তা যদি মন্দ হ'ত কেউ করত না।

সুচিত্রা বললে—জগতের কথা আমরা কতটুকু জানি মেজদি। কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম—সেবার তোমার ভারি অসুখ দেখেও মেজ ঠাকুরকে কলকাতায় যেতে হ'ল। কি-না বিনা নোটিসে কামাই করলে চাকরির ক্ষতি হতে পারে। আচ্ছা সত্যি বলতো মেজদি—তোমার তাতে একটুও কষ্ট হয় নি? বলে সুচিত্রা ওকে দু' হাতে বেষ্টন করে ধরলে।

মন্দাকিনী হেসে ফেললে। সুচিত্রার ওপর ওর রাগ হয়, মমতাও হয়। এমনি ভাবে ছেলেমানুষি করলে কার না স্নেহ হয়—হাসি আসে। ওরা এত লেখাপড়া শিখেও মনের দিক দিয়ে সিদ্ধি লাভ করে নি। বিদ্যেটা ওদের বাইরের চটক—সংসারে ওদের মত অসহায় বুঝি দুটি নেই।

মন্দাকিনী বললে—আমার কষ্ট হয় কিসে জানিস? ঠাকুরপো কি হপ্তায় বাড়ি আসে না বলে।

সুচিত্রা বললে—তাকে সে কথা বল না কেন?

বলেছি—ফল হয় নি। ওরা একালের ছেলে—আর কিছু না থাক, বাহাদুরিটা তো আছেই। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, এক দিন পস্তাতে ওকে হবেই। কাজের সময় কাজ না করলে বিধাতাপুরুষের সাধ্য নেই যে মানুষকে সুখী করেন।

সুচিত্রা বললে—বিধাতাপুরুষ সবাইকে সুখী করেন না—মেজদি।

সে দোষ মানুষের না বিধাতা পুরুষের?

অদৃষ্ট মানলে বলতাম—অদৃষ্টের। সুচিত্রা হাসলে।

মন্দাকিনী পুনশ্চ গম্ভীর হ'ল। বললে—জানি—হিঁদু হয়ে তোমরা অনেক কিছু মান না। এ ভাল নয়। সে যাবার জন্ত পা বাড়ালে।

সুচিত্রা মন্দাকিনীকে বাধা দিলে না। হিঁদুয়ানি যাকে বলে—এদের মুখে সে বহুবার শুনেছে। আচার-বিচারের নিখুঁত বিধান ও উপবিধান—সে সবের অবহেলায় প্রায়শ্চিত্ত—ইহকালের শাস্তি—ও পরকালের নরক ভোগ—এ সব বহু জনের কাছ থেকে অসংখ্যবার সে শুনেছে। শুনেছে—শ্রদ্ধা করতে পারে নি। খুঁত ধরা কিংবা খুঁৎ খুঁৎ করা তো স্বভাবের বশেই ঘটে এবং সংস্কার—বিচার এসবকে যুক্তি বলে খণ্ডন করা—এতেও স্বভাবের ক্রিয়া প্রকট। কার্য্য-কারণের উপলখণ্ডকে মাড়া দিয়ে প্রবল বেগে যে কালের স্রোত ছুটে চলেছে—তার ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করলে—কার্য্য কারণকে উপলব্ধি করা যায় না। এ সংসারে এগিয়ে চলার কথা বললে—এরা নাসিকা কুঞ্চিত করবে—থামলে বলবে—সাবাস।

কিন্তু বাহাদুরি নেবার মত শিক্ষা সুমিত্রা পায় নি।

৩

হেমলতার স্বামী অঘোরনাথ শেষ বয়সে চাকরি নেন। পিতৃপুরুষের উপভোগ-অবশিষ্ট যে ক' বিঘা জমি ছিল—তাতে পেটের ভাত ও পরনের কাপড়ের সংস্থান হলেও—সংসার দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ল। খাওয়া-পরা ছাড়াও নানান রকমের খরচ—যা জমির উপস্বত্ব থেকে মেটানো দুঃসাধ্য। শেষ বয়সে চাকরি নিতে হ'ল—জমিদারি সংক্রান্ত কাজে। তারই আয়ে ছেলেরা বিদ্যা শিখলে—হেমলতার তীর্থধর্ম, বারব্রত যথাসাধ্য হ'ল; পুরাতন ঘর মেরামত—খাজনা ট্যাক্স মিটান—বারোয়ারির চাঁদা—ছেলেদের বৌ-ভাত—নাতিদের অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মর্য্যাদা অনুযায়ী সুসম্পন্ন হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা এ সংসারকে বিশেষ কাবু করতে পারে নি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শেষের দিক থেকে ভয় দেখাচ্ছিল। ছেলেরা উপার্জ্জনক্ষম হওয়াতে সে আঁচও তেমন গায়ে লাগে নি। ক'মর ধান ক'টা তেরশো পঞ্চাশে শুধুই মহাদুর্ভিক্ষ থেকে প্রাণ রক্ষা করে নি—উদ্বৃত্ত ধানের বিনিময়ে কিছু ধন ক্যাশ-বাক্সে এনে দিয়েছে। ধান যে লক্ষ্মী এ কথা তেরশো পঞ্চাশ ভাল মতেই প্রমাণ করে দিয়েছে।...বউরা বলতে নেই—ভাল ঘর থেকেই এসেছে। প্রাচীন আচার নিষ্ঠা-প্রবণ সংসার থেকে—এসেছে বড় ও মেজ, ছোটকে এনেছেন—এ কালের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। এ বাড়িতে সে বিদুষী আখ্যা পেয়েছে। ছেলে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিল—আর শহরে এই শিক্ষার সুযোগেই সুশিক্ষিত এক প'রবারের সঙ্গে তার আলাপ ঘটে। সুচিত্রার সঙ্গে তার পূর্ব্বরাগ যতটুকু ঘটে থাক—এ বাড়িতে ত: নিয়ে বিস্ময়-মিশ্রিত আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। বিয়ের পর অবশ্য আলোচনাটা গোপনেই চলত—তবে মেজবউ মন্দাকিনীর মন থেকে খুঁৎখুঁতুনি যায় নি। তারা এ সংসারে এসেছে স্ব মহিমায়—সপ্ত পদী মন্ত্রের পুণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে—আর সুচিত্রার বিয়ে লোকাচারের অনুষ্ঠানগুলি পালন করেও—বহুদিন লোকায়ত মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে বধূ উপযাচিকা হয়ে আসে—তার প্রতিষ্ঠা বিলম্বেই ঘটে। যাই হোক সুচিত্রাও এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বলতে পারা যায়।

এটি ছোটখাটো দুর্ঘটনার অন্তর্গত হলেও বড় দুর্ঘটনা এ সংসারে ঘটেছে বৈকি। কর্ত্তার স্বর্গারোহণ সেটা কালধর্মের অন্তর্গত—বড় ছেলে মথুরামোহনের বিয়োগটাই—মর্মান্তিক। মথুরামোহন তেজী স্বভাবের ছেলে—চাকরি করতে রাজী হয় নি প্রথমটা। প্রতিজ্ঞা করেছিল—বিদেশীর আপিসে সে কিছুতেই দাসখত লিখে দেবে না। স্বদেশীয়ানা তার ছিল না—ওই দশটা পাঁচটার ওপর বিরাগ ছিল অসীম। ছেলেবেলা থেকেই গানবাজনা—আড্ডা ইয়ারকি এই সবে আসক্তি বশত বাঁধাধরা সময়ের মধ্যে বসে দিনের পর দিন একই রকমের কাজ করে যাওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। যে কাজে উত্তেজনা নেই—সে কাজ আবার মানুষে করে। শেষ পর্য্যন্ত কাজ অবশ্য তাকে নিতেই হয়েছিল—তবে আপিসের চাকরি নয়।...বাবা তাকে জোর করে বসিয়েছিলেন—এক জমিদারি সেরেস্তায়। সেখানে দিন কতক কাজ করে ও পালিয়ে গেল—পশ্চিমের কোন শহরে। কিছু দিন পরে ফিরে এল কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে। সবাই ভাবলে বিদেশের কষ্টে ওর সমুচিত শিক্ষা হয়েছে—হয়ত বা মতিও ফিরেছে। বাবা অনেকক্ষণ ধরে ধমকালেন—ও মাথা হেঁট করে শুনলে।

ওর সহিষ্ণুতা দেখে বাবা অবাক হয়ে বললেন, বলি টো টো করে ঘুরলেই দিন কাটবে না উপার্জ্জন করে দশ জনের এক জন হবি?

ছেলে বললে, চাকরি করব—তবে আপিসে নয়।

সায়েবের আপিসে তো তোমায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয় নি বাপু।

ও রকম খাতা লেখার কাজ আমার পোষাবে না—ঘাড় পিঠ টন্ টন্ করে।

তবে কি লাটসায়েবী তোমায় জোগাড় করে দিতে পারি?

কেন—নায়েব-টায়েব গোমস্তা—

সেও তো লিখতে হবে—খাটতে হবে—প্রজা শাসন করতে হবে—

তা হোক—আমি নায়েবি করব।

অঘোরনাথ কালবিলম্ব করলেন না—তার পরদিনই ছেলেকে নিয়ে রওনা হলেন কাঞ্চনপুরে। গ্রাম থেকে দশ ক্রোশ দূরে—কিন্তু দূরই ভাল। বাড়ীর কাছে—আড্ডা ইয়ারকির পুরোনো টানটা চাকরির ক্ষেত্রে অনুকূল হবে না বলেই এই ব্যবস্থা। নায়েবি পাওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল না—এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার দরকার বটে। তবে বাপের অনুরোধে ছ'মাসের কড়ারে ছেলে শিক্ষানবিশীতে বাহাল হয়ে গেল। মাইনে নামমাত্র, খাটুনিটাও উপেক্ষণীয় নয়, তবু মথুরামোহন

এই চাকরি স্বীকার করে নিলে। নায়েবরা জমিদারের অধীন হলেও বহু ক্ষমতা তাদের হাতে। প্রজা শাসন ব্যাপারে তারা নিরঙ্কুশ। যখন খুশি কাছারিতে আস—যখন খুশি ঘুরে বেড়াও—আড্ডা ইয়ারকি দাও কেউ বলবার নেই। আর রাত্রিতে অনুগত সহচরবৃন্দের সাহচর্যে—গানবাজনা—পান ভোজনে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত স্বপ্নের মত কেটে যায়। ছ'মাস পরে বাবাকে সে চিঠি লিখলে, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে কাঞ্চনপুরের নায়েবি পদে পাকাপাকিভাবে বহাল হইয়াছি জানিবেন।

বাড়ির সবাই খুশি হয়ে দেবতার মানত শোধ দিলেন—কেউ কেউ নূতন মানতও করলেন।

প্রথম বছরের উপার্জ্জিত টাকায় বাড়িটা আগাগোড়া মেরামত করা হ'ল। তার আট মাস পরে কর্ত্তা গত হলে—দানসাগর শ্রাদ্ধ করে মথুরামোহন যথেষ্ট নাম কিনলো। সবাই বললে —এক ছেলে হতেই কুল উজ্জ্বল হয়—দেখ না আমাদের মথুরাকে।

তারপর একদিন হেমলতা যথারীতি দুপুরে পান জরদা খাবার জল শিয়রে রেখে সবে চোখ বুজেছেন, এমন সময় কড় কড় শব্দে সদর দরজায় কড়া বেজে উঠল। বাড়িতে কেউ পুরুষ মানুষ না থাকায় হেমলতাই উঠে দরজা খুলে—দু' পা আতঙ্কে পিছিয়ে এলেন।

লাল পাগড়ী মাথায় দু'জন পাহারা-ওয়ালার মাঝখানে খাকি হাফ প্যাণ্ট পরা একজন সায়েব তাঁর পানে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এইটাই তো মথুরামোহনের বাড়ি? আপনি তার কে হন?

সায়েবের পিছনে যারা গাঁ ভেঙে পড়েছে। তাঁরা হয়ে তারাই জবাব দিলে। সে সওয়াল জবাবের বেশির ভাগই হেমলতা বুঝতে পারেন নি—তবে ভয়ে তাঁর বুক গুর গুর করে উঠেছিল। লাল পাগড়ী যে শুভ সন্দেশবহ নয় এ কথা গ্রামের একজন অজ্ঞ নিরক্ষর লোকও বুঝতে পারে। অচিরে তাঁর আশঙ্কা সত্য হ'ল—পাড়ার লোকে জানিয়ে দিল পুলিসে বাড়ি খানাতল্লাসী করবে। মথুরামোহন কাঞ্চনপুরে এমন এক কাণ্ড করেছে যার ফলে পুলিস এসেছে তল্লাসী করতে। হাঁ—ঘটনাটা পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়ান সবিস্তারে (এবং সোৎসাহে) বলে গেলেন। নায়েবি করে মথুরা নাকি সদরে খাজনা পাঠায় নি—এদিকে লাটের কিস্তির দায়ে জমিদারী নীলাম হয় দেখে সদর থেকে ম্যানেজার মশাই এলেন তদন্ত করতে। তিনি যে দিন আসবেন তার আগের দিন রাত্রিতেই এক ঘটনা ঘটে। তহবিল তছরুপ ধরা পড়বে—এই আশঙ্কাটা প্রবল হওয়াতে প্রমোদ-বাসরে মথুরা অপরিমিত মদ্য পান করে। তারপর সারারাত্রি ধরে চলে তাণ্ডব নৃত্য। পরিশ্রান্ত পারিষদেরা মেঝের অর্দ্ধ উলঙ্গ ভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে—আলোর তেল কমে এসে বাতিটাও হয়েছে নিবু নিবু—মথুরা কিন্তু জ্ঞান হারায় নি। রাত্রি প্রভাতেই তার হিসাব নিকাশ দাখিল করার কথা—এ কথাটা সুরার উগ্র ক্রিয়ার মধ্যেও সে ভুলতে পারে নি। অসহায় রায়তের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের শেষ হবে কালকের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে—এ কথা সে ভাবতেই পারে না। যে করে হোক—মান তথা প্রতিপত্তি বাঁচাতে হবে। চট্ করে একটা ফন্দী তার মাথায় আসতেই অর্দ্ধ-অচেতন·· বার-বধূর হাত ধরে একটা হেঁচ্‌কা টান দিয়ে বললে, শুনছিস্?

'উঃ' বলে মেয়েটি তন্দ্রা-শিথিল দেহ থেকে সব আলস্য ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসল।

শোন্! মথুরা তার চোখের ওপর রক্ত-রাঙা দৃষ্টি মেলে কর্কশ কণ্ঠে বললে, তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে?

টাকা!

হাঁ—চাবিটা দে দিকি—। বলে হাত বাড়াতেই মেয়েটি চীৎকার করে উঠল।

উত্তেজিত মথুরা—পাশের টুল থেকে খপ করে তোয়ালে খানা টেনে নিয়ে তার মুখের ওপর চেপে ধরলে। তারপর দু'জনে নিঃশব্দে ধস্তাধস্তি করতে করতে মেয়েটি শ্রান্ত হয়ে ঢলে পড়ল মেঝের। মথুরা তখন উত্তেজনায় কাঁপছে—কোন দিকে দৃকপাত না করে ওর আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিলে। নগদ টাকা আশানুরূপ পাওয়া গেল না—কাজেই অলঙ্কারের দিকে তার নজর পড়ল। মেয়েটিকে অলঙ্কার মুক্ত করতে করতে তার মনে হ'ল—সে কি সত্যিই অচেতন হয়ে পড়েছে? নিস্পন্দ নিথর দেহ—বুকের উঠা-নামা টের পাওয়া যায় না, নাকের কাছে হাত রেখে নিশ্বাসের একটু তাপও তো পাওয়া গেল না। তবে কি—?…হু-হু করে উত্তেজনা বহু ডিগ্রিতে নেমে এল। ভাল করে মেয়েটিকে পরীক্ষা করে সে বুঝলে—না সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে তহবিল তছরুপের দায়ে কারাবাস না হোক নারী হত্যার দায়ে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর তার অনিবার্য্য। নেশা ছুটে গেল। রাত বেশি নেই—এখনি যা হয় একটা করতে হবে। উপায় বেছে নিতে তার বিলম্ব হয় নি।—সকালে মথুরা-মোহনকে খুঁজে পাওয়া গেল না—অলঙ্কারবিহীনা মেয়েটির দায়ে বন্ধুরা ধরা পড়ল। মথুরামোহনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সবাই একবাক্যে জবানবন্দী দিলে। তারপর চলেছে এই অনুসন্ধান— যার ফলে দেশের বাড়িতে খানা-তল্লাসীর পরোয়ানা নিয়ে পুলিস দিয়েছে হানা।

হেমলতা এই দীর্ঘ কাহিনীর এক বিন্দুও বিশ্বাস করলেন না—দালানে পা ছড়িয়ে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলেন। পুলিসকে মনের ঝাল মিটিয়ে গাল দিতে না পেয়ে প্রতিবেশীদের মরা-বাপ নিয়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করলেন। তারপর পুলিস চলে গেলে তাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকবাসের কামনা করলেন। এই ঘটনার ফলে বড় বউয়ের

আয়ও হ'ল কম কম কিছু, পরে তার মাথার গোলযোগও দেখা দিলে। ফলে এই সংসারে থেকেও সে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। হেমলতা আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন সংসার, এবং পরের সংসারের খুঁটিনাটি ভাল মন্দ নিয়ে ঘরে ঘরে যে কারও কাছে বলে বেড়ানো হ'ল তাঁর সান্ত্বনা বা আনন্দ লাভের উপায়। বার বছর না পেলে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে মৃত বলে ঘোষণা করার নিয়ম নাই, কাজেই বড় বউ সধবার আচার নিয়ম পালন করে থাকেন। অর্দ্ধজ্ঞানে—অর্দ্ধ অজ্ঞানে যতটুকু করা সম্ভব তাই তিনি করেন—তাকে সামলে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছে সুচিত্রা।

ক্রমশঃ

অমৃতের সন্তান

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গা'রে মুক্তির গান,
বল্ তোরা বল্—আমরা অমর অমৃতের সন্তান।
শক্তির তেজে প্রচণ্ড মূর্ত্তি
        একাকার আজি হয়েছি হাজার অংশ,
অস্ত্রে নাহি যে সংহার মম
        অগ্নিতে জলে নাহি—নাহি মম ধ্বংস।
লীলার লাগিয়া রচেছি শরীর মুক্ত অসীম প্রাণ,
খণ্ড খণ্ড আমরা যে ভগবান।
জয় আমাদের জয়,
অমৃতের ছেলে মৃত্যুবিজয়ী নির্জ্জর নির্ভয়।
বজ্রের চেয়ে দুর্জ্জয় মোরা যাত্রার পথে অটল চিরস্থির,
মুক্তির দূত মোরা ভাবী এই বন্দিনী পৃথিবীর।
অগ্নিতে মোরা স্নান করি হেসে
        সঙ্গীত গাহি গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে,
তূর্য্য বাজাই মর্ত্ত্যের মাঝে
        ফুল মালা গাঁথি গ্রহে তারকায় চন্দ্রে।
মৃত্যুরে মোরা চুম্বন করি যৌবন-জরা আমাদের চিরভৃত্য,
ঝঞ্ঝা ধূর্জ্জটি বাজাইয়া গাল সঙ্গে মোদের চিরদিন করে নৃত্য।
অতলান্তের বক্ষ ভেদিয়া নিত্য সন্তরণ দিই মোরা সন্তান,
বিন্ধ্য নগেশের বাধাপর্ব্বত ভেঙে করি খান্ খান্।
গা'রে তোরা এই গান,
আমরা অজর আমরা অমর অমৃতের সন্তান।
আমরা এসেছি খেলিতে নিখিলে যৌবনদোলা-দোল,
সারা সৃষ্টিতে বাঁধা যে মোদের জীবনের হিন্দোল।
আমরা স্বয়ং শ্রীভগবানের অংশ,
এই ত্রিভুবনে কাহার সাধ্য করিবে মোদের ধ্বংস ?
সহসা কখনো অন্যায় সাথে বন্যার মতো
        ঝাঁপ দিয়া মোরা সংগ্রামে তুলি ঝঞ্ঝা,
ধ্বংস করিতে জীর্ণ সমাজে ধ্বংসের রূপে
        যখন যা' খুশী তাই করি চাহে মন যা'।
লোকে দেখে মোরা মরি সংগ্রামে, মিথ্যা কথা সে
        মৃত্যুর মহানন্দে—
পার্থিব রণ-রঙ্গের মাঝে নব জীবনের সঙ্গীত রাগে
        নবীন রূপে যে জেগে উঠি নব ছন্দে।
নিত্য নবীন যুগ সৃষ্টির জোৎস্নায়;
দাপাদাপি ক'রে চলি চঞ্চল রক্তেতে করি রোস্নাই।
তোপ গোলা গুলি পারে নাই কভু
        করিতে মোদের ধ্বংস,
প্রলয়ের সাথে ক'রে মহারণ
আছি অক্ষয় বটের মতন,
মানুষের চেয়ে বড় মোরা ওরে
        দেবতার মহাবংশ।
হিন্দু আমরাই পৃথিবীতে এই অগ্নিমন্ত্রে প্রথম বার্ত্তাবান,
মোরা ধরণীর আদিম মানব অজর অমর অমৃতের সন্তান
পশুদেহ থেকে নরের বিকাশ বলিয়াছে যারা
        লজ্জিত তারা বিশ্বে মানব-বংশে,
আমরা বলেছি—জন্মেছি মোরা অমৃত থেকে
        ধরিয়াছি দেহ শ্রীভগবানের অংশে।
আমাদের এই দেবজন্মের মহাগৌরব,
        এই ইতিহাস এর চেয়ে নাহি গর্ব্ব,
ইহারি লাগিয়া যুগযুগান্ত আছি মাথা তুলে'
        আজো হই নাই খর্ব্ব।
আমাদেরি মাঝে জন্মিল আসি এমনি কত না নর
        তাহাদের কাছে তটস্থ ত্রিভুবন,
কেহ করেছিল মদন ভস্ম কেহ বা জগৎখানি
        বদন বিবরে করাইল দর্শন।
কেহ শুনেছে কি মানুষ কখনো গণ্ডূষ করি পান করিয়াছে সিন্ধু
        সেতু রচি কেউ ক'রতে পেরেছে সিন্ধুতে ভাসমান ?
সাগর মথি' উঠায়েছে কারা সৌন্দর্য্যের অপরূপা উর্ব্বশী
        সুধার ভাণ্ড উঠায়ে একদা দেবতায় দিল দান।
তাহাদেরি মাঝে এক মহাবীর সকল গরল ধরিয়া আপন কণ্ঠে
        ঘুচাল বিশ্বে মৃত্যুর হাহাকার,
তারা আমাদেরি পূর্ব্বপুরুষ দুর্গা স্বয়ং আমাদেরি মহামায়ী—
        দেবজন্মে সে আমাদেরি অধিকার।
ডাকা তবে ওরে দুর্গম দুর্জ্জয়,
বল্ মোরা এই বিশ্বের বুকে কাহারে করি না ভয়।
চল্ তবে চল্ কৃষ্টির শত সৃষ্টির মধু ছন্দে,
চল্ নেচে চল্ মহাপ্রলয়ের ধ্বংসের মহানন্দে।
চল্—সিংহের মুখে লাগাম্ টানিয়া বজ্রের রথ
        বর্ষিয়া জাত্ হুঙ্কার,
তোর—দুর্জ্জয় জয়যাত্রার পথে গর্জ্জন শুনি'
        থাকেনাকো যেন ঘুম কার।
চল দুর্ব্বার গাহে তবে এই গান,
এই পৃথিবীর আমরা মালিক আমরা অমর অমৃতের সন্তান।

ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনী ও চিত্রশিল্পী

শ্রীরঞ্জিত সিংহ

সম্প্রতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে চিত্র-প্রদর্শনী বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রতি বৎসরেই নানা জায়গায় আজকাল চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এবং সেগুলোতে দর্শকের অভাব হয় না। জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর মূল্য কম নয়। চিত্র-প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা যতই বৃদ্ধি পাবে জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পী ও শিল্পকলা এ দুয়ের মিলন ততই নিবিড়তর হয়ে উঠবে। আর এই সংযোগের ফলে শিল্পীর মনে নব নব



বাপুজী —যামিনী রায়

ভাবধারার উন্মেষ হতে থাকবে, নবীন অনুপ্রেরণা আসবে তার হৃদয়ে এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা সামাজিক বোধও জাগ্রত হবে। যে সামাজিক পরিবেশে চিত্রশিল্পী মানুষ, সেই সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে তার তুলির আঁচড়ে। প্রকৃতির রূপমাধুর্য্য এবং বর্ণ-বৈচিত্র্য থেকে শিল্পী আহরণ করবে তার সৃষ্টির উপকরণ। আলো, বাতাস, আকাশ, মাটি ও পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের জীবন লীলায় বর্ণ-বিচ্ছুরণে শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠবে।

কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে চিত্র-প্রদর্শনীর এমন জনপ্রিয়তা ছিল না। কোন চিত্র-প্রদর্শনী হলে তার সংবাদ সাধারণতঃ জনসাধারণের কাছে পৌঁছাত না, তাই আশানুরূপ জনসমাগমও হ'ত না। উপরন্তু যাঁরা এই সব চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন লক্ষ্মীর প্রসাদপুষ্ট উচ্চশ্রেণীর লোক। তখন আর্টের আরতি হ'ত লক্ষ্মীর স্বর্ণখচিত মন্দিরাভ্যন্তরে—তাই তার রোশনাই বাইরে আসতে পারত না। বাংলাদেশের যে সমস্ত ছবি নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হ'ত—সেগুলো দিয়ে রাজা-মহারাজাদের ড্রইং-রুম সাজান হ'ত। অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি পড়লে হয়ত শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিন্তু সে-সব চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের যোগ ছিল না। এক কথায় তখনকার দিনে চিত্রশিল্প জন-মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারে নি—শুধু নিজের কৌলুশ নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনী ও রসগ্রাহীর প্রশংসাপত্র অর্জন করেছে।



নববধূ —যামিনী রায়

কিন্তু আজকের দিনে এই সব চিত্র-প্রদর্শনীর জনপ্রিয়তা ও ক্রমোন্নতি দেখে এই কথাটাই মনে হয় যে, এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বুর্জোয়া কালচার এখন ধ্বংসের মুখে, তাই বুর্জোয়া আর্টও এখন শুধু ড্রইং-রুমের 'শো-কেসে' সাজিয়ে রাখার অবস্থায় এসেছে। এ আর্ট কত দিন বাঁচবে সে প্রশ্ন মনে জাগে। কালক্রমে এক দিন না এক দিন সোভিয়েট

রাশিয়ার তার হয়ত এই শিল্পকলা বাংলাদেশ থেকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের চেহারা বদলে যাওয়ার ফলে অভিনব শিল্প-পদ্ধতির উদ্ভব হতে দেখা যাচ্ছে— এই সমস্ত শিল্পের স্রষ্টারা প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে চির-



আয়নার সামনে —অবনী সেন

নবীনের অগ্রদূত। চিত্রশিল্পের সঙ্গে এখন জনসাধারণের প্রাণের গভীর যোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। আজকের দিনে এই মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে যে আর্টকে জনকল্যাণের কাজে লাগাতে হবে—দেশের উন্নতিকল্পে শিল্পীকেও তার তুলি নিয়ে জনতার সঙ্গে এসে হাত মেলাতে হবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় তাই হয়েছে। সেখানে চিত্রশিল্প সমাজ-জীবনের সহিত সম্পর্কহীন নয়। সোভিয়েট চিত্র-শিল্পীরা যে সমাজে মানুষ, সেই সমাজের জীবনধারাকে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস পাচ্ছেন তাঁরা তাঁদের ছবিতে—শুধু তাই নয়, চিত্র-শিল্পকে তাঁরা দেশের কাজে লাগিয়েছেন। মূঢ় মূক অগণিত জনসঙ্ঘ যেন তাঁদের শিল্পকলার ভেতর দিয়ে কথা কয়ে উঠেছে। তাই সোভিয়েট রাশিয়ার আর্ট জনসাধারণের হৃদয় জয় করেছে। এ শুধু সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে, সোভিয়েটের জনসাধারণ গুণীর কদর বোঝে—তাদের রসবোধ সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করছে। তারা একথা বুঝতে পেরেছে যে, এ যুগের আর্ট সাধারণ মানুষের রস-বোধকে যদি জাগ্রত করতে পারে তবেই তার সার্থকতা। এই কথাটাই লেনিন বলেছিলেন :—

"Art belongs to the people. Its deepest roots must reach into the very thick of the broad masses of working people. It must be comprehensible to these masses and loved by them. It must unite the emotions, thoughts and will of these masses; it must raise them. It must awaken artists in them and develop them…That art may come nearer to the people and the people to art, we must first raise the general educational and cultural level."

সোভিয়েট চিত্রশিল্পীরা লোকশিক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। শুধু সোভিয়েটেই নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও চিত্র-প্রদর্শনীর বিশেষ কদর আছে। বিশেষতঃ ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে কোন জায়গায় চিত্র-প্রদর্শনী হলে যে পরিমাণ দর্শক আসে, আমাদের দেশের তুলনায় তা ঢের বেশী।



পাঠরতা —বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, দিল্লী

এদেশে আর্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হলে চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে জনসাধারণের যোগ যাতে গভীর হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। দর্শকের সঙ্গে আর্টিষ্টদের যোগাযোগ এবং ভাব-বিনিময়ের উপায় যাতে এই সমস্ত প্রদর্শনীতে হয় সে বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। এমনি ভাবেই শুধু জনচিত্তের তথা সমগ্র দেশের সঙ্গে শিল্পীর গভীর সম্পর্কের সূচনা হতে পারে—শিল্পীর ষ্টুডিয়োর ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভেতর থেকে শিল্পকলা বাইরে

ছড়িয়ে পড়ে জনগণের হৃদয়ে আসন লাভ করবার সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ ভ্রমণ-কালে ভারতীয় চিত্রকলার একটি নূতন দিকের সঙ্গে পাশ্চাত্যের জনগণের পরিচয় হয়েছিল। সেখানে তখন "Tagore School of



রেখাচিত্র —সুধীর খাস্তগীর

Painting" নামে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্তর্নিহিত ভাবরসে সেদিন যে ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পরসিক এবং জনসাধারণ সকলেরই কিরূপ চমক লাগিয়ে দিয়েছিল নীচেকার উদ্ধৃতি হইতে তাহা বুঝা যাবে।

"Paris arranged a great exhibition of the 'Tagore School of Painting' as it was called, and the whole art-world of France went crazy over the new vision of art. Berlin followed suit, and the whole of Europe, including England saw something original, something beautiful, something true that was India's. New York got up an Exhibition and saw for the first time the creative value of India and welcomed the *Renaissance* as of great artistic import to the world.'

জাতীয় জীবনে চিত্র-প্রদর্শনীর মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যে অত্যধিক তা বলাই বাহুল্য। জাতির শিল্প ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার কাজে এই সব প্রদর্শনী অনেকটা সহায়তা করে। সোভিয়েট চিত্রশিল্পীরা একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চিত্র-শিল্পের ভিতর দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হয়েছেন। সোভিয়েটের যুদ্ধ-চিত্র দেখলেই সে কথা বিশেষ করে বোঝা যায়। যুদ্ধকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও আর্টিষ্টরা জনকল্যাণ-কর্মে আর্টকে নিয়োজিত করেছিলেন। আমেরিকার যুদ্ধচিত্রগুলি নূতন এক ধরণের চিত্রশিল্পকলার পরিচয় দেয়। বাংলাদেশেও চিত্রশিল্পে দেশ ও সমাজের প্রকৃত রূপকে প্রতিফলিত করবার প্রয়াস যে দেখা যায় নি তা নয়। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার চিত্রশিল্পীদের অনেকেই মন্বন্তর-সম্পর্কিত চিত্র এঁকেছিলেন। কিন্তু চিত্রকলাকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করবার চেষ্টা বাংলাদেশে এখনো হয় নি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব জায়গায় আর্ট স্কুল আছে, সেইখানেই সাধারণত বছরের কোন এক সময়ে চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে। কলিকাতার গবর্ণমেন্ট স্কুল অফ আর্টস, লক্ষ্মৌ ও বোম্বাইয়ের স্কুল অফ আর্টস এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসরেই চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে থাকে। এ ছাড়া দিল্লীর ফাইন আর্ট সোসাইটি ও কলকাতার ন্যাশনাল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, পাটনার শিল্পকলা পরিষদ প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বহু নবীন ও প্রবীণ চিত্রশিল্পীর ছবি নিয়ে সময় সময় চিত্র-প্রদর্শনী



তরণাগী —রণেন আয়ান দত্ত, কলিকাতা

হয়ে থাকে। সম্প্রতি চারুশিল্প ছাড়া অন্যান্য চিত্রশিল্পেরও প্রদর্শনী হয়ে থাকে। যেমন আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রি চিত্র-প্রদর্শনী।

কিন্তু সর্ব্বত্রই অধিকাংশ দর্শকের মধ্যে প্রকৃত শিল্পবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়।



'জলকে' —সফিউদ্দীন আহমেদ, কলিকাতা

তার কারণ আছে। এই সব চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে কারা আসে এবং তারা কোন্ শ্রেণীর দর্শক? সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ ছাত্ররাই ছবি দেখতে আসে, আর আসেন শিল্পানুরাগী ব্যক্তিরা। শিল্প-প্রদর্শনীতে সাধারণ লোকের সমাগম যে খুব বেশী হয় না সে কথা আগেই বলেছি। সেই জন্যেই আমাদের চিত্রকলা এবং চিত্র-শিল্পীদের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় না। কাজেই শিল্পেরও প্রসারতা ঘটতে পারে না। সাধারণ দর্শকের শিল্পানুরাগের অভাব এর একটা কারণ হলেও শুধু সেইটুকুই সব নয়। প্রকৃত কারণ দেশের জনশিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুন্নত অবস্থা। দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক জীবন যদি উন্নত না হয়, তাহলে চারুশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসার অসম্ভব। বাংলাদেশে শিক্ষার দৈন্য অপরিসীম। তাই চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য যেমন এক দিকে হওয়া উচিত জনসাধারণের সহিত নবীন শিল্পীদের পরিচয় করানো অন্য দিকে তেমনি দর্শকদের শিল্পবোধ জাগ্রত করা সম্বন্ধেও তাদের অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতীয় চিত্রশিল্পের রেনেসাঁসে যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের বেশীর ভাগই বাংলাদেশের চিত্রশিল্পী। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই সব প্রতিভাশালী শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলাকে সমগ্র পৃথিবীতে মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ। এই শিল্পাচার্য্যের সাধনার অন্যতম প্রধান পাদপীঠরূপে দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্ট্যাল আর্ট—ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে কারো কারো কৃতিসমূহ দেশবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। তন্মধ্যে নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসিত-কুমার হালদার, মুকুলচন্দ্র দে, সুনয়নী দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যামিনী রায়, সুধীর খাস্তগীর, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অতুল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতি শিল্পীগণ চিত্রকলার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশে আরো কয়েকজন নবীন শিল্পী বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন, সেটা আশার কথা।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে বাঙালী শিল্পীদের অবদান হয়ত উপেক্ষণীয় নয়, কিন্তু মনে হয় জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিল্পবোধ জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁদের সাধনা কিছুতেই চরম সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না। শুধু বাংলা-দেশে নয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জনগণের মধ্যে শিল্পবোধশক্তির একান্ত অভাব বিদ্যমান। প্রত্যেক শিল্পীরও একটি বিষয় মনে রাখা উচিত। নিজের চোখ দুটোকে খোলা রেখে তাকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একবার দুঃখ করে বলেছিলেন:

"আমার মনে হয় আমাদের দেশে যেটা প্রধান অভাব—



মধ্যাহ্নকালের কুটীর —সফিউদ্দীন আহমেদ, কলিকাতা

আমরা দেখবার সুযোগ পাই নি। ছবি আমরা দেখি নি। রিপ্রোডাকশন দেখেছি কিছু বড়ো বড়ো আর্টিষ্টদের ছবির, কিন্তু তা কত তফাৎ। সেই যে সৃষ্টির লীলা, আমরা কেউ এ না দেখার জন্যে একটা ছোট সীমানার মধ্যে তা ধরতে পারি মাত্র। একেবারে অভিভূত লাগার উন্মাদনা, আনন্দ—তা হবার জো নেই। নরওয়েতে দেখেছি এক বড়ো আর্টিষ্ট মূর্তি গড়েছেন—তার রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আমরা অতি দরিদ্র—আমরা কোথায় যাব। কেউ বা আধুনিকতায় আছে, কেউ বা অজন্তায় আছে কিন্তু তা বড়ো কম। তাতে করে inspiration হয় না।'



অহল্যা উদ্ধার —(বোম্বাইয়ের জে জে স্কুল অফ আর্টের সৌজন্যে)

এ তো গেল ছবি দেখার কথা—শিল্পীকে শুধু ছবি নয়—জীবনকেও দেখতে হবে, মানুষকে জানতে হবে পরিপূর্ণভাবে। জীবন ও মানুষের আসল রূপ যদি যথাযথভাবে তাদের শিল্প-সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয় তবে তো হবে চিত্রকলার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগ।

আমাদের দেশে যে সব চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে থাকে, তার ভেতর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব থাকে কম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এক একটি বার্ষিকী হিসেবেই এই সব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—এবং সেইজন্যেই প্রায় প্রতি বৎসরেই একই রকমের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। জল-রং, তেল-রং পোর্ট্রেট আর স্কেচ ছাড়া কদাচিৎ মাত্র দুই-একটি নতুন ধরণের ছবি নজরে পড়ে। ভারতীয় চিত্র-শিল্পীদের অনভিজ্ঞতা ও নূতন ধরণের শিল্প-পদ্ধতির পরীক্ষণে অনুৎসাহের জন্যই এই গতানুগতিকতা।

দেশে চিত্রপ্রদর্শনীর প্রসার ও প্রচার না হলে চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। একই বিষয়ের চিত্র-প্রদর্শনী না করে এবং একসঙ্গে সবরকম ছবির সংমিশ্রণ না করে, বিভিন্ন বিষয়ের অথবা এক একটি বিষয় নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত। যেমন কার্টুন, পোষ্টার, উড্‌কাট, ফটোগ্রাফি, শিশু-শিল্প, আল্‌পনা, সূচী-শিল্প প্রভৃতি। শিশুশিল্প অথবা কার্টুন ইত্যাদির চিত্র-প্রদর্শনী আমাদের হয়ই না। বিভিন্ন জায়গায় এক এক বিষয় নিয়ে এই ধরণের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে।



নিরালায় —নন্দলাল বসু

কোন একজন বিশিষ্ট শিল্পীর ছবি নিয়েও চিত্র-প্রদর্শনী করা যায়—যেমন, অবনীন্দ্রনাথ কিংবা যামিনী রায়ের ছবি। এতে করে প্রত্যেক চিত্রশিল্পীর নিজস্ব অঙ্কনপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য দর্শকের চোখে ধরা পড়ে। একই শ্রেণীর শিল্পীর ছবি নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনী করলে তাতে অভিনবত্ব বৃদ্ধি পায়—যেমন, শান্তিনিকেতন কলাভবন কিংবা আধুনিক শিল্পীদের ছবি। কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর ছবি নিয়ে চিত্র-প্রদর্শনী করা যায়। ফটোগ্রাফির চিত্রপ্রদর্শনীর রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই। পরিমল গোস্বামী, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নীরোদ রায় প্রভৃতির ফটোগ্রাফ নিয়ে

প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত। তা ছাড়া কার্টুনের চিত্র-প্রদর্শনী আমাদের দেশে কোথাও এপর্য্যন্ত হয় নি। বাংলাদেশের শৈল চক্রবর্ত্তী ও 'পিসিয়েল' ও উত্তর-ভারতের 'Shanker'—এঁদের কার্টুনের চিত্র-প্রদর্শনী করলে দর্শক-চিত্তে প্রচুর আনন্দ বিধান করা যেতে পারে। সাধারণতঃ জল-রঙ্ ও তেল-রঙ্ ছবিকেই আমরা চিত্রশিল্পের সবটুকু বলে জানি। এ বিষয়ে আর্ট-ইন-ইণ্ডাষ্ট্রি চিত্র-প্রদর্শনী যথেষ্ট অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছে। ভারতবর্ষে ইমপ্রেসনিষ্ট আর্ট অথবা কিউবিক আর্টের পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র গুণেন্দ্র ঠাকুরের নামই মনে পড়ে। তাঁর "রবীন্দ্রনাথ" চিত্রখানি সত্যই চিত্র-জগতের বিস্ময়। আরও অনেক উদীয়মান শিল্পী আছেন—যাঁদের নিজস্ব রচনাভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য আছে।

সম্প্রতি পাটনার "শিল্প-কলা পরিষদের" উদ্যোগে একটি চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছিল। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করেছেন যে পাটনায় একটি আর্ট-গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করবেন। পাটনা আর্ট স্কুলের সহযোগিতায় যদি তাঁরা এমন একটি আর্ট-গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তা হলে একটা সত্যিকারের কাজ হবে। কারণ ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত কোথাও এ ধরণের আর্ট-গ্যালারি হয় নি যেখানে জনসাধারণ গিয়ে ছবি দেখতে পারে। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েটের "ট্রেটিয়াকভ্ ষ্টেট আর্ট গ্যালারির" কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে এই আর্ট-গ্যালারি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। যাবতীয় সোভিয়েট চিত্রশিল্পীর ছবিসমূহের একত্র সমাবেশ করা হয়েছে সেখানে। ইংলণ্ডের "ষ্টেট গ্যালারি" এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। ভারতীয় চিত্রশিল্পীরা সকলে মিলিতভাবে যদি এই কাজে অগ্রসর হন, তা হলে হয়ত এক দিন ভারতীয় চিত্রশিল্প জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারবে।*

*এই প্রবন্ধের ছবিগুলি পাটনার "শিল্প-কলা-পরিষদের" সৌজন্যে প্রাপ্ত

সাময়িক

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভালবাসাটা আকস্মিক একটা আবেগসঞ্চার মাত্র কিনা তাহা আজও বুঝি না।

কলিকাতার পথে নৈহাটী নামিয়াছিলাম—

সহপাঠী প্রফুল্লর সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় না, সে বার বার যাইতে লিখিয়াছিল। প্রফুল্ল মোটা মাহিনার চাকুরী করে, যাহাকে লোকে সায়েব বলে। সাহেবী ফ্ল্যাটে সোফা, ফ্যান, রেডিও লইয়া সাহেবী চালে থাকে কিন্তু মনটা একেবারেই বাঙালী রহিয়া গিয়াছে। বন্ধু-বান্ধবী সকলেই আনন্দিত হইলেন, সারাটা দিন রাজার হালে কাটাইয়া বেড়াইতে বাহির হওয়া গেল।

জীবনের সুখদুঃখের আদানপ্রদান হইল। প্রফুল্ল কহিল—সবই আছে কিন্তু বড় একা। মিশবার লোক নেই। এখানে সাথী বলতে দেবকী ডাক্তার,কিন্তু ডাক্তার—তাই রোগীর সাথী, আমার নয়। চল সেখানেই যাই—তিনি ত আবার কন্ট্রোলের চা খাইয়ে বলেন খাওয়ানটা অভ্যাস। বেশ পরিবারটি—

অতএব ঘুরিয়া ফিরিয়া সেখানেই যাওয়া গেল। ডাক্তার বাড়ীতে নাই, তাহার কন্যা বেণু, রেণু, টুটু প্রভৃতি শিক্ষিতা ও সুন্দরী, অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করিলেন। পাড়ার নমিতাও উপস্থিত ছিল—দেখিতে দেখিতে আড্ডাও জমিয়া উঠিল।

চা পানের সময় ডাক্তার আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন—কন্ট্রোলের আমলে চা দিলে যে রেণু। তাহার কথা বলার ভঙ্গিই এমন যে কথাটা ব্যঙ্গ না সত্যিকার তাহা বোঝা কঠিন—ওষ্ঠাধর বক্রতা প্রায়শঃই প্রতারিত করে—

পরিহাসে ব্যঙ্গে এই আধুনিক পরিবারটি সন্ধ্যাটিকে দেখিতে দেখিতে সরগরম করিয়া তুলিলেন।

পরিচয়-প্রসঙ্গে ডাক্তার কহিলেন—আপনার পুত্র-কন্যা কি?

আমি প্রফুল্লর মুখের দিকে চাহিলাম। প্রফুল্ল কহিল—বন্ধুটি ভয়েই বিয়ে করেন নি, পাছে খরচ হয়।

অবিবাহিত! বয়স ত পঁয়ত্রিশ হবেই—ঘোর অন্যায়! ডাক্তার বলিলেন।

প্রফুল্ল কহিল—এইজন্যেই ত কন্যাদায় দায় হয়েছে।

রেণু কৌতুকোজ্জ্বল আঁখি মেলিয়া কহিল—ঘোর অন্যায়, বিয়ে না করলে মানায়ই না—

বেণুও কহিল—নিশ্চয়ই অন্যায়—

আমি কহিলাম—অতএব আমি যে অন্যায় করেছি এ বিষয়ে আপনারা একমত?

রেণু কহিল—নিঃসন্দেহে।

দেবকীবাবু একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন—নেহাত কাপুরুষ

—হ্যাঁ তবে কারণ শুনলে কেসটা abnormal কিনা বিচার করা যেত।

আমি হাসিয়া কহিলাম—অন্যায় যখন করেই ফেলেছি তখন—

বেণু চট্ করিয়া কহিল—বিয়ে করে ফেলুন।

বয়স কি আর আছে।

দেবকীবাবু কহিলেন—আমি ফিট্ সার্টিফিকেট দেব।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমার কুমার জীবনের কারণ লইয়াই কথা চলিতে লাগিল। আমি নিজেকে রক্ষার জন্যে কহিলাম—এটার এমন কোন কারণ নেই, বিয়ে করব না বলে অন্য সকলের মতই একটা ঝোঁক ছিল কিন্তু যেদিন বুঝলাম বিয়ে করা উচিত সেদিন বিবাহের আর প্রয়োজন ছিল না। তাই বিয়ে করা হয় নি।

সে কেমন?

অতএব সবই বলিতে হইল:

আমি সুরু করিলাম—

বাবা ও কাকারা দুই ভাই ছিলেন। আমি তাদের বড় ছেলে। আমার পড়াশুনা প্রভৃতির জন্যে কাকাই চেষ্টা করেছেন, খরচপত্র চালিয়েছেন। পাস করে যখন চাকুরী করতে আরম্ভ করলাম তখন কাকা বিয়ে দেবার জন্যে পত্র লিখেছিলেন, দু-একবার কথাবার্তাও বলেছিলেন, কিন্তু আমি এখন না তখন, সংসারে খরচ, ভাল চাকুরী না হলে বিয়ে করব কি ইত্যাদি অযৌক্তিক যুক্তি দেখিয়ে কেবল দেরী করতে আরম্ভ করলাম। কাকা দু'চারটে মেয়েও দেখেছিলেন জানি কিন্তু হঠাৎ সংসারে এল বিপ্লব, কাকা হঠাৎ বিদেশে মারা গেলেন। সে শোক সামলাতে না সামলাতেই বাবাও গেলেন, সংসার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। অন্যান্য ভাইয়েরা ছিটকে চলে গেল, বোনদের বিবাহের দেনা শোধ করতে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তাই দেশে গেলাম

বাবা বাড়ীতেই থাকতেন—এক দিন পুরাতন দলিলপত্র খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা চিঠির ফাইল পেলাম। তখন রাত্রি গভীর—

সংসারের অতীত ইতিহাসের প্রতি কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক তাই চিঠিগুলি দেখতে আরম্ভ করলাম, দু-একখানা চিঠি পড়তেই মনে পড়ল কাকা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেই শেষজীবনে কয়েক বছর দেশে আসেন নি—মৃত্যু আর দেশেও আসতে দেয় নি—ঝগড়া আমাকে নিয়েই।

একখানা পত্রে কাকা লিখেছেন—

"খোকা যখন ছোট ছিল, আমারই বুকের উপর শুয়ে ঘুমোত তখন তুমি ত জানতে না কেমন করে আমি স্বপ্ন দেখতাম। খোকা বড় হবে, তার গ্রাজুয়েট বৌ আনবো, বুড়ো কালে তার বাসায় গিয়ে থাকব, বৌমাটি বেশ সেবা যত্ন করবে, পরম পরিতৃপ্তির মাঝে শেষ দিন ক'টি কাটিয়ে দেব। সারা জীবনই এই আকাঙ্ক্ষা আমার রয়েছে, আজ খোকার বিবাহের বয়স হয়েছে আজ সে তার তাই আমার। আমি খুঁজে যে মেয়েটিকে মনের মত বলে মনে করব সে-ই আমাদের বৌমা হবে। সে সম্বন্ধে তোমার মতামত কিছু থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তোমার পছন্দে গেঁয়ো অশিক্ষিতা একটা মেয়ে ঘরে আনা চলবে না। মেয়ে পছন্দ সম্বন্ধে আমার মতামতই শেষ সিদ্ধান্ত হবে।"

বাবা এর কি জবাব দিয়েছিলেন তা জানি না, কারণ সে চিঠি ছিল না তবে মনে হয় তিনি লিখেছিলেন যে তিনি বাবা, পুত্রের বাবা, তার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই শেষ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, আর আকাঙ্ক্ষা কাকার মত তাঁরও থাকতে পারে এবং সেটা গেঁয়ো মেয়ে দিয়েও হতে পারে। এ পত্রের জবাবে রীতিমত উষ্মা সহকারেই কাকা লিখেছিলেন—

"তুমি খোকার বাবা হতে পার, জন্মদাতা পিতা সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে সবটুকু দাবিই তোমার নয়। খোকার কাপড় জামা, লেখাপড়ার খরচ বাবদ তুমি সারা জীবনেও নয় টাকা হয় আনার বেশী খরচ কর নি। আজ বিয়ের সময় বাবা হয়ে বাবাগিরি করছ। পড়ার সময় কোথায় ছিলে? তোমার মেয়ের বিয়ের সময় কাকারাই ত সব দিল কিন্তু ছেলের বিয়ের সময় হঠাৎ বাবা হয়ে বসলে…"

শেষের দিকে লিখেছেন—

"খোকাকে জিজ্ঞাসা করব, সে আমার মতানুসারে বিয়ে করবে কিনা, যদি সে রাজি হয় তবে বিয়ে ঠিক করে তোমাকে নিমন্ত্রণ করব, ইচ্ছে হয় এস না হয় আমার মতেই বিবাহ হবে। লোকতঃ ধর্মতঃ সেইটাই ন্যায্য। শুধু তাই নয়, বিয়ের পরে বৌমা আমার এখানেই থাকবে যত দিন না খোকা বাসা করে—"

মায়ের কয়েকখানা পত্র বোধ হয় ফাইলে ছিল না। শেষের চিঠিখানা ছিল—

"খোকার বিয়ে দিয়ে বৌমাকে নিয়েই বাড়ী যাব, নইলে আর যাব না। যদি জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তাদের ঘরের মত ভেঙেই পড়ে তবে আর সংসারের এই অসাধ্য দুঃখ বরণ করার কি মানে হয়? তখন তোমরা খোকা ও বৌমাকে নিয়ে ঘরসংসার কর—আমি বিদেশেই থাকব, এখানেই মরতে চাই।"

শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিহাসপ্রিয়তা দূর হইয়া ঘরের মাঝে একটা বেদনার্ত স্তব্ধতা পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণুর চোখ দুইটি যেন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে—নমিতা বাহিরের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে—

আমি পুনরায় আরম্ভ করিলাম—

চিঠিগুলি পড়ে যখন শেষ করলাম তখন রাত্রি গভীর—ভোর হতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক আছে। নিস্তব্ধ নিঝুম

রাত্রি—গ্রামের সেই অন্ধকারময় নির্জনতার মাঝে বিগত দিনের সেই প্রিয়জন সব যেন তাদের শত ইচ্ছার বাহু মেলে আমাকে ঘিরে ধরল। এই ঘরে, এই বাড়ীতে যখন আমার অজান্তে আমি বড় হচ্ছিলাম তখন আমাকে ঘিরে তাঁরা সব কত স্বপ্নই না দেখেছেন—সেই স্বপ্নকে অবলম্বন করেই সংসারে বেঁচে ছিলেন—

কাকা বা বাবার মৃত্যু যে দুঃখ দিতে পারে নাই, সে দিন রাত্রে তাঁদের পত্র তার শতগুণ দুঃখে আমাকে অভিভূত করে ফেলল। আমি বিবাহ করতে চাই নি এমন নয় কিন্তু বিবাহ করে আমি সুখী হতে চেয়েছিলাম, সেটা যেন একান্তই আমার আপনার ব্যাপার। সেদিন বুঝলাম আমি আমার জন্যেই নয়, আমার বিবাহ কেবল আমারই ব্যাপার নয়। আমার বিবাহকে কেন্দ্র করেই দুটি প্রিয়জন দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। বিয়ে করলে তাঁরা সুখী হতেন এবং আমার জীবনের চেয়ে তাঁদের জীবনে সেটা বেশী প্রয়োজন ছিল কিন্তু আজ তাঁরা নেই তাই বিবাহের প্রয়োজনও নেই। আমি ত আর সুখী হব না—জানি, তাঁদের আনন্দ-উদ্দীপনার মাঝে যা সার্থক হ'ত আজ তা নিরর্থক হয়েই রইবে—

কথা শেষ করিতে হয়ত কণ্ঠস্বর ভারি হইয়াছিল। ঘরখানা একটি বেদনার্দ্র নিস্তব্ধতায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। রেণু, বেণু, নমিতা, দেবকীবাবু সকলেই যেন বিমনা হইয়া বসিয়া আছেন।

নমিতা প্রথম কথা কহিল- সত্যিই, পৃথিবীতে আমরা কেবল আমাদের জন্যেই নয়। আমাদের ঘিরে কত জনের কত আশা, আকাঙ্ক্ষা—

রেণু ভিজা কণ্ঠে কহিল—যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা আজ পরপারে বসে হয়ত সুখী হতে পারতেন যদি আপনাকে বিবাহিত দেখতেন।

আমি শান্ত ভাবেই কহিলাম—যদি তাই হয়, যদি পরপারে মানুষের বোধশক্তি থাকেই তবে তাঁরা একথাও ভাবতে পারেন—সেই বিবাহই করেছি কিন্তু তাদের জন্যে করি নি, করেছি কেবল আমার জন্যেই—আমি এমনি স্বার্থপর—

রেণু আমার মুখের পানে প্রশান্ত দৃষ্টি হানিয়া কহিল—কিন্তু আপনার কাহিনী শুনে মনে হয়, বিবাহ না করবার চেয়ে করবার যুক্তিই এর মাঝে বেশী।

দেবকীবাবু কহিলেন—আপনার শান্তি হ'ত এই ভেবে যে তাঁদের অপূর্ণ ইচ্ছাকে আপনি পূর্ণ করেছেন সেটা কম নয়।

প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। নমস্কারান্তে বিদায় লইয়া আসিতেছিলাম কেবলমাত্র রেণুই সামনের বাগানের গেট পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিল। তাহাকে বিদায় জানাইতে সে কহিল—কিন্তু আপনার বিয়ে করাই উচিত বলে মনে হয়।

আমি হাসিয়া কহিলাম—এ বয়সে কে আর আমাকে বিয়ে করবে—বিয়ে করে সুখী হবে। রেণু কহিল—যারা আপনাকে জানে তারা সকলেই করবে।

কথাটি বলিয়া ফেলিয়া সে যেন লজ্জিত হইয়াই ক্ষুদ্র নমস্কারান্তে দ্রুত পায়ে চলিয়া গেল।

তাহার পর কয়েক দিন রেণুদের ওখানে গিয়াছি, রেণু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই আলাপ করে এবং আমি অবিবাহিত বলিয়া অনুযোগও করে। মাঝে মাঝে স্বর্গত কাকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে।

জানি তাহার অন্তর সত্যিই সমবেদনাপূর্ণ।

কিন্তু এটা কি সাময়িক একটা আবেগ মাত্র? না কেবল সহানুভূতি? রেণুর নিকটেই যদি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফেলি তবে তাহা সমীচীন হইবে কিনা বলিতে পারেন?

মৃত্যু

এ এন এম বজলুর রশীদ

আপনার স্বার্থসুখে সুপ্তিমগ্ন ছিলাম শয়ান
জীবনেরে ক্ষুদ্র করি—রুদ্র তব নির্ম্মম আহ্বান
তাণ্ডব নৃত্যের তালে বিদ্যুতের জ্বালি বহ্নিশিখা
ভাঙিল সুখের ঘুম। মর্মান্তিক মৃত্যুর লিপিকা
নিমিষে পড়িনু যবে—মুহূর্ত্তেক যত লাভক্ষতি
জীবনের ভুলচুক শত মায়া লভিল বিরতি
দু'ফোঁটা চোখের জলে। জীবনের শুভক্ষণে
পরম লগনে কোন্ অজানার বাঁশী ওঠে বাজি
আঁধারের পার হতে—অনির্বাণ তারার আলোক
পড়ুক নয়নে এসে—ভুলে যাই শত দুঃখ শোক।
পূর্ণতা লভিবে প্রাণ অসীমের মুক্ত বক্ষে আসি—
দুঃখ নাই, নাই ক্ষোভ, নাই সেথা ভালবাসাবাসি
জীবনের ক্ষুদ্র আশা—মরণের বাতায়ন খুলি
দেখিনু সুন্দর তুমি বন্ধু মোর—শঙ্কা গেনু ভুলি।

বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুনীলচন্দ্র বসু

গানেরও যে একটা জাত আছে, জাতীয়তা আছে—বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে সেটা উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি। অধুনা আমরা যে সমস্ত গান শুনে থাকি, গেয়ে থাকি, সে গানের ভাষা বাংলা হলেও সেগুলোর জাতীয়তা রক্ষা হয় নি। কারণ ভারতীয় সঙ্গীত বলতে যা বুঝায় আমাদের আধুনিক বাংলা গান মোটেই তা নয়। এরা বর্ণ-সাঙ্কর্য্যে দুষ্ট।

আধুনিক বাংলা গানে এই যে স্বভাবগত বিভেদ সেটাই জাতীয়তা-হীনতার প্রধান লক্ষণ। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর গানের প্রচলন ও বাহ্যিক উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে থাকলেও সেটা বাংলা গানের গায়ক ও গায়িকার পক্ষে—এমন কি বাঙ্গালী জাতির পক্ষে—খুব গৌরবজনক নয়; কারণ জাতীয়তার লক্ষণ এসব গানে প্রকাশ পায় না। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর গানের প্রাদুর্ভাব দেখতে পাওয়া যায় রেকর্ড, রেডিও আর সিনেমায়। যাঁরা সৌখিন গায়ক, যাঁরা সত্যকার সঙ্গীতশিক্ষার্থী, তাঁরা প্রভাবান্বিত ও বিভ্রান্ত হচ্ছেন ঐ রেকর্ড, রেডিও এবং সিনেমার দ্বারা।

আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী দেশী গানের জাতি-বিচারের একটা প্রধানতম নিদর্শন হলেও সেটা গানের জাতীয়তা নয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালী চিরদিনই এতটা এগিয়ে আছে যেখানে সে জাতির চেয়ে জাতীয়তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ঢের বেশী, গানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বাংলা গান ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ছায়াতলে বেড়ে উঠলেও সে বরাবরই আপনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে এসেছে।

দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের অতঃপতন আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই। ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনই সারা ভারত-বর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের অব-নতির প্রধান কারণ: ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্বে বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরে যেমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের চর্চ্চা হ'ত, সমঝদার মিলত, তার অভাব ঘটতে আরম্ভ হ'ল ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পর থেকে। শেষ অবধি উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত (যা প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী এবং কতক-গুলো উচ্চাঙ্গের মুসলমানী সঙ্গীতের অন্তর্গত) এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছাল যেখানে সেই সঙ্গীতের মূল উদ্দেশ্য প্রায় সকলেই ভুলতে আরম্ভ করলে বা ভুলে গেল। গান গাওয়ার চেয়ে গান গাইবার প্রয়াসই সেখানে বড় হয়ে উঠল—এ ছাড়া সেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তার বৃহত্তর ক্ষেত্র হারিয়ে এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হ'ল—সে হ'ল ঘরোয়ানা। অর্থাৎ হাল আমলের বণিক-সমাজ এবং ধ্বংসোন্মুখ প্রাচীন জমিদার-সমাজ আপনাদের আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্যে তাকে জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখলেন বা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে রইল।

এদেশে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের এমনি যখন অবস্থা, যখন সে ভেঙে পড়েও অন্তঃসারশূন্য হয়ে আহত অভিমানে দাঁড়িয়ে আছে, যখন তার প্রাণরস শুষ্ক হয়ে গেছে এবং যখন গীতি-কলার শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পরিণত হতে চলেছে—সঙ্গীতের সেই রিক্ত রূপটি লক্ষ্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। রবীন্দ্রনাথ সেই পরিবারেরই মানুষ। শিশুকাল হতে তিনি অনেক জলসা দেখেছেন, অনেক মজলিশ দেখেছেন, অনেক নাট্যাভিনয় আর অনেক ওস্তাদি গান শুনেছেন—সেগুলো সবই ছিল ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত। তবে সহজাত সূক্ষ্ম রস-বোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ এটাই অনুভব করেছিলেন যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গায়কগণ তাদের কণ্ঠস্বরকে সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত প্রণালীতে চালনা করবার জন্যে প্রথাগত সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে অঙ্গভঙ্গীদ্বারা রাগ-রাগিণীর সঠিক ভাব প্রকাশ করবার জন্যে একান্তমনে চেষ্টা করছেন অথচ সফলকাম হচ্ছেন না। সে সঙ্গীতে কণ্ঠস্বরের সুমিষ্ট উচ্ছলতা নেই, আর নেই প্রাণের প্রাচুর্য্য। এ সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:—

"যে মানুষ গান বাঁধবে আর যে মানুষ গাইবে দু'জনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে গান গাওয়া হচ্ছে সেটা আবৃত্তি নয়, সে যে তখন তখনি জীবন-উৎস হতে তাজা হয়ে উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অম্লান থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণতঃ এরা দু' জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড়া মেলে, কিন্তু সর্ব্বদা মেলে না। ফল দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলার অংশটা থাকে গানকর্ত্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশলের অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে সোনা হিসাবে নয়। কেননা ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারি মানুষের প্রভুত্বটাই জগতে সব চেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুর-সভা ছেড়ে অসুরের আখড়ায় নেমেছে। সেখানে তান-মান-খাদের

তাণ্ডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে, আসল গানটা ঝাপসা হয়ে যায়।"*

রবীন্দ্রনাথ সুগভীর বীক্ষণশক্তি দিয়ে এটাই দেখেছিলেন যে, সঙ্গীত-শাস্ত্রটাই হয়ে উঠেছে মুখ্য আর আসল যা গান, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাই হয়ে গেছে গৌণ। রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাংলার ক্লাসিক্যাল গান যেমন ওস্তাদের হাতে পড়ে প্রাণহীন হয়ে টিকে আছে এবং সবল ও সুস্থ হয়ে উন্নতি লাভ করতে পারছে না, তেমনি সেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের দু' পাশে যে সব গান ভূঁইফুঁড় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে সেগুলিও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তথা-কথিত আভিজাত্য—পদাবলী, কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল, জারি-গানকে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আসরে স্থান দেয় নি। স্থান না দিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় নি, কারণ বাঙালীর প্রাণের সজীবতা ও গানের বাঙালীয়ানাকে বাঁচিয়ে রাখে ঐ দেশজ গানগুলি। যা হোক উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের গাড়ে চড়া পড়বার কারণ একটি নয়, অনেক। যে সুখ শান্তি ও সময়ের প্রাচুর্য্যের মধ্যে রাজা জমিদারদের আশ্রয়ে এরা লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছিল তার অভাব এর একটা কারণ, এ ভিন্ন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের পিছনে যে একটা ঐতিহ্য ও মানসিক অভিব্যক্তির একটা রূপ আছে তার অজ্ঞতাই বোধ হয় এর অধঃপতনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ।

আসল গান বলতে যা বুঝায় তথাকথিত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত যে তা নয় এ কথা অনেকেই বোধ হয় স্বীকার করবেন না; কিন্তু সত্য বলতে কি এই শ্রেণীর গানে রাগ-রাগিণীর প্রাধান্যই বেশী, 'কথা' বলতে কিছুই নেই। এই শ্রেণীর দু'ছত্রের একটা গান(?) দু' ঘণ্টা আসর জমিয়ে রাখতে পারে কিন্তু সেখানে রাগ-রাগিণীর পরিচয়টাই বড় হয়ে ওঠে, 'কথা' ও সুরের' মিলিত পরিচয় হয় গৌণ। উচ্চশ্রেণীর গায়কের কণ্ঠে এর সার্থকতা লাভ হয় স্বীকার করি, কিন্তু যেখানে তার অভাব সেখানে অধিকাংশ ক্লাসিক্যাল গান হয় গায়কের পক্ষে অসাধ্য সাধন করবার চেষ্টা। রাগ-রাগিণীর সঙ্গে গীতিকলাবর্জ্জিত ওস্তাদি কসরৎ শুধু কর্ণপীড়াদায়কই নয়, চক্ষুর বিরক্তি উৎপাদকও বটে। এখানে যেন গানের কথাকে তুচ্ছ করে রাগিণী আপনার প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা পায়—'কথা' রয়ে যায় অস্ফুট।

বাঙালী সুরশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞগণ সঙ্গীত-জগতে রবীন্দ্রনাথকে বিটোভেন, মোজার্ট প্রমুখ সুরকারদের অনুরূপ মর্য্যাদা দেবেন কিনা জানি না, কিন্তু খাঁটি বাংলা গান-রচয়িতা ও সুরকার হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথই। গানের সত্যকার ভাবকল্পনাকে রবীন্দ্রনাথের মত আর কেউ প্রকাশ করেছেন কিনা সন্দেহ—তাই খাঁটি বাংলা গানের প্রবর্ত্তক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয় সকলের আগে। গান সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের একটা নিজস্ব বলিষ্ঠ মতবাদ গড়ে উঠেছিল তাঁর প্রথম বিলাত প্রবাসকালে। বর্ত্তমান লেখক রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন রচনা পড়াতে ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি সুরের কসরত দেখানো অপেক্ষা গান গাওয়াকেই বড় করে দেখতেন; শুধু দেখতেন কেন সেই আদর্শকে তিনি সমর্থন করতেন। সঙ্গীতকে আসরের তথাকথিত ওস্তাদের এই উৎকট প্রয়াস থেকে রেহাই দেবার জন্যেই তিনি বোধ হয় গান-রচনায়, তথা সুরসংযোজনায় মনোনিবেশ করেন এবং 'গান সাধাটাই' নয়, 'গান গাওয়াটাকেই' তিনি গানের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে এখানে বলা দরকার যে, রাগ-রাগিণীর উদ্দেশ্যের সঙ্গে গানের উদ্দেশ্য এক নয়। রাগ-রাগিণীর মধ্যে যে 'ভূমা'র স্পর্শ আছে, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি আছে, গানে তা নেই; আত্মপ্রকাশের বিচিত্রতায় গানের সার্থকতা। কথা এর অবলম্বন, সুর এর প্রাণ। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একদা এই কথাই বলেছিলেন, "গীতিকলার নিজেরই একটা বিশেষ প্রকৃতি ও কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানের বাহক মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্য্যেই বড়, বাক্যের দাসত্ব সে করিতে যাইবে কেন? বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেই-খানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্ব্বচনীয়তা সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।...কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথার আধিপত্য এত বেশী যেখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্যে এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্য্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমা-দের দেশে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অনুবর্ত্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাড়াইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে।"*

গানের কথা শুধু কথাই, কথার অতিরিক্ত যেটা সেইটাই হ'ল গান ও সে থাকে সুরের মধ্যে। ফুলের সৌন্দর্য্য তার পাপড়ি-বিন্যাসে, কিন্তু তার প্রাণ তার গন্ধের মধ্যে। গানের শিল্প-নৈপুণ্য কথায়—প্রাণ থাকে গানে, কথা যা ব্যক্ত করতে পারে না সে তাই প্রকাশ করে, যেমন—

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস গেলে করবো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।

* ছন্দ। 'সঙ্গীতের মুক্তি'—পৃঃ ১৬৪-৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* জীবন স্মৃতি, পৃ. ২১৪-৫,।

যখন বেলা শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে,
সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা তখন বাজে,
তখন আমার শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।"

গানটি পাঠ করলে ক্লান্ত হৃদয়ের সত্যকার বেদনা প্রকাশ পাবে না, সে বেদনা জেগে উঠবে গানের সুরে। এ গান দিনান্তের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহমন নিয়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার ম্লান দীপশিখার পানে চেয়ে যেন অশ্রুমোচন—এর সুরে তার অনির্বচনীয়তা। বিপুল আনন্দে মানব-হৃদয় নির্বাক, তেমনি নির্বাক গভীর দুঃখে। মানুষের সুখদুঃখ ও হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ এই গানে। রবীন্দ্রনাথের সব গানই প্রায় এই অনির্বচনীয়তায় ভরা, তাঁর গান বাক্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে এমনি জায়গায় এসে থেমে যায় যেখানে চরম দুঃখের মধ্যেও পরম শান্তি; সে তার সেই সত্তা হারিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

গীতিকলার প্রধান কথাই হচ্ছে কথাকে বাদ দিয়ে গান হতে পারে না, কিন্তু সে গানের স্বকীয়তা হবে কথাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া। সে হবে বনের পাখীর মতন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, কিন্তু তার গান হবে সকলের। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি :—

"কে সে আমার কেইবা জানে, কিছু বা তার দেখি আভা।
কিছু বা পাই অনুমানে কিছু বা তার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী, আমার গানে
লুকিয়ে তারে।"

রবীন্দ্রনাথ শুধু গানকে গান বলে দেখেন নি, তারও অতিরিক্ত কিছু তিনি গানের মধ্যে দেখেছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীরও আগে তিনি যখন বাংলা গান নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন এবং নিজের মধ্যেও একটা বুঝাপড়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন কীর্তন, বাউল, ভাটিয়াল, জারি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতগুলোর সঙ্গে আসরের গানের বিরাট ব্যবধান ছিল। পাঁচালী, তর্জ্জা, কবিগান ছিল বহু দূরে। রামপ্রসাদ, নিধু বাবুর গানও আসরে ঠাঁই পেত না—থিয়েটারী গানের সম্বন্ধে কোন কথা না তোলাই ভাল। তাই এ সব গান যেমন উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের ত্রি-সীমানায় প্রবেশাধিকার পেত না, তেমনি বৈচিত্র্যময় বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এরা আসন পাতবার অবকাশ পায় নি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের বাংলা গানের বিস্তারের সেই অভাব রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন—তিনি তাঁর প্রথম ইউরোপ প্রবাসকালে এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

"আজ পর্য্যন্ত আমার মনে হয় যে, ইউরোপের গান এবং আমাদের গানের মহাল ভিন্ন, ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের এক মহালে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। ইউরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেই ঘটনা বর্ণনা আশ্রয় করিয়া ইউরোপের গানের সুর খাটান চলে—আমাদের দেশী সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহার রস থাকে না।"*

আমাদের গানের এই দৈন্যটি মনে মনে মেনে নিয়ে এ অভাব পূরণের জন্যে রবীন্দ্রনাথই সেদিন প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন। পরীক্ষণ হিসাবে তিনি "বাল্মিকী প্রতিভা" ও "কাল মৃগয়া"র কয়েকটি গানে ইউরোপীয় সুর দিয়ে সাফল্য লাভ করেন। বিলাতে থাকা কালে তিনি সে দেশীয় গানের সঙ্গে তুলনা করে আমাদের দেশী গানের যে বিপুল সম্ভাবনার আভাষ পেয়েছিলেন সেটা তাঁর "সেই সময়কার একটা সঙ্গীত উত্তেজনায়" প্রকাশ করে এবং সেই রকম একটা "দস্তুর ভাঙা গীতি-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দের" মধ্যে থেকেই উল্লিখিত দুটি নাটিকার সৃষ্টি। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতে থাকেন যে, আমাদের বাংলা গানেরও বিশেষ একটা ধর্ম্ম আছে, প্রধানতঃ সে ধর্ম্মটি এই, যা আমাদের বাস্তব জীবনে নিরুক্ত, অব্যক্ত তাকে প্রকাশ করা। গানকে রাগ-রাগিণীর বন্ধন ও অনুশাসন থেকে মুক্ত করা এবং ওস্তাদদের tradition ও যথেচ্ছাচার থেকে মুক্তি দিয়ে নূতন সুরের জন্মদেওয়া। এখানেও আমরা রবীন্দ্রনাথের কথাই তুলে দেখাচ্ছি :—

"শুধু মাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না সমস্তকে বিচিত্ররূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোকে আপনার হাতে সৃষ্টি করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা।...শাসন-তন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট এবং তার মধ্যে শাসনের আত্মপ্রকাশের কোন ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে এ সোনার দড়িতে চির উদ্বন্ধন। মহাদেব নারদ ভরত মুনি মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা কেবল মানতেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে ঐ সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে "†

আমাদের বাংলা গানে তাঁর 'প্রধান উদ্দেশ্য'কে সফল করেন রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গানে। পূর্ব্বে আমাদের বাংলা সঙ্গীত বলতে রামপ্রসাদ, রাম বসু, নিধু গুপ্ত, গোপাল উড়ে প্রমুখ অনেকেই গান রচনা করলেও আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে সেগুলির প্রভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। এঁদের অনেক গান যথেষ্ট ভাব ও কবিত্বপূর্ণ হলেও ইংরেজী শিক্ষা ও

* জীবন-স্মৃতি ; পৃ. ১৯৮-৯

† ছন্দ ; পৃ. ১৭৩-৪

সংস্কৃতি-প্রভাবে সে সমস্ত গান ক্রমেই সকলের রুচিবিরুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তাঁদের ভাষা ও তাৎকালিক রচনা-পদ্ধতি নব্য সম্প্রদায়ের কাণে বাজতে থাকে—কালক্রমে তাঁদের গানের চর্চ্চা আর না থাকার দরুন সে সব গান সকলেই ভুলতে থাকেন। বাংলার সঙ্গীত-জগতে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-প্রকাশ ঠিক সেই বিবর্ত্তনের মুখে—এমন কি, তাঁকে এই রুচি-পরিবর্ত্তনের প্রধান নায়ক বললেও ভুল করা হবে না। রবীন্দ্রনাথ কাব্য ও সাহিত্যে যেমন আমাদের রস ও রুচি-বোধকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করেন তেমনি গানেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। বাংলা গানে যুগান্তর আনয়ন করেন রবীন্দ্রনাথই। আধুনিক বাংলা গানের আসরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গীতিকার, যিনি কথার সঙ্গে সুরের সমন্বয় করেন; আরো বড় কথা সে সমস্ত গানের সুর তাঁরই দেওয়া। প্রথম তিনি কতক-গুলি বিলিতি সুর ভেঙে সেগুলিকে বাঙালী কণ্ঠের উপযোগী করবার প্রয়াস পান; শেষ অবধি রবীন্দ্রনাথ সে পথ ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ছায়াতলে থেকেই আপনার সুর-গুলিকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য করে তুলেন। ইউরোপীয় গানের সুরের হার্ম্মনির যে অভাব তিনি দেখেছিলেন বাংলা গানে, সেই অভাব মেটানোও তাঁর নিজস্ব সুর-সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর কথা ছেড়ে দিলাম: রামপ্রসাদ, নিধুবাবু প্রমুখ গীতিকারদের গানের সুরও বাঙালীর বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অনুভূতি ও রসবোধ মেটাতে পারে না—রবীন্দ্র-সঙ্গীত সেই বিশেষ অভাবের প্রধান পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়—তবে এ কথা সত্য যে তাঁর গান ও সুর আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুভূতিকে কথা ও গানে মুখরিত করে তুলে, যা তাঁর সমসাময়িক আর কোন গীতিকার দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে প্রথম আমরা পাই দ্বিজেন্দ্রলাল অতুল-প্রসাদকে। এরা দু'জনেই ছিলেন সম্পূর্ণ ভাবে রবীন্দ্র-প্রভাব-বর্জ্জিত। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ এঁরা তিন-জনেই ছিলেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত ও অনু-প্রাণিত, কিন্তু এঁরা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত সে প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং বাংলা গান ও সুরকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেন। এ ছাড়া যাঁরা সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ করেন তাঁদের গানেও রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরের একটা হালকা ছাপ থেকে গেছে—এঁরা কেউই সরাসরি রবীন্দ্র-প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

বর্ত্তমান কালে এক শ্রেণীর গানের প্রচলন হয়েছে যেগুলোর সুর-বৈচিত্র্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু সেগুলির সবই প্রায় বর্ণসাংকর্য্যে দুষ্ট। আধুনিক গানের রিদিম্ এবং হার্ম্মনির আতিশয্য বাংলা গানের সুরের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা গান, তথা ভারতীয় গানের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য—মেলডি, তার অভাব আমাদের আধুনিক গানে অত্যন্ত বেশী। এই সব গানে সুরের প্রাধান্য অপেক্ষা নেপথ্যের যন্ত্রসঙ্গীত বা back gound music-এর বাদ্ বাদানিই খুব বেশী।

বৈদেশিক গান গাইলে অথবা সেই সুরে সঙ্গীত-চর্চ্চা করলে যে, গায়কের কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটা ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত। তাই বিদেশী সুরে সঙ্গীত-চর্চ্চা করতে করতে সেটা গায়কের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়। তখন অভ্যাসের দরুণ কতকগুলি সুরের প্যাটার্ণ বা কাঠামো গড়ে উঠে যার ফল হচ্ছে এই যে, গান গাইবার সময় বা রচনা করবার সময় গায়কের কণ্ঠস্বর অভ্যাসবশতঃ সেই প্যাটার্ণ ধরেই চলে, অর্থাৎ, গায়কের কণ্ঠস্বরে সুর-বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে গিয়ে একঘেয়েমিতে পরিণত হয়, এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'আধুনিক' গানগুলি একটু মনযোগ দিয়ে শুনলে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করতেন তাঁর হৃদয়ে সুরের জন্ম হলে, আবার কখনো বা গান লিখে সুর দিতেন। কিন্তু আধুনিক গীতিকারগণ প্রধানতঃ গান লেখেন কোনো বিশেষ সুরকারের সুরকে অবলম্বন করে—যার জন্যে প্রায় সব সুরই হয়ে পড়ে এক ধাঁচের। এর আরো একটা দোষ এই যে সুর সম্বন্ধে গায়কেরও কোন স্বাধীনতা থাকে না, তাকে গীতিকারের মুখ চেয়েই চলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গান এই সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত: রবীন্দ্রনাথের সুর একান্ত ভাবে তাঁর আপনার, তা ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে নাড়ির সম্পর্কটুকু বজিয়ে দেয়। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতে এর অভাব বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। বিদেশী শিশু বাঙালীর ঘরে বাঙালী মায়ের কোলে প্রতি-পালিত হলেও যেমন দু'জনের মধ্যে রক্তের টান থাকে না এবং মনন-ধর্ম্মেরও বৈপরীত্য ঘটে থাকে, তেমনি বিদেশী সুর বাংলা কথায় গীত হলেও তার মধ্যে মেলডি ও হার্ম্মনির তফাৎ ঘটবেই। বাংলা গানে এটাই বিজাতীয় প্রভাবের পরিচায়ক। 'রবীন্দ্রনাথের গান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছিলেন—

"যে সুর ও গান দেশের প্রাণকে ধরতে পারে তাইতো হচ্ছে জাতীয় গান। বিদেশ থেকে ধার করা সুর ও গানের চেয়ে জাতীয় সঙ্গীতের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই বেশী।"

এই সূত্রে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের সুর সংযোজনা সম্বন্ধে কিছু বললে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বন্দেমাতরম্ গানটি বহু বৎসর যাবৎ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গীত হচ্ছে। বিভিন্ন সুরে এ গান গাওয়া হয়, তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বাধিক প্রচলিত তার সুরকার হলেন রবীন্দ্রনাথ। কয়েক বছর আগে আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পত্রিকার পরিচালকগণ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর জনমনে যথেষ্ট প্রেরণা জাগাতে পারছে না; এর জন্যে তাঁরা বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে নূতন সুর দেন—তা হয়

পুরোপুরি বিদেশী, কিন্তু সেই নতুন সুর রেকর্ডেই চিরবন্দী হয়ে আছে, জনমনে ঘটেছে তার অপমৃত্যু। দেশী সুর ও বিদেশী সুরের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলতে হয় যে, বিলিতি সুরগুলি আমাদের দেশী সুরের মতন অবিচ্ছিন্ন নয়, এরা বিচ্ছিন্নভাবে পাশাপাশি সাজানো। বন্দেমাতরম্‌ গানের 'আনন্দবাজারী' সুর হয়েছিল বিচ্ছিন্ন, কাটাকাটা—যা ভারতীয় সুরের সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশী ও বিলিতি সুরের তফাৎ কোথায় তা দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

"বিলেতির সঙ্গে এই দেশী গানের ছাঁদের তফাৎটা কোনখানে, প্রধান তফাৎ সেই সূক্ষ্ম সুরগুলি নিয়ে যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরি যোগে এক সুর কেবল যে আর এক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগ-রাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে যে কন্সার্টের প্রচলন ছিল তার গৎগুলি এর প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা কাটা নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা নিয়ে সঙ্গীতের গভীরতা।...এই সব কাটা সুরগুলি নিয়ে নানা প্রকার খেলানো যায়, উত্তেজনা বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী আপনার সম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে নির্ব্বিকারভাবে বিরাজ করছে সেখানে এরা লজ্জিত।" *

এইখানেই প্রবন্ধের সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ টানব। রবীন্দ্র-সঙ্গীত যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের বর্ত্তমান বাংলা গানের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে আছে তার সম্পূর্ণ চর্চ্চা এখনো হয়নি। মনে হয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চ্চা এখন ব্যাপকভাবে হওয়া একান্ত আবশ্যক ; এতে করে শুধু গানের জাতীয়তা বা বাঙালীয়ানাই বজায় থাকবে না এর দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুশীলনও হবে। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ছায়াতলে বিকশিত।

* ছন্দ ; পৃ. ১৭১।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য

শ্রীদীনবন্ধু দাস

রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ ক্ষমতাশালী ও প্রতিষ্ঠাবান্‌ তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাহার স্থান খুব উচ্চেই হইবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। যদিও ইংরেজ এক কালে এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া অবশেষে ক্রমে ক্রমে এখানে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছে, তথাপি বাণিজ্যকে সব সময় রাষ্ট্রিক মাপকাঠি দিয়া মাপা যায় না। এক সময় আমাদের আমদানী ও রপ্তানি উভয়বিধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে রাজত্বের সঙ্গে বাণিজ্যের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইংরেজে ও জার্মানে যে এত শত্রুতা তথাপি শান্তিকালে বাণিজ্য-ব্যাপারে ইঁহাদের এক দেশকে ছাড়িয়া অপর দেশের কিছুতেই চলে না। জাপানের উপর বিন্দুমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব না থাকা সত্ত্বেও বিগত যুদ্ধপূর্বকালে মার্কিনের সবচেয়ে বেশী বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল কানাডার পরেই জাপানের সঙ্গে। ভারতবর্ষেও বিগত ৩০।৩০ বৎসরের মধ্যে ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্য হ্রাস পাইয়া জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভারতের আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্যে কোন্‌ দেশের কতটা অংশ ছিল, নীচে তাহা দেখান হইল।

(১) ভারতের আমদানী বাণিজ্যের শতকরা অংশ*

	ব্রিটেন	ব্রহ্মদেশ	জাপান	জার্মানী	মার্কিন
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব ৫ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব—	৬২·৮	...	২·৫	৬·৪	৩·১
প্রথম মহাযুদ্ধকালে গড়পড়তা হিসাব	৫৬·৫	...	১০·৪	০·৭	৭·০
প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ৫ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব	৫৭·৬	...	৬·৯	২·৮	৮·৫
১৯৩৮–৩৯ সনে	৩০·৫	১৬·০	১০·১	৮·৫	৬·৪
১৯৩৯-৪০ সনে	২৫·২	১৯·০	১১·৭	৪·০	৯·০

(২) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা অংশ*

	ব্রিটেন	জাপান	মার্কিন	ব্রহ্মদেশ	জার্মানী
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে	২৫·১	৭·৫	৭·৫	...	৯·৮
,, ,, মধ্যে	৩১·১	১১·২	১১·৯	...	০·৯
,, ,, পরে	২৪·২	১৩·৩	১২·০	...	৪·৯
১৯৩৮–৩৯ সালে	৩৪·৩	৮·৮	৮·৪	৬·৬	৫·০
১৯৩৯–৪০ সালে	৩৫·১	৬·৬	১২·৭	৬·৩	...

* ১৯৩৭-৩৮ সালের পূর্বে ভারতীয় বাণিজ্যের হিসাবের মধ্যে ব্রহ্মদেশকে ভারতের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

(৩) মোট বাণিজ্যের শতকরা অংশ*

	ব্রিটেন	ব্রহ্মদেশ	জাপান	মার্কিন	জার্মানী
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে	৪০.০	...	৫.৫	৫.৮	৮.৫
" " মধ্যে	৪১.২	...	১০.৯	৯.৯	০.৮
" " পরে	৩৯.৫	...	১০.৪	১০.৪	৪.০
১৯৩৮-৩৯ সনে	৩২.৫	১১.০	৯.৪	৭.৫	৬.৬
১৯৩৯-৪০ সনে	৩০.৮	১১.৮	৮.৮	১১.১	২.৫

ভারতীয় বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে যুদ্ধপূর্ব ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যকারী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান ছিল চতুর্থ। ঐ সালে ভারতের মোট বাণিজ্যে মার্কিনের অংশ ছিল শতকরা ৭।০। ইংরেজের অংশ ছিল ৩২। শতাংশ বা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। (পূর্বে ভারতের বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ আরও অনেক বেশী ছিল।) ব্রহ্মদেশের অংশ ১১ শতাংশ, আর জাপানের ৯.৪ শতাংশ ছিল। মার্কিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষা জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ কম ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতের বাণিজ্যের ৬.৬ শতাংশ হইয়াছিল জার্মানীর সঙ্গে। এটা হইল আমদানী ও রপ্তানি উভয় প্রকার বাণিজ্যের একত্র হিসাব। ১৯৩৮-৩৯ সনে ভারতের আমদানীর ৬.৪ শতাংশ আসিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে, আর ভারতের রপ্তানির ৮.৪ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারতের আমদানী বাণিজ্যে মার্কিনের স্থান ছিল পঞ্চম, আর রপ্তানি-বাণিজ্যে তৃতীয়। উভয় বাণিজ্যেই ব্রিটেন ও জাপান তাহার উপরে ছিল। রপ্তানি-বাণিজ্যে অবশ্য মার্কিনের স্থান জাপানের খুব কাছাকাছি ছিল। ভারতের বাণিজ্য-ব্যাপারে মার্কিনের স্থান কোথায় দেখা গেল। এবারে দেখা যাক মার্কিনের বাণিজ্যে ভারতের স্থান কোথায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যে ভারতের স্থান

ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেশী। সুতরাং ভারতের বাণিজ্যে মার্কিনের যে স্থান মার্কিনের বাণিজ্যে ভারতের স্থান তাহা অপেক্ষা অনেক নীচে। ১৯১১ সন হইতে ১৯৪৪ সনের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে যত মাল আমদানী করিয়াছে তাহার ৩ হইতে ৪ শতাংশ আসিয়াছে ভারত হইতে। আর বিদেশে মার্কিন যত মাল রপ্তানি করিয়াছে তাহার ১ হইতে ২ শতাংশ মাত্র ভারতে গিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এখন পর্যন্ত ভারত ও মার্কিনের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান খুব প্রসার লাভ করে নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের অবস্থা

বিগত যুদ্ধকালে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে। ১৯৩৯ সন হইতে ১৯৪৫ সন এই ৭ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে মোট ২৫০ কোটি ডলার (১ ডলার=৩ টাকার) বেশী। ইতিপূর্বে ১৯০০ সন হইতে ১৯৩৮ সন এই ৩৯ বৎসরে মার্কিন হইতে ভারতে যত মাল আসিয়াছিল, এই ৭ বছরে আসিয়াছে তাহার দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। এই সমুদয় আমদানীর চারি-পঞ্চমাংশ ধণ-ইজারা ব্যবস্থা অনুযায়ী আসিয়াছিল, বাকী এক-পঞ্চমাংশ আসিয়াছিল নগদ দামে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের খাতে।

১৯৩৮ সনে, যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্ববৎসরে ভারত, মার্কিন হইতে ৩.৩৪ কোটি ডলার মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছিল, আর সেদেশে রপ্তানি করিয়াছিল ৫.৮৪ কোটি ডলার। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধের শেষ বৎসরে মার্কিন হইতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪৯.১৩ কোটি ডলার, আর সেদেশে রপ্তানি হইয়াছিল ১৭.৩২ কোটি ডলার। ১৯৪৪-এ আমদানীর পরিমাণ ছিল আরও বেশী। ৭৭.৭৬ কোটি ডলার। যুদ্ধপূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৪৪ সনে আমদানীর ২০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর রপ্তানি (১৯৪৫ সনে) ৩ গুণ বাড়িয়াছিল। এই হিসাবের মধ্যে ধণ-ইজারা এবং পাল্টা-সাহায্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত মালের আদান-প্রদান ধরা হইয়াছে। নগদ ক্রয়বিক্রয়ের খাতে কিরূপ আমদানী রপ্তানি হইয়াছিল তাহা নীচে দেখান হইল :—

(হাজার ডলার)

	ভারতের রপ্তানি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে)	ভারতের আমদানী (মার্কিন হইতে)
১৯৩৮	৫,৮৩,৭৪	৩,৩৪,৪১
১৯৪২	—	৯,০৫,২১
১৯৪৩	১২,৫৭,৮৪	—
১৯৪৪	১১,০৯,৮৭	—
১৯৪৫	১৪,৯১,৩৩	৬,৯০,৮০

সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় খাতে ১৯৪৫ সনে ভারত হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ২½ গুণ বেশী মূল্যের মাল রপ্তানি হইয়াছিল। আর ১৯৪২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত ১৯৩৮ সনের প্রায় ৩ গুণ অধিক মূল্যের মাল আমদানী করিয়াছিল। যুদ্ধের মধ্যে উভয় দেশেই পণ্যমূল্য কম বেশী বাড়িয়াছিল। সুতরাং মূল্যের হিসাবে বাণিজ্য যতটা বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে আসলে আমদানী ও রপ্তানির পরিমাণ ততটা বাড়ে নাই। তথাপি কিছু যে বাড়িয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গত যুদ্ধপূর্ব যুগে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের মূল্য সবচেয়ে বেশী হইয়াছিল ১৯২০ সনে, সেই বৎসর পণ্যমূল্য খুব চড়া ছিল। ১৯৩৯ সনের পণ্যমূল্যের তুলনায় ১৯২০ সনের পণ্যমূল্য গড়ে প্রায় দ্বিগুণ ছিল।

---

* ১৯৩৭-৩৮ সালের পূর্বে ভারতীয় বাণিজ্যের হিসাবে ব্রহ্মদেশকে ভারতের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

১৯২০ সনে মার্কিন হইতে ভারতে আমদানী মালের মূল্য ছিল প্রায় ১০ কোটি ডলার, আর সে দেশে রপ্তানি মালের মূল্য ছিল ১৭'৬ কোটি ডলার। এ বারের যুদ্ধের মধ্যে কোন বৎসরেই নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের খাতে এত বেশী দামের মাল আমদানী অথবা রপ্তানি হয় নাই।

যুদ্ধোত্তর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য

মার্কিনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য যুদ্ধশেষে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪৫ সনের শেষ তিন মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে নগদ দামে ৪ কোটি ডলার মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছিল। ১৯৪৬ সনের প্রথম তিন মাসে খরিদ করিয়াছিল ৬'৮৪ কোটি ডলার মূল্যের মাল। ভারতও মার্কিন হইতে পূর্বের চেয়ে বেশী মাল খরিদ করিতেছে। ১৯৪৫ সনে সারা বছরে ভারত মার্কিন হইতে নগদ দামে ৬'৯০ কোটি ডলার মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছিল, ১৯৪৬এর প্রথম তিন মাসেই ২'৭৬ কোটি ডলার মূল্যের মাল খরিদ করিয়াছে। আমদানী রপ্তানির উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ থাকা অবস্থায়ই যখন বাণিজ্যের হার বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন বিধিনিষেধ অপেক্ষাকৃত শিথিল হইলে বা উঠিয়া গেলে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও বৎসর দুই ভারত-মার্কিন বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২০ সনে যে আমদানী ও রপ্তানী খুব বাড়িয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মনে হয়, এবারেও আরও দেড় কি দুই বৎসর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য বাড়িয়া চলিবে।

ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে ভারতের উদ্বৃত্ত ডলার

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কি যুদ্ধের মধ্যে কি যুদ্ধপূর্বযুগে সর্বদাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত যত মাল আমদানী করে, মার্কিনের নিকট তাহার চেয়ে অনেক বেশী মাল রপ্তানি করিয়া থাকে। ভারত মার্কিন হইতে যত মাল খরিদ করে, গড়ে তাহার প্রায় দ্বিগুণ মাল মার্কিনের নিকট বিক্রি করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতি বৎসর ভারতের হাতে অনেক উদ্বৃত্ত ডলার জমা হয়। যুদ্ধের সময়ে ব্রিটেন তাহার সাম্রাজ্যের সকল ডলার একত্র জমা করিয়া তাহা সাম্রাজ্যের স্বার্থে সংরক্ষণ করার নীতি গ্রহণ করে, ইহাকেই বলা হয় "ডলার পুল" বা ডলার জমাকরণ নীতি। ডলার-ভাণ্ডারের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত ভারতের পুঁজিপতিরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন, কারণ তাহা না হইলে তাঁহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে খুশিমত যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে পারিতেছেন না এবং শিল্প-প্রসারের একটা সুবর্ণ সুযোগ এই বিপাকে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। ভারতীয় ক্রেতারা ডলার পাইলে মার্কিন যন্ত্রনির্মাতা এবং যন্ত্রব্যবসায়ীদেরও বিশেষ লাভ। ব্রিটেন ১৯৪৬ সনে মার্কিনের নিকট যে ঋণগ্রহণ করিয়াছে তাহার সর্তাদির মধ্যে এ কথাও আছে যে, ঋণ গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যিক ডলার জমাকরণ নীতি ত্যাগ করিয়া ভারতকে মার্কিন যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্ত ডলার ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হইবে। ডলারের বাধা কাটিয়া গেলে মার্কিন হইতে ভারতের আমদানী অনেক বাড়িবে। ডলারের টানাটানির জন্ত বর্তমানে ভারত ইচ্ছানুরূপ মার্কিন মাল কিনিতে পারিতেছে না।

ভারত-মর্কিন বাণিজ্য সামগ্রী

১৯১৩-১৪ সনে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, এবং ১৯৩৯-৪০ সনে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারত প্রধানতঃ কি কি মাল আনিয়াছিল এবং ঐ সব মালের ভারতের মোট আমদানীর কত শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া গেল—

ভারতের আমদানী মালের কত শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছিল—

	১৯১৩-১৪ সনে	১৯৩৯-৪০ সনে
মোটর গাড়ী	১৫'১	৪৭'৯
যন্ত্রপাতি	৩'৩	১৭'০
লোহালক্কড়ের জিনিষ	৯'৭	১৪'১
ধাতব তৈল	৫৬'১	৮'৫
লোহা ও ইস্পাত	২'৬	৬'৯
কাগজ, পেষ্টবোর্ড ইত্যাদি	—	৬'৭
কার্পাসজাত দ্রব্য	০'৪	০'৩

(১৯১৩-১৪ সনের হিসাবে ব্রহ্মদেশকে ভারতের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে।)

উক্ত দুই সালে ভারত হইতে প্রধানতঃ কি কি মাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হইয়াছিল এবং এই সমস্ত মালের মোট রপ্তানির কত শতাংশ মার্কিনে গিয়াছিল, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল।—

ভারতের মোট রপ্তানির কত শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল—

	১৯১৩-১৪ সনে	১৯৩৯-৪০ সনে
পাটজাত দ্রব্য	৪১'৫	২২'৮
কাঁচা চামড়া	২৪'৩	২০'১
কাঁচা পাট	১১'৯	১০'২
কাঁচা তুলা	—	৩'৯
চা	০'৭	৩'১
তৈল-বীজ	১'২	৩'০

(১৯১৩-১৪ সনের হিসাবের মধ্যে ব্রহ্মদেশকে ভারতের অন্তর্গত ধরা হইয়াছে।)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, ১৯৩৯-৪০ সনে, ভারতে যত মোটরগাড়ী আমদানী হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের কিছু কম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছিল। যন্ত্রপাতির মোট

আমদানীর এক-ষষ্ঠাংশের বেশী এবং লোহার জিনিষেরও প্রায় এক-সপ্তমাংশ মার্কিন হইতে আসিয়াছিল। এ ছাড়া খাদ্য তৈল, লোহা ও ইস্পাত এবং কাগজ প্রভৃতির মোট আমদানীর উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আনা হইয়াছিল।

১৯৩৯-৪০ সনে ভারত হইতে যত পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। কাঁচা চামড়ার এক-চতুর্থাংশ রপ্তানি হইয়াছিল মার্কিনে। কাঁচা পাট রপ্তানীর এক দশাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিল। কাঁচা তুলা, চা ও তৈল-বীজের যথাক্রমে ৩·৯ শতাংশ, ৩·১ শতাংশ এবং ৬·০ শতাংশ সে দেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

১৯৪৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতে নগদ দামে যে সব জিনিষ আমদানী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান। (ইহাদিগকে আমদানী মূল্যের ক্রমানুসারে সাজান হইল)*

	(লক্ষ ডলার)
রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী	১৫১ (২২·৫)
(১) আলকাতরা জাত দ্রব্য (তন্মধ্যে রং প্রধান)	—
রং	৯·৬
(২) ঔষধপত্র	—
(৩) সাবান ও প্রসাধন দ্রব্য	—
যন্ত্রপাতি :	১·০৫ (১৫)
(১) শিল্প কারখানার যন্ত্র	৭৪
(২) বৈদ্যুতিক যন্ত্র	২৫
(৩) কৃষি-যন্ত্র	৫·৭
তামাক :	৯৬ (১৪)
খাদ্য-দ্রব্য :	—
কাগজাদি :	৪৬
লোহা ও ইস্পাতের জিনিষ :	১০
উন্নত ধরণের লোহা ও ইস্পাতের জিনিষ :	২০
মোটর গাড়ী :	১৪

১৯৪৫ সনে ভারত মার্কিনের নিকট যে সব জিনিষ বিক্রী করিয়াছিল তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির রপ্তানির হিসাব নীচে দিলাম। ইহাদিগকে রপ্তানিমূল্যের ক্রমানুসারে সাজান হইল।†

	লক্ষ ডলার
পাট ও পাটজাত মাল	৭,৩০ (৪২)
চা	১,৫৯ (৯)
কেশু নাট	১,৫৭ (৯)
কাঁচা চামড়া	৭৮
তুলা	৬৫
কার্পেটের পশম	৬৩
গাভ গালা (শেলাক)	৪৮
অভ্র	৩৮
লাক্ষা বা গালা	২৪

১৯৪৫ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে যে সকল মাল আমদানী করিয়াছিল, তাহা মার্কিনের সমুদয় আমদানীর ৪·২ শতাংশ মাত্র। কিন্তু ভারত হইতে এমন কতকগুলি জিনিষ সেদেশে রপ্তানী হয়, যেগুলি ভারত ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই প্রকারের ৮ রকম মাল আছে। এ ছাড়া আরও ১৫ রকম মাল আছে, এইগুলির চার-পঞ্চমাংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত হইতে আমদানী করিয়া থাকে। মার্কিনের নিকট ভারতের মালের প্রয়োজন খুব বেশী। পাট ও পাটজাত দ্রব্য লাক্ষা, গাভ গালা, অভ্রের কিশ্ম, ইলমেনাইট, কেশু নাট, কেশু নাটের তেল এই সব জিনিষে ভারতের একচেটিয়া অথবা প্রায় একচেটিয়া কারবার রহিয়াছে।

* মোট আমদানীর কত শতাংশ তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইল।

† মোট রপ্তানীর কত শতাংশ তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেখান হইল।

আলোচনা

"মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতিতে নিয়োগ"

মাননীয়
শ্রীযুক্ত "প্রবাসী" সম্পাদক
মহোদয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, এই ভাদ্র মাসের "প্রবাসী"র 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (পৃ. ৪২২-৪২৩) মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতির পদগুলির নিয়োগ ব্যাপারে আপনি আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, "...সবগুলিতে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছে ইহা কি তিনি বলিতে পারেন ?"

বাস্তবিকই সবগুলিতে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হয় নাই। আপনাদের, বাহিরের লোকের, কাছে আমার দপ্তর সম্বন্ধে আমি দায়ী বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমার দপ্তরেও আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল না। ইতি

বিনীত
শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

ঘরে-বাইরে

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। কাব্য করিব না। করিবার মত মানসিক অবস্থাও নয়। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খল আবহাওয়ার বিপাকে পড়িয়া প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছি। তদুপরি দেহযন্ত্রটিও বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দোষ দিব না। পেটের ভাত, পরণের কাপড়খানাও যার নিয়মিত যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি না তার কাছে এ ছাড়া আর কি আশা করা যায়। দেড়শত বৎসরের দাসত্ব শৃঙ্খল সে পায়ে পরে নাই। মিথ্যার কুহেলিকায় তাই সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে নাই। দাবি তার রুদ্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে—যে দাবি তার বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত অপরিহার্য্য। ঐ দেখুন কি কথায় কোন্ প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছি।

সন্ধ্যাটি আষাঢ়ের। স্থান আমার এক এবং অদ্বিতীয় শয়ন অথবা বাহিরের ঘর। তাস খেলিতেছিলাম। খেলা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় সদরের কড়া নাড়ার শব্দ এবং সেই সঙ্গে দরজা খোলার আদেশ আসিল। যিনি আসিয়াছেন তিনি বর্ত্তমানে আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী—বাড়ী-ওয়ালি। খেলাটি অবশ্যই দানা বাঁধিয়াছিল নহিলে এত বড় দুঃসাহস আমার নিশ্চয় হইত না। কহিলাম, এদিকের দরজা খোলা আছে, আসুন না।

প্রত্যুত্তরে কঠিন প্রতিবাদ আসিল। আমার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। যেহেতু এতগুলি পুরুষ মানুষের উপস্থিতি আমি উপেক্ষা করিয়াছি। তিনি যে এতক্ষণ বহু রাস্তাঘাট ঘুরিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন এ কথাটা প্রায় ভুলিয়া গেলাম। বরং প্রতিবাদ না করিয়া অভিযোগটা নিঃশব্দে মানিয়া লইয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে দরজা খুলিয়া দিয়া চোখের পলকে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি আর একবার মধুর কণ্ঠে আপ্যায়ন করিয়া সশব্দে উপরে উঠিয়া গেলেন। তাঁর ক্রুদ্ধ পদশব্দ যেন নূতন করিয়া জানাইয়া দিল যে, এইখানেই শেষ নয়। যাঁহার আসিবার আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন কিন্তু আমাদের জমাট খেলাটি একেবারে মাটি হইয়া গেল। কিন্তু সেজন্ত বিশেষ দুঃখিত হইলাম না। উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম ইহার পরিবর্ত্তী পরিস্থিতির জন্ত।

অনিল আমার মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, একেবারে কেনা ভৃত্য দেখ ছি।

আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, সবিনয়ে কহিলাম, একটু আস্তে ভাই। এ বাড়ীর দেয়ালগুলোর পর্য্যন্ত কান আছে। তা ছাড়া ঐ সদর দরজা খোলা-বন্ধর চুক্তিতে এই কামরাখানি পেয়েছি। আমাকে আশ্রয়চ্যুত ক'র না অনিল।

অনিল তিক্ত কণ্ঠে কহিল, দাসখতও লিখে দিয়েছ তা হলে। তা বেশ করেছ। কিন্তু আইন নেই?—

পুনরায় তেমনি মৃদু গলায় কহিলাম, আছে তা মানি। কিন্তু ব্যবহার করতে জানি না। তা ছাড়া ভদ্রমহিলার মুখে যেন জাত সাপের বিষ। বিচার নেই বিবেচনা নেই অনর্গল যৌবন মেরেই চলেন।

সুশীল একটু হাসিয়া কহিল, এতদিনে নীলকণ্ঠ নামটা তোমার সার্থক হবে। ভদ্রমহিলাটি এ, আর, পিতে চাকরি করেন না?

সম্মতি জানাইলাম।

মণি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। সহসা মুখ খুলিল, তোমাদের সমালোচনা শুনছিলাম। আমি বলি এ তোমাদের অন্যায়। তিনি নিজের বাড়ীতে যদি আব্রু বাঁচিয়ে চলতে চান তাতে বলবার কিছু নেই। বর্ত্তমান যুগে বেঁচে থাকাটাই একটা বড় সমস্যা। পেটের দাবি অন্দর মহলকেও আজ নাড়া দিয়েছে। সখ করে মেয়েরা আরকিছু বাইরে নেমে আসে নি। বাইরের জীবনটাকেই ওদের সত্য পরিচয় বলে সিদ্ধান্ত করায় আর যাই থাক যুক্তি নেই—আন্তরিকতা নেই।

অনিল রীতিমত গরম হইয়া উঠিয়াছে। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। বক্র কণ্ঠে কহিল, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মণি।

মণি হাসি মুখে কহিল, মোটেই নয়। রাস্তায়, ঘাটে, ট্রামে, বাসে এমন অনেক মেয়েকেই দেখা যায়। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি হয়েই তাদের অনেক সময় চলতে হয়। তা বলে এই ব্যবস্থাই তাদের সর্ব্বত্র মেনে চলতে হবে, এমন কি নিজেদের গণ্ডির মধ্যেও এর অন্যথা করা চলবে না, এমন দাবি করতে যাওয়া শুধু অবিচার করা নয়—অন্যায়।

অনিল পুনরায় তিক্ত কণ্ঠে কহিল, সস্তা দামের খোসামুদি—

মণি তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছ অনিল, নইলে একটু ভেবে দেখলেই আমার কথাটা বুঝতে পারতে। শুধু বড় গলায় চিৎকার করে সমস্যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বরং আরও জটিল হয়ে উঠে। ভারতবর্ষ আজও বিলেত হয় নি। তার নিজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এ দেশের মেয়েরা খুব সাধারণ কারণে বাইরের জগতে বেরিয়ে আসে না। নিতান্ত প্রয়োজনেই আসতে হয়। তাই পুরোপুরি বাইরের জীব ওরা হয়ে উঠতে পারে নি। এর মূলে রয়েছে ওদের রক্তের ধারা। সামাজিক জীবনের সহজ অভ্যাস। এতে রাগ না করে আমাদের বরং খুশী হওয়া উচিত।

মণি একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমাকে তোমরা সবাই

জান। আমার বর্ত্তমান এবং অতীত জীবনে এতটুকু গোঁজামিল নেই। তা প্রকাশ করতেও তাই আমার কোন সঙ্কোচ নেই। আমার অতীত জীবনের সঙ্গে আজকের ঘটনার বড় সুন্দর একটা সঙ্গতি দেখা দিয়েছে তাইতেই তোমাদের বাধা দিচ্ছি নইলে কাউকে আঘাত করা কিংবা খোসামোদ করবার অভিপ্রায় আমার নেই। লাভও নেই।

অখিল এবারে আর প্রতিবাদ করিল না। মণি রায় বলিয়া চলিল, আমার বর্ত্তমানের ধোপদোরস্ত ভদ্র চেহারার সঙ্গেই তোমাদের পরিচয় ঘটেছে। এর অন্তরালে যে আমার আর একটা বৃহৎ কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত হয়ে গেছে সেই কথাই তোমাদের বলব।

প্রথম শহরে এসে পা দিলাম মনে একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা এবং মনের আড়ালে একটা মিথ্যা অহমিকা নিয়ে। আমি শিক্ষিত, ভদ্র, আমি সজ্জন। পূর্ব্বপুরুষের জমিদারীর উষ্ণ রক্তের স্রোত আমার দেহের এবং মনের অলিতে-গলিতে। আমার বংশের অভিমান চিত্তকে রেখেছিল আচ্ছন্ন করে। জীবনযাত্রার মূলধন হিসাবে এর যথার্থ ধারণা আমার ছিল না। যার ফলে পদে পদে এল বাধা। যা জীবনের গতিকে ভিন্ন পথে চালিত করলে। কোথাও প্রবেশপথ পাই না। কর্ম্ম-প্রার্থী আমি। কাজের সন্ধান নাই অথচ যাচাই ক'রে এবং বাছাই ক'রে নেবার সে কি অত্যুগ্র বাসনা। অর্থ নেই— সামর্থ্য ঠেলে নিয়ে চলেছে ভুল পথে। কথাটা বুঝেও ঠিক গ্রহণ করতে পারি নি। হানা দিলাম বড় বড় লোকের বাড়িতে পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করতে। বিফল হয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের অমূদার ব্যক্তিত্বের কাছে নতি জানিয়ে। কতই বা বয়স তখন আর কতখানিই বা অভিজ্ঞতা। বক্তৃতায় তারা সর্ব্বসাধারণের, প্রয়োজনে কারুর নয়—কথাটা বুঝে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করি নি। ফিরে এসেছি। আরম্ভের বিফলতায় মনটা তিক্ত হয়ে ওঠে। হিসাবে গোল বাধিয়েছি কথাটা বুঝলেও মন মানতে চায় না। শিল্কে কমা আদ্দি পাঞ্জাবীর মোহ তখনও আমার অত্যন্ত প্রবল। অথচ চোখের সম্মুখে মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়াদের গগনচুম্বী অট্টালিকাগুলি সার বেঁধে আমায় ব্যঙ্গ করে। নিজের সঙ্গে চলল আমার ঘোরতর যুদ্ধ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সে যুদ্ধে হেরে গেল আমার আজন্মের সংস্কার···আমার বংশের দম্ভ, মিথ্যা অহঙ্কার। বেঁচে থাকার দাবি বড় হয়ে দেখা দিল। মিহি ছেড়ে মোটায় এলাম। পাঞ্জাবী ছেড়ে ফতুয়া। সুরু হ'ল বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ওরা পারছে আমি কেন পারব না? কিন্তু সম্বল? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি। বিবেক গর্জ্জে ওঠে, বলে, আত্মবিশ্বাস। আমি তলিয়ে গিয়েও কূল পেলাম। মণি রায় নবজন্ম লাভ করলে মনোহর ফেরিওয়ালা রূপে। শহরের ছোট বড় নানা পল্লীতে মনোহরের আবির্ভাব হ'ল কাপড়-ফেরিওয়ালার বেশে।

মণি রায় থামিল। আমি বিস্মিত চোখে তার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। মানুষের জীবনে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। নইলে বর্ত্তমান মণি রায়কে দেখিলে তার কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু আমার মন বলিল, সে মিথ্যা বলে নাই। অভাবের সহিত সত্য পরিচয় যাহার ঘটিয়াছে সে জানে তার জ্বালা। মণি রায়কে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, তারপর?

মণি রায় পুনরায় আরম্ভ করিল, মনোহরের নূতন জীবন-যাত্রায় পদে পদে ছন্দ কেটে যেতে লাগল। মণি রায়ের আজন্মের সংস্কার তাকে ভুলপথে চালাতে চায়। পেটের দাবি চোখ রাঙিয়ে ধমক দেয়, সাবধান। সাবধান মনোহর যথেষ্টই হয়েছিল, নহিলে মণি রায়কে আজ তোমাদের মধ্যে পেতে না। সত্য বলতে কি, আমার নবজন্মের নূতন অভিজ্ঞতায় আমি স্তম্ভিত এবং বিস্মিত হলাম। শুধু পয়সাই সব নয়। আমার ভদ্রবেশ যেখানে কোন দিন প্রবেশ অধিকারও পায় নি সেই সব দুরতিক্রম্য স্থান থেকে আসতে লাগল সাগ্রহ আহ্বান। অন্দরমহল তাদের স-গোষ্ঠীর মর্য্যাদা দিলে। কোন অন্তরাল নেই কোন সঙ্কোচের বালাই নেই।

এতক্ষণে অখিলের মুখে হাসি দেখা গেল।

মণি কহিল, হাসির কথা নয় অখিল। একেবারে নিছক সত্য। অনেক সময় আমি নিজেকেই ভুলে যেতাম। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগত। কাপড়ের দাম নিয়ে দর কষাকষি—তার বুনোট নিয়ে সন্দিগ্ধ প্রশ্ন, কোথাও আসল ছেড়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, এমনি বহু সমস্যা এসে একের পর এক পথ রোধ করে দাঁড়ায়। কখনও অনভ্যস্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছি—সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হয়েছি, কখনও অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছি। পরমুহূর্ত্তে অসৌজন্যের জন্য মাপ চেয়েছি। এ পথে নূতন ব্রতী কি না—এ প্রশ্নও বহু স্থানে উঠেছে। মোটের উপর আমাদের যে জাত আলাদা এ তথ্যটা জানতে এবং তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে বেশ কিছু সময় লাগল। স্থান কাল পাত্র বিশেষে না, বৌদি অথবা দিদিমণি এমনি নানা বৈষয়িক বুলি আয়ত্ত করে নিলাম। ব্যবসাটা জমে উঠল।

পশ্চিমবাসীদের লোটাকম্বলের ইতিবৃত্ত শোনা থাকলেও ঠিক বিশ্বাস করতাম না। বাঙালী—চাকুরিটাকেই জীবনের চরম এবং পরম প্রাপ্তি ব'লে জেনে এসেছি। তার উপর ঐকান্তিক টানও আমার ছিল। কাজেই এই অবিশ্বাসের মূলে সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু আজ সে দিনের গল্প আমার কাছে জীবন্ত সত্য।

অদৃষ্টবশে এমন দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি যেখানে মানুষ অনাহারে দিনে দিনে তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে জানে কিন্তু কেড়ে নিতে জানে না। বাঁচবার দাবি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে তারা শেখে নি। শত শত বছরের গোলামীর

নাগপাশ হাড়গোড় সব চূর্ণ করে দিয়েছে। অটুট আছে শুধু খোলসটা। কোন সত্য মূল্যই তার নেই। অথচ তাকেই সাজপোষাক পরিয়ে নিজেদের দুরবস্থা ঢাকার কি চমৎকার আমাদের অপপ্রয়াস।

অনিল অকস্মাৎ বাধা দিল, কহিল, বড় বেশী অনাবশ্যক সাহিত্য করছ তুমি।

মণি তেমনি হাসিমুখে কহিল, ওটা আমার দোষ নয় অনিল। বাংলাদেশের জলবায়ুর ছোঁয়াচে ব্যাধি। তারপর শোন: ব্যবসাটা অল্প দিনেই বেশ রপ্ত হয়ে গেল। মা, বৌদি, অথবা দিদিমণি সম্ভাষণের অমোঘ ফল হাতে হাতে মিলল। লাভের অঙ্ক দিনে দিনে কেঁপে উঠতে লাগল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ুর বড় বড় অট্টালিকাগুলি আমার স্বস্তি দেয় না। সার বেঁধে চোখের সম্মুখে নৃত্য জুড়ে দিলে। নাচে ভাটিয়া, নাচে মাড়োয়ারী, নাচে আমার বুকের উষ্ণ রক্ত। চোখের সম্মুখে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে এক বিরাট কল্পিত ভবিষ্যৎ। যাকে আমি গড়ে তুলবই। সারা দেহে একটা উত্তেজনার কম্পন অনুভব করি। গা ঝাড়া দিই। মাথার বোঝা ছিটকে পড়ে। চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে মাড়োয়ারীর গদি—মিলের চোঙ। তার থেকে ঊর্দ্ধমুখী ধূম্রজালের বিসর্পিল গতি। অগণিত শ্রমিকের কর্ম্মব্যস্ত কোলাহল। তোমরা হেস না। আমার কল্পনার গতি আরও বহুদূরে অগ্রসর হয়ে যায়। যেখানে গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। যেখানে মানুষের বুদ্ধি আর কর্ম্মকুশলতা ভগবানের অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে প্রবৃত্তি জাগায়। নিজেকে নিজে ধমক দিলাম। অলস কল্পনা করাও বিলাস। বিলাসিতা আমি ত্যাগ করেছি; তা ছাড়া আমি ফেরিওয়ালা। সম্মুখে পড়ে আছে আমার মাথার বোঝা। এত বড় প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করি কেমন করে! মাথার বোঝা তুলে নিয়ে পথ চলি। দিন চলে যায়। কিন্তু ব্যাঙ্কের জমার অঙ্ক আমাকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম দেয় না। কল্পনা এবং বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা মনের মাঝে প্রচণ্ড আলোড়ন জুড়ে দেয়। সে বিপুল আলোড়নে মনোহর ফেরিওয়ালা তলিয়ে যায়। মৃত মণি রায় পুনরায় নূতন জীবন এবং নবতম কর্ম্মপ্রেরণা নিয়ে বেঁচে ওঠে মনোহরের অধ্যবসায় এবং সাধনার জোরে।

অনিল গর্জ্জন করিয়া উঠিল, হামবাগ—

পদে পদে অনিলের এইরূপ অসহিষ্ণু উক্তি আমার ভাল লাগে না। একটু তিক্ত কণ্ঠেই কহিলাম, তোমার এই ধরণের অশিষ্টতা অমার্জ্জনীয়। কথাটা বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হ'ল।

অনিল দমিল না। সমান ওজনে কহিল, তোমরা সবাই সমান—

আমি পুনরায় একটা রূঢ় জবাব দিতে উদ্যত হইতেই মণি আমাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিল এবং অনিলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, নীলকণ্ঠ তোমার উপর অসন্তুষ্ট হলেও আমি হইনি। আমার বিগত দিনের ইতিহাস আমার নিজের কাছেও মাঝে মাঝে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়। জীবনে এক দিন ঝড় উঠেছিল যার প্রচণ্ডতা আমার মনের অনাবশ্যক বাধাকে চিরদিনের জন্য বিনাশ করেছে। তাইতেই তথাকথিত লজ্জা-ভয়-মান-সম্ভ্রম সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে পেরেছি। তা ছাড়া আমাদের জীবনধারণের সমস্যা আজ এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যাকে কতকগুলি বাজে যুক্তি দিয়ে আর কোনমতেই ঠেকিয়ে রাখা উচিত নয়। যে অসার যুক্তি এবং অনাবশ্যক সঙ্কোচ আর্থিক জগৎ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে তাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার ক'রে অন্য জাতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে। আমরা তারই কিঞ্চিৎ কৃপা-প্রার্থী হয়ে তাদের দুয়ারে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকি। তবু কুটীর মোহ ত্যাগ করব না।

অনিল পুনরায় শ্লেষ করিল, নীলকণ্ঠের পাঠশালার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হউক।

অনিলকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া আমি মণিকে কহিলাম, অনিলের হয়ে আমি দুঃখিত কিন্তু তুমি থেম না। বল।

মণির এতটুকু ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। সে হাসিমুখে বলিয়া চলিল, বড় করে ব্যবসা সুরু করলাম এবং যাদের অনুকম্পা, সহৃদয়তা আমি জীবনের সত্যিকারের প্রারম্ভে পেয়েছিলাম তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান কর্তব্য বলেই মনে হ'ল।

কাগজে কাগজে দিলাম বিজ্ঞাপন। ছাপালাম নিমন্ত্রণ-চিঠি; নিজেই তা বহন করে নিয়ে চললাম আমার গ্রাহক, অনুগ্রাহকদের বাড়ী। আমার নূতন কর্ম্মক্ষেত্র তাদের পদধূলি পেয়ে ধন্য হয়ে উঠুক। কিন্তু আমার প্রধান এবং বিশিষ্ট গ্রাহকের বাড়ী থেকে যে ভাবে অভ্যর্থনা পেলাম তাতে বড় ব্যথা পেলাম। আমাদের মত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দুরবস্থা আর একবার নূতন করে উপলব্ধি করলাম।

জাষ্টিস্ মিঃ সেনের বাড়ীতে আমার প্রথম অভিযান। প্রবেশ পথে বাধা পেলাম। পাঁড়েজি গর্জ্জন করে উঠল। মুখ ফেরাতেই সে উচ্চরবে হেসে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বললে, আরে—ইয়ে তু মনোহর ভাইয়া? মায় সোঁচা কোই বাঙ্গালী ভদ্দরবাবু আছে।

ভগ্ন একটু বিশেষভাবেই হয়েছিলাম। কথাটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই ব'লে এমন পরিস্থিতির জন্যও প্রস্তুত ছিলাম না। প্রবেশ-অধিকার মিলল। কিন্তু অন্দরের প্রবেশ-পথে আর এক বিভ্রাট বাধল। মিঃ সেনের পুত্রবধূ বাইরের ঘরেই ছিলেন। আমার আবির্ভাব তাঁকে ত্রস্ত ক'রে তুলল। ভাল করে একবার চেয়েও দেখলেন না। অস্ফুট একটা শব্দ করে চকিতে পর্দার আড়ালে সরে গেলেন। মুখে আমার ভাষা যোগাল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলাম। অথচ আমি জানি এঁদের আসা-যাওয়া বড় বড় সমাজে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সকলের সঙ্গেই এঁরা সমান ভাবে মেলা-মেশা করেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেন। কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডীর একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই। সকলেই ওরা সচেতন।

পর্দার আড়ালে মিসেস্ সেনের কণ্ঠের ব্যঞ্জনা কানে এল। পাঁড়েজি কি ঘুমিয়ে আছে নাকি? চাকর-বাকরগুলোই বা কোথায় গেছে। পর্দার আড়ালে অনেকগুলি নারীকণ্ঠের উত্তেজিত কথাবার্তা আমার কানে এল এবং পর মুহূর্তেই মিসেস্ সেনের মুখ পর্দার আড়াল থেকে দেখা দিল। আজ কিন্তু আর সহজ কণ্ঠের মা অথবা বৌদিমণি সম্ভাষণ মুখে এল না। আনাড়িকে কথা ক'য়ে উঠলাম। মিসেস্ সেন সশরীরে প্রকাশ পেলেন। সেই সঙ্গে দেখা দিলেন তাঁর পুত্রবধূ এবং মেয়েরা। সকলের মুখেই কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়। মিসেস্ সেন এক মুখ হেসে বললেন, তাই বল—তুমি আমাদের মনোহর। মীরা কোন ভদ্রলোক ভেবে অমন করে সরে গিয়েছিল। তিনি একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। অথচ এর সত্যিই কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

এক মুহূর্তে রাশি রাশি প্রশ্ন মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললে। ভদ্রলোকের সহজ প্রবেশ অধিকার যখন এখানে নেই তখন দাঁড়িয়ে এদের আলোচনার ইন্ধন যোগাই কেন। একটা প্রবল অস্বস্তি নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এলাম। মধ্যবিত্ত জীবনের আর একটা দিক সত্যরূপে দেখা দিল। যারা মানব সমাজের যথার্থ মেরুদণ্ড।

মণি রায় থামিল।

রাগটা অনিলেরই কিছু বেশী, পুনরায় সে প্রতিবাদ করিল, এ অবিশ্বাস্য।

কিন্তু মণি রায় সে প্রতিবাদ গায়ে মাখিল না। সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং এতক্ষণের বাগ্‌বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অনিল উগ্র দৃষ্টিতে তার অপস্রিয়মান মূর্তির প্রতি চাহিয়া রহিল।

বলিবার কথা ছিল

শ্রীকরুণাময় বসু

কুয়াশা জড়ানো চাঁদ, হিমে ভেজা ঘাস,
তুমি আমি আছি বসে মায়াময় রাতের আকাশ।
জোনাকির ঝিকিমিকি, ঝিলিমিলি এই নদীজল
রূপালি সুতোয় বোনা পরীদের জরীর আঁচল;
মনে হয়, চাঁদ নয়, সোনার কুসুম,—
হাওয়ার সুবাস আসে, চোখে মুখে ভেঙে আসে ঘুম,
চাঁদ নয়, সোনার কুসুম।

আমি যেন ঝরাপাতা বনের হাওয়ায়
এলোমেলো উড়ে যাই বনের ছায়ায়,
উড়ে যাই পাহাড়ের গায়;
তুমি যেন নীল পাখী, ভীরু মমতায়
খড়কুটো, ফুলশাখা, লতায় পাতায়
একখানি ছোট নীড় রচিতে কি চাও?
আমার এ ঝরাপাতা সাথে নিয়ে যাও।

হয়তো বা যেতে দিতে হবে,
যাযাবর বুনো পাখী উড়ে যাবে দূর নীল নভে,
আজিকার ফুলশাখা, বাঁকা চাঁদ মনে নাহি রবে;
হয়তো বা যেতে দিতে হবে।

এখনো সময় আছে, আছে চাঁদ, কোয়েলিয়া ডাকে কুহু কুহু,
ফুলের লতায় কাঁপে মৌসুমী বায়ু;
নদীর স্রোতের মতো ঝরে যায় সময়ের আয়ু,
এখনো সময় আছে, কোয়েলিয়া ডাকে কুহু কুহু।
তার পর যাবে কতো কাল,
মাঠের ঘাসের শীষে পাতা রবে শিশিরের জাল,
কুয়াশা নিমীল চোখে চেয়ে রবে শীতের সকাল,
তার পর যাবে কতো কাল।

তুমি যাবে ওই পারে, আমি এই পারে,
কান পেতে বসে রবো স্মৃতির দুয়ারে;
আজিকার চেনা মুখ মুছে যাবে কালের আঁধারে,
সেদিন কি মনে রবে কতো কথা বলেছিনু তারে?
আজিকার ফুলরাখী, বাঁকা চাঁদ, এই হাসি গান
সেদিন রবে না মনে এ রজনী হলে অবসান;
চামেলির ঝরাপাতা উড়ে যায়, চাঁদ বলে, তবে যাই, যাই;
বলিবার কথা ছিল,
এ জীবনে যে কথাটি কভু বলি নাই।

সমুদ্রের জল হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি

যে-কোনও আধুনিক শিল্পেরই, বিশেষ করিয়া রাসায়নিক শিল্পের পক্ষে সুলভ ও অপর্য্যাপ্ত কাঁচামাল ব্যতীত পাথুরিয়া কয়লা সঞ্জাত শক্তি বা বৈদ্যুতিক শক্তি, নির্দিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ও কেমিষ্ট এবং শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুত, প্যাক প্রভৃতি করিবার জন্য স্বাস্থ্যবান সুদক্ষ কারিগর বা কর্ম্মীশ্রেণীর আবশ্যক। কোনও দেশে কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট হইলেও উহার ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়; পক্ষান্তরে, পাথুরিয়া কয়লা আজকাল বহুবিধ অধুনাবিকশিত রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য্য কাঁচামালরূপে পরিগণিত হওয়ায় পাথুরিয়া কয়লাকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণরূপে যত কম ব্যবহার করা যায় ততই সেই দেশের কল্যাণ হয়। এই কারণেই নদনদীর জলস্রোত-সাহায্যে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার সকল দেশেরই প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্যের মেটুরে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, ফলে সেখানে রাসায়নিক শিল্পেরও সূত্রপাত হইয়াছে। বাংলাদেশের দামোদর পরিকল্পনা লইয়া শ্রদ্ধেয় ডক্টর মেঘনাদ সাহা মহোদয় অক্লান্ত চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। তবে দেশে বর্ত্তমানে উপযুক্ত সংখ্যক সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও অনেক প্রকার আবশ্যকীয় উপকরণের অভাবনিবন্ধন ঐ পরিকল্পনা কবে যে কার্য্যে পরিণত হইবে তৎসম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু বলা যাইতেছে না। উত্তর বঙ্গের তিস্তা পরিকল্পনারও ঐ একই অবস্থা। আজ আমি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি তাহার বিকাশ ও সাফল্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বৈদ্যুতিক শক্তির পরেই আসে জনশক্তির কথা। রসায়ন-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসম্পন্ন লোক বাংলাদেশে নিতান্ত অল্প নাই—প্রধান অভাব হইতেছে রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়রের। আমাদের দেশে যে রাসায়নিক শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই—ইহা তাহার অন্যতম কারণ। শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অতিশয় অনুন্নত বলিয়া সকলেই শুনিয়া থাকি। আমরা যে এই বিষয়ে কতদূর অনগ্রসর ভারতের পেটেন্ট বিভাগের কনট্রোলার দেওয়ান বাহাদুর রাম পাই-এর *The Patent System and its Role in India* নামক সদ্যপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ১৯৩০-১৯৩৭ সালে পৃথিবীর কোন্ দেশে গড়পড়তা বার্ষিক কত পেটেন্ট লওয়া হইয়াছে উক্ত পুস্তিকা হইতে নিম্নে লিখিত হইল:

দেশ	গড়পড়তা বার্ষিক গৃহীত পেটেন্ট
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪৮৬৯৭
জার্মানী	২০৬২১
ফ্রান্স	২০০২৫
গ্রেট ব্রিটেন (১৯৩০-৩৫)	১৮৪১৭
ইটালি	১০৬৩৪
বেলজিয়ম	৭৩১৫
সুইজারল্যাণ্ড (১৯৩০-৩৬)	৭৩০৭
জাপান	৪৮৪৫
জেকোস্লোভেকিয়া	৩৬১৩
ভারতবর্ষ	৮৯৮

কোনও দেশে যত পেটেন্ট দেওয়া হয় তাহার মধ্যে বিদেশী লোকেরাও উহা লইয়া থাকেন। নিম্নে কয়েকটি দেশের শতকরা দেশী ও বিদেশী পেটেন্টের উল্লেখ করা হইল।

দেশ	শতকরা কত পেটেন্ট দেওয়া হইয়াছে	
	দেশের লোককে	বিদেশীদিগকে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮৬.৮%	১৩.২%
জার্মানি	৭৪.২%	২৫.৮
ফ্রান্স	৭০.১	২৯.৯
গ্রেট ব্রিটেন (১৯৩০-৩৫)	৪৮.৩	৫১.৭
জাপান	৭৬.০	২৪.০
ভারতবর্ষ	১০.০	৯০.০

প্রথম তালিকায় পেটেন্ট ক্ষেত্রে ভারতের স্থান যে শোচনীয় ভাবে সর্ব্বনিম্নে তাহা দেখা গেল এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, বার্ষিক প্রদত্ত ১ শত পেটেন্টের মধ্যে ১০টি মাত্র ভারতীয়দের নিজস্ব। পেটেন্ট যে-কোনও দেশেরই শিল্পোন্নতির মাপকাঠি। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে আমাদের স্থান উক্ত তালিকায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের জন্য সুদক্ষ কর্ম্মিশ্রেণীরও অভাব বিদ্যমান। তথাকথিত উচ্চবর্ণের দরিদ্র ব্যক্তিরাও এখন পর্য্যন্ত হাতের কাজের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকেদের পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে অপরিপুষ্ট দেহ ও প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে অগঠিত মন ও অপরিণত নৈতিক চরিত্র তাহাদের কর্ম্মশক্তির বিকাশ ও কর্ম্মোদ্যমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতেছে। কাজেই এরূপ শ্রমিক সস্তা হইলেও শ্রম সুলভ নয়। অন্যান্য দেশের

শ্রমিকের তুলনায় ইহাদের পারিশ্রমিক হয়ত এক চতুর্থাংশ, কিন্তু অন্যদেশের শ্রমিকদের তুলনায় ইহারা কাজ দেয় এক অষ্টমাংশ। জার্মানির রাসায়নিক শিল্পের গোড়ার ইতিহাসে দেখা যায়, সে দেশে কারখানাসংলগ্ন আবাসে শ্রমিকদিগের সপরিবারে বাস করিবার ব্যবস্থা আছে। তাঁহাদের চিকিৎসার ও স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক ব্যবস্থা, পুত্রকন্যাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কাজ করিতে করিতে আকস্মিকভাবে কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও পুত্র-কন্যাদের সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত শিক্ষাদান প্রভৃতির ও বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য কর্মীদের পেনসনের ব্যবস্থাও শিল্প-প্রতিষ্ঠানই করিয়া থাকেন। সকল কর্মীকেই সামরিক শিক্ষা ও নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ফলে, শ্রমিকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে শিল্পোন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ায় নির্দিষ্ট শিল্পপরিচালনায় ক্রমশঃ সুদক্ষ হইয়া উঠিতে থাকেন। আমাদের দেশে বর্তমানে অধিকাংশ শ্রমিকই আসে গ্রামের একান্নবর্তী চাষী পরিবার হইতে। গ্রামে থাকেন তাঁহাদের বাবা মা, ভাইবোন ও স্ত্রীপুত্র। দেশে জোতজমা তাঁহাদের থাকে; সুতরাং জার্মানীর মত ব্যবস্থা করিলেও আমাদের অধিকাংশ শ্রমিকের পক্ষেই শহরে স্ত্রীপুত্র লইয়া আসা আপাততঃ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং যে সব শ্রমিক-নেতা বিদেশের শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের শ্রমিকদের তুলনা করিয়া অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়াস পান তাঁহাদিগের উভয় দেশের সমাজ-ব্যবস্থার দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্নতার দরুন আমাদের শ্রমিকদিগের একটি নির্দিষ্ট আয়ের বেশী আয় বর্তমানে তাহাদের বিপথগামিতার পাথেয় হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য কারিগরি কার্য্যে দক্ষ যে অল্পসংখ্যক শ্রমিক এখন সহরের উপকণ্ঠে সপরিবারে বাস করেন কারখানা-সংলগ্ন স্বাস্থ্যকর আবাস পাইলে তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করিয়া অধিকতর কর্মনৈপুণ্য লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের দেখাদেখি আরও শ্রমিক এইরূপ আবাসের সুবিধা গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন। আমাদের জাতীয় চরিত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভাবও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে সত্যিকারের ইউনিয়নও আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই। ফলে, কর্মিসম্প্রদায় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান উভয়কেই যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

দেশের শিল্প-সংগঠন ও সংরক্ষণে রাজনীতিকদেরও গুরু দায়িত্ব বিদ্যমান। আইনের সামান্য গলদে দেশীয় শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। এজন্য আইন-সভায় শিল্প সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহাদের নির্বাচন বাঞ্ছনীয়। অধুনা-লুপ্ত অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, শিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি (মহম্মদ লিয়াকৎ আলি খাঁন) কর্তৃক রচিত হওয়ায় দেশের শিল্পসম্প্রসারণের পক্ষে উহা পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাজেটের সমালোচনায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত ভবাব কারনেটভি দ্রাইভার এ বিষয় যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এস্থলে তাঁহার বক্তৃতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল—

"Wo have experienced the effects of this Budget and they are ghastly. At one fell swoop it has destroyed the confidence of the investing public which had only recently learnt to invest in industries instead of in land and gold; by the insane stepping up of supertax-slabs, it has dried up, savings which would have gone to nourish and fertilize new industries....This perverse Budget spells negation to all our planning....The Assembly that passed the Budget was the Assembly of the yes-men of the Congress and the yes-men of the League hailing mostly from rural areas. These paddy politicians are green with the jealousy about the progress of our industry and the success of our industrialists. This will explain their bias and their vote."

শিল্পের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির সহিত ভাষারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার্য্য। পৃথিবীর কোথায় শিল্প-বিজ্ঞানের কি উন্নতি হইতেছে তাহার দৈনন্দিন খবর রাখিতে এবং সারা পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের আদান-প্রদান করিতে হইলে ইংরেজী ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। যে বাংলাদেশ এখনও পর্য্যন্ত শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পে ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রণী তাহাকে তাহার স্থান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইংরেজী ভাষা ভুলিলে চলিবে না। রাষ্ট্রনেতাগণ ভাষা সম্বন্ধে ভাবাবেগ দেখাইতে পারেন কারণ তাঁহাদের কারবার অধিকাংশ সময়েই দেশের জনগণকে লইয়া। কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প-নায়কগণের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন—তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য কেবলমাত্র ইংরেজীই নয়, পরন্তু জার্মান ও রুশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তিও অনেক ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য। এই সব বৈদেশিক জ্ঞান ও চিন্তাধারায় ক্রমশঃ মাতৃভাষাকেও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে—যাহাতে দেশের জনগণের চিত্তোৎকর্ষ ও কর্মস্পৃহার বিকাশ সাধিত হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এতদিন আই-সি-এস প্রভৃতি পদের গর্ব ও মর্য্যাদার মোহে প্রকৃত প্রতিভাবান ছাত্রেরা বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। ইহাতে দেশের কম ক্ষতি হয় নাই। শিল্পের উন্নতির সহিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে জড়িত, সুতরাং এখন যাহাতে এদিকে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা আকৃষ্ট হইতে পারেন তজ্জন্য দেশের শিল্পপতিগণের যথাবিহিত ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

আর একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় এই যে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, দেশের লোক তৈরি না হইলেও ক্ষতি নাই, টাকা থাকিলেই বিদেশী যন্ত্রপাতি ও টেকনিক্যাল একস্‌পার্ট বা শিল্প-বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া যে কোনও লাভজনক শিল্প দাঁড় করান যাইবে। এ বিষয়ে দেওয়ান বাহাদুর রামশাই তাঁহার পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—

"It must be borne in mind that every country is at present zealously working for its own industrial rehabilitation, and, therefore, it would be not at all easy to obtain the necessary supply of machinery or technical experts."

অর্থাৎ—"ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দেশই বর্তমানে শিল্পবিষয়ে তাহার নিজের ঘর সামলাইতেই বিব্রত রহিয়াছে, সুতরাং এখন বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি বা সুদক্ষ যন্ত্রবিদ্‌ পাওয়া আদৌ সহজসাধ্য হইবে না।"

পক্ষান্তরে শিল্পপ্রধান দেশে গিয়া কোনও নির্দিষ্ট শিল্প সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে নিষেধ না থাকিলেও ঐ পথও যে যথেষ্ট বাধাবিপত্তিসঙ্কুল সে সম্বন্ধেও দেওয়ান বাহাদুর একটি সত্য ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। অথচ তিনি দেশের নাম ইহাতে প্রকাশ করেন নাই। নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

"No stranger was allowed to enter a workshop and no manufacturer was permitted to give any exhibition of, or otherwise to disclose any processes, methods or particular implements. A strict watch was kept on all foreigners entering the industrial area and suspects were rigorously expelled therefrom. Offences against these protective measures were punishable with great severity. In extreme cases the maximum penalty was death."

উদ্ধৃত বিষয় হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, শিল্প-বিস্তারে বিদেশীর বদান্যতার উপর নির্ভর করা আদৌ সমীচীন হইবে না। দেশে ইতিমধ্যে যে-সব কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলিকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া দেশে ইতিমধ্যে যে-সব কারিগর বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্মাণে দক্ষতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্যেই আমাদের দেশীয় শিল্পসম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলাদেশে রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার ও উহার সম্প্রসারণকল্পে প্রোক্ত বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলিয়া এগুলি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল। এখন সমুদ্রজল হইতে বাংলাদেশে কোন্‌ কোন্‌ রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

সমুদ্রজলের প্রধান উপাদান যে আমাদের সাধারণ লবণ তাহা প্রায় সকলেই জানেন। এই সাধারণ লবণ আমাদের জীবন-রক্ষায় যেরূপ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় তেমনি রাসায়নিক শিল্পেরও ইহা একটি অত্যাবশ্যক কাঁচামাল। কারণ এই লবণ হইতেই প্রস্তুত হয় আমাদের কাপড়কাচা সোডা, খাবার সোডা এবং সাবান, কাগজ, কৃত্রিম রেশম ও অন্য অসংখ্য রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বরূপ কষ্টিক সোডা। পক্ষান্তরে এই কষ্টিক সোডা যখন ঘনীভূত লবণ-জল হইতে প্রস্তুত করা হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে দুর্গন্ধ মাছের তেল বা তরল উদ্ভিজ্জ তেল কঠিন, গন্ধহীন দ্রব্যে পরিণত হয়। তদ্ভিন্ন এমোনিয়া ও মিথাইল এলকহল প্রস্তুতকল্পে এবং কয়লা হইতে পেট্রোল উৎপাদনেও হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্লোরিণের ব্যবহারও বহুবিচিত্র। ব্লিচিং পাউডার এনটারোভায়ো ফরম, এটেব্রিণ, প্যালুড্রিন, গ্যাম একসেন, ডি ডি টি, লুমিনাল প্রভৃতি আধুনিক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতকল্পে ক্লোরিনের অসম্ভব চাহিদা বিদ্যমান। যে কার্বলিক এসিড সুপরিচিত ফরম্যালডিহাইড-ফিনোল প্লাস-টিক্‌সের অপরিহার্য্য উপাদান এবং পিকরিক এসিড নামক বিস্ফোরক ও বহুবিধ ঔষধের মূল উপাদান—সেই কার্বলিক এসিড ও বেনজিন হইতে ক্লোরিনের সাহায্যে তৈরী করা হইয়া থাকে। ক্লোরিণের এই সহস্রবিধ ব্যবহারের জন্য উহাকে বর্তমানে 'রাসায়নিক পদার্থের রাণী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এখন সমুদ্রজলের প্রধান উপাদানগুলির কথা বলা যাইতেছে। এক হাজার ভাগ সমুদ্রজলে সাধারণ লবণ থাকে ২৭ ভাগ, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড প্রায় ৪ ভাগ, ম্যাগনেসিয়ম সালফেট দেড় ভাগ, ক্যালসিয়ম সালফেট সোয়া ভাগ, পটাসিয়ম ক্লোরাইড একভাগ এবং ম্যাগনেসিয়ম ব্রোমাইড থাকে দশ হাজার ভাগে এক ভাগ। সমুদ্রজলে অতি সামান্য পরিমাণে আয়োডিনও থাকে। সমুদ্রের জলজ উদ্ভিজ্জে এই আয়োডিন শোষিত হয় এবং সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া উহা পুড়াইলে তাহার ছাই হইতে আয়োডিন প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে সমুদ্রজলে অত্যল্পমাত্রায় স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্রও বিদ্যমান। আমেরিকার সমুদ্রজল হইতে এক সময়ে স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। বলা বাহুল্য, ঐ প্রচেষ্টা লাভজনক না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঔষধরূপে, বস্ত্রাদি রং করিতে, কাগজ রেশম ও চামড়া মসৃণ করিতে ম্যাগনেসিয়ম সালফেট ব্যবহৃত হয়। ইন্‌সিন্‌ডিয়ারী বোমের প্রধান উপাদান যে ম্যাগনেসিয়ম ধাতু তাহা গত যুদ্ধের সময় অনেকেই শুনিয়াছেন। বর্তমানে এরোপ্লেনের কল্যাণে ম্যাগনেসিয়ম ধাতুর চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ এলুমিনিয়ম ও ম্যাগনেসিয়মের মিশ্র ধাতু অতিশয় হাল্‌কা অথচ শুধু এলুমিনিয়মের অপেক্ষা অধিকতর শক্ত ও ঘাতসহ হওয়ায় উহা এরোপ্লেনের অংশাদি প্রস্তুতকল্পে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বলা বাহুল্য, ম্যাগনেসিয়ম

ক্লোরাইড প্রভৃতি হইতেই ম্যাগনেসিয়ম ধাতু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

এখন কি উপায়ে বাংলায় সমুদ্রোপকূলে কোথায় এই অত্যাবশ্যক সোডিয়ম ম্যাগনেসিয়ম ও পটাসিয়ম লবণসমূহ প্রস্তুত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের গুজরাট, করাচি প্রভৃতি অঞ্চলে সমুদ্রজল হইতে বহুকাল হইতেই প্রচুর পরিমাণে লবণ (সোডিয়ম ক্লোরাইড) তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে। ঐ সব অঞ্চলে বারিপাত অত্যল্প বলিয়া সাধারণতঃ সূর্য্যের তাপের সাহায্যেই জল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে ঠিক ঐ উপায়ে প্রভূত পরিমাণে লবণ সারা বৎসর ধরিয়া তৈয়ারী করার প্রধান অন্তরায় বাংলায় বারিপাতের আধিক্য। অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, গুজরাটের কাথিয়াবাড় প্রদেশের মিঠাপুরে স্বর্গীয় কপিলরাম ভকিলের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রভূত পরিমাণে লবণ তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে সোডা, কষ্টিক সোডা ও আনুষঙ্গিক বহুবিধ অত্যাবশ্যক রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলে লবণ তৈয়ারীর প্রাথমিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করিয়া সূর্য্যতাপে ঐ জল অনেকটা ঘনীভূত হইলে যদি পাইপ লাইনের সাহায্যে সেই ঘনীভূত লবণজল কোলাঘাটে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া সেখানে আনীত হয় এবং কয়লার তাপে বা পরে দামোদর পরিকল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে উপযুক্ত মাত্রায় ঘনীভূত করিয়া লবণ প্রস্তুত করা যায় তবে সেখানে সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক সামগ্রীগুলিও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার সমুদ্রোপকূলে অল্প পরিমাণ লবণ তৈয়ারী হইয়া থাকে। সমুদ্রতীরের একটি খাল ভিতরে একটি বিলের মত নীচু জায়গার সহিত সংযুক্ত থাকে। জোয়ারের জল ঐ খালদ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিলে খালের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ বিলের মত স্থানের সংলগ্ন অনেকগুলি জমিনি দুরমুস করা ও পাহাড়ের পাদদেশের আলবাঁধা ধানের ক্ষেতের মত বাঁধ দেওয়া ক্ষেত থাকে। ঐ জলার জল প্রথমে তাহার সংলগ্ন ক্ষেত্রে কয়েক ইঞ্চি গভীর জল করিয়া পাঁচ ছয় দিন সেখানে রাখা হয়। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রের জল তাহার সংলগ্ন নীচের ক্ষেত্রে আনিয়া আবার কয়েক দিন রৌদ্রে শুকানো হয়। এইরূপ দুই তিন ফালি জমির উপর দিয়া অনেকটা ঘনীভূত ঐ জল একটি গর্তে ধরা হয়। পরে ঘনীভূত ঐ জল গর্ত হইতে তুলিয়া কড়াই বা অন্য পাত্রে জাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ঠিক ঐ উপায়েই ঘনীভূত সমুদ্রজল শেষের গর্ত হইতে পাইপ-লাইন সাহায্যে কোলাঘাটের প্রস্তাবিত কারখানায় আনিয়া লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ঘনীভূত সমুদ্রজল জাল দিতে দিতে এমন একটি অবস্থায় আসে যখন ক্যালসিয়ম সালফেট পৃথক হইয়া যায়। তখন সেগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া জলটি আরও ঘনীভূত করিলে লবণ জমিতে থাকে। ঐ অবস্থায় উহা ঠাণ্ডা করিলে লবণ জমিয়া যায় ও তাহা পৃথক করিয়া বিশুদ্ধ ও শুষ্ক করিবার পর উহা গুদামজাত করা হয়। লবণ তুলিয়া লইবার পর যে ঘনীভূত তরল পদার্থ থাকে তাহা হইতে ম্যাগনেসিয়ম সালফেট, ম্যাগনেসিয়ম ক্লোরাইড, পটাসিয়ম ক্লোরাইড ও ব্রোমিন প্রস্তুত করা যায়। টাটা কোম্পানীর মিঠাপুর কারখানায় সমুদ্রজল হইতে বার্ষিক এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টন সাধারণ লবণ ও তৎসঙ্গে ঐ রাসায়নিক দ্রব্যগুলিও তৈয়ারী করা হইতেছে। এক লক্ষ টন সাধারণ লবণের সঙ্গে ষোল হাজার টন ম্যাগনেসিয়ম সালফেট পাওয়া যায় বলিয়া জানা গিয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে সাধারণ লবণ যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে কষ্টিক সোডা ও সোডা তৈয়ারীর প্রকৃষ্ট সম্ভাবনা। ঘনীভূত বিশুদ্ধ লবণ জলের ভিতর উপযুক্ত পাত্র মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলে ক্লোরিণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস এবং কষ্টিক সোডা উৎপন্ন হয়। এইগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রাসায়নিক শিল্পগুলি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তাহা পূর্ব প্রবন্ধেই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রস্তাবিত কোলাঘাট কারখানায় একটি বিভাগে হাইড্রোজেন সাহায্যে তেল ঘনীভূত করা, এমোনিয়া ও মিথাইল এলকহল, তথা ফরম্যালডিহাইড তৈয়ারীর ব্যবস্থা ও ক্লোরিণের সাহায্যে কার্ব্বলিক এসিড, ব্লিচিং পাউডার ডি ডি টি ও তৎসঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈয়ারীর বিভাগ খোলা যাইতে পারিবে। উদ্বৃত্ত ক্লোরিণ তরলীভূত করিয়া সিলিণ্ডার বা ট্যাঙ্কে পুরিয়া অন্যত্র চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে।

এখন ব্লিচিং পাউডার তৈয়ারী করিতে চুনের দরকার হইবে, সুতরাং ঐ কারখানাতেই চুনাপাথর হইতে বিশুদ্ধ চুন তৈয়ারীর ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে; আর চুন প্রস্তুতকালে যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হইবে তাহা লবণ জল হইতে সোডা প্রস্তুতকল্পে আবশ্যক হইবে। পূর্ব্বে যে এমোনিয়া তৈয়ারীর বিষয় উল্লেখ করা হইল ঐ এমোনিয়া গ্যাস ও সোডা প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয়। লবণজল হইতে কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড ও এমোনিয়া সাহায্যে সোডা প্রস্তুতকে এমোনিয়া সোডা-শিল্প বলা হইয়া থাকে। টাটা কোম্পানির মিঠাপুর কারখানায় দৈনিক এই উপায়ে ১৫০ টন সোডা উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যতদিন না দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে ততদিন আমাদের প্রস্তাবিত কোলাঘাট রাসায়নিক কারখানার জন্য সেখানে প্রভূত পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা এবং জব্বলপুর বা কাটনী হইতে আবশ্যকীয় চুনাপাথর আনিতে হইবে। ঘনীভূত লবণজল বৎসরের সকল ঋতুতে সমভাবে সরবরাহের জন্য কাঁথি উপকূলে সুপরিকল্পিত বিস্তৃত লবণজলের ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে সমুদয় রাসায়নিক শিল্পের প্রাণস্বরূপ যে পদার্থগুলি উৎপাদনের আভাস দেওয়া হইল উহা যদি আগামী আট দশ বৎসরের মধ্যেও যথাযথভাবে কার্য্যে পরিণত হয় তবে উহা সত্য সত্যই দেশে নবযুগের সূচনা করিবে ; কারণ ইহার উপরেই জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানদণ্ডের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। এই বিরাট পরিকল্পনার রূপদান করিতে যে সব অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা শিল্পপ্রধান কোনও দেশ হইতে আপাততঃ সংগ্রহের কোনও আশা নাই তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের মধ্যে যে সব কারিগর ও বিজ্ঞানী যন্ত্রাদি প্রস্তুত-কার্য্যে দক্ষতালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সাহায্যেই উহা আরম্ভ করিতে হইবে। মিঠাপুর বা মেট্টুর কারখানাকে আদর্শস্বরূপ ধরিয়া আমাদের জাতীয় কর্ম্মোদ্যমকে উদ্দীপিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে সাহসের সহিত অবতীর্ণ হওয়াই সমস্যা সমাধানের এক মাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়। আশা করি জাতীয় গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দানের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবেন।

পাড়ি

শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা

কালো খোঁড়ো রাত, আজকে বন্ধু, হয়েছি পার।
নবজীবনের সূর্য্যেরে করি নমস্কার।
এই মাটি, আর এই সোনারঙা ক্ষেত-খামার—
আজ থেকে তাই বলা যেতে পারে—'এরা আমার'
নীলাকাশ-তলে বলতে পারবো—'আমার দেশ'
কালো খোঁড়ো রাত, বন্ধু আমার, হয়েছে শেষ।

বন্ধু আমার, চোখে কেন তবু কাঁপছে জল ?
—ভিক্ষা পেলাম···আপোষ পেলাম···স্বর্ণফল।
এর বেশী আর, কাম্য কি বলো ?···মণিপুরের,
রাঙা ইতিহাস ?—সেতো উপকথা বহু দূরের···
তার কথা কেন ?—হিংসার পথে নেইক লোভ।
নিপুণ ছুরিতে দু'টুকরো দেশ, মিটেছে ক্ষোভ।

ক্ষুদিরাম, আর সূর্য্যসেন ও কানাইলাল—
বুকের রক্তে, জানি খেলে গেল রংমশাল,—
হাজার হাজার, তিলক ভেকা, ও মাতঙ্গিনী
ভুল বুঝোনাক, আমিও বন্ধু, তাদের চিনি !
আমি তুলিনিক', কোনো পরিচয়,—শুধু···বোমার···
তবুও বন্ধু,···সংযত রাখো···কথা তোমার।

মনে করিও না, সে সব দিনেরে আজ—দোহাই ;
বিস্বাদ হবে, যা পেলাম তাও,—থাকগে তাই ;
অনেক দিলাম—ঢের হারালাম 'স্বাধীন' আজ,
কি চেয়েছিলাম,···কি পেলাম—তার ভাবী সমাজ
বিচার করবে।—কাজ কি বন্ধু, আজকে তার,
হিসাব নিকাশে ?—আমাদের
নেই সে অধিকার।

মিছিলে বন্ধু, যোগ দিয়ে চলো, তোলো নিশান
কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' সুরে—উঠুক গান।
(তবু একখানি রাখি চুপিচুপি, ভীরু প্রণাম।
কালো খোঁড়ো রাতে যারা বেয়ে গেছে,
তাদের নাম
গোপনেতে স্মরি।—একটি প্রণাম রাখি সজল,
বলি—আমাদের মাপ করো, গত বন্ধুদল···
রক্তের ঋণ মেটেনি যা আজো···স্মরণে থাক···।)
পাড়ি বুঝি শেষ, রাঙা বন্দর—আমার ডাক।

নবজীবনের, সূর্য্যেরে করি, নমস্কার···
কালো খোঁড়ো রাত, বন্ধু আমার, হয়েছি পার।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংলণ্ডে ছয় সপ্তাহ

যে হোটেলে গিয়া উঠিলাম তাহা কেন্‌সিংটন উদ্যানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীট ও কেন্‌সিংটন কোর্টের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আমার গৃহ-সংলগ্ন ঝুল-বারান্দা হইতে উদ্যানটি দেখা যায়।

কেনসিংটন উদ্যানটি হাইড পার্কেরই প্রসারিত অংশ এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত। পার্ক ও উদ্যানে মিলিয়া দৈর্ঘ্যে মাইলের উপর। ইহাদের মাঝে মাঝে বনস্পতি-বিরচিত মনোরম কুঞ্জ ও ছোটবড় হ্রদ। হ্রদের মধ্যে রাজহংসশ্রেণী খেলিয়া বেড়াইতেছে। দিন ভাল থাকিলে বৈকালে হ্রদগুলির পাড়ে যথেষ্ট জনসমাগম হয়। বালক-বালিকাগণ ছোটবড় নৌকা পালসংযোগে হ্রদের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। যখন পাল-সমেত নৌকাগুলি বায়ুভরে হ্রদের এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত চলিয়া বেড়ায় তখন দেখিতে বেশ লাগে। নৌকা-গুলির দৈর্ঘ্য আধ হাত হইতে দুই হাত আড়াই হাত পর্য্যন্ত হইবে।

যুদ্ধকালীন রেশনপ্রথা তখন পুরাদমে চলিতেছে। রেশন কার্ড ব্যতীত পাঁচ দিন পর্য্যন্ত হোটেলে থাকা যায়। সেজন্য প্রায় হোটেলেই পাঁচ দিনের বেশী কাহাকেও রাখিতে চাহে না। সপ্তাহান্তে রেশন কার্ড সংগ্রহ করিয়া আমি অন্য হোটেলে গিয়াছিলাম। সেটি উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বেইস্‌-ওয়াটার অঞ্চলে অবস্থিত। এই হোটেলেই আমার লণ্ডনবাস সমাপ্ত হইয়াছিল এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে এই উদ্যানটিই আমার ভ্রমণের প্রধান স্থান ছিল।

১৭ই আশ্বিন শুক্রবার ইণ্ডিয়া-হাউসে গিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারী-বৃন্দের সহিত পরিচিত হইলাম। ইঁহাদের সহায়তায় আমার সমস্ত কাজ অনায়াসে সম্পন্ন হইয়াছিল।

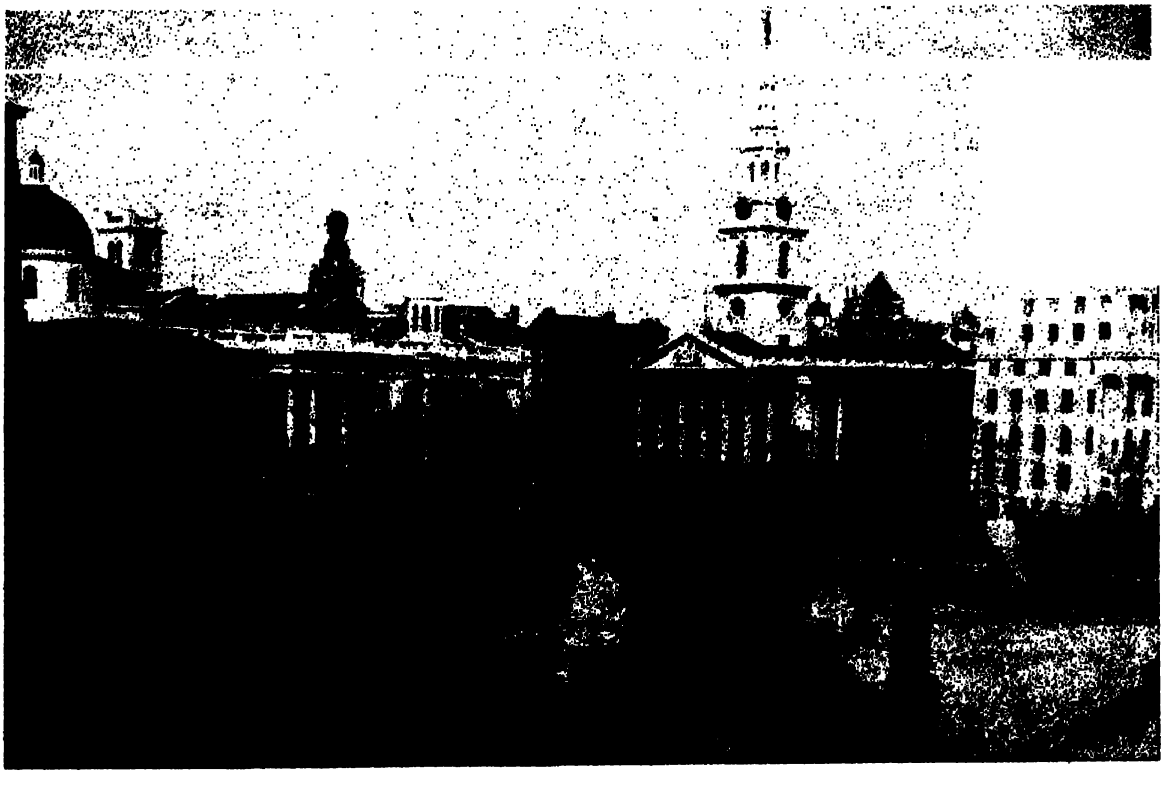
ইণ্ডিয়া-হাউসে আমার মূল কর্ম্মস্থল স্থাপন করিলাম। এখানে বহু ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ হইল। কেহ ইণ্ডিয়া-হাউসের কর্ম্মচারী, কেহ ছাত্র, কেহ আমারই মত রাজকার্য্যে আগত, কেহ ব্যবসায়ী এবং কেহ লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা। কেহ ছাত্রাবস্থায় এখানে আসিয়া ইংরেজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। এখানে আমার সোদর-প্রতিম শ্রীমান জগদীশচন্দ্র দাশগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। শ্রীমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বর্ত্তমানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ-প্রত্নতত্ত্বের কিমিতি বিষয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। ইনি লণ্ডনে আমার নিত্য-সহচর ছিলেন।

যুদ্ধের পর লণ্ডনে ভারতীয়-সমাগম প্রচুর। তাহাদের মধ্যে ছাত্রই বেশী। সরকারী বৃত্তিভোগী ছাত্র দলে দলে এ দেশে আসিতেছেন। বিলাতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু কিছু ভারতীয় ছাত্র আছে। তন্মধ্যে লণ্ডনেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডেও কম নয়। লণ্ডনের কোন কোন কলেজের গবেষণা-বিভাগে ইংরেজ ছাত্র অপেক্ষা ভারতীয় ছাত্রই নাকি বেশী। ছাত্রদের জন্য কলেজে স্থান সংগ্রহ ও বাসস্থান সংগ্রহের ভার ইণ্ডিয়া-হাউসের উপর। যুদ্ধোত্তর অনটনের দিনে এ কাজ অবশ্যই দুরূহ। ইণ্ডিয়া-হাউসের যত্ন সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু কিছু বিভ্রাট ঘটিয়াছে। সেজন্য ছাত্র-মহলে একটু অসন্তোষ দেখিলাম। শুনিলাম একটি ছাত্র এক বৎসর যাবৎ এখানে আসিয়াছে; এখনও তাহার জন্য কোন কলেজে স্থান পাওয়া যায় নাই। বরাদ্দমত সরকারী বৃত্তি অবশ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে। আমি থাকিতে থাকিতে এক দল ছাত্র লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের জন্য কোন বাসস্থান সংগ্রহ না হওয়ায় পূর্ব্ব-ক্রয়ডেনে এক তাঁবুতে তাহা-দিগকে রাখা হইল। শীতের দেশে তাঁবুতে থাকা অবশ্যই সুখদায়ক নহে এবং পায়খানার ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই সন্তোষজনক ছিল না। একটি ছাত্র এদেশে "টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার" জন্য আসিতেছেন খবর পাইয়া তাহার জন্য এক "টেক্‌নিক্যাল কলেজে" স্থান স্থির করা হইয়াছিল। ছেলেটি আসিয়া প্রথম দিন কলেজে যাইয়া দেখে যে সেখানে সেলাই, কাঠের কাজ প্রভৃতি নানাবিধ হাতের কাজ শেখান হয়। ছেলেটি শিবপুর কলেজের বি-ই এবং সেখানকার একজন কৃতী ছাত্র।

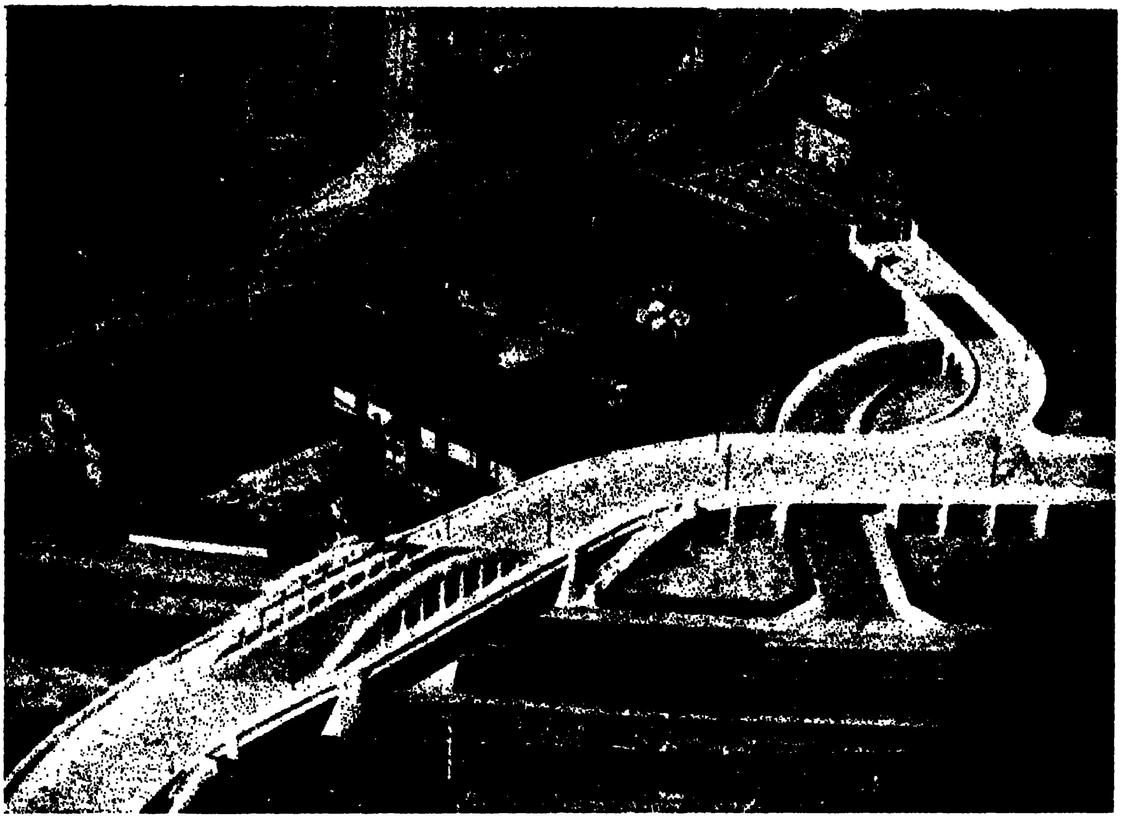
১৮ই আশ্বিন শনিবার পূর্ব্ব-ক্রয়ডেনে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগদান করি। সেদিন বঙ্গদেশে বিজয়া উৎসব। তদুপলক্ষে পূর্ব্ব-ক্রয়ডেনে একটি স্কুলঘরে বিশভাষিক ভারতীয় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মের এবং সকল প্রদেশের লোকই সেখানে দেখিলাম। জনৈক বাঙালী যুবকের সুমধুর সেতার-বাদ্য, ভারতীয় মহিলাদের হিন্দুস্থানী, বাংলা ও নেপালী সঙ্গীত, বেলুচি যুবকের বেলুচি ভাষায় গজল ইত্যাদি শ্রবণ করিলাম। সকলকে চা ও কেক্‌ দেওয়া হইল। বহু ইংরেজ নরনারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সাধারণ গৃহস্থ-শ্রেণীর এবং সানন্দে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে শিখাধারী—ধুতি পাঞ্জাবী ও আলোয়ান পরিহিত শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইংরাজী ভাষায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুনিলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক। শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভের মানসে কাশী হইতে এদেশে আসিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছেন। পরে এক ভারতীয়



হোয়াইট হলের সম্মুখে রাজা প্রথম চার্লসের প্রতিমূর্তি



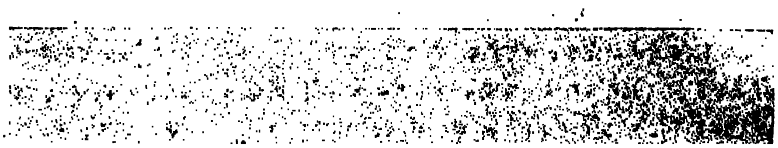
নেশন্যাল গ্যালারি—লণ্ডন



'সিলভারটাউন ওয়ে'—বিলাতের নূতন ধরণের একটি রাজপথ



ব্লুমসবারীতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভবন





ট্রাফালগার স্কোয়ার, লণ্ডন—বামপার্শ্বে নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ

হোটেলে দুই মিনিটের জন্য ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে এদেশে গীতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিখিবার কিছুই নাই। তিনি শুধু ইহাদের গবেষণা-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার সহিত দীর্ঘতর আলোচনার সুযোগ পাই নাই।

আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে ভারতীয় হাই কমিশনার মহাশয় একদিন ২রা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর ইণ্ডিয়া হাউসে একটি "ইন্দ ভারতীয়" জলসার আয়োজন করেন। জলসাটি নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশনের আর্টিষ্টগণ এই জলসা পরিচালনা করেন। গায়ক ও বাদকগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ে খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ মহিলা ও পুরুষ। তাহাদের নেতা একজন ভারতীয় (মাদ্রাজী) ওস্তাদ। জলসাটি বি বি সি সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও মহিলা এই জলসাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া ইংরেজদের শ্রবণযোগ্য করাই নাকি এই দলের উদ্দেশ্য। ক্লারিওনেট, বেহালা ও হার্পসিকর্ড এই তিন প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভারতীয় ওস্তাদটি মাঝে মাঝে তানপুরাও ধরিয়াছিলেন। কয়েকটি ভারতীয় সুর পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালিয়া বাদিত হইল। সর্ব্বপ্রথম ক্লারিওনেটে রবীন্দ্রনাথের একটি ভাটিয়ালি সুরের গান বাজান হইল। তারপর অন্যান্য গান ও সুর বাজান হইল। আশা করি সকলেই খুব উপভোগ করিয়াছিলেন। আমি সঙ্গীতে বড়ই অরসিক, সর্ব্বপ্রথমের ভাটিয়ালি গানটি এবং উপসংহারের নানাবিধ মিষ্টান্নযুক্ত চা-ই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছিল।

১৯শে আশ্বিন রবিবার—প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার আকাশ। সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে। তাপ ৫০ ডিগ্রির কাছাকাছি। পশ্চিমগামী একটি বাসে উঠিয়া বসিলাম। কেন্‌সিংটন হাই ষ্ট্রীট, হামারস্মিথ ও চিস্‌উইক অতিক্রম করিয়া সেতুবদ্ধ টেম্‌স নদী পার হইয়া কিউ উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া নদী দক্ষিণে চলিয়াছে। নদীর পূর্ব্বপারে কিউ উদ্যান। মানুষের জানা সর্ব্বপ্রকার তরুলতা নাকি এ বাগানে আছে। উদ্যানটি সত্যই পরম রমণীয়। ছোট বড় গাছ, নানাবিধ লতা। কেহ পুষ্প-স্তবকে মণ্ডিতগাত্র, কেহ শ্যামল পত্রসম্ভারে ভূষিতদেহ; কোন গাছ বৌদ্ধ প্যাগোডার মত, আবার কোন গাছ ছত্রাকার। কোন গাছ পথিকগণকে ছায়াদানের জন্য তৈরী, আবার কেহ লতিকা সমাগমের জন্য সমুৎসুক। উদ্যান-মধ্যস্থলে এক বৃহৎ সরোবরে রাজহংসশ্রেণী ক্রীড়ারত। সুসজ্জিত মনোজ্ঞ উদ্যান-মধ্যে বিচরণ করিয়া তরুলতার লীলা ও শোভা দর্শন করিলাম। টেম্‌স নদীতীরে পদচারণা করিয়া নদীগামী নানাবিধ নৌকা দেখিতে লাগিলাম। নদীতীরবর্ত্তী রাস্তাটি অনেকটা আমাদের গ্রাম্য রাস্তার মত অপ্রশস্ত; ভাল বাঁধানো নয়, মাঝে মাঝে

কর্দ্দমযুক্ত, দু'পাশের গাছ হইতে ঝরা-পাতায় সমাকীর্ণ। নদীর ওপারে শূন্য প্রান্তর; মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। নিকটবর্ত্তী একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া দক্ষিণে রিচমণ্ডের দিকে চলিলাম। এ অঞ্চলে বড়লোকের বাস। প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ। সুগঠিত, সুসজ্জিত সৌধশ্রেণী। রাস্তায় লোকের ভিড় নাই। রিচমণ্ড পার্ক ও উইম্বেলডন্ প্রান্তর দেখিয়া সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরিলাম। বোমার ক্ষতি কোথাও দেখিলাম না।

কিউ উদ্যানে বটগাছ বা বটগাছের মত বড় গাছ দেখি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের জমিদার পরিবারকে বটবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বটবৃক্ষ যেমন সর্ব্বদা নানা পক্ষীর আশ্রয়স্থল ও তাহাদের কোলাহল-মুখরিত, জমিদার বাড়ী ও সেইরূপ আত্মীয় অনাত্মীয় বহু পরিবারের আশ্রয়স্থল এবং তাহাদের কোলাহলে সতত মুখরিত। ইংলণ্ডে বটবৃক্ষও নাই, জমিদার-বাড়ীও নাই। পিতা-পুত্রও এখানে বেশী দিন একত্র বাস করে না। বর্ত্তমান গৃহ-স্বল্পতার দিনে পিতা ও পুত্রকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া এক বাড়ীতে থাকিতে হইতেছে। কাগজে দেখিলাম তাহাতে শাশুড়ী ও বৌ-এর মধ্যে নাকি বড়ই সংঘর্ষ বাধিতেছে। সংঘর্ষের প্রধান কারণ রান্নাঘর। সাধারণতঃ ইঁহারা হোটেলেই খান। কারণ মেয়েরাও বাইরে কাজ করেন। কেবল রবিবারে নিজ বাড়ীতে রান্না করেন। রবিবারে যখন শাশুড়ী ও বৌ একই রান্নাঘরে স্ব স্ব পৃথক রান্নার উদ্যোগ করেন তখন খটাখটি বাধিতেছে। কাগজে দিখিলাম একজন পাদ্রী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যতদিন এই গৃহ-স্বল্পতা থাকে ততদিন শাশুড়ীদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

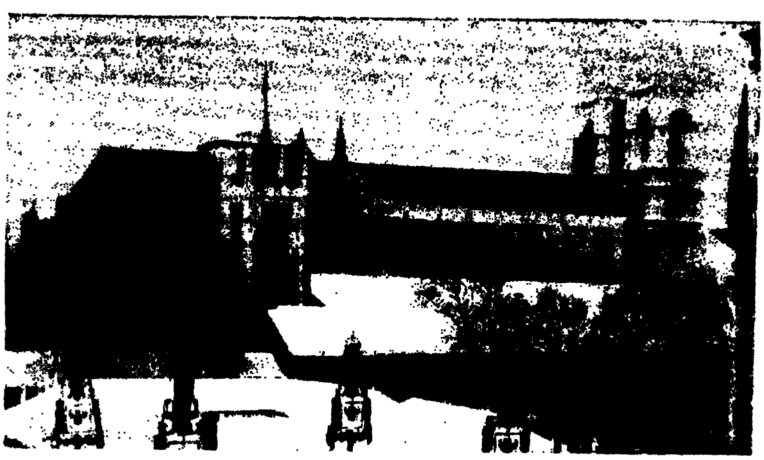
এর পরই রেশন কার্ড সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হইল। খাদ্য রেশন কার্ডের জন্য কেন্‌সিংটন এলাকায় অফিসে গেলাম। পনর কুড়ি জন লোক কাজ করিতেছে। অধিকাংশই স্ত্রীলোক। রেশন কার্ড প্রার্থীদের ভিড় মন্দ নয়। কেহ আমার মত বিদেশী, কেহ নবাগত ইংরেজ। কেহ শিশু বা অসুস্থের জন্য দুগ্ধ রেশন প্রার্থী। কেহ ঠিকানা বদলাইতে আসিয়াছেন। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা কাউণ্টার আছে। প্রবেশমাত্র এক ব্যক্তি আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া আমাকে উপযুক্ত কাউণ্টারে লইয়া গেল। তত্রত্য কর্ম্মচারিণী আমাকে প্রশ্ন করিয়া একটি ফরম নিজেই লিখিয়া আমাকে সই করিতে বলিলেন। সই করিবার পর আমাকে মিনিট পনের অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া থাকিতে হইল। তারপর অন্য এক কর্ম্মচারিণী আমাকে ডাকিয়া আমার কার্ড আমাকে প্রদান করিলেন। কার্ড দিবার সময় অতি ভদ্রভাবে কার্ডের ব্যবহার-বিধি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয় রেশন অফিসের অভিজ্ঞতা-লব্ধ আমার মন ইহাদের ক্ষিপ্রতা, পটুতা এবং ভদ্রতায় বিস্মিত হইয়াছিল।

ইহার পর বস্ত্র-কুপনের জন্য বোর্ড-অব-ট্রেডে যাই। প্রবেশমাত্র এক ব্যক্তি আমার প্রয়োজন জানিয়া লইয়া আমাকে উপযুক্ত কক্ষে প্রেরণ করিল। সেখানে গিয়া একটা ফরমে কি কি বস্ত্র দরকার তাহা লিখিতে হইল। আমি শুনিয়াছিলাম যে এদেশে বস্ত্রের বিশেষ অভাব এবং কুপন প্রদান বিষয়ে ইহাদের বিশেষ কড়াকড়ি। কাজেই আমি খুব সংক্ষেপেই আমার প্রয়োজন লিখিলাম। তত্রত্য কর্ম্মচারিণী আমার লিখিত ফর্দ দেখিয়া বলিলেন যে আপনি এদেশে নবাগত, কাজেই এদেশের শীতের তীব্রতা জানেন না। আপনার নিশ্চয়ই এটা দরকার, ওটা দরকার ইত্যাদি। তিনি আরও তিন চার প্রকারের বস্ত্র ফরমে নিজেই লিখিয়া আমাকে সবগুলি কিনিবার মত কুপন দিয়া দিলেন।

টেমস্ নদী লণ্ডনের মধ্যস্থল দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত। নদীর উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই শহর বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে কোথাও বাঁকিয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইয়াছে। এইরূপ একটি উত্তর-দক্ষিণ বাঁকের পশ্চিম তীরে পার্লামেণ্ট ভবন অবস্থিত। পার্লামেণ্ট ভবনের পাশে ওয়েষ্টমিনষ্টার সেতু। এরূপ শহরের মধ্যে টেম্‌স নদীর উপর বহু সেতু বিদ্যমান। টেম্‌স নদী বেশী প্রশস্ত নয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার সেতুর নিকট কলিকাতার গঙ্গার অর্দ্ধেক হইবে। প্রশস্ততা পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকে বাড়িয়াছে।

পশ্চিমে পার্লামেণ্ট ভবন হইতে পূর্ব্বে টাওয়ার অব লণ্ডন পর্য্যন্ত টেম্‌স নদীর উভয় তীরে, বিশেষতঃ উত্তর পাড়ে, লণ্ডনের বাণিজ্যবহুল অংশ। পার্লামেণ্ট ভবন ও টাওয়ার অব লণ্ডন উভয়ই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। দুই শিলিং দিলে টেম্‌স নদীতে ওয়েষ্টমিনষ্টার সেতু হইতে টাওয়ার অব লণ্ডন পর্য্যন্ত মোটর-বোটে ঘুরিয়া আসা যায়। যাতায়াতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে।

পার্লামেণ্ট ভবন হইতে উত্তর মুখে গিয়াছে হোয়াইট হল ষ্ট্রীট এবং পশ্চিম-দক্ষিণে গিয়াছে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট। এই উভয় রাস্তায়, বিশেষতঃ হোয়াইট হল ষ্ট্রীটে, বহু সরকারী আপিস। এই উভয় রাস্তার সংযোগস্থলের নিকটবর্ত্তী গ্রেট-জর্জ্জ ষ্ট্রীট। এই রাস্তায় ট্রেজারী। তাহারই অনতিদূরে ইণ্ডিয়া-অফিস। হোয়াইট হল ষ্ট্রীটের গোড়া হইতে বাহির হইয়া গ্রেট জর্জ্জ ষ্ট্রীট সিধা পশ্চিমে সেণ্ট জেমস্-পার্ক পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য খুব কম। পার্কের পরেই রাজপ্রাসাদ এবং রাজপ্রাসাদের অপর পারে গ্রীণ পার্ক। গ্রীণ পার্কের পরেই পিকাডেলি—লণ্ডনের অভিজাত-ভূয়িষ্ঠ অঞ্চল। ঐ স্থানেই হাইড-পার্কের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ। পিকাডেলি ষ্ট্রীট হাইড-পার্কের দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গিয়া কেনসিংটন রোডে মিলিত হইয়াছে। কেন্‌সিংটন রোডও প্রথমে হাইড-পার্ক এবং পরে কেন্‌সিংটন গার্ডেনের দক্ষিণ দিক দিয়া গিয়া কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীটে মিলিয়াছে।



ওয়েস্টমিন্‌ষ্টার এবি

হোয়াইট হল ষ্ট্রীট পার্লামেণ্ট ভবন হইতে নদীর বাঁক ধরিয়া উত্তর মুখে আসিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বহু সরকারী আপিস। ডাউনিং ষ্ট্রীট হোয়াইট হল ষ্ট্রীট হইতে বাহির-হওয়া একটি ছোট রাস্তা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর সরকারী আবাসস্থল ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটে। হোয়াট হল ষ্ট্রীট আসিয়া চেয়ারিং ক্রশ রেল ও টিউব স্টেশনে পড়িয়াছে। নদী এখানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে।

চেয়ারিং ক্রশ লণ্ডনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। শহর চেয়ারিং ক্রশ হইতে প্রত্যেক দিকেই সাত-আট মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখান হইতে পশ্চিম দিকে রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত যে বড় রাস্তা গিয়াছে তাহার নাম মল। কোনও বিশেষ উপলক্ষে রাজারাণী যখন শোভাযাত্রা করিয়া পার্লামেণ্ট ভবনে আসেন, তখন মল ও হোয়াইট হল ষ্ট্রীট দিয়াই আসেন।

চেয়ারিং ক্রশ হইতে নদীর উত্তর পাড় ধরিয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে। অল্ডউইচ রাস্তাটি একটি ছোট বৃত্তচাপের মত; ষ্ট্র্যাণ্ড হইতে বাহির হইয়া ষ্ট্র্যাণ্ডেই পুনর্ম্মিলিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া-হাউস অল্ডউইচের উপর অবস্থিত। অল্ডউইচ হইতে কিংস্‌ওয়ে নামক একটি রাস্তা উত্তরে অনতিদূরে হাই হবর্ণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কেন্‌সিংটন উদ্যান ও হাইড পার্কের উত্তর দিয়া বেইস্‌ওয়াটার রোড নামক যে রাস্তা পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়াছে তাহারই পার্কের পরবর্ত্তী অংশের নাম অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট এবং তৎপরবর্ত্তী অংশের নাম হাই হবর্ণ। এই অঞ্চলে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স্ অবস্থিত। হাইকোর্ট এবং ব্যারিষ্টারগণের আড্ডাও অল্ডউইচের নিকটে।

ষ্ট্র্যাণ্ড পূর্ব্ব দিকে গিয়া ফ্লীট ষ্ট্রীট নাম ধারণ করিয়াছে। এখানে খবরের কাগজওয়ালাদের আড্ডা। এই পূর্ব্বাভিমুখী রাস্তার পরবর্ত্তী অংশের নাম ক্যানন ষ্ট্রীট। ইহারই উত্তরে লিভারপুল ষ্ট্রীট। তাহারই দক্ষিণে থ্রে্‌ড নিড্‌ল্‌ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ। অদূরে সেণ্টপল গির্জ্জা। ইহারই কিছু পূর্ব্বে টাওয়ার অব লণ্ডন। তাহার পূর্ব্ব দিকে লণ্ডনের ডক এলাকা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশন নদীর উত্তর পাড়ে। নদীর দক্ষিণ পাড়ে ওয়াটারলু ষ্টেশন; চেয়ারিং ক্রশ হইতে ওয়াটারলু পর্য্যন্ত রেল লাইন নদীর উপরিস্থ সেতু দিয়া গিয়াছে, আর টিউব লাইন নদীর নীচের সুড়ঙ্গ দিয়া গিয়াছে।

চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের পাশেই ট্রাফালগার স্কোয়ার। এখানে নেল্‌সনের খুব বড় মূর্ত্তি আছে। পাশে খোদাই করা আছে—"ইংলণ্ড আশা করেন তাঁহার প্রত্যেক সন্তান স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিবে।" কাছে ভারতবিদ্রোহ দমনকারী সেনানী হ্যাভেলকের একটি মূর্ত্তি আছে। অনতিদূরে এক আকাশচুম্বী চূড়ার উপর দণ্ডায়মান নেলসন। ট্রাফালগার স্কোয়ারে বহু পারাবত আসিয়া বসে এবং জনতার হাত হইতে খাদ্য ঠোকরাইয়া খায়। ইহারই পাশে জাতীয় আর্ট গ্যালারী। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরগণের প্রতিভায় সর্ব্বদা ভাস্বর, সজীব ও আনন্দময়।

লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। সত্তর-আশী লক্ষ লোকের বাস। লোকের যাতায়াতের প্রধান উপায় টিউব বা সুড়ঙ্গপথ এবং মোটর বাস। শহরের মধ্যে অনেক রেল ষ্টেশনও আছে। শহর হইতে শহরতলীতে যাইতে হইলে অনেকস্থলে রেলপথই প্রশস্ত। মাটির নীচ দিয়া সুড়ঙ্গ-পথ লণ্ডনের সর্ব্বত্র গিয়াছে। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া ইলেকট্রিক ট্রেন্ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। মাটির নীচে এক একটি স্টেশন খুব বড় এবং সুসজ্জিত। কোন কোন লাইন মাটির খুব নীচে দিয়া গিয়াছে। বেশী নীচের ছোট স্টেশনে লিফ্‌ট এবং বড় স্টেশনে ঘোরানো সিঁড়ি আছে। স্টেশনে এবং গাড়ীর মধ্যে সুন্দর পথপ্রদর্শক ইঙ্গিত এবং ম্যাপ আছে। নবাগতের পক্ষে এ সব দেখিয়া যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না। সকাল ৮টার পর হইতেই মধ্য-লণ্ডনের সুড়ঙ্গগুলি অনবরত জনস্রোত উদ্গীরণ করিতে থাকে।

টাওয়ার অব্ লণ্ডন বিজয়ী উইলিয়ম রাজপ্রাসাদরূপে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নৃপতিগণ ইহাকে বাড়াইয়াছেন। ইহা কখনও রাজপ্রাসাদ, কখনও দুর্গ এবং কখনও বা কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাকে একটি মিউজিয়াম-রূপে রক্ষা করা হইতেছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস এই বাড়ীটির সঙ্গে বিশেষরূপে জড়িত। রাজা প্রথম জেম্‌স পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে বাস করিয়াছেন।

বড় বাড়ীটির মধ্যে অনেকগুলি প্রাসাদ আছে। প্রত্যেকটিকে এক একটি টাওয়ার বলা হয়। রাজদরবারের কত ষড়-

যন্ত্র, কত নিষ্ঠুরতা এক সময়ে এই প্রাসাদগুলিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাসাদে ঢুকিয়াই টাওয়ার হিল। এখানে সর সাইমন বার্লির ফাঁসী হইয়াছে। সপ্তম হেন্‌রীর মন্ত্রী ডাড্‌লি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের শিরশ্ছেদ হইয়াছে। বেল টাওয়ারে রচেষ্টারের বিশপ ফিসার, রাজকুমারী এলিজাবেথ, মনমাউথের ডিউক জেম্‌স প্রভৃতি বহু ব্যক্তি কারাবাস করিয়াছেন। হোয়াইট টাওয়ারে দ্বিতীয় রিচার্ড সিংহাসন ত্যাগ-পত্র স্বাক্ষর করেন। পঞ্চম হেন্‌রী এজিনকোর্টের যুদ্ধবন্দী অর্লিন্সের ডিউককে এখানেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন। টাওয়ার গ্রীনে যে সমস্ত ব্যক্তির ফাঁসী হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অষ্টম হেন্‌রীর দ্বিতীয় রাণী এনিবোলিন এবং পঞ্চম রাণী ক্যাথারিন হাওয়ার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ব্লাডি টাওয়ারে পঞ্চম এডোয়ার্ড ও তাহার ভ্রাতা ইয়র্কের ডিউকের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের দীর্ঘ কারাবাসের কতক সময় এখানে যাপিত হয়।

এই টাওয়ারের মধ্যে একটি বর্ম্ম ও প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনী আছে। অষ্টম হেন্‌রী এই সংগ্রহের কাজ সুরু করেন। বিজয়ী উইলিয়ম্‌ হেষ্টিংসে এবং প্রথম রিচার্ড প্যালেষ্টাইনে যে বর্ম্ম ও অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা এখানে আছে। অষ্টম হেনরীর চারিটি বর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে একটি সম্রাট ম্যাক্সি-মিলিয়ামের উপহার। প্রথম চার্লস, দ্বিতীয় জেম্‌স্‌ প্রভৃতি অনেক রাজার বর্ম্ম এখানে আছে। বর্ম্ম এবং অস্ত্রের বহু শতাব্দীর ইতিহাস এই প্রদর্শনীতে একত্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

সেদিন শনিবার। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ওয়েষ্ট মিনষ্টার সেতুর দিকে চলিয়াছি। রাস্তায় দ্রুতগামী জনস্রোত। চেয়ারিং ক্রশের নিকট একটি ইংরেজ যুবকের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া গেল। আমরা উভয়েই বলিয়া উঠিলাম "দুঃখিত"। ইংরেজ যুবকটি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপনি কি ভারতবাসী ?" আমি বলিলাম "হাঁ।" যুবকটি—"আপনি কি কলিকাতায় থাকেন ?" আমি—"হাঁ"। যুবকটি বলিল—"আপনার কি বিশেষ কোনও কাজ আছে ? আপনি কোন দিকে যাইবেন ?" আমি—"আমি ওয়েষ্ট মিনষ্টার সেতুর দিকে যাচ্ছি।"

যুবকটি—"চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

যাইতে যাইতে যুবকটি বলিল—"আমি মিস্ত্রী। (মিস্ত্রী কথাটি বাংলা ভাষায়ই উচ্চারণ করিল) আমার বাড়ী স্কট-লণ্ড। যুদ্ধোপলক্ষ্যে আমি প্রায় এক বৎসর কলিকাতায় ছিলাম। হ্যারিংটন ষ্ট্রীটে থাকিতাম। অমুক দোকানে আমি প্রায়ই যাইতাম। তাহাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। কলিকাতা সহর একটু গরম ; কিন্তু আমার খুব ভাল লাগিত। সুবিধা হইলে আমি আবার কলিকাতা যাইব।"

আমার প্রশ্নের উত্তরে যুবকটি বলিল—"আমি আমার ব্যবসায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছি। এখনও কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।"

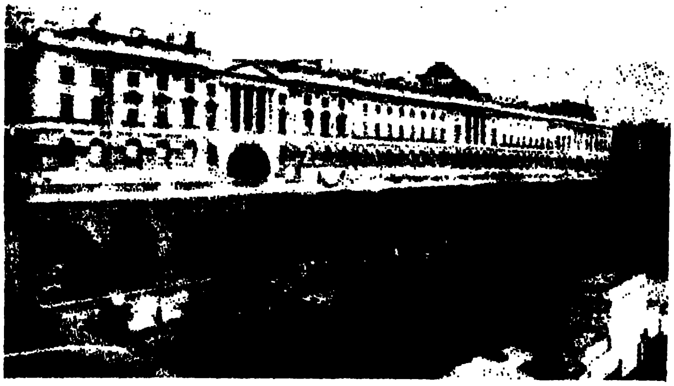
কলিকাতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যুবকটির খুব আগ্রহ দেখিতে পাইলাম। এর মধ্যে ওয়েষ্টমিনষ্টার সেতু আসিয়া গেল। আমি মোটরবোটে ভ্রমণার্থ চলিয়া গেলাম। যুবকটি আমাকে সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া আমার দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত তাকাইতে তাকাইতে সেতু পার হইয়া চলিয়া গেল।

৭ই কার্ত্তিক, ২৪শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাউস অব্‌ কমন্স সভায় বিতর্ক দেখিতে গেলাম। সদর দরজা পার হইয়া একটি দরদালান দিয়া কেন্দ্রস্থলে বড় ঘরে অপেক্ষা করিতে হইল। দরদালানে এবং কেন্দ্রস্থ ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ছবি টাঙানো আছে। ইংলণ্ড ও পার্লামেণ্টের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা লইয়া এই ছবিগুলি অঙ্কিত। একটা ছবিতে ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিলাম। ছবিটি হইতেছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে সর টমাস রো। অনেক ইতিহাসের বইয়ের পৃষ্ঠায় এই ছবিটি দেখা যায়। ছবিটির নীচে এইরূপ লিখিত আছে—"সর টমাস্‌ রো আজমীর দরবারে ভদ্রতা ও দৃঢ়তা দ্বারা ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভাবের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন।" দৃঢ়তা কথাটা কানে বাজিল।

যথাসময়ে গদা, পার্শ্বচর ও অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হইয়া স্পীকার আমাদের সামনে দিয়া বিতর্ক-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আমরা ঢুকিলাম। হাউস অব কমন্সের কক্ষটি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখ রাত্রে জার্ম্মান বোমাবর্ষণে সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কক্ষটিকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হইতেছে। এক্ষণে কমন্সের সভ্যগণ হাউস অব লর্ড্‌সে বসিতে-ছেন। কক্ষটি ছয় শতাধিক সভ্যের বসিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত নয়। কক্ষের চারি দিকে গ্যালারী। এক প্রান্তে স্পীকারের আসন। তাহার দক্ষিণে সরকারী দল, বামে সরকার বিরোধী দল। মধ্যস্থলে অনেকটা ফাঁকা জায়গা কার্পেটে ঢাকা। গ্যালারী ও কার্পেটের মধ্যে খানিকটা খোলা মেঝে আছে। সভ্যগণ বক্তৃতা করিবার সময় কার্পেট স্পর্শ করিতে পারেন না—ঐ খালি জায়গায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের বক্তৃতা করিতে হয়। পূর্ব্বে সভ্যগণ নাকি বক্তৃতা করিতে করিতে সহসা উত্তেজনাবশে অসি নিষ্কাশিত করিয়া অপর পক্ষকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতেন। সেইজন্য নিয়ম করা হয় যে, কোন সভ্য কার্পেটের উপর উঠিতে পারিবেন না এবং কার্পেটের মাপও এমনি ভাবে ঠিক করা হইত যে দুই দিক হইতে দুই জনে তরবারী বাড়াইয়া দিলে যেন কেহ কাহাকেও আঘাত করিতে না পারেন। আত্মরক্ষার্থ স্পীকার গদা ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমানে উহা সুবর্ণমণ্ডিত রূপার গদায় পরিণত হইয়া স্পীকারের মর্য্যাদার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দর্শকগণের আসন উচ্চে, চারি দিকে ঘোরানো মঞ্চের উপরে। আমার আসন ছিল স্পীকারের মাথার উপর। ঠিক বিপরীত দিকে রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন স্পীকারের দক্ষিণে উপবিষ্ট মন্ত্রিগণ। বামে চার্চ্চিল প্রমুখ বিরোধী

দলের নেতাগণ। প্রধান মন্ত্রী এটলি ঐ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথমে প্রশ্নোত্তর চলিল। পরে যুদ্ধমন্ত্রী পদাতিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে এবং কৃষি-মন্ত্রী কল আমদানী এবং বন-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার মধ্যে এবং পরে সভ্যগণ মন্ত্রীদিগকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। অনেক সময় মনে হইতেছিল যেন বক্তার খেলা চলিতেছে। প্রশ্নোত্তর কালে এবং পদাতিক বাহিনীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে চার্চিল ঘনঘন প্রশ্ন করিতেছিলেন। প্রশ্নোত্তর ছলে পরস্পরকে আঘাত করায় চার্চিলের বিশেষ নিপুণতা লক্ষ্য করিলাম। বিদেশ হইতে বেশী কল আমদানী সম্ভব কিনা এ বিষয়েও সভ্যগণের বেশ আগ্রহ লক্ষিত হইল। বন-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ হইতেই কক্ষ খালি হইতে লাগিল। প্রথমে তিন শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ কমিয়া ১৫।২০ জনে পরিণত হইল; পরে দেখিলাম ইহাদের প্রত্যেকেরই বক্তৃতা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমি উঠিয়া চলিয়া আসিলাম।



টেম্‌স নদীর তীরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সমারসেট হাউস

কার্য্যোপলক্ষে আমাকে ইণ্ডিয়া অফিসে যাইতে হইত। ইণ্ডিয়া অফিসে কতকটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তনকাল সমুপস্থিত। তথাপি এখানে কোনও কর্ম্মব্যস্ততা নাই। জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন, "এবার তো সমস্ত সিদ্ধান্তই ভারতবর্ষে গৃহীত হইবে, আমরা সই করিব মাত্র।" ইহার কিছুদিন পরেই* ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহারা ভারত ত্যাগ করিবেন।

সর থিওডোর গ্রেগরি তখন সবেমাত্র ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি তিনটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তাঁহার শেষটি শুনিতে গিয়াছিলাম (৫ই কার্ত্তিক বা ২২শে অক্টোবর)। যথেষ্ট ইংরেজ শ্রোতা। ভারতীয় শ্রোতাও মন্দ নয়। জনৈক সিংহল দেশীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে আমার আলাপ হইয়াছিল। গ্রেগরী মহাশয় বলিলেন যে, ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের পথে চলিবে, না টোটেলেটেরিয়ানিজমের পথে চলিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কারণ রাজতন্ত্র ভারতবাসীর ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশেষ রূপে জড়িত এবং বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় — এমন কি সুভাষ বোস পর্য্যন্ত—দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য একনায়কত্বমূলক রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। রাশিয়ার কম্যুনিজম এবং জার্ম্মানীর ফ্যাসিজম উভয়ই যে একনায়কত্বমূলক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা ভারতীয়গণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতীয় সিবিল সার্ভিসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার জন্য গ্রেগরী মহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে সমস্ত জমিতে সরকারী মালিকানা স্থাপন করিলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না; কারণ কেবলমাত্র মালিক পরিবর্ত্তনে জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়িবে না। কৃষি, শিল্প এবং সামাজিক কল্যাণমূলক বিভাগগুলির সুসমঞ্জস উন্নতি দ্বারাই ভারতের দুঃখ দূর হইতে পারে। কোনটিকে অবহেলা করিলে চলিবে না এই সম্পর্কে তিনি লবণকর, মদ-গাঁজা-আফিমের উপর আবগারী কর এবং মৃত্যু-করের প্রশংসা করিলেন।

২৬শে কার্ত্তিক (১২ই নবেম্বর) রাত্রে লণ্ডনের ছাত্র-মজলিসের উদ্যোগে প্রফেসর লেভি একটি উপাদেয় বক্তৃতা দান করেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার কয়েকটি কথা আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি বলিলেন যে, ভারতীয় ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করে, কোন্ বিষয়টি দেশের উন্নতির সহায়ক হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া। ইংরেজ ছাত্রগণ পাঠ্যবিষয় নির্ব্বাচন করে কোন্ বিষয়টি তাহার নিজের জীবিকার্জ্জনের সহায়ক হইবে ইহা চিন্তা করিয়া। বহু ভারতীয় ছাত্র যখন তাঁহাকে বলিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়টি পড়িতে চাহেন না, কারণ ইহা তাহার দেশের বিশেষ কাজে লাগিবে না, তখন তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একজন কৃতী ভারতীয় ছাত্র কৃষি-বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। এক দিন তাঁহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহার ভাবার্থ এইরূপ:

প্রফেসর—তুমি দেশে গিয়া কি করিবে?

ছাত্র—হয়তো কোন কৃষি-কলেজে শিক্ষকতা করিব।

প্রঃ—তাহা হইলে খুবই ভাল হইবে। তোমার গবেষণা-লব্ধ নূতন পদ্ধতি দ্বারা ভারতীয় কৃষির প্রভূত উন্নতি করিতে পারিবে।

ছাত্র—আপনি বোধ হয় জানেন না যে, ভারতীয় কৃষি-কলেজগুলি কৃষির উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

* ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী

প্রঃ—(বিস্মিত ভাবে)—তবে ?

ছাত্র—আমাদের মত দু-চার জন শিক্ষিত ও চক্ষুষ্মান লোককে চাকুরী দিয়া সন্তুষ্ট রাখাই ঐ কলেজগুলির উদ্দেশ্য।

ধর্মহিসাবে সরকারী চাকুরী বণ্টন সম্বন্ধে প্রফেসর লেভি বলিলেন—এই প্রথা দেশের দারিদ্র্য-প্রসূত। ইংলণ্ডে বেকার সমস্যা নাই। কাজেই এখানে চাকুরী লইয়া কাড়াকাড়ি নাই। আয়ার্লণ্ডে বেকার-সমস্যা সঙ্গীন। কাজেই কোন্ ধর্মসম্প্রদায় কত চাকুরী পাইল ইহা লইয়া কামড়াকামড়ি লাগিয়াই আছে।

সেদিন ভারতপ্রবাসী জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর পত্নী পিকাডেলি সার্কাসে এক হোটেলে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করেন। ভারতবর্ষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কিছু আলোচনা হইল। ইংরেজ রাজত্বাবসানে ভারতবর্ষে কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক রূপই বা কিরূপ হইবে ইহা বর্তমানে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অনেকেরই চিন্তার বিষয়। কলিকাতার হত্যাকাণ্ড এবং তৎপরবর্তী নোয়াখালী এবং বিহারের ঘটনাবলীর কথা উঠিলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা অবশ্যই ধর্মগত সমস্যা নয় ; ইহা মূলতঃ রাজনৈতিক সমস্যা। আমাদের নিজেদেরই এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং এ সমস্যার সমাধান একদিন হইবেই। যখন সমস্যার সমাধান হইবে, তখন দুই সম্প্রদায় আবার শান্তিতে এবং সপ্রেমে পাশাপাশি বাস করিবে। তবে কোন্ পথে সমস্যা মিটিবে—হিংসার পথে না প্রেমের পথে—ইহাই ভাবনার কথা। হিন্দু-মুসলমান বহুকাল ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়াছে। ধর্মোপাসনা ব্যতীত সমস্ত কার্য্যই তাহারা একযোগে করিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে মারামারিও করিয়াছে। উত্তেজনা কমিয়া গেলে আবার মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবারের গোল কি সাময়িক উত্তেজনা-প্রসূত না রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রণোদিত ? ধর্মগত পার্থক্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে অবশ্য পূর্ব্বেও ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে গোলযোগ কখনও এত ব্যাপক ও স্থায়ী হয় নাই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর গৃহকর্ত্রী আমাকে ওয়েষ্টমিনষ্টার এবিতে লইয়া গেলেন। পার্লামেণ্ট ভবনের পাশেই ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি। প্রকাণ্ড গীর্জা। গথিক স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। বড় বড় স্তম্ভের উপর সু-উচ্চ খিলানগুলি তালবৃক্ষের মত চারি দিকে প্রসারিত। মধ্যবর্তী লম্বা হলের উভয় পার্শ্বে বারাণ্ডা—স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। হলের শেষে উপাসনা-মঞ্চ। মৃত ইংলণ্ডাধিপতিগণকে এই ঘরে সমাহিত করা হয়। দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণকেও মৃত্যুর পর এই এবিতে সমাহিত করিয়া সম্মানিত করা হয়। তাঁহাদের স্মৃতিস্তম্ভ ও শিলামূর্তিতে এবি ভর্ত্তি। গ্লাডষ্টোন, ডিজরেলি পিট প্রভৃতি রাজনৈতিক এবং নিউটন, ডারউইন, হার্সেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের মূর্ত্তি এই বাড়ীতে আছে। ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সমস্ত মৃত সৈনিকের খোঁজ পাওয়া যায় নাই বা যাহাদের মৃতদেহ সনাক্ত হয় নাই, তাহাদের স্মরণার্থ একটি "অজানা সৈনিকের সমাধি" এই গীর্জার মধ্যস্থলে আছে। দুইটি প্রস্তরফলক ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। একটি মেজর লরেন্সের স্মরণার্থ, অপরটি সেনানী কুটের স্মরণার্থ। দ্বিতীয় ফলকটিতে লিখিত আছে যে ইনি ভারতবর্ষে ফরাসীগণকে এবং হায়দর আলীকে পরাজিত করেন।

উপাসনা-মঞ্চের উপরে পিছনের দিকে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত পর্দা আছে। পর্দাটির উপরে অনেক কারুকার্য্য আছে। ইহার অনেকটাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। খুব উচ্চাঙ্গের মনে হইল না। ইংলণ্ডে পাথর-খোদাই কাজের আর কোনও নমুনা আমি দেখি নাই। যে সিংহাসনে বসিয়া ইংলণ্ডের রাজাদের রাজ্যাভিষেক হয় তাহা এই পাথরের পর্দার পিছনে রক্ষিত আছে। খুব সাধারণ চেয়ার। পায়ার নীচে চারিটি ছোট ছোট সিংহ এবং মধ্যস্থলে একখণ্ড পাথর আছে। এই পাথরটিকে স্কোনের পাথর বলে। প্রথম এডওয়ার্ড পাথরটি স্কটল্যাণ্ড হইতে আনিয়া এই সিংহাসন তৈরী করেন। তদবধি এই সিংহাসনেই সমস্ত রাজার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে।

সমগ্র গীর্জাটিতে একটি রহস্যময় নীরবতা বিরাজ করিতেছে। প্রবেশ করিলেই অন্তর বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যায়।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখিয়া আমি হতাশ বোধ করিয়াছিলাম। কলিকাতার মিউজিয়মের তুলনায় ছোট। ইংলণ্ড ছোট দেশ এবং প্রাচীন দেশও নয়। পাথরের কাজ এদেশে প্রচলিত ছিল না। কাজেই এদেশের পুরাকীর্ত্তি ভারতবর্ষের তুলনায় নগণ্য। কিছুদিন পূর্ব্বে মিডেন হল নামক স্থানে একটি কৃষক জমি চাষ করিবার সময় কয়েকটি রৌপ্য-পাত্র পান। পণ্ডিতগণ সেগুলিকে রোমান আমলের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই রৌপ্য-পাত্রগুলি 'মিডেন হল ট্রেজার' নামে পরিচিত হইয়া বর্তমানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মিউজিয়মের মধ্যে চীন, ভারতবর্ষ, জাভা এবং আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের এক একটি বিভাগ আছে। সেগুলি ছোট, কিন্তু দেখিতে ভাল। ভারতীয় বিভাগে কয়েকটি সুন্দর বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

লণ্ডনে প্রাচীন কীর্ত্তি প্রধানতঃ তিনটি—লণ্ডন টাওয়ার, পার্লামেণ্ট ভবন এবং ওয়েষ্টমিনষ্টার এবি। আর সবই আধুনিক।

হিন্দীভাষা ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

অনেকের মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে হিন্দীভাষাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হবে। এই হিন্দীভাষা প্রায় একুশ কোটি লোকের কথ্য মাতৃভাষা। অবশ্য এ ভাষার রূপ বদলেছে প্রায় প্রতি প্রদেশে। যুক্তপ্রদেশে কোন কোন অঞ্চলে আব্‌ধী, মগধী, ব্রজবুলী, কারসী, হুড়িয়া ও আরবী-ফারসী মিশ্রিত 'খড়ী বোলী'র ভাষাসমূহ প্রচলিত আছে। কুমায়ুন প্রভৃতি অঞ্চলে এক প্রকার পাহাড়ী 'বোলী'র হিন্দী প্রচলিত আছে। কিন্তু এসব বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, বিহার, পঞ্জাবের অর্দ্ধাংশ ও সিন্ধু, এবং সীমান্তপ্রদেশের কতক অংশে হিন্দীভাষা নিজের আসন কায়েম করে নিয়েছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশেও হিন্দীভাষার প্রভাব ক্রমেই ব্যাপকতর হয়ে চলেছে। বাংলা দেশের কলিকাতা ও তার সহরতলী, বর্দ্ধমান ও ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই এই ভাষার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচিত।

হিন্দী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও উক্ত ভাষার কবিদের সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। পণ্ডিত ক্ষিতি-মোহন সেন শাস্ত্রী হিন্দীভাষার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন।

বাংলা ভাষায় নানা প্রবন্ধে ও আখ্যায়িকায় আমরা হিন্দী ভাষার অতি বিখ্যাত সন্ত কবিদের যথা তুলসীদাস, সুরদাস, নানক, দাদু, কবীর, পলটুদাস, মীরাবাঈ, কেশোদাস, হিত হরিবংশ, রহীম, রসখান, জায়সী প্রভৃতির রচনার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেছি।

বহুকাল আগেই ইউরোপের অধিবাসীদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণ এদেশবাসীদের সহিত ব্যবসায়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় সকলেই গোড়া থেকেই হিন্দীভাষার সহিত পরিচিত হয়েছিলেন।

ইংরেজগণ যখন থেকে এদেশে আসেন প্রায় তখন থেকেই হিন্দীভাষা আয়ত্ত করতে চেষ্টা সুরু করেন। হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমানে যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মূলে ইংরেজদের চেষ্টাও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যকরী হয়েছে। অবশ্য একথাও মানতে হবে যে ইংরেজদের এদেশে আগমনের গোড়ার দিকে এদেশবাসিগণ নিজেদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তেমন যত্নবান ছিল না। অনেকগুলি পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থও বিনষ্ট হয়েছিল।

মুসলমানগণ এদেশে এসে প্রথমে হিন্দীভাষাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু যখন এই ভাষায় রহিম, রসখান, জায়সী, মুবারক প্রভৃতি অতুলনীয় প্রতিভাশালী কবিদের অভ্যুদয় হ'ল তখন তাঁরাও এ ভাষার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শন করতে লাগল।

হেনরিখ নাথ (Henrich Noth) নামক একজন বিদ্বান্ জার্ম্মান ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে এসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকটে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আর একজন জার্ম্মান পণ্ডিত হেবক্স লেডেন (Habaksa Ladden) ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে ইংরেজদের জ্ঞান-লাভের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হয় ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় থেকে। অবশ্য দেশে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই তার বিশেষ আবশ্যকতা হয়েছিল। তাই সর্ব্বাগ্রে সর্ উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র ইংরেজী অনুবাদে। উক্ত অনুবাদ-গ্রন্থ বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল।

প্রাকৃত ভাষাসমূহ অধ্যয়নের জন্যেও অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের গ্রন্থাদি তাঁরা বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করেছিলেন।

ক্রমে দেখা গেল, হিন্দীভাষা শিক্ষা করা শাসকবর্গের একান্ত প্রয়োজন, অপরিহার্য্য বললেও চলে। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ডাক্তার জন গীল ক্রাইস্ট, কাপ্তেন আব্রাহিম লাকেট, মিঃ জে ডবলিউ টেলর ও ডাক্তার হণ্টার হিন্দী-ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়নে দেশীয় পণ্ডিত-গণকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেন এবং তারই ফলে পণ্ডিত লল্লুলালজী 'প্রেমসাগর' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন ও পণ্ডিত সদল মিশ্রজী নাচিকেতা উপাখ্যান হিন্দীভাষাতে পরম কৃতিত্বের সহিত অনুবাদ করেন। প্রায় তখন থেকেই হিন্দী গদ্য-লেখার সূত্রপাত হয়।

উইলিয়াম কেরী হিন্দীতে বাইবেলের অনুবাদ করেন—তা যেমনি বিশদ তেমনি যথাযথ হয়েছিল। এই অনুবাদ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

জন চেম্বারলেন ও জন ক্রিশ্চিয়ান হিন্দীতে কবিতা রচনা করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত দিল্লীবাসী টমসন সাহেব, ইটাওয়া-বাসী জনসন সাহেব ও বেডন সাহেবের নামও উল্লেখযোগ্য। সব চাইতে বেশী প্রখ্যাত হয়েছিলেন এথরিংটন সাহেব, যাঁর রচিত 'ভাষাভাস্কর' অদ্যাপি হিন্দী পাঠশালাসমূহে পড়ান হয়। কিশোরদের জন্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

হিন্দীভাষার সব চাইতে বেশী সেবা করেছেন ডাক্তার সর্ জর্জ গ্রীয়ারসন। হিন্দীভাষার প্রামাণিক ও তথ্যসংবলিত বিরাট ইতিহাস ও হিন্দী বিশ্বকোষ অভিধান তাঁর ঐকান্তিক অনুসন্ধিৎসা ও অক্লান্ত সাধনার ফল। ভারতবর্ষের রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়ে তিনি বিলাত যান, কিন্তু সেখানে যাবার

পরও তাঁর হিন্দী সাহিত্যসেবার অবসান হয়নি; হিন্দী সাহিত্যের সকল বিভাগের প্রতি সর্ব্বদা তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি হিন্দী ভাষার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আজীবন যত্নবান ছিলেন। হিন্দীভাষা যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ততদিন গ্রীয়ারসন সাহেবের অক্ষয় কীর্ত্তি ম্লান হবে না।

ডাক্তার হার্ণলী, মিঃ এফ এস গ্রাউজ ও মিঃ জন বীম্‌সও হিন্দীভাষায় অশেষ সেবা করে গেছেন। যাতে ইংরেজগণ এই দেশবাসীর উপর শুধু কর্ত্তৃত্ব করেই নিজেদের কর্ত্তব্য শেষ হ'ল বলে মনে না করে, যাতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত তাহারা সহানুভূতিপরায়ণ হয় এবং হিন্দীভাষার সহিত তাদের যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়, তার জন্যে উল্লিখিত ইংরেজ পণ্ডিতগণ প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে হিন্দীভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। অবশ্য শাসকবর্গের হিন্দীভাষা জানাও একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

একদা মুসলমানেরা যখন এদেশে এসে আধিপত্য বিস্তার করতে সুরু করেছিল তখন গোড়া থেকেই তারাও হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেছিল। তারা ঐ হিন্দী কথা ফারসী লিপিতে লিখে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি করে নাম দেয় উর্দ্দু। আসলে হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা বলা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হলেও হিন্দী লেখা সহজসাধ্য ছিল না, তাই আরবী ফারসী শব্দবহুল এক ভাষার—যাকে হিন্দীর রূপান্তর বললে অসঙ্গত হয় না—প্রচলন হল, এরই নাম রেখতা বা উর্দ্দু।

ইংরেজদের মধ্যেও অনেকে প্রথমে অশুদ্ধ হিন্দী শিখেছিলেন, কিন্তু উপরে যে সকল সুপণ্ডিত ইংরেজের নাম করা হ'ল তাঁরা হিন্দীভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, ভারতবাসীদের নিকট থেকে তাঁদেরও অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান দূর করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা এদেশবাসীগণের ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি বরং আংশিকভাবে ফলবতী হয়েছিল।

হিন্দীভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেছিলেন এফ এস গ্রাউস সাহেব। তিনি মহাকবি গোস্বামী তুলসীদাস-রচিত অমর কাব্য 'রামচরিত মানস' ইংরেজীতে সুললিত অনুবাদ করে অশেষ যশের অধিকারী হন। গ্রাউস সাহেব ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ উপাধি লাভ করে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আই-সি-এস পাশ করে বাংলাদেশে চাকরী করতে আসেন। প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ তিনি বাংলাদেশে সিভিলিয়ান রূপে কার্য্য করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উক্ত কাব্যের অনুবাদ সুরু হয়, শেষ হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইংরেজীতে তৎকৃত 'রামচরিতমানসের' অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর বিলাতের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অতি-প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহিত পরিচিত হন। এই পুস্তক বিলাতের বিদ্বৎসমাজের ভূয়সী প্রশংসা

লাভ করে। গ্রীয়ারসন সাহেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হওয়ার পর বিলাতে এই পুস্তক আরও ব্যাপকভাবে সমাদৃত হতে থাকে।

গ্রীয়ারসন সাহেব বহুভাষাবিদ্ ছিলেন ; তাঁর মত ভাষা-তত্ত্ববিদ্ আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নি। কথিত আছে তাঁর এক শত ত্রিশটি ভাষায় দখল ছিল। শুধু তাই নয়, অনেকগুলি ভাষাতে পরীক্ষা দিয়ে তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। হিন্দীভাষা তাঁর পরম প্রিয় ছিল এবং তিনি গোস্বামী তুলসী-দাসের রচনার এক জন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি 'রামচরিত মানসে'র অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইউরোপের পাঠকমণ্ডলীকে সচেতন করতে সমর্থ হন এবং তারই ফলে ডাক্তার টেসী টোরী নামক একজন ইটালিয়ান পণ্ডিত 'রামচরিত মানস' ইটালী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তা ইটালীর সর্ব্বত্র পরম সমাদৃত হয়।

হিন্দীভাষা গ্রিয়ারসন সাহেবের নিকট যে কতভাবে ঋণী তা বলে শেষ করা যায় না। তিনিই প্রথমে বিহারী-কবির 'সৎসই'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদকার্য্য ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। তাছাড়া হিন্দীভাষার মুসলমান মহাকবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর অমর গ্রন্থ 'পদ্মাবত' নামক বিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ তিনিই প্রকাশিত করেন।

জন বীম্‌স নামক আর এক জন ইংরেজ 'তত্ত্বার্থবোধক' ব্যাকরণ প্রণয়ন করে খ্যাতি লাভ করেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে হিন্দীভাষার আদি কবি চন্দবরদাঈর কবিতা অধ্যয়ন করে তাঁর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করেন। তিনি অনুবাদকার্য্যও আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তিতে তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

ডাক্তার হার্ণলী চন্দবরদাঈর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাসো'র প্রথম খণ্ড ইংরেজীতে অনুবাদ করে এসিয়াটিক সোসাইটির Bibliothica Indica নামক গ্রন্থমালার অন্যতম পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত করেন।

মিঃ এম এ মেকলীফ শিখদের বিখ্যাত ধর্ম্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেবে'র অনুবাদ ছয়খণ্ডে প্রকাশ করে অপার ধৈর্য্য ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

মিঃ ডাবলিউ আর জনসন বুন্দেলাদের ইতিহাস অনুবাদ করেন। ঐ গ্রন্থে বুন্দেলখণ্ডের বিখ্যাত লাল-কবির কাব্যগ্রন্থ 'ছত্রপ্রকাশে'র অনুবাদও সন্নিবেশিত হয়েছে।

হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের আর এক জন মর্ম্মজ্ঞ ও বিদেশী সেবক হচ্ছেন মিঃ ফ্রেডারিক পিন্‌কাট্‌। পিন্‌কাট্‌ সাহেব কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি। অথচ তাঁর দরদী ও সজাগ মন হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বদা সক্রিয় ছিল। কি প্রকারে হিন্দী সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ তার পরিপূর্ণ মহিমায় ও অপরূপ সৌন্দর্য্যে ইউরোপ-খণ্ডের সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায়ের জনগণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় তার জন্যে তিনি তাঁর তনুমনধন উৎসর্গ করেছিলেন।

এই মহামনা পণ্ডিতের জন্মভূমি, কর্ম্মভূমি ছিল বিলাতেই এবং সেখানেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে হিন্দীভাষাকে তিনি কি করে এত আপনার করে নিয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

হিন্দীভাষাতে লিখিত তাঁর পত্রাবলী বহু প্রসিদ্ধ হিন্দী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়ে হিন্দীভাষাভাষীদের অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে। ঐ সব পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, ইউরোপের সভ্যতা ও বর্ত্তমান সংস্কৃতিতে ভারতের অবদান কম নয়। ইউরোপের যে সংস্কৃতি প্রায় ছয় শত বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, তার মূলে ভারতীয় কৃষ্টির দান প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান।

তিনি আরও লিখেছেন যে সাহিত্যের দরবারে, বাণীর পবিত্র অঙ্গনে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন ঘোটেই অসম্ভব নয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়ের মিলন না হলে ইংরেজদের যে একদিন না একদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে এ ইঙ্গিতও তাঁর লেখায় আছে। এটাও তাঁর আশা ছিল যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি একদিন ইংরেজী অনুবাদের মারফতে সমগ্র বিশ্বের সমাদর পাবে।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ ছাড়া মিঃ আর পি ডিউহার্ষ্ট হিন্দী ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ মর্ম্মজ্ঞ ও অনুরাগী ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ডাক্তার জে এন কারপেন্টার বিলাতের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য অশেষ প্রযত্ন করেছিলেন। জব্বলপুরের প্রধান পাদ্রী Rov. Frank E. Keay হিন্দীভাষায় অসীম অনুরাগের জন্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। এমনিধারা হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী আরও বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নামোল্লেখ করে তালিকা বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু তা নিষ্প্রয়োজন। এই সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হিন্দীভাষা যাতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা হয়, সকল প্রদেশের অধিবাসিগণের নিকটে যাতে এর বোধগম্যতা ও জনপ্রিয়তা বাড়ে সে চেষ্টা প্রত্যেক দেশবাসীর করা একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।*

* এই প্রবন্ধ লিখতে আমি সর অর্জ্জ গ্রীয়ারসনের হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস ও হিন্দী বিশ্বকোষ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি।



প্রতি উৎসবে
রূপ সাধনার
প্রধান অঙ্গ
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর
কুমকুম
আলতা
"রূপং দেহি জয়ং দেহি"—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হ'বার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ—বল্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে "রাঙ্গাজবা"র নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ প্রতি উৎসবে "রাঙ্গাজবা"র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম্ম ও বয়স নির্ব্বিশেষে ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা।
অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

অস্পৃশ্যতার প্রতিকার

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী, কাব্যতীর্থ

বিরাট এই ভারতবর্ষে এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসী হিন্দুর তেমনি বিরাট এই সমাজদেহে দুরপনেয় কলঙ্ক-স্বরূপ হীনতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি যতগুলি দোষ . কালে কালে স্থানলাভ করিয়াছে ইহাদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা অন্যতম ও প্রধানতম।

বিষ মানুষের প্রাণ সংহার করে, কিন্তু সে বিষ যদি শোধিত হইয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত হয় তবে সে বিষ মৃতের দেহেও জীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। প্রথমতঃ এই অস্পৃশ্যতা, বোধ হয় সমাজদেহে সে ভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে জাতি যখন সে বিষের শোধন-প্রক্রিয়া ও মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ বিস্মৃত হইয়া অপপ্রয়োগ আরম্ভ করিল তখন হইতেই এই অস্পৃশ্যতা সমাজের অকল্যাণ সাধন করিতে লাগিল। ইহা সুদূর অতীতের কথা, কিন্তু আজ ইহার বিষময় ফল এত উগ্র আকার ধারণ করিয়াছে যে, জাতি আজ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এ কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নহে।

এই অস্পৃশ্যতা-বিষ দূর করিবার জন্য বহু সমাজ-হিতৈষী নানাভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা এমনি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মত হিন্দুর সমাজদেহে স্থানলাভ করিয়াছে যে কেহই ইহা সম্পূর্ণরূপে দূরীকরণে সমর্থ হন নাই। দুর্গতিকে মানুষ কায়মনোবাক্যে পরিহার করিতে চায়, কিন্তু দুর্গতি যেমন 'কমলি নেহি ছোড়্তা'র তায় মানুষকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া থাকে, ছাড়িলেও ছাড়িতে চাহে না—এই অস্পৃশ্যতাকেও তেমনি আমরা এত দিন প্রাণপণ প্রয়াস-সত্ত্বেও পরিহার করিতে পারি নাই। সৌভাগ্যক্রমে আজ সকলের মুখেই এক কথা—অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা কতকাল যাবৎ তো এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ সাফল্যলাভ হইল কই? কাজেই আজ এ বিষয়ে দুই-চারিটি কথা খোলাখুলি ভাবে বলিবার সময় হইয়াছে। বীজ যখনই উপ্ত হউক না কেন যথাকালেই তাহা অঙ্কুরিত হয়। নতুবা মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলন এত দিনে পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইবে না কেন? বহুদিন পূর্ব্বেই যাহাকে আমরা ফলপুষ্পে সুশোভিত দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতাম আজ তাহার অঙ্কুরোদ্গম মাত্র দেখিতেছি কেন? সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে "কালই সকলের নিয়ন্তা।" অস্পৃশ্যতা যে আজও টিকিয়া আছে সেজন্য ব্যক্তিগত ভাবে কাহাকেও বা কোন সমাজকে দোষ দিয়া লাভ নাই। আজ সমস্যা দাঁড়াইয়াছে সকলেরই সম্মুখে। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। আজ সকলকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। নতুবা ইহার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে "ইতো দেয়ং ততো গ্রাহ্যম্" অর্থাৎ বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট হইতে নিবেও দিবেও] এই দেওয়া-নেওয়া বিষয়ে সমাজ-শিরোমণি দুই জন মহামহোপাধ্যায়ের মধ্যে দীর্ঘ দিন ব্যাপী মসীযুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কে জয়লাভ করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু ইহাকে দেশবাসীর কোন লাভ হয় নাই। আজ যদি ইহা সংঘটিত হইত তাহা হইলে ইহা সর্ব্বসাধারণে মনোযোগ দিয়া পড়িত এবং শুনিত, কাজেরও সহায়তা হইত।

অস্পৃশ্যতা হিন্দুর সমাজদেহে অস্থিমজ্জাগত দুরারোগ্য ব্যাধি-স্বরূপ এবং ইহা যুগযুগান্তরের কুসংস্কার, সুতরাং ইহার দূরীকরণোপযোগী মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে কিছু সময় লাগিবেই। বাংলাদেশে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অগ্রণী বলা চলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম আচণ্ডাল সবাইকে 'নাম' দিয়া স্ব-সম্প্রদায়ে গ্রহণ আরম্ভ করেন। সে আজ প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ইহার ফল কি

হইয়াছে? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতছাড়া হইয়া গেলে শিক্ষা-দীক্ষায় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন না হইয়াও একটা জাতি যে কতখানি অধঃপতিত হইতে পারে বর্ত্তমান হিন্দু জাতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নতুবা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুসৃত নীতি বহুদিন পূর্ব্বেই ফলপ্রসূ হইত। আমার কথা, হিন্দু জাতি যে আজ কি কারণে অধঃপতনের এতদূর গভীর গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে তাহা দেশের নেতৃস্থানীয় বিচক্ষণ ও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বেকার, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনুসৃত অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ও অস্পৃশ্যকে সমাজে গ্রহণ নীতি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহারা কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। দীর্ঘ দিন যাবৎই নানাবিধ ঘাতপ্রতিঘাতে এই অস্পৃশ্যতার প্রতি জনসাধারণের মনে একটা বিরক্তির ভাব দিন দিন পুঞ্জীভূত হইতেছিল, কিন্তু আজ তাহা চরমে উঠিয়াছে। তাই আজ সকলেই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু প্রশ্ন হইল—কি বর্জ্জন করিতে হইবে, কি গ্রহণ করিতে হইবে এবং কি রক্ষা করিতে হইবে? অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে হইবে, তাই বলিয়া বিধবা ঠাকুর মা 'নাতির' ছোঁয়া খান না এই ধরণের অস্পৃশ্যতা বর্জ্জননীতি অনুসরণ করিলেই শুধু চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ বাহিরে সকল বর্ণে মিলিয়া আহার করিয়া পত্রিকায় ছাপাইয়া ঘরে আসিয়া অস্বীকার করিবার মনোবৃত্তি পরিহার করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ব্যক্তিবিশেষ যদি হরিজন জাতের সঙ্গে আহার করিতে না চায় তবে তাহার উপর বলপ্রয়োগ করাও সমীচীন হইবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন পত্রিকা-সংশ্লিষ্ট একজন আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের জন্য প্রবন্ধ লিখুন আমি তাহা পত্রিকায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করিব। উত্তরে আমি পূর্ব্বোক্ত মনীষিদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম দেখুন, এসবে কিছুই হইবে না। আমার মতে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রধান উপায় হইল—যাহারা সমর্থ এমন সকল বর্ণহিন্দুর পাচক ও ভৃত্যের কাজে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের নিযুক্ত করা। তাহা হইলে যে কেহই উক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবে তাহাদের সকলেরই দীর্ঘ দিনের অস্থিমজ্জাগত সংস্কারের মূলে আঘাত লাগিতে লাগিতে এক দিন না এক দিন তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। কিন্তু তখন তিনি আমার কথায় খুব মনঃসংযোগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আমি কিন্তু দৃঢ়তার সহিত এখনও সেই কথাই বলিতেছি। ইহাতে যত শীঘ্র অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হইবে তত শীঘ্র আর কিছুতেই হইবে না। আর এ বিষয়ে পুরুষের চেয়ে নারীর কর্ত্তব্য অনেক বেশী; কারণ তাঁহারাই হইলেন গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। অথচ আমাদের সমাজে পুরুষগণ অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন ব্যাপারে যতখানি অগ্রসর নারীগণ ঠিক ততখানি পশ্চাৎপদ। নারীরা যতই অগ্রসর হইবেন অস্পৃশ্যতাও ততই দ্রুত দূরীভূত হইবে।



সকল বর্ণে মিলিয়া একত্র আহার করা অস্পৃশ্যতা বর্জনের অন্যতম উপায় বটে, কিন্তু সেইজন্যই যত্রতত্র যা তা আহার করা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কিনা তাহা ধীরভাবে বিবেচ্য। আমার পক্ষে একেবারে অতীত যুগে ফিরিয়া যাওয়া যেমন ভাল হইবে না তেমনি বর্তমানেরও সবকিছুকেই নির্বিচারে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখাও যে ভাল নয় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতীতের সুগুণগুলি গ্রহণ করিতে হইবে তেমনি বর্তমানের দোষত্রুটিগুলিও বর্জন করিতে হইবে—তবেই আমরা নির্বিঘ্নে ও নির্বিবাদে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব। অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হইতেছে এই যে, কোন কোন তথাকথিত নীচশ্রেণীর লোক বর্ণহিন্দুর গৃহে প্রবেশ করিলে অথবা অন্নাদি স্পর্শ এমন কি জল পর্য্যন্ত ছুঁইলে তাহা অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই আমরা প্রথমতঃ কঠোর হস্তে নিবারণ করিতে চাহিতেছি। শুধু তাহাই নয় একাজ যাহাতে আশু সুসম্পন্ন হয় সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এই অস্পৃশ্যতাই আমাদের হিন্দু সমাজের তথা স্বাধীনতা-সংগ্রামের কতখানি যে অনিষ্টসাধন করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়া কি কি বাধার সম্মুখীন হইয়াছি তাহা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে—প্রথমতঃ, বর্ণহিন্দুদিগের জাত্যভিমান ও গোঁড়ামি, চিরাচরিত সংস্কার ও সামাজিক নিন্দার ভয় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ তথাকথিত অনুন্নতদিগের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহা একটা প্রবল বাধা। আশা করা যায় আজ হিন্দুর এই দুর্দিনে কি বর্ণহিন্দু কি অনুন্নতশ্রেণী সকলেই তাহাদিগের দুর্বলতাগুলি অচিরে পরিহার করিয়া দৃঢ় ও সবল মনোবৃত্তির পরিচয় দিবেন। আজ এক দিকে যেমন আমাদের সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজন, অন্য দিকে তেমনি দৃঢ়তা ও সবলতারও প্রয়োজন। একথা সর্ব্বদাই মনে রাখা অবশ্যকর্তব্য যে দুর্ব্বলমনা ব্যক্তিরা কোন মহৎ কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আমরা যতই অনুন্নতশ্রেণীকে নিকটে টানিবার চেষ্টা করি তাহারা যেন ততই বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি লইয়া দূরে সরিয়া থাকিতে চায়। অবশ্য বর্তমানে তাদৃশ মনোবৃত্তির অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত, তপশীলী, হরিজন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। উক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করার অর্থ কি এই নহে যে, আমরা তাহাদিগকে সমাজে যতই পাংক্তেয় করিয়া লই না কেন একটা হীনতার ছাপ তাহাদিগের আষ্টে-পৃষ্ঠে থাকিয়াই যায়। এখন সময় আসিয়াছে—যখন সমস্ত অনুন্নত পদবী উঠাইয়া তাহাদিগের জন্য এমন পদবীর ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে কি দেশে কি বিদেশে অনুন্নত বলিয়া তাহাদের হীনতাসূচক সংজ্ঞা থাকিবে না।

ব্রিটিশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত বিভেদ চলিয়া যাইবে এই আশা অনেকে পোষণ করেন কিন্তু আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহা কখনও সম্ভব হইবে না। সুতরাং আমাদের জাতীয় সঙ্ঘবদ্ধতার নিতান্ত প্রয়োজন। এই কথা গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

চোমরা গ্রামের প্রাচীন বৈভব

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

খুলনা বাগেরহাটের অন্তঃপাতী মোরলগঞ্জ থানার অধীন চোমরা একটি প্রাচীন পল্লী। এক সময় ইহাতে অনেক উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাস ছিল।

ভারতেশ্বর আকবর বাদশাহ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়াধিপ দায়ুদকে বিতাড়িত করিয়া যখন বঙ্গদেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন রাজা তোডরমল্ল নিবিড় অরণ্যময় নিম্ন-বঙ্গের শাসনসৌকর্য্যের জন্য যে সমস্ত তৌজি সৃষ্টি করেন চোমরার তৌজি তাহাদের অন্যতম। জমি-জমা ইত্যাদির পরিমাপাদি সমাপ্তির পর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উপর যশোহর রাজ্যের আধিপত্যের ভার অর্পিত হয়। সুদক্ষ অমাত্য রাজা কালিকাপ্রসাদ আধুনিক বাগেরহাট উপ-বিভাগের প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন।

রাজকীয় অর্থে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন, রাজপথ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইল। নিষ্কর ভূমি দানাদির দ্বারা গৌড়, রাঢ়, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে অভিজাত-বংশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের আনাইয়া উপনিবেশ গঠিত হইল। চাপড়ি, তেলিগাতি, আঠারগাতি, পানবাড়িয়া, বিষ্ট, সোনারকোলা, ভাটকোলা, বাদলপাড়া, বাবুনকাটি, চোমরা প্রভৃতি পল্লীসমূহ সেই সময়েই গড়িয়া উঠে। ইচ্ছামতী নদীর উভয় তীরে মনুষ্যবসতিগুলি ধান্য-সম্পদে ও ধনৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এতদঞ্চলের সামাজিক বন্ধন চোমরার বিখ্যাত নামেই পরিচিত ছিল।

চোমরা-সমাজ যে সংস্কৃতির দীপ প্রজ্বলিত করে, সুন্দরবন-সান্নিধ্যে বিক্রমাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত অভাভ জনপদ তাহার সমুজ্জ্বল প্রভায় সমুদ্ভাসিত হয়। চোমরার আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি শিক্ষা-দীক্ষা নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

তখন দেশে উর্দ্দুর প্রভাব ছিল বিপুল। অনেক উর্দ্দু শব্দ এই সময় বঙ্গভাষায় অঙ্গীভূত হয়। "চোমরা" উর্দ্দু শব্দ—শ্রেষ্ঠত্ববোধক। "হোমরা-চোমরা" "চোমরামে লওয়া" প্রভৃতি বাক্যাংশ এখনও সচরাচর ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

চোমরা গ্রামের বদজ কায়স্থ-বংশীয় রায়হাট ঘোষ চৌধুরী এতদঞ্চলের একজন ভূস্বামী ছিলেন। তিনি সমাজের একজন

মান্যগণ্য ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার ভদ্রাসনচিহ্নিত পল্লী "চোমরা" বিশেষণে বিশেষিত হইল। বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সূত্রধর, মোদক, মালী, কুম্ভকার প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির সমাবেশে চোমরায় জনসম্পদ বৃদ্ধি করা হয়। বৈদ্যভিটা কোন চিকিৎসকের বসতির নির্দেশক। চোমরা গ্রামের চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তি সম্পর্কিত বহু কাহিনী আজও লোকমুখে শোনা যায়। এ সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। দূরদূরান্তর হইতে বহু ভক্ত এই স্থানে আসিয়া উক্ত বিগ্রহের পূজা-অর্চনা সমাপনান্তে বাঞ্ছিত কর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন। বাসুদেবের শেষ পুরোহিত কেলাস ঠাকুরের গৃহদাহে বিগ্রহটি দগ্ধীভূত হয়। বস্তুত কোন পাপের ফলে এইরূপ অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা মনে করিয়া পুরোহিত ঠাকুর একেবারে মুষড়াইয়া পড়িলেন এবং দগ্ধ-মূর্তিটিকে কোন সাধকের হস্তে সমর্পণ করিয়া সাশ্রুনয়নে পুত্রকলত্রসহ স্থান ত্যাগ করেন। বর্তমানে খুলনা-বাগেরহাট লৌহপথের যাত্রাপুর ষ্টেশনের সান্নিধ্যে সাটজালা পল্লীর গোপাল-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে এই মূর্তিটি সন্নিবেশিত। গ্রামমধ্যে কাশীদত্তের ভিটা, বসু চৌধুরীর ভিটা, ঈশ্বর মালীর ভিটা, পালের ভিটা সংজ্ঞিত স্থানসমূহও হিন্দু-বসতি জ্ঞাপক।

খাতকের পরিবেষ্টিত ঘোষচৌধুরীর ভিটায় স্থানান্তর হইতে আগত কোন নমঃশূদ্র পরিবার কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জন করিয়া পুরুষানুক্রমে প্রায় এক শত বৎসর যাবৎ বাস করিতেছে। এই অংশের পরিচায়ক সংজ্ঞা—নমঃশূদ্র হাওলাদারের বাসা-বাড়ী। ভদ্রাসনের উত্তর কোণে একটি মন্দির ও ইষ্টক-স্তূপ অতীতের সহিত বর্তমানকে সম্বন্ধ রাখিয়াছে। "মঠবাড়ী" স্থানটিরই নামান্তর।

মন্দিরের উচ্চতা পয়তাল্লিশ ফুট। বহির্ভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ত্রিশ ফুট ত্রিশ ফুট। প্রাচীরের বেড় পাঁচ ফুট। ভিত্তির অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। দক্ষিণ দিকের অলিন্দের আয়তন ষোল ফুট, পাঁচ ফুট ও বিশ ফুট। চারিটি স্তম্ভের উপর ইষ্টক নির্মিত সুদৃঢ় আচ্ছাদন। ইহা অতিক্রম করিয়া মন্দিরে ঢুকিতে হয়। এইটিই প্রধান দ্বার। এই দ্বার এত সঙ্কীর্ণ যে ইহা দিয়া দুই জন লোক এক সঙ্গে কোনক্রমে গতায়াত করিতে পারে। অভ্যন্তর-দেশ তিন ভাগে বিভক্ত। মধ্যস্থলে সিদ্ধেশ্বরী দেবী পূজিত হইতেন। উত্তর দিকের প্রাচীরগাত্রে বার ফুট দীর্ঘ এবং ছয় ফুট প্রস্থ দেব-অধিষ্ঠানের চিহ্ন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি—আরবীয় স্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত। ইহার চতুষ্পার্শ্ব মঞ্জুবদ্ধ পুষ্প-স্তবক শোভিত। পশ্চিমাংশে নারায়ণ শিলা, লক্ষ্মী জনার্দন, শীতলা, মনসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিগ্রহের চারিটি কুলুঙ্গী। উত্তরার্দ্ধে একটি মাত্র কুলুঙ্গী—শিবলিঙ্গের পূজাস্থল। এদিকেও একটি দরজা। দ্বার অর্গলবদ্ধ করিবার ছিদ্র প্রাচীরগাত্রে অদ্যাপি সুস্পষ্ট নজরে পড়ে।

মন্দিরের ইষ্টকগুলি প্রাচীন ধরণের—এক একখানি দক্ষ

বৃংখণ্ড। চূণ-বালি, চূণ-সুরকি এবং শুধু মাত্র চূণে ইষ্টকসমূহ গ্রথিত। দেবায়তন-শীর্ষে নানা জাতীয় পাদপে একটি অনবদ্য জঙ্গল সৃষ্ট হইয়াছে। ত্রিশ হস্ত ব্যবধানে একটি বৃহদাকার তিন্তিড়ী বৃক্ষ ইহার উপর শাখিতাবস্থায় বর্দ্ধিত হইতেছে।

প্রাচীর-গাত্রে খোদিত লতা-পত্র-চক্র প্রভৃতিতে উচ্চাদের ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন বিদ্যমান। দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোয়াল মঠ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ভবন এই প্রাচীন দেবস্থলীর অনুরূপ কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত। নদীয়া শান্তিপুর এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষ স্থপতিগণ কর্ত্তৃক এই পূজামণ্ডপ রচিত হয়। তখন মুসলমান রাজত্বকাল। ভাষায়, আচরণে, হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব তখন কতকটা অনুপ্রবিষ্ট হয়। দেবশালার এরূপ আকৃতি—মুসলিম কৃষ্টিরই অনুকৃতি।

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে রামসর্ব্বস্ব ঘোষ চৌধুরীর দিল্লী গমনের সুযোগ ঘটে। আগ্রার তাজমহলের নির্ম্মাণকার্য্য তখন সবেমাত্র পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়—তাজমহল-সৌধের গঠনসৌষ্ঠব তাঁহার অন্তরে যে রেখাপাত করে, তাহাই রহিয়াছে চোমরা গ্রামের কারুকার্য্যখচিত সিদ্ধেশ্বরী-নিকেতনের পরিকল্পনার মূলে।

স্তূপের অধিকাংশ ভূগর্ভগত; ইহার বর্ত্তমান আকার ছয় × চারি × পাঁচ ফুট। বল্মীক মৃত্তিকায় ইষ্টকগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। দূর্ব্বা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় তৃণরাজি ইহার অঙ্গ-শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

উত্তর পার্শ্বস্থ কৃষিক্ষেত্রে খনিত দুইটি দীর্ঘিকা অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে। বৃহত্তরটি দুই শত × এক শত হস্ত। ক্ষুদ্রতরটি আশী × ষাট। প্রতি বৎসর হলকর্ষণ কালে জলাশয় দুইটির জীর্ণ সোপানাবলীর মৃত্তিকাবৃত ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহাদের সু-উচ্চ পাড় এখনও ভগ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষাৰ্দ্ধে ইচ্ছামতী ক্রমশঃ ক্ষীণ-স্রোতা হইতে থাকে। পুঞ্জীভূত বর্ষার জল, বন্যার বারিরাশি জনপদসমূহকে জলাভূমিতে পরিণত করে—ফলে উক্ত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া সন্নিপাত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ দেখা দেয়। তেলিগাতি, মালমগাছা বামনকাটি ও চোমরা প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা ক্রমে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। মনুষ্যবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ ক্রমে সম্পূর্ণরূপে জনমানবশূন্য হইয়া ধীরে ধীরে নল-খাগড়া, হোগলা আদি জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া পড়িল।

রায়েরকাটি, খলিশাখালি, দৈবজ্ঞহাটি, সোলারকোলা, প্রভৃতি পল্লীর অনেকে চোমরা-সমাজের লোক বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন।

খলিশাখালি গ্রামের ঘোষ চৌধুরী-পরিবার চোমরার ভূম্যধিকারী বংশীয়। ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর পরিত্যক্ত স্থানসমূহে পুনরায় জনবসতি আরম্ভ হয়। শতবর্ষে ভূমির উচ্চতা আড়াই ফুট হইয়া থাকে। ইংরেজী ১৮৫৮ অব্দে জলাভূমি প্রায় পাঁচ ফুট উন্নত হয়।

তেলিগাতি গবর্ণমেণ্টের খাসমহল। এখানকার ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। প্রান্তরবক্ষে কালিকা দীঘি রাজা কালিকাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত জনপদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে সমস্ত জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে সু-উচ্চ পাড় ছিল, সেইগুলি আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

অধুনা দেববিগ্রহশূন্য হইলেও এই প্রাচীন মন্দির হিন্দু-সংস্কৃতির নিদর্শন-স্বরূপ। নিভৃতে অবস্থিত এই দেবায়তনটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় লোকদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ৩য় সংস্করণ। ২৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য—চারি টাকা। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

এই বইখানা বাঙালী-সমাজের ইতিহাসের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা সকলেই জানেন। এরূপ সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ তথ্য-সংগ্রহকে ভিত্তি করিয়াই আমরা জাতীয় অভিব্যক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারি। ব্রজেন্দ্রবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতি সংস্করণেই পূর্ব্বকার ভুল সংশোধন এবং নূতনপ্রাপ্ত সত্য খবর যোগ করিয়া দিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই তৃতীয় সংস্করণে কয়েকটি পৃষ্ঠা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি (যেমন রসরাজ অমৃত বসুর আত্মকাহিনী) ছাপানতে জ্ঞানপিপাসুদের বিশেষ সুবিধা হইবে। অনেকেই ঋণ স্বীকার না করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজ রচনায় স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা যেন এই সংস্করণে নিবদ্ধ সংশোধনগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন—অন্ততঃ তাঁহাদের পাঠকগণ যেন এই সতর্কবাণী মনে রাখেন। এইরূপ নির্ভুল সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের উপাদান বহু মূল্যবান। এজন্য ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকট আমরা নানা ক্ষেত্রে ঋণী।

শ্রীযদুনাথ সরকার

কুরপালা—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। দেশপ্রিয় গ্রন্থালয়, ৬১, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

ইহা একখানি উপন্যাস। নদীবহুল পূর্ব্ববঙ্গের একখানি গ্রাম—কুরপালা। পল্লীর অধিকাংশ অধিবাসীই জেলে এবং চাষী। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ইহাদের জীবনধারা একটানা চলিতেছিল। জমিদারীর অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিয়াছে। ব্যবসাদার এবং ধনিকের আমদানি যান্ত্রিক সভ্যতার সংঘাতে সেই শান্ত মন্থর কৃষি-নির্ভর জীবনযাত্রার মধ্যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। সেই সঙ্গে লবণ-সত্যাগ্রহ এবং গান্ধী-আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাতে পল্লীজীবনের মধ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হইল বইখানিতে সেই ছবি দেখানো হইয়াছে। জমিদারের ছেলে শঙ্কর সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসের নায়ক শঙ্কর। হাস্নু, পদ্ম প্রভৃতি অনেকগুলি স্ত্রী-চরিত্র থাকিলেও নায়িকাপদবাচ্য কেহ নয়। উপন্যাসখানি যুগসন্ধিকালের একটি পল্লী-চিত্র। চিত্র হিসাবে ইহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া চরিত্র-গুলি জীবন্ত। স্থান ও কালের মধ্যে যে মানুষগুলি ধরা পড়িয়াছে তাহারা আলোকপাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের সম্পূর্ণতা। কাহিনী যে সমাপ্তির অপেক্ষা করে এরূপ ক্ষেত্রে সেই সমাপ্তি থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে

সুকৌশলে পরিস্ফুট করিয়া গ্রন্থকার শেষ পর্য্যন্ত আমাদের আগ্রহকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন। এইখানে তাঁহার কৃতিত্ব। "কুয়পালা" বহু অপরিচিতকে পরিচিত এবং বিস্মৃতকে স্মরণ করাইয়া দেয়। উপন্যাসটি পাঠকের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে।

পঙ্গপাল—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা আট আনা।

ছোট গল্পের বই। আটটি গল্পের সমষ্টি। চতুর্থ গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে—"পঙ্গপাল"। ছোট গল্পের বিষয়বস্তুর অন্ত নাই। রচয়িতার দৃষ্টি ও রুচির উপর বিষয়ের নির্ব্বাচন নির্ভর করে। জীবনের যে অংশ পীড়াদায়ক বলিয়া সাধারণতঃ দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়, লেখক সেই অংশ বাছিয়া লইয়াছেন। "ধোঁয়া" ও "পঙ্গপাল" পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুইটি চিত্র। মন্বন্তরের বিভিন্ন দিক লইয়া বহু লেখক গল্প লিখিয়াছেন। অনেক গল্পেই ভয়ঙ্কর অপেক্ষা বীভৎস দিকটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকারের শক্তি আছে। বর্ণনাগুণে দৃশ্য ও ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ হইয়া ওঠে। সমাজের যেথায় গ্লানি লেখক নির্ম্মমভাবে সেই স্থানগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ইচ্ছা করিলে তিনি মূল ব্যাধি নির্ণয় করিতে পারিতেন, তাহা হইলে গল্পগুলিতে বীভৎস অপেক্ষা ভয়ঙ্কর রসই বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিত। আটটি গল্পই বিষয়বস্তুতে বিচিত্র। "পঙ্গপাল" ছোট গল্পের ক্ষেত্রে লেখককে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

উপনিষদ—প্রথম খণ্ড : ঈশ, কেন, কঠ। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৹

এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ এই তিনখানি প্রসিদ্ধ উপনিষদের সংস্কৃত মূল বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং শঙ্কর ও রামানুজের মতানুসারে ইহাদের ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সার বাংলা ভাষায় উপনিবদ্ধ হইয়াছে। মাঝে মাঝে মধ্বাচার্য্যের মতও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে রামানুজের ব্যাখ্যার আকর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—কোন্ গ্রন্থে কোন্ প্রসঙ্গে রামানুজ উপনিষদের আলোচ্য অংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা বিবৃত হইয়াছে। সর্বত্র এইরূপ না করার হেতু বুঝা যায় না। যাহা হউক, উপনিষদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় যে বিভিন্ন মত পোষণ করেন সাধারণ ভাবে তাহা বুঝিবার পক্ষে এই গ্রন্থ সহায়ক হইবে। বিশেষতঃ বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া উপনিষদের রামানুজী ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়া গ্রন্থকার বাঙালী পাঠকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

"অপমানিতা মানবী"—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮ সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট। পৃ. সংখ্যা ২০১, মূল্য—৩৲

যুগধর্ম্মের বশে মেয়েদের মনও যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, আর এটা অস্বাভাবিকও নয়; কিন্তু দেশ বা সমাজ এর জন্য বেশ প্রস্তুত হইয়া না ওঠায়, এখনও এই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পদে পদে বিঘ্ন। শিক্ষিতা যুবতী কল্পনার জীবনের মধ্যে লেখিকা এই জিনিষটি ফুটাইয়া

তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পদে পদে বাধার সম্মুখীন হইবার মত তেজস্বিতা কল্পনার চরিত্রে আছে, কিন্তু এক এক জায়গায় তাঁহার উগ্রতা এবং পুরুষ সম্বন্ধে একটা চ্যালেঞ্জের ভাব দেখিয়া মনে হয় পুরুষের প্রতি বিদ্বেষবশেই লেখিকা এই চরিত্রটি সৃষ্টি করিয়াছেন। কল্পনার আপিস-জীবনে তাহার চারি দিকে যে রকম পুরুষের সমাবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের ব্যবহারে যা ভঙ্গি এবং মুখে যা ভাষা দিয়াছেন তাহাতে এই ধারণাই মনে বদ্ধমূল হয়।

লেখিকা একটা সমস্যা লইয়া উপন্যাসটি লিখিয়াছেন নিশ্চয়। কিন্তু মনের সেই নিরপেক্ষতাটুকু রক্ষা করিতে পারেন নাই—যাহাতে সমাধানের একটা আদর্শ রূপ ধরিয়া দিতে পারেন। এ ধরণের উপন্যাস নিজের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হইয়া পড়ে, পাঠকের মনে তিক্ততা জাগায় মাত্র।

রচনার দিক দিয়া বইটি ভাল হইয়াছে; ভাষা স্বচ্ছ, চিন্তারও মৌলিকতা আছে; বিচারের নিরপেক্ষতা থাকিলে লেখিকার কাছে ভাল জিনিষ পাইব বলিয়াই আশা হয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

যাঁরা ছিলেন মহীয়সী :—ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ, পিএইচ-ডি। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, আশুতোষ লাইব্রেরী। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৸০।

আমাদের দেশের নারীজাতি ইচ্ছা করিলে সংসারের, তথা সমাজের কত যে উপকার তাঁদের ছোট বড় নানা কাজের দ্বারা, নিঃশব্দে করিতে পারেন তাহারই কয়েকটি কাহিনী পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। সারদা ঠাকরুণ, দরবারী বৌ, চৌধুরীদের ছোট বৌ এবং ছোড়দি এই চারিটি কাহিনীতে পুস্তকখানি সমাপ্ত। কাহিনীগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে, কিন্তু এদের প্রকাশ ঘটিয়াছে বিভিন্ন পরিবেশে। লেখকের সহজ ভাষা স্বাভাবিক ঘটনা-প্রবাহের সহিত চমৎকার খাপ খাইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

মাদাম বোভারি—(প্রথম খণ্ড) গুস্তাভ ফ্লবেয়ার—অনুবাদক: শ্রীশীতাংশু মৈত্র এম-এ। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা

গুস্তাফ ফ্লবেয়ার ফরাসী সাহিত্যের একজন দিকপাল। তাঁহার মাদাম বোভারি শুধু ফরাসী-সাহিত্যের নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ অথচ কুখ্যাত গ্রন্থ। এই পুস্তকের সঙ্গে একটি ইতিহাস জড়িত আছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইহাতে ব্যভিচারের প্ররোচনার পরিচয় পাইয়া ফরাসী রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া উঠেন এবং সামাজিক অপরাধের জন্য ফ্লবেয়ারকে শাস্তি দিবার আয়োজন করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়, যে-সমাজের ছবি তিনি আঁকিয়াছেন তাহা নিছক তাঁহার কল্পনার সৃষ্টি নহে, আসলে ফরাসীদের সমাজ-জীবনই তখন তলে তলে ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজের নরনারী তখন প্রবৃত্তির রাশ আল্‌গা করিয়া দিয়া দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। 'মাদাম বোভরি'তে সেই উন্মার্গগামী সমাজের চিত্রই হুবহু রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। ব্যভিচারের মসীলিপ্ত হইলেও ইহা তদানীন্তন ফরাসী-সমাজের সত্যচিত্র।

ডাক্তার চার্লস বোভারির পত্নী, সন্তানবতী মাদাম বোভারির অবৈধ প্রণয়লীলার কাহিনীই এই উপন্যাসের চৌদ্দ আনা জুড়িয়া আছে। স্বামীর প্রতি অনুরক্ত এমা প্রথমে আসক্ত হইল লেঁও-এর প্রতি, তার পর সে আত্মসমর্পণ করিল ব্যভিচারী রুদলফ্‌কে—যাহার কাছে প্রেম মানে দেহকামনা। এই দেহসর্ব্বস্ব প্রেমিক একদিন এমাকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল। এই অতি সাধারণ বিষয়বস্তুকে ফ্লবেয়ার এমনি শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহা পাঠককে চমকিত করে। নিসর্গচিত্রণ আর এমার রূপবর্ণনার জায়গাগুলি অনবদ্য—পড়িতে গদ্য-কাব্যের মত লাগে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় তাহা এই যে, মাদাম বোভারিতে ব্যভিচারের কথা আছে সত্য, কিন্তু তথাকথিত অশ্লীলতা নাই বলিলেই চলে। এ বিষয়ে ফ্লবেয়ার অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। অথচ ফরাসী সাহিত্যে অশ্লীলতায় একেবারে ছড়াছড়ি। মোপাসাঁ'র The Window গল্পে যে ধরণের অশ্লীল বর্ণনা আছে বোধ হয় তাহার তুলনা সচরাচর মেলে না। ইহার উপর সরকারের নেকনজর পড়ে নাই, অথচ 'মাদাম বোভারি'কে রাজরোষে পড়িতে হইয়াছিল, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য লাগে। নগ্ন সত্যের প্রকাশেই কি তদানীন্তন অচলায়তন রাষ্ট্রের ভিৎ নড়িয়া উঠিয়াছিল। শীতাংশু বাবুর অনুবাদ স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়াছে। এ অনুবাদ 'মাদাম বোভারি'কে গাউনের বদলে শাড়ী পরানো জাতীয় ব্যাপার নহে, এই উপন্যাসের নায়িকাকে তিনি নব মূর্ত্তিতে গড়িয়া তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

গ্রহরত্ন বিজ্ঞান বা রত্ন-সমীক্ষা—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। ভারত-সাহিত্যভবন। ২০৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশুভ গ্রহকে প্রসন্ন করিবার জন্য, গ্রহপূজা এবং বিশেষ ভাবে সমীক্ষাপূর্ব্বক ও শোধনান্তর গ্রহরত্নাদি ধারণের বিধি আছে। জ্যোতিষ বেদের অঙ্গ। গ্রহ-রত্ন-সমীক্ষার কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। যথা—অথাতঃ গ্রহ-রত্ন সমীক্ষানুক্রমিষ্যামঃ। ঋক্ ১।১।১।১—অর্থাৎ, 'অনন্তর গ্রহরত্ন সমীক্ষা বিষয়ে যথাক্রমে বর্ণনা করা হইতেছে।'

মহাভারত যে বিগ্রহাপক অথর্ব বেদেও তাহা উল্লিখিত আছে। যথা:— দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভুবা। বিষ্কন্ধং সর্বা রক্ষাংসি ব্যায়ামে সহামহে। অথর্ব: ২।১।৪।৪। জাতকের জন্মকুণ্ডলীতে কোনো গ্রহ যদি নীচস্থ, পাপযুক্ত পাপপীড়িত অথবা পাপদৃষ্ট হয় তবে তাহা অশুভ ফলের উৎপত্তি করিয়া থাকে। জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, গ্রহরত্নাদি ধারণ করিলে উক্ত গ্রহদোষের খণ্ডন হইয়া সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়। গ্রহরত্নাদির অশুভ-নাশকারিতায় যাঁহাদের আস্থা আছে তাঁহারা গ্রহরত্নবিজ্ঞান একখানি নিত্য ব্যবহার্য্য পঞ্জিকার মত সঙ্গে রাখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। কিন্তু ইহাকে শুধু গ্রহরত্নের প্রশস্তিমূলক একখানি পুস্তক বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের বিশদ্ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম গ্রন্থকার স্বীয় বক্তব্য সমর্থনকল্পে বেদ উপনিষদ গীতা ষড়্দর্শন, মনু সংহিতা, জ্যোতিষশাস্ত্র, এমন কি চরক সুশ্রুত হইতেও ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলও অপূর্ব্ব।

চক্রধারী—শ্রীঅজিৎকুমার সেন। বুক ষ্টাণ্ড, ১।১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

আলোচ্য উপন্যাসখানি ভারতের গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। লেখক এই কাহিনীটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বাস্তব ও ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমিকায়। ১৯৪২ এর আগষ্ট আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া কাহিনীর সূচনা, আর ১৯৪৫ এ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী অফিসারদের মুক্তি-আন্দোলন উপলক্ষে ছাত্রদের আত্মাহুতিতে ইহার পরিসমাপ্তি। উপন্যাসের নায়ক শ্রীমন্ত ওরফে মধুর দত্ত ছিল আগষ্ট বিপ্লবেরও অন্যতম প্রধান নায়ক। বারখোলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন জ্বালাইয়া দিয়া সে হইল পলাতক। তার পর এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া সে ছদ্মনামে আত্মগোপন করিয়া রহিল—মন্ত্রশিষ্যা সৌদামিনীর সঙ্গে হইল তাহার বিচ্ছেদ। নূতন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে ব্যর্থ হইল। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তার অন্তরের আগুনের দু'একটি স্ফুলিঙ্গ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িয়া আচমকা তার সহকর্মীদের চমক লাগাইয়া দিত। শেষ পর্য্যন্ত সে সেই ক্ষুদ্র শহরে নিশ্চিন্ত আরামের আশ্রয় ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে জানিতে পারিল যে, তাহার উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কাহিনীর কাঠামোটি মোটামুটি এই। শ্রীমন্তর চরিত্র ভালোই ফুটিয়াছে, বরং এত বেশী ফুটিয়াছে যে, তাহা যেন আর সমস্ত চরিত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সৌদামিনীর দৃপ্ত আত্মমর্য্যাদাবোধ ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু সুধীরকে তাহার জীবনের একটা অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িত না করিলে কোনই ক্ষতি হইত না। 'পিশিমাকে' লেখক শেষের কবিতার মাসির ছাঁচে গড়িতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে মিঃ ঘোষের চরিত্রটি অল্প পরিসরের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উপন্যাসখানি একটু প্রচারধর্মী এবং জায়গায় জায়গায় সংলাপ অতি দীর্ঘ এবং বক্তৃতাভারাক্রান্ত হইয়াছে। ইহার প্রধান গুণ এই যে, কথা সস্তা ভাবালুতায় আবিল হইয়া উঠে নাই, ভাবুকতায় উপভোগ্য হইয়াছে। ভারতের তেত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্য হইতে চক্রধারী গণদেবতার যে বিরাট অভ্যুত্থান হইতেছে তাঁহার রথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি যেন এই উপন্যাসের ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে সুস্পষ্ট শোনা যায়।

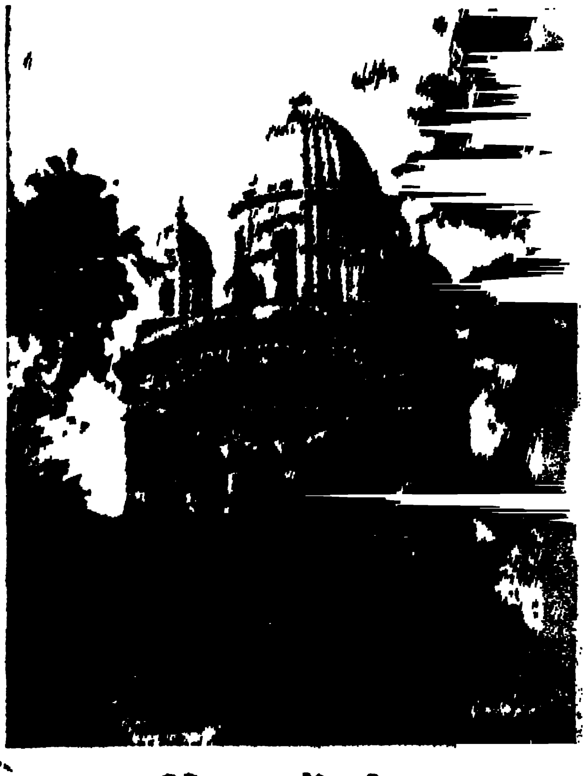
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়ার আকুই গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর শ্রীমন্দির

বাঁকুড়া জেলার আকুই গ্রামের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উক্ত মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন একখানি প্রস্তরে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ কয়েক পংক্তি লেখ দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে, ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তিন বৎসরে শেষ হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত আকুই গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার রায়-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ৺কাস্তরাম রায় মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। উহা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ (তিলকচাঁদ) বাহাদুরের জমিদারীভুক্ত ছিল। দেবসেবা নির্ব্বাহের জন্য মহারাজা যে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ ২৫০/০ বিঘা।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের সুবিখ্যাত শ্রীজীবগোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধা দামোদর জীউর সেবাইতগণের সহিত আকুই গ্রামের রায়-পরিবারের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। এই মন্দিরে যে বিগ্রহ চতুষ্টয় (শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ, শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীশ্রীগোপাল জীউ ও শ্রীশ্রীরাধা দামোদর জীউ) বিরাজিত আছেন ও নিত্য পূজিত হন তাঁহারাও শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আনীত। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মন্দিরগাত্রে যে সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে সেগুলি সেকালের বাঙালী স্থপতিদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে।



শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউর মন্দির

সম্পাদক ও প্রকাশক: শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা